দশটি উপন্যাস

দশটি উপন্যাস

দিব্যেন্দু পালিত

২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা - ৯

প্রকাশক
গোপা দাশশর্মা
অরুণকুমার বসু ও প্রণতি মুখোপাধ্যায় সংবর্ধনা সমিতি
নবার্ক। ৫৮/৪৭ বি, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড
কলকাতা ৭০০০৪৫

সম্পাদক পর্ষৎ
মুখ্য সম্পাদক : অসীম দাশশর্মা
সদস্যবৃন্দ : তুলসীদাস লাহিড়ী, বৈদ্যনাথ বসু, কাবেরী রায়, কবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্যামলী মিত্র, গীতশ্রী চট্টোপাধ্যায়, জয় ঘোষাল, মিতা বসু, অনন্যা ঘোষ।

প্রচ্ছদ
রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

অক্ষর বিন্যাস
প্রিন্ট ম্যাক্স, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

মুদ্রক
দেজ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩

সূচি

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের
অন্যান্য বই

অচেনা আবেগ
অনুভব
অন্তর্ধান
উড়োচিঠি
গল্পসমগ্র (১ম)
ঢেউ
দশটি উপন্যাস (১ম-২য়)
বহুদূর অভিমান
মাত্র কয়েকদিন
মৌনমুখর
যখন বৃষ্টি
রজত জয়ন্তী
সেকেন্ড হনিমুন
স্বপ্নের ভিতর
সঙ্গ ও প্রসঙ্গ
সিনেমায় যেমন হয়
হঠাৎ একদিন

দশটি উপন্যাস

সহযোদ্ধা

উৎসর্গ:

সমরেশ বসু

শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

লিফ্‌ট্ থেকে বেরিয়ে কলিং বেল টেপার পর দশ সেকেন্ডও অপেক্ষা করতে হল না। দরজা খুলে গেল।

তার আগে, ওয়াচম্যানের সাড়াশব্দ নেই দেখে গেট খোলার জন্যে যখন ট্যাক্সিওলাকে হর্ন দিতে বলল, তখনই, দ্বিতীয় হর্নের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে একই সঙ্গে ওয়াচম্যানকে এগিয়ে আসতে এবং ফ্ল্যাটে আলো জ্বলে উঠতে দেখেছিল আদিত্য। পৌনে তিনটে বাজে। প্রহর গুনে রাত না ভোর বলা যাবে না ঠিক ঠিক। সময়টা এমনই যখন ঘুমে কাই হয়ে থাকে মানুষ; দোঁহার ভাষায় তৎপর হয়ে ওঠে তস্কররা। তেমন কোনও প্রয়োজন নেই বলেই অবান্তর মনে হয় রাস্তার আলোগুলো—বরং আরও ঘন হয়ে ওঠে অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্য।

এত দ্রুত আলো জ্বলে ওঠার মানে এখনও জেগে আছে মহাশ্বেতা।

বেচারা! এমনিতেই ঘুম-কাতুরে। পার্টি বা ব্যস্ততার অন্য কোনও উপলক্ষ না থাকলে নটা বাজতে না বাজতেই খেয়ে নেবার জন্যে তাড়া দেয়; দশটা, সাড়ে দশটার মধ্যে প্রায়ই থেমে যায় ওর ঘড়ির কাঁটা। আজ এতক্ষণ জেগে থাকার ফলে নষ্ট হয়ে গেল পুরো রাতের ঘুম। এর পর শুলে যত বেলা পর্যন্তই ঘুমোক না কেন, আলস্যে গা ম্যাজম্যাজ করবে সারাদিন; হাইয়ের পর হাই উঠে ক্লান্তি বাড়িয়ে দেবে আরও।

দরজা অবশ্য মহাশ্বেতা খুলল না।

পৃথা। গড়নে মায়েরই মতো; তবে রঙটা চাপা, যেটা ও পেয়েছে আদিত্যর কাছ থেকে। অল্প পুরু ঠোঁটেও তারই আদল।

আদিত্য বলল, 'তুইও জেগে আছিস এখনও!'

'তুইও কি। আমিই।' আদিত্যর হাত থেকে চব্বিশ ইঞ্চি স্যুটকেসটা নিজের হাতে নিয়ে পৃথা বলল, 'যা ভাবনায় ফেলেছিলে!'

'বুঝতেই পারছি—!' লিভিং রুমের মাঝবরাবর এগিয়ে গিয়েছিল আদিত্য। জিজ্ঞেস করল, 'মা কোথায়?'

'বাড়িতে নেই—'

'কেন!'

'দাদুর হার্টের ট্রাবল শুরু হয়েছিল সকালে। খবর পেয়ে চলে গেল।'

'তারপর?'

'এগারোটায় ফোন করেছিল। ভাল আছে। অক্সিজেন খুলে নেওয়া হয়েছে। আবদুল

ফেরেনি তখনও। আমিই বললাম, রাতটা থেকে যেতে। তখন বৃষ্টিও হচ্ছিল সাংঘাতিক।'

সোফায় বসে জুতোর ফিতে খুলতে খুলতে আদিত্য বলল, 'আবদুল গিয়েছিল এয়ারপোর্টে?'

'সে তো সাতটা থেকেই গিয়ে বসেছিল।' বাবার মুখোমুখি বসার আগে ফ্যানের সুইচটা অন্ করে দিল পৃথা। তারপর বলল, 'নটা নাগাদ জানাল দু ঘণ্টা লেট। তারপর আবার ফোন করে বলল, বম্বের ফ্লাইটের কোনও খবর নেই—ওয়েদার ভাল না হলে নাও আসতে পারে। অপেক্ষা করবে কি না জানতে চাইল। বললাম চলে আসতে—'

মুখ তুলে মেয়েকে দেখল আদিত্য। পরনে হাল্কা নীল রঙের নাইটি। গলা, কান খালি। চুলের গোছা ঘাড় বেয়ে নেমে গেছে কোমরের দিকে। মুখশ্রী সুন্দর বললে নিতান্তই প্রশংসা হয়ে যায়; প্রায় ছাঁচে-ঢালা। পৃথার কপাল, চোখ, নাক ও চিবুক আরও কিছু দাবি করে। রঙ নিখুঁত ফর্সা হলে লাবণ্য থেকে বুদ্ধির ভাবটা চলে যেতে পারত। সাতচল্লিশে পৌঁছে মাঝে মাঝে ভাবে আদিত্য, শ্বেতা যা পায়নি তার অনেকটাই বেশি করে পেয়েছে পৃথা। স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়িয়ে গেল এখনও। বলল, 'ভালই করেছিস। আননেসেসারিলি লোকটা আরও তিন-চার ঘণ্টা আটকে থাকত।'

'তোমার নিশ্চয়ই আসতে খুব কষ্ট হল?'

আদিত্যর আগের কথায় ভরসা থাকলেও পৃথা এমনভাবে বলল যেন ড্রাইভারকে চলে আসতে বলে বিরাট কোনও অপরাধ করে ফেলেছে।

জুতো জোড়া পা থেকে খুলে হাসল আদিত্য।

'কষ্ট আর কি! গ্র্যান্ড হোটেল পর্যন্ত এলাম এয়ারলাইন্স-এর বাসে। তারপর ট্যাক্সিতে—'

'ট্যাক্সি পেলে?'

'পেলাম। তবে, অনেক সাধ্য-সাধনা করে—মিটারের ডাবল ভাড়া গুনে। বাড়তি টাকা তো চায়ই, তার ওপর একাধিক সওয়ারি না পেলে নড়তে রাজি হয় না। যে-রেটে খুনটুন হচ্ছে!'

কথাগুলোয় যতই ভার থাক, এই পর্যন্ত পৌঁছে হাল্কা হাসি ছড়িয়ে পড়ল আদিত্যর মুখে। ধরনটা মনে পড়ার।

বিস্ময়ে ভুরু কোঁচকাল পৃথা।

'হাসছ যে!'

'সব ট্যাক্সিই রিফিউজ করছে দেখে বুড়ো এক সর্দারজি এগিয়ে এল তার ট্যাক্সি নিয়ে। বলল, আও জি, একসাথ মরে। উড স্ট্রিট জানে মে খুন হোগা, দমদম জানে মে নেহি। রাস্তায় আসতে আসতে বলল, বেশি ভাড়া পেলে লাইফের রিস্ক নেওয়া যায়—যেন ট্যাক্সি চড়াটাই একটা রিস্ক, কে বা কারা খুন করার জন্যে বসে আছে!'

গল্পটায় জোর নেই কোনও। বিশেষত কম কথার মানুষ আদিত্যকে নাড়া দেবে, হাসাবে, এমন কোনও ঘটনাই নেই এর মধ্যে। তবু, বাবাকে দেখতে দেখতে স্বস্তি হল পৃথার—মন-মেজাজ খোলামেলা আর শরিফ থাকলেই মানুষ পারে তুচ্ছ বিষয়কে বড় করে দেখতে। শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে না প্লেন জার্নির ধকল কোনও ভাবে ক্লান্ত করেছে আদিত্যকে।

'ব্যাপারটা কিন্তু খুব হাসির নয়, বাবা।' পৃথা বলল, 'আজকের কাগজ তো পড়নি। পরশু

ভোর রাতে বেলেঘাটার খালপাড়ে চারটে ছেলেকে গুলি করে মেরেছে।'

'জানি।' আদিত্য স্বাভাবিক হল। পৃথার ওপর থেকে চোখ তুলে ব্যালকনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাসেই বলাবলি করছিলেন দুই ভদ্রলোক। গুলির শব্দে নাকি অনেকেরই ঘুম ভেঙে যায়, অনেকেই দেখেছে। এক মহিলা বাড়ির জানলায় দাঁড়িয়ে দুটি ছেলেকে চিনতেও পারেন—ওই পাড়ারই ছেলে। রক্তের ওপর বালি চাপা দিয়ে লাশগুলো ভ্যানে তুলে নিয়ে যায়—'

কথা শেষ করে একই সঙ্গে অবিশ্বাস ও অপছন্দের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল আদিত্য। ডান হাতের মুঠোটা ঠুকতে লাগল হাঁটুর ওপর, দাঁত দিয়ে চেপে ধরল নীচের ঠোঁট। আর, সচরাচর যা হয় না, হঠাৎই তীব্র ও কৌণিক হয়ে উঠল তার চোখের দৃষ্টি।

বেপরোয়া শব্দ তুলে রাস্তা দিয়ে ছুটে যাচ্ছে একটা বড় গাড়ি। লরি কিংবা ভ্যান হতে পারে। মিনিটখানেকের মধ্যে একই দিকে আরও একটা। তবে দ্বিতীয় শব্দটা শুধুই গতির। অনুসরণ করলে মনে হয় একটার পিছনে আর একটা, কিংবা প্রথমটার পিছনে তাড়া করেছে দ্বিতীয় গাড়িটা। শব্দের শুরুতেই নানা দূরত্বে ডেকে উঠেছিল একটি বা দুটি বিরক্ত কুকুর। গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতেই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল অসংখ্য কুকুরের ডাক। তারই ভিতর দিয়ে একটি কুকুরকে চাপা দিয়ে ছুটে গেল আর একটা গাড়ি, সেই একই দিকে। বিশ্রীভাবে বেঁকে গেল একটি চিৎকার—চেনা বলেই ভুল হবার কারণ নেই। হঠাৎ শুনলে মনে হত শিয়ালই বুঝি বা। তারপর আস্তে আস্তে থেমে এল আকস্মিকের সমস্ত শব্দ, চিৎকার, কাতরানি। রাস্তার ওদিকে আমগাছের আড়াল থেকে কিছু দূর শূন্যে উড়ে আবার বাঁক নিয়ে গাছের আড়ালে চলে গেল একটা কাক।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর জুতোজোড়া হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল আদিত্য।

'বাচ্চু কোথায়? ঘুমুচ্ছে?'

'আর কি!' বাবা সম্পর্কে এই মুহূর্তের ভাবনাগুলো আড়াল করে পৃথা বলল, 'বারোটা পর্যন্ত লুডো খেললাম দুজনে। আর পারল না—'

'বারোটা! এটা কিন্তু তোর টরচার।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে প্রশ্রয়ের গলায় বলল আদিত্য, 'আসলে তুই নিজেও তো খুব সাহসী!'

'তা কেন!' পৃথা বলল, 'মা বাড়িতে নেই, তুমিও নেই! ফিরবে কি ফিরবে না তাও বুঝতে পারছি না। মাঝখানে ভাবলাম কোয়ার্টার থেকে সত্যকে ডেকে পাঠাই—'

'সেটা না করে ভালই করেছিস। ভয় লাগাটা স্বাভাবিক, তবে ফ্ল্যাটের ভেতরে তো। প্রোটেকশানের অভাব নেই এখানে—'

তিন বেডরুমের ফ্ল্যাটে বেডরুম হিসেবে ব্যবহার হয় দুটো। স্বামী-স্ত্রীর জন্যে একটা, পৃথা-বাচ্চুর জন্যে আর একটা। তৃতীয়টা এখনও ব্যবহার হয় স্টাডিরুম হিসেবে। লেখাজোকা, পড়াশুনো, আদিত্যর সবই ওখানে। অভ্যাসটা এমনই যে ওই ঘরে নির্দিষ্ট চেয়ার-টেবিলে না বসলে কনসেনট্রেসন আসে না লেখায়, কেমন খাপছাড়া লাগে নিজেকে। অবশ্য ঘরটার ওপর আগে যতটা দখল ছিল এখন আর তা নেই। যখন বাড়িতে থাকে না, কিংবা বেরুতে হয় ট্যুরে—তখন পৃথাই ব্যবহার করে ঘরটা। লেখাপড়ার ব্যাপারে বেশ সিরিয়াস মেয়েটা। বি.এ. পড়ছে ইংরিজি অনার্স নিয়ে, এইটেই শেষ বছর। এই সময় ওর নিজস্ব একটা পড়ার ঘর থাকলে ভাল হত। একই কারণে না হলেও, শ্বেতাও চায় পৃথা ও

বাচ্চুর জন্যে আলাদা আলাদা ঘর হোক—বাচ্চুও তো বড় হচ্ছে দিন দিন। কিছুদিন আগেই চলে গেল ওর বারো বছরের জন্মদিন।

ওদের বেডরুমের পর্দা সরিয়ে ছেলেকে একনজর দেখে নিল আদিত্য। জায়গাটা ছেড়ে নড়ল না। বাসে, ঠিক তার পিছনের সিটে বসে, চাপা স্বরে কথা বলছিলেন দুজনে। কান খাড়া রাখায় সমস্তই শুনেছে আদিত্য। ষোলো থেকে ছত্রিশ—পুরুষ হলেই হল, ঘাড় ধরে টেনে বের করে নিয়ে যাচ্ছে। তারপরেই গুলি। মেয়ে না হয়ে ছেলে হলে পৃথাও আজ ওই বয়সে, ওই স্পেসিফিকেসনে ফিট করে যেত। বাচ্চু এখন বারোয়। বিপ্লব বা গণতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার যে-কোনও একটা বন্ধ না হলে আর বছর তিনেকের মধ্যে বাচ্চুকে নিয়েও ভাবতে হবে তাকে।

হঠাৎ হাই উঠে আসায় দাঁতে দাঁত চেপে চোয়াল শক্ত করল আদিত্য। হঠাৎ ফাঁকা লাগছে মাথাটা। অন্য কোনও কথা মনে এল না।

পৃথা পাশের ঘরে গিয়েছিল। ফিরে এসে আদিত্যর হাত থেকে জুতো জোড়া টেনে নিয়ে পায়জামা-পাঞ্জাবি এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন। হাতমুখ ধুয়ে জামা-কাপড় ছেড়ে নাও।'

'হ্যাঁ। নিচ্ছি।'

'কিছু খাবে?'

'নাঃ। বোম্বে এয়ারপোর্টে ডিনার কুপন দিয়েছিল। খেয়ে নিলাম।' আদিত্যর চোখ এখনও পৃথাদের ঘরের অন্ধকারে। দৃষ্টি বাচ্চুকে ছুঁয়ে থাকলেও নির্দিষ্ট কিছু দেখছে না। যতটা না এলোমেলো তার চেয়ে বেশি অন্যমনস্ক। একইভাবে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোদের কলেজ খোলার কোনও খবর পেলি?'

'না। খুলবে বলে মনে হয় না।'

আদিত্য শুনল বলে মনে হল না।

পিছন থেকে দেখলে লম্বা, দোহারা চেহারার বাবাকে কেমন অন্যরকম লাগে। মনে হয় এটাই আদিত্যর ভঙ্গি, এই মুহূর্তের সমস্ত কিছু থেকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়েছে। অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য গোটা শরীরে—যেন একার জগৎ নিয়ে নিজেই চলে যাবে কোথাও, কিংবা আলাদা হয়ে যাবে আশপাশের বস্তু ও বিষয় থেকে। মাত্র কিছুক্ষণ আগে এই লোকই গুলি চালানোর খবরে মুঠো ঠুকেছিল হাঁটুতে, অনেক দূর ভিতর পর্যন্ত প্রতিক্রিয়ার জেরে তীব্র হয়ে উঠেছিল চোখের দৃষ্টি। ভাবা যায় না, এই মানুষটিই অফিস যাবার জন্যে কাঁটায় কাঁটায় নটায় গাড়িতে ওঠে; অফিসে, এয়ার-কন্ডিশানড্ ঘরে বসে অনর্গল বকতে পারে ইংরিজিতে; মাসে দুবার না হলে একবার অন্তত প্লেনে চড়ে ট্যুরে যায়—ঘুরে আসে বম্বে, দিল্লি, মাদ্রাজ কিংবা বাঙ্গালোর, ত্রিবান্দ্রম থেকে। এই মানুষটিই লেখে; পাতার পর পাতা, কখনও বা ফ্লাস্ক থেকে ব্ল্যাক কফি ঢেলে, সারা রাত, সেই সব লেখা ছাপা হয় নামকরা সমস্ত কাগজে, বই হয়ে বেরোয়, বহু লোকে পড়েও নিশ্চয়ই—না হলে আদিত্য রায় নামটা বলার পরেই এমন কী অচেনা লোকও কেন বলে উঠবে, লেখক? এই তার বাবা, তার অনেকদিনের চেনা। তবুও মাঝে মাঝে এত অচেনা আর একা লাগে কেন! কেন মনে হয়, রক্তের সম্পর্কটা আপেক্ষিক—আসলে নিজের মধ্যেই একটা দ্বীপ হয়ে আছে বাবা!

এই মুহূর্তে পায়জামা পাঞ্জাবি নিয়ে শান্তভাবে আদিত্যকে বাথরুমে ঢুকতে দেখে পৃথা

ভাবল, অসুবিধে ছিল ঠিকই, তবু, চারদিন পরে বাড়ি ফিরছে বাবা—মা ফিরে এলেও পারত!

মন ব্যাপারটা সাংঘাতিক, একবার কাদায় পড়লে টেনে তোলা মুশকিল। তার চেয়ে অনেক ভাল কাদার দিকে পিছন ফিরে হাঁটা। এইভাবে নিজেকে বোঝাল আদিত্য, যাতে মাথার মধ্যে হঠাৎ ঢুকে-পড়া দুর্ভাবনার ভারটা নামিয়ে ফেলতে পারে। মোটামুটি ভাল একটা চাকরি, আর্থিক স্বাচ্ছল্য এবং লেখক হিসেবে কিছু পরিচিতি—কার্যকরভাবে বিশিষ্ট হয়ে ওঠার পক্ষে এগুলো কোনও মূলধন নয়, হতেও পারে না। হাজার অনুনয়, অনুরোধ, স্তাবকতার পরেও যার কথায় সাধারণ একজন ট্যাক্সিওলারও মন গলে না—একজনের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে ছুটতে হয় আর একজনের কাছে, একই গলার প্রার্থনা নিয়ে; তার সঙ্গে নামহীন অতি সাধারণ যে-লোকটি অফিস-শেষের এসপ্ল্যানেডে দাঁড়িয়ে যে-কোনও একটি বাসে শরীর গলানোর জন্যে এদিক থেকে ওদিকে ছুটোছুটি করে এবং ব্যর্থ হয়, তার তফাত কোথায়? না, সত্যিই তফাত নেই কোনও। শুধু ক্ষমতাই পারে এই তফাতটা এনে দিতে—নির্দেশ দিতে এবং দেওয়াতে। ক্ষমতা না থাকলে যে-কোনও ঘটনা, যে-কোনও অন্যায়ের সামনে দাঁড়িয়েই বোধ করতে হবে অসহায়, দুঃখে ঝাঁ ঝাঁ করবে মাথা, নিজের এলাকা ও অধিকারের বাইরে এক পা বাড়ালেই আকস্মিক শব্দে জেগে উঠবে ঘুমন্ত মানুষ। খানিক আগে পৃথার সঙ্গে গল্প করতে করতে নিজের ভিতরে এই অসহায়তাটা টের পেয়েছিল আদিত্য, বিক্ষোভে শক্ত হয়ে উঠেছিল মুঠো। মজা এই, সবল ও অক্ষম, দুজনেরই হাতে থাকে মুঠো—দান হিসেবে পাওয়া কিছু কিছু ব্যাপারকেই মনে হয় অধিকার!

নিজেকে উপহাস করতে পারলে অনেক জটই খুলে যায়। ফিরে আসে স্বাচ্ছন্দ্যও। এখনও তাই হল। মাথায়, মুখে জল দিয়ে, চটপট পোশাক বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে আদিত্য দেখল বিছানা গুছিয়ে তার শোবার ব্যবস্থা করছে পৃথা। শ্বেতা ও আবদুলকে যা বলার বললেও, বোঝাই যায়, আদিত্য না-ফেরায় এবং ফেরা সম্পর্কে নির্দিষ্ট কোনও খবর না থাকায় বিরাট একটা টেনসনে ভুগছিল মেয়েটা। ভাইকে ঘুমোতে দিলেও নিজে ঘুমোয়নি। ঘুম ভেঙে জেগে ওঠা মানুষের চোখমুখের চেহারা আলাদা হয়—দায়িত্বপালন ছাড়া অনিচ্ছা ও অবসাদ আর কিছুই করাতে পারে না, হাই ওঠে, গলার স্বরেও জড়িয়ে থাকে আলস্য। দরজা খোলা থেকে এই পর্যন্ত পৃথার চোখমুখ ব্যবহারে সেরকম কিছুই ধরা পড়েনি। এত স্বাভাবিক আর জড়তামুক্ত যে মনে হয় রাতের গভীরেও টেনে এনেছে দিনের বেলার স্বাভাবিকতা। টেনসন কেটে যাওয়ার খুশিতে এখন আরও চনমনে।

বিছানার এদিক থেকে ওদিকে যাওয়া পৃথাকে দেখতে দেখতে বুক ভরে গেল আদিত্যর। ফ্লাইটের গোলমাল হওয়ায় আজ রাতে না ফিরে কাল সকালেও ফিরতে পারত। বাড়ির টানেই বাতিল করেছিল অপসন। এখন মনে হচ্ছে সিদ্ধান্তটা ঠিকই নিয়েছিল; না ফিরলে শ্বেতাহীন বাড়িতে নিজ রক্তজাতিকার চমৎকার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হত সে। নিরুপায় কিছু দুর্ভাবনা ছাড়াও আজকের রাতটা তাকে উপহার দিয়ে গেল বিরল কিছু অনুভূতি। অফিস, ট্যুর, লেখা, পার্টি—এই সব নিয়েই কেটে যায় দিনের পর দিন, কতক্ষণই আর একান্ত করে পাওয়া যায় ওদের!

'মা-মণি, একটু কফি পাওয়া যেতে পারে?'

'এত রাতে কফি!' ঘরের আড়াল থেকেই জবাব দিল পৃথা, 'ঘুমোবে কখন?'

'রাত আর কোথায়! সাড়ে তিনটে বাজল বোধ হয়।' পৃথাকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় দিয়ে আদিত্য বলল, 'এমনিতেই পাঁচটায় মর্নিং-ওয়াকে যাই। আজ না হয় আগে বেরুব—শরীরটাও ছাড়ানো যাবে।'

তিন হাত দূরত্ব থেকে স্পষ্ট চোখে আদিত্যর দিকে তাকাল পৃথা।

'টায়ার্ড লাগছে?'

'না। বরং ঝরঝরে লাগছে অনেক। তবে, অনিশ্চয়তার একটা জের আছে তো, স্নায়ুর ওপর চাপ পড়ে।'

'মাঝে মাঝে তুমি তোমার চরিত্রদের ভাষায় কথা বলো!' বাবাকে দেখতে দেখতে হাল্‌কা হবার সুযোগটা ছাড়ল না পৃথা, 'তুমি বোসো। আমি কফি বানিয়ে আনছি।'

কফি বানাবার জন্যে রান্নাঘরে ঢুকল পৃথা। আদিত্য চলে এল বসার ঘরে।

আমি আমার চরিত্রদের ভাষায় কথা বলি না—পৃথাকে বলা যেত, চরিত্ররাই কথা বলে আমার ভাষায়। আমারই অভিজ্ঞতা, অভিমান, আবেগ ও দুঃখ থেকে জন্ম নেয় তারা, ক্রমশ গড়ে ওঠে আমাবই ভালবাসা ও ঘৃণায়, গুপ্তঘাতকের চক্রান্তে—যা আমি হতে পারতাম কিন্তু হইনি, যা আমি পেতে পারতাম কিন্তু পাইনি, এইভাবে। তার পর আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে ওঠে নিজেদের পায়ে। ছোট্ট কাচের জারে জডাজড়ি করে বেঁচে থাকা মাছগুলোকে অ্যাকুইবিয়ামেব বড় জলে উপুড় করে ছেড়ে দিলেই ডানার জড়তা কাটিয়ে আত্মহারা, তারা ছুটতে থাকে নানা দিকে। ওইভাবেই পেয়ে যায় যে যার নিজের রঙ ও পূর্ণতা। তারপর আবার ফিরে আসে পরস্পরের দিকে—মেতে ওঠে আলাপ, পবিচয়, ভালবাসা ও আক্রমণে। যে যেমন সে তেমন রপ্ত করে নেয় ভাষা; একই জল থেকে টেনে নেয় বাঁচার বিভিন্ন উপকরণ। আলাদা হয়ে যায় রক্তের গ্রুপ। ব্যবহারও। তখনই গোলমাল হতে থাকে তাদের সামাজিক বিন্যাসে, গণতন্ত্রে। একজন ভয় দেখায় আর একজন ভয় পাবে বলে। একজন গুলি চালায় যাতে গুলি করার একই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় আর একজনকে।

না, এসব বলা যাবে না।

নিজেকে নিজেরই দুর্বোধ্য লাগে আদিত্যর। আজ, এখন বলে নয়; প্রায়ই। মাঝে মাঝে মনে হয় নিজেকে নিজের ব্যাখ্যার দ্বারা চালিত করার মধ্যে আবেগ যতটা আছে সততা ঠিক ততখানি নেই। কিংবা লেখা নিয়ে, দেশ, সমাজ, রাজনীতি ও মানুষ সম্পর্কে লেখকের প্রতিক্রিয়া নিয়ে সে যা যা ভাবে ও যে-ভাষায়, তার মধ্যেও অভিনবত্ব নেই কোনও। তার আগেও আরও অনেক লেখক ভেবে গেছে এসব, তার পরেও ভাববে আরও অনেকে। সমাজ ও মানুষ তাতে বদলাবে না এতটুকুও। বোধহয় এটাই সত্যি, ভাবনার ভাষা ও প্রতিক্রিয়ার ভাষা এক নয়; আর প্রতিক্রিয়া যতক্ষণ না হয়ে উঠছে শারীরিক ও প্রত্যক্ষ, ততক্ষণ শুধু অক্ষরে আবদ্ধ তার অস্তিত্ব নিয়ে নাড়াচাড়া করবে কিছু লোক, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে পাঠক-পাঠিকা—যারা ক্ষুধার বিবরণ পড়তে পড়তে নিজেরাও হয়ে ওঠে ক্ষুধার্ত, তার পরও যা গেলে সবই চোখ দিয়ে, শেখেনি মুখ কিংবা দাঁতের ব্যবহার; অক্ষরই তাদের তেল-নুন-লকড়ি। খুব সহজে চেনা যায় এদের—এরা তারই সগোত্র। এই যে কোথাও কিছু নেই খুন হয়ে গেল চারটে ছেলে, এদের কথা ভেবে খানিক আগেই মুঠো শক্ত

হয়ে উঠেছিল তার। ব্যস, ওইটুকুই। মুঠো আলগা হতে দেরি হল না। কারণ, ততক্ষণে এসে গেছে নিরাপত্তার চিন্তা। পৃথা মেয়ে না হলে কী হত, আর বছর তিনেকের মধ্যেই বাচ্চুও পৌঁছে যাবে ওই খুন হবার বয়সে, ইত্যাদি। এই ভাবনা নিয়েই আর একটু পরে ময়দানের দিকে মর্নিং-ওয়াক করতে হেঁটে যাবে সে—বছর দুয়েক আগে বুকে ব্যথা এবং ইস্‌কিমিয়া ধরা পড়ার পর শরীর ঠিক রাখার জন্যে আরও বেশি হাঁটা-চলা করার পরামর্শ দিয়েছিলেন ডাক্তার। ফিরে আসতে আসতে কাগজ দিয়ে যাবে হকার। যতটা সম্ভব খুঁটিয়ে পড়বে বাংলা ও ইংরিজি দুটো কাগজ, কারণ অন্য কেউ যেটা জানে সেটা না জানা থাকলে কেমন অপরিণত লাগে নিজেকে। তারপর অফিসে যাবে ঘড়ির কাঁটা ধরে। চাকরির জন্যেই উড স্ট্রিটের এই ফ্ল্যাট এবং অন্যান্য ভাল থাকা; চাকরিটা আছে বলেই লেখালেখির ব্যাপারটা চালিয়ে যেতে পারছে নিজের ইচ্ছেমতো। না হলে লিখতে হত সিনেমার গল্প, শিকার কাহিনী, ভ্রমণ কাহিনী, এইসব। লেখাটা দরকার বেঁচে থাকার জন্যে। তা ছাড়া লেখাই তাকে এনে দিয়েছে এক ধরনের প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, আর পাঁচজনের থেকে আলাদা হয়ে বাঁচার সুযোগ। বহুদিনের অভ্যাস এখন পরিণত হয়েছে আশ্রয়ে। মানুষের ইতিহাস যদি তার অগ্রগতির ইতিহাস হয়, তা হলে যৌবন থেকে প্রায় প্রৌঢ়ত্বে সে নিজেও কম এগোয়নি। খেলাটা এমনই যে এখন তাকে হয় আরও এগোতে হবে না হয় থেমে পড়তে হবে সব ঝুট্‌ হ্যায় বলে। সেটা সম্ভব নয়। সমস্ত রোগের মধ্যে পক্ষাঘাতটাকেই সব চেয়ে বেশি ঘৃণা করে আদিত্য।

জোর করে বেরিয়ে আসা নিঃশ্বাসটা আড়াল করতে গিয়ে একটা উপমা মনে এসে গেল আদিত্যর। মন্দির চূড়ার পতাকা। অবস্থানের কৌলীন্যই তাকে করে রাখে আলাদা—রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, সমস্ত কিছুর প্রভাবই যখন যেমন আসে সয়ে নেয় নির্বিশেষে; বিবর্ণ, জীর্ণ এবং কখনও বা আন্দোলিত হলেও অবস্থানের খুঁটি ছেড়ে বেরুতে তার বড় ভয়। এইভাবেই একদিন এসে যায় ক্ষয়; যদি না তারও আগে এসে পড়ে এমন কোনও সাইক্লোন বা ভূমিকম্প যা তার অবস্থানের পবিত্র পটভূমি মন্দিরটাকেই দেবে ধসিয়ে!

'বাবা, তুমি এত অন্যমনস্ক কেন!'

'কেন!'

'কফি চাইলে। কখন কফি দিয়েছি খেয়াল নেই তোমার! ওটা তো গতকালের কাগজ, বাসী! কী পড়ছ বলো তো অত মন দিয়ে?'

'কিছু না। চোখ বোলাচ্ছিলাম—।' ধরা পড়ার ভঙ্গিতে পৃথার প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল আদিত্য; পৃথা বলাতেই বুঝতে পারল এতক্ষণ তার চোখ ছিল দু হাতে ধরা খবরের কাগজের পাতায়। নিজেকেই পড়ছিল। কফির কাপ হাতে তুলে রীতিমতো আগ্রহে চুমুক দিয়ে বলল, 'ভাল হয়েছে। খুব রিফ্রেশিং—'

'ওটা তোমার ধারণার কথা। এক চুমুক দিয়েই কোনও ক্লান্ত লোক রিফ্রেশড্‌ হয় না।'

পৃথার মুখ ভার। ওকে খুশি করার চেষ্টায় কফিতে আর এক চুমুক দিয়ে আদিত্য বলল, 'একটু আগে আমাকে ঠুকলি। এবার তুইও কথা বলছিস আমার চরিত্রের ভাষায়।'

'আমাকে প্লিজ করতে হবে না।' পৃথা বলল, 'কফিটা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে বোঝাই যায়। একটুও ধোঁয়া নেই—আমি দেখতে পাচ্ছি—'

আদিত্য হাসল। নিজের মেয়ে বলে বাঁচোয়া; না হলে কফি চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীন

অন্যমনস্কতায় সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া পরিষ্কার অবহেলার পর্যায়ে পড়ে। আর কেউ হলে অপমান খুঁজত। পৃথার অভিমানের কারণ আছে।

'রাগ করছিস কেন! ব্ল্যাক কফি ঠাণ্ডা করে খেলে আলাদা মেজাজ আসে—স্বাদটাও পাল্টে যায়—'

'চারদিনেই তোমার টেস্ট পাল্টে গেল, এটা তো হতে পারে না—', বলতে বলতে মুখ নামিয়ে নিল পৃথা। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমি জানি তুমি কি ভাবছ!'

'কী!'

'মা'র কথা। এত কাণ্ড করে বাড়ি ফিরে মাকে না দেখে—'

'এই-এই-এই—,' পৃথাকে আর এগোতে দিল না আদিত্য। কৌতুকের গলায় বলল, 'কোনও বুদ্ধিমতী মেয়েরই এমন চটপটে ব্যাখ্যায় যাওয়া উচিত নয়। নিজেই তো বললি দাদুর অসুখ, এত রাতে ফেরার অসুবিধে দেখে আসতে মানা করেছিস!'

পৃথা চুপ করে থাকল।

আদিত্যর দৃষ্টি নরম হয়ে এল। শেষ চুমুকে একসঙ্গে অনেকটা কফি গিলে নিয়ে বলল, 'সরল মন তোর, সব সময়েই গড়ে তুলতে চাস একটা আইডিয়াল সিচ্যুয়েসন। বাবা বাড়ি ফিরবে, মা দরজা খুলে দেবে, তারপর আমরা একসঙ্গে গোল হয়ে বসে গল্প করব—'

থামার প্রয়োজনেই এই জায়গায় থামল আদিত্য; খুটিয়ে দেখল মেয়েকে।

'কী মা-মণি, ঠিক বলিনি?'

জবাব না দিয়ে নাইটির নরম চাদরে আঙুল টানতে লাগল পৃথা।

আদিত্য বলল, 'আগে আগে—যখন বয়স কম ছিল, আমিও এইরকমই ভাবতাম। আশায় সারাক্ষণ ভরে থাকত মন। পরে দেখলাম, আইডিয়াল সিচ্যুয়েসন বলে কিছু নেই, এ-সম্পর্কে ধারণাগুলোই শুধু ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে চারিদিকে। তাদের একত্র করে একটা সম্পূর্ণ আকার দেওয়া কখনওই সম্ভব হয় না। হলে আমার ফ্লাইট ডিলেড হত না, তোর দাদুর অসুখ করত না, বৃষ্টি পড়ত না সাংঘাতিক, খবর পেয়েই গাড়ি নিয়ে তোর মাকে ফেরত আনতে চলে যেতে পারত আবদুল। এর কোনওটাই হয়নি। মা ফিরবে কেমন করে!'

'আমি অত ভেবে বলিনি, বাবা।'

'জানি। ভেবে বললেও অন্যায় বলতিস না কিছু। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম অন্য কারণে—তোকে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না কেন! হয়তো আরও একটু বড় হয়ে যখন আরও একটু বড় করে ভাবতে পারবি, নিজেই বুঝবি কোনও মানুষই তার চার দেওয়ালের নিরাপত্তার মধ্যে সুখে থাকার জন্যে তৈরি হয় না। তাকে বেরোতে হয় আরও বড় একটা জায়গায় ঘোরাফেরা করার জন্যে—যেটার নাম সমাজ। সেখানেও কিছুই আইডিয়াল নয়। এই ভাবনা, ঘর আর বাইরের এই টানাপড়েনটাই গোলমাল করে দেয় সব কিছু। অচেনা লাগে—অসহায় লাগে—'

দূর থেকে এগিয়ে আসছিল অস্পষ্ট একটা ধ্বনি; আদিত্যর কথা পুরোপুরি শেষ হবার আগেই প্রচণ্ড হয়ে উঠল। আরও একটা গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ভীষণ গতিতে, তাদেরই বাড়ির সামনে দিয়ে। শব্দের তাড়ায় আবার জেগে উঠল রাস্তার কুকুরগুলো—গাছের অন্ধকার থেকে ঝটাপটি করে ডাকতে ডাকতে বেশ কয়েকটা কাক একসঙ্গে উড়ে গেল আকাশে।

শব্দ শুনেই ব্যালকনির দিকে উঠে গিয়েছিল পৃথা। গাড়িটা চলে যাবার পর রেলিংয়ের

ওপর ঝুঁকে এদিক-ওদিক দেখে ফিরে তাকাল আদিত্যর দিকে।

'পুলিশ ভ্যান।'

'তাই আন্দাজ করেছিলাম—'

আদিত্য উঠে দাঁড়াল। কাঁধের দুদিকে দু হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে হেঁটে গেল মেয়ের কাছে। পৃথার কাঁধে আলগোছে হাত রেখে বলল, 'চারটে বেজে গেল বোধ হয়। অনেকক্ষণ জাগা হল, তুই এবার শুয়ে পড়। এর পর শরীর খারাপ করবে—'

পৃথা আবার রেলিংয়ের ওপর ঝুঁকল। সেই আগেরই ভঙ্গি—যত দূর চোখ যায় দেখে নিচ্ছে কিছু। তারপর বলল, 'এত ঘন ঘন পুলিশের গাড়ি ছুটছে কেন বলো তো?'

অল্প ভাবল আদিত্য, রাস্তা দেখল। তারপর বলল, 'হয়তো রোজই ছোটে এইভাবে, টহল দিয়ে বেড়ায়। আজ জেগে আছি বলে চোখে পড়ছে। ঘুমিয়ে থাকলে টের পাওয়া যেত না।'

ভোর হবার আগে নতুন করে অন্ধকার জমতে শুরু করেছে আকাশে। চোখ তুলে একটিও তারা দেখতে পেল না আদিত্য; চাঁদের আভা বলতেও ছিটেফোটা নেই কোথাও। তখন মনে পড়ল, কৃষ্ণপক্ষ চলছে। সামনাসামনি দিগন্তে বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে যেতে বুঝতে পারল মেঘও আছে আকাশে। এতটুকু হাওয়া নেই কোথাও। সন্ধে থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত বৃষ্টি হবার পরে ধরে এসেছিল আকাশ। আগস্ট মানেই পুরোপুরি বর্ষাকাল; এখন যখন-তখন নামতে পারে।

পৃথা হাই তুলল। মস্ত হাঁয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ওর নিঃশ্বাসের গন্ধ।

'সাংঘাতিক ঘুম পেয়েছে তোর! যা, শুয়ে পড়গে—'

'যাচ্ছি।' এবার নিজে থেকেই যাবার তাড়া দেখাল পৃথা, 'তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিলে পারতে—'

'বললাম তো, দরকার নেই। আকাশ একটু পরিষ্কার হলেই বেরুবো।'

'দরজাটা ভাল করে টেনে দিও। চাবি বুক সেল্‌ফের মাথায় আছে।'

পৃথা চলে যাচ্ছিল, আদিত্য আবার ডাকল।

'কেউ ফোনটোন করেছিল?'

'ওই তো, তোমার অফিস থেকে শেখর দত্ত।' থেমে দাঁড়িয়ে একটুক্ষণ ভাবল পৃথা, 'ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি। 'স্বকাল' থেকে দেবু চৌধুরী ফোন করেছিলেন কাল বিকেলে। ফিরে এলেই যোগাযোগ করতে বলেছেন—'

'আচ্ছা।'

পৃথা চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই পৃথা ছিল এমন মনে হল না। শূন্য হয়ে এল মাথা। এমনও হতে পারে শূন্যতার বোধ আক্ষরিক হয় না কখনও। অফিস, লেখালেখি, সংসার, সমস্তই জড়াজড়ি করে আছে বলে কোনওটাই পাচ্ছে না নির্দিষ্ট কোনও রূপ। এমন কী, প্রায় ঘণ্টাখানেক কি তারও বেশিক্ষণ ধরে অস্বস্তিকর যেসব চিন্তা বার বার অন্যমনস্ক করে দিচ্ছিল তাকে, এখন সেগুলোও নেই। শ্বেতার কথা মনে পড়ল একবার—সঙ্গে সঙ্গে তার মুখ, শরীর ও শরীরের সুগন্ধ; অনুভূতিতে জড়ানোর আগেই হারিয়ে গেল আবার।

একই ভাবে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে, বেশ কিছুটা সময় আকাশের দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিল আদিত্য। আকাশের রঙে তেমন কোনও তারতম্য না হলেও ভোর হবার লক্ষণগুলো পরিষ্কার হচ্ছে ক্রমশ। পাখির গলা স্পষ্ট হচ্ছে দূরে, পার্কের ওদিকে জাহাজ প্যাটার্নের

বাড়িটার একেবারে ওপরের তলার একটি ঘরে আলো জ্বলে উঠল। অলস গতিতে সাইকেল চালিয়ে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে দুটি লোক—নৈঃশব্দ্য আছে বলেই তাদের হিজিবিজি গলার স্বর উঠে এল কানে। অনেক দূরে, দিগন্ত যেখানে মাটি স্পর্শ করে বলে ভ্রম হয় সেখানে, আদিত্য দেখল, আকাশের কালো থেকে আলাদা হয়ে ফুটে উঠেছে অল্প লালের আভা। একটা ট্যাক্সি হর্ন দিতে দিতে দক্ষিণ থেকে উত্তরে চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে কানে এল পরবর্তী শব্দ—এবার তাদের বাড়ির নীচে থেকেই। গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছে কেউ। দু-তিন মিনিটের মধ্যে ব্যস্তভাবে গেট খুলে দিল ওয়াচম্যান—বেরিয়ে যাচ্ছে একটা সাদা অ্যামবাসাডর। আরোহীকে চেনা না গেলেও অনুমান করতে অসুবিধা হয় না ভোরের ফ্লাইটের যাত্রী, এখন ছুটবে এয়ারপোর্টের দিকে। আদিত্য জানে, বত্রিশ ফ্ল্যাটের এই মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংয়ের কেউ না কেউ ভোরের এই সময় বেরিয়ে যায় প্রতিদিন। তাদের সকলের নাম সে জানে না, অনেকের মুখও চেনে না। বছর দুয়েক আগে দিল্লির কাছে একটা প্লেন ভেঙে পড়ার পর খবরের কাগজে নিহত যাত্রীদের নাম বেরুনোর পর সে জানতে পেরেছিল তাদের একজন ছিল এই বাড়িরই কোনও এক ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। দিন দশেক পরে একদিন সকালে ফ্ল্যাটের দরজায় বেল বাজার পর দরজা খুলে একটি বিষণ্ণমুখ কিশোরীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে খুবই অবাক হয়েছিল আদিত্য। মেয়েটির হাতে শ্রাদ্ধের চিঠি। নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, 'বাবা আপনার লেখার খুব ভক্ত ছিলেন। প্রায়ই বলতেন আপনার সঙ্গে এসে আলাপ কববেন। তাই—মা বললেন—যদি বাবার কাজের দিন—।' বলতে বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েছিল কিশোরী মেয়েটি। দুর্ঘটনায় সদ্য পিতৃহারা মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিতে দিতে আদিত্যর মনে হয়েছিল, মেয়েটি কাঁদছে শোকের চেয়ে বেশি অভিমানে, কিংবা রাগে। যে-আদিত্যকে তার বাবা এত ভাল করে চিনত, সে কেন এত কাছে থেকেও তার বাবাকে চিনত না, এই প্রশ্নজনিত অপমানে।

অন্ধকার কাটবার আগেই আশপাশে চারিদিক খুলে যাচ্ছে দেখে মর্নিংওয়াকের উদ্দেশ্যে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল আদিত্য। সঙ্গে সঙ্গে ভাবনাগুলোও এল। বড় অদ্ভুত ব্যাপার এই মৃত্যু—দ্রুত কিন্তু চিন্তিত ভাবে নির্জন ময়রা স্ট্রিট, লর্ড সিন্‌হা রোড পেরিয়ে চৌরঙ্গি রোডে পৌঁছে ভাবল কেউই জানে না কার জন্যে, কখন অপেক্ষা করে আছে কোথায়! কোনও কোনও অপরিচিতের মৃত্যুসংবাদ পাবার পর মনে হয় এর সঙ্গে পরিচয় থাকলে ভাল হত। হয়তো দেখার চোখ পাল্টে যেত একটু, জীবনও। হয়তো খুলে যেত নতুন কোনও আশ্রয়।

এলোমেলো ভাবনাই করে রাখে আচ্ছন্ন। হাঁটায় অনুভূতি থাকে না কোনও। তবু, ময়দানের গাছগুলির সান্নিধ্যে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে ভোরের হাওয়ার স্পর্শে চনমনে হয়ে উঠল স্নায়ু। নিঃশ্বাসে মিশিয়ে বুক ভরে সেই হাওয়া টানতে টানতে অন্যমনস্ক ভাবনার মধ্যে এদিক-ওদিক তাকিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল আদিত্য। দেখল, দূরে, ময়দানের পশ্চিম দিকে, আবছায়া অন্ধকারের মধ্যে নিভে গেল একটা গাড়ির হেডলাইটের জোরালো আলো। আকৃতি কিছুটা স্পষ্ট হতেই মনে হল, পুলিশ ভ্যান। একটি রোগা ও লম্বা লোক নেমেই দৌড়তে শুরু করল—তার পিছনেও কয়েকজন। তার পরেই গুলির শব্দ—। লোকটা পড়ে গেল মাটিতে।

কয়েক মুহূর্ত। তার পরেই দৌড় দিল আদিত্য।

২

মাথার মধ্যে সরু আঙুলের বিলি কাটা, দুদিক থেকে চোয়াল ধরে নাড়ানো এবং ওরই মধ্যে কপালে আলতো ঠোঁট চেপে ধরা—পরিচিত এইসব স্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল আদিত্যর। দেখল, সংলগ্ন বালিশে মাথা রেখে শুয়ে আছে শ্বেতা, ঠিক সেই জায়গায় যেখানে গত রাতেই শোবার কথা ছিল তার। শোয়নি যে তার কারণটাও অজানা নয়। দিব্যি ফিটফাট, স্নান সারা ও কাপড় বদলানো, সাবধানে আঁকা গোল সিঁদুরের টিপ জ্বলজ্বল করছে কপালের মাঝখানে—সব মিলিয়ে এমনই যে চাইলেই উজাড় করে দেবে লাবণ্য। একুশ বছর ধরে ক্রমাগত ব্যবহার করার পরও শরীর আর স্বাস্থ্য মোটামুটি ধরে রেখেছে শ্বেতা। একুশ বছর ধরে একই রূপ দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে যাবার কথা আদিত্যর; তবু, শ্বেতা জানে, রহস্য কীভাবে আড়াল করে রাখতে হয়।

আদিত্য উঠে বসল। এই অবস্থায় সোজাসুজি দেয়ালের দিকে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে জাপানি দেয়াল-ঘড়িটা। আটটা বেজে দশ। অবশ্য ঘর ভর্তি আলো দেখেও সময় আন্দাজ করা কঠিন হত না।

এই ভাবনাই ঠেলে দিল আরও একটি অনুমানের দিকে।

আশঙ্কা ও উত্তেজনা চাপা দেবার জন্যে বিপর্যস্ত সে যখন বিছানার আশ্রয় নিয়েছিল, তখন পাঁচটা বেজে কয়েক মিনিট মাত্র—তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছে পৃথা, বাচ্চুর ভঙ্গিতেও পরিবর্তন হয়নি কোনও, আকাশে আলো ফুটলেও ফ্ল্যাটের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে আছে শেষ রাতের অন্ধকার। অন্য কোনও কারণ না থাকলে সাধারণত ছ'টার আগে নীচের সারভেন্টস কোয়ার্টার্স থেকে সত্যও উঠে আসে না। তার ফিরে আসাটা, সুতরাং, কেউই লক্ষ করেনি। ইতিমধ্যে কখন ঘুমিয়ে পড়ল এবং কেটে গেল প্রায় তিন ঘণ্টা সময়, তার কোনও হিসেব নেই। ক্লান্তি ও উদ্বেগ অনেক সময় মরফিয়ার কাজ করে।

উল্টোদিকে তাকিয়ে তাকার ফলে মুখ আড়াল হয়ে আছে শ্বেতার। আদিত্য ওর কোমর থেকে পা পযন্ত অংশটা দেখতে পেল। সাদা, বড্ড বেশি সাদা—এত ফর্সা রঙ কম বাঙালি মেয়েরই হয়। শুধু লজ্জাই পারে সেখানে গোলাপ ফোটাতে, হাল্‌কা মনে কখনও-সখনও এরকমও ভেবেছে আদিত্য, মহাশ্বেতা ছাড়া আর কোনও নামে মানাত না শ্বেতাকে। উপমাটা এখনও অস্পষ্টভাবে ছুঁয়ে গেল তাকে। কল্‌কা পাড় ডুরে তাঁতের শাড়ির ভিতর থেকে বেরিয়ে-আসা নগ্ন দুটি পায়ের পাতা আর কিছু না দেখিয়েও দৃষ্টিকে টেনে নিয়ে যায় ওপরের দিকে। অন্য দিন, অন্য কোনও সময় হলে—বিশেষত পাঁচ রাতের অদেখাব পর, অন্য কোনও ইচ্ছায় জড়িয়ে যেতে পারত আদিত্য। কিন্তু, এই মুহূর্তে শরীর নিয়ে যা কিছু চিন্তা সবই এল অবিন্যস্ত ভাবে; নিজের হাত-পা-কোমরেও সাড় পেল না কোনও। একটু সচেতন হবার চেষ্টায় টের পেল অসম্ভব ভোঁতা লাগছে নিজেকে।

কয়েক মুহূর্ত আদিত্যকে লক্ষ করল শ্বেতা।

'অফিস যাবে তো?'

'যাব।' ঘাড় ঘুরিয়ে একবার স্ত্রীকে দেখে নিল আদিত্য। তারপর বিছানা থেকে নামতে নামতে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কখন ফিরলে?'

'সাতটায়। একটা ফাঁকা বাস পেয়ে গেলাম। ওদিকে এখনও এক হাঁটু জল—।' শ্বেতা

উঠে বসল। আদিত্যকে অন্যমনস্ক দেখে প্রায় কৈফিয়ত দেবার গলায় বলল, 'যা ঝড়বৃষ্টি চলছিল, ভাবলাম তুমি আর ফিরছ না।'

'হ্যাঁ, খুব ঝামেলা গেছে। বাড়ি পৌঁছুলাম আড়াইটের পর।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখছে আদিত্য। শ্বেতা ওর মুখের আধখানা। চার-পাঁচ দিনে মানুষের চেহারার বদল হয় না কোনও। তবু, শ্বেতার মনে হল, একটু অন্যরকম লাগছে আদিত্যকে। এক নজর দেখে বোঝা যায় না ঠিক কেমন। এমনিতেই গম্ভীর মানুষ; কথা বলে কম এবং যেটুকু বলে তাও মেপে—চোখের দৃষ্টি এবং ভুরুর ওঠা-নামা দেখেই কী ভাবছে না ভাবছে বুঝে নিতে হয়। এই ধরনের মানুষকে প্রথম দেখায় যে-কেউই দাম্ভিক ভেবে নিতে পারে, ভাবতে পারে নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা করে রাখা পছন্দ করে আদিত্য। কুড়ি-একুশ বছরের সম্পর্কে শ্বেতা অবশ্য জানে ধারণাটা ভুল; স্বভাবই ওর মনোভাব নয়। 'আদিত্যদাকে মিসআন্ডারস্ট্যান্ড করা খুব সোজা—', কাঞ্চন একবার বলেছিল, 'বুঝলে শ্বেতাদি, তোমার স্বামীটিকে ঠিক ঠিক বোঝা যায় ক্যামেরায়; এমন ইনোসেন্ট ফেস কম দেখা যায়।' শুনে ঠাট্টা করে বলেছিল শ্বেতা, 'শুভদৃষ্টির সময় আমার চোখে ক্যামেরা লাগানো ছিল না—।'

তবে এটা ঠিক, আদিত্যর এই চুপচাপ থাকার ধরনটা এমনকী তাকেও ভাবিয়ে তোলে প্রায়ই। কখনও কখনও মনে হয়, আরও অনেক কিছুর মতোই দাম্পত্য সম্পর্কটাকেও শুধুই মেনে নিয়েছে আদিত্য; তাই, দান ও গ্রহণের মধ্যে আগ্রহ থাকলেও উচ্ছ্বাস থাকে না কোনও। যেমন এখন। অনুমানে বুঝে নিতে হল আদিত্যর এই মুহূর্তের অন্যমনস্কতার সঙ্গে খুশি-অখুশির সম্পর্ক নেই কোনও—এমন কিছু ভাবছে যা শ্বেতা উপস্থিত না থাকলেও ভাবত।

সাহস পেয়ে শ্বেতা বলল, 'বাবার শরীরটা হঠাৎ খুব খারাপ হয়েছিল কাল—'

'পৃথা বলছিল—।' আয়নার সামনে থেকে সরে গিয়ে জানলার ধারে দাঁড়াল আদিত্য, 'এখন তো ভাল আছেন?'

'ওই আর কি। ঘণ্টা তিনেক অক্সিজেন দিয়ে রাখতে হয়েছিল।'

ফ্ল্যাটের ডিজাইন অনুযায়ী এই ঘরে এই জানলাটার সামনে দাঁড়ালে পুবদিক চোখে পড়ে শুধু। দৃষ্টি আড়াল করার জন্যে উঠছে অনেক উঁচুমাথা বাড়ি; দেখা যায় না রাস্তা বা ফুটপাথ, পর পর টিনের চালায় সাজানো ঘিঞ্জি বস্তিগুলো। বছর দশেক আগে ভবানীপুরের বাড়ি থেকে যখন এখানে উঠে এল, দৃষ্টি তখনও শুধুই আকাশ দেখার জন্যে প্রস্তুত থাকত না। চোখে পড়ত রডন স্ট্রিটের গায়ে-লাগানো বিশাল কবরখানা, পার্ক স্ট্রিট কেটে বেরিয়ে যাচ্ছে লোয়ার সার্কুলার রোড এবং আরও অনেক কিছু। এখন জায়গাগুলো চিনে নিতে হয় আন্দাজে। নতুন নতুন ফ্ল্যাটবাড়ি বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে নতুন প্রতিবেশীদের, মাটি থেকে অনেক ওপরে থাকার কারণে যাদের চোখ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে স্বচ্ছ নীলিমায়, বহুদূর ব্যাপ্ত উজ্জ্বলতায়। কিছুদিন আগে, অফিসে, ইকনমিক জার্নালের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখে পড়েছিল একটি সমীক্ষার বিবরণ—ভারতবর্ষের ন'টি বড় শহরের জনসংখ্যার শতকরা পাঁচ ভাগেরও কম সংখ্যক মানুষ থাকে জাঁকজমকঅলা এই সব বাড়ি কিংবা ফ্ল্যাটে, এ-দেশের দামি ভোগ্যপণ্যের বেশিটাই তৈরি হয় এদেরই ব্যবহারের জন্যে। বাদবাকিদের জন্যে গ্রাম ও শহরের অর্থনৈতিক অবস্থার তফাত নেই কোনও—লবণ

আনতে ফুরায় পান্তা—। এইভাবেই হয়ে গেল আমাদের পরাধীনতা থেকে স্বাধীনতায় উত্তরণ! কিছুটা এলোমেলো ভাবে চিন্তাটা ছুঁয়ে গেল আদিত্যকে, আলাদা কোনও রাগ, ক্ষোভ কিংবা লজ্জার সঞ্চার হল না মনে। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে, এই পাঁচ শতাংশের আত্মরক্ষার দেয়ালটাই সব চেয়ে ভঙ্গর, তেমন-তেমন আঘাতে চিড় খেয়ে যেতে পারে বলেই সারাক্ষণ চলেছে রঙ লাগানোর চেষ্টা, উঁচু থেকে আরও উঁচুতে ওঠার পরিকল্পনা।

চিন্তার মধ্যেই বেড়ে ওঠে কাছের পরিবেশের সঙ্গে দূরত্ব। সময়ও থেমে যায়।

সাড় ফিরে পেল শ্বেতার গলায়।

'দাঁড়িয়ে রইলে যে! চা দেব?'

'দাও—'

আদিত্য ব্যস্ততা দেখাল। বাথরুমে ঢুকে টুথব্রাশটা চেপে ধরল দাঁতের ওপর। ভাবল, পৃথাদের ঘরটা পশ্চিম দিকে। ওখানে, জানলায় দাঁড়ালে, এখনও ময়দানের অবস্থিতি সম্পর্কে আন্দাজ পাওয়া যায় একটা। তার বেশি কিছু নয়।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে বসার ঘর। শ্বেতা নিজেই চা দিয়ে গেল। এখন চলেছে ডেকে-ডেকে পৃথার ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা। শেষ রাতের ঘুম চট করে ভাঙে না। বাচ্চু বোধ হয় এতক্ষণ খবরের কাগজের খেলার পাতা নিয়ে ব্যস্ত ছিল; আদিত্য উঠেছে শুনে দিয়ে গেল কাগজদুটো। নির্বিকার হাসিমুখে শৈশব মাখানো—এখন কিছুক্ষণ পড়া নিয়ে থাকবে, তারপরেই শুরু হবে স্কুলে যাবার তাড়া। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে সত্যকে কী হবে না হবের নির্দেশ দিচ্ছে শ্বেতা। দিন স্বাভাবিক হয়ে আসছে সংসারের নিয়মে। খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ রেখে আদিত্য ভাবল, শ্বেতাই চালায়। এটা ঠিক কাল রাতে শ্বেতা বাড়িতে থাকলে ঘটনাক্রমও পাল্টে যেত—বাড়ি ফেরার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিছানায় চলে যেত সে এবং দেরিতে ঘুমোতে যাবার কারণেই উঠতে দেরি হত। তার মানে পুরোপুরি ভোর হবার আগে মর্নিং-ওয়াকে বেরুনোর কোনও সুযোগ থাকত না। তারপর যা-যা ঘটত সবই গতানুগতিক। রাতের ঘুম নিশ্চিত করার জন্যেই খবরের কাগজ পৌঁছয় সকালে—বিভিন্ন খবরের সঙ্গে যুক্ত হত আরও একটি খবর, কিংবা হত না। কে বলতে পারে!

আচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়ে তিন ঘণ্টা বা তারও কিছু বেশি সময়ের ব্যবধান পেরুতে দেরি হয় না। আচ্ছন্নতার মধ্যেই দৃশ্যটা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনল আদিত্য।

যতই অন্ধকার থাক, লোকটির চেহারা যে রোগা ও লম্বা, মুহূর্তের দেখাতেও তা চিনতে অসুবিধে হয়নি আদিত্যর। ভ্যান থেকে লোকটিই আগে নামে—একা, সামান্যক্ষণের ব্যবধানের পর পর আরও কয়েকজন। ঠিক ক'জন তা অবশ্য কখনওই বুঝতে পারেনি। লোকটা দৌড়তে শুরু করার পর যখন তার ও অন্যান্যদের মধ্যে দূরত্ব কিছুটা স্পষ্ট হল, তখনই বুঝতে পেরেছিল আদিত্য, লোকটির এলোপাথাড়ি ভঙ্গির মধ্যে প্রাণভয়ে পালানোর চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নেই। এর পরেই ছুটে আসে গুলির শব্দ এবং সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যায় লোকটি।

পরবর্তী কোনও দৃশ্য চোখে পড়েনি। এটা যে একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড তা বুঝতে পারার আগেই সারা শরীরে কাঁটা ফুটিয়ে দৌড়তে শুরু করেছিল সে—চৌরঙ্গি ধরে, নির্দিষ্ট কোনও দিক লক্ষ করে নয়, তবে নিজের স্বাভাবিক গতির বিরুদ্ধে, প্রায় অন্ধভাবে। থিয়েটার রোডে পৌঁছে দূরে দূরে দু' একটি মানুষ ও গাড়ির যাতায়াত লক্ষ করে বুঝতে পারে এখন

সে নিরাপদ। পিছনে তাকালে ময়দান চোখে পড়ে না। উল্টো দিক থেকে মিটার উঁচিয়ে এগিয়ে আসছিল একটা খালি ট্যাক্সি, সেটাকে থামিয়ে দ্রুত ঢুকে পড়ে ভিতরে। সোজা উড স্ট্রিটে, নিজের বাড়িতে। পাঁচ টাকার একটি নোট ট্যাক্সিওলার হাতে গুঁজে দিয়ে, খুচরো ফেরত নেবার জন্যে অপেক্ষা করেনি আর—ওয়াচম্যানের কিছুবা বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে চলে এসেছিল লিফ্‌টের সামনে। ছ'টার আগে লিফ্‌টম্যান আসে না, সুতরাং নিজেকেই চালাতে হল। ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে কলিং বেল টিপতে গিয়েই প্রথম বুঝতে পারে এইমাত্র একটা ভুল করতে যাচ্ছিল। পৃথার কথায় বেরুনোর সময় চাবি নিয়েছিল সঙ্গে—আরও নিরাপদ হবার জন্যে বেল বাজিয়ে সকলকে জাগিয়ে তোলার দরকার নেই কোনও। তা ছাড়া, এতটা বিভ্রান্ত বোধ করার কারণ কি? সে নিজে খুন করেনি; কার্ফুও নেই যে অমান্য করার প্রশ্ন উঠবে। ইচ্ছেমতো মর্নিং ওয়াকে বেরুনোটা তার নাগরিক অধিকারের মধ্যে পড়ে এবং তা করতে গিয়েই একটি হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী হয়ে পড়েছে। দু' পাঁচ মিনিটের এদিক-ওদিক হলেই ঘটনাটা চোখে পড়ত না তার, কিন্তু ঘটনা ঘটতই। এরকম ঘটনা কলকাতা শহরে, পশ্চিমবঙ্গে কিংবা ভারতবর্ষে নতুন ঘটছে না। উনিশশো পঁয়ষট্টি থেকে এই একাত্তর সাল পর্যন্ত ঠিক কত জন খুন হয়েছে তার কোনও পরিসংখ্যান নেই—গত পরশুই বেলেঘাটার খালপাড়ে হত্যা করা হয়েছে চারটি যুবককে। সে-ঘটনা যারা প্রত্যক্ষ করেছিল তারাই পরে জানিয়ে দেয় পুলিশ, রাইটার্স বিল্ডিং ও খবরের কাগজকে। তা হলে সে, আদিত্য রায়—যার নাম বললেই কিছু লোক অন্তত সাহিত্যিক হিসেবে চিনতে পারবে সঙ্গে সঙ্গে, এত বিচলিত হয়ে পড়ছে কেন! ভয়ে? যদি জানাজানি হয়ে যায়, কিংবা পুলিশে টানাটানি করে, এই আশঙ্কায়? মর্নিং ওয়াকে যদি তার নাগরিক অধিকার থেকে থাকে, তা হলে প্রাণভয়ে ভীত, অসহায় একটি মানুষকে গুলি করে হত্যার সাক্ষী হওয়ায় নেই কেন? পালিয়েই বা এল কেন? তার কি উচিত ছিল না এই ঘটনার পর চিৎকার করে আকাশ ফাটানো এবং লোকজন জড়ো করে ছুটে যাওয়া সেই ঘটনার জায়গায়—যেখানে বুকের ধুকপুকুনি নিয়ে গুলিবিদ্ধ মানুষটি হয়তো পড়ে আছে তখনও। নাকি তার সমস্ত বিবেকই কাজ করছে শুধু খবরের কাগজে বেরুনো ঘটনার বিবরণ পড়ে ক্ষুব্ধ হবার এবং তারপর, যদি প্রয়োজন হয়, আরও কারও কারও সঙ্গে একত্র হয়ে বিবৃতিতে সই করার জন্যে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সহজ হয়ে এল নিঃশ্বাস। সিদ্ধান্তে পৌঁছুতেও দেরি হল না।

ডেপুটি কমিশনার অশোক দত্ত বন্ধু মানুষ। ইউনিভার্সিটিতে একই সঙ্গে পড়াশুনো করেছিল দু'জনে। শেষ দেখা হয়েছিল জুলাইয়ে, গ্র্যান্ড হোটেলে কনস্যুলেটের দেওয়া এক পার্টিতে। একান্তে এই সব নিয়েও কথাবার্তা হয়েছিল, যদিও শেষ পর্যন্ত মুখ খুলতে চায়নি অশোক। বলল, 'আমার নিজের মামাতো ভাই এক মাস ধরে নিখোঁজ। সিউড়িতে গ্রেফতার হয়েছিল আরও কয়েকজনের সঙ্গে। মামা দু'দিন অন্তর এসে হাতে-পায়ে ধরে, কান্নাকাটি করে, যে-কোনও একটা খবর চায়। আই অ্যাম হেল্পলেস; হোয়াট ক্যান আই ডু রিয়েলি? বিবেক আর চাকরি এক ব্যাপার নয়। যে-সিস্টেম আমাকে চাকরি দিয়েছে, সেই সিস্টেমকে কোয়েশ্চেন করতে পারি না। অ্যান্ড রিমেম্বার, শুধু পুলিশই খুন করছে এটা কিন্তু ঠিক নয়। যারা সমাজকে বদলাতে চায়, তাদের বলো আসল জায়গায় ঘা মারতে। ওদের হাতে এখনও একজনও বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট কিংবা মন্ত্রী খুন হয়নি।' অশোককে উত্তেজিত দেখে আদিত্য বলেছিল, 'তাতেই কি সমস্যার সমাধান হবে?' 'তা হয়তো হবে না—'; একই গলার জের

টেনে বলেছিল অশোক, 'কিন্তু রাজনীতিটা পাল্টাবে। ঘৃণা তাদেরই করা উচিত যারা ঘৃণ্য। ডোন্ট হেট মি জাস্ট বিকজ আই অ্যাম ইন পুলিশ সার্ভিস। আমার ছেলে সুদীপ— প্রেসিডেন্সিতে পড়ে—আজকাল আমার সঙ্গে কথা বলে না। কারণ পুলিশের হাতে ওদের দু'জন বন্ধু খুন হয়েছে এবং আমিও পুলিশ।' এর পরে আর এগোয়নি কথা, হঠাৎ শ্বেতাকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখে কৃত্রিম হাসি ফুটিয়ে অশোক বলেছিল, 'বৌদি, কেমন আছেন?'

আজ সকালে, সিদ্ধান্তে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে, অশোককেই মনে পড়ল প্রথম। ঘটনাটা জানানো যায় অশোককে।

উত্তেজনায় তখনও শরীর কাঁপছে আদিত্যর, রিসিভার তুলে ডায়াল করার আগেই নিরস্ত হল। কী লাভ, ভাবল, অশোককে ফোন করে এই হত্যাকাণ্ডের কথা জানানোর অর্থ আর একটি খুনের বিবরণ জানানো—অশোক শুনবে এবং ভুলে যাবে, হয়তো পরামর্শ দেবে এসব নিয়ে মাথা না ঘামাতে। আদিত্য তো তা চায় না। সে চায় ঠিক যা যা প্রত্যক্ষ করেছে তার বিবরণ রেকর্ড করাতে, যাতে অন্ধকারে সংঘটিত একটি গুপ্ত ঘটনা প্রকাশ্য হয়ে ওঠে, ক্রমশ হয়ে ওঠে আলোচনা ও প্রতিবাদের বিষয়। খবরের কাগজকেও জানানো যায়; সাংবাদিকদের অনেকেই তার বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ। কিন্তু, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাবল আদিত্য, খবরের কাগজের মাধ্যমে ঘটনাটা জানাজানি হলে প্রশ্ন উঠতে পারে, নিয়মমাফিক পুলিশে ডায়েরি না করিয়ে সে খবরের কাগজকে জানাতে গিয়েছিল কেন? এমন কথাও উঠতে পারে যে, তার দ্বারা কথিত সমস্ত বিবরণই কল্পনাপ্রসূত এবং মিথ্যা—এরকম কোনও ঘটনা আদৌ ঘটেনি এবং তার খবরের কাগজকে জানানোর পিছনে আত্মপ্রচার ছাড়া আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না!

চিন্তা ও যুক্তিগুলো এল পর পর, কিছুমাত্র সময় না দিয়ে। মনঃস্থির করতে যেটুকু সময় লাগে তার আগেই ডিরেক্টরি খুঁজে পার্ক স্ট্রিট থানার নাম্বার বের করল আদিত্য এবং ফোন করল।

ও.সি. নিজেই টেলিফোন ধরলেন। পরিষ্কার গলায় নিজের পরিচয় দিয়ে আদিত্য ঘটনাটা বর্ণনা করার পর গম্ভীর গলায় কিছু বা শ্লেষ মিশিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'এটা অ্যাবসার্ড ব্যাপার। আধঘণ্টা ধরে ওই এলাকায় টহল দিয়ে এই ফিরলাম আমি! আপনি স্বপ্ন দেখেননি তো!'

'এটা রসিকতার ব্যাপার নয়। ফ্যাক্ট।' যতটা সম্ভব রূঢ় হয়ে আদিত্য বলল, 'আমি নিজের চোখে দেখেছি। লোকটি কে আমি বলতে পারব না, বাট ইট ওয়াজ এ কেস অফ ব্রুটাল মার্ডার।'

'এটা বেলেঘাটা বা বরানগর নয়, স্যার, চৌরঙ্গি—আপনি কী বলছেন তা তো বুঝতে পারছি না!'

'বোঝাবুঝির ব্যাপার নেই। আপনি কেসটা রেকর্ড করুন। আমি এর পর খবরের কাগজকেও জানাব।'

'তা জানান। আপনার হাই কানেকশন আছে মনে হচ্ছে! কী যেন বললেন ঠিকানা?'

আদিত্য আবার নিজের ঠিকানা দিল।

'মিস্টার রায়, আর একটা প্রশ্ন—', ও.সি. হঠাৎ বললেন, 'যে টাইম বললেন, তখন তো ঘুটঘুটে অন্ধকার। ওই সময় তো কেউ মর্নিং ওয়াকে যায় না!'

'ওটা অবান্তর প্রশ্ন।'

ফোন ছেড়ে দিল আদিত্য। এবং ভাবল, এটার দরকার ছিল। সে ঠিকই করেছে। এর পর থানায় খবর দেওয়ার কথাটা পুলিশ অস্বীকার করলেও যায় আসে না কিছু। মানুষের জবাবদিহি করার দায়িত্ব নিজের বিবেকের কাছে।

কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এতক্ষণ নিজেকেই পড়ছিল আদিত্য; এবার, প্রকৃত অর্থে, খবর খোঁজায় মন দিল। আজকের কাগজে নতুন কোনও হত্যার বিবরণ নেই। প্রথম পৃষ্ঠার অনেকটা জুড়ে আছে বাংলাদেশ এবং জুন মাসে পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হবার পর রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নতির ফিরিস্তি। ভিতরের পাতায় দমদম জেলে নকশালপন্থীদের ওপর পুলিশের গুলিচালনা সম্পর্কে বিরোধী পক্ষের নেতাদের বিবৃতি। এঁরা পরিষ্কারই বলেছেন, নকশালপন্থীদের আন্দোলনের মোকাবিলা করার ভার কলকাতা পুলিশের ডিটেকটিভ বিভাগের ওপর ন্যস্ত করার সরকারি সিদ্ধান্তের একটিই কারণ এবং তা হল পুলিশের হাতে খুন করার ঢালাও এবং যথেচ্ছ ক্ষমতা দেওয়া। এর ফলে নকশালপন্থীদের আর কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে গণ্য করা হবে না; সরকারের দৃষ্টিতে এখন তারা শুধুই খুনি কিংবা অপরাধী এবং সেইভাবেই চিহ্নিত হবে—

'বাবা, তুমি পারো বটে!'

পৃথা। সদ্য ঘুমভাঙা মুখে ক্লান্তির ছাপ নেই কোনও, মুখধোওয়া জলের কিছু চিহ্ন এখনও ছড়িয়ে আছে কানের পাশে, গালে ও চিবুকে। চায়ের কাপ হাতে চলে এসেছে এখানে।

মেয়েকে দেখতে দেখতে হাসল আদিত্য।

'কেন রে!'

'সারা রাত ঘুমোলে না! এখন আবার দিব্যি কাগজ নিয়ে বসেছ!'

শ্বেতা সম্ভবত কাছেই ছিল। আদিত্য কিছু বলবার আগেই বলল, 'ঘুমোয়নি বলছিস কেন! একটু আগে আমিই তো ঠেলে তুললাম ওকে!'

'তাই বুঝি!' পৃথা বলল, 'আমাকে যে বললে ঘুমোবে না—মর্নিং ওয়াকে বেরুবে—!'

আদিত্য বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাচ্ছে। কিন্তু, আজ সকালের ঘটনা কিছুতেই বলা যাবে না ওদের। অকারণ চিন্তিত হবে, এখন থেকে মর্নিং ওয়াকে যাওয়া যে নিরাপদ নয়, এমন পরামর্শও দিতে পারে। শ্বেতার পেট আল্‌গা, এই বাড়িরই কোনও কোনও ফ্ল্যাটে যাতায়াত আছে—গল্পের ছলে ঘটনাটা পাঁচকান করাও অসম্ভব নয়। ঘটনাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে সহজ মিথ্যার আশ্রয় নিল সে।

'তুই আর তোর মা, দু'জনেই ঠিক। বেরুব ভেবেছিলাম, তারপর এমন ঘুম পেল, ভাবলাম—'

টেলিফোন বাজছে। পৃথা উঠে গেল। ফিরে এসে বলল, 'কাঞ্চনমামা ডাকছে তোমাকে।'

উঠতে গিয়ে অনুভব করল খসে যাচ্ছে হাঁটুদুটো, ব্যথা জঙ্ঘা ও কোমরে, শরীর জুড়ে জায়গা বদল করছে কেমন একটা অস্বস্তি। ঠিক বোঝা যায় না কেন। হয়তো ভোরবেলার রুদ্ধশ্বাস দৌড়েরই জের এটা। কলেজ ছাড়ার পর মনে পড়ে না আর কখনও ছুটতে হয়েছে এইভাবে।

টেলিফোন থাকে স্টাডিরুমে। রিসিভার তোলার আগে জানলার পর্দা সরিয়ে আলো

আসতে দিল আদিত্য।

'হ্যালো—'

'গুড মর্নিং। কাঞ্চন।'

'হ্যাঁ, বলো?'

কাঞ্চন একটু চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'গলার স্বর ভারী কেন! ঘুম থেকে ডেকে তুলল নাকি?'

'না, আগেই উঠেছি—'

'হাউ ওয়াজ দ্য ট্রিপ?'

আদিত্য না হেসে পারল না। প্রত্যেকবারই ট্যুর থেকে ফেরার পর একই কথা জিজ্ঞেস করে কাঞ্চন, একই ধরনের তৎপরতায়। হয়তো এটাকেই স্মার্টনেস ভাবে। বলল, 'ইউজুয়াল, নাথিং এক্‌সাইটিং। তবে ফিরেছি অনেক রাতে—ফ্লাইট ডিলেড ছিল—'

'আই নো। ইয়েসটারডে'জ রেন ওয়াজ ডিজাস্‌স্টারাস্! ওয়াটারলগিং-এর ছবি তুললাম অনেকগুলো—'

'আর কি খবর বলো?'

'ব্যস, ক্যারিয়িং অন।' কাঞ্চন বলল, 'শঙ্খ পত্রিকার লিটারারি নাম্বারে আপনার ইন্টারভিউ দেখলাম—'

'তাই নাকি? কাগজ বেরিয়ে গেছে?'

'না, আজকালের মধ্যেই বেরুবে। কাল গিয়েছিলাম ওদের অফিসে—অ্যাডভান্‌স্ কপি দেখলাম—'

'আচ্ছা—'

'আই মাস্ট সে—', কাঞ্চন একটু ইতস্তত করল; থেমে বলল, 'যে চার-পাঁচজনের বড় কভারেজ দিয়েছে, তার মধ্যে আপনিও একজন। তবে, ইট্‌স্ নট ভেরি ফেভারেবল্ টু ইউ। কিছু কিছু রিমার্কস্ আছে, যেটা আমার ভাল লাগেনি।'

'কেন!'

'পড়ে মনে হতে পারে লেখার চেয়ে চাকরিটাই আপনার কাছে বেশি ইম্‌পর্ট্যান্ট—চাকরির জন্যে লেখার সময় পান না, তাই কোয়ানটিটি কম, মাঝেমধ্যে লেখেন—এই আর কি!'

'লেখক মুরগী নয় যে ডিমের সংখ্যা দিয়ে তার বিচার হবে।' আদিত্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রিসিভারটা হাত বদল করে বলল, 'তা ছাড়া, এসব কথা তো আমি বলিনি!

'ইয়েস, ইয়েস, দ্যাট আই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। আপনার কম লেখা সম্পর্কে এটাই ওদের ব্যাখ্যা—'

'বুঝতে পারছি, কাঞ্চন। ধ্রুব নন্দী আমার 'যুদ্ধ' উপন্যাসটি ধারাবাহিক ভাবে ছাপবে বলে নিয়েও ছাপেনি; ওটা ছাপলে নাকি অনেকেই চটে যেত, ওরও চাকরি যেত! একটা ঝরঝরে প্রেমের উপন্যাস দিতে বলেছিল যাতে পাঠকরা গোগ্রাসে গেলে। সেই থেকে আমি ওর কাগজে লিখি না। ইন্টারভিউ চাওয়ার পর ভেবেছিলাম সম্পর্কটা নর্মাল করতে চাইছে—সেই জন্যেই রাজি হয়েছিলাম—'

বলতে বলতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল আদিত্যর। রিসিভারটা আবার হাত বদল করে

নিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার কম লেখা সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা না করলে বুদ্ধিজীবী ও পাঠকমহলে খাটো হয়ে যাবে ওরা। তুমি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড জানো, কাঞ্চন; জানো কীভাবে আমি সাফার করেছি। ওরা এটা কখনওই স্বীকার করবে না যে, দিনের পর দিন আমার লেখা না ছেপেই ওরা আমার সময়টাকে আড়াল করে দিয়েছে—, বিকজ আই রিফিউজড্ টু বি দ্য ইয়েস-ম্যান—'

চেষ্টা সত্ত্বেও নিজেকে রোধ করতে পারল না আদিত্য; আবেগ পরিণত হল বিস্ফোরণে।

'আই অ্যাম সরি, আদিত্যদা।' সঙ্কুচিতভাবে কাঞ্চন বলল, 'ব্যাপারটা আপনাকে না বললেই ভাল করতাম।'

'না, না—ভালই করেছ বলে—। ধ্রুব নন্দী আর কিছু বলল?'

'না, অনেক দিন দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে, কম লিখছেন কেন—এই সব। কিন্তু, আপনার ছবিটা দারুণ এসেছে। ইউ নো, দ্যাটস্ বাই মি?'

'হ্যাঁ, তুমি বলেছিলে।'

ভোঁ দিয়ে ন'টা বাজছে। হঠাৎই খেয়াল হল আদিত্যর, এর পর তৈরি না হলে দেরি হয়ে যাবে।

'কাঞ্চন, আর কিছু বলবে?'

'ওই রোলিং মিল্স-এর অ্যাসাইনমেন্টটা কমপ্লিট হয়ে গেছে। কনট্যাক্ট প্রিন্ট দেখলাম, ভালই এসেছে। ক্যান ইউ স্পেয়ার মি সাম টাইম টুডে? দেখাতাম?'

'এসো। লাঞ্চের পর যে-কোনও সময়ে। আমি থাকব।'

রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে কেমন বিপন্ন লাগল নিজেকে। কাঞ্চন যা বলল তার কতটা সত্যি কতটা নয় তা লেখাটা পড়লেই বোঝা যাবে। তবে যা বলল তা না দেখে বলেনি। ব্যাপারটার সঙ্গে ধ্রুব নন্দী জড়িত বলেই সন্দেহ ঘন হয় আরও। দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং এক ধরনের বন্ধুতার সূত্রে এটুকু অন্তত ধারণা হয়েছে আদিত্যর যে উদ্দেশ্য ছাড়া কোনও চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না ধ্রুব। এমনকী হতে পারে যে সাক্ষাৎকার নেওয়া ও ছাপার সঙ্গে তাকে নিয়ে মাছের তেলে মাছ ভাজার পরিকল্পনা ছিল ধ্রুবর! অসম্ভব নয়। কোন কনটেক্সটে কী বলেছে সেটাও জানা দরকার। তবে, কাঞ্চন যা বলল, তা সত্যি হলে, এসব কথার এমন অর্থও হতে পারে যে লেখা ব্যাপারটা আদিত্যর কাছে শখ—নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নয়, কিংবা শেষ পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশ্রয়ও নয়; যদি কোনও দিন চাকরি বা লেখা দুটোর মধ্যে যে-কোনও একটাকে বেছে নেবার প্রশ্ন ওঠে, তাহলে চাকরিটাই বেছে নেবে সে! অথচ তার লেখার বয়স তার বিবাহ বা সন্তানের বয়সের চেয়েও বেশি এবং অবশ্যই, এই চাকরিটার চেয়েও।

মনে পড়ে, শুধু লেখার জন্যেই এম.এ. পাশ করার পর মফঃস্বলে কলেজের চাকরি পেয়েও নেয়নি সে—সামান্য পার্ট টাইমের স্কুল মাস্টারি জুটিয়ে নিয়েছিল কলকাতাকে আঁকড়ে ধরার জন্যে। শুধু এই ভেবে যে যে-শহরে তার জন্ম, যে-শহরের দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে তার শৈশব থেকে ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা, যে-শহরের মানুষ, জীবনযাপন ও মানসিকতা নিয়ে তার লেখা—একবার সেখান থেকে চলে গেলে চলেই যাওয়া হবে; হারিয়ে যাবে তার উত্তরাধিকার ও শিকড়। পরে, অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছে, সেই সময়ের ধারণায় সত্যের চেয়ে আবেগ ছিল বেশি। লেখকের জন্ম তার নিজেরই রক্তে; বিভিন্ন অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতার

টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে একই রক্তে বার বার সংঘটিত হয় তার পুনর্জন্ম। তাহলে স্থান বদলই কেন মৃত্যু ঘটাবে কোনও লেখকের? বরং ভিতরের দেখা শেষ হলে বাইরে থেকে দেখায় যুক্ত হয় নতুন আরও অভিজ্ঞতা; খুলে যায় আরও অনেক জানলা, দরজা। এইভাবেই প্রায় তিরিশ বছর ধরে অক্ষরের পর অক্ষরের জন্মে গোপন আহ্লাদে শিহরিত হয়েছে সে; অক্ষরের মধ্যেই লক্ষ করেছে মানুষ ও ঘটনার জন্ম ও মৃত্যু। আজ তোমরা সেটাকে শুধুই শখ বলে চিহ্নিত করতে চাও! এটা জালিয়াতি, প্রবঞ্চনা, ষড়যন্ত্র ছাড়া আর কী হতে পারে!

স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করল আদিত্য। একটু আগে যা ছিল, তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা—ফ্ল্যাট জুড়ে নেমে এসেছে স্তব্ধতা। বঁটির ওপর ঝুঁকে এক মনে ঝিঙের খোসা ছাড়াচ্ছে শ্বেতা; পৃথার চোখ খবরের কাগজের পাতায়, কিন্তু ধরনটা না-পড়ার; বিছানায় হাঁটুর ওপর পা তুলে টিনটিন পড়ছে বাচ্চু। এমন কী কড়াইয়ে খুন্তি নাড়ার শব্দ—যেটা আদিত্য টের পেয়েছিল টেলিফোন ধরতে যাওয়ার সময়ে—থামিয়ে, হাঁটুতে থুত্‌নি পেতে কুলোয় বিছানো চালের কাঁকর বাছতে বসে গেছে সত্য।

কিছুই বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্ত দিশেহারা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল আদিত্য। তারপর বিশেষ কাউকে সম্বোধন না করে বলল, 'কী হল! তোমরা সবাই চুপচাপ হয়ে গেলে কেন!'

আদিত্যর পক্ষে অস্বাভাবিক, প্রকৃতই করুণাপ্রার্থীর গলা।

'তোমার কথা শুনে!' ঘাড় ঘুরিয়ে স্বামীকে দেখল শ্বেতা। বলল, 'কে কোথায় কী লিখেছে তা নিয়ে অত বিচলিত হও কেন!'

'খুব চ্যাঁচালাম বুঝি! তোমরা শুনতে পেয়েছ!' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে পৃথাকে খুঁজল আদিত্য, 'কী রে, তুই কী বলিস?'

'তুমি খুব টেন্‌স্‌ হয়ে আছ, বাবা! রাত্রেই আমার মনে হয়েছিল। তুমি তো কখনও এত উত্তেজিত হও না!'

'কী জানি!' এগিয়ে গিয়ে সোফায় গা এলিয়ে বসল আদিত্য। কৃত্রিম হেসে বলল, 'হঠাৎ কেমন অপমান লাগল।'

'তুমিও যেমন!' পৃথা বলল, 'শঙ্খ-ই দেশের একমাত্র কাগজ নয়; লোকেও অত স্টুপিড নয় যে যা গেলানো হল তাই গিলবে!'

একটু থেমে কিছু ভাবল পৃথা। আদিত্যকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'এবারের ইলাসট্রেটেড উইক্‌লিটা দেখেছ? মডার্ন বেঙ্গলি নভেলস্‌ নিয়ে চার পাতার প্রবন্ধ বেরিয়েছে, সুবোধ মিত্রের লেখা। তোমার সম্পর্কে অনেকটা লিখেছেন। তুমি যদি ফেলনা হতে তাহলে নিশ্চয়ই লিখতেন না!'

'হয়তো। তুই যখন বলছিস নিশ্চয়ই তাই।' নিজেকে উদ্ধারের চেষ্টা করে আদিত্য বলল, 'কাগজটা কোথায়?'

'দিচ্ছি।'

পৃথা ছুটল স্টাডিরুমের দিকে। শ্বেতা চেঁচিয়ে বলল, 'ওই সঙ্গে ছবিগুলোও দেখা বাবাকে। দেখেনি তো।'

'বাচ্চু, ছবিগুলো দেখা বাবাকে।' রোল-করা ইলাসট্রেটেড্‌ উইক্‌লি হাতে ফিরে এল পৃথা। আদিত্যর হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় দ্যাখো—'

বাচ্চু এল খামভর্তি ছবি নিয়ে। শ্বেতা এসে দাঁড়াল। এক নজর কাগজটা দেখে পাশে

সরিয়ে রাখল আদিত্য। ছবির প্যাকেটটা তুলে নিল হাতে। একগাদা রঙিন ছবি—নানা ভঙ্গিমায় শ্বেতা, পৃথা, বাচ্চু—কলকাতার বিভিন্ন পরিবেশে। কাঞ্চনের তোলা, বোঝাই যায়।

নিবিষ্ট চোখে ছবিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎই অনুভব করল আদিত্য, ছবির দৃশ্য নয়, তার চোখের সামনে এগিয়ে আসছে অন্ধকার ময়দান। রোগা ও লম্বা একটি লোক, তার পিছনে পর পর আরও কয়েকজন। গুলির শব্দ। বিহ্বল দৃষ্টিতে সে তাকাল তার সংসারের দিকে। তারপর আবার ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে নিজেকে আড়াল করার চেষ্টায় মনে মনে বলল, তোমরা আমাকে ঘিরে থাকো।

৩

দিন চারেক পরে একদিন অফিসে কাজ করতে করতে হঠাৎ বৃষ্টির শব্দে খাপছাড়া বোধ করল আদিত্য। বড় বড় ফোঁটার জলের ঝাপ্‌টায় ঝাপ্‌সা হয়ে আসা জানলার কাচের দিকে তাকিয়ে ভাবল, তিন দিনেও যখন ওই ঘটনা সম্পর্কে ছিটেফোঁটা কোনও খবরও বেরুল না কোনও কাগজে, তখন আর বেরুবে বলে মনে হয় না। বেলেঘাটার ঘটনাটা ছেপে বেরিয়েছিল কম-বেশি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে। কিন্তু, ভোর থেকে ভোর ধরলে ময়দানের ঘটনার পর কেটে গেছে টানা ছিয়ানব্বুই ঘণ্টা। এতটা সময় চলে যাবার পর খবর আর খবর থাকে না, ছ্যাতা পড়ে যায় তার গায়ে। এ-ক্ষেত্রেও হয়তো তাই হবে। অন্ধকার অন্ধকারই থেকে যাবে।

ব্যাপারটা ক্রমশ বিষণ্ণ করে তুলল তাকে। ক্লান্তও। গলার ভিতর ছোট ছোট হাই উঠে পরিপূর্ণতা পাবার আগেই নেমে গেল বুকের দিকে। কাচের গায়ে বৃষ্টির জল জমতে জমতে পরিণত হচ্ছে বাষ্পে—দেয়াল এগিয়ে আসছে চোখের দিকে। তবু একটা দৃশ্য পরিষ্কার দেখতে পেল সে—ময়দানে, ঠিক যে-জায়গাটায় আবদ্ধ হয়ে আছে তার দৃষ্টি, সেখানে, সবুজ, বড় আঁশের ঘাসের ওপর অবিরল ঝরে চলেছে বৃষ্টি।

তখনই মনে হল, সেদিন, গুলির আঘাতে মুখ থুবড়ে না পড়লে কিংবা আরও কিছুক্ষণ দৌড়ে আসার সুযোগ পেলে, পশ্চিম থেকে পুবে লোকটি তারই কাছাকাছি পৌঁছে যেত। এমনও হতে পারে, মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হত তাদের এবং পড়ে যাবার আগে একবারের জন্যেও লোকটি ভাবতে পারত, অন্তত একজন এই হত্যাকাণ্ডের সাক্ষী থেকে গেল! কিংবা, এমনও হতে পারে, নিঃসঙ্গতার অসহায়তায় যে-চিৎকার স্তব্ধ হয়ে থাকে গলার ভিতরে, আর একজনের সাক্ষাতে তাই হয়ে উঠতে পারত সোচ্চার, 'বাঁচাও, বাঁচাও' শব্দে। কোনও দিন এরকম ঘটনার সম্মুখীন না হলেও, শুনেছে, মৃত্যুর আশঙ্কায় আর সব শব্দ ভুলে মানুষ ওই একটি শব্দকেই আঁকড়ে ধরে। এমনও হতে পারে, লোকটি তাকে দেখতে পাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘাতকরাও দেখতে পেত তাকে এবং যেহেতু এই খুনটি অন্ধকারে ও নির্জনে সংঘটিত হবার কথা—কোনও সাক্ষী রেখে নয়, সেইজন্যে, লোকটি খুন হবার আগে কিংবা পরে সে নিজেও খুন হত, একই ভাবে। তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই পাল্টে যেত এবং কী কী হত বা হতে পারত, এই মুহূর্তে তার বিবরণ কল্পনার বাইরে। এইসব সম্ভাবনার

কোনওটিই না ঘটে শুধু সে যা দেখেছে তাই যে ঘটল, এর কি কোনও তাৎপর্য আছে? বা মানুষ হিসেবে তার কাছে আলাদা কোনও দাবি?

আজ বলে নয়, গত চারদিন ধরেই থেকে থেকে ফিরে আসছে প্রশ্নটা। এই পর্যন্ত এসেই ফিরে যাচ্ছে পুনরাবির্ভাবের জন্যে। এখনও তাই হল। অস্বস্তির মধ্যে অনুভব করল আদিত্য, উত্তরটা এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে।

সেদিন ঝোঁকের মাথায় এবং কিছুটা বিক্ষোভে পার্ক স্ট্রিট থানায় ফোন করে ঘটনাটা জানালেও তার ফলে পুলিশ যে নড়াচড়া করেছে এমন মনে করার কারণ নেই কোনও। সে নিজেও ব্যাপারটা আগাগোড়া চেপে রেখেছে নিজের মধ্যে। বাড়িতে বলেনি, খবরের কাগজে জানায়নি, এমনকী এর মধ্যে কয়েকবারই ফোন করে অশোককে জানানোর কথা মনে হলেও জড়িয়ে পড়েছে দ্বিধায়। কিন্তু, সেদিন থেকেই অনুভব করছে, ঘটনাটি ঘটবার আগে সে যেমন ছিল, পরে আর ঠিক তেমন নেই।

সুবিধে এইটুকু, আত্মমনস্কতার একটা আবরণ সারাক্ষণই সঙ্গে থাকে বলে বাইরে থেকে কারও বুঝবার উপায় নেই কী হল না হল। ইতিমধ্যে তার দৈনন্দিন জীবনযাপনেও এমন কোনও হেরফের ঘটেনি যে কাউকে ভাবতে হবে চরম একটা সংকটের মধ্যে দিন কাটছে আদিত্যর। পুরোপুরি ভোর হবার আগে এখনও রোজই ঘুম ভেঙে যায় তার; মুখ ধুয়ে বেরিয়ে পড়ে মর্নিং ওয়াকে। প্রায় একই রাস্তায়। সূর্যোদয় না হলেও আলো থাকে, আশপাশ দিয়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে হেঁটে যায় লোকজন। তারও অনেক আগে বেরিয়ে পড়ে ভোরের ট্রাম, বাস; হাওড়া স্টেশন, হাসপাতাল কিংবা অন্যান্য দিকে যাবার জন্যে ফাঁকা রাস্তায় স্পিড তুলে ছুটে যায় ট্যাক্সি ও প্রাইভেট গাড়ি। পরিচ্ছন্ন সুবাতাস বলতে যা বোঝায় সকালের এই সময়টাই শুধু স্পর্শ পাওয়া যায় তার। কিছুদূর এগিয়ে যখন নিজে থেকেই গতি মন্থর এবং দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে আদিত্যর, কেউই খেয়াল করে না নির্দিষ্ট একটি দিকেই তাকিয়ে আছে সে। তারপর, বাড়ি ফিরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে যখন সে পাতা ওল্টায় খবরের কাগজের, কেউ কি বুঝতে পারে, বাংলাদেশ থেকে রাষ্ট্রপতির শাসন, জলে ডুবিয়া বালকের মৃত্যু থেকে নাবালিকা ধর্ষণের দায়ে কারাদণ্ড ইত্যাদি বিভিন্ন খবরের ওপর চোখ থাকলেও আসলে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে একটিই খবর। কিংবা, শ্বেতা, পৃথা বা বাচ্চুর সঙ্গে কাজে অকাজে যখন এটা ওটা কথা বলে, তখনও, অস্বাভাবিক এক নিরপেক্ষতায় আক্রান্ত হয়ে থাকে সে— হঠাৎ মনে হয় যাদের সঙ্গে কথা বলছে স্থানের কারণে তারা তার কাছের লোক হলেও আসলে দূরের। কেন কে জানে, যে তার কাছের লোক—রোগা ও লম্বা একটা আকৃতি ছাড়া কোনও ভাবেই চিহ্নিত করা যায় না তাকে, অন্ধকারে এমনই আচ্ছন্ন তার মুখ! কিন্তু, এটা ঠিক, অপরিচয় ও অস্পষ্টতা সত্ত্বেও কয়েক মুহূর্তের ওই দেখার মধ্যেই লোকটির সঙ্গে স্থাপিত হয়ে গেছে একটি গভীর সম্পর্ক, হাজার চেষ্টা করলেও যা কখনও মুছতে পারবে না আদিত্য।

একটু আগেই করপোরেট ক্যাম্পেনের প্রেজেনটেসন সেরে চলে গেছে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির লোকজন। ব্রিফ সমেত কপি ফাইলটা তখনও পড়েছিল সামনে। মন না বসায় সেটা বন্ধ করে বৃষ্টির জল ও বাষ্পে সম্পূর্ণ ঝাপ্‌সা হয়ে থাকা জানলার কাচের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল আদিত্য। বিশেষ কিছু না ভেবেই উঠে দাঁড়াল তারপর—এগিয়ে এল জানলার সামনে। কাচের ওপর এলোমেলো হাত ঘষে পরিষ্কার করে নিল কিছুটা জায়গা।

সেখানে কপাল চেপে ধরতেই এক ধরনের শীতল মসৃণতায় ঠাণ্ডা হয়ে এল মাথা। এখান থেকে যতদূর দেখা যায় সবই আবছা হয়ে আছে তুমুল বৃষ্টিতে। ভিজছে টেলিফোন ভবন ও বাঁদিকে রাইটার্স বিল্ডিং, নীচে রাস্তায় লোকজন আছে কি নেই বোঝা যায় না; বাঁক ঘুরে জি.পি.ও.-র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে পর পর দুটো ডাবল ডেকার। আর একটু পরেই এসব হারিয়ে গেল আরও জোর বৃষ্টিতে। নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আদিত্য ভাবল, সময় বড় ব্যাপার—সময়ই পারে অনেক ঘটনা আড়াল করে দিতে। একটি মানুষ—সে যেই হোক না কেন, বাঁচে কর্পোরেশনের রেজিস্টারে নথিবদ্ধ তার নিজস্ব পরিজনের স্মৃতিতে, সেই স্মৃতি কতটা ব্যাপ্ত তার ওপরেই নির্ভর করে তার সম্পর্কে চিন্তিত হবার সময় ও পরমায়ু; এর বাইরে যারা, তাদের সব স্মৃতিই তাৎক্ষণিক এবং ঘটনা-নির্ভর। ঘটনা গুরুত্ব পেলেই গুরুত্ব পায় স্মৃতি। এ-ক্ষেত্রে যে-লোকটি খুন হল সে কে জানা সম্ভব নয়—কারা তার নিজস্ব পরিজন, তাও নয়; এবং যেহেতু সমস্ত ঘটনাটাই ঘটেছে প্রায় লোকচক্ষুর আড়ালে, অন্ধকারে, ময়দানে কারও লাশ পাওয়া গেছে এমন খবরও নেই, সেইজন্যে ঘটনাটিরও গুরুত্ব নেই কোনও। দ্বিধা ওই 'প্রায়' শব্দটি নিয়ে। ঘটনাটি যখন সম্পূর্ণ লোকচক্ষুর আড়ালে ঘটেনি, এই তথ্য ফাঁস করে দিয়ে ঘটনাটিকে গুরুত্ব দেওয়ার দায়িত্ব তার, তার এবং তারই। তা না করে, কিংবা শুধু থানায় খবর দিয়ে, তুমি কি নিজের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে চাইছ! কেন? প্রাণের ভয়ে? কিংবা এই ঘটনার সঙ্গে আরও নানা ব্যাপার জড়িয়ে থাকতে পারে, এই আশঙ্কায়? বেলেঘাটার ঘটনাটা গোচরে এসেছিল যেহেতু তার সাক্ষী ছিল অনেকজন, এবং এ-ক্ষেত্রে, তুমি একা? তাহলে কি এটাই সত্যি যে যে-তুমি লেখাকে অবলম্বন করেছ সাধারণের মধ্যে থেকেও সাধারণের চেয়ে স্বতন্ত্র হবার জন্যে, সেই একই তুমি সত্য ও অন্যায় প্রত্যক্ষ করেও তা প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে পারছ না কোনও-না-কোনও কারণে! তাহলে তোমার স্বাতন্ত্র্য কোথায়!

টেলিফোন বেজে ওঠার শব্দে খেই-হারানো নিজেকে ফিরে পেল আদিত্য। নিজের জায়গায় ফিরে এসে, আরও একবার বাজবার সুযোগ দিয়ে রিসিভারটা তুলে চেপে ধরল কানে।

'হ্যালো—'

'মিস্টার রায়, ডিস্টার্ব করলাম না তো!'

ক্রিয়েটিভ কনসালটান্টের অ্যাকাউন্ট ডিরেক্টর পরেশ সোমের গলা। আদিত্য ধরেই নিল প্রেজেনটেসন সম্পর্কে খবরাখবর চায়। সহজ হয়ে বলল, 'পৌঁছুলেন কখন? এদিকে তো সাংঘাতিক বৃষ্টি হচ্ছে—'

'এদিকেও হচ্ছে। তবে সাংঘাতিক কিছু নয়।' পরেশ বলল, 'রিঅ্যাকসন কী?'

'মন্দ নয়। গুড বি ও.কে.।'

'গুড বি! মনে হচ্ছে রিজারভেসন আছে কিছু?'

'তা থাকবে কেন! ক্রিয়েটিভ কাজ তো ভালই হয়েছে—'

'থ্যাঙ্ক ইউ। এম.ডি.-র ওপিনিয়ন শুনলেন? কী বলছেন?'

আদিত্য বলল, 'না। হয়তো কাল জানা যাবে।'

'অল রাইট, স্যার।' একটু চুপ করে থাকল পরেশ। তারপর বলল, 'রিসার্চ ফাইন্ডিংস নিয়ে আপনার মতামতগুলো আলোচনা করছিলাম আমরা—হোয়াইল কামিং ব্যাক।

ফ্র্যাঙ্কলি, আমরা এখনও বুঝতে পারছি না আপনার আপত্তির কারণ কি!'

'আপত্তি ফাইন্ডিংস নিয়ে নয়, ইন্টারপ্রিটেসন নিয়ে।'

আদিত্য নড়ে বসল। মাথার মধ্যে ফিরে আসছে সেই একই প্রতিক্রিয়া, ঘণ্টাখানেক কি তারও কিছু আগে কনফারেন্স রুমে বসে প্রেজেনটেসন দেখতে দেখতে যা তাকে চঞ্চল করে তুলেছিল। একই কথা বার বার বললে জোর থাকে না আর। কী বলবে ভেবে নিয়ে বলল, 'যা বলেছি তা উইথড্র করার কারণ এখনও দেখছি না। অসুবিধে কি জানেন, মিস্টার সোম, আমাদের দেশে যারা মার্কেটিং, অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের অনেকেই সোসিও-পলিটিক্যাল পারস্‌পেকটিভটা ঠিক-ঠিক মাথায় রাখেন না—লোকের অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক অবস্থাটা বিচার না করেই পৌঁছে যান তাদের ক্লাসিফিকেসনে—তাদের মানসিকতার বিচারে—'

'বুঝলাম না!'

'আর কি করে বোঝাব!' বিরক্তি এসে যাচ্ছে কথায়। নিজেকে সংযত করে আদিত্য বলল, 'আপনারাই বোঝাতে চাইলেন, যারা টেরিলিন ট্রাউজার্সের দিকে ঝুঁকেছে তারা সব ব্রড মাইন্ডেড, আর যারা এখনও সুতির কাপড়ে, ধুতি-খদ্দরে আটকে আছে, তারা কনজারভেটিভ। এ কথা একবারও আপনাদের মনে হল না যে এই ব্যাপারটার সঙ্গে মানসিকতার চেয়েও বেশি জড়িত আর্থিক সঙ্গতির প্রশ্ন!'

'বুঝলাম।' প্রচ্ছন্ন কৌতুক খেলে গেল পরেশের গলায়। বলল, 'কিন্তু, স্যার, বিজ্ঞাপনের কাজ মাল বেচা, ইমেজ বেচা—আর্থিক সঙ্গতি বিচার করার আগে লোকের মানসিকতা দেখা এবং সেই অনুযায়ী স্ট্র্যাটেজি ঠিক করা। সঙ্গতি নেই এমন অনেক লোকই টেরিলিন পরে। এটা বিজ্ঞাপনেরই সাকসেস্—'

'হয়তো তাই, আপনি যখন বলছেন নিশ্চয়ই তাই।' চাপা গলায় বলল আদিত্য, 'বিজ্ঞাপন ব্যাপারটা শিখতে হবে।'

'আপনি রাগ করছেন!'

'না, বলুন?'

'আই অ্যাডমিট, দেয়ার ইজ সাম ট্রুথ ইন হোয়াট ইউ সে। কিন্তু, বুঝতেই পারেন, এরিয়াটাকে ছোট আর সহজ করে না নিলে আন্দাজে ঢিল ছুড়তে হবে—'

আদিত্য বুঝতে পারল পরেশ এড়িয়ে যেতে চাইছে। বলল, 'এরিয়া ছোট করা আর ভুল ব্যাখ্যা করা এক জিনিস নয়, মিস্টার সোম। সঙ্গতির অভাবে যারা ফ্যাশন রপ্ত করতে পারে না তাদের কনজারভেটিভ বলার মধ্যে এক ধরনের স্নবারি কাজ করে। আপনাদের রিসার্চ থেকেই জানলাম সিলি রক্ নামে একটা ব্যাপার আছে, যে সব ছেলেরা কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে যায় তাদের শতকরা তিরিশ ভাগই নাকি এর ভক্ত! এরা কোথাকার ছেলে! আমাদের এই কলকাতার? পশ্চিমবঙ্গের? তাহলে যারা সমাজ ব্যবস্থা বদলাবে বলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, পড়াশুনো ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে—পুলিশের গুলি খেয়ে সাবাড় হয়ে যাচ্ছে একে একে, তারা কারা?'

'আমি বুঝতে পারছি আপনি কী বলছেন। বাট, স্যার, দে ডোন্ট্ রিড অ্যাডভার্টাইজমেন্টস্!'

আদিত্য থেমে গেল। এমনিতেই নুয়ে পড়েছিল কথাগুলো; নিজেরই মনে হচ্ছিল এসব

নিয়ে আলোচনার মানে হয় না কোনও। শেষ করার আগে বলল, 'থ্যাঙ্কস্ ফর কলিং। দু-চারদিন যেতে দিন, কী হল না হল আমিই জানাব।'

একটানা বৃষ্টির শব্দে এক ধরনের নেশা থাকে, কান ও মস্তিষ্কে তার প্রভাবে অভ্যস্ত হতে হতে এক সময় মনে পড়ে না আগের শব্দটা কী রকম ছিল। এখনও তেমনি হল। তবে বৃষ্টি যে থেমে গেছে এটা বুঝতে পারল হঠাৎ বেড়ে ওঠা যানবাহন চলাচলের শব্দে। আদিত্য দেখল, জানলার কাচের যে জায়গাটা হাত ঘষে পরিষ্কার করে দিয়েছিল সে, বাষ্প জমে জমে আবার ধোঁয়াটে হয়ে গেছে সেই জায়গাটা। বৃষ্টি থেমে যাবার কারণে ফ্রেমের ভিতর থেকে গোটা কাচ জুড়ে ওপর থেকে নীচে চুঁইয়ে পড়ছে সরু সরু জলের রেখা। একদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে করার চেষ্টা করল আজ ঠিক কোন কোন কাজগুলো তার করার কথা ছিল। অ্যাসোসিয়েশন অফ দ্য ইয়াং এনট্রেপ্রিনিউয়ার্স্-এর অ্যানুয়াল জেনারেল মিটিংয়ে বক্তৃতা করবেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর—পয়েন্টগুলো দিয়ে দিয়েছিলেন, পুরো বক্তৃতাটা তৈরি করে এই সপ্তাহেই তাঁকে দিয়ে দেবার কথা। মনে পড়ল খসড়া লেখাটা টাইপ করতে দিয়েছিল সেক্রেটারিকে। ওটা কতদূর কী হল দেখা দরকার। আছে আরও নানা কাজ। ডায়েরির পাতায় চোখ ফিরিয়ে আদিত্য ভাবল, ধারাবাহিকতায় ক্ষান্তি নেই কোনও। তা সত্ত্বেও এতক্ষণ অন্যমনস্ক ছিল কী করে!

কনফারেন্স রুম থেকে বেরুতে বেরুতে বারোটা হয়েছিল। এখন প্রায় সাড়ে বারোটা। এর মধ্যে মিনিট পাঁচ-সাত পরেশের সঙ্গে কথা বলা ছাড়া বাকি প্রায় আধ ঘণ্টা সময় কেটে গেছে ভাবনার মধ্যে। সেই ভাবনাটাই আবার ফিরে আসার চেষ্টা করতে ইন্টারকম-এর বোতাম টিপল আদিত্য।

ওদিকে সেক্রেটারি চিত্রার গলা।

আদিত্য বলল, 'আসুন, দু-চারটে ডিক্টেসন দেবার আছে।'

'ও.কে।' চিত্রা বলল, 'মিস্টাব রায়, আপনার একজন ভিজিটর অপেক্ষা করছেন। অনেকক্ষণ বসে আছেন ভদ্রলোক।'

'ভিজিটর।' পেপারওয়েট চাপা দেওয়া ভিজিটরস্ স্লিপটা চোখে পড়তেই খেয়াল হল আদিত্যর, 'ও, হ্যাঁ, ভুলেই গিয়েছিলাম। পাঠিয়ে দিন ভদ্রলোককে।'

ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, ক্ষয়া চেহারার লোকটি, চোখে পুরু লেন্স্-এর চশমা। চুলে পাক ধরেছে অল্প। দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না ঠিকঠিক, তবে অনুমান করা যায় সপ্তাহে দু-তিনদিনের বেশি দাড়ি কামায় না। কলেজ স্ট্রিটে বইপাড়ার দিকে গেলে প্রায়ই চোখে পড়ে এই ধরনের চেহারা। লোকটিকে দেখতে দেখতেই মনে পড়ে গেল অনেকদিন যাওয়া হয়নি ওদিকে। নতুন উপন্যাসটি ছাপা শুরু হয়েছে, বম্বে যাবার আগে ফোন করে একদিন যেতে অনুরোধ করেছিলেন প্রকাশক শ্যামাপদবাবু। হয়ে ওঠেনি। শেষ গিয়েছিল মাসখানেক আগে। তবে, গিয়েছিল না বলে যাবার চেষ্টা করেছিল বলাই ঠিক হবে। ইডেন হাসপাতাল অব্দি পৌঁছে প্রায় ফাঁকা রাস্তায় লোকজনের ছুটোছুটি ও বোমার শব্দে গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছিল আবদুল। বাড়ি ফিরে শুনল পৃথা ফেরেনি তখনও। কী যেন হয়ে গেল মাথার মধ্যে—খবরটা পাওয়ার পর এক মিনিটও অপেক্ষা করেনি আদিত্য; সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছিল নীচে। এতক্ষণের রাগ ও হতাশাবোধ তখন পরিণত হয়েছে উদ্বেগে, তরল স্নেহ ফুটে উঠছে সারা গায়ে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গিয়েছিল ট্রাম রাস্তা পর্যন্ত, যেখান দিয়ে বাড়ি

ফেরে পৃথা। ট্রাম বন্ধ। আবার একই রাস্তা দিয়ে ফিরে এসে দাঁড়িয়েছিল গেটের সামনে। তখনই দক্ষিণের রাস্তা দিয়ে ফিরে এল পৃথা। কিছু বা বিভ্রান্ত, গম্ভীর মুখ। লাল চোখ তুলে বলেছিল, 'টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়া—দেখতে পাচ্ছিলাম না কিছু। শিয়ালদায় গিয়ে ট্রেন ধরে এলাম বালিগঞ্জে।' পরে বলল, 'আমাদের ক্লাসের সোমেনের পেটে গুলি লেগেছে—।' মেয়েকে দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ পরে আদিত্য বলেছিল, 'টিয়ার গ্যাস, না কেঁদেছিলি?' পৃথা বলল, 'এসব সময় কান্না পায় না, বাবা, গা রিরি করে রাগে—।' বাকিটা পড়েছিল পরের দিন কাগজে—প্রেসিডেন্সি কলেজের সামনে ছাত্র-পুলিশে সংঘর্ষ। একজন নিহত। তবে তার নাম সোমেন নয়।

'চিনতে পারছেন?' আদিত্যর বলার অপেক্ষা না করে চেয়ার টেনে বসে পড়ল লোকটি। বলল, 'আমার নাম বিনয়ভূষণ হাজরা। একদিন গিয়েছিলাম আপনার বাড়ি!'

প্রসঙ্গে পৌঁছুনোর আগে লোকটি—এইমাত্র যে নিজেকে বিনয়ভূষণ হাজরা নামে পরিচয় দিল, চেনানোর চেষ্টা করছে নিজেকে। ঈষৎ ভুরু কুঁচকে লোকটির দিকে তাকিয়ে মনে করবার ইচ্ছা থেকে আবছা ভাবে স্মরণ করতে পারল আদিত্য, ঠিক বাড়িতে কিনা মনে পড়ছে না, তবে এই চেহারার, এই কণ্ঠস্বরের কোনও মানুষের সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছিল তার। বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

'বৈকুণ্ঠ লাইব্রেরি? রজত-জয়ন্তী? মনে পড়ছে না!'

'বেশ তো, কী করতে হবে?'

'আজ আট। সামনের সাতাশে ফাংশন। বেস্পতিবার। আপনি প্রধান অতিথি। বলেছিলেন ফাংশনের আগে জানাতে, তাই এলাম। কার্ড ছাপাতে হবে তো!'

আদিত্য বলল, 'আমি রাজি হয়েছিলাম কি?'

'রাজি হলে তো কার্ড ছেপে ফেলতাম!' বিনয় হাজরা বলল, 'এখন সম্মতি নিতে এলাম।'

'উইকডে বলেই মুশকিল। তা ছাড়া ওই সময় ট্যুরও পড়তে পারে—', জানলা দিয়ে হাল্‌কা রোদ এসে পড়েছে ঘরে, সেদিকে তাকিয়ে আদিত্য বলল, 'আমাকে বাদ দিলে হয় না?'

'হবে না কেন! পঁচিশ বছর ধরে লাইব্রেরি চালিয়েছি একা—ফাংশনও একাই চালাতে পারি। মেম্বারদের অনেকেই আপনার ফ্যান, তারা আপনাকে চায়। সেইজন্যেই আসা। আমি সাহিত্যিকদের বইটই পড়ি—সাহিত্যিক দেখার ঝোঁক নেই কোনও।'

'দ্যাটস্ হাইলি ইন্টারেস্টিং!' প্রকৃত উৎসাহে বলে উঠল আদিত্য, 'আপনি তো খুব স্পষ্ট কথা বলেন!'

পুরু লেনস্-এর ভিতর দিয়ে সোজাসুজি তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল বিনয় হাজরা। জবাব দিল না।

'কোথায় যেন আপনাদের লাইব্রেরি?'

'বেলেঘাটা—'

আদিত্য বলল, 'কদিন আগে ওখানে চারজনকে—

ওর কথা শেষ হবার আগেই বিনয় হাজরা বলল, 'চারজনকে নয়, পাঁচজনকে। কাগজগুলো সত্যি কথা রিপোর্ট করে না। যা গেলানো হয় তাই গেলে। একটা লাশ আগেই

ফেলে রেখেছিল ভ্যানে—'

আদিত্য চুপ করে থাকল।

বিনয় হাজরার চোখ ঘুরছে চেম্বারের চারিদিকে। পুরো ঘরটায় চোখ বোলাতে যতক্ষণ সময় লাগে নিল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আপনি তো কম্যুনিস্ট?'

'তার মানে!'

'লেখা পড়ে মনে হয়।'

দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েছিল চিত্রা। আদিত্যকে তখনও লোকটির সঙ্গে ব্যস্ত দেখে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'প্লিজ কল মি হোয়েন ইউ আর ফ্রি।'

'ও.কে.।'

ভিজিটরদের চোখমুখ চেহারা দেখেই আন্দাজ করা যায় কে কতটা সময় নিতে পারে। সেই বুঝেই উঁকি দিয়েছিল চিত্রা। ফিরে গেল। এই লোকটি নিশ্চিত প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে। কথার ধরনে মনে হয় মাথায় ছিট থাকাও অসম্ভব নয় কিছু। এখন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব উঠে গেলেই ভাল হয়। সেইভাবেই কথা শেষ করতে চাইল আদিত্য।

'লেখায় কি ছাপ মারা থাকে?'

'তা থাকে না। তবে মনে হতে দোষ কী!' বিনয় হাজরা বলল, 'যারা আপনাকে বুর্জোয়া ভাবে তারা আপনার চাকরি, এয়ার কন্ডিশনড্ ঘর, কথা বলার ধরন, এইসব দেখেই ভাবে। লেখা পড়ে নয়—'

'বুঝলাম।' ঝুঁকে থাকা অবস্থা থেকে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে আদিত্য বলল, 'কাল কিংবা পরশু আপনি একবার অফিসে ফোন করুন আমাকে। যেতে পারব কিনা জানিয়ে দেব।'

'তাই করব।' বিনয় হাজরা নিজেই উঠে দাঁড়াল, 'কাল হালিশহরে যাব মেয়ের কাছে। পরশুই করব। এই সময়, কী বলেন?'

আদিত্য মাথা নাড়ল এবং দেখল, কালক্ষেপ না করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে লোকটি।

অদ্ভুত মানুষ! নাকি মানুষই অদ্ভুত! একটু আগে পর্যন্ত এই লোকটির অস্তিত্ব সম্পর্কে কোনও ধারণাই তার ছিল না। এর আগে একদিন বাড়িতে এসেছিল বললেও সেদিন নিশ্চয়ই এত কথা বলেনি। জানা থাকলে প্রশ্রয়ও পেত না। কিন্তু, দ্বিতীয় চিন্তায় ভাবল আদিত্য, লোকটিকে পুরোপুরি ছিটগ্রস্ত ভাবাও কি ঠিক হবে? সামান্যক্ষণের প্রায় সঙ্গতিহীন কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই কিছু বলবার চেষ্টা করল না তো—একই সময়ে কিছু লোক তাকে কম্যুনিস্ট ভাবে, অন্যমতে বুর্জোয়া, এই ধরনের কোনও কথা? শব্দগুলোয় ভার নেই কোনও, অল্প হাওয়া লাগলেই কেঁপে ওঠে। তবে জায়গা জুড়ে থাকে অনেকটা। হয়তো অন্যের আলাপ শুনে কানে তুলেছে, হয়তো নিজেরই ধারণাপ্রসূত। আদিত্যও কি নতুন শুনল! মাঝে মাঝে এখানে ওখানে ছাপা আলোচনাগুলি ভুল ব্যাখ্যায় চালান হতে হতে তৈরি করে দিচ্ছে লেখকের কাঠামো, যার সঙ্গে লেখকের প্রাণের সম্পর্ক নেই কোনও। বিভিন্ন ঘটনার টানাপড়েনে বেঁকে যাচ্ছে মূল মানুষের স্রোত, এর ওর তার মধ্যে সৃষ্টি হচ্ছে নানা ধরনের প্রতিক্রিয়া। বর্তমানের প্রতিক্রিয়াই ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের সম্ভাবনার দিকে। আজ যা ঘটনামাত্র—ধোঁয়া কিংবা লাবণ্যে চিহ্নিত, কালই তা পরিণত হবে ইতিহাসে। তার কাজ এই ধোঁয়াটে কিংবা লাবণ্যময় পরিবেশে বসবাসকারী মানুষের

প্রতিক্রিয়া নিয়ে। নিজেকে যতদূর জানে আদিত্য, বুঝতে পারে, লেখালেখির সময় এইরকম একটি ধারণা ছাড়া আর কিছুই থাকে না মাথায়। যে যেমন প্রতিক্রিয়া দ্বারা আক্রান্ত হোক না কেন, নিজস্ব বিশ্বাস এইভাবেই টেনে নিয়ে যায় অক্ষরের পর অক্ষরের দিকে। কিংবা যদি এমন হয় যে এরই মধ্যে কেউ ফুঁসে ওঠে প্রতিবাদে কিংবা বিক্ষোভে—চেষ্টা করে ভবিষ্যতের ধরনটা পাল্টে দিতে, তাহলে সেই পরিবর্তিত ভবিষ্যৎও ক্রমশ মূল স্রোতের অংশ হয়ে ওঠে নাকি! এই যে সে, আদিত্য রায়, একদার স্কুল মাস্টার থেকে পরিবর্তিত হল কমার্সিয়াল ফার্মের এক্সিকিউটিভে, তাতে তার চেহারার বদল হল না কোনও—দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতায়, এবং অবশ্যই অভিজ্ঞতায়, কিছু কিছু পরিবর্তন এলেও নিশ্চয়ই তা পুরনো রক্ত বের করে নতুন রক্ত ইনজেক্ট করে নয়। স্মৃতির ধারাবাহিকতা কাটছাঁট করে নয়। মুখোমুখি দেখা হলে এখনও একজন আর একজনকে চিনতে পারে স্বচ্ছন্দে। তাহলে?

এই প্রশ্নের সামনে এসে খেই হারিয়ে ফেলল আদিত্য। তখন ভাবল, নিজের বিশ্বাসে স্থির থেকেই এতদিন ধরে নিজেকে বিশ্লেষণ করেছে সে—বিশ্লেষণের অভাবে খেই হারায়নি কখনও, অসহায়ও বোধ করেনি। যেদিন তা করবে, সেদিন অসহায়তা থেকেই খুঁজতে হবে আত্মরক্ষার অবলম্বন। তখন, অবলম্বন হিসেবে, এই লেবেলগুলো বা এর কোনও একটির দরকার হতে পারে—যাতে তকমার আড়ালে সহজেই গোপন করা যায় নিজেকে। এরিয়া ছোট করে আনা বলতে হয়তো এইরকমই কিছু একটা বুঝিয়েছিল পরেশ সোম। আর্থিক সঙ্গতির অভাব বললে অনেক বড় বিষয়ের মধ্যে ঢুকে পড়তে হয়; কনজারভেটিভ কিংবা কম্যুনিস্ট বা বুর্জোয়া বা প্রতিক্রিয়াশীল বরং অনেক নিরাপদ শব্দ।

আদিত্য নিজেই জানে এসব ভাবনায় অর্থহীনতা ছাড়া আর কিছু নেই। শুধুই ক্লান্তি বাড়ে, এগিয়ে নিয়ে যায় না কোথাও। যেত হয়তো যদি সে কোনও রাজনৈতিক দলের সদস্য হত এবং তার পরে লেখক। তা যখন নয় এবং কোনও দিনই ছিল না, তখন কে কী বলল বা ভাবল তা নিয়ে অত মাথাব্যথা করার দরকার কি! এসব ব্যাপারে যদি কোনও জবাবদিহি করার থাকে তা শুধু নিজের কাছে, নিজেরই বিবেকের কাছে।

চিত্রাকে ডেকে খান তিনেক চিঠির ডিক্টেসন দিতে না দিতেই লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেল। এখন আর ওকে ধরে রাখা ঠিক হবে না।

আদিত্য বলল, 'এই পর্যন্ত থাক। লাঞ্চের পরে আবার বসা যাবে।'

'বেরুচ্ছেন কোথাও?

'না।'

রোদ বাড়তে বাড়তে আলো। এতই প্রখর যে বিস্কিট রঙ দেয়াল রূপান্তরিত হয়েছে সাদায়। কে বলবে খানিক আগেই হয়ে গেছে তুমুল বৃষ্টি! জানলা থেকে বিস্তৃত রোদের আয়তক্ষেত্র চিত্রার মুখ ও শরীরের আধখানা ছুঁয়ে চলে গেছে পিছনের স্টিলের আলমারি পর্যন্ত। মেশিন চালু না থাকলে এই রোদে গা পুড়ে যেত।

কাজ আপাতত শেষ, তবু শর্টহ্যান্ডের খাতায় চোখ রেখে চিত্রা তখনও বসে আছে দেখে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবেন?'

'আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারি? সাড়ে তিনটে, চারটে নাগাদ?'

'কেন?' আদিত্য জুড়ে দিল, 'পার্সোনাল কাজ?'

'না।' অল্প ইতস্তত করল চিত্রা। শাম্পুকরা চুলের একটি গুচ্ছ নেমে এসেছিল কপালে,

সেটা সরিয়ে কানের দিকে ঠেলতে ঠেলতে বলল, 'কাল সারারাত গোলমাল হয়েছে পাড়ায়। পুলিশ এসেছিল সার্চ করতে। শুনলাম আজ নাকি হাঙ্গামা হতে পারে—'

'হাঙ্গামা তো এখন সারা শহর জুড়ে। রোজকার ব্যাপার—।' ম্যানেজিং ডিরেক্টরের বক্তৃতার খসড়াটা মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করতে লাগল আদিত্যর। চিত্রা তাড়াতাড়ি চলে গেলে আজ বিকেলের মধ্যে কাজটা সেরে ফেলার পরিকল্পনা পিছিয়ে যাবে আরও। ভেবে বলল, 'যাবেন তো ভবানীপুর! মোটামুটি সেফ্ জায়গা—'

'আমি এখন ভবানীপুরে থাকি না।'

সোজাসুজি আদিত্যর মুখের দিকে তাকাল চিত্রা। আদিত্য দেখল, ওর মুখের যেদিকে রোদের আলো পড়েছে সেদিকটায় ফুটে উঠেছে ঈষৎ লালের আভা। চোখে অস্বস্তি।

'মাসখানেক আগে বরানগরে চলে গেছি।' চিত্রা বলল, 'মার কাছে—'

'ও। বলেননি তো!'

'বলার কী আছে! জানেনই তো সব!'

চোখ নামিয়ে ঠোঁটের ওপর পেনসিল বোলাতে লাগল চিত্রা। ক্বচিৎ আভা এখন ছড়িয়ে পড়েছে সারা মুখে। ফাঁপানো চুল জায়গা পাল্টে দিয়েছে সিঁথির। এর পরের এলাকাটা ব্যক্তিগত। ব্যাকগ্রাউন্ড জানা থাকলেও কৌতূহল দেখানো সমীচীন হবে না; চিত্রা ভাবতে পারে পজিসনের সুযোগ নিচ্ছে আদিত্য।

'বেশ। অসুবিধে থাকলে নিশ্চয়ই যাবেন।'

'এই চিঠিগুলো এখনই করে দিচ্ছি।' জবাব পেয়েই উঠে দাঁড়িয়েছিল চিত্রা। বলল, 'আর কিছু আর্জেন্ট থাকলেও করে দিতে পারি—'

'একটা ড্রাফট টাইপ করতে দিয়েছিলাম?'

'হয়ে এসেছে—'

'ঠিক আছে। লাঞ্চের পর ওটা পাঠিয়ে দেবেন।'

চিত্রা চলে যাবার পর উঠে গিয়ে জানলার পর্দাটা টেনে দিল আদিত্য। হঠাৎ আলোর তারতম্যে বহুদিনের ব্যবহারে পরিচিত ঘরটাকেও নতুন লাগছে কেমন। নতুন লাগছে চেয়ার, টেবিল, টেবিলল্যাম্প, সেলফের বই, স্টিলের আলমারি ও দেয়ালে টাঙানো ক্যালেন্ডারটা; রবিবারের পড়ন্ত বিকেলে টানা তিন ঘণ্টা ঘুমের পর জেগে উঠে নিজের শোবার ঘরটাকে প্রায়ই যেমন অপরিচিত লাগে। মন ভরে ওঠে এক ধরনের বিচ্ছিন্নতার অনুভবে। মনে হয়, মাঝের তিনটি ঘণ্টাই ছিল জরুরি—হয়তো বা জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়; এই সময়টা জেগে থাকলে অনেক কিছুই করা যেত। সেই অনেক কিছুটা যে কী তা অবশ্য মনে পড়ে না; বরং মনে করার চেষ্টা থেকে তলিয়ে যেতে হয় গভীর-গভীর অবসাদের ভিতর। বুক জ্বালা করে, ভোঁতা হয়ে থাকে মাথা, চায়ে চুমুক দিয়ে স্বাদ পাওয়া যায় না কোনও। চেয়ারে গা এলিয়ে বসে তখন শুধু তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে—আরও বেশি অন্ধকারের অপেক্ষায়। একসময় অন্ধকারটাকেই মনে হয় সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত। হঠাৎ ধারণা হয়, বস্তুত জীবনযাপন, বেঁচে থাকা, এক-একটি সম্পর্কের সঙ্গে এক-একভাবে নিজেকে যুক্ত করে রাখা, এসবের মধ্যে প্রাত্যহিকতা যতটা আছে সার্থকতা ঠিক ততটা নেই। তার একার নয়, হয়তো এই ধারণা অনেকেরই। এমনও হতে পারে, বেঁচে থাকা-জনিত ধারণা নিয়ে কিছুদূর এগিয়ে সকলেই বুঝতে পারে রাস্তা একটা আছে বলেই ক্রমাগত

এগিয়ে যাওয়া—যদিও শেষ পর্যন্ত ঠিকানা নেই কোনও, ঠিকঠাক পৌঁছুনো যায় না কোথাও। বড় ভয়ঙ্কর এই অভিজ্ঞতার কথা চেঁচিয়ে বলা যায় না কাউকে। তা হলেই থেমে পড়তে হবে। আর থামা মানেই তো পিস্তলের ঠাণ্ডা নল চেপে ধরা নিজেরই কপালে। কে আর তা চায়? তখনই শুরু হয় বিপন্নতা আড়াল করার জন্যে নিজেকে ঠকানো—নিজেরই গালে চুমু খাওয়া।

খাপছাড়া ভাবে এইসব চিন্তা করতে করতে আরও কিছুটা সময় পার করল আদিত্য। লাঞ্চের সময় শেষ হতে দেরি আছে এখনও। এই সময়টা সে কাজ কিংবা যা হোক কিছু করতে পারে। তিনতলা থেকে দোতলায় নেমে অফিসার্স ক্যান্টিনে ঢুকলে পাওয়া যেত আরও কাউকে কাউকে। অল্প খিদে আছে পেটে। খাওয়া হত, কিছুক্ষণ আড্ডাও দিয়ে নেওয়া যেত। কিংবা কিছুক্ষণের জন্যে চলে যাওয়া যেত 'স্বকাল' পত্রিকার অফিসে বা কলেজ স্ট্রিটে। কিংবা নির্দিষ্ট কোনও উদ্দেশ্য মাথায় না রেখে বেরিয়ে পড়া যেত রাস্তায়—পরিত্যক্ত ডাবের খোলা, ঘুগনির এঁটোলাগা শালপাতা, বাসী ছানা ও ডিম ভাজার গন্ধের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে তাকিয়ে নেওয়া যেত সেইসব মানুষগুলির মুখের দিকে, লেখার টেবিলে বসলে যাদের অনেককেই চেনা লাগে।

আদিত্য কিছুই করল না। নিজের জায়গায় বসে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে পৌঁছে গেল আরও একটা ভাবনায়—সে আসলে এই। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর চাপানো দায়িত্ব ও কাজের খাঁচায় আবদ্ধ থাকতে থাকতে অসাড় হয়ে গেছে হাত-পা; কাজ করে না রক্ত—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেও তাকিয়ে থাকে খাঁচাটিরই দিকে। ওই খাঁচাটাই তার নিরাপত্তা, আশ্রয় এবং অন্যদের থেকে ক্রমাগত নিজেকে আলাদা ও বিশিষ্ট করে রাখার রণভূমি। চিন্তার মধ্যেই ওখানে সম্পন্ন হয় গতি; মূল্যবান হয়ে ওঠে সময়। ওখান থেকে বের করে এনে রাস্তায় ছেড়ে দিলে স্তব্ধ হয়ে যাবে পা দুটি; নখ ঢুকে পড়বে মাংসে—হাল্‌কা রোদ্দুরে বসে নেলকাটার ব্যবহারের প্রয়োজন থাকবে না কোনও। তখনও দৌড়বে হয়তো—বা তখনই দৌড়বে, যদি তার আগের বা পাশের লোকটি আক্রান্ত হয়, নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে দেখা দেয় সংশয়। একদিন দৌড়েছিল। অনেকটা দৌড়ে নিজেকে আরও নিরাপদ করার জন্যে চটপট উঠে পড়েছিল ট্যাক্সিতে, খুচরো ফেরত নিতে হলে আরও কিছুক্ষণ রাস্তায় দাঁড়াতে হবে ভেবে পুরো একটি নোট নির্দ্বিধায় গুঁজে দিয়েছিল ট্যাক্সিওলার হাতে। তারপর অবশ্য ফোন করেছিল থানায়। তার পরের সব নিঃশ্বাসই খরচ হতে থাকে প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের পাতায় অন্যায় সম্পর্কিত বিবরণ প্রকাশের আশায়।

দরজায় টোকা পড়ল। বেঁকে বসা থেকে সামান্য একটু খাড়া হয়ে নিল আদিত্য।

চিত্রা ফিরে এসেছে। হাতে কাগজের তাড়া।

'চিঠিগুলো হয়ে গেছে। বেরোননি দেখে নিয়ে এলাম।'

'তাড়া কিন্তু আপনার ছিল; আমার নয়। এরপর ভাববেন না যেন যে আমার কাজ করতে গিয়ে লাঞ্চ মিস করতে হল।'

'আই ডিড্‌ন্ট সে দ্যাট!' অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে হাসল চিত্রা। পাশ দিয়ে ঘুরে এসে টাইপ-করা চিঠিগুলো রেখে দিল আদিত্যর সামনে।

'বসুন।'

কোনওরকম ব্যস্ততা দেখাল না আদিত্য। চিত্রা বসার পর চিত্রাকেই দেখতে লাগল—

যে-দৃষ্টিতে দর্শকের আসনে বসে সিনেমার পর্দায় ক্লোজ-আপ প্রত্যক্ষ করে। কত বয়স হবে? পঁচিশ-ছাব্বিশ? দু এক বছর বেশিও হতে পারে। খুব খুঁটিয়ে না দেখলে সুন্দরী বলা যাবে, শরীরে ঘাটতি নেই কোনও। মুখে জায়গা বদল করে লাবণ্য ও বুদ্ধি; চোখের কালো তারা দুটোয় আছে এক ধরনের সারল্য—সোজাসুজি তাকালে সারল্যই পরিণত হয় লজ্জায়। তখনই বোঝা যায় চটপটে ভাবটা কত ভঙ্গুর!

বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা মানেই অস্বস্তি বাড়ানো। অন্যমনস্ক ভাবে টেবিলের দিকে তাকিয়ে চিত্রাকে কাঁধের ওপর ব্লাউজের ঘের টানতে দেখে আদিত্য নিজেই অস্বস্তি বোধ করল।

'নিজে থেকে যখন কিছু বলেননি, তখন কিছু জিজ্ঞেস করব না-ই ভেবেছিলাম।' আদিত্য বলল, 'তবে—'

চিত্রা মুখ তুলল।

'কী জিজ্ঞেস করবেন? কেন ভবানীপুর ছেড়ে মার কাছে চলে গেলাম?'

'কারণটা জানি।' থামার প্রয়োজনেই একটুক্ষণ চুপ করে থাকল আদিত্য, প্রশ্নের আকস্মিকতায় যদি কোনও আঘাত থাকে. চিত্রা তা সহ্য করে নিক। তারপর বলল, 'সম্পর্ক একবার ভেঙে গেলে ভেঙেই যায়, হাজার চেষ্টা করেও তখন আর জোড়া লাগানো যায় না। দাগটা থেকে যায়।'

ঠোঁটের ওপর দাঁত। একদিকে বেশি চাপ পড়ার ফলে অন্যদিকের ফ্যাকাশে ভাব চোখ এড়ায় না। চিত্রা জবাব দিল না।

আদিত্য বলল, 'আমার স্ত্রীকে তো আপনি অনেক কথাই বলেছেন, ওর কাছেই শুনেছি কিছু কিছু। আত্মীয়স্বজন, এমনকী বাবা-মাও অনেক সময় অনেক অশান্তির ইন্ধন জোগান। আমার মনে হয়েছিল কোনও ভাবে সলিলকে নিয়ে আপনি কিছুদিন বাইরে থাকলে একটা আপস হতে পারত।'

চিত্রা বলল, 'যাকে ভালবাসি না, যার প্রতি শ্রদ্ধা নেই কোনও, তার সঙ্গে আপস করে লাভ কী!'

'ওটা আবেগের কথা, কিংবা রাগের। মনের কথা নাও হতে পারে। আমরা অনেক সিদ্ধান্তই খুঁড়ে বার করি ঘটনা ঘটে যাবার পরে—'

একটা ছটফটে ভাব দেখাল চিত্রা। নিজেকে নিয়ে কী করবে বুঝে পাচ্ছে না।

'সলিলকে যখন বিয়ে করেছিলেন, তখন আপনার বাড়িরই সমর্থন ছিল না, মনে আছে। আপনার বাবা কোর্টে যাবারও চেষ্টা করেন। এত কাণ্ডের পর ভালবাসি না বা শ্রদ্ধা করি না বললেই কি দায় মেটানো যায়! হয়তো আরও একটু ধৈর্য দেখালে কাজ হত!'

'ধৈর্যের মাপকাঠিটা কে ঠিক করবে?' চিত্রা বলল, 'যাকে সহ্য করতে হয় সে? না বাইরের লোকেরা?'

'তা অবশ্য ঠিক।' সঙ্কুচিত ভাবে বলল আদিত্য, 'আপনার ধৈর্যের মাপকাঠি আমি তৈরি করে দিতে পারি না।'

'আমি তা বলিনি।' চিত্রা এমন চোখে তাকাল যেন একই সঙ্গে আদিত্যর অনেকগুলো চেহারা দেখতে পাচ্ছে—অফিসে তার বস্, একজন পরিচিত ব্যক্তি এবং এমনও একজন যে তার জীবনের একটা প্রয়োজনের মুহূর্তে মধ্যস্থতা করেছিল হিতাকাঙ্ক্ষী হিসেবে। নিজেকে

গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আমি জানি কেন আপনি প্রসঙ্গটা তুললেন। বাবা নেই, মা আমাকে বলেছিলেন আপনাকে জানাতে। আপনার সম্পর্কে সলিলের একটা উইকনেস্ আছে, হয়তো আপনার কথা শুনত ও। তাতে প্রসেসটাই ডিলেড হত শুধু, আমার কোনও লাভ হত না।'

আদিত্য চুপ করে থাকল।

'কী লজ্জা!' চিত্রা বলল, 'স্ত্রীর প্রতি যার ভালবাসা নেই, শ্রদ্ধা নেই—যে-লোক সারাদিন চাকরি-করা স্ত্রীর বাড়ি ফেরার পর কেন তাকে খাবার দেওয়া হয়েছে বলে বাড়ির ঝিকে ধমকায়—আর একজনের কথায় আমায় ভালবাসত সে, শ্রদ্ধা করত! আপনি কি বলেন, আমি তা মেনে নেব!'

কথাগুলো চেঁচিয়ে বলতে পারলে যতটা স্বস্তি হত, চাপা গলায় বলার ফলে, মনে হল, অস্বস্তি বেড়ে গেল চিত্রার। যা প্রকাশ করতে পারল না তাই প্রকাশিত হয়ে পড়ল চোখ থেকে গালের ওপর গড়িয়ে পড়া জলে। কোমরের শাড়ির ঘেরে গোঁজা রুমালটা বের করে চোখ চাপা দিয়ে নিজেই চেষ্টা করল স্বাভাবিকতায় ফিরে আসতে।

'না। আমি তা বলি না।' কোনও সান্ত্বনা দেবার সুযোগ না নিয়ে আদিত্য বলল, 'হয়তো ঠিকই করেছেন আপনি। মন যা চায় তাই করাই ভাল। প্রসঙ্গটা তোলা উচিত হয়নি আমার। সরি।'

'আপনার সরি বলার কী আছে! যারা ফিল করে তারা বলেই—', অনেকক্ষণ পরে হাসল চিত্রা। মুখচোরা হাসি। বলল, 'আমার জন্যে ভাববেন না। আই অ্যাম ও.কে.।'

'ভালই তো। মনের জোর থাকা ভাল।'

অন্য কোনও কথা না পেয়ে দায়সারা হল আদিত্য।

'সলিল ডিভোর্স চেয়েছে। অন্য কাকে বিয়ে করবে।' এবার নিজে থেকেই এগিয়ে এল চিত্রা। বলল, 'সোজাসুজি বললে এত কাণ্ডের দরকার হত না। ও ভেবেছিল আই উড ক্রিয়েট প্রব্লেমস্ ফর হিম। হোয়াই শুড আই! বলুন? আই ডোন্ট ডিপেন্ড অন হিম!'

আদিত্য এমন ভাবে ঘাড় নাড়ল যার অর্থ হ্যাঁ বা না দুই-ই বোঝায়। চিত্রার মুখ থেকে চোখ সরিয়ে বলল, 'জানি না। হয়তো এই ভাবেই ভাবতে হয়।'

'আর কী ভাবে ভাবব! ও একটা হিপোক্রিট। সিচুয়েসনটাকে সরাসরি ফেস করতে পারছিল না বলেই ছলছুতো খাড়া করছিল। ও একটা কাওয়ার্ড!'

চিত্রা কথা শেষ করার পরও আদিত্যর মনে হল আবার নতুন করে কথাগুলো বলতে শুরু করেছে চিত্রা। যে-শব্দে যে-ভাবে বলা হয়েছিল এবারে তা নয়। বরং, এবারে, প্রতিটি কথার প্রতিটি শব্দের ভিতর অনুরণিত হচ্ছে ঘৃণা ও আক্রমণ; একটার পর একটা পাথরের আঘাতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে জানলার কাচ। সে-আক্রমণের লক্ষ্য সলিল নয়, আদিত্যই। একই সঙ্গে কথাগুলো এবং ভাঙা কাচের টুকরো অব্যর্থ লক্ষ্যে বিঁধে যাচ্ছে তার মাথায়। নিজেকে বাঁচানোর জন্যে এখন দরকার নিরাপত্তা—যার আর এক অর্থ চিত্রার উঠে যাওয়া।

ব্যস্তভাবে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল আদিত্য।

'গুডনেস্! অনেকটা সময় চলে গেল!'

'আমিই নষ্ট করলাম বোধহয়।' উঠে দাঁড়িয়ে বলল চিত্রা, 'আপনাকেই বললাম। পার্সোনাল ব্যাপার, ডিসকাস করতেও এম্ব্যারাস্‌ড্ লাগে। প্লিজ, কিছু মনে করবেন না!'

'আমি আর কী মনে করব। ব্যাপারগুলো মেলানো যায় না, এই যা।'

স্মৃতি জুড়ে শব্দ হচ্ছে এখনও। লেখা যা শেখায় তার একটি হল শব্দের যথাযথ ব্যবহার। ঠিকঠিক ব্যবহারের গুণে একই শব্দ তার আপাত সঙ্কীর্ণতা ছাড়িয়ে পৌঁছে যেতে পারে ব্যাপক অর্থময়তায়—এক পরিণত হতে পারে অসংখ্যে। পাল্টে যেতে পারে পটভূমি, এমনকী ঘটনাও। চিত্রা চলে যাবার পর আদিত্য ভাবল, সকাল থেকে খানিক আগে পর্যন্ত যা যা ঘটেছে তার মধ্যে চিত্রার স্থান ছিল না কোনও--ডায়েরির আকারে নিজেকে লিখলে চিত্রা আসত না। তা হলে আগ বাড়িয়ে ওকে জড়াতে গিয়েছিল কেন? বিষয় থেকে সরে যাবার জন্যে, নাকি বিষয়ের ভার সহ্য হচ্ছিল না বলেই প্রয়োজন ছিল আত্মরক্ষার?

জোরে বেজে উঠল টেলিফোন। দ্বিতীয়বারের শব্দে রিসিভারটা তুলে নিল আদিত্য।

'হ্যালো?'

'মিস্টার রায়?'

'ইয়েস?'

'স্পিক টু ইওর রেসিডেন্স প্লিজ—'

'হ্যালো?'

'শোনো, আমি বলছি—'

শ্বেতার গলা। প্রায় অপ্রত্যাশিত। কপালে খাঁজ পড়ল আদিত্যর।

'কী ব্যাপার।'

'শোনো, তুমি অফিসে যাবার পর থেকে কে একজন দু-তিনবার ফোন করেছিল—'

'তার মানে!'

'বুঝলাম না। তোমার নাম করে এটা তোমার টেলিফোন কি না, বাড়ির অ্যাড্রেস এই কি না জিজ্ঞেস করল!'

'কে? নাম জেনে নাওনি?'

'বললে তবে তো!' শ্বেতার গলায় উত্তেজনা। বলল, 'নাম জিজ্ঞেস করতেই ছেড়ে দিচ্ছিল। তারপর একটু আগে অন্য একটা লোক ফোন করল। নাম বলল না, তোমার অফিসের নাম জিজ্ঞেস করল—'

'বলেছ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর!'

'একটা নাম্বার দিয়েছে। তোমাকে ফোন করতে বলেছে—'

'কী আশ্চর্য!' ঈষৎ বিরক্ত গলায় আদিত্য বলল, 'শুধু নাম্বার বললে কী হবে। নামটা জানবে তো!'

'আমাকে বলছ কেন!' শ্বেতা বলল, 'নাম বললে তো বলব! বলল, নাম্বার দিলেই হবে।'

'কত নাম্বার?'

শ্বেতা নাম্বারটা বলার পর টেবিলের ওপর রাখা কাগজে টুকতে টুকতেই অনুমান করে নিল আদিত্য, নাম্বারটা তার অফিসেরই এলাকার। হয়তো কাছাকাছি কোনও অফিসের। এক্সচেঞ্জ নাম্বার দেখে অন্তত মনে হয় না টেলিফোনটা কারও ব্যক্তিগত। এমন নয় যে ডালহৌসি পাড়ায় কেউ বসবাস করে না। কিন্তু, পরিচিত বা অর্ধ পরিচিত কারও কাছে

কখনও এই রকম নাম্বার শুনেছে বলে মনে পড়ল না।

শ্বেতার সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এইসব ভাবল আদিত্য।

'গলাটা চেনা মনে হল?'

'না।'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি—।' একটু থামল আদিত্য। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'পৃথা ছিল না?'

'পৃথা গেছে বালিগঞ্জ গার্ডেন্‌স্‌-এ, শর্মিষ্ঠাদের বাড়ি। ওখানেই খাবে—'

'বাচ্চুও তো স্কুলে!'

'হ্যাঁ।'

আদিত্য বলল, 'এরপর যদি কোনও অচেনা লোক আমাকে খোঁজে, তুমি শুধু অফিসের নাম্বার দিয়ে যোগাযোগ করতে বলবে। অন্য কোনও কথায় যেও না।'

'আচ্ছা।' শ্বেতা বলল, 'এরকম তো কখনও হয় না! রং নাম্বারও নয়। নাম্বারটা কার বুঝতে পাবছ কিছু?'

'না।' আদিত্য বলল, 'তবে হতেও পারে চেনা কেউ। তুমি যেটাকে ছেড়ে দেওয়া বলছ সেটা লাইন কেটে যাওয়াও হতে পারে। কলকাতার টেলিফোন! যাক্‌গে, তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি দেখছি। সত্যকেও বলে দিও যেন আজেবাজে কলের জবাব না দেয়।'

'তুমি ফিরবে কখন?'

'দেখি।'

'সন্ধেবেলায় কাঞ্চন আসবে বলেছিল, মনে আছে তো?'

'আছে।' আদিত্য কথা শেষ করতে চাইল, 'ছেড়ে দিচ্ছি—'

টেলিফোন ছেড়ে দেবার পরই ঝেঁপে এল একরাশ শূন্যতা। আচমকার ঢেউ সরে যাবার পর ভিজে বালি, দৃশ্যের শুষ্কতা তখনও লেগে আছে চোখে। ভাবনা থেকে বর্শা ফলক ছিটকে যায় নানাদিকে। কথাগুলো এখনও লেগে আছে কানে—ও একটা হিপোক্রিট, ও একটা কাওয়ার্ড! সলিলের পাশে নিজেকে দাঁড় করাতে গিয়েও ফিরে এল আদিত্য। তারপর ভাবল, লেখালেখির ব্যাপারে কেউ ফোন করে থাকলে এতখানি হেঁয়ালি করত না। সরাসরি নাম বলত, পরিচয় দিত। জরুরি হলে অফিসের নাম্বার নিয়েই ছেড়ে দিত, তারপর নিজেই ফোন করত। শ্বেতা ভুল শুনবে না। পরিষ্কারই বলল, নাম্বার নেওয়া সত্ত্বেও তাকেই ফোন করতে বলেছে। হয়তো সে এসব ভাববার আগেই শ্বেতাও ভেবেছে। না হলে অফিসে ফোন করে জানাত না। সাধারণত তার অনুপস্থিতিতে ফোনটোন এলে মাথায় রেখে দেয়, বাড়ি ফিরলে বলে।

কে হতে পারে।

রিসিভার তুলে নাম্বারটা চাইবার আগে হাতটা কিছুক্ষণ শূন্যে ঝুলিয়ে রাখল আদিত্য। পি-বি-এক্স-এর থ্রু দিয়ে যাবে কিনা ভাবল। সূত্র পেল না। ঘরে একটা ডিরেক্ট লাইনও আছে—বিশেষ প্রয়োজনে কিংবা একান্ত আলাপের সময় ওটাই ব্যবহার করে। আপাতত তার মাথায় আছে ছ'টি সংখ্যাযুক্ত একটি নাম্বার, আর কিছু নয়; নাম্বারের পিছনে নাম বা আদল ধরা দেয় না কোনও। ঘোস্ট কলারও হতে পারে। ক'দিন আগে কাগজে বেরিয়েছিল, টেলিফোনে ভুয়া ডাকের সংখ্যা বেড়ে গেছে, এ নিয়ে কাগজের অফিসে এবং টেলিফোন

ভবনে অভিযোগ আসছে প্রায়ই। সাধারণত দুপুরে, যখন ধরেই নেওয়া যায় গৃহকর্তারা কাজে, বাইরে, স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরাও তাই এবং বাড়িতে গৃহিণী কিংবা বয়সের মেয়েরা ছাড়া আর কারও থাকার কথা নয়—আসে এইসব ভুয়া ডাক। হঠাৎ টেলিফোন করে—হয়তো ঘুম থেকে তুলে—চলে আজেবাজে প্রশ্ন এবং অশালীন বাক্য প্রয়োগের চেষ্টা। কলাররা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরুষ, ধরে নেওয়া যায় বেকার যুবক। খবরের শেষে ছিল একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা, এটা একটা সামাজিক বিকার ছাড়া আর কিছু নয়। ১৯৭০ সালের শেষে ভারতবর্ষে শুধু এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখানো কর্মপ্রার্থী বা বেকারের সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ; আরও দশ বছর আগে, ১৯৬০-৬১-তে এই সংখ্যা ছিল আঠারো লক্ষ। এটা সরকারি হিসেব। ধরে নেওয়া যেতে পারে চাকরির প্রয়োজনে অনেকেই নাম লেখায় না এবং সেই কারণেই, সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি। এর একটা বিরাট অংশ শিক্ষিত পর্যায়ভুক্ত। মূল হিসাবে, যেখানে জনসংখ্যা বাড়ছে ২.২৫ শতাংশ হারে, সেখানে বেকারি বাড়ছে বছরে ১২ শতাংশের চেয়েও বেশি। ভয়াবহ এই পরিস্থিতিতে শহুরে শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে যাদেব কোনও সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বীকৃতি নেই, নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ধারণা নেই কোনও—এমনকী রাজনৈতিক আদর্শও নেই, তাদের একটি অংশ খুব সহজেই মানসিক বিকারের শিকার হতে পারে, ইত্যাদি ইত্যাদি। হতে পারে, নাও হতে পারে, আদিত্য জানে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সহজতম ব্যাখ্যার এইসব সুযোগ সন্ধানের মধ্যেও কাজ করে এক ধরনের বিকার, কথার পর কথা সাজিয়ে মূল বিষয় থেকে পালানোর চেষ্টা।

ডিরেক্ট লাইনে ডায়াল করার পর এনগেজ্‌ড্ সাউন্ড পেল। দ্বিতীয়বারেও তাই। থেমে থেমে বেজে যাচ্ছে একই সুরে, এমনই একটানা পুনরাবৃত্তি যে মনে হয় রেকর্ডেড। বিরক্তি এসে যায়। তৃতীয়বারও এনগেজ্‌ড্ সাউন্ড পেয়ে হাল ছেড়ে দিল আদিত্য। এমনও হতে পারে, ডায়ালটোন থাকা সত্ত্বেও তার নিজেরই লাইনে আছে কোনও গোলমাল, কানেক্ট করতে পারছে না ঠিক ঠিক। শ্বেতাও এসেছিল অপারেটরের মাধ্যমে।

কিন্তু সত্যি সত্যিই তার অত ব্যস্ত হবার কারণ আছে কি? যে ফোন করেছিল প্রয়োজনটা তার, আদিত্যের নয়। ব্যস্ততা থাকলে তারই থাকবে। এক্ষেত্রে কোনও সন্দেহের মধ্যে না গিয়ে, কলারের প্রতি দায়িত্ব পালনের ইচ্ছা থাকলে বড়জোর অপারেটরকে নাম্বারটা দিয়ে রাখতে পারে, যদি লাইন পায় দেবে, না হলে পরিষ্কার ভুলে যেতে হবে। তা ছাড়া, অজানা সূত্রের এমন কোনও গোপনীয়তা থাকতে পারে না যার জন্যে দরকার ডিরেক্ট লাইনের নিভৃতি। সম্ভবত ব্যাপারটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গুরুত্ব দিচ্ছে সে।

নানা সম্ভাবনার ভিতর থেকে নির্দিষ্ট কোনও সূত্র না পেয়ে নিঃশব্দে চিৎকার করে উঠল আদিত্য, কে হতে পারে? উত্তর পেল না। তখন অপারেটরের কাছে নাম্বারটা চেয়ে বলে দিল ঠিকঠিক কানেকশন হলেই যেন লাইন দেওয়া হয় তাকে। তারপর ফিরে এল অস্বস্তির ধারাবাহিকতায়। এখনকার চিন্তার নির্দিষ্ট রূপ নেই কোনও।

সিনেমায় যেমন হয়, আপাত সংলগ্ন অথচ বিচ্ছিন্ন নানা দৃশ্য দিয়ে গড়ে ওঠে মন্তাজ, অনেকটা সেইরকম—সময় সন্ধে, তাদের উড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে বসে আছে সে ও সলিল, অন্যদিকে চিত্রাকে নিয়ে শ্বেতা ও পৃথা; ভোরভোর অন্ধকারে বেলেঘাটার খালপাড়ে সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে আছে চারটি যুবক; বিনয় হাজরার মুখ, ময়দানের পশ্চিম দিক

থেকে পুব দিকে ছুটে আসছে লম্বা ও রোগা একটি লোক; প্রায়ান্ধকারে থিয়েটার রোডের দিকে ছুটে যাচ্ছে আরও একটি লোক; চিত্রা চিৎকার করে উঠল, ও একটা হিপোক্রিট, ও একটা কাওয়ার্ড—

টেলিফোন। ব্যস্তভাবে রিসিভার তুলে কানে লাগিয়ে 'হ্যালো' বলতেই অপারেটর বলল, 'স্পিক হিয়ার। ইওর নাম্বার রেসপন্ডিং—'

'হ্যালো?'

'হ্যাঁ, বলুন?'

নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'এটা কার নাম্বার?'

'ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ। লালবাজার।' একই গলায় উত্তর এল, 'কাকে চাই, বলুন?'

ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ শুনেই সতর্ক হয়েছিল, এর পরের অনুভূতিটা হল সন্দেহের। সংযত ভাবে আদিত্য বলল, 'আমার নাম আদিত্য রায়। উড স্ট্রিটে আমার ফ্ল্যাটে ফোন করে এই নাম্বারে ফোন করতে বলা হয়েছিল। কী ব্যাপার বলুন তো?'

'আচ্ছা, ধরুন একটু—'

অপেক্ষা করাব সময়েই ওদিক থেকে আবছা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সরকার, তাড়াতাড়ি ধরো, তোমার কেস, আদিত্য রায়—। পরের কথাটা শোনা গেল না। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই ওদিক থেকে উঠে এল আর একটি কণ্ঠ, 'হ্যালো—'

'আমি আদিত্য রায় বলছি—'

'মিস্টার রায়? নমস্কার, স্যার!'

'কী দরকার বলুন?'

'আপনিই তো লেখক আদিত্য রায়?'

'আই বি থেকে যখন বলছেন, নিশ্চয়ই সে-খবর রাখেন।' দৃঢ় এবং কিছুটা অসহিষ্ণু গলায় আদিত্য বলল, 'আপনি কে বলছেন?'

'নাম জানতে চান? সরকার—'

'বলুন!'

'ওই আপনার ডায়েরির ব্যাপারটা—', লোকটি, যে নিজেকে শুধুই সরকার বলে পরিচয় দিল, সময় নিল। রিসিভারটা নামিয়ে রাখল এবং আবার তুলল। বলল, 'পাঁচ তারিখ সকালে পার্ক স্ট্রিট থানায় আপনি একটা ইনফরমেশন দিয়েছিলেন—ওই, ময়দানে কি দেখেছিলেন—'

'হ্যাঁ। একটি লোককে গুলি করে মার্ডার করা হয়েছিল—'

'আমাকে বলতে দিন, স্যার! আগেই মার্ডার বলে ধরে নেবেন না!'

আদিত্য চুপ করে গেল।

সরকার বলল, 'আপনি টেলিফোনে জানিয়েছিলেন, ডায়েরিতে সই করেননি—'

'দরকার হলে সই করব—'

'মিস্টার রায়, আমাকে বলতে দিন। প্লিজ!'

'বেশ, বলুন?'

'আপনার মুখের কথাতেই আমরা কেসটা ইনভেস্টিগেট করেছিলাম। আফটার অল, আপনি একজন নোন পার্সোনালিটি—। তবে, স্যার, ইনভেস্টিগেশনে কিছুই পাওয়া গেল

না।’

‘তার মানে!’ আদিত্য উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

সরকার গলা খাঁকারি দিল। বলল, ‘ওই ধরনের কোনও ব্যাপার ওই দিন ঘটেনি। আপনার ইনফরমেশন কারেক্ট নয়—’

‘কী বলছেন কী! আমি মিথ্যে কথা বলেছি! আমি নিজের চোখে যা দেখেছি—’

কথা শেষ করতে দিল না সরকার। বলল, ‘অনেক সময় ভুলও হয়। তা ছাড়া আপনি একজন ইমপর্ট্যান্ট লোক—আপনার কাছে আমরা কো-অপারেশন চাই। আপনিও যদি এইরকম ফিক্‌টিসাস—’

‘হোয়াট। ইউ সেড ফিকটিসাস!’ মাথায় রক্ত চড়ে গেল আদিত্যর। বিসিভারটা কান বদল করে বলল, ‘আমারই বোঝা উচিত ছিল পুলিশে জানিয়ে কিছু হবে না। কারণ এই মার্ডারটা পুলিশই করেছে। লাইক ইউ হ্যাভ ডান অ্যাট বেলেঘাটা, অ্যাট বরানগর, অ্যাট—’

‘আপনি খবরের কাগজ পড়ে বলছেন। যাক গে, আমাদের রিপোর্টটা জানালাম। আপনার ফারদার কিছু বলার থাকলে ডি.সি.-কে জানাবেন, স্যার। আমরা কেসটা ক্লোজ করে দিচ্ছি।’

ডায়ালটোন ফিরে এল। তার মানে লাইন কেটে দিয়েছে। ভণিতা দিয়ে শুরু করলেও শেষ করল পরিষ্কার অভদ্রতা দিয়ে; অর্থাৎ এর পর আদিত্য কী ভাবল না ভাবল তাতে এসে যায় না কিছু।

কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকল আদিত্য। ইতিমধ্যে বিকেলের চা দিয়ে গিয়েছিল বেয়ারা—মনে পড়ল, তখন সে উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলছিল টেলিফোনে। একটা চুমুক দিয়েই সরিয়ে রাখল কাপটা। স্বাদ পাচ্ছে না কোনও। হাত কাঁপছে। এ সময় পুরোপুরি ঠাণ্ডা হয়ে আছে ঘর, তা সত্ত্বেও ঘাম অনুভব করল কপালে ও গলার খাঁজে। হাত দিয়েই মুছে নিল কপালটা। এখন মনে হচ্ছে একাধিকবার তাকে নোন পার্সোনালিটি, ইমপর্ট্যান্ট লোক ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করার মধ্যেও ছিল এক ধরনের তাচ্ছিল্য করার প্রবণতা। এমনকী তার দ্বারা কথিত ঘটনাটি যে সম্পূর্ণ বানানো এবং মিথ্যা, তা বলতেও দ্বিধা করেনি। আগাগোড়া সমস্ত সংলাপগুলি খুঁটিয়ে দেখলে ঘটনাটা অস্বীকার করাতেই থেমে থাকে না। মনে হয় আরও গভীর কোনও উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল, তাকে অপমান করা। ভয় দেখানোর চেষ্টাও কি? বলা যায় না। তবে, উদ্দেশ্য যাই হয়ে থাক, যে কথা বলল—ওই সরকার নামের লোকটি—সে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছে আদিত্যও ছেড়ে কথা বলার পাত্র নয়। কিন্তু, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাবল আদিত্য, সে কী বলেছে তাতে পুলিশের কি এসে যায় কিছু? এক্ষেত্রে লোকটি ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বা পুলিশের প্রতিনিধি মাত্র। একই ভূমিকায় তার জায়গায় কোনও মুখুজ্যে, বাঁড়ুজ্যে, মিত্র কি চৌধুরী এলেও একই কথা বলত। কিন্তু, সে আদিত্য রায়, একজন ব্যক্তি ছাড়া আর কিছু নয়—নিজেরই প্রতিনিধি এবং একা; ব্যাপক জনসমাবেশের কেউ নয়। তার ক্রোধে পুলিশ যে গুরুত্ব দেবে কোনও এমন মনে হয় না। টেলিফোন ছেড়ে দেবার আগে লোকটি বলেছিল কেসটা ক্লোজ করে দিচ্ছে। তার মানে কি এই যে একটি অন্যায় সংঘটিত হলেও তার প্রতিকার হবে না কোনও, প্রতিবাদও নয়? যুক্তি দিয়ে দেখলে, ক্লোজকে ক্লোজড্ বলে মেনে নিলেও, তার দায়িত্ব শেষ হয়ে যাচ্ছে এখানে। এরপর নিজেকে বোঝাতে পারে, পুলিশে জানিয়ে নিজের নৈতিক দায়িত্ব পালন করেছিল

সে, কিন্তু যে-সমাজ, যে-প্রশাসন ব্যবস্থা, একটি প্রত্যক্ষ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাকেও কাল্পনিক বলে চালাতে পারে, সেখানে এর অধিক আর কোন দায়িত্ব পালন করবে সে! ইতিমধ্যে কেটে গেছে পুরো চারটি দিন। চার দিন চুপ করে থাকার পর এই ঘটনা নিয়ে জানাজানি করলে অনেকের কাছে তা সত্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না—সত্যি সত্যিই মনে হতে পারে কাল্পনিক।

এসব প্রশ্ন ও উত্তরের সামনে নিজেকে দাঁড় করাতে গিয়ে প্রকৃত দিশেহারা বোধ করল আদিত্য। রাগটা যাচ্ছে না—একটা কিছু করা দরকার সেটাও বুঝতে পারছে ঠিকঠিক, কিন্তু সেই একটা কিছু যে কী, তা ভাবতে গিয়ে বোধবুদ্ধি জড়িয়ে ঢুকে পড়ছে অসহায়তার ধোঁয়া। ঘটনাটা টিকতে পারে যদি আবার করে শুরু করা যায় সব। হয়তো এই টেলিফোনের কথাবার্তাতেই আছে সূত্রপাতের বীজ। পুলিশ যেটাকে ক্লোজ বলে শেষ করতে চাইছে সে সেটাকে শেষ নাও ভাবতে পারে; বরং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের একজন নাগরিক হিসেবে পুলিশের বিরুদ্ধে আনতে পারে তাকে ও তার স্ত্রীকে বাড়িতে ফোন করে হ্যারাস করার অভিযোগ। লোকটি বলেছিল, আর কিছু বলবার থাকলে ডি-সিকে জানাতে। অবশ্যই জানাতে পারে সে এবং লিখিত ভাবে, তেমন তেমন দরকার হলে চিঠি দিতে পারে খবরের কাগজে। হয়তো দেরিতে নড়াচড়া করার জন্যে সমালোচনা হবে; কিন্তু আদিত্য রায় একটা কাল্পনিক ঘটনার আশ্রয় নিয়ে জেহাদ ঘোষণা করতে চাইছে পুলিশের বিরুদ্ধে, এমন অপবাদ নিশ্চয়ই কেউ দেবে না। জ্বালাটা আসছে সে একজন বুদ্ধিজীবী বলেই। তড়পানি শুনে মনে হল, পুলিশের স্ট্যান্ড এ-বিষয়ে খুব পরিষ্কার। টেলিফোনে জানানো হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে তোমার অভিযোগের মূল্য নেই কোনও; তবু যে ফলাফলটা জানানো হল তোমাকে তার কারণ তুমি একজন 'ইমপর্ট্যান্ট' লোক। এর বেশি কিছু আশা না করে ঘটনাটা মেনে নাও, চুপ করে থাকো।

নানা দিক থেকে ঘটনাটাকে বুঝবার চেষ্টা করলেও মনঃস্থির করতে পারল না আদিত্য। এই সময়েই হঠাৎ মনে পড়ল অশোক দত্তকে। অশোকও তো পুলিশে। ঘটনার দিন ভোরে ওকেই ফোন করার কথা মনে হয়েছিল প্রথম, সাতপাঁচ ভেবে করেনি। বন্ধু হিসেবে ও নিশ্চয়ই উচিত পরামর্শ দেবে। এই সরকার লোকটি আসলে কে, তাও জেনে নিতে পারে।

অশোকের নাম্বার আছে পার্সোনাল টেলিফোন বুকে। সেটা জানার জন্যে অ্যাটাচিটা টানল আদিত্য। চিত্রা ফিরে এল। হাতে কাগজের তাড়া।

অ্যাটাচি খুলে টেলিফোন বুকটা খুঁজতে খুঁজতে আদিত্য বলল, 'কী ব্যাপার! আপনি যাননি এখনও?'

'ড্রাফটটা রেডি করে যাবার কথা ছিল।'

'হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে। রেখে যান। আমি দেখে নেব।' জোর করে হাসল আদিত্য, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

মাঝে মাঝে গোলমাল হয়ে যায় হিসেবে। চেনা রাস্তায় এগিয়েও থেমে যেতে হয় ব্লাইন্ড লেনের সামনে—চট করে খুঁজে পাওয়া যায় না বেরুবার রাস্তা। অশোকের নাম্বারটা খুঁজে পেয়েও দোটানার সম্মুখীন হল আদিত্য। বন্ধু হলেও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন ভূমিকা নেবে অশোক। কিছুদিন আগেই বলেছিল ওর মামাতো ভাইয়ের গল্প; চাকরির দায় মেটাতে

নিখোঁজ ভাইটিকে খুঁজে বের করার কোনও চেষ্টাই করতে পারেনি সে। সম্পর্কের টানাপড়েনে আদিত্যর ব্যাপারটাকে কোনও গুরুত্ব নাও দিতে পারে, এড়িয়েও যেতে পারে। তা ছাড়া, প্রশ্নটা নীতি নিয়ে, আর পাঁচ রকম বিবেচনা নিয়ে নয়। যদি এমন হয় যে অশোক তাকে নিরস্ত হতে বলল—বলতেই পারে, কেননা যে-লোকটি খুন হল তার বেঁচে থাকা বা মরে যাওয়া কোনওটিই কোনও ভাবে প্রভাবিত করত না তার জীবন, তা হলে কি আদিত্য আর কিছু করা থেকে নিবৃত্ত করত নিজেকে? যদি তা না করে তা হলে অকারণ অশোককে বিব্রত করা কেন! নাকি তাৎক্ষণিক জ্বালাটা কমে আসার পর আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে খুঁজছে অবলম্বন? আবারও জড়িয়ে পড়ছে দ্বিধায়? শুধু নীতির প্রয়োজনে একা এগিয়ে যাবার সাহস নেই তার!

না, অশোককে এ-ব্যাপারে না জড়ানোই ভাল। এমন হওয়াও অসম্ভব নয় যে, অশোক এরই মধ্যে জেনে গেছে সব কিছু, ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে তাকে!

ভাবনাগুলো নিয়ে যাচ্ছে না কোথাও। বরং যত সময় যাচ্ছে ততই একই বৃত্তের মধ্যে ঠেসে ধরছে তাকে। শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে অস্বস্তিকর খাপছাড়া ভাব। নিজেকে ব্যবচ্ছেদ করলে দেখা যেত নানা আকার ও বর্ণের চিন্তা ছাড়া রক্ত-মাংস-মস্তিষ্ক-নিঃশ্বাসে আর কিছু নেই। নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ একা—একার মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে আছে একটা জগৎ। সেখানে অন্য কোনও মানুষ নেই, কিংবা থাকলেও তাদের সকলেই মুখে আদিত্যর আদল। একই বয়স, সময় ও চৈতন্যের ভারে ঘাড় কুঁজো করে ছুটছে একজনের পিছনে আর একজন, মিউজিক্যাল চেয়ারের প্রতিযোগীদের উৎকণ্ঠা নিয়ে, কখন থেমে যাবে আত্মরক্ষার জন্যে প্রয়োজনীয় শব্দটুকু এই আশঙ্কায়। সেখানে ঘটনা ঘটে না কোনও, কিংবা ঘটলেও সচকিত হয় না স্বাভাবিক পরম্পরায়—ওপরে উঠে কিংবা নীচে নেমে, এগিয়ে কিংবা পিছিয়ে, একই মাকড়শা বুনে যায় বিভিন্ন জাল। অদ্ভুত যান্ত্রিকতায় সম্পন্ন হয় সব কিছু। সংঘর্ষ হয় তবু আঁচড় লাগে না গায়ে—যার যেরকম গলা তার চেয়ে অন্যরকম হয়ে ছুটে আসে টেলিফোনের ভিতর দিয়ে। বই আর খবরের কাগজ পড়া আন্তর্জাতিকতার বোধে অহঙ্কারে ফেঁপে ওঠে বুক—দ্রুত হাতের সই পড়ে ভিয়েতনাম আর বাংলাদেশ বিষয়ে বিবৃতির নীচে। কম-বেশি, আর কিছু নয়।

নিজেকে নিয়ে এসব ভাবনায় স্বস্তি নেই কোনও। আজ বিকেলে, তবু, এইভাবেই নিজেকে ভেবে নিল আদিত্য। একটু অন্যরকম হওয়ার জন্যে কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে জ্যাম। গাড়িতে ওঠার আগে আকাশটা দেখে নিল একবার। রোদ চলে গিয়ে মেঘ জমতে শুরু করেছে আবার। গুমোট নেই। চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ঈষৎ আর্দ্র, ছিমছাম হাওয়া। জোরে নিঃশ্বাস নিতেই খোলসা হয়ে এল মাথা। পিছনের সিটে বসে দু'দিকের জানলার কাচ নামিয়ে দিল আদিত্য। চোখ রাখল দু'দিকে। এটা ঠিক অফিস ছুটি হওয়ার সময় নয়, তবু রাস্তায় এলোমেলো ভিড় দেখে মনে হয় ছুটিই হয়ে গেছে—যে যার নিজের দিকে একা কিংবা দলবদ্ধ হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। এই ভিড়ে নিশ্চয়ই চিত্রাকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, আদিত্য ভাবল, অন্তত আধ ঘণ্টা আগে চলে গেছে মেয়েটি। আশ্চর্য! সততার অভাব দেখে যে অন্যকে কাপুরুষ বলে, দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও বোধ করে না নিরাপত্তার অভাব, আর কোন নিরাপত্তার ভাবনা তাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে

নিয়ে যায় বাড়ির দিকে।

আবদুলকে বলেছিল কলেজ স্ট্রিটের দিকে যেতে। রাইটার্স আর লালবাজার পেরিয়ে মত বদলাল আদিত্য। গাড়ি ঘুরিয়ে নিতে বলল ডান দিকে। দেবু চৌধুরীকে বলেছিল শীঘ্রিই একদিন আসবে 'স্বকাল' অফিসে। আজ সময় আছে, আজই যাওয়া ভাল।

দোতলায় অফিস। দেবু চৌধুরী ঘরেই ছিলেন। জায়গা ছেড়ে এসে হাত ধরে টেনে বসালেন চেয়ারে। বসতে বসতে বললেন, 'কাগজের অফিসে এসেছিলেন, না আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন?'

'সত্যি বললে বলতে হয় দুটোর কোনওটাই নয়।' মাথার মধ্যে পুরনো ভাবনার জের থেকে গেলেও নিজেকে অনেকটা সামলে উঠেছিল আদিত্য। হেসে বলল, 'অফিসে বসে বসে বোর লাগছিল। বেরিয়ে পড়লাম। ইচ্ছে ছিল কলেজ স্ট্রিটে যাব। তারপর ভাবলাম আপনার কাছে আসি—'

'ভাল করেছেন।' বেয়ারাকে ডেকে কফি আনতে বললেন দেবু চৌধুরী। তারপর বললেন, 'কলেজ স্ট্রিটে না গিয়ে ভালই করেছেন। আজ তো ওদিকে ঝাঁপ বন্ধ।'

'কেন!'

'গোলমালের আশঙ্কায়। কে একজন বড় নকশাল নেতা নাকি গ্রেপ্তার হয়েছেন।'

'কে, শুনেছেন কিছু?'

'কী করে বলব! রিপোর্টাররা ছুটোছুটি করছে এখনও। কনফারমেশন পাওয়া যায়নি। যাবার সময় একবার নিউজ ডিপার্টমেন্টে ঘুরে যেতে পারেন। পাকা খবর কিছু থাকলে পেয়ে যাবেন।'

তেমন কোনও কারণ নেই, তবু হঠাৎই বিমর্ষ বোধ করল আদিত্য। জানলার বাইরে অনেকটা আকাশ, তিন স্তর ইলেকট্রিকের তার ডোরা কেটে যায় মেঘে। অফিস থেকে বেরুবার সময় যা দেখেছিল, এখন তার চেয়ে অনেক বেশি ঘন ও কালো—ওপরে ও নীচে ফাঁকফোকরগুলোও ভরে উঠছে ক্রমশ। ওদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই সিলিং ফ্যানের আওয়াজটা প্রকট হয়ে উঠল কানে।

'এটাই তো হবার কথা ছিল।' দেবু চৌধুরী বললেন, 'এই অবস্থাটা সৃষ্টি করার জন্যেই তেইশ-চব্বিশ বছর ধরে কাজ করে গেছি আমরা। কাজের ফল সম্পর্কে কোনও ধারণা থাকলে নিশ্চয়ই সতর্ক হতেন নেতারা। আজকের স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশ ভারতবর্ষ ঠিক কাদের নিয়ে বোঝা যাচ্ছে না। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের চেহারা দেখলে মনে হয় একটা স্বাধীন দেশের মধ্যে আর একটা পরাধীন দেশ। টোটাল ফ্রিডমের ব্যাপারটা হারিয়ে গেছে—'

দেবু চৌধুরীর পিছনের দেয়ালে রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর ছবি। টেবিলের কাচের নীচে বিশ্বভারতীর ছাপা চিত্ত যেথা ভয় শূন্য-র পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি। একটা শেষ-হয়ে-যাওয়া জগতের স্মৃতি, যার সঙ্গে আজকের বাস্তবের সম্পর্ক নেই কোনও।

দেবু চৌধুরী যেভাবে বললেন আরও অনেকেই বলেন সেভাবে। গতকাল বলা হয়েছিল, হয়তো বলা হবে আগামিকালও। চেনা পরিমণ্ডলে এর ওর তার সামনে কান খাড়া করে রাখলে মনে হয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে একই লোকের লেখা একটা বড় প্রবন্ধের পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে লটারি মারফত ছোট, বড়, মাঝারি, প্রক্ষিপ্ত অংশগুলো গুঁজে

দেওয়া হয়েছে এর ওর তার হাতে—সূত্রহীন ভাবে আউড়ে যাচ্ছে যে যার প্রাপ্ত অংশ। কথার মধ্যে স্পষ্ট হয় না ব্যক্তির বিভিন্নতা। একই মুখ চেপে বসানো হয় লম্বা বা বেঁটে, রোগা বা মোটা, ফরসা বা কালো, বিভিন্ন শারীরিক আকারে। আরও বৈচিত্র্যের জন্যে ধার দেওয়া হয় চশমা কিংবা চুরুট কিংবা ঝকঝকে বাঁধানো দাঁত। থিয়েটারের বিজ্ঞাপনের সার্টিফিকেট হিসেবে ব্যবহারের জন্যে দেওয়া ম্যাড়মেড়ে ও গতানুগতিক কথাগুলো বেরিয়ে আসে কোটেশনের ভিতর থেকে—চিন্তায় বিস্ফোরণ ঘটায় না কোনও।

'হতাশা থেকেই জন্ম নেয় অস্বীকার করার চেতনা—', আদিত্যর অন্যমনস্কতার মধ্যেই আগের কথার জের টানলেন দেবু চৌধুরী। চৌকো ও চ্যাপ্টা একটা রঙিন টিনের বাক্স থেকে সিগার বার করে চেপে ধরলেন ঠোঁটে, জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি থেকে টেনে নিলেন পর্যাপ্ত আগুন। সিগারের ধোঁয়ার গন্ধ এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। সিগারটা আঙুলের ফাঁকে ধরে বললেন, 'যা ঘটছে তা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

কফিতে চুমুক দিয়ে নিঃশব্দ হল আদিত্য। নিজের চার দেয়ালের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেও ক্লান্তিটা এখনও টের পাচ্ছে স্পষ্ট। সিগাবের গন্ধেই সম্ভবত পাল্টে যাচ্ছে জিভের স্বাদ। জুত হল না কফিতে।

'বলুন, খুঁজছিলেন কেন?'

'হ্যাঁ। আপনার ওই 'প্রতিবিম্বের অন্যদিক' গল্পটা। ব্রিলিয়ান্ট। কম্পোজ হবার পর পড়লাম। তারপর ভাবলাম, ছাপার আগে আপনার সঙ্গে একটু আলোচনা করে নিলে ভাল হত।'

'কী হল!'

'তেমন কিছু নয় অবশ্য।' দেবু চৌধুরী ইতস্তত করলেন, 'গল্প হিসেবে অসাধারণ। তবে বিষয়টা একটু রিস্‌কি হয়ে যাচ্ছে। সময়টা ভাল নয় তো! ভাবলাম ছাপা হলে আপনি অসুবিধেয় না পড়েন!'

আদিত্যর চোখে বিস্ময়। খানিক দেবু চৌধুরীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বাপ ছেলের দ্বন্দ্ব নিয়ে সাদামাটা গল্প। দুজনেই পলিটিক্যাল—দুটো আলাদা রিয়ালিটি থেকে উঠে এসেছে। একটা সময়ের পর ছেলে তার এতদিনের চেনা যুধিষ্ঠির বাপকে প্রতারক ভাবে। রিঅ্যাক্ট করে। এর জন্যে অসুবিধেয় পড়ব কেন!'

'পলিটিক্যাল বিষয় নিয়ে গল্প আমাদের দেশে বড় একটা লেখা হয় না। সেদিক থেকে গল্পটা অভিনব। কিন্তু—'

দেবু চৌধুরীকে চিন্তিত দেখাল। অল্প চুপ করে থেকে বললেন, 'আমার মনে হল লেখাটার মধ্যে একটা পক্ষপাত এসে গেছে। অ্যাকুজেসন এসে গেছে। কোনও ভাবে মিসইন্টারপ্রিটেড হলে আপনাকে আমাকে নিয়ে টানাটানি হবে। ইন্‌স্‌টিগেটর ভাবতে পারে। সেন্টারে কংগ্রেস, এখানে প্রেসিডেন্টস্‌ রুল। পুলিশ খেপে আছে। জানেন তো, এখন সমস্ত পলিটিক্যাল হাঙ্গামা ট্যাকল করছে ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট? ওদের চোখে সবাই ক্রিমিনাল!'

আদিত্য চুপ করে আছে দেখে নিজেও চুপ করে গেলেন দেবু চৌধুরী। পরের কথাটা ভাববার সময় নিয়ে বললেন, 'আমাদের সুবন্ধু মিত্রের 'জল্লাদের প্রশাসন' লেখাটা নিয়ে কী কাণ্ড হল। পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে ওকে। শুনছি ছেড়ে দেবে। তবে এখনও ছাড়েনি। ওটাও

ছিল একটা সাদামাটা ফ্যাকচুয়াল রিপোর্টাজ।'

কথাগুলো শুনতে শুনতেই জোর করে তাড়ানো কিছুক্ষণ আগেকার জ্বালাটা ফিরে এল। কঠিন হয়ে উঠল চোয়াল। আদিত্য বলল, 'দেবুদা, লেখা নিয়ে ফাটকাবাজিতে আমার বিশ্বাস নেই। আমার অ্যামবিশান খুব লিমিটেড—তা হল নিজের কাছে সৎ থাকা, তার বেশি কিছু নয়—'

কথাগুলো কেড়ে নিল দেবু চৌধুরী। বলল, 'বদ লোক ছাড়া আপনাকে কেউ অসৎ অপবাদ দিতে পারবে না।'

আদিত্যর মনে হল কথার মোহ পেয়ে বসেছে দেবু চৌধুরীকে। তা না হলে এই কথাগুলো এই জায়গায় বলবার দরকার ছিল না কোনও।

'আমি তা বলিনি।' বক্তব্যে ফিরে আসার চেষ্টায় আদিত্য বলল, 'লেখক হিসেবে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে আমি রাইফেল হাতে রাস্তায় নামব না; শ্রেণী সংগ্রামের জিগির তুলে সস্তা হাততালি পাবার দিকেও যাব না। আপনি তো জানেন, আমি কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট কি নকশাল—কোনও রাজনৈতিক দলেরই সদস্য নই। সুতরাং পক্ষপাত দেখানোর প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু, লেখার ব্যাপারে আমি নিজে যা দেখি, যা বুঝি তাই লিখব। আপনি যেটাকে পক্ষপাত বলছেন, অ্যাকুজেসন বলছেন, আমার মনে হয় যে-কোনও বিবেকবান মানুষই তাই করত।'

'এটা আমাকে বোঝালে আমি বুঝব। বললাম তো, লেখাটা অসাধারণ। তবে, এসব লেখা সময়টা একটু ঠাণ্ডা হলে লিখলেই ভাল হত না? এখন ছাপলে এর সাহিত্যমূল্য নিয়ে কেউ মাথা ঘামাবে না; অন্য কথা ভাববে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব খুঁজে পেল না কোনও। ভাববার সময়ও যে নিল তা নয়; পরিষ্কার অস্বস্তি ফুটে উঠল চোখে। খানিক চুপ করে থেকে আদিত্য বলল, 'আপনি কী সাজেস্ট করেন?'

'গল্পটা আরও একটু ঘষামাজা করা যায় কিনা দেখুন না?' দেবু চৌধুরী বললেন, 'জ্বালা, বক্রোক্তি এগুলো বাদ দিলেও গল্পের শিল্পমূল্য ক্ষুণ্ণ হবে না কোনও—'

চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল আদিত্যর মুখে। গরম লাগছিল। গলা থেকে টাইটা খুলে ভাঁজ করতে করতে বলল, 'তা হলে আপনিও ভয় পান!'

'ভয় নিজেকে নিয়ে নয়। কাগজটাকে নিয়ে। পার্টির কাগজ হলে অন্য কথা ছিল। কোয়ালিটির আগে আমরা বিজনেসকে কনসিডার করি না ঠিকই, তবু এটা একটা কমার্শিয়াল কাগজ। সুবন্ধু মিত্রের লেখাটা ছাপা হবার পর সরকারি বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়ে গেছে। এর পর যদি কোনও কারণে পাবলিকেশন বন্ধ হয়ে যায়! মুখে আমরা গণতন্ত্র বলে যতই চ্যাঁচাই না কেন, রাজনৈতিক বিরোধিতা, সমালোচনা ইত্যাদি মেনে নেবার মতো মানসিকতা আর নেই।'

দেবু চৌধুরী কতটা সিরিয়াস বুঝবার জন্যে সময় নিল আদিত্য। ভাবল। সংশয়টা স্বাভাবিক, পরিপ্রেক্ষিতে ভুল নেই কোনও। হঠাৎই মনে পড়ল, সেদিন বম্বে যাবার আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টর মহাদেবন সাহেব ডেকে পাঠিয়ে বলেছিল, যেসব কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় তাদের রিডারদের এজ, এডুকেশন, সেক্স, ইনকাম—সবই পাওয়া যাচ্ছে রিডারশিপ সার্ভের মাধ্যমে; কিন্তু কাগজগুলোর প্রোফাইল সম্পর্কে জানা যায় না প্রায়

কিছুই। কোনও পার্টির কাগজ না হয়েও পলিটিক্যাল ওপিনিয়নের জন্যে কোনও কোনও কাগজ বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। এ নিয়ে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করে রেকর্ড করলে ভাল হয়। খোলসা করে কিছু না বললেও, আদিত্যর মনে হল, কথাগুলো যত সহজ করে বলা হয়েছিল, তাদের ভিতরের অর্থ তত সহজ নাও হতে পারে। দেবু চৌধুরী হয়তো এইরকম কিছুরই আভাস দিলেন।

নিজেকে সমর্থন করার চেষ্টা কখনও কখনও দায় হয়ে ওঠে। এই মুহূর্তের সমস্যার সহজ সমাধান একটিই, কথা না বাড়িয়ে গল্পটা ফেরত চেয়ে নেওয়া। কিন্তু, দেবু চৌধুরীর সঙ্গে যা সম্পর্ক, তাতে এই ধরনের সিদ্ধান্তকে প্রশ্রয় দেওয়া অনুচিত হবে। কুড়ি বছর কিংবা তারও বেশি দিনের সম্পর্কে এই মানুষটি কখনও প্রত্যাখ্যান করেননি তাকে। তর্ক করেছেন, সমালোচনা করেছেন, কিন্তু আগ্রহও দেখিয়ে গেছেন একটানা। দেবু চৌধুরী ধ্রুব নন্দী নন।

যতদূর সম্ভব আন্তরিক হবার ইচ্ছায় আদিত্য বলল, 'এতটা ভয় পাবার কোনও কারণ সত্যিই আছে কি? প্রশাসন ভয় পেলে মরিয়া হয়ে ওঠে। তা বলে ভারতবর্ষে কিংবা পশ্চিমবঙ্গে ফ্যাসিজম এসে গেছে এটা ভাবা ভুল। হয়তো এই করতে করতেই এসে যাবে কোনও দিন, আমি জানি না। হয়তো ভয় পেতে পেতে আমরাই ডেকে আনব!'

ঘাড় বেঁকিয়ে ভারাক্রান্ত মুখে বসে থাকলেন দেবু চৌধুরী। জবাব দিলেন না কোনও।

আদিত্য বলল, 'আমার জন্যে আপনি অনেক বছর ধরে অনেক কিছু করেছেন। আপনাকে অসুবিধেয় ফেলব না। গল্পটা ফেরত দিয়ে দিন।'

'এটা তো ভাই রাগের কথা হল!' দেবু চৌধুরী বললেন, 'আপনার ওপর আমার একটা জোর আছে, ফেরত চাইলেই তো আর ফেরত দিতে পারব না!'

'কিন্তু ছাপবেনও না তো!'

'দেখি। আর একটু ভাবি। রিসক্ নেওয়া যায় কিনা দেখি।'

মাথাটাকে পিছন দিকে নিয়ে গেলেন দেবু চৌধুরী। এতক্ষণের চিন্তিত মুখে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে প্রশান্তি। এর কতটা স্বাভাবিক, কতটা জোর করে, তা অবশ্য তখনও বোঝা যায় না। সিগারের বাক্স খুলে কী ভেবে বাড়িয়ে ধরলেন আদিত্যর দিকে—আদিত্য উৎসাহী নয় জেনেও, তার আগেই বের করে নিলেন নিজেরটা।

'চলবে নাকি?'

'চলে না।' আদিত্য নিজেও সহজ হতে চাইল। হেসে বলল, 'তবে আজ চলুক।'

একটি সিগার তুলে নিল আদিত্য। ঘটনাটা দেবু চৌধুরীকে বলবে কিনা ভাবল। না, থাক। কাগজের অফিসে কোনও কথা বলা মানেই পাঁচকান হওয়া। ঘটনাটা ঘটনা হিসেবেই ধরা হবে—এর সঙ্গে জড়ানো আদিত্য রায়ের স্নায়ুসংকট নিয়ে মাথা ঘামাবে না কেউ। ভুল ব্যাখ্যাও হতে পারে। বরং অপেক্ষা করা ভাল। চার দিন ধরে যে-ঘটনা নিজের মধ্যেই আড়াল করে রেখেছে, আরও কিছুটা সময় গেলেও ধুলো পড়বে না তার গায়ে। দেবু চৌধুরীর বাড়িয়ে দেওয়া দেশলাইয়ের আগুনের ওপর চোখ রেখে সিগার ধরাতে ধরাতে আদিত্য অনুভব করল, আজ দুপুরের পর থেকে যতই সিদ্ধান্তের দিকে এগোচ্ছে সে ততই কঠিন হয়ে উঠছে ভাষা। চিন্তার ভিতরের অন্ধকারে ক্রমশ সক্রিয় হয়ে উঠছে শব্দের পর শব্দের সমাবেশ, হঠাৎ-নির্দেশে জেগে ওঠা অক্ষরগুলো গায়ের ধুলো ঝেড়ে পরে নিচ্ছে যুদ্ধের পোশাক। সে-যুদ্ধের চেহারা কেমন, ভবিষ্যৎই বা কী, তা তারা জানে না। জানবার

আগ্রহও ফুরিয়ে আসছে ক্রমশ। লক্ষ্য একটিই এবং তা হল, গুলির শব্দের চেয়ে প্রবল হয়ে ফেটে পড়া। জানা এবং জানানো।

সিগারে টান দিতেই অনভ্যাসে বুঁজে এল গলা। কাশি সামলাতে নাক-মুখ উজাড় করে ধোঁয়া বের করতে লাগল আদিত্য। সেইভাবেই হাসল।

হাঁ করে তাকিয়ে ওর কাণ্ড-কারখানা লক্ষ করছিলেন দেবু চৌধুরী।

'অসুবিধে লাগলে ফেলে দিন। এসবে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে।'

গলা খালি করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় টান দিতে উদ্যত হল আদিত্য। সহজ করে আনল ব্যাপারটা।

'সময় লাগার ব্যাপারটা অজুহাত। আসল দরকার কষ্টটা সইয়ে নেওয়া—'

'যাক গে।' কথার অর্থ বুঝতে না পারার ধরনে প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন দেবু চৌধুরী, 'অন্যান্য খবর কি? মেয়ের কলেজ তো খোলেনি এখনও?'

আদিত্য মাথা নাড়ল।

'খোলেনি। কবে খুলবে তারও ঠিক নেই। এদিকে মেয়েটা টেনসনে ভুগছে—'

'কেন!'

'দল ভেঙে গেছে। বন্ধুবান্ধবদের অনেকেই নিখোঁজ। সকালে কাগজ এলেই হুমড়ি খেয়ে পড়ে খুন আর গ্রেপ্তারের খবরে। বুঝতে পারি, নাম খোঁজে। রাত্রে পুলিশ ভ্যানের শব্দ শুনলেই শুকিয়ে ওঠে মুখ। কে বোঝাবে এই শব্দগুলো নতুন নয়—আগেও ছিল, পরেও থাকবে!'

কথাবার্তার মাঝখানেই নেমে এল স্তব্ধতা। হঠাৎ বাইরে চোখ যাওয়ায় আদিত্য লক্ষ করল অন্ধকার হয়ে আসছে। সম্ভবত মেঘের জন্যে। মেঘই পরিণত হয়েছে রঙে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ওঠার কথা ভাবল। শ্বেতা মনে করিয়ে দিয়েছিল কাঞ্চন আসবে। সঙ্গে গাড়ি থাকলেও এই সময়টায় রীতিমতো জ্যাম থাকে রাস্তায়। সুবিধে এইটুকু, বাড়ি দূরে নয়।

'ঠিকই, ওদের টেনসন আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।' দেবু চৌধুরী বললেন, 'নকশালবাড়ির শেষ কোথায় আমি জানি না। এরই মধ্যে অনেকে অনেক কথা বলতে শুরু করেছে—সোসাল মেনাস, রোম্যান্টিক, অ্যাডভেঞ্চারিস্ট, আরও কত কী! পুলিশ যাদের গ্রেপ্তার করে বা খুন করে, তাদের অনেকের পিছনেই দেখি দাগী আসামির হিস্ট্রি থাকে। অসম্ভব নয়। লুম্পেনরা যে-কোনও অবস্থারই সুযোগ নেয়, অনেক সময়েই তাদের হায়ার করে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু, একটা কথা কে অস্বীকার করবে যে, গত চার-পাঁচ বছরে আমাদের বেস্ট বয়েজদের একটা জেনারেশন শেষ হয়ে গেল। কেউ পুলিশের গুলি খেয়ে, জেলে পচে, কেউ নিখোঁজ হয়ে। বিপ্লবের স্বপ্ন না দেখে এরা পড়াশুনো করে সহজেই চাকরি-বাকরি, প্রতিষ্ঠা পেয়ে যেতে পারত। কী অসম্ভব এক-একটা পোটেনসিয়াল, ভেবে দেখুন। ভুল হোক, ঠিক হোক, কী অসম্ভব সাহস, আত্মত্যাগ! দেশ একদিন এদের মিস করবে। একদিন বুঝতে পারবে—'

কথাগুলো যে মিথ্যে নয় তা আদিত্যও জানে। একান্তে, নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সময় এই সবই মনে হয়। তবু আর কেউ চেঁচিয়ে বললে বক্তৃতার মতো শোনায়—সন্দেহ হয় কথাগুলো টেনে নিয়ে যাচ্ছে আত্মপ্রতারণার দিকে। জ্বালা করে শরীর। আবেগের সততা ছেঁড়া কাগজ হয়ে উড়তে থাকে হাওয়ায়।

যা অবস্থা হয়েছিল মুখ-চোখের, দেবু চৌধুরী হয়তো আরও কিছু বলতেন। দরজা ঠেলে হঠাৎ একজন ঢুকে পড়ায় থামতে হল।

'দেবনারায়ণ চৌধুরী?'

'হ্যাঁ। আমিই। বলুন কী দরকার?'

'নমস্কার।'

ঘাড় ফিরিয়ে আদিত্য দেখল, দরজা থেকে ভিতরের দিকে কয়েক পা এগিয়েই থেমে দাঁড়িয়েছেন ভদ্রলোক। বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের বেশি নয়। লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়, রোগাও নয়, মোটাও নয়—কেমন একটা বেঢপ আকৃতি। রঙ অসম্ভব ফরসা, টিকালো নাকমুখের সঙ্গে সরু, সোনার ফ্রেমের চশমাটা মানিয়ে গেছে বেশ। গালভর্তি চাপ দাড়ি। পরিষ্কার ধুতি পাঞ্জাবি এবং কাঁধের ঝোলা ব্যাগ নিয়ে রীতিমতো সম্পন্ন—ডিরোজিও কিংবা কেশব সেনের পাশের বাড়ির ছেলে। তবে কণ্ঠস্বরে পুরোপুরি মেয়েলি। তোতলায় সামান্য। নমস্কার কথাটা কানে এল 'মস্কার' হয়ে।

দেবু চৌধুরীর কাছ থেকে সাড়াশব্দ পাচ্ছে না দেখে নিজেই পরিচয় দিল, একই মেয়েলি গলায়।

'আমার নাম রঙ্গন সেনগুপ্ত। একটি প্রবন্ধ এনেছিলাম—'

'কী প্রবন্ধ?'

ঝোলা থেকে গাটার লাগানো একটা পাকানো কাগজের তাড়া বের করল রঙ্গন। বলল, 'দেখুন—'

হাত বাড়িয়ে পাণ্ডুলিপিটা নিজের হাতে নিলেন দেবু চৌধুরী। একপলক নজর বুলিয়ে কুঁচকে উঠল ভুরু। বললেন, 'অবহেলিত যৌবনের গান! মানে কী! প্রবন্ধের বিষয়টা কী?'

অনেকক্ষণ ধরেই উঠবে উঠবে করছিল আদিত্য। ওদের কথার মাঝখানেই উঠে দাঁড়াল।

'যুবশক্তি নিয়ে। ফ্রান্স, লাতিন আমেরিকা, ইন্দোনেশিয়া, এই সব জায়গার স্টুডেন্ট পাওয়ার, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তাদের প্রভাব ইত্যাদি নিয়ে সিনথেসিস করে লেখা।'

'সিনথেসিস কোথায়, মশাই!' বিরক্ত গলায় বললেন দেবু চৌধুরী, 'এ তো থিসিস দেখছি। প্রায় এক দিস্তে কাগজ! অত জায়গা কোথায় আমাদের কাগজে!'

আদিত্য বুঝতে পারল যুবকটি এর পরেও কথা বলবে এবং দেবু চৌধুরীও বিরক্ত হবেন। সে সামনে আছে বলেই বাধো বাধো ভাবের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে কথাগুলো। এখনই তার চলে যাবার সময়।

'চলি আজ। আর একদিন আসব।'

'হ্যাঁ, এখন বসা মানেই বিড়ম্বনা।' দেবু চৌধুরী বললেন, 'কোনদিকে যাবেন? সোজা বাড়ি?'

'একটু নিউজরুমে ঘুরে যাব ভাবছি। প্রদীপ্তবাবু থাকবেন তো?'

'থাকে তো এই সময়।'

'চলি তা হলে—'

নিউজরুম পর্যন্ত যেতে হল না। তার আগেই, প্যাসেজে দেখা হয়ে গেল প্রদীপ্ত মুখার্জির সঙ্গে। পলিটিক্যাল করেসপনডেন্ট হিসেবে এখনকার ক্রেজ। অনেকদিনের পরিচয়।

ব্যস্তভাবে হাঁটা দেখে মনে হল বেরুচ্ছে কোথাও। আদিত্য দাঁড়িয়ে পড়ল।

'আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম—'

'দেখা হলেই এই কথা।' কাছে পৌঁছে হাতটা নিজের হাতে টেনে নিল প্রদীপ্ত, 'বড় লেখক, বড় এক্সিকিউটিভ—আমাদের মনে পড়বে কেন!'

'করলেন তো ঠাট্টা!' আদিত্য বলল, 'তাড়া আছে মনে হচ্ছে?'

'রাইটার্সে যাব। সেখান থেকে লালবাজার। ফিরে এসে রিপোর্ট করা। তাড়া না করলে আমাদের চলে!' হাতটা টেনে নিল প্রদীপ্ত, 'আপনার খবর কি? দেখি না কেন?'

'বড় লেখক, বড় এক্সিকিউটিভ!'

একই কথার জেরে হেসে নিল দুজনে।

ঘড়ি দেখে প্রদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, 'সত্যিই আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। এদিকে এসেছিলাম দেবুবাবুর কাছে। ভাবলাম দেখা করে যাই—।'

প্রদীপ্তর চোখে সরু লেন্সের চশমা, হঠাৎ তাকালে তারা দেখা যায় না। সোজাসুজি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তারা খুঁজতেই দৃষ্টি আটকে গেল কাচে। আদিত্য বলল, 'শুনলাম কোন বড় নেতা ধরা পড়েছেন?'

'হ্যাঁ। শৈবাল মজুমদার।'

'কে!'

'শৈবাল মজুমদার, স্টেট কমিটির সেক্রেটারি।'

না-বোঝা মুখে আদিত্য তখনও তাকিয়ে আছে দেখে প্রদীপ্ত বলল, 'চিনতে পারছেন না! ভেটারেন জার্নালিস্ট, এককালে প্রেস ক্লাবে আসতেন নিয়মিত। রোগা, লম্বা—ঝুঁকে হাঁটতেন একটু। দেখেছেন নিশ্চয়ই—'

সিগারের ধোঁয়া জাল সৃষ্টি করেছে গলায়, তার ভিতরে নিঃশ্বাস আটকে প্রতিরোধ করছে শব্দের স্বাভাবিক প্রবাহ। ঢোঁক গিলে আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'কবে?'

'কবে তা বোঝা যাচ্ছে না এখনও। খবরটা সারপ্রাইজ হিসেবে এল। পুলিশ ভাঙছে না কিছু। এই নিয়েই ছুটছি। কাল সকালের কাগজে ডিটেলস্ কিছু দেওয়া যায় কি না দেখি। শুনছি, সাউথ ক্যালকাটার কোনও হাইডআউটে রেড্ করে অ্যারেস্ট করেছে—'

মেঝের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো শুনল আদিত্য। চুপ করে থাকল।

প্রদীপ্ত তাড়া দেখাল।

'আর কোথাও যাবেন, না ফিরবেন?'

'না।' ব্যস্ত হয়ে বলল আদিত্য, 'চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক—'

পাশাপাশি। প্যাসেজ পেরিয়ে সিঁড়ি। পুরনো বাড়ি, বলা যায় জন্ম থেকেই দেখছে আদিত্য। কাঠের ওপর জোড়া পায়ের বেঢপ শব্দ অন্তঃসারশূন্য করে দেয় স্মৃতি। আদিত্য ভাবল, সে যা ভাবছে প্রদীপ্ত তা ভাবছে না। তবে শব্দটা দুজনকে নিয়েই।

'ব্যাপারটা সত্যি হলে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্টদের মুভমেন্টে একটা বিরাট সেটব্যাক হবে।' নামতে নামতে বলল প্রদীপ্ত, 'এমনিতেই ইন-ফাইটিং বাড়ছে দলের মধ্যে। চারু মজুমদারের প্রতিপক্ষ এখন অনেকে। শহরে, ইউথ সেকশনের মধ্যে শৈবালদার বিরাট ফলোইং ছিল—'

ফুটপাথে নেমে এসে থামল প্রদীপ্ত। আদিত্যও দাঁড়িয়ে পড়ল। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির রেণু

গায়ে লাগায় চোখ তুলে আকাশ দেখল আদিত্য। কিছুই দেখা গেল না। মনে হয় ভাসাবে।
'লেখালেখি চলছে কেমন?'
'চলছে, মোটামুটি।' আদিত্য বলল, 'তবে উৎসাহ পাই না তেমন।'
'কেন!'
আদিত্য জবাব দিল না।
দূরে দাঁড়ানো 'প্রেস' লেবেল-আঁটা গাড়ির ড্রাইভারকে ইশারা করল প্রদীপ্ত। তারপর বলল, 'আপনার 'সংকট' উপন্যাসটা পড়লাম সেদিন। জোরালো লেখা।'
আদিত্য হাসল।
প্রদীপ্ত বলল, 'শুধু গল্প, উপন্যাস লিখলেই হবে! অন্য কিছুও লিখুন?'
'অন্য কিছু!'
'এই সময়টা নিয়ে—চারিদিকে যা চলছে তা নিয়ে। ইনটেলেকচুয়ালদের কোনও রিঅ্যাকশন নেই কেন!'
'রিঅ্যাকশন হয়তো আছে। কিন্তু লিখলে ছাপবে কে?'
'আমাদের ডেলিতে দিন, আমরা ছাপব। ইন ফ্যাক্ট, অন্যমত নামে একটা ওপেন ফোরামের কথা ভাবছি—'
'দেখি। লিখলে যোগাযোগ করব।'
'আর একদিন আসুন। চুটিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে।' সামনে এগিয়ে এসেছে প্রদীপ্তর গাড়ি। দরজা খুলে উঠে বসার আগে প্রদীপ্ত বলল, 'লেখার কথাটা মনে থাকে যেন—'
হাত তুলে সম্মতি জানাল আদিত্য।
বৃষ্টির গন্ধে মিশে আছে পোড়া মবিলের গন্ধ। গলার ভিতর ধোঁয়ার জাল। নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে টের পেল অদ্ভুত বিষয়হীন লাগছে নিজেকে। সারা গায়ে বাড়ির ঠিকানা লেখা, তবু, এখন, টিপটিপ বৃষ্টি মাথায় ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আদিত্য ভাবল, শুধু বাড়ি থেকে বেরুনো এবং বাড়ি ফেরা কোনও বিবেকসম্পন্ন মানুষের গন্তব্য হতে পারে না। অব্যবহিত সম্পর্কগুলোকে জুড়লে তৈরি হয় যে রেখা তা দিয়ে দেশ, কাল, মানুষকে ধরা এক অবাস্তব ব্যাপার। হয়তো ঠিকই বলে গেল প্রদীপ্ত, রিঅ্যাকশন নেই কেন!
গা গুলোনো ভাবটা কাটানোর জন্যে পান কিনে নিয়েছিল একটা। এলাচ, সুপুরি, ভাজা মশলার স্বাদ চিবুতে চিবুতে আবদুলকে বলল, 'পার্ক স্ট্রিট ধরতে হবে না। চৌরঙ্গি দিয়ে চলো—'
'বাড়ি যাবেন না, স্যার?'
'যাব। তুমি চৌরঙ্গি দিয়ে চলো।'
গাড়ির ভিতর অন্ধকার। তবু সামনের আয়নায় তাকেই দেখবার চেষ্টা করছে আবদুল। সেখানে চিবুকের আভাস, কানেরও কিছুটা। খুব চেনা না হলে এইমাত্র আদল দিয়ে সনাক্ত করা যায় না কাউকে। পিছনের গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ায় সেটুকুও ধাঁধিয়ে গেল। গাড়িটা পাশ কাটিয়ে যেতে দেখল সে নেই, পরিবর্তে ফুটে উঠেছে আবদুলের কপাল ও চোখ। প্রদীপ্তর বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে আদিত্য ভাবল, তার পরিচিত অনেককেই রোগা ও লম্বা ভাবা যায়, ভাল করে লক্ষ করলে হয়তো ঝুঁকে হাঁটার ধরনটাও চোখে পড়ত। কিন্তু, না, শৈবাল মজুমদারের নামের সঙ্গে পরিচয় থাকলেও আলাপ হয়নি কখনও। হলে মনে

থাকত।

বৃষ্টিটা জোরে নামল এবার। ওয়াইপার চালু করার দরকার হলেও নিজের দিকের জানলার কাচটা নামাল না আদিত্য। বৃষ্টির ছাঁটে নিজেকে ভিজতে দিয়ে ডান দিকে যত দূর দেখা যায় দেখে নিল একাগ্র দৃষ্টিতে। ঝাপসা ময়দান, বৃষ্টির ভিতর দিয়েই দেখা যাচ্ছে ফ্লুরোসেন্ট আলো, ভিক্টোরিয়ার সামনেটা, পশ্চিমে রেড রোড ধরে দ্রুত গতিতে যাতায়াত করছে নিরাকার অসংখ্য গাড়ির হেডলাইটের আলো। সেদিনের অন্ধকারের সঙ্গে তুলনাই হয় না কোনও। তবে সন্ধের অন্ধকার এবং ভোরের অন্ধকারে তফাত থাকা অসম্ভব নয়। পার্থক্যই চিনিয়ে দিয়েছিল ভ্যানটিকে, লোকটিকে এবং অন্যান্যদের। লোকটির পোশাক নিশ্চয়ই সাদা ছিল, না হলে অন্ধকারে কারও দৌড়ে আসা অত পরিষ্কার বোঝা যায় না। গুলির শব্দ না হলে আরও কিছু দেখতে পারত। কিন্তু, তা হলে তো চেনাই যেত!

'আবদুল, থিয়েটার রোড ধরো।'

'বাড়ি?'

'হ্যাঁ—'

একই রাস্তায় ফিরে এল উড স্ট্রিটে। ট্যাক্সিটার নাম্বার জানা থাকলে পালিয়ে আসার ঘটনাটাকে মজবুত করা যেত আরও। কথা হল, পালানোর জন্যেই ওই সময় ট্যাক্সি চড়ার যুক্তি ছিল না কোনও। আসলে সে ভয় পেয়েছিল।

দরজা খুলতেই কাঞ্চনকে দেখল। পিছনে পৃথা।

'ওয়েলকাম, আদিত্যদা। জাস্ট এ সেকেন্ড!' আদিত্য কিছু বুঝবার আগেই ক্লিক্ শব্দে ফ্ল্যাশ্ জ্বলে উঠল। ক্যামেরা নামাতে নামাতে কাঞ্চন বলল, 'নাউ, প্লিজ কাম ইন।'

'যা রোজগার করো আজেবাজে ছবি তুলেই উড়িয়ে দাও!' ঈষৎ ক্ষুণ্ণ গলায় আদিত্য বলল, 'এবার তোমার ক্যামেরা নিয়ে বাড়িতে ঢোকা বন্ধ করতে হবে—'

কাঞ্চন অপ্রস্তুত। মাথা চুলকে বলল, 'রাগ করবেন না, স্যার। ফ্যামিলি অ্যালবামটা যেদিন প্রেজেন্ট করব, সেদিন আপনার কমেন্ট শুনতে চাই। তার আগে নয়—'

'দেখা যাক।' আদিত্য জিজ্ঞেস করল, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'আধ ঘণ্টা—'

অ্যাটাচিটা হাত থেকে টেনে নিল পৃথা।

'তোমার এত দেরি হল, বাবা?'

'দেরি কোথায়! সামান্য হয়তো। দেবু চৌধুরীর ওখানে গিয়েছিলাম।' আশপাশে তাকাল আদিত্য, 'বাচ্চু কোথায়? মা?'

'বাচ্চু পড়ছে। মা বোধ হয় বাথরুমে।'

'বোসো, কাঞ্চন। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

একবার বাচ্চুর ঘরে উঁকি দিয়ে বেডরুমে গেল আদিত্য। রান্নাঘরে ঝিরু দিচ্ছে প্রেসার কুকার। বাষ্পে মাংস রান্নার গন্ধ। ইন্দ্রিয় টান করতেই দূর থেকে কাছে, আরও কাছে, এগিয়ে এল বৃষ্টির শব্দ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে শ্বেতা। ঈষৎ এলোমেলো; দাঁতের মাঝখানে চেপে রেখেছে চুলের রিবন। সামনাসামনি আদিত্যকে প্রতিফলিত হতে দেখে ঘুরে দাঁড়াল।

'ও! তুমি।'

'আর কোনও ফোন এসেছিল?'

'না তো!' অভ্যাসে বুকের আঁচল টানল শ্বেতা। চিন্তিত মুখে বলল, 'কার ফোন বুঝতে পারলে কিছু?'

'ওই আর কি।'

আদিত্যর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল শ্বেতা। অন্যমনস্ক ভাবটা অবশ্য নতুন নয় কিছু, তবে ধরনটা আলাদা। এখন তাড়াহুড়ো করে পোশাক বদলাচ্ছে। আলনা থেকে পায়জামা-পাঞ্জাবিটা নিয়ে ওর হাতে এগিয়ে দিয়ে শ্বেতা বলল, 'বাড়িতে টেলিফোন থাকাও এক ঝকমারি!'

'না থাকলেও তো চলে না। হিসেব করে দেখো, সারাদিন বাইরের যত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ হয় তার থ্রি-ফোর্থ টেলিফোনে।'

'তা হলেও—'

শ্বেতা যুক্তি খুঁজে পেল না। বাথরুমে যেতে যেতে আদিত্য বলল, 'চা দাও—'

স্নান করে, জামাকাপড় বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে সময় লাগল না। এখন অনেক ঝরঝরে লাগছে নিজেকে। শরীরই আত্মবিশ্বাস নয়, তবে সম্পর্ক নিশ্চয়ই আছে একটা। ভাবনাগুলো দানা বাঁধে ঠিকঠাক। চিঠির বয়ানটা অনেকক্ষণ ধরে তৈরি হচ্ছিল মাথায়—এখন মনে হচ্ছে যুক্তি সাজিয়ে লিখে ফেলতে অসুবিধে হবে না কোনও। তারপর খবরের কাগজকে দেওয়া এবং অপেক্ষা করা। দেখা। ঘটনা যে ঘটবেই তার কোনও মানে নেই। তবে পাথরটা নামাতে পারবে।

বসার ঘর থেকে কানে এল হাসাহাসির আওয়াজ। নিশ্চিত কাঞ্চনকে নিয়ে। আদিত্য সামনে গিয়ে পড়তেই খামের সাইজের কী একটা লুকিয়ে ফেলল কাঞ্চন। নিষ্পাপ মুখে তাকাল দেয়ালের দিকে।

আদিত্য বলল, 'কী ব্যাপার! সাসপেনসটা কীসের?'

হাসি চেপে সরে গেল শ্বেতা। বোধ হয় চা আনতে।

'লুকোবার কী হল!' পৃথা বলল, 'দেখাও না বাবাকে ছবিটা!'

অন্যমনস্ক চোখে ব্যালকনির দিকে তাকাল আদিত্য। শব্দের জোর কমে গেলেও বৃষ্টিটা পড়ছে এখনও। ফ্যানের হাওয়ার সঙ্গে মিশে আছে অন্যরকমের ঠাণ্ডা। ঘরে থাকতেই ঝনঝনে একটা বাজনা ভেসে আসছিল কানে। ওরা চুপ করার সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্ট হল আওয়াজটা। দমাদম-দমাদম-হিঃ-হিঃ-হিঃ-হিঃ। জ্যাজ! সিলি রক বলতে হয়তো এইরকমই কিছু বুঝিয়েছিল পরেশ সোম। একদিন সঙ্গে গিয়ে বুঝে নিতে হবে। সামনের ফ্ল্যাটের রাজঘেরিয়ারা লন্ডনে গেছে ক'দিন হল। কলেজে-পড়া ছেলেটা একা থাকবে, বলেছিল খেয়াল রাখতে। তার আর দরকার হয়নি অবশ্য। প্রায়ই সন্ধের দিকে বন্ধুবান্ধব নিয়ে এসে হৈ চৈ করে ছেলেটা—ফুল ভল্যুমে রেকর্ড চালায়। সত্য বলেছিল মদটদও খায়। হতে পারে। যেভাবে শুরু করেছে, আজ হয়তো অনেকক্ষণ চলবে। উড স্ট্রিট কলকাতা নয়।

'কার ছবি?'

'মা'র।' পৃথা বলল, 'এমনিতে হয়নি, আবার ব্লো-আপ করেছে। বিচ্ছিরি!'

'দ্যাটস রিয়েলি আনফেয়ার। বিচ্ছিরি কিছু হয়নি—'। পিছনে লুকানো হাতটা সামনে এনে খাম থেকে একটা বড় সাইজের প্রিন্ট বের করে আদিত্যর সামনে রেখে কাঞ্চন বলল,

'বলুন তো, ডাজ ইট লুক ব্যাড?'

প্রিন্টটা হাতে তুলে নিল আদিত্য। টেনে আনল চোখের সামনে।

দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে ফিরে এল শ্বেতা। কাপগুলো নামিয়ে রেখে আদিত্য ছবিটাই দেখছে দেখে বলল, 'কী বিচ্ছিরি হয়েছে দ্যাখো! নাকের ফুটো দুটো যেন হাঁড়ির মুখ—রোমকূপগুলো ব্রণের মতো দেখাচ্ছে!'

'সাধারণ চোখে তুমি যা, ব্লো-আপে তার ঠিক উল্টোটাও হয়ে যেতে পারো।' আদিত্য বলল, 'আমাকে করলেও হয়তো একই রেজাল্ট হবে। কী কাঞ্চন, ঠিক বলেছি তো?'

'দ্যাটস ট্রু।' কাঞ্চন বলল, 'কিন্তু এটা এখনও রিটাচ করা হয়নি। রিটাচিংয়ের পর এসব ত্রুটির কিছুই আর থাকবে না।'

'হতে পারে। তবে, খুঁত একবার চোখে পড়লে হাজার রিটাচিংয়েও কাজ হয় না। ক্যামেরা বড় বেয়ারা জিনিস। তোমার আর দোষ কী!'

'বাবা, তুমি একেবারে যা তা!' পৃথা বলল, 'এতদিন পরে কাঞ্চন মামাকে হুক্ করার একটা সুযোগ পেয়েছিলাম!'

'আর একদিন করিস। আগেভাগে জানালে আমি বরং থাকব না।'

আদিত্যর এ ধরনের কথার মানে বোঝা যায়। এই আলোচনাটা থামাতে চাইছে, হয়তো কাঞ্চনকে কিছু বলবে।

বুঝতে পেরে উঠে গেল শ্বেতা। কিছু পরে পৃথাও। যেতে যেতে বলল, 'তোমাদের চা ঠাণ্ডা হচ্ছে—'

ছবিটা খামে ভরে সরিয়ে রাখল কাঞ্চন। ক্যামেরাটাও। চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে বসতে বসতে বলল, 'আজকের খবর শুনেছেন কিছু?'

'কী?'

'আমি কফিহাউসে গিয়েছিলাম। শুনলাম একজন বড় নকশাল লিডার অ্যারেস্টেড হয়েছিল, তবে পুলিশ নাকি আইডেনটিফাই করতে না পেরে ছেড়ে দিয়েছে।'

আদিত্য গম্ভীর হল।

'হ্যাঁ, শৈবাল মজুমদার। তবে ছেড়ে দিয়েছে এ কথা তো শুনিনি!'

৪

মাঝরাতের বৃষ্টি বড় একা করে দেয়। একটানা অঝোর শব্দে জড়িয়ে থাকে এক ধরনের শূন্যতা—স্মৃতি ও ভবিষ্যতের মাঝখানের ব্রিজটা কখন যে জায়গা বদল করে চলে যায় অন্যত্র, হারিয়ে যায় এদিক ওদিকে, হাজার ছুটোছুটি করেও তার হদিশ পাওয়া যায় না কোনও। পারাপার বন্ধ। আর বন্ধ যাওয়া কিংবা ফেরা। হঠাৎ ঘুম ভেঙে জেগে উঠলে মনে পড়ে দ্বীপ—চেনাজানা পৃথিবীর শেষ জীবিত মানুষ তুমি, জলভুক্ত আত্মীয়তার স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছ এখনও। একে সৌভাগ্য মনে কোরো না। অদৃশ্যের ইচ্ছা বড় ভীষণ। সে আসছে, প্রস্তুত থাকো তার আবির্ভাবের জন্যে। শূন্যতাবোধের ভিতর সময় থাকে না। সুতরাং কখন

সে আবির্ভূত হবে, গ্রহণ করবে তোমাকে, আকস্মিকের আঘাতে থেমে যাবে নিঃশ্বাস, তার কোনও স্থিরতা নেই। এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটিই আসল। এই মুহূর্তেই ভেবে নাও তুমি কে, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এতকাল ভাবিত করেছ নিজেকে—কোন সম্ভাবনা ও বিশ্বাস বৃষ্টিতে আড়াল দিয়েছে তোমাকে, অসহ্য শীতে সস্নেহে চাদর জড়িয়ে দিয়েছে গায়ে? প্রখর সূর্যের নীচে শুষ্ক কাষ্ঠ যখন অঞ্জলি পেতে দাঁড়িয়েছিল, তখন কে উজাড় করে দিয়েছিল শুশ্রূষার জল? উত্তরে মূক করে দেবার জন্যেই এই সব প্রশ্ন। শূন্যতা থেকেই জেগে ওঠে আত্মঘাতী অসহায়তা। তখন আর একটা ছবিও ভেসে ওঠে চোখে। স্মৃতি, স্বপ্ন, অভিজ্ঞতা, আত্মীয়তায় পূর্ণ পৃথিবীতে শেষ দিনের ঘুম থেকে উঠে ফাঁসির মঞ্চের দিকে যাবার জন্যে স্নান করে নিচ্ছে একজন দণ্ডিত। চৈতন্য বিলুপ্ত হবার পর অভ্যাসই সক্রিয় করে রাখে তাকে। জীবন বা মৃত্যু কোনওটার কথাই আর সে ভাবে না। সে তো জানেই, জীবন তাকে ছেড়ে গেছে অনেক দিন, এখন মৃত্যুও যাচ্ছে। নিঃশ্বাস উপলব্ধি করার জন্যে এই তার শ্রেষ্ঠ সময়!

মাঝ রাতে একবার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আদিত্যর। তখনই টের পেয়েছিল বৃষ্টি। শ্রাবণের শেষ, এখন এইভাবেই ঝরবে। তবু তখনই বুঝতে পেরেছিল কারণ না থাকা সত্ত্বেও কিছু কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাবনা ঘিরে ধরছে তাকে। আরও অনেক কিছুর মতো কেন এমন হচ্ছে তার উত্তর পেল না কোনও। ঘড়ি দেখল, সাড়ে তিনটে। অন্ধকারে আবদ্ধ ফ্ল্যাটের চারিদিকে নিজের নিরাপত্তা পরখ করার ধরনে ঘুরে এল নিঃশব্দ পায়ে। ঠিকই আছে সব। ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরছে পৃথা, অন্ধকারেও চোখে পড়ে ঘুমন্ত বাচ্চুর বুকের ওঠা-নামা। শ্বেতার নিঃশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসছে সুখে থাকার মৃদু শব্দ। অস্পষ্ট এইসব দৃশ্য ও শব্দে চোখ কান খোলা রেখে হঠাৎই স্থির হয়ে এল শরীর, এ পর্যন্ত ধরে রাখা স্মৃতিও। তা হলে কি নিরাপত্তা সম্পর্কে তার সমস্ত ভাবনা জড়িয়ে আছে দরজা, জানলা, দেয়াল, আসবাব, পর্দা, বই দিয়ে ঘেরা এই ভীষণ ছোট্ট জগতের তিনটি প্রাণী নিয়ে—আপাত-অসহায়, তবু সব ঠিক আছে জেনে যারা ঘুমের মধ্যে নিশ্চিন্ত, পার করে দিচ্ছে কয়েক ঘণ্টার অন্ধকার, কাল সকালে আবার সব ঠিকঠাক ফিরে পাবে এই আশায়! নাকি নিরাপত্তার সঙ্গে আশা-আকাঙ্ক্ষার যোগ নেই কোনও—বস্তু ও সম্পর্কের মধ্যে বহু দিন একসঙ্গে থাকার অভ্যাসই পৌঁছে দেয় নিরাপত্তার ধারণায়! ধারণাটাই পরিণত হয় আশ্রয়ে, নিঃশ্বাস নেবার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গায়! দৃষ্টি, ঘ্রাণ এবং আবেগ দিয়ে সে যেমন চিনে নেয় শ্বেতা, পৃথা, বাচ্চুকে, কিংবা, আরও এগিয়ে, নিজের অব্যবহিত পরিবেশকে, তেমনি যে যার নিজের ভূমিকায় থেকে শ্বেতা, পৃথা, বাচ্চুও চিনে নেয় তাকে! অভ্যাসের অভাবেই আশ্রয়ের বাইরে আর যারা তারা সবাই হয়ে ওঠে দূরত্বপূর্ণ—চোখ চিনিয়ে দিলেও পরিচয়ে আবেগ থাকে না কোনও!

হয়তো, হয়তো নয়। গুছিয়ে, অর্থের সম্পূর্ণতা নিয়ে আসছে না বলেই চোরাগোপ্তা আক্রমণে শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে অবসাদ। আদিত্য বুঝতে পারল না সে ঠিক কোথায়, কোনখানে, কেন! স্মৃতির ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নিজেকে টেনে তুলতে গিয়ে ভাবল, যদি এমন হয় যে এখন, এই অদ্ভুত দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেই—আর সকলেই যখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, কিছু একটা হয়ে গেল তার, নিঃশ্বাস নেয় না এমন আরও একটি আসবাবের মতো পড়ে রইল সে, তা হলে, কাল সকালে এই অবস্থায় তাকে আবিষ্কার করে কোন শূন্যতার বোধে আক্রান্ত হবে ওরা? এটা ঠিক, শ্বেতা যা ভাববে, পৃথা বা বাচ্চু তা ভাববে না; কিংবা পৃথা যা ভাববে, শ্বেতা ও বাচ্চু তা ভাববে না। বাচ্চু এখনও ছোট ধারণায় পৌঁছুবার জন্যে

হয়তো অভিজ্ঞতা ধার করবে শ্বেতা ও পৃথার কাছে। অবিশ্বাস মূক করে রাখবে ওদের। আত্মরক্ষার জন্যে, তারপর, একজন ছুটে যাবে অন্যজনের দিকে।

জায়গা থেকে সরে এল আদিত্য। এমনও হতে পারে, ঘটনা ও অনুভূতিগুলোকে সে যেভাবে সাজিয়ে নিচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে তার মিল নেই কোনও। সেদিন ভোর রাতে, লোকটি ছুটে আসার আগে, এইভাবে ছুটে আসা এবং মানুষের করণীয় সম্পর্কে তার যে-ধারণা ছিল—ঘটনা ঘটে যাবার পরেও যেটাকে উচিত বলে ভেবেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে, লোকটি যখন সত্যি সত্যিই ছুটে আসতে থাকে তার দিকে এবং পড়ে যায়, তখন, আগের ও পরের সমস্ত ধারণাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে সে নিজেই পালাতে থাকে আত্মরক্ষার জন্যে। কেন!

উত্তর পেল না। আরও কিছুক্ষণ না-বোঝা অস্বস্তির মধ্যে কাটিয়ে আবার উঠে এল বিছানায়। ঠিক যে ঘুমোবার জন্যে তা নয়। সময়ের হিসেবে ভোর হতে অনেক দেরি আছে এখনও। ঘণ্টা দেড়েক কিংবা আরও বেশিও হতে পারে। শ্রাবণের শেষ; এরই মধ্যে বড় হতে শুরু করেছে রাতগুলো, বৃষ্টি ও মেঘের জন্যেও ঘোলাটে হয়ে থাকে আকাশ। আজ যেভাবে বৃষ্টির দাপট চলেছে তাতে কখন আলো ফুটবে তার ঠিক কি! তা ছাড়া, এইভাবে চললে, নিশ্চিত মর্নিং ওয়াকে বেরুনো যাবে না। হয়তো কাগজ পেতেও দেরি হবে।

চিন্তাটা মাথায় আসতেই ভারী হয়ে এল নিঃশ্বাস। খানিক আগে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলেও খটখট করছে চোখ। সেখানে ঘুমের জড়তা নেই কোনও। সিলিংয়ের দিকে তাকালে কম পয়েন্টে চালানো ফ্যানের ব্লেডগুলো গতির বৃত্ত থেকে আলাদা হয়ে ধরা পড়ে চোখে, নৈঃশব্দ্যের মধ্যেও ভেসে ওঠে এক ধরনের শব্দ। থেমে থেমে নিঃশ্বাস পড়ছে শ্বেতার, তার শব্দ। জানলা দিয়ে ছুটে আসা বিদ্যুতের আকস্মিক আলোয় ওর পাশ ফিরে হাঁটু ভেঙে শুয়ে থাকার ভঙ্গিটুকু স্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে যায় আবার। প্রায় চিন্তাহীন ভাবে অস্পষ্ট ও আবছা এইসব শব্দ ও দৃশ্যগুলিকে আলাদা করতে করতে আদিত্য ভাবল, আজ এখন পর্যন্ত এক রকম আছে, কিন্তু আরও কিছুক্ষণ পরে, ভোরের আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সাইকেলের ঘণ্টি বাজিয়ে কাগজের হকাররা যখন বেরিয়ে পড়বে রাস্তায়, ছুটতে শুরু করবে নানা দিকে—জীবন তখন আর একই রকম থাকবে না।

কাল বিকেলে কাগজের অফিসে গিয়ে প্রদীপ্তর হাতে নিজের লেখা চিঠিটা দেবার পর রুদ্ধশ্বাসে পড়া শেষ করে প্রদীপ্ত বলেছিল, 'আপনি মশাই মানুষ খুন করতে পারেন। কালই দেখা হল, কিছু বলেননি! এত বড় একটা সেনসেশন চেপে রেখেছিলেন কী করে!'

জবাবে চুপচাপ হেসেছিল আদিত্য। এই ধরনের সোজাসুজি প্রশ্নের উত্তর থাকে না কোনও। প্রদীপ্তকে বোঝানো যেত না, চিঠিটা দু পৃষ্ঠার হলেও আগের পাঁচ দিনের ঘটনার—যার সঙ্গে সে নিজেই শুধু জড়িত, আগাগোড়া বিবরণ লিখে রাখলে প্রায় একটা উপন্যাসের চেহারা নিত। খুন করার পরিকল্পনা আঁটা থেকে প্রকৃত খুন করার মধ্যে যদি কোনও ধারাবাহিকতা থেকে থাকে, তা হলে সেই খুন প্রত্যক্ষ করা এবং স্মৃতি ও বিবেক থেকে ঘটনাটা সম্পূর্ণ মুছে ফেলার মধ্যেও আছে একটা ধারাবাহিকতা; শেষটা যদিও সে জানত না। চিঠিটা একভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছে তাকে। ঠিক জানে না, চুপচাপ আত্মরক্ষার কথা ভাবতে ভাবতে হয়তো ক্রমশ আত্মঘাতের দিকে পৌঁছে যেত সে। একটি মৃত্যুর পরিণতিতে ঘটে যেত আর একটি মৃত্যু—অগোচরে ও নিঃশব্দে। সব মৃত্যুর জন্যে ময়দানের অন্ধকার কিংবা গুলির শব্দের দরকার হয় না।

দৃশ্যটা ফিরে আসছে। ঠিক যে ভাবে ঘটেছিল, ঠিক যে ভাবে ধরা পড়েছিল অক্ষরে। আদিত্য ভাবল, ঠিক যে ভাবে জন্ম নেয় গল্প। তফাত বলতে এখানে কল্পনা নেই কোনও; সুতরাং শুরু নেই, শেষও নেই। তবে গল্পেরই ধরনে আছে এগিয়ে যাওয়া। নিজেই বুঝতে পারছে, চিঠিটা লেখার আগে পর্যন্ত সে যেখানে ছিল, লেখা এবং হাত-বদলের পর ঠিক সেখানে আর নেই। এমনকী, এই মুহূর্তেও সে যেখানে আছে, খবরের কাগজে বেরিয়ে যাবার পর আর সেখানে থাকবে না। রক্তপাত বন্ধ হবার পর আঘাতের গভীরতা নিয়ে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ক্ষত—জ্বালার পরিবর্তে অনুভূতি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে নির্বোধ শূন্যতা। আরও অনেকের মধ্যে ব্যাপ্ত হবার পর সম্ভবত আরও হালকা লাগবে নিজেকে, আরও স্বচ্ছন্দ।

আবার ঘুম আসছে টের পেয়ে আড়াআড়ি হাত তুলে চোখ চাপা দিল আদিত্য। হাই উঠে এল পর পর—ছোট থেকে বড় হয়ে, শেষে আর শব্দ আড়াল করতে পাবল না। ঘরের অন্ধকার আর বাইরে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে নিজেকে ছেড়ে দিতে দিতে অনুভব করল বুকের ওপর চুড়ি-পরা হাতের স্পর্শ। কিছুক্ষণ বুকের ওপর থেকে গলা ও কপাল ছুঁয়ে আস্তে আস্তে হাতটা উঠে এল মাথায়। সেখান থেকে আবার নেমে এল বুকে। চুল ও শরীরের গন্ধের সঙ্গে নিঃশ্বাসের ঈষৎ বাসী গন্ধ ঘোরাফেরা করছে নাকের সামনে। খানিক আগে থেমে থেমে নিঃশ্বাস্ পড়ার ধরন থেকেই মনে হয়েছিল পাত্‌লা হয়ে আসছে শ্বেতার ঘুম। হাই তোলার শব্দেই সম্ভবত জেগে উঠেছে পুরোপুরি। আদিত্য কিছু বুঝতে পারার আগেই মাথার বালিশটা টেনে গায়ে গায়ে এগিয়ে এল শ্বেতা।

'ঘুমোচ্ছ না কেন!'

'কী জানি!' আদিত্য বলল, 'ঘুমটা ভেঙে গেল হঠাৎ।'

'কেন! শরীর খারাপ লাগছে?'

'না।' আদিত্য চুপ করে থাকল একটু। তারপর বলল, 'জানি না।'

'আমি জানি। ভাবনায়।' স্বগতোক্তির গলায় বলল শ্বেতা, 'কী যে ভাব সারাক্ষণ!'

'কী আর ভাবব! কিছু না!'

'নিজেকে বোঝাও।' মাথার চুলে আলগোছে বিলি কেটে যাচ্ছে শ্বেতার আঙুল। বলল, 'তুমি না বললেও বুঝি কিছু একটা হয়েছে। আজ পৃথাও বলল।'

'কী!'

এখনও ঘুমঘোর কাটাতে পারেনি শ্বেতা। হাই তুলতে তুলতে সরে এল কাছে, যতটা কাছে এলে মিশে যাওয়া যায় শরীরে। তারপর বলল, 'ভয় ভাবনায় জড়িয়ে রাখো সারাক্ষণ। আমরা আর কী বলব! যখন সবাই ঘুমোয়, তখন তুমি পায়চারি করো। জানতে চাইলে উত্তর দেবে না বলেই জিজ্ঞেস করি না।'

আবেগে গলার স্বর বেঁকে গেল শ্বেতার। মাথা থেকে হাতটা নামিয়ে আনল গলার ওপর, তারপর কাঁধ চেপে ধরল। বুকের পাশে ওর ভারী বুকের তাপ অনুভব করে পাশ ফিরল আদিত্য। বোতাম-খোলা ব্লাউজের অন্ধকার মাংসে নাক ডুবিয়ে বলল, 'প্রত্যেক মানুষেরই একটা আড়ালের জগৎ থাকে—নিজস্ব ভাবনার জগৎ থাকে। সেখানকার কথা চেঁচিয়ে বলা যায় না। বললেও বুঝতে পারতে না।'

'জানি না। এক ঘরে এক ছাদের নীচে থেকেও তুমি দূরে চলে যাচ্ছ!'

বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে খরার মাঠ, বীজ গ্রহণের জন্যে ক্রমশ কাদা হয়ে উঠছে মাটি। নিজেকে খুলে দেবার আগে আদিত্যর গালে ঠোঁট চেপে ধরল শ্বেতা—যদি এইভাবে দূরত্ব কমে। তারপর বলল, 'সেদিন বম্বে থেকে ফিরে নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিলে! সত্যকে দারোয়ান বলেছে, রোজকার মতো মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলে তুমি। তারপর হঠাৎ ফিরে আসো ট্যাক্সিতে। এমন ভাবে ফিরছিলে যেন কেউ তাড়া করেছে! আজই জানলাম।'

যত দূর এগিয়েছিল সেইখানেই থেমে গিয়ে আদিত্য বলল, 'সত্য বলেছে?'

'না বললে জানব কী করে!'

'তা অবশ্য—।'

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিল আদিত্য। কোনও ভাবে পরিবর্তিত হল না। তারপর সহজ গলায় বলল, 'তোমাদের বলিনি, তার কারণ ছিল। কাল বলব, কাল সবাই জানতে পারবে।'

শ্বেতা কিছু বলল না। মুখের ওপর ঝুঁকে পড়া আদিত্যর মাথাটা নিজের দিকে টেনে নিয়ে বলল. 'বৃষ্টি পড়ছে। আজ আর বেরুবার দরকার নেই।'

৫

জীবন এই রকম থাকবে না, একদিন ভেবেছিল আদিত্য। কিন্তু, জীবন বদলে যাবে—খবরের কাগজ পড়ে বিচলিত হবার নিষ্ক্রিয়তা থেকে একদিন নিজেই খবর হয়ে উঠবে সে, বাড়ি আর অফিস আর বাড়ির নিরাপত্তা নামক একঘেয়েমি থেকে মুক্ত হয়ে ঢুকে পড়বে যুদ্ধের এলাকায়. ভেবেছিল কী?

চিঠিটা খবরের কাগজে বেরুনোর পরই ঘটনা ঘটতে লাগল দ্রুত এবং অপ্রত্যাশিতভাবে।

'কাজটা ভাল করোনি।' সেদিনই সকালে ফোন করে বলল অশোক দত্ত, 'সাংঘাতিক ঝুঁকি নিলে—'

'কেন!' জিজ্ঞেস করল আদিত্য। তারপর, অশোক চুপ করে আছে দেখে, ঈষৎ ঠাট্টার সুরে বলল, 'গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পুলিশ যে কত মহৎ আর দয়ালু, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যেই আইন তুলে নিচ্ছে নিজের হাতে—এটার একটা ছোট্ট প্রমাণ পাওয়া গেল বলে!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না অশোক। থমকে-যাওয়া গলায় বলল, 'আমি পুলিশে কাজ করি বলেই অ্যাটাক কোরো না। আমি তোমার বন্ধুও। তা ছাড়া, খবরের কাগজে চিঠি লিখেই কিছু প্রমাণ করা যায় না—'

'কী বলতে চাও!'

'এই সময় তোমার ওই চিঠি ছেপে কাগজ একটা স্কুপ করল—মে বি টু ক্রিয়েট এ সেনসেশন। কিন্তু, তাতে তোমার কতটা সুবিধে হল সেটাও ভাবা দরকার।'

'কোনও সুবিধে আদায়ের জন্যে আমি কিছু করিনি।'

ভাববার সময় নিল অশোক। থেমে বলল, 'পুলিশ তোমার চিঠি নিয়ে কী করবে জানি

না। তবে, আর একটা বিপদও আছে। নকশালদের মধ্যে দলাদলি বেড়েছে, ওদের নিজেদের মধ্যেই চলেছে বিশ্রী রকমের হানাহানি। ওরা তোমাকে ব্যবহারের চেষ্টা করলেই বিপদ। এখন একটু সাবধানে থেকো।'

'দেখা যাক।' বলে চুপ করে গেল আদিত্য।

ইতিমধ্যে বেরুতে লাগল খবরের পর খবর।

প্রদীপ্ত একদিন চলে এল বাড়িতে। বলল, 'যে-লোকটিকে খুন হতে দেখেছিলেন তার চেহারাটা ঠিকঠিক মনে পড়ছে?'

'কেন!'

প্রদীপ্ত চুপ করে থাকল।

আদিত্য বলল, 'চিঠিতে যা লিখেছি তার বাইরে একটি অক্ষরও জানা নেই আমার। তখনকার অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। এইটুকু মনে আছে, লোকটি ছিল রোগা আর লম্বা। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছিল। এর বেশি আর কিছু দেখার সুযোগ ছিল না।'

'কোইনসিডেন্স বলেই মনে হচ্ছে। তবে এতখানি মিল ঘটনার মধ্যে থাকে না।' প্রদীপ্ত বলল, 'শৈবাল মজুমদার যেদিন রাত্রে অ্যারেস্ট হন বলে অনুমান করা হচ্ছে, সেদিনই ভোর রাতে আপনি ওই মার্ডারের ঘটনাটা দেখেন! পুলিশ অবশ্য গ্রেফতারের খবরটা কনফার্ম করেনি। কাগজে দেখেছেন তো, অফিসিয়াল রিপোর্ট বলছে খবরটা ভুয়া। আবার কানাঘুষায় শোনা যাচ্ছে, শৈবাল মজুমদার ভেবে যাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছিল সে-লোকটি আদৌ শৈবাল মজুমদার নয়—একটা আধপাগলা নিউরোটিক লোক। আইডেনটিফায়েড না হওয়ায় সেদিন রাত্রেই পুলিশ ছেড়ে দেয় তাকে। এদিকে চারু মজুমদার স্টেটমেন্ট দিয়েছেন, শৈবাল মজুমদারকে যেদিন রাত্রে অ্যারেস্ট করা হয় সেদিনই মেরা ফেলা হয়েছে—'

এগুলো বিবরণ শুধু। কাগজেই দেখেছে। নিঃশ্বাস চেপে আদিত্য বলল, 'জানি না। জানতে পারলে বলতাম।'

'বলা মুশকিল। শৈবাল মজুমদারের সঙ্গে চাক্ষুষ আলাপ থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। যাকগে—', হঠাৎ কথা শেষ করে উঠতে উঠতে প্রদীপ্ত বলল, 'আপনার চিঠিটা নিয়ে একটা কমোশন হচ্ছে। সেন্টারেও রেফারড হয়েছে। পুলিশ আপনাকে হ্যারাস করতে পারে। ঘাবড়াবার কিছু নেই। বাড়িতে বলে রাখবেন, যদি সেরকম কিছু হয়, জানাবেন—

কাঞ্চন এখনও আসে তার ক্যামেরা নিয়ে। ছটফট করে উড স্ট্রিটের ফ্ল্যাটের স্তব্ধতা ছিঁড়ে আগের স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে। একদিন বলল, 'আপনাকে নিয়ে জোর ডিসকাসন চলছে, আদিত্যদা।'

'ডিসকাস করার কী আছে!'

'না, ওই চিঠিটা।' অভ্যাসে ক্যামেরার লেনস্ অ্যাডজাস্ট করতে করতে কাঞ্চন বলল, 'সবাই বলছে কারেজ না থাকলে কেউ এই চিঠি দিতে পারত না। দ্য এপিসোড হ্যাজ মেড ইউ এ হিরো।'

স্পষ্ট অথচ কিছু বা অস্বস্তির চোখে কাঞ্চনকে দেখল আদিত্য। বলল, 'জানি। তোমাদের ধ্রুব নন্দী ফোন করেছিল। বলল, লাইমলাইটে আসবার জন্যে ফিল্মস্টাররা নিজেদের কেচ্ছা ছড়ায়। লেখক হিসেবে আমি নাকি একটা ট্রেনড সেট করলাম!'

কাঞ্চন বিষণ্ণ হল।

'আমি তা বলিনি, আদিত্যদা। আমি বিশ্বাস করি এই সময়ে এই চিঠি লেখার সাহস আর কারুর হত না। আপনি একা—এই ঘটনার আর কোনও সাক্ষী নেই। এই লড়াইটা আপনার একার—'

আদিত্য হাসল। ব্যালকনির ওদিকে আকাশ। অনেক দূরে খুব নিচু হয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। দূরত্ব বেশি বলেই শব্দটা পৌঁছয় না এখানে। প্যাঁচ লেগে ঘুরতে ঘুরতে একই দিকে এগিয়ে চলেছে দুটো ঘুড়ি। অন্যমনস্ক চোখে এই সব দেখতে দেখতে বলল, 'জানি না। এটা লড়াই কি না তাও জানি না। প্রতিপক্ষ কে?' তারপর বলল, 'কে কীভাবে ব্যাখ্যা করছে জানি না। জেনে আমার লাভ কি! আমি তো জানি, লড়াইটা ছিল নিজেরই বিরুদ্ধে!'

থমথমে শ্বেতা, পৃথার মুখ। বাচ্চু ছোট, কাছে ঘেঁষে না। আদিত্য লক্ষ করল কাঞ্চনকে নিয়ে প্রতিদিনের তামাশাটা ভুলে গেছে ওরা। চোখ তুললেই কথা বলতে হবে এই ভাবনায় নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ে দৃষ্টি। ভাবনাটা ঠিকই, জীবন বদলে যাচ্ছে।

'কত লোক খুন হচ্ছে চারিদিকে!' পৃথা হঠাৎ বলল, 'এর মধ্যে আর একটি লোক খুন হলে সংখ্যাই বাড়ে শুধু। চিঠিটা না লিখলে কী হত!'

'পৃথিবীর ভাল মন্দ হত না কিছুই।' চাপা হেসে বলল আদিত্য, 'কিন্তু, আমি ছোট হয়ে যেতাম।'

পৃথা চুপ করে গেল।

গভীর ঘুমের মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল একদিন। ঘুম ভাঙার পর মনে হল শব্দটা পুরনো—বেজে চলেছে অনেকক্ষণ ধরে, যে চাইছে তার সঙ্গে যোগাযোগ না হলে বেজে চলবে অনন্তকাল ধরে। প্রতিটি শব্দে আলাদা খাঁজ পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারে।

উঠে বসতে গিয়ে আদিত্য দেখল তার আগেই উঠে পড়েছে শ্বেতা। ওকে নিরস্ত করার জন্যে বলল, 'তুমি থাকো। আমি ধরছি—'

'না। আমিই ধরব।'

আলো জ্বালল শ্বেতা। পর পর দুজনেই বেরিয়ে এল বেডরুম থেকে। দেখল, আগেই উঠে এসেছে পৃথা। আদিত্যর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দাঁড়াল একটু। চিন্তিত মুখে বলল, 'তুমি থাকো। আমি ধরছি।'

আবহাওয়াটা সহজ করবার চেষ্টায় আদিত্য বলল, 'বাড়িতে টেলিফোন থাকলেই ফোন আসে। এত ভয় পাচ্ছিস কেন!'

রাস্তা দিয়ে বনেটের ঝড়ঝড়ে শব্দ তুলে দ্রুত চলে যাচ্ছে একটা বড় গাড়ি। শ্বেতা এমন দৃষ্টিতে তাকাল আদিত্যর দিকে যে মনে হবে গাড়িটার রঙ ও আকার পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। তারপর, ফোনের শব্দে কান রেখে বলল, 'কলকাতায় আমাদের এমন কোনও আত্মীয় নেই যে মারা যাবে হঠাৎ। তোমার লেখা চাইবার জন্যেও এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকবে না কেউ—'

আদিত্য জবাব দিল না। বাধাও দিল না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে দেখল, তৎপর হাতে রিসিভার তুলে কানে লাগাচ্ছে পৃথা।

'হ্যালো—!'

দশ সেকেন্ডও হবে কি হবে না, ধমকের গলায় পৃথা বলে উঠল, 'রং নাম্বার। এত রাত্রে আজেবাজে কল করে বিরক্ত করবেন না!'

ফোন ছেড়ে দিল পৃথা। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাকাল আদিত্যর দিকে।

একবার স্বামীকে দেখে বিব্রত চোখে মেয়ের দিকে তাকাল শ্বেতা।

'রং নাম্বার?'

'না। বাবাকে খুঁজছিল। অচেনা গলা।'

আদিত্য বলল, 'রং নাম্বার বললি কেন! আমি কথা বলতে পারতাম!'

পৃথা জবাব দিল না। আদিত্য ও শ্বেতার সামনে দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে বলল, 'যে ফোন করছিল সে নিশ্চয়ই তোমার বন্ধু নয়।'

ঘরে এসে শ্বেতা বলল, 'পুলিশ নয় তো!'

'পুলিশ কেন হবে!' কিছুটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে আদিত্য বলল, 'তোমরা হঠাৎ এত ভয় পেতে শুরু করলে কেন!'

আলোটা নিবিয়ে দিল শ্বেতা। আকাশে আলো আছে, হালকা জ্যোৎস্নাও। তার কিছুটা মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে জানলা দিয়ে। সেই আলোয় শ্বেতার মুখের আধখানা দেখতে পেল আদিত্য। রাত একটায় টান পড়েছে বাতাসের ভারসাম্যে। দুদিন বৃষ্টি হয়নি। তবু আবার গরম পড়ার বদলে অল্প ঠাণ্ডার ছোঁয়া লেগেছে হাওয়ায়।

বিছানায় এসে পায়ের গোড়া থেকে পাতলা চাদরটা গায়ে টেনে নিয়ে শুতে শুতে শ্বেতা বলল, 'ভয় আমাদের জন্যে নয়—'

এক রকম থেকে আর এক রকম হওয়া নয়, আদিত্য অনুভব করল, জীবন বদলে যাচ্ছে ক্রমশ—টান পড়ছে শিকড়ে। কার্ফুর আতঙ্কে যত দ্রুত সম্ভব সকলেই ঢুকে পড়তে চাইছে আশ্রয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণা। এতদিন সে-ই শ্বেতা, পৃথাদের কথা ভেবে এসেছে, এখন ওরাই ভাবছে তাকে নিয়ে। ভয় পেয়ো না বললেই ভয় যায় না।

কথা না বাড়িয়ে নিজেও উঠে এল বিছানায়। দেয়াল থেকে ছিটকে-পড়া জ্যোৎস্নার আলোয় মাখামাখি হয়ে আছে নিজের পায়ের পাতা দুটো। নিজের মুখ দেখা যায় না; পা দুটোর দিকে তাকিয়েই মনে পড়ে শবযাত্রা। মানুষ এইভাবেই যায়।

শ্বেতা পাশ ফিরল। একটা হাত তুলে দিল আদিত্যর বুকের ওপর।

'ভাল কথা বলব?'

'কী?'

'এই হাঙ্গামায় থাকলেই অশান্তি হবে।' শ্বেতা বলল 'চলো, আমরা কিছুদিন অনিমেষের কাছ থেকে ঘুরে আসি। পুণার জল-হাওয়া ভাল। কিছুদিন দূরে থাকলে ব্যাপারটা থিতিয়ে যাবে। তখন ফিরে আসব।'

আদিত্য মনে করতে পারল শ্বেতার ভাই অনিমেষ পুণায় আছে অনেক দিন। প্রায়ই যেতে বলে। শ্বেতাও মাঝে মাঝে ওখানে বেড়াতে যাবার কথা তুলেছে। হয়ে ওঠেনি। খানিক চুপ করে থেকে বলল 'পালিয়ে যেতে বলছ? তার মানেই হবে আমি ভয় পেয়েছি।'

'তোমার ওই দোষ।' শ্বেতা বলল, 'জেদ মাথায় চাপলে নামাতে চাও না!'

জবাব দেবার সুযোগ পেল না। তার আগেই আবার বেজে উঠল টেলিফোন। সেই একই শব্দ—একটানা তীক্ষ্ণ: একবার বাজলেই মনে হয় বাজছে অনেকক্ষণ ধরে।

এবার নিজেই ছুটে গেল আদিত্য। রিসিভারটা তুলতে তুলতে দেখল পৃথাও বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে।

'হ্যালো!'

'আদিত্যবাবু বলছেন?'

অস্পষ্ট, কিছু বা কর্কশ গলা। অনেক দূর থেকে, কিংবা ট্রাঙ্ক-কলে যেমন শোনায়। পরিচিত নয়। আদিত্যর চুপ করে থাকার সময়ে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'হ্যালো! হ্যালো।'

'ইয়েস।'

'আদিত্য রায় বলছেন?'

মনে হয় যে বলছে তার সময় কম। ভুরু কুঁচকে উঠল আদিত্যর।

'আপনি কে?'

'তা জেনে আপনার লাভ নেই কোনও। আপনি আদিত্য রায়?'

'হ্যাঁ—'

'শুনুন।' ওদিকের কণ্ঠ স্পষ্ট হয়ে এল এবার, 'আপনার চিঠিটা আমরা দেখেছি। যা লিখেছেন সেটা বুর্জোয়া স্টান্ট ছাড়া কিছু নয়। আপনি যাকে মার্ডার হতে দেখেছেন, সেই লোকটি কমরেড শৈবাল মজুমদার। আপনি তাকে চিনতেন—'

'না। চিনতাম না।'

'চিনতেন। পুলিশের ভয়ে ব্যাপারটা চেপে গেছেন।'

বিরক্ত গলায় ঝাঁঝ মিশিয়ে আদিত্য বলল, 'এই কথা বলার জন্যে ফোন করছেন! কে আপনি!'

কণ্ঠস্বর থেমে গেল হঠাৎ। আদিত্য অপেক্ষা করল দু এক মুহূর্ত। 'হ্যালো' বলতে গিয়েও বলল না।

তখনই ওদিক থেকে গলা ভেসে এল আবার।

'শুনুন। আপনাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে যাকে মার্ডার করা হয়েছে সে কমরেড শৈবাল মজুমদাব। তিনদিন সময় দেওয়া হল। আমাদের অর্ডার না শুনলে আপনাকে শ্রেণীশত্রু বলে ধরে নেওয়া হবে—'

ওদিকে রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ডায়াল টোন। আর কোনও কথা নেই জেনেও রিসিভারটা কিছুক্ষণ কানে ছুঁইয়ে রাখল আদিত্য। তারপর নামিয়ে রাখল আস্তে।

কথাগুলো শুনছে অনেক দিন ধরে। ভার আছে, ধার নেই কোনও। টোকা দিলে বেরিয়ে আসে ধাতব শব্দ। ভাবনা তা নিয়ে নয়। আদিত্য ভাবল, ভাবনা হঠাৎ এই ভাবে ফোন করে কী বোঝাতে চাইল তাকে! সামনে এসে প্রশ্ন করলে বোঝানো যেত এসব থ্রেট করে লাভ হয় না কোনও। উটকো গলায় শ্রেণীশত্রু বলে চ্যাঁচালেই নির্দিষ্ট হয় না মানুষের শ্রেণী। বুদ্ধি থাকলে বুঝতে, আমি কোনও ক্লাসে বিলং করি না; আমি একা—ভীষণ একা। কিংবা আমি একাই একটি ক্লাস। হয়তো আরও কেউ কেউ আছেন আমার মতো, আমি তাঁদের চিনি না।

পৃথা বলল, 'কে, বাবা?'

'উটকো ফোন।' মেয়ের ভীত মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল আদিত্য। দরজার পর্দা ধরে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতা। বিভ্রান্ত ভঙ্গি। আদিত্য বলল, 'মনে হচ্ছে একটা অদ্ভুত সময়ের মধ্যে এসে পড়েছি আমরা! কেউ কাউকে বিশ্বাস করি না, কেউ কাউকে বুঝবার চেষ্টা করি না। শুধু মাঝ রাতে ঘুম থেকে তুলে ভয় দেখাই মানুষকে।'

'আমি জানি কারা তোমাকে ফোন করেছিল!'

যা ছিল তার চেয়ে আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল পৃথা।

আদিত্য এগিয়ে গেল মেয়ের দিকে। স্নেহের হাত রাখল পিঠে।

'তুই সব জানিস! তোর বন্ধুদের মতোই সব কিছু বোঝা হয়ে গেছে তোর!'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ, বাবা।' কাঁপা গলায় পৃথা বলল, 'তুমি কি বুঝতে পারছ কী হচ্ছে চারিদিকে!'

'পারছি না!' নিজেকে যথাসম্ভব সহজ করে নিয়ে বলল আদিত্য, 'এড়াতে চাইলে এতদূর এগোতাম!'

শ্বেতা বলল, 'তোমার হেঁয়ালি কিছুই বুঝি না। নিজে মরবে, আমাদেরও মারবে।'

'কী বলছ, মা!'

'থাক ওসব কথা।' মা ও মেয়েকে আলাদা করে দিল আদিত্য। বলল, 'যত ভাববি ততই ভাবনা বাড়বে। এরপর বাচ্চুরও ঘুম ভাঙবে। বরং আয় আমরা গল্প করি। আজ আর ঘুম হবে না—'

৬

২৩ আগস্ট গভীর রাতে বৃষ্টি নামল তোড়ে। মুষলধারায় বৃষ্টি; সেই সঙ্গে মেঘের ডাক আর ঘন ঘন বিদ্যুতের চমক। শব্দে কান পাতা যায় না। ওরই মধ্যে কলিং বেল বেজে উঠল দরজায়।

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসল শ্বেতা। শব্দটায় কান রেখে ঠেলল আদিত্যকে।

'শুনছ!'

'হ্যাঁ।' শুনেও খানিক চুপ করে থাকল আদিত্য। তারপর বলল, 'আলোগুলো জ্বেলে দাও। আমি দেখছি।'

পৃথাও উঠে পড়েছে। দরজার বাইরে থেকে ওর গলা শুনল আদিত্য, 'বাবা, কে বেল দিচ্ছে দরজায়! খুলব?'

'না, আমি আসছি।'

শ্বেতা আলো জ্বালল। পাঞ্জাবিটা টেনেটুনে ঠিক করে নিল আদিত্য। চোখ কচলে হাত চালাল মাথার চুলে! তারপর এগিয়ে গেল দরজা খোলার জন্যে।

দু' এক মুহূর্ত। আগন্তুকদের চেহারাগুলো চিনতে যেটুকু সময় লাগে তার বেশি নিল না আদিত্য। অল্প চাঞ্চল্য এল শরীরে, কেঁপে উঠল ঠোঁটদুটো। তারপর বলল, 'কী ব্যাপার!'

'সরি, মিস্টার রায়। আপনাকে একবার যেতে হবে আমাদের সঙ্গে—'

'কোথায়!'

'জানতে পারবেন। অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট আছে।'

'ও, আচ্ছা।' ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই আদিত্যর; তবু এই মুহূর্তে তাঁর কাছেই প্রার্থনা করল অলৌকিক শক্তি। দৃঢ় গলায় বলল, 'একটু সময় দিন।'

পিছন ফিরতেই শ্বেতাকে ছুটে যেতে দেখল ঘরে। চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই কাছে ছুটে এল পৃথা। দু' হাতে আদিত্যকে আঁকড়ে ধরে বলল, 'তুমি যাবে না, বাবা। ওরা তোমাকেও মেরে ফেলবে—'

'পাগলামি করিস না, পৃথা।' মেয়েকে ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে আদিত্য বলল, 'মারা সহজ নয়। বুঝতে পারছিস না, ওরা ভয় না পেলে আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবত না!'

দাঁতে ঠোঁট চেপে নিজেকে নিরস্ত করার চেষ্টা করল পৃথা।

আদিত্য ঘরে ঢুকল। দেখল, দরজায় ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতা। কিছুই না বলে ব্যস্তভাবে আলনা থেকে ট্রাউজার, শার্ট খুঁজে নিল আদিত্য। বাথরুমে গেল। ফিরে এসে বলল, 'ঘাবড়ে যেয়ো না—'

মানিব্যাগ ও কলমটা পকেটে নিয়ে চপ্পলে পা গলাল আদিত্য। বেরুবার আগে হাত রাখল শ্বেতার কাঁধে।

'বাচ্চুকে উঠিয়ো না। কাঞ্চনকে খবর দিয়ো। তুমি তো জানোই সব—'

শ্বেতা মুখ ফিরিয়ে নিল। আবেগ চাপা দিচ্ছে প্রাণপণে। অস্ফুট গলায় বলল, 'তুমি এসো।'

ঘুমন্ত বাচ্চুকে দেখে বেরুতে বেরুতে আদিত্য দেখল গা ঘেঁষে এসেছে পৃথা। এখন আর আবেগ নেই কোনও। আলতো ভাবে মেয়ের পিঠে হাত রেখে আদিত্য বলল, 'চলি। আমি চলে গেলে প্রদীপ্তকে ফোন করিস একটা, দেবু চৌধুরীকেও জানাবি। ওদেরই বলিস অফিসে জানাতে—'

আদিত্য আর দাঁড়াল না। দরজা পর্যন্ত গিয়ে পিছনে তাকাল একবার। শ্বেতাকে দেখল না। তখন পৃথাকেই বলল, 'সাবধানে থাকিস—'

অটোমেটিক লিফট। ধরাই ছিল ফ্লোরে। চারজন পুলিশের সঙ্গে দ্রুত নীচে নেমে এল আদিত্য। কোনও দিকে তাকাল না। শুধু বৃষ্টির মধ্যে দিয়ে গেটে দাঁড়ানো পুলিশ ভ্যানটার দিকে এগোতে এগোতে ভাবল, হতে পারে এটাই সেই ভ্যান, একদিন রাস্তা থেকে যেটা নেমে গিয়েছিল ময়দানের অন্ধকারে—

ঘরবাড়ি

উৎসর্গ:
রীণা ও প্রীতীশ নন্দী-কে

১

‘এটা আমার অনেকদিনের শখ, জানেন। বিয়ের আগে থেকেই ভাবতাম, আমাদের একটা বাড়ি হবে—আমাদের নিজেদের, যেখানে নিজের ইচ্ছেমতো থাকা যাবে। বাড়িওলার ঝামেলা থাকবে না, যখন ইচ্ছে যা খুশি করতে পারব।’

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে দম নেবার জন্যে থামল জয়া; এমন জায়গায় যাতে মনে হবে আরও অনেক কথা বলার আছে তার—আরও অনেক স্মৃতি ও স্বপ্নের কথা, যা বলতে গেলে দরকার আরও অনেক সময় ও নিঃশ্বাস। এই মুহূর্তে বাড়িই তার বিষয়। মনের ভিতর পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে একটার পর একটা অসংখ্য সিঁড়ি উঠে গেছে আকাশের দিকে, তার চারপাশে যে দেয়াল সেখানে শুধুই আঁকা নিজস্ব অধিকারের দিকে এগোনোর চিহ্ন—দাগগুলো চিনে চিনে ক্রমশ কিন্তু নিশ্চিত ভাবে উঠে যেতে পারবে ওপরে। তবে, নিশ্চিত হলেও, আকাঙ্ক্ষার ভিতরেও থাকে পরিশ্রম। ইচ্ছা যে-গতিতে এগোয় সাধ্য ঠিক তা পারে না। সিঁড়ির প্রথম দিকের একটি ধাপে পা রেখে তাই সে জিরিয়ে নিচ্ছে।

রেখা জয়াকে দেখছিলেন। স্বপ্নের চেয়ে, আশা-আকাঙ্ক্ষার কথার চেয়েও মানুষের মুখ যে কিছু কম সুন্দর নয়, জয়াকে দেখলে তা বোঝা যায়। মেয়েটির মুখ এবং গায়ের রংই যে শুধু সুন্দর তা নয়, মেদহীন টান-টান স্বাস্থ্যেও আছে এমন এক আকর্ষণ, যা সহজেই চোখ টানে—সঙ্গে সঙ্গে পাশে এনে বসায়। আশপাশে আরও কয়েকটি শূন্য টিনের চেয়ার এবং ছড়িয়ে থাকা অন্যান্যদের মধ্যে দু-একটি চেনামুখ থাকা সত্ত্বেও একা বসে থাকা এই মেয়েটির পাশেই এসে বসেছিলেন তিনি। তারপর আলাপ। এখন বুঝছেন মেয়েটি শুধুই সুন্দরী বা স্বাস্থ্যবতী নয়; অত্যন্ত সরল মনের মানুষ। তা না হলে হঠাৎ-আলাপে এই গোলমেলে অহঙ্কারের যুগে কে আর এমন ভাবে খুলে দেয় নিজেকে।

মুখ নামিয়ে বসে হাতের নখে আঙুল ঘষছিল জয়া। হয়তো পরের কথাটির সন্ধানে; হয়তো রেখাকে কাছে পেয়ে এতক্ষণ যা বলে গেল তার ভিতর কিছু ফাঁক থেকে গেল কি না বুঝবার জন্যে। মুখে অনাবশ্যক ছায়া। নিজের বয়স ও অভিজ্ঞতা দিয়ে রেখা বুঝতে পারেন, জয়ার কথা ও আবেগের মধ্যে আর কেউ যেটাকে আদেখলেপনা ভাবতে পারত, তিনি তা ভাববেন না। উপড়ে তোলা শিকড়ে লেগে আছে মাটি ও মাটির গন্ধ; নিজেই জানেন, বড় দুঃখে, বড় আনন্দে মানুষ এই সব কথা বলে—অভূমিষ্ঠ সন্তানকে শেখায় আদরের মা-ডাক! জয়াও তাই করছে। কত আর বয়স হবে মেয়েটির। পঁচিশ-ছাব্বিশ? বিবাহিতা না হলে আরও কম ভাবতেও অসুবিধে হত না কোনও। তার মানে তার নিজের মেয়ে নন্দিনীর চেয়েও বছর দু- তিনের ছোট। একে অন্য চোখে দেখার অসুবিধে নেই

কোনও।

কিছু বলার আগে ইচ্ছা করেই জয়ার পিঠে হাত রাখলেন রেখা, এই ভাবে যতটা আন্তরিকতা ফোটানো যায়। সহজ করে নিলেন নিঃশ্বাসটা। বললেন, 'ইচ্ছে থাকলে অনেক কিছুই হয়। ভগবানই দেন। সেদিক থেকে তো মা তুমি লাকি। এই বয়সেই নিজের জায়গা পেয়ে যাচ্ছ।'

সামান্য মুখ তুলে রেখাকে দেখল জয়া। চোখে অস্বস্তি। হয়তো তার, কিংবা রেখার, কিংবা দুজনেরই কথাবার্তার মধ্যে ফাঁক দেখতে পেয়েছে কোনও, মূল প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে এখন সেটাই ভাবছে। আপাতত অল্প হেসে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল।

'এটাকে অবশ্য বাড়ি বলা যাবে না। ফ্ল্যাট।' রেখা বললেন, 'মাল্টিস্টোরেড মানেই বারো ভূতের সংসার। যে-জমির ওপর দিয়ে হেঁটে এসে নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকবে, সেটা তোমার একার নয়। যে-ফ্ল্যাটে থাকবে তার ভিতরের দেয়ালটা তোমার, বাইরেরটা তোমার নয়। এইরকম সাত সতেরো কত যে আছে। আমরা এখানে যেখানে আছি, সেটাও একটা মাল্টিস্টোরেড—একেবারে গড়িয়াহাট বাজারের ওপরে। ভাসুর দেরাদুনে থাকে, তাঁর। বুঝি তো। কী আর করা যাবে।'

জয়া রেখাকেই দেখছিল। মুখ ফিরিয়ে নড়েচড়ে বসল ঈষৎ। কথাগুলো যে শুনেছে ও বুঝেছে, ওর মুখ দেখে তা বোঝা যায়; তার বেশি কিছু নয়। এই মুহূর্তে ওর চোখের অন্যমনস্কতা লক্ষ করে যে-কারুরই মনে হতে পারে ফ্ল্যাট ও বাড়ির মধ্যে তফাতটুকু এত দিন বুঝে নিতে পারেনি ঠিকঠাক—হয়তো মাথাতেই আসেনি; এবার নেবে।

'আমার কাছে ফ্ল্যাটই বাড়ি।' গলায় নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা নেই কোনও; জয়া বলল, 'বাব্বা! এই করতেই হিমশিম! এত টাকার ধাক্কা জানলে আমার স্বামীকে এগোতে মানা করতাম।'

'তা আর নয়! আমার কর্তা রিটায়ার করেছেন বছরখানেক হল। প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে যা পেয়েছিলেন, সবইটাই ঢালতে হল প্রায়। তার ওপর দামও তো বাড়িয়েছে—'

'আর নিশ্চয় বাড়বে না!'

'জানি না।' বলার পর মনে হল জয়া প্রশ্নই করেছিল; উত্তরটা জানা থাকলে সেইভাবেই দেওয়া উচিত। মেয়েটির গলায় শঙ্কা অস্পষ্ট নয়। সময় নিয়ে, ভেবেচিন্তে রেখা বললেন, 'পজেশন পাবার পর কী আর দাম বাড়ে! বোধহয় বাড়বে না।'

জয়া চুপ করে থাকল।

কথার সূত্রেই রেখা এবার কৌতূহল প্রকাশ করলেন।

'তোমরাও আজ পজেশন নেবে তো?'

'আমি ঠিক জানি না জানেন! আমার স্বামী বলতে পারবেন—'

'কোন ফ্ল্যাট নিয়েছ? সাড়ে বারো শো?'

'না, আট শো পঞ্চাশ।'

জয়া অনুমান করল, মিসেস চৌধুরীদের ফ্ল্যাটের আয়তন নিশ্চয়ই তাদেরটার চেয়ে বড়, তা না হলে সরাসরি জিজ্ঞেস করতেন না এই ভাবে। যেভাবে যেচে এসে আলাপ করলেন, কথা বললেন স্নেহ মিশিয়ে, তাতে ভদ্রমহিলাকে খুবই কাছের বলে মনে হয়েছিল। এখনও অবশ্য ধারণা পরিবর্তন করবার মতো কোনও কারণ ঘটেনি। তবু অস্বস্তিতে পড়ল জয়া এবং

ভাবল, খুব ভাল হত যদি এখন এখান থেকে সরে যাওয়া যেত, কিংবা যে-কোনও কারণে নিজেই উঠে যেতেন ভদ্রমহিলা।

তা হবার সম্ভাবনা আপাতত কম। জয়ার এখানে এসে পৌঁছুবারও বেশ কিছুক্ষণ পরে ওঁরা এসেছিলেন এখানে। স্লিপ পাঠানোর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ডাক পড়ে ভিতরে। মিস্টার চৌধুরী তখন উঠে যান। এখনও বেরোননি। হিমাদ্রিও স্লিপ পাঠিয়েছিল, তবে এখনও ডাক পড়েনি। আরও কতক্ষণ দেরি হবে তার ঠিক নেই কোনও। এমনকী হতে পারে যে যারা বড় ফ্ল্যাট নিচ্ছে এবং টাকাও দিচ্ছে বেশি, ছোট ফ্ল্যাটের লোকদের চেয়ে তাদের কদর বেশি!

না, এভাবে ভাবা উচিত নয়। নিজেকে শাসন করল জয়া, এই ধরনের চিন্তায় সঙ্কীর্ণতা ছাড়া আর কিছুই নেই। এমনও হতে পারে, কথায় কথায় কৌতূহলটা প্রকাশ করে ফেলেছিলেন মিসেস চৌধুরী—কোনও উদ্দেশ্য থেকে নয়; ওঁর জায়গায় বসলে এবং আলাপটা একই ভাবে এগোলে সে নিজেও হয়তো একই প্রশ্ন করত। ভাল লাগায় একরকমের টান থাকে যা প্রশ্ন যেমন করায় তেমনি বলিয়েও নেয়। যখন কথাগুলো প্রশ্ন হয়ে আসেনি, তখন সে নিজেও এমন অনেক কথা বলেছে, যেগুলো না বললেও চলত। কোনও কোনও পরিচয় প্রথম সাক্ষাতের সময় থেকেই দীর্ঘ হতে চায়; হয়তো মিসেস চৌধুরীর সঙ্গেও সম্পর্কটা সেই রকমই হতে যাচ্ছে—জয়া ভাবল, ছিয়ানব্বইটি ফ্ল্যাট নিয়ে গড়া এই বারো ভূতের সংসারে সম্পর্ক এড়িয়ে চলা কঠিন। পরিচয় এইভাবেই হয়ে যায় হঠাৎ, কোনওরকমের প্রস্তুতি ছাড়া। সেটাই থেকে যায়।

নিজের সঙ্গে বোঝাপড়াটা এইভাবে সেরে নিতে পারলেও অস্বস্তি গেল না। এখানে আসবে বলে আজ অফিস থেকে তাড়াতাড়ি ফিরেছিল হিমাদ্রি; তাড়াতাড়ি পৌঁছুলে তাড়াতাড়ি ফেরা যেতে পারে এমন কথাও বলেছিল। ব্যস্ততার জন্যে খানদুয়েক বিস্কুট আর চা ছাড়া আর কিছুই মুখে দেয়নি। এসে স্লিপ জমা দেবার পরে কেটে গেছে কম করে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যখন এসেছিল তখনও ইতস্তত আলোর আভা ছড়িয়ে ছিল আকাশে। এখন পুরোপুরি সন্ধ্যা। অপেক্ষায় এক ধরনের ক্লান্তি থাকে, অস্বস্তিটা বাড়িয়ে দেয় আরও। জয়া এখন তা পুরোপুরি অনুভব করছে।

নিস্পৃহ চোখে তাকালে জায়গাটাকে হাসপাতালের আউটডোর কিংবা কোনও বড় ডাক্তারের চেম্বার বলে ভ্রম হতে পারে। কম করেও জনা ত্রিশেক মেয়ে-পুরুষ ভিড় করেছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। 'বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওন্‌লি' লেখা অফিসঘরের ভিতর থেকে বন্ধ করা দরজাটা দেখা যায় এখান থেকে, হয়তো ভিতরেও আছে আরও কেউ কেউ। অপরিচ্ছন্ন হলঘরে দু দিকের দেয়াল ঘেঁষে কয়েকটা পুরনো ফোল্ডিং চেয়ার এবং একটি কাঠের বেঞ্চি এতগুলি মানুষকে বসার জায়গা দিতে পারে না। তবু এখনও খালি পড়ে আছে গোটা তিনেক চেয়ার, ইচ্ছা করেই বসেনি কেউ কেউ—একধরনের ধরা পড়া মুখ নিয়ে হয় দাঁড়িয়ে আছে এক জায়গায়, কিংবা পরিচয়ের সূত্র থাকলে নিচু গলায় কথা বলছে পরস্পরের সঙ্গে। এমন কী কচিৎ হাসির শব্দেও নেই স্বাভাবিকতার রেশ। সব মিলিয়ে ঘরবাড়ি যে সুখের ব্যাপার এমন ভাববার কারণ নেই কোনও। আজ অবশ্য অন্যান্য দিনের তুলনায় লোকজনের সংখ্যা একটু বেশি। তবু জয়া মনে না করে পারল না যে, আবাহন কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির বিল্ডার ও প্রোমোটারদের অফিসে এর আগেও যে তিন-চারবার এসেছে এই অস্বস্তি ও অপেক্ষার আবহাওয়াটা কোনও বারই চোখ এড়ায়নি

তার। হয়তো কারণ আছে কোনও। হয়তো এটাই ঠিক, নিজস্ব অধিকার প্রতিষ্ঠার দিকে যত এগোনো যায়, ততই প্রকট হয়ে ওঠে মানুষের অসহায়তা। সে নিজে অতটা তলিয়ে ভাবতে না পারলেও, হিমাদ্রিকে দেখেই বুঝে নিতে পারে।

সে যেখানে বসে তার ঠিক উল্টোদিকের সারিতে বসে একটি লোক অনেকক্ষণ ধরে পুরনো ও মলাট-ছেঁড়া সিনেমা ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল; হঠাৎ চোখাচোখি হতে খেয়াল হল তারই দিকে তাকিয়ে আছে লোকটি। শরীরের তুলনায় মুখ ও মাথাটা কিছু বড় —কেমন একটা থ্যাবড়া গড়ন, চওড়া কপালের গোড়ার দিকের সাদা চুল হঠাৎই কালো হয়ে উঠে গেছে পিছনে। মোটা ভুরুর তলায় চোখদুটো ছোট। দৃষ্টিটা ভাল নয়।

লোকটির দৃষ্টি বাঁচিয়ে শাড়ির আঁচলটা পিঠের দিকে টেনে যতটা সম্ভব নিজেকে গুছিয়ে নিল জয়া। জায়গাটা বড় হলেও একটিমাত্র বাল্‌বের আলোয় যথেষ্ট উজ্জ্বল নয়। সমতার অভাবে যেখানটায় আলো পড়ে তার বাইরে অনেকটা জায়গা জুড়ে ছায়া ছড়ানো। দায়সারা ভাবে তৈরি দেয়ালে চুন ফেরানো হয়নি ভাল করে, ঝকঝকে সাদা হলে হয়তো আরও একটু পরিষ্কার লাগত।

আশপাশের ছায়াচ্ছন্নতার মধ্যে দিয়েই আপাতত হিমাদ্রি ঠিক কোথায় দেখে নিল জয়া। দেখল, টানা হলঘর যেখানে রাস্তার দিকে ব্যালকনিতে মিশেছে, সেখানে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে কারুর সঙ্গে কথা বলছে হিমাদ্রি। লোকটিকে চেনে; শ্যামল বসু—এখানেই আলাপ হয়েছিল একদিন। সেদিন ওঁর স্ত্রীও ছিল সঙ্গে; ধীরা না কি—নামটা মনে পড়ছে না ঠিক, সম্ভবত ধীরাই। এমন মিশুকে ও হাসিখুশি দম্পতি দেখা যায় না চট করে। সেদিনই ঢাকুরিয়ায় ওঁদের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল জোর করে, চা না খাইয়ে ছাড়েনি।

শ্যামল ও হিমাদ্রি দুজনেই দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনির রেলিংয়ে পিঠ দিয়ে, এমন ভাবে যে রেলিংটা যদি হঠাৎ ভেঙে পড়ে তা হলে দুজনেই ভারসাম্য হারাবে। ব্যাপারটা কল্পনা করে গা-ছমছম করে উঠল জয়ার । তবে, এটা দোতলা, উচ্চতা বেশি নয়; ঝুঁকে হাত বাড়ালে ফুটপাথ ছোঁয়া যায়। আটতলা থেকে নিশ্চয়ই তা মনে হবে না।

এর আগে যেদিন বিকেলের আলোয় হিমাদ্রির সঙ্গে আটতলায় উঠেছিল, সেদিন কিছুই ভাল করে দেখার উপায় ছিল না। নিশ্চয়ই মাস চারেক আগেকার কথা। সদ্য তৈরি-হওয়া ন্যাড়া ও এবড়ো-খেবড়ো কংক্রিটের সিঁড়ি দিয়ে অতখানি উঁচুতে উঠতে বুকে হাঁফ লেগে যাবার কথা। লেগেও ছিল হয়তো; গা করেনি। কৌতূহলের সঙ্গে অধিকারবোধ মিশে তখন আর এক রকম হাওয়া লেগেছে নিঃশ্বাসে। ধকলটা সয়ে যায়। বাইরের দেয়াল ও ভিতরের দেয়াল সব ঠিকঠাক উঠে একটি ফ্ল্যাট থেকে অন্য ফ্ল্যাটটিকে আলাদা করে চিনিয়ে দিলেও সম্পূর্ণতা ছিল না কোথাও—ফ্লোর গুনে, দিক চিনে, তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটটিকে আবিষ্কার করেছিল হিমাদ্রি। স্বামীর গায়ে গা লাগিয়ে ন্যাড়া দরজার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে নিঃশ্বাসে অন্যরকমের তৎপরতা অনুভব করেছিল জয়া, ঠিক কেমন তা বুঝতে পারেনি যদিও। তবু নিজেরটাকে নিজের বলে ভাবতে অসুবিধে হয়নি। সাবধানে এদিক থেকে ওদিকে গিয়ে তাকে দিক ও জায়গা চিনিয়ে দিচ্ছিল হিমাদ্রি—দুটো শোবার ঘর, দুটো বাথরুম, কিচেন, বসার জায়গা, খাবার জায়গা, স্টোররুম, ব্যালকনি—ব্লু-প্রিন্টে যা ছিল প্রায় ট্যুরিস্ট ম্যাপের বিবরণ হয়ে, হাজার হাজার মাইল দূরত্ব পেরিয়ে জয়া এখন নিশ্চিতভাবে পৌঁছে গেছে সেখানে। দেখতে দেখতেই বুঝতে পারছিল, কয়েকবারই বের

করে দেখানো হিমাদ্রির দেরাজে রাখা ম্যাটমেটে ব্লু-প্রিন্টের ওপর আঁকা আবছা রেখাগুলো বাতিল হয়ে গেল স্মৃতি থেকে। এখন থেকে যতদিন না আরও বদলে যায় রূপ, রেখার জায়গা নেবে কংক্রিটের দেয়ালগুলো।

স্মৃতি এইভাবেই বদলায়। সেদিন ভেবেছিল, আজও মনে পড়ল, ফ্ল্যাট বুক করে আগাম দেওয়া টাকার রসিদ ও ব্লু-প্রিন্ট সঙ্গে নিয়ে তাকে ট্যাক্সিতে তুলে একটা ফাঁকা জমির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল হিমাদ্রি। নিচু দেয়াল-ঘেরা সেই জমির এক কোণে দুটো বাঁশের খুঁটিতে লাগানো বিল্ডারদের সাইনবোর্ড ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অদ্ভুত আবেগে চাপা গলায় হিমাদ্রি বলেছিল, জায়গাটা চিনে রাখো। বলেছিল কি? তারপর, রাত আটটার জ্যোৎস্নার থমথমে আলোয় স্বামী-স্ত্রী দুজনেই চোখ তুলে তাকিয়েছিল আকাশে—যেখানে শূন্যতা। ওই শূন্যতারই মাঝখানে সম্ভাব্য কোনওখানে আছে তাদের স্বপ্নের আটতলা, একদিন যা পরিণত হবে পরিচিত ঘরবাড়িতে, তাদের ফ্ল্যাটে। কেউ জানে না গত দু বছরে তারপর থেকে কত বার তারা একই জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, আটতলা আরও কত উঁচুতে এই প্রশ্নে মুখ তুলে তাকিয়েছে আকাশের দিকে।

সেদিন, সত্যি সত্যিই আটতলায় পৌঁছে, ফ্ল্যাটের অসম্পূর্ণতার মধ্যেও নিজের সবকিছু চেনা হয়ে গেলে, উড়িয়ে নিয়ে-যাওয়া হাওয়ায় হিমাদ্রির হাতের কবজি চেপে ধরে দক্ষিণমুখো দাঁড়িয়ে হঠাৎ নীচের দিকে চোখ পড়ায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জয়া। তারপর বলেছিল, 'কেমন ভয় করছে, জানো!'

'কেন!'

'এত উঁচুতে তো উঠিনি কখনও। নীচে তাকালে মাথা ঘুরে যায়—'

'ওটা অভ্যেসের ব্যাপার।' জয়ার ভয় থেকে সারাংশ খুঁজে নিয়ে হিমাদ্রি বলেছিল, 'থাকতে থাকতেই অভ্যাস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে আরও অনেক মানুষ আরও অনেক উঁচুতে থাকে। তাদের মাথা ঘোরে না।'

'তা ঠিক।' অভ্যাসেই উত্তরটা এসে গিয়েছিল মুখে। কথাগুলো বুঝে একটু পরে জয়া বলেছিল, 'তবে একবার নীচে পড়লে আর বাঁচতে হবে না।'

'এখানে লোকে বসবাস করবার জন্যে আসবে, ঝাঁপ দেবার জন্যে নয়।' হিমাদ্রি বলল, 'তোমার হঠাৎ এসব কথাই বা মনে হচ্ছে কেন!'

লজ্জা পেয়ে ঘোর কেটে গেল জয়ার। বলল, 'ভয়ের কথাটাই প্রথমে মনে আসে।'

আজ, এই মুহূর্তে, পুরনো ভাবনায় সংশ্লিষ্ট হয়ে জয়া ফিরে গেল হুবহু সেই একই দৃশ্যে। অস্পষ্ট হলেও একটা দীর্ঘশ্বাস ছুঁয়ে গেল তাকে। হিমাদ্রি যেভাবেই বলুক না কেন, ভয় কিংবা আশঙ্কার ব্যাপারটা সে নিজেও কি এড়াতে পেরেছে। আক্ষরিক অর্থে না হোক, ফ্ল্যাট বুক করার সময় থেকেই যে-অনিশ্চিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে—একটা-না-একটা দোটানা বা উদ্বেগের মধ্যে কাটাতে হচ্ছে দিন, তার সঙ্গে শূন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ার তফাতটা কোথায়। ওর মুখ চোখ হাবভাব দেখলেই অনুমান করা যায় ফ্ল্যাট বুক করার আগের ও পরের হিমাদ্রি ঠিক একই মানুষ নয়—এমনিতে হাসিখুশি ও প্রাণোচ্ছল মানুষটা হঠাৎই যেন হয়ে গেছে কেমন গম্ভীর ও হিসেবি; মেজাজটাও আর সব সময় ফুর্তিতে থাকে না। মনে হয় অবচেতনার অন্ধ উত্তর খুঁজে যাচ্ছে ক্রমাগত; এগোবার আগেই ঠিক করে রাখছে পিছিয়ে আসার পা। বিয়ের পর প্রথম তিন বছরে বার সাত-আট কলকাতা ছেড়ে বেড়াতে

বেরিয়েছিল তারা। বার দুয়েক কাশ্মির এবং কন্যাকুমারীর মতো খরচ-সাপেক্ষ দূর জায়গাতে যেতেও পিছপা হয়নি হিমাদ্রি। পুরী, দিঘা, দার্জিলিং—এসব তো ছিল হাতের পাঁচ। গত দু বছর এক ফ্ল্যাটের চিন্তাই বেড়ি পরিয়ে রেখেছে পায়ে। বেরুবার ইচ্ছা থাকলেও খরচের কথা ভেবে কথা তোলেনি জয়া। এমনকী, মাস ছয়েক আগে মাসতুতো বোন শিখার বিয়েতে দিন সাতেকের জন্যে ডিব্রুগড় যাওয়া ঠিকঠাক হয়ে যাবার পরও বাতিল হয়ে গেল শেষ মুহূর্তে। হিমাদ্রি অবশ্য হঠাৎ অফিসের কাজ পড়ে যাওয়ার কথা বলেছিল; তবু, আড়ালটুকু বুঝতে অসুবিধে হয়নি জয়ার। মন খারাপ হলেও মানুষের অসহায়তা নিয়ে খোঁচাতে কার ভাল লাগে! হিমাদ্রি তো আর মিস্টার চৌধুরীর মতো ঝাড়া হাত পা'র লোক নয়! স্বপ্নটায় ভুল ছিল না কোনও—মাঝে মাঝে মনে হয় জয়ার, তবু তাদের বয়স সে-তুলনায় পুরোপুরি তৈরি হবার আগেই কি বাস্তবটাকে হাতের মুঠোয় পেতে চেয়েছিল তারা!

এসব যখন ভাবে তখন নিজের মাঝখানেই অস্পষ্ট একটা দেয়াল উঠতে দ্যাখে জয়া। এত কাছের সম্পর্কেও ঢুকে পড়ে এক ধরনের দূরত্ব। খোলামেলা করে বলা যায় না কিছু। নিজেদের জন্যে একান্ত করে কিছু একটা পাওয়ার ইচ্ছা হিমাদ্রির যতটা ছিল, তার নিজেরও তার চেয়ে কম ছিল না। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে স্বামীকে তাতানোর প্রাথমিক কাজটা সে নিজেই করেছিল, কথাবার্তা বলার জন্যে জোর করে নিয়েও এসেছিল এখানে। এমনকী আগাম দেবার আগে কালীঘাটে গিয়ে পুজো পর্যন্ত দিয়ে এসেছিল। এতদিন পরে অন্য কোনও কথা ভাববার উপায় নেই। হিমাদ্রি অবশ্য তার ধরনে ভাবে না। যা করার, বয়স থাকতে থাকতেই তো করে নেওয়া ভাল—এত টানাপড়েনের মধ্যে থেকেও এই ভাবনাটাকেই জিইয়ে রেখেছে এখনও। ভালবাসাটা টের পায়। যে-মাটিতে হিমাদ্রির পা, জয়া জানে তাকেও পা রাখতে হবে সেখানে।

অন্যমনস্ক স্মৃতি এর বেশি নিয়ে যায় না। এসব ভাবনায় সামান্য এলোমেলো হয়ে পড়ে নিঃশ্বাস—চাপা, কিন্তু তাৎক্ষণিক, একটা আবেগ নড়াচড়া করে বুকের মধ্যে। তখন মনে হয় সিঁড়িগুলো পাঁজর-ঘেঁষা; তারই মতো আর কেউ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পা ফেলে ফেলে ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরে।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই পাশ কাটিয়ে গেল কলিং বেলের শব্দ। হাতে চিরকুট নিয়ে বেরিয়ে এল রোগা ও বেঁটে গড়নের পিওনটি। জয়া চেনে। ওর নাম দুলাল। প্রতিবারই দেখা হয়—এর আগে কখনও সখনও ওর হাতে দু এক টাকা গুঁজে দিয়েছে হিমাদ্রি। উল্টোদিকের চেয়ারে বসে থ্যাবড়া চেহারার যে-লোকটি খানিক আগে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল তার দিকে, তাকে হঠাৎ উঠে যেতে দেখে জয়ার খেয়াল হল মিস্টার চৌধুরী ফিরে আসছেন। মুখে পরিতৃপ্ত হাসি। ওঁর পাশ দিয়েই হেঁটে গিয়ে থ্যাবড়া লোকটি ঢুকে পড়ল অফিসে। এই লোকটি তাদেরও আগে এখানে এসেছিল কি না মনে পড়ল না ঠিক। ব্যালকনির প্রায়ান্ধকার ছেড়ে হলঘরের ভিতর এগিয়ে এসেছিল শ্যামল ও হিমাদ্রি; এখন দুটো খালি চেয়ার টেনে বসে পড়ল পাশাপাশি। এই সময় জয়ার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মাথা নেড়ে হতাশার ভঙ্গি করল হিমাদ্রি—যাতে মনে হবে, এইবার ডাক পড়বে ভেবেই এগিয়ে এসেছিল ওরা; তা না পড়ায় নতুন করে সময় কাটানোর উদ্যোগ করছে। যে ভাবে আঠার মতো শ্যামলের সঙ্গে লেগে আছে হিমাদ্রি, তাতে মনে হয় সঙ্গী হিসেবে শ্যামলকে

রীতিমতো ভাল লেগে গেছে ওর। তা না হলে একজন অর্ধপরিচিত মানুষের সঙ্গে এতক্ষণ ধরে আলাপ চালানোর কী এমন বিষয় থাকতে পারে!

জয়া হঠাৎ একা এবং অধৈর্য বোধ করল। নিতান্তই আলাদা পরিবেশ, না হলে একভাবে বসে থাকা অবস্থা থেকে কোমর ছাড়ানোর জন্যে এতক্ষণে সে পায়চারি শুরু করে দিত। হিমাদ্রিরা যেখানে বসে আছে তার কাছাকাছি একটা খালি চেয়ার দেখে ও উঠে যাবার কথা ভাবছিল, এই সময় আবার ওর পিঠে হাত রাখলেন রেখা। পাশ ফিরে তাকিয়ে জয়া দেখল, রেখার পাশের চেয়ারটিতে এসে বসেছেন মিস্টার চৌধুরী—এক হাতের মুঠোয় উঁকি দিচ্ছে চাবির গোছা, অন্য হাতে রুমাল নিয়ে থুপে থুপে ঘাম মুছছেন কপালের। রেখার ইঙ্গিতে সাবলীল হাসি ফুটল মুখে।

'আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই—', রেখা বললেন, 'এর নাম জয়া। কী মিষ্টি মেয়ে দেখেছ! ওরাও এখানে ফ্ল্যাট নিয়েছে—'

'ভালই তো।' নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত তুলেছিল জয়া, আলতো ভঙ্গিতে সেটা ফেরত দিলেন মিস্টার চৌধুরী। রেখার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মনে হচ্ছে বেশ ভালই আলাপ হয়ে গেছে তোমাদের!'

'কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল ও আমাদের পুরনো পাড়ার মেয়ে। কবে দেখেছি, সে কি আজকের কথা।

রেখা থামলেন। তারপব মিস্টার চৌধুরীর হাতের মুঠোর দিকে লক্ষ রেখে বললেন, 'চাবি দিল?'

'দিল তো।' চাবির গোছাটা স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মিস্টার চৌধুরী। ঈষৎ চিন্তিত। বললেন, 'এদের ডিম্যান্ড কখনও শেষ হয় না!'

'কী হল আবার!'

'আরও সাড়ে তিন হাজার টাকা দিতে হবে। জেনারেটর, তারপর আরও কী কী সব আছে! আগে না কি এইসব কস্ট ধরা হয়নি—'

'দ্যাখো তো, কী কাণ্ড!' রেখা এমন চোখে জয়ার দিকে তাকালেন যাতে মনে হতে পারে এই বাড়তি দেয়টার সঙ্গে তার নিজের চেয়ে বেশি সম্পর্ক জয়ার—সেইজন্যেই উদ্বিগ্ন। ব্যস্তভাবে বললেন, 'এই আমরা বলাবলি করছিলাম আর কিছু বাড়বে না; সাড়ে তিন হাজার কি কম হল!'

জয়া আগেই থমকে গিয়েছিল। টাকার অঙ্কটা শুনে শিরদাঁড়ায় শীত অনুভব করল হঠাৎ, দৃষ্টিটা অদ্ভুত তৎপরতায় ছুটে গেল হিমাদ্রির দিকে। নিশ্চিত হিমাদ্রি এখনও জানে না ব্যাপারটা--যদি না শ্যামল ইতিমধ্যেই জেনে থাকে এবং জানিয়ে থাকে হিমাদ্রিকে। জয়া শুনেছে এখানকার ম্যানেজিং কমিটির লোকজনের সঙ্গে হৃদ্যতা আছে শ্যামলের। 'আমি তো মশাই বরের ঘরের মাসি, কনের ঘরের পিসি—', কথায় কথায় এর আগে একদিন বলে ফেলেছিল, 'অর্ডিনারি মেম্বার, একটা সাউথ ফেসিং ফ্ল্যাট চাইলাম, পেলাম না! এদিকে কর্পোরেশনে গিয়ে ধরাকরার ব্যাপারে আমাকেই ছুটতে হয় সঙ্গে!' শ্যামল জানলেও জানতে পারে।

আপাতত সমস্যা সেটা নয়, জয়া ভাবল। জোগাড় হয়নি বলে শেষ কিস্তির টাকাটা এখনও দিতে পারেনি হিমাদ্রি। যাতে আরও কিছুদিন সময় পাওয়া যায় এবং এই টাকাটার

জন্যে ফ্ল্যাটের পজেশন দেওয়া না আটকায়, সেজন্যে একদিন গোপনে চলে গিয়েছিল বিল্ডারদের প্রোজেক্ট ইনচার্জ সাধন সরকারের বাড়িতে। জয়াও ছিল সঙ্গে। সাধন না বলেনি, হ্যাঁ-ও করেনি; শুধু বলেছিল, দেখবে। তবে, সাধনই বলেছিল, ফ্ল্যাটের চাবি হ্যান্ড-ওভার করার পর বিল্ডারদের আর কোনও দায়িত্ব থাকবে না—কো-অপারেটিভের ম্যানেজিং কমিটিই তখন সব। সে বিবেচনা করলেও হিমাদ্রির কেস্‌টা ম্যানেজিং কমিটি অ্যাপ্রুভ করবে কি না, তা বলা সাধনের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দেখবে। এ নিয়ে কী হল না হল আজই তা জানবার কথা। এমনও হতে পারে, হিমাদ্রির ব্যাপারটা একটু অন্যরকম বলেই ওকে ডাকছে না এখনও। এর মধ্যে বাড়তি টাকার ভাবনা! জয়া খেই হারিয়ে ফেলল।

জয়া যে তাকিয়ে আছে, দেখছে, হিমাদ্রি অবশ্যই তা লক্ষ করেনি। ওর চোখ মেঝের দিকে নামানো। শ্যামল কী বলছে তা-ই শুনে যাচ্ছে একমনে। জয়ার মনে হল, হয়তো শুনছেও না—এমনই আত্মস্থ!

এরই মধ্যে উঠে দাঁড়ালেন রেখা ও মিস্টার চৌধুরী। দেখাদেখি জয়াও।

'আলাপ হয়ে ভাল লাগল।' মিস্টার চৌধুরী বললেন, 'একা? না কর্তাও এসেছেন সঙ্গে?'

'ওকে আপনি বলছ কেন!' রেখা বললেন, 'ও আমাদের নন্দিনীর চেয়ে ছোটই হবে—'

'মুখ দেখেই তা বুঝছি।' এক ধরনের স্নেহের অভিব্যক্তি ফুটল মিস্টার চৌধুরীর চোখেমুখে, শান্ত হাসি ছড়িয়ে পড়ল কপাল থেকে চিবুক পর্যন্ত। অল্প ইতস্তত করে বললেন, 'একসঙ্গে এক জায়গায় থাকব, আস্তে আস্তে চেনাশোনা হয়ে যাবে—'

কোনও কোনও মানুষকে দেখলেই ভাল লাগে, মনে হয় খুব কাছের লোক। জয়া ভাবল, মিস্টার চৌধুরীও সেইরকম। সহজেই আকৃষ্ট হতে হয়।

এই মুহূর্তের ভাললাগাটুকু আড়াল করতে পারল না জয়া। স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলল, 'একটু দাঁড়ান। আমার স্বামীকে ডাকছি।'

ব্যস্তভাবে জয়াকে এগিয়ে আসতে দেখে মুখ তুলল হিমাদ্রি। যেন গভীর কোনও ভাবনায় ডুবে ছিল—ভুরুর কোঁচকানিতে কপালের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল আরও।

'একবার আসবে?' কাছে গিয়ে জয়া বলল, 'মিস্টার চৌধুরী আলাপ করতে চাইছেন তোমার সঙ্গে—'

'মিস্টার চৌধুরী!' নিজের জায়গা থেকে কিছু দূরে দাঁড়ানো মিস্টার ও মিসেস চৌধুরীর দিকে তাকাল হিমাদ্রি। উঠেও দাঁড়াল। কিন্তু সেই সময়ের আচ্ছন্নতা থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করতে পারল না নিজেকে।

'থ্রি-সি। বারো শো পঞ্চাশ।' শ্যামল বলল, 'চলুন, আমিও যাই। বলা যায় না, কোনও দিন ইনিই হয়তো কমিটির চেয়ারম্যান-ট্যান হয়ে বসবেন।'

জয়া এগিয়ে গিয়েছিল। ইতিমধ্যে ভিড় কিছু পাতলা হলেও, কেউ কেউ অপেক্ষা করছে তখনও। সবগুলি চোখই এখন জয়ার দিকে।

'আমার স্বামী।'

মিস্টার চৌধুরী হাত বাড়িয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। হিমাদ্রির হাতে অল্প ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'আমি সুনীল চৌধুরী। ইনি আমার স্ত্রী। আপনার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচয় হল। পুরো নামটা কী?'

'হিমাদ্রি। হিমাদ্রি রায়।' হিমাদ্রি এখনও অন্যমনস্ক; ব্যবহারে ভদ্রতা থাকলেও উত্তাপ

নেই কোনও। দায়সারা ভাবে শ্যামলের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইনি শ্যামল বসু—'

'আচ্ছা!' সুনীল চৌধুরী বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো বোধহয় আগেও—'

'হ্যাঁ। আলাপ হয়েছিল।' নতুন একটা সিগারেটের প্যাকেটের সেলোফেন ছিঁড়তে ছিঁড়তে শ্যামল বলল, 'আমার স্বভাবটাই এই—আলাপ করার সুযোগ পেলেই আলাপ করে নিই। চাবি পেয়ে গেছেন তো?'

'হ্যাঁ। শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।'

আনকোরা প্যাকেট থেকে গোটা দুয়েক সিগারেট উঁচিয়ে সুনীল চৌধুরীর দিকে বাড়িয়ে ধরল শ্যামল। সুনীল নিলেন না; হিমাদ্রিও ঘাড় নাড়ল। লাইটার জ্বেলে শ্যামল নিজেই তখন একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল। প্যাকেট ও লাইটারটা পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'ফ্ল্যাটটা দেখে যাবেন তো?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন না সুনীল। ব্যালকনির দিক দিয়ে বাইরে তাকালেন একবার, চোখ রাখলেন রিস্টওযাচে।

'এই অন্ধকারে!'

'সিঁড়িতে আলো আছে।' শ্যামল বলল, 'দুলালের কাছে টর্চও পাবেন।'

সুনীল রেখাকে দেখলেন। ভাবলেন একটু। তারপর বললেন, 'নাঃ। আজ থাক। কাল সকালেই বরং আসব একবার। দিনের আলোয় ভাল করে দেখা যাবে—'

'সেটাই অবশ্য ভাল।' শ্যামল বলল, 'অনেকরকমের খুঁত পাবেন—সমস্ত নোট করে রাখবেন কাগজে। আমি তো আঠারোটা পেয়েছি। ছ মাসের মধ্যে যা করাবার করিয়ে নেবেন। তারপর আর বিল্ডারদের টিকিও দেখতে পাবেন না।'

শ্যামল আরও কিছু বলে কি না শোনার জন্যে অপেক্ষা করলেন সুনীল। তারপর হেসে বললেন, 'আপনি তো অনেক জানেন দেখছি।'

'উপায় কী, বলুন! নিজের স্বার্থেই খবর রাখছি, ফেলো মেম্বারদের যতটা পারছি জানিয়ে দিচ্ছি। আফটার অল, আমরাই থাকব এখানে। কিছু বেগার খাটাও খাটতে হচ্ছে। কর্পোরেশন জলের কানেকশান দেয়নি এখনও। এইসব মিটিং শেষ হলে ওই নিয়ে বসা হবে। জল চালু না হলে তো আসতে পারবে না কেউ!'

শ্যামল যেখানে থামল, সেইখানেই শেষ হয়ে গেল কথা। সুনীলের মুখ দেখে মনে হয় শ্যামলের কথাগুলোর অর্থ ও গুরুত্ব বুঝবার চেষ্টা না করে শ্যামলকেই বুঝবার চেষ্টা করছেন তিনি। এমনও হতে পারে, তাঁর কাছে অন্তত কথাগুলোর মধ্যে খবর নেই কোনও—শ্যামল যেটা এখনই জানাল বলে ভাবছে, এইমাত্র অফিসঘর থেকে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে বেরিয়ে আসা সুনীল তা জেনে নিয়েছে আগেই। এসব ব্যাপারে কে আর চোখ কান বন্ধ রেখে চলে! এখন শুনতে হবে বলেই শোনা।

এই সব মুহূর্তগুলি সত্যিই অস্বস্তিকর। এতক্ষণ যাদের কাছের ও পরিচিত বলে মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সম্পর্কচ্যুত হয়ে তারা যেন সরে গেল দূরে। সেই গোড়ার দিকে দু চারটি কথা ছাড়া হিমাদ্রি এ-পর্যন্ত কোনও কথা বলেনি। রেখাও গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে; সুনীল সামনে আছেন বলেই হয়তো নিজে থেকে কথা বলছেন না কোনও। ওপরে মাথা তুলে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল শ্যামল। এলোমেলো ধোঁয়ার রেখাগুলো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে ইলেকট্রিকের তার থেকে ঝোলানো বাল্‌বের দিকে—যেতে যেতেই হালকা হয়ে

মিলিয়ে গেল শূন্যে।

জয়া হিমাদ্রিকেই চিনল।

'কিছু খবর পেলে! আর কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে?'

'কী করে বলি!' চারদিকে তাকিয়ে কে কোথায় বসে আছে দেখে নিল হিমাদ্রি। ঘড়ি দেখল। গলায় খেদ মিশিয়ে বলল, 'ঘণ্টাখানেক হয়ে গেল প্রায়! শ্যামলবাবু, একবার খোঁজ নেওয়া যায় না? আপনার তো অবারিত দ্বার—'

'দাঁড়ান। দেখছি।'

'আমরাও চলি আজ—', শ্যামল সরে যাবার আগেই বললেন সুনীল, 'আপনাদের তো এখন যাবার উপায় নেই—'

'দেখি কতক্ষণে ডাকে!' হিমাদ্রি বলল, 'ধৈর্যের পরীক্ষা তো এ-পর্যন্ত কম দিলাম না!'

'জয়া, চলি।' রেখা পাশেই ছিলেন, জয়ার গায়ে আলতো হাত বুলিয়ে বললেন, 'একটা ভাল দিন দেখে আমরা হয়তো শীঘ্রিই এসে পড়ব। তুমি খোঁজ নিও। কর্তাকে নিয়ে এসো।'

জয়া মাথা নাড়লেও হাসতে পারল না ঠিক। কেন জানে না, খানিক আগে থেকেই মনটা হঠাৎ খারাপ হতে শুরু করেছিল তার—অস্পষ্ট ভাবে মনে হচ্ছিল, আপাত চোখে যেমনই দেখাক না কেন, পাওয়া ও না-পাওয়ার মাঝখানে দূরত্ব অনেকখানি। মিস্টার চৌধুরী যতক্ষণ অফিসঘরের আড়ালে ছিলেন ততক্ষণ এই বোধটা কাজ করেনি। হয়তো এটাই ঠিক, ওই চাবির গোছটাই চিনিয়ে দিচ্ছে বোধের ভিতরের শূন্যতা।

'দেখছি তো তাই।'

'এরা কিন্তু খুব পার্সিয়ালিটি করে—'

'কী করা যাবে!' হতাশ গলায় বলল হিমাদ্রি, 'জোর করে তো আর ঢুকে পড়তে পারি না!'

'এত বোরিং লাগে!'

জয়া আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। অফিসঘরের দরজা ঠেলে বেরিয়ে আসছে সেই থ্যাবড়া চেহারার লোকটি। ওর পিছনে আরও দু জন ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা। শ্যামল বসুকে দেখা যাচ্ছে না ধারে-কাছে; হয়তো ওদের কথা বলার ফাঁকে ঢুকে পড়েছে ভিতরে। এই সময় আবার কলিং বেল বেজে ওঠার শব্দ হল এবং আড়াল থেকে ভিতরে ঢুকল দুলাল, যেমন ঢোকে—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল বাইরে। নিঃশ্বাসটা ধরে রেখে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওরা দেখল, দুলাল এগিয়ে আসছে তাদেরই দিকে। থ্যাবড়া চেহারার লোকটি চলে গেল না। ঠিক আগের জায়গাতেই চেয়ার টেনে বসতে বসতে তাকাল হিমাদ্রির দিকে।

'আপনি কি মিস্টার রায়?'

'হ্যাঁ—'

'যান। আপনাকেই ডাকছে বোধহয়।'

অকারণ হলেও কেউ কেউ স্বতঃপ্রবৃত্ত হতে ভালবাসে। হিমাদ্রি শুনল, কিন্তু ব্যস্ত হল না। দুলাল ডাকবার পর জয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি যাবে না? না বসবে?'

'যাব?' জয়া তার পুরনো প্রবণতা দেখাল। হিমাদ্রির সঙ্গী হবার ব্যাপারে ওর যতটা উৎসাহ, অন্য লোকজনের সামনে বসে বৈষয়িক কথাবার্তা বলায় ততটা নয়। বলল, 'তুমিই যাও না? কতক্ষণ আর লাগবে। আমি বরং এখানেই বসি।'

হিমাদ্রি চলে যাচ্ছিল। পিছন থেকে জয়া ডাকল আবারও। ওকে দাঁড়াতে দেখে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল, 'চাবির কথাটা ভুলো না। অনেক দিন দেখিনি; আজ একবার দেখে গেলে হত!'

হঠাৎ শুরু হওয়া স্তব্ধতায় চারদিকে আঁকা হয়ে যায় অদৃশ্য গণ্ডি। পরিধির ভিতরের সবকিছুই মনে হয় শূন্য ও অসার। বোঝা যায় না কেন!

ওখানে দাঁড়িয়েই হিমাদ্রির চলে যাওয়াটা লক্ষ করল জয়া, পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে—হাত বাড়িয়ে দরজা ঠেলছে হিমাদ্রি, সামান্য থামল, এইবার ঢুকে পড়ল ভিতরে। চোখের সামনে সাদা দরজার উপরে লেখা 'বাই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ওনলি' ছাড়া এখন আর কিছুই নেই। নিঃশ্বাসটাকে অন্য খাতে বইয়ে দেবার পক্ষে এই দৃশ্যগুলিই যথেষ্ট। জয়া গম্ভীর হল। এখানে আসবার আগে ঠাকুর প্রণাম করে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে। এখনও, অভ্যাসেই প্রায়, অন্যদের দৃষ্টি বাঁচিয়ে একটা হাত কপালে ঠেকাল সে, তারপর নামিয়ে আনল বুকের ওপরে। আবার চেয়ারে বসতে বসতে অন্যমনস্কতা থেকে ক্রমশ প্রবল ভাবে ঢুকে পড়ল তাদের জন্যে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটে। একদিন চিনেছিল; তাবপর বেশ কিছু দিন কেটে গেলেও সব দেয়াল, সব বাঁকগুলিই মনে আছে পুরোপুরি। এত দিনে নিশ্চিত দরজা, জানলা, গ্রিল, ইলেকট্রিকের পয়েন্ট, সবই বসে গেছে ঠিকঠাক—মসৃণ হয়ে আছে মোজেইকের মেঝে; অব্যবহারের রূপ নিয়ে বাথরুমের কমোড, শাওয়ার ও বেসিন; পরিচ্ছন্ন সাদায় উজ্জ্বল হয়ে আছে দেয়ালগুলো। তা হলেও চেনা। শাড়ি, জামার আচ্ছাদন কখন আর আড়াল করে রাখে নিজের শরীরের বিভিন্ন খাঁজ ও রেখাগুলি!

ফাল্গুনের মাঝামাঝি। হাওয়ায় শিহরন থাকলেও শীত কিংবা গ্রীষ্ম অনুভব করা যায় না ভাল করে। বহু দূর থেকে উড়ে আসা আকস্মিক হাওয়ার ঝোঁকে কখনও বা ধরা পড়ে হেঁয়ালি—তাপের তারতম্য বোঝা যায় না ঠিকঠাক। গরম পড়েছে ভেবে লেপ তুলে ফেলেছে কদিন আগে; বেলার দিকে রোদ বাড়লে জামা রাখতে ইচ্ছা করে না গায়ে। তবু, আজ ভোরে, হঠাৎ হাওয়ার সিরসিরানি লেগে ঘুমের মধ্যে হিমাদ্রি যখন তার গা ঘেঁষে এল, তখন বিছানা থেকে উঠে গিয়ে আর কিছুর অভাবে আলনা থেকে একটা শাড়ি টেনে এনে পাট করে দিয়েছিল হিমাদ্রির হাঁটুমোড়া শরীরে। অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ-দেখা পরিচিত মুখই হয়ে ওঠে কেমন অন্যরকম—জানলা দিয়ে এলিয়ে আসা প্রায় রহস্যময় ভোরের আলোয় এই হিমাদ্রিই আবির্ভূত হয়েছিল প্রথম দৃশ্য হয়ে, এমনই অসহায় ও শর্তহীন যে বিশ্বাস হয়নি তাদের পাঁচ বছরের সম্পর্ক ও পারাপার, এমনকী কাল রাতের অন্ধকারেও জলা মাঠময় নিজের শরীরে প্রবল আকাঙ্ক্ষায় গ্রহণ করেছিল হিমাদ্রির বীজ। এই মুখ অন্য। জয়ার মনে হয়েছিল, যে তার আশ্রয়, নিরবচ্ছিন্ন ঘুমের মধ্যে সে-ই হয়ে উঠেছে আশ্রিত। আরও এক আশ্রয়ের ভাবনায় ক্রমশ কাহিল হয়ে পড়ছে লোকটা, ক্রমশ বাকশূন্য—দ্বীপের সৌন্দর্য দেখার নেশায় হঠাৎ নৌকা ছেড়ে যেতে দেখলে যেমন হয়, অনেকটা তেমনি, জলের গভীরতা না ভেবেই তখন ঝাঁপ দিতে হয় সাঁতারে। জয়া জানে, এখন নেশার চেয়ে বড় ব্যাপার লক্ষ্যে পৌঁছুনো। হিমাদ্রিও দূরে নেই খুব। এখন ফেরার অর্থ আর কখনও না যাওয়া।

নিজেকে বা নিজেদের নিয়ে এই ধরনের চিন্তায় সময় ও পরিপার্শ্ব যায় হারিয়ে; দৃষ্টির ভিতরের বস্তু ও অবয়বও হয়ে ওঠে প্রায় জলরঙে আঁকা ছবি—যতই দেখুক, আবছা ভাব

স্পষ্ট হয় না কখনও।

কিছুক্ষণের জন্যে হলেও নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল জয়া। ভোরের আলোয় দেখা হিমাদ্রির পরিশ্রান্ত মুখ ছাড়া আর কিছু ছিল না চোখের সামনে। সচেতন হল চেয়ার টানার খরখর শব্দে। দেখল, শ্যামল দাঁড়িয়ে আছে সামনে। ইতিমধ্যে কখন যে ফিরে এসেছে খেয়ালই করেনি।

জয়া যেখানে তার কাছেই কোনাকুনি একটা জায়গায় বসে শ্যামল বলল, 'কী মেমসাহেব, এমন থমথমে মুখ কেন!'

শ্যামল এইভাবেই বলে। এর আগে যেদিন ওর স্ত্রীও সঙ্গে ছিল—ধীরা, নামটা এখনই মনে পড়ে গেল স্পষ্ট, বলেছিল, রানিসাহেবা। বলায় সঙ্কোচ থাকে না কোনও।

শ্যামলকে অন্তরঙ্গ হতে ও হাসতে দেখে জয়াও হাসল। ঠিক জানে না, হয়তো মনে মনে সে নিজেও এতক্ষণ খুঁজছিল একজন কথা বলার লোক। শ্যামল বলেই অপরিচিত লাগল না।

'কোথায় ছিলেন এতক্ষণ! ভেতরে?'

'হ্যাঁ। ভেতরেই।' শ্যামল বলল, 'কেসটা ধরিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলাম।'

'কতক্ষণ লাগবে?' জয়া একই সঙ্গে দুটো প্রশ্ন করল, 'আর কেউ আছে?

'না। রায়সাহেব একাই। ওদিকে ম্যানেজিং কমিটির লোকজন, সাধন সরকার—পুরো কোর্ট। শুনানি শুরু হতে চলে এলাম।'

সিগারেট ধরাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শ্যামল। লাইটার জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে থ্যাবড়া চেহারার লোকটি এগিয়ে এল তাদের দিকে। হাতে একটা সিগারেট।

'আগুনটা দেবেন একটু?'

'হ্যাঁ। নিন না!'

জ্বলন্ত লাইটারটা লোকটির সিগারেটের সামনে বাড়িয়ে ধরল শ্যামল। জয়া লক্ষ করল, সিগারেটে আগুন টেনে নেবার মুহূর্তেও লোকটি আড়ে তাকিয়ে আছে তারই দিকে। দৃষ্টিটা, আগেও খেয়াল করেছিল, ভাল নয়। বিরক্ত হয়ে আঁচলটা টেনে পুরো পিঠ ও ব্লাউজের হাতা পর্যন্ত ঢেকে নিল সে।

জয়ার মুখের বিরক্তির ভাবটা সম্ভবত লক্ষ করেছিল লোকটি। যেখানে যেভাবে দাঁড়িয়ে ছিল তার চেয়ে একটু অন্যরকম ভাবে দাঁড়াল, যাতে জয়ার চোখের দিকে তাকাতে না হয়। সিগারেটটা ভালভাবে ধরানোর দিকে নজর ছিল না বোঝাই যায়; এখন ঘন ঘন টান দিয়ে প্রায়-নিবন্ত আগুনটাকে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছে। কিছুটা জুত হবার পর শ্যামলকে বলল, 'মিস্টার বোস, আমার নাম রাঘব মজুমদার—'

'ও। নমস্কার।' সৌজন্য দেখালেও, শ্যামলের কথায় ওর পক্ষে স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা গেল না। সোজাসুজি রাঘবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি তো বিখ্যাত লোক, মশাই!'

'কেন!'

'আপনিই তো কো-অপারেটিভের নামে উকিলের চিঠি পাঠিয়েছিলেন?'

'ব্যাপারটা আপনিও জানেন তা হলে!' এক ধরনের চোরা হাসি ফুটল রাঘব মজুমদারের ঠোঁটে। অস্বস্তি লুকিয়ে বলল, 'এরা ক্লিন্ লোক নয়। বুক করলাম ফোর্থ ফ্লোরে,

অ্যালটমেন্টের চিঠি গেল থার্ড ফ্লোরের। পরে বলল, ক্লারিকাল মিসটেক!'

'মাঝখান থেকে আপনার উকিলের ফি-টাই জলে গেল।'

'কী আর করা!'

রাঘব দাঁড়াল না। শ্যামলের কথার শ্লেষটুকু ধরতে পেরেছিল সম্ভবত। জয়া দেখল, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে লোকটি চলে যাচ্ছে ব্যালকনির দিকে। তখনই মনে পড়ল, হিমাদ্রি ভিতরে ঢুকেছে বেশ কিছুক্ষণ হল—এতক্ষণ বেরিয়ে আসা উচিত ছিল ওর। এত কী কথাবার্তা চলছে ভিতরে! শ্যামলের উপস্থিতি অগ্রাহ্য করেই ও ফিরে গেল পুরনো ভাবনায়।

শ্যামল জিজ্ঞেস করল, 'কবে এখানে আসবেন ঠিক করেছেন কিছু?'

জয়া ঘাড় নাড়ল, যার অর্থ 'না'। কিছু বলবার আগে ভেবে নিল শ্যামলকে কতটা কী বলা যায়। তারপর বলল, 'আগে চাবিটাবি পাই! আসব ভাবলেই তো আর আসা হয় না।'

'তা ঠিক।' শ্যামল বলল, 'আমি পজেসন পেয়েছি পরশু। কাল গিন্নিকে নিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে এসেছি। দেখছি অনেক কাজ নিজেদেরই করিয়ে নিতে হবে। বৈশাখের আগে আসা যাবে বলে মনে হয় না।'

কথা বললে জবাব দিতেই হয়। অনিশ্চিত গলায় জয়া বলল, 'আমরা কিছুই ভাবিনি।'

'দিন পনেরোর মধ্যেই লোকজন আসতে শুরু করবে। সামনে দোলপূর্ণিমা—ওইদিনই কেউ কেউ গৃহপ্রবেশ করবে শুনছি। তবে সকলের আসতে আসতে চার পাঁচ মাসের আগে নয়।'

জয়া চুপ করে থাকল। শ্যামলও।

'হিমাদ্রিবাবুকে বলবেন—', হঠাৎ শুরু করে আবার থেমে গেল শ্যামল। তারপর বলল, 'পজেসন নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করা ঠিক নয়। কো-অপারেটিভের খাতায় নাম রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে। এখন দু দিন আগে পরে হলে কিচ্ছু হবে না। ফ্ল্যাটের মালিক এখন আমরা—শেয়ারহোল্ডারও। সোসাইটি যা করছে তা খানিকটা চাপ সৃষ্টির জন্যে—'

শ্যামল কী বলছে এবং কেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না জয়া। সামান্য সন্দেহে মনটা দুলে উঠল শুধু। শ্যামল এখানকার অনেক খবর রাখে; খানিক আগেও দেখেছে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে হিমাদ্রির সঙ্গে। হিমাদ্রিও কিছু বলে থাকতে পারে ওকে—এমন কিছু যা শ্যামল এখনও ধরে রেখেছে মাথায়। এমন কী হতে পারে, জয়াকে একা পেয়ে সম্ভাব্য কিছুর জন্যে প্রস্তুত করে গেল!

'বাড়িওলাকেও তো নোটিশ দিতে হবে—'

শ্যামল কথা শেষ করার আগেই অফিসঘরের দরজা খুলে হিমাদ্রিকে বেরিয়ে আসতে দেখল জয়া। সন্ধ্যা থেকে যেমন গম্ভীর ছিল, তেমনিই; বরং এখন যেন আগের চেয়ে বেশি অন্যমনস্ক। সোজাসুজি জয়ার কাছে এসে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'ফ্ল্যাটটা কি তুমি আজই দেখে যেতে চাও?'

'কেন!'

'আগে বলো দেখতে চাও কি না? ওঁরা অপেক্ষা করছেন।'

জয়ার মুখে উত্তর জোগাল না।

'দেখবেন না কেন!' শ্যামল বলল, 'এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই দেখে যাবেন—'

'তা হলে চাবিটা নিয়ে আসছি—'

'পজেসন দেয়নি!"

জয়ার প্রায় ফ্যাকাশে ও বিহ্বল মুখের দিকে তাকিয়ে হিমাদ্রি নিজেও কেঁপে গেল একটু। ইচ্ছার সঙ্গে দায়িত্বের সম্পর্ক নেই কোনও; ভাবল জয়ার দায়িত্ব তাকেই নিতে হবে। এই মুহূর্তটি এড়িয়ে যাবার জন্যে বলল, 'পরে বলব। অত চিন্তা করার কিছু নেই—'

জয়া কুঁকড়ে গেল। শ্যামল সামনে আছে বলেই লজ্জা আরও বেশি। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই টের পেল ঝড় আসছে, আকস্মিক দাপটে বেসামাল লাগছে শরীর—গরম হাওয়ার স্পর্শে তপ্ত হয়ে উঠছে কানের লতি। অহেতুক, তবু হঠাৎ শুরু হওয়া আবেগ থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্যে আর কোনও দিকে না তাকিয়ে কয়েক পা হেঁটে গিয়ে সিঁড়ির কাছে দাঁড়াল জয়া। যেতে হলে এখান দিয়েই যেতে হবে।

হিমাদ্রির ফিরতে দেরি হল না। দিব্যি তৎপর ভঙ্গি, যেন ভিতরের অস্বস্তি চাপা দেবার জন্যে ব্যস্ত করে রেখেছে বাইরেটা। তবে একা নয়; দুলালও এল সঙ্গে। হিমাদ্রিকে উঠতে দেখে যখন ও ওপরের সিঁড়িতে পা রাখল, জয়া দেখল, চাবিটা দুলালেরই হাতে।

দোতলা থেকে তিনতলায় উঠে পিছন ফিরে একবার তাকে দেখে নিল হিমাদ্রি।

'আলো কম। সাবধানে উঠো।'

জয়া সাড়া দিল না।

প্যাসেজ ও সিঁড়ির সর্বত্রই কিছু আলোকিত নয়; বরং বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে টেনে আনা বালবগুলো অনেকটা পরে পরে এমন ভাবে লাগানো যাতে অন্ধকার এই আলো এই ছায়া হয়ে ওঠে। ল্যান্ডিংয়ের যে-অংশে রেলিং আছে কিন্তু দেয়াল নেই কোনও, সেখানে আকাশও উঁকি দিয়ে যায় চকিতে। গুছিয়ে কিছু ভাবতে না পারার কারণ হঠাৎই খেয়াল হল জয়ার, এখন শুক্লপক্ষ, সামনে দোলপূর্ণিমা।

নিঃশব্দে সিঁড়িই উঠছে হিমাদ্রি। তারও আগে দুলাল; হাতে ধরা টর্চটা জ্বালছে মাঝে মাঝে। চারতলা থেকে পাঁচতলায় পৌঁছে গতি কমাল। বোধহয় বুঝতে পেরেছিল এত দ্রুত আটতলায় ওঠা সম্ভব নয়, সহজ কারণেই হাঁফ ধরে যেতে পারে নিঃশ্বাসে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঁচু কম নয়, স্যার। উঠতে পারবেন তো?'

'আগেও উঠেছি।' পিছনে তাকাল হিমাদ্রি। তিনটি সিঁড়ির ব্যবধান পেরিয়ে জয়াকে পাশাপাশি নেবার আগে বলল, 'পারবে? না জিরিয়ে নেবে একটু?'

'চলো—।' হিমাদ্রিরও আগে ল্যান্ডিং থেকে সিঁড়িতে বাঁক নিয়ে উঠে, সত্যিকারের হাঁফিয়ে ওঠা ভাবটা সংবরণ করে নিল জয়া। কত কী যে মনে পড়ে! এর আগে যেদিন এসেছিল সেদিন সিঁড়িগুলোয় আজকের মতো মসৃণতা ছিল না, তবু উঠতে গিয়ে ওঠার ইচ্ছা ছাড়া আর কিছু অনুভব করেনি। হিমাদ্রিও থেমে দাঁড়ায়নি। আজ সবই গোলমাল লাগছে। কারণটা ঠিক-ঠিক বুঝতে পারার ভয়ে যতটা সম্ভব দ্রুত হবার চেষ্টা করল সে।

'আপনারা আজই পজেসন পেয়ে যেতেন—', জয়া ও হিমাদ্রির মাঝখানের সিঁড়িতে আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে দুলাল বলল, 'সরকার সাহেব এমনিতে টিটিয়াল লোক; কিন্তু আপনাদের ব্যাপারটা কমিটিকে দিয়ে কনসিডার করিয়ে নিয়েছিলেন—'

'তুমি কী করে জানলে!'

'আমরাও কিছু কিছু খবর রাখি, স্যার। সারাক্ষণই তো ঢুকছি বেরোচ্ছি!' প্রশ্রয়ের আভাস

পেয়ে দুলাল বলল, 'ওই রাঘব মজুমদার লোকটা এক নম্বরের হারামি, স্যার!'

কথাটা কানে লাগল হিমাদ্রির; বলল না কিছু।

'দুটো ইনস্টলমেন্টের টাকা এখনও দেয়নি। রোজই স্যার একটা না একটা ঝামেলা পাকায়। আজ অবশ্য একটা পেমেন্ট দিয়েছে—পজেসন নেবার জন্যে ঝামেলা করছিল। এখনও বসে আছে, দেখলেন না!'

'কে রাঘব মজুমদার! আমি চিনি না।'

অল্প বিরক্তি ফুটল হিমাদ্রির গলায়। দুলালও চুপ করে গেল।

আরও দুটো সিঁড়ি উঠলেই সাততলা। হাওয়া এই সময় এমনই প্রবল হয়ে উঠল যেন অনধিকার প্রবেশ আটকাতে ব্যস্ত। পায়ে পায়ে অবসাদ, দ্রুত লাগছে নিঃশ্বাস। জয়া দাঁড়িয়ে পড়ল। হিমাদ্রিও। অল্প দূরে দুলাল। যথেচ্ছ হাওয়ায় জয়াকে স্বাভাবিক হবার সুযোগ দিয়ে হিমাদ্রি জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের লিফট কবে চালু হবে, দুলাল?'

'লোকজন এলেই হবে, স্যার। আজ সকালেও মেকানিক এসেছিল। লিফট বেডিই আছে।'

জয়ার কি মনে পড়ল তাদের যেতে হবে আটতলা? না কি, এ সেই বুড়ি ছোঁয়ার খেলা—একটা দৌড় শেষ না হতেই পাল্টা দৌড়ের জন্যে তৈরি হওয়া! কথার মধ্যে ওকে আরও ওপরের সিঁড়ির দিকে পা রাখতে দেখে হিমাদ্রিও পা বাড়াল। খুব দূর থেকে একটা কান্নার শব্দ কানে এল এই সময়—বাড়িব পাশেই খাপবা আর টিনের চালার বস্তি, হয়তো সেইখান থেকেই আসছে শব্দটা। তবে মাটি থেকে উদ্‌গত হয়ে এত উঁচু পর্যন্ত আসতে আসতে হাওয়ার ধাক্কায় খেই হারিয়ে ফেলেছে অনেকটা। মনে হয় হাওয়ারই শব্দ। জয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে পৌঁছুতে পৌঁছুতে শব্দটাকে অনুসরণ করল হিমাদ্রি।

'এরপর চাবির দবকার হবে না। টেনে দিলেই ল্যাচ আটকে যাবে।' ফ্ল্যাটের দরজা খুলে রাবারের স্টপারটা আটকে দিতে দিতে দুলাল জিজ্ঞেস করল, 'টর্চটা লাগবে, স্যার?'

বাইরে থেকেই হল ও ব্যালকনি পর্যন্ত ভিতরটা খানিক দেখে নিল হিমাদ্রি। অন্ধকারেও সমান ভাবে বিচ্ছুরিত জ্যোৎস্নায় বিকেল হয়ে আছে মেঝে ও দেয়ালগুলো। দেখায় অস্পষ্টতা থাকে না কোনও। পরিবেশের জন্যেই হয়তো, এমন অপরূপ আলো এর আগে কোনও দিন দেখেছে মনে পড়ল না।

হিমাদ্রি জয়াকে দেখল। চিত্রার্পিত; ভিতবে যাবার তাড়া নেই কোনও। ওই আলোয় জয়াকে দেখার ইচ্ছাটা ধরা দিতে গিয়েও হারিয়ে গেল। স্ত্রীকে কিছু বলবার আগে পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করল হিমাদ্রি। কম অঙ্কের মধ্যে পাঁচ টাকার নোট পেল একটা—সেটাই দুলালের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'না। দরকার নেই। তুমি কি নীচে যাবে?'

'না, স্যার।' নোটটা কপালে ঠেকিয়ে দুলাল বলল, 'আমি সিঁড়িতে বসছি। একটা বিড়ি খাব। আপনারা দেখুন—'

দুলাল সরে যেতে জয়ার কোমরটা হাতের বেড়ি দিয়ে যতদূর সম্ভব জড়িয়ে হিমাদ্রি বলল, 'কী হল! চলো?'

জয়া জবাব দিল না, নড়লও না। মুখ ফিরিয়ে এমন দৃষ্টিতে তাকাল হিমাদ্রির দিকে, জ্যোৎস্নার রহস্যময়তার ভিতর যার অর্থ বোঝা সহজ নয়। কিছুটা অনুমান করে নিল হিমাদ্রি, তার আগে ফিরে গেল খানিক আগেকার ভাবনায়। একই ভাবে ভাবল, জয়ার

দায়িত্ব তার।

'এসো—'

প্রায় জোর করে জয়াকে নিজের সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে এনে দরজা বন্ধ করে দিল হিমাদ্রি। ল্যাচ ঠিক আছে কি না পরীক্ষা করার জন্যে নব ঘুরিয়ে দরজাটা খুলল, দেখল, বন্ধ করে দিল আবার।

সে যেখানে দাঁড়িয়ে তারই হাতখানেকের মধ্যে স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে জয়া; নিজস্ব কোনও তৎপরতা দেখা দিচ্ছে না ভঙ্গিতে। দেখে রাগ হল, কিছু বা দুঃখও—মিশ্র একরকম ঠিকঠাক না-বোঝা অনুভূতির টানাপড়েনে জ্যোৎস্না থেকে আরও বেশি জ্যোৎস্নায় ব্যালকনির দিকে এগোতে এগোতে হিমাদ্রি বলল, 'বাস্তব কখনওই স্বপ্নের হাত ধরে হাঁটে না। একদিন মনে হত পঁচাশি হাজার টাকার ব্যবস্থা কী করে হবে! তখন এই বাড়ি ওঠেনি, সবটাই ছিল মাঠ! আজকের সমস্যাটা মাত্র সাড়ে বারো হাজার নিয়ে—তবু মনে হচ্ছে কত কঠিন!'

ব্যালকনির রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়ালে পরিষ্কার ছায়া পড়ে পিছনে। ছায়াটা না মাড়ানোর চেষ্টায় ইচ্ছা করেই পাশ দিয়ে হেঁটে এসে হিমাদ্রির পাশে হিমাদ্রির গা-ঘেঁষে দাঁড়াল জয়া। অন্যরকম গলায় বলল, 'আমি কি কিছু বলেছি!'

'বলোনি। তবু আজই পজেসন না পেয়ে আপসেট হয়েছ তো!'

জয়া চুপ করে থাকল, সেই সঙ্গে তার চারদিকের সমগ্র প্রকৃতিও। শব্দের শেষে এসে মাথা খুঁড়ছে অনুচ্চারিত, ঠোঁট স্পর্শ করে মিশে যাচ্ছে দক্ষিণের এলোমেলো হাওয়ায়। এর নাম অভিমান—জয়া ঠিকই চিনতে পারল, হিমাদ্রিও কি চেনেনি! কার প্রতি সেটা বোঝা যাচ্ছে না বলেই অনুভূতিটা দানা বাঁধছে না ঠিকঠাক। নীচে তাকালে বোঝা যায় পঁচাশি হাজারের বিনিময়ে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছে তারা। তবে পুরোপুরি অধিকার প্রতিষ্ঠার আগে আরও কিছু দাম দিতে হবে। আশপাশের ঘরবাড়িগুলো এখান থেকে অনেক নীচে—বিভিন্ন আকার ও আয়তন নিয়ে অদ্ভুত, প্রান্তরেখা পর্যন্ত বহুদূর বিস্তৃত থমথমে জ্যোৎস্নায় যা স্বাভাবিক তার চেয়ে অনেক বেশি রূপান্তরিত লাগে। তার স্পর্শ জয়াও এড়াতে পারে না।

'সবই হয়ে যায়—হয়েও যাবে।' স্ত্রীকে নয়, যেন কথাগুলো নিজেকেই শোনাল হিমাদ্রি, 'শুধু সময়ের ব্যাপার—'

অনুচ্চ তার গলার স্বর, রূপান্তরিত জ্যোৎস্নায় প্রাপ্ত এই নির্জনতা ও নৈঃশব্দ্যের ভিতর এর চেয়ে বেশি কিছুর দরকার পড়ে না। জয়া সরে এসেছে আরও কাছে, নিঃশ্বাসে এসে মিশছে ওর মাংসময় লাবণ্যের গন্ধ। ঘনিষ্ঠতার মধ্যে হঠাৎ তাকিয়ে ওর চোখে জল দেখল হিমাদ্রি। ভঙ্গিটা অপরিচিত নয়। জয়ার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে আর-এক জয়া—বৃষ্টিকে গ্রহণ করার আগে খরার মাঠ যেমন স্তব্ধ হয়ে ওঠে, অনেকটা তেমনি, প্রস্তুতিতে ঘন হয়ে উঠেছে চোখমুখ।

বড় আদরের এই শূন্যতাবোধ। হাত বাড়িয়ে জয়াকে কাছে টেনে হিমাদ্রি ওর চোখের তলায় আঙুল বোলাল প্রথমে, আঙুলের গোড়ায় লাগা ঈষদুষ্ণ আর্দ্রতা অনুভূতি এড়াল না। তারপর ওর গালে গাল রাখল।

'আজ নয়—।' জয়া সরে গেল চকিতে। হিমাদ্রির কিছু বা অবাক চোখে চোখ রেখে

হেসে বলল, 'নিয়ম জানো না!'

'কী!'

'নিজেদের না হলে এ সব করতে নেই।' জয়া বলল, 'তখন আমাদের তিন রাত্তির একসঙ্গে কাটাতে হবে এখানে।'

'তারপর!'

'তারপর আবার কী!' জয়া ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে।

নিজেকেও আড়াল করে নিল হিমাদ্রি। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এবং কিছুই না বলে ওরা শুধুই তাকিয়ে থাকল সামনের আকাশ ও জ্যোৎস্নার দিকে।

২

'সবই হয়ে যায়—', সেদিন বলেছিল হিমাদ্রি। এক আকাশ জ্যোৎস্নায় অনেক দূর পর্যন্ত ছুড়ে-দেওয়া নিজের কণ্ঠস্বর পরেও ভেসে এসেছিল কানে; এমনকী সেদিনের দৃশ্যও। তফাত এইটুকু, সেদিন যা অনুভব করেছিল এখন তা-ই ছড়িয়ে পড়েছে অভিজ্ঞতায়। প্রায় সারাক্ষণই ঘোরে তার সঙ্গে সঙ্গে।

কথাগুলো আরও বেশি করে মনে পড়ে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে জয়ার দিকে তাকালে—সেইসব সময়ে, যখন জয়াও হয়তো নিজের মধ্যে নেই। জয়া কী ভাবছে না ভাবছে বুঝতে পারে না ঠিকঠাক। কখনও মনে হয়, ঠিক ওই কথাগুলো না বলে ওই ধরনের অন্য কোনও কথা বললে হয়তো এতখানি টানাপড়েনের মধ্যে পড়তে হত না তাকে।

টাকার চিন্তা যত বাড়ে ততই আত্মরক্ষার যুক্তি খুঁজতে থাকে হিমাদ্রি। 'হয়ে যাবে—' বলেছিল ঠিকই; তবে সবটাই যে হিসেব করে বলেছিল তা নয়। ঘরবাড়ি ও দায়দেনা বিষয়ে এতদিনের চিন্তার ভিতরে কোথাও একটা আশ্বাস ছিল বলেই ভেবেছিল হয়ে যাবে। বেশিটাই জয়াকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে। নিজেকেও কি নয়? মানুষ এইভাবেই ভাবে। তা না হলে সেদিন, সেই মুহূর্তে, মনের ওই অবস্থায় আর কোন কথা সে বলতে পারত জয়াকে!

সত্যি বলতে, মনের মধ্যে ছোটখাট একটা সন্দেহ থাকলেও সেদিন ওখানে যাবার আগে পর্যন্ত একবারও ভাবেনি যে পঁচাশি হাজার টাকা দিয়ে দেবার পরেও নিয়মের কড়াকড়িতে পজেসন আটকে দেবে ওরা—ফ্ল্যাটটা একবার চোখের দেখা দেখবার জন্যে চাবিটা তার হাতে না দিয়ে দেবে দুলালের হাতে। না-পাওয়ার হতাশা থেকে অভিমান করেছিল জয়া। অভিমানই জল এনে দিয়েছিল চোখে। হিমাদ্রির ক্ষোভের জায়গা আলাদা; জানে, অভিমান আর অপমান একই ব্যাপার নয়। যতবার মনে পড়ে ততবারই অপমানটা আরও বেশি জায়গা নিয়ে নড়াচড়া করে বুকের মধ্যে।

তবু মুখ বুজে সমস্ত ঘটনাটা মেনে নিয়েছিল হিমাদ্রি। স্বপ্ন বড় মারাত্মক! সার্থকতার দিকে যত এগোয় ততই বেড়ে ওঠে তার জেদ!

নিজেকে বোঝানোর দায়িত্বটা এরপর নিজেই নিল সে এবং সেদিনই, জয়াকে সঙ্গে নিয়ে চুপচাপ বাড়ি ফেরার সময়, পরিষ্কার দু ভাগে ভাগ করে নিল নিজেকে। নিজের ফেলা থুথু

নিজেরই জিব দিয়ে চেটে নেওয়ার মধ্যে যতই গ্লানি থাক, প্রক্রিয়াটা চমৎকার আপস শিখিয়ে দিল তাকে। বাস্তবটাকে চিনে নেওয়ায় ভুল ছিল—বোধহয় অনেকটাই ছেড়ে দিয়েছিল ধারণার ওপর। এখন টের পাচ্ছে সে ছিয়ানব্বই জনের একজন মাত্র। আলাদা করে তার সুবিধে অসুবিধে অভিমান অপমান বুঝবার জন্যে কো-অপারেটিভের মাথাব্যথা থাকবে কেন। তার ভাবনা তাকেই ভাবতে হবে।

সাধন সরকার এবং ম্যানেজিং কমিটির পরামর্শ মতো পরের দিনই অফিস ফেরতা একটা অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে এসেছিল আবাহন কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটির অফিসে। শেষ কিস্তি এবং জেনারেটর ইত্যাদি বাবদ বাড়তি টাকাটা দেবার জন্যে আরও মাসখানেক মাস-দুইয়ের সময় চেয়ে আবেদন করেছিল ইতিমধ্যে তাকে ফ্ল্যাটের পজেসন দেওয়া হলে খুবই উপকার হবে। পজেসন পেয়ে তাড়াতাড়ি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যেতে পারলে কী কী সুবিধে হবে তারও একটা হিসেব করে রেখেছিল মনে মনে। প্রথমত, লেক রোডের এই ফ্ল্যাটটা ভাড়া নেবার সময় যে দু হাজার টাকা ডিপোজিট রেখেছিল সেটা ফেরত পাবে। তা ছাড়াও বাড়িওলা লক্ষ্মণবাবু বলেছিলেন, নোটিশ-ফোটিশ মেনে চলার দরকার কী! বাড়ি ছেড়ে দিলে ভাঙা মাসের ভাড়াটাও পুরো ফেরত দেবেন তিনি। তাড়াটা যে লক্ষ্মণবাবুরই তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি হিমাদ্রির। দুটো ঘর, একফালি খাবার জায়গা, রান্নাঘর ও বাথরুম নিয়ে একতলার একটা দিকের এই ছ শো টাকা ভাড়ার ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিলে কম করেও মাসিক হাজার টাকা ভাড়া এবং বেশ কয়েক হাজার টাকার অ্যাডভান্স পেয়ে যাবেন তিনি। এই সুযোগ কে ছাড়ে!

এই করেই স্বচ্ছন্দে হাতে এসে যেত তিন, সাড়ে তিন হাজার টাকা। বাকি থাকে আরও আট ন হাজার। সেটার কী ব্যবস্থা হবে, কোত্থেকে আসবে অতগুলো টাকা, তার কোনও ছবি আপাতত চোখের সামনে নেই। দিক-চিহ্নহীন উপলক্ষের মধ্যে ডুবে যেতে যেতে নিঃশ্বাস যখন খুব গভীর এবং বাইরে থেকে আরও কিছু টেনে নেবার মতো জায়গা নেই শরীরে, তখন অস্বস্তিতে মাথা ঝাড়া দিয়ে হিমাদ্রি ভেবেছিল, একেবারে শূন্য থেকে পঁচাশি হাজার টাকার ব্যবস্থা যে করতে পারে, আর মাত্র কয়েক হাজার টাকা সে জোগাড় করতে পারবে না!

প্রশ্নটা ছাড়ল না তাকে।

দিন কয়েক পরে একদিন একই বিছানায় জয়ার পাশে শুয়ে যখন এসব ভাবছে, হঠাৎ খেয়াল হল হিমাদ্রির, তার বুকের ওপর অন্যমনস্ক পড়ে আছে জয়ার সাদা ও নিটোল একখানি হাত। ঘটনা হিসেবে সামান্য। নিতান্তই অভ্যাস কিংবা মুদ্রাদোষ; মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেলে কখনও কখনও বুকের ওপর একই হাতের নিশ্চিন্ত শুয়ে থাকা আবিষ্কার করেছে হিমাদ্রি—একবার ভেবেছিল এটা অভ্যাস কিংবা মুদ্রাদোষ নাও হতে পারে, হয়তো ঘুমের মধ্যেও এইভাবে নিজের নিরাপত্তা সম্পর্কে ধারণাটাকে ছুঁয়ে থাকে জয়া। ভাবনাটা এগোয়নি। শুধু অস্পষ্ট ভাবে ভেবেছিল হিমাদ্রি, জয়াও যে তার আশ্রয় এটা সে কী করে বোঝাবে! এখন অবশ্য সেসব কোনও স্মৃতিই ধাক্কা দিল না তাকে। বরং এই মুহূর্তে আবিষ্কৃত দৃশ্যটাই ওলটপালট করে দিল সব। পরিচিত হাতের নরম ও মাংসল স্পর্শে ক্রমশ যুক্ত হল ধাতুর ভার। এ হাতে আছে একখানি সোনার বালা, নিশ্চিত জানে অন্য হাতেও আছে আরও একটি। তখন, পাশ ফিরতে ফিরতে হিমাদ্রি তাকাল জয়ার গলার দিকে। নিঃশ্বাসের মৃদু

ওঠানামায় সোনার মধ্যেও ঝিলিক দিচ্ছে প্রাণ। সামান্য বিছে হার। তবু ওটা এবং বালা দুটো জোড়া দিলে ভরি চারেকের কম ওজন হবে না। হিসেবটা মিলে যাচ্ছ প্রায়। আর ক দিন পরেই দোলপূর্ণিমা। ওই দিনই গৃহপ্রবেশের কথা জয়া কি বলেছিল কখনও!

স্বপ্নের ভিতরের হিংস্রতা নিয়ে প্রায় তার লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিল হিমাদ্রি। তখনই জয়ার চোখে চোখ পড়ায় অন্যরকম হয়ে গেল হঠাৎ, ভাবল, সে কি সত্যিই এই ধরনের চিন্তায় অভ্যস্ত ছিল—না কি ব্যর্থতার বোধ থেকেই মানুষ হিসেবে ছোট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ! সে কি জানে না, মাত্র এইটুকু আর গাছা চারেক চুড়ি এবং একজোড়া ঝোলা দুল ছাড়া আর যা ছিল সবই এর মধ্যেই দিয়ে দিয়েছে জয়া—স্বেচ্ছায় এবং কিছুটা হিমাদ্রির ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর খাটিয়ে; অন্তত দুটো কিস্তির টাকা সে মিটিয়েছিল বউয়ের গয়না বেচে!

পঁচাশি হাজারের হিসেবটা ফিরে এল তক্ষুনি। স্মৃতি এইভাবেই ধাক্কা দেয়। আবছা ভাবে মনে পড়ল, পদ্মপুকুর রোডের পৈতৃক বাড়ির দোতলার চৌদ্দ বাই বারো ঘরটিতে আর কোনও দিনই সে ফিরে যেতে পারবে না। রাস্তার দিকের ঘর; বিয়ের পর পর অফিস-ফেরত যখন সে ঘিঞ্জি দোকানপাট আর মানুষের ভিড়ের মধ্যে দিয়ে পদ্মপুকুর রোডে ঢুকত, একটু এগিয়েই দেখতে পেত জানলার পাশে আড়াল খুঁজে নিয়ে জয়া দাঁড়িয়ে আছে অপেক্ষায়। বাড়ির বিষয়ে তখনও কোনও ভাবনা দানা বাঁধেনি মনে, শুধু বাড়ি ফেরার একটা কারণ ছটফট করে উঠত বুকের মধ্যে। সম্পর্কে ঢুকে পড়ত মায়া; আত্মীয়তা, ভালবাসা হত। ফ্ল্যাট কেনার ইচ্ছা থেকেই পঁচিশ হাজার টাকায় ওই ঘরটা দাদাকে বেচে দিয়েছে সে। দাদা অ্যাডভোকেট, স্ট্যাম্প পেপারে নিজেই বিক্রির বয়ান টাইপ করে এনেছিল । সই করিয়ে, চেকটা হাতে দিয়ে বলেছিল, 'চিন্তাটা মন্দ করিসনি! নিজের করে পাওয়ার স্বাদই আলাদা।' ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি মার। 'হলই বা একখানা ঘর—!' বলেছিল, 'এই জমির ওপর দাঁড়িয়ে না খেয়ে না দেয়ে তোর বাবা তুলেছিল এই বাড়ি—তোদের জন্যেই! ফ্ল্যাটের তলায় কোন জমি পাবি!'

এসব কথার উত্তর থাকে না কোনও। হিমাদ্রিও জবাব দিতে পারেনি। বাড়ি ছেড়েছে, কিন্তু কথাগুলো নিয়ে এসেছে সঙ্গে।

দৃষ্টি এই সময় সামান্য আর্দ্র হতে চায়। বিকেলের ম্লান আলোয় অনেকদিন পরে দোতলার জানলায় এসে দাঁড়ায় জয়া। পাড়ার ছেলেরা কখনও সখনও তাকিয়ে থাকে ও টিপ্পনী কাটে বলে ওরই মধ্যে খুঁজে নিয়েছে আড়াল। হিমাদ্রির চোখ ঠিকই খুঁজে নেবে তাকে।

মুখের ওপর এইভাবে হিমাদ্রিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জয়া বলল, 'কী দেখছ বলো তো!'

'দেখছি না, ভাবছি।'

'ভাবনা সবটাই কি আমার দিকে তাকিয়ে!'

'তা নয়।' অভিজ্ঞতা শিখিয়ে দিয়েছে কীভাবে আড়াল করতে হয় নিজেকে। হিমাদ্রি হাসল এবং বলল, 'ভাবছি এমন সুন্দরী যার বউ, সামান্য একটা ফ্ল্যাট করার জন্যে সে এমন হা-পিত্যেশ করে মরে কেন!'

'আ-হা!' হালকা হবার চেষ্টা করলেও জয়ার দৃষ্টিই বলে দেয় হিমাদ্রির কথাগুলো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি সে। নিছক ঠাট্টা বলেও মেনে নেয়নি। আরও একটু আঁচ

করবার সময় নিয়ে এবং কিছুই না বুঝে বলল, 'তা হলে বউকেই ছেঁড়ো। দেয়াল, দরজা বানাও। কিচেন, ব্যালকনি, বাথরুমও বাদ দিয়ো না। ইট-কাঠের বাড়ির জায়গায় রক্ত-মাংসের বাড়ি। কেউ শোনেনি কক্ষনও।'

মাঝে মাঝে এমনিই মজায় পেয়ে বসে জয়াকে! দারুণ মজা থেকে সাবলীল হয়ে তাকাল হিমাদ্রির তখনও-ভাবুক চোখ দুটির দিকে। হদিস পেল না কোনও। তখন নিজের অজ্ঞাতে কিছুক্ষণ আগে যে-হাত তৈরি করেছিল সমাধানের তাৎক্ষণিক উপায়, সেই হাতেই খোঁচা দিল হিমাদ্রিকে।

'কী মশাই, চুপ করে গেলে কেন!'

হিমাদ্রি বোঝাতে পারবে না কোন স্মৃতি কাকে কখন কীভাবে রুদ্ধ করে। জয়া যে তার দুশ্চিন্তার আশপাশ দিয়ে ঘোরাঘুরি করছে সারাক্ষণ, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। তবু, জয়া তাকে যতই হালকা করার চেষ্টা করুক না কেন, খানিক আগেকার স্বার্থপর চিন্তা—যেটাকে এখন ও নোংরামি বলেই চিনতে পারছে স্পষ্ট, তাকে হালকা হতে দিল না। অন্যমনস্ক ভাবে সে ভাবল, স্ত্রীও যদি নিজের অঙ্গ না হয়ে থাকে, তা হলে সংসারে সত্যিই আত্মীয় কে!

শেষ দুপুরে এক ঝাঁক বৃষ্টি নেমেছিল চকিতে। চাপা গরমের ভাবটা কমেছে তাতে। মাথার ওপরে পাখাটা ঘুরছে ফুল স্পিডে। ঘাম হবার কথা নয়। তবু জয়ার কপালে, চোখের তলায় ও ঠোঁটের আশপাশে আবছা তৈলাক্ত ভাব লক্ষ করল হিমাদ্রি। না কি এটা মনে হচ্ছে নিজেরই দৃষ্টির বিভ্রমে।

জয়া শুনতে না পায় এমন ভাবে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে হিমাদ্রি মনে করার চেষ্টা করল শেষ কথাটা কী বলেছিল জয়া। মনে পড়ায় জয়ার মুখের ওপর সোজা আঙুলের হিজিবিজি রেখা টানতে টানতে বলল, 'তা হলে শোবো কাকে নিয়ে?'

'আর শুয়ে কাজ নেই।' জয়া আধশোয়া হল। হিমাদ্রির দৃষ্টিতে অভিপ্রায় ফুটে উঠেছে ততক্ষণ; বুঝতে পেরে দুষ্টুমিভরা চোখে ওব দিকে তাকিয়ে বলল, 'বউ তো খালি শোয়ারই জন্যে! ফ্ল্যাট হবে না শোয়াশুয়ি, সেটা ঠিক করে নাও আগে—'

'নিয়েছি।'

ছুটির দিন, বিকেল হব হব। মাত্র দু'জনের জন্যে সাজানো এই নিভৃত মুহূর্তে আর কেউ যে হানা দেবে না তা জেনেও হাতের উল্টোপিঠে হিমাদ্রিব প্রথম চুম্বনের রেশ মুছতে মুছতে রাস্তার দিকের জানলাটা বন্ধ আছে কি না দেখে নিল জয়া। অন্যদিকের জানলার পর্দাটাও পুরোপুরি টানা। ওদিকের সরু প্যাসেজটা তাদেরই দখলে—খিড়কির দরজা, আট ফুট উঁচু পাঁচিল এবং জানলা পর্যন্ত মুখ বাড়ানো নিমগাছের ডালপালা বে-আব্রু হবার যে-কোনও সম্ভাবনা সরিয়ে রাখে দূরে। নিশ্চিত হয়ে নিজের ইচ্ছেটাও গোপন রাখল না জয়া। হিমাদ্রিকে যথেচ্ছ হবার সুযোগ দেবার আগে বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার আর গা নেই!'

'কেন!'

'সপ্তাহ ঘুরতে চলল। এর মধ্যে কোনও ব্যবস্থাই করলে না!'

'হয়ে যাবে।' জয়ার শরীরে নাক ডুবিয়ে নিজের ভিতরের আচ্ছন্নতা টের পেল হিমাদ্রি—সেদিন সন্ধ্যায় ফ্ল্যাটের চৌকাঠ পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে যেমন হয়েছিল; সুতরাং, ফিরে গেল পুরনো কথায়। ওর স্তনের চাঁদরেখায় ঠোঁট ছুঁইয়ে বলল, 'চিঠি দিয়েছি। ওরা জবাবটা কী দেয় দেখি না।'

সিলিংয়ের দিকে মুখ করে নিঃশ্বাস নিল জয়া এবং কে জানে কেন লক্ষ করল পুরো স্পিডে পাখা চললে চক্রটাই চোখে পড়ে শুধু। হয়তো এটাই ফুল স্পিড নয়, হাওয়ায় টান পড়ায় জয়া সেইরকমই ভাবল।

'যদি না দেয়?'

'কী!'

'তুমি যেভাবে চাইছ তাতে যদি রাজি না হয়?'

'হবে না! তোমার মনে হচ্ছে?'

হিমাদ্রি দায়সারা হল। শরীর থেকে মনটা সরিয়ে নিলে অভ্যাসে দ্রুত হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়গুলো—ইচ্ছার মধ্যেও ক্রমশ ঢুকে পড়ে ভাল না-লাগার অনুভূতি। কিংবা, ভাল লাগা এবং না-লাগার মধ্যে দূরত্ব থাকে না কোনও। সে যেভাবে ভাবে, জয়াও কি ঠিক সেইভাবেই ভাবে! আজ না হোক কাল, কিংবা আরও কয়েকদিন পরে, ফ্ল্যাটের পজেসন তারা পাবেই। তবু কেন ভূতটা ঘাড় থেকে নামাতে পারছে না জয়া! ভাবতে ভাবতে একাগ্র হবার চেষ্টা করল হিমাদ্রি। সম্পর্কের শুরুতে সে আর জয়াই শুধু ছিল, তখনও ফ্ল্যাটের ভাবনা হানা দেয়নি। তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই, তবু কোনও কারণে যদি ফ্ল্যাটটা না হয়—তখনও তারাই থাকবে। থাকবে তো? না কি একটু অন্যরকম হয়ে যাবে জীবন!

নিঃশ্বাসে এলোমেলো ভাব। বিস্ফোরণের আগের মুহূর্তে শরীর কীভাবে একার আহ্লাদে মেতে ওঠে তা অনুভব করতে করতে হিমাদ্রির মাথাটা দু হাতে বুকের মধ্যে টেনে নিল জয়া। শেষ চেষ্টায় বলল, 'এভাবে গা ঢিলে দিয়ে থাকলে কিছুই হবে না—'

হয়তো ঠিকই বলেছে জয়া, না বললেও সে জানত—এই ভাবনা নিয়ে হঠাৎ হঠাৎ আবির্ভূত কিছু হাওয়া এবং থেকে-থেকে হাই তোলা এক ধরনের আলস্যের মধ্যে বিকেলের আলো ফুরোতে এবং ক্রমশ অন্ধকার হতে দেখল হিমাদ্রি। বিছানা গুছিয়ে স্নান করতে বাথরুমে ঢুকেছিল জয়া। এখন রান্নাঘর থেকে শব্দ আসছে টুকটাক, তার মানে চা-টা তৈরি করেই আসবে এদিকে। বসার ঘরে বেতের সোফায় বসে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল হিমাদ্রি। জুত হল না তেমন । হঠাৎ মনে হল, কয়েক ঘণ্টা আগে সে যেখানে ছিল তার চেয়ে পিছিয়ে পড়েছে অনেকটা। শরীর নিবে যাবার পর নিঃশ্বাস ভারী করে রাখা ছাইয়ের গন্ধে অদ্ভুত শূন্যতার বোধ ছাড়া আর কিছু থাকে না—উদাসীন হয়ে ওঠে রক্ত, ঘৃণা করতে ইচ্ছা করে নিজেরই শরীর থেকে বের হওয়া ঘামের অনুভূতি। নির্দিষ্ট কোনও চিন্তার অভাবে তখন হঠাৎ চলে যেতে ইচ্ছা করে কোনও এক সাঁকোব ওপরে—অপ্রয়োজনীয় ভেবে মুঠো খুলে শেষ কপর্দকটিও ছুড়ে দিতে হয় বহুদূর নীচে, জলের শূন্যে।

অস্থিরতা কাটাতে উঠে গিয়ে সদরের দরজাটা খুলে দিল হিমাদ্রি। দু টুকরো পর্দা ঠেলে সরিয়ে দিল দু পাশে। রাস্তায় চোখ রেখে দাঁড়াল। আগে যা ভেবেছিল তা নয়; এখনও কিছু আলো ছড়িয়ে আছে চারিদিকে। দিব্যি হাওয়া ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে; তার কিছু ওকেও ছুঁয়ে গেল। ছুটির দিন বলেই সম্ভবত রাস্তায় লোকজন কম। অনেকক্ষণ পরে একটা গাড়ি চোখে পড়ল; যাত্রী ছাড়াই ঠুনঠুন ঘণ্টি বাজিয়ে এগিয়ে আসছে একটা রিকশা। তাকে পেরিয়ে যাবার পরও শব্দটা লেগে থাকল কানে।

হিসেবটা ফিরে এল। মাথার পিছনে এবং ঘাড়ের মাঝামাঝি কোথাও আছে একটা অনিচ্ছুক জায়গা, সেখানে সিরসির করছে মনে পড়ার অস্বস্তি। সামান্য ব্যথাও যেন লেগে

আছে সেখানে। ইদানীং এমন হয় মাঝে মাঝে; সঙ্গে সঙ্গে মেজাজে ঢুকে পড়ে নিম। ব্লাড প্রেসার-ট্রেসার হল না কি!

প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে হিমাদ্রি ভাববার চেষ্টা করল, বারো সাড়ে-বারো হাজারের চেষ্টাটা আর কোথায় কোথায় চালানো যেতে পারে! প্রভিডেন্ট ফান্ড থেকে ম্যাক্সিমাম যা পেতে পারত তা তুলে নিয়েছে। দশ এগারো বছরের পাকা চাকরি হলেও সে কেউকেটা নয়। ঢুকেছিল সিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে; তারপর বছর ছয়েক হল প্রোমোশন পেয়েছে অফিসার র‍্যাঙ্কে। কত আর জমবে! তাতেও না কুলানোর পরে ব্যাঙ্কে জমানো সামান্য কয়েক হাজার এবং বড় জামাইবাবু এবং বন্ধুবান্ধবদের কাছে ধার করে কয়েক দফায় জোগাড় করেছে হাজার কুড়ির মতো। এর মধ্যে এক অবনীই দিয়েছে পাঁচ। অফিসে কাজকর্মে মোটামুটি সুনাম আছে তার; ওই খাতিরেই, ভেবেছিল, ম্যানেজ করা যাবে হাজার পনেরোর একটা লোন। কথাবার্তা বলে আশ্বাসও পেয়েছিল—ফরমালি অ্যাপ্লাই করার পর কেঁচে গেল ব্যাপারটা। কিছুদিন আগেই না কি নাকচ হয়ে গেছে আর একজন অফিসারের একই ধরনের আবেদন; সেটাই শেষ পর্যন্ত না পাবার অজুহাত হয়ে দাঁড়াল। তবে রিগ্রেট করেনি এখনও। চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট পুলক বিশ্বাস আড়ালে ডেকে বলেছিল, কিছুদিন যাক না, মশাই; কোনও এক ছুতোয় বের করে দেব টাকাটা। কিছুদিন মানে কতদিন! প্রশ্নটার জবাব পেল না আজও। হচ্ছে, হবে, দেখছি—এই সব; এদিকে ইটের ওপর ইট গাঁথা হয়ে যাচ্ছে বুকের মধ্যে! কংক্রিটের সেই কাঠিন্যে এখন আর সজল কিছু অনুভব করা যায় না।

এর পরেও আছে সরকারের লোন, সুদ সমেত শোধ দিতে হবে কুড়ি বছরে। সেটা অবশ্য গায়ে লাগবে না তত। নতুন ফ্ল্যাটে একবার উঠে যেতে পারলে এখনকার বাড়িভাড়ার টাকাটা বাঁচবে; ওর থেকে হিসেব করে মাসে মাসে আলাদা করে রাখলে এখন যা দিচ্ছে তার কমেই বছর-বছর শোধ হয়ে যাবে সুদ আর আসলের অংশ। ওটা সমস্যা নয়। খুব তাড়াতাড়ি বাড়তি টাকাটা জোগাড় করে ফেলা ছাড়াও আছে আরও বড় বোঝা, ধরা-করা টাকাগুলো এখন যত শীঘ্রি সম্ভব শোধ না দিলেই নয়। বিশেষ করে অবনীর টাকাটা। এই সেদিনও অফিসে ফোন করেছিল অবনী—কী রে শালা! তোর ফ্ল্যাট যে তাজমহলের চেয়ে বেশি সময় নিয়ে উঠছে! মানে বোঝা কী আর এমন অসাধ্য!

এখন হিমাদ্রি আগের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান এবং কাতর; যখন-তখন নাড়াচাড়া করে নিজেকে নিয়ে। তবে, এগোতে কি আর পারে!

অফিসে টেলিফোন এলে আজকাল যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে সে—থেকেও থাকে না প্রায়ই। আড্ডাটাড্ডাও বাদ। এমনকী বড় জামাইবাবু যদিও যেচেই দিয়েছিলেন টাকাটা—আরে, তুমি তো আমার ছেলের মতো, ইত্যাদি বলে এবং এখনই শোধ দেবার কথা উঠছে না; তবু, দু মাসের ওপর হয়ে গেল হিমাদ্রিরা আর ওদিকে মাড়ায়নি। অথচ যোধপুর পার্ক আর কত দূর এখান থেকে! আত্মীয় সম্পর্কের মধ্যে দিদি আর বড় জামাইবাবুই তাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ, ভালও বাসে। আগে শনি কি রবিবার যেতই, রাতের খাওয়াটা ওখানেই সেরে ফিরত। জয়াকে পাঠিয়েছিল একদিন—অফিসের নানান ঝামেলা চলছে, ট্যুরে যেতে হয় ঘন ঘন, এই সব বলবার জন্যে। ইদানীং জয়াও যেতে চায় না আর। মাঝে বলেছিল, তোমার লজ্জা লাগে, আমার লাগে না! ক্ষোভ বুঝতে পেরে হিমাদ্রিও কথা বাড়ায়নি। পদ্মপুকুর রোডের বাড়ির ঘরটা হাতছাড়া হবার পর থেকে মা-র সঙ্গেও বড়

একটা দেখা করতে যায় না জয়া—বউদি নাকি এক দিন খোঁচা দিয়ে কী বলেছিল ওকে, হিমাদ্রি জানে না। তবে অবিশ্বাস করতে পারেনি। জয়া যে খুব গরিব ঘরের মেয়ে এবং সুন্দরী—আর কেউ না জানুক, হিমাদ্রি অন্তত জানে, এই দুটো ব্যাপারের সঙ্গে কোনও দিনই আপস করতে পারেনি বউদি। আলাদা হয়ে যাবার ওটাও একটা কারণ। ভাবনাগুলো প্রায়ই অন্যমনস্ক করে দেয় তাকে। রাগ বস্তুটা তার শরীরে একেবারেই ছিল না বলতে গেলে, আজকাল সেটাও টের পায়। এই সব সময়ে বিশ্রী রকমের অবিন্যস্ত লাগে নিজেকে। মনে হয় সে যতই গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে ততই ছড়িয়ে পড়েছে তার চারপাশের জাল। এর থেকে বেরুবার উপায় নেই কোনও।

মাঝখানে একদিন তার অফিসে এসেছিল অবনী। সামনাসামনি পড়ে যাওয়ার প্রাথমিক অস্বস্তি কাটিয়ে হিমাদ্রি নিজেই সুবিধে-অসুবিধের কথাগুলো বলেছিল তাকে। তুই একটা গাড়ল, কিছু কিছু শুনে অবনী বলল, তোর দাদাই তোকে কম করেও দশ হাজার টাকা জক দিয়েছে। তুই ঘরের দাম ধরলি, জমিটার দাম ধরলি না! আচ্ছা হারামি দাদা তোর মাইরি! অবনী এইভাবেই বলে, বলার ব্যাপারে রাখঢাক থাকে না কোনও। পরে বলল, কুছ পরোয়া নেহি, হো জায়গা। লাইফ ইজ লাইক দ্যাট!

সঙ্গে গাড়ি এনেছিল। ছুটির পর তাকে পৌঁছে দিতে দিতে বলল, হ্যাঁ রে, তোর বউ তো সুন্দরী, বেশ ফোটোজিনিক। মডেল হতে চায় তো বলিস। আমাদের এজেন্সি নতুন নতুন ফেস খুঁজছে—ইয়াং, বিউটিফুল ফেসেস। আর্ট ডিরেক্টর কানু মুখার্জি সেদিন বলেছিলেন চেনাশোনা কেউ থাকলে জানাতে। জানিস তো, বিজ্ঞাপনের মডেলরা আজকাল অনেক টাকা পায়। এক-একটা পোজের জন্যে হাজার দেড় দুই তো বটেই। একবার লেগে গেলে আরও বেশি। স্কাই ইজ দ্য লিমিট!

অল্প সন্দেহ নিয়ে অবনীর কথাগুলো শুনেছিল হিমাদ্রি। শুনতে শুনতেই ভেবেছিল প্রস্তাবটায় মতলব লুকিয়ে রেখেছে অবনী, হয়তো ভেবেছে চটপট কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারলে তার টাকাটাই আগে শোধ করে দেবে হিমাদ্রি। তার পরেই অবশ্য মনে হয়েছিল, মডেলিং-এর প্রস্তাবটা নতুন হলেও, এর আগে জয়ারই বন্ধু মীনা ওকে ফিলমে নামার প্রস্তাব করেছিল—মীনার খুড়তুতো দাদা ফিলম ডিরেক্টর। এটা তাদের বিয়ের বছর খানেক পরের ঘটনা। হিমাদ্রিই উড়িয়ে দিয়েছিল ব্যাপারটা। জয়াও যে রাজি ছিল তা নয়। আড়ালে বিশ্লেষণ করে দেখেছে হিমাদ্রি, নিজের শরীর, স্বাস্থ্য, রূপ নিয়ে খুব একটা কনসাস নয় জয়া—স্বামী, সংসার এবং মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক কিছু আশা-আকাঙ্ক্ষার বাইরে তাকায় না বেশি দূর। সরল তো বটেই; সত্যি বলতে ভাবভঙ্গি দেখে নিজের স্ত্রীটিকে কখনও-সখনও বোকাও মনে হয় হিমাদ্রির। এই ফ্ল্যাট কেনা নিয়েই যা একটু জেদ দেখিয়েছিল। তবে বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়া আর সিনেমায় নামা একই ব্যাপার নয়। কিছুদিন আগে একটা বিস্কিটের বিজ্ঞাপনে অবনী নিজেও মডেল হয়েছিল নিজের বউ সুমিত্রা আর ছেলেকে নিয়ে। এরকম আকছার হচ্ছে আজকাল; সকালে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে নিত্য নতুন মুখ। সেদিন একটা নারকোল তেলের বিজ্ঞাপনে একজনকে দেখে মনে হয়েছিল মেয়েটিকে আগেও দেখেছে অনেকবার—হয়তো কাছে পিঠেই থাকে কোথাও; তারপর একদিন লেক মার্কেটে বাজার করতে গিয়ে দেখল তারই পাশে দাঁড়িয়ে মাছ কিনছে—যদিও অন্য চেহারায়; সিঁথিতে সিঁদুর এবং বিবাহিতা।

অবনীকে কিছু না বললেও ওর প্রস্তাবটা মাথায় রেখে দিয়েছিল হিমাদ্রি। কথায় কথায় জয়াকেও বলেছিল। তেমন গুরুত্ব দেয়নি জয়া। ঠিক জানে না, মনে মনে সে নিজেও হয়তো চেয়েছিল জয়া না বলুক।

এখন অন্যরকম ভাবল। এই মুহূর্তে স্রোতে ভাসতে ভাসতে হঠাৎই মনে হল হিমাদ্রির, অবনীর পরামর্শে গোলমাল ছিল না কিছু—সে নিজে মেনে নিতে পারলে এবং জয়া রাজি হয়ে গেলে আরও একটা উপায় এসে যেত মুঠোয়; হয়তো সমস্ত টাকাটারই একটা ব্যবস্থা হয়ে যেত এতদিনে! তা না হলে, চৌত্রিশ বছর বয়সের পক্ষে ঝুঁকিটা বড্ড বেশিই নিয়ে ফেলেছে সে। এখন আর কার কাছে যাবে! কিস্তির টাকার বন্দোবস্ত করতে করতে এরই মধ্যে টান পড়েছে সংসার খরচে। আরও ধার করলে সেগুলোও শোধ দেবাব প্রশ্ন থাকবে। কে তাকে দেবে এতগুলো টাকা! যাওয়া যায় অবশ্য বড় জামাইবাবুর কাছে, আবার, কিংবা মুখ কাঁচুমাচু করে দাদার কাছে। কিন্তু—, দিকচিহ্নহীন উপলক্ষের মধ্যে হিমাদ্রির বুকের ওপর আবার সেই কিছু বা অন্যমনস্ক, সাদা ও নিটোল হাতখানি উঠে এল।

'কী মশাই, কী ঠিক করলেন শেষ পর্যন্ত?'

লক্ষ্মণবাবু। পাশের গেট দিয়ে কখন যে বেরিয়ে এসেছেন খেয়াল করেনি। হিমাদ্রি জানে, বিকেল শেষের এই সময়টায লেকের দিকে হাঁটতে যান ভদ্রলোক। ফেরেন সন্ধ্যার পর পাড়ার লাইব্রেরিতে খবরের কাগজ পড়ে। আপাতত সামনে পেয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছেন।

'কোন ব্যাপারে!'

'ওই, আপনার ফ্ল্যাট। কবে যাবেন-টাবেন ঠিক করলেন কিছু?'

চট করে কোনও উত্তর জোগাল না মুখে। এতক্ষণ ধরে ডুবে থাকা চিন্তার জের থেকে নিজেকে বের করার চেষ্টায় হিমাদ্রি বলল, 'দেখি। এখনও ঠিক করিনি কিছু—'

নিজের মনে মাথা নাড়লেন লক্ষ্মণবাবু। হাওয়ার তাড়া খেয়ে একটা দোমড়ানো কাগজের ঠোঙা নড়াচড়া করছে পায়ের কাছে। হাতের ছড়ি দিয়ে সেটাকে ফুটপাথ থেকে রাস্তায় সরিয়ে বললেন, 'পুরো টাকা না দিলে কি পজেসন দেবে!'

'তার মানে!'

হিমাদ্রির চোখে সন্দেহ। কিছু বা বিরক্তি। সেটা লক্ষ করেই সম্ভবত নিজেকে গুটিয়ে নিলেন লক্ষ্মণবাবু। ইতস্তত করে বললেন, 'আমার এক রিলেটিভও ফ্ল্যাট নিচ্ছে ওখানে। জামশেদপুরে থাকে। কাল ওর সঙ্গে গিয়েছিলাম সরকারের কাছে। এস্কালেসানের টাকাটা দিলে পজেসন পাবে।'

আলো ফুরিয়ে আসছে দ্রুত। পশ্চিমের আকাশে সূর্যাস্তের পরের রং, লাল ও কালোয় মিশে গাঢ় থেকে ধূসর হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। এর পরের রংটা চেনা—কিছুদিন আগে একদিন দেখেছিল, এখনও গেঁথে আছে স্মৃতিতে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হয় কেউ চলে গেছে আর না-ফেরার জন্যে। জবাবের চিন্তায় মিশ্র ও পাঁশুটে ওই রঙের দিকে অনির্দিষ্টভাবে তিনটি কাককে উড়ে যেতে দেখল হিমাদ্রি। পিছনে না তাকিয়েও বুঝল জয়া ঢুকেছে ঘরে। নিশ্চিত চা নিয়ে। এখন যা বলার বুঝে বলতে হবে।

'হ্যাঁ—', লক্ষ্মণবাবু যেদিকে তার উল্টোদিকে তাকিয়ে হিমাদ্রি বলল, 'ঝামেলা তো আছেই—'।

'ঝামেলা থাকবে না! কোন ব্যাপারে ঝামেলা নেই!' ছড়িটা বাগিয়ে ধরলেন লক্ষ্মণবাবু,

'কর্পোরেশন থেকে নোটিশ দিয়েছে নতুন করে অ্যাসেসমেন্ট হবে। আমাদেরও কি ঝামেলা কম। ভাড়া থেকে আর কতটা পাই। সবটাই লস্!'

জয়া পাশে এসে দাঁড়াল। এই কথার উত্তর না দিলেও চলে। লক্ষ্মণবাবু আর কী বলবেন, বলতে পারেন তা অনুমান করার চেষ্টায় চুপ করে থাকল হিমাদ্রি।

'একটা ফার্ম ডেট না পেলে তো আমারও অসুবিধা। নতুন ভাড়াটে বাছতে সময় লাগে—তাদেরও নোটিশ দিতে হয়!'

অবনী থাকলে হারামি বলত। কিংবা গাড়ল, কিংবা—। মনে পড়ায় হিমাদ্রি বলল, 'দেখি। ডেট ঠিক করলে জানাব।'

ওপরে ব্যালকনি। কে আছে না আছে দেখা যায় না এখান থেকে। তবু হিমাদ্রি বুঝতে পারল, গলার আওয়াজ শুনে কেউ কেউ এসে দাঁড়িয়েছে ওখানে। সম্ভবত লক্ষ্মণবাবুর স্ত্রী কিংবা বেকার ধাড়ি ছেলেটা, দুজনেও হতে পারে। মেয়েটিকে একটু আগে গিটার হাতে বেরিয়ে যেতে দেখেছে। যে-ই আসুক, ওপরে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন লক্ষ্মণবাবু এবং যাবার জন্যে পা বাড়িয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখুন—'

ফাঁকা রাস্তাতেও কোনও কোনও লোক অতিরিক্ত সাবধানে হাঁটে। লক্ষ্মণবাবু বাঁ দিকে তাকালেন, তারপর ডান দিকে, তারপর আবার বাঁ দিকে এবং ডান দিকে। ফুটপাথে উঠলেন। তারপর একবার পিছনে ওদের দিকে তাকিয়ে গতি বাড়ালেন পায়ের। ক্রশিংয়ের কাছাকাছি বড় রাস্তায় ওঁর চেহারাটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে একটি কাগজের ঠোঙা এবং কিছু চিনেবাদামের খোলা একই সঙ্গে উড়ে এসে ছড়িয়ে পড়ল ফুটপাথে, প্রায় হিমাদ্রিদের দরজার সামনে। এক দলা থুথুও। বিরক্ত চোখে সমস্ত ঘটনাটা লক্ষ করল হিমাদ্রি। সুবিধে এইটুকু, ব্যালকনিটা ফুট চারেক চওড়া। না হলে গায়ে এসে পড়ত।

ঘরে ঢুকে আলো জ্বালল হিমাদ্রি। রেগুলেটার ঘুরিয়ে আস্তে করে দিল পাখাটা। তারপর সোফায় বসতে বসতে চায়ের কাপটা তুলে নিল হাতে। এরই মধ্যে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে খানিকটা। পাখাটা যে চলছে জয়ার তা খেয়াল করা উচিত ছিল।

উষ্ণতা নয়, যতটা সম্ভব স্বাদ পাবার চেষ্টায় এক সঙ্গে অনেকটা চা গিলে ফেলল হিমাদ্রি।

জয়া দরজায়। পর্দাটা টেনে ভিতরে এসে বলল, 'তুমি কিছু বলো না কেন।'

'কী!'

'এই যে সারাক্ষণ এটা ওটা ফেলে নোংরা করছে!'

'আমি কী বলব!' এক চুমুকে বাকি চা-টুকু শেষ করে অনিচ্ছুক গলায় হিমাদ্রি বলল, 'বাড়িটা ওদের, ফুটপাথটাও আমার নয়। যাদের সিভিক সেন্স নেই তাদের বলে শেখানো যায় না।'

জয়া কিছু বলল না। বরং হিমাদ্রিকেই বুঝবার চেষ্টা করে বলল, 'চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, না?'

'না। ঠিকই ছিল।' হিমাদ্রি জয়ার দিকে তাকাল। তারপর মুখ নামিয়ে বলল, 'সবই ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, চায়ের আর দোষ কী।'

হিমাদ্রির মুড খারাপ। এটা এই সময়েরই জের, না কি আগেও ছিল—লক্ষ্মণবাবুর সঙ্গে কথাবার্তায় বেরিয়ে এল প্রকাশ্যে, তা বুঝবার উপায় নেই। কীভাবে আবার তাকে স্বাভাবিক করা যায় বুঝতে পারল না জয়া। তার সম্পর্ক বলতে হিমাদ্রিরই সঙ্গে—যে তার স্বামী; কিন্তু

স্বামী বললেই ঠিকঠাক বোঝা যায় না সম্পর্কটা; যে তার অস্তিত্ব। সেখানে টান পড়লে হঠাৎ হয়ে যেতে হয় একা। যা না হলেও চলত তা হয়ে গেলে যেমন হয়—ভীষণ খাপছাড়া লাগে নিজেকে, পূর্বাবস্থায় ফেরার জন্যে ছটফট করে সর্বস্ব।

এখন কথা বলে লাভ নেই। জয়ার মনে পড়ল, তার চা-টাও ঠাণ্ডা হচ্ছে ভিতরে; হিমাদ্রিকে আগে দিতে এসে কৌতূহলে আটকে পড়েছিল। এখন সে সরে গেল সামনে থেকে। গ্যাস জ্বেলে চটপট আর একবার চা করল হিমাদ্রির জন্যে, নিজেরটা ফুটিয়ে নিল। ওপরে টি-ভিতে সিনেমা চলছে, শব্দটা ভেসে এল গানের ভিতর দিয়ে—তুমি আমায় ডেকেছিলে...। চেনা গান, মনে হয় ছবিটা তারাও দেখেছিল আগে। কোন ছবি মনে পড়ল না। তখন দু হাতে চা নিয়ে বসার ঘরে আসতে আসতে ভাবল আজ তারা বেরুতে পারত; মনে পড়ল পদ্মপুকুর রোডের বাড়ির নীচের তলার হলঘর থেকে টি-ভি সেটটা হঠাৎই এক দিন সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল দোতলায় হিমাদ্রির দাদা-বউদির শোবার ঘরে—না কি হাটে বসে দেখলে ঝি ও ঝিয়ের মেয়ে দুজনেই কাজকর্ম ফেলে এঁটে থাকত টি-ভিতে। তারপর থেকে সে আর টি-ভি দেখেনি; ওই মাঝে মধ্যে ছাড়া—দিদি, বড় জামাইবাবুর ওখানে গেলে দেখার সুযোগ হয়েছে কচিৎ কখনও। অনেকদিন পরে একদিন উত্তমকুমারকে দেখল, তার আগে দেখেছিল রাস্তায় দাঁড়িয়ে, মারা যাবার পরের দিন যখন বিশাল মিছিলের মধ্যে ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তাঁকে। হিমাদ্রিও ছিল পাশে। হিমাদ্রিকে কি রাজি করানো যাবে যোধপুর পার্কের দিকে যেতে?

হিমাদ্রি আবার উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে দরজায়। রাস্তা দেখছে।

'তোমার চা।' জয়া বলল, 'এবার আর ঠাণ্ডা বলতে পারবে না।'

'আগে বলেছি!'

'বলোনি।' নিজে বসবার আগে হিমাদ্রির আগ্রহটা লক্ষ করল জয়া, 'কেমন গুম মেরে গেলে, সেটা তো বুঝতে পারি।'

হিমাদ্রি কিছু বলল না। চায়ে চুমুক দিচ্ছে এবং তখনও অন্যমনস্ক দেখে জয়া বলল, 'যাবে? তোমার দিদির বাড়ি? অনেকদিন তো যাও না!'

'ভাল লাগে না আজকাল।' হিমাদ্রি চোখ তুলল, জয়াকেই দেখছে। বলল, 'তোমার ইচ্ছে করছে?'

'ইচ্ছে অনিচ্ছে নয়। অনেকদিন যাই না। যারা ভালবাসে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়।'

হিমাদ্রি হাসল একটু, এমনিই, অন্তত জয়ার কথার উত্তরে নয়। সময় নিয়ে বলল, 'আজ থাক। বরং চলো, রাস্তায় ঘুরে আসি—'

'রাস্তায়!'

'কেন! ভাল লাগে না? বাইরে হাওয়া দিচ্ছে বেশ—'

জয়ার চোখে অস্বস্তি। হিমাদ্রির মনটা যে চায়ের কাপে কিংবা বেড়ানোর ভাবনায় নেই, ওর ভাবভঙ্গিতেই তো স্পষ্ট। তখনই একা হয়ে যাওয়ার ভাবটা ফিরে আসতে লাগল।

হিমাদ্রি উঠে দাঁড়াল।

'বাড়িওলা মনে হচ্ছে ওখানে গিয়েও খোঁজ-খবর করেছে আমাদের সম্পর্কে—'

'কোথায়?'

'কো-অপারেটিভের অফিস। আমরা যে এখনও পুরো টাকা দিতে পারিনি, ফ্ল্যাটের পজেসন পাচ্ছি না—এ সব খবরও পেয়েছে মনে হয়।'

'বলল তোমাকে?'

'খোলাখুলি কি আর বলে। লোকটাকে তো চেনো। বাড়ি ছেড়ে দেব শোনার পর থেকে আর ঘুম হচ্ছে না। আজকাল লোকটাকে দেখলেই ইরিটেশন হয়—'

ছোট ঘর। ওরই মধ্যে হাত দুটো পিছনে বন্দি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে হিমাদ্রি। পারলে কিছু একটা করে ফেলত; পারবে না বলেই রাগটা নামাতে পারছে না। দেয়ালের ক্যালেন্ডারটার সামনে গিয়ে থেমে গেল। পাতা উল্টে পরের মাসের তারিখগুলোয় চোখ বুলিয়ে দেখল কিছু। তারপর পায়চারি শুরু করল আবার।

'কোনওরকমে টাকাটা জোগাড় করে দিয়ে দিলেই তো হত!'

জয়া কি এইভাবেই বলতে চেয়েছিল? অন্তত এই কথাটি? হিমাদ্রির হঠাৎ-তাকানোর ধরন ও দৃষ্টি দেখে তা মনে হবে না। নিজের মধ্যেই অল্প একটু সিঁটিয়ে গেল জয়া।

'তুমি যে মেয়েমানুষ, সেটা বোঝাই যায়।' হিমাদ্রির গলায় বিরক্তি। বলল, 'এমনভাবে বলছ যেন টাকাটা আমার পকেটেই আছে, ইচ্ছে করে ঝামেলা পাকাচ্ছি!'

'তা বলব কেন!' চোখ না তুলেই বলল জয়া, 'জোগাড় করার কথা বলছিলাম—'

'জোগাড়! কোত্থেকে?' হিমাদ্রি উত্তেজিত। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল, 'কে দেবে! তুমি জানো না কীভাবে কী করতে হচ্ছে!'

পাঁচ বছরের সম্পর্কে হিমাদ্রিকে ঠিক এতখানি রুক্ষ ভঙ্গিতে আর কখনও দেখেছে বলে মনে পড়ে না; এই ভাষাও হিমাদ্রির ভাষা নয়। বুকের ভিতর কী একটা জায়গা বদল করছে টের পেল জয়া। ফ্ল্যাট কি তবে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কটাকেও নষ্ট করে দেবে! কী হত যদি ফ্ল্যাটটা না হত, যদি এইভাবেই এইরকম ছোট্ট এক টুকরো বাড়িতে কাটিয়ে দিতে পারত তারা! জীবন কি বদলে যেত খুব? চেতনাটা আছে—প্রায় সারাক্ষণই কাজ করে যাচ্ছে নিঃশব্দে; তবু সে কিংবা হিমাদ্রি কি জানে ওই আটতলায় উঠে গেলেই বা কেমন হবে জীবন!

চোখের কোণে এটা সিরসিরে অনুভূতি নিয়ে হিমাদ্রিকে দেখবার জন্যে মুখ তুলবার চেষ্টা করল জয়া। পারল না। শুধু চাপা গলায় বলল, 'যে কটা গয়না আছে বেচে দাও। আমি তো বলেই ছিলাম!'

'তোমাকে নিয়ে এই মুশকিল!' হিমাদ্রি নরম হয়ে এল। থেমে, আরও একটু স্বাভাবিক হয়ে বলল, 'যে কটা বেচেছি তাও উচিত হয়নি। শালার কপাল একখানা—বউয়ের গয়না বেচে ফ্ল্যাট তুলছে! সারাক্ষণ খচখচ করে মনটা—'

'এটা তোমার বেশি বেশি!' জয়া বলল, 'অত খচখচ করারই বা আছে কী! খোঁজ নিয়ে দেখ অনেকেই এমন করেছে। সোনা এইভাবেই কাজে লাগে।'

'জানি না।' সিলিংয়ের দিকে মুখ করে কী ভাবল হিমাদ্রি। তারপর বলল, 'এর চেয়ে অবনীর সাজেসানটা ভাল ছিল। মডেলিং করে কিছু টাকা পেলে—'

কথাটা শেষ করল না হিমাদ্রি। জয়ার চোখে চোখ পড়ায় থেমে গেল। জয়া তাকেই দেখছে; ভিতর পর্যন্ত, যতদূর দেখা যায়।

'আজকেই বলছ। তখন ফিলমে নামলে অনেক বেশি টাকা আসত। তখন তুমি বারণ

করেছিলে।'

'জয়ি—', হিমাদ্রি ফিরে গেল তার আদরের ডাকে, হঠাৎ, কোনও উদ্দেশ্য থেকে নয়। জয়ার দৃষ্টি ও কণ্ঠস্বরই সম্ভবত ভাবিয়ে তুলেছিল তাকে। তারপর বলল, 'তখন প্রয়োজন ছিল না। প্রয়োজনই মানুষকে বদলে দেয়।'

ঠোঁটে দাঁত রেখেছে জয়া। এই রূপে যে-কোনও অভিব্যক্তিতেই আলাদা হয়ে ফুটে ওঠে সাদা ও রক্ত। বেশ খানিকটা সময় নিয়ে জয়ার মুখের স্তব্ধতা লক্ষ করতে করতে ওর দিকে এগিয়ে গেল হিমাদ্রি। বসতে বসতে বলল, 'একটা কথার কথা বললাম। অত মনে করার কী আছে।'

তারপর বেশ কিছুক্ষণ ওরা কেউই আর কোনও কথা বলল না।

৩

প্রয়োজনই বদলে দেয় মানুষকে—জয়ার কথার উত্তরে নিজেকে দাঁড় করাবার জন্যেই সেদিন কথাটা বলেছিল হিমাদ্রি। সত্যি হলেও তাতে ভার ছিল না কোনও। এমনও নয় যে, ভেবেছিল বলেই একটা ইচ্ছার দিকে এগোচ্ছিল সে। নিজেই জানে মানুষ বাইরে যা ভিতরে তা নয়। অবনীর প্রস্তাবটা যেভাবেই এসে থাকুক, কিংবা আপাত চোখে বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ায় দোষের কিছু না থাকলেও, কাগজে কাগজে জয়ার ছবি বেরুচ্ছে এবং আর পাঁচজনে তা দেখছে—বিষয়টা এইভাবে যখনই ভাবে তখনই ঈর্ষাজনিত অল্প একটু অস্বস্তি ছটফট করে বুকের মধ্যে, কেন যেন মনে হয় যে-অধিকার তার একার আর পাঁচজনে ভাগ বসাচ্ছে তাতে। ছবিতে রক্ত-মাংস না থাকলেও কারও ছবির দিকে তাকালে কল্পনায় শারীরিক খুঁটিনাটির আদল ফুটিয়ে তোলা যে-কারুর পক্ষেই সম্ভব।

নিজেকে দিয়েই ভাবনার সত্যটা যাচাই করে নিতে পারে সে। নিজের অধিকারের মধ্যে জয়ার মতো অমন সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অফিসে বা রাস্তায় তেমন কোনও মেয়ে দেখলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও সখনও কুচিন্তা ঢুকে পড়ে মাথায়। নিজেকে তিরস্কার করতে গিয়ে দার্শনিকতা এসে যায়; ভাবে, একের সঙ্গে অন্যের আইনসম্মত সম্পর্ক সৃষ্টি করে সমাজ যতই অধিকার অনধিকারের বেড়া তুলুক—যে-কোনও পুরুষের চোখে মেয়েমানুষ আসলে ভোগের বস্তু। তারতম্য থেকে যায় ব্যবহারে, এই যা। বিয়ের পরেও একদিন সিনেমার পর্দায় এক সুন্দরী অভিনেত্রীকে দেখে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল তার, মনে পড়ে—ভোররাতের স্বপ্নে অদ্ভুত অবারিত হয়ে হানা দিয়েছিল যুবতীটি; ঘটনাটা ভাবলে এখনও অস্বস্তিবোধ করে হিমাদ্রি। অথচ সে চরিত্রবান এবং ন্যায়-অন্যায়-নীতিতে বিশ্বাসী। এসব দিয়েও অন্ধকারটা চাপা দিতে পারেনি। সংসারে তার চেয়ে খারাপ লোক নিশ্চয়ই আছে এবং তাদের কেউ কেউ জয়ার ছবির দিকে তাকিয়ে আছে, ভাবছে সাত-পাঁচ, এরকম সম্ভাবনার কথা চিন্তা করলে অধিকারবোধটা চাগিয়ে ওঠে। এসব কথা কাউকে বলা যায় না; এমন কী জয়াকেও না। সরল, সাদামাটা মানুষ সে, অন্য কিছু ভেবে নেবে। তা ছাড়া, সাদা চোখের দেখায় যা নেই তা খুঁচিয়ে তুলে লাভ কী।

তবু, প্রয়োজনই বদলে দেয় মানুষকে। নিজের তৈরি দেয়াল টপকানোর জন্যে নিজেকেই কাঁধে করে বয়ে আনতে হয় সিঁড়ি। মন যে কী ব্যাপার তা ভাবতে গিয়ে রহস্যে ধাঁধিয়ে যায় মাথা।

কয়েকদিনের মধ্যে আবাহন কো-অপারেটিভের চিঠিটা আসবার পর ওলটপালট হয়ে গেল সব। হিমাদ্রির আবেদন সহৃদয়তার সঙ্গে বিচার করেও বকেয়া কিস্তির টাকা শোধ দেবার আগে ফ্ল্যাটের পজেসন দেবার ব্যাপারে সম্মত হতে পারেনি ওরা। শুধু তার ব্যাপারে রাজি হলে একটা দৃষ্টান্তের সৃষ্টি হবে, ফলে এরকম অন্যান্য কেসগুলিকেও রেয়াত করতে হবে তাদের। তাতে কো-অপারেটিভের আর্থিক কাঠামো ও বাড়ি তৈরির পূর্ব-নির্দিষ্ট পরিকল্পনা ভেঙে পড়বে। সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করে হিমাদ্রি যেন চিঠির তারিখের এক মাসের মধ্যে বকেয়া কিস্তির টাকা শোধ করে দেয়।

এ-পর্যন্ত ঠিকই ছিল। খটকা লাগল পরের প্যারাগ্রাফে পৌঁছে। কো-অপারেটিভের সঙ্গে চুক্তি অনুযায়ী বিল্ডারদের প্রাপ্য পুরো টাকা মিটিয়ে দেবার সময় পার হয়ে গেছে—অথচ, যথেষ্ট তাগাদা ও সময় দেওয়া সত্ত্বেও, অনেক মেম্বারই মেম্বারশিপের শর্ত অনুযায়ী ফ্ল্যাটের জন্যে দেয় টাকা শোধ করেননি এখনও। এই অবস্থায় কো-অপারেটিভ বাধ্য হয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে যে, কোনও মেম্বারকেই এই চিঠিতে নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত সময় দেওয়া হবে না। ওই তারিখের মধ্যে যাঁরা টাকা দেবে না, হয় তাঁদের মেম্বারশিপ খারিজ হবে, না হয় অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ফ্ল্যাটের অ্যালোকেসনে হেরফের করা হবে।

ভাষা পরিষ্কার; কিন্তু বয়ানটি গোলমেলে—করাতের ধার নিয়ে সেঁধিয়ে যায় বুকে।

চিঠিটা এসেছিল রেজিস্ট্রি ডাকে, দুপুরে, হিমাদ্রি তখন অফিসে। অ্যাকনলেজমেন্ট স্লিপে সই করে জয়া নিজেই নিয়েছে। পৌঁছয়নি বা ডাকের গোলমালে হাতে পায়নি এমন বলা যাবে না। সাধারণ একটা আবেদন করেছিল হিমাদ্রি; তার উত্তরে রেজিস্ট্রি-করা চিঠি পাঠানোর অর্থ আটঘাট বেঁধে নামা। মত পাল্টানোর ছিটেফোঁটা সুযোগ রাখেনি কোথাও। সহৃদয়তার উল্লেখ থাকলেও ভাষাটা আইনের। অপমানেরও কি নয়!

হিমাদ্রি মূক হয়ে গেল । যা জেনেছিল তার পরে আর একটিও কথা জিজ্ঞেস করল না জয়াকে। অফিস থেকে ফিরে অন্যদিন যা যা করে এবং যেভাবে, আজও তাই করল। তফাত এইটুকু, বাক্যহীন এক অন্যমনস্কতা সারাক্ষণ ঘিরে থাকল তাকে।

চা খেতে খেতে খানিক স্বামীর উদাসীন মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জয়া বলল, 'দ্যাখো, অমন হাত-পা-ছাড়া মুখ করে থেকো না।'

ব্যস্তভাবে হিমাদ্রি বলল, 'কী করতে হবে!'

কথাটা ভেবে বলেনি হিমাদ্রি। ভাবল পরে। জয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে ভিতরের রুক্ষতা ফুটে উঠল চোখেমুখে।

'যেটা সম্ভব নয় তার পিছনে ছুটলে এইরকমই হয়। এখন বোঝো! চিঠি পেতে পেতেই দশদিন চলে গেল । লোকগুলো হারামি। উত্তরটা আগেই তৈরি করে রেখেছিল। তখনই বলে দিলে আরও কিছুদিন সময় পাওয়া যেত!'

কথার ধরনেই বোঝা যায় ক্ষোভটা কতদূর। সাধারণত এমন ভাষায় কথা বলে না হিমাদ্রি। জয়া অন্তত শোনেনি। অবস্থার চাপে কি স্বভাবটাও পালটে যাচ্ছে ওর!

'সময় আর কত দেবে। দোষটা তো আমাদেরই।' জয়া বলল। তারপর হিমাদ্রি কোনও

প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না লক্ষ করে বলল, 'তা বলে ওদের হাতে ফ্ল্যাট তুলে দেব তা তো হয় না।'

'জয়া, প্লিজ!'

'কী আশ্চর্য। তুমি এমন পাগলের মতো করছ কেন? আমি কী বলছি সেটা শুনবে তো!'

চোখ তুলে সরাসরি স্ত্রীর মুখের ওপর রাখল হিমাদ্রি। দৃষ্টিতে যত না কৌতূহল তার চেয়ে বেশি বিস্ময়। জয়াকেই দেখছে। এখনই তার মনে হল, শুরু থেকেই জয়া আজ অন্যরকম—যেন চিঠিটা যে আসবে একই ভাষা ও বয়ান নিয়ে তা ও আগেই জানত। আকস্মিকতার কিছুই স্পর্শ করেনি তাকে।

জয়া আরও একটু সময় নিল। রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে তীক্ষ্ণ হর্ন দিয়ে, শব্দটাকে শেষ পর্যন্ত পেরিয়ে যেতে দিল। মুখ মুছল আঁচল তুলে। তারপর বলল, 'রাগারাগি, মন খারাপ করে লাভ কী। তুমি অবনীদাকে ধরো।'

'তার মানে!'

'কেন, তুমিই বলেছিলে মডেলিং করলে অনেক টাকা। অবনীদা বলেনি?'

'বলেছিল—'

হিমাদ্রি থেমে গেল; এমনকী দায়সারা হবার চেষ্টাতেও এর বেশি এগোতে পারল না। যেখানে থেমেছিল তার পরের নিঃশ্বাসটুকু দলা পাকাচ্ছে গলার কাছে। অভিজ্ঞতাটা আলাদা। এই মুহূর্তে ঠিক কোন অনুভূতি ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে নিজেই বুঝতে পারল না।

'চিঠিটা পড়ার পরই ফোন করতে বেরিয়েছিলাম। লাইন পেলাম না কিছুতেই।' জয়া বলল, 'পেলে তখনই অবনীদাকে কনট্যাক্ট করতে বলতাম তোমাকে।'

হিমাদ্রি শুনছে কি না, কিংবা শুনলেও কতটা, ওর ভাবভঙ্গি দেখে তা স্পষ্ট হয় না। খানিক মেঝের দিকে তাকিয়ে থেকে চোখ তুলে মাথার ওপর ঘূর্ণমান পাখাটা দেখল। কিছু ভাবছে যেন। তারপর বা পায়ের জানুর ওপর ডান পা-টা তুলে বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটতে লাগল। চায়ের কাপে দু-একবার চুমুক দিয়ে সেই যে নামিয়ে রেখেছে তারপর আর ছোঁয়নি। হয়তো ইচ্ছা নেই। হয়তো তাৎক্ষণিক রাগ ও জ্বালা থেকে এখনও মুক্ত করতে পারছে না নিজেকে। কিন্তু, হিমাদ্রি কি বোঝে না, যাদের বিরুদ্ধে তার এই রাগ, জ্বালা, অভিমান, তার সুবিধে-অসুবিধে নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয় তারা!

আরও কিছুটা সময় নিয়ে জয়া বলল, 'অত ভাবনার আছেটা কী!'

'না। কিছু নেই। তুমি আমাকে বললে, আমি অবনীকে বললাম। ব্যস, মিটে গেল আমাদের সমস্যা!'

হিমাদ্রির গলার প্রচ্ছন্ন শ্লেষ কান এড়াল না জয়ার। বলল, 'কেন, টাকা দেবে না!'

'দেবে।' অন্যমনস্কতা থেকে চোখ তুলে সোজাসুজি জয়ার মুখের দিকে তাকাল হিমাদ্রি, 'টাকার ভাবনাটাই মাথায় ঘুরছে তোমার। এ-ব্যাপারে আমারও যে কোনও মতামত থাকতে পারে সেটা একবারও ভাবলে না!'

ঠিক এই কথাগুলির জন্যে প্রস্তুত ছিল না জয়া। আগে নয়, এখনও নয়। সত্যি বলতে, খামের ওপর আবাহন কো-অপারেটিভের ছাপ দেখে চিঠিটা পাবার পর হিমাদ্রির জন্যে অপেক্ষা করার তর সয়নি তার। কী আছে না আছে দেখার জন্যে মুখ ছিঁড়ে সঙ্গে সঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। নিজের জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে চিঠির বক্তব্য বুঝে ফ্ল্যাটের পজেসন পাওয়া

না-পাওয়ার চেয়ে হিমাদ্রি কতখানি অসহায় বোধ করবে না করবে এই ভাবনাটাই চিন্তিত করে তুলেছিল তাকে। একটা উপায় খুঁজে পাবার চেষ্টায় মানুষটা যে রাতদিন টেনশনে ভুগছে সেটা তার চেয়ে ভাল আর কে জানে! এই ভাবনাতেই ইদানীং রাত্রে ঘুম হয় না ভাল, ঘরে মশা না থাকলেও কল্পিত মশার চিন্তায় চাপড় মারে গায়ে, নিজের পাতলা ঘুমের মধ্যে অন্তত দু-তিনবার বাথরুমে ফ্লাশ টানার শব্দ পায় জয়া। চোখের কোণে কালচে ভাবটা এখন আর অস্পষ্ট নয়। এমনকী ওর গায়ে হাত দিলে একরকম তাপও টের পায় জয়া—মনে হয় পাতলা একটা জ্বরের আবরণ সারাক্ষণ গায়ে জড়িয়ে রেখেছে হিমাদ্রি। নিঃশ্বাসে পোড়া তামাকের গন্ধ বুঝিয়ে দেয় সিগারেটটাও বেশি খাচ্ছে আজকাল। কাল রাতে নিজেই একটা কাম্পোজ খেয়ে শুয়েছিল। লক্ষণটা ভাল নয়, তখনই বুঝেছিল জয়া, এর মানে ভিতরে ভিতরে ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে হিমাদ্রি। এই সব দুর্ভাবনাই তাকে ঠেলে দিয়েছিল একটা সিদ্ধান্তের দিকে। আর গয়নায় হাত দেবে না, হাত পাতবে না আত্মীয়-স্বজনের কাছে, অফিসে যে-লোনটা পাবার কথা ছিল সেটারও হদিস নেই কোনও। এদিকে দিন চলে যাচ্ছে। দিশা না-পাওয়া অভাবগ্রস্ত মানুষ আত্মরক্ষার জন্যে সুড়ঙ্গ খুঁড়তে শুরু করে নিজেরই ভিতর—অদৃশ্য সেই পথে ক্রমশ পাচার করার চেষ্টা করে নিজেকে। বিয়ের আগে দীর্ঘদিন বাবাকে দেখে বুঝেছিল ব্যর্থতাবোধ থেকেই ক্রমশ কুঁজো হয়ে পড়ে মানুষ, তখন ভাগ্য বা ওইরকম একটা কিছুরই দোহাই দিয়ে যুদ্ধে নামার আগেই সন্দেহ করতে শুরু করে নিজের শক্তিকে। হিমাদ্রিও কি ক্রমশ সেইরকম হয়ে পড়ছে? প্রশ্নটা মাথায় উঁকি দেবার সঙ্গে সঙ্গে অবনীর প্রস্তাবটা মনে পড়ে গিয়েছিল জয়ার। তখনই ভেবেছিল, টাকাটাই আসল—কোনওরকমে টাকাটা জোগাড় করে কো-অপারেটিভের দেনা মিটিয়ে ফ্ল্যাটে উঠে যেতে পারলে সবই ঠিকঠাক হয়ে যাবে আবার। সিনেমায় নামা কিংবা মডেলিং করার বিষয়ে মনের মধ্যে এই যে না-না ভাব, সত্যি, এটাই বা কেন! সংস্কার? লজ্জা? ফ্ল্যাট না হয়ে—কপালে হাত ঠেকিয়ে ভেবেছিল জয়া, যদি এমন হত যে কঠিন কোনও অসুখ হল হিমাদ্রির আর চিকিৎসার জন্যে দরকার হল এক কাঁড়ি টাকা, তা হলেও কি সে চুপচাপ বসে থাকত সংস্কার আর লজ্জা নিয়ে! ফ্ল্যাটের জন্যে জেদ ধরেছিল সে-ই, তার-ই জেরে ক্রমশ সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে যাচ্ছে হিমাদ্রি। তা হলে দুটো ব্যাপারের মধ্যে তফাত কোথায়!

টুকরো টুকরো এইসব ভাবনা দিয়ে দুপুর থেকে যেভাবে তৈরি করেছিল নিজেকে, তার সঙ্গে এখনকার কথাবার্তার সম্পর্ক নেই কোনও। একটা আশায় নেচেছিল জয়া; হঠাৎ সমাধান খুঁজে পেলে যেরকম হয়—অনুভূতির মধ্যে ঢুকে পড়েছিল পরিচ্ছন্ন বাড়ি ফেরা। ধরেই নিয়েছিল তার সিদ্ধান্তে খুশি হবে হিমাদ্রি। সে আর মডেলিং-এর কী বোঝে। কিংবা ওই সূত্রে যে টাকার সুরাহা হতে পারে, এই ভাবনাটা আসবেই বা কী করে তার মাথায়। অবনী কী বলেছে, না বলেছে সেটা হিমাদ্রিই জানে, তা ছাড়া এই সেদিনও কি ও বলেনি অবনীর সাজেশানটা নিলে ভাল হত। এর মধ্যে, তা হলে, নতুন করে হিমাদ্রির মতামত নেবার প্রশ্নটা আসছে কেন! না কি আজকের রাজি হওয়াটা জয়ার মন থেকে উঠে এসেছে বলেই পৌরুষে ঘা লেগেছে হিমাদ্রির!

এই পর্যন্ত এসে এলোমেলো হয়ে গেল ভাবনাগুলো। চাপ ধরল নিঃশ্বাসে। আর, যে-অনুভূতিটা—হিমাদ্রির সম্পর্কে অন্তত—তার মধ্যে নেই বললেই হয়, অদ্ভুত রাগে কপালের দু পাশে উত্তেজনা শুরু হয়ে গেল জয়ার। হঠাৎই ভাবল, লোকটা স্বার্থপর এবং

গোঁয়ার—স্ত্রীর ওপর জোর খাটিয়ে ব্যাপারটায় রাজি করাতে পারলেই খুশি হত হয়তো, তখন আর মতামতের প্রশ্ন উঠত না।

হিমাদ্রি তখনও চুপচাপ। মাথা নিচু করে অন্যমনস্ক বসার ভঙ্গিতেও পরিবর্তন হয়নি কোনও।

অস্থির বোধ করায় উঠে দাঁড়াল জয়া। চাপা, কিন্তু হিসেবি গলায় বলল, 'তোমার মত না থাকলে হবে না। আমি আর কী বুঝি!'

হিমাদ্রি দেখল জয়া চলে যাচ্ছে, যদিও বুঝতে পারল না ঘটনাটায় এইখানেই ছেদ পড়ল কি না। অদৃশ্য বা অভাবিতের চিন্তায় কখনও বা কাতর হয়ে ওঠে শরীর—অতর্কিতে খুলে যায় জ্বরবাহী শিরার মুখ, উপসর্গ না থাকলেও মনে হয় জ্বর সঙ্গ নিয়েছে। এখনকার অবস্থাটাও সেইরকম—অপ্রার্থিত, কিন্তু সত্য। জয়া চলে যাবার আগে পর্যন্ত সে ভাবতে পারেনি জয়া চলে যাবে। জয়ার প্রতি ক্ষুব্ধ হবার আগে পর্যন্ত সে কি জানত, কারণ থাক না-থাক, এই কথাগুলিই সে বলবে!

একইভাবে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল হিমাদ্রি। চারদিকের শব্দহীনতায় নিজের মধ্যেই দ্বীপ হয়ে উঠতে সময় লাগে না। চারপাশের জল ক্রমশ এগিয়ে আসছে নিজস্ব ভূখণ্ডটুকু গ্রাস করতে। হিমাদ্রি একটা সিগারেট ধরাল এবং দু টান দিয়েই নিবিয়ে ফেলল আবার—অ্যাশট্রে থেকে উঠে আসা ধোঁয়াটা ছড়িয়ে পড়ল নিজের দু চোখে। জয়া থাকা সত্ত্বেও জয়া না থাকলে অবস্থাটা কীরকম হবে এখনই তা অনুভব করতে অসুবিধে হল না কোনও। তা ছাড়া, শারীরিক উপস্থিতিই তো সব নয়—সম্পর্ক বাঁচে সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণার মধ্যে। ধারণাটায় ফাটল ধরলে ক্রমশ নড়বড়ে হয়ে ওঠে টান রাখার খুঁটিগুলো—একটা ধাক্কা এলেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে কাঠামো। বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র উঠে গেলেও বাড়ির অবস্থানের পরিবর্তন হয় না কোনও, তবু সেই বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ালে নিজের বলে মনে হয় না আর। সে তো আর আশ্রয় নয়।

হিমাদ্রি এইভাবেই ভাবল। ফ্ল্যাট তার অধিকার হলেও আশ্রয় হবে না কখনও। জয়াই আশ্রয়। হয়তো—হয়তো কেন, নিশ্চয়ই—সেও জয়ার আশ্রয়। এই ভাবনার পারস্পরিকতা থেকেই পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে ক্লেশের জীবনে ছুটে এসেছিল সে, ক্লেশের জীবন থেকে জয়াকে নিয়ে নিজস্বতায় পৌঁছুবার জন্যে। এইভাবেই কী? যদি তা না হয়, তা হলে অকারণ কেন সে সম্পর্কের মধ্যে সৃষ্টি করে যাচ্ছে টানাপড়েন। মনের দিক থেকে সত্যিই কি অসুস্থ হয়ে পড়ছে সে, কিংবা বিকারগ্রস্ত!

মনঃস্থির করতে সময় লাগল না। অনুতপ্ত ভাবে উঠে দাঁড়াল হিমাদ্রি। জয়ার নৈঃশব্দ্য একা করে রেখেছে চারদিক। অন্ধকার শোবার ঘরে এসে দেখল উপুড় হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে জয়া। শোবার ধরনে হাত-পা-ছাড়া বিভ্রান্তি; এমন কী সাধারণত যে ভব্য, এখন তার ডান পা-টা আলাদা হয়ে বেরিয়ে আছে শাড়ির আড়াল থেকে।

হিমাদ্রি একটু কাশল; নাম ধরে ডাকল তারপরে। জয়া সাড়া দিল না।

'আমি অবনীর বাড়ি যাচ্ছি—', অপেক্ষা করে হিমাদ্রি বলল, 'যাবে না কি সঙ্গে?'

এবারেও কোনও উত্তর দিল না জয়া।

প্রয়োজন থাকলেও আলোটা জ্বালল না হিমাদ্রি। অন্ধকারেই পোশাক বদলাল। তারপর বলল, 'ব্যাপারটায় আমার মনের সায় নেই, জানোই তো! কী করব! নিজে যে কত অক্ষম

নিজেই তা বুঝতে পারছি ক্রমশ—'

নিজের কণ্ঠস্বরের অসংলগ্নতা নিজের কানেই অসহায় শোনাল। একই অসহায়তা টের পেল রাস্তায় বেরিয়ে। এই বয়স পর্যন্ত যতটা এবং যতবার রাস্তায় হেঁটেছে তার বেশিটাই একা-একা। তবু অনুভব করেনি কিছু। এখন সত্যিই একা লাগছে।

৪

কোনও কোনও বোধের ভিতর ধাঁধা থাকে, কিছু বা মজাও; হালকা হয়ে ভাবলে দিল্লির যন্তরমন্তর মনে পড়ে। অফিসের কাজে ট্যুরে বেরিয়ে হঠাৎ-পাওয়া এক ছুটির দিনে দেখে এসেছিল হিমাদ্রি। অনেকদিন আগেকার কথা, তখনও তাদের বিয়ে হয়নি। আজ অবেলায় রবীন সাধুখাঁর স্টুডিয়োর সোফায় বসে কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হিমাদ্রির মনে হল এই একাকিত্বটাও তেমনি—জট পাকিয়ে আছে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের আলাদা আলাদা ও বিভিন্ন বর্ণ, আলাদা বলেই রংগুলো চেনা যায় ঠিক-ঠিক, কিন্তু জটের কারণেই, কোনটা কার নির্ভর, কীভাবে তাদের সম্পূর্ণ আলাদা করে নিয়ে চিনতে পারবে, বোধগম্য হয় না ঠিক। তখনই অস্বস্তিতে ফেলে ধাঁধাটা। অনুভূতি বলে দেয় সম্পূর্ণতা থেকে ক্রমশ টুকরো ও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে সে—নিজের ভিতরে একদা যে ঘন, টান-টান ভাবটা টের পেত এখন আর তা নেই। সেদিন সন্ধ্যায় যা শুরু হয়েছিল, অবনীর সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে একা রাস্তায় টের পেয়েছিল যে-অসহায়তা, এই তিন চার দিনে আবার সব ঠিকঠাক হয়ে গেলেও অনুভূতিটা ফিরে আসছে থেকে-থেকে। ভারী অদ্ভুত লাগে সবকিছু, নিজেরই রহস্যে মাঝে মাঝে এলোমেলো হয়ে পড়ে নিঃশ্বাস। যাকে মনে হত নিজেরই অংশ, সেই জয়াকেই এখন সে স্ত্রী বলে চেনে, নিজেকে তার স্বামী। অন্যমনস্কতার মধ্যে বুঝতে পারে, প্রকৃত অর্থে সে আসলে দুজন—একজন হিমাদ্রি, আর একজন যে জয়ার স্বামী।

জয়াও কি সেইভাবে ভাবে? বুঝতে পারে না হিমাদ্রি। তখন ভাবে, পারলে সেদিনই পারত। এই মন খারাপ-করা বিশ্রী বোধটাও এড়িয়ে যেতে পারত।

এই মুহূর্তের নিঃশ্বাসটা সহ্য করে নিল হিমাদ্রি। সাধুখাঁর আপ্যায়নে ত্রুটি নেই কোনও। বিলিতি সিগারেটের নতুন প্যাকেট খুলে অফার করেছিল একটু আগে, হিমাদ্রি নেয়নি। প্যাকেট ও দেশলাইটা এখনও সামনে পড়ে আছে দেখে এবার একটা সিগারেট বের করে ধরিয়ে নিল। বিষণ্ণতা ভাল নয়—ধোঁয়া টেনে বোঝাবার চেষ্টা করল নিজেকে; আর একটু পরেই হাতে এসে যাবে হাজার দুয়েক টাকা। অর্থাৎ সে যেখানে ছিল তার চেয়ে এগিয়েছে কিছুটা। এখনই জুত হবার সময়।

দু হাত দূরত্বে আর-একটা সোফায় বসে আছে জয়া। গালে হাত রাখার কারণে বালাটা নেমে এসেছে কনুইয়ের দিকে। হিমাদ্রি চিনে নেয়—এই দিনটিরও আগে আর একদিন যেমন চিনেছিল। আপাতত ওর চোখ পুরনো এক বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতায় এমনই নিবিষ্ট যে হিমাদ্রির দৃষ্টিটা লক্ষ করল না। ঠিক যে কিছু পড়ছে তাও নয়। বরং, নিজেকে জুত

করার চেষ্টায় স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে হিমাদ্রি ভাবল, তার পক্ষে অস্বাভাবিক পোশাক ও মেকআপে প্রায় ঘণ্টা দুয়েক স্ন্যাপরুমের উজ্জ্বল আলোয় ক্যামেরার সামনে উনিশ শতকের যুবতীর ভূমিকায় পোজ দিতে দিতে নিজের অজান্তেই যে-পরিবর্তন সৃষ্টি করে নিয়েছিল নিজের মধ্যে, এখনও তার জের কাটিয়ে উঠতে পারেনি জয়া; তাই নিজেকেই পড়ছে। মেকআপ তুলে ফেললেও মুখের রেখা, চুলের ছাঁদ ও সামগ্রিক ভঙ্গিমা এখনও ছুঁয়ে আছে সেই অপরিচিত আদল—যা বেশ কিছুক্ষণের জন্যে হিমাদ্রিকেও করে রেখেছিল অধিকারচ্যুত। তখন অবনী ও অবনীদের আর্ট ডিরেক্টর কানু মুখার্জি ছিল, সাধুখাঁ তো ছিলই। টাকা অধিকার দেয়, টাকাই কেড়ে নেয়—ঘরের এক কোণে নির্দিষ্ট চেয়ারে বসে চুপচাপ সমস্ত ব্যাপারটা লক্ষ করতে করতে এক অনিশ্চিত মানসিকতার মধ্যে কখনও বা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল হিমাদ্রি। দু হাজারের বিনিময়ে এক পুতুল খেলার দর্শক হয়ে থাকার এই যে নিরপেক্ষতা, এটা সে নিজেই কিনেছে। ওদের নির্দেশে জয়া নিজেকে যে-কোনও ভূমিকাতেই নামাক না কেন, আসলে একই সময়ে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তার নিজেরও ভূমিকা। সত্যি বলতে, এই ভূমিকা অর্জনের জন্যেই গত দু তিনদিন এখান থেকে ওখানে ছুটোছুটি করেছে সে—নিজের অফিসে বুড়ি ছুঁই কি না ছুঁই করে ঘোরাঘুরি করেছে অবনীদের অফিসে; জয়াকে নিয়ে কখনও গেছে প্রোফাইল তোলাতে স্টুডিয়োয়, কখনও বা বিজ্ঞাপনের ছবির প্রয়োজন অনুযায়ী পোশাকের মাপজোখ দিয়ে তৈরি হতে।

ফাইনাল টেক-এর জন্যে আজ দুপুরে অবনীদের অফিসের গাড়িতে জয়াকে সঙ্গে নিয়ে সাধুখাঁর স্টুডিয়োয় আসবার সময় অবনী বলল, 'তোদের লাকটা ভাল । ছবি তোলার ব্যাপারে সাধুখাঁ লোকটা জিনিয়াস। আমাদের এই ক্লায়েন্ট ছাড়াও আরও অনেক বড় ক্লায়েন্টের সঙ্গে ওর পার্সোনাল র‍্যাপো আছে। সাধুখাঁ নিজেই সার্টিফাই করেছে এই প্রোডাক্টের জন্যে জয়াই হবে আইডিয়াল মডেল। ওর ফেস-এ আছে রিকোয়ার্ড্ ইনোসেন্স। কাল আমাকে ফোনে বলেছিল, অনেকদিন এমন ভাল মডেল পায়নি—'

জয়া কথা বলছিল না কোনও। ঠায় রাস্তার দিকে মুখ করে বসে আছে চুপচাপ, চোখমুখে উত্তেজনার চেয়ে বেশি শঙ্কা। বস্তুত সেদিন সন্ধ্যা থেকেই জয়া যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে কিছুটা। ফ্ল্যাটের জন্যে তাড়াতাড়ি টাকা জোগাড় করার ব্যাপারে যতই ব্যস্ত হয়ে উঠুক, হয়তো এই টানাপড়েনটা কল্পনা করতে পারেনি। অভিজ্ঞতাটাও। শঙ্কা সেইজন্যেই।

অবনী কথা শেষ করার পর জয়ার দিকে তাকিয়ে একটু সময় নিল হিমাদ্রি, নিজের ভাবনাটাকেও পরীক্ষা করে নিল। তারপর অনিচ্ছুক ভাবে বলল, 'ফ্র্যাঙ্কলি, টাকা হঠাৎ দরকার হয়ে পড়ল বলেই রাজি হল জয়া। ওর একেবারেই ইচ্ছে ছিল না।'

'তুই এ কথাটা বার বার বলছিস কেন! আমি তো জানিই—।' অবনী বলল, 'শিক্ষিত, বড় ফ্যামিলির মেয়েরা এখন মডেলিং-এর চান্স পাবার জন্যে লাইন দিয়ে পড়ে থাকে। গ্ল্যামারের কথা বাদ দিলাম, টাকাটা কে ইগনোর করতে পারবে!'

মনের সায় না থাকায় চুপ করে থাকল হিমাদ্রি। অন্য সময় হলে তর্ক করত; বলতে পারত তারা সাধারণ, খুবই সাধারণ—গ্ল্যামার বা টাকা, দুটোর কোনওটাতেই মোহ নেই কোনও। আসল কথা প্রয়োজন, যা ক্রমশই তাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে অভাবের দিকে। আজকের এই যাওয়াটাতেও দৈন্য ছাড়া আর কিছু নেই। তবু, ইচ্ছা করেই এড়িয়ে গেল কথাগুলো। অবনী অনেকদিনের বন্ধু, চেষ্টাও করেছে। সত্যি বলতে, ও না থাকলে আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা

পাবার আশা ছিল না কোনও। ওরই পরামর্শে সেদিন কানু মুখার্জির সঙ্গে দেখার করার পর ভদ্রলোক বলেই দিয়েছিলেন, একটু দেরি করে ফেলেছেন—পরের বার দেখা যাবে। তারপর অবনী যে কোথা থেকে কী করল হিমাদ্রি নিজেও জানে না। মাসখানেকের মধ্যেই আরও কয়েকটা অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া যেতে পারে, বলেছিল, সাধুখাঁর প্যানেলে একবার এনলিস্টেড হতে পারলে আর কোনও চিন্তা থাকে না।

'কাকে সরিয়ে জয়া এই ক্যাম্পেনটার জন্যে সিলেক্টেড হল জানিস।" ওরা চুপ করে আছে দেখে অবনী বলল, 'জাস্টিস দত্তের মেয়ে। গতবার মিস ক্যালকাটায় রানার্স আপ হয়েছিল—'

হিমাদ্রির জগৎ আলাদা, এসব নাম আগে শোনেনি। সে শোনেনি বলেই জয়াও শোনেনি, অবনীর কথাবার্তা থেকে আরও বেশি চুপ করে থাকার একটা উপসর্গ পেয়ে যায় সে।

পূর্বাপর ভাবতে গেলে হঠাৎই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে স্মৃতি। প্রত্যেক ঘটনার পিছনেই থাকে ইতিহাস, হয়তো ভাগ্যও। দুইয়ের টানাপড়েনে সৃষ্টি হয় আর কোনও অভিজ্ঞতা। বিয়ের আগে কি হিমাদ্রি জানত জয়ার সঙ্গেই বিয়ে হবে তার? কিন্তু জয়ার সঙ্গেই বিয়ে হবার পর জীবন যে বদলে গেল, কিছুই আর থাকল না আগের মতো, এটা সে অস্বীকার করবে কী করে? তেমনি সেদিন সন্ধ্যায় জয়া যখন অবনীর সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলল, হঠাৎই মঞ্চে আবির্ভূত এইসব চরিত্র—বিশেষত সাধুখাঁ, তখন কোথাও ছিল না। তখন কে ভেবেছিল, আজ, এই মুহূর্তে, সত্যি সত্যিই সে আর জয়া বসে থাকবে রবীন সাধুখাঁর স্টুডিয়োয়—তারও আগে ক্যামেরার রহস্যময় অন্ধকারে বন্দি হয়ে যাবে জয়া। ঠিক জানে না কবে, তবে খুব তাড়াতাড়ি একদিন খবরের কাগজে কিংবা ম্যাগাজিনের পাতা খুলে জয়াকে দেখতে দেখতে কোন অনুভূতি সঞ্চারিত হবে তার শরীরে—নিশ্চয়ই বিয়ের পর যা হয়েছিল তা নয়! তখন জীবন আরও একটু বদলে যাবে না তো।

ফিটফাট পোশাকের একটি বেয়ারা এসে দু কাপ চা দিয়ে গেল টেবিলে। সঙ্গে বাহারে ট্রে-তে কিছু বিস্কিট। যাবার আগে হিমাদ্রির সামনে কাচের জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে গেল দু দিকে, যাতে ঘরটা কিছু আলোকিত হয়। কিন্তু, লক্ষ করল হিমাদ্রি, বাইরে আকাশে মেঘ করে থাকার জন্যেই ঘরের আলোয় সামান্য হেরফের হওয়া ছাড়া তারতম্য ঘটল না কিছু। ব্যস্তভাবে ঘড়ি দেখল সে। প্রায় পাঁচটা বাজে। তার মানে অবনীরা চলে যাবার পরেও কেটে গেছে মিনিট পনেরো কুড়ি সময়।

'আর কতক্ষণ থাকতে হবে এখানে?'

হাতের ম্যাগাজিনটা পাশের টেবিলে রাখতে রাখতে হাই তুলল জয়া; বেশ কিছুক্ষণের মধ্যে এই প্রথম কথা ফুটল ওর মুখে।

'আর তো দেরি হওয়ার কথা নয়—' নিজের প্রয়োজনে চায়ের কাপটা তুলতে যাচ্ছিল হিমাদ্রি, ঈষৎ দ্বিধান্বিত ভাবে থেমে গিয়ে জয়াকে বলল, 'হাই উঠছে। চা-টা খেয়ে নাও। ভাল লাগবে।'

নিঃশব্দে চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিল জয়া। চুমুক দিয়ে, কাপটা আবার নামিয়ে রাখতে রাখতে এমন চোখে তাকাল হিমাদ্রির দিকে যার মধ্যে একই সঙ্গে ফুটে উঠল অস্বস্তি ও বিরক্তি। কিংবা, হিমাদ্রি ভাবল, তার দেখার ভুলও হতে পারে। ঘটনাটা যেদিকেই নিয়ে যাক তাদের, এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে আগাগোড়া সমস্ত ধকলটাই গেছে জয়ার ওপর

দিয়ে। প্রায় হাজার ওয়াট কিংবা তারও বেশি আলোর সামনে চোখ খুলে ওদের নির্দেশ মতো একটার পর একটা ভঙ্গি ফুটিয়ে তোলার মধ্যে পরিশ্রম কম নেই, তার সঙ্গে নিশ্চয়ই যুক্ত হয়েছিল অস্বস্তি ও অপরিচয়। বস্তুত, শুধু বসে থাকতে থাকতেই কাহিল লাগছিল তার, সারাক্ষণ। মনে হচ্ছিল আর কতক্ষণ। জয়ার বাহাদুরি আছে—মনের জোরও, একবারও অস্বস্তি বা বিরক্তি দেখায়নি। বরং এমন স্বাভাবিক ভাবে সমস্ত ব্যাপারটা করে গেল যাতে যে-কারুরই মনে হবে কাজটার মধ্যে টেনশন নেই কোনও। ক্লান্তিটা চোখে পড়ছে এখনই। ওকে দেখতে দেখতে একটা মায়া উঠে এল হিমাদ্রির বুকে। প্রয়োজনই বদলে দেয় মানুষকে, সে কি ভেবেছিল?

'খুব ক্লান্ত লাগছে?'

'মাথাটা ধরে গেছে—', দু আঙুল ছড়িয়ে কপালের দু পাশে টিপে ধরল জয়া। ওরই মধ্যে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বাব্বা, কী আলো! যেন ভেতর পর্যন্ত চলে যায়!'

হিমাদ্রি হাসল। চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'ছবি বেরুলে চিনতে পারবে না নিজেকে—'

'তুমি তো দেখেছ!' জয়া সহজ হয়ে আসছে ক্রমশ। গলায় কৌতূহল। বলল, 'মানিয়েছিল আমাকে?'

'না মানালে ওরা সিলেক্ট করত না তোমাকে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল জয়া। দেয়ালে ফ্রেমে বাঁধানো সাইকাডেলিক ধরনে ন্যুডের ছবি, খুব মনোযোগ দিয়ে তাকালেই আকৃতিটা ধরা পড়ে। জয়ার চোখ সেইদিকে, তবে ছবিটাই দেখছে কি না বোঝা যায় না। দেয়াল পেরিয়েও দৃষ্টি যেতে পারে আরও অন্যত্র।

সাধুখাঁর স্টুডিয়ো জমাটি কম নয়। হিমাদ্রি নিজেও দেখছে। বাইরে থেকে অতটা বোঝা যায় না; কিন্তু নো অ্যাডমিশনের পর্দা সরিয়ে একবার ভিতরে ঢুকলেই ধাঁধিয়ে যায় চোখ। ফুলের টব সাজানো করিডোর; স্ন্যাপরুম, ডার্করুম, হালকা সবুজ টাইল-মারা টয়লেট। যেদিকটায় যাওয়া হয়নি, 'প্রাইভেট' লেখা সেদিকটায় হয়তো আছে আরও অনেক বাহার। হিমাদ্রি জানে না। শুধু রহস্যটা টানে।

জয়া বলল, 'অবনীদার কথাটা কি সত্যি?'

'কী?'

'ওই যে বলছিল, এ-মাসেই আরও ছবি তুলতে পারে?'

প্রশ্নটা আশা করেনি হিমাদ্রি। অল্প ভেবে বলল, 'কী করে বলব!'

'হলে ভাল হত।' জয়া বলল, 'তা হলে আমাদের সব টাকাটাই উঠে আসত।'

হিমাদ্রি জবাব দিল না। উত্তরটা জানা নেই বলে নয়, উপায়ের ভাবনাটা জয়া নিজেই ভাবতে চাইছে বলে। অবশ্য কথাটা সে নিজেও যে এরই মধ্যে ভাবেনি তা নয়। মনের সায় না থাকলেও, হিসেবটা এসেই যাচ্ছে। এসকালেসানের টাকাটা নতুন। মনে হয় কিস্তির আট হাজার টাকা দিয়ে দিতে পারলেই পজেসন ছেড়ে দেবে কো-অপারেটিভ।

বর্ষাকাল নয়, তবু দু দিন থেকে বৃষ্টি হচ্ছে প্রায়ই। কিংবা যখন বৃষ্টি নেই তখনও মেঘলা হয়ে থাকে আকাশ। এরকম আবহাওয়ায় বড় কুণ্ঠিত লাগে নিজেকে। এই মুহূর্তে কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল আচ্ছন্ন নীল ঘোলাটে হয়ে উঠছে ক্রমশ, তারপর কালো। কাঁচের গায়ে পর পর ছিটকে আসা কয়েকটা জলের বিন্দু দেখে বুঝল বৃষ্টিও

নামছে। দৃশ্যটা ম্লান করে দিল তাকে, কিছুটা চিন্তিতও। অফিস ছুটির সময় হয়ে এল। অসময়ে বৃষ্টির দরুন সকলেরই তাড়া থাকবে বাড়ি ফেরার। কপাল জোরে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেলে ভাল, না হলে জয়াকে সঙ্গে নিয়ে এই বৃষ্টির মধ্যে থিয়েটার রোড থেকে বাড়ি ফেরা সত্যিই মুশকিল হবে।

টেক হয়ে যাবার পর স্ন্যাপরুম থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে অদৃশ্য হয়েছিল সাধুখাঁ। ফিরে এসে জিজ্ঞেস করল, 'চেকটা কার নামে হবে?'

দেরির জন্যে চিন্তিত হিমাদ্রি চা-টা শেষ করছিল তখন। চট করে উত্তর জোগাল না মুখে। ওদিকে জয়া। সাধুখাঁর সামনে বিব্রত বোধ করার জন্যেই সম্ভবত ম্যাগাজিনটা তুলে নিয়েছে হাতে, এমনও হতে পারে সাধুখাঁ পৌঁছুনোর আগেই ম্যাগাজিনটা আবার হাতে তুলে নিয়েছিল সে, অন্যমনস্কতার জন্যে লক্ষ করেনি হিমাদ্রি। সাধুখাঁকে নয়, স্ত্রীকে লক্ষ করতে করতে সাধুখাঁর প্রশ্নটা ভেবে সামান্য দ্বিধায় পড়ল হিমাদ্রি, এবং শেষ পর্যন্ত ভাবল, প্রয়োজনটা তার বা তাদের হলেও রোজগার জয়ার। পরিবর্তে বিক্রি করেছে সুন্দর মুখশ্রী এবং চমৎকার স্বাস্থ্য, যেটাকে বলা হচ্ছে ফিগাব। অবনীও এইভাবেই বলেছিল। তখন বুঝতে পারেনি টাকার অঙ্কে কোনও দিন এ-সবের দাম পাওয়া যাবে।

খতিয়ে ভাবতে গেলে বিমর্ষ লাগে; কিছুটা দিশেহারাও। পাঁচ বছরের বেশিদিন ধরে যে সব ব্যাপার নিয়ে আলাদা করে ভাবতে হয়নি কিছু, আজ সেগুলোই হয়ে উঠছে ভাবনার বিষয়। উঠছে অধিকার অনধিকারের প্রশ্ন। তা না হলে চেকটা কার নাম হবে না হবে, সত্যি, এটা কি কোনও প্রশ্ন! না কি সাধুখাঁ নিজেও জানে, রোজগার যার প্রাপ্য টাকায় অধিকারটাও তারই; নিতান্তই জয়ার স্বামী বলে পরিচিত হিমাদ্রি রায় লোকটি সামনে ও সঙ্গে আছে বলেই প্রশ্নটা তুলল!

জয়ার ব্যবহারে পার্থক্য নেই কোনও। যেভাবে বসেছিল, আলগা অথচ আড়ষ্ট, সেইভাবেই থাকল, এমনকী সামান্য একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হিমাদ্রি যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নিচ্ছে, সেটাও লক্ষ করল না।

হিমাদ্রি সাধুখাঁর দিকে তাকাল এবং দেখল, স্পষ্ট চোখে না হোক, সাধুখাঁ জয়াকেই দেখছে। উত্তরটা জানারও তাড়া নেই। তখন বলল, 'আমার স্ত্রীর নামেই হবে।'

'ও।' সাধুখাঁ জিজ্ঞেস করল, 'মিসেস রায়, আপনার নামটা যেন কী?'

'কেন, আমার নামে কেন!' অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম ঘটনায় ফিরে এল জয়া। কিছু বা অবাক চোখে হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমার নামেই তো—'

'ওর নাম জয়া। জয়া রায়।' জয়ার কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না হিমাদ্রি; নিশ্চিত জানে সে যেভাবে ভাবছে জয়া সেভাবে ভাবছে না। তাতে কিছু যায় আসে না। সাধুখাঁ তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে দৃঢ় গলায় বলল , 'ওর নামেই লিখুন—'

সাধুখাঁ চলে গেল সেই প্রাইভেট মার্কা দরজা দিয়ে। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। মধ্যবর্তী সময়ের অস্বস্তিটুকু কাটানোর জন্যে ইচ্ছাকৃত অন্যমনস্কতায় বাইরে তাকিয়ে থাকল হিমাদ্রি। বসে থাকার কারণ মাথার ওপরের উচ্চতায় বসানো জানলা দিয়ে রাস্তা চোখে না পড়লেও চাপা ও এলোমেলো নানা শব্দে অনুমান করল জ্যাম শুরু হয়ে গেছে রাস্তায়। বৃষ্টিটাও ঝেঁপে এল এই সময়।

চেকটা হাতে নিয়ে আলগোছে একবার চোখ বুলিয়ে নিল হিমাদ্রি। এ-ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত

'থ্যাঙ্ক ইউ' বলতে হয় বলেই বলা; কিন্তু, সেটাই যথেষ্ট কি না বুঝতে না পেরে দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল, 'অনেক উপকার করলেন—'

'উপকার আমি কোথায় করলাম!' এমনিতে গম্ভীর সাধুখাঁ হাসল অল্প, আড়চোখে একবার জয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, 'দিস ইজ আর্নড্।'

'তা হলেও—', হিমাদ্রি কথাটা শেষ করতে পারল না।

'ইফ্ ইউ ডোন্ট মাইন্ড—', তখনও হাতে-ধরা টাইপ-করা কাগজ দুটো হিমাদ্রির দিকে বাড়িয়ে দিল সাধুখাঁ, 'এই কন্ট্র্যাক্ট দুটোয় একটু সই করে দেবেন—'

'কন্ট্র্যাক্ট!'

হিমাদ্রিকে সামান্য অবাক হতে দেখে সাধুখাঁ বলল, 'কেন, এজেন্সি কিছু বলেনি আপনাকে? মডেলের কনসেন্ট না থাকলে তো ছবি ব্যবহার করতে পারব না আমরা।'

'ও, আচ্ছা—।' অবনী যাবার আগে বলেছিল পেপার সই করে চেকটা নিয়ে যেতে, হিমাদ্রির মনে পড়ল হঠাৎ, শুধু চেক-এর কথাটাই মাথায় ছিল। বিব্রত ভঙ্গিতে বলল, 'কোথায় সই করতে হবে, বলুন?'

দু পৃষ্ঠাব্যাপী টাইপ-করা দুটি কাগজের দ্বিতীয় পৃষ্ঠার তলায় দুটো জায়গা দেখিয়ে দিয়ে সাধুখাঁ বলল, 'এটা মিসেস রায়ের, এটা আপনার। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, পড়ে নিন ভাল করে। কোথাও কনফিউসন থাকলে জেনে নেবেন—'

'কনফিউসন থাকবে কেন!' পকেট থেকে ডট পেন বের করে জয়াকে জায়গাটা দেখিয়ে দিল হিমাদ্রি, 'তুমি আগে করো—'

জয়ার হাত কাঁপছে; কাগজের ওপর পেন ছুঁইয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাংলায়?'

'যাতে আপনার ইচ্ছে।' সাধুখাঁ বলল, 'এগুলো ফর্মালিটি। বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যাবার পর যদি আপনি মামলা করেন, তা হলেই কাজে লাগবে আমাদের। তা না হলে এর কোনও ভ্যালু নেই।'

সাধুখাঁর কথায় এতক্ষণ ধরে দেখা গাম্ভীর্যের ভাবটা নেই; ঠোঁটের কোনায় অল্প হাসিও দেখা গেল এতক্ষণ। না হলে লোকটিকে পুরোপুরি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী ভাবা যেত। কার্যকারণের সম্পর্ক নেই কোনও, তবু সাধুখাঁকে খোলামেলা হতে দেখে নিজেও কিছুটা হালকা বোধ করল হিমাদ্রি। যে সব চিন্তায় নিজেকে বিব্রত রেখেছিল এতক্ষণ তার মধ্যে আগে এবং পরের ধারাবাহিকতা ছিল না কোনও; সেগুলি থাকলেও এই মুহূর্তের স্বাচ্ছন্দ্যে তফাত ঘটাল না। নিজের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গায় সই করতে করতে হিমাদ্রি বলল, 'মামলাও হয় না কি?'

'হয় না। হলেও টেকে না।' কন্ট্র্যাক্টের দুটো কাগজই হিমাদ্রির হাত থেকে ফেরত নিয়ে সাধুখাঁ বলল, 'এই ধরুন মিসেস রায়ের যে-ছবিগুলো তোলা হল—ছবি দেখেই কোর্ট বুঝতে পারবে এগুলো অ্যারেঞ্জড ফোটোগ্রাফি—মডেলের কনসেন্ট ছাড়া তোলা সম্ভব নয়। কিন্তু কোর্ট কোর্টই, একবার সেখান পর্যন্ত গেলে পুরো ব্যাপারটা এসটাব্লিশ্ করা ঝামেলার হয়ে দাঁড়ায়।'

সাধুখাঁ এমন জায়গায় শেষ করল যেখান থেকে আর এগোনো যায় না। তখন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া ভঙ্গি থাকে না কোনও। সন্দেহ করতে হয় কথাগুলোকে; আবছা ভাবে মনে হয় কন্ট্র্যাক্ট ব্যাপারটার সঙ্গে আইন জড়িত—এ-ক্ষেত্রে সাধুখাঁর তরফে কোনও

আপত্তি না থাকলেও চোখ বুজে সই করার আগে সে হয়তো পুরো বয়ানটা পড়ে দেখতে পারত একবার। না কি সন্দেহটা আসছে তার মনের দোষে? সাধুখাঁ পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই কি অবনীর অফিসের কাছে জয়ার সই করা ফর্মাল অ্যাপ্লিকেশন দিতে হয়নি তাকে। চিঠিটা অবনীই টাইপ করে এনেছিল। তখন কোনও ভাবনা না এলে এখনই বা ভাবছে কেন!

হিমাদ্রি বৃষ্টি দেখে। তারপর জয়াকে। ক্লান্তিটা ওরই। জয়াকে আবার হাই তুলতে দেখে মনে হয়, যে-সারল্যে ও কোন ভাষায় সই করবে জিজ্ঞেস করেছিল, সেই একই সারল্য ও ক্লান্তিতে মুহ্যমান তার এখনকার মানসিকতা হিমাদ্রি কিংবা সাধুখাঁর কথাবার্তার কিছুই গ্রহণ করেনি। হাই আড়াল করার জন্যে ঠোঁটের ওপর হাত চাপা দিয়েছিল, আর কেউ কিছু বলছে না শুনে উঠে দাঁড়াল।

'আমরা কি যাব এবার?'

'হ্যাঁ—'

বৃষ্টির জলে ধুয়ে যাচ্ছে জানলার কাচ। অস্পষ্টতার ভিতর দিয়ে নিজেকে দেখার চেষ্টায় ফেরার ভাবনাটা আবার ঘিরে ধরল হিমাদ্রিকে। এখনই তার মনে হল, যে-লোকটির সঙ্গে কথা বলছে এতক্ষণ, বস্তুত সে সম্পর্কিত নয়—কিংবা, সম্পর্ক যেটুকু ছিল তা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। হয়তো সাধুখাঁও ভাবছে একই ভাবে। চোখ দুটো নামানো মেঝের কার্পেটের দিকে; দাঁড়ানোর ধরনেও চাঞ্চল্য নেই কোনও। ভঙ্গিটা চেনা—স্যাপরুমে ক্যামেরার পিছনে দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে যেমন ক্যামেরারই অংশ বলে মনে হচ্ছিল, কিংবা, যেভাবে, কোনও ভূমিকা ছাড়াই, ক্যামেরার পিছন থেকে সরে এসে জয়ার গাল কিংবা থুতনি ধরে দেখিয়ে দিচ্ছিল বসবার ভঙ্গিটা ঠিক কীরকম হবে। তখন মনে হয়েছিল অধিকার ব্যাপারটা যত ভারী, ঠিক গভীর নয় ততটা। চিন্তাটা এলেও, পাশ কাটাবার চেষ্টায় হিমাদ্রি ভাবল, এই বৃষ্টির মধ্যে কীভাবে ফিরবে না ফিরবে সেটা পরের কথা। আপাতত এখান থেকে বেরুনো দরকার।

'চলো।' হিমাদ্রি তাড়া দিল এবার, 'আচ্ছা, মিস্টার সাধুখাঁ—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

নো অ্যাডমিশনের আড়াল পেরিয়ে বাইরে এসে অবস্থাটা বোঝা গেল। বৃষ্টিতে জোর নেই তেমন, তবু বেরুলেই ভিজবে। ট্রাফিকের জট খুলে একই সময়ে কয়েকটা গাড়ি পারাপার করবার পর প্রায় ফাঁকা হয়ে এল রাস্তা—গাড়ি ও রিকশা ছাড়া পায়ে হাঁটা মানুষ নেই বললেই হয়। ছোট ছাতার নীচে জড়াজড়ি করে রাস্তা পার হচ্ছে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রৌঢ়া ও যুবতী—স্কার্ট পরা বলেই হাঁটু পর্যন্ত ভেজা পাগুলো চোখে পড়ে। হিমাদ্রি লক্ষ করল যুবতীটি গর্ভবতী; জলের ঝাপটায় পোশাক লেপটে বিশাল উদরটিকে স্পষ্ট করে তুলেছে আরও। আগে আগে তারা ছেলেপুলে হবার কথা বলত, ইদানীং বলে না—অনেক দিন হয়ে গেল ফ্ল্যাটের ভাবনাই ঘন হচ্ছে তাদের রক্তে। জয়াও কি তাই-ই ভাবে? বুক পকেটে রাখা ভাঁজ-করা চেকটা হাত দিয়ে অনুভব করতে করতে হিমাদ্রি ভাবল, নিজের পকেটে না রেখে জয়ার পরিশ্রমের দামটা সে জয়ার হাতেই তুলে দিতে পারত কি না। বেমানান হত? এই যে ব্যাপারটা হয়ে গেল, সে তো আর জয়া তার স্ত্রী বলেই নয়।

স্টুডিয়োর বাইরে কাচের দরজা ঘেঁষে দু-তিনজন দাঁড়িয়ে। মাথার ওপরে যেটুকু আচ্ছাদন তাকে আড়াল বলা যায় না, বৃষ্টির ঝাপটায় সিঁটিয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বৃষ্টিটা

আরও কিছুক্ষণ চললে পুরোপুরি ভিজে যাবে, তখন এই আশ্রয়টুকুরও মানে থাকবে না কোনও। অথচ দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকার কথা ভাবেনি। কম করেও—নিজেদের চারপাশের জায়গাটা পরিমাপ করে দেখল হিমাদ্রি—সেখানে জন পনেরোর দাঁড়াবার জায়গা হতে পারে। কাউন্টারে বসে-থাকা রোগা ও ফর্সা চেহারার ছেলেটিও নির্বিকার—মুখে বৈচিত্র্য নেই কোনও, কাচের দরজাটার মতোই স্বচ্ছ ও নিরেট, ওই মুখ কাউকে আশ্রয়দানের কথা ভাবে না। হঠাৎ আবির্ভূত ভাবনায় অস্বস্তি বোধ করল হিমাদ্রি। খানিক আগে খেই-হারানো চিন্তার সূত্রটাই ফিরে এল আবার; শুধুই কাচ না হয়ে আয়না হলে এই মুহূর্তে নিজের অক্ষমতাটাকে তার চেয়ে বেশি আর কেউই চিনত না। তবু, রক্তই ঠেলে দিচ্ছে চেনার দিকে। কিছুটা অধৈর্য ভঙ্গিতে বাইরে তাকিয়ে দেখতে পেল অনেকটা দূরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ট্যাক্সি। বৃষ্টির জালের আচ্ছন্নতার কারণে খালি কি না বোঝা যায় না।

নিঃশ্বাসের ভারটা বুক থেকে নামিয়ে দিল হিমাদ্রি। জয়ার ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এইখানেই দাঁড়াই একটু। জোর কমে আসছে। হয়তো থেমে যাবে এক্ষুনি।'

শুধুই ক্লান্ত নয়; জয়া অন্যমনস্কও। জবাব দিল না।

এগিয়ে দিতে এসে সাধুখাঁও থেমে দাঁড়িয়েছিল। দরজা টেনে দু দিকে রাস্তাটা দেখে নিল একবার; আকাশটাও দেখল।

'কোনদিকে যাবেন?'

'বাড়ি।'

'মানে, সেই লেক রোড?'

হিমাদ্রি মাথা নাড়ল, সাধুখাঁ কী বলতে চায় আঁচ করবার চেষ্টা করল একটু।

'লেক মার্কেটের কাছাকাছি। একটা ট্যাক্সি পেলে অবশ্য—'

'ট্যাক্সি! এই সময়!' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে কিছু ভাবল সাধুখাঁ।

টেলিফোনের শব্দ। রিসিভার তুলে কাউন্টারের ছেলেটি 'হ্যালো' বলল; তারপর 'হোল্ড অন' বলে ইশারা করল সাধুখাঁকে। তার ও জয়ার মাঝখান দিয়ে টেলিফোন ধরতে এগিয়ে গেল সাধুখাঁ। যারা বাইরে দাঁড়িয়েছিল, মাথায় রুমাল বিছিয়ে তাদের একজন নেমে পড়ল রাস্তায়।

'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে! চলো না, আস্তে আস্তে এগোই?'

'এই বৃষ্টিতে!'

'না হয় ভিজব একটু। বাড়িই তো যাব!'

জয়া এমন ভাবে উচ্চারণ করল কথাগুলো যেন বৃষ্টিতে ভেজা দরকার ছিল তাদের, হিমাদ্রিই বাধা। ওর মুখের হতাশার ভাবটুকু চোখ এড়াল না হিমাদ্রির। কিছু বলবে না ভেবেও বলল, 'দ্যাখোই না একটু!'

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দে দুজনেই চুপচাপ হয়ে গেল আবার। একই সঙ্গে দুজনেই তাকাল সাধুখাঁর দিকে।

'তা হলে অপেক্ষা করুন মিনিট পাঁচেক। ন্যাগিং রেন, ইমিডিয়েটলি থামবে বলে মনে হয় না।' সাধুখাঁ বলল, 'আমি আলিপুরের দিকে যাব। আপনাদের লিফট দিতে পারি—'

'অসুবিধে হবে না?'

'ইটস মাই প্লেজার—'

সাধুখাঁ অপেক্ষা করল না। কথাগুলো বলতে বলতেই নো অ্যাডমিশনের দরজা ঠেলে আবার ঢুকে গেল ভিতরে।

কাউন্টারের ছেলেটির মুখে ভাব ফোটে না কোনও। দু হাতের তালুর মধ্যে মুখটা রেখে সমানে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। ঠিক এই সময় কোথাও-কিছু-নেই-এর মধ্যে আকাশ চিরে ছুটে গেল বিদ্যুৎ, সঙ্গে তুমুল মেঘের গর্জন। হঠাৎ আলোর বিচ্ছুরণের কিছুটা ওদেরও ছুঁয়ে গেল।

বুকের ওপর শাড়ির আঁচলটা বিছিয়ে নিয়ে জয়া বলল, 'এই বললে অপেক্ষা করবে! আবার লিফট নিতে রাজি হলে কেন!'

কথাটা অদ্ভুত লাগল কানে। অনুযোগ না অনিচ্ছা ঠিক বুঝতে পারল না হিমাদ্রি। দোটানায় পড়ে অনিশ্চিত গলায় বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। যে উপকার করে তাকে চট করে না বলা যায় না—'

৫

অসময়ের বর্ষা; যেমন এসেছিল তেমনি চলেও গেল তাড়াতাড়ি। চৈত্রের শেষে যেমন হয়, কিংবা বৈশাখের গোড়ায়। তারপর হঠাৎই একদিন লাবণ্যে ভরে উঠল চারদিক।

আবাহন কো-অপারেটিভের ছিয়ানব্বইটি ফ্ল্যাটের মধ্যে এখন প্রায় ষাটটিতেই আলো জ্বলে সন্ধ্যায়। নিয়মিত ভাবে বেড়ে যাচ্ছে সংখ্যাটা। চেহারা ও চরিত্রে অনেক বদলে গেছে পাড়াটা। বদলে যাচ্ছে। আশপাশে গড়ে উঠছে দোকানপাট। স্টেশনারি দোকান ছিলই একটা, সেটা বড় হল আরও। নতুন সাইনবোর্ডের ওপর শুধু যে নিয়নই জ্বলল তা নয়— দামি ও শৌখিন যে সব জিনিস এদিকটায় চলত না তেমন, সেই সব জিনিসে ভরে উঠল দোকানের নতুন রং-করা শেলফ। এখন চাইলে এমন কী ছবি রাখার অ্যালবাম, গ্রিটিংস কার্ড কি গ্যাস লাইটারও পাওয়া যাবে। কাছেই একতলা যে ছাদটা না হয়ে পড়ে ছিল অনেক দিন, রাতারাতি শেষ হয়ে গেল সেটা। সেখানে বসল ওষুধ আর মুদির দোকান। কয়েক দিনের মধ্যে একটা মিষ্টির দোকানও খুলে গেল সেখানে। সন্দেশ, রসগোল্লার সাইজ বড়, দামও বেশি। এখানে ফুটপাথ নেই, তবু রাস্তার ধারেই ভোর ভোর বসে যায় কাঁচা তরকারি ও ঝুড়িতে মাছের পসরা। সূর্যের আলোয় ঝকমক করে রুই, কাতলার রক্ত-লাগা বঁটি। জমি দখলের পর বস্তিটা সরে গিয়েছিল দূরে—এখন সেখান থেকেই ঠিকে কাজের জন্যে ঝাঁকে ঝাঁকে উঠে আসে মেয়ে, বউরা। বড়লোক দেখলেই চেনা যায়। তাদের নিরাপত্তার জন্যে দারোয়ান বসে গ্যেটে। গাড়ি ঢোকবার বা বেরোবার সময় পথ-চলতিদের সাবধান করে তারা। দুর্ঘটনা যে-কোনও সময়েই ঘটতে পারে। বাসস্টপ দূরে হলেও সামনের রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে বাস কিংবা মিনিবাস নিজে থেকেই থেমে যায় আবাহনের সামনে।

দুপুরে বড় রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে চোখ তুলে বিশাল বাড়িটার দিকে তাকালে উড়তে থাকে রংবেরঙের শাড়ি। লোডশেডিংয়ের মধ্যে যখন চারদিকে অন্ধকার, জেনারেটরের বিরক্তিকর শব্দ পর্যন্ত পৌঁছে, কিছু বুঝবার আগে দূর থেকে মনে হয় শূন্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে

ঝুলছে অনেকগুলো আলোকিত জানলা, দরজা। তাদের কোনও কোনওটি শুধুই আলো—কোনওটির ভিতর থেকে হঠাৎ বেরিয়ে এসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে দুপুরে-শুকোনো শাড়ি-পরা কোনও যুবতী কিংবা স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে কোনও যুবক। তাদের চেহারা জয়া কিংবা হিমাদ্রির মতো; কিন্তু, তারাই জয়া কিংবা হিমাদ্রি নয়।

আসলে, চোখের দেখার সঙ্গে কল্পনা মেশালে এইরকমই রূপ পায় চেহারাগুলো—একেবারে আইডেনটিকাল; মাল্টিস্টোরেডে যারা থাকে তারা একটা আলাদা ক্লাশ। ব্যাপারটা একদিন জয়াকে বুঝিয়ে দিল হিমাদ্রি। সমগ্রে যাদের অধিকার নেই—যারা শুধুই অংশ, মনের দিক থেকেও বুঝি তারা আংশিক হয়ে থাকে। জয়া এ সব বোঝেনি; নিজেই জানে সে অত বুঝদার নয়। যার যার নিজের নিজের, তাদের ফ্ল্যাট তাদেরই হবে, থাকবে—মনটনের ব্যাপারটা এর মধ্যে কোত্থেকে আসছে বুঝতে পারে না ঠিকঠাক। বরং ভাল লাগে মায়ায় জড়িয়ে যেতে। পজেসন পাবার জন্যে, নিশ্চিত হবার জন্যে টানাহেঁচড়া কম হল না শেষ পর্যন্ত। এসব নিজের করে পেতে ভালই লাগে; তবু মাঝে মাঝে একটা বিষাদ, এক ধরনের অস্পষ্টতা ছুঁয়ে যায় তাকে—সত্যি, এ সব পাওয়াটা কি খুবই জরুরি ছিল। হয়তো হিমাদ্রিও তাই ভাবে, হয়তো ভাবে না। আটতলায় যেখানে আলো তার পাশেই অন্ধকারটাকে অনায়াসে নিজেদের বলে চিহ্নিত করতে পারে তারা। তফাত এইটুকু, দিন যত যাচ্ছে কিংবা এগিয়ে আসছে, তাদের দীর্ঘশ্বাসের শব্দটাও কমে আসছে তত।

একদিন সন্ধ্যায় থ্রি-সি, বারো শো পঞ্চাশের দরজায় কলিং বেল বাজল আচমকা। তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দরজা খুলে চমকে গেলেন রেখা।

'ও মা! তুমি! এসো, এসো—', হাত ধরে জয়াকে ভিতরে টেনে এনে বললেন, 'একা কেন!'

'ও-ও এসেছে। অফিসে। আসবে।' এই প্রথম আবির্ভাবের জড়তা কাটিয়ে জয়া বলল, 'বলেছিলাম না আসব! হয়েই উঠছিল না।'

'খুব ভাল করেছ।' ওকে ব্যালকনি পর্যন্ত নিয়ে এলেন রেখা। সেখানেই বসালেন। চোখে দৃশ্যটা বিশ্বাস্য করে তোলার দৃষ্টি। কিছু করছিলেন হয়তো—ডান হাতের কবজি অব্দি ভিজে, আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বললেন, 'গৃহপ্রবেশের দিন তোমাদের কথা মনে হচ্ছিল খুব। ঠিকানা জানি না তো।'

'আপনারা দোলের দিনই এসেছেন?'

'হ্যাঁ, বলতে পারো। পুজোটুজো করেছিলাম কদিন। পাকাপাকি এসেছি ধরো মাসখানেক। তার আগে ঘরদোর রং করিয়ে নিতে হল; বড়ই ম্যাড়মেড়ে লাগছিল। কিছু ফার্নিচারও বদলাতে হল—'

জয়ার ইচ্ছা এখনই ঘুরে দেখে ফ্ল্যাটটা। অস্বস্তিতে পারল না। তবে এখানে বসেই নিজেদের অসম্পূর্ণতাটা চিনতে পারল সে। নিঃশ্বাস নিয়ে আবার ছাড়তে ছাড়তে ভাবল, যা সাদা তা কখনও রঙিন নয়। ভাল লাগারও কি শেষ আছে কোনও! খানিক আগেই চাবি পেয়ে ঘুরে এসেছে ফ্ল্যাটে। আজও দুলালকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল হিমাদ্রি। অন্ধকারে সিঁড়ি গুনে নয়, আলোর মধ্যে দিয়ে পিঠ টান করে—সোজা লিফটে। নতুন কেনা দুটো বাল্‌ব পরিয়েছে হোল্ডারে। স্যুইচ্ টেপার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠার মুহূর্তে গোটা শরীরে অদ্ভুত বেজে-ওঠা টের পেয়েছিল জয়া—তা হলে সত্যি সত্যিই পজেসন পেল

তারা। বিদ্যুতের কাঁপুনিটা মেরুদণ্ড বেয়ে নীচে নেমে যাবার পর খানিক ফাঁকা ঘর দুটি ও বসবার জায়গার মধ্যে ঘোরাঘুরি করে দক্ষিণমুখো শোবার ঘরের জানলায় এসে পাশাপাশি দাঁড়াল দুজনে।

হিমাদ্রি বলল, 'আজ অন্যরকম লাগছে না!'

তেরাত্তিরের ভাবনা মাথায় থাকলেও ভিতরের আবেগে হিমাদ্রির গা-ঘেঁষে দাঁড়ানোর ইচ্ছাটা আড়াল করতে পারেনি জয়া। ধরা গলায় বলল, 'লাগছে। ইচ্ছে করছে এই মেঝেয় শুয়ে পড়ি—'

হিমাদ্রি স্ত্রীকে দেখল। ঘন হয়ে উঠেছে মুখ, টলটল করছে চোখের দৃষ্টি। এতদিন জয়াকেই ভেবে এসেছিল তার ঘরবাড়ি; এখন দেখল, ঘরবাড়ির মধ্যে ওকে নিজের করে দেখার মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ছে শিকড়ে। এতদিনের চেনা, তবু এই মুহূর্তে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে, ওর ঠোঁট দুটো নিজের মুখের মধ্যে টেনে নিতে নিতে হিমাদ্রি অনুভব করল—এই প্রথম—শরীরের কোলাহল যেখানে গিয়ে ঘা মারে বুকের সেইখানে জমে আছে খাঁ খাঁ শুষ্কতা। আত্যন্তিক ইচ্ছায় জয়াই আবার হয়ে ওঠে আত্মরক্ষার আশ্রয়। এর রূপ আলাদা; অনুভূতিও পারে না এর গভীরতা ছুঁতে।

হয়তো আরও এগোত হিমাদ্রি। জয়াই ছাড়িয়ে নিল নিজেকে। তাৎক্ষণিক আবেগে ক্লান্ত নিঃশ্বাসটাকে সহজ করে নিল আস্তে আস্তে। রাস্তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন যারা ওইখান দিয়ে হেঁটে আসছে, এদিকে তাকালে আজ আর তারা অন্ধকারটা দেখতে পাবে না—'

হিমাদ্রির সিগারেট ধরানোর ইচ্ছা হল। ক্লান্তিটা তারও। একটু আগে স্ত্রীকে চুমু খেতে খেতে টের পেয়েছিল শরীর এক থাকলেও, ভাটা পড়েছে জোরে। আজকাল একটুতেই অবশ লাগে হাত-পা। জয়ার কথাটার মানে বুঝতে ধোঁয়া টানল। বলল, 'আর কেউ কি পারে! ওই অন্ধকারটা ছিল আমাদের, আমরাই শুধু দেখতাম—'

মানে বুঝবার চেষ্টায় স্বামীর দিকে তাকিয়ে পরের কথাটা খুঁজে পেল না জয়া। তখন নিজেকেই খুঁজতে লাগল।

এখনও, রেখাদের ফ্ল্যাটে বসে, পরের ভাবনাটা ভাবতে অসুবিধে হল তার। দেয়ালের চমৎকার রং ও ফার্নিচার দেখেই বোঝা যাচ্ছে রেখা গুছিয়ে বসেছেন। মুখ ফুটে বলেননি, তবু সিলিংয়ের পাখাগুলোও যে নতুন তা বুঝতে পারা শক্ত নয়। এ সবের জন্যে দামও নিশ্চয়ই দিতে হয়েছে অনেক। সকলে সব কিছু পারে না। ইচ্ছা যত দূর টেনে নিয়ে যায়, সাধ্য কি তা পারে! পজেসন পেয়ে মাত্র একটু আগেই বুড়িছোঁয়া করে দেখে এল নিজেদের ফ্ল্যাটটা—কাল সকালের আলোয় আবার দেখবে। তারপর ধীরেসুস্থে উঠে আসার ভাবনা। যত দিন না নিজেরাও গুছিয়ে বসতে পারছে তত দিন অন্তত কী হলে আরও ভাল লাগত তা ভেবে খুঁতখুঁত করা ঠিক হবে না। লোকে বেশি বয়সে কিংবা রিটায়ার করার পর এসব করে, হিমাদ্রি বলেছিল একদিন, তার বয়সের পক্ষে ভারটা বড্ড বেশি। ঠিকই। ভারটা এখনও নেমেও নামেনি। কত যে ধারধোর চারদিকে! সাধুখাঁ আরও একটা কাজ দিল—আরও দু হাজার টাকা। এ কাজটায় ঝামেলা ছিল না কোনও, স্টুডিয়োতেও যেতে হয়নি। নতুন প্রিন্টের শাড়ি পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সিঁড়িতে দাঁড়ানো—দমকা হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে আঁচল। সপ্তাহখানেক আগেকার ঘটনা। কিছু হবার জন্যেই হয়ে যাচ্ছিল সবকিছু;

এ কদিনে জয়ার মনে হয়েছে সে না চাইলেও এইসব ঘটনাই ঘটত। সেদিন হিমাদ্রি দেরি করে ফিরল অফিস থেকে, তার পক্ষে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি খুশির মেজাজে। জয়া জানত দেরি হবে; অফিস থেকে বেরিয়ে সাধুখাঁর সঙ্গে দেখা করে চেক নিয়ে ফিরবে। খুশির কারণটা জানল পরে।

'ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে মরে যাচ্ছিলে—', দু হাজার টাকার চেকটা জয়ার হাতে তুলে দিয়ে হিমাদ্রি বলল, 'ইচ্ছে করলে কাল কিংবা পরশু উঠে যেতে পারো ফ্ল্যাটে—'

'দুইয়ে দুইয়ে চার হল। এই নিয়েই!' জয়া বলল, 'এখন অনেক দেরি আছে—'

'না নেই।'

'হঠাৎ এমন খুশি হয়ে উঠল! কারণটা বলবে তো!'

'বলব। তার আগে বলো সত্যিই ব্যবস্থা হয়ে গেলে কী দেবে?'

'তোমার চাওয়া তো একটাই—', জয়াও পিছিয়ে থাকল না, 'মাছি যেখানেই যাক চোখ দুটো রেখে যায় ফেরার জায়গায়।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না হিমাদ্রি। হাসিটা জিইয়ে রাখল কিছুক্ষণ। জয়া ভাবুক।

'বলবে তো!'

'বলছি—।' ওয়ালেট বের করে তার ভিতর থেকে একটা ভাঁজকরা কাগজ টেনে নিয়ে জয়ার দিকে বাড়িয়ে ধরল হিমাদ্রি। বলল, 'সাধুখাঁ আজ মুডে ছিল। নানা গল্প। তাক বুঝে টোপ ফেললাম, টাকার জন্যে ফ্ল্যাটে উঠে যেতে পারছি না তাও। মোটামুটি দরকারটা শুনে সাত হাজারের চেক কেটে দিল। বলল, এমন মোবাইল ফেস না কি অনেকদিন চোখে পড়েনি।'

'ছিঃ!' জয়া ভুরু কোঁচকাল, 'এটা কী করলে!'

'কেন!'

'লোকটাকে চেনো না, জানো না। হাত পাততে লজ্জা করল না!'

হিমাদ্রি গুটিয়ে গেল। অপ্রস্তুত ভাবটুকু চোখ এড়ায় না। ক্রমশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'হাত একবার পাতলে বার বার পাততে দোষ কী! এটা অ্যাডভান্স, গিফ্‌ট্ নয়। তবে—'

চেকটা হাতে নিয়ে জয়া তখনও স্তব্ধ। এখন আর হিমাদ্রির চোখে চোখ রাখার দরকার নেই।

যেখানে থেমেছিল, সময় নিয়ে সেইখান থেকেই আবার শুরু করল হিমাদ্রি।

'মনে হচ্ছে খুশি হওনি তুমি। ব্যাপারটা তোমাকে নিয়েই। পছন্দ না হলে ফেরত দিয়ে আসব।'

'এখন ফেরত দিলে হাসবে।' হিমাদ্রিকে নতুন কোনও সমস্যায় জড়াতে চাইল না জয়া। সম্পর্কের ভিতর ঢুকে পড়ছে মেঘ। আজ নয়—জয়া জানে, ভাবনার দিক থেকে আজকাল প্রায়ই তারা পরস্পরের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়াচ্ছে, লক্ষ্যটা যদিও এক। নিজের অজান্তে কবে যে সে হিমাদ্রিকে শাসন করার অধিকার অর্জন করে ফেলল নিজেই তা জানে না। এইসব ভাবতে ভাবতে খাপছাড়া গলায় বলল, 'তোমায় কিছু বলিনি। দোষ আমারই। আমিই ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট করে মরে যাচ্ছিলাম।'

'তা নয়।' জয়াকে অন্যরকম হতে দেখে ফেরার চেষ্টা করল হিমাদ্রি, 'যেদিন সমস্ত ধারদেনা শোধ হয়ে যাবে, সেদিন দেখবে এসব কথা তোমার আমার কারুরই মনে নেই।'

দিন দুয়েকের স্মৃতি পেরোতে দু মিনিটও লাগে না। হঠাৎ হাওয়ায় ধুলো ওড়ে এলোপাথাড়ি, চোখে কুটো পড়ে কিংবা নিঃশ্বাস নিতে হয় জোর করে—মনে পড়ায় এর বেশি আর কিছু হয় না। হিমাদ্রি যতই বলুক, সত্যিই কি মনে থাকবে না কিছু! কী করে ভুলবে শেষ পর্যন্ত সাধুখাঁর দেওয়া টাকা ভাঙিয়েই উঠে আসা গেল! কেউ জানে না, জানবেও না হয়তো—জয়ার হঠাৎ মনে হল, বড় দীনের মতো উঠে আসছে তারা।

সামনে দাঁড়ানো রেখার দিকে চোখ পড়ায় জট খুলে গেল। নিজেকে লুকোবার চেষ্টায় আঁচলে আঙুল জড়াল জয়া।

'আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম! কী করছিলেন? রান্না?'

'না। রান্নার জন্যে লোক আছে।' রেখা বললেন, 'রিঠে ভিজিয়েছি, তোমার মেসোমশাইয়ের গরম পাঞ্জাবিটা কাচবার মতলব করছিলাম—'

'কেমন আছেন উনি? বাড়িতে নেই?'

'এই তো, স্নান করতে ঢুকলেন।' জয়াকে বসালেও নিজে বসছেন না রেখা। বললেন, 'চা খাবে তো? জলটা চাপিয়ে আসি—'

'না, না। থাক।'

'থাকবে কেন!'

'ও এখুনি এসে পড়বে। যেতে হবে।'

'আসতে না আসতেই! তোমার কর্তার জন্যেও বসাচ্ছি। উনিও তো খাবেন—'। বাথরুমের ছিটকিনি নামানোর শব্দে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন রেখা, 'উনি বেরিয়েছেন। বোসো।'

রেখা সরে যেতে দৃশ্যটা এগিয়ে এল কাছে। অনুমানে বুঝে নিল এটা পুবদিক। চারতলা বলে উচ্চতাটা চোখে পড়ে না—সামনে যত দূর দেখা যায় কিছু গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে জীবন্ত হয়ে ওঠে তিন বা চারতলা বাড়িগুলো। আরও দূরে একটা মাল্টিস্টোরেড চোখে পড়ে, দু দিকে ছড়ানো আলোর খুপরিগুলোর মাঝখান দিয়ে ওপর থেকে নীচে নেমে গেছে সিঁড়ির আলো। ওটা কোন পাড়া? নিজের জায়গা থেকে সরে এলেই চারপাশ থেকে ভিড় ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসে এক-একটা অচেনা জগৎ। ঠিক কেন বোঝা যায় না, তবু, হঠাৎ মনে হয়, অচেনা ওই জগৎ ও সংস্পর্শের মধ্যে অপেক্ষা করে আছে কোনও ঘটনা—যা সে ভাবতে পারছে না তেমনই কিছু ঘটে যাবে হঠাৎ, চমকে দেবে তাকে। প্রথম যেদিন হিমাদ্রির সঙ্গে অবনীদের অফিসে ঢুকেছিল, সেদিনও হয়েছিল এরকম। তখন জানত না, অবনীও নয়—শেষ পর্যন্ত তাদের উপকার করবার জন্যে অনির্দিষ্ট কোথাও অপেক্ষা করে আছে ছুঁচলো দাড়ি ও মোটা ফ্রেমের চশমা নিয়ে লম্বা ও ভারী চেহারার একটা গম্ভীর লোক! কদিন যেতে না যেতেই অবনী সরে গেল। না, একা হিমাদ্রিকে দোষ দিয়ে লাভ নেই—ওরাও জেনে গেল, এর পরের ভূমিকাটুকু সাধুখাঁর। যে উপকার করে তাকে না বলা যায় না বলেই আজকাল প্রয়োজন বুঝে মাথা নেড়ে যাচ্ছে হিমাদ্রি। অ্যাডভান্সের চেকটা ব্যাঙ্কে জমা পড়েছে জেনে কাল সন্ধ্যায় বাড়িতে ডেকেছিল সাধুখাঁকে। সঙ্গে ওর বউও এল। ওইরকমই লম্বা চেহারা, পাঞ্জাবি মেয়ে হলেও রংটা চাপা—পুরুষালি ছাঁদে চুল ছাঁটার জন্যে কেমন একটু রুক্ষ দেখায়। কথা বলে অদ্ভুত উচ্চারণে; তার যতটা না বাংলায় তার চেয়ে বেশি ইংরিজি। মাঝে মাঝে ওর কথাবার্তার কিছুই প্রায় বুঝতে পারছিল না জয়া। শীলাও না কি ছবি তোলে, স্বামীর ব্যবসার পার্টনার। তা হোক, বড়সড় চেহারা রুক্ষ মেয়েমানুষ

দেখলেই কেমন অহঙ্কারী মনে হয়—অস্বস্তিতে বেড়ে ওঠে দূরত্ব। বেশিক্ষণ থাকেনি বলেই বাঁচোয়া।

ওদের গাড়িটা একটু দূরে যাবার পর দরজায় দাঁড়িয়ে জয়া বলেছিল, 'আর আসবে না তো?'

'কেন!'

'ওরা আমাদের স্ট্যান্ডার্ডের নয়। কেমন যেন হাঁফিয়ে উঠতে হয়!'

যা বলেনি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে তাও আঁচ করবার চেষ্টা করে হিমাদ্রি বলেছিল, 'ঘরকুনো স্বভাব, তোমার অস্বস্তি লাগবেই। যেখানে যাচ্ছ সেখানেও এমন অনেককেই দেখবে।'

কথাটা কেন বলেছিল হিমাদ্রি এখনও বুঝতে পারল না জয়া। ও রেখার কথা ভাবল। তারপর ধীরার কথা। শ্যামল বসুর স্ত্রী। অনেকদিন দেখা না হলেও এক দু বারের আলাপেই বুঝে গেছে ধরনটা। এরা কেউই শীলার মতো নয়। তবে দুজনকে দিয়েই কি আর চেনা যায় ছিয়ানব্বই জনকে! সংখ্যাটা বহু হয়ে গেলে; লতায় পাতায় জড়িয়ে শেষ পর্যন্ত হয়তো আরও অনেক বেশিতে গিয়ে দাঁড়াবে। তাদের কেউ কেউ শীলার মতো হলেও হতে পাবে। খুব একটা যায় আসে না তাতে। এক ছাদের নীচে থাকলেই আপনজন হয়ে ওঠে না সকলে; এমন কী নিকট সম্পর্কের ভিতরে থাকলেও না। তা যদি হত, তা হলে এতদিন হিমাদ্রির বউদিই হতে পারত তার সবচেয়ে কাছের মানুষ—হয়তো ফ্ল্যাট কেনার ভাবনাটাই মাথায় আসত না তাদের, একলা মুহূর্তে হঠাৎ কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়ত না হিমাদ্রি। এবং নিশ্চিত আজ, এই মুহূর্তে, রেখার ফ্ল্যাটে বসে হিমাদ্রির অপেক্ষা করত না সে। এমন কী টাকার অঙ্কে সে যে দামি, তাও কি বুঝবার সুযোগ হত কখনও!

ভাবনাগুলো আজ ক্রমাগত টেনে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরের দিকে। ভাবনার মধ্যেই তৈরি হয়ে যাচ্ছে পাওয়া এবং হারানো। ভাবনাই হাতছানি দিচ্ছে দূরে, যেখানে সম্পর্ক হয়তো আছে—নেই স্পষ্ট কোনও আদল। কোনও কারণ না থাকলে কেন যে ভয় লাগে মাঝে মাঝে!

অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল বোলাল জয়া। এই সেই ঠোঁট, একটু আগে যা সম্পূর্ণ ভাবে গ্রাস করেছিল হিমাদ্রি। একই হিমাদ্রি তাকে বলেছিল নিজেদের অন্ধকারের কথা—আর কেউই যা চিনতে পারবে না।

'আজ তোমাকে অন্যরকম লাগছে—অন্যমনস্ক—'

রেখা যে কখন ফিরে এসেছেন আবার ঠিকঠাক খেয়াল করেনি। করলে লজ্জায় পড়তে হত না। সামান্য অস্বস্তিতে জড়সড় হয়ে জয়া বলল, 'না; অন্যমনস্ক কিছু নয়। দেখছিলাম এখান থেকে সব কেমন অন্যরকম দেখায়।'

'নতুন পরিবেশ। প্রথম প্রথম আমারও লাগত। এখন সয়ে গেছে।'

'আপনাদের ব্যালকনিটা সুন্দর। এখানে বসলেই সময় কেটে যায়।'

'তাই।' রেখা হাসলেন। মজা করে বললেন, 'আমাদের বুড়ো বুড়ির সময় কাটানোই সমস্যা। সারাদিন কী যে করি! উনি তবু একটা কাজ পেয়েছেন। কমিটির লোকেরা ধরাধরি করেছিল, রোজ সকালে ঘণ্টা দুয়েক অপিসে বসেন। এটা ওটা করে দেন।'

রেখার একনাগাড়ে কথা বলে যাওয়ার ধরনটা লক্ষ করছিল জয়া। রূপ নয়, সম্ভবত

বয়সই মানুষকে আলাদা লাবণ্য দেয়।

'তোমরা এসো।' রেখা বললেন, 'তোমাদের নিয়ে একটা লেডিজ ক্লাব গড়ব। ধীরাকেও বলেছি—'

মিস্টার চৌধুরীও এসে পড়লেন। বেতের চেয়ার টেনে বসতে বসতে হাসলেন শান্ত ভঙ্গিতে।

'লেডিজ ক্লাবের কথা কী হচ্ছিল?'

'ও আমাদের নিজেদের মধ্যে।' রেখা বললেন, 'ওকে বলছিলাম সবাই এসে পড়লে এখানে মেয়েদের নিয়ে কিছু কাজকর্ম করা যায়—'

'পারলে তো ভালই।' অল্প থেমে মুখের হাসিটা আগে ছড়াতে দিলেন সুনীল; নামটা এইমাত্র মনে পড়ল জয়ার। চুল আঁচড়ানোর পরেও সিঁথির কাছে ও জুলপির পাশে লেগে আছে কয়েকটা জলবিন্দু। হাতের উল্টোপিঠে কপাল মুছে সোজাসুজি তাকালেন জয়ার দিকে, 'কবে আসা হচ্ছে?'

'দেখি। আজই তো পজেসন পেলাম।'

'ও, হ্যাঁ। তাই তো।'

কথা শুনে মনে হল ওদের ব্যাপারটা কিছু কিছু জানেন সুনীল। অসম্ভব নয়। একটু আগেই রেখা বলেছিলেন উনি কমিটির কাজকর্ম দেখাশোনা করছেন। জানলেও অবশ্য ক্ষতি নেই কিছু—অস্বস্তি দানা বাঁধার আগেই চাপা দিল জয়া। পজেসন পেয়ে যাবার পর কে কী ভাবল না ভাবল ভেবে লাভ নেই কিছু। সত্যি বলতে, যে-পরিচয় বা সম্পর্কের জোরে আজ এখানে এসেছে এবং বসে আছে, তার পিছনেও তো ভূমিকা নেই কোনও। যদি না আসত তা হলে রেখা কিংবা সুনীলের তাদের সম্পর্কে ভাববার কারণ ঘটত না।

'বোসো। চা-টা আনি—'

রেখা উঠতে যাচ্ছিলেন, তখনই বেল পড়ল দরজায়। রেখাই এগিয়ে গেলেন।

জয়া অনুমান করেছিল হিমাদ্রিও হতে পারে। তবে একা আসেনি। সঙ্গে শ্যামল। এসেই হৈচৈ শুরু করে দিল। একই সঙ্গে আপ্যায়ন ও অনুযোগ—সবই জয়াকে; নীচে হিমাদ্রির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল বলেই জানতে পারল ওরা এসেছে; তবে ওদের ফ্ল্যাটে না গিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া কিংবা আসাটা খুবই অন্যায়, ইত্যাদি। একই সঙ্গেই অনেকগুলো কথা বলার চেষ্টা করলে যা হয়, ঠিক বোঝা যায় না কোন কথাটার ওপর গুরুত্ব দিতে চাইছে। শুনতে শুনতে পরম্পরা হারিয়ে ফেলল জয়া। এমনও হতে পারে বলার অভ্যাস থেকে উগরে যাচ্ছে কথা, সত্যি সত্যিই উত্তর পাবার জন্যে নয়। তবে, জয়া ভাবল, যা সম্পর্ক তাতে শ্যামলদের সঙ্গে দেখা করাটাই স্বাভাবিক ছিল তাদের পক্ষে—বস্তুত, একদিনই মাত্র কিছুক্ষণের জন্যে আলাপ হয়েছিল রেখা ও মিস্টার চৌধুরীর সঙ্গে; তা হলে কেন সে রেখার সঙ্গেই দেখা করার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল! শ্যামল, ধীরাদের কথা মনে পড়েনি তো! তা হলে কি নিজের অগোচরেই কোনও পক্ষপাত তৈরি হয়ে যাচ্ছে তার মনে! না কি টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে ক্লান্ত, বন্ধুতা থেকে স্নেহই এখন তার কাছে কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে বেশি।

শ্যামল থামবার পর কথাটা বললেন সুনীল।

'কেন, শ্যামলবাবু! আসবার জায়গা হিসেবে আমাদের ফ্ল্যাটটা কি খুব খারাপ!'

'না, স্যার। তা বলিনি।' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাত জোড় করল শ্যামল, যেটা ওকেই মানায়। বলল, 'যদি বলেন কানও ধরতে রাজি আছি। ভুলবেন না, এই অধমদেরও প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল আপনারই আস্তানায়।'

'আর বিনয়ী হতে হবে না।' রেখা হিমাদ্রিকে দেখছিলেন, বললেন, 'বসুন আপনারা। আমি চা নিয়ে আসি।' তারপর, 'ধীরাকে নিয়ে এলেন না কেন?' যেতে যেতে বললেন শ্যামলকে, 'বেশ কদিন দেখিনি ওকে।'

'কী করে বুঝব আড্ডা বসেছে এখানে!' শ্যামল সিগারেট বের করল, রেখা যে সামনে নেই তা নিয়ে মাথাব্যথা নেই কোনও। প্যাকেটটা হিমাদ্রির দিকে বাড়িয়ে কৌতূহলের দৃষ্টিতে তাকাল জয়ার দিকে, 'আমাদের স্টার যে লুকিয়ে বসে আছেন এখানে, জানলে নিশ্চয়ই আসত।'

কথাটা ঠিকঠাক বুঝতে না পারলেও লক্ষ্য যে সে-ই তা বুঝে অস্বস্তি বোধ করল জয়া। আড়ষ্ট ভাবে তাকাল হিমাদ্রির দিকে। হিমাদ্রি চোখ নামিয়ে নিল।

সুনীল বললেন, 'স্টার মানে!'

'স্টার ছাড়া আর কী।' গলার স্বরে যতটা না তার চেয়ে বেশি নাটকীয়তা শ্যামলের চোখেমুখে, রহস্য করে বলল, 'দ্যাখেননি কালকের আনন্দবাজার!'

'কেন!'

'বিশাল ছবি বেরিয়েছে আমাদের জয়া দেবীর।'

চকিত হয়ে উঠলেন সুনীল। একবার জয়াকে দেখলেন, তারপর হিমাদ্রিকে। দুজনেই চুপচাপ দেখে শ্যামলকেই জিজ্ঞেস করলেন, 'তার মানে!'

'বিজ্ঞাপনে। মডেল। সৌন্দর্য একশো বছর আগেও ছিল, আজও আছে—', বিজ্ঞাপনের হেডলাইনটা পুরোপুরি উদ্ধার করতে পেরে কৃতার্থের ভাব ফুটল শ্যামলের মুখে, 'সত্যি, বিউটিফুল!'

শ্যামল প্রশংসা করলেও তেমন খুশি হতে পারল না জয়া। কী একটা হচ্ছে শরীরের ভিতর—মাথায় ভার। শীতে সিরসির করছে মেরুদণ্ড। নিজের মধ্যেই নিঃসঙ্গ হতে শুরু করল জয়া এবং ভাবল, দায়টা তার একার নয়। তবু, হিমাদ্রি কোনও কথা বলছে না কেন!

'দেখিনি তো! স্টেট্‌স্‌ম্যানেও বেরিয়েছে?'

'তা বলতে পারব না। ধীরাই দেখেছিল আগে।' শ্যামল বলল, 'ভাবলাম, যাক, অন্তত একটা মুখ দেখিয়ে বলতে পারব ইনি আমাদের বিল্ডিংয়ে থাকেন।'

'আচ্ছা! জানতাম না তো!' প্রশ্নটা সোজাসুজি জয়াকেই করলেন সুনীল, 'মডেলিং করা হয় না কি?'

'না, ঠিক তা নয়। মানে—'

'রেগুলার কিছু নয়।' জয়াকে অসহায় দেখে হিমাদ্রি বলল, 'ওই ফার্মটা আমাদের এক বন্ধুর, জোরজার করল। মডেলিং করার সময় কোথায়!'

ট্রে-তে চা নিয়ে এলেন রেখা । শ্যামল কিংবা সুনীল আবার কথাটা তুলবে কি না ভেবে শঙ্কিত হল জয়া। রেখার কৌতূহল নিশ্চয়ই অল্পেই থামবে না।

ট্রে থেকে নিজের কাপটা তুলে নিলেন সুনীল।

'কবে আসছেন আপনারা?'

'এখনও ঠিক করিনি কিছু।' ব্যস্তভাবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে গরমটা জিবে সহ্য করে নিল হিমাদ্রি, তাড়া বোঝাবার জন্যে ঘড়ি দেখল। বলল, 'অফিসের কাজে ট্যুরে বেরোতে হবে কদিনের জন্যে। ফিরে এসে ব্যবস্থা করব।'

'হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি চলে আসুন।' শ্যামল বলল। তারপর তাকাল রেখার দিকে, 'আপনার লেডিজ ক্লাবের প্ল্যানটা বলেছেন?'

'বললাম তো।' রেখা বললেন, 'নেক্সট্ দিন হয়তো আরও কিছু বলতে পারব।'

'আমরা এবার উঠব—আর এক জায়গায় যাব।' ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়াল হিমাদ্রি, এখন জয়াই তার দ্রষ্টব্য। তাড়া দেবার ধরনে বলল, 'হয়েছে? অবনীদের ওখানে যেতে দেরি হয়ে যাবে কিন্তু—'

হিমাদ্রি কেন, কী বলছে বুঝতে পারল না জয়া। শুধু এটুকু বুঝল, এটাই সুযোগ—বেরুতে হলে এখনই। এবং উঠে দাঁড়াল। দেখাদেখি রেখা এবং সুনীলও।

'এ আসাটা আসা হল না।' দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে সুনীল বললেন, 'আবার আসবেন—'

'নিশ্চয়ই।'

উঠতে পেরেছে ভেবে স্বস্তি হলেও হিমাদ্রির অতিরিক্ত ব্যস্ত হওয়ার ধরনটা ভাল লাগল না জয়ার। হয়তো ওঁদেরও লাগেনি। এখন আর ফিরে বসা যায় না। দরাজর বাইরে দাঁড়িয়ে রেখার দিকে তাকাল জয়া—মুখে খেই-হারানো ভাব, থেমে দাঁড়িয়েছেন হলঘরের মাঝখান পর্যন্ত এসে। জয়া বলল, 'মাসিমা, চলি আজ—'

'এসো।'

ওরা এমনভাবে বেরিয়ে এল যেন এখন নয়, আরও আধঘণ্টা আগে বেরুতে পারলেই ভাল হত। লিফ্‌ট্‌টাকে এই ফ্লোরে টেনে আনার জন্যে বোতাম টিপেছিল শ্যামল। হিমাদ্রি অপেক্ষা করল না। ওঠা হলে কথা ছিল; লিফটের জন্যে অপেক্ষা করতে যতটা সময় লাগবে তারও আগে তরতর করে নেমে যাওয়া যায় সিঁড়ি দিয়ে। শ্যামল সম্ভবত সঙ্গ দিত; কিন্তু প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যস্ততা নিয়ে ওদের নেমে যেতে দেখে ওপরের কোনও অদৃশ্য বাঁক থেকে চেঁচিয়ে বলল, 'আবার দেখা হবে—'

নীচে পৌঁছে হাঁফ ছাড়ার জন্যে দাঁড়াল জয়া। পুরো হেডলাইট জ্বেলে গেট পেরিয়ে গাড়ি ঢুকছিল একটা—সার্চলাইটের ধরনে আলোটা সোজাসুজি ওর মুখের ওপর লেগে থাকল খানিক, হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে দৃশ্যটা লক্ষ করল হিমাদ্রি। তারপর কাছে এসে বলল, 'তুমি তো হাঁফাচ্ছ দেখছি।'

'হাঁফাব না! এমন তাড়া করলে!' যাবার জন্যে এগিয়ে জয়া বলল, 'হঠাৎ অবনীদার কথা তুললে। সত্যিই যাবে না কি?'

'একটা কিছু না বললে বেরোনো যেত না। অবনীর নামটাই মনে এল।'

জয়া চুপ করে থাকল। গেট পেরিয়ে রাস্তায় নামবার সময় শুধু বলল, 'চাবিটা নিয়েছ?'

থেমে দাঁড়িয়ে পকেট চেপে ধরল হিমাদ্রি।

'আছে—'

রাস্তায় আলো কম। আবাহনের গেট পেরিয়েই পর পর দুটো ল্যাম্পপোস্টে আলো নেই। জয়াকে পাশে নিয়ে চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে হিমাদ্রির হঠাৎ শ্যামলের কথা মনে পড়ল;

শ্যামল বলছিল আশপাশে বস্তি থাকার জন্যে পাড়াটা তেমন নিরাপদ নয়—রাত্রের দিকে প্রায়ই ছেলে-ছোকরারা মদ খেয়ে খিস্তিখেউড় করে। হয়তো উদ্দেশ্য থাকে না কোনও, তবে আবাহনের সামনে এলেই বেড়ে ওঠে চিৎকারটা। গেট খোলা পেয়ে এর মধ্যে একদিন পাঁচ-সাতটা মাতাল ঢুকে পড়েছিল। আজকাল রাত দশটায় গেটে তালা লাগিয়ে রাখে দারোয়ান। গভীর রাতে জানলার কাচ ভাঙার শব্দে একদিন সচকিত হয়ে উঠেছিল অনেকে। সকালে জানা গেল পাঁচ ও সাততলার বাথরুমে জানলা ভেঙেছে। দুটো ফ্ল্যাটই রাস্তার দিকে। মনে হয় অদৃশ্য কোনও হাত পাথর ছুড়েছে আক্রোশে। ব্যাপারটা যে কী, কেনই বা এই সন্দেহ—ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি। তবে হতে পারে।

রাস্তায় লোকজন কম বলেই হয়তো আলোর তারতম্য চোখে পড়ছে বেশি। সন্ধ্যার দিকে যখন এসেছিল তখন চাঁদ ছিল আকাশে, এখন আর দেখা যাচ্ছে না। বরং পশ্চিম দিকের অনেকটা আকাশ জুড়ে ঘোলাটে রং, তার জের ছড়িয়ে পড়েছে অন্যত্রও, ছেঁড়া-ছেঁড়া মেঘে। হাওয়া নেই এতটুকু। কদিন চুপচাপ থাকার পর হয়তো আবার বৃষ্টির জন্যে তৈরি হচ্ছে চারদিক। তবে এখনই নামবে না। আর একটু এগোলেই বড় রাস্তা—ওখানে একটা ট্যাক্সি পেলেও পাওয়া যেতে পারে। না হলে বাস। নির্জনতায় এমনিতেই সন্দেহ ঠেসে আসে বুকে; পাশ দিয়ে একটা গাড়ি ছুটে যাবার পর দুজন যুবককে এগিয়ে আসতে দেখে পকেটে হাত দিয়ে ফ্ল্যাটের চাবির গোছটা অনুভব করল হিমাদ্রি। তখনই খেয়াল হল চাবির চেয়ে আরও ভয়ের কারণ তার পাশেই হাঁটছে।

'তুমি হঠাৎ চুপচাপ হয়ে গেলে কেন!'

'কী বলব!'

হিমাদ্রি হাসল। দূর থেকে যাদের যুবক বলে মনে হচ্ছিল পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় আর তাদের সন্দেহ হল না। তবু জয়ার দিকে যতটা পারে ঘেঁষে এল সে।

'পজেসন পাওয়া গেল। আজ তো তোমারই সবচেয়ে বেশি খুশি হওয়ার কথা!'

'জানি না।' জয়ার গলা অন্যরকম। রাগ কিংবা অভিমান নয়, চাপা আবেগে কেঁপে গেল সামান্য। পাশ ফিরে হিমাদ্রিকে দেখল একবার। আরও একটু দ্রুত হয়ে বলল, 'আমার কিছুই ভাল লাগছে না।'

'কী হল!'

'এই সব কথা। এত এম্ব্যারাসিং!'

হিমাদ্রি এইরকমই কিছু অনুমান করেছিল, নিশ্চিত হতে পারেনি। খানিক চুপ করে থেকে বলল, নতুন শুনছ বলেই এমন লাগছে। পরে সহ্য হয়ে যাবে, লোকেও বলবে না—'

'তা হলেও—', বলতে গিয়ে থেমে গেল জয়া। তারপর অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তুমি ওই অ্যাডভান্সটা নিতে গেলে কেন বলো তো! এখন যতদিন না শোধ হবে, কাঁটার মতো বিঁধে থাকবে ব্যাপারটা।'

সঙ্গে সঙ্গে কোনও জবাব দিল না হিমাদ্রি। একই প্রশ্নের অনেকগুলো উত্তর হয়। একটিই বাক্যের আশ্রয় পাবার জন্যে মাথার মধ্যে ছুটোছুটি করে তারা। বলা যেত মডেল হবার ব্যাপারটায় শেষ পর্যন্ত তুমিই রাজি হয়েছিলে—সেদিন উস্কানি না দিলে এসব ঘটনা আদৌ ঘটত না। পরে ভাবল, পকেটে ফ্ল্যাটের চাবি নিয়ে জয়াকে অন্তত এসব কথা বলা উচিত হবে না। বলা যায় না।

'আপসেট হোয়ো না।' বড় রাস্তার কাছাকাছি এসে হিমাদ্রি বলল, 'সাধুখাঁ দিলদরিয়া লোক হলেও আসলে ব্যবসাদার। টাকাটা বেশিদিন ফেলে রাখবে না।'

জয়া কিছু বলল না। পেট্রোল পাম্পের সামনে সত্যিই দাঁড়িয়ে আছে একটা খালি ট্যাক্সি। হিমাদ্রি সেইদিকেই যাচ্ছে দেখে সেও গতি বাড়াল।

৬

যেমন করেই ভাবুক, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনও কল্পনাই আজকাল বেশি দূর এগোতে দেয় না জয়াকে। মনে হয়, বস্তুত পরিকল্পনানির্ভর ভবিষ্যতের জন্যে কোনও চেষ্টা তারা করেনি। কোনও দিনই করেনি। গত দু তিন বছর ধরে যা করেছে তার বেশিটাই জেদের বশে। সে জেদ করেছিল বলেই ল্যাজামুড়ো এক হয়ে থাকার কারণে ছুটোছুটি করেছে হিমাদ্রিও। সত্যি, ইট-কাঠ-সিমেন্টের দেয়ালঘেরা একটা ফ্ল্যাটই কি হতে পারে কারুর জীবনের লক্ষ্য? পারস্পরিক নির্ভরতায় যে সুখ ও নিরাপত্তা, কিংবা এইভাবে, সুখ ও নিরাপত্তার মধ্যে থেকে সংগ্রহ করে নেওয়া জীবনের যে আহ্লাদ, একটা ফ্ল্যাট কি দিতে পারে তা? যদি তা পারত, তা হলে, পজেসন পাবার পর—হিমাদ্রি যেমন বলেছিল সেদিন—কেন খুশি হতে পারছে না মনটা! কেন মনে হচ্ছে যা পাওয়া গেল তা না পেলেও খুব একটা ক্ষতি হত না তাদের! বরং যা না পেলেও চলত তা পেতে গিয়ে অদৃশ্য অন্তর্লোকের কোথাও কোথাও ছোট বড় অনেকগুলো ফাঁক নিজেরাই সৃষ্টি করে গেছে তারা। এর একটা পার হলে আর-একটা পেরোতে গিয়ে টান পড়ে স্নায়ুতে। বর্ষার খোঁদলে ভরা রাস্তায় হাঁটতে গেলে যেমন হয়, কোনও কোনও জমা জলের সামনে এসে থমকাতে হয় হঠাৎ—অভিজ্ঞতাই বলে দেয় ফাঁকটা তোমার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শক্তি ও সাধ্যের চেয়ে বেশি, চেষ্টা করলেই ডুবজলে সেঁধিয়ে যাবে হাত-পা।

এগুলো যে নিতান্তই অবসরের ভাবনা, উঠে আসছে আলস্য থেকে, তাও নয়। মনও পুরোদস্তুর সায় দিচ্ছে তাতে। তাকে ও হিমাদ্রিকে নিয়ে সম্পূর্ণ যে-বৃত্ত তাতে ছেদ পড়েনি কোথাও। তবু, আজকাল প্রায়ই মনে হয় জয়ার, ছোট পরিধির যে উত্তাপ তা প্রায়ই গায়ে লাগছে না তাদের। হিমাদ্রি অবশ্য চাপা মনের মানুষ—প্রকাশটা কম, কী ভাবছে না ভাবছে তা বোঝা যায় না সব সময়। কিন্তু, নিজেকেও কি বুঝতে পারে না জয়া? কেমন মনে হয় বৃত্তটা বৃত্তই আছে, তবু নিজেদের অলক্ষ্যে, কখন যে বিস্তৃত হয়েছে তার চারদিকের পরিধি। ভাবনার মধ্যে আপাত-সত্য না থাকলেও তার ও হিমাদ্রির মধ্যে ক্রমশ বেড়ে-ওঠা ফাঁকটা টের পায় প্রায়ই—বড় দূরত্বপূর্ণ লাগে সব কিছু; এক এক সময় মনে হয় তারই দীর্ঘশ্বাসে ভরে উঠছে ফাঁকা জায়গাটা। হয়তো হিমাদ্রিরও দীর্ঘশ্বাস মিশছে সেখানে। জয়া জানে না।

আজকাল তারা কথা বলে কম। কাছাকাছি থাকলেও কাছে থাকার শারীরিক সান্নিধ্যটুকু পেয়ে যায় শুধু—বাকি সবই ভরে ওঠে অদ্ভুত, কখনও বা অসহনীয় নীরবতায়। মনে হয় অনেকদিন ধরে ফ্ল্যাট নিয়ে বড্ড বেশি বলেছে তারা। প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনের কথা বলতে বলতে ঘরবাড়িই হয়ে উঠেছিল তাদের বাঁচা কিংবা মরা, স্বপ্ন ও রক্ত-বিশেষ।

প্রয়োজন কিংবা অপ্রয়োজনে অন্য যে সব কথা বললেও বলতে পারত, এমন কী আজেবাজে যে সব কথার ঢেউ তুলে সম্পর্কের মধ্যে আনতে পারত পারাপারের স্বাচ্ছন্দ্য, ক্রমাগত প্রত্যাখ্যাত হতে হতে সেগুলিও গেছে হারিয়ে। পজেসন পাবার পর ভারটা যখন বুক থেকে নেমে গেল, এর পরের ধার-দেনা এবং দায়-দায়িত্ব কি নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবার ভাবনা ছাড়া কিছুই থাকল না আর, তখন হারানো বিষয় ও কথাগুলিকে ফিরে পাবার চেষ্টায় দেখছে বড় কঠিন তাদের ফিরিয়ে আনা। সব কি মনেও পড়ে ঠিকঠাক। নতুন করে ভাবতে গেলে শুধুই জড়িয়ে পড়তে হয় ধাঁধায়। সন্দেহ হয়, স্বপ্নটায় ভুল ছিল না তো কোনও। সত্যি-সত্যি, ঘরবাড়িই কি হতে পারে কারও আশ্রয়!

মাঝে মাঝে গোলমাল লাগে সবকিছু। হিমাদ্রির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে— হিমাদ্রিও যখন অন্যমনস্ক—মনে হয়, তার ও হিমাদ্রির মধ্যে আর কেউ এসে গেলে হয়তো ভরে উঠত দূরত্বটা। ফ্ল্যাট থাকত, তবু আশ্রয়ের ভাবনা থেকে এমন ভাবে বিচ্যুত হতে হত না। ইচ্ছা করলেই আনা যেত তাকে—বিয়ের পর পর, কিংবা এই পাঁচ, সাড়ে-পাঁচ বছরের মধ্যে যে-কোনও সময়। ইচ্ছার কথাটা কয়েকবারই মুখ ফুটে বলেছিল হিমাদ্রি, একান্তে অন্ধকারের মধ্যে; তবে, অন্ধকারে তার মুখের অভিব্যক্তি নিশ্চয়ই পড়া যেত না। এই করতে করতেই আটকে গেল হওয়াটা। তার চেয়ে বড় ইচ্ছা ঢুকে পড়ল মগজে। ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট, ফ্লাট। এই চাওয়াটা যেমন, সেইভাবে কি চেয়েছিল? জয়া কি অস্বীকার করতে পারবে শেষের দিকে সমস্ত ইচ্ছাটাই হয়ে পড়েছিল কাগুজে। বলতে হয় বলেই ঠাট্টা ইয়ার্কির ছলে বলত মাঝে মাঝে। উপলক্ষ না থাকলে আক্রমণ দানা বাঁধে না, দুই শরীরের যুদ্ধে উত্তাপ থাকে না কোনও। না; দুজনের কেউই আর শেষ পর্যন্ত আন্তরিক থাকেনি।

এসব একদিনের ভাবনা নয়। প্রতিদিনই সুড়ঙ্গ কেটে এগোচ্ছে। তবে সেদিন সকালে নিঃশ্বাসটা ছুটে গেল বৃত্তেরও বাইরে।

অফিসের কাজে ট্যুরে গেছে হিমাদ্রিও। এখন বোম্বাইয়ে, আজ বিকেলে আহমেদাবাদে যাবার কথা। সেখান থেকে ইন্দোর, দিল্লি হয়ে ফিরবে। চার-পাঁচদিনের আগে নয়। আহমেদাবাদ হয়েই ফিরে আসতে পারত হয়তো, তা হলে পরের সপ্তাহে যেতে হত আবার—ফ্ল্যাটে উঠে যাবার তাড়ায় দুটো ট্যুর জুড়ে নিয়েছে একসঙ্গে। উঠে যাওয়া মানেই নিশ্চিন্ত হওয়া নয়। টুকটাক নানা ঝামেলা লেগে থাকবে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবার পরেও বেশ কিছুদিন পর্যন্ত। ওগুলো জয়ার কাজ নয়। ওই সময়টা নিজেই থাকতে চায়।

একা বাড়িতে হিমাদ্রির থাকা না-থাকাটা এখন বেশি করে টের পাচ্ছে জয়া। এর আগে যতবার ট্যুরে গেছে হিমাদ্রি, ততবারই চোখ কান বুজে বাপের বাড়ি চলে গেছে জয়া। একবার কী কারণে যেন যোধপুর পার্কে হিমাদ্রির দিদি, জামাইবাবুর কাছে ছিল। এবার ইচ্ছা করেই যায়নি। হিমাদ্রি ফিরলেই উঠে যাবে নতুন ফ্ল্যাটে। তার আগে গোছগাছ শেষ করতে হবে। কোনটা সঙ্গে নেবে, কোনটা ফেলে যাবে বা দান খয়রাত করবে সেটাও দেখা দরকার। জয়া নিজেই থেকে যেতে চাইল। হিমাদ্রিও না করেনি। একা বাড়িতে জয়াকে ফেলে রাখার দুর্ভাবনাটাও নেই এবার। বাড়ি খালি হয়ে যাচ্ছে দেখে কদিন খুব ভাল ব্যবহার করছেন লক্ষ্মণবাবু। সবটাই যে লোক-দেখানো তা নয়। হাজার হোক, অনেকদিন থাকা হল একসঙ্গে—একটু আধটু মন খারাপের ব্যাপারও থাকতে পারে। ওদের পরিকল্পনা জানতে পেরে আশ্বস্ত করার জন্যে নিজেই এগিয়ে এলেন। আসল ভাবনা তো রাত্রে কী হবে তাই

নিয়ে! ওটা কোনও সমস্যাই নয়। এ কদিন জয়া থাকবে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের সঙ্গে, ছেলেকে নিয়ে তিনি নেমে আসবেন নীচে, ইত্যাদি। সত্যি বলতে এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা হতে পারে না। জয়াও রাজি হয়ে যাচ্ছে দেখে দ্বিধা করেনি হিমাদ্রি।

দু চারদিনের অস্বস্তি মানিয়ে নেওয়া কঠিন নয় কিছু। হিমাদ্রির অফিসে যাওয়া এবং ফিরে আসা—এই দুটো সময়ের আগে ও পরের ব্যবস্থা করতেই সময় যেত অনেকটা; সংসার যতই ছোট হোক টুকিটাকি ঝামেলাও কম থাকত না। ঝাড়া হাত-পা হয়ে বরং সুবিধেই হল জয়ার। নিজের ইচ্ছামতো ট্র্যাঙ্ক, সুটকেস, আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারছে—বাঁধাছাঁদাও দু দিনে কম করেনি। যতই একা লাগুক, পাশাপাশি আর একটা ইচ্ছাও কাজ করে যাচ্ছে সামানে। হিমাদ্রিও এলে সারপ্রাইজ দেবে একটা—দ্যাখো হে, তোমাদের, পুরুষমানুষদের মুখে শুধু বাক্যি আছে; কাজ কিন্তু মেয়েরাই করে।

মন খারাপ হল অন্য কারণে। যাতায়াত ও চোখে চোখে থাকার সুবিধে হবে বলে দোতলা ও একতলার মাঝখানের দরজাটা—ওরা ভাড়াটে হয়ে আসবার পর থেকে যেটা বন্ধই করে রাখতেন লক্ষ্মণবাবু—খোলা থাকছে এখন। সকালের চা-টা ওপরেই খাচ্ছে জয়া। লক্ষ্মণবাবুর স্ত্রী, বিশেষত ওঁর মেয়ে, কাকলি, যত্ন করছে সারাক্ষণ। আজ চা খেয়ে নীচে এসে স্নান সেরে বেরিয়েছিল ফিতে ও তালা কেনবার জন্যে। মনটাও খুশি ছিল বেশ। লেক মার্কেটের কাছাকাছি বড় রাস্তায় এসে হঠাৎ ঠাণ্ডা হয়ে গেল হাত-পা। ভিড়ের মধ্যে যা হয়, ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি-মোটরের মধ্যে দিয়েই যে যেমন পারে রাস্তা পার হচ্ছিল—হঠাৎ দ্রুতগামী ট্যাক্সির ধাক্কা খেয়ে সামলাতে গিয়ে ডবলডেকারের চাকার তলায় সেঁধিয়ে গেল একটা মানুষ। চাকা চলে গেছে বুকের ওপর দিয়ে। ফর্সা, সুন্দর মুখখানি বেরিয়ে আছে বাইরে—হাতের অ্যাটাচিটা ছিটকে পড়েছে দূরে, মুখ দিয়ে অনর্গল রক্ত বেরুতে দেখেই বোঝা যায় বেরিয়ে যাচ্ছে প্রাণ। বাসটা থেমে দাঁড়িয়েছিল। চারদিক থেকে ছুটে আসা মানুষের ভিড়ে সঙ্গে সঙ্গে আড়াল হয়ে গেল দৃশ্যটা। তবু, ঠাণ্ডা, আড়ষ্ট হাত-পা এবং বুকের মধ্যে ধড়াস-ধড়াস শব্দ নিয়ে জয়া হঠাৎই ভাবল, যে চলে গেল তার বয়স হিমাদ্রির মতোই হবে।

ভাবনাটা আদ্যন্ত নাড়িয়ে দিল তাকে। পৃথিবীতে এত যে মানুষজন, তাদের কারুর সঙ্গে কারুর বয়সের মিল থাকতে পারে—চোখমুখের সাদৃশ্য থাকাও বিচিত্র নয় কিছু। সাধারণ অবস্থায় জয়া নিজেও হয়তো মেনে নিত সত্যটাকে। এখন তা হল না। হিমাদ্রির কথা মনে পড়ায় হিমাদ্রিতেই থেমে গেল সে এবং ভাবল, এমন হওয়া কি খুবই অসম্ভব যে, যে চলে গেল অফিসে বেরুবার আগে তার হাতের তেলোয় ভাজা মশলা গুঁজে দিয়েছে তার স্ত্রী—বয়সে যে জয়ারই মতো! হয়তো চেহারাতেও; হয়তো চিন্তা ভাবনার সাদৃশ্য নিয়ে সম্পূর্ণ আর এক জয়া সে! এমন কি হতে পারে, এই মুহূর্তে চারদিকে দেয়াল ঘেরা একটি ছাদের তলায় দাঁড়াবার জন্যে সেও প্রস্তুত করছে নিজেকে। জানে না কী হয়ে গেল। এমন যদি হয়, যে-হিমাদ্রি ভোরের ট্যাক্সি থেকে তাকে হাত নাড়তে নাড়তে চলে গিয়েছিল—যার সঙ্গে সঙ্গে একই সঙ্গে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাবে বলে নিজের ভিতরে ক্রমশ ঘন হয়ে উঠছে জয়া, হঠাৎ দুর্ঘটনায় পড়ে সে আব ফিরল না! একজনের সঙ্গে আর একজনের যে-কোনও সাদৃশ্য থাকলে একটি ঘটনার সঙ্গে আর একটি ঘটনার সাদৃশ্য থাকবে না কেন! তা হলেও জয়া থাকবে হয়তো, কিন্তু কোন ফ্ল্যাট, নিজস্ব কোন ঘরবাড়ির নিরাপত্তার মধ্যে তাকে পৌঁছে দেবে হিমাদ্রি!

জয়া এইভাবেই ভাবে। ভাবতে ভাবতে কাঠ হয়ে থাকে। পর পর নিঃশ্বাস জুড়ে জুড়ে এক ভাবনা থেকে পৌঁছে যায় আর এক ভাবনায়; কিংবা আসলে পৌঁছয় না কোথাও—স্মৃতি এখনই তার সঙ্গী হয়ে উঠছে।

ঠিক কতক্ষণ এমন সীমাহীন হয়ে ছিল খেয়াল করেনি। ওপর থেকে কাকলি নেমে এসে সামনে দাঁড়ানোর পর ঘোর কাটল।

'কিছু বলবে?'

'বাব্বা!' ওকে লক্ষ করতে করতে কাকলি বলল, 'কী এত ভাবছ বলো তো!'

কাকলিকে দেখেই বিছানায় আধশোয়া হয়েছিল জয়া। এবার পুরোপুরি উঠে বসতে বসতে বলল, 'ডাকছিলে?'

মুখে দিশেহারা ভাব। চোখ কাকলির ওপরে থাকলেও কাকলিকেই দেখছে না। যে হাতে অ্যাটাচি ধরে ছিল লোকটি, মনে পড়ল, মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে থাকার পরও অদ্ভুত ভঙ্গিতে সেই হাতটা মেলে ধরেছিল শূন্যে। মুঠোটা খুলতে গিয়েও খোলেনি। আর কিছু দেখতে পাবার আগে লোকজন ছুটে গিয়েছিল সেদিকে। চোখের সামনে এখনও সেই ভিড়টাকেই দেখল জয়া।

'তোমার ফোন।' কাকলি বলল, 'ধরতে বলেছি। চলো তাড়াতাড়ি।'

'কে!'

'তা জিজ্ঞেস করিনি। বাবা ধরেছিল। বলল একজন মহিলা। ডেকে দিতে বলল—'

নিজের মনে অল্প একটু ভাবল জয়া। তার চেনাশোনা কম। তার চেয়ে বড় কথা কজন আর চেনে তাকে! যারা চেনে, অর্থাৎ তার ও হিমাদ্রির বাড়ির লোকজন, তারা ফোন করে না। কিংবা, এমন কোনও ঘটনা ঘটে না যার জন্যে ফোন করার দরকার হয়। কাছাকাছি সময়ের মধ্যে, মনে পড়ে, হিমাদ্রির দিদি করেছিল একদিন—হার্ট অ্যাটাক হয়ে সেদিন নার্সিং হোমে যেতে হয়েছিল বড় জামাইবাবুকে। কে হতে পারে?

প্রশ্নটা প্রশ্নই থাকল। নিজেকে গোছাতে গোছাতে জয়া বলল, 'একটু ধরে রাখো। আমি আসছি।'

কাকলি চলে যাবার পর বাথরুমে গেল জয়া। ঝাপসা, ঘোরলাগা ভাবটা কাটানোর জন্যে জল দিল চোখেমুখে। রোদ দেখে মনে হয় বেলা গড়িয়েছে অনেকটা। সাড়ে দশটা কি এগারোটা—মোটামুটি আন্দাজ করা যায় সময়টা। গোটা শরীর জুড়ে তবু মাঝঘুম থেকে উঠে আসার অনুভূতি। জলের স্পর্শে কিছুটা চাঙ্গা বোধ করলেও দরজা পেরিয়ে দোতলার সিঁড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে হাই উঠে এল গলায়। কিছু বা অস্বস্তি কারণে কৌতূহলটা আগ্রহে পরিণত হল না। লক্ষ্মণবাবুর ফোন নাম্বারটা সেরকম বুঝলে কাউকে কাউকে দিয়ে রাখে হিমাদ্রি—যদি হঠাৎ দরকার পড়ে। তা ছাড়া, নিজেদের দরকার হলে, একটু এগিয়ে ওষুধের কিংবা পেইন্টস-এর দোকানে গিয়ে, কিংবা, সেখানেও না পেলে পোস্টাপিসে গিয়ে ফোন করে তারা। তা হলে এমন কেউ যাকে নাম্বারটা দিয়ে রেখেছে হিমাদ্রি। আত্মীয়স্বজন কেউ? তা না হলে মহিলা কেন!

ফোনটা থাকে বসার ঘর ও শোবার ঘরের মাঝখানে চওড়া প্যাসেজে। ঢাকা, তবু বারান্দাও বলা যায়। রেলিংয়ের আড়াল নিয়ে খাঁজ-কাটা রোদ্দুর ছড়িয়ে পড়েছে মেঝেয়। ওই অবধি পৌঁছে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে খবরের কাগজ পড়তে দেখল লক্ষ্মণবাবুকে।

জয়াকে দেখে, উঠে শোবার ঘরের দিকে হেঁটে যাবার আগে বললেন, 'দ্যাখো, আছে কি না—'

অস্বস্তি আড়াল করার জন্যে হাসল জয়া। কথা শুরু করার আগে ভিজিয়ে নিল গলাটা।

'হ্যালো—'

'আমি শীলা বলছি। মিসেস রায় তো?'

'কে?'

পুরোপুরি চেনার আগে গলা কেঁপে গেল জয়ার। ছোট একটা হাই উঠতে গিয়েও নেমে গেল বুকে।

'শীলা—শীলা। মিসেস সাধুখাঁ।'

'ও। বলুন। নমস্কার।'

'নমস্কার।' গলায় অবাঙালি টান। সামান্য থেমে শীলা বলল, 'আপনার হাসব্যান্ডের অফিসে ফোন করে পেলাম না—'

কথাটা শেষ করতে দিল না জয়া। তাড়াহুড়ো করে বলল, 'উনি তো নেই। ট্যুরে গেছেন।'

'জানি। সেটা শুনেই আপনাকে ফোন করছি।'

জয়া চুপ করে থাকল। সম্পর্কটা হিমাদ্রির সঙ্গে তার—তার সঙ্গে হিমাদ্রির নয়।

'শুনুন, ভাই। একটা খুব আরজেন্ট অ্যাসাইনমেন্ট আছে। আজ কখন সময় দিতে পারবেন?'

'আজই!' সাত হাজারের কাঁটাটা এই সময়েই জ্বালা করে উঠল গলায়। নিচু, আড়ষ্ট গলায় জয়া বলল, 'কিন্তু আমার স্বামী তো—'

'স্বামী কী করবেন!' শীলাই কাটল এবার। শব্দ ফোটানো হাসিতে সহজ করার ভঙ্গি। বলল, 'ঘাবড়াবার আছে কি এতে? স্বামীর পারমিশান তো আছেই। উনি কন্ট্র্যাক্ট সই করেছেন—এই নাম্বারটাও দিয়েছেন। সব কথাই তো হয়েছে মিস্টার সাধুখাঁর সঙ্গে। আপনি জানেন না কিছু?'

'জানি।'

'তা হলে প্রব্লেম কী?'

'না, মানে—।' ঠিক কী বলতে চায় নিজেও বুঝতে পারল না জয়া। ইতস্তত করে বলল, 'ঠিক একা তো—'

'একা আপনাকে আসতে হবে না। কখন রেডি থাকবেন বলুন? আমি নিয়ে আসব।।'

এমন জেরার সামনে এর আগে কখনও পড়েনি। আজ মানেই কি আজ, এত কি জরুরি যে এক-দুদিন অপেক্ষা করা যায় না! বিমূঢ় বোধ করায় জবাব দিল না জয়া। শোবার ঘরের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন লক্ষ্মণবাবু। ও তখনও ফোন ধরে আছে দেখে ঢুকে গেলেন আবার। অস্বস্তি বাড়ছে, ঘাম টের পেল গলার নীচে। ছেড়ে দেবার ভাবনা থেকে রিসিভারটা হাত বদল করে আবার কানে দিল জয়া।

'হ্যালো!'

'শুনছি তো!'

'কখন আসব তবে?'

'দুটো।' জয়া হঠাৎই বলল, 'দুটো নাগাদ—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' শীলা বলল, 'রেডি থাকবেন। আমি না থাকলে মিস্টার সাধুখাঁ যাবেন। ঠিক আছে তো?'

কথার দায়িত্ব যে বলে তার। শীলাকে দোষ দেওয়া যাবে না। জয়া চুপ করে থাকল।

'হ্যালো—হ্যালো—'

'বলুন না!'

'ঠিক আছে তো? টু পি-এম—'

'আচ্ছা—'

রিসিভারটা নিজেই নামিয়ে রাখল জয়া। মেঝের ওপর পায়ের অবস্থান অনুভব করতে করতে কিছু একটা ভাবতে চাইল। পারল না। বৃষ্টিতে ঝাপসা কাচের মধ্যে দিয়ে কাউন্টারের ওদিকে যাকে বসে থাকতে দেখছে তার চেহারা রোগা, রং ফর্সা, মুখে অভিব্যক্তি নেই কোনও। চোখ দুটো শুধুই তাকিয়ে থাকে সামনে। তখন ফিরতে ফিরতে—তাকে দেখবার জন্যে লক্ষ্মণবাবু কিংবা আর কেউ আসছে না দেখে, ভাবল, সাধুখাঁর টেলিফোন নাম্বার জানা থাকলে সে আবার ফোন করার কথা ভাবতে পারত। জানে না বলেই সিঁড়ি নামাটা স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি দ্রুত হয়ে উঠল।

কিন্তু, বিচলিত হবার মতো সত্যিই কি কিছু ঘটে গেল এর মধ্যে! প্রথম দিন যে অপরিচয় ছিল এখন আর তা নেই। সাধুখাঁকে চেনে, শীলাকেও। দেখা হলে মাথা নাড়া গোছের চেনা নয়। একদিন বাড়িতেও এসেছিল ওরা। তা ছাড়া, ক্যামেরার সামনেও নতুন দাঁড়াচ্ছে না। তার চেয়ে বড় ব্যাপার অ্যাডভান্সের টাকাটা। হিমাদ্রির ওপর যতই রাগ করুক, টাকাটা দিয়ে শেষ মুহূর্তের বাধাটা সাধুখাঁই পার করিয়ে দিয়েছে; না হলে তার আগে মুখ দেখে মনে হচ্ছিল হাল ছেড়ে দিয়েছে হিমাদ্রি। ভাবতে গেলে এগুলোও ভাবতে হবে। তাড়া? টাকাটা তাড়াতাড়ি শোধ করে দেবার জন্যে সে নিজেও কি তাড়া দেয়নি হিমাদ্রিকে? সাধুখাঁ ব্যবসাদার লোক, জয়ার ক্ষোভ ও অস্বস্তি অনুমান করে হিমাদ্রি কি বলেনি, টাকাটা ফেলে রাখবে না বেশি দিন? সত্যি বলতে, এর মধ্যে হিমাদ্রি যত না তার চেয়ে বেশি তাড়া দেখিয়েছিল সে নিজেই—এমন কী, তার পরেও এক দিন কথায় কথায় বলেছিল হিমাদ্রিকে, অ্যাডভান্সের টাকা গলায় ঝুলিয়ে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে যাওয়া ঠিক হবে কি? ঠিক এই কথাগুলিই হয়তো নয়, তবে মানেটা একই ছিল। 'আমার কথা ছেড়ে দাও—', বলেছিল, 'তোমার কেমন লাগবে?'

এসব প্রশ্নের উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দেওয়া যায় না। হিমাদ্রিও দেয়নি। দিন দুয়েক পরে অফিস থেকে ফিরে এসে বলল, 'সাধুখাঁকে বললাম আজ—'

'কী বলল?'

'কী আর! হাসল। পাগল ভাবল হয়তো। এগুলো প্রফেশনাল ব্যাপার, বলছিল, তোমার আমার চাওয়ার ওপরেই নির্ভর করে না। অ্যাসাইনমেন্ট পেলে ডাকবে। তাড়াটা ওরও।'

'তার মানে ঝুলিয়ে রাখল এখন!'

'ঝোলানোর কী আছে!' জয়াকে অধৈর্য দেখে হিমাদ্রি বলল, 'সিরিজ ফোটোগ্রাফ না কীসের কথা বলছিল। কথাবার্তা চলছে, এখনও পাকা হয়নি কিছু।'

'ভেবেছিলাম ঝাড়া হাত-পা হয়ে উঠে যাব।' জয়া বলল, 'টাকা যারা দেয় তাদের অধিকারও থেকে যায়। মনে হয় ফ্ল্যাটটা ওদেরই, আমরা ভাড়াটে!'

এ-কথারও জবাব দেয়নি হিমাদ্রি। তাকানোর ধরনটা পালটে যাচ্ছে ক্রমশ; বলার কথাটা ফুটে ওঠে দৃষ্টিতে। কয়েক মুহূর্ত অন্যমনস্ক থেকে বলেছিল, 'দেখা যাক। ওপরের টেলিফোন নাম্বারটা দিয়ে এলাম। আমি থাকি ভাল, না হলে তোমাকেই কন্ট্যাক্ট করতে বলেছি।'

তখন ভিতর পর্যন্ত খতিয়ে না দেখলেও এ সব কথা তারাই বলেছিল। তা হলে প্রতিরোধটা আসছে কেন!

উত্তেজনা আলস্য আনে শরীরে। আলস্যে ঢুকে পড়ে কৌতূহল। ঠিক বোঝা যায় না অনিচ্ছার সঙ্গে কখন জায়গা বদল করে ইচ্ছা। একটার পর একটা হাই উঠে আসে; অথচ, নিজেই বুঝতে পারে জয়া, ক্লান্তি বোধ করার মতো কারণ সত্যিই ঘটেনি। এক সময় মনে হয় বাস্তবের এই খেলায় বস্তুত কোনও ভূমিকা নেই তার। কোনও দিনই কি ছিল! হাতের অ্যাটাচিটা দূরের দিকে ছুড়ে দিয়ে রক্তে ভাসতে ভাসতে যে-লোকটা চলে গেল, তারও ছিল না।

শুধু দুটো নাগাদ বন্ধ দরজার সামনে সাধুখাঁদের হলদে ফিয়াটটা থামবার পর নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারল জয়া, যাবার জন্যেই এতক্ষণ সে তৈরি করেছে নিজেকে।

লক্ষ্যে ভুল থাকে না কোনও। পৌঁছুবার রাস্তাটাই যা বদলে যায় শুধু। জমা জলের অসম্ভব-সাধ্য খোঁদল পেরিয়ে এসে যদি বা কখনও মনে হয় ভুল রাস্তায় আসা হল, আবার ঠিক রাস্তায় পৌঁছুবার চেষ্টায় পেরুতে হয় সেই একই খোঁদল—আকারে প্রকারে যা হয়তো আরও অনেক বড় এবং অনতিক্রম্য। নতুন করে চেষ্টা করার ইচ্ছাটা সত্যিই কি কাজে লাগে তখন! ভুল রাস্তায় হলেও এত দিন ধরে এত দূর হেঁটে আসার ক্লান্তির ছাপ পড়ে শরীরে। মনটাও সাদা থাকে না—মনে পড়ানোর জন্যে সারাক্ষণ সেখানে লেগে থাকে বসন্তের দাগ। এগোতে গেলে টান পড়ে রক্তে। যেমন তেমন করে পাওয়া মাথার ওপরের ছাদ ও চারদিকের দেয়ালঘেরা জায়গাটাকেই তখন আঁকড়ে ধরতে হয় নিজের বলে। মাথা গুঁজতে হলে এখানেই—এইখানেই নিঃশ্বাস নেওয়া কিংবা হাঁফ ছাড়া। রাস্তাটা ভুলই শুধু নয়, চেনাও। আর, চেনা বলেই ফেরার ভয় বেশি করে চেপে বসে বুকে।

এর বেশি আর কিছু ধরা পড়ে না জয়ার ভাবনায়। দূর থেকে তাকিয়ে দেখে হিমাদ্রিকে—কিছু আঁচ করতে গিয়ে শিউরে ওঠে শরীর। তল পায় না। ধকলটা, মনে হয়, একটু বেশিই সহ্য করেছে হিমাদ্রি; হয়তো বা করেও যাচ্ছে। বেঁচে থাকায় একরকম শব্দ থাকে, শব্দের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়লেই অসহনীয় লাগে চুপচাপ অবস্থাটা। এতকাল ভাবত কাছাকাছি থাকাটাই সব, কাছাকাছি গায়ে-গায়ে লেগে থাকলেই সম্পূর্ণ হয় বৃত্তটা। ঠিক নয়। আঠা বলতে মন। সেখানে শুষ্কতা ছড়ালে আলগা দশাটা অনুভব করা যায় আরও বেশি করে।

প্রয়োজনের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে যতই বোঝাক নিজেকে, বিষণ্ণতা মাখানো এক ধরনের

ক্লেদ সারাক্ষণ ছুঁয়ে থাকে তাকে। ক্লেদ থেকে উঠে আসে অভিমান। ক্রমশ ম্লান হতে থাকে জয়া। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সিঁথিতে সিঁদুর ও কপালে সিঁদুরের টিপ পরতে পরতে সন্দেহ হয়, একটু কি রোগা হয়ে গেছে সে, চোখের কোলে কালি পড়েছে একটু! ভাবতে ভাবতেই প্রাণপণে সাজিয়ে তোলে নিজেকে। অফিস থেকে বাড়ি ফিরে সাজগোজ-করা বউ দেখতে ভালবাসে হিমাদ্রি। ওকে চা, খাবার দিতে কথা বলার ছলে যতটা পারে দেখে নেয় জয়া। দেখতে দেখতেই সন্দেহ কিরকির করে চোখ। অনেকটা রোগা হয়ে গেছে হিমাদ্রি—সেটা কিছু নয়; কিন্তু আরও একটু গম্ভীর হয়েছে কি? স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অন্যমনস্ক? রাতের বিছানায় কখনও ঘনিষ্ঠ হতে গিয়ে কেন মনে হয় জোর কমে গেছে হিমাদ্রির—আগের মতো আর তাপ ছড়াতে পারে না শরীরে। হিমাদ্রির নিরুত্তাপে উৎসাহে টান পড়ে তারও। অভিমানে ভরে ওঠে আবেগের ছেড়ে যাওয়া জায়গা।

অবস্থাটা মেনে নিতে পারে না জয়া। জেগে থাকায় যা পারে না সেটাকেই পেতে চায় ঘুমের মধ্যে হিমাদ্রির শরীরে লেপ্টে থেকে। মানুষ দুটি হলেও সম্পর্ক অবিভাজ্য। বৃষ্টি পড়ে সারারাত। অঝোর সেই শব্দে আচমকা ঘুম ভেঙে গেলে অন্ধকারে ভ্যাবাচাকা খাওয়া অবস্থায় দেখে নেয় চারদিক। হঠাৎ বিদ্যুতের আলো যতটা দেখায় আড়াল করে রাখে তার চেয়ে বেশি। তখন ভাবতে হয়, সব ঠিকঠাক আছে তো! বদলালেও সবই বদলে যায়নি তো! জবাব পায় না কোনও। বড় একা লাগে নিজেকে। ভয়টা ফিরে আসে।

সেদিন সাধুখাঁ ও শীলার সঙ্গে সাধুখাঁর স্টুডিয়োতে গেলেও ফিরে ছিল একা। ওদের সঙ্গী না হওয়ার ব্যাপারে ওর জেদ দেখে জোর করেনি সাধুখাঁ। কিছুটা রাস্তা হেঁটে আসার পরও যখন গা গুলানো অস্বস্তিটা কাটল না, জোর কমে গেল পায়ের, তখন—ড্রাইভারকে রাস্তার নির্দেশ দিয়ে সিটের পিছনে যতটা সম্ভব নিজেকে এলিয়ে দিয়ে ভেবেছিল, হিমাদ্রির অজ্ঞাতে আরও একটা অভিজ্ঞতা হয়ে যাচ্ছে তার। বারণ করার ব্যাপারে যদি হিমাদ্রির ধারণাই সত্যি হয়, তা হলে আজ আর বাড়ি পৌঁছুতে পারবে না সে—সুন্দরী এবং একা যুবতী হওয়ার বিপদের সঙ্গে মিশে যাবে একসঙ্গে। যদি কিছু ঘটে, ভেবেছিল, ঘটনায় স্বেচ্ছাচারিতা থাকবে না কোনও। তারপর ট্যাক্সিটা যখন তাকে পৌঁছে দিল গন্তব্যে, ভাড়া নিল এবং মিটার তুলে হর্ন দিতে দিতে চলে গেল দূরে—এমন কী সে কোথায় গিয়েছিল ফিরল কোথা থেকে জানবার জন্যে ওপর থেকে নীচে ছুটে এল না কাকলি, তখন, স্যুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে চমকে-ওঠা ঘরের আলোয় একা দাঁড়িয়ে ভেবেছিল, হয়তো শীলার কথাই ঠিক—যে-ভাবনা থেকে সে না-না করে গেল সারাক্ষণ, রাগ দেখাল কিংবা চোখের জল ফেলল, কন্ট্র্যাক্ট খারিজ হবে, টাকাটা ফেরত দিতে হবে এবং আরও নানাভাবে হিমাদ্রিকে হেনস্থা হতে হবে ভেবে শেষ পর্যন্ত নিমরাজি হল ক্যামেরার সামনে নিজেকে বেশ কিছুটা অনাবৃত করতে, তার মধ্যে আবেগ থাকলেও যুক্তি ছিল না কোনও। সে তো ভেবেই নিয়েছিল, কন্ট্র্যাক্টের অজুহাত দেখিয়ে শীলা যা বলছে তা আসলে মতলব, হিমাদ্রির অনুপস্থিতির সুযোগে তাকে ব্যবহারের চেষ্টা করছে সাধুখাঁ, শীলার কাজ শেষ হলেই লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। সেসব কিছুই হল না। স্টুডিয়োয় পৌঁছুনোর পর শীলার হাতে তাকে ছেড়ে দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেল সাধুঁখা, স্ন্যাপরুম থেকে বেরিয়ে আসার আগে পর্যন্ত দেখা দেয়নি আর। এমনকী এসব নিয়ে কথাও বলেনি কোনও। পরে ভেবেছিল জয়া, যা ঘটবে না তারই জন্যে কেন সে প্রস্তুত করেছিল নিজেকে! ঘটনাগুলোর

সঙ্গে অভিজ্ঞতার সম্পর্ক নেই। তা হলে কী অজ্ঞতা? ভয়? না কি গত দু-আড়াই বছরে সব বোধ ফেলে দিয়ে শুধু আশঙ্কাটাকেই ধরে রেখেছে সে?

দৃশ্য দৃশ্যই। চাইলেই ফিরে আসার জন্যে লাইন দিয়ে থাকে সামনে। কাউন্টারের ওদিকে যে বসে আছে তার রং ফর্সা, মুখে অভিব্যক্তি নেই কোনও। নো অ্যাডমিশনের পর্দা সরিয়ে কী আছে না আছে এখন আর তা ভেবে বলতে হয় না। এমনকী নিজের এবং শীলার বসে থাকার ভঙ্গিও মনে পড়ে স্পষ্ট। হারানো বলতে সেই মুহূর্তের অনুভূতি—চেষ্টা করলে হয়তো সেটাও ফিরিয়ে আনতে পারবে।

'আপনি না করলে আর কেউ করবে—।' শীলা বলেছিল, 'মডেলের অভাব নেই। তারা কেউ ব্যাড গার্ল নয়।'

জয়া জবাব দেয়নি। একই কথা বার বার বলতে বলতে ধার কমে গেছে; শোনবার হলে আগেই শুনত শীলা।

ওকে চুপ করে থাকতে দেখেও ধৈর্য হারাল না। ন্যুড অ্যালবামের পাতা ওলটাতে ওলটাতে এক জায়গায় থামল, নিজেকে দেখাল। জয়াকে দেখানোর চেয়ে নিজেই দেখছে স্থির চোখে। পরের পৃষ্ঠায় যাবার আগে মুখ তুলল শীলা।

'ফোটোগ্রাফির এস্‌থেটিক সাইডটা আপনি বুঝতে পারছেন না।' বলতে বলতে হাসল শীলা, 'এসব পোজ আপনাকে দিয়ে হবে না—আমরাও ডিম্যান্ড করছি না। আমি পারলাম কী করে। অ্যাজ এ উয়োম্যান আমার লজ্জা নেই।'

'আমি পারব না।' কানের ভিতর অসহ্য তাপ অনুভব করতে করতে অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম কথা বলতে পারল জয়া। শীলার চোখই তখন ক্যামেরা। বুকের ওপর আঁচল গোছাতে গোছাতে বলল, 'আমি আপনার মতো নই। এটা আপনার পেশা।'

'আপনার নয়! আপনি টাকা নেননি? কন্ট্র্যাক্ট সই করেননি?' শীলা কি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল হঠাৎ? থেমে বলল, 'ব্রিচ অফ কন্ট্র্যাক্টের জন্যে আপনাদের এগেনস্ট্‌-এ আমরা আরও কয়েক হাজার টাকার ড্যামেজ স্যুট করতে পারি কোর্টে—'

গালের নীচে চোয়াল নামে যে একটা আকৃতি আছে সেটা তখনই টের পেয়েছিল জয়া। বলতে চাইছিল, করুন। তখনই মনে পড়ে হিমাদ্রি ফিরলেই তারা উঠে যাবে নতুন ফ্ল্যাটে—এদিকে টাকা থেকে অধিকারের ব্যাপারটা বাদ দিতে পারেনি এখনও। চোয়াল নয়, তাপের ভিতরের শীতে ততক্ষণে কোঁকড়াতে শুরু করেছে সে। গাড়িতে নিয়ে আসতে আসতে সাধুখাঁ বলেছিল অ্যাসাইনমেন্টটা খুবই জরুরি, না হলে এভাবে বিব্রত করত না তাকে—হিমাদ্রির ফিরে আসার অপেক্ষা করত। আজ ছবি তোলা হলে কালই রেডি হয়ে যাবে প্রিন্ট। বাইরে যাবে। যদি সব ঠিকঠাক লেগে যায়—টাচ উড না কী একটা কথা বলেছিল তখন, টাকা আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে। চাই কি কপালও ফিরে যেতে পারে। তাঁদেরও তো টাকার দরকার। এইসব এবং আরও অনেক কথা, সুন্দর করে বলা। দরকার যে, তার চেয়ে বেশি আর কে জানে তা। অ্যাডভান্সের টাকাটা না হয় শোধ হয়ে যাবে। কিন্তু, সেইখানেই থেমে থাকবে না কিছু। হিমাদ্রির সঙ্গে যে-সিঁড়ি দিয়ে আটতলায় উঠেছিল জয়া, সেই একই সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামতে লাগল দ্রুত। মনে পড়ল, অবনীকে এড়িয়ে যাচ্ছে হিমাদ্রি; এরই মধ্যে ভুলে গেছে যোধপুর পার্কের রাস্তা। বলেছিল গৃহপ্রবেশের দিন ডাকবে সকলকে। এতদিন ধরে দেনা ফেলে রেখে যদি কোনও গ্লানি জমে থাকে, দেনা শোধ হলেও মিটবে না

তা। আগেরটা আগে।

এসব ভেবে জিব ভারী হয়ে উঠল জয়ার।

শীলা সময় নিচ্ছিল। নরম হয়ে বলল, 'আপনাকে নেকেড হতে বলছি না। ব্রা পরবেন না, ব্রেস্টের খানিকটা সাজেশান পেলেই চলবে। তা ছাড়া—', জয়া স্থির হয়ে আছে দেখে বলল শীলা, 'এটা তো অ্যাডভার্টাইজমেন্টে ব্যবহার করা হবে না। কেউ জানতেও পারবে না। বিসাইড্স, আমরা আপনার বিউটিটাকেই ধরব।'

দৃশ্য দৃশ্যই থাকে। নিজেকে দেখার জন্যে গিয়ে দাঁড়াতে হয় নিজেরই সামনে। তেমন করে ভাবলে বদলাতে থাকে জীবনও। এতদিন ফ্ল্যাট কেনা ও ফ্ল্যাটের পজেসন পাওয়া নিয়ে দুর্ভাবনা ছিল; তার মধ্যে ঘটনা ছিল না কোনও। রক্ত দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জয়া টের পেল ঘটনা ঘটছে—প্রস্তুতিহীন আক্রমণ সামলাতে হাঁফ ধরে যাচ্ছে বুকে।

দু তিনদিনের জন্যে বাইরে গেলে সাধারণত খবর পাঠায় না হিমাদ্রি। চিঠি লিখলে চিঠি পৌঁছুতে যে সময় লাগে তার আগে নিজেই ফিরে আসে। কোনও কারণে প্রোগ্রামের হেরফের হলে কেউ না কেউ জানিয়ে দেয় অফিস থেকে। বাড়িতে ফোন নেই যে ফোন করবে। তা ছাড়া, চাকরিটাও এমন কিছু বড় নয় যে ট্রাঙ্ক লাইনে বউয়ের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে টাকা গুনবে অফিস । হিমাদ্রি যায় এবং ফিরে আসে। কয়েকবার দেখতে দেখতে নিজেও ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল জয়া। এবার অবশ্য বলেছিল দেরি হবে। সেইজন্যেই, জয়া আশা করেছিল এবার অন্তত একটা চিঠি পাবে সে। দিন চারেক অপেক্ষা করার পরও যখন কিছু এল না, তখন, দেরি হবে জেনেও; ফোন করল হিমাদ্রির অফিসে। শেখর নামে একটি ছেলেকে চেনে—এর আগে কখনও সখনও ফোন করে হিমাদ্রিকে জায়গায় না পেলে শেখরকেই খবর দিয়ে রাখত জয়া। ফোন পেয়ে শেখর বলল, 'এবার তো লম্বা ট্যুর—অনেকগুলো জায়গা—'

'বলেছিল।' জয়া বলল, 'কবে ফিরবে বলেনি কিছু। চিঠিও পাইনি। তাই ভাবলাম—'

'চিঠি দিলেও কি পাবেন এত তাড়াতাড়ি!'

চিঠিটাই বিষয় নয়। জয়া চুপ করে থাকল।

'ভাববেন না।' শেখর বলল, 'আমি দেখছি। কোনও খবর পেলে জানাব আপনাকে।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখে। আস্তে। আলস্যে ঢুকে পড়ে বিষণ্ণতা।

গোছগাছে মন নেই আর। গোড়ার উৎসাহে যা করেছিল তাতেই এগিয়ে আছে অনেকটা। কী সঙ্গে নেবে, কী ফেলে যাবে, মোটামুটি তার একটা হিসেব রেখে দিয়েছে মাথায়। যা করার হিমাদ্রি ফিরলেই করবে। মনের গোলমালে দুটো দিন কেটে গেল দুশ্চিন্তা ও আচ্ছন্নতায়। ভাবনায় ছেদ নেই কোনও। এখন ভাবছে লেক রোডের বাড়িতে পড়ে না থেকে অন্যবারের মতো বাপের বাড়ি চলে গেলে পারত। গোছগাছের ভূত মাথায় না চাপলে ঘটনাও ঘটত না। সাধুখাঁর স্টুডিয়োতে যাবার দিনটা মনে আছে জয়ার। মঙ্গলবার। বেস্পতিবার দুপুরে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে ঠাণ্ডা করে গেল চারদিক। রোদ আড়াল হয়ে অবেলা ছড়িয়ে পড়ল আকাশে। বিছানায় শুয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অল্প তন্দ্রা এসেছিল, দরজায় বেল শুনে উঠে বসল। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলেই ছ্যাঁত করে উঠল বুক। দরজা থেকে দূরে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে রোগা ও ফর্সা, সাধুখাঁর স্টুডিয়োর কাউন্টারে বসে-থাকা সেই যুবকটি। মুখে অভিব্যক্তি নেই কোনও। তাকানোর ধরনে সামনে

বহুদূর পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছুই দেখছে না। হাতে বড় একটা খাম। জয়ার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে যেমন ছিল তেমনিই দাঁড়িয়ে থাকল নিঃশব্দে।

মেরুদণ্ডের শীতে থরথর করে কেঁপে উঠল জয়া। কীসের প্যাকেট বুঝতে পারল না, শেষ পর্যন্ত নেবে কি না তাও না। পরে ভাবল, দরজা খুলে অচেনা একটি লোককে সামনে রেখে দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন এবং দৃষ্টিকটু। তখন, অপ্রস্তুত হাতে খামটা নিয়ে অস্ফুট গলায় বলল, 'ঠিক আছে—'

যুবকটি দাঁড়িয়েই থাকল। এবার জয়াকেই দেখছে। হঠাৎ বলল, 'রিপ্লাই?'

ধাঁধা লাগানো কথা । হয়তো চিঠিপত্র আছে খামে—হয়তো সেদিনের ঘটনার জের, হয়তো অন্য কিছু। জয়া অনুভব করল ঘাম ফুটছে, নীচে থেকে ওপরে উঠে আসা শীতটা আবার নেমে যাচ্ছে নীচে। পায়ের তলায় মেঝে স্পর্শ করে থাকার যে অনুভূতি তাও পাল্টে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সামলে নিয়ে বলল, 'আপনি ভেতরে এসে বসুন—'

দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াতেই ঘরের ভিতর ঢুকে এল যুবকটি। সামনের সোফাটা এড়িয়ে গিয়ে চলে গেল দরজা থেকে দূরতম কোণে। এমন ভঙ্গিতে বসল যাতে মনে হবে বসবার জন্যেই এসেছে।

যেমন খোলা ছিল তেমনিই খোলা থাকল দরজাটা। বৃষ্টি থেমে গেলেও মেঘে ভার হয়ে আছে আকাশ। লোকজন নেই রাস্তায়। এমন একটা সময় যখন কে এল না এল দেখবার জন্যে মুখ বাড়াবে না কেউ। ভাবতে ভাবতে খামটা নিয়ে শোবার ঘরে চলে এল জয়া। বিছানায় বসে ব্যস্ত হাতে মুখ খুলল সেলোটেপ-আঁটা খামের।

খামের ভিতর খাম। তার গায়ে জেম ক্লিপ্ দিয়ে আঁটা চিরকুট। ভিতরের খামটা খোলার আগে দ্রুত চিঠিটা পড়ে নিল জয়া—'কয়েকটা প্রিন্ট পাঠালাম। চমৎকার এসেছে। আমাদের ক্লায়েন্ট এখন কলকাতায়। দেখে খুব হ্যাপি। তবে ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে চলবে না। রঙিন ফিল্ম্ তুলতে হবে। ব্যাপারটা আরজেন্ট। ক্লায়েন্টও আলাপ করতে চায় আপনার সঙ্গে। আজ সন্ধ্যাবেলায় গাড়ি যাবে। রেডি থাকবেন। না বলবেন না, তাতে অসুবিধে হবে। চিঠির বাহককে কোন সময় গাড়ি যাবে বলে দেবেন। ফেরার ব্যবস্থা আমরাই করব।'

সম্বোধন নেই, নীচে সই নেই কোনও। লেখার ছাঁদটা মেয়েলি এবং দায়সারা রকমের দ্রুত। তবে, বিষয়টা বুঝিয়ে দিচ্ছে ঠিকই।

চিরকুটটা পড়ার পর নতুন কোনও অনুভূতি এল না শরীরে। শুধু সামান্য দ্রুত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস।

ঘটনা ঘটে গেলেও থেকে যায় ধারাবাহিকতা। অনিশ্চিত অনুভূতির মধ্যেই জয়া বুঝতে পারল, রাস্তার শুরু থেকে খানিকটা এগিয়ে এসেছে সে; তবে শুরুটা এখনও হারিয়ে যায়নি চোখ থেকে। কিছু না-জানা থেকে মঙ্গলবার যা ঘটেছিল, যতই ভয় বা তাড়া দেখাক, সমস্ত জানা হয়ে যাবার পর বেস্পতিবারেও তা ঘটবে না। অধিকারের দাম না বুঝে এরই মধ্যে দিয়েছে অনেকটা। এর পরের দেওয়া না-দেওয়ার অধিকারটা তার। সে যেতে না চাইলে এখান থেকে জোর করে তুলে নিয়ে যাবার সাধ্য ওদের নেই।

এসব ভেবে চোয়াল দৃঢ় হল জয়ার। এসব ভাবতে ভাবতেই চিরকুটটা বালিশ চাপা দিয়ে সঙ্গের খামটার মুখ ছিঁড়ল সে। পাঁচটা না ছ'টা ছবি। না-দেখার মতো করে দেখলেও চিনতে অসুবিধে হয় না। ছবি যার, অনাবৃত গলা, ঘাড় এবং বোতাম-খোলা ব্লাউজের ভিতর

থেকে বেরিয়ে আসা স্তনের আভাসও তারই। সুতরাং খুঁটিয়ে দেখার দরকার হল না। গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়া অনিশ্চিত অনুভূতিটা ততক্ষণে মাথা অব্দি পৌঁছে সৃষ্টি করেছে জ্বালার; জ্বালাটাই জল এনে দিল চোখে। তফাত এইটুকু, আজ সে সবই ভাবতে পারছে পরিষ্কার করে।

ছবির প্রিন্টগুলো ও চিরকুটটা আবার খামে ভরে, সেলোটেপ এঁটে নিজেকে যতটা সম্ভব স্বাভাবিক করে নিল জয়া। তারপর বসার ঘরে এল।

একইভাবে বসে আছে লোকটা। উদাসীন মুখ। জয়াকে দেখে উঠে দাঁড়ালেও তাকাল না।

'এটা নিয়ে যান।' খামটা ফেরত দিয়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্যে থামল জয়া। তারপর বলল, 'এসব পাঠাবার দরকার নেই। বলে দেবেন, আমি যাব না।'

দরজা খোলাই ছিল। খানিক পরে খেয়াল হল চলে গেছে লোকটা। তবু, দরজাটা বন্ধ করবার জন্যে ব্যস্ত হল না জয়া। সেইখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অভ্যাসের হাতে ব্লাউজের হাতাটা কাঁধের দিকে টেনে নিল একটু। আঁচলটা জড়িয়ে নিল গায়ে।

নিজেকে দেখার জন্যে দাঁড়াতে হয় নিজেরই সামনে। হিমাদ্রির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে অন্যমনস্ক জয়া—হঠাৎ মনে হয় টেলিফোন বাজছে, এইবার নেমে আসবে কাকলি। কিংবা বেল পড়বে দরজায়। হঠাৎ ভাবনায় থরথর করে ওঠে মেরুদণ্ড। নিজের শোয়া, বসা কিংবা দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও এসব কারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠার প্রতিক্রিয়াগুলো টের পায় সে। নিজের ভিতরেই চুপচাপ হতে থাকে। ছায়া পড়ে চোখের কোলে। আরও একটু রোগা হয়ে যায় সে; আরও একটু অন্যমনস্ক।

যেমন তেমন করে কটা দিন কাটিয়ে দিলেও ভয় শুরু হল হিমাদ্রি ফিরে আসার পরে। ওকে কতটা বলবে ভাববার আগেই ঠিক করে নিল কতটা বলবে না এবং এই চেষ্টায় নিজেই পাঁচিল তুলতে শুরু করল তার ও হিমাদ্রির মধ্যে। প্রশ্ন আসবার আগেই উত্তরটা ঠিক করে রাখে মনে। একই প্রশ্নের ছাল ছাড়িয়ে বের করে নানারকম উত্তর। বদলে যায় ক্রমশ। প্রয়োজনই বদলে দেয় মানুষকে—হিমাদ্রি কি বলেছিল?

৮

তারপর একদিন আবাহন কো-অপারেটিভে নিজেদের ফ্ল্যাটে উঠে এল জয়া ও হিমাদ্রি।

আসতই। তবে, বড় অনাড়ম্বর এই আসা। যেমন তেমন করে, ভীষণ রকমের ব্যস্ততা নিয়ে; যেন না এলেই চলছিল না আর। গৃহপ্রবেশ বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুই হল না। সামর্থ্য ছিল না, ইচ্ছাও নিয়ে গেল না বেশি দূর। কিছু না করলে কিছুই করা হয় না। সেইজন্যেই সামান্য পুজোর ব্যবস্থা হল।

এটা শ্রাবণ মাস। সামনের অগ্রহায়ণে তাদের বিবাহবার্ষিকী। ততদিন নিশ্চয়ই খানিকটা গুছিয়ে নিতে পারবে নিজেদের। ধারধোর করে এর ওর কাছে হাত পেতে ফ্ল্যাটে আসা যায় হয়তো, কিন্তু লোকজন সাক্ষী রেখে হই-হই করতে মন সায় দেয় না। হিমাদ্রি বলল যা

করার তখনই করবে। জয়া জানে জেদ কোথায় নিয়ে যেতে পারে। তাই জেদ করেনি।

পৃথিবীতে মানুষের জন্ম নিয়ে আসে যে-আরোগ্য, যে-সুখ আহ্লাদিত হয়ে ফেটে পড়ে মাতৃত্বের অহঙ্কার বোধে, সূচনা থেকেই নিজের মধ্যে তার প্রায় সবই সঞ্চারিত করে নিয়েছিল জয়া। এই শহরের বুকে নিজেদের জন্যে একটি ফ্ল্যাটের অধিকার অর্জনের স্বপ্নে বিভোর সে, নিজের রক্ত-মাংস-মোহ-নিঃশ্বাস সর্বত্রই গ্রহণ করেছিল লক্ষ্যে পৌঁছুবার ভার ও জ্বালা। হিমাদ্রিকেও দিয়েছিল বীজ বপনের সজল ভূমি, অনিবার্য ভাবে যা তাকে এনে দিতে পারে আকাঙ্ক্ষিত পিতৃত্ব। মানুষেরই আগ্রহ সঞ্জীবিত করে মানুষকে। দুঃখ ও ক্লেশের অন্ধকারে অনাদৃত সমূহ থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করে প্রাপ্তির মাটিতে, গভীর ভালবাসা ও আলোয়। সহজ না হলেও রাস্তা রাস্তাই। দীর্ঘ সেই দূরত্ব অতিক্রমের শেষে প্রবল ভাবে এসে পড়ে জন্মদানের শুভ মুহূর্ত, গৌরব দেখানোর সময়। ওরাও কি চেয়েছিল কিছু কম! তবু, কোথায় কী ঘটে গেল, যাতে, এমনকী তাদের নিজেদের কাছেও এই প্রাপ্তি অসাধারণ হয়ে উঠল না।

ঘরদোর আগের দিনই পরিষ্কার করিয়ে রেখেছিল হিমাদ্রি। খাট বিছানা এবং আরও কিছু জিনিসপত্র তুলে এনেছিল ভাড়া-করা টেম্পোয়। বাকি যা আছে এসে পড়বে আজ বিকেলে। আজ থেকে ঠিকানা বদল হয়ে গেল তাদের।

জয়াকে সঙ্গে নিয়ে ভোর-ভোর চলে এসেছিল এখানে। সামান্য পুজোর যা জোগাড় জয়াই করল। যোধপুর পার্কে দিদির বাড়িতে যে-পুরুত বারো মাস কাজ করেন, তাঁকে বলে রাখা হয়েছিল—বেলা না হতেই তিনি চলে এলেন নারায়ণ নিয়ে। জয়া এবং হিমাদ্রির নিকট আত্মীয় ছাড়া বাইরের কাউকে বলেনি। এ-ছাড়াও আসবে রেখা-সুনীল, শ্যামল-ধীরারা। এখানে আর কারুর সঙ্গে এখনও চেনাজানা হয়নি তেমন। হিমাদ্রি সাধুখাঁ, অবনীর কথাও বলেছিল; জয়াকে চুপচাপ দেখে নিজেও গা করেনি আর।

পুজোয় বসবার আগে পানের পাতায় সিঁদুরে ঘি মিশিয়ে পুরুতমশাই যখন মঙ্গলচিহ্ন আঁকছেন দেয়ালে—তখন যেখানে ছিল সেখান থেকে সরে এসে চিত্রার্পিত জয়ার পাশে দাঁড়াল হিমাদ্রি। আলতো হাত রাখল স্ত্রীর পিঠে। স্বচ্ছ হাসি তার মুখে, বিস্তৃত হতে গিয়েও হচ্ছে না পুরোপুরি; বেঁকে যেতে চাইছে অন্য দিকে।

হিমাদ্রির স্পর্শ নিজের মধ্যে ফিরিয়ে আনল জয়াকে। ধূপ-ধুনোর গন্ধে নিঃশ্বাস আচ্ছন্ন করে, স্বামীর দিকে অপলক চোখ তুলে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জয়া ঠিক বুঝতে পারল না কে তাকে এমন করাচ্ছে, কেনই বা! একটা আবেগ আসছে—অসহ্য ও অপ্রতিরোধ্য, অবলম্বন না পেলে ভেঙে পড়বে এখুনি। সেই অবস্থার মধ্যেই আশ্রয় চিনতে পারল জয়া। তাড়াতাড়ি ঘরে ফেরার ইচ্ছায় মাথাটা নামিয়ে আনল হিমাদ্রির বুকে। ফুলে ফুঁপিয়ে সম্পূর্ণ নীরব সেই কান্না বুকে জমা হতে থাকল হিমাদ্রির। কানায় কানায় ভরে ওঠার মুহূর্তে দু হাতে জয়ার মুখখানি তুলে এনে অশ্রুর রেখাগুলি প্রত্যক্ষ করল সে। শর্ত দুজনেরই—জয়ার নৈঃশব্দ্য এখন তাকেও স্পর্শ করছে। ধরা গলায় বলল, 'আজ তো তোমার সুখী হবার কথা! কী হল, জয়ি!'

বলার কথাটা বলবার জন্যে একটু সময় নিল জয়া। নিজের তৈরি পাঁচিলই এখন তার বাধা। অবুঝের মতো মাথা নেড়ে বলল, 'জানি না—জানি না—'

যাদের আসবার কথা তারা কেউই এসে পৌঁছয়নি তখনও। সুতরাং দৃশ্যটা কারুরই

চোখে পড়ল না।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত দক্ষিণের ব্যালকনির রেলিং ছুঁয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা।

গোটা দিনটা গেছে ঘোরের মধ্যে। সকালে সেই একবারই যা একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিল জয়া; সংস্পর্শে হিমাদ্রিও। তারপর বেলা হল, পুজোর গন্ধ মিলিয়ে গেল হাওয়ায়, যারা এসেছিল তারা ফিরে গেল একে একে। মেঘভাঙা রোদ্দুরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ঘরদোর, দেয়াল। কাজকর্ম সারতে সারতে নতুন এবং নিজেদের ফ্ল্যাটের দুপুর, বিকেল ও আসন্ন সন্ধ্যা প্রত্যক্ষ করল তারা। সন্ধ্যার চা খেতে ডেকেছিল শ্যামল, ধীরারা। ফিরে আসতে আসতে বৃষ্টি নামল আকাশ উজাড় করে। এই ফ্ল্যাট থেকে এই প্রথম বৃষ্টি দেখছে তারা। এক সময় বৃষ্টিও থেমে পরিষ্কার হল আকাশ। শ্রাবণের শুক্লপক্ষ। অসীম শূন্যতায় নির্দিষ্ট স্থান খুঁজে চাঁদ উঠে গেল ওপরে। চরাচর ভাসছে হালকা, মাখন রঙের শুভ্রতায়। আলো নিবিয়ে দেবার পর ফ্ল্যাটের অনেক দূর ভিতর পর্যন্ত ছুটে এল জ্যোৎস্না। সেই আলোয় পরস্পরের রহস্য হয়ে-ওঠা মুখ দেখতে দেখতে বিপরীত দিকে উঠে গেল তারা। ব্যালকনির মেঝে পেরোলে রেলিং, তারপরেই শূন্যতা। এর বেশি এগোনো যায় না।

ক্রমশ স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ছে আবাহনে। অন্যান্য আশপাশেও। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ওদের ভঙ্গিতে ফুটে উঠল সেই প্রথম দিনের দৃশ্য—ফ্ল্যাটের অসম্পূর্ণতার মধ্যেও নিজের সবকিছু চেনা হয়ে গেলে উড়িয়ে নিয়ে-যাওয়া হাওয়ায় হিমাদ্রির কব্জি চেপে ধরেছিল জয়া। স্মৃতিই ভাবায়। আরও একটু ভাবলে কী বলেছিল তাও মনে পড়বে। হিমাদ্রিও বলেছিল কিছু। তবে সেদিন আর আজকের দিনটা এক নয়। আর, তা নয় বলেই ভাবনাগুলোও আসছে অন্যরকম হয়ে।

সামনের দিকে তাকিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর হিমাদ্রি বলল, 'এই নিয়ে তিনটে বাড়িতে নিয়ে এলাম তোমাকে—'

জয়া অন্য কথা ভাবছিল। হিমাদ্রির আরও কাছে পৌঁছে বলল, 'এইবারই শেষ—'

'হ্যাঁ।'

হিমাদ্রি একটা গন্ধ পেল। স্মৃতি ও শরীরে মাখা সেই গন্ধ তাকে টেনে আনল জয়ার আরও কাছে। পরিশ্রান্ত নৌকা এইভাবেই ঘেঁষে আসে তীরের দিকে।

পরের দুটো দিন অফিসে গেল না হিমাদ্রি। বাথরুমের কলটা খুললে বন্ধ হয় না সহজে—প্লামবার ধরে এনে সারাল সেটা। জয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে গোছগাছ করল, পর্দা টাঙাল জানলায়, কারুকাজ-করা ফ্রেমে বাঁধানো তাদের বিয়ের পরে তোলা ছবিটা কোথায় টাঙাবে ঠিক করতে না পেরে মাথা ঘামালো অনেকক্ষণ। তারপর জায়গাটা খুঁজে পেয়ে দেয়ালে পেরেক পুঁততে পুঁততে বলল, 'তুমি এত চুপচাপ হয়ে গেছ কেন বলো তো!'

জয়া কাঁপল। পাঁচিলের আড়াল থেকে হিমাদ্রিকে দেখা যায় না ঠিক। ঢোক গিলে বলল, 'তোমার মনে হচ্ছে?'

'হল বলেই তো বললাম!'

পরের দিন আর নতুন থাকল না তারা। হিমাদ্রি অফিসে গেল।

স্মৃতিই একা করে। স্মৃতিই চিনিয়ে দেয় বিষ। ভাবতে গেলে নিজের মধ্যে আরও একটু একা হয়ে পড়ে জয়া। হিমাদ্রি যা লক্ষ করে তার চেয়ে বেশি চুপচাপ হয়ে যাবার প্রবণতায় জ্বর টের পায় শরীরে। যা পাবার তা পাওয়া হয়ে গেলে আর কি থাকে ঠিকঠাক ভাবতে

পারে না সে; দামটাই পারদ হয়ে ওঠানামা করে মাথায়। স্মৃতিই পাল্টাতে থাকে রক্ত।

সারা দুপুর একা থাকার পর ধীরা এল বিকেলে। লেডিজ ক্লাবের মিটিং বসবে রেখার ফ্ল্যাটে, নিয়ে গেল সেখানে। আরও অনেকে ছিল। আলাপের পর রেখা বললেন, 'তুমি কি বরাবরই এমন চুপচাপ! বিজ্ঞাপনের ছবিতে যেভাবে হাসো, আমাদের সামনে সেভাবে হাসো না কেন!'

জয়া কিছু বলবার আগে ধীরা বলল, 'নিশ্চয়ই কর্তার সঙ্গে লেগেছে আজ!'

'ও মা! এরই মধ্যে! সত্যি না কি?'

'না, না।' রেখার কথা শুনে অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসল জয়া, 'তা নয়।'

মোটা গড়নেব আর একজন—অন্যমনস্ক থাকার জন্যে এইমাত্র পরিচয় হওয়া নামটা গুলিয়ে ফেলল জয়া, বলল, 'ফ্ল্যাট নতুন হলেও এই বস্তুটি পুরনো। সঙ্গে করেই নিয়ে এসেছি আমরা—'

তেমন কোনও হাসির কথা নয়। তবু হেসে উঠল কেউ কেউ। দেখাদেখি জয়াও।

হিমাদ্রি ফিরবে ভেবে উঠে পড়ল তাড়াতাড়ি। বাথরুমে গেল, স্নান করল, কাপড় বদলে সাজগোজ যেটুকু না করলেই নয় করে নিল অভ্যাসে। চায়ের জোগাড় করে রেখে সন্ধ্যা দিতে গেল। শব্দই ডেকে আনছে অন্ধকার। শাঁখ বাজানোর নিবিষ্টতা থেকে নিজেকে তুলে বাইরে তাকিয়ে দেখল দ্রুত নেমে পড়েছে সন্ধ্যা। হাওয়ায় জোলো ভাব। বৃষ্টি নামল আর একটু পরে। হিমাদ্রি ফিরল না।

শুয়ে বসে ঘরবাব করতে করতে দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসল জয়াকে। সুন্দর মুখ দিয়ে গলগল করে বেবিয়ে আসছে রক্ত; যে-হাতে অ্যাটাচি ধরে রেখেছিল সেটা তখনও তুলে আছে শূন্যে—অ্যাটাচিটা ছিটকে পড়েছে দূরে। চারদিক থেকে লোকজন ছুটে যাওয়ায় আড়াল হয়ে যায় পরের দৃশ্য। তবু, যা দেখেছিল, তাই ফিরিয়ে আনতে আনতে ব্যালকনির রেলিংটা মুঠোয় চেপে ধরল জয়া। নীচে তাকালে মাথা ঘোরে এখনও—গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে অদ্ভুত শৈত্য। অন্ধকার ও বৃষ্টিতে কিছু দূর পৌঁছে ঝাপ্‌সা হয়ে এল দৃষ্টি। মনে হল, ছিয়ানব্বইটি ফ্ল্যাট নয়, বিশাল এই বহুতলের মধ্যে সে ছাড়া আর কেউই নেই এই মুহূর্তে—এমন কী সে যেখানে আছে কিছুই নেই তার ওপরে কিংবা নীচে।

বেল বাজল দরজায়। বৃষ্টি থেমে গেছে ততক্ষণে। দরজা খুলে দেখল, হিমাদ্রি। জয়াকে দেখল কি দেখল না, ব্রিফকেস হাতে নিয়ে সোজা হেঁটে গেল শোবার ঘরের দিকে। খাটের ওপর সেটা নামিয়ে রেখে জুতো খুলল হিমাদ্রি, কাঁধ ভিজে-যাওয়া শার্টটাও। চুপচাপ জয়ার হাত থেকে পাজামাটা টেনে নিয়ে বাথরুমে গেল এবং বেরিয়ে এল। এত বেশি স্তব্ধতায় শব্দের সৃষ্টি হয় না কোনও। আয়নার নীচে টেবিলের ওপরে রাখা টাইমপিসটাই টিকটিক করে যাচ্ছে শুধু। মিনিটের কাঁটা আর কিছুক্ষণের মধ্যে দশটায় পৌঁছবে।

জয়া অনাদর চিনছে। উদাসীন ভাবে হিমাদ্রিকে খাটের ওপর এলিয়ে পড়তে দেখে বলল, 'এত দেরি হল ফিরতে?'

'দেরি হল!' হিমাদ্রির মুখে কাঠিন্য। ওরই মধ্যে জয়ার দিকে তাকাল চকিতে, অল্প হাসলও যেন। বলল, 'কেন ফিরলাম ভাবছি!'

চাকাটা চলে গিয়েছিল বুকের ওপর দিয়ে। ফুসফুসের সমস্ত রক্ত উঠে এসেছিল মুখে। হিমাদ্রিকে দেখতে গিয়ে নিজেকেই দেখল জয়া। ঠিক বুঝতে পারছে না, হয়তো পাঁচিলটাই

ভাঙছে। এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটিকে অসহ্য লাগল তার। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ঢুকল। তার প্রস্তুত হবার কিছু নেই; হয়তো যা ভাবছে তার সবটাই ভুল। সত্য যা-ই হোক, সে আড়াল হলে কিছুটা সময় পাবে হিমাদ্রি। নিজেকে গোছানোর জন্যে এই সময়টা পাওয়া দরকার ওর।

সময় থেমে আছে। কিংবা চলছে হয়তো; এই সময়ের মধ্যে নিজের উপস্থিতিটা অনুভব করতে পারছে না বলেই এমন নির্ভার লাগছে নিজেকে। জয়া সুযোগ পেল না।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এল হিমাদ্রিও। দূর থেকেই বলল, 'তুমি কি চা করছ?'

'খাবে না?'

'না।' হিমাদ্রি বলল, 'এদিকে এসো। কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

আবার বিছানাতেই গিয়ে বসল হিমাদ্রি। একটা কিছু ধরে থাকার প্রয়োজন ছিল; সুতরাং, দরজায় দাঁড়িয়ে পর্দাটা মুঠোয় করে নিল জয়া।

'সাধুখাঁ এসেছিল আজ। ডেকে নিয়ে গেল স্টুডিয়োয়। তোমাকে দেখানোর জন্যে কয়েকটা ছবি দিয়েছে—'

বলার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিফকেস খুলে ফেলল হিমাদ্রি। একটা খাম বের করে ব্রিফকেসটা বন্ধ করল দ্রুত হাতে। খামটা খুলতে যাচ্ছিল, নিজের অজ্ঞাতে ছুটে এসে ওর হাতটা চেপে ধরল জয়া।

'না, দেখাবে না—'

'দেখার জিনিস দেখতেই হয়।' হাতটা ঝটকা দিয়ে সরিয়ে নিল হিমাদ্রি। ছবিগুলো বের করে একটার পর একটা খাটের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'এরপর লোকে দেখবে—'

'কী বলছ এসব!'

'ভুল বলছি!'

অনেকদিন পরে হিমাদ্রির খুব কাছাকাছি চলে এল জয়া। স্তব্ধতা আসছে, চেনায় ভুল নেই কোনও। কোনওরকমে বলল, 'তোমাকে বলেছিলাম—সবই বলেছিলাম—তুমিই যেতে বলেছিলে।'

'থামো, থামো।' কথা শেষ করতে দিল না হিমাদ্রি। চাপা গলায় বলল, 'এরপর কি বলবে এইসব ছবিও আমিই তোলাতে বলেছিলাম!'

'বিশ্বাস করো। ওই ছবিগুলো ছাড়া আর কিছুই সত্যি নয়।' ভেঙে পড়ার আগের মুহূর্তে হিমাদ্রির দিকে ছুটে এল জয়া। শরীরের সমস্ত আবেগ দিয়ে দু হাতের মধ্যে স্বামীর মুখটা ধরবার চেষ্টা করে বলল, 'এর বেশি তুমি আর কিছু ভেবো না—'

'সরো!' স্ত্রীকে ঠেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল হিমাদ্রি। জয়ার স্বামী বলে এখন আর চেনা যায় না তাকে। হতচকিত ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল এক মুহূর্ত; চোয়ালের নড়াচড়ায় নিজেকে ক্ষিপ্ত করে তুলল আরও। সেইভাবেই বলল, 'সাধুখাঁর ক্লায়েন্ট দেখতে চায় তোমাকে। যা দেখাওনি এরপর তাও দেখাবে। টাকা পাবে—টাকা—'

'কী বলছ এসব!'

'তুমি একটা বেশ্যা!' কথার সঙ্গে সঙ্গে জয়ার মুখ লক্ষ করে আক্রোশের হাতটা ছুড়ে দিল হিমাদ্রি।

লক্ষ্যে ভুল হয়নি কোনও। আকস্মিক আঘাতের ধাক্কায় কিছুটা ঘুরে, কিছু বা বিহ্বল,

ঠোঁটে ও মুখে কিছু বা রক্তের স্বাদ পেতে পেতে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল জয়া। রেখায় রেখায় ভরে উঠল মুখ। প্রতিরোধহীন কান্নায় ডুকরে উঠে বলল, 'মেরো না। তুমি মারলে আমি মরে যাব—'

'একদম চ্যাঁচাবে না।' কিছু কি বুঝতে পারল হিমাদ্রি? না কি জয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও ভাঙতে শুরু করেছিল সে—নিজেকে বলবার জন্যেই জয়াকেও বলা! না হলে হঠাৎ ছুটে গিয়ে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিল কেন! অন্ধকারে তখনও কেঁপে যাচ্ছে জয়ার অদ্ভুত কান্না। দূরে দাঁড়িয়ে হিমাদ্রি বলল, 'বাঁচার অধিকার যার নেই তার মরে যাওয়াই ভাল—'

বললেও, তেমন জোর পেল না গলায়। বুক থেকে উঠে আসা শ্লেষ্মায় ভারী হয়ে উঠল কথাগুলো।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল হিমাদ্রি। রান্নাঘরের আলোটা জ্বলছে, নিবিয়ে দিল। তখনই চোখে পড়ল আলো জ্বলছে বসবার জায়গাতেও। জ্বলবারই কথা। তবু অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই তাকে আড়াল করতে পারবে না। শুধু আঘাতই কাঁদায় না মানুষকে। স্মৃতি কাঁদায়; সম্পর্কও। নিজের দোষটা পুরোপুরি চেনবার জন্যে দোষী করতে হয় অন্যকে—নিজেকে আহত করবার জন্যেই আঘাতটা ছুড়ে দিতে হয় অন্যের দিকে, যাতে তা ফিরে আসে দ্বিগুণ হয়ে।

চারদিকে অন্ধকারের সম্পূর্ণতা লক্ষ করে কাঁপা হাতে সিগারেট ধরাল হিমাদ্রি—সেই একই হাতে, যে-হাত একটু আগে নিশ্চিত লক্ষ্যে ছুটে গিয়েছিল জয়ার দিকে। কত যে আদরের জয়া তার! সুখে দুঃখে এত দিন এই হাতেই বুকে টানত তাকে, জড়াত; মিশে যাবার আগ্রহে যাবতীয় রক্ত সঞ্চালিত করত এরই শিরা উপশিরায়। ভাবতে গিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় চোখ ছেয়ে গেল তার। অসহ্য আলোড়নে কাঁপতে শুরু করল শরীর। আবেগ চাপা দেবার জন্যে চেয়ার টেনে বসল ব্যালকনিতে। অন্ধকারের একটা সুবিধা আছে, তাকে অনুভব হয়তো করা যায়—দেখা কখনওই যায় না। জয়াও দেখবে না।

৯

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল হিমাদ্রির। কেউ কি ডাকছে দরজায়? আচ্ছন্নতার ভিতর অনুভব করল মাথার ভার। কাল রাতে কখন শুয়েছে মনে নেই। তবে শোবার আগে ঘুমের বড়ি খেয়েছিল; মনে আছে, বিছানায় ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে থাকা জয়ার শরীরটাকে নিজের হাতে গুছিয়ে দিয়ে চাদর চাপা দিয়েছিল গায়ে। এক বিছানায় ওর পাশে শুতে গিয়েও কী ভেবে চলে এসেছিল পাশের ঘরে। আর কিছু মনে পড়ল না।

আবার পাশ ফিরতে যাচ্ছিল; সুযোগ পেল না। বেল বাজার কোঁ-কোঁ শব্দটা তাড়া করে এল কানে। সাত সকালে ডিম বা রুটির ফেরিওলা এসে বেল দেয় দরজায়। অন্যদিন তারও আগে উঠে পড়ে জয়া। এসব সামলায়। আজ ওঠেনি। হয়তো ঘুমোচ্ছে এখনও, কিংবা বাথরুমে। কাল রাতের ঘটনার পর হয়তো দায় বোধ করছে না কোনও।

নিজেই উঠল হিমাদ্রি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল এবং অবাক হল।

অদ্ভুত চোখমুখ নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে আছে শ্যামল। হিমাদ্রিকে দেখেও কথা বলল না কোনও।

'কী ব্যাপার!' সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল হিমাদ্রি, 'এই ভোরে—হঠাৎ!'

'জানেন না কিছু!'

'কী!'

কিছু না বলে ভিতরে ঢুকে এল শ্যামল; হাত চেপে ধরল হিমাদ্রির। প্রায় টেনেই নিয়ে গেল দক্ষিণের ব্যালকনির দিকে। রেলিং পর্যন্ত এসে বলল, 'ভিড় জমে গেছে। দেখুন নীচে তাকি া!'

অ ।ক চোখে শ্যামলের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল হিমাদ্রি। কিছুই বুঝল না। তখন দু হাতে রেলিং চেপে ধরে ঝুঁকে তাকাল নীচে। তাকিয়েই থাকল।

লোকগুলিকে চিনতে পারছে। আরও যারা আসছে, তাদেরও। তারও আগে জয়াকেই চিনল। মুখটা হেলে আছে এক পাশে। ডান হাত মোড়া; সোনার বালা সমেত বাঁ হাতটা প্রায় ভিক্ষার ভঙ্গিতে ছড়িয়ে আছে পাশে। বাঁ পা-টা হাঁটু থেকে মুড়ে আলগা ভাবে ছুঁয়ে আছে টান-টান করে বিছানো ডান পায়ের পাতা। শাড়ি, ব্লাউজ, সবই আছে গায়ে; তবে বড় এলোমেলো, বেআব্রু। যে-শরীরের সামান্য আভাসের দাম দিতে দিতে এই ফ্ল্যাটে উঠে এসেছিল—দামি সেই শরীরটাকেই এখন স্তব্ধতায় মেলে ধরেছে সকলের চোখের সামনে।

আটতলা থেকে ওই জায়গাটার দূরত্ব বড় বেশি। এতদিন পেরেছিল; যতই হাত বাড়াক, আজ আর কোনও চাদরেই ওকে আড়াল দিতে পারবে না হিমাদ্রি।

দেখতে দেখতেই দৃশ্যটা ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল হিমাদ্রির চোখে। যেভাবে হয়।

আড়াল

উৎসর্গ:
স্বাতী ও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-কে

॥ ১ ॥

রুচি আড়াল চেনে। শুধু মেয়েমানুষ বলেই নয়; নিজস্ব কারণেও। স্বভাব ও অনুভূতি কাউকে কাউকে আলাদা করে শিখিয়ে দেয় কিছু, চিনিয়েও দেয়—গোপনে, দিনের পর দিন, এই রকম চেনার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে এক সময় সেটাই হয়ে ওঠে প্রবণতা। বাইরে থেকে ব্যাপারটা বোঝা না গেলেও যে-বোঝার সে ঠিকই বোঝে। প্রবণতাই চালিয়ে নিয়ে যায়।

রুচি নিজেও যে সব ঠিকঠাক বোঝে তা নয়। আগে একদমই বুঝত না। অস্পষ্ট হলেও ইদানীং কখনও সখনও ভিতরের এই বদলটা টের পায় সে। কেমন অন্যরকম লাগে নিজেকে। একটা সময় ছিল যখন শুধুই রুচি, কিংবা সোমেনের স্ত্রী শ্রীময়ী ও কৌশিকের মা হয়ে থাকার মধ্যেই খুঁজে পেত নিজেকে। এখন মনে হয় ওদের জন্যেই রুচি; রুচির জন্যে সে নয়। ভাবনাটা মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক করে দেয় তাকে, অনুভূতির মধ্যে ঢুকে পড়ে আচ্ছন্নতা।

আজ সকালে স্নান করার জন্যে বাথরুমে ঢোকার পর আরও একটা অনুভূতি ছুঁয়ে গেল তাকে। আড়াল দেবার জন্যে আছে বাথরুমের দরজা, সেটায় ছিটকিনি লাগালেই নিঃশেষে খোলা যায় নিজেকে। মোটামুটি তিরিশ বছর ধরে এই রকম করতে করতে ঘটনাটা পরিণত হয়েছে অভ্যাসে। আজও তাই করেছিল, অভ্যাসে; এবং যেভাবে খুলতে হয় ঠিক সেইভাবেই খুলতে শুরু করেছিল নিজেকে। তারপর, শাওয়ারের জলের স্বতঃস্ফূর্ত ধারা গায়ে লাগতেই থমকে গেল রুচি। হঠাৎ মনে হল, অনাবৃত স্নানের এই দৃশ্যটা তার একার ও নিজস্ব নেই, কেউ না কেউ দেখছে তাকে।

এটা তার থেমে পড়ার সময়।

চারতলার ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানলা দিয়ে তাকালে চোখে পড়ে বিভিন্ন আকারের ছাদ ও আকাশ। সামনে বেলা দশটার ঝকঝকে রোদ্দুর। যত দূর চোখ যায় তাকিয়ে দেখেও দূরে কিংবা কাছে খুঁজে পেল না কাউকে। অন্য দিনও জানলাটা খোলা থাকে এইভাবে। সামনা-সামনি কোনও বাড়ি নেই এবং রাস্তার ওদিকের বাড়ির ছাদগুলো নিচু হওয়ায় কেউ কখনও এদিকে তাকিয়ে থাকতে পারে ভাবেনি। সন্দেহও হয়নি। আজও হল না। বুঝতে না-পারা অনুভূতির মধ্যে, তখন, রোদ্দুরই বিষয় হয়ে উঠল। দেয়ালের আড়ালে দাঁড়িয়ে ভিজে হাতে ফ্রেমে-আঁটা ঘষা কাচের জানলার একটা পাট টেনে বন্ধ করল সে, অন্যটাও এমনভাবে আধা-আধি টেনে আনল যাতে পুরোপুরি অন্ধকার হওয়াটা এড়ানো যায়। চেনা শরীরে নিজেকে নতুন করে দেখার জন্য তখনও কিছু আলোর দরকার ছিল।

এর পরের কিছুক্ষণ নিজেকে নিয়েই কাটাল রুচি। জল আজ অন্যভাবে প্রবাহিত হচ্ছে শরীরে। ভিতরের তাপে তারতম্য ঘটলে এই সব সময়ে শীত করে ওঠে কখনও। এখন সেরকমও কিছু নেই। তবু, স্পর্শে খাড়া হয়ে উঠছে রোমকূপ।

অনুভূতিটা ধরে রাখার জন্যে নিজেকে ঢিলে করে দিল সে। আড়ালের ভাবনা যখন-তখন এলেও এখন ভাবল, সোমেন, তার স্বামী, গাড়ি হাঁকিয়ে অফিসে চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। যেমন যায়। তবু আজকের ধরনটা ছিল অন্যরকম। গম্ভীর ও খাপছাড়া, যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাড়ি থেকে—নাকি রুচির সান্নিধ্য থেকে?—বেরুতে পারলে বাঁচে!

গম্ভীর হওয়ার অর্থই অন্যমনস্ক হওয়া কিংবা ভুলে-যাওয়া নয়। বেরুবার আগের মুহূর্তে, তাই, কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিল রুচি, 'তোমার রুমাল—'

'ও, হ্যাঁ, রুমালটা! থ্যাঙ্ক ইউ—'

সোমেন এমন ভাব দেখাল যেন রুমালটার কথা সত্যিই মনে ছিল না। রুচি তার খুঁটিনাটি দ্যাখে এবং যেহেতু দ্যাখে, সেজন্যে রুচির অভ্যাসে তার রপ্ত হওয়ার কথা নয়। কী ভাগ্যি, বেরুবার আকে রুমালটার কথা মনে পড়েছিল রুচির! সত্যি সত্যি ভুলে গেলে আজ সারা দিন গরমে, ঘামে, এমনকী হাতের মুঠোয় নির্ভরতার অভাবে নাজেহাল হতে হত তাকে।

অসুবিধে পাকাল ওই 'থ্যাঙ্ক ইউ' কথাটা। স্বাভাবিক কোনও শব্দের বদলে ওই দুটোই উঠে এল সোমেনের মুখে। তারপর, অস্বস্তি এড়াতে না পেরে ব্যস্ত হয়ে উঠল চলে যাবার জন্যে।

রোজ না হলেও প্রায়ই, সোমেনের বেরুবার মুহূর্তে রুচি জিজ্ঞেস করে, দেরি হবে ফিরতে? আজ করল না, কারণ, ততক্ষণে ছিটকে গেছে সোমেন। তার চেয়ে বড় কথা, কেন যেন মনে হল রুচির, আজ এ-কথা জিজ্ঞেস কবার মানে হয় না। আজ হয়তো দেরি করেই ফিরবে সোমেন। রাতের অন্ধকারে বুঝতে পারেনি—ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকার জন্যে সকালেও নয়! এখন দেখল স্পষ্টই অপমান লেগে আছে সোমেনের মুখে।

বাবা নেমে গেছে সিঁড়ি দিয়ে, অথচ মা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দরজায়—দৃশ্যটা নিশ্চয়ই স্বাভাবিক নয়। শ্রীময়ী এসেছিল আজই বেরুনো 'দেশ'-এর কপি কুড়োতে। রুচির কাছাকাছি এসে সিঁড়িগুলো কীভাবে নেমে যায় দেখতে দেখতে বলল, 'ঝগড়া করেছ নাকি?'

শ্রীময়ীর গলায় ঠাট্টা জড়ানো। এমনও হতে পারে প্রশ্নের প্রস্তুতি আগেই ছিল মনে, এখন জিজ্ঞেস করল।

চকিতে মেয়ের দিকে তাকিয়ে রুচি বলল, 'কেন!'

'কেন আবার, মনে হচ্ছে!' শ্রীময়ী বলল, 'রুমাল এগিয়ে দিলেই কি আর ফ্রেন্ডশিপ হয়।'

উনিশ বছরে পৌঁছে সম্পর্কের টানাপড়েন বোঝা কঠিন নয়। বিষয়টার মধ্যে তাকেও টেনে আনছে বলেই অস্বস্তি। ইদানীং লক্ষ করছে বেশ একটা তফাত এসে যাচ্ছে মেয়ের পক্ষপাতে। বাপকে এখন আগের চেয়ে বেশি সমীহ করে শীমু; মা-কে যেমন ছিল তেমনি, তবু সহজ সম্পর্কের মধ্যে কখনও সখনও ঢুকে পড়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি। কৌশিকের কথা ওঠে না। বছরের ন-দশ মাস যে-ছেলে হস্টেলে থাকে, তাকে প্রতি দিনের সম্পর্কের মধ্যে আনা যায় না।

'থামবি!' এ-সব ভাবতে ভাবতেই বিব্রত রুচি বলল, 'লঘুগুরু জ্ঞান নেই, বাবা-মাকে নিয়েও ফাজলামি!'

'আ-হা, রাগ করছ কেন।'

পিছন থেকে এগিয়ে এসে দু হাতে রুচিকে জড়িয়ে ধরল শ্রীময়ী। পিঠে ওর ব্রা-হীন বুকের স্পর্শে উনিশ বছরের দাপট। শীমু তার বাপের স্বাস্থ্যের অনেকটা পেলেও, ওই বয়সে ছোটোখাটোর মধ্যে রুচি নিজেও কিছু কম ছিল না। বিয়ে হয় আরও এক বছর পরে। তারও দু বছর পরে শীমু আসে পেটে। কাঠিন্যে ঢল নামলেও ব্রা-র সাইজে এত বছর পরেও খুব একটা বদলায়নি সে। মাঝখানে পাঁচ বছর বাদ দিয়ে কৌশিকও এসে পড়ে। মাতৃত্বকে জায়গা দিতে যেটুকু দেবার দিলেও শরীর তাকে ছেড়ে যায়নি।

শীমু নিজেই আলগা করে নিল নিজেকে। এখন আর উচ্ছ্বাস নেই। হাতে ম্যাগাজিন, দৃষ্টিও সেখানে। নির্দিষ্ট একটি পাতায় চোখ রেখে ডিভানে গিয়ে বসল।

এখন মনে হয় ম্যাগাজিন কুড়োনোর উপলক্ষ না থাকলে মাকে নিয়ে আদিখ্যেতাগুলো করত না। ওপর-ওপর যেমনই হোক, বাবা-মা'র সম্পর্ক নিয়ে ও যে খুব চিন্তিত এমন মনে হয়নি কখনও। যা হবার হল; এরপর কলেজে যাবার জন্যে ব্যস্ত হবে এবং ফিরবে সেই সন্ধে পার করে। রুচি জানে, শুধু কলেজ বা পড়াশুনোর জন্যেই এতটা সময় বাইরে থাকে না শীমু।—নিজের বয়স ও প্রয়োজনগুলোকে এরই মধ্যে চিনতে শিখেছে ও; কোনদিকে যাচ্ছে, কী ভাবছে, কিছুই বোঝা যায় না ঠিকঠাক। এসব ভাবনায় দূরত্ব আছে, এ নিয়ে সরাসরি সোমেনকে কিছু বলতে পারে না বলে কিঞ্চিৎ অসহায়তাও। বয়সটা ভয়ের। এই সেদিন ব্রা-র সাইজ বদলাতে সন্দিগ্ধ চোখে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল রুচি। ঠিক জানে না, হয়তো বাড়িয়ে ভাবছে সে। সব অঙ্ক দু'য়ে দু'য়ে চারের দিকে এগোয় না।

মেয়েকে লক্ষ করতে করতেই ভিতরে এল রুচি। দরজাটা বন্ধ করে দিল। তাহলেও সোমেনের ব্যস্ততা ওবং সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যাবার দৃশ্যটা লেগে থাকল চোখে। কিছু করা দরকার, কিন্তু কী করবে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোনও ধারণা না থাকলে যেমন হয়, তেমনি, অনাবশ্যকভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। দ্রুত হেঁটে চলে এল শোবার ঘরে; আলনার কাছে দাঁড়িয়ে নিজের শাড়ি, সায়া, ব্লাউজ গোছগাছ করে নিল একটু। তারপর আবার কী মনে করে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিজেকে দেখার জন্যে ততটা নয়। সিঁথি যেখানে সিঁদুর ছুঁয়ে আছে তার পাশে একটি রুপোলি চুল কালই লক্ষ করেছিল বিকেলে, তখনই লোডশেডিং হওয়ায় ঘটনাটা মনে থাকেনি। এখন থেমে দাঁড়াল আবার। সিঁথির কাছে আঙুল চালিয়ে ভাবল আলোর তারতম্য কখনও বা বিভ্রম ঘটায় চোখে—হয়তো পরে কোনও সময় চোখে পড়বে।

ভাবনা এইভাবেই এগোয়। রুমালটা হাতে নেবার সময় মুহূর্তের জন্যে চোখাচোখি হয়েছিল সোমেনের সঙ্গে—সেই সময় কেন যে আত্মবিশ্বাসে টান পড়ল সোমেনের এবং সহজ হবার সুযোগ এড়িয়ে কথা বলল দূরত্ব মেশানো গলায়, এখনও তা বোঝা যায় না। ঘটনা যাই হোক, এ ক্ষেত্রে নিজেই এগিয়ে গিয়েছিল রুচি, সোমেনও কি পারত না স্বাভাবিক হতে। অবশ্য, রুচি ভাবল, চব্বিশ বছরের বিবাহিত সম্পর্কের মধ্যে সাবলীলতার সঙ্গে কিছু রুক্ষতা থাকবে না এমনটা সে কিংবা সোমেন নিশ্চয়ই আশা করেনি কখনও। ব্যবহারের হেরফেরে রুক্ষতাই কখনও বা বাঁক নিয়েছে অভিমান কিংবা অপমানের দিকে। তবে জের থাকেনি। সোমেনের ভাবনা সোমেনই ভাবে। রুচি জানে, মান-অপমানও আসলে তাৎক্ষণিকতার সৃষ্টি—পরে, পারম্পরিক থেকে নিজেকে একা করে নিলে, ভাবতে ভাবতেই

হঠাৎ মনে হয় বাড়িয়ে ভাবছে, কিংবা যা ভাবছে তার অনেকটাই ধোঁয়ায় গড়া। তখনই ফিরে আসতে হয়। হয়তো সোমেনও এইভাবে ভাবে। চব্বিশ বছরে শুধু শ্রীময়ী ও কৌশিকের জন্মদানই নিশ্চয়ই তাদের প্রাপ্তি নয়। এক সঙ্গে থাকার বেশিটাই যদি অভ্যাস হয়, তাহলে, অভ্যাসটাই এতদিনে হয়ে উঠেছে আশ্রয়। নির্ভরতায় এবং ভয়ে সেটাই আগলে রাখে।

রুচি এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত। তবে আজ মনে হল, জের থাকবে। অপমানটা সহজে ভুলতে পারবে না সোমেন। হয়তো কাল রাত থেকে আরও বেশি রাত পর্যন্ত প্রকাশ্যে বা অন্ধকারে যা যা ঘটেছে তার সবকিছুর মধ্যেই খুঁজবে তাকে অবহেলা ও অপমান করার চেষ্টা। আর, সত্যি সত্যিই, রুচি নিজেও কি পারে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে!

ঘর থেকে বেরিয়ে আবার মেয়ের সামনে এল রুচি। ম্যাগাজিন ছেড়ে শীমু এখন খবরের কাগজ পড়ায় ব্যস্ত। গোটা শরীর এলিয়ে দিয়েছে ডিভানে। ব্রডশিটের আড়ালে থাকায় রুচি ওর মুখ দেখতে পেল না, পরিবর্তে চোখে পড়ল হাঁটু থেকে গোড়ালি পর্যন্ত ওর পুরো ডান পা-টা। বেকায়দা শোবার ফলে ঢোলা কাফতানের অনেকটাই যে উঠে গেছে ওপরে, নিশ্চয়ই তা খেয়াল করেনি শীমু। অবশ্য তাতেও যে খুব বেআব্রু হল তা নয়। দেখার মতো কে আর এখন আছে বাড়িতে। সোমেন বেরুবার আগেই সকালের কাজ সেরে চলে গেছে ঠিকে ঝি, সাবিত্রী; আসবে আবার সেই বারোটার পরে এঁটো বাসনকোসন ধুতে। এ-ছাড়া আছে দিলীপ—বাঁধা কাজের ছোকরা। মাস দু তিন হল ওকে এক অফিসে বেয়ারার চাকরি জুটিয়ে দিয়েছে সোমেন। সকালের বাজার, রান্না সেরে চলে যায় নটা নাগাদ, ফেরে অফিসের পরে ছ'টা সাড়ে ছ'টায়; তখন আবার হেঁসেল সামলায়। বাকি যা কাজকর্ম রুচিই করে। বস্তুত, এই কাজগুলো না থাকলে যা আছে তার চেয়ে আরও একটু একা হয়ে যেত রুচি। এখনও মনে হয় একা—বই পড়া এবং ঘুম তবু ভুলিয়ে রাখে কিছুটা, না হলে সময়ের ভার চেপে বসত বুকে।

গলায় হাই উঠে আসায় ঠোঁট চাপা দিল রুচি। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তোর কলেজ কি দেরিতে?'

'না, কেন!'

'দশটা তো বাজল। আমি এবার বাথরুমে ঢুকব।'

'যাও না!' বাঁ পা ঠেলে ডান পায়ের অনাবৃত অংশ ঢাকল শীমু। কাগজটা সরাল মুখের ওপর থেকে। রুচি তাকেই দেখছে। আধশোয়া হয়ে শীমু বলল, 'আজ আমার ফিরতে দেরি হতে পারে—'

'কেন!'

'নীলা, মন্দিরার সঙ্গে সিনেমায় যেতে পারি ইভনিং শোয়ে। নিউ এম্পায়ারে। মন্দিরার গাড়ি থাকবে—পৌঁছে দেবে—'

রুচি বিরক্ত হল।

'এগুলো তোমার বাবাকে বলো না কেন!'

'বাবাকে। কেন!' শীমু উঠে বসল, 'তোমাকেই তো বললাম!'

'আমাকে এর জন্যে কথা শুনতে হয়।' সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইল না রুচি। বলল, 'আজকাল প্রায়ই তোমার দেরি হচ্ছে—'

'বাবা রাগ করবে কেন। বাবা ফেরার আগেই তো ফিরি।' শীমু থামল এবং সোজাসুজি

মা'র দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি নিশ্চয়ই কিছু বলেছ।'

'না। আমি কিছু বলিনি—।' এখন নিজেকে গোটানোর সময়। রুচি বলল, 'বাবা অনেক সময় ফোনটোন করে, খবর নেয়—'

শীমু মুখ ঘুরিয়ে নিল। সোমেনের ধরনে ওর চোয়াল কিছু চওড়া, রাগলে কিংবা উত্তেজিত হলে আরও চওড়া দেখায়। তবে সামনে থেকে দেখলে ও যে রুচিরই মেয়ে তা চিনতে অসুবিধে হয় না।

খানিক চুপ করে থাকল রুচি। জানে, বানিয়ে বলা কথাও অনেক সময় সত্যি হয়ে ওঠে। সে এমন কিছু বলেনি যাতে সন্দেহ করতে পারে শীমু। এখন আর এর বেশি কিছু বলা ঠিক হবে না। মেয়েকে দেখতে দেখতে বলল, 'আজ যাচ্ছিস যা—দেরি করিস না। আমি বলে দেব।'

এরপরেই সে বাথরুমে ঢোকে এবং নিজেও বুঝতে পারে না ঠিক কেন, আড়ালে ভাবনা হঠাৎ আক্রমণ করে তাকে।

জল যেভাবেই প্রবাহিত হোক, স্রোত থেকে শরীরটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে অসুবিধে হয় না কোনও। বয়স বেয়াল্লিশে পৌঁছুলেও, রুচি ভাবল, পূর্ণতায় টান পড়েনি এখনও। এই শরীর এখনও যে-কাউকে টানবে। মেদহীন কোমর পেটের কাছে ঈষৎ উঁচু হয়ে সাহসে ছড়িয়ে পড়েছে জঙ্ঘার দু দিকে, সেখানে শাঁখের দাগ জলেও আড়াল হয় না—বরং স্পষ্ট করে মাংসের টান-টান ভঙ্গিমা। একই জায়গা থেকে ওপরেও বিন্যস্ত সে। ঈষৎ লম্বাটে গলা সমান ভাবে জায়গা ছেড়ে দিয়েছে সামান্য পরিস্ফুট কণ্ঠার হাড় দুটিকে—প্রায় সেইখান থেকে যেভাবে নামা উচিত সেইভাবে নেমে গেছে দুটি বাহুল্য বর্জিত স্তন। নিজের মুখ নিজে দেখা যায় না, তবু, রুচি জানে, লাবণ্য যা দিতে পারে তার অনেকটাই সে পেয়ে গেছে কপাল, ভুরু, নাক, ঠোঁট ও চিবুকে। আরও কী পেতে পারত তা ভেবে আক্ষেপ হয়নি কখনও। এখনও হল না। তবে, শাড়ি, সায়া, ব্লাউজের আড়াল কি চেনায় এভাবে!

হয়তো চেনায়, হয়তো না। তবু এই মুহূর্তে—এবং তারও অনেক আগে থেকে—গত রাতের স্মৃতি যে-রকম এলোমেলো হয়ে আসছে তাতে এইভাবে ছাড়া আর কোনও ভাবেই ভাবতে পারল না সে।

কাল, মিন্টো পার্কে, ধ্রুবর ফ্ল্যাটে, সোমেন যখন নেশায় আচ্ছন্ন, অনর্গল উল্টোপাল্টা বকে যাচ্ছে অশোক, মানী, জ্যোতি, নীলাদ্রি, রমা, চন্দ্রিমা, আভা, দীপঙ্করদের সঙ্গে, খাপছাড়া ও বিরক্তিকর লাগছে এমনিতে রাশভারী সোমেনকে, তখন, কিছুবা অসহায় রুচি মীনার সঙ্গে চলে এসেছিল ওদের বেডরুমে। বউ নিয়ে সদ্য ইউরোপ বেড়িয়ে ফিরেছে ধ্রুব: আলমারি খুলে মীনা তার কেনাকাটা দেখাল। তারপর 'আসছি' বলে রুচিকে একলা রেখে উঠে গেল তাড়াতাড়ি ডিনার সার্ভ করার ব্যবস্থা করতে। সেই সময় হুইস্কির গ্লাস হাতে দীপঙ্করকে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে অবাক ও বিব্রত হয়েছিল সে। এমন নয় যে দীপঙ্কর তার অচেনা। অফিস কিংবা ক্লাব পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুবান্ধবও পাল্টে যায় সোমেনের, আড্ডাও পাল্টায়। তারপর যা হয় আর কি, একদা ঘনিষ্ঠরা তাদের স্ত্রী-সহ চলে যায় দূরে—তাদের খালি করা জায়গাগুলো ভরে ওঠে নতুন বন্ধু-বান্ধবীতে। গত সাত কি আট বছর এই দলটাকে চিনেছে সোমেন। সুতরাং রুচিও। বেশিরভাগই ক্লাবের, সেই সূত্রেই মেলামেশা। ঘনিষ্ঠতাটা অবশ্য হালের। মাঝখানে দল বেঁধে একটা নাটক করার সঙ্গে সঙ্গে

বিশেষ ভাবে এই দলটাই ঘোঁট বেঁধে গেল—আপনি থেকে যা যার মতো সময় নিয়ে নেমে এল ভূমি-তে। ওই নাটকের প্রেমিক-প্রেমিকা ও তার পরে স্বামী-স্ত্রী হয়েছিল দীপঙ্কর ও রুচি; সোমেন, তার চেহারার জন্যে, এক জাঁদরেল পুলিস অফিসার; পাড়ার মাস্তানের রোলে একাই একশো হয়ে উঠেছিল নীলাদ্রি। এইভাবে। আগে এর বাড়ি তার বাড়িতে আড্ডা বসানো ছিল কালেভদ্রের ব্যাপার। ইদানীং মাসে দু'বার কি তিন বারও হয়ে যাচ্ছে। দীপঙ্কর গোড়া থেকেই ছিল, এখনও আছে, অচেনা হবে কেন। বরং ভাবতে পারে রুচি, দীপঙ্কর সম্পর্কে সে নিজেই বেশি সচেতন, সত্যি বলতে, নাটকের পর দীপঙ্করের ঝোঁকটাই ছিল বেশি চেনানোর দিকে। রুচিকে নিয়ে এমন করতে যাতে একটা রিয়েল লাইফ ব্যাপার এসে যায়। এগুলো ঠাট্টার পর্যায়ে থাকলেও মাঝে মধ্যে সন্দেহ হয়েছে রুচির, আড়ালে পৌঁছুনোর সাহস—নাকি অধিকার?—নেই বলেই এতটা প্রকাশ্য হয়ে পড়ে দীপঙ্কর। মুখ ফুটে কোনও দিন কিছু না বললেও সোমেনও হয়তো লক্ষ করেছিল ব্যাপারটা। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে, সুতরাং, যতটা সম্ভব দূরে থাকার চেষ্টা করত রুচি। তবে, এই সময়, এই জায়গায়, দীপঙ্কর না হয়ে আর কেউও যদি আসত, তাহলেও বিব্রত হত সে। ঘটনা এই, আজ সন্ধে থেকেই আড্ডাটা এগোচ্ছিল বেসামাল হবার দিকে। রুচি মদ খায় না, মীনাও প্রায় খায় না বললেই হয়, দীপঙ্করের বউ আভাও তাই। কিন্তু, ধ্রুবর স্কচ্ আর হোয়াইট ওয়াইনের ঢালাও ব্যবস্থার জন্যেই সম্ভবত, আভা কি রমা কি চন্দ্রিমাও আজ পাল্লা দিতে শুরু করেছিল পুরুষদের সঙ্গে। তারপর ক্রমশ ঢুকে যেতে লাগল এ ওর মধ্যে। বোর ফিল করতে শুরু করায় কিছুক্ষণ আগে এইখানে চলে এসেছিল রুচি; তা বলে সঙ্গ দেবার জন্যে ডাকেনি কাউকে। ব্যাপারটা দৃষ্টিকটুও।

ওকে এড়াবার জন্যে ঘর থেকে বেরুবার চেষ্টা করতেই হাত বাড়িয়ে দরজা আঁটকে দাঁড়াল দীপঙ্কর। ঘাবড়ে যাওয়া মুখ তুলে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে একটা কিছু অনুমান করার চেষ্টা করল রুচি। সঙ্গে সঙ্গে বুঝল, দীপঙ্করের দৃষ্টি ওর মুখের ওপর নিবদ্ধ থাকলেও দেখছ বহুদূর ভিতর পর্যন্ত, তীব্রতা মিশিয়ে—মাতালের চোখে অনুগ্রহ থাকে না।

জোর করলে গায়ে লাগবে ভেবে খোলা দরজায় পিঠ দিয়ে দাঁড়াল রুচি। অন্যদের শোনানো যাবে না ভেবেই চাপা গলায় বলল, 'বেশ তো ছিলে ওখানে, আবার এখানে উঠে এলে কেন!'

'যে-কারণে তুমি উঠে এসেছ—'

'আমি এমনিই এসেছি—'

'না।' মনে হয় এদিকে আসবার আগে নতুন করে গ্লাসটা ভরে নিয়েছে দীপঙ্কর। রুচির মুখের ওপর থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই গিলে নিল এক ঢোঁক। হাসিটা চেনা। বলল, 'সোমেনকে সহ্য করতে পারছ না বলে—'

'বাজে কথা বলবে না!' রুচি রূঢ় হবার চেষ্টা করল, কিন্তু রাগ বা বিরক্তি কোনওটাই প্রকাশ পেল না তার কথায়। যেভাবে বলল তাতে দীপঙ্করই শুনতে পাবে শুধু। তখন, নিজেকে আরও একটু ফোটাবার চেষ্টায় বলল, 'মদ খেলেই বুঝি মাতলামি করতে হয়!'

কথা শেষ করলেও তখনও ঠোঁটে ঠোঁট নামায়নি রুচি। হাতে ধরা হুইস্কির গ্লাসটা হঠাৎ ওর মুখের ওপর চেপে ধরল দীপঙ্কর, এমনভাবে, যাতে রুচি নড়াচড়া করলেই বেসামাল হবে, এমনকী পড়েও যেতে পারে।

'মদ খেয়েছি বলেই বুঝতে পারছি তুমি কত সুন্দর—তোমাকে কত ভালোবাসি—'

বলতে বলতেই, গ্লাসটা যেভাবে ধরা ছিল হাতে সেইভাবেই থাকল, রুচির কপালে নিজের মুখটা নামিয়ে আনল দীপঙ্কর।

রুচি কেঁপে উঠল।

প্রথমত ভয়ে। হাত তুলে দীপঙ্করকে ঠেলে সরিয়ে দেবার পরিবর্তে হাতটা নিজের কাঁধের কাছে চেপে ধরল, যাতে আঁচলটা পড়ে না যায়। কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই যে অত্যন্ত অশোভন এবং অন্যায় তা বুঝবার সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল, নিজের ভিতর থেকে দীপঙ্করকে নিরস্ত করার মতো কোনও জোর পাচ্ছে না সে। বরং এক ধরনের আরাম এই স্পর্শটাকে ধরে রাখার জন্যে প্রশ্রয় জুগিয়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গে। কেন এমন হবে তা সে জানে না। কিন্তু, অনুভূতিই বুঝিয়ে দিল, সে আর একজনের স্ত্রী এবং এইভাবে দীপঙ্কর চাইছে বলেই নিজেকে সঁপে দিতে পারে না। ভয়ই তখন পরিণত হল অপমান বোধে।

তার পরের ঘটনাটা ঘটল মুহূর্তের মধ্যে—প্রায় সস্তা নাটকের ধরনে।

কাচের গ্লাস ভেঙে পড়ার আচমকা শব্দে যখন কেউ কেউ ছুটে এলো এদিকে, রুচি তখন ঘটনাস্থল থেকে অনেকটা দূরে—মীনাদের বেডরুমের দরজার কাছে হতচকিত দাঁড়িয়ে আছে দীপঙ্কর। কী হয়েছে কারুর পক্ষেই বোঝা সম্ভব না হলেও ঘটনাস্থল থেকে রুচিই যে নিকটতম তা বুঝতে কারুরই অসুবিধা হবার কথা নয়। একই সম্ভাবনা রুচিরও মুখে।

কেউই অবশ্য কিছু জানবার চেষ্টা করল না। এটা ধ্রুবর ফ্ল্যাট, সে-ই এগিয়ে এল। প্রথম।

'একটা গ্লাসই যদি না ভাঙল তাহলে আবার পার্টি কী!'

এই সময় সোমেনের সঙ্গে চোখাচোখি হল। চোখ তুলেই রুচি অনুমান করল, সে তাকানোরও অনেক আগে থেকে তাকে লক্ষ করছিল সোমেন। এখন গ্লাস হাতে সরে গেল ড্রইংরুমের দিকে।'

অনেকক্ষণ পরে দীপঙ্কর বলল, 'সরি, ধ্রুব।'

'এত ফর্মাল হবার কী আছে!' দীপঙ্করকে টেনে নিয়ে এল ধ্রুব, 'কাম, হ্যাভ অ্যানাদার ড্রিঙ্ক—'

'থাক। আর অ্যানাদার করতে হবে না—', আভার গলায় ঝাঁজ, 'যারা গ্লাস সামলাতে পারে না তাদের ড্রিঙ্ক করাই উচিত নয়—'

'নো, আভা! নো।' নীলাদ্রি বলল, 'ব্যাপারটাকে তুমি বেশি গুরুত্ব দিচ্ছ। আমরা সবাই কখনও না কখনও গ্লাস ভেঙেছি। আমি তো তোমার বাড়িতেই—'

আভা জবাব দিল না। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সরে এল একটু। প্রায় রুচির পাশাপাশি। রুচি আভাকেই দেখল, জানত—যেরকম সোমেন করল, তেমনি, আভাও মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

'দ্যাট রিমাইন্ডস মি—', নীলাদ্রি বলল, 'আভা, তোমাদের এক সেট ওয়াইন গ্লাস প্রেজেন্ট করব বলেছিলাম, সেটা এখনও দেওয়া হয়নি—'

'ন্যাকামি কোরো না।'

গলার ঝাঁঝেই বোঝা যায় আভা কতটা ক্ষুব্ধ। আর দাঁড়াল না। ওকে এগোতে দেখে নীলাদ্রিও এগোলো।

মোটামুটি পুরুষরা আবার যে যার জায়গায় ফিরে যাবার পর মুখ খুলল চন্দ্রিমা।

'এখানে কী করছিল বলো তো!'

'কী আবার করবে!' ভাঙা কাচের টুকরোগুলো দেখতে দেখতে মীনা বলল, 'টয়লেট যাচ্ছিল বোধহয়—।' তারপর, কী ভেবে, জুড়ে দিল, 'এরকম হতেই পারে। বুঝতে পারছি না সবাই এত আপসেট কেন!'

ওদের পাশ কাটিয়ে বেডরুমে ঢুকল মীনা। খাটের তলা থেকে ওকে ঝাঁটা বের করতে দেখে রুচিও এগিয়ে এল।

'দাও, আমি ঝেঁটিয়ে দিচ্ছি—'

'না, না। তোমাকে আর হাত লাগাতে হবে না।'

'কেন!'

আড়ে তাকিয়ে মীনা দেখল অন্যরা সরে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এরপর হয়তো আর জমবে না তেমন। রাতও হয়েছে, একটু আগে দেখেছিল ঘড়ির কাঁটা বারোটা ছুঁই-ছুঁই। বস্তুত, এই ঘটনাটা না ঘটলে সে খাবার ডাক দিতে পারত।

'তোমার এত অস্বস্তি বোধ করার কী আছে!'

'অস্বস্তি হবে কেন!'

মীনা হাসল। কাচের টুকরোগুলো জড়ো করতে শুরু করেছে ততক্ষণ। রুচিকে দেখতে দেখতে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছিল? চড়টড় মারলে নাকি?

'আমি কেন মারব!'

আপত্তি জানালেও রুচির স্বর স্বাভাবিক নয়, মীনা বেরিয়ে গেল এবং পুরনো খবরের কাগজ হাতে ফিরে এলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

রুচি বলল, 'নিজে করছ কেন। জনার্দনকে ডাকলেই পারতে—'

'ওকে এসব ব্যাপারে না ডাকাই ভালো।'

কথা এইখানেই শেষ হয়। এখান থেকেই আলাদা করে শোনা যায় বিভিন্ন কণ্ঠস্বর—ধ্রুব, চন্দ্রিমা, নীলাদ্রির। খাপছাড়া এবং নিশ্চিত আগের মতো নয়। টুকরো টুকরো কথাগুলিই জড়ো করছে অনেক বেশি নৈঃশব্দ্য। রুচি বুঝতে পারল না এর মধ্যে তার জায়গা ঠিক কোনখানে। কিংবা, এখন যেখানে আছে, এর পরেও ঠিক সেখানে থাকবে কি না।

'দোষ আভার।' মীনা হঠাৎ বলল, 'দীপঙ্কর যে কী করে ওকে নিয়ে আছে!'

'ওদের ব্যাপার, ওরা বুঝবে—'

'না। আভাকে কখনও হাসতে দেখেছ? অলওয়েজ কমপ্লেনিং—। এই যে চ্যাচামেচিটা করল, এটা বাড়ি গিয়ে করলেই পারত। হাসব্যান্ডের প্রতি এটুকু রেসপেকট থাকা উচিত। দীপঙ্কর নিশ্চয়ই খুব এমব্যারাসড ফিল করেছে!'

রুচি চুপ করে থাকল।

'অবশ্য দীপঙ্করের এই রোমিও হবার চেষ্টাটাও আমি সাপোর্ট করতে পারছি না।' মীনা বলল, 'সোমেন তোমাকে ভুল বুঝতে পারে—'

'আমাকে ভুল বোঝার কী আছে!'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য—।' চোখ তুলে রুচিকে দেখল মীনা, থেমে থেকে বলল, 'তুমিই বা করবে কী!'

উত্তরে, রুচি কি কিছু বলেছিল? মনে পড়ে না। তখনই ধ্রুব এসে তাদের ডেকে নিয়ে

গেল বাইরে। চন্দ্রিমা গান গাইবে।

এইসব এবং এর পরেও যা ঘটেছে, দৃশ্য ও কথাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে কাল রাত থেকে এ-পর্যন্ত ঘোরাফেরা করছে রুচির মাথায়। এও জানে, সে একাই ভাবছে না সবকিছু। সোমেনও। শেষরাতের অন্ধকারে এক বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে আবছা ঘুমের মধ্যে হঠাৎ মনে হয়েছিল দূরত্ব অনেকখানি—মনে হল, সে যতটা দূরত্ব রেখেছে সোমেনও প্রায় ততটা। জানলা দিয়ে অদ্ভুত যেটুকু আলো আসে তা এসে পড়েছে মাঝখানের ওই শূন্যতায়—হলুদে-নীলে শীতল রহস্যময় তার আভা। সে কখনও আত্মঘাতী হতে দ্যাখেনি কাউকে, তবে আত্মহত্যা করলে এইভাবেই করা যায়। সোমেনকে দেখেই মনে হল, কেউই কিছু দ্যাখেনি হয়তো, তবু, যে যতটা দেখেছে তার সঙ্গে নিজের নিজের অনুমান মিশিয়ে একটা তাৎপর্য খুঁজে বের করতে পারে, প্রতিক্রিয়াও দেখাতে পারে। সেজন্যে রুচি আড়াল খুঁজবে কেন? ঘটনার সাক্ষী বলতে সে আর দীপঙ্কর। যতদূর মনে হয় দীপঙ্কর কাউকে বলবে না কিছু—কেউ বলে নাকি? ঘোর কেটে যাবার পর ভাবতে পারে তার—হয়তো রুচিরও—সেই মুহূর্তের আচরণ ছিল অবিশ্বাস্য। ইচ্ছে করলেই এর পর আস্তে আস্তে স্বাভাবিক করে নেওয়া যায় সম্পর্কটা। দীপঙ্কর যেমন ছিল তেমনিই থাকবে, রুচিও রুচির মতো; আগের মতোই দূরত্ব মেনে। রুচি জানে, অন্তত কাল ওই ঘটনা ঘটবার আগে পর্যন্ত দীপঙ্করকে নিয়ে আলাদা কোনও আবেগ ছিল না তার মনে। এখনও আছে কি না জানে না। যা স্পষ্ট নয় তা নিয়ে এমন ডুবে থাকারই কি মানে আছে কিছু!

না, এগুলো কোনও সমস্যাই নয়। রুচি থেমে আছে অন্যত্র—আরও গভীর কোনও অনুভূতির মধ্যে, যা তাকে অনবরত টেনে নিয়ে যাচ্ছে নিজেরই দিকে। সত্যি সত্যিই, কাল, সেই মুহূর্তে, কেন তার মনে হয়েছিল দীপঙ্করের স্পর্শে আছে এক ধরনের আরাম, যা ধরে রাখার জন্যে ঘন হয়ে উঠেছিল তার সর্বাঙ্গ! এমন এক অনুভূতিতে যা সোমেন তাকে দিতে পারেনি কখনও! সেই মুহূর্তে ভালো লেগেছিল সেই মুহূর্তটিকেই একান্ত করে ভাবতে—মনে হচ্ছিল দিনে দিনে ক্রমশ বাতিল বালিরেখা ধরে তিরতির করে ছুটে আসছে প্রবল ও অবিন্যস্ত জল, আর কিছুক্ষণ ওই স্পর্শের মধ্যে নিজেকে ধরে রাখলেই আত্মহারা হবে সে! সেটা কি শুধুই একটা অনুভূতি, না কি আরও কিছু—শরীরে সঙ্কেত পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল চব্বিশ বছর ধরে অস্পষ্ট কিন্তু অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া অপূর্ণতার বোধ, যা তাকে রুচি হয়ে উঠতে দেয়নি কখনও, কিংবা ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে শুধুই সোমেনের স্ত্রী এবং সেই সূত্রেই শ্রীময়ী ও কৌশিকের মা হয়ে থাকার দিকে! নাকি চব্বিশ বছর ধরে পেতে পেতে নিজের আড়ালে ক্রমশ একটা অভাবের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সে—যেখানে যা পাচ্ছে তা স্বীকার করে নিলে টেকা যায় হয়তো, নিজের দিকে ফেরার জো থাকে না কোনও! যেখানে হয়তো—আরও ভাবল রুচি—অধিকার খাটানোর অর্থ ভালোবাসা, গতানুগতিকতার অর্থ স্বাচ্ছন্দ্য, সবকিছু স্বীকার করে নিলেই সম্পূর্ণ হয় স্বাধীনতা; সুতরাং সে একা বোধ করবে কেন!

ঠিক এইভাবে, এমন গুছিয়ে এর আগে কখনও আসেনি ভাবনাগুলো। আজ আসছে। হয়তো এসব ভাবনা তাকে কোনওদিকে নিয়ে যাবে না কখনও, তবু।

জল, জলের নীচে রুচি, অনেকটা সময় অর্থহীন ভিজে যেতে যেতে চোখদুটো জ্বালা করছে অল্প—এই অবস্থায় বাথরুমের দরজায় টোকা এবং বাইরে থেকে শীমুর গলা কানে

এল।

'আর কতক্ষণ লাগবে তোমার!'

'কেন, কী হয়েছে!'

'দীপঙ্করকাকুর টেলিফোন—'

মেয়ের গলা পেয়েই নব ঘুরিয়ে শাওয়ার বন্ধ করেছিল রুচি। এখন ব্র্যাকেট থেকে তোয়ালেটা টেনে চাপা দিল বুকে।

'আমাকে?'

'না।' শীমু বেশ স্পষ্ট, 'বাবা ডিরেক্ট অফিসে গেছে কি না জিজ্ঞেস করছে।'

'অফিসেই তো যাবার কথা। ফোন করে দেখতে বল না?'

শীমু চলে গেল। রুচি কান খাড়া করল, যদি কিছু শোনা যায়। টেলিফোনটা এখান থেকে অনেক দূরে। কথা দূরের কথা, রিং হলেও শোনা যায় না অনেক সময়। এখনও গেল না।

এর বেশি আর কোনও কৌতূহল দেখাল না রুচি। গা মুছল তাড়াতাড়ি; স্নানের পরেও থম ধরে থাকা গায়ে সায়া, ব্রা, ব্লাউজ পরে নিল যথাযথ। শাড়িটা কোনওরকমে জড়িয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। দরজা থেকেই উঁকি দিয়ে দেখল শীমু কোথায়, নিশ্চয়ই কথা চালিয়ে যাচ্ছে এখনও। রুচি মেয়ের গলা শুনল, কিন্তু কথাগুলো স্পষ্ট হল না।

শাড়িটা ঠিকঠাক করে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুচি। চিরুনি বুলোতে যাবে, এমন সময় শীমু ফিরে এলো আবার।

'যাও, তোমাকে ডাকছে—'

কথাটায় কিছু ছিল হয়তো, রুচি কেঁপে গেল একটু। সামলে নিয়ে তাকাল মেয়ের দিকে।

'আমাকে কেন!'

'আচ্ছা তো!' বিরক্ত হয়ে শীমু বলল, 'আমি কী করে বলব!'

রুচি আর ভাবল না। আয়নার দিকে ফিরতে ফিরতে বলল, 'বলে দাও নেই—'

'কী আশ্চর্য! ধরতে বললাম, এখন—'

ভঙ্গিতে পরিবর্তন হল না রুচির। চোয়াল শক্ত করে বলল, 'তাহলে অন্য কিছু বলে দাও—বাথরুমে—আমি এখন কথা বলতে পারব না—'

উত্তরটা মনঃপূত না হলেও আয়না থেমে শীমুর প্রতিফলন সরে যেতে চিরুনি ধরা হাতটা থেমে গেল রুচির। দু' এক মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য অচল অবস্থাটা কাটিয়ে ব্যস্ত ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। যেদিকে টেলিফোনটা থাকে। ওদিকে টুংটাং শব্দ; দেখল, রিসিভার নামিয়ে রাখছে শীমু।

চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা ছাড়তে ছাড়তে রুচি জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে করছিল? বাড়ি থেকে?'

'জানি না।' সামনে দিয়ে না তাকিয়ে চলে যেতে যেতে শীমু বলল, 'এত কৌতূহল থাকলে নিজেই ধরলে পারতে—'

রুচি সেইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল। খানিক আগেকার কথাবার্তার জের টানছে শীমু। ঘরে ঢুকল, এরপর হয়তো বাথরুমে ঢুকবে। দেয়ালঘড়িতে সওয়া দশটা। আর

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর কলেজে বেরিয়ে যাবার কথা। তারপর থেকে সন্ধে না হওয়া পর্যন্ত রুচি একা।

ভাবতে ভাবতেই দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতায় ফিরে গেল রুচি—কপালের ওপর নামিয়ে আনতে চাইল একটি অবিশ্বাস্য স্পর্শ। কোনও অনুভূতিই সঞ্চারিত হল না শরীরে। এমনও হতে পারে, কাচ ভাঙার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ওই স্পর্শটুকুও হারিয়ে ফেলেছে সে; ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়, আর কোনও দিনই ফেরাতে পারবে না। ভাবতে ভাবতেই এক ধরনের বিষণ্ণতার মধ্যে টেলিফোনটার দিকে এগিয়ে গেল রুচি।

শীমুর কাজই এইরকম। রিসিভারটা জায়গাতেই রেখেছে, কিন্তু ঠিকঠাক বসেছে কি না খেয়াল করেনি। এই অবস্থায় ফোন করলে যে-কেউই এন্‌গেজ্‌ড সাউন্ড পাবে।

॥ ২ ॥

অফিসে যাবে বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে ছিল সোমেন। কিছু দূর এসে ড্রাইভারকে বলল, 'শোনো, অফিসে নয়—। ফ্যাক্টরি চলো—

নির্দেশটা এমনই হঠাৎ এলো যে ড্রাইভারও ইতস্তত করল একটু। গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ফ্যাক্টরি, স্যার?'

'হ্যাঁ। বললাম তো!'

এখান থেকে বাঁদিকে যাবার রাস্তা নেই; হয় সামনে যেতে হবে অনেকটা, না হয় পিছনে। আরও এগিয়ে জ্যাম হয়েছে কোথাও। অন্যান্য গাড়িগুলো দাঁড়িয়ে যাচ্ছে পরপর। ড্রাইভার ব্যাক করার চেষ্টা করতেই একসঙ্গে বেজে উঠল প্রতিবাদসূচক বেশ কয়েকটা হর্ণ। তারপর ঠিকই পবিবর্তিত রাস্তায় পৌঁছে গেল ওরা।

সোমেন ভাবল, দোষ ড্রাইভারের নয়। সিদ্ধান্ত নেবার ব্যাপারে সাধারণত ভুলচুক করে না সে—যা করবে সে-সম্পর্কে ভাবনাটা তৈরি থাকে মনে, হঠাৎ বা মাঝখান থেকে শুরু করার দরকার হয় না। অফিসে যাবে, না ফ্যাক্টরিতে—এটাও আগে ভাববার কথা, পাঁচ মিনিট দূরত্ব পেরিয়ে এসে নয়। কিন্তু আজ তার সমস্তই উল্টোপাল্টা হচ্ছে। একটু আগে, বাড়ি থেকে বেরুবার সময়, গাড়িতে উঠেও রওনা হবার মুখে গাড়ি থামাতে বলেছিল সে। হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ধরনে নেমে এগিয়ে গিয়েছিল গেট পর্যন্ত। দু'এক মুহূর্ত ওইখানেই মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে এলো আবার। ড্রাইভার নিশ্চয়ই ওর আদব কায়দা জানে, লক্ষও করেছিল। প্রশ্ন করার অর্থ ঠিকঠাক বাজিয়ে নিল।

ফ্যাক্টরি তারাতলায়। চেনা রাস্তা, তবু প্রতিদিনের নয়। সোমেনের হাতে সিগারেট, জানলায় মুখ, গা পিছনের সীটে হেলানো—বেলা দশটার ব্যস্ত রাস্তায় চোখ মেলে ভাবল রাস্তা বদলালেই দৃশ্য বদলায় না তেমন, যদি না এমন কোথাও এসে পড়ে যেটা সম্পূর্ণ নতুন, প্রতিদিনের দেখার সঙ্গে মেলে না একেবারে। এখনও তেমনি, সেই একই লোকজন, সেই একই ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি, যেটা এখানে দেখছে খানিক পরেই সেটা গিয়ে পৌঁছুবে চেনা রাস্তা

বলতে সে যা বোঝে সেখানে। সেই একই জটপাকানো শব্দ। এক সময়, যখন ছোট ছিল, খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে কানে আঙুল দিয়ে দেখত শব্দে তারতম্য ঘটে কি না। কান খুললেই একই শব্দ ঝপ্ করে ঘা মারত পর্দায়। চাকরি ছেড়ে ইদানীং নিজের অডিও-ভিস্যুয়াল ইউনিট খুলেছে নীলাদ্রি; নয়েজ পল্যুসনের ওপর ডকুমেন্টারি তুলেছে একটা—সেদিন বলছিল, দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে শুধু সাউন্ড ট্র্যাকে মনোনিবেশ করলে যে-কোনও সুস্থ মানুষ পাগল হয়ে যেতে পারে। তবে, সোমেন ভাবল, পাগল হবার জন্যে সবসময় বাইরের উপলক্ষ দরকার হবে কেন। নৈঃশব্দ্যের আক্রমণও কি কম জোরালো।

শেষ রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। সকালে কড়া রোদ উঠলেও এখনও জল জমে আছে রাস্তার ভাঙা খোদলে। একটা বাস গা-ঘেঁষে যাবার সময় কাদা ছেটালো অল্প, আর একটু হলেই গায়ে লাগত। সোমেন একটু সরে বসল। এখন লাগেনি বলে পরেও লাগবে না তার কোনও মানে নেই। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে নামিয়ে নিল কাচটা।

এটা তার হাসবার সময়। আলাদা হল বটে, ভাবল, কিন্তু কতটা? এই যে অফিসে যাবে বলে বেরিয়েও সিদ্ধান্ত পাল্টে যাচ্ছে ফ্যাক্টরির দিকে, তাতে সত্যি-সত্যি কতটা সুবিধে হবে তার? প্রোডাকসন ম্যানেজার জয়ন্ত চৌধুরীর সঙ্গে দুটো নাগাদ অফিসেই মিটিং করার কথা ছিল—সেলস ও ডেলিভারি চার্ট তৈরি করে কালকেই গোছগাছ করে রেখে এসেছিল অফিসে। এখন সে নিজেই ছুটছে ফ্যাক্টরিতে। আনসিডিউলড ভিজিটে দায়িত্ব থাকে না কারও। তখন গাড়িতে উঠেও গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল ফোন করবে ভেবে। একটা অফিসে, তার সেক্রেটারিকে; আর একটা ফ্যাক্টরিতে, জয়ন্তকে আগাম খবর দিতে। শেষ পর্যন্ত গেল না। ভিতর থেকে ঠেসে এলো দ্বিধা। এই ফোন টোনগুলো বেরুবার আগেই সেরে নিতে পারত; কিন্তু, তখন তার তাড়া ছিল বেরিয়ে আসার জন্যে। সত্যি বলতে, সকাল থেকে যত সময় যাচ্ছিল ততই অসহ্য লাগছিল রুচির উপস্থিতি—অসহায়তাও ছিল; চব্বিশ বছরের সম্পর্কে আর কখনও তাকে এমনভাবে অপ্রস্তুত করেনি রুচি। ফিরে যাওয়াটা খেলো হবে। রুচি ভাবতে পারে অশান্তি সৃষ্টির জন্যেই বাড়তি টেনসন গড়ে তুলছে সোমেন—রাতের অন্ধকারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কী হল না হল তা নিয়ে এরকম আজগুবি ব্যবহারের মানে হয় না কোনও। রুচি ভাবতে পারে নিজের টেনসনটা শীমুর মধ্যেও ছড়াতে চাইছে সোমেন। সেরকম কিছু বললে দাঁড়াতে পারত না সোমেন। তখন ঠিক করল ওপরে যাওয়া নয়। অফিসেই যাওয়া যাক আগে।

কিছু দূর এগিয়ে অবশ্য মন বদলাতে হল। যে-কারণে অফিসে যাওয়া এড়াতে চাইছিল, সেটাই চেপে ধরল তাকে। ন'টা নাগাদ ফোন এসেছিল ধ্রুবর, শীমু ধরেছিল, শীমুকে বলল, 'এইমাত্র অফিসে বেরিয়ে গেছে' বলে দিতে। জানে, অফিসে গেলেই ধ্রুব ফোন করবে আবার, প্রশ্ন করবে কাল ঠিকঠাক পৌঁছেছিল কিনা, ইত্যাদি। এসে পড়বে অন্য প্রসঙ্গ, যেমন আসে, সারবত্তা থাকা না-থাকাটা জরুরি নয়, ধ্রুব ছাড়াও ফোন করতে পারে নীলাদ্রি কিংবা অশোক। দীপঙ্কর? সোমেন নিশ্চিত নয়। করা অসম্ভব নয় কিছু। সকলেই কি আর সোমেন বাঁডুজ্যে। তাছাড়া তার সমস্যাটা তার নিজেরই—এক অর্থে গোপন এবং একান্ত। ওরা যেহেতু কিছুই জানে না তা নিয়েও মাথা ঘামাবে না। এখনই মনে হল, পরস্পর সম্পর্কে এত বেশি কৌতূহল কেন তাদের! বন্ধুতার কারণে? এই বন্ধুতার বেসগুলো কী? একজোট হয়ে এ ওর বাড়িতে যাওয়া। মদ গেলা, কিছু পরচর্চা এবং আত্মচর্চা—মাঝে একটা থিয়েটার

করেছিল অবশ্য, মোটামুটি একইভাবে, আড্ডা দিতে দিতে, সেটা কিছু নয়; তারপর বাড়ি ফেরা। গভীরে গেলে এর মধ্যে আর কোনও তাৎপর্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এই করতে করতেই এদের সঙ্গে কেটে গেল সাত আট বছর। সোমেন আরও একটু এগিয়ে গেল, ভাবল, যদি এমন হয় যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে হঠাৎ সম্পর্ক ছাড়ল এদের সঙ্গে, তা হলে আর কার কার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারে সে? ঠিকঠাক ভাবতে পারল না। সুমিত্র, চন্দন, অপূর্ব, অসীম, দ্বিজেন—অর্থাৎ আগে যারা কাছাকাছি ছিল, তাদের অনেকের সঙ্গেই দেখা হয় না আজকাল, তাদের বউদের সঙ্গেও না; এমনকী—এটাই সত্যি—দেখা হলেই কি খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে সে। মনে হয় আলাপ চালানোর মতো প্রসঙ্গ নেই কোনও। তখনই ফরমাল হতে হয়, এড়িয়ে যেতে হয় ছুতো খুঁজে। এই সেদিন, মাস খানেক আগে, দ্বিজেন এসেছিল সস্ত্রীক, মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করতে। সে এবং রুচি দুজনেই আগ্রহ দেখাল খুব; যাবে, অবশ্যই যাবে। পরে চক্রান্ত আঁটতে হল। যাবে বলে ঠিক করেও মত বদলাল, কারণ, ওইদিন সন্ধ্যায় নীলাদ্রি ডাকল বাড়িতে—ভি ডি ও'তে 'লাস্ট ট্যাঙ্গো ইন প্যারিস' দেখাবে, আনসেন্‌সরড্, মাত্র এক সন্ধ্যার জন্যে পাওয়া গেছে ক্যাসেটটা; তাছাড়াও একটা সফ্‌ট্ পর্নো পাওয়া যেতে পারে; অন্যরা সবাই আসছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। সোমেনকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে রুচিও উৎসাহ দেখাল না, যদিও এরই মধ্যে, দ্বিজেনের মেয়েকে দেবে বলে একটা সিলকের শাড়ি কিনে প্যাক করে ফেলেছিল রুচি। বুদ্ধিটা এল পরে। ড্রাইভারের হাতে আগের দিন উপহারটা পাঠিয়ে দিল সোমেন। সঙ্গে তিন চার লাইনের চিঠি—অফিসের কাজে বোম্বাই যেতে হচ্ছে হঠাৎ, রুচি আর ছেলেমেয়েরাও যাচ্ছে সঙ্গে, দ্বিজেনরা যেন কিছু মনে না করে, ফিরে এসেই দেখা করবে, ইত্যাদি। সোমেন অবশ্যই ব্যস্ত মানুষ; এ-ধরনের ঘটনা ঘটে এবং বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। কিন্তু, যদি এমন হয় যে চিঠির বক্তব্য বিশ্বাস করেনি, সন্দেহবশত খোঁজ করেছিল অফিসে, টেলিফোন অপারেটরের কাছে কিংবা, ওই সময়েই যাতায়াতের রাস্তায় তাকে কিংবা রুচিকে হঠাৎ দেখে ফেলেছিল দ্বিজেন বা আর কেউ, তাহলে, কী ধারণা হল ওদের। সহজ কারণে যেতে না পারা এবং ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যাওয়া—দুটো নিশ্চয়ই এক ব্যাপার নয়। দ্বিজেন অপমানিত বোধ করতে পারে। কারণ এটা এমনি কোনও আড্ডা দেবার নিমন্ত্রণ ছিল না; সেদিনই বলেছিল দ্বিজেন, 'শুধু মেয়ে তো নয়, জানো তো, ও-ই আমাদের একমাত্র—যারা কাছের তাদের নিয়ে আনন্দ করার উপলক্ষ আর পাব না—।' তার মানে, ক্ষমা প্রার্থনার কিংবা পুষিয়ে দেবার আর কোনও সুযোগ সোমেন পাচ্ছে না। সেদিন সন্ধেটা, অনেক রাত পর্যন্ত, তারা কাটিয়েছিল 'লাস্ট ট্যাঙ্গো' দেখে ও মদ খেয়ে। একটা ব্লু-নাইটের সাজেসান এসেছিল, মনে পড়ে—শুধু নীলাদ্রিই প্রকাশ্যে চুমু খেল চন্দ্রিমাকে; দেখাদেখি ধ্রুব মীনার দিকে এগোলে মীনা সরে গিয়ে বলল, 'তুমি তো সারাক্ষণ খাচ্ছ, এখন আর কেউ থাক—'; শুনে দীপঙ্কর, দার্শনিকের ভঙ্গিতে বলল, 'আমি কারুর দিকে যাব না—যদি কেউ ইচ্ছে করে আসতে পারে আমার কাছে—।' রুচি ও আভা বসেছিল পাশাপাশি, দীপঙ্করের দৃষ্টি, সুতরাং, ওদের যে-কোনও একজনের ওপর পড়েছিল। হয়তো রুচির মুখে, এখন ভাবল সোমেন; যদিও আভা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'আদিখ্যেতা দেখলে গা জ্বালা করে—।' এইসব করতে করতে একবারও মনে পড়েনি দূরে কোথাও বেজে চলেছে সানাই। আর মধুর ওই মাঙ্গলিকের ধ্বনি ক্রমাগত আড়াল করে যাচ্ছে একটি প্রতারণা—

নিউ আলিপুরের রাস্তায় বাম্প পেরোতে গিয়ে ঝাঁকুনি খেল গাড়িটা। তখনই খেয়াল হল

ক্যান্টরি দূরে নয়। সোমেন সোজা হয়ে বসল। জানলার কাচটা নামিয়ে দিল আবার। রাস্তা এখানে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা বলেই সম্ভবত হঠাৎ হাওয়া ছুটে এল তার দিকে। চোখ তুলে আকাশ দেখল—রোদে তেজ নেই, ইতস্তত কিছু মেঘও সঞ্চারিত। আরও একটা বাম্প পেরোতে না পেরোতে বিকেলের ধরনে ছায়া ছড়াল রাস্তায় এবং আশপাশের বাড়িগুলোতে। অন্যমনস্কতার মধ্যে পকেট থেকে রুমালটা বের করল সে, ঠোঁটের পাশে জমে ওঠা ঘাম মুছল এবং যেন বা রুমালেরই স্মৃতিতে, এতক্ষণের ভাবনা থেকে সরে গেল তার ও রুচির সম্পর্কের মধ্যে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তার তলপেটে এবং আরও নীচে শুরু হল অস্বস্তি, সেটা ক্রমশ পরিণত হল মৃদু উত্তেজনায়। আগের সিগারেটটা কখন শেষ হয়েছে ও ফেলে দিয়েছে মনে নেই। ঠোঁট দুটো শুকনো লাগায় ওই মুহূর্তে সে আরও একবার সিগারেট ধরানোর প্রয়োজন অনুভব করল।

কালকের রাতটা চট করে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়, কী হয়েছিল সে ঠিকঠাক জানে না, লক্ষও করেনি। কিন্তু, ধ্রুবর ফ্ল্যাটে, দীপঙ্করের গ্লাস ভাঙবার পর, রুচির দিকে তাকিয়ে এবং তারপর যেভাবে সকলেই চাপা দেবার চেষ্টা করল ঘটনাটা, সোমেনের মনে হয়েছিল চেষ্টাটা আসলে তারই জন্যে। তারপরেও ঘন্টাখানেক ছিল ওরা, নিছকই ভদ্রতার খাতিরে—ধ্রুবর জেদাজেদিতে আরও এক রাউন্ড হুইস্কি ঘুরেছিল হাতে হাতে। কিন্তু আরও মদে যে নেশা ছুটেও যেতে পারে কখনও, নিজেকে দিয়েই ক্রমশ বুঝতে পারছিল তা। পাছে ঘৃণা ফুটে ওঠে সেজন্যে দীপঙ্করের দিকে সোজাসুজি তাকায়নি সে। ইচ্ছে করেই দূরে দূরে থাকছিল রুচি। এমনিতে চুপচাপ ও শান্ত হলে হবে কি, মুখ যে-কাউকেই চিনিয়ে দিতে পারে। সোমেন সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যা হবার হয়েছে, ব্যাপারটা নিয়ে রগড়ানোর দরকার নেই কোনও। তা ছাড়া, যেটা শেষ পর্যন্ত ভাববার চেষ্টা করছিল সোমেন, রুচি সম্পর্কে দীপঙ্করের দুর্বলতা আর কেউ টের পাক না পাক স্বামীর অনুভূতি দিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই লক্ষ করেছে সে। কিন্তু, তার অর্থ কি এই যে রুচির দুর্বলতা আছে দীপঙ্কর সম্পর্কে? রুচির মুখে যে-ছায়া তা বিব্রত হবার কারণ ছাড়া ভয়েরও হতে পারে। মনে হয় এর পর সতর্কতা দরকার, অবস্থা বুঝে রুচিকে সাবধান করাও, ইত্যাদি। কিন্তু, এইভাবে ভাবা সত্ত্বেও, নিজের ভিতরের ক্ষোভ তাকে স্বাভাবিক হতে দিল না।

বাড়ি ফিরল চুপচাপ। চারতলা বাড়ি। নীচের তলায় থাকে এক পাঞ্জাবি পরিবার; পরের দুটিতে বাড়িওলা নিজে—ওপরের ফ্লোরটা তাদের। কোম্পানি লিজে পাওয়া। ওপরের তিনটি ফ্লোরে উঠতে হয় প্যাসেজ পেরিয়ে বাঁদিকের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির দরজাটা সারাদিন খোলা থাকলেও বন্ধ করে দেওয়া হয় বেশি রাতের দিকে। ল্যাচ টানা দরজা, চাবি থাকার জন্যে খুলতে অসুবিধে হয় না। প্রয়োজনে ডাকার জন্যে কলিং বেল আছে আলাদা। রুচি ব্যাগ হাতড়াচ্ছে দেখে অধৈর্যভাবে কলিং বেল টিপল সোমেন। ফ্ল্যাটের পিছন দিকে সারভেন্টস রুমে দিলীপ থাকে, কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে খুলে দিল। আগে সোমেন, কিছুটা তফাতে রুচি—নিজের ফ্ল্যাটের দরজায় পৌঁছে সোমেন দেখল রুচি তখন আরও তফাতে। ঘরের আলো নেভানো দেখে বুঝল শীমু ঘুমিয়ে পড়েছে, যেমন অভ্যস্ত—একটা, দেড়টায় বাড়ি ফেরা তাদের পক্ষে নতুন কিছু নয়। সোমেন টয়লেটে গেল। তারপর নিজেদের ঘরে এসে কিছু খেয়াল না করেই আলো জ্বালল হঠাৎ এবং দেখল রুচি কাপড় ছাড়ছে, আলো জ্বলতেই তখনও অবিন্যস্ত বুকের ওপর চটপট হাতে শাড়ি জড়ো করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল,

মুখে বিরক্তি। আলোটা সঙ্গে সঙ্গে নিভিয়ে দিল সোমেন।

'মেয়েটাকে এভাবে একলা বাড়িতে ফেলে রাখা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না—' সোমেন বলল, 'সারভেন্টস রুম হলেও দিলীপ বাড়ির ভেতরেই থাকছে—'

রুচি তখনও নিজেকে গুছিয়ে নিতে ব্যস্ত। জবাব দিল না।

খানিক অপেক্ষা করল সোমেন। শার্টটা আগেই খুলে ফেলেছিল, এখন ট্রাউজার্স ছেড়ে আন্ডারওয়্যার পরা অবস্থাতেই বিছানায় এসে বসল। তারপর বলল, 'কখন কী করে বলা যায় না।'

'হঠাৎ এসব ভাবছ?' রুচি প্রশ্নই করল; এমন ভাবে, যেন সোমেনের আগের কথাবার্তায় যুক্তি ছিল না কোনও।

'হঠাৎ-এর কী আছে।'

অন্ধকারেই আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রুচি।

'দিলীপ এ-বাড়িতে নতুন থাকছে না। কখনও বেচাল কিছু করেনি।'

'কখনও করেনি বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না—'

'কী ব্যাপার বলো তো।' রুচি মুখ ফেরাল সোমেনের দিকে। পরবর্তী কথাগুলো বেরিয়ে এল ঝাঁজ নিয়ে, 'মাঝরাত্তিরে একগাদা মদ গিলে এসে আবোলতাবোল বকছ!'

'মদ না গিলেও তো অনেকে অনেক কিছু করে—'

নিশ্চিত এভাবে, কিংবা, এই কথাগুলো বলতে চায়নি সোমেন। কিন্তু, সিদ্ধান্ত যেমনই থাক, ক্ষোভই নিয়ন্ত্রণ করল তাকে। তখন আর ফেরার উপায় নেই।

'অত লুকিয়ে চুরিয়ে বলার কী আছে!' রুচি বলল, 'রাগটা যে আমার ওপর তা তো বুঝতেই পারছি!'

সোমেন এরই মধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল। অন্ধকারে দুজন রুচি; সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে আয়নাতেই চোখ যায় বেশি । রাগ এবং অসহায়তা, দুটোই তখন প্রবল। এড়িয়ে যাবার মতো কোনও প্রসঙ্গও খুঁজে পেল না।

'কী স্বভাব!' চাপা গলায় রুচি বলল, 'এখন মেয়েকে নিয়ে টানাটানি!'

রুচি বেরিয়ে যাচ্ছিল ঘর থেকে। হঠাৎ হাত বাড়িয়ে সোমেন ওর চুলের গোছা চেপে ধরল এবং ক্ষিপ্ত ভঙ্গিতে ঝাঁকাতে লাগল মাথাটা। দু এক মুহূর্ত পরে যখন ছাড়ল তখন কয়েকটা চুল উঠে এসেছে হাতের মুঠোয়। কথার অভাবে নিঃশ্বাস পড়ছে দ্রুত।

'এই আমার প্রাপ্য!' অন্ধকারে, স্তম্ভিত মুখে স্বামীর দিকে তাকাল রুচি। তারপর ভাঙা, চাপা অথচ তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'এই তো, সামনেই রয়েছি। ইচ্ছে হলে আরও মারতে পারো!'

'এটাকে মারা বলে না—', দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে সোমেন বলল, 'বাড়িয়ে বলবে না—'

সোমেন কি বুঝতে পেরেছিল কিছু? সম্ভবত। তখনকার অনুভূতি এখন ভাবনা মাত্র, চৈতন্যে সাড়া তোলে না কোনও। তবে, সে নিজেই বেরিয়ে এসেছিল ঘর থেকে। সিগারেট ধরিয়ে চুপচাপ বসেছিল সোফায়, অনেকক্ষণ, আবার ফিরে যাবার জন্যে।

নেপালি দারোয়ান গেট খুলে দিতে দু পাশে কেয়ারি-করা বাগানের মধ্যে দিয়ে গাড়িটা চলে এল ফ্যাক্টরির অফিসের সামনে। ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে সামান্য, আকাশ বেশ ভার; ওই পরিপ্রেক্ষিতে চোখে পড়ল অফিসের পিছন দিকে মাথা তোলা অ্যালুমিনিয়ামের চিম্‌নিটা। ঈষৎ আর্দ্রতা মেশানো কখনও ধূসর কখনও সাদা ধোঁয়া উঠে যাচ্ছে আকাশে।

ফ্যাক্টরিতে বড় একটা আসতে হয় না তাকে। তাই, যতবারই আসে নতুন লাগে। সদ্য রঙ ফেরানোর জন্যে এবার একটু বেশিই লাগছে। চারদিকের পরিচ্ছন্নতা ছুঁয়ে যাচ্ছে চোখ। রিসার্চ ল্যাবোরেটরির সামনে দিয়ে যেতে যেতে অ্যালকোহলের গন্ধ পেল। সঙ্গে পোড়া-পোড়া, বনজ একটা গন্ধ। আরও এগিয়ে বাঁ দিকে বাঁক ঘুরলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিস। পার্সোনেল ম্যানেজার, ওয়ার্কস-এর পরের ঘরটা জয়ন্ত চৌধুরীর। বাইরের বেঞ্চিতে বসে আর একজনের সঙ্গে গল্প করছিল পিওন; মুখ চেনা, সোমেনকে দেখে ব্যস্তভাবে উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল।

'সাহেব তো নেই, স্যার।'

'নেই।' না-থাকার অর্থ বুঝে নিয়ে সোমেন জিজ্ঞেস করল, 'কোথায়?'

পিওন দরজাটা খুলে ধরল। এটা ডিপার্টমেন্ট, সোজাসুজি তাকালে জয়ন্তর ক্যাবিন। ছ'জন কি সাত জন কাজ করছে বিভিন্ন টেবিলে। ওরা উঠে দাঁড়িয়েছিল, দেখাদেখি— সবচেয়ে শেষে—রোগা, ফর্সা একটি যুবতী, আগে কখনও দেখেছে মনে পড়ল না। সম্ভবত নতুন। সোমেন শুনেছিল একটি টাইপিস্ট মেয়েকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া নিয়ে এজিটেট করেছিল ইউনিয়ন, সেই মেয়েটিও হতে পারে। জয়ন্তর অ্যাসিস্টান্ট দাশগুপ্ত বলল, 'আসুন, স্যার। মিস্টার চৌধুরী তো ফ্যাক্টরিতে—'

'খবর দেওয়া যাবে?'

'হ্যা, নিশ্চয়ই।' দাশগুপ্ত ওকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসাল। এয়ারকন্ডিশানারটা খুলে দিয়ে বলল, 'ওঁরই যাবার কথা ছিল না?'

'হ্যাঁ। আমিই এলাম।'

'চা কফি কিছু?'

ঘরটা মুহূর্তেই ঠাণ্ডা হতে শুরু করেছে। সোমেন বলল, 'না। খবর দিন একটা—'

সোমেনের পিছন দিয়ে ঘুরে গিয়ে জয়ন্তর টেবিলের রিসিভারটা তুলল দাশগুপ্ত, কানে দিয়ে ট্যাপ করল বার দুয়েক। সম্ভবত রেসপন্ড করছে না। নাকি এনগেজ্‌ড্? রিসিভারটা আবার নামিয়ে রেখে বলল, 'আমি খবর পাঠাচ্ছি—'

দাশগুপ্ত বেরিয়ে যেতে সিগারেট ধরাল সোমেন। মনে হয় ফার্নিচারে রদবদল ঘটেছে কিছু। জয়ন্ত যেখানে বসে তার পিছনে কাঁচের স্যাম্পেল ক্যাবিনেটটা নতুন—ভিতরের চেনা প্রোডাক্ট স্যাম্পেলগুলোকেও নতুন লাগছে সেজন্যে। ক্যাবিনেটের মাথায় রাখা ফুলদানিটা নতুনই। দুটি পাতা নিয়ে পরিচ্ছন্ন লাল গোলাপ ফুটেছে সেখানে। বড় কাচের জানলা দিয়ে চোখে পড়ে ফ্যাক্টরি বিল্ডিং। কংক্রিটের ধূসর দেয়ালে বড় লাল ইংরিজি অক্ষরে লেখা 'নো স্মোকিং', 'জি' অক্ষরটা ঢাকা পড়েছে এলোমেলো ভাবে সাঁটা ইউনিয়নের পোস্টারে। কী বক্তব্য পড়া যায় না এখান থেকে, তবু আঘাত করে চোখে। এখনই মনে পড়ল শেষবার যখন এসেছিল তখন পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে ছিল গেটের বাইরে থেকে ভিতর পর্যন্ত সব দেয়াল। দাবি-দাওয়া নিয়ে নতুন চুক্তি হবার পরই সম্ভবত তুলে ফেলা হয়েছে সব, রঙ করা হল ফ্যাক্টরি। মনে হয় কোনও চুক্তিই টেকে না, কোনও পরিচ্ছন্নতাই স্থায়ী নয়। দেখতে দেখতে ঝাপ্‌সা হয়ে এলো ফ্যাক্টরি দেয়াল। বৃষ্টিতে জোর বেড়েছে; বাষ্পাচ্ছন্ন হতে হতে ক্রমশ পুরু পর্দায় ঢেকে গেল কাচের জানলাটা।

অধৈর্য ভাবে সিগারেটটা অ্যাশট্রের মধ্যে গুজে দিল সোমেন। ধোঁয়া স্তব্ধ না হওয়া পর্যন্ত

ঘষতে লাগল টুকরোটা।

চব্বিশটা বছর হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল বুকে। স্মৃতি আছে, ভূমি নেই—সুতরাং, শিকড়ও নেই। কাল রাতে যেমন গিয়েছিল, তেমনি, পুনরভিনয়ের মধ্যে দিয়ে নিজেকে ফিরে যেতে দেখল সোমেন; অন্ধকারে। রুচি শুয়ে পড়েছিল। পাশে শুয়ে, স্পর্শ না করেও, ওর শরীরের কাঠিন্য অনুভব করল সোমেন। জেগে না থাকলে এই নৈঃশব্দ্যে নিশ্চয়ই শব্দ শোনা যেত রুচির নিঃশ্বাসের। যেটা পেল তা ওর মাংসের গন্ধ, সন্ধ্যায় ব্যবহৃত পারফিউমের গন্ধ। অন্ধকারই চিনিয়ে দেয় অন্ধকার, আদল, ক্রমশ সম্পূর্ণ অবয়ব। সোমেন কি ভাববার চেষ্টা করেছিল নৈকট্য থাকে শুধুই ক্রমাগত শরীর সংস্পর্শের মধ্যে, কারণ শরীরই টানে; সম্পর্ক একটা ধারণা মাত্র—শর্তাধীন, চুক্তিবদ্ধ, মেনে না নিলেই দাগ পড়ে সেখানে, অপরিচ্ছন্নতায় ঢুকে পড়ে রাগ, বিদ্বেষ, গ্লানি? মিলিত ভাবে এগুলোই চিনিয়ে দেয় অসহায়তা।

'আই অ্যাম সরি, রুচি।'

সোমেন একটু অপেক্ষা করল এবং সাড়া না পেয়ে ধরে নিল রুচি বিরূপ নয়; হয়তো নিজেও অনুতপ্ত। এইভাবে এগোলো সে। ঠোঁট ছোঁয়াল রুচির গলায় ও বুকে; মাংস ও পারফিউমের গন্ধে; এবং বাধা না পেয়ে, সোমেন—যেন প্রথম প্রাপ্ত সুযোগে এই প্রথম চুম্বন করছে স্ত্রীকে—কামড়ানোর ধরনে শুষতে লাগল ওর ঠোঁট দুটো। নিজের উত্তাপের অনেকটা এরই মধ্যে রুচির ভিতর সঞ্চারিত করতে পেরেছে ভেবে আরও এগিয়ে গেল সে, খুলে ফেলল ওর ব্লাউজের হুকগুলো যাতে অনর্গলতার স্পর্শে রুচিও উঠে আসে দ্রুত। এমন অনেকবারই হয়েছে, শেষ পর্যন্ত শরীরই হয়ে উঠেছে ক্ষমা, যদিও, সোমেন মনে করতে পারে না আর কখনও গায়ে হাত তুলেছে কি না। তবু, রুচির ভাবা উচিত, একটি মাত্র ঘটনাই সম্পূর্ণতা আনে না বছরের পর বছরের সম্পর্কে। রুচির ভাবা উচিত, তার স্বামী ভগবান নয়—কিন্তু স্বামীই, অবশ্য যদি কথাটার মানে থাকে কোনও। এই পর্যন্ত পৌঁছে সোমেন তার পৌরুষ চিনল, স্পষ্ট ও অস্পষ্ট অনেক মুখের ভিতর দিয়ে। কিন্তু, রুচির শরীরে প্রবেশের আগেই, প্রচণ্ড হতাশার মধ্যে, শিকড়হীন উপড়ে আসার মতো, সে অনুভব করল, সাঁতারে অক্ষম তার শরীর স্রোতে নিঃশেষিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। আক্ষেপ ও গ্লানিতে ঠোঁটে দাঁত বসে গেল সোমেনের। আগাগোড়া প্রক্রিয়াটির মধ্যে দিয়ে সে কিছু বোঝাবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু, এখন, সোমেনের মনে হল, শরীর নয়, সম্পর্কও নয়, শুধু অন্ধকারই পারে তাকে আশ্রয় দিতে।

রুচি উঠে বসল। ঠিক বোঝা গেল না সে সোমেনের দিকে তাকাল, না নিজেরই দিকে। জানলা দিয়ে অস্পষ্ট যেটুকু আলো আসছিল তাতে স্টিল লাইফে বর্ণিত কাটা আপেলের দুটি স্তব্ধ টুকরোর মতো যুক্ত ও বিচ্ছিন্ন দেখাল তাদের। অন্ধকার গলায় রুচি বলল, 'পশু—', বলল। 'পশুদেরও মন থাকে—ডিগনিটি থাকে—'

কথাগুলো এবং সেই একই কণ্ঠস্বর পুরোপুরি উদ্ধার করতে পেরে ঠোঁটে দাঁত ঘষল সোমেন। বাইরে বৃষ্টির শব্দ এতদূর পৌঁছায় না। কিন্তু জানলাটা লেগেই থাকে চোখে। নিজেকে মনে হল আবদ্ধ। গাঢ় নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টায় নাকে উঠে এলো অ্যালকোহলের গন্ধ—খানিক আগে যা পেয়েছিল, গুড় গুড় করে উঠল তলপেট। কিছু একটা নেমে যাচ্ছে আরও নীচে। অনুভূতিটা অস্বস্তিকর। তাহলে কি বয়স? সোমেন ভাবল, তাহলে কি পঞ্চাশ পেরিয়েই পৌরুষ ছেড়ে যাচ্ছে তাকে? পশু বলতে কি সারা জীবন ধরে টান দিল রুচি?

সোমেন আর একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল। তার আগেই জয়ন্ত এলো।

'কী ব্যাপার, স্যার! হঠাৎ?'

'হঠাৎ নয়।' সোমেন হাসতে পারল না, নার্ভাস ভঙ্গিতে ঠোঁট কাঁপল শুধু, 'বিকেলে আর একটা মিটিং—ইন ফ্যাক্ট, আই ট্রায়েড টু কনট্যাক্ট ইউ। কলকাতার টেলিফোন তো। ইট কেপ্‌ট্ অন রিংগিং—'

'নো প্রব্লেম।' জয়ন্ত নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল। জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বর্ষা এবার আগেই আসবে মনে হচ্ছে। কফি বলি?'

সোমেন সিগারেটটা ধরিয়ে নিল এবার। প্যাকেটটা এগিয়ে দিতে গিয়ে মনে পড়ল জয়ন্ত খায় না।

'প্রোডাকসনের খবর কি, চৌধুরী? সাপ্লাই পজিসন ভালো নয়—'

'কেন? লাস্ট মান্থ-এ যা বলেছিলেন, সে-অনুযায়ী তো ঠিকই চলছে?'

'দ্যাট্‌স মিনিমাম। এক্সট্রা ডিম্যান্ডের কী হবে?'

জয়ন্ত সোজাসুজি তাকাল, প্রশ্নটার ঠিকঠাক অর্থ কী হতে পারে চেষ্টা করল বুঝতে। তারপর বলল, 'বী প্রিপারেশন কম হচ্ছে। পুরো স্টক এখনও এসে পৌঁছয়নি। তা ছাড়া আর সবই তো—'

'আমি বী প্রিপারেশনের কথা বলিনি।' বিক্ষিপ্ত লাগছিল; প্রাণপণে নিজেকে আলোচনার মধ্যে ফেরাবার চেষ্টা করল সোমেন। টেবিলের ওপর সামান্য ঝুঁকে এসে বলল, 'শুনুন, একটা ডেভলপমেন্ট হয়েছে। নর্থ ইন্ডিয়া মার্কেটে টনিক সাপ্লাইয়ে ব্লু-বেল মনোপলি করে নিয়েছিল। ওদের ফরিদাবাদ ফ্যাক্টরিতে লক-আউট হয়েছে—শর্মা কাল সকালে ট্রাঙ্ককল করেছিল লক্ষ্ণৌ থেকে। দিস ইজ অ্যান অপারচুনিটি উই মাস্ট নট মিস —'

ট্রে-তে দু কাপ কফি সাজিয়ে বেয়ারা ঢুকল। লোকটা চলে যাবার আগেই কফির কাপ তুলে ঠোঁটে ছোঁয়াল সোমেন; মনে হল দরকার ছিল।

ড্রয়ার থেকে চাবি বের করে স্টিলের আলমারি খোলার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছে জয়ন্ত। কিছুটা গম্ভীর এবং বেশ চিন্তান্বিত, একটা ফাইল টেনে আনল ভিতর থেকে, আবার চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'লক্ষ্ণৌ ডিপোতে প্রচুর মাল গেছে।'

'প্রচুর মানে কত?'

ট্যাগ খুলে নির্দিষ্ট একটি পাতায় চোখ বোলাল জয়ন্ত। হোল্ডার থেকে পেনসিল তুলে পর পর গুনে গেল কিছু। তারপর বলল, 'একশো চব্বিশ ক্রেট। আরও ছাব্বিশ ক্রেট কাল যাবে।'

'হাঃ, নস্যি!' চেয়ারের পিছনে মাথাটা ঠেলে ঊর্ধ্বমুখে ধোঁয়া ছাড়ল সোমেন, 'এ ড্রপ ইন দ্য সি। ব্লু-বেল-এর মার্কেট শেয়ার কত জানেন? ফরটি-টু পারসেন্ট। আমাদের মোটে টেন—'

জয়ন্ত ফাইল বন্ধ করে দিল।

'ইমপসিবল। এ ডিম্যান্ড আমরা মিট করতে পারব না।'

'লিসন!' টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে সোমেন বলল, 'পুরো ডিম্যান্ড মিট করা যাবে না তা আমিও জানি। কিন্তু, কিছুটা? যা আছে তার ডাবল সাপ্লাই দিতে পারি আমরা?'

জয়ন্ত তাকিয়েই থাকল। জবাব দিল না।

সোমেন হাসল। এতক্ষণ মনে হল ঠিকই হাসতে পারছে সে। হয়তো পারবে।

'কফি খান। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে—'

কফিতে চুমুক দিতে না দিতেই টেলেফোন এলো। জয়ন্ত যে হঠাৎই ঢুকে পড়েছে একটা টেনসনের মধ্যে তা বোঝা যায় ওর গলার স্বরে। তিনটি মাত্র শব্দ উচ্চারিত হতে শুনল সোমেন—নো, নো এবং অ্যাজ ইউ লাইক। পর মুহূর্তেই নামিয়ে রাখল রিসিভারটা। চিবুকে পেনসিল ঘষতে ঘষতে বলল, 'স্টক পজিসন না দেখে কিছু বলতে পারব না। বটল সাপ্লাইও ডিলেড হচ্ছে—'

'ঠিক আছে। বটল সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে আমি আগরওয়ালার সঙ্গে কথা বলব। তেমন তেমন দরকারে হিন্দুস্থানের সঙ্গেও কথা বলা যায়—ওরা তো চাইছেই। আপনিও দেখুন। সামনে বর্ষা—এখন ডিম্যান্ড আরও বাড়বে। আমি শর্মাকে বলেছি নতুন সাপ্লাই গেলে মার্কেট থেকে ব্লু-বেলের একজিসটিং স্টক কিনে নিতে—যাতে ডিম্যান্ডটা অ্যাকিউট হয়—'

মন দিয়ে শুনল জয়ন্ত। সোমেন দেখল প্রচ্ছন্ন হাসি ছায়া ফেলেছে ওর চোখে।

'মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি তো বলে দিলেন প্রোডাকসন বাড়াতে। এদিকের খবর রাখেন কিছু?'

'কী!'

শূন্য কফির কাপগুলো ফেরত নিতে এসেছে সেই একই লোক। ট্রে হাতে লোকটি চলে যাবার পর উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত। এগিয়ে গিয়ে ঠেসে বন্ধ করে এলো দরজাটা। চোখমুখ সিরিয়াস। ফিরে এসে বসতে বসতে বলল, 'কাল থেকে গো স্লো সুরু করেছে—'

'কেন!'

'নতুন ডিম্যান্ড। কাজকর্ম আর করানো যাবে বলে মনে হয় না।'

বৃষ্টিটা ধরে এসেছে। সোমেন আবার সেই 'নো স্মোকিং' কথাগুলো দেখতে পেল—যদিও আবছাভাবে, 'জি' অক্ষরটা ঢাকা পড়েছে পোস্টারে। জয়ন্তর উদ্বেগ এবং ওই পোস্টারের মধ্যে হয়তো সম্পর্ক আছে কোনও। মাস দু-তিন আগেও এরকম অবস্থায় অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে কোম্পানির, ঠিক সময়ে ঠিক সাপ্লাইটা পৌঁছুতে না পারায় ক্যানসেল হয়ে যায় অনেক অর্ডার। বিশেষত সাউথে। সেনসিটিভ মার্কেট, ওখানে কম্পিটিশনও বেশি। সেলস গ্রাফ দেখলে যে-কেউই বুঝতে পারবে কীভাবে ক্রমশ বাজার হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে ওদিকে। এরপর গো স্লো থেকে ব্যাপারটা যদি অন্যদিকে গড়ায়—আর একটা ধাক্কা হয়ে ওঠে, তাহলে ঝামেলা বাড়বে। চাকরি রাখাও দায় হয়ে উঠতে পারে। সম্প্রতি বোর্ড মিটিংয়ে পারফরমেন্স অ্যানালাইজ করতে গিয়ে ম্যানেজেরিয়াল স্টাফের কর্মদক্ষতার ওপর জোর দিয়ে অনেক কথা বলেছেন চেয়ারম্যান; এমনও হতে পারে বিক্রি কমে যাওয়ার সঙ্গে প্রোডাকশন আর সাপ্লাইয়ের যে-প্রশ্নগুলো জড়িত সেগুলো বুঝতে চাইছে না ম্যানেজমেন্ট। দোষটা পুরোপুরি চাপাতে চায় সেলস টিমের ঘাড়ে। ইতিমধ্যেই—সোমেন ব্যাপারটা পছন্দ করেনি—মাদ্রাজের ম্যানেজার কৃষ্ণমাচারীকে ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে পরোক্ষে। দু বছর আগে রিচার্ডসন থেকে সোমেনই ভাগিয়ে এনেছিল লোকটাকে। অবস্থার চাপে কৃষ্ণকে চলে যেতে হলে সে নিজেই পড়বে চাপে, কোম্পানিও সাফার করবে। ম্যানেজমেন্ট অত খতিয়ে দেখে না, ফিগারস দেখেই পৌঁছে যায় ধারণায়।

সোমেন ডুবে এল নিজের মধ্যে। খানিকক্ষণের নিঃশ্বাস অজ্ঞাতেই চাপ হয়ে বসেছিল

বুকে—সেটা ছাড়তে ছাড়তে ফিরে এল কাল রাতের ঘটনায় এবং ভাবল, সম্ভবত টেনসনই ক্ষতি করছে তার। একটু আগে সে পৌরুষ ছেড়ে যাবার কথা ভেবেছিল। ডিগনিটির অভাব বলতে কী বুঝিয়েছিল রুচি এখনও তা বোধগম্য হয়নি। গভীরে গিয়ে ভাবলে একটা দূরত্ব এসে যায় মনে—এটা কি তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, না কি বলার জন্যে তৈরিই ছিল রুচি, উপলক্ষই সাহস জুগিয়েছে তাকে? ভাবতে ভাবতে অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে এল আবার। তলপেটে এবং দুই উরুর মাঝখানে সন্ধিতে কী একটা ঘটে যাচ্ছে থেকে থেকে—সোমেন বুঝল না, অস্বস্তি এড়ানোর জন্যে হাঁটুদুটো যতদূর সম্ভব জড়ো করে বসল। সম্ভবত আত্মবিশ্বাসে টান পড়ছে তার। ড্রিঙ্ক বেশি করার জন্য কি? কিন্তু, এসবের চেয়ে বড় ভাবনা হয়তো এখনই আসছে। পঞ্চাশ পেরিয়ে ইদানীং চাকরির ভাবনাও মাঝে মাঝে হাতুড়ি ঠুকে যায় মাথায়। রুচি কি শরীরের কথাই ভেবেছিল?

ক্ষণিক অন্যমনস্কতা থেকে নিজেকে টেনে তুলল সোমেন। জয়ন্তও যে খুব মনস্ক ওর মুখ দেখে তা মনে হয় না। এখানে আসবার পর অন্যরকম দেখেছিল, বেশ চনমনে আর স্বতঃস্ফূর্ত, যেরকম থাকে; প্রোডাকশন বাড়ানোর কথা তুলে হয়তো সোমেনই চিন্তিত করে তুলল ওকে!

যেখানে থেমেছিল সেখান থেকেই আবার শুরু করল সোমেন।

'কী হয়েছে বলবেন তো?'

'কী আর হবে! ইউজুয়াল প্রিটেক্সট।' জয়ন্ত ভার নামাতে চাইল। সোমেন আবার সিগারেটের প্যাকেট টানছে দেখে বলল, 'দিন, একটা সিগারেট খাই—'

জয়ন্তর সিগারেটটা ধরিয়ে দিল সোমেন। নিজেও ধরাল।

'রতন বেহারা আমাদের একজন লোডার ছিল। পার্মানেন্ট!' জয়ন্ত বলল, 'শনিবার দেশে গিয়েছিল। সোমবার ফেরার সময় খড়্গপুর মার্কেটের সামনে লরি চাপা পড়ে—মারা গেছে হাসপাতালে। ফ্যামিলি—চারটে ছেলেমেয়ে। ব্যাপারটা স্যাড। কিন্তু, এরা ডিম্যান্ড করছে ডেথটাকে অন জব অ্যাক্সিডেন্ট হিসেবে ট্রিট করে পুরো কমপেনসেশন দিতে হবে।'

সোমেন চোখ ছোট করল।

'তা কী করে হয়!'

'করলেই হয়। যুক্তির ধার ধারে না কি!' সিগারেটে অনভ্যস্ত, এক সঙ্গে অনেকটা ধোঁয়া বের করে ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে দিল জয়ন্ত। আধাআধি পোড়া সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে হাসল শিথিল ভাবে, 'ফ্যাক্টরির ডাক্তার সেরকম রিপোর্ট দিলেই হয়। টাকা তো দেবে কোম্পানি!'

'অ্যাবসার্ড। এরপর তো যে-কোনও ন্যাচারাল ডেথ-এ অ্যাক্সিডেন্ট কমপেনসেশন চাইবে।'

'হ্যাঁ। পার্সোনেল ম্যানেজারও তাই বলে দিয়েছেন। তারপর থেকেই গো স্লো।'

সোমেন চুপ করে থাকল। চোরা একটা ঢেঁকুর উঠে আসছিল গলায়, নড়ে বসে চাপা দিল সেটা।

জয়ন্ত বলল, 'আপনি আসার আগে এইসব দেখতেই গিয়েছিলাম। প্যাকাররা হাত গুটিয়ে বসে আছে। এদিকে চারটের মধ্যে পাটনার কনসাইনমেন্ট ছাড়ার কথা। তিনটে ট্রাক লোড করতে হবে—'

সোমেন শুনে যাচ্ছিল। মনে হয় কাল শর্মাকে যা যা বলেছিল ট্রাঙ্ককলে, তার সবই হয়তো প্রত্যাহার করে নিতে হবে। নতুন কোনও স্ট্র্যাটেজি ভাবতে পারল না।

জয়ন্ত একটু থামল এবং বলল, 'হাউ ডু ইউ ম্যানেজ, মিস্টার ব্যানার্জি?'

প্রশ্নটা উত্তর পাবার জন্যে নয়। স্বগতোক্তির মতো শোনাল কানে। তাছাড়া, উত্তর যা হতে পারে তা তো আগেই ভেবে নিয়েছে সোমেন। জয়ন্তকে তা বলার অর্থ হাল ছেড়ে দেওয়া। তাছাড়া এত তাড়াতাড়ি একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো কি ঠিক? আজ আছে, কিন্তু কাল বা দুদিন পরে গো স্লো তুলেও নিতে পারে। এরকম হয়। অফিসিয়ালি কিছু না জানা পর্যন্ত, শুধু জয়ন্তর কথায় নির্ভর করে এই মুহূর্তে তার পক্ষে কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না।

'দেখুন না কী হয়।'

নিজেকে এড়িয়ে গেল সোমেন। বিকেলের মিটিংয়ের কথাবার্তা এখানে সেরে নিলেও আসবার আগে তার সমস্যাটা ছিল অন্য। মনে পড়ায় ঘড়ি দেখল। সাড়ে এগারোটা। তারপর ব্যস্ততা দেখিয়ে বলল, 'অফিসের লাইনটা পাওয়া যাবে? দেখুন তো?'

রিসিভার তুলে অপারেটরকে সেল্‌স অফিসের লাইন দিতে বলল জয়ন্ত।

'অফিসে যাবেন?'

সোমেন ঘাড় নাড়ল।

'লাঞ্চ খেয়ে যান এখানে—', জয়ন্ত বলল, 'আর তো হাফ অ্যান আওয়ার?'

'নো। থ্যাঙ্ক ইউ। আজ থাক। বললাম না—', কী বলেছিল ভেবে নিয়ে সোমেন বলল, 'আর একটা মিটিং আছে। আই মাস্ট রিটার্ন বিফোর লাঞ্চ—'

কথাটা শেষ করতে না করতেই বেজে উঠল টেলিফোন। জয়ন্ত 'হোল্ড অন' বলতে সোমেন বুঝল তার অফিস, টেবিলের পাশের দিকে উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল জয়ন্তর হাত থেকে, অপারেটরকে বলল তার সেক্রেটারিকে লাইন দিতে। দু'এক মুহূর্তের মধ্যেই অপারেটর বলল মিসেস চোখানি সিটে নেই, তবে সোমেন ধরে থাকুক, নিশ্চয়ই আছে কোথাও আশপাশে, সে খুঁজে দেখছে। সোমেন, সুতরাং, কানে রিসিভার লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। দেখল, জয়ন্ত ফাইলটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছে আবার। তারপর জানলা দিয়ে তাকাল বাইরে। জায়গা পরিবর্তনের কারণে এখন দৃশ্যও পাল্টে গেছে অনেকটা। এখান থেকে অনেক দূর অবধি দেখা যায় ফ্যাক্টরির ভিতরেই রাস্তা—সারি সারি, কিছু বেঁটে মাপের, দেবদারু, একটা ট্রাকের পিছন দিক, একটা ফাঁকা থ্রি-হুইলার চলে গেল ডানদিকে। ভারী একটা ড্রাম গড়াতে গড়াতে নিয়ে আসছে দুজন। এইসব দেখতে দেখতে ট্রাউজারের নীচে একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব টের পেল সে এবং নীচে তাকাল; একটা বিরক্তি এসে গেল মাথায়—সোমেন ঠিকঠাক বুঝতে পারল না, হঠাৎ এবং অকারণ এসব অনুভূতি নিয়ে কেনই বা এত বিব্রত হচ্ছে সে। সম্ভবত কাল রাতের ঘটনাই অবচেতনায় কুরে খাচ্ছে তাকে। অপমানজনিত বিষাদে শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয় কখনও, সেরকমও হতে পারে। কিন্তু, সত্যি সত্যিই, কেন এত গুরুত্ব দিচ্ছে কাল রাতের ব্যর্থতাটাকে! এসব ভাবতে ভাবতে চব্বিশ বছরে কতগুলি রাত একসঙ্গে কাটিয়েছে সে এবং রুচি এবং কীভাবে, তার একটা আঙ্কিক হিসেবে পৌঁছুবার চেষ্টা করল সোমেন। অঙ্কটা জটিল, কারণ, ভেবে দেখল, নির্দিষ্ট কোনও হিসেবে পৌঁছুবার আগে তাকে পেরোতে হবে অনেকগুলো যোগ-বিয়োগের ধাপ—এর মধ্যে ধরতে হবে নিষিদ্ধ তারিখ এবং ছুটিছাটার দিনগুলো যখন সে আর রুচি

হয়তো একসঙ্গে ছিল না, অফিসের কাজে প্রায় ট্যুরে যেতে হয়েছে তাকে, বার তিনেক বিদেশে গিয়েছিল, তাছাড়া রুচিও যে সব সময় তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল তা নয়, আগে কথায়-কথায় বাপের বাড়ি যেত, ইত্যাদি। আরও সঠিক তথ্যে পৌঁছুতে হলে এই হিসেবের মধ্যে লিপ-ইয়ার-টিয়ারও ধরা দরকার। মুখে মুখে এই অঙ্কের সমাধান হয় না। ভাবতে গিয়ে, অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম, হাসির মতো কিছু একটা উঠে এল তার মাথায়, ঠোঁটের কোনাও কেঁপে গেল অল্প—সম্ভবত তার আগে আর কেউ এরকম রিসার্চের কথা ভাবেননি! চিন্তাটা মন্দ নয়, বিশেষত এই গো স্লো'র ব্যাপারটা যদি পাকাপাকি কোনও ঝামেলায় গিয়ে পৌঁছয়, তাহলে, অকাজ করার মতো প্রচুর অবসর এসে যাবে হাতে, সেই সময় আর কিছু না করে পকেট ক্যালকুলেটর নিয়ে বসতে পারে সে। কিন্তু, সে কি ঠিকঠাক ভাবছে?

নতুন করে সন্দেহে ফিরে আসার মুহূর্তে অপারেটর ডাকল। ওদিকে মিসেস চোখানির গলা। সে যে ফ্যাক্টরিতে এসেছে তা জানিয়ে সোমেন জিজ্ঞেস করল, কোনও খরব-টবর আছে কি না। যা ভেবেছিল, তা-ই। তিনটি ফোন এসেছিল সকাল থেকে, সেক্রেটারি বলল, প্রথমটা লক্ষ্ণৌ থেকে শর্মার—না, কোনও মেসেজ রাখেনি, তিনটে নাগাদ কল করবে আবার। আর দুটো এসেছিল ধ্রুব দাস এবং দীপঙ্কর রায়চৌধুরীর কাছ থেকে; নো, দেয়ার ওয়াজ নো মেসেজ! তাহলে দীপঙ্করও ফোন করেছিল? খটকাটা বেশি দূর টানল না সোমেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই অফিসে আসছে জানিয়ে নামিয়ে রাখল রিসিভার।

এখন তাকে ফেরার কথা ভাবতে হবে। সোমেন চেয়ারটার দিকে এগিয়ে গেল, কিন্তু বসল না।

'চৌধুরী, তাহলে—'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার।'

সোমেনের সঙ্গে সঙ্গে জয়ন্তও বেরিয়ে এলো। করিডোর দিয়ে হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। পরিচিত, অ্যালকোহলের গন্ধ। একটা গাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছে গেট দিয়ে। ওয়ার্কস ম্যানেজার দত্ত। নিশ্চয়ই দেখতে পায়নি তাকে। ল্যাবরেটরির সামনে দিয়ে নিজের গাড়ির দিকে যেতে যেতে সোমেন বলল, 'রিকোয়ারমেন্ট স্টেটমেন্টটা আপনাকে পাঠিয়ে দিচ্ছি কুরিয়ার দিয়ে। স্টাডি করে কী ঠিক করলেন না করলেন জানাবেন আমাকে—'

জয়ন্ত জবাব দিল না।

'আমার মনে হয় এই গো স্লো'র ব্যাপারটা টিকবে না।'

'তাহলে তো ভালোই।' ওরা গাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেল। জয়ন্ত বলল, 'একটা অলটারনেটিভও ভাবতে পারেন—'

'কী?'

'লক্ষ্ণৌ, দিল্লি প্রায়রিটি করে যা আছে পাঠিয়ে দিই এখন। অন্য জায়গায় না হয়—'

'না না। ওসব ভাববেন না এখন। আপনি প্রোডাকসন বাড়ান। ও-কে?'

মেঘলা ভাব না কাটলেও হালকা আলো ছড়িয়ে আছে আকাশে। হাওয়া যেমন ছিল তেমনি, তাতে প্রশান্তি নেই তেমন। বৃষ্টি হয়েও গুমোট কাটেনি। হয়তো আবার হবে।

যেতে যেতে হঠাৎ উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ল সোমেন। জয়ন্তর সান্নিধ্যে এতক্ষণ যেমন-তেমন করে কেটে যাচ্ছিল সময়, চিন্তারও সুযোগ পাওয়া যাচ্ছিল কিছুটা। এখন ভালো না-লাগা থেকে পরিপূর্ণ ক্লান্তির দিকে এগোতে লাগল সে। এক ধরনের

নিরপেক্ষতায় ছেয়ে এলো সর্বাঙ্গ। ভাবনা বলতে সবই একপেশে; বস্তুত সে আরও একটা ব্যাপার ভেবে অবাক হল—এখন সে কিছুই ভাবে না যা ঘটে না; কিংবা এমন কোনও ঘটনার সংস্পর্শে আসে না, যে-সম্পর্কে আগে কখনও ভাবেনি। যেমন এই ফোনটোনগুলো। সকালেই কি সে ভাবেনি যে ধ্রুব ফোন করবে, দীপঙ্করও করতে পারে! এমনও হতে পারত যে অনুমান ছারখার করে দিল বাস্তব, এমন কেউ—যাকে আশা করেনি, কল্পনাতেও আনেনি—হঠাৎ ফোন করল তাকে, খোঁজ-খবর নিল কিংবা এসে পড়ল চমকে দিয়ে! এই ধরনের ঘটনা বহুদিন হল ঘটছে না তার জীবনে। বহুদিন হল একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে সে, বহুদিন কাজ করেছে, বহুদিন কাজ ছাড়া অন্য কিছু করেনি, বহুদিন বাড়ি থেকে বেরুনো এবং বাড়ি ফেরার মধ্যে রাখেনি কোনও তারতম্য। এই মুহূর্তে পরিচিত কয়েকটি মুখ ভিন্ন যখন আর কোনও মুখই মনে পড়ে না, কোনও নামও না, ঠিকঠাক ভাবতে গেলে মনে হয় তার জন্মই হয়েছিল এদের সঙ্গে, অবিচ্ছেদ্য; তার মৃত্যুও হবে এদের সঙ্গে! আর, যদি ভাবা যায় এরা তার কেউই নয়, ইচ্ছে করলেই যে-কোনও সময়ে ছিন্ন করা যায় এদের সংস্রব, তাহলে আর কে থাকে? রুচি? শ্রীময়ী? কৌশিক? ভাবতে গিয়ে দ্বিধায় জড়িয়ে গেল সোমেন। সাত-আট বছরে অসংখ্যবার রুচির সঙ্গে শোয়াশুয়ি করলেও মনে পড়ে না টাকাকড়ি ও প্রয়োজন ছাড়া শুধুই নিজেকে এবং রুচিকে নিয়ে মন বিনিময় করেছে কি না। রুচির সঙ্গে হালকা যে ক'টি কথাবার্তা তা হয় ওই দলে পড়ে, হয়তো স্ত্রী হিসেবে চিহ্নিত হয়ে না থাকলে ওই কথাগুলিই একটু অদলবদল করে সে বিনিময় করতে পারত মীনা কিংবা চন্দ্রিমা কিংবা আভা কিংবা রমার সঙ্গে। কিংবা এরকম—তত ঘনিষ্ঠ নয় হয়তো—আরও কারও কারও সঙ্গে। রুচিকে নিয়ে ক্লাবে গেছে কিংবা পার্টিতে—যেমন যায়, মিসেস সোমেন ব্যানার্জি বলতে যে-আদল ফুটে ওঠে তা রুচিরই; গেছে রঙিন টিভি কিনতে। কিছুদিন হল একটা নতুন ফ্রিজ কিনেছে তারা। স্ট্যান্ডার্ড সাইজের বদলে শেষ পর্যন্ত যে জায়ান্ট সাইজ কেনাই সাব্যস্ত করল সোমেন তাও রুচিরই পরামর্শে—পরে অবশ্য সোমেন নিজেই স্বীকার করে জায়ান্ট সাইজে বরফের ট্রে-টা বড়; হামেশাই আড্ডা বসে বাড়িতে, এখন থেকে আর বরফের টানাটানি হবে না। এইসব, সব কিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে দেখা যায় রুচিকে। আলাদা করে নয়। আর শ্রীময়ী? শীমু? হ্যাঁ, শীমু তাদেরই মেয়ে, নিশ্চিতভাবে তারই মেয়ে—বছরে একবার কি দুবার কলেজ থেকে ফর্ম নিয়ে এলে ফাদার/গার্জেন ছাপা জায়গার ওপরে টানা অক্ষরে নিজের নাম সই করে সোমেন। ইচ্ছে ইংরিজি নিয়ে এম-এ পড়বে মেয়ে। কিছুদিন আগে, ঠিক কতদিন বা কী প্রসঙ্গে মনে নেই, সোমেন বলেছিল সে ডক্টর ব্যানার্জিকে চেনে, ইউনিভার্সিটিতে ইংরিজিতে এখন নাম্বার ওয়ান। তাছাড়া, কিছুদিন আগে, বাড়তি হাত খরচের জন্যে শীমু তার মানিব্যাগ থেকে না বলে টাকা বের করে নিলে রুচি যখন মেয়েকে তিরস্কার করছিল তখন বাড়াবাড়ি হচ্ছে ভেবে সোমেনই নিরস্ত করে রুচিকে—বাইরের কেউ নয়, শীমু তাদেরই মেয়ে, সুতরাং মাঝে মধ্যে এটুকু লিবার্টি নিতেই পারে। ইমপর্ট্যান্ট ব্যাপার হল হ্যাবিট ফর্ম করছে কি না দেখা। রুচির কেন মনে পড়ে না সে নিজেও করে এরকম, ইত্যাদি। কৌশিকের বেলাতেও তাই। রুচির আপত্তি সত্ত্বেও সে নিজেই কৌশিককে নরেন্দ্রপুরে দিয়েছিল, হস্টেলে, ছেলের বেসটা ঠিক করার জন্যে, অনেক ভেবেচিন্তে। কী আর এমন দূরে জায়গাটা! রবিবার-রবিবার গাড়িতে করে গিয়ে দেখে আসে তারা। কৌশিক খারাপ আছে এ-পর্যন্ত মনে হয়নি তা। রুচি না পারলে সে যায়,

সে না পারলে রুচি যায়; শীমুও কারও না কারও সঙ্গী হয় প্রায়ই। কখনও তিনজনেই একসঙ্গে। লম্বা ছুটিতে কৌশিক বাড়ি এলে অন্তত দুদিন ডিনারে বেরোয় তারা। গত বছর প্যাকেজ ট্যুরে নেপাল আর পোখরা গিয়েছিল। ফ্র্যাঙ্কলি, যাতে পক্ষপাত না ঘটে সেজন্যে, কৌশিক না থাকলে, সেরকম অকেসন ছাড়া শীমুকে নিয়েও বেরোয় না তারা। এরকম আরও ভাবা যেতে পারে। এইভাবেই ভেবে এসেছে এতকাল। কিন্তু, আজ হঠাৎ সবাইকে জড়িয়ে ভাবতে গিয়ে একটু বা দিশেহারা বোধ করল সোমেন। যাদের নিয়ে ভাবল তাদের মুখগুলি মনে পড়ল, এবং চেহারা—ফ্যামিলি ফোটোগ্রাফের দিকে তাকিয়ে থাকার মতো, আর কিছু নয়। ভিতরে খুঁজলে মনে হয় কোথায় যেন কী নেই! মনে হল যেমন হয়েছিল, তেমনি, রুচির ধরনে শীমু বা কৌশিক কোনও একটা কথা বলে ফেলবে তাকে—আচমকা; সোমেন ঠিক জানে না কেন, বুঝতেও পারবে না এবং সেইজন্যেই, নিজেকে অসহায় লাগবে আরও।

নিজের অফিসে পৌঁছে পরিষ্কার ক্লান্তি বোধ করল সোমেন। খুব বেশি অবসাদ এলে যেমন হয়, রক্ত প্রতারণা করছিল তার সঙ্গে। একটা ঝিমুনির ভাব ঠেলে আসছে থেকে-থেকে। এতক্ষণের সমস্ত ভাবনা ও অনুভূতি—অসহায়তার, বিষাদের, অচরিতার্থতার এবং, শেষ পর্যন্ত, ভয়েরও—একটিই পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেল তাকে। দারুণ অবসাদজনিত ক্লান্তিটা চিনতে ভুল হয় না কোনও। যদিও জানে এটা ক্লান্ত বোধ করার সময় নয়, তার কাজ আছে এবং সকালে জয়ন্তর সঙ্গে কথাবার্তা কাজ সম্পর্কিত চিন্তাটা বাড়িয়ে দিয়েছে আরও, তবু, ঠিক কোনখানে শুরু করলে কাজের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারবে পুরোপুরি, বুঝতে পারল না। চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। একা বেশ-ঠাণ্ডা ঘরের মধ্যে কফিতে চুমুক দিতে দিতে ইলাসট্রেটেড উইকলির পাতা ওল্টাল; ক্যানিং স্ট্রিট থেকে ক্যালকাটা রিজিঅনের হোলসেলার ফোন করেছিল, কথা বলল তার সঙ্গে, সেক্রেটারিকে বলল সে অফিসেই আছে জানিয়ে লক্ষ্ণৌয়ে টেলেক্স পাঠাতে শর্মাকে, ইত্যাদি। ধ্রুব বা দীপঙ্কর কাউকে কল-ব্যাক করার কথা ভাবল না, যদিও টেবিলের ওপর পেপারওয়েট চাপা-দেওয়া মিসেস চোখানির মেমো-প্যাডের কাগজে সেরকমই লেখা ছিল। বাস্তবিক, কিছুক্ষণের মধ্যেই অদ্ভুত জ্বালায় কাগজটাকে মুঠোয় পাকিয়ে ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করল সে। লাঞ্চের সময় এগিয়ে আসায় হঠাৎই তার মনে হল রুচিকে ফোন করে বাড়িতে—শুধু এটুকু বলার জন্যে যে সে বাড়িতে আসবে, বাড়িতেই খাবে। কিন্তু, চিন্তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল ইচ্ছাটা। রাতের অন্ধকারে দ্বিখণ্ডিত সবকিছুর মধ্যে চাপা কিন্তু ভয়ঙ্কর হয়ে যেভাবে ঢুকে পড়েছিল 'ডিগনিটি' কথাটা, এখনও সেইভাবে ধাক্কা দিল মাথায়। সোমেন থিয়োরিতে বিশ্বাস করে; জানে সব দিনই কিছু এক রকমের হয় না। কিন্তু, এই কথাটা—ডিগনিটি—দুরকম মানে চেনায় না; ইনফ্রা রেড-এর মতো তাপ ছড়ায় কপালের ঠিক মাঝখানে। ভয় লাগে। আস্তে আস্তে নিচু হয়ে আসে মাথাটা।

সত্যি বলতে, ইতিমধ্যে আরও একটা ভাবনায় ছেয়ে যাচ্ছিল সে। এই সময়টাও কেটে যাবে। তারপর? নিশ্চয়ই কোথাও একটা যেতে হবে তাকে। বাড়ি ফেরা যায়। কিন্তু, মনে পড়ল, অভ্যাসে হলেও রুচি আজ কি কিছু জিজ্ঞেস করেনি তাকে। তার মানে কি এই যে রুচিও তাকে আশা করবে না! কী এসে যায় তাতে? নিজের মতো একা ও নিশ্চুপ একটি সন্ধ্যা কাটাতে পারে সে—চানটান করে, হুইস্কি নিয়ে—

সম্ভবত এটার সঙ্গেও জড়িয়ে আছে ডিগনিটির প্রশ্ন। সত্যিই কি এমন অবস্থায় পৌঁছেছে সে যেখানে যে-কোনও একটা অবলম্বন ছাড়া আত্মরক্ষা করতে পারে না? সোমেন ক্রমশ খুঁড়তে লাগল নিজেকে। আরও গভীরে—যেখানে নিশ্চিত ভাবে আত্মগোপন করতে পারে সে।

চারটে নাগাদ ফোন এল শর্মার। অভ্যাসের মজা আছে, অভিজ্ঞতারও; কথা বলতে বলতে সোমেন টের পেল একটু ভারী শোনালেও প্রয়োজন ছাড়া আর কিছু নির্গত হচ্ছে না তার গলা থেকে। শর্মাকে বলল সাপ্লাই সম্বন্ধে যা করার সে করছে, কিন্তু ইতিমধ্যে পজিসনটা অ্যাসেস করে কালকের মধ্যেই যেন ডিম্যান্ড অ্যাডভাইস পাঠায়। অসুবিধে হলেও যেখান থেকে হোক ব্যবস্থা করবে সোমেন। প্রয়োজনে সে নিজেও উড়ে যেতে পারে লক্ষ্ণৌয়ে।

শেষের পরামর্শটা হঠাৎই এসে গেল মাথায়। আজ বুধবার। সোমেন ভাবল, পরশু না হোক, তার পরের দিন চলে যেতে পারে সে। উপলক্ষটা আঁকড়ে থাকা দরকার। এ বিষয়ে দিল্লি, আহমেদাবাদকেও জানাতে হবে।

ভাবা মাত্র মনঃস্থির করে ফেলল সোমেন। সেক্রেটারিকে ডাকল ডিক্টেসন নেবার জন্যে।

ঠিক সেই সময়ে আবার বেজে উঠল টেলিফোন। সোমেন একটু ইতস্তত করল, তারপর ভাবল, সমস্ত ব্যাপারেই এমন দ্বিধা কেন। ভাবতে ভাবতেই রিসিভার তুলল, 'হ্যালো!'

'সোমেন?'

মহিলাব কণ্ঠস্বর। প্রথম শোনায় পরিচিত লাগল না।

'ইয়েস!'

'আমি আভা বলছি—'

নামটা শোনা মাত্র অপ্রতিভ বোধ করল সোমেন। যে-পরিচয়গুলো আজ ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যেতে চাইছে সে, প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও আভাও তার মধ্যে পড়ে। ঠিক সেজন্যে নয়। সোমেন মনে করতে পারল না এর আগে কোনও দিন তাকে ফোন করেছে কি না আভা, বিশেষত অফিসে। মাঝে মধ্যে যখনই করেছে তা রুচিকে বাড়িতে। অবশ্য রুচিকে হাতের কাছে না পেলে তার সঙ্গেও কথা বলেছে কখনও সখনও। এই কলটা অপ্রত্যাশিত। অল্প সন্দেহ দেখা দিল মনে। আভা তাকে ফোন করবে কেন!

তবু, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল সোমেন।

'আ-রে! কী খবর!'

'খবর হল—', আভা ইতস্তত করল, বলার কথাটা ঠিকঠাক গুছিয়ে নিতে না পারলে যেমন হয়। তারপর বলল, 'আজ তুমি কেমন ব্যস্ত?'

'কেন?'

'বলোই না?'

'অফিসে যখন—ব্যস্তই। এর পরে—'

সোমেন এখানেই থামল। আভা যে-ই হোক, তার কাছে পরিচয়টা দীপঙ্করের স্ত্রী হিসেবে। সুতরাং নিজেই সংযত হল সে।

আভা চুপ করে থাকল।

'কী? চুপ করে গেলে কেন!'

'কীভাবে বলব ভাবছি।' আভার গলা স্বাভাবিক নয়, বরং রহস্যময়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি একা? না আর কেউ আছে সঙ্গে?'

'থাকলেও যায় আসে না কিছু। তুমি চিনবে না।' মিসেস চোখানিকে দেখতে দেখতে সোমেন বলল, 'বলো?'

'আমার খুব বিপদ, সোমেন!'

'বিপদ!'

'বললাম তো।' দ্রুত, সামান্য নার্ভাস গলায় আভা বলল, 'ক্যান ইউ হেল্‌প্‌ মি?'

কথাগুলো এমনই আকস্মিক যে কিছুই বুঝতে না পেরে চুপ করে থাকল সোমেন।

'হ্যালো!'

'শুনছি—'

'জবাব দিচ্ছ না কেন!'

'বুঝতে পারছি না কিছু!'

'আই নিড ইওর হেল্‌প্‌।'

সোমেন এবারও চুপ করে থাকল। কী হয়েছে জানা নেই; তা ছাড়া এভাবে কেউ হঠাৎ কিছু বললে এমনিতেই খটকা লাগে মনে। কাল রাত্রে তো দেখা হয়েছিল, যেমন থাকে তেমনি—নিজের স্বভাবে স্বতঃস্ফূর্ত ছিল আভা। ওই শেষের দিকটা ছাড়া। মদ্যপানজনিত কারণে ওই সময়টা তারা কেউই পুরোপুরি প্রকৃতিস্থ ছিল না; আভাও না। ওটা নৈমিত্তিক ব্যাপার। সমস্যা কিছু থাকলে কালই জানা যেত। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে এমন কী ঘটল যে তাকে নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল আভা। তাকেই বা কেন! তেমন কিছু হলে দীপঙ্করই বলতে পারত। দীপঙ্কর অবশ্য ফোন করেছিল সকালে—ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেছে সোমেন। তবে, যার বিপদ সে এড়ানোর ধার ধারে না, নিজের প্রয়োজনেই ফিরে আসে আবার।

সাতপাঁচ ভেবে দ্বিধান্বিত গলায় সোমেন জিজ্ঞেস করল, 'বিপদ আবার কী হল!'

'ফোনে বলা যাবে না!'

কথাগুলো পুনরাবৃত্তি করে সোমেন বলল, 'দীপঙ্কর কোথায়?'

'জানি না।'

'হুম্‌!'

'তোমাকে কি বিরক্ত করছি খুব?'

'এটা বিরক্ত করার ব্যাপার নয়।' সোমেন দৃঢ় হল এবার, 'কী হয়েছে না হয়েছে পরিষ্কার করে বললেই তো পারো।'

'বললাম তো—', আভা ঢোঁক গিলল, 'ফোনে বলা যাবে না—'

'তাহলে কী করতে হবে বলো?'

সোমেন যে বিরক্ত, উষ্মা প্রকাশ পাচ্ছে গলায়, এটা বুঝতে না পারার কথা নয়। খানিক চুপ করে থেকে আভা বলল, 'একবার আসতে বলছি। পারবে?'

'কোথায়?'

'বাড়িতেই। ছুটির পর—পারবে? তোমার অফিস তো কাছেই—'

হয়তো সিরিয়াস কিছু; এমন কিছু—যা তাকেই বলা দরকার। কথা বলতে বলতেই

সম্ভাব্য কারণগুলি হাতড়ে যাচ্ছিল সোমেন, নিশ্চিত কোনও কারণে পৌঁছতে পারল না। শুধু ভাবল, যদি এটা ওদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার হয়—মনে হয় তা-ই, আভা যে ফোন করছে তাকে এবং অফিসে, এটা দীপঙ্কর নাও জানতে পারে—তাহলে সে এর মধ্যে থাকবে না। ওদের ব্যাপার ওরা বুঝবে। কিন্তু, কিছু না জেনে সরাসরি 'না' বলাটাও অভদ্রতা। আভার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তা না বলার পর্যায়ে পড়ে না।

'ঠিক কথা দিতে পারছি না।' সোমেন বলল, 'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, কখন শেষ হবে জানি না। যদি পারি যাবো।'

'চেষ্টা কোরো। আমি এক্সপেক্ট করব তোমাকে। রাখি?'

'হ্যাঁ।'

সোমেন নিজেই ছেড়ে দিল আগে। কিছু একটা মনে করার চেষ্টা করল, মাথার ভিতরের অবিরাম বিশৃঙ্খলা কিছুই ভাবতে দিল না তাকে। অবশ্য আভা বা তার কথাবার্তাকে কতটা দায়ী করা যাবে এর জন্যে! এ বিশৃঙ্খলা সকাল থেকেই ছিল তার মধ্যে, এখনও আছে, হয়তো থেকে যাবে। অনেকক্ষণ থেমে থাকার পর তলপেটের অস্বস্তিটা টের পাচ্ছে আবার, ঘেমে উঠছে নিম্নাঙ্গ—হয়তো টয়লেটে যাওয়া দরকার। সামনে স্টেনোগ্রাফির নোটবুক নিয়ে চুপচাপ বসে আছে মিসেস চোখানি। খানিকটা ডিক্টেসন দিয়ে থেমে গিয়েছিল সোমেন। এখনও শুরু করছে না দেখে আড়ে রিস্টওয়াচে চোখ বুলিয়ে বলল, 'ক্যান আই রিড আউট হোয়াট ইউ হ্যাভ সেড সো ফার?'

লজ্জিত ভাবে সোমেন বলল, 'প্লিজ!'

সূত্র পাবার পর বাকিটা শেষ করতে সময় লাগল না। দিল্লি ও আহমেদাবাদের চিঠি দুটো আজই যাবে বলতে গিয়েও বলল না। অফিস শেষ হতে সময় আছে এখনও, তাছাড়া এগুলো যে আর্জেন্ট আগেই তা বলেছিল। মিনিট পনেরোর বেশি লাগা উচিত নয়।

সোমেন টয়লেটে গেল। দেখল, প্রয়োজন যতটা ছিল সে-তুলনায় নির্গত হচ্ছে না কিছু। খানিক অপেক্ষা করেও যখন কাজ হল না এবং অস্বস্তিটা কমবেশি থেকেই গেল, তখন নতুন একটা সন্দেহ দেখা দিল মনে। তবে কি সে ডায়েবেটিক হয়ে পড়ছে? মাস পাঁচেক আগে ক্লিনিকাল টেস্টে সুগার এক শো পঞ্চাশ ধরা পড়ার পর সাবধান হতে বলেছিল ডাক্তার—ব্লাডসুগার আর কোলোস্টোরোল দুটোকেই বলা হয়েছিল বর্ডার-লাইন কেস। তখন থেকেই, ডাক্তারের নির্দেশে, কিছুটা ডায়েটিং-এর দিকে নজর দিয়েছিল সে। আলু, মিষ্টি, চিনি—এখনও পারতপক্ষে ছোঁয় না এগুলো; ডিম, মাখনও বাদ দিয়েছে খাদ্য থেকে। ওজন না কমলেও বাড়েনি। এসব করার পর মোটামুটি এক ধরনের ফিটনেস টের পাচ্ছিল শরীরে। এখন, টয়লেটের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে মনে হল ফিটনেস সম্পর্কে তার ধারণাটা আপেক্ষিকও হতে পারে। লম্বা ও বড়সড় চেহারার জন্যে কম বয়স থেকেই বয়স্ক লাগে। চৌকো মুখে টিকালো নাক ছাড়া আর কোথাও ঔজ্জ্বল্য নেই। ভারী চোয়ালে থসথস করছে মাংস, ক্লান্তির কারণে স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট লাগছে চোখদুটো, ঠোঁটের দু দিকের চামড়ার রঙের সঙ্গে গাল বা চিবুকের রঙের সামঞ্জস্য নেই কোনও, কপালে ভাঁজ না পড়লেও এক ধরনের ধূসরতা মিশে গেছে কপাল থেকেই চেপে বসানো ঘন চুলের সঙ্গে। জুলপিতে পাক ধরাটা নতুন কিছু নয়। সব মিলিয়ে, তাহলে, সে কি আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে বার্ধক্যের দিকে। নাকি চাপা কোনও রোগ, মানসিকতার কোনও বিভ্রম

শারীরিক ভাবে অনিচ্ছুক করে তুলছে তাকে। তা-ই যদি হবে, তাহলে, কাল অমন বিশ্রী ধরনের একটা মনোমালিন্যের পর, রুচিকে নিরুত্তাপ দেখেও কেন সে চেপে রাখতে পারেনি নিজের শরীরের উত্তাপ, কেন মনে হয়েছিল সেই মুহূর্তের প্রচণ্ডতা আগ্রহে ফিরিয়ে আনবে রুচিকে। শারীরিক আগ্রহ বলতে সে যা ভাবছে, আবেগ ছাড়া আর কিছু ছিল না তার মধ্যে—আবেগেরই প্রভাব পড়েছিল শরীরে; ভারসাম্যে টান পড়ায় শুরুর আগেই শেষ হয়ে যায় সে। এমন কি হতে পারে যে এটা সূচনা মাত্র, এর পর থেকে ক্রমশ নিঃশেষিত হতে হবে তাকে? যদি সেরকম কিছু হয় কীভাবে তাকে গ্রহণ করবে রুচি?

চোখে, কপালে জল দিয়ে অনেকটা সময় মুখে তোয়ালে চেপে রাখল সোমেন। দু এক মুহূর্তের জন্যে একটা ঠাট্টা ছুঁয়ে গেল তাকে। কেউ বুঝতে পারুক না-পারুক, নিশ্চয়ই তার চিন্তাগুলো হাস্যকর হয়ে উঠেছে ক্রমশ। একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, চব্বিশ বছর বিবাহিত এবং দুটি সন্তানের বাপ, কাজকর্মে দায়িত্ববান ও প্রতিষ্ঠিত, পঞ্চাশ পেরুনো বয়সে পৌঁছেও সকাল থেকে ক্রমাগত চিন্তা করে যাচ্ছে নিম্নাঙ্গের অসারতা নিয়ে—যা হয়তো কোনও সমস্যাই নয়। হাঃ হাঃ, ইজন্ট দ্যাট সিলি!

এইভাবে, টয়লেট থেকে বেরিয়ে, স্মার্ট হবার চেষ্টা করল সে। হাঁটাচলায় আনতে চাইল প্রত্যয়। করিডোরে ডিপার্টমেন্টের একটি জুনিয়র মেয়ের মুখোমুখি হয়ে এবং মেয়েটি নড্ করায় হাত বাড়িয়ে আদরের টোকা দিল তার মাথায়। এরকম করে সে প্রায়ই। চালে ভারিক্কি হলেও অমায়িক বলে সুনাম আছে তার অফিসে। তারপর ঘরে ফিরে চিঠি দুটো সই করে, পিওনের হাতে ডেসপ্যাচের জন্যে পাঠিয়ে ভাবল, ওই ঘটনার আগের ঘটনাটা না ঘটলে কিছুই হত না হয়তো; কিংবা, দুটো ঘটনার যে-কোনও একটা ঘটলেও ব্যাপারটা গড়াত না এতদূর কিংবা, দুটো ঘটনাই যথেষ্ট তফাতে, সময় ও বিরতি দিয়ে ঘটলে ফল উল্টো হতে পারত। সে-সুযোগ ছিল। কিংবা, ফল এক হলেও তারপর যা যা হল এবং এখনও হচ্ছে, সেগুলো হত না—ক্রমশ স্বাভাবিকতায় মিলিয়ে যেত সব। রুচি কী ভাবত না ভাবত তা তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়। কিন্তু, গ্লানিটা এড়াতে পারত সে; হয়তো রুচির কথাগুলোও শেষ পর্যন্ত মনে হত না পঞ্চাশ বছরের জীবনে আর কখনও এমন ভাবে অপমানিত হতে হয়নি তাকে।

অফিস থেকে বেরিয়ে ঠিক কোথায় যাবে ঠিক করতে পারল না সোমেন। আগেই ভেবেছিল এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবে না। আভা ফোন করে আসতে বললেও নিজের ভিতর থেকে উৎসাহ পাচ্ছিল না তেমন। বোধহয় ভুল হয়ে গেল চালে; আভাকে বলতে পারত জরুরি কাজ আছে, আজ কোনও ভাবেই তার পক্ষে দেখা করা সম্ভব নয়। অবশ্য যেতেই যে হবে তারও কোনও মানে নেই। তেমন কোনও কথা দেয়নি সে। তাহলে? ক্লাবে? না। সেখানেও দেখা হয়ে যেতে পারে কারও না কারও সঙ্গে। পরিচিত কেউ না থাকলে নিজেই বসতে হবে ড্রিঙ্ক নিয়ে। তারপর কেউ না কেউ এসে যোগ দিতে পারবে তার সঙ্গে। তা যদি না হয় তা হলে দূরে কাছের কোনও আড্ডা থেকে ডেকে নেবে তাকে। সোমেন জানে প্রত্যেকেরই আছে বলার কথা। আবহাওয়া দিয়ে শুরু করতে পারে তারা, চেনাশোনা কেউ হলে কোম্পানি অ্যাফেয়ারস দিয়ে। তাছাড়াও দেশ নিয়ে আলোচনা চলতে পারে, রাজনীতি নিয়ে, জ্যোতি বসু নিয়ে, মানেকা ও আকবর আহমেদের সম্পর্ক নিয়ে, পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম-এর ভবিষ্যৎ নিয়ে, পাঞ্জাবে যা হচ্ছে তা নিয়ে, ইন্দিরা গান্ধী

সম্পর্কে জ্যোতিষির ভবিষ্যৎবাণী নিয়ে, বিদ্যুৎ কি খাদ্য পরিস্থিতি নিয়ে, ইত্যাদি, ইত্যাদি; প্রসঙ্গের অভাব হবে না কোনও। অভিজ্ঞতা থেকেই এসব ভেবে নিল সোমেন। না। ক্লাবে নয়। অন্য কোথাও, হয়তো অন্য কারও কাছে, কিন্তু, কোথায়? কার কাছে?

রাস্তায় নেমেই টের পেল ভিজে। কখন বৃষ্টি হল আবার! তবে নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ ধরে হয়নি। ডবল ডেকারের চাকার তলায় চড়চড় শব্দ এবং ধোঁয়া উঠতে দেখে অনুমান করল উড়ো মেঘের বৃষ্টি, কংক্রিটের উত্তাপও শুষে নিতে পারেনি পুরোপুরি। বেলাশেষের হালকা রোদ্দুরে আবার ছেয়ে যাচ্ছে আকাশ। হঠাৎ কান পাতলে নানা শব্দে ধাঁধিয়ে যায় কান—সম্ভবত এইরকমই কোনও সমবেত ধ্বনি নীলাদ্রি ধরে রেখেছে সাউণ্ড ট্র্যাকে। মনে হয় তা শোনবার জন্যে সত্যি সত্যিই কেউ কোনও দিন একাগ্র ও নিরপেক্ষ হবে এবং অবশেষে, পাগলও হবে।

ব্রিফকেসটা গাড়িতে রেখে টাইটাও খুলে ফেলল সোমেন। প্রায় এই সময়েই, কিছুটা অলস, সে অনুভব করল খিদে পাচ্ছে। আগেই পেয়েছিল। দুপুরে লাঞ্চ বাদ দেবার পর খানকয়েক বিস্কিট চিবিয়েছিল বিকেলের চায়ের সঙ্গে; পেটটাকে এখন আর বাগ মানানো যাচ্ছে না। সম্ভবত কোথাও নেমে সে কিছু খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু, মিশন রো থেকে এসপ্ল্যানেড পৌছুতে না পৌছুতেই আটকে পড়ল জ্যামে। অনেক গাড়ি ও দু-তিনটি ডবল ডেকারের পিছন থেকে সামনে কী হয়েছে না হয়েছে দেখতে না পেলেও বুঝতে পারল ধর্মতলা স্ট্রিট ও ক্রসিং জুড়ে মিছিল। অস্পষ্ট শ্লোগান কানে এলো কয়েকটা, দাবি-দাওয়া নিয়েই হবে—সকালে, ফ্যাক্টরিতে, জয়ন্ত চৌধুরী কী বলেছিল মনে পড়ে গেল হঠাৎ—হাউ ডু ইউ ম্যানেজ, মিস্টার ব্যানার্জি? বিরক্ত হয়ে সোমেন ভাবল, না, ম্যানেজ করা অবশ্যই অসম্ভব হয়ে পড়ছে ক্রমশ। যেভাবে বাড়ছে এসব এবং প্রশ্রয়ও পাচ্ছে তাতে নপুংসকতাই ধরা পড়ে। সেদিন কোন কাগজে যেন পড়ছিল ব্যাখ্যাটা—পলিটিক্যাল ইমপোটেন্স। হ্যাঁ, সে একমত।

ভাগ্য ভাল বলতে হবে, যত দেরি হবে আশঙ্কা করছিল, তার অনেক আগেই ক্লিয়ার হতে শুরু করল ট্র্যাফিক। পিছনে হেলান দিয়ে বসতে গিয়ে মনে হল অস্বস্তিকর অনুভূতিটা ফিরে আসছে আবার। না, তা নয়; নিজেই ভাবল, হয়তো ধারণাই ভাবাচ্ছে এরকম।

পার্ক স্ট্রিট পর্যন্ত এসে গাড়ি থামাতে বলল ড্রাইভারকে। সামনে পরিচিত রেস্তোরাঁ। খাবে বলেই নেমে পড়ল। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল ফুটপাথে। ভাবল কিছু। তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'তুমি চলে যাও গাড়ি নিয়ে—বাড়িতে—'

'আপনি ফিরবেন কী করে, স্যার?'

'ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' সোমেন বলল, 'আমার দেরি হবে। বাড়িতে বলে দিও—'

ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে চলে যাবার পর দু দিক দেখে ধাবমান গাড়ির মধ্যে দিয়ে রাস্তা পার হল সোমেন। ফুটপাথে উঠতে যাবে, হঠাৎই পা থেমে গেল তার।

রেস্তোরাঁর ডান দিকে বিদেশি এয়ারলাইন্স্‌-এর অফিস—তার সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে রমেন; তার ছোট ভাই। হাতের ঠোঙা থেকে খাচ্ছে কিছু নিয়ে। মুড়িটুরি হবে। ফুড কর্পোরেশনের চাকরি করে, মনে পড়ল, এদিকেই কোথায় যেন অফিস ওর। ছেলে মাধ্যমিক পাশ করার পর সন্দেশের বাক্স নিয়ে দেখা করতে এসেছিল বাড়িতে, এই তো কিছুদিন আগে—ওরা ছিল না, শীমুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অবশ্য, তারপর আর

যোগাযোগ করা হয়নি। দক্ষিণ থেকে একেবারে উত্তরে, বরানগরে যাওয়া চাট্টিখানি ব্যাপার নয়। সোমেন নিজে রমেনকে দেখছে বোধহয় ছ-সাত মাস পরে। আপাতত রমেনের দৃষ্টি এড়িয়ে কীভাবে ঢুকে পড়া যায় ভাবতে ভাবতে হঠাৎ দ্রুত হল সে এবং কাচের দরজা ঠেলে স্বচ্ছন্দে ঢুকে পড়ল রেস্তোরাঁর ভিতরে।

এই সময়টায় বেশ ভিড় হয় এখানে। একটা টেবিলও খালি নেই। এদিক-ওদিক তাকিয়ে রাস্তার দিকে কাঁচের জানলার পাশের টেবিল থেকে এক যুবক-যুবতীকে উঠতে দেখে খুব তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা দখল করল সোমেন। দেখল, রমেন তখনও দাঁড়িয়ে আছে একই ভাবে, হাতে-ধরা ঠোঙা থেকে আনমনা মুখে তুলছে কিছু। তবে, ফুলের টবের মাথা অব্দি আড়াল থাকায় এদিকে চোখ ফেরালেও দেখতে পাবে না তাকে। তার চেয়ে বছর সাতেকের ছোট, কিন্তু এরই মধ্যে গোল চাঁদি স্পষ্ট হয়েছে মাথায়। একটু রোগাও হয়েছে কি রমেন? কাচের ভিতর দিয়ে সোমেন তাকিয়ে থাকল তার সহোদরের দিকে।

সোমেনকে বসতে দেখে মেনু কার্ড হাতে নিয়ে এগিয়ে এলো বেয়ারা। চেনা রেস্তোরাঁ। চোখ বন্ধ করে চিকেন ওমলেট আর পেস্ট্রির অর্ডার দিল সোমেন। সঙ্গে চা। সদ্য-দেওয়া গ্লাসটা তুলে আস্তে আস্তে চুমুক দিল যাতে ধাক্কা না লাগে পেটে। একটা সিগারেট ধরাল এবং ভাবল, ড্রাইভারকে একা ফিরতে দেখে রুচি নিশ্চয়ই ভাববে। ভাবুক। অপমানের জের সে যেমন টানছে, তেমনি টানতে হবে রুচিকেও। শুধু মুখের কথায় জন্ম হয় না ডিগনিটির। না, হয় না।

একটি হিপিগোছের লোক উঠে এসে আগুন চাইতে লাইটারটা জ্বেলে ধরল সোমেন। আগুনের আভায় চিকচিক করছে পাতলা ঠোঁটের ওপর লোকটির সোনালি, অসমান গোঁফ, চিবুকেও বিক্ষিপ্ত ইঞ্চি দুয়েক পাতলা দাড়ি, না-আঁচড়ানো চুল নেমে আছে ঘাড় পর্যন্ত। 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলার জন্যে মুখ তুলতেই লোকটির নীল চোখে বিষাদ প্রত্যক্ষ করল সোমেন। গোছের নয়, হিপিই — সংজ্ঞাটা ঠিক-ঠিক জানে না যদিও। এখন পাশের টেবিল পেরিয়ে আরও একটি টেবিলে চলে যেতে লোকটির সঙ্গের যুবতীকে দেখল। পাতলা হ্যান্ডলুমের পাঞ্জাবি গায়ে, নীচে কিছু পরেনি, স্তনদ্বয় প্রস্ফুটিত হয়ে আছে নিজস্ব রেখায়। প্রশান্ত মুখে বিষাদযুক্ত লাবণ্য। সোমেনের চোখ, যতটা বাঁচিয়ে দেখা যায়, ঘোরাফেরা করলে লাগল যুবতীর মুখে ও বুকে—এত প্রত্যক্ষ তবু অযৌন যে কোনও আগ্রহ সঞ্চারিত হয় না শরীরে। ভেসে উঠল রুচির মুখ এবং অন্ধকারে ওথলানো তার স্তন—দৃশ্য যেভাবে ঢুকে পড়ে দৃশ্যের ভিতর, তার বেশি আর কিছু নয়। নাকি যা ঘটেছে তারপর ক্রমশ নিস্পৃহ হয়ে পড়ছে সে। নাকি ঘটনাজনিত বিষাদ—যা তাকে এরই মধ্যে করে তুলেছে গন্তব্যহীন ও সময়সর্বস্ব—দৃষ্টিতেও পার্থক্য এনে দিচ্ছে তার! ভাবতে ভাবতেই বাইরে তাকাল সোমেন। যেখানে দাঁড়িয়েছিল রমেন, তার সহোদর, সেখান দিয়ে এখন যাতায়াত করছে অন্যান্য মানুষজন। দুটো বড় পেস্ট্রির বাক্স নিয়ে ওইখান দিয়েই হেঁটে যাচ্ছে মোটা চেহারার এক মহিলা, সঙ্গে বোধহয় তার স্বামী ও দুটি ছেলেমেয়ে। ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে, এইবার ওরা গাড়িতে উঠবে।

বেয়ারা ওমলেটের প্লেট নামিয়ে গেল টেবিলে। হাতে কাঁটা তুলে আরও একবার বাইরে তাকাল সোমেন। নির্দিষ্ট কিছুই দেখল না। একটা আলো এসে লাগল তার চোখে—কাচের ভিতর দিয়ে আবছা ও অস্পষ্টতর হয়ে উঠল রাস্তা। সন্ধ্যা এভাবেই হয়।

আরও কিছুক্ষণ পরে রেস্তোঁরা থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্যামাক স্ট্রিটে পৌঁছে গেল সোমেন। আরও একটা বাঁক ঘুরে, গেটের ভিতর দিয়ে এগিয়ে লিফ্‌টে উঠল। এইট্‌থ্ ফ্লোরে পৌঁছে বেল টিপল দরজার।

দরজা আভাই খুলল।

'তোমার গাড়ি কী হল, সোমেন?'

'কেন!'

'আমি জানলায় দাঁড়িয়েছিলাম। দেখলাম হেঁটে আসছ—'

'ও, গাড়িটা!' আভাকে দরজা বন্ধ করতে দেখে সোমেন বলল, 'গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। রোজ রোজ একই ব্যাপার—ভালো লাগে!'

আভা হাসল। শাম্পু-করা খোলা চুলে ও কিমোনোর ভেলভেটে আসলে যা তার চেয়ে অন্যরকম—দূরত্বটাও এমন বেছে দাঁড়াল যাতে সুগন্ধের কাছাকাছি এসে যায় সোমেন। চোখের তলায় ফোলা-ফোলা ভাবটুকু ঘুমোনো কিংবা না-ঘুমোনো যে-কোনও কারণেই হতে পারে। হাসিটা জিইয়ে রেখেই বলল, 'ভালো লাগে না! না এখানে এসেছ সেটা ড্রাইভারকেও জানতে দিতে চাও না!'

সোমেন জবাব দিল না। গাড়ি ছেড়ে দেবার সময় সে এখানে আসার কথা ভাবেনি। চিকেন ওমলেটের সঙ্গে মেশা গাঢ় লিকারের চায়ের স্বাদ এখনও লেগে আছে জিবে, হজম হতে সময় লাগবে। গুড়গুড় একটা শব্দ জায়গা বদল করল পেটে। আভার সরানো পর্দার মাঝখান দিয়ে ড্রইংরুমে ঢুকতে ঢুকতে জিজ্ঞেস করল, 'দীপঙ্কর নেই?'

একটিই ল্যাম্প শেড-এর আলোয় প্রায়ান্ধকারে সোফার পিছনে ঝুঁকে স্যুইচ টিপল আভা। ওর সবই বড়, সোমেন লক্ষ করল এবং ভাবল, এতক্ষণ নিশ্চয়ই এখানে ছিল না আভা—উত্তরদিকে বেডরুম থেকে রাস্তা দেখা যায় জানলা দিয়ে।

'দীপঙ্কর থাকবে না জেনেই তোমাকে আসতে বলেছি।' আভা রহস্য হতে গিয়েও হল না। বলল, 'বন্ধুর স্ত্রীদের একা পেলে এত অস্বস্তির হয় কেন! আমি কি তোমার অপরিচিত!'

আভার কথায় দুর্বলতা খোঁজা থাকতে পারে, সাহস জোগানোর চেষ্টাও। কিংবা, সেসব না হয়ে নিতান্তই বলার জন্যে বলা হয়তো কথাগুলো। সোমেন খুব গুরুত্ব দিল না।

'তা বলিনি। সেরকম হলে আসতাম না।'

'জানি।'

অল্প খাপছাড়া লাগছে আভাকে, গম্ভীরও; এ-পর্যন্ত হাসেনি। অবশ্য বরাবরই ও এরকম। চাপা, একপেশে, কখনও বা অসহিষ্ণু। চোখ সামনে রেখে তাকিয়ে থাকে পিছনে। আপাতত সোমেনকে সামনে রেখে পরিবেশটাকে যথাযথ করার দিকেই যেন ওর নজর বেশি। অনেকগুলো আলো ও প্লাগ পয়েন্টের কোনটা ব্যবহার করা যেতে পারে, কোনটা না, তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও আল্‌গা একটা ভাবনা ছুঁয়ে গেল সোমেনকে—ভেলভেট ও মাংসের মধ্যে কোথায় যেন একটা সামঞ্জস্য আছে। ভাবতে ভাবতে একটা উপমা এসে গেল মাথায়—গয়নার বাক্স বা ওই ধরনের কিছু, স্পষ্ট হল না। নিজেকে বোকা লাগল কেমন।

আয়তনে বিশাল ঘরটাকে ড্রইং রুম না বলে হলঘর বলাই ভালো। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে এতটা যে ষাট-সত্তর জনকে নিয়ে যে-কোনও সময়ে সভা ডাকা যায়। নাটকের জন্যে তাদের

রিহার্সালের বেশিটাই হত এখানে। তখন লে-আউট ছিল অন্যরকম। অনেকবার দেখা হলেও সেসব ছিল আরও অনেকের সঙ্গে দেখা, শূন্যতার মধ্যে নয়। আড্ডা বসলে প্রায় সব সময়েই তারা দেরিতে পৌঁছয়—নড়তে-চড়তে, সংসার গোছাতে সময় লাগে রুচির, সেইজন্যে, প্রায় সকলের শেষে। তখন আসবাব ও অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে মানুষের মুখও দেখতে হয়। পারসপেকটিভ পাল্টে যায় অনেকটা। রুচিকে বাদ দিয়ে এই কি প্রথম এলো সে?

বেছে বেছে শেষ পর্যন্ত দুটো আলো জ্বালল আভা, যাতে প্রক্ষেপণে ত্রুটি না থাকে, তাকিয়ে দেখার মধ্যেও ছুঁয়ে থাকে আরও দেখার আকর্ষণ। মনে হয় এভাবেই দেখাবার জন্যে একটা প্রস্তুতি ছিল ওর মনে। মেঝের মেরুন কার্পেট, জাপানি ফুলদানিতে ইকেবেনা, দু দিকের দেয়ালে দুটো বড় পেন্টিংয়ে, টানা পরপর এনসাইক্লোপিডিয়া সাজানো বুক সেলফ্ এবং চকচকে পালিশের দু সেট সোফা নিয়ে এই যে ঘর তার মধ্যে কমবেশি নিজেকেও মানিয়ে নিয়েছে আভা। মেরুন কিমোনোয় সোমেন এই প্রথম দেখল ওকে।

আভা বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন! বোসো।'

বেশ ফর্মাল ওর গলা। সোমেনের জন্যেই বলা নয়।

টানা সোফায় বসতে বসতে সোমেন বলল, 'ব্যাপার কী, বলো তো! বিপদ বলছিলে!'

'বলব।' একই সোফায় নিজেই এসে বসল আভা। ল্যাম্পশেডের আলো ওর মুখ পর্যন্ত পৌঁছয় না—গলায় যেখানে বিছে হার সেখান পর্যন্ত এসে ছায়া হয়ে মিশে যায় পিছনের দেয়াল ও অন্যত্র। বলল, 'অফিস থেকে এসেছ, খাবে তো কিছু?'

'নাঃ। এই খেয়ে এলাম।'

'তাহলে—ড্রিঙ্কস? দেবো?

'আই ডোন্ট ফিল লাইক—।' সোমেন মুখ তুলল। আভাকে দেখতে দেখতে বলল, 'বাড়ি এত চুপচাপ কেন। তোমার সেই কাজের লোক—শেখর না কী নাম যেন—'

'কেউই নেই।' আভার বাঁ হাতটা সোফার ওপর তোলা, প্রায় সোমেনের কাঁধের কাছাকাছি; ডান হাত কোলের ওপর বাঁকাভাবে নামানো। মধ্যমার নিটোল সাদার ওপর চেপে বসা আংটিতে জ্বলজ্বলে রুবি। ওটা ওয়েডিং রিং হতে পারে না। নিরুত্তাপ গলায় বলল, 'আমিই দিতে পারি। কী খাবে? হুইস্কি?'

'না। ওসব থাক এখন।'

দুজনেই থেমে গেল একসঙ্গে।

সোমেন ঘড়ি দেখল এবং বয়সের কথা ভাবল।

'বাড়ি ফিরতে হবে। ডেকেছিলে কেন?'

'বলছি।' নিঃশ্বাসের শব্দটা সোমেন পর্যন্ত পৌঁছে দিল আভা। সময় নিল। যে-হাতটা ছিল সোফার ওপরে সেটাকে টেনে নিল কোলে, অন্যটার পাশে। মনোযোগ আংটির রুবির দিকে। তারপর বলল, 'দীপঙ্কর আমাকে ডিভোর্স করতে চায়—'

সোমেন থেমে গেল।

'তার মানে?'

'সব তো বলতে পারব না। অনেকটাই পার্সোনাল। তা ছাড়া—', বলতে বলতেই চুপ করে গেল আভা। মুখ নিচু; বোঝা যায় ভাবছে, কিংবা ঠিকঠাক গুছোতে পারছে না

নিজেকে। বেশ পরে বলল, 'আমি কি সব কথা বলতে পারি তোমাকে? কিছু মনে করবে না?'

এর উত্তর হ্যাঁ বা না দিয়ে হতে পারে না। নিজের মধ্যে সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল সোমেন। ঠিক অস্বস্তি নয়; এই অনুভূতিটা অন্য। নিজেকে যেসব প্রশ্ন করা যায়, বস্তুত আজ সারাদিন ধরেই করছে, আভা কিছু বলবার আগেই সরল রেখা ধরে এগিয়ে চলল সেগুলো। তবু, সোমেন ভাবল, আভা ডেকেছিল বলেই সে এসেছে এখানে, নিজের প্রয়োজনে নয়। শোনার দায়িত্বটা তার। ভাবতে ভাবতেই কঠিন হয়ে উঠল চোখমুখ।

'আমার মনে করাটা কিছু নয়। তুমি বলো না!'

'আমার মনে হয়—', আভা এবারও ইতস্তত করল, 'আমার মনে হয় রুচি—রুচিও এই ঘটনায় ইন্‌ভল্‌ভ্‌ড্‌ আছে—'

'রুচি!'

'মানে ঠিক রুচিও হয়তো নয়—মানে—আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না তোমাকে।' মুখ তুলে সোমেনকে দেখবার চেষ্টা করল আভা; দেখেও দেখল না। পরের কথাগুলো আগে বলে ফেললে যেমন হয়—সোমেন এক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে ছিল বলেই বুঝতে পারল, সেইরকম অসহায়তা আভার মুখে। ডান হাতে বাঁ হাতের কড়ে আঙুল টেনে ধরে বলল, 'আমার ভুলও হতে পারে। হয়তো দীপঙ্করের ব্যাপার এটা—রুচির নয়। কিন্তু—নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ?—আমারও একটা সেনস্‌ কাজ করে—'

'তোমাদের ব্যাপার তোমরা বুঝবে। হঠাৎ রুচিকে টানছ কেন!' সোমেন থামল একটু, পরের কথাগুলোর অভাবে ঘরের সমস্ত আলো জ্বলে উঠতে দিল মাথার মধ্যে। সেইভাবেই বলল, 'ব্যাপারটা কিছুই বুঝছি না! বাড়ি ডেকে এনে স্বামীর কাছে স্ত্রী সম্পর্কে বলছ! প্রমাণ আছে কিছু?'

আভা মাথা নাড়ল। চুপচাপ।

'তাহলে—!'

সোমেন উঠতে যাচ্ছিল। না উঠে, অস্থির ভঙ্গিতে আরও একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে গুঁজল। ধরাল না।

'সবকিছু কি প্রমাণ দিয়ে হয়, সোমেন!' নিজেকেই শোনানোর ধরনে বলল, আভা, 'কাল রাত্রে আমি মরতে চেয়েছিলাম—তার কোনও প্রমাণ আছে!'

সোমেন চুপ করে থাকল।

'দীপঙ্করই বাঁচাল। কী অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে! বলল, আমাকে ভালোবাসে না, কিন্তু আমি মরে যাই সেটাও চায় না। সো ইনসালটিং!'

আভা আবার তার হাতটা তুলে দিল সোফার পিঠে। অপেক্ষা করল না।

'তোমার মনে হয় না ব্যাপারটা ইনসালটিং!'

একই কথা, ধ্বনি পাল্টানোর সঙ্গে সঙ্গে অন্যরকম লাগছে কানে। হয়তো এই রকমই কোনও প্রশ্ন সে নিজেও করতে পারে। চুপচাপ বসে সেই প্রশ্নটাই খুঁজতে লাগল সোমেন।

॥ ৩ ॥

রুচি বুঝতে পারছিল সে বদলে যাচ্ছে। ওপর ওপর তেমন কিছু নয়, কিন্তু, সময়ের মাপে দাম্পত্য ও সংসার অনেকগুলো বছর ধরে নিলে, বাইরের কোনও কারণ ছাড়াই এরই মধ্যে সে বদলে গিয়েছিল অনেকটা। আস্তে আস্তে ঘটেছিল বলে নিজেও ধরতে পারেনি। এখন পিছনে তাকিয়ে দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে নিজের জায়গা থেকে বেশ কিছুটা দূরে—এমন একটা জায়গায় যেখান থেকে সম্পর্কের ভিতরের টানগুলো ছোঁয়া যায় কিন্তু অনুভব করা যায় না ঠিকঠাক। বড় শিথিল লাগে ন্যায়-অন্যায়ের বোধগুলো।

আর কিছু না হোক, ঘটনাগুলো তাকে সচেতন করে দিল আরও। নিজস্ব কারণেই আড়াল দিয়ে ঘিরতে লাগল নিজেকে। সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগল এমন কিছু ভাবনা আগে যেগুলোকে আমল দেবার কথা ভাবেনি।

হিসেবমতো ওই দিনের দিন দুই পরে শরীর খারাপ হবার কথা ছিল রুচির। না হওয়ায় রীতিমতো চিন্তিত হয়ে পড়ল সে। পিল ব্যবহারে গোলমাল হল না তো কিছু? না, তা কেমন করে হবে, নিজেই ভাবল, পাঁচ ছ' বছর ধরে একই নিয়মে একই ব্র্যান্ডের পিল ব্যবহার করে যাচ্ছে সে। প্রেসক্রিপসন লিখে ডাক্তার বলেছিল খুবই সেফ আর সাইড এফেক্টস্‌ও হয় না তেমন। সত্যি সত্যিই এতদিন এমন কোনও উপসর্গ দেখা দেয়নি যে কমপ্লেন করবে। কয়েক মাসে মোটা হয়েছিল সামান্য—কণ্ঠার হাড় আর কাঁধের মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকু ভরে উঠল, বুকও ভারী হল অল্প, কিন্তু এমন কিছু হল না যে চোখে পড়বে। লাবণ্য আসে নিজস্ব ধরনে। যে চেনার সে ঠিকই চিনে নেয়।

মনে পড়ল, গত মাসের আগের মাসেও হয়েছিল এরকম। তিন চারদিন পার হয়ে যাবার পর যখন সোমেনকে বলবে কিনা ভাবছে, তখনই চলে গেল সমস্যাটা। তবু নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না। নিজেই বুঝতে পারছিল কিছু একটা ন্যাগ করছে ভিতরে। থেকে-থেকে ব্যথা করে কোমর, সঙ্গী আলস্য ও ঝিমুনি, চলতে ফিরতে ঝকঝকে ভাবটা টের পায় না আর। চিন্তা বাড়ল যখন এরও চার পাঁচদিন পরে তাকে বিব্রত করে হঠাৎ শুরু হল এবং স্বাচ্ছন্দ্যের জের চলতে না চলতেই বন্ধ হয়ে গেল আবার। আর কিছু নয়—এমন হয়ও হয়তো, চিন্তা আসে স্বাভাবিক কারণে। শ্রীময়ী ও কৌশিক বড় হয়ে গেছে, এখন আর একটি ভাবলে জ্বর আসে গায়ে। লোকেই বা বলবে কী! ধ্রুবর একটা মন্তব্য মীনা তাকে বলেছিল একদিন, কথায় কথায়, নাকি তার মধ্যে আছে একটা মাদারলি ভাব। কথাটায় খুশি হবে বলে ভাবছে যখন তখনই প্রাঞ্জল করে দিল মীনা, না, সেজন্যে নয়, আসলে কোনও কোনও মেয়েকে দেখলেই মনে হয় না যখন তখন মা হতে পারে? এর বেশি বলার দরকার ছিল না। কোন কথাটার কী অর্থ, কোনটার ইঙ্গিত কোনদিকে, একটু ধরিয়ে দেবার পর কে না বুঝতে পারে তা—অবশ্য যদি না মাথায় মাটো হয় একেবারে। মীনাকে এবং ওর মাধ্যমে ধ্রুবকে ভর্ৎসনা করলেও রুচি ধরে নিয়েছিল এটা প্রশস্তি, তার সৌন্দর্য, যা হয়তো যে-কোনও পুরুষের চোখেই আরও ঘন করে তোলে আকর্ষণ। সত্যি সত্যিই, আর পাঁচজনের চোখে নিজের নারীত্ব ও আকর্ষণ কোন মেয়েই না চায় ধরে রাখতে! সকলেরই নিজের যেটা আছে তা নিয়ে গর্ব যেমন হয়, তেমনি যা নেই, যেটা পাওয়া হল না, তার জন্যে ক্ষোভ বা দুঃখও কি হয় না!

মনে পড়েছিল আভাকে। বেচারা! এমনিতে ভালো, কিন্তু কীরকম যেন একটা কমপ্লেক্সে

ভোগে সারাক্ষণ—এই অভাবটার কারণেই সম্ভবত উল্টো পাল্টা ব্যবহার করে মাঝে-মাঝে। গত বছর কৌশিকের জন্মদিনে খুব বড় চকোলেট কেক এনেছিল একটা—নিজেই বানিয়েছিল; তারপর রুচির হাতে সেটা তুলে দিতে গিয়ে বলল, নিয়মকানুন জানি না। যার নিজের হল না সে কি অন্য কারুর ছেলের জন্মদিনে কেক বানায়! তুমি বুঝে নিও—, ইত্যাদি। রুচি ওর চোখের দিকে তাকাতে পারেনি, জানত কী দেখবে। তারপর, সেদিন যেমন হঠাৎই রেগে উঠল সকলের সামনে—যাকে বলে সিন ক্রিয়েট করা, তাই করল; যদিও ঘটনাস্থল থেকে আভা ছিল অনেকদূরে এবং তার পক্ষে অন্তত কী হয়েছে না হয়েছে তা বুঝবার উপায় ছিল না কোনও।

মীনা আভার দোষ ধরলেও মনে হয় আভার রিঅ্যাকসনটা ভেবে চিন্তে সন্দেহ করে হয়নি। সেদিন সন্ধে থেকেই চুপচাপ ছিল ও, কথাবার্তায় অনিচ্ছুক, ইত্যাদি; আর একটা ব্যাপারও লক্ষ করেছিল রুচি, আগ বাড়িয়ে নিজে থেকেই হুইস্কির গ্লাস টেনে নিয়েছিল আভা, সচরাচর যা করে না। এটাও স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। গভীরে, আরও গভীরে, কে কখন ডুবে যেতে চায় কোন আচ্ছন্নতায় এবং কেন, অন্যরা তা কী করে বুঝবে! তুমি কারও স্ত্রী, স্বামী, বন্ধু, বান্ধবী হতে পারো, কিন্তু সবচেয়ে আগে তুমি কি নিজেরই নও! যন্ত্রণা বা অভাবের কথা বললে কেউ কেউ বুঝবে, সহানুভূতিও দেখাবে হয়তো; কিন্তু অনুভব করবে কি কোথায়, কেন এবং অসহায়তার ঠিক কোন স্তরে পৌঁছে বিমুখ হয়ে উঠছে রক্ত! নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝতে পারে রুচি, এগুলো বোঝানো যায় না। অনুভব হয়তো করা যায়, কিন্তু ব্যাখ্যাটা অস্পষ্ট হয়ে থাকে নিজের কাছেও। সুতরাং, কেউই বলতে পারবে না যে স্কচ দেখেই হ্যাংলামি শুরু করেছিল আভা। ওদের, ওই দলটার মধ্যে 'সলিড' বলতে যদি কাউকে বোঝায় তো সে দীপঙ্করই। আর্কিটেক্ট, কনসালটেন্সি না কি ফার্ম আছে নিজের—ব্যাপারটা ঠিক বোঝে না রুচি; টাকার পাহাড়, শোনা কথায় ও হাঁচলেও নাকি ছিটকে বেরোয় টাকা। আভা নিজেই বা কম কী! বনেদি ফ্যামিলির মেয়ে, বাপ-মার একমাত্র; ওদেরও আছে অনেক। বারাসাতের দিকে যে-বাগানবাড়িটায় দল বেঁধে পিকনিক করতে গিয়েছিল সেবার, সেটার কথা কেউ ভাবতে পারে! টাকাই চালায়। ওরকম স্কচ-টচ নিশ্চয়ই অনেক দেখেছে আভা। বস্তুত, ইচ্ছে করলেই—চামড়া মোলায়েম করবার জন্যে?—স্কচে ডুবে থাকতে পারে ও। সেজন্যে নয়; ওর সেদিনকার সব আচরণই ছিল স্বভাববিরুদ্ধ। আভা সম্পর্কে মীনার ব্যাখ্যাটা সুতরাং, মেনে নিতে পারেনি রুচি। তবে, হ্যাঁ, মনে যা-ই থাক, সকলের সামনে দীপঙ্করকে ওইভাবে হেনস্থা না করলেও পারত। সম্পর্ক তো কাঁচের গ্লাস নয় যে শব্দ তোলার জন্যেই ভাঙতে হবে, আর যেখানে-সেখানে। যদি সেরকমই হবে, তাহলে, সকলের আগে রুচি নিজেই রিঅ্যাক্ট করতে পারত। কেউ না দেখুক, নিজে দেখেছিল কী হয়েছে না হয়েছে; তার চেয়ে বড় কথা, জেনেছিল, তাকে পুরোপুরি অধিকার করার জন্যেই এগিয়ে এসেছিল দীপঙ্কর—এমনভাবে যে রুচি নিজেও ভাবতে পারেনি সত্যি সত্যিই কেউ এমন ডেসপারেট হয়ে উঠতে পারে। রুচি না হয় হল অধিকারের, কিন্তু, কেন একবারও মনে হল না দীপঙ্করের যে রুচি—যাকে সে অধিকারের জন্যে ব্যস্ত—রুচি ছাড়াও, সোমেনের স্ত্রী! এত দূরই যখন হতে পেরেছে, পরে অনেকবার ভেবেছে রুচি, চুরমারের শব্দ না হলে সেদিন আরও কী করতে পারত দীপঙ্কর! কপালের ঠোঁটের স্পর্শেই যে ছড়িয়ে দেয় বিদ্যুৎ, বোধ করে নিঃশ্বাস নেবার অধিকার, বিদ্ধ করে, ধস্ত

করে—, সত্যি বলতে, এখন মনে হয় রুচির, ভয়ই তখন তাকে টানতে শুরু করেছিল ইচ্ছা ও আগ্রহের দিকে। চুরমারের শব্দ না হলে হয়তো তাকেই ভাঙত দীপঙ্কর।

যা হয়নি, কিন্তু হতে পারত, তারই সম্ভাবনার ভাবনায় সম্মোহিত হয়ে আসে নিঃশ্বাস। এর আগে আর কখনও এমন করে অপূর্ণতা চেনেনি রুচি। সোমেন ছাড়া আর কাউকে কখনও এমন করে সারাক্ষণের ভাবনায় জড়িয়ে ফেলেনি—অবশ্য আর কেই বা এসেছে! আর সেই বয়সে সোমেনকে পুরুষ হিসেবে যতটা না তার চেয়ে বেশি চিনেছে স্বামী হিসেবে। স্বামীর মধ্যেও পুরুষ থাকে অবশ্য; কর্তব্য আর অভ্যাসে? এমন কি হয় যে দুটোই একাকার হয়ে গেল; রুচি যেমন স্ত্রী ও মেয়েমানুষ, সুতরাং সোমেনের স্ত্রী এবং শীমু ও কৌশিকের মা। চব্বিশ-পঁচিশ বছর কেটে গেল এইভাবে এবং বাকি কয়েকটা বছরও কেটে যাবে স্বচ্ছন্দে!

শরীর খারাপ হওয়া না-হওয়া নিয়ে চিন্তাটা অবশ্য আসছিল অন্য কারণে। অস্পষ্ট হলেও একটা ধারণা ছিল মনে—বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুরোতে থাকে ভিতরের পুঁজিও, ফরমাসি কলের জল যেমন—সময় হয়ে যাবার সঙ্কেতটা পাঠিয়ে দেয় আগেই, তোড় কমে যায়, শেষ অব্দি ফোঁটায় গড়াতে গড়াতে থেমে যায় একেবারে। তেমনি। কিন্তু, সে তো শুনেছিল এমনটা হয় পঞ্চাশ-টঞ্চাশে পৌঁছুলে, কারও কারও বেলায় তারও পরে। ব্যতিক্রম হলেও হতে পারে। শরীরটা তার, কিন্তু শরীরের ভিতরের কলকব্জা, যন্ত্রপাতিগুলো তো তার নয়। দেখাও যায় না যে প্রয়োজনে বের করে আনবে, প্রয়োজনে অক্সিজেন দেবার জন্যে মেলে দেবে রোদে ও হাওয়ায়, আদরে, হাত বোলাবে গায়ে—আলমারি ওয়াড্রোব থেকে দামি শাড়ি ব্লাউজ শাল বের করে যেমন মাঝে মাঝে শুকোতে দেয় রোদে। নিরুপায় বলতে এটাই—শরীরটা নিজের হলেও শরীরের নিয়ন্ত্রণ তার হাতে নেই। তা বলে ব্যতিক্রম তার বেলাতেই বা ঘটবে কেন, এই বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশে! এখনও তেতাল্লিশে পৌঁছুতেই দেরি আছে ঢের। তা ছাড়া, ভিতরের কলকব্জা যদি সত্যি সত্যিই নষ্ট হয়ে যেত সেভাবে, তাহলে ওপরেও কি কিছু শৈথিল্য, কিছু অনুজ্জ্বল মরচের আভা চোখে পড়ত না তার! বরং, অনুভব করে রুচি, এখনই সে অনেক পূর্ণ, অনেক তীব্র, মনের যে-কোনও আবেগই সংস্পর্শে সজীব হয়ে ওঠে শরীরে, একটু অন্যরকম ভাবলেই বেজে ওঠে রোমাঞ্চে—আলতো স্পর্শ-লাগা একলা সেতারে যেমন হয় কখনও, ধ্বনি মিলিয়ে গেলেও অনুরণন থামে না কখনও, থেকে-থেকে খাড়া হয়ে ওঠে রোমকূপ। চুপচাপ থাকার মধ্যেই এই অনুভূতিগুলোকে ক্রমশ আড়াল দিয়ে যাচ্ছে সে। তা কি এই হঠাৎ ফুরিয়ে যাবার জন্যে!

ভাবনাগুলো দুশ্চিন্তা ও মন খারাপের দিকে নিয়ে গেলেও গড়াল না বেশি দূর। একদিন রাতের মাঝঘুমে—যখন সোমেন পাশ ফিরে শোয়া এবং ঘুমোচ্ছে তার পক্ষে অস্বাভাবিক নাক-ডাকার শব্দ না তুলে, হঠাৎ ঘুম ভাঙার মধ্যে রুচি টের পেল অন্ধকার জল টোকা দিচ্ছে দরজায়। শব্দটা পৌঁছে গেল শরীরে। একা জেগে ওঠার স্বস্তি ছড়িয়ে পড়ল ঘামে ও আরামে, মৃদু যন্ত্রণাজনিত প্রশান্তিতে। আরও বেশি জেগে ওঠার মধ্যে যেতে যেতে অদ্ভুত আরোগ্যে পৌঁছে যায় সে—দ্যাখে জড়োয়া গহনার সাজে সজ্জিত তার অন্ত্র ও জরায়ু সঙ্কুচিত-প্রসারিত হচ্ছে নিঃশ্বাসের ওঠানামায়; মন্থর হলেও নিয়মিত। এইভাবেই ভাবতে ভালো লাগে।

আলোকোজ্জ্বল এই ভিতরের অভিজ্ঞতা বাইরের অন্ধকার ও নৈঃশব্দ্য আরও বেশি স্পষ্ট

করে দিল রুচির চোখে। মাঝঘুম থেকে জেগে ওঠার আকস্মিকতা কেটে গেছে ততক্ষণে। আধো জড়তাও। এখন আর না ঘুমোলেও চলে এই ভেবে জানলার বাইরে নিশুত চরাচরের দিকে তাকিয়ে থাকল সে—কাচের ভিতর দিয়ে, আকাশ নেমে এসেছে মেঘের ভারে, দেখল, অস্পষ্ট ভাবে তার ভিতর দিয়ে জায়গা বদল করছে অচেনা হলুদ রেখা। কিছু প্রতিবাদ কিছু বিনিময়ের ধরনে চাপা শব্দে গুড় গুড় করছে মেঘ, বৃষ্টিও পড়ছে হয়তো। সবই স্তব্ধতা চেনানোর জন্যে। মনে পড়ল রাতে শুতে যাবার আগে বৃষ্টি নেমেছিল বড় বড় ফোঁটার দাপটে। জলের ছাঁট এড়াবার জন্যে টানা জানলাটা বন্ধ করে দিয়েছিল তখন, পাখা খুলে দিয়েছিল জোরে। অল্প গরমেই হাঁসফাঁস করে সোমেন। আগে খালি গায়ে শুত—মাঝে বুকে শ্লেষ্মা জমায় এবং ঘুসঘুসে জ্বরে কিছুদিন ভুগে ওঠার পর গেঞ্জি পরে শোয়। শোবার ধরন দেখে মনে হল ঘরের এই তাপই তার পছন্দ। এখন, প্রায় অন্ধকারের আকর্ষণে, শব্দ বাঁচিয়ে জানলাটা খুলে ফেলল রুচি। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে আলগা হাত বাড়াতেই নিঃশব্দ শিশিরের ছোঁয়া নেমে এল হাতে; ভিজে, অসংলগ্ন হাওয়ার স্পর্শ এসে লাগল চোখেমুখে। তখনই মনে হল, ঘুম ভেঙে গেছে সোমেনের—হঠাৎ হাওয়ার সংস্পর্শ বাঁচাতে শরীরটাকে মুড়ে নিল একটু, কাশল, পাশ ফিরে শুল। মনে হয় জাগার ব্যাপারটা সে জানাতে চায় না রুচিকে।

কিছু না ভেবেই আবার জানলাটা বন্ধ করে দিল রুচি। চুপচাপ তাকিয়ে থাকল সোমেনের দিকে।

এই তার স্বামী—সোমেন; অগ্নিসাক্ষী না কী রেখে যেন, বিবাহিত হয়েছিল এর সঙ্গে, অনেক অনেক বছর আগে। চব্বিশ বছর একটা সময় বটে, ক্যালেন্ডারের হিসেবে, তার আগেও ছিল অনেকগুলো বছর। কিন্তু, আজ, রুচি মনে করতে পারে না তার কোনও কৈশোর বা শৈশবও ছিল। এই যে মনে হওয়া, এটা নিছক ভাবনাও হতে পারে, রুচি ভাবল, জীবন শুরু হয় একটা বিস্ফোরণের মধ্যে দিয়ে, কিংবা জীবনও নয়—অভিজ্ঞতা, জীবন আর অভিজ্ঞতা কি একই ব্যাপার? তাহলে তার অভিজ্ঞতায় শৈশব নেই কোনও। কয়েকটি মুখ আছে অবশ্য। আজ রাতের অন্ধকারে স্মৃতি হয়ে ভেসে যায় মুখগুলি—বাবা, মা, দিদি, পুলু, পুলুরও ছোট বিলু। বাবা মারা গেছে বছর তিনেক আগে। মা আছে পুলুর কাছে, সল্ট লেকে, পুলুর বউ রশ্মি ও ছেলেমেয়ের সঙ্গে। দেখা হয় মাঝেমধ্যে; বিশেষত সোমেনের সঙ্গে পুলুর—এয়ারপোর্টে। দিদি জামশেদপুরে। টাটায় কাজ করেন জামাইবাবু, বাড়িও করেছেন ওখানে। বিলু আমেরিকায়। বছর তিনেক হল। রিসার্চ করছে, আর চাকরিও। শেষ এসেছিল গতবার পুজোয়। ঠাট্টা করে বলল, 'দুর, বাঙালি মেয়ে আবার কেউ বিয়ে করে নাকি?' শুনে রুচি বলেছিল 'মতলব কি তোর! মেমসাহেব বিয়ে করবি?' বিলু হেসেছিল, মনে পড়ে, এত দূরত্বপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হাসি যেন নিউ জার্সি থেকে টিভি স্ক্রিনের মধ্যে দিয়ে হাসল রুচির দিকে তাকিয়ে। তেমনি ভাবে বলল, 'বিয়েটিয়ে নিয়ে ওদেশের মেয়েরা আর ভাবে না আজকাল। যাকে ভালো লাগে তার সঙ্গে থেকে যায়—', ইত্যাদি। রুচি অবাক হয়নি। কিন্তু, ভাই বলেই বলেছিল, 'এ কী অসভ্যতা। ফাজিল। ওসব করবি না। মেমসাহেব বিয়ে করলেও জানাবি আমাদের—আমরা যাবো।' মনে পড়ে। কোন আনন্দে যে চিরুনি দিয়ে বিলুর মাথা আঁচড়ে দিচ্ছিল শীমু, বোঝা যায়নি। বিলু বলল, 'তুই আর গেছিস! দিদি বলছিল এতদিনে জামশেদপুরেও যেতে পারলি না! সোমেন ব্যানার্জির সংসারের বাইরেও যে একটা

জগৎ আছে তা তোর মাথায় ঢোকে না।' রুচি কি তাকিয়েছিল আশপাশে? হয়তো, দেখে নিয়েছিল কাছেপিঠে সোমেন আছে কি না। 'কী সুন্দর লাইফ তোমাদের, ছোটমামু।' শীমু বলেছিল, 'আমাকেও নিয়ে চলো না?'

চেনাশোনা মুখগুলি, যাদের সঙ্গে তার রক্তেরই সম্পর্ক, সামনে এলে হয়েই যায় কিছু কথা। তাৎক্ষণিক অন্তরঙ্গতাই চিনিয়ে দেয় এরা তোমার আপনজন । কিন্তু, আপনজন বলতেও যে ঠিক কী বোঝায়! রক্ত সম্পর্কিত ধারণা থেকেই হয়তো এসে যায় একটা মনোভাব, রুচি ঠিক জানে।

বিলুর আসা এবং চলে যাওয়ার মাঝখানে কয়েকটা বুদ্বুদ ফুটেছিল শুধু। আমেরিকায় ফিরে একটা চিঠি দিয়েছিল বিলু। উত্তরে পাঁচ লাইন জবাব পাঠিয়েছিল রুচি, তাতে প্রশ্ন ছিল না কোনও। এর কিছুদিন পরে সোমেন জিজ্ঞেস করল, 'তোমার ভাই কি ফিরে গেছে?' প্রশ্নটা বুঝতে না পেরে রুচি বলল, 'কেন, ওর পৌঁছুনো চিঠিও তো দেখেছ তুমি।' মনে করার চেষ্টায় সময় নিয়ে সোমেন বলল, 'ও হ্যাঁ, মনে পড়েছে। বেশ আছে ছোকরা —', ইত্যাদি। যার সম্পর্কে কৌতূহল নেই কোনও, সে যে 'বেশ আছে', এ-ধারণাও যে কী করে হল সোমেনের তা বুঝতে পারেনি রুচি। বরং মনে পড়ে, সারাক্ষণ নিজের আলস্যে ভরে থাকলেও খুব যত্নে বিলুর চুল আঁচড়ে দিয়েছিল শীমু। তারপর, ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, সুন্দর একটা কার্ড পাঠিয়েছিল বিলু—টু ডিয়ার ছোড়দি, সোমেনদা, শীমু অ্যান্ড কৌশিক—সিজিন্স্ গ্রিটিংস অ্যান্ড বেস্ট উইশেস ফর এ ভেরি হ্যাপি অ্যান্ড প্রসপারাস নিউ ইয়ার—ফ্রম বিলু অ্যান্ড বো। কার্ড পেয়ে 'বো'-টা কে এই নিয়ে গবেষণায় মেতেছিল তারা। শীমু বলল, 'এ নিশ্চয়ই ছোটমামুকে যার ভালো লেগেছে সে।' শুনে রুচি বলেছিল, 'বো কোনও মেয়ের নাম হতে পারে না।' তখন শীমু বলল, 'কেন হবে না। বো ডেরেক—নাম শোনোনি!' তারপর ওরাও একটা কার্ড পাঠাবে ভেবেছিল; হয়ে ওঠেনি শেষ পর্যন্ত। এখান থেকে নিউ জার্সি যত দূরে বিলুও ঠিক ততটা। জামশেদপুর বা সল্ট লেকের দূরত্বও কিছু কম নয়। ঠাট্টা করে বললেও সম্ভবত মিথ্যে বলেনি বিলু—রুচির চারদিকে সোমেন ব্যানার্জির বেড়া। চব্বিশ বছরের সম্পর্ক দিয়ে বেয়াল্লিশটা বছরকে বেশ আড়াল দিয়ে ফেলেছে রুচি। দুর্গটা মজবুত করেই গড়েছিল সোমেন।

এসব ভাবতে সময় লাগে না। এরপরেও থেকে যায় ভাবনা—পরপর ও ক্রমাগত, কোনওটার ভিতরেই সারবত্তা থাকে না কোনও। শুধু সচেতন হলে এগুলোকে চেনা যায় ভাবনা বলে। তখনই আবার মনে হয়, এত ভাবছেই বা কেন। কার জন্যে!

খুব দূরে একটা কুকুরের ছিতকুড়ে ডাক উঠতে না উঠতেই থেমে গেল। অন্ধকার অন্যমনস্কতার মধ্যে রুচি তাকাল বিছানায় অল্প কুঁকড়ে-থাকা সোমেনের দিকে। আবার কাশল সোমেন। ছোট কাশি, শুষ্কতা মেশানো। কিন্তু তার দেখা ও শোনার সঙ্গে দেখা বা শোনা ছাড়া মিশল না এমন কোনও আবেগ, যা দিয়ে চব্বিশ বছর ধরে প্রবাহিত নিঃশ্বাসটাকে বইয়ে দেওয়া যায় তার চিরাচরিত খাতে। এমন কেন হবে?

প্রশ্ন থেকেই একটা বিচলিত ভাব এসে গেল রুচির মনে।

আজও জানে না সেদিন গাড়ি ছেড়ে দিয়ে কোথায় গিয়েছিল সোমেন। ড্রাইভার বলেছিল পার্ক স্ট্রিটে নেমে গেছে। ওটা দোকান আর রেস্তোরাঁর জায়গা; কারও ঠিকানা হতে পারে না। তাহলে কি-? একটা নয়, অনেকগুলি সম্ভাবনা উঁকি দিচ্ছিল মনে; কিছু ভয় এবং

উদ্বেগও। এমনিতে নিঃশব্দ বাড়ি সন্ধে থেকেই নৈঃশব্দ্য ডেকে এনেছিল আরও। একটা ফোন এল—রুচি উঠতে যাচ্ছিল, তার আগেই ছুটে গেল শীমু। ধ্রুব। দু-চারটের বেশি কথা হল না। কিন্তু শীমু যতক্ষণ কথা বলল ততক্ষণই মেয়ের দিকে তাকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রুচি। রিসিভার নামিয়ে রাখার পর বলল, 'কেউ যদি আমাকে খোঁজে, বলে দিবি বাড়ি নেই।'

শীমু ইতিমধ্যেই গম্ভীর হয়েছিল। রুচির কথায় মেজাজ দেখাল।

'সব সময় তোমার ফোন আসবে ভাবছ কেন! বাবাও তো ডাকতে পারে!'

শীমুর কথায় যুক্তি আছে। এইমাত্র একটা ভুল ভাবনায় ঢুকে পড়েছিল রুচি। সামলে নিয়ে বলল, 'সে-কথা বলিনি।'

শীমু জবাব দিল না। আজ সিনেমায় যাবে বলেছিল, যায়নি। সন্ধের মুখেই—রুচি তখন টেলিফোনে—ফিরে এলো মুখ ভার করে। কিছু একটা হয়েছে হয়তো; হয়তো তখনকার মেজাজ খারাপের জেরটা টেনে চলেছে এখনও। একটু বা বিরক্ত, দ্রুত ভঙ্গিতে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে।

সোমেন ফিরল না।

দিলীপ কিছুক্ষণ নীচে গিয়ে দাঁড়াল। পরে রুচিই ওকে গোছগাছ করে চলে যেতে বলল। দেরি অনেক কারণেই হতে পারে।

অনেক রাতে বাইরে ট্যাক্সির শব্দ শুনে দরজা খুলে নিজেই নীচে নেমে গিয়েছিল রুচি। সোমেনই। মুখ ও হাঁটার ভঙ্গিই বলে দেয় নেশাচ্ছন্ন; যদিও অপ্রকৃতিস্থ বলা যায় না। চিন্তার কারণ না থাকলে ঘটনাটাকেই স্বাভাবিক ভেবে নেওয়া যেত।

রুচি কিছুই বলেনি। আগের রাতের বলাটাকেই হজম করতে পারেনি তখনও। সোমেনকে সিঁড়ির দিকে এগোতে দিয়ে যখন দরজা বন্ধ করছে, সোমেনও রেলিং ধরে উঠে গেছে কয়েক ধাপ; হঠাৎ পিছনে তাকিয়ে সোমেন বলল, 'পশুর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না—সেন্স্ অফ ডিগনিটি থাকে না।' বলতে বলতেই থেমে, আরও এক ধাপ উঠে, বলল, 'স্ত্রীদের থাকে—'

এ-কথার জবাব দেয়নি রুচি। সোমেন ক্ষিপ্ত নয়, দুঃখিতও নয়; ঘোরের মধ্যে বলা ওর কথাগুলো যাতে বিস্তারিত হয়ে আর কারও ঘুম না ভাঙায়, সেজন্যে ইচ্ছে করেই একটু পিছিয়ে থাকল সে। তারপর সতর্কতা মেনে চলে এল ওর কাছাকাছি। খোলা দরজা দিয়ে সোমেন যখন ভিতরে ঢুকেছে, দেখল, শীমু দাঁড়িয়ে আছে ঘরের জরজায়। ঘুমহীন, নিস্পন্দ।

সোমেনকে নয়, শীমু রুচিকেই দেখছিল। চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে।'

ওকে দেখে এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল সোমেন। বলল, 'কিছু হয়নি। শুয়ে পড়। মানুষ আরও খারাপ ভাবে বাঁচে।'

সোমেন নিজেই শোবার ঘরে ঢুকল এবং বিছানায় ঢলে পড়তে পড়তেও সামলে নিল নিজেকে। সোজা হয়ে বসে জুতো, মোজা খোলায় মনোযোগ দিল। স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে, এছাড়া ওর আচরণের তারতম্য নেই কোনও। একসময় অফিসের পোশাকও ছেড়ে, লুঙ্গি পরল এবং বাথরুমে গেল। সমস্তই রুচি দেখল এক ধরনের আশঙ্কা নিয়ে। দেখল, ঠিকই নিজের জায়গাটি চিনে বালিশে মুখ গুঁজছে সোমেন। অদ্ভুত অসহায় ওর শোবার ভঙ্গি। রুচিই প্রত্যক্ষ করল সেটা, সোমেন নয়।

সেই থেকে প্রায় তিনদিন হল কথা নেই তাদের মধ্যে—প্রয়োজনে হ্যাঁ কিংবা না কিংবা মাথা নাড়া কিংবা অনিচ্ছা জানানোর জন্যে হাত নাড়া, এর বেশি সম্পর্ক নেই কোনও। রুচি ভাবল, হয়তো সে নিজেই এর জন্যে দায়ী। 'পশু' এবং 'ডিগনিটি' দুটোই বড় কড়া শব্দ। সেদিন রাতে ওগুলো ব্যবহারের সত্যিই কি দরকার ছিল কোনও? পৌরুষের অপব্যয় তার বেশি সোমেনকে ঘা দেবার কথা—শরীর খারাপ নিয়ে তাব দুশ্চিন্তা থাকলে সোমেনেরও থাকতে পারে অনুরূপ কিছু, থাকতে পারে ব্যর্থতাজনিত দুশ্চিন্তা। রুচি কি তা ভেবেছিল? সেই মুহূর্তে কেন সে ভুলে গিয়েছিল চব্বিশ বছরের ধারাবাহিকতা, শীমু ও কৌশিকের জন্ম—তার অন্যান্য প্রাপ্তি; কেন সে মেনে নিতে পারেনি চুপচাপ। কেন না, তার আগে সোমেন তাকে আঘাত করেছিল। গায়ে হাত তোলার মধ্যে যদি কোনও অপমান থেকে থাকে, যদি অপমানবোধ দ্বারাই চালিত হয়ে থাকে রুচি, তাহলে অত দূর প্রশ্রয় না দিয়ে, সেদিন রাতে, সোমেন স্পর্শ করা মাত্র নিজেকে সরিয়ে নিতে পারত সে। এরকম আগেও যে কখনও করেনি তা নয়, অনিচ্ছা ও আরোপিত দূরত্ব দিয়েই বুঝিয়ে দিতে পারত স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা সব সময়েই শরতের মেঘ নয় যে এই রোদ এই বৃষ্টির সহজ নিয়ম মেনে চলবে। সম্পর্কটা বোঝো তোমার অধিকার বোধ দিয়ে নয়, সম্ভ্রম দিয়ে। হয়তো একটা আপসে পৌঁছে যেতে পারত তারা; তা না পৌঁছে ঢুকে পড়তে পারত আর কোনও গোলমাল ও মন কষাকষির মধ্যে—হয়তো এতদিনে দীপঙ্করকে নিয়ে সোজাসুজি একটা প্রশ্ন তোলার সুযোগ পেয়ে যেত সোমেন। কিন্তু, রুচি কি অস্বীকার করতে পারবে যে সেরকম কিছুই করেনি সে! বরং সোমেনের আগ্রহ তীব্র হবার সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠেছিল সে নিজেও। সুসময়ে যেমন হয়, শরীর জুড়ে চিনেছিল আসন্ন ভূকম্পন এবং যত দূর সম্ভব নিজের সমস্ত আকর্ষণ দিয়ে প্রশ্রয় দিয়েছিল সোমেনকে যাতে সে হয়ে ওঠে আরও প্রবল, আরও ক্ষিপ্ত, আরও ভয়ঙ্কর। আলো কিংবা অন্ধকার এইভাবেই বিচ্ছুরিত হয় শরীরে। নাকি সোমেন নয়, আসলে সেই মুহূর্তে শুধু স্পর্শ ও উত্তাপটুকুই ছিল তার কাঙ্ক্ষিত! সোমেন নয়, দীপঙ্করের ঠোঁটের ছোঁয়ায় যে-স্পর্শ তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল বিস্ফোরণের দিকে, অবচেতনার ধারাবাহিকতায় সেই বিস্ফোরণেরই শেষে পৌঁছুতে চেয়েছিল সে—স্বাদ পেতে চেয়েছিল অনাস্বাদিতের; ব্যর্থতাই শেষ পর্যন্ত চিনিয়ে দিয়েছিল সোমেনকে!

সেই মুহূর্তের প্রতিক্রিয়াগুলোকে এখন আর চেনা যায় না ঠিকঠাক। কেমন একটা গ্লানি ছড়িয়ে যায় মনে। আজ রাতের অন্ধকারে কুঁকড়ে-থাকা সোমেনের দিকে তাকিয়ে দুঃখবোধে ছেয়ে আসে মাথা—অস্পষ্টভাবে খেলা করতে থাকে চব্বিশ বছরের সব স্মৃতি, সব শূন্যতা। রুচি ঠিক বুঝতে পারে না, তবু মনে হয় তার একা হওয়ার মধ্যে সোমেনও ক্রমশ হয়ে পড়ছে একা। একাকিত্বের প্রমাণ তার কুঁকড়ে থাকায়, কাশিতে, ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরায়। প্রায় শব্দহীন নিঃশ্বাসে। মনে হয় একা হতে হতে এরই মধ্যে অনেকটা বয়স কমে গেছে সোমেনের। হতচকিত ও বিভ্রান্ত, যেন এক নাবালক ছেড়ে যেতে চাইছে তার অপরাধের খোলস—শাস্তির ভয় থেকে নিরাপত্তা খুঁজছে ঘুমের মধ্যে।

দূরত্ব থেকে ক্রমশ সোমেনের কাছাকাছি চলে এল রুচি। জড়তা কাটানোর জন্যে, অন্ধকারে, ওর মাথার কাছে এসে দাঁড়াল একটু। তারপর হাত রাখল সোমেনের মাথায়। এইভাবে একসময় তার আঙুলগুলো সচল হয়ে উঠল সোমেনের মাথার চুলে।

সোমেন পাশ ফিরল এবং মাথাটা এমনভাবে হেলিয়ে নিল বালিশে যাতে নিজের

বুদ্ধিতেই হাতটা সরিয়ে নেয় রুচি।

রুচি তা-ই করল। বাইরের আর্দ্রতা পাখার হাওয়াতেও সঞ্চারিত হয়েছে সম্ভবত, শীতশীত করে। খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সোমেনের পুনর্নিস্তব্ধতা লক্ষ করতে করতে রুচি বলল, 'শীত করছে? পাখাটা কমিয়ে দেব?'

সোমেন মাথা নাড়ল না, যার অর্থ, না।

'কাশছ তো?'

এবার আর জবাব এল না কোনও। ইঙ্গিতেও না।

বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির শব্দ আঁচড় কেটে যাচ্ছে জানলার কাচে। না দেখেও অনুমান করল রুচি, তখনকার বিবর্ণ হলুদরেখা সঙ্কেত জানিয়ে জড়ো করছিল আরও বেশি মেঘ, যাতে এইভাবেই শুরু হয় বৃষ্টি। শব্দটায় কান রেখে আস্তে আস্তে সোমেনের পায়ের দিকে হেঁটে এলো রুচি। বিছানার খালি জায়গাটুকু আন্দাজ করে বসল সেখানে, সোমেনের স্পর্শ বাঁচিয়ে কিন্তু নৈকট্যের মধ্যে। মাথা নামানো, হাতদুটো কোলের ওপর, নিঃশ্বাসে আলোড়ন নেই কোনও। হঠাৎ শব্দে মনে হল বাথরুমের দরজা খুলল শীমু। সামান্য সতর্ক হল সে। না, তা নয়। রাতের নৈঃশব্দ্যে দূরের শব্দও কখনও বা এসে পড়ে কাছে। বসে থাকতে থাকতেই একটানা বৃষ্টির শব্দের সুদূরতা আচ্ছন্ন করে ফেলে তাকে। মনে পড়ে কৌশিকের মুখ; আর কিছু নয়—এমনকী শূন্যতার ভাবনাও জলে ধুয়ে যেতে থাকে ক্রমশ। ওরই মধ্যে, মনে হয়, শিথিল শব্দে দূরে কোথাও বেজে যাচ্ছে টেলিফোন।

আস্তে হাতে সোমেনের পা ছুঁয়ে ফেলে রুচি, হাতের মধ্যেই চলে আসে ওর বুড়ো আঙুলের নখ ও গোটা পায়ের পাতা।

ওইভাবে, রুচি হঠাৎ বলল, 'তুমি কি জেগে আছ?'

পা-টা টেনে নিল সোমেন।

'একদিন কী বলেছি তাতে এত দোষ ধরছ কেন!'

'আমি কোনও দোষ ধরিনি।' বালিশে গোঁজা সোমেনের মুখ, হয়তো, ইচ্ছাকৃত। সেইভাবেই বলল, 'এই বয়সে দোষ গুণ ধরার সুযোগ থাকে না। তুমি তোমার কথা বলেছ—'

উদাসীন গলা সোমেনের; তাপ নেই, অভিমানও নেই। যেখানে থামল সেখানেই শেষ হয়ে গেল কথা। চোখ-সওয়া অন্ধকারে রুচি তার স্বামীর শুয়ে-থাকা কাঠামোটা লক্ষ করল। মানুষ এইভাবেই ঘুমোয়।

নিঃশ্বাসটা বেরুনোর মুহূর্তে চেপে দিল রুচি। আবার ফিরে গেল তার আগেকার ভঙ্গিমায়। মাথা নামানো, হাতদুটো কোলের ওপর, নিঃশ্বাসে আলোড়ন নেই কোনও। স্বগতোক্তির মতো কিছু কথা শুধু ঘোরাফেরা করতে লাগল তার গলায় ও বুকে, তার সমগ্র অনুভবের মধ্যে।

আমি খারাপ হয়ে যাচ্ছি, সোমেন। তুমি জানো না, কী ভয়ঙ্কর এক খেলায় জড়িয়ে পড়েছি আমি। কী যেন টানছে আমাকে। আমি জানি এটা অন্যায়, হয়তো বা পাপও। তবু—। তুমি কি দেখছ না কিছু। তোমার কি কিছুই করবার নেই?

রুচি আড়াল চেনে। শুধু মেয়েমানুষ বলেই নয়; নিজস্ব কারণেও। অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি তাকে আলাদা করে শিখিয়ে দেয় কিছু, চিনিয়েও দেয়। গোপনে, দিনের পর দিন, এইরকম চেনার ভিতর দিয়ে চলতে চলতে একদিন সেটাই হয়ে ওঠে প্রবণতা। কখনও দুর্বোধ্য লাগলেও ভালোবাসতে ইচ্ছে করে এই দুর্বোধ্যতা। টের পায় আকর্ষণের ভিতরেই বিস্তৃত হচ্ছে সহানুভূতি; মনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উন্মুখ হয়ে উঠছে শরীরও। ভিতরের টানাপড়েন যতই চুপচাপ করে দেয় তাকে ততই আড়াল খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। পেয়েও যায়।

প্রবণতাই চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল রুচিকে।

যে-কোনও দিন লক্ষ্ণৌ, দিল্লি যাবার কথা ছিল সোমেনের। সোমবার সকালের ফ্লাইটে চলে গেল সে। ঠিক কদিনের জন্যে বলে গেল না কিছু। সামান্য যে কটা কথা বলেছিল—বেশিটাই মেয়ের সঙ্গে, তা থেকেই বুঝে নিয়েছিল রুচি এবারের যাওয়াটা চার পাঁচ দিনের জন্যে। শুক্র কি শনিবারের মধ্যেই ফিরবে। রবিবার কৌশিকের কাছে যাবার দিন। অবশ্য সোমেনকেই যে যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। সোমেন ও রুচি দুজনেই যায় কখনও, শীমুও থাকে সঙ্গে। শুধু সোমেনই গেছে বা রুচি, এমনও হয়েছে। অফিসের কাজে প্রায়ই ট্যুরে যায় সোমেন, কখনও সখনও রবিবারটাও কাটিয়ে আসে বাইরে। তখন যা হোক একটা ব্যবস্থা করার দায় রুচির। শীমু চলে নিজের খেয়ালে। ওকে বাগ মানানো রুচির কাজ নয়—শাসনে কি কথাবার্তায় একটু এদিক-ওদিক হলেই মুখ ভার। ক্রমশ মুডি হয়ে উঠছে মেয়েটা, আত্মকেন্দ্রিক বলতে যা বোঝায় তা-ই। এমনিতে ভাই সম্পর্কে প্রচণ্ড দুর্বলতা; কিন্তু, মাঝে মাঝে ভাবে রুচি, বোধবুদ্ধির বয়সে পৌঁছবার পর এর ওর তার জন্যে দুর্বলতার ব্যাপারগুলোও হয়ে ওঠে আপেক্ষিক, আসল দুর্বলতাটা থাকে নিজেরই প্রতি। শীমুকেই কি ব্যতিক্রম বলা যাবে? প্রায় রবিবারই একটা না একটা অজুহাত থাকে ওর—এমনকী মা-বাবার সঙ্গী হলেও ব্যস্ত হয়ে ওঠে ফেরার জন্যে। অফিসের ড্রাইভারকে রবিবার আসতে বললে খুশি হয় না। এলেও ওভারটাইম দিতে হয় মোটা। সত্যি বলতে, শীমুর জন্যেই গাড়ি বের করতে হয় সোমেনকে, তেমন পছন্দ না করলেও ড্রাইভও করতে হয় নিজেকে। না হলে এখান থেকে যাবার ব্যবস্থা সুন্দর। নটা নাগাদ বাসে উঠে সোজাসুজি চলে যাওয়া যায়। দিব্যি, অনেকেই যায়; একই বাসে ফিরতে ফিরতে সাড়ে চারটে, পাঁচটা। রুচি বাসেই যায়। পরিচিত রাস্তায় এই একা যাওয়া এবং ফেরার সময়টুকু মনে হয় নিজের, একান্ত—এক ধরনের স্বাধীনতায় সাবলীল হয়ে ওঠে মন। কিছু বা আক্রান্ত হয়ে থাকে বিষাদে। কৌশিক এখনও তার মায়েরই ছেলে হয়ে আছে; শুধু মুখের আদলেই নয়, টানেও; ফেরার সময় প্রতি রবিবারই বলে, 'সামনের রবিবার তুমি আসবে তো, মা?' টানটা বোঝা যায়।

শুক্রবার দুপুরে সোমেনের অফিস থেকে ফোন করে জানাল ফিরতে আরও দু-চারদিন দেরি হবে ওর। এখন আছে আহমেদাবাদে, সেখান থেকে লক্ষ্ণৌ হয়ে দিল্লি যাবে। ফিরবে মঙ্গল কি বুধবার। আর্লিয়েস্ট মঙ্গলবার। প্রোগ্রামের হেরফের হলে জানাবে আবার।

ফোন করেছিল সোমেনের সেক্রেটারি মিসেস চোখানি। প্রৌঢ়া, হাসিখুশি মহিলা, দেখতেও সুশ্রী। অফিসেরই কোনও একটা ফাংশনে দেখেছিল একবার। নাকি কোনও দিন

নিউমার্কেট থেকে ফেরার সময় সোমেনকে তুলতে গিয়েছিল অফিস থেকে, সেই সূত্রে? আলগা পরিচয়ে ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না কোনও। খবরটা দিয়ে মিসেস চোখানি জিজ্ঞেস করল তারা কেমন আছে না আছে, বিকেলে তার সঙ্গে কথা হবে সোমেনের— মিস্টার ব্যানার্জিকে কিছু জানাবার থাকলে সে জানিয়ে দিতে পারে। নিছকই ভদ্রতা। তবু সন্দেহ হল রুচির, নির্দেশটা সোমেনেরই কিনা। ভাবল দু একটা মুহূর্ত। সত্যিই কি কিছু জানাবার আছে তার। তারপর বলল, তারা ভালো আছে, চিন্তার কিছু নেই—ঠিক কবে ফিরছে তা যেন জানিয়ে দেয় আগে, ইত্যাদি। 'রাইট', মিসেস চোখানি বলল, 'আই উইল টেল হিম এভরিথিং ইউ সেড।' তারপর চলে গেল অন্য কথায়। শীমুর কথা জিজ্ঞেস করল, কৌশিকের কথাও। কী পড়বে ও, এঞ্জিনিয়ারিং না ডাক্তারি? মিস্টার ব্যানার্জিকে বলবে ছেলেকে যেন ক্যানসার স্পেশালিস্ট তৈরি করে। ইত্যাদি। অল্প বয়সে মহিলার স্বামী মারা গেছেন ক্যানসারে—রুচির মনে পড়ল হঠাৎ, সোমেনই বলেছিল বোধহয়। মানে থাক না থাক, হয়তো এইভাবেই অবলম্বন খোঁজে স্মৃতি।

ফোন ছেড়ে দিয়ে শোবার ঘরে এল রুচি, যেখান থেকে উঠে গিয়েছিল—কী ভেবে শুল না আর। অনির্দিষ্ট কিছুর উদ্দেশে তাকিয়ে থাকল দূরে। মনে হয় খুব নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। শব্দটাই শুনল শুধু। তারপর শোবার ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। রেলিংয়ে দু হাতের ভর দিয়ে ঝুঁকে দাঁড়াল। এবং ভাবল, অন্যবার বেশি দিনের জন্যে বাইরে গেলে নিজেই ফোন করে সোমেন—রাতের দিকে কিংবা ভোরে; মিসেস চোখানির খবর নেবার অর্থ এবার হয়তো করবে না। করলে এই কথাগুলিই বলত। তফাত এইটুকু, দূর থেকে ডাকা তো শুধু কথা বলার জন্যেই নয়, যাকে বলছে তার গলা শুনতে পাবার জন্যেও। রুচিকে খুঁজত, তারপর শীমুকে। সোমেন নির্বোধ নয় যে, রাগ কিংবা অভিমান থেকে, শুধু শীমুকেই ডাকবে।

ছোট দুটো হাই উঠে এল গলায়। তিনটে বেজেছে কি বাজেনি, কিন্তু রোদ উপচে পড়ছে সর্বত্র। রোদের রঙই দুপুর চেনায়। কাল বিকেলের দিকে ধুলো জুড়োনো বৃষ্টি হয়েছিল অল্প; বেশ কয়েকদিন পরে সন্ধ্যায় তারা ফুটেছিল আকাশে। কাগজে দেখছিল বঙ্গোপসাগরের ওপর নিম্নচাপ না কী তৈরি হয়েছিল, সেটা এখন সরে গেছে বিহার ও মধ্যপ্রদেশের দিকে। তা-ই হবে, না হলে, ইদানীং যেমন হচ্ছিল, হালকা কিছু মেঘ অন্তত ভেসে বেড়াত আকাশে, রোদ্দুরও প্রখর হত না এত।

ঈষৎ ধাঁধা লাগায় মাথাটা অল্প ঝাঁকিয়ে নিল রুচি। একটু আগে সে বিছানায় ছিল, বাংলা খবরের কাগজটা তন্ন তন্ন করে পড়তে পড়তে তন্দ্রা এসেছিল সামান্য—আচমকা ফোনটা না এলে ঘুমিয়েই পড়ত এতক্ষণে। আয়নায় না তাকিয়েই বুঝতে পারে ঘোলাটে ভাব কাটিয়ে সাদা রঙ ধরেছে চোখে; এই অবেলায় আবার ঘুমোতে যাবার মানে হয় না কোনও। শীমু বলেছিল তাড়াতাড়ি ফিরবে। তাড়াতাড়ি মানে চারটে, সাড়ে-চারটে; দরজা তাকেই খুলতে হবে। সামনের রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুটি স্কুল-ছুটি হওয়া বালক। ইউনিফর্মটা চেনা। তাদের পাশ দিয়েই চাকায় শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল একটা খালি রিকশা। যতদূর দেখা যায় বালক দুটি এবং রিকশাটিকে অনুসরণ করল রুচি। এর পরে দেখতে পেল চিঠির বাণ্ডিল হাতে পোস্টম্যানকে। পাশের আগের বাড়ি থেকে চিঠি বিলি করে বেরিয়ে এলো রোগা লোকটি—চোখ তুলে তার দিকে তাকালেও মনে মনে একটা বাজি ধরল রুচি,

এ-বাড়িতে ঢুকবে না। কিংবা, ঢুকলেও, আরও সিওর হবার জন্যে নিজেকে শুধরে নিল সে—ব্যানার্জি নামাঙ্কিত তাদের লেটার বক্স টাঙানো আছে প্যাসেজের দরজার মুখে, বাড়িওলা কিংবা নীচের তলার ভাড়াটেদের লেটার বক্স দুটো সামনের দিকে, নিশ্চিত প্যাসেজের দিকে আসবে না। বাস্তবিক, আসবার কারণও নেই কোনও। ইলেকট্রিক আর টেলিফোনের বিল এসে গেছে কদিন হল; পরশু সন্ধ্যায় দীপঙ্করের ওখান থেকে তাড়াহুড়ো করে ফেরার পর আবছায়ায় চোখে পড়েছিল লেটার বক্সের ভিতরের সাদা। লক্ খুলে দেখল সাইক্লোস্টাইল করা ক্লাবের সার্কুলার। সুতরাং, আর কী আসতে পারে! হয়তো মাসের বাকি দিনগুলোও শূন্য হয়ে থাকবে লেটার বক্সটা। আলগা করে রাখা ব্লাউজের প্রথম হুকটা লাগাতে লাগাতে, আবার পোস্টম্যানকে পাশের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল রুচি এবং প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে আঁকড়ে ধরল বাজিটাকে। তাদের গেটের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটি, আঙুলের তৎপরতা বুলিয়ে গেল বাঁ হাতে ধরা চিঠির তাড়ায়, পিছন ফিরে কিছু দেখার ভঙ্গিতে আবার তাকাল তার দিকে। তারপর দ্রুত হেঁটে গেল সামনে। খুশিতে নিঃশ্বাস ছাড়ল রুচি। ঘরের ভিতর থেকে খরখরে শব্দ আসছে একটা—আড়ে তাকিয়ে বুঝল ফ্যানটা চলছে যেমন-কে-তেমনি, বিছানার ওপর থেকে উড়ে খবরের কাগজের পাতাগুলো গড়াগড়ি দিচ্ছে মেঝেয়। তাড়াতাড়ি ঘরে এসে দরজা বন্ধ করল সে। উড়ে-যাওয়া খবরের কাগজের দুটো বড় পাতার একটা সামনেই পেল, অন্যটা চলে গেছে খাটের নীচে—টেনে বের করল সেটা, দুটো একত্র করে ভাঁজ করে রাখল, তোবড়ানো বালিশটা যথাযথ করে গুছিয়ে রাখল বেডকভারের তলায়। এখন আরও কিছু করা দরকার। সুতরাং, সরে এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে।

নিজেকে আরও একবার দেখার মধ্যে আবিষ্কার থাকে না কোনও। তবু, যেভাবে সে দাঁড়িয়ে, মনে হবে এখন তার সব আগ্রহ ফিরে যেতে চাইছে প্রথম দেখার কৌতূহলে। ধরনটা অভিনেত্রীর। চোখের তারায় ফোটাতে চাইল বিভিন্ন দৃষ্টি, ঘাড়ে ভঙ্গিমা, নেমে আসা চুলের ঝুরি থেকে যতটা পারা যায় মুক্ত করে নিল কপাল, ঘাড় ফিরিয়ে বাঁ দিকে তাকাল, তারপর ডান দিকে, গলা তুলে দেখল কোথাও খাঁজ আছে কি না, শাড়ির আঁচলটা ফেলে দিল গা থেকে, আয়নায় স্থির চোখে তাকাল বুকের সেই জায়গায় যেখানে, কণ্ঠার নীচে, শুরু হয় স্তনরেখা—সামান্য ঔদ্ধত্য দেখিয়ে নিখুঁত আকার ফুটিয়ে তোলে মাংসের ঢল। দেখায় স্থিরতা থাকে না কোনও। পালকের ধরনে একটি একলা আঙুল ছুঁয়ে যায় তার চাপা চিবুক। নাকের পাটায় ছড়িয়ে পড়ে তাৎক্ষণিক আভা। এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অস্পষ্ট উচ্চারণে কেঁপে যায় পাতলা দুটি ঠোঁট। নিঃশব্দ পুনরাবৃত্তির গোপনতায় হঠাৎ শীত এসে কাঁপিয়ে দেয় রুচিকে। অনুভূতিটা চেনা; আজ, এই মুহূর্তে, আরও একবার চিনল।

যতক্ষণ একা ততক্ষণই সে হতে পারে যথেচ্ছ—প্রায় আচ্ছন্নতার ঘোরে ঘর থেকে বেরিয়ে, টেলিফোনটার দিকে এগোতে এগোতে, রুচি ভাবল, যা-কিছু আড়ালের তার সবই আনা যায় প্রকাশ্যে। ঢিমেতালে চলা সময়ও তখন এগিয়ে আসে পাহারা দিতে। কিন্তু, সত্যিই কি কোনও মানে আছে এই যথেচ্ছতার, এই প্রাচুর্যে ভরা সময়ের? হয়তো আছে, সে ঠিক জানে না। এমনও হতে পারে, এক অর্থহীন হওয়ার প্রবণতা থেকেই আস্তে আস্তে, কিন্তু ক্রমশ, সে পেয়ে যাচ্ছে নিজেকে; সোমেনের স্ত্রী এবং শ্রীময়ী, কৌশিকের মা হওয়ার গতানুগতিকতা থেকে—আরও কারও পরিচিত হওয়ার সম্পর্কশূন্যতা থেকে পৌঁছে যাচ্ছে

যা হতে পারত তা-ই হওয়ার দিকে। হয়তো। হয়তো যেটাকে ঠিক বলে ভেবে নিচ্ছে তার মধ্যেও কিম্ভূত এক অসারতা। বাস্তবিক, হওয়া কাকে বলে?

রিসিভার তুলে প্রয়োজনেরও বেশি সময় নিয়ে ডায়াল টোন শুনল রুচি। ছ'অঙ্কের নাম্বারটা গুছিয়ে নিল মাথায় এবং অল্প অস্বস্তি জড়ানো আঙুলে ডায়াল করল। রিং হচ্ছে। থেমে থেমে, মন্থর এবং দূরাগত এমন এক ধরনের শব্দে যে অধৈর্য অপেক্ষার মধ্যে রুচির মনে হল শব্দটা উঠছে তার নিজেরই ভিতর থেকে। সেই একই ধরনের শব্দ যা একদিন শুনেছিল গভীর রাতে, বৃষ্টির মধ্যে, সোমেনের পায়ের কাছে বসে, নিয়ন্ত্রণহীন অসহায়তার মধ্যে। মনে হয় বেজেই যাবে।

কেউ কি নেই তাহলে! নাকি আছে, কিন্তু এটা রুচিরই কল ভেবে তোলার আগ্রহ নেই কোনও! এমন কি হতে পারে যে ভেবে চিন্তে করলেও ভুল থেকে গেছে নাম্বারটার মধ্যে, পরিবর্তে পৌঁছে গেছে এমন কোনও নাম্বারে যেখানে কেউ থাকে না! এটা যে গোপন নাম্বার এবং 'ট্যু পার্সোনাল' বলেই সকলে জানে না, তা আগেই শুনেছে; কিন্তু এর আগের দিনও কি এই নাম্বারেই ডায়াল করার সঙ্গে সঙ্গে রেসপন্স্ পায়নি সে?

'হ্যালো!'

না, দীপঙ্কর নয়। হয়তো রং নাম্বার।

নিজে থেকে ছেড়ে দেবার আগে আর একটু অপেক্ষা করার কথা ভাবল রুচি। ওদিক থেকে ভেসে আসা কিছু খুচরো শব্দের সূত্রে মনে হল আরও কেউ কথা বলছে ওখানে। ভাষাটা ইংরিজিও হতে পারে।

'হ্যালো! কাকে চান?'

'এটা কি—'

রুচি জিজ্ঞেস করতে শুরু করেছিল, তার আগেই ওদিকের কণ্ঠস্বর বলল, 'ধরুন একটু।'

সম্ভাবনায় মিশে যায় রহস্য, ঠিক বাজি ধরার আগে যেমন হয়েছিল খানিক আগে। রুচিই জিতে যায়। আপাতত রিসিভারটা কানের গায়ে যতটা পারে ঠেসে ধরল সে।

'হ্যালো?'

এবারে আর ভুল নেই কোনও। না প্রশ্নে, না শোনায়, অল্প কেঁপে উঠল রুচি। তারপর বলল, 'ফোন ধরছিলে না কেন!'

দীপঙ্কর বলল, 'তুমি চাইছ তা কী করে বুঝব!'

'তা-ই?' রুচি ভাবল সে এখন নিজের বয়সে ফিরে যেতে পারে—তার একার সম্পর্কে, যেখানে সে রুচি ছাড়া আর কেউই নয়। কিছু বা এলানো গলায় বলল, 'তাহলে তোমার আগ্রহ নেই বলো?'

'আরে, না, না। এক্সপেক্ট করিনি।' দীপঙ্কর তাড়া দেখাল, 'প্লিজ। একটা ট্রাঙ্ককলে কথা বলছি—ধরবে একটু—?'

রিসিভারটা কান থেকে সরিয়ে গালে ঠেকাল রুচি। নিঃশ্বাস নিল এবং ফেলল। এখন এক থেকে গোনা শুরু করে এগোনো যায় সংখ্যা থেকে সংখ্যায়, যতক্ষণ না আবার ফিরে আসে দীপঙ্কর। সম্ভাব্য কোনও সংখ্যায় পৌঁছুনো গেল না; ভাবল, এত বেশি বাজি ধরা ঠিক নয়। তখন আনমনে তাকাল দূরে। দুপুর আর বিকেলের মাঝখানে নিশ্চয়ই আছে কোনও একটা সময়, যখন হঠাৎই রঙ বদলে ফেলে আলো; নির্দিষ্ট গতি পাবার আগে হালকা অনুশীলন

শুরু করে হাওয়া। সম্ভবত এখনই সেই সময়। এরপর বিকেল হবে, তারপর সন্ধ্যা, তারপর রাত। কেন জানে না, তার কাল রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে অনেকক্ষণ কান খাড়া করে রেখেছিল সে, যদি কোনও কারণে হঠাৎ বেজে ওঠে টেলিফোন। মিসেস চোখানির সঙ্গে কথাবার্তার পর আজ আর সে-দায় থাকবে না।

দীপঙ্করের ফিরে আসার অপেক্ষায় শান্তভাবে ওর কাছাকাছি পৌঁছে গেল রুচি। পুরু চামড়ার গদি মোড়া যে রিভলভিং চেয়ারটায় সে এখন বসে তার সামনেই আছে চামড়ার রঙের হাফ-সার্কল টেবিল, ওপরে কাচ বসানো। যে-টেলিফোনে কথা বলছে এখন তার রঙ সাদা। যে-টেলিফোনটা অপেক্ষা করে আছে রুচির জন্যে সেটার রঙ লাল। সামনে একই ধরনের কিন্তু ছোট মাপের চারটে চেয়ারের কোনওটিতে হয়তো বসে আছে কেউ—না হলে শুরুতেই অন্য গলা ভেসে আসবে কেন! সোজাসুজি তাকালে ক্রিম রঙের দেয়াল। সেখানে, দুই জানলার মাঝখানে, নিখুঁত মাপজোক করে বসানো চাইনিজ ফ্রেমের অয়েল পেইন্টিং। লতাপাতা, মোমবাতি ও স্বস্তিক চিহ্নের অ্যাবস্ট্রাকসন থাকলেও ন্যুড চিনতে অসুবিধে হয় না। দীপঙ্করকে বলবে ছবিটা পাল্টাতে, কেমন যেন চোখে লাগে। বাঁ দিকের দেয়ালের সঙ্গে একই রঙ দরজার হাতল ঘোরালেই থমকে যেতে হয় মানুষ-মাপের আয়নায়। তার আড়ালে রেস্টরুম—ওটা দীপঙ্করের ভাষা; রুচি বেডরুম বলেই চিনত।

'হ্যালো!'

'হুঁ।'

'সরি। তোমাকে অনেকক্ষণ ওয়েট করতে হল।'

'আর কে আছে ঘরে?'

'ঘরে!' অবাক হবার জন্যে থামল দীপঙ্কর। তারপর বলল, 'ওহ্, যে টেলিফোন ধরেছিল? ইনটিরিয়র ডেকরেটরের লোক। চলে গেছে।'

'ট্রাঙ্ককল কার?'

'নাগাল্যান্ড থেকে। বলেছিলাম না ওখানে আমার একটা কাজ চলছে? পরশু যাবার কথা ছিল—ক্যানেসেল করে দিলাম।'

'কেন!'

'কেন। মানে—', স্বর পাল্টে দীপঙ্কর বলল, 'আমার অপরাধটা কী? এত জেরা করছ!'

রুচি হাসল। অনুচ্চ শব্দের জের টেনে বলল, 'নিশ্চয়ই বলবে না আমার জন্যে?'

'হ্যাঁ, তোমারই জন্যে। অনেস্টলি। গেলে সাত দিনের আগে ফেরা যেত না?'

'কত মিথ্যে কথা বলবে!'

'বিশ্বাস করছ না!'

'এই বললে আমাকে এক্সপেক্ট করোনি—'

'আমি যে এত লাকি, তা ভাবব কী করে! সকালে প্রায় আধ ঘণ্টা—' অবশ্য সে-ফোনটা তুমি করোনি।'

'এক্সপেক্ট করছ না জানলে এটাও করতাম না।'

নিজের কথা শুনে নিজেই অবাক হল রুচি। এগুলো কি তারই কথা! সত্যি সত্যিই, মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে কী করে সে পৌঁছে গেল এতদূর সাবলীলতায়! নাকি এটাই তার স্বেচ্ছা রূপ—স্পর্শ থেকে আরও বেশি স্পর্শে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ক্রমশ খুলে যাচ্ছে তার এতদিনের

আড়াল।

আরও খুশি হল দীপঙ্কর জবাব দিতে পারছে না দেখে। অবশ্য টেলিফোনে বলেই স্বস্তি—সামনাসামনি নিশ্চয়ই এতটা স্বতঃস্ফূর্ত হতে পারত না সে। নিজেকে চেনে; নিজের ভঙ্গুরতাকেও। স্পর্শই স্তব্ধ করে দেয়।

'কী হল!' রুচি বলল, 'চুপ করে গেলে কেন!'

'কী বলব ভাবছি।'

'তুমি তো বলো না । বলো কি?'

'রুচি, প্লিজ!' হাল-ছাড়া ভাব করল দীপঙ্কর, 'তোমার কোনও সাজেসানই আমি ধরতে পারছি না।'

'পারবে কী করে! পাওয়া যখন সহজ হয়ে ওঠে তখন পরীক্ষা দেবার ব্যাপারটা কারুরই মনে থাকে না। পেয়েছিলে আভার মতো বউ, তাই জীবনটাও সহজ হয়ে গেছে তোমার কাছে। কী, ঠিক বলেছি তো?'

দীপঙ্কর ইতস্তত করল। রুচি হেঁয়ালি করেছিল—কতকটা না বুঝে; তাও।

'পরীক্ষার কথাটা আসছে কেন!'

পরের কথাটা চটপট মুখে আনার জন্যে তৈরি হচ্ছিল রুচি; ঠিক সেই সময়েই কলিং বেল বেজে উঠল দরজায়। অল্প ত্রাস ফুটল রুচির মুখে, বিরক্তিও। কে হতে পারে! হিসেবমতো শীমুর ফেরার দেরি আছে এখনও। সাধারণত যে সময় বলে যায় ও, ফেরে তার চেয়ে দেরিতে। আর কে হতে পারে? নাকি, ব্যাঘাত ঘটাবে বলে, শীমুই নিয়ম ভাঙল।

যে ডাকছে সে অপেক্ষা করতে রাজি নয়। বেলটা আবার বেজে উঠল সজোরে।

আশঙ্কায় খেই হারিয়ে ফেলল রুচি। নিরুৎসাহের গলায় বলল, 'শোনো, এবার তোমার পালা। ফোনটা ধরে থাকো। কে যেন বেল দিচ্ছে দরজায়—'

'শুনতেই পাচ্ছ।' দীপঙ্কর বলল, 'যাও, দেখে এসো।'

রিসিভার আড়াআড়ি নামিয়ে রাখতে গিয়েও দ্বিধা বোধ করল রুচি। আবার তুলল।

'হ্যালো?'

'কী হল!'

'কিছু নয়। বলছিলাম, যদি শীমু হয়, তাহলে এখন আর কথা বলব না। তুমি কিছু মনে কোরো না—'

'ও-কে, মাই ডিয়ার লেডি। ও-কে।'

আবার বেল বাজায় রুচি ধরে নিল শীমু হতে পারে না। যেই এসে থাকুক, তার সভ্যতাবোধ কম। ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত হেঁটে গিয়ে দরজা খুলল সে এবং প্রায় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকল আগন্তুকের দিকে।

'এখানে একটা বড় মেয়েছেলে কাজ করে?'

একটি যুবতী, হাবভাব ও পোশাকে নোংরা। দেখে ঝি-টি ছাড়া কিছুই মনে হয় না।

বিরক্ত চোখে মেয়েটিকে দেখতে দেখতে রুচি বলল, 'কে বড় মেয়েছেলে?'

'ওই যে গো! কালো, বেঁটে মতো—নাকছাবি আছে।'

'না, এখানে ওরকম কেউ কাজ করে না,—', বলতে বলতে রুচি লক্ষ করল, এই মেয়েটিও কালো এবং বেঁটেই বলা যায়, যদিও নাকছাবি নেই নাকে। বিরক্তিটা পরিণত হল

রাগে। প্রায় চেঁচিয়ে বলল, 'এখানে ঢুকে পড়েছ কেন! যাও!'

ধমক শুনে দু পা পিছিয়ে গিয়ে ঢ্যাঁটার ধরনে দাঁড়াল মেয়েটি।

'আমাকে এই বাড়ি দেখিয়েছিল।'

'বলছি তো, এখানে কোনও মেয়েটেয়ে কাজ করে না। যাও এখন—'

রুচি দরজা বন্ধ করতে উদ্যত দেখে বিশ্বাস-অবিশ্বাস মেশানো চোখে ওকে দেখতে দেখতে সিঁড়ি ধরল মেয়েটি এবং নামতে নামতেই উদ্ধত গলায় বলল, 'ঠিক আছে। ও শালা হারামি মাগী আমার চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় যায় দেখে নেব—'

মেয়েটি নেমে যাচ্ছে এবং নামতে নামতেই চ্যাঁচাচ্ছে। দোতলা থেকে একতলার সিঁড়ি পর্যন্ত ওর কর্কশ কণ্ঠস্বর অনুসরণ করল রুচি। দরজা বন্ধ করে দাঁড়াল একটু। চাপা উত্তেজনায় ইতিমধ্যেই ঘাম ফুটেছিল অল্প; আঁচল তুলে বুলিয়ে নিল কপালে ও গলায়। তারপর ফিরে এলো।

আবার 'হ্যালো' বলবার আগেই দীপঙ্কর বলল, 'বুঝেছি। তোমার মেয়ে নয়।'

'কী করে বুঝলে!'

'তোমার গলা শুনে।'

রুচি বিব্রত হল। লজ্জিত ভাবে বলল, 'বাজে কথা! আমার গলা তুমি শুনতেই পারো না। দরজা এখান থেকে অনেক দূরে—'

'বড় দানার চিনি দাঁতে আটকালেও মিষ্টিই থাকে।' দীপঙ্কর বলল, 'আমি কান খাড়া করেই ছিলাম। ভাবছিলাম এরপর থেকে আমাকেও সাবধান হতে হবে।'

'সত্যি, কী বাজে ব্যাপার! একটা উটকো, বস্তির মেয়ে ঢুকে পড়েছিল—কাকে না কাকে খুঁজতে! নীচের দরজাটা এবার থেকে বন্ধ রাখতে হবে।'

'বলো কী! তাহলে আমার কী হবে! সেদিন কত সহজে ঢুকে পড়েছিলাম।!'

দীপঙ্করের কথা, কিছু ছিল হয়তো, রুচি আড়ষ্টতা চিনল। সেদিন সকালে, যখন সোমেন বাড়ি নেই, শীমুও বেরিয়ে গেছে কলেজে, দু বার টেলিফোন প্রত্যাখ্যান করার পব তৃতীয় বারের কথাবার্তায় সে শুধুই স্বাভাবিক হতে চেয়েছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। কিংবা, সম্ভবত, সহজ হবার তাগিদেই ঠাট্টা করেছিল দীপঙ্করের দুর্বলতা নিয়ে; জানে তো, ইয়ার্কি-রসিকতা তাদের সকলের মধ্যেই চলে। প্রশ্রয়টা তার দিকে থাকলেও, বস্তুত, দীপঙ্কর যে এতটাই সিরিয়াস এবং এখন বলতে এখনই চলে আসবে 'ক্ষমা চাইতে', একবারও তা ভাবেনি। অপ্রত্যাশিত বলেই দরজায় দীপঙ্করকে দেখে কাঠ হয়ে গিয়েছিল সে। কথা ফোটেনি মুখে। দীপঙ্কর কি জানত না, যে-অনুভূতি ক্ষমার মধ্যে দিয়েই হয়ে ওঠে অনুভূতি এবং ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে কিছু বোঝা, কিছু না-বোঝা আরও নানা আবেগে, তার জন্যে ক্ষমা চাওয়ার প্রশ্ন থাকে না কোনও! এমনও হতে পারে, প্রশ্রয়ের মধ্যেই দুর্বলতা চিনেছিল দীপঙ্কর—ইচ্ছে করেই ঝুঁকি নিয়েছিল। এর চেয়ে বড় ঝুঁকি কি সে আগেই নেয়নি!

দৃশ্য যত না দেখায় খুলে দেয় তার চেয়ে বেশি। চেয়ে থাকার অর্থই দেখা নয়। বরং দৃশ্যে চোখ রাখার একাগ্রতা থেকে দৃষ্টিটা ফিরে আসে নিজেরই দিকে—নিজের ভিতরেই বেরিয়ে পড়তে হয় সরেজমিন তদন্তে। এই মুহূর্তে, কানে রিসিভার লাগিয়ে, দীপঙ্করের কথা শুনতে শুনতে, কিছু বা অন্যমনস্ক রুচি অন্ধকারে দেরাজ ঘাঁটার মতো করে ঘাঁটতে লাগল নিজেকে এবং ভাবল, খামোকা এতদিন ধ্রুবর ফ্ল্যাটের ঘটনাটাকে গুরুত্ব দিয়েছিল সে। না কী যা

ভাবছে তার মধ্যেও থেকে যাচ্ছে ভ্রান্তি, দীপঙ্করও উপলক্ষ—যা ঘটবে তার প্রস্তুতি অনেক আগে থেকেই ছিল তার মনে!

ওদিক থেকে অধৈর্য ভঙ্গিতে 'হ্যালো' 'হ্যালো' করে যাচ্ছে দীপঙ্কর। সেকেন্ড নয়, এর মধ্যে মিনিটও পার হয়ে গেছে হয়তো।

স্তব্ধতা থেকে নিজেকে বের করে আনল রুচি।

'এত ইমপেশেন্ট কেন তুমি!'

'তাই বলো!' দীপঙ্কর বলল, 'আমি ভাবলাম ছেড়ে দিলে!'

'এটা আমার কল। আমিই ছাড়ব। যদি না—'

'কী?'

'আমারও ট্রাঙ্ককল আসতে পারে।'

কথাটার কী অর্থ হতে পারে ভাববার সময় নিল দীপঙ্কর। গোড়ার দিকে যেমন ছিল এখন আর তা নেই, কিছু বা বিষণ্ণতা ঘন করে তুলেছে রুচির কণ্ঠস্বর। ভেবেচিন্তে জিজ্ঞেস করল, 'সোমেন কি কালই ফিরছে?'

'জানি না।'

'তুমি সেরকমই বলেছিলে?'

রুচি হাসল। তারা দুজনেই প্রাপ্তবয়স্ক এবং বিবাহিত। তবু, পরশু বিকেলে সে যখন দীপঙ্করের সঙ্গে ওর প্রাইভেট চেম্বারের সিঁড়ি দিয়ে উঠছে, তখন দীপঙ্করের মুখের ভিতু-ভিতু ভাব লক্ষ করে মনে হয়েছিল এই প্রথম কোনও নারীর সান্নিধ্যে এল! হাত দুটো কোথায় রাখবে এবং কীভাবে ব্যবহার করবে, তা নিয়েও অনিশ্চিত। নাটকে যখন তারা স্বামী-স্ত্রী—তখনও এইরকম করেছিল দীপঙ্কর; রিহার্সালে ঠাট্টার উত্তরে বলেছিল, স্টেজে ঠিক হয়ে যাবে। স্টেজে ঠিক হয়নি। হয়নি বলেই পার্ট ভুলে যায় এবং তা নিয়ে অনেক হাসাহাসি হয় পরে। তফাত এইটুকু, যা দেখার রুচিই দেখেছে। ভয় সে নিজেও পেয়েছিল। পরে, দীপঙ্করের সঙ্গে একই সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, অবসাদ ও স্মৃতির আচ্ছন্নতায় একা হতে হতে ভেবেছিল, সে নিজেও বিবাহিত; চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা ওঠার সময় যেমন তার সঙ্গী হয়েছিল, তেমনি নামার সময়েও; ভেবেছিল, তার স্বামীর নাম সোমেন—সোমেনের মেয়ে ও ছেলের নাম শ্রীময়ী এবং কৌশিক; তবু অভিজ্ঞতাই সব নয়। একই শরীর কথা বলতে পারে বিভিন্ন ভাষায়, এটা সে জানত না।

ইচ্ছা ও অনিচ্ছার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এখনও এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করল রুচি এবং বলল, 'কবে ফিরলে খুশি হও তুমি?'

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল দীপঙ্কর। তারপর চুপ করে থাকল।

সোজা কথায় ফিরে এল রুচি।

'ওর সেক্রেটারি ফোন করেছিল। মঙ্গল, বুধবারের আগে ফিরবে বলে মনে হয় না।' বলতে বলতেই থামল এবং বলল, 'নিশ্চয়ই খুশি হলে?'

'না। ঠিক তা নয়।' থামার ধরনে মনে হল পরের কথাটা আগেই ভেবে রেখেছিল দীপঙ্কর। হঠাৎ বলল, 'রুচি, আমি আসব এখন?'

'পাগলামি কোরো না।'

'কেন. মোটে তিনটে চল্লিশ। দশ মিনিটে চলে আসব?'

'না। শীমু ফিরে আসবে এখুনি।'

'ওফ! সোমেন—শীমু—! কী শুরু করলে বলো তো!'

'কেমন। বোঝো এবার।' শব্দ করে হেসে উঠল রুচি। অনেকক্ষণ পরে আবার সাবলীলতা এসে গেল তার গলায়, 'অন্যের বউয়ের সঙ্গে প্রেম করার ফ্যাসাদ বুঝতে পারছ এখন! নিশ্চয়ই ভেবেছিলে আমি তোমার এক্সক্লুসিভ?'

কথাটা এড়িয়ে গেল দীপঙ্কর। বলল, 'কাল ঝামেলা আছে। পরশু? রবিবার—ক্যান উই মিট?'

'কী করে! পরশু কৌশিকের কাছে যেতে হবে—'

'ঠিক আছে। লেটস ডু ওয়ান থিং। সোমেন নেই—আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ওখানে। ইন মাই কার। কৌশিক জানতে পারবে না। তুমি যদি দেখা করার ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি সেরে নিতে—'

'তা হয় না। শীমুও যাবে সঙ্গে।'

'তা হলে—!' কিছু ভাববার সময় নিল দীপঙ্কর। ইতস্তত করে বলল, 'একটা রবিবার বাদ দেওয়া যায় না?'

'কী বলছ তুমি!' রুচি হঠাৎই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। সেইভাবেই বলল, 'সেলফিস!'

'রুচি। প্লিজ!'

'প্লিজ বলে কী হবে!'

'আই ডিডনট মিন ইট। আমি তোমাকে হার্ট করতে চাইনি। প্লিজ!'

অনুনয়ে অপ্রস্তুত স্বর দীপঙ্করের, এমনই যে মনে হয় সামনে থাকলে হাঁটু গেড়ে বসত। রুচি ভাবল, যা বলেছে তা কথার কথাও হতে পারে—শব্দও প্রতারণা করে মাঝে মাঝে, হঠাৎ, অসাবধানেই হয়তো, যে-কথাটি আসার নয়, সেইটাই এসে যায় মুখে—হয়তো সত্যিই কিছু ভেবে বলেনি দীপঙ্কর। তা ছাড়া, এ-কথাও ভাবল সে, মিসেস চোখানির ফোনটা আসবার পরই যে সে দীপঙ্করকে ফোন করার কথা ভেবেছিল, তার পিছনেও কি উদ্দেশ্য ছিল না কোনও? তখনই অবশ্য রবিবারের ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। শীমুর কথাও না। শনিবার দীপঙ্কর ব্যস্ত থাকবে, সুতরাং রবিবার; এদিকে রবিবারটা কৌশিকের জন্যে বরাদ্দ। তবু, কৌশিকের সঙ্গে দেখা করেও, সে বের করে নিতে পারত নিজের জন্যে কিছুটা সময়—সল্ট লেকে মা-র সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া বা ওই ধরনের কোনও অজুহাতে; বস্তুত তার নিজেরও জীবন আছে একটা। তা ছাড়া দীপঙ্কর নিজেই তাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল কৌশিকের কাছে, তারই গাড়িতে। সম্ভবত 'সেলফিস' বলা উচিত হয়নি।

এইভাবে যুক্তি সাজালেও নিজেকে ফেরাতে পারল না রুচি। স্ফূর্তিটা নেই আর। কেমন একটা তিতকুটে স্বাদ এসে গেছে। দীপঙ্করকে সে সেলফিস বলতে চায়নি; কিন্তু বলার পর থেকেই মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ হল, আর ভালো লাগছে না কথা বলতে। এবার থামা দরকার।

ওদিকে দীপঙ্কর। কোনও একটা অজুহাত খুঁজতে হয় এখন। এমনিতেই বিষণ্ণতা ছুঁয়ে যাচ্ছিল রুচিকে। বলল, 'ওভাবে বলছ কেন। আমি হার্ট হইনি—'

'প্রমিস?'

'হ্যাঁ।'

'বাঁচালে!' দীপঙ্কর হালকা হয়ে এল। বলল, 'এটা বলতে যা সময় নিলে, মনে হচ্ছে ডাক্তার দেখিয়ে এলে—'

'নিজের ডাক্তারি নিজে করলে ক্ষতি কী!' একটু থামল রুচি। সুযোগ বুঝে বলল, 'আমি এবার ছাড়ছি। পরে কথা হবে।'

'কেন!'

রুচি চুপ করে থাকল।

'হ্যালো। শীমু এসে গেল নাকি?'

'ঠিকই ধরেছ।'

'তাহলে—'

'হ্যাঁ। পরে—!'

নিজে বললেও ওদিকে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দটা না শোনা পর্যন্ত অপেক্ষা করল রুচি। তারপর নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে শুনতে টেলিফোন ছাড়ল।

চারটে বাজেনি এখনও। চার দেয়ালের আবদ্ধতায় আকাশ ঢোকে না, তবু আলো চিনতে অসুবিধে হয় না। যখন শুরু করেছিল তখন যেমন আর যতটা ঔজ্জ্বল্য ছিল এখন আর তা নেই। সম্ভবত বেলা পড়ে আসছে, নিজস্ব আভা নিয়ে উঠে আসছে বিকেল। সন্ধে হতে না হতেই ছায়া ঢুকে পড়ে এখানে। আলো না জ্বাললে, কিংবা যখন লোডশেডিং থাকে, ওই একটা সময় ঠিক ভৌতিক নয়, কেমন যেন ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে। প্রায় দিনই বাড়িতে কেউ থাকে না তখন। দিলীপ ফেরে ওই সময়টা পার করে—অবশ্য কাছেপিঠে আরও কেউ আছে এই আশ্বাসটুকু ছাড়া দিলীপের থাকা না-থাকায় যায় আসে না কিছু; তারপর শীমু, সোমেন ফেরে আরও দেরিতে। হঠাৎ মন খারাপের মধ্যে, কে জানে কেন, এই ভর বিকেলেই সেই অন্ধকার ডেকে আনল রুচি।

আবার ফিরে এল শোবার ঘরে। সামনে বিছানা দেখলেই ইচ্ছে করে গড়াতে। বুদ্বুদের ধরনে পর পর হাই উঠে আসে গলায়। এখন গড়ালে ঘুমিয়েও পড়তে পারে ভেবে শুল না। শীমুর ঘরে ঢুকে খুঁজে পেতে দেশ আর ইলাসট্রেটেড উইক্‌লি পেল, শীমুর পড়ার টেবিলেই ঝুঁকে বসে কোনটা পড়বে না-পড়বে ভেবে পাতা উল্টে গেল দুটো কাগজেরই। মন বসল না। আসলে সে নিজেকেই পড়ছিল। কখনও কখনও এমন হয়—সময়ই হয়ে ওঠে উপমা। ইচ্ছে করে তার মধ্যে নিজেকে প্রোথিত করে রাখত। রুচি একটা নির্জন দুপুরের কথা ভাবল, তারপর এক নিস্তরঙ্গ পুকুরের কথা—সমাহিত তার জল কেঁপে উঠল উড়ন্ত পাখির ডানা থেকে খসে পড়া পালকের স্পর্শে। কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর পালকটা ভাসতে থাকল অপ্রয়োজনীয় হয়ে—পুকুর ফিরে এল তার নিস্তরঙ্গে। এরকম আরও।

মন খারাপ থেকেই ছড়িয়ে পড়ে আরও নানা ভাবনায়। স্মৃতিতেও। স্থির থাকতে পারে না কোথাও।

টেলিফোনে কথা বলতে বলতে এরকম অনিচ্ছা থেকেই থেমে যেতে চেয়েছিল সে—একটা অজুহাত খোঁজার কথা ভেবেছিল। কিন্তু, কী অদ্ভুত ব্যাপার, শেষ পর্যন্ত সে নিজে কিছু ভেবে ওঠার আগেই দীপঙ্কর ধরে নিল মেয়ে এসে পড়ায় আপাতত রুচির পক্ষে আর এগোনও সম্ভব নয়। কোনওরকম জোরজারি করল না। এই ঘটনাই কি প্রমাণ করে না যে দীপঙ্কর তার কথা ভাবে, সে অসুবিধায় পড়তে পারে এমন কিছুই করতে চায় না। এবং

দীপঙ্করের অনুমান মিথ্যা জেনেও সামান্য দ্বিধা না করে সে নিজেও সায় দিল কথাটায়—'ঠিকই ধরেছ', বলল, যাতে ব্যাপারটা ওইখানেই থেমে যায়। হয়তো আরও কিছু বলত দীপঙ্কর, রবিবারের অসুবিধের কথা মনে রেখে তাড়াতাড়ি দেখা হওয়ার আর কোনও উপায় ভেবে নিত হয়তো, বলতও তাকে। এমন কি হতে পারে যে, যেমন নাগাল্যান্ডে যাবার প্রোগ্রামটা ক্যানসেল করে দিল, তেমনি শনিবারের ঝামেলাটাও কাটিয়ে উঠত দীপঙ্কর এবং যেভাবে বলে, বলত, ডোনট ওয়ারি, আই উইল ম্যানেজ। তাহলে কাল—?

এই ভাবেই ভাবা যায়। হয়তো বলত, বলত নয়; সম্ভাবনাটা ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি থাকলেই হানড্রেডের দিকে এগোনরও চেষ্টা করা যায়। এখন যেভাবে হঠাৎ শেষ করে দিল সে, তাতে সমস্ত সম্ভাবনাই ফিরে এসেছে শূন্যে। শেষপর্যন্ত যেভাবেই কথা শেষ করে থাক দীপঙ্কর, সংযোগ হারিয়ে যাবার পর ও কি ভাববে যে কৌশিকের কাছে যাওয়া, কিংবা তাকে সেলফিস বলা এবং তার পরের নৈঃশব্দ্য—সমস্ত ঘটনার মধ্যেই ধরা পড়েছে তাব সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারে রুচির অনাগ্রহ, রুচি হয়তো উৎসাহ পাচ্ছে না আর!

সেজন্যেও নয়। পরের ভাবনাটায় ঢুকতে ঢুকতে রুচি ভাবল, যদি কখনও, কোনও কারণে দীপঙ্কর জেনে ফেলে যে শীমুর এসে পড়াটা মিথ্যে, একটা অজুহাত দেখিয়ে কথা বলা বন্ধ করেছিল রুচি, তাহলে তার সম্পর্কে কীরকম ধারণা হবে দীপঙ্করের! যাব জন্যে হঠাৎ হলেও সারাক্ষণ টান অনুভব করছে এত, যার জন্যে জরুরি কাজ থাকা সত্ত্বেও ক্যানসেল করল নাগ্যাল্যান্ডে যাওয়া, যার জন্য, হয়তো, এবং যতই গোপন কবে রাখো, বাড়িতেই ভোগ করছ অশান্তি—প্রবল উন্মাদনায় মুখ রেখেছ যার ঠোঁটে ও বুকে, যাব শরীরের বিদ্যুতে ঝলসে যেতে যেতে বলেছ এই অবস্থাতেই মৃত্যুর কথা ভাবা যায়—আই উড লাইক টু ডাই লাইক দিস্; অর্থাৎ, যে তোমাকে এনে দিচ্ছে পৌরুষের পূর্ণতা, তার মধ্যে কোথাও আছে ছোট্ট একটু মিথ্যা, যা মুহূর্তেই ধসিয়ে দিতে পারে সব ভাবনা, সব সম্ভাবনা, সব নির্ভরতা!

যে-আহ্লাদ থেকে খানিক আগে প্রায় অকারণ কথা বলতে শুরু করেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে এবং কথার পিঠে কথা সাজিয়ে—তার অনেকগুলিরই কোনও মানে নেই জেনেও—উজাড় করে দিচ্ছিল নিজেকে, সেই আহ্লাদই যে শেষ পর্যন্ত গভীর ভার হয়ে চেপে বসবে বুকে তা ভাবতে পারেনি। চিন্তায় বিষাদ ঢুকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল রুচি এবং ভাবল, সময় আছে এখনও, কতক্ষণ আর কেটেছে ইতিমধ্যে যে আবার টেলিফোন করে বলতে পারবে না, যা বলেছিলাম সব মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে। আর তুমিই বা কেমন, বিড়ালের স্বভাবে মুখ মুছে নিলে হঠাৎ, যেন নাগাল্যান্ড বা আর কোথা থেকে বিজনেস কল এসেছিল একটা—ঝুপ্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখতে দ্বিধা হল না একটুও! আশ্চর্য, এই নাকি চুম্বক কাজ করছে আমাদের মধ্যে!

বুকের মধ্যে রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেল রুচি এবং সত্যি সত্যিই হেঁটে গেল টেলিফোনের দিকে। রিসিভারটাও তুলে নিল হাতে। ডায়াল করতেও শুরু করেছিল, কিন্তু, চতুর্থ সংখ্যার আধাআধি পৌঁছেই অদ্ভুত স্তব্ধতায় থেমে এল আঙুল। এইভাবে, ক্রমশ, নিজের মধ্যেই থেমে এল সে। হাত-পা ঠাণ্ডা হল না, কিন্তু, অনুভব করল, নিজেকে বড় বেশি খেলো করে ফেলছে সে। করছে না কি? আরও একবার ফোন করে কী প্রমাণ করতে চাইছিল সে, কার কাছে? কেন?

রুচি ফিরে এল। শোবার ঘরের ভিতর দিয়ে, দরজা খুলে, আবার সেই বারান্দায়—দুপুরের রোদ মুখে নিয়ে যেখানে থেকে বাজি ধরতে শুরু করেছিল। রেলিং ঘেঁষে দাঁড়াল। সামনে তাকিয়ে পরিষ্কার চোখে রাস্তাই দেখতে লাগল। রোদ চলে গেছে কখন। ছায়া-ছড়ানো রাস্তা জুড়ে ব্যস্ততা—বিশেষ কোনও দৃশ্য, গাড়ি বা মানুষের মুখে স্থির থাকছে না চোখ, মনে হচ্ছে যা দেখছে তার সবই পরস্পর-সংলগ্ন। এমনকী তার দিকে ফিরে দেখার চেষ্টা নেই কারও, চিঠির তাড়া হাতে ডাকপিওন নেই। নীচে ছোট ঘাসজমি ও বাগানের পাশে পেরেম্বুলেটরে গ্রাউন্ড ফ্লোরের বাচ্চাটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আয়া। শিশুটিই আগে দেখেছিল বলে মাঝবয়েসী আয়াটিও চোখ তুলে তাকাল রুচির দিকে, ভাঙা-ভাঙা গলায় বলল, 'আন্টিকো টা-টা করো বেটা।' ভঙ্গিটা তৈরি হয়েই ছিল: ছোট্ট ও গোল ও ঈষৎ গোলাপি মুঠো নেড়ে পেরেম্বুলেটরের মধ্যেই নড়াচড়া করে এক মুখ হাসি দিয়ে রুচির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল শিশুটি। একসঙ্গে থাকতে চেনা হয়ে যায় একরকমের—হাবলা-গোবলা বাচ্চাটিকে শীমুও কখনও সখনও তুলে নিয়ে আসে ওপরে। কোলে নেবার ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়ে রুচি দেখল পেরেম্বুলেটরের ঠেলায় চলে যেতে যেতেও টা-টা করে যাচ্ছে শিশুটি এবং সে নিজেও বাড়িয়ে আছে দুটি হাত, অভ্যাসে—মনে পড়ায় চট করে বাড়ানো হাত দুটি গুটিয়ে নিল রুচি। লেকের দিকেই যাচ্ছে এখন। দু দিক দেখে পেরেম্বুলেটর নিয়ে রাস্তা পার হল আয়াটি। বাঁ দিকে মোড় ঘুরতেই আর দেখা গেল না ওদের।

রুচি ভাবল, সত্যি সত্যিই কোনদিকে যাচ্ছে তারা! এতক্ষণ যেভাবেই ভাবুক না কেন, অসাবধানে বললেও একটা রবিবার বাদ দেবার কথা দীপঙ্করই বলেছিল; এমন কী, নিজের গাড়িতে নিয়ে যাবে বলেও জুড়ে দিয়েছিল আরও একটা শর্ত—যেটা অবশ্যই স্বার্থপরের ভাবনা ছাড়া কিছু নয়, অর্থাৎ, কৌশিকের সঙ্গে দেখা করার ব্যাপারটা রুচি যদি তাড়াতাড়ি সেরে নিতে পারে, ইত্যাদি। কৌশিক তারই ছেলে—তার এবং সোমেনের, দীপঙ্করের নয়; গোটা সপ্তাহ বেচারা ছেলেটা অপেক্ষা করে থাকে রবিবারের জন্যে। দেখা করাটা তাড়াতাড়ি সারবে, না তার এবং কৌশিকের যেমন ইচ্ছে তেমনি, প্রয়োজনে দেরিতে, স্কুলের নিয়ম মেনে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত, সেটা রুচিরই ভাবার কথা, দীপঙ্করের নয়। তা হলেও কী করা যেতে পারে না পারে তা নিয়ে পরামর্শ দিয়ে দীপঙ্কর কি প্রভাব খাটাতে চেয়েছিল তার ওপর? এমন কি ভেবেছিল যে একটা ছেলে যখন আছেই তখন—যেহেতু মা—সেই ছেলে সম্পর্কে কিছু না কিছু টান ও চিন্তা থাকবেই, যাওয়াটা আটকানো যায় না। কিন্তু যাওয়া মানেই আটকে পড়া নয়। রুচিকে সারাক্ষণই ভাবতে হবে দীপঙ্করের কথা—সময়ের বেশিটাই যেন দীপঙ্করের ভাগে পড়ে, যাতে রুচিকে নিয়ে যথেচ্ছ হতে পারে সে?

আশ্চর্য! বারো কি পনেরো দিন আগে হলে সে কী করবে না করবে তা নিয়ে কোনও পরামর্শই দিতে পারত না দীপঙ্কর। আজ দিচ্ছে। যেহেতু নাগাল্যান্ড যাওয়া বাতিল করলে—সত্যি মিথ্যে জানি না, ফোনে তাই বলেছিলে—সুতরাং, ধরেই নিচ্ছে রুচির পক্ষেও একদিন ছেলেকে ভুলে থাকা কি আর এমন শক্ত! তাই কি? মনে হয় ভিতরে কোথাও একটা জোর পেয়ে গেছে দীপঙ্কর। এমন কোনও ধারণা তৈরি হয়েছে ওর মনে যে অ্যাজ ইফ ওর ইচ্ছের সঙ্গেই তাল রেখে চলা উচিত রুচির। আর সবাই—অর্থাৎ কৌশিক বা শীমু, কিংবা সোমেনও—এখন রুচির অবসরের দায়। এমন ধারণা কি করে হল

দীপঙ্করের। না তার সম্পর্কে দুর্বলতা দেখিয়েছে রুচি এবং নিজেকে আগলে রাখতে পারেনি বলেই, গোপনে, এগিয়ে গেছে আরও। কিন্তু, দীপঙ্করের ভাবা উচিত, দুর্বলতা তার দিক থেকেই এসেছিল প্রথম। নিজেকে জানানোর দুঃসাহস হয়েছিল বলেই আমাকেও জানলে। তোমার তা-ই ধারণা, দীপঙ্কর, হয়তো আমারও। হয়তো বলছি শুধু এই জন্যেই যে এখনও জানি না ঠিক কী দিয়েছি তোমাকে। আমি নিজেই বা কী পেয়েছি। শরীর? সে তো বাথরুমের দরজা খোলা আর বন্ধ করার মতো—ইচ্ছা আর অনিচ্ছার মতো, হেরফেরে পাওয়া যায়। টান বলতেও হয়তো বোঝায় একটা কিছু। কিন্তু টানই যে মন—শুধুই আকর্ষণ কিংবা অসহ্য একঘেয়েমি থেকে বেরুবার চেষ্টা নয়, তা বুঝব কী করে। যদি দুটোই হত একই ব্যাপার, তাহলে, শুধু মিথ্যে বলেছি এটুকু বলবার জন্যে তোমাকে আবার ফোন করতে ছুটে গিয়েও কেন হাত থেমে গেল আমার! কেন মনে হল, তোমাকে কিছু জানাবার জন্যে কেনই বা উতলা হতে হবে আমাকে! সত্যি সত্যিই, তুমি কে? একটা শরীর কিংবা চেহারা—যাকে চেনা যায় নামে ও আদলে, কিছু কথা, কিছু গোপনীয়তা, কিছু বিনিময় বা আদানপ্রদান, হয়তো এইরকমই আরও কিছু—আমি যার সবটুকু জানিও না। কিন্তু, তুমিই আমার নির্ভরতা, আমার আশ্রয়? যদি তা না হয়, তাহলে জবাবদিহি করার দায়িত্বটা আসছে কোত্থেকে! তোমাকে জানানর আগে নিজেকেই কি জানা দরকার না আমার! কোনটা মিথ্যে বলেছি কোনটা না, তা নিয়েই বা কেন এমন ছটফটানি! আরও বড় মিথ্যা দিয়ে আড়াল করে রাখছি যাদের, তাদের কাছে কিছুই কি বলবার নেই আমার! সোমেনের কাছে, শীমু আর কৌশিকের কাছে!

এসব ভাবলেও কোনটা ঠিক এবং কেন ভাবছে, ঠিকঠাক বুঝতে পারল না রুচি। এক ধরনের অভিমানে জল এসে গেল চোখে। নিষ্ক্রিয়তা থেকেই চব্বিশ বছরের স্মৃতি ও সম্পর্ককে ছোঁবার চেষ্টা করল সে, তারপর বেয়াল্লিশ বছরের— কিন্তু কী চেয়েছিল তা ধরতে পারল না ঠিক, কী চাইছে, তাও না। একটা ভুল করার পর যেমন অসহায় লাগে, আর অসহায়তা থেকেই আঁকড়ে ধরতে হয় ভ্রান্তিটাকে—তেমনি, এই মুহূর্তে তার সমস্ত সম্বোধন ধাবিত হতে থাকল দীপঙ্করের দিকে।

স্তব্ধতাই এনে দেয় নিরপেক্ষতা। রুচি যে নির্দিষ্ট কিছু দেখছিল তা নয়, বরং তাকে দেখানোর জন্যেই হঠাৎ-হঠাৎ কিছু দৃশ্য চলে আসছিল সামনে। আইসক্রিম ভেণ্ডরের পিছনে অকারণ ঘেউ-ঘেউ করে ছুটে আসছে রাস্তার কুকুর। লোকটা সভয়, থামতে থামতে এগোচ্ছে, আবার তাকাচ্ছে পিছনে। উল্টো দিক থেকে একটা বড় স্কুল বাস এগিয়ে আসতেই বিপরীত দিকে দৌড় দিল কুকুরটা। রাস্তার ওদিকের একটা বাড়ির নীচের তলার জানলায় একটি মেয়ে এসে দাঁড়াল—মেয়ে না বউ বোঝা যায় না ঠিক, মনে হয় সিঁদুর আছে সিঁথিতে, বউও হতে পারে। আসছিল কিছু অদৃশ্যও। আলগা আঙুলে সিঁথি চুলকোতে চুলকোতে মিসেস চোখানিকে মনে পড়ল রুচির। বলেছিল বিকেলে কথা হবে সোমেনের সঙ্গে। ঠিক কটা বাজে এখন? যদি এরই মধ্যে হয়ে গিয়ে থাকে কথা, আহমেদাবাদের দূরত্বে বসে কিংবা দাঁড়িয়ে সোমেন কি ভাবতে পারে, যা-ই হয়ে থাক—অফিসের মাধ্যমে যোগাযোগ না করে বাড়িতেই একটা ফোন করতে পারত সে। রুচিকেই খুঁজতে হবে তার কী মানে আছে। শীমুকেও ডাকতে পারত। কথা বলতে বলতে শীমু কি বলত না, মা'র সঙ্গে কথা বলবে? কী বলত সোমেন? না? কিংবা, শীমু তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে শুনে অবশ্যই নিজেও

এগিয়ে যেতে পারত রুচি, বলতে পারত, ফোনটা ছাড়িস না। আমি কথা বলব। আড়াল অনেক কিছুই শেখায়। তবে, মিসেস চোখানির সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর আজই হয়তো, রাতের দিকে, কিংবা কাল সকালে—,অন্যমনস্কতার মধ্যে এইরকম যেতে-যেতে রুচি দেখল একটা ট্যাক্সি এসে থামছে বাড়ির সামনে, পুরোপুরি থামবার আগেই আরও একটু এগিয়ে গিয়ে থামল পাশের বাড়িটা ছাড়িয়ে। ট্যাক্সি থেকে তাড়াহুড়ো করে নেমে এল শীমু। ওখান থেকে শীমুর তাকে দেখতে পাবার কথা নয়, তারও শীমুকে—বস্তুত ট্যাক্সিটার থামা এবং শীমুর নেমে আসা, দুটোকে মেলাল সে। ট্যাক্সিটা যখন আবার চলতে শুরু করে মাঝরাস্তায় এবং গেট পর্যন্ত এসে পিছনে তাকাচ্ছে শীমু, রুচি লক্ষ করল শীমু একা ছিল না। গেটের সামনে এসে ওপরে তাকাল শীমু। রুচি ওকে প্যাসেজের দিকে এগোতে দেখল। একটু বা অনিশ্চিত। মনে পড়ল, একরকম ওকে নিয়েই সোমেনের সঙ্গে ঘটনাটা শুরু হয়েছিল সেদিন। রুচি না হয়ে আজ যদি সোমেন নিজেই দাঁড়াত এখানে, এই বারান্দায়, তাহলে হয়তো অন্য কিছু ভাবত। দীপঙ্কর জানে, শীমু আগেই ফিরেছে।

বেল শোনার অপেক্ষা করল না রুচি। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

'বাব্বা!' সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শ্রীময়ী বলল, 'ওভাবে তাকিও না, মা। আজ মোটেই দেরি করিনি।'

'আমি কি বলেছি কিছু?'

'না। বলোনি।' সামনে দিয়ে ভিতরে ঢুকল শীমু। শালোয়ার কামিজে স্বাভাবিকের চেয়ে বড় লাগে ওকে। রুচিকে দরজা বন্ধ করার সময় দিয়ে বলল, 'বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলে কেন? ঘুমোওনি আজ?'

মেয়েকে চপল লাগছে। তবু স্নেহ মেশাল রুচি। বলল, 'রোজ ঘুমোতেই দেখিস আমাকে?'

'থাকলে দেখতাম হয়তো।' শীমুর ঠোঁটে চোরা হাসি, 'তোমাকে সব সময়েই এত ফ্রেশ লাগে!'

নিতান্তই কথার কথা। বুঝতে অসুবিধে হয় না কোনও। তবে ঠিক এই কথাটাই কী ভেবে বলল বুঝতে পারল না রুচি।

পা থেকে জরির স্লিপার খুলে নিজের ঘরে ঢুকল শীমু। ওখান থেকেই বলল, 'চা খেয়েছ, মা?'

রুচি সাড়া দিল না। প্রশ্নের ভিতরেই আছে উত্তরটা; চব্বিশ বছরের অভিজ্ঞতা তাকে যা যা শিখিয়েছে, কী করে আরও বেশি নিঃশব্দ থাকা যায় তার একটি। আগে আগে বিকেল হতে দেখলেই চা খাবার কথা মনে পড়ত তার; কেউ থাকুক না-থাকুক, জল চাপিয়ে নিজেরটা নিজেই করে খেত। মাঝে অল্প অম্বলের ধাত ধরা পড়ায় চা খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে সে। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়েছে শুধু নিজের জন্যে করার অভ্যাসটাও। সত্যি বলতে, মাঝে এর মধ্যে দুঃখও দেখত—নিজের হাত নিজেরই ঠোঁটে ছোঁয়ালে যেমন অনুভূতি সাড়া দেয় না কোনও, তেমনি, একা স্বাদ পেত না কোনও। এখন মনে হয় খুব হাঁফিয়ে না উঠলে এই অভ্যাসটাই জিইয়ে রাখতে পারে অনেকক্ষণ।

এখনও অন্ধকার না হলেও ছায়া জমতে সুরু করেছে। ড্রইংরুমের একটা আলো জ্বেলে দিল রুচি। রান্নাঘরে এল। গ্যাস জ্বেলে চায়ের জল চাপিয়ে ব্র্যাকেট থেকে কাপ ডিস

নামাতে নামাতে কানে এল শীমুর গলার গুনগুন। বাথরুমে ঢুকল বোধহয়, ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয় অদ্ভুত খুশি ছড়িয়ে আছে মনে—এটা ওর স্বাভাবিক মুড নয়। নিজেকে দিয়েই বুঝতে পারে, এইভাবেই হঠাৎ কখনও পেয়ে বসে ভাল লাগা, ইচ্ছে করে জড়িয়ে পড়তে—ইচ্ছেটাই টেনে নিয়ে যায়। তখন আর ফেরার রাস্তা থাকে না কোনও। থাকে কি? হয়তো থাকে, সে জানে না। তবে তার বয়স আর শীমুর বয়স এক নয়। তার সোমেন আছে, শীমু আছে, কৌশিক আছে। আড়ালও আছে। যদি ভুল করে, শীমুর কে থাকবে?

দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে মেয়ের দিকে এগোল রুচি। ভাবল, ট্যাক্সিতে কে ছিল জিজ্ঞেস করবে শীমুকে। সুযোগ পেল না।

ডিভানে বসতে বসতে শীমু বলল, 'আভাকাকির সঙ্গে দেখা হল—'

রুচি কেঁপে গেল একটু। জড়তা ফুটল গলার স্বরেও।

'কোথায়!'

'কলেজের কাছে। বাস স্টপে।'

'আভা বাস স্টপে দাঁড়াবে কেন!' মেয়ের চোখে চোখ রেখে কিছু পড়ার চেষ্টা করল রুচি, 'ও তো গাড়ি ছাড়া নড়ে না!'

'সেই তো!' চায়ে চুমুক দিল শীমু, 'আমিও অবাক হলাম। ওই রোদ্দুরে—একা—কেমন ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগছিল। চেহারাটা খারাপ হয়ে গেছে—'

'জিজ্ঞেস করলি না কিছু?' রুচি আড়াল খুঁজল, 'অনেকদিন দেখা হয়নি ওর সঙ্গে।'

'কী আর জিজ্ঞেস করব! আমার সঙ্গে বন্ধুরা ছিল, রিসেস পিরিয়ডে বেরিয়েছিলাম।' শীমু থামল। তারপর বলল, 'তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিল।'

এর পরের কথাগুলো কোনদিকে যেতে পারে ভাববার চেষ্টা করল রুচি। হয়তো এর পরেও আছে কোনও কথা, হয়তো নেই। আভা কি অনুমান করতে পারে কিছু?

শীমুর চোখ অন্যদিকে ।

ওকে দেখতে দেখতে রুচি বলল, 'বাবার অফিস থেকে ফোন করেছিল। মঙ্গলবারের আগে ফিরবে না।'

'কেন! আজই তো ফিরবে বলে গিয়েছিল!'

'জানি না।' রুচি বলল, 'আহমেদাবাদে গেছে নাকি। লক্ষ্ণৌ, দিল্লি হয়ে ফিরবে।'

শীমু রুচিকে দেখছিল। ফাঁকা চোখের দৃষ্টি অনেক সময় অর্থময় হয়ে ওঠে। কথা বলল না।

চা-টা ইতিমধ্যে শেষ করেছিল রুচি। ডাইনিং টেবিলের ওপর কাপটা রেখে এসে বলল, 'রবিবার কৌশিকের ওখানে আমাদেরই যেতে হবে—'

'রবিবার!' শীমুর মুখে থমকানো ভাব। বলল, 'তুমি একা যেতে পারবে না?'

প্রশ্ন নয়, রুচির মনে হল সে উত্তরই শুনছে। আড়ে টেলিফোনটার দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে জিজ্ঞেস করল, 'কেন?'

॥ ৫ ॥

সোমেন ফিরে আসে এবং তার পরেও কেটে যায় বেশ কয়েকদিন। নামব নামব করতে করতেই ইতিমধ্যে নেমে পড়ে বৃষ্টি। আকাশে তাকালে বোঝা যায় বর্ষা এসে গেল।

আরও একটু চুপচাপ হয়ে গেল ওরা।

বাইরে থেকে তফাত চোখে পড়ে না কোনও। চব্বিশ বছরের শিকড় শুধু ছেলেমেয়ের মধ্যেই নয়, নানা অনুভবের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়ে আরও গভীরে। এই গভীরতা কতটা অন্ধকার চিনে চলে গেছে আরও কত দূরে—যাদের শিকড় তারাও কি বুঝতে পারে ঠিকঠাক? ওপরের ঝড়, সুতরাং, ওপরেই থাকে। বস্তুত, যা চলেছে সোমেন ও রুচির মধ্যে তাকে ঠিক ঝড়ও বলা চলে না। একরকম থম—ঝড় উঠলেও উঠতে পারে এই অবস্থায়, দুজনকে দেখলে তা-ই মনে হয়; তবে উঠবেই যে তারও স্থিরতা থাকে না কোনও।

সোমেন যা ভাবে রুচি তা ভাবে না, কিংবা, রুচির স্বভাবই সোমেনেরও স্বভাব নয়। তবু এই একটি ব্যাপারে যেন একই ভাবে ভেবে যাচ্ছে তারা– -স্বামী-স্ত্রীর আচরণের কিছু কিছু বাধ্যতা ও স্বয়ংক্রিয়তা বাদ দিলে হয়তো এই থম আগেও ছিল তাদের সম্পর্কের মধ্যে। স্বয়ংক্রিয়তাজাত অভ্যাসই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল এতদিন। হয়তো একদিনে হয়নি এটা। দিনে দিনে, অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে, তারপর অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করার মধ্যে দিয়ে, ক্রমশ পৌঁছে যাচ্ছিল এক ধরনের স্তব্ধতায়। তফাত এইটুকু, তখন কথাও ছিল। এখনও যে নেই তা নয়। তবে, শুধু প্রয়োজনে। কখনও বা ইঙ্গিতে।

রুচি যেভাবে ভাবে সোমেনও সেভাবে ভাবে না। কিন্তু, যেহেতু তারা এখনও একই বিছানায় শোয় এবং কমবেশি ঘুমিয়েও পড়ে—অসাবধানের স্পর্শ থেকে নিজেদের আলাদা করে নিতে নিতে বুঝতে পারে স্পর্শ ছিল এবং আছে। সুতরাং, দুজনের ভাবনা যে কোথাও মেলে না তা কী করে হবে! এ ছাড়াও আছে ভদ্রতা, সামাজিকতা; হঠাৎ কিছু ঘটে যাওয়ার অনিশ্চিতি! এগুলোও চালায়।

এই তো সেদিন। সোমেন ফেরার দিন চারেকের মধ্যেই ছিল অশোক আর রমার পঁচিশতম বিবাহবার্ষিকী। একটা প্ল্যানও ঠিক হয়ে গেল এর ওর সঙ্গে কথা বলে। রাত্রে খেতে ডেকেছিল অশোক-রমারা। সারপ্রাইজ দেবার জন্যে উপহার ছাড়াও কিছু একটা ভাবতে ভাবতে স্টেটসম্যানের পার্সোনাল কলামে ওদের উইশ করে একটা বিজ্ঞাপন পাঠিয়ে দিয়েছিল সোমেন। কিন্তু, বিজ্ঞাপনটা বেরুবার পর সকালে কাগজ দেখতে দেখতে অদ্ভুত একটা বোধে ছেয়ে গেল তার মাথা। এতই যদি দূরত্ব তাহলে শুভেচ্ছাসূচক কথাগুলোর শেষে রুচি অ্যান্ড সোমেন নাম দুটো নিজেই জুড়ে দিল কেন! অভ্যাসে? নাকি এখানেও কাজ করেছে একই অসহায়তা, ঘুমের মধ্যে রুচির গায়ে হাত রাখা এবং হাত রেখেছে অনুভব করে তুলে নেবার মতো! শুধু তাই-ই নয়, সোমেন দেখল, একই বয়ানে তাদের আগের নোটিশটা বেরিয়েছে মীনা-ধ্রুবর নামে—তারও আগেরটা আভা-দীপঙ্করের নামে। গোলমেলে লাগে। কোনও দিন রাতে আভা কি সত্যিই মরতে গিয়েছিল, তারপর, শেষপর্যন্ত দীপঙ্করই বাঁচিয়েছিল বলে। আর একটা নোটিশও ছিল, মনে হল রমার ভাইবোনেদের দেওয়া। নামগুলো অপরিচিত। সোমেন আটকে থাকল নিজের পরিচয়ের মধ্যে।

একে তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এরকম রোজই বেরোয় কারও না কারও নামে। চেনে না বলেই অনেকদিন ভেবেছে সোমেন, এই ধরনের লোক-জানানো শুভেচ্ছায় আন্তরিকতা থাকে না কোনও। অবাক হল অন্য কারণে।

রুচি সম্পর্কে দীপঙ্করের হাবভাব ইদানীং ভালো লাগছিল না তার। সেদিন ধ্রুবর ফ্ল্যাটে কী হয়েছে না হয়েছে তা সে নিজে না দেখলেও অন্যদের মুখ চোখ দেখে মনে হয়েছিল ঘটনাটি দীপঙ্করকে নিয়ে হলেও পরোক্ষে রুচিকে নিয়েও— ব্যাপারটা আরও দূর ছড়াবার আগেই স্বামী হিসেবে তার ইনটারফেয়ার করা দরকার। সিদ্ধান্ত নেবার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো রাগটা গিয়ে পড়েছিল রুচির ওপর। দীপঙ্কর কী করছে না করছে সেটা তার দেখার কথা নয়। আফটার অল, ভেবেছিল, তুমি শুধুই মেয়েই নও, একজনের স্ত্রী এবং ছেলেপুলের মা। ইউ শুড নো হোয়াট টু ডু অ্যান্ড হোয়াট নট টু ডু। তোমার প্রশ্রয় ছাড়া কোনও ভাবেই এগোতে পারে না দীপঙ্কর। পারে কি? সেই নাটক কবার সময় থেকেই চলেছে একটা আদিখ্যেতা, কিন্তু—তোমার মনে কী আছে জানি না—দ্য ফ্যাক্ট রিমেনস, এ নিয়ে তুমি যে আমাকে—তোমার স্বামীকে—কিছু বলবে বা কমপ্লেন করবে, তাও করোনি! এইসব ভেবেই সেদিন রাতে রুচিকে নিজের অখুশি চেনাতে চেয়েছিল সোমেন, জুতসই উপলক্ষ ছিল না বলেই খুঁজেছিল যে-কোনও একটা অজুহাত। ভাবতে পারেনি, প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত রুচির গায়ে হাত তোলায় দাঁড়াবে।

পরে মনে হয় সে বাড়াবাড়ি করেছিল একটু। এসব না করে অন্যভাবেও ট্যাকল করতে পারত রুচিকে—রুচি, তুমি কি দীপঙ্করকে ভালবাসো? আগে আগে যখন গল্পের বই পড়ত, লক্ষ করেছে এভাবেও জিজ্ঞেস করে কেউ কেউ; উত্তরে, স্ত্রী বলত, তোমার কী মনে হয়? ইত্যাদি। ঠিক এই প্রশ্ন না হলেও এই ধরনের কোনও প্রশ্ন। তা ছাড়া তখনই, যা ঘটবার ঘটে যাবার পর, বিছানায় শুয়ে, আরও কিছু-কিছু কথা মনে হয়েছিল সোমেনের। যেমন, তোমার বউ আর কাউকে ভালবাসছে কি না এবং ভালবাসা পাবার জন্যে সে-বানচোতকে প্রশ্রয় দিচ্ছে কি না, এটা জানবার জন্যে যদি বউকেই প্রশ্ন করতে হয় তাহলে তুমি নিজে শালা কী? নপুংসক, না হিজড়ে? শুধু মাল খেয়ে খেয়ে আর ওষুধ বেচে বেচে আর পার্টি করে করে আর আড্ডা দিয়ে দিয়ে আর ক্লাবে গিয়ে গিয়ে আর চাকরিতে কী করে আরও ওপরে ওঠা যায় ভাবতে ভাবতে আর সবকিছু ভুলতে ভুলতে কি এমনই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে যেখানে জেবড়ে গেছে সব অনুভূতি, নষ্ট হয়ে গেছে সব বোধ—অদৃশ্য ঘায়ের মতো অনাবিষ্কৃত কিছু আচ্ছন্ন বোধ ও অনুভূতির মধ্যে জ্বালা ছড়াতেই বুঝে নিলে স্বামী হিসেবে কী তোমার করণীয়। এইসব এবং আরও অনেক কথা, ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত আবেগে নিজের কাছেই অসহ্য হয়ে উঠেছিল সোমেন। তখন রুচিকেই মনে হয়েছিল আত্মরক্ষার উপায়, ক্ষমা। তারপর যা হল, সত্যি সত্যিই সোমেন ভাবতে পারেনি আবেগ তাকে এইভাবেই অবিন্যস্ত করে দেবে—ঠিক সেই সময়ে, যখন রুচিও ধরা দিচ্ছে। পশু, ডিগনিটি—বড় ভয়ঙ্কর এই কথাগুলো; গলার স্বর শুনে মনে হয়েছিল বলবার জন্যেই বলেছে রুচি। অপমান যা চেনায়, সন্দেহ তার তুলনায় কতটুকু।

হয়তো এটাই সত্যি, অসারতা আছে বলেই টিকে থাকে মানুষ। বিস্ময় আছে বলেই উত্তর পেয়ে যাবার পরেও ফিরে যেতে হয় প্রশ্নে।

সেদিন রুচিকে সঙ্গে নিয়ে রমা-অশোকের নেমন্তন্নে যেতে-যেতে যেমন, তেমনি ফেরার

সময়েও একই কথা ভেবেছিল সোমেন। মদে আর তেমন নেশা হচ্ছে না ইদানীং। মুখগুলি যেমন ছিল তেমনিই আছে, ধ্রুব এল মীনাকে নিয়ে, আগে যেমন তেমনি সেদিনও দীপঙ্করের পিছনে পিছনে মাপা দূরত্বে হেঁটে এল আভা। এসেই হইচই জুড়ে দিল নীলাদ্রি আর চন্দ্রিমা। ঠাট্টা করেও ওদেরই বলা হয় 'মেড ফর ইচ আদার', অন্যদেরই বা বলা হবে না কেন! যেমন যায় তেমনি কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজের আড়ালে চলে গিয়েছিল রুচি—রমা ও মীনার সঙ্গে ভিতরে কোথাও, ফিরে আসার পর আর একটা দল হয়ে গেল ওরা। দীপঙ্কর কম খাচ্ছিল, কথাও বলছিল মেপে। আগের দিনের স্মৃতিতেই কি? হতে পারে। সোমেন বুঝতে পারেনি ঠিকঠাক। একসময় এক দৃষ্টিতে কিছু বা অন্যমনস্ক আভার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেবেছিল, দীপঙ্কর কি জানে কিছু? তার কথা? আভার কথা? যদি না জেনে থাকে, তাহলে আভাই বা জানল কী করে?

হয়তো এটাই ঠিক, প্রশ্ন থাকে বলেই স্মৃতিও থাকে। স্বাভাবিকের চেয়ে একটু অন্যরকম হয়ে পড়ে নিঃশ্বাস। দিনযাপনের আর কোনও তারতম্য ধরা পড়ে না কোথাও। দিন কেটে যায়।

একদিন গভীর রাতে ঘুমের মধ্যে একটা হাত এসে পড়ে সোমেনের বুকে। সচেতন কিনা বোঝা যায় না। তবে, অন্ধকারে চুপচাপ সেই স্পর্শ অনুভব করতে করতে আরও বেশি স্পর্শে জড়িয়ে পড়ে সোমেন। বয়স মনে পড়ে, আর সম্পর্ক; মনে পড়ে শিকড়—তার ভিতর দিয়ে ক্রমাগত প্রবাহিত রস। বুঝতে পারে না এ সবের মানে কী। তবু, কী যেন হতে থাকে তার মধ্যে। এখন জেগে আছে, স্বপ্নও দেখছে না, নিজের নিঃশ্বাসটাকে অনুভব করছে নিজেরই বলে, তবু—সচরাচরের চেয়ে অন্যরকম—অদ্ভুত এক নাব্যতা ঢুকে পড়ছে তার কাঠ হয়ে থাকা অনুভূতির মধ্যে। কালো জলের ওপর দিয়ে একা নৌকার মতো কিছু একটা ভেসে যাচ্ছে সেখানে—অস্পষ্ট, কিছু বা মন্থর, কিন্তু নিশ্চিত যাওয়ার দিকে। এরই নাম সময়, বুকভর্তি অসহায়তার মধ্যে চিনতে পারে সে—ক্রমশ চলে যাচ্ছে স্মৃতি ও সম্পর্ক থেকে।

হাতটা চিনতে পারে সোমেন। মনে হয় শুধু আজ, এই মুহূর্তে নয়—হয়তো সচেতনভাবেই নয়, ঘুমে ও অভ্যাসে, বহুদিন ধরে এই হাত উঠে এসেছে তার বুকে; অভ্যাসের মধ্যেই কিছু বুঝতে ও বোঝাতে। রুচি কি কোনও দিন এসেছিল, বসেছিল তার পায়ের কাছে? কিছু কি বলেছিল?

বড় আদরে হাতটা নিজের হাতে জড়িয়ে ধরে সোমেন। আস্তে টেনে নেয় নিজের মুখ ও কপালের ওপর, ঠোঁটের ওপর, এতদিনের অনিশ্চিতির ওপর স্পর্শই গাঢ় করে তোলে শরীর। এই বয়সে আহ্লাদ থাকে না কোনও, তবু অনুভব করে, আহ্লাদে আটখানা হয়ে যাচ্ছে সে। ঠোঁটে লাগে রুচির চোখের নোনা জল। আরও বেশি স্পর্শের মধ্যে যেতে হঠাৎই অনুভব করে, ঠিক যেন রুচি নয়—বীজ গ্রহণের আগ্রহে ভিজে মাটির উর্বরতা ক্রমশ তাকে টেনে নিচ্ছে ভিতরে।

থমটা থেকে যায় তবু। গিয়েও যায় না। মনে হয় একটা সঙ্কোচ এখনও থেকে গেছে কোথাও। এটা শুরু হয়েছিল সেদিন, সেই কাচের গ্লাস ভাঙার শব্দে। মনে হয় শব্দটাই এখনও লেগে আছে কানে, যখন তখন ফিরে আসে।

সেদিন সকালে কাগজ পড়তে পড়তে রুচির হাত থেকে চায়ের কাপ টেনে নিল

সোমেন। চোখ তুলে বলল, 'মুখ শুকনো কেন?'

'মনে হচ্ছে?'

'শুধু মনে হওয়া নয়, দেখছি। তোমার চোখের কোলে কালি ছিল না।'

সোমেন কী বলতে চায় বুঝবার চেষ্টা করল রুচি। অল্প হেসে বলল, 'কী করে বলব।'

'তাহলে—।' বলার আগে রুচির মুখে অস্বস্তি লক্ষ করেছিল সোমেন। চোখ নামিয়ে নিল। একটু পরে, রুচি তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে, বলল, 'সম্পর্ক যেমনই হোক, চোখে পড়ে সবই। গালও ভেঙেছে—'

রুচি সরে গেল। পিছন থেকে সোমেন দেখল ওর হাঁটার ধরনেও যেন পরিবর্তন এসেছে একটা। তবে পরিবর্তনটা কী ধরতে পারল না ঠিক।

সকালের প্রথম টেলিফোনটা এসে গেল এই সময়ে।

রুচি থমকে দাঁড়াল। সোমেনও উঠবে কি না ভাবছিল। দেখল, এ-ব্যাপারে শীমুর তৎপরতা তাদের চেয়ে বেশি। মেয়েকে এগিয়ে আসতে দেখে শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল রুচি।

'হ্যালো!'

'গুড মর্নিং।' ওদিকে দীপঙ্করের গলা, 'সোমেন উঠেছে?'

'ধরো।' রিসিভার হাতে নিয়ে ওখান থেকেই ডাকল শীমু, 'বাবা, দীপঙ্করকাকু।'

সামান্য ইতস্তত করল সোমেন। তারপর উঠে দাঁড়াল।

'বলো?'

'গম্ভীর কেন!' দীপঙ্কর বলল, 'না কি এই ঘুম থেকে উঠলে?'

'না। বলো?'

'আভাকে বলছিলাম, অনেকদিন আমাদের বাড়িতে আসো না তোমরা! আজ এসো না? ফ্রি আছ তো? আমি ধ্রুবটুবকেও বলছি—'

সময় নেবার জন্যে রিসিভারটা হাত বদল করল সোমেন। ভুরু কোঁচকাল। তারপর বলল, 'আজই—?'

॥ ৬ ॥

এবারেও হল না। আগে দু তিনবার গোলমাল হওয়ায় এবার আগে থেকেই সচেতন ছিল রুচি, দিনটা মনে রেখেছিল ঠিক। আশা থেকেই এসে যাচ্ছিল অন্যমনস্কতা, ছিল দুর্ভাবনাও। না-হওয়ার আশঙ্কা তাকে টেনে নিল ভিতরে।

সময় তার বরাবরই বেশি; কিন্তু, কেন কে জানে, সময়ের ভার ইদানীং যেন বেশি করে চেপে বসছে বুকে। যে-আড়াল সে খুঁজেছিল শুধু মেয়েমানুষ বলেই নয়, নিজস্ব কারণেও, সেই আড়ালই, মনে হয়, এখন প্রতারণা করে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ভাল লাগায় মিশে যাচ্ছে মন খারাপ। বেয়াল্লিশ বছর থেকে চব্বিশটা বছর আলাদা করে নিলে স্মৃতি হয়ে পড়ে দ্বিখণ্ডিত—তার যে-অংশটায় সে একাই দাঁড়িয়ে সেখানে বস্তুত স্মৃতি নেই কোনও, একদিন

এইভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত ছিল সে। এখন মনে হয় চব্বিশ বছর জুড়েও যা আছে তা বিভিন্ন ঘটনা মাত্র, আর কিছু নয়। কমবেশি তারও মধ্যে থেকে আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় কয়েকটিকে। সোমেন সামনে এলেই বুঝতে পারে এই লোকটা তার স্বামী, এরই সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তার এবং আর যা যা হবার, হয়েছিল; যেমন চিনতে পারে শীমু তার মেয়ে, কৌশিক তার ছেলে। কখনও এদের নিয়ে আলাদা করে ভাবতে আবেগে এসে যায় গতানুগতিকতা—মনে হয় জোর করে টানা। এরাই তখন নাম পাল্টে হয়ে যায় আশ্রয়, দায়িত্ব, কর্তব্য। সম্পর্ক বলতে এতদিন ধারণা ছিল একটা, ধারণা নিয়েই এগিয়ে ছিল ওঠার দিকে। কিন্তু, মাঝখান থেকে সত্যিই কি এভাবে অদৃশ্য হয়ে যায় সিঁড়ি।

রুচি বুঝতে পারে না। অন্যমনস্কতা থেকে ঢুকে পড়ে বিষাদে।

আড়াল থেকেই পেয়ে গিয়েছিল দীপঙ্করকে; নিজেকেই দিয়েছিল বলা যায়—যতখানি দিলে অভাবের মধ্যেও এসে পড়ে চাঞ্চল্য, ইচ্ছে করে আরও একরকম ভাবে বেঁচে থাকতে। দেওয়ার শেষ এখনও হয়নি। তবু, এখন মনে হয়, অক্ষমতা তার নিজেরই না হলে ক্রমশ দীপঙ্করও অভ্যাস মনে হবে কেন! কেন মনে হয় প্রাণ বস্তুত দূরের; দূরেই ছিল—এখন দূর থেকে আরও দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ! শিকড়ে রস নেই কোনও। বিশাল জমির উর্বরতা নিয়ে এখনও ভ্রম জাগিয়ে যাচ্ছে সে—শেষ পর্যন্ত যে খুঁড়ে দেখবে তারই হাতে উঠে আসবে শুকনো শিকড়ের টুকরো মেশানো ঝুরঝুরে মাটি। সোমেন কি বোঝে কিছু? হয়তো বোঝে—তার অভিজ্ঞতা বেশি। সেই জন্যেই কি চোখের কোলে কালি দেখার পরে বলে ওঠে, সম্পর্ক যেমনই হোক—!

দিন চলে যেতে লাগল। দু দিন গেল, তিন দিন গেল, দেখতে দেখতে পুরো একটা সপ্তাহ। তার পরেও যখন হল না, তখন, অবসাদের ভিতর, গভীর আত্মমনস্কতা থেকে শরীরের ভিতরের কলকব্জাগুলোকে লক্ষ করতে লাগল রুচি। হওয়া এবং না-হওয়ার মাঝখানে অব্যক্ত প্রশ্ন ও সন্দেহগুলোকে ক্রমাগত ছুড়তে লাগল সে। সম্ভবত সে আরও কিছু হতে যাচ্ছে, ভাবল, সম্ভবত নারীত্ব যা দেয় তার সবটুকুই এখনও পাওয়া হয়নি তার, এবার পাবে; সম্ভবত নারীত্ব যা নেয় এবং ফিরিয়ে দেয় না, সম্মুখীন হবে সেরকম কোনও অভিজ্ঞতার। দুটোর কোনওটাই কি তার কাঙ্ক্ষিত।

জীবন বদলায় না। আড়াল থেকে আরও আড়ালে চলে যায় রুচি। ভাবে সোমেনকে বলবে।

ভাবতে ভাবতেই বলে ফেলল একদিন। যেভাবে বলা যায়।

সম্পর্ক যেমনই হোক বলার আগে সেদিন যেমন চোখে তার দিকে তাকিয়েছিল সোমেন, আজও তাকাল সেইভাবে।

'তুমি কি পাগল হয়ে যাচ্ছ! এই বয়সে—'

কথাটা শেষ করল না সোমেন। হয়তো বা নিজের বয়স মনে পড়ে গেল তার। হয়তো ভাবল, বয়সই বিষয় কি না।

রুচি কথা বলল না। তের কি চোদ্দ বছর আগে কৌশিকের জন্মের সময় কোন ভাষায় কথা বলেছিল আজ আর তা মনে পড়ে না।

আলোটা নিভিয়ে দিল সোমেন। অন্ধকারেই সিগারেট ধরাল। বিছানায় আধশোয়া হয়ে তাকাল দূরে—জানালার বাইরে। সোমেন তাকাল বলেই রুচিও তাকাল। হালকা বিদ্যুতের

আভা থেকে থেকে কাঁপিয়ে যাচ্ছে আকাশটাকে। হয়তো বৃষ্টি নামবে।

মুখ ফিরিয়ে রুচিকে দেখল সোমেন। হঠাৎ ধোঁয়া টানায় মুহূর্তের জন্যে লাল হয়ে উঠল ওর মুখের এক পাশ। আবার হারিয়ে গেল আবছায়ায়।

'আগে যখন এমন হচ্ছিল, বলোনি কেন?'

রুচি এবারও বলল না কিছু।

প্রশ্নটা ভুলে গেল সোমেন। ছোট অ্যাশট্রেটা অন্ধকারেই খুঁজে নিল হাতে। জোর দিয়ে ঘষে ঘষে নেভাল সিগারেটটা। তারপর টান হয়ে শুল।

'একটা টেস্ট করিয়ে নিলেই হয়।' গভীর ভাবে নিঃশ্বাস টানল সোমেন। 'আমি তো আর ডাক্তার নই!'

আস্তে আস্তে কথাগুলো নামিয়ে দিল সোমেন। হাত টেনে চাপা দিল কপালে।

'কবে?'

'যেদিন তোমার ইচ্ছে—'

অনিচ্ছা থেকে পাশ ফিরল সোমেন। আরও একটা নিঃশ্বাসের শব্দ পাশ কাটিয়ে গেল রুচিকে। সম্ভবত পুরনো ভাবনায় ফিরে যাচ্ছে ও, রুচি ভাবল, তাকে সন্দেহ করতে গিয়ে নিজেকেও করছে। মুখ ফুটে কি আর বলবে কিছু! খুব ভাল করে লক্ষ করে দেখেছে রুচি, আজকাল প্রায়ই ভয়-পাওয়া মনে হয় সোমেনকে। কথা বলে শুনে—ঘরে কিংবা বাইরে, মুখের অন্যমনস্কতাই বুঝিয়ে দেয় ক্রমাগত প্রশ্ন করে নিজেকে। প্রশ্নই থামিয়ে রাখে।

ইচ্ছেমতো নেমে আসে বৃষ্টি। আস্তে থেকে জোরে, ক্রমশ ধারাবাহিক হয়ে ওঠে শব্দ। ওরই মধ্যে বিনবিন করে একটা মশা । ঘুমহীন চোখে অন্ধকার সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রুচি লক্ষ করে হাওয়া ছড়ানোয় ব্যস্ত থেকেও আকার চিনিয়ে দিচ্ছে নিরাকার পাখার ব্লেডগুলো। তাকিয়ে থাকতে থাকতেই নিঃশ্বাস ভারী হয়ে আসে তার; অবরুদ্ধ হাওয়া পাক খায় গলায়, বুকে, যেন বা মাথারও ভিতরে।

ইদানীং যেমন টের পায় মাঝে মাঝে, তেমনি, এখনও টের পেল, তলপেটের কোথায় ঘোরাফেরা করছে মৃদু জ্বালা। কেমন যেন অদ্ভুত এই অনুভূতি—এই থামে, এই শুরু হয়ে যায় আবার। যখন শুরু হয়, মনে হয় লুকোবার জায়গা না পেয়ে একটা কাঁকড়া বিছে যেন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে ক্রমশ—ধারালো তার শরীরের ঝাপটায় দাগ বুলিয়ে যাচ্ছে চারদিকের দেয়ালে।

কোমরের কষি আলগা করে জ্বালার জায়গাটায় আদরের হাত বোলায় রুচি। টিপে দেখে তার কোনখানে আছে জরায়ু, সত্যিই কেমন হয় তার ঝিল্লির কারুকাজ! এই মুহূর্তের অন্ধকারে কোন আলোর সাজ সেখানে। রঙ বেরঙের কোন দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে তার চারদিকে! না কি রঙও তার অপছন্দ; ছোট ছোট হীরকখণ্ডের তীব্র জ্যোতির ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত সে—একা সার্চলাইটের আলো ফেলে নিজেকেই পাহারা দিচ্ছে নিজে!

এতকালের চেনা আড়াল আজ আবার তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে নতুন এক আড়ালে। কাউকে বোঝানো যাবে না এ অনুভূতি কেমন, কতখানি অসহায়তা এই আড়াল থেকে আরও আড়ালে ফিরে যাওয়ায়।

তবু নিশ্চিত এই যাওয়া চিনতে ভুল হয় না কোনও। বড় দুঃখে, বড় আনন্দে জল এসে যায় চোখে।

আরও একটু রোগা হয়ে যায় রুচি।
চোখের কোলে গভীর ছায়া ফেলে কালি।
চওড়া হতে থাকে সিঁথি।
গালদুটো ভেঙে যায় আরও।
হাড় জিরজিরে হাত থেকে অনিচ্ছায় খুলে আসে বালাদুটো—

॥ ৭ ॥

অনেকদিন পরে একদিন হঠাৎ সোমেনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় দীপঙ্করের। কিছু বা অপ্রস্তুত, দুজনেই থেমে দাঁড়ায়।

সোমেন জিজ্ঞেস করে, 'কেমন আছ?'

দীপঙ্কর জিজ্ঞেস করে, 'তুমি?'

'এই তো, চলে যাচ্ছে—। কারুর সঙ্গে দেখাটেখা হয়?'

'দেখা? না। কার সঙ্গে হবে!'

'হ্যাঁ। তাই—'

সামান্য অন্যমনস্ক, মুখ ফিরিয়ে নেয় সোমেন।

'ক্যানসারের ব্যাপারটা—'. নিজেকে ফেরাতে না পেরে অস্বস্তি জড়ানো গলায় দীপঙ্কর বলে, 'আগে কিছু বোঝা যায়নি!'

সোমেন হাসে, আলগা; তেমনিই অন্যমনস্ক।

তারপর দুজনেই চুপ করে যায়। দৃষ্টি যা দেখায় সেদিকেই তাকিয়ে থাকে। আড়াল খোঁজে।

সোনালী জীবন

উৎসর্গ:
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

দমদম এয়ারপোর্টের সিকিউরিটি এনক্লোজারের সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল ওরা। এরই মধ্যে বার দুয়েক সিকিউরিটি চেক করে নিতে বলা হয়েছে দিল্লির যাত্রীদের। কিন্তু ওরা নড়েনি। এগুলো রুটিন কল; প্লেন ছাড়তে অন্তত আধঘণ্টা দেরি আছে এখনও। সিকিউরিটি গেটের ওদিকে দাঁড়িয়ে অলস মেজাজে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে ইউনিফর্ম পরা তিন চারজন লোক। যাত্রীরাও আসছে একজন দু'জন করে, যে যেমন আসছে হ্যান্ড ব্যাগেজ দেখিয়ে ঢুকে পড়ছে ভিতরে। রেনকোটের জল ঝরাতে ঝরাতে এইমাত্র একটি বড়সড় চেহারার লোক অতিক্রম করে গেল ওদের।

জুনের মাঝামাঝি। পর পর ক'দিন বৃষ্টি হওয়ায় গরম নেই তেমন। আজও দুপুরে বৃষ্টি নেমেছিল হঠাৎ। এখনও পড়ছে টিপটিপ করে। আকাশের মেঘাচ্ছন্নতা যে-কোনও সময়েই ভেঙে পড়ার স্তব্ধতা মেশানো।

মোটর ও ট্যাক্সিতে দুটো দলে ভাগাভাগি হয়ে মধ্য কলকাতা থেকে এতটা রাস্তা আসতে আসতে নিজেদের মধ্যে কিছু খুচরো আলাপ ও অল্প বয়েসীদের প্রশ্ন ও কৌতূহলের উত্তর দেওয়া ছাড়া ওরাও ছিল থমথমে। স্তব্ধতার জের এখনও কাটেনি। বাইরের আবহাওয়ার সঙ্গে অবশ্য ভিতরের দৃশ্যের সম্পর্ক নেই কোনও। ঝলমলে আলোয় যাত্রী, কুলি এবং অন্যান্য মেয়ে, পুরুষ, শিশুদের আনাগোনায় ব্যস্ত চারদিক। হঠাৎ হঠাৎ শোনা যাচ্ছে মাইকের ঘোষণা—কলিং দ্য অ্যাটেনশন অফ মিস্টার পি সুন্দরম, প্যাসেঞ্জার অ্যারাইভড় ফ্রম বম্বে, ইত্যাদি। একটু আগে ভারী আর গুড়গুড়ে একটা শব্দ শুনে সচকিত হয়েছিল কেউ কেউ। পরে বুঝতে পারে, মেঘের গর্জন নয়, ওটা কোনও প্লেনের টেক-অফ করে আকাশে উড়ে যাওয়ার শব্দ।

সিকিউরিটি চেক-এর জন্যে ফাইনাল কলের অপেক্ষা করছিল ওরা। ডাক পড়লেই একদল চলে যাবে ভিতরে; অন্যরা—হয়তো—ভিজিটরস্ গ্যালারির দিকে। দূর থেকে হাত বা রুমাল নাড়ায় বিদায় এক ধরনের নিশ্চয়তা পায়। সেটাই ক্রমশ হয়ে ওঠে স্মৃতি।

ওরা মানে আর্থার পাইবাসের ঔরসজাত কিংবা তার সঙ্গে কোনও-না-কোনও ভাবে সম্পর্কিত এগারো জন। আর্থার পাইবাস, তার স্ত্রী ডরোথি; আর্থার-ডরোথির ছেলে রবিন, রবিনের স্ত্রী সারা এবং ছেলে স্যামুয়েল; আর্থারের বড় মেয়ে রোজালিন, তার স্বামী মাইকেল এবং ওদের ছেলেমেয়ে ডোনাল্ড আর ডেইজি; এবং আর্থার পাইবাসের মেজ ও ছোট মেয়ে অড্রি এবং লরা। চেহারা, গায়ের রঙ এবং পোশাক দেখে বোঝা যায় ওরা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান—খাঁটি সাহেব মেমদের জৌলুস ও অহঙ্কার নেই, কিন্তু যেতে-যেতেও

থেকে গেছে কিছু স্বাতন্ত্র্য; শেষ বিকেলের আলো যেমন দেখায়। ওরই মধ্যে মাইকেলের রঙ একটু তামাটে; যেমন অন্য মেয়েগুলির চেয়ে সারা অপেক্ষাকৃত বেশি ফর্সা, তার নাকমুখও অন্যদের মতো টিকালো নয়। এরা দু'জনেই পাইবাস পরিবারে বহিরাগত। আর্থারের মেজ মেয়ে অড্রিকেও চেনা যায় আলাদা করে। ট্রাউজার্স কিংবা স্কার্ট পরিহিত এই দলটির মধ্যে একমাত্র তারই পরনে শাড়ি ও ব্লাউজ, হালকা সিঁদুরও রয়েছে সিঁথিতে। বাঙালি বিয়ে করে অড্রি এখন বিনতা। তার স্বামী অলোক দত্তেরও আসবার কথা ছিল; কিন্তু শেষ মুহূর্তে অফিসের কাজে আটকে পড়ায় আসতে পারেনি। অবশ্য ক্রাচ-নির্ভর হওয়ার জন্যে আর্থার পাইবাসকেই চোখে পড়ে সবচেয়ে আগে।

আরও একটু ভাল করে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এই মুহূর্তে গোটা দলটি ভাগ হয়ে আছে দু' তিনটি ছোট ছোট দলে। থামের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়ানো বুড়ো আর্থার পাইবাসের গা ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর্থারের পুত্রবধূ সারা—দু'জনেই কথা বলছে আর্থারের মেজ মেয়ে অড্রির সঙ্গে। ওদেরই বাঁ-দিকে, বুক স্টলের দিকে মুখ করে বুড়ি ডরোথি পাইবাস ও তার ছেলে রবিন, ওদের দু'জনকে ঘিরে রোজালিন ও তার কিশোরী মেয়ে ডেইজি। আর্থার পাইবাসের ছোট মেয়ে লারাকেও দেখা যাচ্ছে ওদের সঙ্গে। এই দু'টি দল থেকেই খানিকটা দূরে—মাঝখানে অন্যদের যাতায়াতের রাস্তা রেখে—দাঁড়িয়ে কথা বলছে রোজালিনের স্বামী মাইকেল এবং রবিন-সারার যুবকপুত্র স্যামুয়েল। কথা বলছে না, কিন্তু স্যামুয়েলের ডান হাতের কনুই থেকে কবজি পর্যন্ত দু' হাতে ধরে নিজের শরীরটাকে দোল খাওয়াচ্ছে রোজালিন-মাইকেলের ছেলে এবং স্যামুয়েলের পিসতুতো ভাই ডোনাল্ড। এগারো জনের মধ্যে শুধু ডোনাল্ডই বোধহয় আদৌ টেনস্ নয়। মাইকেলকে দেখা গেল স্যামুয়েলকে নিয়ে বুক স্টলের দিকে এগোতে। ডোনাল্ডও সঙ্গ ধরল।

আর্থারের শোক

কিন্তু, এই মুহূর্তটিই সব নয়। চোখমুখ কাঁপিয়ে নিঃশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়েছে আর্থার পাইবাস—একটু আগে কেউ কেউ সেই দৃশ্যও দেখে থাকতে পারে।

'আই কান্ট ইমাজিন দিস—আই কান্ট্ অ্যাকসেপ্ট্ দিস্—', বলতে বলতে লোকটি যখন বগলের ক্রাচ পিছলে পড়ো পড়ো, সেই সময় পুত্রবধূ সারাই দু' হাতে আগলে ধরেছিল তাকে। সারার নিজের চোখেও তখন রক্তাভা, দাঁত বসে গেছে ঠোঁটে। অন্যরা হতচকিত।

বুড়ো শ্বশুরের গালে শিশুকে আদর করার ধরনে চুমো দিতে দিতে সারা বলল, 'কাম ইওরসেল্ফ্, পাপা! ও মাই সুইট পাপা! আমি বলিনি, তোমাকেও নিয়ে যাব অস্ট্রেলিয়ায়! ভেরি সুন! হোয়াই আর ইউ গেটিং সো আপসেট!'

'আহ, হু আর ইউ ট্রাইং টু ফুল। গডড্যাম লায়ারস। সব কটা মিথ্যেবাদী। আমার কফিনটা যাবে ওখানে!' আর্থার পাইবাস তখনও সামলাতে পারেনি নিজেকে। নাক টেনে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, 'আমি ওই বাস্টার্ডটার মুখ দেখব না কোনও দিন—'

বাপকে এভাবে ভেঙে পড়তে দেখে রবিন নিজেও বিচলিত বোধ করছিল। এবার বলল,

'হাউ মেনি টাইমস্, ইউ সেড দ্যাট ড্যাড! কী বলো মা, আমার জন্ম থেকেই বাবা এই কথাটা শুনিয়ে যাচ্ছে! বাস্টার্ড কথাটা অবশ্য আমার খুব পছন্দ। কাম অন ড্যাড, সে ইট অ্যাগেন!'

ডরোথি তখন চোখ মুছছে হাতের ছোট রুমালে। হাসি-ঠাট্টা করে বাপকে ভোলাতে চাইছে রবিন, যেন ওতেই চাপা পড়ে যাবে সব। আর্থারকে তার চেয়ে বেশি আর কে চেনে! ঠাট্টার কথায় তাকে সুদ্ধ জড়ালেও, রবিনের কথার জবাব দিল না ডরোথি। অন্যরাও চুপ করে থাকল।

এসব বেশ কিছুক্ষণ আগেকার কথা—চেক-ইন্ কাউন্টার থেকে বেরিয়ে তখন সবে এই জায়গায় জড়ো হয়েছিল ওরা।

আর্থার পাইবাস এখন শান্ত। অজস্র রেখাঙ্কিত তার মুখে ফুটে উঠেছে এক ধরনের ঔদাসীন্য। জমে ওঠা রক্তের চাপে নাকের ডগায় লালচে ভাবটা পাঁশুটে হয়ে উঠছে ক্রমশ।

সারা-রবিন-স্যামুয়েলের চলে যাওয়া এবং না-যাওয়ার মাঝখানে থমকে আছে সময়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশে উড়বে দিল্লিগামী ইভনিং ফ্লাইট। ওই ফ্লাইটে চলে যাবে ওরা। কাল রওনা হবে সিডনির দিকে। সারার বাপের বাড়ির লোকজন অনেকদিন আগেই চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। রবিন আর সারা, দুজনেই কাজ পাবে ওখানে। স্যামুয়েলেরও একটা ব্যবস্থা হয়ে যেতে পারে।

দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত

এসব সুখের কথা। কিন্তু, এই মুহূর্তে, সুখ দুঃখের চেয়ে পরস্পরের কাছাকাছি থাকাটাই হয়তো আরও বড় ব্যাপার। অন্তত সারার তা-ই মনে হচ্ছিল।

এতকালের চেনা জায়গা ও মানুষজন ছেড়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবার সিদ্ধান্তটা সে-ই নিয়েছিল প্রথম, এ-ব্যাপারে চিঠি লেখালেখি থেকে শুরু করে আর যা যা করার নিজেই করেছিল—রাজি করিয়েছিল রবিন, স্যামুয়েলকেও। রবিন অবশ্য খুব রাজি ছিল না গোড়ার দিকে। জীবনে এই প্রথমই, সম্ভবত, বাপ-মা সম্পর্কে ভাবতে শুরু করেছিল সে, একেবারে অন্য ধরনের একটা চেতনা নাড়া দিচ্ছিল তাকে। এ নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মন কষাকষি কম হয়নি। বাঁকা গলায় সারা জিজ্ঞেস করেছিল, সত্যি-সত্যিই কি রবিন বাপ-মা'র কথা ভাবে? কিংবা স্ত্রী ও ছেলের কথা? কোনও দিনই কি ভেবেছে?

জ্বালাটা কোথায় তা বুঝতে অসুবিধে হয়নি রবিনের; জানত, জবাবটা তার চেয়ে ভাল সারাই দিতে পারে।

এইসব টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে এক সময় রবিনের মনে হয়েছিল, বড় স্বার্থপরের মতো জীবনটা কাটিয়েছে সে। চাকরি একটা করে গেছে বটে, কিন্তু সেটা প্রায় নিজেরই জন্যে—যাকে দেখা বলে সেভাবে কখনও বাপ-মাকে দ্যাখেনি, বউকে দ্যাখেনি, এমনকী ক্রমশ বড় হয়ে ওঠা ছেলেটাকেও দ্যাখেনি। সেদিক থেকে সারার জোর অনেক বেশি।

শেষ পর্যন্ত সারা বলেছিল রবিন যেতে না চাইলেও সে যাবে, স্যামুয়েলকেও সঙ্গে নিয়ে

যাবে। রবিন যেন পরে আক্ষেপ না করে।

মনের দিক থেকে পুরোপুরি সায় না থাকলেও এর পরে যাওয়াটা মেনে নিয়েছিল রবিন। সারা বলেছিল, ওখানে একটু গুছিয়ে বসবার পর আর্থার-ডরোথিকেও টেনে নিয়ে যাবে।

তবে, এত তাড়াতাড়ি যেতে হবে ভাবতে পারেনি। সারা যে কেন অধৈর্য হয়ে উঠেছিল রবিনের কাছে আজও তা রহস্য!

সিকিউরিটি এনক্লোজারের সামনে দাঁড়িয়ে ডরোথির মুখেব দিকে তাকিযে হঠাৎই অন্যমনস্ক হয়ে গেল রবিন। এই বয়স পর্যন্ত বাবার অনেক হাঁকডাক শুনলেও মা তার বরাবরই চুপচাপ। মনে পড়ে ক্রাচ নিয়ে পা-কাটা আর্থারের বাড়ি ফিরে আসা আর বুক-ফাটা কান্না। ডরোথি তখনও ছিল অচঞ্চল; শুধু ছেলে রবিনকে এগিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'লুক অ্যাট হিজ লেগস্। ওর পা দুটো তুমি যেখানে যেতে চাও সেখানেই নিয়ে যাবে।'

ভাবতে ভাবতেই বাষ্পায়িত হয়ে উঠল রবিনের চোখ।

হাওড়ার এক জুট মিলে জুনিয়র সিকিউবিটি অফিসারের কাজ করত রবিন। এখন তার বয়স চুয়াল্লিশ। বয়সকালে হকি খেলেছে কলকাতার মাঠে, বক্সিং জানত, চেহারাটাও ছিল পাকাপোক্ত। দোষের মধ্যে একটু বদমেজাজি। বছর দেড়েক আগে ইউনিয়নের লোকজনের সঙ্গে বচসা হওয়ায় ফ্যাক্টরির মধ্যেই বেধড়ক মার খায় সে—মাথা ফাটিয়ে এবং পাঁজরের হাড় ভেঙে একমাস পড়েছিল হাসপাতালে। আরও মাস দুয়েক বাড়িতে। সেই অবস্থাতেই শোনে উসকানি দিয়ে ইউনিয়নকে দাঙ্গায় প্ররোচিত করার অভিযোগে মিলের ম্যানেজমেন্ট ডিসমিস করেছে তাকে। মিলের মালিকানা এখন মাড়োয়ারিদের—কর্মচারীদের অধিকাংশই হয় বাঙালি না হয় বিহারি ও মুসলমান। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান বলতে সে একাই ছিল। ব্যাপারটা নিয়ে, সুতরাং, কেউই কোনও প্রতিবাদ করেনি। পাঁজবের ভাঙা হাড় জোড়া লাগলেও ঘটনাটা দুর্বল করে দিয়েছিল রবিনকে—চোখের সামনে সারাক্ষণ ভেসে বেড়াত লোহার রড হাতে কয়েকটি হিংস্র মুখ। নিজেও প্রতিবাদ কবতে পারেনি। এর পর থেকেই বেকার হয়ে পড়ে সে।

সারা খড়্গপুরের মেয়ে। রেল কলোনিতে মানুষ। স্কুলের পাট চুকিয়ে কলেজে ঢোকবার আগেই তার বিয়ে হয়ে যায় রবিন পাইবাসের সঙ্গে। মোটামুটি সচ্ছল পরিবার, তাছাড়া শ্বশুর আর্থার পাইবাস লোকটি ছিল খুঁতখুঁতে। বাড়ির বউ বউয়ের মতো থাকবে, এটাই ছিল তার বিধান। এসব অনেক বছর আগেকার কথা। তখন শুধু রিপন স্ট্রিট কেন, আশপাশের গোটা অঞ্চলটায় ঘোরাফেরা করলে তাদের নিজেদেরই মুখ দেখা যেত। দিনকাল, মানুষ, মন—সমস্তই পালটে গেছে আস্তে আস্তে। পাইবাস পরিবারেরও আভিজাত্যের পর্দায় ছিদ্রের সংখ্যা বাড়ছিল; সঙ্গে সঙ্গে রিফুর দাগও। রবিনের চাকরি যাবার পর সেটাকে আর টাঙিয়ে রাখা গেল না।

ইতিমধ্যে টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখে নিয়েছিল সারা। তিন মাসের কোর্স শেষ করার আগেই বড় ননদ রোজালিন একটা বদলি-চাকরি জুটিয়ে দিল তাকে। মাস খানেকের কাজ। রোজালিনদেরই অফিসে। চাকরিটা পাকা না হওয়া সত্ত্বেও সারা ভেবেছিল, খানিকটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল—এর পরে কোথাও না কোথাও পাকা চাকরি পেতে অসুবিধে হবে

না। কিন্তু, এখানে ওখানে হপ্তা, দু' হপ্তা কিংবা পার্ট টাইমের কাজ জুটলেও পাকা বন্দোবস্ত হল না কোথাও। এই সময়েই—যখন রবিন বেকার এবং রোজগারপাতির ব্যাপারে সে নিজেও অনিশ্চিত—আকস্মিক একটি ঘটনায় সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ল সারা।

স্যামুয়েলের অস্ট্রেলিয়া

স্যামুয়েল পড়ত ডন বসকোয়। নামেই পড়া। আই-সি-এস-ই-তে পৌঁছুবার আগেই লুকিয়ে মদ, গাঁজা খেতে শিখেছিল ছেলেটা। ধরা পড়ে যাওয়ায় ব্যাড কন্ডাক্টের জন্যে ওকে ছাড়িয়ে নিতে হল স্কুল থেকে। অন্য কোনও স্কুলেও ঢোকানো গেল না। লেখাপড়া করাটা যে জরুরি এই বোধ কোনও দিনই কাজ করেনি স্যামুয়েলের মাথায়; এত কাণ্ডের পরেও তাকে দেখে মনে হল না সে নিজের ভবিষ্যতের জন্যে চিন্তিত। সাইকেল নিয়ে দিনরাত ঘুরে বেড়ায় টো-টো করে—কোথায় যায় না যায় তার কোনও হদিশই পাওয়া যায় না।

একদিন সন্ধেবেলায় কিড স্ট্রিট দিয়ে আসতে আসতে রবিনের হঠাৎ চোখে পড়ল, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মোড়ে একটা বাড়ির সরু দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসছে স্যামুয়েল। দেখেই বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল তার। বাড়িটা চেনা। সরু দরজা দিয়ে ঢুকে সিঁড়ি উঠে গেলে বেশ্যাদের আড্ডা। ওখানে যেতে-যেতেই তাব বন্ধু ম্যাকলিয়ড স্ট্রিটের ডেভিড আক্রান্ত হয়েছিল গনোরিয়ায়—অনেক চিকিৎসা করার পরও রোগ সারেনি; আস্তে আস্তে পাগল হযে গিয়েছিল ডেভিড। ওকে পাঠানো হয়েছিল রাঁচিতে। সেখানেই মারা যায় সম্ভবত। ওদেব পরিবারের লোকজন ততদিনে চলে গেছে কলকাতা ছেড়ে; ডেভিডের মৃত্যুর খবরটা রবিন জানতে পারে খবরের কাগজে 'ডেথ' কলাম পড়ে। কিন্তু স্যামুয়েল ওখানে কেন!

নিজে চিন্তায় পড়লেও ঘটনাটা সারার কাছে চেপে গেল রবিন। আর কাউকেও বলেনি। ছেলেটা মাথা-পাগলা ও আহ্লাদে, লোক চিনতে শেখেনি একেবারে, ওর পক্ষে যার তার সঙ্গে ভিড়ে যাওয়া অসম্ভব নয় কিছু। কিন্তু প্রায় আঠারো বছর বয়স হলেও মেয়েদেব সম্পর্কে কোনও দুর্বলতা আছে বলে মনে হয় না। সে কি ভুল দেখেছিল তাহলে! হয়তো তা-ই।

ভাবতে ভাবতে একদিন বিকেলে নিজেই সেই বাড়িটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল রবিন, তারপর সরু দরজা দিয়ে ঢুকে পড়ল ভিতরে। রাস্তা থেকে সিঁড়ি চোখে পড়লেও, দেখল, সিঁড়ির পাশে আড়াল হয়ে থাকা আয়তক্ষেত্রের মতো জায়গাটিতে ছোট্ট একটি দোকান। দেয়ালে কাচের শো-কেসে নানা দেশের ডাকটিকিট। নীল বুশসার্ট পরা ক্ষয়া চেহারার একটি বয়স্ক লোক বসেছিল কাউন্টারের পিছনে। রবিনকে দেখেই উঠে দাঁড়াল।

'আসুন, মিস্টার পাইবাস। হোয়াট ক্যান আই ডু ফর ইউ?'

এইভাবে, হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত, তার নাম ধরে সম্বোধন করায় ঘাবড়ে গেল রবিন। লোকটির মাথার চুল অর্ধেক পাকা, চওড়া কপালের তুলনায় মুখের নিম্নাংশ ছোট, খুব মোটা,

কাঁচাপাকা ভুরুর তলায় চোখ দুটিও ছোট ও নিষ্প্রভ। কিন্তু ঠোঁটের হাসিটুকু সহজ। হঠাৎ দেখলে লোকটিকে সরলই মনে হবে।

রবিন জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

'অনুমান করলাম।' লোকটি তার হাসি আরও একটু ছড়িয়ে বলল, 'স্যামুয়েলের সঙ্গে আপনার চেহারার আশ্চর্য মিল।'

'স্যামুয়েলকে চেনেন?'

'নিশ্চয়ই।' লোকটি এবার নিজের পরিচয় দিল, 'কল মি কুরুভিলা। আই অ্যাম ফ্রম কেরালা। আ ক্রিশ্চান। আপনার ছেলে স্যামুয়েল প্রায়ই আসে এখানে—স্ট্যাম্প দ্যাখে।'

রবিনের বুক থেকে একটা ভার নেমে যাচ্ছিল। আড়ে তাকিয়ে দেখল সিঁড়িতে ওঠার মুখে দেয়ালে একটি 'হোটেল' লেখা বোর্ড, তীর এঁকে ওপরে যাবার রাস্তা দেখানো। কী ভাগ্যিস শুধু চোখের দেখায় নির্ভর করে স্যামুয়েলের ওপর চোটপাট করেনি, রবিন ভাবল, এই একটি ব্যাপারে অন্তত সত্যিকারের সংযমের পরিচয় দিয়েছে সে।

কাউন্টারের নীচে ঝুঁকে কিছু খোঁজাখুঁজি করছিল কুরুভিলা। এবার একটা সেলোফেনে মোড়া চৌকো প্যাকেট বের করে রবিনের সামনে রাখল।

'আপনার ছেলে অস্ট্রেলিয়ার ডাকটিকিটের জন্য পাগল। দিস্ ইজ আ নিউ সেট অফ ফোর স্ট্যাম্পস। অল ক্যাংগারুজ। রেয়ার কোয়ালিটি, স্যার। আপনি কি নিয়ে যাবেন ওর জন্যে? দাম বেশি নয়—জাস্ট ফোর রুপিজ—'

কিছু বা শূন্য দৃষ্টিতে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রবিন। এত কথার মধ্যে শুধু অস্ট্রেলিয়া নামটিই মাথায় গেঁথে গেছে তার; অন্যমনস্ক ভাবে ভাবল, সারা একাই নয় তাহলে—ছেলেটাও স্বপ্ন দেখছে অস্ট্রেলিয়ার! মাঝে মধ্যে সিডনি থেকে ওর মামা-মাসিদের যে-চিঠি আসে সেগুলো রবিন পড়েও দ্যাখে না। এমনও হতে পারে, ওগুলোর মধ্যেই লুকিয়ে থাকে হাতছানি! মায়ে-পোয়ে বেশ শুরু করল যা হোক!

চোট-লাগা পাঁজরে অল্প শিরশিরানি অনুভব করল রবিন। নিজেকে ধাতস্থ করতে সময় লাগল না। ডাকটিকিটের প্রতি কোনও মোহ নেই তার, অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কেও না। কিন্তু লোকটি তাকে চিনে ফেলেছে, স্যামুয়েল সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হবার মতো খবর দিয়েছে ইতিমধ্যে। এখন কিছু না কিনে চলে যাওয়াটা খারাপ দেখাবে।

'ইয়েস, অফ কোর্স!' বলে চটপট পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল রবিন, 'আমি স্যামুয়েলের খোঁজেই এসেছিলাম—'

ডাকটিকিটের প্যাকেটটা বুক পকেটে নিয়ে রাস্তায় নেমে আবার বাড়িটার দিকে তাকাল রবিন। দোতলায় পর পর চারটি ছোট জানালা; কোনওটায় সাদা, কোনওটায় ছিটের আধময়লা পর্দা লাগানো। তৃতীয় জানালাটির পর্দার ওপর দিকে হঠাৎ একটি মেয়ের মুখ ভেসে উঠল। রুক্ষতা মেশানো খসখসে চেহারা—সোজা চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। রবিন আর দাঁড়াল না।

স্যামুয়েলকে নিয়ে দুশ্চিন্তাটা তবু থেকে গেল মাথায়। পড়াশুনো হল না, অন্য কিছু করার দিকেও উৎসাহ নেই। ছেলেটার ভবিষ্যৎ কি?

বিপর্যয়ের শুরু

শেষ পর্যন্ত একে ওকে ধরাধরি করে মোটর মেকানিকের কাজ শেখার জন্যে ছেলেকে একটা গ্যারাজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল রবিন। কিন্তু পাইবাস পরিবারের ঝামেলা তাতেও শেষ হল না।

মাস দুয়েক যেতে না যেতেই বিনা লাইসেনসে গাড়ি চালানো এবং অ্যাক্সিডেন্ট করার জন্যে পুলিশের হাতে পড়ে স্যামুয়েল। ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে কী হয়েছিল কে জানে, রবিনকেও আটকে দিল পুলিশ।

রিপন স্ট্রিটে আর্থার পাইবাসের ভাঙাচোরা বাড়িতে যখন এসব ঘটনা ঘটছে, তখন থানা-পুলিশ জামিনের ব্যবস্থা করার জন্যে কাউকেই পাওয়া যায়নি। ছিলই বা কে! রোজালিনের স্বামী মাইকেল পিয়ার্স দাম্ভিক প্রকৃতির, গা-বাঁচানো লোক; তাছাড়া রবিন তাকে পছন্দও করে না তেমন। বাকি থাকে অড্রির স্বামী অলোক দত্ত। কিন্তু এ বাড়ির জামাই হলেও অলোকের সঙ্গে পাইবাসদের দেখা হয় কালেভদ্রে—সামাজিক মেলামেশা নেই বললেই হয়। আলগা হতে হতে ওর সঙ্গে সম্পর্কটা এখন এতই দূরত্বপূর্ণ যে কোনও পারিবারিক জমায়েতেও অলোকের আসা নিয়ে মাথা ঘামায় না কেউ। অড্রি কষ্ট পায়, মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও করে, এই যা। এইসব সময়ে আর একজনের কথাও মনে পড়ে। সে আর্থার-ডরোথির ছোট মেয়ে, লরা। বছর খানেক আগে হলে লরাই হয়তো তার পরিচিত কোনও হোমরাচোমরাকে ধরে যাহোক একটা ব্যবস্থা করে ছাড়িয়ে আনত ওদের। মিশনারি স্কুলে টিচারি করে অনেক ছেলেমেয়ের বাপ-মায়ের সঙ্গেই ভাল খাতির হয়ে গিয়েছিল মেয়েটার। কিন্তু মাস আষ্টেক আগে রাঁচির এক মিশনারি স্কুলে চাকরি নিয়ে চলে গেছে লরা; ছুটিছাটা ছাড়া আসতে পারে না।

পাইবাস পরিবারের সঙ্কটে রিপন স্ট্রিটের আর পাঁচটি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পরিবারের লোকজন সহানুভূতি দেখালেও সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে এল না কেউ। কেলেঙ্কারি হবার সম্ভাবনায় আর্থারকে যেটুকু না বললেই নয় তার বেশি বলা হয়নি। কেউ কেউ পরামর্শ দিল বুড়ি ডরোথিকে নিয়ে থানায় চলে যাক সারা। অ্যাক্সিডেন্ট করলেও গাড়ি নিয়ে বেকায়দায় ল্যাম্পপোস্টে ধাক্কা মেরেছিল স্যামুয়েল, কেউই হত বা আহত হয়নি। এটা গুরুতর কোনও অপরাধ নয়। আর রবিন যা গোঁয়ার, বোধহয় মেজাজ দেখিয়েছিল পুলিশকে—তা না হলে ছেলেকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেও ফেঁসে যাবে কেন! বুঝিয়ে বললে, অনুনয়-বিনয় করলে, পুলিশ হয়তো ছেড়ে দেবে। এ-পাড়ার মানুষ পুলিশকে ভয় পায় খুব। কেউই চায় না অন্যের উপকার করতে গিয়ে নিজে কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ুক।

আর্থার পাইবাস পেশায় ছিল সৈনিক। ব্রিটিশ আর্মিতে থাকতে থাকতেই বার্মা মুলুকে গুলিবিদ্ধ হয়, বাঁ পা-টা কেটে বাদ দিতে হয় হাঁটুর নীচে থেকে। কিন্তু, পঙ্গু ও ক্রাচ-নির্ভর হয়ে পড়লেও তার প্রাণ এবং আয়ু দুটোই থেকে যায় টাটকা। এখন তার বয়স আশির কাছাকাছি। মাঝে মাঝে যৎসামান্য পেনসনের টাকা হাতে এলে এতদিন পরেও যোদ্ধার দর্প টের পায় বুকে। আর্থারের তখনকার অবস্থাটা দেখবার মতো। বারান্দার পুরনো ও বেত-ছেঁড়া ইজিচেয়ারের চওড়া হাতলে এক পা তুলে দিয়ে যুদ্ধের গল্প করে নাতি-নাতনিদের কাছে, অল্প বয়সেই বুড়িয়ে যাবার জন্যে খোঁটা দেয় ডরোথিকে এবং সে

যে খাঁটি ইংরেজ—ইন্ডিয়ায় না থেকে ইংরেজরা ইন্ডিয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ডে চলে গেলে কত মর্যাদা পেত তা নিয়ে আক্ষেপ করতে করতে গালিগালাজ শুরু করে নিজের ছেলেমেয়েদেরও। তারা সবাই বাস্টার্ড, আর্থারের আক্ষেপ তারা কেউই তার রক্ত পায়নি। মনে হয় এসব কথা বলে একরকম সুখও বোধ করে সে। পেনসনের টাকার অনেকটাই চলে যায় বিয়ারের বোতল জুগিয়ে তাকে শান্ত করতে। গত তিনটি সাধারণ নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পাইবাস পরিবারের কেউই ভোট দিতে যায়নি।

একে পঙ্গু তায় আবেগপ্রবণ, এ হেন লোককে নিয়ে ছোটাছুটি করা যায় না। ডরোথিও চুপচাপ মানুষ, ওকে সঙ্গে নেওয়া না-নেওয়া দুই-ই সমান। তাছাড়া ডরোথিও সঙ্গে গেলে আর্থারকে দেখবে কে।

স্বামী ও ছেলেকে ছাড়িয়ে আনতে, সুতরাং, সারাকেই ব্যস্ত হতে হল।

সারার হয়রানি

স্বাস্থ্য ও লাবণ্যে আকর্ষণীয়া হলেও সারা সুন্দরী নয়। তার ছত্রিশ বছর বয়সের সৌন্দর্য ধরা পড়ে চোখমুখের প্রচ্ছন্ন বিষাদে। রবিনের সঙ্গে বিয়ের পর প্রথম কয়েকটি বছর মোটামুটি সুখে কাটালেও সে-সুখ স্থায়ী হয়নি। ইদানীং প্রায় সারাক্ষণ ভাগ্য এবং মাঝে মাঝে ভগ্নমন স্বামীর মার খেতে খেতে এরই মধ্যে সে বুঝে নিয়েছিল কত ধানে কত চাল; নিজের মনে ক্রমশ একা হতে হতে জীবন ও বেঁচে থাকা সম্পর্কে একটা ধারণাও সে করে ফেলেছিল। অর্থাৎ, এসব দেখেশুনে সে যদি আত্মহত্যা করে তাহলে মরেই যাওয়া হবে। কিন্তু সে কি মরবার জন্যেই এসেছিল? সারার ঈষৎ ভারী চেহারার মতো তার মনটিও ছিল ভারী—কথাবার্তা কম বলত, ভাবত বেশি। প্রশ্নটা তাকে অন্যমনস্ক করে তুলেছিল।

বছর তিনেক আগে তার দুই ভাই, এক বোন আর মা চলে গেছে অস্ট্রেলিয়ায়। ভাইদের মধ্যে বড় রবার্ট; লেখাপড়ায় কৃতী, স্বভাবে ধার্মিক। কলকাতার এক অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে কপিরাইটারের কাজ করত, কিছুদিনের মধ্যেই এমন সুনাম করে ফেলে যে কোম্পানি থেকেই তাকে পাঠানো হল মেলবোর্নে ট্রেনিং নিতে। ছ' মাস পরে রবার্ট ফিরে এল ওখানেই চাকরির ব্যবস্থা করে। রবার্টের ছোট, ইয়ানও এজেন্সিতে ভিস্যুয়ালাইজারের কাজে দক্ষ হয়ে উঠেছিল ইতিমধ্যে—ওকেও অস্ট্রেলিয়ায় টেনে নিয়ে গেল রবার্ট। সঙ্গে মা আর বোনও গেল গুছিয়ে বসতে। ওদের চিঠিপত্তর থেকেই সারা বুঝতে পারে, ঠিকঠাক বেঁচে থাকার মতো এখনও অনেক জায়গা আছে পৃথিবীতে। আহ্, কোনও ভাবে যদি সেও চলে যেতে পারত সেখানে।

এই দুঃখ থেকেই স্বপ্ন দেখত সে—রবার্ট আর ইয়ানকে চিঠি লিখত, যদি কোনওরকমে তাদেরও একটা হিল্লে করে দিতে পারে। আজকাল অনেকেই কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছে এখানে ওখানে। কিছুদিন আগে তাদের পাড়ার মিসেস গ্রাহামরা চলে গেছে কানাডায়; স্টলমেয়ার পরিবারও যাবে শুনছে। খুব শিথিল ভাবে কখনও বা মনে পড়ত, বিয়ের পর খড়্গপুর থেকে যখন সে পাইবাসদের রিপন স্ট্রিটের বাড়িতে আসে, তখন শুধু এ-পাড়াটা

কেন, আশপাশের অনেকটা অঞ্চল ছিল তাদেরই দখলে—তাদের নিয়েই গমগমে। বড়দিন ঘিরে দিন পনেরো সে কি আহ্লাদ, উন্মাদনা আর উৎসব! এখন অনেক বাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে, প্রায়ই দেখা যায় নতুন নতুন মুখ—রবিবার সকালে গির্জায় গেলে বোঝা যায় পৃথিবীটা ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ।

থানায় কেউই পাত্তা দিল না সারাকে। ইন্সপেক্টর বলল, কেস উঠলে কোর্টে গিয়ে ছাড়াতে—সারার যদি মনে হয় লঘু পাপে গুরুদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, তাহলে, ইচ্ছে করলে, সে পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগও করতে পারে। সারা জানে এসব হ্যাফার মানে কী। গভীর এক হতাশা চেপে বসল তার বুকে।

অসহায় অবস্থায় সে যখন ফিরে আসছে থানা থেকে তখন এক সেপাই ধরল তাকে। ইন্সপেক্টরের সঙ্গে কথা বলবার সময়েই অফিসে ঘুরঘুর করতে দেখেছিল লোকটিকে, চিনতে অসুবিধে হল না। সেপাই বলল, বড়বাবুকে বলে ব্যাপারটার মীমাংসা করে দিতে পারে, তবে সেজন্যে টাকা লাগবে হাজারখানেক। তাকেও দিতে হবে কিছু। এইটেই উপায়। তা না হলে পুলিশের কাজ পুলিশে করবে। আর, একবার কেস উঠলে কি সহজে মিটবে!

জুট মিলের চাকরি থেকে ডিসমিস হবার পর রবিন যে টাকা পেয়েছিল তার সবই গচ্ছিত ছিল ব্যাঙ্কে। এখন সেখান থেকেই টাকা তুলে সংসার চলে পাইবাসদের। উপায় না দেখে পরের দিন দুপুরের মধ্যেই টাকাটা তুলে থানায় ফিরে এল সারা।

কাল বিকেল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত বুড়ো-বুড়ির কাছে কী হল না হল'র জবাবদিহি করতে করতে নাজেহাল হতে হয়েছে তাকে। কাল অবশ্যই ওদের ছেড়ে দেবে বলে বুঝিয়ে বাঝিয়ে আর্থার-ডরোথিকে সামলাতে পারলেও দুশ্চিন্তায় ঘুমোতে পারেনি নিজে। এ ধরনের অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয়নি; হাতে পায়ে খিল-ধরা এরকম অনুভূতিও কি কখনও টের পেয়েছে আগে? রিপন স্ট্রিটের কুকুরগুলোর পরস্পরবিরোধী চিৎকার ছাড়া আর কোনও শব্দ ছিল না কোথাও; জানালা দিয়ে ঢুকে পড়া ক্ষীণ চাঁদের আলোয় দেয়াল ও ঘরের আসবাবপত্রগুলো অন্যরকম লাগছিল চোখে। ঠিক কী রকম বুঝতে পারেনি সারা। তবে অসহায় চোখে এসব দেখতে দেখতে হঠাৎই তার মনে হয়েছিল গারদের অন্ধকারে স্যামুয়েল আর রবিনও নিশ্চয়ই জেগে আছে এখনও। দু'জনে কি এক জায়গাতেই আছে! ওরা কি জানে সারা চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি! এলোমেলো এইসব ভাবনার সঙ্গে আরও একটা ভাবনা মাঝে মাঝে ছুঁয়ে যাচ্ছিল তাকে—হয়তো সে যা ভাবছে তা-ই শেষ নয়, হয়তো বড় কোনও অশুভ অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্যে, এই মুহূর্তে তার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারছে না সে! এইভাবে, দূরে কোথাও পর পর দু'বার ঘণ্টা বাজার পর বুঝতে পারে, রাত দুটো বেজে গেল; খুব দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়। আজ কাটছে বলে কালও যে কাটবে তার নিশ্চয়তা কোথায়! বিছানা থেকে উঠে তখন সে একটা ঘুমের বড়ি খেয়েছিল। কাজ হয়নি খুব। অস্বস্তিটা এখনও ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে।

বড়বাবুর কাছে

সেপাই তাকে নিয়ে গেল বড়বাবুর কাছে। রাশভারী চেহারা এবং গম্ভীর মুখের লোকটি কিছু বলবার আগে এমন ভাবে তার আপাদমস্তক দেখে নিল যে মনে হবে এখুনি বলে উঠবে, এটিকে আবার কোথা থেকে জোটালে! সামনে দু'জন লোক ছিল, তাকে বসতে বলে লোক দু'টির সঙ্গে আলাপে ফিরে গেল বড়বাবু। সুইসাইড কথাটা কানে এল সারার—লোক দু'টির মধ্যে যে রোগা আর অল্পবয়স্ক তাকে বিচলিত দেখাচ্ছে খুব, মনে হয় কোনও আত্মহত্যার ঘটনা নিয়ে আলোচনা করছে ওরা। ক্রমশ আরও গম্ভীর দেখাচ্ছে বড়বাবুকে। একটু পরে ডেকে পাঠাল একজন ইন্সপেক্টরকে—সারা দেখল, কাল বিকেলে যে ইন্সপেক্টরটির সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল এ-লোকটি সে নয়; কিছু নির্দেশ দেবার পর লোক দু'টি বেরিয়ে গেল ইন্সপেক্টরের সঙ্গে। এতক্ষণ পরে সারার দিকে চোখ তুলে বড়বাবু বলল, 'ইয়েস, ম্যাডাম?'

সেপাইটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল দরজার কাছে। সারা দু' চার কথা বলবার পরেই তাকে থামিয়ে দিয়ে মাথা নাড়ল বড়বাবু, কেসটা তার জানা আছে। হয়তো সেপাইটাই আগেভাগে গেয়ে রেখেছে সব কিছু।

তবে, কেসটা ঝামেলার। বড়বাবু বলল তার কাছে খবর আছে রবিন অনেক গোলমেলে কাজের সঙ্গে যুক্ত, ছেলেটাকে ছাড়া গেলেও প্রপার ইনভেসটিগেসন না হওয়া পর্যন্ত রবিনকে ছাড়া যাবে না। আর, ছেলেটাকেই বা ছাড়া যাবে কী করে! একে লাইসেনস ছাড়া গাড়ি চালিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে, তার ওপর কেউ যদি মারা যেত তাহলে তো খুনের দায়ে সাজা পেত। এখানে খুন করা আর না-করার মধ্যে তফাতটা সামান্য, তবে দোষ একই ধরনের। সারা কি এসব বুঝবে?

বলতে বলতেই খুব মনোযোগ দিয়ে সারাকে নিরীক্ষণ করল বড়বাবু। তারপর হঠাৎ বলল এখন তার অনেক কাজ, এখনই কোনও কথা দিচ্ছে না সারাকে। সন্ধের পর ফ্রি হলে কিছু করা যায় কি না দেখবে। আর কোনও কথা না বলে পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল বড়বাবু।

সারা চেয়েছিল অন্তত স্বামী ও ছেলের সঙ্গে একবার দেখা করার অনুমতি চাইবে। সুযোগ পেল না।

সেপাইটি অনেকটা রাস্তা তার সঙ্গে সঙ্গে এল। সান্ত্বনা দিয়ে বলল, ঘাবড়াবার কিছু নেই। বড়বাবু যখন একবার বলেছেন দেখবেন, তখন দেখবেনই—দুটো কেসই খালাস হয়ে যাবে। খালাস করার ইচ্ছে না থাকলে সোজা না বলে দিত। সাড়ে সাতটা, আটটা নাগাদ আবার আসুক সারা। এসব বলে রাস্তার মধ্যেই দাঁড়িয়ে টুপি খুলে মাথা চুলকোতে চুলকোতে লোকটি বলল, টাকাটা যখন সঙ্গেই আছে তখন তার প্রাপ্য দুশো টাকা—, ইত্যাদি।

সারা বুঝল, এই লোকটা ভাইটাল, এখন পর্যন্ত যা করার এই লোকটাই করেছে—মুখে হেঁ হেঁ করলেও টাকাটা না পেলে পরে বাগড়া দিতে পারে। সুতরাং, দ্বিধা না করে টাকাটা বের করে দিল সে।

আশপাশে তাকিয়ে সেপাই বলল, সন্ধেবেলায় তার ডিউটি নেই, সিনেমায় যাবে ভেবেছিল, তবু সারার জন্যেই সে অপেক্ষা করবে থানায়।

সেদিন সন্ধের পর যথাকথা থানায় উপস্থিত হল সারা। সেপাই বলল, বড়বাবু রাউন্ডে বেরিয়েছেন, কখন ফিরবেন ঠিক নেই। তবে 'এই' ঠিকানায় গেলে দেখা হতে পারে। ব্যাপারটার আজই হেস্তনেস্ত করে নেওয়া দরকার—যাতে আজই ছাড়া পেয়ে যায় দু'জনে। কাছেই তো, মিছিমিছি সময় নষ্ট না করে সে বরং চলে যাক। সাব-ইন্সপেক্টরবাবু নতুন লোক আর খুব টিটিয়া, সামনে পড়লে ঝামেলা করতে পারে। টাকাটা সঙ্গে আছে তো?

সেপাই নিজেই তাকে ট্যাক্সি ডেকে দিল। বলল, 'বিলকুল বেফিকির রহো মেমসাব। আগর তুম ঠিক রহো তো ভগবান সাথ হ্যায়। আজই খালাস হো যায়গা।'

সারার গলার হারে লকেটের জায়গায় সোনার ক্রশ ঝোলানো। রবার্ট এনে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া থেকে। ভগবানের কথায় সেটা ছুঁয়ে ক্রশ চিহ্ন আঁকল বুকে। তারপর ট্যাক্সির পিছনে গা এলিয়ে দিয়ে ভাবল, জীবন একার—একারই, তবু বেঁচে থাকার জন্যে সকলকে জড়াতে হয় কেন!

বলাৎকারের পটভূমি

নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছে বড়বাবুকে একাই পেল সারা। তবে সকালে থানায় যেমন দেখেছিল, গম্ভীর-গম্ভীর, একেবারেই সেরকম নয়। এমনভাবে আপ্যায়ন করল তাকে যেন সে না এলে ভীষণ হতাশ হত। এটা কি বড়বাবুরই ফ্ল্যাট? হবেও বা। সারা বিশেষ কিছু ভাববার সুযোগ পেল না। শুধু ভাবল, ছলাকলা যতই থাক, ব্যবস্থা হিসেবে এটাই ঠিক—ঘুষের টাকা সকলের সামনে নেওয়া যায় না।

দরজা বন্ধ করে, কাছে বসিয়ে, একটু পরেই যখন আরও কাছে ঘেঁষে এল বড়বাবু এবং বড়বাবুর হাতের থাবা তার বুক স্পর্শ করল, তখনও, একটু হকচকিয়ে গেলেও, সারা বুঝতে পারল, এটাও স্বাভাবিক—ব্যাপারটায় নতুন কিছু নেই। শেষ যে-লোকটির দয়ায় সে টেলিফোন অপারেটরের চাকরি পেয়েছিল, চাকরি পাবার দিন সাতেকের মাথায় সেই লোকটিও একদিন তাকে ট্যাক্সিতে তুলে হাত দিয়েছিল বুকে। সেদিন মাথা ঠাণ্ডা রেখে লোকটিকে আরও একটু এগোবার সুযোগ দিলে চাকরিটায় টিকে যেত সে। কিন্তু, কী যে জ্বালা আর গোঁয়ার্তুমি ঢুকে গেল তার মাথায়—লোকটাকে যা-তা খিস্তি করে ট্যাক্সি থেকে নেমে গিয়েছিল সে। আজকের ব্যাপারটা অন্য, তার ওপর থানার বড়বাবু বলে কথা! বাধা দিলে তাকেও ভরে দিতে পারে।

সেপাইয়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠবার আগে অবশ্য মুহূর্তের জন্যেও ভাবতে পারেনি শেষ পর্যন্ত এইরকম একটি জায়গায়, এই অবস্থার মধ্যে এসে পড়বে সে। জানলেও কি ফিরে যেত? কপালে ঘাম ফুটিয়ে সরে গেল প্রশ্নটা। নিজেকে নিজেই বুঝতে না-পারার মতো অসহায়তা আর কিসে আছে! নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল স্যামুয়েলের মুখ, রবিনের মুখ, ডরোথি আর আর্থার পাইবাসের মুখ। কাঠের মেঝেয় ক্রাচ নিয়ে ঘোরাফেরা করলে অদ্ভুত একটা শব্দ ওঠে চারদিকে; সেই শব্দটাই এখন ঢুকে পড়ল মাথায়।

সারার এবংবিধ চিন্তার মধ্যে বড়বাবুর থাবা আরও বড় এবং হাতটি আরও লম্বা ও সক্রিয় হয়ে উঠল। রবিনের নিঃশ্বাসের গন্ধ চেনে বলেই বড়বাবুর নিঃশ্বাসের গন্ধটিও চিনতে অসুবিধে হল না সারার। শুধু সম্পর্কই আলাদা করে দিচ্ছে দু'জনকে; তার অনুভূতিগুলিকেও।

খানিক এদিক-ওদিক করে, নিঃশ্বাস নেবার জন্যে নিজেকে আলগা করে নিল বড়বাবু। মিহি হেসে বলল, 'এত কাঠ- কাঠ কেন গো মেয়ে। লজ্জা করছে নাকি?'

বলতে বলতেই তার হাতের লকেটটি হাতে তুলে নিল বড়বাবু। উলটেপালটে দেখে বলল, 'এ যে দেখছি ধম্মের ব্যাপার! এটা থাকতেই হবে নাকি, অ্যাঁ! আমি বাপু এসবে বিশ্বাস করি না। ধম্মেও নয়, পাপেও নয়। কোনও পিক অ্যান্ড চুজ নেই—একেবারে সেকিউলার!'

আজন্ম বাঙালিদের কাছাকাছি থাকতে থাকতে বাংলায় বলা কোন কথাটির কী অর্থ তা পুরোপুরি বুঝতে না পারলেও কিছু-কিছু অনুমান করতে পারে সারা। এখন অবশ্য বড়বাবুর আহ্লাদিত কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছুই তার বোধগম্য হল না। এক ধরনের অবসাদে এরই মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল সে, চিন্তার মধ্যেও ধারাবাহিকতা ছিল না। নতুন কিছু ভাববার আগেই হা-ভাতের আবেগে তপ্ত বড়বাবুর মুখ আবার তার মুখের ওপর এসে পড়ল।

সেদিন সন্ধ্যায় তাকে যথা প্রয়োজন বলাৎকার করল বড়বাবু। তবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়—সারা কোনওরকম বাধা দিলে এরকম বলা যেত। তার যত্ন আত্তিতেও ত্রুটি হয়নি কিছু। যে-টাকাটা দেবার জন্যে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সেটা সঙ্গে নিয়েই ক্লান্ত এবং হতচকিত অবস্থায় হাঁটতে-হাঁটতে রিপন স্ট্রিটে ফিরে আসে সে। সঙ্গে টাকা থাকা সত্ত্বেও কেন যে সে ট্যাক্সি বা রিকশা নেয়নি তা সে নিজেও জানে না। সম্ভবত সে মৃত্যু চিনেছিল; এমনও হতে পারে এর পরেও বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজতে গয়ে নিজের মধ্যেই দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। হাঁটতে হাঁটতেই, ইতিমধ্যে একবার শরীর ভারী লাগায় ফুটপাথে একটা বন্ধ দোকানের সিঁড়িতে বসে জিরিয়ে নিয়েছিল খানিকক্ষণ— চোখে মাঝঘুমের জড়তা। এটুকু বুঝতে পারছিল সে যা ছিল এখন আর তা নেই। স্যামুয়েল, রবিন ছাড়া পেলেও এসব কথা সে বলতে পারবে না কাউকে।

অপমানের পরে

এলিয়ট রোডের কাছে রাস্তা পার হবার সময় ট্রামের জোরালো ঘণ্টা শুনে অনেকক্ষণ পরে আবছা ভাবে নিজেকে খুঁজে পেল সারা। রাত হলেও রাস্তা সুনসান হয়নি এখনও। তবে লোকজন কম। হর্ন বাজাতে বাজাতে দ্রুত পার্ক স্ট্রিটের দিকে ছুটে গেল একটা গাড়ি। বন্ধ জুতোর দোকানের সামনে ভাড়ার জন্যে অপেক্ষা করছিল একটা রিকশা—তাকে আশা করেই সম্ভবত হাতলে ঠুকে ঠুকে কয়েকবার ঘণ্টি বাজাল রিকশাঅলা, ঠুন ঠুন শব্দটা আরও কিছু দূর অনুসরণ করল তাকে। রিপন স্ট্রিটে ঢোকার মুখে রাস্তার ধারে রেস্তোরাঁয় খাওয়াদাওয়া করছে ক'জন লোক। উনুনের গনগনে আঁচে ঝলসানো শিক কাবাবের গন্ধে

ভারী হয়ে ওঠা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিতে নিতে সারা দেখল, রিকশায় চেপে রিপন স্ট্রিটের ভিতরে চলে যেতে যেতে একজোড়া যুবক-যুবতী পিছন ফিরে দেখছে তাকে। চেনার আগ্রহ নেই বলেই চিনতে পারল না। আরও কয়েক পা এগোলে কাঠ চেরাইয়ের কারখানা, প্রিন্টিং প্রেস এবং ডাক্তার মরিসের চেম্বার। সবুজ-ধোয়া পাইবাসদের বাড়ির কাঠের গেটটা চোখে পড়ার আগেই বাড়িটা চোখে পড়ল। আলো জ্বলছে দোতলায়। গেট পেরিয়ে ছোট লন, বাঁদিকে এগিয়ে কাঠের সিঁড়ি। যতই দেরি হোক আর অপার্থিব লাগুক নিজেকে, তার বাড়ি ফেরায় ভুল হয়নি কোনও।

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে উঠতেই দেখল, সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে আছে রবিন। জানত বলেই এ দেখায় আকর্ষণ ছিল না কোনও, সুতরাং আশ্বস্ত কিংবা অস্বস্তি কিছুই বোধ করল না সারা। অন্যমনস্ক ভাবে শুধু ভাবল, রবিন ফিরে থাকলে স্যামুয়েলও ফিরেছে।

কিন্তু, পরের ঘটনার জন্যে আদৌ প্রস্তুত ছিল না সে।

বউকে হাতের নাগালে পেয়েই চোটপাট, মারধোর শুরু করে দিল রবিন।

'কোথায় ছিলি, ব্লাডি বীচ! স্বামী মরছে হাজতে পচে আর তুমি বেরিয়েছ ফুর্তি মারতে! আজ তোকে খুনই করে ফেলব!'

রবিন বরাবরের রগচটা। একের পরে এক ঝামেলায় ফেঁসে ইদানীং আরও খিটখিটে আর বদমেজাজি হয়ে উঠেছিল। পুরো দুটো দিন গারদে থেকে রাগে আর অপমানে নিজেকে ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছে করছিল তার। ইতিমধ্যে ছেলেকে গালিগালাজ করেছে, পুলিশের বিরুদ্ধে মামলা করবে বলে শাসিয়েছে অনেকবার। এর ওপর বাড়ি ফিরে বউকে দেখতে না পেয়ে সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সারার ওপর।

হয়তো মেরেই ফেলত। কিন্তু রবিনের চ্যাঁচামেচি শুনে তখনই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল স্যামুয়েল আর বুড়ি ডরোথি। ক্রাচ ঠুকতে ঠুকতে আর্থার পাইবাসও।

ছুটে গিয়ে মারমুখী বাপকে আটকে ধরল স্যামুয়েল। মারের প্রথম ঝটকাতেই ভারসাম্য হারিয়ে মেঝেয় পড়ে গিয়েছিল সারা। ডরোথি টেনে তুলল তাকে।

'বাস্টার্ড, আমি বলিনি ও একটা বাস্টার্ড!' ক্রাচের ওপর ঝুঁকে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল আর্থার পাইবাস, 'হাজতই তোর জায়গা রে হতভাগা! যা সেখানে! পুলিশ কেন ছেড়ে দিল তোকে!'

'কী ধরনের লোক তুই!' ডরোথির গলায় একই সঙ্গে অপমান আর অসহায়তা, ছেলেকে ধমক দিয়ে বলল, 'বলিনি তোকে, তোদের ছাড়ানোর জন্যে থানায় গিয়েছিল মেয়েটা। ওহ্ ক্রাইস্ট, কী সব ঘটছে আমাদের বাড়িতে!'

ততক্ষণে খানিকটা হুঁশ হয়েছে রবিনের। রাগ পড়েনি। গজরাতে গজরাতে বলল, 'থানায় গেলে আমাদের সঙ্গেই ফিরত! আমরা অনেকক্ষণ ফিরে এসেছি—'

স্যামুয়েল বলল, 'তোমাকে বলিনি সেপাই কী বলেছে—মাম্‌মি আমাদের ছেড়ে দেবার জন্যে বড়বাবুর কাছে গিয়েছিল!'

'হ্যাঁ, তাই আর কি। ও সব ধাপ্পা! ও গেল আর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ছেড়ে দিল আমাদের! ওকে আমি চিনি না। তোর জন্মের আগে থেকে চিনি। বাড়িতে মন টেকে না। ও মেয়েমানুষটা এইরকম।'

স্যামুয়েল তখনও ধরে আছে বাপকে। বলল, 'কী বলছ রাবিশ যত সব! তুমি কি পাগল

হয়ে গেছ নাকি।'

'স্যামুয়েল, ওকে ছেড়ে দে।' সারা হঠাৎ বলল, 'হ্যাঁ, আমি খারাপ। তোর বাপকে বল আমাকে মেরে ফেলতে—'

কথাগুলো শেষ হবার আগেই গোটা শরীর কাঁপিয়ে কেঁদে উঠল সারা। নিজেকে সামলাতে না পেরে আবার লুটিয়ে পড়ল মেঝেয়। এর পরের খানিকটা সময় ওর কান্না ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

সারা যেভাবে কাঁদছিল তাতে মনে হবে এই কান্নার প্রস্তুতি তার মধ্যে আগে থেকেই ছিল, এই মুহূর্তের অপমানবোধ একটা উপলক্ষমাত্র। রবিন মারধোর না করলেও হয়তো একইভাবে কাঁদত সে—রবিনের হঠাৎ আক্রমণ তার কান্নার কারণটা আড়াল করে দিল।

কী হয়েছে না হয়েছে সেটা বুঝবার অবস্থা এখন ওদের কারুরই নেই। হাহাকারের মতো কান্নাটা এখন অবশ্যই ছড়িয়ে পড়েছে রাস্তায়। আর্থারের মনে হল বারান্দার কাঠের মেঝেটা কাঁপতে শুরু করেছে তার পায়ের তলায়।

রিপন স্ট্রিটে আর্থার পাইবাসকে চেনে না এমন কেউই নেই। একটা পা না থাকলেও ব্রিটিশ আমলের যোদ্ধা হওয়ার সুবাদে এক সময় খ্যাতি ছিল তার; শিক্ষিত ও ভদ্র হিসেবে পরিবারটিকেও সম্মান করত সকলে। এখন অবশ্য বেশিরভাগ লোকই তাকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটা খোঁড়া বুড়ো হিসেবে চেনে। আর্থার পাইবাসের আত্মসম্মানবোধের পরিবর্তন হয়নি তাতে।

সারার কান্নায় সেই বোধই আক্রান্ত হল। কিছু গ্লানি ও কিছু অসহায়তায় বিভ্রান্ত আর্থার পাইবাস ক্রাচ ঠুকতে ঠুকতে ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে—রাস্তায় লোকজন জড়ো হয়েছে কিনা দেখতে। তেমন কোনও দৃশ্য চোখে পড়ল না। আরোহী নিয়ে একটা রিকশা চলে যাচ্ছে ঠুনঠুন শব্দ তুলে। রাস্তার উলটোদিকের বাড়িতে থাকে অলিভাররা এবং একটি মুসলমান পরিবার; আলো নেভানো জানালা দেখে মনে হল হয় কেউ নেই, না হয় এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে সকলে। বেশ দূর থেকে ভেসে এল কুকুরদের ঝগড়ার শব্দ। হঠাৎই মাঝ রাস্তায় উঠে এল একটি লোক, মনে হয় পেচ্ছাপ করতে বসেছিল তাদেরই গেটের পাশে। রিপন স্ট্রিটে আর কোনও দৃশ্য বা শব্দ নেই।

ওখান থেকে ফিরে এসে মেঝেয় পড়ে থাকা পুত্রবধূর দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল আর্থার, গোঙানির শব্দটা শুনল মন দিয়ে। তারপর বিরক্ত গলায় বলল, 'আহ্, অ্যাজ ইফ সি হ্যাজ বিন কিলড! বলি এত কান্নার আছেটা কী। মেরে তো আর ফ্যালেনি। কাম অন পুওর গার্ল, স্টপ ইট নাউ। উই হ্যাভ এনাফ অফ ইট। তোমার শাশুড়িকে এরকম কত দু'চার ঘা দিয়েছি; জিজ্ঞেস করো সে এরকম কাঁদত কি না।'

'হ্যাঁ, তোমার কাছেই তো শিখেছে।' ডরোথি খেপে গিয়ে বলল, 'হোয়াট ডু ইউ টক অ্যাবাউট। গস, আই অলওয়েজ হ্যাড আ ব্লিডিং নোজ! ডোনট্ টক্। গো, ব্রিং ইওর গান্। বাই গড, হোয়াট আ লাইফ!'

'টেলিং মি!' আর্থার তার লঘুতা বজায় রেখে বলল, 'হেল ইট। এ গুড লাইফ ইজ হোয়াট ইউ লিভ। যেমন কপাল করে এসেছ তেমনিই হবে।'

রবিনের অনুশোচনা

বাপ-মা'র পারস্পরিক দোষারোপমূলক কথাবার্তা আর বউয়ের থেমে-আসা কান্নার মাঝখানে ওখানে থেকে সরে গেল রবিন। ঘরে এসে ঢুকল। খানিক আগেকার কাঠিন্য নেই ভঙ্গিতে, বরং কিছুটা উদভ্রান্ত। আলো নিভিয়ে জানলার পাশে থাক মতন জায়গাটায় বসে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রাস্তার দিকে।

পুলিশের হেফাজত থেকে তাদের ছাড়িয়ে আনবার জন্যে সারা যে সত্যিই ছুটোছুটি করে বেড়িয়েছে এটা সে আগেই শুনেছিল। সত্যি বলতে, আশ্বস্তও হয়েছিল কিছুটা। বিনা কারণে অপরাধী হওয়ার জ্বালা ছাড়া গারদে থাকতে থাকতে আরও একটা ব্যাপার নিয়েও সে চিন্তিত হয়ে পড়েছিল খুব। তাদের ছাড়ানোর জন্যে সারা এবং তার বাপ-মা নিশ্চয়ই কারুর না কারুর শরণাপন্ন হবে, তখনই ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে চারদিকে। আত্মীয়স্বজন বলতে তাদের কেউই নেই প্রায়—হয়তো রোজালিনের কাছে যাবে সারা, ওখানে সুবিধে করতে না পারলে অদ্রির কাছেও যেতে পারে। বড় লজ্জার ব্যাপার হবে তাহলে। চাকরি যাবার পর থেকে এমনিতেই সে মাথা নিচু করে হাঁটে; আরও একটা কাজ জুটিয়ে নিতে না পারার দৈন্যে হীনম্মন্য বোধ করে সারাক্ষণ। এই বদনামটা হবে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেওয়ার মতো। রোজালিনের চাপে পড়ে মাইকেল কিছু নড়াচাড়া করলেও হাসবে মনে মনে। ব্যাটাচ্ছেলে এমনিতেই দাম্ভিক, তাকে কোনও দিন ধেড়ে ইঁদুরের বেশি আর কিছু ভাবেনি। আর অলোক দত্ত? ওই বাঙালি বাবুটি যে কী চিজ রবিন আজও তা ঠিকঠাক বুঝে উঠতে পারেনি। অদ্রির সঙ্গে ওর মাখামাখির ব্যাপারটা কেউ টের পাবার আগেই পেটে বাচ্চা এসে গিয়েছিল মেয়েটার, তাছাড়া ওকে বিয়ে করার জন্যে অদ্রিও তখন পাগল—কিছুতেই অ্যাবোরশন করাতে রাজি হল না। হলে ল্যাঠা চুকে যেত। এরকম তো কতই হয় আজকাল। ভুলটা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে অদ্রি—স্কার্ট ছেড়ে শাড়ি ধরলেই কি আর সম্পর্ক গড়ে ওঠে! মেয়েটাকে নিয়ে ফুর্তিই করতে চেয়েছিল লোকটা, শেষ পর্যন্ত কাটাতে পারেনি; আর এখন এমন ভাব দেখায় যেন একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলবে অদ্রিকে!

জুট মিলে পরিতোষ ভট্টাচার্যি নামে একজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছিল রবিনের—হাসপাতালে, ইউনিয়নের ভয় থাকা সত্ত্বেও, এই পরিতোষবাবুই মাঝে মাঝে লুকিয়ে দেখতে আসত তাকে, বাড়িতেও এসেছিল বার দুয়েক। এখন আর দেখাসাক্ষাৎ হয় না। সংসারের কথায় একদিন দুঃখ করে ওকে অদ্রির কথাটা বলে ফেলেছিল রবিন। সব শুনে পরিতোষবাবু বলল, বুঝলে সাহেব, এটা একেবারে কাঁচা কাজ করে ফেলেছ তোমরা। বাঙালি মানেই কি আর রামমোহন আর বিদ্যাসাগর যে উদার মনে মেনে নেবে সব! আর তোমরাও কিছু গঙ্গাজলে ধোওয়া তুলসীপাতা নও। ম্লেচ্ছ তো, গোরু খাও। ফটাফট ইংরিজি বললেই কি আর সাত খুন মাপ হয়! বন্ধুত্ব-টন্ধুত্ব ভাল—মেয়ে-পুরুষ একঠাঁই হলে আজকাল কাজকারবারও হয়ে যায় শুনেছি, দিনকাল পালটে গেছে তো! তা বলে একেবারে বিয়ে করে ঘরের বউ বানানো! না গো রবিন সাহেব, এটা হয় না। সংস্কারটা যাবে কোথায়! তোমাদের বাড়িতে একটা হিন্দু মেয়ে গেলেও কিছু না কিছু অসুবিধেয় পড়ত।

রবিন বুঝেছিল, কথাগুলো ঠিক। যে-মেয়ে সাধ করে কুড়ুল মেরেছে নিজেরই পায়ে,

তার রক্ত সে মোছাবে কেমন করে! কিন্তু, তাদের ছাড়ানোর জন্যে যদি কোনওভাবে অলোক দত্তকে ধরা হয় তাহলে কেলেঙ্কারির একশেষ হবে। নিজেদের মানসম্মান তো যাবেই, অদ্রির পেডিগ্রি নিয়েও আর এক প্রস্ত টানাটানি পড়ে যাবে।

সারা যে কারুর কাছেই যায়নি এবং তাদের পুলিশে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাটা জানানো হয়নি কাউকে—বাড়ি ফিরে ডরোথির কাছে খবরটা শুনে এত বিড়ম্বনা আর অপমানের মধ্যেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সে। তবু, সারা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই সে অমন হিংস্র হয়ে উঠেছিল কেন! যার প্রতি তার কৃতজ্ঞই বোধ করা উচিত ছিল, তাকে ঠিক ভাবে বাড়িতে ঢুকবার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে সে যে হঠাৎই আক্রমণ শুরু করে দিল, এরই বা কারণ কি! স্যামুয়েল বলেছিল, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ! সত্যি-সত্যিই কি সে পাগল হয়ে গিয়েছিল, না কি শুধু সেই মুহূর্তেই নয়—আরও অনেক আগে থেকেই রবিন নামের আড়ালে এক উন্মাদের অস্তিত্ব বহন করে বেড়াচ্ছে সে!

অন্ধকার ঘরে জানলায় চোখ রেখে গভীর অনুশোচনায় ডুবে গেল রবিন। নিজের আচরণের সপক্ষে যুক্তি খুঁজে পেল না কোনও। বাড়ি এখন নিঃশব্দ হয়ে গেলেও সারার গোঙানিটা যেন এখনও ভেসে আসছে কানে। এর আগেও যে কখনও স্ত্রীর সঙ্গে তর্কাতর্কি হয়নি বা হঠাৎ রাগে সারাকে চড়চাপড় মারেনি, কিংবা সারাও তাকে গালিগালাজ করেনি, তা নয়। দু'জনের কেউই কোনও দিন গায়ে মাখেনি ব্যাপারগুলো। আজকের ঘটনাটা ছিল আলাদা—স্ত্রী নয়, সারা এসেছিল তাদের রক্ষাকর্ত্রী রূপে। এই কি তার পুরস্কার!

রিপন স্ট্রিটের আকাশে তারা ফুটে আছে অসংখ্য। স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার আলোয় মায়াময় চারদিক। সেদিকে তাকিয়ে রবিনের মনে হল একটার পর একটা মার খেতে খেতেও এতদিন তার মধ্যে একজন মানুষ বেঁচেছিল হয়ত, আজ সে নিজেই হত্যা করেছে তাকে। এর পরেও কি বেঁচে থাকার সার্থকতা আছে কোনও!

ভালবাসায় প্রত্যাবর্তন

আচ্ছন্নতার ঘোরে অনেকক্ষণ স্যামুয়েলের ঘরে শুয়েছিল সারা। ঘুমোয়নি; বরং অবসাদ থেকে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছিল নিজেকে। গভীর রাতে সে উঠে এলো নিজের বিছানায়।

রবিনের কাছে এই সান্নিধ্যটুকু জরুরি ছিল; হয়তো বা বিপর্যস্ত সারার কাছেও। যা হবার হয়েছে, সে যা ছিল তাও আর হতে পারবে না। তবু, সারা বুঝতে পারছিল, আরও বড় বিপর্যয় এড়াতে হলে, নিজের অপমান আর ঘৃণ্য অভিজ্ঞতার কথাটা সারাজীবনই লুকিয়ে রাখতে হবে তাকে। রবিনের আচরণই তাকে আরও ভাল করে বুঝিয়ে দিয়েছে ব্যাপারটা। খ্যাপাটে, রগচটা এই লোকটি বরাবরই অধিকারের বস্তু মনে করে তাকে—জীবনযাপনের ছকে দেওয়া গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে সে কিছু করুক, কোনও দিনই তা চায় না। বিয়ের পর এত বছর হয়ে গেল, কিন্তু, কোনও দিন আর কোনও মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি—নিজের রাগ, অভিমান, জ্বালা সমস্ত কিছু থেকে আড়াল খুঁজেছে স্ত্রীর মধ্যে। আর কোথাও তো পাত্তাও পায় না! পুলিশের হাত থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফিরে আজও হয়তো সারাকেই

খুঁজেছিল প্রথম; না পেয়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল। সব কিছুর পরেও, সারা ভাবল, তার সামনে এখন দুটো রাস্তা খোলা, বাঁচা কিংবা মরা। কিন্তু, সে মরবে কেন! শরীরের অপমানে? তাদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে একটি লোক তাকে বলাৎকার করেছে বলে? এর জন্যে রবিন কিংবা স্যামুয়েলকে দোষী করবে কেন! সে মরলে ওরাও মরবে। আর, যদি তাকে বাঁচতে হয়, তাহলে এই খ্যাপাটে স্বামী আর বাউণ্ডুলে ছেলেকে নিয়েই হবে। এরাই তার আশ্রয়।

অনুতপ্ত রবিনের আবেগে সাড়া দিয়ে বহুদিন পরে নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করে দিল সারা। রবিনের শরীরের প্রচণ্ড তাপ ও রোমাঞ্চ নিজের শরীরে সঞ্চারিত করতে করতে সে অনুভব করল, গ্লানি ধুয়ে যাচ্ছে, ক্রমশ ফিরে পাচ্ছে বিস্মৃত এক নিরাপত্তা। এই অনুভূতির একটুও সে হারাতে চায় না।

শরীর জুড়ে প্রশান্তি, শরীরটাকে আর দুর্বহ মনে হয় না। নিজের বুকে রবিনের মাথাটা টেনে নিয়ে সারা জিজ্ঞেস করল, 'ওরা তোমাকে মারেনি তো?'

'হ্যাঁ, মেরেছিল।' পিঠ দেখানোর জন্যে পাশ ফিরল রবিন, সারার হাত টেনে নিয়ে পিঠের সেই জায়গাটায় রাখল যেখানে কন্সটেবলের ব্যাটনের ঘা পড়েছিল। একটিই আঘাত, কিন্তু আড়াআড়ি অনেকটা জায়গা ব্যথায় অবশ হয়ে আছে এখনও।

রবিনের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে সারা বলল, 'পাঁজরে মারেনি এই রক্ষে! নিশ্চয়ই তর্ক করতে গিয়েছিলে!'

'আর কী করব! ওরা আমাকে ক্রিমিনাল বলছিল। দোজ বাস্টার্ডস—ইউ নো—দোজ মিল পিপল—আমি জানতামই না এখানেও ওরা আমার নামে একটা ডায়েরি করিয়েছিল! তোমার মনে আছে, আমি হাসপাতাল থেকে ফেরার পর পুলিশ এসেছিল খবর নিতে—?'

'কী করবে! তোমার ভাগ্যটাই এইরকম।' গভীর নিঃশ্বাস নিয়ে ছাড়তে ছাড়তে সারা বলল, 'থ্যাঙ্ক গড, দে ডিডনট বিট আপ স্যামুয়েল।'

'কী বলছে? ছেলেটা?'

'ও আর কী বলবে! ওর কোনও বোধ আছে নাকি! হি হ্যাজ নট গ্রোন। হি কমপ্লেনড অ্যাবাউট দ্য ফুড, নাথিং এলস্। চাল ভাল নয়, মাছটাছও নাকি খারাপ। যেন নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছিল ওখানে!'

রবিন কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, যেন নিজের অভিজ্ঞতাটা জারিয়ে নিচ্ছে নতুন করে। তারপর দু'দিন না-কামানো খরখরে গাল চুলকে জিজ্ঞেস করল, 'ও-সি লোকটা কেমন? ইজ হি আ নাইস পার্সন?'

'ইয়েস।' সারা একটু সময় নিয়ে বলল, 'আই থিংক সো।'

'কী বলল তোমাকে?'

'কী আর বলবে।'

'তুমি গেলে আর আমাদের ছেড়ে দিল—তা হয় নাকি! ইট মাস্ট বি আ লং স্টোরি!'

'মাস্ট বি।' অন্ধকারে হাসল সারা। হাই তুলতে তুলতে বলল, 'ফরগেট দ্যাট, রবিন। এখন ঘুমোবার চেষ্টা করো—'

রবিনের আলাপ শেষ হয়নি এখনও; ভার নেমে যাওয়ায় এখন অনেকটা হালকা লাগছে নিজেকে। পাশ ফিরে বললে, 'তুমি গিয়ে ভালই করেছিলে। ওরা বোধহয় মেয়েদের সমীহ

করে। বিসাইডস—', এতক্ষণে গলায় ঈষৎ ঠাট্টা মেশাল রবিন, 'ইউ আর ভোলাপচুয়াস অ্যান্ড প্রিটি। তোমার চেহারা দেখেই বোধহয় কাত হয়ে গেছে।'

'হয়তো তাই।' সারা নিজেই এবার পাশ ফিরে শুল। আসলে সে প্রসঙ্গটা এড়াতে চাইছিল। খানিক চুপচাপ থেকে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'মেক আপ ইওর মাইন্ড, রবিন। এখানে আমাদের কোনও ভবিষ্যৎ নেই—এখান থেকে আমাদের চলে যেতেই হবে। এটা একটা নরক—এখানে বেশি দিন থাকলে আমি সুইসাইড করতে বাধ্য হব—'

ক্ষোভে গলা বুঁজে এল সারার; শরীরটাও যেন কাঁপছে একটু একটু—না হলে রবিনের নিজের হাতটাও দুলে উঠত না।

কী বলবে বুঝতে পারল না রবিন। শুধু বলল, 'তুমি একটু বেশি ইমোশানাল হয়ে পড়ছ। এ-ব্যাপারটা কাল পরশুও ভাবা যেতে পারে। ভেব না যে আমারও খুব ভাল লাগছে—'

একটু থেমে রবিন বলল, 'ওরা আমাকে হপ্তায় একদিন থানায় হাজিরা দিতে বলেছে—'

'কেন।'

আবার পাশ ফিরে স্বামীর মুখ দেখবার চেষ্টা করল সারা। রবিন চিৎ হয়ে থাকায় সে-মুখ কেমন বোঝা যায় না। ক্রমশ চোখ চলে যায় চাঁদের আলোয় বিস্তৃত ওর শিরা-বেরুনো বড় বড় পা দুটির দিকে। কোনও উত্তর না পেয়ে সেদিকেই তাকিয়ে থাকল সারা।

সাদা পোশাকের ডাক

দিন চারেক পরে একদিন দুপুরে পাইবাসদের দরজায় কলিং বেল বেজে উঠল।

একটু আগে রবিন গেছে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে; ডালহৌসি পাড়ার এক অফিসে সিকিউরিটি অফিসার চায়—বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে সকালের কাগজে, সেখানেও যাবে। অনেকদিন পরে স্যুট-টাই পরে বেশ দুরন্ত লাগছিল রবিনকে; তবে হঠাৎ বয়স বেড়ে যাওয়ার ছাপ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে মুখে। খুব তাড়াতাড়ি একটা কাজকর্ম জোটাতে না পারলে অকালে বুড়ো হয়ে যাবে লোকটা, ওকে দেখতে দেখতে সারা ভেবেছিল, বেকার স্বামী আর অন্ধ ভিখারি—দু'জনের অবস্থাটাই হয় একই রকমের, সামনে কিছু দেখতে না-পাওয়ায় দৃষ্টিটা চলে যায় ভিতরে।

স্যামুয়েলের স্বভাবে পরিবর্তন হয়নি কোনও। ধোপার দোকান থেকে বাপের স্যুটটা ইস্ত্রি করিয়ে এনে বেরিয়ে গেল সাইকেল নিয়ে। একবার গণ্ডগোল বাঁধাবার পর আগের গ্যারাজ তাকে ফেরত নেয়নি, সেজন্যে চিন্তিত নয় স্যামুয়েল। ও এখন আরও কয়েকটা গ্যারাজ চিনে ফেলেছে, রবিনকে বলছিল নিজেই কোনও একটায় ঢুকে যেতে পারবে।

সেদিনের ঘটনার পর ক্রমশ স্বাভাবিকতা ফিরে আসছিল পাইবাস পরিবারে।

দুপুরের এই সময়টায় আর্থার পাইবাস নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়, ডরোথিও থাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন। সুতরাং, জ্যাকি কলিনস্-এর একটা পুরনো নভেলের পাতা থেকে চোখ সরিয়ে, সারাই উঠে গিয়ে দরজা খুলল এবং দেখল, সাদা পোশাকে সেই সেপাইটি দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির নীচে।

নিমেষে ফ্যাকাশে হয়ে গেল সারার মুখ। আশপাশে আর কেউ দেখছে কি না দেখে নিয়ে

তাড়াহুড়ো করে নেমে এল নীচে।

খুব নিচু গলায় সেপাই বলল, বড়বাবু দেখা করতে বলেছে সারাকে, জরুরি ব্যাপার। পাঁচটা পর্যন্ত থাকবে ওই ফ্ল্যাটে—তবে তাড়াতাড়ি যেতে পারলেই ভাল। সুতরাং—

সারা জানে এ কথার মানে কি। খানিক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল সে। ঘটনার জের তাহলে সেদিনই শেষ হয়ে যায়নি—রবিন, স্যামুয়েলকে ছাড়াতে গিয়ে নিজেকেই বন্ধক রেখে এসেছে সে।

ডেকে যখন পাঠিয়েছে তখন যেতেই হবে, তা না হলে নতুন কোনও কাণ্ড বাঁধাতে পারে। হয়তো আজকের যাওয়াই শেষ নয়।

এসব ভাবতে ভাবতেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল সারার। সবজান্তা হাসি-হাসি মুখে লোকটি তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে কোনওরকমে বলল, 'ঠিক হ্যায়—তুম যাও—'

গেট পেরিয়ে লোকটি রিপন স্ট্রিটের রোদ্দুরে হারিয়ে যাবার পরেও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল সারা। এখনকার অনুভূতিটা অন্য—এখন কান, মুখ, মাথা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে অদ্ভুত এক জ্বালা, ইচ্ছে করছে চিৎকার করে উঠতে। কিন্তু, কিছুই করল না সে। অনুভূতিটা ক্রমশ থিতিয়ে আসতে দিল মাথার মধ্যে।

আবার সিঁড়িতে পা রাখতে গিয়ে দেখল সিঁড়ির মাথায় স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি। সেদিন, ঠিক ওই জায়গায়, রবিনও দাঁড়িয়ে ছিল। তফাত এইটুকু, ডরোথি রবিন নয়।

'কে লোকটা?' সারা উঠে আসবার পর জিজ্ঞেস করল ডরোথি, 'চেনো ওকে?'

'থানা থেকে এসেছিল। বড়বাবু এখুনি দেখা করতে বলেছে।'

খুব দায়সারা ভাবে জবাব দিল সারা।

'তোমাকে!'

'না। আপনার ছেলেকে!'

একবার নিজেকে লুকোতে পারলে বার বারও যায়, যত দিন না সে ধরা পড়ে যাচ্ছে। তারপর কী হতে পারে জানে না। ডরোথিকে আর কিছু না বলে ঘরে ঢুকল সারা, ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে পোশাক বদলাতে শুরু করল—যেন যাবার তাড়াটা তার নিজেরই।

পিছন থেকে তাকে লক্ষ করতে করতে ডরোথি বলল, 'তুমি যাচ্ছ!'

'আর কে যাবে! রবিন যাক, তারপর আবার আটকাক ওকে!'

'ওহ্ ক্রাইস্ট!' বিচলিত গলায় ডরোথি বলল, 'হোয়াই দে আর আফটার আস। কী করেছি আমরা বলবে তো!'

'ডোনট রেজ ইওর ভয়েস!' প্রায় ধমক দিয়ে উঠল সারা। তারপর, বুড়ি তখনও থমথমে মুখে তার দিকে তাকিয়ে আছে দেখে বলল, 'দেখি গিয়ে কী চায়। কাউকে কিছু বলবার দরকার নেই। প্রমিস, ইউ আর নট গোয়িং টু টেল এনিবডি—নট টু রবিন, নট টু পাপা! আমি যাব আর ফিরে আসব।'

সন্দিগ্ধ চোখে সারার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল ডরোথি, হাত তুলে ক্রশ চিহ্ন আঁকল বুকে। তারপর বলল, 'পুওর গার্ল। তুমি কী বলছ তুমিই জানো!'

রাস্তায় বেরিয়ে একবার নিজেকে দেখে নিল সারা। বুড়ি কি আঁচ করেছে কিছু? করলেই বা কি, যে-অভিশাপ তাকে ঠেলে দিয়েছে জঘন্য এই অভিজ্ঞতা মেনে নিতে, বুকে হাজার ক্রশ আঁকলেও মুছবে না তা। ভাবতে ভাবতেই কোতে গা গুলিয়ে উঠল সারার। আত্মগ্লানি

ও অসহায়তা বোধের জন্যে যতটা না তার চেয়ে বেশি ভয়ে। সম্ভবত এসব ঘটনা বেশি দিন লুকিয়ে রাখা যায় না। আজ ডরোথির চোখে সন্দেহ দেখল, সেদিন রাতে রবিনও উপহাস করেছিল তার শরীর নিয়ে। এমন কি হতে পারে যে রবিনও অনুমান করেছে কিছু, সত্য প্রকাশিত হয়ে যাবার আশঙ্কায় ভেঙে বলতে চায়নি! তার কি উচিত ছিল যা ঘটেছে সমস্তই খুলে বলা? বললে কী হত? সেদিন যা ঘটেছিল এবং আজও যা ঘটতে পারে—দুটোর মধ্যে তফাত নেই কি! সেদিন ওই ফ্ল্যাটে পৌঁছুবার পরেও কিছুক্ষণ পর্যন্ত সে বুঝতে পারেনি কোন পরিণতির দিকে এগোচ্ছে সে—যখন বুঝল তখনও হয়তো আত্মরক্ষার উপায় ছিল কোনও, কিন্তু রবিন আর স্যামুয়েলের কথা ভেবে চুপচাপ মেনে নিয়েছিল সব। আজ সে জেনেশুনেই যাচ্ছে। যতই নিরুপায় মনে হোক নিজেকে, কেন যেন স্বেচ্ছা এসে যাচ্ছে এর মধ্যে। তবে কি ফিরে যাবে? কী হয়েছিল না হয়েছিল বলে দেবে সকলকে?

ওয়েলেসলি স্ট্রিটের তেকোনা পার্কটার সামনে দাঁড়িয়ে ট্যাক্সির অপেক্ষা করতে করতে নিজেই মাথা নাড়ল সারা—না, না, না। সে রবিনের হাতে খুন হতে চায় না, পরিবারটাকে ভেঙে দিতে চায় না। সে বাঁচতে চায়—সকলকে জড়িয়ে, রবিন আর স্যামুয়েলকে নিয়ে, পঙ্গু আর্থার আর ডরোথিকে নিয়ে। বড় আদরের আর ভালবাসার সম্পর্ক এসব, এদের তুলনায় তার শরীরের দাম কতটুকু!

খুবই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সারা। বেলা তিনটের রোদ ক্রমশ রঙ পালটে লাল, নীল, হলদে, সবুজ অসংখ্য বিন্দু হয়ে ঘোরাফেরা করছিল তার চোখে, মনে হচ্ছিল তারই শরীর থেকে নামা অসংখ্য শিকড় বিস্তৃত হতে হতে মাটির গভীরে টেনে নিচ্ছে তাকে।

মায়ের জন্যে উপহার

হঠাৎ একটা মোটরবাইক এসে থামল তার সামনে। সম্বিত ফিরে পেয়ে সারা দেখল রাস্তায় পা ঠেকিয়ে বাইকের হ্যান্ডেল ধরে বসে আছে লাল সার্ট পরা ঘোর কৃষ্ণবর্ণের, রোগাটে এক যুবক। বাইকের পিছন থেকে নেমে এল স্যামুয়েল।

'তুমি এখানে!'

এমনই আকস্মিক ওদের আবির্ভাব যে সারার মুখে কথা ফুটল না কোনও। জবাব না দিয়ে স্যামুয়েলের সঙ্গীটিকে লক্ষ করতে লাগল সে। আগে কখনও দেখেছে মনে পড়ল না।

'মামমি, দিস ইজ জোহান। মাই নিউ ফ্রেন্ড।'

আলতো গলায় 'হ্যালো' বলল সারা। হাসতে গিয়ে বুঝতে পারল হাসি ফুটছে না মুখে।

স্যামুয়েল কখনও গম্ভীর হতে পারে না। তার নতুন বন্ধুর পরিচয় দিয়ে আরও কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'জোহান একটা গ্যারাজে কাজ করে। আমাকেও সেখানে নিয়ে নেবে। ইউ নো, মামমি, হিজ আংকল, স্টেজ ইন অস্ট্রেলিয়া। ডিড ইউ সে মেলবোর্ন, জোহান?'

'ইয়া!' ঈষৎ হলদেটে দাঁত বের করে হাসল জোহান, 'ইন মেলবোর্ন।'

জোহানের মুখের চেয়ে ওর সার্টের ক্যাটকেটে লাল রঙটাই নজর টানে বেশি। ছেলেটি

কি অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, না অন্য কিছু?

পরিষ্কার চোখে এবার ছেলের মুখের দিকে তাকাল সারা। রোদ্দুরে ঘোরাঘুরি করে ঘামে ভিজে লালচে হয়ে উঠেছে মুখটা। অবিকল রবিন যেমন ছিল। বিয়ের পর পর বাইকের পিছনে বসিয়ে তাকে নিয়েও অনেক ঘোরাঘুরি করত রবিন। নেশার মতো গতি ঢুকে পড়ত রক্তে।

দৃশ্যগুলো খুব দ্রুত পেরিয়ে এল সারা। অস্ট্রেলিয়ায় যাবার স্বপ্নটা সে-ই ঢুকিয়েছিল স্যামুয়েলের মাথায়। কোনও দিন যাওয়া হবে কিনা জানে না; কিন্তু স্যামুয়েলকে দেখে মনে হয় সে যেন এখনই চলে গেছে সেখানে।

সামনে দিয়ে ফাঁকা একটা ট্যাক্সি বেরিয়ে যেতে কবজির ঘড়িতে চোখ বুলিয়ে নিজেকে লুকোতে চাইল সারা।

পকেট হাতড়াচ্ছে স্যামুয়েল। তার দিকে তাকিয়ে হাসছে মিটিমিটি।

'গেস হোয়াট আই হ্যাভ ফর ইউ?'

ছেলের রহস্যে নিজেকেও জড়িয়ে ফেলাতে ইচ্ছে করছে সারার। অনুমান করতে পারল না কিছু।

এবার পকেট থেকে একটা রঙিন র‍্যাপার মোড়া চকোলেট বার বের করল স্যামুয়েল। সারার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'কাম। টেক ইট।'

কোনওরকমে সারার হাতে চকোলেটটা গুঁজে দিয়েই বাইকের পিছনে উঠে বসল স্যামুয়েল, জোহান স্টার্ট নিয়ে এগিয়ে যেতে পিছনে তাকিয়ে বলল, 'আই উইল বি লেট, মামমি।'

বাঁচা অনেক ভাবেই দেখায়। কিন্তু, সারা জানে, সে এখন মরতেই যাচ্ছে।

স্যামুয়েলরা যেদিকে গেল সেদিক থেকেই হর্ন দিতে দিতে এগিয়ে আসছে একটা ট্যাক্সি। সম্ভবত ফাঁকা। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসার জন্যে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। চকোলেটটা ব্যাগে ভরে চোখ মুছবার জন্যে রুমালটা বের করে নিল সারা। তারপর প্রায় অবশ হাত তুলে ক্ষীণ গলায় ডাকল, 'ট্যাকসি—'

রাস্তা চিনতে অসুবিধে হয় না। শরীরের নড়াচড়ায় এরই মধ্যে এসে গেছে যান্ত্রিকতা। অস্বস্তি বলতে ঘাম জমছে এখানে ওখানে, গলার ভিতরে, যেন বা চোখের তারাতেও। ওপরে উঠতে উঠতে লিফটম্যান ঘুরে ফিরে তাকেই দেখতে লাগল, সেদিনও একই লোক ছিল কিনা মনে নেই। সম্ভবত নয়।

লিফট থেকে বেরিয়ে ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎই শরীরজোড়া আলোড়ন টের পেল সারা। চাপা উত্তেজনা ও আশঙ্কায় সঙ্কুচিত হচ্ছে নিম্নাঙ্গ। মন যেমনই বোঝাক, শরীর এরই মধ্যে তুলতে শুরু করেছে আত্মরক্ষার দেয়াল। বাস্তবিক, কী অসার আর নিরর্থক নিজের সঙ্গে এই যুদ্ধ!

উদ্বেগে ভারাক্রান্ত থাকায় সেদিন খেয়াল করেনি, আজ দেখল, দরজায় সরু প্লাস্টিকের বোর্ডে লেখা খুদে খুদে কয়েকটা অক্ষর—ইমেজ কনসালটান্‌টস্‌ প্রাইভেট লিমিটেড। দেখতে দেখতেই তার দ্বিধান্বিত হাত কলিং বেলের বোতাম স্পর্শ করল।

দরজা বড়বাবুই খুলল। চোখ নামিয়ে ভিতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই সারা লক্ষ করল, ফর্সা, বড়সড় চেহারার, টাকমাথা আরও একটি লোক বসে আছে ভিতরে। না তাকালেও

বুঝতে পারা যায় তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি দিয়ে তার সর্বাঙ্গে জিব বোলাচ্ছে লোকটি।

দরজা বন্ধ করে হাতের আগলে তাকে কাছে টেনে নিল বড়বাবু। তারপর বলল, 'ইনি মিস্টার সিং। তুমি বলছিলে না টেলিফোন অপারেটরের কাজ জানো! ওর ট্র্যাভেল এজেন্সিতে তোমার জন্যে কাজ আছে—'

স্মৃতির দিকে

ডিপারচার লাউঞ্জে অপেক্ষারত যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে বসে পরবর্তী অভিজ্ঞতাগুলিকে পাশ কাটাতে গিয়ে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল সারার। অসহিষ্ণু ভাবে ভাবল, ওর কি আর কোনও স্মৃতি নেই!

পাশের চেয়ারে বোর্ডিং কার্ড হাতে নিয়ে রবিন; গভীর ও গম্ভীর এই ধরনের বসে থাকায় উপলক্ষ থাকে না কোনও। শুধু এখন বলে নয়, ক'দিন ধরেই সে অন্যমনস্ক। কথাবার্তা বলছিলই না প্রায়। গত রাতেই লক্ষ করেছিল সারা, মাঝঘুম থেকে উঠে জানলার পাশে চুপচাপ বসে আছে রবিন। অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত ভৌতিক চাঁদের আলোয় কফিনের ভিতর শুয়ে থাকা মানুষের মুখের মতো দেখাচ্ছিল ওর মুখ। দু' বছরের ওপর বসে থাকতে থাকতে ইতিমধ্যেই বুড়িয়ে গিয়েছিল অনেকটা; অস্ট্রেলিয়া থেকে রবার্টের গ্রিন সিগন্যাল এসে পৌঁছুনোর পর পুরোপুরি উদাসীন হয়ে গেল রবিন। একই ঔদাসীন্য ওর এখানকার চেহারায় আর বসে থাকার ধরনে। সব প্রতিরোধ ভেঙে যাওয়ার জন্যেই কি? নাকি আরও কোনও কারণ আছে এর মধ্যে, সারা যার কিছুই জানে না! ইদানীং সে যেমন নিজেকে মনে করত বিচ্ছিন্ন, তেমনি, হঠাৎ খেয়ালে কখনও রবিন, ডরোথি, আর্থারের মুখের দিকে তাকালে মনে হত তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যেও এসে গেছে এক ধরনের নৈঃশব্দ্য; মনে হত যে-কোনও সময়েই ঘটে যাবে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। সেরকম কিছু না ঘটলেও এই মুহূর্তে রবিনের দিকে তাকিয়ে সারার মনে হল, সে জানে বলেই লোকটি তার স্বামী, না হলে অপরিচিতও ভাবা যেত।

অদূরে, দেয়ালের কাচে মুখ লাগিয়ে টারম্যাকে দাঁড়ানো বিশাল এয়ারক্রাফটটার দিকে তাকিয়ে আছে স্যামুয়েল—অচঞ্চল ভঙ্গি, অনেকক্ষণ একই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকার জন্যে সন্দেহ হয় ও দেখছে না কিছু। এখানে ঢোকার আগে রোজালিনের দুই বাহুর মধ্যে ধরা পড়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিল ছেলেটা। রবিন টেনে এনেছিল ভিতরে। সেই থেকেই দূরে থাকছে। এখন আর বৃষ্টি নেই। ডিপারচার গেটের সামনে সিকিউরিটির পাহারা। খোলা দরজা দিয়ে ভেসে আসছিল এয়ারক্রাফটের এঞ্জিনের একটানা স-স শব্দ।

সারা এখন নিজেকে নিয়েই ভাবছে। অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবার স্বপ্নটা সে-ই দেখেছিল প্রথম, তখন একটা উদ্দেশ্যও ছিল। সেই উদ্দেশ্যটা কি আছে আর? এত গ্লানির মধ্যেও শেষ পর্যন্ত বেঁচে যাচ্ছে ভেবে এ ক'দিন যাবার তোড়জোড় করেছিল সে। এখন মনে হচ্ছে ধারণাটা ভুল। বাঁচার চেষ্টাই বাঁচিয়ে রাখে না কাউকে। সম্ভবত প্রত্যেক মানুষেরই মনের ভিতর একটা জায়গা থাকে—সেখানেই তৈরি হয়ে যায় তার নিজস্ব ঘরবাড়ি কিংবা ধ্বংসের

আকৃতি; মানচিত্রের দূরত্ব পার হলেও নতুন করে বসবাসের জন্যে আর কোনও জায়গা পাওয়া যায় না। যদি যেত, তাহলে এতদিনের পরিচিত মাটি ও পরিজনদের ছেড়ে চলে যাওয়ার দুঃখ থাকত মনে, দুঃখের মধ্যে অল্প একটু সুখও বোধ করত সে। আঠারো-কুড়ি বছরে, কিংবা তারও আগের ষোল-সতেরো বছরে, সুখের স্মৃতি কম জমেনি, নাড়াচাড়া করতে পারত সেগুলো নিয়ে। সেসব স্মৃতির কোনওটাই আজ কাছে ঘেঁষছে না তার। মন ফেরানোর চেষ্টায় আশপাশ দিয়ে শুধু উঠে আসছে কয়েকটি রাস্তা, কয়েকটি মুখ, বিভিন্ন শরীরের মিশ্র গন্ধ, আর আত্মরক্ষার যুক্তি সাজিয়ে তার বর্ণনাহীন বেঁচে থাকা। দৃশ্যের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে না কোনও।

দূরদর্শী বড়বাবু

বড়বাবু বুঝতে পেরেছিল গভীর জলে পড়ে শিকড়ে পা জড়িয়ে গেছে মেয়েটার—ওখান থেকে ইচ্ছে করলে ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু কোনও দিনই আর ডাঙায় ফিরতে পারবে না। অসহায়তা এক একজনকে টেনে নিয়ে যায় এক এক দিকে—এরকম অনেক দেখেছে বড়বাবু. দু'দিকেই মৃত্যু জানা হলে মনই তাদের বলে দেয় কোনটা বেশি সহনীয়। নিজের অজান্তেই ঠেলে দেয় নির্বাচনের দিকে। সারা পাইবাসের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটবে কেন!

অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান এই যুবতীটির কোথাও যে কোনও খুঁটি নেই গোড়াতেই ধরা পড়েছিল তা। 'ইয়ে ঔরত তো বিলকুল বদনসিব হ্যায়, সাব।' খোঁজখবর নিয়ে এসে সেপাই বলেছিল, 'মিট্টি বোলযে তো মিট্টি, আসমান বোলে তো আসমান—ফারাক নহি কর সকেগি। আর সাথ দেনে কা হ্যায় ভি কৌন! আপ জো ভি কাহা মান লেগি।' তথ্যে ভুল ছিল না কোনও। অভিজ্ঞতা থেকেও বুঝতে পারছিল, কোনও মুরুব্বি-টুরুব্বি থাকলে স্বামী আর ছেলেকে ছাড়ানোর জন্যে আগেই ধরে আনত সে; নিদেন চেনাশোনা আর কোনও পুরুষকে এগিয়ে দিত রফা করার জন্যে—ওই ভরন্ত চেহারা আর যৌবন নিয়ে একা-একা হত্যে দিত না থানায়। অন্তত সেপাইয়ের কাছে ঠিকানা নিয়ে ফ্ল্যাটে আসবার আগে কোনও পুরুষ জোটাতে না পারুক একটা মেয়েছেলেকেও ধরে আনতে পারত। এতই অসহায় যে এসব কিছুই মাথায় ঢোকেনি মেয়েটার। চুপচাপ মেনে নিল সব—এমনকী বলাৎকারের পরও দু' তিন দিনের মধ্যে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত করল না! মেয়েমানুষ কলঙ্ক ভয় পায়, কলঙ্ক আড়াল করার জন্যেই কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ে আরও বেশি কলঙ্কে। তখনই ধরে নিয়েছিল বড়বাবু, এই মেয়েটাকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে এ ধরনের ঠাণ্ডা স্বভাবের মেয়েমানুষকে নরমে গরমে না রাখলে ঝোঁকের মাথায় যে-কোনও দিন যা-তা করে ফেলতে পারে। অকেজো শ্বশুর, বেকার স্বামী আর বাউণ্ডুলে ছেলেকে নিয়ে এমনিতেই টেনশনে আছে মেয়েটা। সেদিন সকালে থানায় বসে নিজেই তো বলে ফেলেছিল—উই আর পুওর, উই আর হেলপলেস। প্লিজ বড়বাবু, উই আর ইনোসেন্ট, প্লিজ সেভ আস—! এসব বলে নিজেকে নিজেই উদোম করে ফেলেছিল মেয়েটা। ওকে লক্ষ করতে করতে তখনই বলতে ইচ্ছে করেছিল, মাগো, যে-মেয়েমানুষের শরীর আছে তার আবার কিসের পরোয়া! হিসট্রি

পড়োনি? সিং-এর মুখটা তখনই ভেসে উঠেছিল চোখে।

রুজির মুখ দেখা

আরও একবার বড়বাবুকে তুষ্ট করতে হতে পারে—মনে মনে এরকম আশঙ্কা ও প্রস্তুতি থাকলেও, দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি প্রকৃত ত্রাসের সঞ্চার করল সারার মনে। আরও বিভ্রান্ত বোধ করল বড়বাবুর মুখে ওই লোকটি—মিস্টার সিং—তাকে চাকরি দিতে পারে শুনে। অসহায় হলেও সারা বোকা নয়। এটা যে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে তাকে নতুন করে প্যাঁচে ফেলার ছলা তা বুঝতে অসুবিধে হল না। প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার পর সে এখন অনেকটা পোক্ত। অপমান একবার হলে আরও একবার হওয়ায় নতুন কোনও তাৎপর্য যুক্ত হয় না, এটা জেনেও সে ত্রাসিত হল অন্য কারণে। যে-ঘটনা একজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, দ্বিতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবে তা ছড়িয়ে পড়বে না তো। সে কি তাহলে উপভোগের পণ্য হয়ে দাঁড়াল। এর পর তো যে-কেউই আঙুল তুলে দেখাবে তার দিকে—এমনকী সে যখন রবিনের সঙ্গে কি স্যামুয়েলের সঙ্গে, তখনও। সম্ভবত সে স্ত্রী ও মায়ের ভূমিকা থেকে সরে আসছে আস্তে আস্তে। এর চেয়ে রবিন, স্যামুয়েলের নিগ্রহ এবং ওদের পুলিশের খপ্পরে পড়ার ব্যাপারটা জানাজানি হওয়া অনেক বেশি সহনীয় হত না কি। রবিন ও স্যামুয়েলের ঘটনার জন্যে নিশ্চয়ই কেউ দোষী করত না তাকে!

অদ্ভুত এক কাঠিন্য এসে গিয়েছিল সারার সর্বাঙ্গে। পিঠে বড়বাবুর স্নেহস্পর্শ কোনও ভাবে আশ্বস্ত করতে পারত না তাকে—করলও না। এখনই ভাবল, রবিন ফিরে আসার আগে বাড়ি পৌঁছুতে না পারলে আজ আবার তাকে জেরার সম্মুখীন হতে হবে। ডরোথিকে যদিও বলে এসেছে কাউকে কিছু না বলতে, তাহলেও খোঁজ-খবরের চাপে বুড়ি যে কিছু বলে ফেলবে না তার নিশ্চয়তা কি? রবিন যেরকম গোঁয়ার, তাতে সারা আবার থানায় এসেছে শুনে চলেও আসতে পারে। সে যেখানে দাঁড়িয়ে সেটা থানা নয়।

পায়ের তলায় অস্বস্তি বোধ করার সঙ্গে সঙ্গে রঙিন বিন্দুগুলি আবার উঠে এল সারার চোখের সামনে।

ওর অস্বস্তি লক্ষ করে কাঁধে আরও একটু চাপ দিল বড়বাবু। বলল, 'ভয় পাচ্ছ কেন! তোমার কি চাকরির দরকার নেই?'

হঠাৎ এই উপকারের বাসনা কেন তা তো আগেই জেনে গেছে সারা। জবাব একটা দিতে হবে বলেই কুণ্ঠিত ভাবে বলল, 'ইটস নট দ্যাট।'

'ইউ লুক নার্ভাস।' সিং বলল এবার, 'নার্ভাস হবার কী আছে। ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে চাই। অবশ্য যদি তোমার দরকার না থাকে—'

'না, না। দরকার আছে বইকি—'

প্রায় জোর করে এবার তাকে টেনে এনে সোফায় বসিয়ে দিল বড়বাবু। পাশে বসতে বসতে বলল, 'তোমার ফ্যামিলির অবস্থা শুনেই আমি পার্সোনাল রিস্ক নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি তোমার স্বামী আর ছেলেকে—যাতে তোমার হ্যারাসমেন্ট না বাড়ে। ইনি আমার পুরনো

বন্ধু। এঁর অফিসে একজন রিসেপসনিস্ট-কাম-অপারেটরের দরকার আছে শুনেই তোমার কথা মনে পড়ল। ইউ আর কোয়াইট স্মার্ট অ্যান্ড ইউ স্পিক ইংলিশ।'

দিশেহারা চোখ তুলে একবার দু'জনকেই দেখে নিল সারা। সামনাসামনি বসে থাকায় সিং-এর চোখ এখনও তার ওপরেই নিবদ্ধ। এই দৃষ্টি দু'রকম ভাবায় না। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে সারা ভাবল, ভণিতা না করে লোক দু'টি যদি তাকে ছেড়ে দিত তাহলে সে পালিয়ে বাঁচত। এই ফ্ল্যাটটি তার চেনা। যেখানে বসে আছে সেখান থেকে গজ চারেক দূরে পর্দা ঝুলছে বেডরুমের। হে প্রভু, ব্যবচ্ছেদের জন্যে এখনই আমাকে নিয়ে যাওয়া হোক সেখানে।

সারার চুপচাপ থাকার মধ্যেই সিং তাকে ট্র্যাভেল এজেন্সির কাজের ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিল। আপাতত দেড় হাজার টাকা দেওয়া হবে এবং লাঞ্চ অ্যালাউন্স হিসেবে আরও দুশো। ছ' মাস প্রোবেশনে থাকতে হবে। তবে এটা ফর্মালিটি মাত্র।

পকেট থেকে কোম্পানির নাম ও ঠিকানা ছাপানো একটা কার্ড বের করে সারার দিকে বাড়িয়ে দিল সিং। বলল কাল সকাল দশটায় সারা যেন অবশ্যই দেখা করে তার সঙ্গে—তখনই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পেয়ে যাবে। কাল না হলে পরশু থেকে জয়েন করতে পারে। চাকরিটা এরই মধ্যে বিজ্ঞাপিত হয়েছে কাগজে, অ্যাপ্লিকেশনও জমা পড়েছে কিছু। অল গুড ক্যানডিডেটস। তবে সারা ও-সি সাহেবের ক্যানডিডেট, কাজটাজও জানে—দিস ডিল ইজ ফাইনাল।

কথা শেষ করে সিগারেট ধরাল সিং। সারা কি সিগারেট খায়?

'নো। থ্যাঙ্কস।'

ইতিমধ্যে বার দুয়েক ঘড়ি দেখেছে বড়বাবু। এবার বলল, 'ঠিক আছে তো? এই অ্যারেঞ্জমেন্টটাই পাকা তাহলে? কাল সকালে—'

কথাগুলো শুনলেও অন্যান্য ভাবনা এতক্ষণ অন্যমনস্ক করে রেখেছিল সারাকে। সত্যি বলতে, প্রস্তাবটি খাঁটি হলে কী কী সুবিধে হবে তা নিয়েও ভাবতে শুরু করেছিল সে। অনেকদিন রুজি-রোজগারের মুখ দ্যাখেনি পাইবাস পরিবারের কেউ। ব্যাঙ্কে গচ্ছিত টাকা তুলে আর কতদিন চলবে! রবিনের চাকরি যাবার পর থেকে তারা কেউই দর্জির দোকানে যায়নি, বাইরে খায়নি। বাড়িটাও নিজেদের নয় যে ভাড়া গুনতে হবে না। যতই কম হোক, এটাও একটা খরচ। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ইতিমধ্যে কারুর কোনও গুরুতর অসুখ-বিসুখ হয়নি। এই সময় মাসে হাজার দেড়েক টাকার একটা পাকা বন্দোবস্ত, শুনলেও লোভ হয়। কিন্তু, লোক দু'টি যে মতলববাজ তাতে সন্দেহ নেই কোনও। এদের কথায় বিশ্বাস কি!

ইতস্তত করে সারা বলল, 'আই নিড টু ডিসকাস দিস উইথ মাই হাসব্যান্ড।'

'বাই অল মিনস। ইউ আর ম্যারেড, ইউ শুড ড্যু দ্যাট।' সিং বলল, 'তোমার স্বামীকেও কাল সঙ্গে নিয়ে আসতে পারো। রাইট?'

সারা ভাবল, চাকরির ব্যাপারটা ধাপ্পা নাও হতে পারে, বিশেষত রবিনকেও যখন সঙ্গে করে নিয়ে যেতে বলছে। সত্যি মিথ্যে যা হোক রবিনও বুঝে নিতে পারবে।

বড়বাবু আবার ঘড়ি দেখল। সারাও। পৌনে চারটে বাজছে প্রায়। জানলা থাকলেও ঘরটার চারদিকে পর্দা টানা এবং আলো জ্বালানো। সময় না জানা থাকলে ভিতরে বসে এখন রাতও ভাবা যেত।

মুখ না তুলেই সারা আবার বলল, 'আমি আমার স্বামীর সঙ্গে কথা বলব।'

বড়বাবু উঠে দাঁড়াল। তাকে বেরুতে হবে এখুনি, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসবে।

দেখাদেখি সারাও উঠতে যাচ্ছিল। বাধা দিয়ে বড়বাবু বলল, 'এত তাড়া কিসের! বোসো। আমার কিছু কথা আছে তোমার সঙ্গে—ফিরে এসে বলব। এই সময়টায় তুমি মিস্টার সিং-এর সঙ্গে কথা বলতে পারো। তোমারও নিশ্চয়ই অনেক কিছু জানবার আছে—'

জোর করে ওকে বসিয়ে দিল বড়বাবু এবং সঙ্গে সঙ্গে দরজা টেনে বেরিয়ে গেল ফ্ল্যাট থেকে।

সারা দেখল, মাথা ঝুঁকিয়ে আধপোড়া সিগারেটটা অ্যাশট্রের ভিতর গুঁজে দিচ্ছে সিং। তার ও সিং-এর মধ্যে এখন যে ব্যবধান, এর আগের দিন বড়বাবু ও তার মধ্যে এই একই ব্যবধান ছিল। তফাত এইটুকু, সেদিন নিজেকে নিয়ে ভাববার সঙ্গে সঙ্গে রবিন এবং স্যামুয়েলের কথাও ভাবতে হয়েছিল তাকে। আজকের ভাবনা শুধু নিজেকে নিয়েই।

সিং বলল, 'আরনট ইউ ফিলিং হ্যাপি নাউ?'

কথার অভাবে সারা তাকিয়েছিল অ্যাশট্রে থেকে উঠে আসা আবছা ধোঁয়ার দিকে। সে কিছু জবাব দেবার আগেই দেখল লোকটি উঠে এসেছে তার পাশে। ঘাড়ের নীচের অনাবৃত অংশে তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে শিরশির করে উঠল তার সর্বাঙ্গ।

আজ আর নতুন কোনও অপমানবোধে আক্রান্ত হল না সারা। যা চিন্তা করে বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে তার চেয়ে অন্যরকম কিছু ঘটেনি। ব্যবহৃত, ক্লান্ত ভঙ্গিতে ওখান থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে উঠে সে ভাবল, এই লোকটি না হয়ে আর কেউ হলেও একই ঘটনা ঘটত। বড়বাবু অপেক্ষা করতে বললেও সে করেনি। দরকারও ছিল কি? তবে, নিশ্চিত ভাবে সে বুঝতে পারছিল, জীবন অন্যরকম হয়ে গেল। আর সে চমকাবে না, দ্বিধান্বিতও হবে না। শরীর যেদিকে যেতে বাধ্য করাবে সেদিকেই যাবে।

ডরোথির সামনে

•

রিপন স্ট্রিটের কাছাকাছি এসে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিল সারা। শরীরে অনাকাঙ্ক্ষিত বীজের সংক্রমণ একধরনের ক্লেদাক্ত অনুভূতির সঞ্চার করলেও, ক্লান্তি ছাড়া এখন তার চোখেমুখে আর কোনও প্রভাব নেই। চারদিকে রোদ পড়ে আসার শূন্যতা, কচিৎ হাওয়া পিছলে যাচ্ছে এদিক ওদিকে। ফুটপাথে জমে উঠেছে বাঁদর নাচের আসর—ডুগডুগির শব্দে ছাতার বাঁটের মতো বাঁকানো আঁকশিতে বানর তার বানরির গলা জড়িয়ে ঘুরছে চক্রাকারে। রবিন নিশ্চিত বাড়ি ফেরেনি এখনও। ঈষৎ মন্থর পায়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে সারা দেখল ডরোথি দাঁড়িয়ে আছে গেটের সামনে—তার সঙ্গে চোখাচোখি হতে পিছিয়ে গেল একটু।

গেট বন্ধ করে ওর সামনে দিয়েই হেঁটে সিঁড়ির দিকে এগোল সারা। কথা বলল না। এই প্রথম পরিচিত কারুর মুখোমুখি হয়ে সে টের পেল রাগে ও বিরক্তিতে ঝাঁ-ঝাঁ করছে শরীর। অস্পষ্ট জ্বালা ছুঁয়ে আছে মাথার মধ্যিখানে। এখুনি বাথরুমে ঢুকে স্নানটান করে নিলে হয়তো স্বস্তি হবে কিছুটা।

কাঠের বারান্দা দিয়ে হেঁটে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল সারা।

সামনে ডরোথিকে দেখে থেমে গেল। শাশুড়ির ছোট ও উজ্জ্বল দু'টি ভিতর-পর্যন্ত-খুঁজে-দেখা চোখের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'ওভাবে দেখার কী আছে। জানেনই তো কোথায় গিয়েছিলাম!'

অপ্রত্যাশিত কণ্ঠস্বর ডরোথিকেও অবাক করল। তাদের পুত্রবধূটি বরাবরই নরম মেজাজের, সাত চড়েও ঝাঁঝ ফোটে না মুখে। এখন অন্যরকম লাগছে। মনে পড়ল, বেরুবার আগেও তাকে একবার ধমক দিয়েছিল সারা—মানা করেছিল চ্যাঁচামেচি করতে। তখন যেমন দেখেছিল তার চেয়েও থমথমে লাগছে এখন। আবার কি নতুন কিছু হল।

ঘাবড়ে গিয়ে কী বলবে বুঝতে পারল না ডরোথি। সারার মুখের ওপর থেকে চোখদুটো সরাল না; কিন্তু প্রায় অভ্যাসে ক্রশ-চিহ্ন আঁকার ধরনে একটা হাত উঠে গেল কপালে ও বুকে।

'হোয়াট মেকস ইউ বিহেভ লাইক দ্যাট!' ভুরু কুঁচকে বলল সারা, 'হয়েছেটো কি?'

'কী হয়েছে তুমিই বলবে।' চাপা গলায় ডরোথি বলল, 'আই ক্যান রিড ইয়োর ফেস। কী হয়েছে বলো! ওরা ডেকেছিল কেন!'

বুড়ির গলায় 'মুখ দেখে বুঝতে পারছি' শুনেই ছ্যাঁত করে উঠেছিল বুকটা, পরের কথাগুলো শুনে গুটিয়ে গেল সারা। সে কি ধরিয়ে দিতে চাইছে নিজেকে?

কিছুটা ধাতস্থ হয়ে বলল, 'আমার ভাল লাগছে না—আই ফিল ইনসালটেড।' বলতে বলতেই গলা কাঁপতে লাগল সারার, 'ওরা আমাকে চাকরি দিতে চাইছে। কেন জানেন? আমার স্বামী একটা ক্রিমিনাল আর বেকার—আমার ছেলে—'

ডরোথি বলল, 'ওরা রবিনকে খুঁজতে এসেছিল। তোমাকে নয়!'

'আমি জানি।' সারা চেঁচিয়ে বলল, 'রবিনই আপনার সব। আমি কে! আমার তো মনটন বলে কিছু নেই! আপনারা আমাকে তাই ভাবেন—আ মাইন্ডলেস অ্যানিমেল—আ ব্লাডি হোর—'

নিজেকে হারিয়ে ফেলছিল সারা, হয়তো আরও কিছু বলত। হয়তো ডরোথিও বলত কিছু। কিন্তু সেই মুহূর্তে ক্রাচ ঠুকতে ঠুকতে আর্থার পাইবাস বেরিয়ে আসায় দু'জনেই চুপ করে গেল। চ্যাঁচামেচি শুনেই সম্ভবত ঘুম ভেঙে গিয়েছিল বুড়োর, ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া মুখে তাকিয়ে থাকল ওদের দিকে।

অন্ধকার বারান্দা

ডরোথি চলে গেল উৎকণ্ঠ বুড়োকে আগলাতে। এখান থেকে ওদের কথা শোনা যায় না।

বাথরুমে না ঢুকে বিক্ষোভে নিজেকে বিছানার ওপর ছুড়ে দিল সারা। এর পর অনেকক্ষণ সে বুঝতে পারলে না কেন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ডরোথির ওপর। আচ্ছন্ন বোধ করায় সে ক্রমশ বিস্তৃত করে দিল নিজেকে।

সন্ধেবেলায় রবিন ফিরে আসার পর সারা নিজেই ওকে থানায় যাবার ঘটনাটা বলল। বড়বাবুর ডেকে পাঠানো থেকে সিংয়ের সঙ্গে পরিচয় এবং চাকরির প্রস্তাব—কিছুই বাদ দিল

না। সমস্তই নিজেকে আড়াল করে। ডরোথির সামনে মাথা গরম করার পর তার ধারণা হয়েছিল ডরোথিই হয়তো আগ বাড়িয়ে বলে দেবে সব কথা। কী বলতে কী বলবে, তার কথার অন্যরকম মানে করতে পারে রবিন। স্বামীর প্রতিক্রিয়া আশ্বস্ত করল তাকে। শুধু রবিন কেন, সভয়ে লক্ষ করল সারা, তাকে কেউই অবিশ্বাস করেনি। এই অভিজ্ঞতা তাকে আরও একটু একা করে দিল।

ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে যাওয়ায় গতকাল থেকে আর্থার পাইবাসের বাড়ির সিঁড়ি ও বারান্দার আলো জ্বলছে না। সকালে মিস্ত্রি ডেকে এনেছিল রবিন। লোকটির মুখে সম্ভাব্য খরচের ফিরিস্তি শুনে আর মেরামতের কথা ভাবেনি।

তারও আগে খারাপ হয়ে গেছে আর্থারদের দিকের বাথরুমের কমোড ও সিস্টার্ন। ওখানে আর জল ওঠে না। মেরামতেব কথায় ডরোথি বলেছিল, ইলেকট্রিক লাইনের আগে সিস্টার্ন মেরামত করা দরকার। জল ঢালতে ঢালতে মাজা ভেঙে যাচ্ছে তার। আর, এই বুড়োটাও হয়েছে তেমনি, রাগ করে বলেছিল ডরোথি, বয়স যত বাড়ছে ওর পায়খানার পরিমাণও বাড়ছে তত! এ কথায় খুবই লজ্জা পেয়ে যায় আর্থার। সাধারণত ডরোথিই খোঁটা খায় তার কাছে; কিন্তু এই মারটি মোক্ষম। জুতসই জবাব না পেয়ে বলেছিল, ডরোথির মতো পাকানো চেহারা আর খিটখিটে স্বভাবের মানুষ হলে সেও পায়খানা করত কম। যার হজমই হয় না সে পায়খানার কী বুঝবে! স্যামুয়েল হাততালি দিয়ে বলেছিল এ ব্যাপারে একটা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যেতে পারে—দু'জনকেই জোলাপ খাইয়ে পেট সাফ করে একই পরিমাণ খাবার খাইয়ে দেখা হোক কে কতটা কী করে।

মুখ টিপে হাসলেও, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে সারা ও রবিন বুঝতে পারে আরও বেশি গরিব হয়ে যাচ্ছে তারা।

আজকের ঘটনার পর সারার চাকরির ব্যাপারটাই পাইবাস পরিবারে একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। বড়বাবু লোকটি যে অতিশয় হৃদয়বান এ-বিষয়ে কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। শুধু ডরোথিই যা চুপচাপ থাকল। রবিনকে কেন ধরেছিল ওরা তার উত্তর এখনও পায়নি সে। তেমনি, কোথাও কিছু নেই, সারার প্রতিই যে কেন হঠাৎ এমন দয়ালু হয়ে উঠল ওরা—সেটাও একটা রহস্য। দয়া? সেটা তো রবিনকেই দেখানো যেত! তবে কিনা পৃথিবীতে আজও চমকপ্রদ সব ঘটনা ঘটে। সে জানে না তাদের পরিবারেও সেরকম কিছু ঘটতে যাচ্ছে কিনা। রবিন সঙ্গে যাবে—ব্যাপারটা ভাল মন্দ সে-ই বুঝে নিতে পারবে। তাদের দিন শেষ হয়ে এল, এখন সন্দেহ বা প্রশ্ন তুলে সে কেন নিমিত্তের ভাগী হতে যাবে!

আর্থার পাইবাস ধর্ম মানে। পঙ্গুর অসুবিধা সত্ত্বেও আগে গির্জায় যেত নিয়মিত, এখন আর পারে না। তবু, প্রতি রবিবার সকালে নিজের ঘরে যীশুর ছবির সামনে নত হয়ে থাকে সে—স্মরণ করে যোশেফ ও মরিয়মকেও। ইদানীং স্মৃতি সঙ্কুচিত হয়ে এলেও যীশুর বৃত্তান্তের প্রতি তার আনুগত্য কমেনি। আর্থারের ধর্ম অধর্মের বোধ নিতান্তই সরলরেখায় প্রসারিত—নিজস্ব এই ধর্মবোধ নিয়েই সে তাকিয়ে থাকে নিজের সংসারের দিকে।

বিকেলে ডরোথি ও সারা কী নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল তা সে শোনেনি; কিন্তু ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল মনটা। এখন রবিনের মুখে বড়বাবুর প্রস্তাব শুনে বিলক্ষণ খুশি হল আর্থার। মনে মনে ভাবল, আলো আছে, সুতরাং অন্ধকারও থাকবে।

'ঈশ্বরের রাজ্য এদের মতো লোকেদের জন্যেই।' অন্ধকার বারান্দায় বসে কৃতজ্ঞ আর্থার বলল, 'কী ভাগ্যিস সারা নিজেই চলে গিয়েছিল তখন আর ঝোঁকের মাথায় না বলে আসেনি! হ্যাঁ হে, রবিন, তুমিও কাল যেয়ো ওর সঙ্গে। ব্যাপারটা ঠিকঠাক বুঝে নেওয়া দরকার। বড়বাবু নিশ্চয়ই এই জন্যেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তোমাকে।'

সিংয়ের দেওয়া নাম-ঠিকানা ছাপা কার্ডটা তখনও রবিনের হাতে। অন্ধকারে সেটায় চোখ বুলিয়ে বলল, 'আমি তো এই বড়বাবু লোকটিকে চোখেই দেখিনি। আমাকেই যখন ডেকে পাঠিয়েছিল—কালই একবার গিয়ে দেখা করব ভাবছি।'

'তোর আবার এখনই যাবার কী দরকার হল। তুই কি মেয়েমানুষ!' ব্যস্ত গলায় ডরোথি বলল, 'তোকে দেখলেই আবার মাথা বিগড়ে যেতে পারে লোকটার। আগে চাকরিটা হোক—'

পরের দিন ঠিক সকাল দশটায় সিংয়ের ট্রাভেল এজেন্সিতে উপস্থিত হল দু'জনে।

সারার প্রশ্ন

বড়বাবু বা সিং, কেউই ধাপ্পা দেয়নি। চাকরিটা হয়ে গেল সারার। ঠিক হল, কাল থেকেই ও জয়েন করতে পারবে।

সিংয়ের দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের কপিতে সারা সই করার পর ওরিজিনালটা নিজের কাছেই রেখে দিল রবিন। কাল যে স্যুট-টা পরে সে ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল আজও পরেছে সেটা। যে-রকম ওপর-ওপর ইন্টারভিউ নিল তাতে তাকে ডাকবে কি না সন্দেহ; তবু এই মুহূর্তে নিজের ব্যর্থতায় কোনও বিষাদ অনুভব করল না রবিন। নিজেকে সে কখনওই সারার থেকে আলাদা করে ভাবেনি। আজও ভাবল না। ট্রাভেল এজেন্সির অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে অনেকদিন পরে খোলামেলা হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সারাকে টেনে নিয়ে গেল পার্ক স্ট্রিটের এক রেস্তোরাঁয়।

সারা যে অতিরিক্ত রকমের চুপচাপ এটা চোখ এড়ায়নি রবিনের। মুখোমুখি বসে খুব খুঁটিয়ে স্ত্রীকে লক্ষ করল সে। তারপর বলল, 'চাকরি পেলে, কিন্তু তোমাকে খুশি লাগছে না কেন!'

সারা হাসল। বিষণ্ণ চোখ তুলে দেখল রবিনকে।

'তুমি নিজেও কি খুশি হয়েছ, রবিন?'

'কেন হব না!' রবিন বলল, 'অন্তত নির্ভর করার মতো কিছু একটা পাওয়া গেল!'

কথাগুলো ঠিকঠাক শুনেছে কিনা বুঝবার চেষ্টায় আরও কয়েক মুহূর্ত রবিনের দিকে তাকিয়ে থাকল সারা। তারপর চোখ নামিয়ে আঙুলের দাগ টানতে লাগল টেবিলের ওপর।

'তুমি কী ভাবছ বলো তো!' অসহিষ্ণু গলায় রবিন এবার বলল, 'মাঝে মাঝে তোমাকে একেবারে বুঝতে পারি না! ইচ্ছে না থাকলে নিয়ো না চাকরিটা—'

'নির্ভরতা কাকে বলে, রবিন?' সারা হঠাৎই গভীর হয়ে উঠল, যেন রবিনের আগের কথাগুলো কানে তোলেনি। বলল, 'আমি কার ওপর নির্ভর করব। আমার কী থাকল!'

ওয়েটার পেস্ট্রি ও কফি দিয়ে গেছে। পট থেকে কাপে কফি ঢালতে ঢালতে রবিন বলল, ' তুমি কি আমার কথা বলছ? আমার মনে হয় না আমার কিছু হবে আর—'

এরই মধ্যে বিমর্ষতা ছায়া ফেলেছে রবিনের মুখে। চোখ রাস্তার দিকে। ভঙ্গিটা চেনা। সারা বুঝতে পারল সে যা বোঝাতে চেয়েছিল রবিন তার একবর্ণও বোঝেনি। পরিবর্তে ভুল বুঝেছে তাকে।

'কার কী হবে না হবে কে জানছে!' সময় নিয়ে সারা বলল, 'সেদিন তুমি আমাকে মেরেছিলে—যদিও আমি থানায় গিয়েছিলাম তোমাদেরই বাঁচাতে। সেদিন তুমি আমার ওপর নির্ভর করতে পারোনি! আজ করছ! কিছু টাকা পাব বলে? হাউ স্যাড! রবিন, আমি তোমার ওপর নির্ভর করেছি তুমি আমার স্বামী বলে। তুমি টাকা রোজগার করো বলে নয়—'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকল সারা। তারপর স্বগতোক্তির ধরনে বলল, 'এর মানে কি আমি জানি না। জানার দরকার আছে কি? কিন্তু, এর ভাবনাটাই আমার সব।'

'ওহ, তুমি বোধহয় দর্শন আউড়াচ্ছ!' রবিন এবার হাসল অল্প, 'চুপচাপ লোকেরা বেশি ভাবে। ভাবতে ভাবতে পাগল হয়ে যায়।'

'হয়তো আমিও পাগল হয়ে যাচ্ছি।' টেবিলের ওপর ছড়ানো রবিনের হাতটা নিজের হাতে চেপে ধরল সারা। কাতর গলায় বলল, 'বুঝবার চেষ্টা করো, রবিন। এই চাকরিটা আমাদের কোথাও নিয়ে যাবে না। আমাদের সম্মানও বাড়াবে না। উই উইল স্টিল বি হিউমিলিয়েটেড। দিস ইজ নো লাইফ। এখানে থাকলে তুমি আমি কেউই বাঁচতে পারব না শেষ পর্যন্ত। স্যামুয়েলেরই বা কী হবে।'

রবিন চুপ করে থাকল। আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিল হাতটা।

নৈঃশব্দ্য নেমে এসেছে দু'জনের মাঝখানে। এতক্ষণ নিজেরাই কথা বলছিল বলে অন্যান্য টেবিলের সমবেত কণ্ঠস্বর কানে আসেনি। শব্দটা এবার জাঁকিয়ে এল। খিদে ছিল না, তবু ফেলে রাখলে রবিন বিরক্ত হবে ভেবে ফেলে ছড়িয়ে খানিকটা পেস্ট্রি মুখে দিল সারা। কফিও নিল। দূরে একটি লোকের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুহূর্তের জন্যে শিউরে উঠল সে। না, ভুল দেখেছিল। লোকটির মুখে সিংয়ের আদল থাকলেও সিং-ই নয়। রবিন অন্যমনস্ক, এখনও তার দৃষ্টি রাস্তার দিকে। সম্ভবত আজই তাকে এসব কথা বলা উচিত হয়নি।

সারার ভাবনার মধ্যে রবিন হঠাৎ বলল, 'তুমি অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাবার কথা বলেছিলে। তোমার ভাইও তো কিছুই জানায় না।'

সারা জবাব দিল না। সে নিজেও কি জানে কিছু! এতক্ষণ শুধু নিজের আবেগটাকেই চিনেছিল সে, ভাষা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারেনি। হয়তো কোথাও-ই নিয়ে যায়নি। যায়ও না।

খাপছাড়া ভঙ্গিতে রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে এল ওরা। বাড়ি ফিরে দেখল, জোহানকে ধরে এনেছে স্যামুয়েল। বেঁটে টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বারান্দার সুইচ বোর্ড খুলে স্ক্রু আঁটছে জোহান। লালের পরিবর্তে আজ তার গায়ে নেভি ব্লু সার্ট—ছেলেটি বোধহয় হালকা রঙ পছন্দ করে না। বেতের চেয়ারে কোলে গামলা নিয়ে বসে চাল বাছছে ডরোথি। এমনই তন্ময় যে ওদের আবির্ভাবে মুখ পর্যন্ত তুলল না। আর্থার সম্ভবত ঘরে। ক্রাচটা ওর ইজিচেয়ারে আড়াআড়ি শোয়ানো।

বাপ-মাকে ফিরতে দেখেই লাফিয়ে উঠল স্যামুয়েল।

'সি মাম্‌মি, হোয়াট জোহান হ্যাজ ডান! দ্য লাইন ইজ ওয়ার্কিং। হাই জোহান! কাম, শো ইট।'

কালো মুখের দাঁতগুলি বের করে হাসল জোহান। কৃতার্থ হাসি। সুইচ টিপতেই জ্বলে উঠল বারান্দা ও সিঁড়ির বালব দুটো।

ঘটনাটা রবিনকেও অবাক করেছে। খানিক আগেকার গাম্ভীর্য ভুলে সপ্রশংস দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে থাকল জোহানের দিকে।

'ভগবানের দিব্যি, তুমি তো ম্যাজিক জানো হে ছোকরা!'

চকোলেটের স্বাদ

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সারার হঠাৎ মনে পড়ল কাল স্যামুয়েল যে তাকে চকোলেট দিয়েছিল একেবারেই ভুলে গেছে সে-কথা। ব্যাগ হাতড়ে খুঁজে পেল সেটা। মোড়ক খুলতে খুলতে ডাকল, 'স্যামুয়েল, কাম হিয়ার—'

সঙ্গে সঙ্গেই চলে এল স্যামুয়েল।

'হ্যাভ ইউ গট দ্য জব, মাম্‌মি?'

'ইয়েস। আই হ্যাভ।' স্যামুয়েলকে হাঁ করতে বলল সারা। তারপর ওর মুখে চকোলেটের একটা বড় টুকরো ভরে দিয়ে বলল, 'বাকিটা তোর বন্ধুকে দিয়ে আয়।'

'গড!' স্যামুয়েল বলল, 'আমি তো তোমাকেই দিয়েছিলাম এটা। খাওনি!'

'পরে আবার দিস। খাবো।'

আড়ষ্ট হয়ে এল সারার গলা। হঠাৎ স্যামুয়েলকে জড়িয়ে ধরে ছেলের বুকে নিজের মুখটা ঠেসে ধরল সে। থরথর করে কাঁপতে লাগল তার সর্বাঙ্গ।

এর আগে কখনও মাকে এরকম ব্যবহার করতে দ্যাখেনি স্যামুয়েল। অবাক হলেও সারার কান্না তাকেও স্পর্শ করেছিল। অস্ফুট গলায় সে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে। তুমি কি পাওনি কাজটা!'

সারা কিছু বলল না। শুধু তার আবেগমথিত মাথাটা এদিকে থেকে ওদিকে এমন ভাবে নাড়ল যার অর্থ হ্যাঁ কিংবা না, দুই-ই হতে পারে।

রবিন ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকেছিল। সারাকে ওইভাবে দেখে থমকে গেল একটু। তারপর হতাশ গলায় বলল, 'উইপ বিফোর গড। স্যামুয়েল কী করবে! অপদার্থ স্বামীটির জন্যেই তো তোমার যত জ্বালা! সেজন্যে ঈশ্বরকে দোষ দাও। তিনিই তোমার জন্মদাতা।'

সেদিনের পর আর কোনও দিন আলোড়িত হয়নি সারা।

কেউ জানতে পারে না, পরের দিন থেকে পুরোপুরি বেশ্যা হয়ে যায় সে।

দৃশ্যটা নতুন নয়

একটু আগে ডিপারচার কল হয়ে গেছে দিল্লি ফ্লাইটের। গেটে বোর্ডিং কার্ড দেখিয়ে যাত্রীরা হেঁটে যাচ্ছে টারম্যাকের দিকে। যারা তখনও যায়নি, তারা দেখল, বিষাদগ্রস্ত এক মহিলাকে সামলাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এক প্রৌঢ় আর এক যুবক। সম্ভবত এরা মহিলার স্বামী ও ছেলে। মহিলাকে দেখে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মনে হয়।

ওদের আস্তে আস্তে গেটের দিকে এগোতে দেখে অন্যরা জায়গা ছেড়ে দিল এবং ভাবল, দৃশ্যটা নতুন নয়। যাত্রার আগে কেউ কেউ এমন বিপন্ন ও শোকার্ত হয়ে পড়ে।

২

দিন মাসের হিসেবে বর্ষা চলে গেলেও আকাশে আর্দ্রতা যায়নি। এখনও মাঝে মাঝে বৃষ্টি নেমে আসে হঠাৎ; ধুলোর গন্ধ ভালভাবে মরতে না মরতেই থেমে যায় আবার। তখন রোদ ওঠে, হালকা মেঘের সংস্পর্শ জড়ানো নীলবর্ণ আকাশ উঠে যায় আরও উঁচুতে। হাওয়া দেয় ক্বচিৎ। তখন বোঝা যায় শীত এসে পড়বে ক্রমশ।

সেদিন রাতে তুমুল বৃষ্টির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল ডরোথির। শুধু বৃষ্টির শব্দেই নয়, সে যেন পরিষ্কার শুনল হুড়মুড় শব্দে কী একটা ভেঙে পড়ছে কোথাও। তার ঘুম এমনিতেই পাতলা, ভুল হবার কথা নয়।

অন্ধকারে ঘোর কাটার আগেই কানে এল আর্থারের নাক ডাকার শব্দ। ইচ্ছে করেই গলা খাঁকারি দিল ডরোথি, বিছানা থাবড়াল বার দুয়েক—আর্থারের ঘুমের ব্যাঘাত হল না কোনও।

বিমূঢ় ভঙ্গিতে সে চেয়ে থাকল স্বামীর দিকে।

কিছু দিন থেকেই ঘুমের মাত্রা বেড়ে গেছে বুড়োর। আর এমনই নিঃসাড় সে-ঘুম যে মনে হয় কানের কাছে বাজ পড়লেও ভাঙবে না। ডরোথি জানে ভাবনাটা ভাল নয়—এ তো আর জোয়ান যুবা নয় যে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে দাপিয়ে বেড়াবে। বয়সটাও বেড়ার ওদিকে। পা কাটা যাবার পরই সিকিভাগ গিয়েছিল, তার ওপর রবিনরা যাবার পর এমনই মুষড়ে পড়ল যে এক মাস যেতে না যেতেই হার্টের অসুখ এসে নিয়ে গেল বাকি অর্ধেক। বাকিটুকু যেতে কতক্ষণ। আর্থার বেশি নাক ডাকলে তাই সন্ত্রস্ত হতে হয়। অন্ধকারে ঝুঁকে পড়ে তখন ওর বুকে কিংবা পিঠে হাত রাখে ডরোথি; খুব সন্তর্পণে, নিজের অনুভব দিয়ে বুঝে নেয় নিঃশ্বাস আছে কিনা। হার্ট আর ব্লাডপ্রেসার ঠিক রাখার জন্যে যে-ওষুধগুলো খায় তাতেও ঘুম পায় হয়তো। ডরোথির ভয় তবু যায় না। তার নিজের বয়সও সত্তর পেরিয়েছে। শরীরও আর আগের মতো ধকল সহ্য করতে পারে না। দু' পায়ের হাঁটুতে সারাক্ষণ লেগে থাকে আলগা একটা যন্ত্রণা, উঠতে বসতে ঝনঝন করে ওঠে কোমর। ক'দিন আগে মারা গেল রয়েড স্ট্রিটের মিস্টার ওব্রায়েন—আর্থারের পুরনো বন্ধু, প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভেবে খবরটা চেপে গেছে ডরোথি। মানুষটা বড়ই আবেগপ্রবণ আর অভিমানী; সত্য বলতে বিশ্বাসই হয় না কোনও কালে সৈনিক ছিল।

এসব দেখেশুনেই হয়তো রোজালিন বলেছিল এ-বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে চৌরঙ্গি লেনে ওদের ফ্ল্যাটে উঠে যেতে। এই বয়সের প্রায় অথর্ব দু'টি মানুষের একা-একা এই বাড়িতে পড়ে থাকার ঝুঁকি অনেক। অন্যদেরও চিন্তা বাড়বে।

রোজালিনের কথায় যুক্তি এবং আগ্রহ থাকলেও ডরোথি কিংবা আর্থার কেউই রাজি হয়নি এখান থেকে নড়তে। দু'জনেই অবশ্য আলাদা আলাদা কারণে।

তিনটি খুপরি ঘর নিয়ে রোজালিনের ফ্ল্যাট। নিজেরাই থাকে ঠাসাঠাসি করে। ওর দুই ছেলেমেয়ে, ডোনাল্ড আর ডেইজি বড় হচ্ছে ক্রমশ—ওদেরও প্রয়োজন আছে। এর মধ্যে বুড়ো-বুড়িকে জায়গা দিতে হলে এরকম দমচাপা অবস্থার সৃষ্টি হবে। আর্থার মুখর মানুষ, ওর হাঁকডাক চ্যাঁচামেচিতেও অশান্তি দেখা দিতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা, ডরোথি ভেবেছিল, রোজালিন যতই উৎসাহ দেখাক, মাইকেল এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করেনি। এই অবস্থায় ওদের ঘাড়ে গিয়ে পড়লে সমস্যা দেখা দিতে পারে। মেয়ের পরামর্শে, সুতরাং, খুব উৎসাহ বোধ করেনি ডরোথি।

আর্থারের রাজি না হওয়ার কারণ অন্য। ও জানে, সারা আর রবিন কথা দিয়ে গেছে একটু সুবিধে করতে পারলেই ওদেরও নিয়ে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়। যেতে হলে এখান থেকেই যাবে। একনাগাড়ে তিরিশ বছর থাকা হল রিপন স্ট্রিটের এই বাড়িতে—চোখ বেঁধে কানামাছি খেললেও কোথায় সিঁড়ি, কোথায় বারান্দা, কোথায়ই বা দেয়াল, জানলা বা বাথরুমের আলোর সুইচ তা বলে দিতে পারবে ঠিকঠাক। তাছাড়া, এ পাড়ায় কে না চেনে আর্থার পাইবাসকে! সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাঁক দিলেই আপদে-বিপদে ছুটে আসবে কেউ না কেউ। রোগ-অসুখ? আর্থার বলেছিল, সে কি সত্যিই বুড়ো হয়ে গেল নাকি!

আর্থারের ধারণা সত্য হয়নি। কিছুদিনের মধ্যেই ছোটখাটো একটা হার্ট অ্যাটাক হয়ে গেল তার। ভাগ্য ভাল, গ্রীষ্মের ছুটি থাকায় লরা তখনও রাঁচি ফিরে যায়নি—ঘটনাটা ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার আনতে পেরেছিল। এখন লরাও নেই। নিতান্তই মনের জোরে আর্থার কিছুটা পূর্বাবস্থায় ফিরে এলেও ডরোথি জানে এ-সবের মানে কি। ওপরে ওপরে তেমন কিছু বোঝা না গেলেও আর্থার অসহিষ্ণু, একদিন হয়তো ও বুঝতে পারবে এভাবে অপেক্ষা করার মানে হয় না কোনও। রবিনরা যে চেষ্টা করবে না তা নয়। কিন্তু চেষ্টা করলেই কি আর কাজ হয় সবসময়! হলে তো এখানেই হত। তাছাড়া যে-টান কাছাকাছি থাকায়, দূরে গেলেও কি তা থাকবে।

অন্ধকারেই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল ডরোথি। আকস্মিক সেই শব্দটা এখনও লেগে আছে কানে—বৃষ্টি ও রবিনের নাক ডাকার শব্দ থেকে আলাদা হয়ে ছুঁয়ে গেছে স্মৃতি। একবার দেখা যাক ভেবে বালিশের পাশ থেকে টর্চ আর চাবির গোছাটা টেনে নিয়ে দরজা খুলল সে। চাপা একটা দুর্গন্ধ উঠে এল নাকে।

বারান্দায় অন্ধকার থাকলেও ঘরের মধ্যে যতটা রাত মনে হয়েছিল ততটা নয়। কেমন একটা আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। বৃষ্টি না পড়লে হয়তো ভোরেরও দেখা পেত। অলিভারদের বাড়ির উঠোন থেকে মোরগের ডাক ভেসে এল কানে; অস্পষ্ট কাকের ডাকও। সামনের রাস্তা দিয়ে একটা ট্যাক্সির হর্ন বাজিয়ে চলে যাওয়া সাহস এনে দিল মনে।

সিঁড়ির দরজাটাও খুলল ডরোথি। যত দূর দেখা যায় আলো ফেলে দেখল, কোথাও কিছু নেই। তখন ভাবল, রাতের বেলায় দূরের শব্দও কাছে চলে আসে অনেক সময়, হয়তো সেইরকমই কিছু শুনেছে। কেউ এসে দরজায় আঘাত করেনি তো?

নিঃসন্দেহ হবার জন্যে আরও কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ডরোথি। বৃষ্টি থেমে এসেছে। আলো ফুটে উঠেছে ক্রমশ। একই ছাতা মাথায় কথা বলতে বলতে দুটি লোক হেঁটে গেল রাস্তা দিয়ে।

মরা ইঁদুর ও ভাঙা পাঁচিল

এখন আর বিছানায় ফিরে যাওয়ার মানে হয় না। চোখমুখ ধুয়ে স্টোভ জ্বেলে নিজের চা-টুকু করে নিতে হবে। আর্থারের ওঠার তাড়া নেই। তার আগে দরজায় তালা লাগিয়ে বুথে যেতে হবে দুধ আনতে, ফেরার সময় রুটিও কিনে নেবে। দেরির জন্যে প্রায় রোজই বুথে গিয়ে লাইনের পিছনে দাঁড়াতে হয় তাকে।

ঘুরতে গিয়ে দুর্গন্ধটা নাকে লাগল আবার। সামনে রবিনের ঘর। ওরা যাবার পর থেকে বন্ধই থাকে। খাট, বিছানা, আলমারি ছাড়াও ওদের কিছু জিনিসপত্র থেকে গেছে ওখানে। কে আর পাহারা দেবে সারাদিন! গত রবিবার গির্জা-ফেরত রোজালিন এসেছিল ছেলেমেয়েদের নিয়ে, ঝাড়পোঁছ যা করার ও-ই করে দিয়ে গিয়েছিল। আজ বৃহস্পতিবার। গন্ধটা ওইখান থেকেই আসছিল।

নিঃসন্দেহ হয়ে দরজাটা খুলে ফেলল ডরোথি। নাকে হাত চাপা দিয়ে টর্চের আলো ফেলে দেখল দরজা থেকে অল্প দূরে মেঝের ওপর মরে পড়ে আছে একটা ধেড়ে ইঁদুর। সারি সারি পিঁপড়ে জড়ো হয়েছে ওটাকে ঘিরে। দেখে মনে হয় পচনটা নতুন নয়।

'ও মাই গড!' নিজের মনেই আঁতকে উঠল ডরোথি, 'হু হ্যাজ ডান দিস টু আস!'

একবার ভাবল আর্থারকে ডেকে তোলে। কিন্তু, ও-ই বা এসে করবে কী! যা করার নিজেকেই করতে হবে। সাতসকালে বেশ ঝামেলা হল যা হোক!

নাক বন্ধ করে ঘরে ঢুকে জানলা দুটো খুলে দিল ডরোথি। আশপাশে তাকিয়ে একটা খালি জুতোর বাক্স দেখতে পেল, একটা পুরনো স্কেলও। মরা এই জীবটিকে এখনই বিদেয় করতে হবে, না হলে গন্ধের উৎপাতে টেঁকা যাবে না বাড়িতে। ভাবতে ভাবতে গা গুলানো অস্বস্তি নিয়ে মেঝের ওপর উবু হয়ে বসল ডরোথি, তারপর স্কেল দিয়ে খুঁচিয়ে পিচবোর্ডের বাক্সের মধ্যে এনে ফেলল ইঁদুরটাকে। ঘেন্না লাগলেও বিরাট একটা কিছু করে ফেলার প্রসন্নতা আরও তৎপর করে তুলল তাকে। বাক্সটা বন্ধ করে সেটা নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগোল—রাস্তার জঞ্জালে ফেলে না দেওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই। ফিরে এসে আবার ফেনোয়েল ঢালতে হবে জায়গাটায়। মরা ইঁদুর ভয়ঙ্কর ব্যাপার। ঠিক কতদিন আগে মনে নেই, রবিনের জন্মের পর পরই বোধহয়, প্লেগে ছারখার হয়ে গিয়েছিল তালতলার ওদিকে একটা বস্তি। বেশ কিছু লোক মারা যায়। রবিনের জন্মের পরে, নাকি রোজালিনই ছোট ছিল তখন? একই সময়ে নিজের এবং মরা ইঁদুরটির প্রতি বিরক্তিতে বিড়বিড় করে উঠল ডরোথি। আজকাল

অনেক কথা, অনেক ঘটনাই ঠিকঠাক মনে পড়ে না।

গেট পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই আরও একটা দৃশ্য দেখে চমকে উঠল ডরোথি। প্রায় পাঁচ-ছ' গজ জায়গা নিয়ে ভেঙে পড়েছে গেটের লাগোয়া পাঁচিলটা। এমনভাবে যে এখন গেট থাকা না-থাকা সমান, রাস্তা থেকে যে-কেউ এক লাফে ডিঙিয়ে চলে আসতে পারে ভিতরে। করুণ দৃষ্টিতে খানিক ওই ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে থেকে নিঃশ্বাস সম্বরণ করল ডরোথি। এই পাঁচিল ভেঙে পড়ার শব্দেই তাহলে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল তার—আড়াল থাকায় সিঁড়ি থেকে দেখতে পায়নি তখন!

জঞ্জালে ফেলে দেওয়া মরা ইঁদুরটির কর্তৃত্ব নিয়ে ঝগড়া করছে কয়েকটা কাক। শোরগোল তুলে উড়ে আসছে আরও কয়েকটা। রাস্তার মাঝখানে দাঁড়ানো ডরোথির গায়ের ওপর দিয়ে একটা কুকুরও ছুটে গেল সেইদিকে।

বিষণ্ণ মুখে স্তূপীকৃত ইট আর পলেস্তরার দিকে তাকিয়ে থাকল ডরোথি। একটু পরে চোখ তুলে তাকাল, খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে লাগল বাড়িটাকে। যেখানে সেখানে পলেস্তরা খসা, ছোপ ছোপ শ্যাওলায় কালো হয়ে গেছে দেয়ালগুলো। তাদের বাথরুমের পিছনে আর রবিনদের বেডরুমের দেয়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে বটের পাতা। রঙ জ্বলে গেছে কাঠের। নীচের তলাটা গোডাউন করে রেখেছে সিম্পসন কোম্পানি—কালেভদ্রে আসে ওদের লোকজন, বড় বড় প্যাকিং বাক্স ঢোকায় কিংবা বের করে নিয়ে যায়। বাঁদিকে ঘুরে সিঁড়ির দিকে এগোতে হয় বলে লনের এদিকটায় আসা হয় না কখনও। রাস্তা দিয়ে হেঁটে এলে দৃষ্টি আড়াল হয়ে যেত পাঁচিলে। আজ দেখল লম্বা-লম্বা ঘাস আর আগাছায় জঙ্গল হয়ে আছে জায়গাটা। কবে হল এরকম, কোথায় গেল সেই হলুদ-রঙা বাড়ির সবুজ জানলা, দরজা, বারান্দা!

অপ্রত্যাশিত এই জীর্ণতার রূপ মূক করে দিল ডরোথিকে।

শিশি-বোতলের হাসি

এ বাড়ির এলাকা পেরুলেই শিশি-বোতল-পুরনো-খবরের কাগজের ঘুপচি দোকান। ডরোথিকে ওইভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নিমের দাঁতন মুখে এগিয়ে এল ওই দোকানের লোকটি। ভাঙা অংশটা দেখতে দেখতে বলল, 'ইয়ে মাকান তো মেমসাব বহুত পুরানা হো গিয়া। আজ এ দিবার গিয়া, কাল কঁহি ঔর যায়গা—'

'হাঁ। তুমারা লিয়ে ইয়ে বহুৎ ফান হ্যায়।' লোকটিকে দেখতে দেখতে একটু সরে গেল ডরোথি। বিরক্ত ও বেসুরো গলায় বলল, 'তুমারা সব গোট ঔর চুহা আব অন্দর এনট্রি করেগা। তুম লোগ বদমাশ হ্যায়।'

বুড়ির কথা শুনে হাসতে লাগল লোকটি—অন্তত শ' পাঁচেক আস্ত ইট পাওয়া যাবে ওই স্তূপ থেকে, তাড়াতাড়ি সরিয়ে নিতে পারলে তার দোকানের ভিতর মাল রাখার জন্যে তাক তোলার খরচ অনেকটাই বেঁচে যেত। দুধের বোতল হাতে বুথের দিকে যেতে যেতে ঝি-মতন একটি মেয়েও দাঁড়িয়ে পড়ল সেখানে। এর পর হয়তো আরও লোক জুটবে।

হাতে হাত ঘষতে ঘষতে গেটের দিকে হেঁটে গেল ডরোথি। এখন পুরোপুরি সকাল। বৃষ্টিধোয়া নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। সম্ভবত আজও বেরুতে দেরি হয়ে গেল তার।

ফেনোয়েলের বোতলটা শূন্য। অগত্যা বাথরুম থেকে বালতিতে জল নিয়ে গিয়ে ঝাঁটা বুলিয়ে রবিনের ঘরের মেঝেটা পরিষ্কার করল ডরোথি। খানিকক্ষণ থেকেই অভিমান জমা হচ্ছিল বুকে। এতটা বয়স পর্যন্ত নিজের কথা সে খুব কমই ভেবেছে। সময় পায়নি, উপলক্ষও ঘটেনি। মরা ইঁদুরের গন্ধ এবং ভাঙা পাঁচিলের অভিজ্ঞতা আজ তাকে টেনে নিল নিজেরই ভিতরে। ব্রাইডাল গাউন পরিহিতা, শ্বেতবসনা সে যেদিন আর্থারের বাহুতে বাহু জড়িয়ে বেরিয়ে এসেছিল গির্জা থেকে, সেদিন কী ভেবেছিল আজ আর তা মনে পড়ে না। তবে আজকের সকালটা নিশ্চয়ই তার মনের মধ্যে ছিল না। একটু আগে রাস্তায় দাঁড়িয়ে যখন সে তাকিয়ে ছিল বাড়িটার দিকে, তখন হঠাৎ মনে হয়েছিল, বাড়ি নয়, সে নিজেকেই দেখছে। কে জানে, ওই শিশি-বোতলঅলা এলেবেলে লোকটাই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা কিনা! আজ দেয়াল গেল, কাল হয়তো আর কিছু যাবে—, হা ভাগ্য, এই পরিণতির জন্যেই কি জন্ম! তাহলে মৃত্যু কী!

একরকম আচ্ছন্নতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল ডরোথি। সাড়া পেল আর্থারের ডাকে।

'কামিং, কামিং—' ঝাঁটা আর বালতি তুলে উঠতে উঠতে ডরোথি বলল, 'হোয়াট মেক্স্ ইউ গেট আপ সো আরলি!'

'হারি আপ, ডার্লিং!' আর্থার চেঁচিয়ে বলল, 'তোমার ওই ক্যাঁক্কেরে গলা শোনবার লোভেই বোধহয় ঘুম ভেঙে গেলে আমার।'

মজা এই, হাত ধুতে ধুতে ডরোথি ভাবল, এই মানুষটার পরিবর্তন হল না কোনও। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই রসিকতায় ভাসিয়ে দিচ্ছে নিজেকে—জানে না কী কাণ্ড ঘটছে চারদিকে।

দেড়খানা পা নিয়ে বিছানার মাঝখানে বসে ছিল আর্থার। মুখে প্রকৃত শান্তি। ডরোথিকে দেখে বলল, 'তুমি যে বাড়িতে কী করে বুঝব! ভাবলাম দুধ আনতে গেছ বুঝি! তা, সাত সকালে ঘর ঝাঁটানোর শখ হল কেন!'

'হ্যাঁ, শখই তো! মরা ইঁদুরটা তোমার নাকের ওপর ছুড়ে মারলেই বুঝতে কোন দুঃখে ঝাঁটা ধরেছি।'

অজস্র রেখাঙ্কিত ডরোথির মুখে কোনও অভিব্যক্তিই পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়ে না; একটি রেখা ফুটতে না ফুটতেই হারিয়ে যায় অন্য রেখার আড়ালে।

'ওটা ইঁদুর ছিল বুঝি!' অমনোযোগের ভঙ্গিতে আর্থার বলল, 'ক'দিন ধরেই কিঁচ-কিঁচ শব্দ শুনতাম। লন থেকে উঠে এসেছে বোধ হয়—'

ডরোথি জবাব দিল না।

'লন থেকেই বা আসবে কী করে! ইঁদুর কি সিঁড়ি উঠতে পারে!'

গলা শুনে মনে হবে এ-বাড়ির তল্লাটে কখনও ইঁদুর দ্যাখেনি আর্থার; কিংবা ইঁদুর একটি ভয়াবহ জন্তু। ব্যাপারটা তাকে খুব চিন্তায় ফেলেছে।

বলবে বলবে করেও পাঁচিল ধসে পড়ার ঘটনাটা ওকে আর বলল না ডরোথি। আর্থারের ধৈর্য কম, অল্পেই বিচলিত হয়ে পড়ে। কী বুঝতে কী বুঝবে, তারপর জবাবদিহি করতে

করতে জেরবার হতে হবে তাকে। আপাতত এ নিয়ে রোজালিনের সঙ্গে একটা পরামর্শ করা দরকার। বাড়িঅলা থাকে ব্যাঙ্গালোরে। তার এক ভাগ্নে না ভাইপো কে যেন থাকে এখানে—প্রত্যেক মাসের সাত থেকে দশ তারিখের মধ্যে এসে ভাড়া নিয়ে যায়। রোজালিন ওর ঠিকানা জানে। স্যামুয়েলের বন্ধু সেই জোহান ছেলেটা প্রায়ই আসে খোঁজখবর করতে, ওকে দিয়ে একটা খবর পাঠানো যেতে পারে। ওরা আসুক, দেখুক, মেরামত করে দিক পাঁচিলটা। আর যদি কিছু না করে, তাহলে রইল পাঁচিল যেমনকার তেমনি ভাঙা অবস্থায়। সম্বল তো মাত্র ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রবিনের যোল হাজার টাকা আর লরার পাঠানো মাসিক বরাদ্দটুকু। খরচের ভাবনায় এক পা এগোলে সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে আসতে হয়।

তা ছাড়া, ডরোথি ভাবছিল, সত্যি-সত্যিই কি পাঁচিলটার কোনও অর্থ আছে আর্থারের কাছে? রবিনরা যেদিন চলে গেল, সেদিনই, এয়ারপোর্টে ওদের সী-অফ করতে যাবার জন্যে শেষবার নীচে নেমেছিল ও। আর কি পারবে কখনও? এখন তো ডাক্তারেরও বারণ। যদি না পারে তাহলে পাঁচিল থাকা এবং না-থাকার মাঝখানের তফাতটুকু কোনও দিনই ছায়া ফেলবে না ওর মুখে। দোতলার তিনখানা ঘর আর টানা বারান্দাটাই এখন বেঁচে থাকার পৃথিবী। কে জানে, হয়তো মাটির সংস্পর্শও ওর জীবন থেকে হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো।

শেষের চিন্তাটায় বিমূঢ় বোধ করল ডরোথি। আজকের দিনটাই কি অশুভ! না হলে এমন অলক্ষুণে কথাই বা তার মনে হবে কেন!

আর্থারের স্বপ্ন দেখা

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে আর্থার। মুখে পরিচ্ছন্ন ঘুমের প্রশান্তি। গাল এবং চিবুকের সাদা খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলোই যা একটু চোখে লাগে। আর নাকের পাটার ওই লালচে আভাসটুকু—খুঁটিয়ে দেখলে মনে হয় রঙটা যেন ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে পড়ছে গোটা মুখমণ্ডলে।

ওকে দেখতে দেখতেই একটা উপমা স্পর্শ করে গেল ডরোথিকে। লোকে জানে সৈনিক; কিন্তু শরীর বাদ দিয়ে শুধু ওর বড় মুখের মধ্যে চেপে বসানো চোখ দুটির দিকে তাকালে আর্থারকে নাবিক মনে হতে পারে। যেন জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে বহু দূর ব্যাপ্ত জলরাশির দিকে তাকিয়ে আছে ও। বিপুল এই জলরাশির শেষে কোথাও আছে তার কাঙ্ক্ষিত তটরেখা—দৃশ্যত চোখে না পড়লেও মনে মনে এখনই সে পৌঁছে গেছে ওখানে। বাড়িতে কথা বলার লোক কমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাবুকতা বেড়েছে আর্থারের। ডরোথি নিজেই বা ক'টা কথা বলে। নিঃশব্দ নৈকট্য দিয়ে সাজানো এতকালের সম্পর্কে এমনই অভ্যস্ত সে যে নতুন করে আলাপের বিষয় খুঁজে পায় না। মাঝে রোজালিনকে বলেছিল ডোনাল্ডকে রেখে যেতে এখানে। দাদুর সঙ্গে ছেলেটার জমে ভাল; যেভাবে হই-হট্টগোল করে কথা বলে ওরা তাতে মনে হয় দু'জনই সমান বয়সী। ওই রকম একজন কথা বলার সঙ্গী পেলে আর্থারের মনটাও হালকা হত। কিন্তু রোজালিনকে রাজি করানো যায়নি। দামাল

ছেলে; কখন কী করে বসে এই ভয়ে ওরা নিজেরাই তটস্থ থাকা সারাক্ষণ। এই তো সেদিন। স্যামুয়েল যাবার আগে সাইকেলটা উপহার দিয়ে গিয়েছিল ডোনাল্ডকে। ভাল করে চালাতে না শিখেই সাইকেল নিয়ে ছেলেটা বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়—বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে চোট পেয়েছে হাঁটুতে। ওই ছেলেকে সামলানো বুড়ো-বুড়ির কাজ নয়।

আর্থার কেন ডেকেছিল তা শোনা হয়নি এখনও। এদিকে দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর্থার বেলা পর্যন্ত ঘুমোয় বলে অন্যদিন সিঁড়ির দরজায় তালা লাগিয়ে দুধ আনতে যায় ডরোথি। বিস্তর সময় থাকে হাতে। আজ সাততাড়াতাড়ি উঠে পড়ে লোকটা সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিল।

'আমার এখন অনেক কাজ।' আর্থার তখনও তন্ময় দেখে ডরোথি বলল, 'দুধ আনতে যেতে হবে। চা খেলে বলো? নাকি কমোডে বসবে?'

'কোনটা ইমপর্ট্যান্ট মনে হচ্ছে তোমার?'

খেয়াল-খুশির উত্তর শুনে বিগড়ে গেল ডবোথি। রাগ দেখিয়ে বলল, 'দ্যাখো হে বুড়ো, তুমি বড্ড ঝামেলা করছ! তুমি তাহলে বোসো—চা করে দিচ্ছি, খাও। বাথরুমে যাবার ব্যাপারটা ইচ্ছেমতো সেরে নিয়ো। আমি দুধ আনতে যাব—'

'এত দুধ-দুধ করছ কেন! কাজের মধ্যে তো একটাই! একদিন না বেরুলে কী হয়!'

'কী আর হবে। এখন এই বলছ, তারপর দুধ আনা হয়নি বলে পাড়া মাথায় করবে—নালিশ করবে মেয়েদের কাছে। তোমার ফন্দি-ফিকিরের অভাব আছে না কি!'

'ও, তুমি বুঝি সারাক্ষণ আমাকে নালিশ করতে দেখছ!' আর্থার বলল, 'এই ছুতোয় তোমার পাড়া বেড়ানোর ব্যাপারটা কেউ বুঝি জানে না!'

কথা শুনে রাগবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না ডরোথি। মানুষটা ক্রমশ বেআক্কেলে হয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে তর্ক করে লাভ আছে কিছু!

'হা ঈশ্বর! সংসারে এই বুড়োটা ছাড়া কি আর কেউ নেই আমার!'

নিজের মনে গজগজ করতে করতে চলে যাচ্ছিল ডরোথি। পিছন থেকে আর্থার বলল, 'অহো, রাগ করছ কেন! একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল, সেই কথাটা বলব বলে ভাবছিলাম। তা ইচ্ছে না হয় না শুনো—'

'স্বপ্ন আবার কি!'

রহস্যের গন্ধ পেয়ে ফিরে এল ডরোথি।

সারল্যে ঝলমল করছে আর্থারের মুখ। আবার জানলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'সারাকে দেখলুম স্বপ্নে! অনেকক্ষণ ধরে—'

'সারাকে!' ভুরু তুলে ডরোথি বলল, 'কেমন শ্বশুর তুমি, অ্যাঁ। পুত্রবধূকে স্বপ্ন দ্যাখো!'

'আ-রে! পুরোটা বলতে দেবে তো?'

মুখ নিচু করে কাটা পায়ের হাঁটুতে হাত বোলাতে লাগল আর্থার। ধরনটা হারানো কিছু খুঁজে বেড়ানোর। একটু পরে চোখ তুলে বলল, 'দেখলুম, সারা আমাকে ধরে ধরে প্লেনের সিঁড়িতে তুলছে। রুপোলি রঙের বিশাল এয়ারক্র্যাফট। হোয়াট ডু দে কল ইট? জাম্বো? হ্যাঁ, জাম্বো। সারাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছিল। সি হ্যাড আ ভেলভেট অন হার, ইউ নো! অ্যান্ড আ বিউটিফুল নেকলেস!'

স্বপ্নে ও স্মৃতিতে একাকার মুখচোখ। আবেগ ওর কণ্ঠস্বরেও। দম নিয়ে আর্থার বলল, 'সি আস্কড মি ইফ আই ওয়াজ ফিলিং হ্যাপি!'

'দ্যাটস হোয়াই ইউ লুক সো হ্যাপি।' ডরোথি রঙ্গ করে বলল, 'সারাকেই দেখলে শুধু! ও মাই পুওর রবিন! ও মাই লিটল ডার্লিং স্যামুয়েল! ছেলে আর নাতিকে ভুলে গেলে।'

'আ-হা ভুলব কেন!' খোঁচাটা হজম করার চেষ্টায় চোখমুখের বিব্রত ভাব লুকোতে পারল না আর্থার। ইতস্তত করে বলল, 'ওরাও নিশ্চয়ই ছিল আশপাশে। আমি কি বায়োস্কোপ দেখছিলাম যে খুঁটিনাটি কে কোথায় সব মনে রাখব! তোমার মতো হিসেবি বুড়িরাই আঁটঘাট বেঁধে সবাইকে জড়ো করে স্বপ্ন দ্যাখে।'

বিষণ্ণ ডরোথি

ডরোথি এবার পাল্টা দিল না। মেঘাচ্ছন্ন রোদ্দুরে ছেয়ে আছে বাইরেটা। অদূরে নারকেল পাতার জাফরি। আর্থারের চোখ সেদিকে। ওকে দেখতে দেখতে অদ্ভুত এক মায়ায় জড়িয়ে গেল ডরোথি। ওর মনে কী হচ্ছে না হচ্ছে তা অনুমান করা কী আর এমন শক্ত! সারা শুধুই উপলক্ষ, আসলে আর্থার নিজেকেই দেখেছে স্বপ্নে। ডরোথি কি জানে না, জাগরণেও সারাক্ষণ ওই রকম একটা দৃশ্য কল্পনা করে যায় আর্থার? বেচারা! সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছেই দিক হারিয়ে ফেলেছে স্বপ্নটা—পঙ্গু না হলে হয়তো লাফিয়ে গিয়ে উঠে পড়ত প্লেনে।

'তুমি কি লেটার বক্সটা চেক করো ভাল করে?' আর্থার জিজ্ঞেস করল, 'অনেকদিন চিঠি আসেনি ওদের!'

'অনেকদিন কেন হবে! গত হপ্তাতেই তো স্যামুয়েলের চিঠি পেলাম।'

'জবাব দিয়েছ?'

ডরোথি ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, 'তুমি কখনওই কাউকে লেখো না কিছু। লেখো না কেন!'

আর্থার সাড়া দিল না।

'এয়ার লেটার আছে। সারাকে লিখতে পারো—ইউ ক্যান রাইট অ্যাবাউট দ্য ড্রিম! অ্যান্ড হাউ উই মিস অল অফ দেম—'

'হ্যাঁ। স্কুলের খাতায় যেমন লিখতাম?'

আর্থারের কথায় তাচ্ছিল্য। কার প্রতি বোঝা যায় না ঠিক।

ডরোথি দেখল, দু'হাতে ভর দিয়ে পাছা ঘষটে ঘষটে খাটের কিনারায় পৌঁছে গেছে আর্থার। ক্রাচটা টেনে নিয়ে নিজেই উঠে দাঁড়াল। সম্ভবত বাথরুমে যাবে।

ওকে বেরুবার জায়গা করে দিয়ে নিজেও পিছনে পিছনে এল ডরোথি। বাথরুমকে তার বড় ভয়—ওইখানেই ক্রাচ পিছলে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল আর্থার।

'অস্ট্রেলিয়ায় সূর্য ওঠে আমাদেরও আগে—।' আর্থার হঠাৎ বলল, 'নিশ্চয়ই বেশ কয়েক ঘণ্টা আগে। কী আশ্চর্য! ওরা যখন কাজেকর্মে বেরিয়েছে আমি তখন শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিলাম!'

ডরোথির মুখে কথা জোগালো না। বলল দেখছিলাম, কিন্তু স্বপ্নের ঘোর থেকে স্পষ্টই এখনও নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি আর্থার। হয়তো কোনও দিনই পারবে না।

আরও একটু পরে প্লাস্টিকের ঝুড়িতে দুধের বোতল নিয়ে বেরিয়ে এল ডরোথি। বাইরে থেকে সিঁড়ির দরজায় তালা দিতে গিয়ে চোখ গেল লেটারবক্সের দিকে। কিছু মনে পড়ায় চাবি ঘুরিয়ে ছোট্ট তালাটি খুলে ফেলল সে। একটা খাম পড়ে আছে তলার দিকে। ঠিকানার হাতের লেখাটা চেনা লাগছে। উল্টেপাল্টে দেখল, তাকেই লেখা। লরা এইভাবেই লেখে।

কাল দুপুরে শেষবার বাক্সটা খুলেছিল সে। তখন কিছুই পায়নি। নিশ্চয়ই বিকেলে কিংবা সন্ধের দিকে ফেলে দিয়ে গেছে পোস্টম্যান। দশবার খুললে হয়তো একবারই পায় কিছু; সেইজন্যেই বাক্সটার প্রতি নিয়মিত কোনও আগ্রহ বোধ করে না সে। খানিক আগে আর্থার জিজ্ঞেস করায় এখনই তার চেক করার কথা মনে হল; তা না হলে চিঠিটা হয়তো এইভাবেই পড়ে থাকত।

লরার চিঠি

পরে পড়বে ভেবেও কৌতূহল চেপে রাখতে পারল না ডরোথি। খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করতে করতে সিঁড়ির ওপরেই বসে পড়ল সে। কে জানে কেন, আজকাল একলা মনে যখনই নিজেদের কথা ভাবে তখন তার এই কনিষ্ঠ সন্তানটিকেই সবচেয়ে কাছের জন মনে হয় ডরোথির। মনে হয়, লরা কাছে থাকলে তাদের জীবন হয়তো একটু অন্যরকম হত।

পুরনো চামড়ার ব্যাগ থেকে সরু ফ্রেমের চশমাটা বের করে চোখে দিল ডরোথি। জড়ো করা দুটি হাঁটুর ওপর কাগজটা ধরে ঝুঁকে পড়ল সে—

'প্রিয় মম, আমার আগের চিঠি কি তুমি পাওনি? তোমাকে যে বলেছিলাম তিন দিন অন্তর একটা করে চিঠি লিখো আমাকে। তোমার শরীর কেমন? ড্যাড ভাল আছে তো? আশা করি হার্টের অসুখের ওষুধগুলো ঠিক-ঠিক খাচ্ছে? রোজালিন অবশ্য সবই জানে, ও নিশ্চয়ই তোমাদের দেখাশোনা করছে নিয়মিত।

'এবারে তোমার মানি-অর্ডার পাঠাতে একটু দেরি হল। তিন দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় ভুগে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। আজ স্কুলে এসে পাঠালাম।

'এবার একশো টাকা বেশি পাঠিয়েছি। সামনের সপ্তাহে ড্যাডের জন্মদিন। একটা কেক কিনে দিয়ো।

'সারাকে চিঠি দিয়েছিলাম, জবাব পাইনি এখনও। তুমি কি জানো ওরা কেমন আছে?

'তুমি না পারলে রোজালিনকে বোলো আমাকে যেন সব খবর জানায়। আজ ওকেও চিঠি দিলাম।

'আজই স্কুলে এসে খবর পেলাম নাইজিরিয়ার একটা নতুন স্কুলের জন্যে ছ'জন টিচারকে পাঠানো হচ্ছে ও দেশে। আমার নামও রেকমেন্ডেড হয়েছে। অন্তত দু' বছর থাকতে হবে ওখানে। আমি কি যাব? মনঃস্থির করতে পারছি না একেবারে। কেন, বুঝতেই পারো। আবার মনে হচ্ছে আমার ওপর ঈশ্বর যে আস্থা স্থাপন করেছেন, তা-ই বা প্রত্যাখ্যান করব কী করে? প্রিন্সিপাল যেতে বলছেন।

'তুমি কি এ নিয়ে ভাববে একটু? রোজালিনকে লিখলাম, ওর সঙ্গে পরামর্শ কোরো।

'অভ্রি কি এসেছিল এর মধ্যে? ওকে বোলো যেন মাথা ঠাণ্ডা রাখে সব সময়। আমি ওর জন্যে রোজই প্রার্থনা করি।

'আর হ্যাঁ, নাইজিরিয়া যাবার ব্যাপারটা নিয়ে ড্যাডকে এখন বোলো না কিছু। ড্যাড জানলে আমি তোমার ওপরেই রাগ করব।

'ভালোবাসা।—লরা'

একবার পড়ার পর আরও একবার চিঠিটা পড়ল ডরোথি। চশমাটা খুলে ভাঁজ করে রাখল খাপে। তবু উঠতে পারল না। হাত-পা-মাথা-পিঠ জুড়ে কেমন একটা অসাড়, অবসাদের ভাব। অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে একটিই শব্দ ঘুরপাক খাচ্ছে মাথায়—নাইজিরিয়া, নাইজিরিয়া!

ডরোথি বুঝতে পারছিল না খবরটা সুখের, না দুঃখের! এক ধরনের শূন্যতা আচ্ছন্ন করে রাখল তাকে।

৩

সেদিন দুপুরে, লাঞ্চের পর, গ্রিনভ্যালি টি কোম্পানি লিমিটেডের অফিসে, জেনারেল ম্যানেজার, মার্কেটিং সোমদেব বাসুর চেম্বারে বসে ডিক্টেসন নিচ্ছিল রোজালিন। ফোন বেজে উঠল।

কিছুবা বিরক্ত হয়ে রিসিভার তুলে কানে দিল সোমদেব। তারপর 'হোল্ডঅন' বলে ইশারা করল রোজালিনকে।

'ইয়োর কল।'

রোজালিনের মুখে অস্বস্তি। সোমদেব খুঁতখুঁতে লোক; কাজকর্মের মাঝখানে ব্যাঘাত পছন্দ করে না। তার ওপর কালই সকালে এক সপ্তাহের ট্যুরে বেরুবে বলে কিছু জরুরি চিঠিপত্র ডিক্টেট করে যাচ্ছিল। রোজালিনকে ডাকার পর নিজেই অপারেটরকে নির্দেশ দিয়েছিল এখন যেন তাকে কোনও লাইন দেওয়া না হয়—ফোনটোন এলে মেসেজ নিয়ে রাখলেই হবে। এই অবস্থায় তাকেই বা ফোনটা দিল কেন! মিস্টার বাসু লোক ভাল। কিন্তু, কখন কোন মুডে থাকে ধরা যায় না চট করে। মেজাজ খারাপ থাকলে মুখে যা আসে বলে দেয়, মেয়ে পুরুষের ধার ধারে না। আজও যে মুড ভাল নেই চিঠির ভাষাতেই বোঝা যাচ্ছে তা। লাঞ্চের আগে প্রায় পুরো সকালটাই ম্যারাথন মিটিংয়ে কাটিয়েছে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে। সেখানেই কিছু ঘটে থাকতে পারে।

পি-বি-এক্স-এ এখন ক্লদিয়ার ডিউটি। ওকে বলতে হবে কাজটা ঠিক করেনি। ভাবতে ভাবতে বিব্রত ভঙ্গিতে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলে নিল রোজালিন।

'সরি, ডার্লিং।' ওর গলা পেয়ে ক্লদিয়া বলল, 'মিস্টার বাসু কল দিতে মানা করেছিলেন। কিন্তু তোমার এই কলটা মনে হচ্ছে জরুরি। তোমার ছেলের সঙ্গে কথা বলো।'

'হ্যালো—?'

'ইজ দ্যাট মিসেস পিয়ার্স?'
'ইয়েস, ডোনাল্ড। হোয়াট হ্যাপেন্ড?'
'আই ডোন্ট নো।' ডোনাল্ড বলল, 'গ্র্যানি ওয়ান্টস টু স্পিক টু ইউ।'
'গ্র্যানি!' মানে ডরোথি? চিন্তিত হয়ে রোজালিন জিজ্ঞেস করল, 'কোত্থেকে কথা বলছ?'
'নীচে, ড্রাগ স্টোর থেকে। গ্র্যানি তোমার অফিসের নাম্বার ভুলে গেছে। এখানে এসেছে—'
'ও-কে। পুট মি অন টু হার।'

টেলিফোনে আর্তি

'রোজালিন?' ওদিক থেকে ভেসে এল ডরোথির খসখসে গলা, 'রোজালিন, তোর সঙ্গে খুব জরুরি দরকার। একবারটি আসতে পারবি?'
'কী হয়েছে!'
'কী হয়েছে এলেই বুঝবি!' ডরোথি তার ভয়-ভাবনা লুকোতে পারল না। অল্প থেমে বলল, 'হঠাৎ অড্রি এসে হাজির। বলছে ফিরবে না—'
'বাচ্চাটা।'
'বাচ্চা নিয়েই এসেছে।'
'ঠিক আছে।' সোমদেব চোয়াল চেপে সিগারেট ধরাচ্ছে দেখে সংক্ষিপ্ত হতে চাইল রোজালিন, 'আমি আসব অফিসের পরে—'
'তাই আয়।' ডরোথি বলল, 'আমি কি ডোনাল্ডকে নিয়ে যাব সঙ্গে? আর্থার কাল থেকে খুবই দেখতে চাইছে ওকে।'
'আচ্ছা। তুমি ডোনাল্ডকে দাও—'
ডোনাল্ড ফিরে এল লাইনে।
'হ্যালো, মম।'
'ডোনাল্ড, তোমার বাবা কি বাড়িতে? না বেরিয়েছে?'
'একটু আগে বেরুল। বলল অফিসে যাচ্ছে।'
'বেশ। তুমি গ্র্যানির সঙ্গে যাও। আমি ডেইজিকে নিয়ে যাব। সোফিয়াকে বলে রেখো ডেইজি স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত যেন বাড়িতে থাকে। ও-কে?'
'ও-কে।'
রিসিভার নামিয়ে রেখে নিজের জায়গায় এসে রোজালিন বলল, 'সরি, মিস্টার বাসু।'
সোমদেব বলল না কিছু। খানিকটা ধোঁয়া তখনও ছিল গলায়। সেটা ছাড়তে ছাড়তে শেষ সেন্টেন্সটা কী ছিল জেনে নিয়ে ডিক্টেসন দিতে শুরু করল আবার।
সোমদেবের কথায় কান খাড়া রেখে নোট নিয়ে গেলেও অন্যমনস্কতা কাটাতে পারছিল না রোজালিন। অড্রির আসাটা খবর নয় কোনও—সঙ্গে ছেলেকে না আনাও নয়। এর আগেও কখনও সখনও এইভাবে হঠাৎ চলে এসেছে অড্রি। ফিরবে না বলাটা ওর রাগের

কথা। তবে, এই ভর দুপুরে ডরোথি কেন ছুটে এল সেটাই ভাববার বিষয়। ফোনে সব কথা বলা যায় না।

রোজালিন ভাবল, নিশ্চয়ই আরও কিছু ঘটেছে ইতিমধ্যে—এমন কোনও সমস্যা, যা আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছে ডরোথিকে। নিজের মা-কে সে চেনে। ঝড়-ঝাপটা সারা জীবন কম সহ্য করেনি; বয়স হবার সঙ্গে সঙ্গে অনেকটা নুয়ে এলেও ভাঙেনি পুরোপুরি। তবে এই বয়সেও ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঝক্কি ঝামেলা পোহাতে হলে বেশিদিন খাড়া রাখতে পারবে না নিজেকে।

মা-র কথা ভাবলে সত্যিই মাঝে মাঝে অবাক লাগে রোজালিনের। ডালপালা ছেঁটে-দেওয়া নিষ্পত্র গাছের মতো; ফুল, ফল, পাতার আশা নেই জেনেও শিকড়ের মায়ায় জড়িয়ে আছে এখনও! ভাবনা এর বেশি এগোয় না। ক'দিন আগেই লক্ষ করেছিল, ছোটখাট শরীরের পিঠটা একটু কুঁজো হয়ে গেছে ডরোথির। প্রায়ই বিড়বিড় করে নিজের মনে।

রোজালিনের অন্যমনস্কতা সোমদেবের দৃষ্টি এড়ায়নি। শর্টহ্যান্ড নিতে গিয়ে বার দু' তিন ওর সপ্রশ্ন চোখ তুলে তাকানো দেখে বলা কথাটা আবার বলতে বাধ্য হয়েছিল সে, মুখে কিছু না বললেও শ্লথ করে এনেছিল ডিক্টেসনের গতি। মেয়েটি এফিসিয়েন্ট এবং ভদ্র; এ-পর্যন্ত কাজকর্মে শৈথিল্য চোখে পড়েনি কখনও। সম্ভবত এমন কিছু শুনেছে টেলিফোনে যার জের নামাতে পারছে না মাথা থেকে।

লম্বা চিঠিটা শেষ করে সোমদেব বলল, 'আজ এই পর্যন্ত থাক। ক'টা নোট হল? পাঁচটা?'

খাতার পাতা উল্টে মাথা নাড়ল রোজালিন।

'ক্যান ইউ ডু অল দিজ টুডে?'

পোড়া সিগারেটের গন্ধ লাগছে নাকে। এয়ারকণ্ডিশনার চালু থাকায় আশপাশ বন্ধ, একটা ধোঁয়াটে আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়েছে ঘরে। ঠাণ্ডাও কম নয়।

সোজাসুজি বসের মুখের দিকে তাকাল রোজালিন। আগে যতটা গম্ভীর ছিল সোমদেব, এখন আর তা নেই। রাগ, বিরক্তির নিয়মই এই, না খোঁচালে ঝরে যায় আস্তে আস্তে। রোজালিন আশ্বস্ত হল। কাল টুরে যাবার তাড়া না থাকলে আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে যাবার অনুমতি চাইতে পারত। যদিও, রোজালিন মনে মনে আন্দাজ করে নিল, এই চার-পাঁচটা চিঠি আর নোট শেষ করতে ঘণ্টাখানেকের বেশি সময় লাগার কথা নয়। তারপরেও সময় থাকবে।

আলগা হেসে রোজালিন বলল, 'আই ডিডন্ট সে নো।'

'ইচ্ছে করলে বলতে পারো। শেষেরটাই খুব ইমপর্ট্যান্ট।'

সোমদেব ঠিক কী বলতে চাইছে বুঝতে পারল না রোজালিন। তার আচরণে কি ব্যস্ততা লক্ষ করেছে কোনও, নাকি টেলিফোনের কথাবার্তা থেকেই অনুমান করল কিছু? হতে পারে। অকারণ কোনও ব্যাপারে কারও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে ভাল লাগে না তার। ডরোথির কথাগুলো এখনও গেঁথে আছে মাথায়, আজ উপলক্ষ থাকলেও সায় পাচ্ছিল না মনে।

সোমদেব বলল, 'তোমাকে চিন্তিত দেখাচ্ছে। কী ব্যাপার! কোনও খারাপ খবর?'

'ইটস নট দ্যাট।' দ্বিধাগ্রস্ত গলায় বলল রোজালিন, 'আমার মা ফোন করেছিলেন—যেতে বললেন—'

'সে তো শুনতেই পেলাম।' সোমদেব হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গিয়ে এয়ারকণ্ডিশানারের নবটা ঘুরিয়ে ফিরে এল। বলল, 'ডোন্ট ইউ ফিল কোল্ড? ঘরটা যেন বেশি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—'

'আমি ভাবছিলাম আপনারই গরম লাগছে! অক্টোবরের শেষ, সন্ধের পর বেশ শীত করে—'

সোমদেব শুনল কি না বোঝা গেল না। ডায়েরির পাতায় চোখ রেখে সিগারেটের প্যাকেটটা হাতে নিয়েও রেখে দিল আবার। আধশোনার ধরনে মাথা নাড়ল শুধু।

রোজালিন উঠব উঠব করছিল। বলল, 'আমি তাহলে এগুলো সেরে ফেলি?'

'তোমার সেই বোন, যার নাইজিরিয়া যাবার কথা হচ্ছিল—?'

'আমার ছোট বোন। লরা।' উঠে দাঁড়িয়ে রোজালিন বলল, 'সে চলে গেছে।'

কথাটা বলতে গিয়ে সামান্য গলা কেঁপে গেল রোজালিনের। মনে পড়ল লরার মোমে মাজা সরল মুখখানি। দেখতে দেখতে কেটে যাচ্ছে দিন। লরার চলে যাবার খবরটা আগেই জানানো উচিত ছিল সোমদেবকে। তাড়াতাড়ি পাশপোর্ট পাবার জন্যে ভদ্রলোককে দিয়ে পাশপোর্ট অফিসে ফোন করিয়েছিল সে। সোমদেব তাকে স্বার্থপর ভাবতে পারে।

সোমদেবের শীত করছিল। আবার উঠে হ্যাঙ্গার বোর্ড থেকে জ্যাকেটটা নামিয়ে গায়ে দিতে দিতে বলল, 'তোমার বোনকে আমি দেখিনি। তবে মনে হয় সে খুব ভাল মেয়ে। শুধু বেঁচে থাকার জন্যে টাকা রোজগার করা ছাড়া তো আমাদের জীবনে আর কোনও ফিকির নেই! আছে কি? কোনও মিশানও নেই। ওর আছে। ফ্র্যাঙ্কলি, সি বিলংস টু অ্যানাদার ওয়ার্লড, হোয়্যার লাইফ হ্যাজ এ মিনিং।'

জ্যাকেটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে থাকল সোমদেব।

চলে যাবে ভেবেও যেতে পারল না রোজালিন। কথাগুলো শুনতে ভাল লাগছিল তার। লরার যাওয়ার ব্যাপারে ডরোথির সায় ছিল না, আর্থারেরও না। সে-ই জোর করেছিল এবং আজ সোমদেব যে-কথাগুলো বলছে, অনেকটা সেই ধরনের কথা বলেই। মনে হয় ভুল করেনি।

ইদানীং লরার মুখে চোখে একটা দূরের আভা লক্ষ করত রোজালিন। সেটা কেমন বোঝানো যাবে না; কিন্তু, রোজালিনের মনে হত, লরা অন্য কিছু ভাবছে, এমন কিছু—যার সঙ্গে তাদের পাঁচজনের ভাবনার যোগ নেই কোনও। সংসারের সুখ-দুঃখ-মান-অভিমানের পিছুটান দিয়ে ওকে বেঁধে রাখা ঠিক হবে না। অবশ্য এসব ব্যাপার রোজালিনও যে খুব বোঝে তা নয়; অনুভূতি এইভাবেই বুঝিয়েছিল তাকে। ডরোথি-আর্থারও শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিল।

সোমদেব আর কিছু বলল না। ওকে টেলিফোনের রিসিভার তুলতে দেখে রোজালিন বুঝতে পারল সে এবার যেতে পারে।

বারো বছর একনাগাড়ে একই কাজ করতে করতে চাকরিও পরিণত হয় অভ্যাসে। মনঃসংযোগের অভাব পুষিয়ে দেয় মস্তিষ্কের স্বয়ংক্রিয়তা—টাইপরাইটারের কী-বোর্ডে ব্যস্ত আঙুলগুলো শব্দের যে-ঝড় তোলে, তার কতটা যন্ত্রের এবং কতটা তার নিজের বুঝতে পারা যায় না ঠিক। মেশিনের সঙ্গে এক ধরনের সখ্য অনুভব করতে করতে মনে হয় এও তার শরীরের অংশ; বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টায় বিচ্ছিন্নই হবে। এবং মূক। পারস্পরিক সম্পর্কগুলোও কি তা-ই? তাদের ভয়, ভাবনা, আন্তরিকতার মধ্যেও কি এসে যাচ্ছে না এক ধরনের যান্ত্রিকতা?

সোমদেবের বলা ইমপর্ট্যান্ট চিঠিটাই আগে শেষ করল রোজালিন। তারপর আরও দুটো। যা সময় লাগবে ভেবেছিল তার চেয়ে আগেই শেষ হয়েছে। বাকি দুটো তেমন জরুরি নয়, ইনফরমেশন মাত্র—ডিকটেটেড বাই জি-এম-এম অ্যান্ড সাইনড ইন হিজ অ্যাবসেনস ছেপে সে নিজেও সই করে পাঠিয়ে দিতে পারে কাল। কিন্তু, তা কেন করবে!

কিছু অস্পষ্ট প্রশ্ন

আপাতত কিছুক্ষণের বিশ্রাম খুঁজল রোজালিন। সে ছাড়াও এ ঘরে বসে আরও তিনজন—মার্গারেট, শামিম আর স্বপ্না লাহিড়ী। মার্গারেট আর মিস লাহিড়ী নেই এখন; একেবারে পিছনে বসে একমনে টাইপ করে যাচ্ছে শামিম। গত মাসে হঠাৎই জণ্ডিসে মারা গেছে ওর স্বামী। ইদানীং ওরা আলাদা থাকত, হয়তো ডিভোর্সও হয়ে যেত কিছুদিনের মধ্যে। আনোয়ারের মৃত্যুর পর অদ্ভুত শোকার্ত এবং বিধ্বস্ত হয়ে ফিরে এল শামিম। রোজালিনকে বলেছিল, 'যার সঙ্গে বিচ্ছেদ মেনে নিয়েছিলাম, তার মৃত্যুটা সহ্য করতে পারছি না কেন!'

রোজালিন জানে না কেন। আজ বিকেলে তবু কিছু অস্পষ্ট প্রশ্ন ছুঁয়ে গেল তাকে। আসন্ন শীতের পড়ন্ত বেলার দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় একা মনে হল তার। নিজেকে কখনও অসুখী ভাবেনি সে, এখনও ভাবল না। তবু মনে হল, কিছুটা দাম্ভিক ও অহঙ্কারী হওয়া সত্ত্বেও মাইকেলের মতো অনুগত স্বামী এবং ডোনাল্ড, ডেইজির মতো ফুটফুটে দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার যে-দুর্গ সে গড়েছে, যে-কোনও দিন ফাটল ধরতে পারে তাতে। পাইবাস পরিবারেও যে এমন একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটবে—টান-টান এবং একত্র মানুষগুলো ঘূর্ণ্যমান পাখার বৃত্ত থেকে হঠাৎ ছিটকে পড়া ব্লেডের মতো ছত্রাখান হয়ে পড়বে এদিকে ওদিকে, দু' তিন বছর আগেও কি কেউ ঘুণাক্ষরে টের পেয়েছিল তা! অদ্রির ভাবনায় এই অশক্ত শরীর নিয়েও ছুটোছুটি করছে ডরোথি। কী হয়েছে না হয়েছে বুঝে তাকেও হয়তো ঝামেলা পোহাতে হবে কিছুটা; এর আগে একবার যেমন হয়েছিল, তেমনই, শেষ পর্যন্ত হয়তো ওই অলোকের কাছে গিয়েই অনুনয় করতে হবে। কিন্তু, কোন ভাগ্য অপেক্ষা করে আছে অদ্রির জন্যে, তা কি অদ্রিও জানে! লরা হয়তো এরই মধ্যে ঢুকে পড়েছে বিরাট কোনও আশ্রয় ও নির্ভরতার মধ্যে; কিন্তু এই যে একটুখানি বাঁচার মতো বেঁচে থাকার জন্যে হুড়োহুড়ি করে অস্ট্রেলিয়ায় চলে গেল সারা—সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল রবিন

আর স্যামুয়েলকেও, সেও কি সুখে আছে? চাকরি করছে, টাকা-পয়সাও রোজগার করছে দু'জনে, স্যামুয়েল ভরতি হয়েছে কমপিউটার এঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে, হয়তো কিছুদিনের মধ্যে আর্থার এবং ডরোথিকেও টানবে—এ সবই তো ভাল থাকার কথা। তবু কেন অদ্ভুতভাবে নিঃশব্দ হয়ে গেল সারা!

সত্যি বলতে, সারার ব্যাপারটাই সবচেয়ে বেশি অবাক করে তাকে। ওখানে যাবার পর কেমন বদলে গেছে মেয়েটা। তিন-তিনটে চিঠি দেবার পর মাত্র সেদিন একটা জবাব দিয়েছে, তাও অফিসের ঠিকানায়। চিঠির প্রতিটি অক্ষরে যেন বিষাদ মাখানো। বেশ কয়েকবার পড়ে মুখস্থ হয়ে গেলেও এখনও বুঝতে পারেনি রোজালিন, কেন এই বিষাদ, কেনই বা এমন অধৈর্য হয়ে পড়েছে সারা।

'রবিনের সঙ্গে বিয়ের পর তোমার বাবা, আর্থার আমাকে বলেছিলেন, তুমি এক সোনালি জীবনে প্রবেশ করছ, তোমার সংস্পর্শে যেন সকলের ভাল হয়।' সারা লিখেছিল, 'সেই চেষ্টাই করেছিলাম, এমনকী নিজেকে আড়াল করেও। এই করতে গিয়ে কত না ভালবাসা পেয়েছি তোমাদের! কিন্তু, এখন বুঝছি, অন্যকে নিয়ে বাঁচার আগে মানুষকে বাঁচতে হয় নিজেকে নিয়ে—নিজের শুদ্ধতাই অন্যকে স্পর্শ করে, পরিশুদ্ধ করে। আমার সব জবাবদিহিও তো আমার নিজেরই কাছে! সেটা করতে গিয়ে দেখছি, যে-সারাকে আমি চিনতাম সে আর কোথাও নেই। গির্জা থেকে যিশুর ছবি চুরি গেলেও গির্জার কাঠামোর পরিবর্তন হয় না কোনও। হয় কি? কিন্তু এসব আমি কী লিখছি, কেন লিখছি! প্রিয় রোজি, তুমি মেয়ে, তুমি আমার সমবয়সী, তুমি আমার প্রিয়তম বন্ধু, তুমি কি বুঝতে পারছ কিছু?'

না, সত্যিই কিছু বুঝতে পারেনি রোজালিন, এতদূর অস্পষ্টতা ভাবানো ছাড়া আর কিছু করতে পারে না। কাছে থাকলে জিজ্ঞেস করা যেত, যে-সোনালি জীবনের কথা তুমি লিখেছ, তার সবটাই কি ব্যর্থ হয়েছে, সারা? সে-বিচারের দায়িত্ব তুমি একাই বা নেবে কেন!

সারা লিখেছিল তার চিঠির কথা কাউকে না জানাতে। না লিখলেও কি জানাতে পারত রোজালিন?

কী লিখবে ভেবে ঠিক করতে না পারার জন্যেই এ ক'দিন ওর চিঠির জবাব দিতে পারেনি। এখন ঠিক করল, কালই লিখবে, সুন্দর একটা চিঠি। বলবে, জীবনকে ভালবাসো, জীবনই পূর্ণতা দেবে তোমাকে।

টাইপ করা চিঠি ও নোটগুলো সিগনেচার ফাইলে ভরে পাঠিয়ে দিয়েছিল সোমদেবের কাছে। সই হয়ে ফিরে আসার পর সেগুলো ডেসপ্যাচে পাঠাল রোজালিন। একটু আগেই কি সে যান্ত্রিকতার কথা ভেবেছিল? একই সময়ে ভাবল, ডেইজি নিশ্চয়ই স্কুল থেকে ফিরে এসেছে এতক্ষণে। ডোনাল্ড বলেছিল মাইকেল বেরিয়েছে এবং অফিসে। সত্যিই গেছে কি না কী করে বোঝা যাবে! সকালেও তো বলেছিল যাবে না! ব্যাপারটা চিন্তা করে দ্বিধায় পড়ল রোজালিন। একবার রিপন স্ট্রিটে গেলে কখন ফিরতে পারবে না পারবে ঠিক নেই। দুপুরে বিকেলে ফাঁকা বাড়িতে ছেলেমেয়েকে পাহারা দেবার জন্যে সোফিয়াকে রেখেছে, ছ'টা বাজতে না বাজতেই বাড়ি ফেরার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। এখন মাইকেলের যা মনের অবস্থা তাতে বাড়ি ফিরে কাউকে না দেখলে অশান্তি হতে পারে।

সাত-সতেরো ভেবে রিসিভার তুলে মাইকেলের অফিসের লাইন চাইল রোজালিন।

ক্লদিয়া বলল, 'চেষ্টা করছি। তবে, জানোই তো, ডাবল ফোরে লাইন পাওয়া কী

ঝামেলা! সকালে বা রাত্তিরে হাসব্যান্ডের সঙ্গে কথাবার্তা সেরে নাও না কেন!'

'তখন অন্যের হাসব্যান্ডের সঙ্গে থাকি তো!' রোজালিন ঠাট্টা করল। তারপর বলল, 'ক্লদিয়া, প্লিজ ট্রাই। আই অ্যাম ডেসপারেট।'

রসিকতা করলেও মনের ভার নামাতে পারল না রোজালিন। ভিতরে ভিতরে চলে যাবার জন্যে অধৈর্য হয়ে উঠেছিল সে, যদিও জানে, মাইকেলের সঙ্গে যোগাযোগ না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না। মাইকেল অফিসে গিয়ে থাকলে ভাল। যদি না যায়, কিংবা, কাল যেমন করেছিল, কোনও বারেটারে গিয়ে মদ নিয়ে বসে, তাহলে—!

রোজালিন খেই হারিয়ে ফেলল।

এ কেমন ভালবাসা!

মার্গারেট আর মিস লাহিড়ী ফেরেনি এখনও। শামিম এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল, নিজে কাজ বন্ধ করলেও ওর অবিরত টাইপ করে যাওয়ার শব্দ শুনতে পাচ্ছিল রোজালিন। কখন যে তা থেমে গেল খেয়াল করেনি। বাইরের ক্রমশ ম্রিয়মাণ রোদ্দুর থেকে চোখ তুলে পিছনে তাকিয়ে দেখল, মেশিনের পাশে মাথা নামিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে শামিম। খুব ক্লান্ত বা ভারাক্রান্ত বোধ না করলে এরকম ভঙ্গি ফোটে না। দেখে হঠাৎই মায়া হল রোজালিনের। এই অফিসে তার চেয়ে পরে এসেছে শামিম, বয়সেও ছোটই হবে। চটপটে ও স্মার্ট, সুন্দরী না হলেও চটক ছিল চেহারায়—এই সেদিন পর্যন্ত সালোয়ার কামিজ আর ফাঁপানো চুলে নিজেকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয়া করে রাখত সব সময়। এখন ওর চেহারা আলাদা। মেক-আপ নেয় না, পোশাক-আশাকেও একটা দায়সারা ভাব; কথা বলেই না প্রায়। মনে হয় আনোয়ার গিয়ে ওকেও মেরে গেছে। লোকটাকে কি সত্যিই ভালবাসত ও? এ কেমন ভালবাসা, যা মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে চিনতে হয়!

'কী হল, শামিম!' ওকে দেখতে দেখতেই রোজালিন জিজ্ঞেস করল, 'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না, এমনিই। রিল্যাক্স করছিলাম।' মাথা তুলে বিষণ্ণ হাসল শামিম, 'তোমার হাসব্যান্ডের লাইন পেলে না এখনও?'

'দেখছি তো তাই।' রোজালিন ঘড়ি দেখল, 'তোমার কাজকর্ম শেষ? চলে গেলেই তো পারো!'

'যাব। কিন্তু—' শামিম ইতস্তত করল একটু। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আজ সন্ধেবেলায় ফ্রি আছ তুমি?'

'আজ! সন্ধেবেলায়!'

'আমার কাছে গ্লোবের দুটো টিকিট আছে। মিস লাহিড়ী হাফ-ডে নিয়েছে, ভেবেছিলাম মার্গারেটকে সঙ্গে নেব। কিন্তু, ও কি আর ফিরবে! মিস্টার রোহাতগি'র সঙ্গে ও সলিসিটরের অফিসে গেছে—'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রোজালিন। সিনেমায় যাওয়াটা সম্ভবত অজুহাত, ভাবল,

যে-কোনও কারণেই হোক, সন্ধে কাটানোর জন্যে একজন সঙ্গী খুঁজছে শামিম, আগে থেকেই তাই টিকিট কিনে এনেছে দুটো। সত্যি-সত্যিই কি একজন সঙ্গী জোটানো অসুবিধে ওর পক্ষে? ওর তো বয়ফ্রেন্ডের অভাব ছিল না। যখন-তখন ফোন আসত অফিসে। মার্গারেট একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'তোমার বয়ফ্রেন্ডদের নাম্বার অ্যালট করো—অত নাম মনে থাকে না, নাম্বার অনুযায়ী মেসেজ রাখতে পারব।'

এসব কথা জিজ্ঞেস করা যায় না। রোজালিন বলল, 'ইজ দ্যাট আ জ্যাকলিন বিসেট ফিলম? যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু, সরি, আমার অন্য একটা জায়গায়—'

রোজালিন কথা শেষ করতে পারল না। তার আগেই শব্দ হল টেলিফোনে।

'হ্যালো!'

'মিস্টার পিয়ার্স অন দ্য লাইন। স্পিক, রোজালিন।'

'মাইকেল?'

'ইয়েস!'

মাইকেলের গলার স্বর ভারী; কিছু বা অনিচ্ছুকও। সম্ভবত সকালের জের এখনও চলছে।

রোজালিন বলল, 'তুমি বাড়ি ফিরবে কখন?'

'জানি না। কেন?'

'মা ফোন করেছিল। আমি একটু রিপন স্ট্রিটে যাব। বাচ্চা দুটোও যাবে সঙ্গে। তুমি কি আসবে ওখানে?'

'না। রিপন স্ট্রিট মানেই তো ঝামেলা! আমি নিজেও কিছু কম ঝামেলায় নেই। আই হ্যাভ এনাফ অফ রিপন স্ট্রিট—', বলতে বলতেই মাইকেল বলল, 'হোল্ড অন—হোল্ড অন—'

রিসিভার কানে লাগিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রোজালিন। যা বলবার বলে ফেলেছে; বস্তুত, বুঝতে পারছিল না রোজালিন, এর পরেও আর কী বলবে মাইকেল!

অপমানিত মাইকেল

অফিসের ব্যাপার নিয়ে ক'দিন ক্ষুব্ধ হয়ে আছে মাইকেল। ইন্ডিয়া পেন্টস-এ সেলস অফিসারের চাকরিতে পাঁচ ছ' বছর একঠাঁই হয়ে ছিল ও, সম্প্রতি ওদের সেলস ম্যানেজার রাঘবন রিজাইন করে অন্য কোম্পানিতে চলে যাওয়ায় ভেবেছিল তাকেই প্রোমোশন দেবে ওই পজিসনে। কানাঘুষোয় শুনেছিল ম্যানেজমেন্টও একই লাইনে ভাবছে। দিনচারেক আগে একদিন সকালে খবরের কাগজে সেলস ম্যানেজার চেয়ে কোম্পানিকে বড় মাপের বিজ্ঞাপন দিতে দেখে মুষড়ে পড়ল মাইকেল। দরবারও করেছিল অফিসে। কাজ হয়নি। পার্সোনেল ম্যানেজার নাকি ওকে বুঝিয়েছে, কম্পিটিশন বাড়ছে বাজারে, মালপত্র কাটছে না তেমন—ভবিষ্যতের কথা ভেবে সেলস ম্যানেজমেন্ট-এ পুরোদস্তুর ট্রেনিং-পাওয়া নতুন ও অভিজ্ঞ লোক চাওয়া হচ্ছে, যাতে খোলনলচে পালটে নতুন করে নামা যায় বাজারে। শুধু একটা কেমিস্ট্রির পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি নিয়ে মাইকেল কি পারবে এসব চাহিদা মেটাতে!

এসব শুনে নিমেষে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল মাইকেল। শুধু ডিগ্রিই নয়, এম-এস-সি-তে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল সে, ওটাই ছিল ওর অহঙ্কারের জায়গা।

'ঘটনাটা না জানলে কিছু ভাবতাম না; ভাবতাম পলিটিক্স।' রোজালিনকে বলেছিল মাইকেল, 'জানার পর বদলে যায় সবকিছু। আগে প্রোমোশনের কথা ভাবতাম, এখন থেকে প্রতি মুহূর্তেই আমাকে ভাবতে হবে চাকরি বাঁচানোর কথা। ইটস সো ইনসাল্টিং!'

রোজালিন বুঝিয়েছিল 'বয়স হচ্ছে, বাড়তি দায়িত্ব মানেই তো টেনশান। কী দরকার প্রোমোশনের!'

পরামর্শে কাজ হয়নি। এর পরেই অফিসে যাওয়া বন্ধ করল মাইকেল। সত্যি বলতে চাকরিটা ছেড়ে দেবার কথাই ভাবছে ও। টানা তিনদিন হয় বাড়িতে বসে না হয় এদিক ওদিক করে সময় কাটাল। আজও যাবে না বলেছিল। পরে গেলেও গোঁ যায়নি।

গলার ঝাঁঝ শুনে মনে হচ্ছে ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না মাইকেল। অহঙ্কার ভেঙে পড়ায় সম্ভবত আত্মবিশ্বাসেও টান ধরেছে ওর, এখন নিজেকে সহ্য করতে পারছে না।

মাইকেল ফিরে এল।

'ইজ দ্যাট অল ইউ ওয়ান্টেড টু সে?'

'তাহলে তুমি আসছ না!'

'বললাম তো!'

'ইচ্ছে করলে এসো। আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসব।'

'ওকে। লেট মি থিংক।'

'টেক কেয়ার অফ ইয়োরসেলফ, মাইকেল। বাই দেন?'

'বাই।'

মাইকেল ফোন ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল ডায়ালটোন। ধাতব ও তীক্ষ্ণ, মধ্যরাতের অ্যালার্মের মতো তীব্র। খানিক শব্দটায় কান ছুঁইয়ে রাখল রোজালিন। তারপর, রিসিভারটা আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে ভাবল, কোনও অদৃশ্য হাত কি খেলা করছে কোথাও! না হলে সকলকে জড়িয়ে তার সুখে থাকার জীবনেও হঠাৎ এমন অশান্তি দেখা দেবে কেন!

৪

'আচ্ছা, এইবার আমি একটা প্রশ্ন করছি তোমাকে। ঠিক ঠিক জবাব দেবে। তোমার গায়ে কি খুব জোর?'

'হ্যাঁ। খুউব।'

'হাতির চেয়ে বেশি?'

'হাতি?' আর্থার একটু ভাবল। তারপর বলল, 'না। হাতির চেয়ে বেশি নয়। হাতিকে তুমি অ্যাটাকই করতে পারবে না। শুঁড়ে তুলে আছাড় দেবে, তারপর পিষে মারবে পায়ের

তলায়!'

'দেন? হোয়াট ক্যান ইউ ফাইট উইথ?'

আর্থার এমন ভাব করল যেন খুব চিন্তিত। সময় নিয়ে বলল, 'ও-কে। আই ক্যান ফাইট আ বাইসন।'

'আ বাইসন!' সন্দেহের চোখে আর্থারের মুখের দিকে তাকাল ডোনাল্ড, 'বাইসন কি ষাঁড়? শিং আছে?'

'বলতে পারো। এক ধরনের ষাঁড়। মাথায় ইয়াবড় শিং। গায়েও প্রচণ্ড শক্তি।'

'যাঃ! বাজে কথা!' ডোনাল্ড হেসে ফেলল, 'শিং ঢুকিয়ে পেট ফুটো করে দেবে তোমার।'

'আঃ। পেট ফুটো করে দিলেই হল! হ্যাভ নট ইউ সিন বুল ফাইটিং? দ্য মাতাদোরস?'

ডোনাল্ডের চোখে বিস্ময়। বারান্দায় ইজিচেয়ারের চেতানো হাতলে পাছা ছুঁইয়ে বসেছিল এতক্ষণ, আর্থারের প্রায় গা ছুঁয়ে। বিস্ময়ের ঘোরে উঠে দাঁড়াল।

'আ কাইন্ড অফ বুল!'

'মাতাদোরস! আ কাইন্ড অফ বুল?' আর্থার হেসে উঠল হা-হা করে। হাসির চোটে সর্দি এসে গিয়েছিল নাকে। রুমাল তুলে ফোঁ-ফোঁ করে নাক ঝাড়ল খানিক। ছলছলে চোখদুটো হাতের উল্টো পিঠে রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'দে লিভ ইন স্পেন। দে ফাইট বুলস। দে আর কল্‌ড মাতাদোরস।'

ডোনাল্ড ভাবতেই পারেনি এইভাবে বোকা বনে যাবে বুড়োর কাছে। ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকল আর্থারের দিকে।

মজা পেয়ে আর্থার বলল, 'ঠিক আছে। তোমার জন্মদিন কবে? আমি তোমাকে বুল ফাইটিংয়ের ওপর বই দেব একটা। অ্যাবাউট দ্য মাতাদোরস। কিন্তু—'

ঈষৎ থেমে, এদিক ওদিক তাকিয়ে সিঁড়ির দরজার কাছে অদ্রিকে দেখতে পেল আর্থার; বারান্দার রেলিংয়ে ঝুঁকে তাকিয়ে আছে নীচে। বলল, 'অদ্রি, তুই কি মনে পড়াবি আমাকে? আজকাল আমার কিছুই মনে থাকে না!'

ওখানে দাঁড়িয়ে কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে আর্থার-ডোনাল্ডের বাক্যালাপ শুনছিল অদ্রি। আর্থারের কথা শুনে হাসল পাশ ফিরে।

প্রায় একই সময়েই তার কানে এল বাথরুমের দরজা বন্ধ করার শব্দ। অবশ্যই ডরোথি। পেট-টেট খারাপ হল নাকি। আগে খেয়াল করেনি, এখন মনে পড়ল ডোনাল্ডকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকার পর বার তিনেক গেছে অন্তত। নাকি এইভাবে তার হুট করে এসে পড়ার পর থেকেই বিশৃঙ্খলা বোধ করছে মনে—অনিশ্চিতি কাটানোর জন্যে বাথরুমে ঢুকছে বার বার!

ব্যাপারটা চিন্তা করে অস্বস্তি বেড়ে গেল অদ্রির। সকালে তাকে দেখা ইস্তক মা যেন বোমকে গেছে কেমন! গোড়ায় যে কয়েকটা কথা হয়েছিল, তারপর আর জিজ্ঞেস করেনি কিছু; এমনকী যাকে আদর করা বলে ছেলেটাকে নিয়ে তাও করেনি। রবিনদের ঘরটা খুলে বিছানা করে দিল চটপট, যাতে তখনও ঘুমে আচ্ছন্ন ছেলেটা ঘুমোতে পারে আরামে। তারপর থেকে যা যা করেছে সবই প্রায় নিঃশব্দে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর বেরিয়েছিল ডোনাল্ডকে আনতে। বলেছে রোজালিনের সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে; রোজালিন আসবে অফিসের পরে। কী বলল মা রোজালিনকে?

অস্বস্তি ছিলই, বেলা পড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর চাপা ভয় অনুভব করতে লাগল অদ্রি। রাগের মাথায় বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় অতশত ভেবে দ্যাখেনি। এখন মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর একটা ভুল করে ফেলেছে। রবিন-সারা-স্যামুয়েল থাকার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে অনেক পাল্টে গেছে বাড়িটা—কেমন যেন বদলে গেছে সব।

বদলটা কেমন তা অনুভব করতে পারছিল না অদ্রি। ঘরে ঢুকে একবার ঘুমন্ত ছেলেটাকে দেখে এল সে। ডোনাল্ডকে দেখতে দেখতে ভাবল, সম্পর্কে ভাই দু'জনে, কিন্তু ডোনাল্ড আর তার ছেলে পুলককে কাছাকাছি দেখলে কেউই ভাবতে পারবে না ওরা সম্পর্কিত। অদ্রি লক্ষ করেছে, এখানে আসার পর থেকে পুলকের বিষয়ে কোনও উৎসাহ দেখায়নি ডোনাল্ড। ওর আর দোষ কি! সম্পর্ক গড়েই ওঠে, আছে বললেই দানা বাঁধে না।

ডোনাল্ডের শক্তি পরীক্ষা

'কিন্তু, তুমি নিজে তো আর ষাঁড়ের সঙ্গে লড়োনি!' ভাবনা-চিন্তা করে যুদ্ধে ফিরে এল ডোনাল্ড, 'তুমি তো মাতাদোর ছিলে না। ইউ ওয়্যার আ সোলজার।'

'তাতে কি!' প্রকৃত গাম্ভীর্য ফুটিয়ে আর্থার বলল, 'সোলজার না হলে আমি মাতাদোর হতাম। সোলজাররা অনেক বেশি সাহসী।'

'তুমি কি আমার সঙ্গে পাঞ্জা লড়তে পারবে?'

'তোমার সঙ্গে? পাঞ্জা! না, তুমি একরত্তি ছেলে। তুমি আমার সঙ্গে পারবে না।'

'আর ইউ সিওর?'

'ওহ্-হ্!' আর্থার কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'অফ কোর্স আই অ্যাম সিওর!'

এতক্ষণে বসার সময় পেল ডোনাল্ড। ডরোথি যে বেতের মোড়াটা দিয়ে গিয়েছিল সেটা টেনে বসতে বসতে নিজের হাতখানা বাড়িয়ে দিল আর্থারের দিকে।

'কাম অন, শো ইট!'

অদ্রি ঘুরে দাঁড়াল। মাঝখানের প্রায় সত্তরটা বছর হারিয়ে গেছে কোথায়! ইজিচেয়ারের চেতানো হাতলে কনুই রেখে পাঞ্জা লড়ছে দাদু আর নাতি। ক্যামেরা থাকলে ধরে রাখা যেত।

এক ধরনের কৌতূহল দৃশ্যটার দিকে টেনে রাখল অদ্রিকে।

উদ্যত দুটি সাপের মতো মৃদু মৃদু দুলছে হাত দুটো। আর্থার যত না সিরিয়াস তার চেয়ে বেশি সিরিয়াস ডোনাল্ড। এরই মধ্যে ভুরু কুঁচকে গেছে ওর, লাল হয়ে উঠেছে কান, দুই ঠোঁটের পারস্পরিক চাপ কুঞ্চনের আকারে ছড়িয়ে পড়েছে গালে। মনে হয় নিঃশ্বাসটাকেও ধরে রেখেছে এমনভাবে যাতে আরও বেশি শক্তি সঞ্চারিত হয় বাহুতে। আর্থারের মুখে শেষ বিকেলের আভা। দৃষ্টি ডোনাল্ডের চোখে নিবদ্ধ। ওর কপালে আর্দ্রতার ছোঁয়া লক্ষ করে অদ্রির সন্দেহ হল, খোঁচা খোঁচা দাড়িভরা মুখে হাসি লেগে থাকলেও ডোনাল্ডের হাতের চাপ কি ভিতরে ভিতরে শক্ত করে তুলছে আর্থারকেও? তা না হলে আগে যেটাকে স্বাভাবিক আর্দ্রতা বলে মনে হয়েছিল, কেন তা স্পষ্ট ঘামের রেখা হয়ে ফুটে উঠছে কপালে।

'কাম অন, ডোনাল্ড, স্টপ ইট নাউ।' কিছুটা ব্যস্ত হয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল অদ্রি, হাতদুটো টেনে ছাড়িয়ে দিল পরস্পরকে। আর্থারকে বলল, 'হোয়াট ওয়্যার ইউ ডুইং, ড্যাড। তোমার যে হার্ট খারাপ সেটা ভুলে যাও কেন। তোমার না স্ট্রেন করা বারণ।'

অপ্রস্তুত ভাবে আর্থার বললে, 'না, না। স্ট্রেন কিছু করিনি।'

'তাহলে জিতলটা কে?' অদ্রির দিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ গলায় ডোনাল্ড বলল, 'তুমি আমাদের খেলাটা নষ্ট করে দিলে।'

ডোনাল্ড যে ভীষণ ভাবে হতাশ হয়েছে ওর মুখের কাঁদো-কাঁদো ভঙ্গি দেখেই তা অনুমান করা যায়। এক সময়ে যখন অদ্রির বিয়ে হয়নি এবং ডোনাল্ডও ছোট্ট, তখন, কে জানে কেন রোজালিনের চেয়ে অদ্রিকেই বেশি পছন্দ করত ডোনাল্ড, বেশিটা সময়ই কাটত এ বাড়িতে। একেবারে গা-আঁকড়া; বাড়ি ফেরার নামে এমন চিৎকার জুড়ত যে পাড়াসুদ্ধ লোক জেনে যেত ঘটনাটা। এখনকার দূরত্ব কবে শুরু হল?

প্রশ্নটা ছুঁয়ে যেতেই তখনকার ডোনাল্ডের শরীরের কাঁচা গন্ধে নিঃশ্বাস ভারী হয়ে উঠল অদ্রির। ওর মাথায় হাত বুলিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ধরো দাদুই জিতেছে। দাদু বুড়ো মানুষ—'

বলার পরেই অদ্রির মনে হল সে উল্টোটাই বলতে চেয়েছিল।

'হাউ সিলি!' ডোনাল্ডকে মুখ ব্যাজার করতে দেখে আর্থার বলল, 'ডোনাল্ডই জিতেছে। ওরেব্বাস। আমার মনে হচ্ছিল একটা বাঘের সঙ্গে লড়ছি—'

'সে দ্যাট!' প্যান্টের পিছনে পাঞ্জা-লড়া হাতের তালু ঘষতে ঘষতে খাড়া হয়ে দাঁড়াল ডোনাল্ড। মুখে অনিশ্চিত বিজয়ীর হাসি। প্রথমে অদ্রিকে, তারপর আর্থারকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি কি মা-কে বলতে পারি আমিই জিতেছি?'

'অফকোর্স, অফকোর্স!' হাত বাড়িয়ে ডোনাল্ডকে কাছে টেনে নিল আর্থার। প্রায় নিজের বুকের ওপর ওর হালকা সোনালি চুলের মাথাটা নামিয়ে এনে উচ্ছ্বসিত গলায় বলল, 'রোজালিন আসুক, আমিই বলব ওকে। অদ্রি ছাড়িয়ে না দিলে আর একটু হলে আমি হেরে যেতাম—'

'সে দ্যাট।' ডোনাল্ড এখন নিশ্চিত, আর্থারের চোখের সামনে হাতের তালু মেলে ধরে বলল, 'দ্যাখো, হাতটা কেমন লাল হয়ে গেছে। ইউ নো হোয়াই?'

'হ্যাঁ, বেশ লাল হয়েছে বটে।' আর্থার গুরুত্ব দিয়ে বলল, 'কেন বলো তো।'

'কারণ আমি একজন সোলজারের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম।'

'হ্যাঁ, সত্যিই তো—সত্যিই তো—'

অদ্রির প্রশ্ন

সম্পর্ক এক একজনকে এক একভাবে টানে। আর্থার ও ডোনাল্ডের পারস্পরিক খেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে এনে অদ্রি ভাবল, কিন্তু কী ভাবে তৈরি হয় এই সম্পর্কগুলো? রক্তের দাবিতে। তা-ই যদি হবে, তাহলে এই যে দেখে এল ওদের দু'জনকে, ওদের মধ্যেও

তো নেই কোনও প্রত্যক্ষ রক্তের সম্পর্ক। পুলক কি পারবে কোনও দিন ওইভাবে আর্থারের বুকে মাথা রাখতে! হয়তো ভাগ্য, হয়তো প্রজাতি—অদ্রি জানে না; আরও দূর ভেবে ওঠার আগেই অনুচ্চারিত বিষাদ ছড়িয়ে পড়ল তার মাথায়। এসব কথা বলা যাবে না কাউকে, বস্তুত বলতে পারলে খানিকটা হালকা হতে পারত সে; জিজ্ঞেসও করা যাবে না। শ্বশুরবাড়িতে, অলোক বা আর কেউ যখন তাকে বিনতা নামে ডাকে, অন্যমনস্কতার মধ্যে কখনও সখনও নামটা বিভ্রান্ত করে তাকেও। মনে পড়ল অলোকের অফিসের এক পার্টিতে গিয়ে কী হয়েছিল একবার। হঠাৎ ভুলে নিজেকে 'অদ্রি' বলে পরিচয় দেবার পর আড়ালে ধমক দিয়ে অলোক বলেছিল, 'শুধু অদ্রি বলে থেমে যাও কেন! বলবে অদ্রি অফ রিপন স্ট্রিট।'

আশ্চর্য ঘুম আজ নেতিয়ে রেখেছে ছেলেটাকে। বিছানায় ওর পাশে খানিক শুয়ে থাকল অদ্রি। আচ্ছন্নতা থাকলেও টান করে রাখল চোখের পাতা। নির্দিষ্ট কিছুই ভাবল না। এখন মনে হচ্ছে ওভাবে, অলোককে কিছু না জানিয়ে চলে আসা ঠিক হয়নি। মন কষাকষির ব্যাপারটা নতুন নয়। তিন সাড়ে-তিন বছর আগে তাড়াহুড়ো করে অলোককে যখন বিয়ে করেছিল তখন সে চারমাসের গর্ভবতী। কিন্তু বিয়ের পরই কি তার মনে হয়নি একটা খাপছাড়া, দো-আঁশলা জীবনে ঢুকে পড়েছে সে! অলোক অবশ্য তখন অনেক কাছে ছিল, অদ্রির কথা ভেবেই কালীঘাটে নিজেদের পৈতৃক বাড়ি ছেড়ে আলাদা ফ্ল্যাট নিয়েছিল বালিগঞ্জে। অদ্রির মনে হল, আলাদা না হলে যথেচ্ছ হবার স্বাধীনতা হয়তো কম পেত কিছুটা, কিন্তু আজকের সমস্যা এড়ানো যেত। আর, সত্যি-সত্যিই কি সে যথেচ্ছ হতে পেরেছে!

কিচেন থেকে বাসনের নড়াচড়ার শব্দ পেয়েই উঠে গেল অদ্রি। স্টোভ জ্বলছে টেবিলে, গনগনে আঁচে ফুটছে কী একটা, গন্ধে টের পেল দুধ। দেখল, মেঝেয় উবু হয়ে বসে কাপ-ডিস ধুচ্ছে ডরোথি। অদ্রিকে দেখেও কাজ থামাল না। মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'বাচ্চাটা কি ঘুমোচ্ছে এখনও?'

অদ্রি হ্যাঁ না বলল না কিছু।

'দুধটা ওর জন্যেই গরম করছি। তুই আগে আসবি জানলে আরও একটু দুধের বন্দোবস্ত করা যেত।'

'আমি এসে ঝামেলায় ফেললাম!'

'এ কী রকম কথা!' থমকানো গলায় বলল ডরোথি, 'আমি কি তা-ই বললাম!'

'আমি কি বাইরের লোক, মা!' অদ্রি বলল, 'এ কাজগুলো তো আমিও করতে পারতাম!'

'বললি যা হোক! রোজ তোরাই করিস এসব! এই ভুতুড়ে বাড়িতে আমি ছাড়া আর কে আছে!' ডরোথি বলল, 'বুড়োকে নিয়ে তো জ্বালাতনের একশেষ। এখুনি আবার চায়ের জন্যে চ্যাঁচামেচি শুরু করবে!'

অদ্রি নিজেই এবার এগিয়ে এলো। স্টোভের আঁচ কমিয়ে ডরোথির পাশে বসে বলল, 'যাও তুমি। পেট খারাপ নাকি? ঘন ঘন বাথরুমে যাচ্ছ!'

'হ্যাঁ, পেট খারাপ। মাথাটাও খারাপ।' ছাড়া পেয়ে খুশিই হল ডরোথি। দু' হাতে কোমর চেপে উঠতে উঠতে বলল, 'চা করলে বেশি করে করিস। রোজালিনও এসে পড়বে।'

ডরোথি চলে গেল। সম্ভবত বারান্দায়। ওখান থেকেই ভেসে আসছে আর্থার আর

ডোনাল্ডের গলা। এটা বাড়ির পিছন দিক। ছোট জানালার একটা পাল্লা আটকানো; কাচ ভেঙে যাওয়ায় রঙিন কাগজ সেঁটে আড়াল দেওয়া হয়েছে কোনওরকমে। কাগজটায় চোখ পড়ায় অদ্রি খেয়াল করল আসলে ওটা ছেঁড়া পোস্টার—পেটের খোলা বাচ্চা নিয়ে বসে আছে একটা মুণ্ডহীন ক্যাঙারু। নিশ্চয়ই স্যামুয়েল এনেছিল কোনও সময়ে। বাইরেটা ঘষা, মনে হয় সন্ধে হয়ে এল। যাবার সময় আলো জ্বেলে গেছে ডরোথি।

স্টোভ থেকে দুধের পাত্র নামিয়ে জলভরতি কেটলিটা চাপিয়ে দিল অদ্রি। হঠাৎ দেখল, কাঠ চেরাইয়ের কারখানার পাশে খয়েরি রঙা বাড়ির দোতলার জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তারই দিকে তাকিয়ে আছে একটি লোক। দাঁড়ানোর ধরনটা বেয়াড়া। ভালভাবে লক্ষ করতেই বুঝতে পারল লোকটি পেচ্ছাপ করছে। অদ্রি সরে দাঁড়াল। নীল আগুনের সোঁ-সোঁ শব্দটা আবার অন্যমনস্ক করে দিল তাকে।

কাল রাতে সে যখন শুতে যায় অলোক তখনও ফেরেনি। তখনও ভাবেনি, কয়েক ঘণ্টা পরেই ভোর হবে এবং সে চলে আসবে এখানে। রাত একটা নাগাদ ডোরবেল বেজে ওঠার সময়েও ভাবেনি এরকম কিছু ঘটবে। বরং অলোক ফিরে এসেছে ভেবে নিশ্চিন্ত হয়েই দরজা খুলতে যায় সে।

দৃশ্যগুলো পর পর মনে করতে পারছিল অদ্রি। এই মুহূর্তে দৃশ্যের গন্ধটুকুও উঠে এল তার নাকে।

মদের নেশায় বেসামাল হয়ে ছিল অলোক—সেটা কিছু নয়, এরকম আগেও দেখেছে সে। অদ্রি ঘা খেল শীলা গুহ এবং শীলার স্বামী রমেনকে দেখে। কেউই প্রকৃতিস্থ নয়। অলোকের বন্ধু হিসেবে অদ্রি ওদের অনেক দিনই চেনে; তবে ইদানীং নিজেদের সম্পর্কে টান পড়ায় অদ্রির সন্দেহ হচ্ছিল ক্রমশ শীলার দিকে ঝুঁকছে অলোক। সন্দেহ সন্দেহই, ব্যাপারটা যুক্তি দিয়ে দাঁড় করাতে পারত না অদ্রি। আজ দরজা খোলার পর দেখল, প্রায় বেহুঁস শীলাকে জাপটে ধরে ঘরে তুলছে অলোক—শাড়ির আঁচল গড়াচ্ছে মাটিতে, ব্লাউজের হাতা সরে গিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ব্রা'র স্ট্র্যাপ, অবশ্যই ভারী মাথাটা ক্রমাগত অলোকের বুকে রাখবার জন্যে ছটফট করছে শীলা।

দেয়ালে কপাল চেপে ধ্বস্ত.ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল রমেন। অদ্রিকে দেখেই ওর গায়ে পড়তে পড়তে বলল, 'হোয়াই ডোন্ট ইউ কাম টু আস, বিনতা—মাই সুইটি ডার্লিং—'

অদ্রির মনে আছে, সে ধাক্কাই দিয়েছিল রমেনকে। প্রায় সেই সময়েই অলোক বলল, 'হোয়াট মেকস ইউ ডু দ্যাট। দেখছ না ও ড্রাঙ্ক!'

'দেখেছি। তোমাকেও দেখছি।' অদ্রির ধৈর্য তখন শেষ সীমায়। বলল, 'তুমি ড্রাঙ্ক নও!'

'ইয়েস, আই অ্যাম ড্রাঙ্ক। সো হোয়াট!'

বেসামাল শীলাকে সোফায় বসিয়ে, রমেনকেও টেনে তুলল অলোক। স্তব্ধ অদ্রির দিকে তাকিয়ে বলল, 'গেলাসগুলো আনো, অ্যান্ড দ্য বটল অফ হুইস্কি। ইচ্ছে করলে তুমিও বসতে পারো। আই হ্যাভ প্রমিসড দেম সাম মোর ড্রিঙ্কস।'

শীলা এইসময় উঠে দাঁড়াল এবং কোনও কথা না বলে অলোকের হাত ধরে টানতে লাগল সোফার দিকে।

সেই অবস্থাতেই অলোক বলল, 'যা বলছি করো। ওরা আজ এখানেই থাকবে।'

ক্রমশ মুঠে শক্ত হচ্ছিল অদ্রির। তিনজন তিনটি ছায়ার মতো ঘুরছিল চোখের সামনে।

রমেন এই সময় উঠে এল তার কছে। এলোমেলো হাত জোড় করে বলল, 'সরি। আমি খারাপ কিছু বলেচি কিচু! তাহলে এক্সট্রিমলি সরি, ভাই। প্লিজ! ইউ আর এ স্যুইট গার্ল।'

ঘৃণার জন্যে নয়, রাগেও নয়; তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া থেকে নিজেকে মুক্ত করে তখনই সিদ্ধান্তের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল অদ্রি। ফিরে তাকায়নি।

অলোক যা যা করতে বলেছিল, তা-ই করল। ভিতর থেকে বাইরে ওদের অসংলগ্ন কণ্ঠস্বব শুনতে শুনতে ছোট চামড়ার সুটকেসটা গুছিয়ে নিল সে; আলো নিবিয়ে বিছানায় এসে ছেলের মাথা স্পর্শ করে নিজের মনেই বলল, তুই আমার—তোকে পাবার জন্যেই আমি আজ এইখানে। তুই আমারই থাকবি।

রাত্রেই টের পেয়েছিল অলোকের নিশ্চুপ বিছানায় উঠে আসা এবং অঘোরে ঘুমিয়ে পড়া। ভোরে, হাতে সুটকেস এবং কাঁধে পুলককে নিয়ে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে দেখেছিল, সোফার সামনে কার্পেটের ওপর পড়ে আছে স্মৃতি-সম্পর্কহীন, বিচ্ছিন্ন দুটি দেহ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরই ট্যাক্সি পেয়ে যায় অদ্রি।

'হাই অদ্রি! হোয়াট আ সারপ্রাইজ!'

দরজার সামনে রোজালিনকে দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না অদ্রি। তখনও ঘোর কাটেনি তার, তখনও ভাবছিল এভাবে অলোককে কিছু না জানিয়ে চলে আসা ঠিক হয়েছে কিনা। যেখানে এল সেটাও কি তার জায়গা!

'সারপ্রাইজ বলছিস কেন!' রোজালিনের দিকে না তাকিয়ে একটু পরে অদ্রি বলল, 'মা বলেনি!'

'বলেছে বলেই তো এলাম।' রোজালিন গম্ভীর হল, 'কী হয়েছে? আবার কোনও—'

চায়ের কাপগুলো গোছাতে গোছাতে নিজের মধ্যে কেমন একটা বাধা টের পেল অদ্রি। রোজালিন তার বোন, চার বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও একসময় তারাই ছিল সবচেয়ে কাছাকাছি; লরা বড় হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু, আজ, এই মুহূর্তে, রোজালিনের সঙ্গে সম্পর্কে কোনওরকম নৈকট্য বোধ করল না সে। বড় দীন লাগছে নিজেকে; মনে হচ্ছে এরপর নিজেকে আলোচনার বিষয় করে তোলার চেয়ে কাল রাতের ঘটনা অনেক বেশি সহনীয় ছিল।

রোজালিনের প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল অদ্রি। দূর থেকে বলল, 'তোদের কী খবর? মাইকেল, ডেইজি—এরা কেমন আছে? ডোনাল্ডকে অবশ্য দেখেছি। দাদুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েছে আজ। বলেছে তোকে?'

রোজালিন ওর মনোভাব আঁচ করতে পারল। অদ্রিকে দু'হাতে দুটো কাপ নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে থমথমে গলায় বলল, 'আমাকে দে—আমি নিয়ে যাচ্ছি—'

অদ্রির ব্যবহারে কিছু আছে যা দেয়াল তুলে দাঁড়ায়। দুঃখই কি গাঢ় করে তোলে অভিমান?

আরও কিছুক্ষণ পরে অদ্রির ছেলেকে আদর করতে করতে রোজালিন ভাবল, কেন সে প্রশ্ন করতে গিয়েছিল অদ্রিকে। সে কি জানে না কী হয়েছে বা কী হতে পারে। সে কি জানে না, তেমন কিছু না ঘটলে এইভাবে চলে আসে না কেউ।

অবুঝ ডেইজি

বয়সের তুলনায় অভ্রির ছেলে একটু বেশি শান্ত। গড়নেও ছোট। এ বাড়ির কাউকে তো চেনেই না প্রায়। তা সত্ত্বেও ভয়, ভাবনা, অস্থিরতা নেই কোনও। বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেল, হাতে একটা মলাটছেঁড়া রঙিন ম্যাগাজিন ধরিয়ে অভ্রি কিচেনে গেছে ডরোথিকে সাহায্য করতে—ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ছেলেটা সেই থেকেই আছে নিজের মনে। মাঝে অ্যারোপ্লেন উড়ে যাবার শব্দে খুব মনস্কভাবে তাকিয়ে ছিল জানলার বাইরে। শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর রোজালিনের দিকে মুখ ফিরিয়ে হাসল। এখন তার চোখ বেবি পাউডারের বিজ্ঞাপনের ওপর। ছেলেটা ইংরেজি শিখছে না বলে একদিন আক্ষেপ করেছিল অভ্রি; এখানেও হয়তো ভাষার বাধা চুপ করিয়ে রেখেছে। নাকি অপরিচিত পরিবেশে আর কোনও প্রতিক্রিয়া কাজ করছে মনে!

রোজালিন ওকে আরও একটু কাছে টেনে নিল। চাপা আবেগ থেকে ওর ঘাড়ে নাক ঘষে বলল, 'পু-লক, শো মি ইয়োর ফেস?'

হাসি হাসি মুখ করে শিশুটি তাকাল রোজালিনের দিকে, সামনে দাঁড়ানো ডেইজির দিকেও। তারপর আঙুল তুলে নিজের নাকের ওপর রেখে অস্ফুট গলায় বলল, 'নোজ।'

'ইয়েস, দ্যাটস ইয়োর নোজ।' রোজালিন ওর গাল টিপে দিয়ে বলল, 'টেল মি, হোয়্যার ইজ ইয়োর ফাদার?'

পুলক জবাব দিল না। হাসল শুধু।

রোজালিন বলল, 'বাবা, বা-বা! তুমার বাবা!'

এবারও সাড়া দিল না পুলক। বিচিত্র ধরনের হর্ন বাজিয়ে সামনের রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে একটা মোটর, ওর আগ্রহ সেইদিকে।

ডেইজি শান্ত মেয়ে। রোজালিন যেদিকে তার উলটোদিকে খাটের ওপর বসে অনেকক্ষণ ধরেই হাবভাব লক্ষ করছিল ছেলেটার। এবার বলল, 'ওর রঙ এত কালো কেন, মা?'

'ডেইজি! এ কী অসভ্যতা!' মেয়েকে ধমক দিল রোজালিন, 'নেভার সে দ্যাট। ইউ আর নট আ ব্যাড গার্ল। আর ইউ!'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে মাথা নামিয়ে নিল ডেইজি।

'যাও, দেখে এসো ডোনাল্ড কোথায়! অনেকক্ষণ ওর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।' রোজালিন বলল, 'দাদুকেও দেখে এসো। বোধহয় একা বসে আছে বারান্দায়—'

ডেইজি উঠে যাবার পর দীর্ঘশ্বাস চাপল রোজালিন। উদাসীন হয়ে গেল অল্প। ডেইজির প্রশ্নে কৌতূহল ছাড়া আর কিছু ছিল না। ধমক খেয়েছে, আর কখনও জিজ্ঞেস করবে না হয়তো। তবু, প্রশ্নটা কি থেকেই যাবে না ওর মনে? ডরোথির কথা মনে পড়ল। ডরোথির নিজের রঙ চাপা, যাকে ফর্সা বলে তা নয়—এখন তো কালোই বলা যায়। তবু, অলোককে প্রথম বার দেখার পর ডরোথিও খেদোক্তি করেছিল ওর রঙ নিয়ে। অভ্রি কী ভাবে?

ডেইজি ফিরে এসে বলল ডোনাল্ড টয়লেটে। আর্থার বিছানায়, চোখ বন্ধ, সম্ভবত ঘুমোচ্ছে।

এই সময় কলিং বেলের অস্পষ্ট আওয়াজ হতে বারান্দার দিকে ছুটে গেল ডেইজি।

কে হতে পারে! এই সন্ধেয় এ বাড়িতে আসার মতো তো আর কেউই নেই। নাকি ডরোথিই বেরিয়েছিল কোথাও! রোজালিন অনুমান করতে পারল না।

হঠাৎ আবির্ভাব

'মম। ইটস ড্যাড!' ফিরে এসে ফিসফিসিয়ে বলল ডেইজি, 'তোমাকে ডাকছে!'

'কোথায়!'

'ওপরে ওঠেনি। সিঁড়িতে। তোমাকে এক্ষুনি যেতে বলল।'

বিকেলে টেলিফোনে কথবার্তার পরও মাইকেল যে আসবে তা ভাবতেই পারেনি রোজালিন। এলেও সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন! মেয়ের মুখ দেখে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল সে। বলল, 'তুমি বোসো এখানে। বাচ্চাটাকে দেখবে। আমি আসছি।'

ভোল্টেজ কম হওয়ার জন্যে ম্লান লাগছে বারান্দার আলো। বাড়িটাও নিঃশব্দ। দ্রুত পায়ে সিঁড়ির মুখে এসে রোজালিন দেখল, তিন চার ধাপ নীচে আবছা আলোয় রাস্তার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে মাইকেল।

'কী হল! ওখানে কেন!'

ইশারায় রোজালিনকে নীচে ডাকল মাইকেল। ও নেমে আসার পর জিজ্ঞেস করল, 'অদ্রি কি এখানে?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'ওর বাচ্চা?'

রোজালিন মাথা নাড়ল।

কয়েক পলক তাকিয়ে থেকে স্ত্রীর হাত ধরে টানল মাইকেল। নীচে গিয়ে এমন জায়গায় দাঁড়াল, যেখানে ওপর থেকে কেউই দেখতে পাবে না ওদের। আশপাশ দেখে নিয়ে বলল, 'অদ্রির হাসব্যান্ড—অলোক—ফোন করেছিল আমাকে—'

'তার মানে! কখন!'

'তুমি ফোন করার পর। খুব আপসেট মনে হল। বলল অদ্রি আর ওর বাচ্চা সকাল থেকেই মিসিং। আমি কিছু জানি কিনা জিজ্ঞেস করল।'

'কী বলেছ?'

'কী বলব! আমি তো জানিই না কিছু! ও বলল, কাল রাতে ড্রিঙ্ক করে ফিরেছিল দেরিতে। আর কিছু মনে নেই।'

রোজালিন চুপ করে থাকল। অন্ধকারে গা শোঁকাশুঁকি করতে করতে বাড়ির পিছন দিক থেকে বেরিয়ে দুটো কুকুর এদিকেই আসছিল, ওদের দেখে পাঁচিলের ভাঙা অংশ টপকে দ্রুত বেরিয়ে গেল রাস্তায়। পায়ের পাশে কিছুর ছোঁয়া লাগতে চমকে উঠেছিল রোজালিন, সরে গিয়ে দেখল একটা বড় গিরগিটি হারিয়ে যাচ্ছে ঘাসের জঙ্গলে। উলটোদিকের জানলায় মিসেস অলিভার। দৃষ্টি তাদেরই দিকে। পাশের শিশি-বোতলের দোকান থেকে রেডিওর হিন্দি গান ভেসে আসছিল।

'আমার হঠাৎ মনে পড়ল তুমি বলেছিলে মা ফোন করেছে।' মাইকেল বলল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'হয়েছে কি? এভাবে চলে এল কেন?'

'অলোকই বলতে পারবে।' ক্ষুব্ধ গলায় রোজালিন বলল, 'কিছুই জানে না এটা কি হতে পারে। লোকটা পাজি। এখন সাধু সাজছে—'

মাইকেল কিছু বলল না। ওর চোখ মাটিতে।

'অভ্রি খুব ভয়ে ভয়ে আছে। কী হয়েছে আমাকেও ভেঙে বলেনি।' কথাগুলো বলে অল্প থামল রোজালিন। কিছু ভাবল যেন। তারপর বলল, 'চলো। ওপরে চলো। তুমিও অনেকদিন পরে এলে। ড্যাড তোমাকে দেখলে খুশি হবে—আজই জিজ্ঞেস করছিল আমাকে—'

'আমি সেজন্যে আসিনি।' মাইকেল বলল, 'ও বোধহয় ধরেই নিয়েছে অভ্রিরা এখানে এসেছে। বলল আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। সাতটায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছে অলিম্পিয়ায়। আই থিংক আই শুড গো।'

'কী করবে! মদ খাবে!'

'ডোন্ট বি কিডিশ!' মাইকেল বিরক্ত হল, 'দিস ইজ আ সিরিয়াস অ্যাফেয়ার। তুমি কি চাও অভ্রি এখানেই পড়ে থাকুক! আমি না গেলে লোকটা এক্সকিউজ খুঁজবে। ও তো অভ্রিকে ঝেড়ে ফেলতে পারলেই বাঁচে। মনে হয় ছেলেটার জন্যেই কনসার্নড।'

নিঃশব্দে চোখ তুলে মাইকেলের দিকে তাকাল রোজালিন। সিঁড়িতে সামান্য যেটুকু আলো তা এত দূর পৌঁছয় না। রাস্তার আলোও অনুজ্জ্বল। একরকম আবছায়ায় স্বামীকে দেখতে দেখতে ওর মনে হল, সকাল-বিকেলের মাইকেল নয়, ও অন্য কাউকে দেখছে। নিজেকে নিয়ে যে হতাশায় ভুগছিল ক'দিন হাবেভাবে কথায় এখন তার লেশমাত্র নেই। বাইরে যতই গম্ভীর ও দাম্ভিক হোক, নিজস্ব নির্জনে তার স্বামীটি যে অত্যন্ত নরম এবং দায়িত্ববান তা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে! রোজালিনের মনে পড়ল, গতবার অভ্রি এইভাবে চলে আসার পর মাইকেলই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ফেরত দিয়ে এসেছিল ওকে। তখন রবিনরাও ছিল। অলোক দত্ত তাদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না বোঝাই যায়; কিন্তু কেন কে জানে, মাইকেলকে সমীহ করে একটু। অভ্রির খোঁজখবর মাঝেমধ্যে যেটুকু পায় তা মাইকেলেরই মাধ্যমে।

'যদি পারি ওকে নিয়ে আসব এখানে?'

মাইকেলের আগ্রহ দেখে কৌতুক বোধ করল রোজালিন। সামান্য হেসে বলল, 'তুমিও যেমন! ও আসবে এখানে!'

'আই ডোন্ট নো।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল মাইকেল, 'আসতেও পারে। পারহ্যাপস আই ক্যান ম্যানেজ হিম।'

'পারবে?' রোজালিন সন্দেহের ভঙ্গিতে তাকাল। একটু চুপ থেকে বলল, 'এলে আমাদের সম্মান বাঁচে। মেয়েটাও বাঁচে।'

'ও-কে দেন।' মাইকেল ব্যস্ত হয়ে উঠল। চোখের কাছে হাতঘড়িটা নিয়ে গিয়ে সময় দেখতে দেখতে বলল, 'এখন কাউকে কিছু বোলো না। আমি ঘুরে আসছি।'

দ্রুত হাঁটছে মাইকেল। গেট পর্যন্ত ওর পিছনে পিছনে গেল রোজালিন, যত দূর দেখা যায় দেখল। একরকম মায়া আচ্ছন্ন করছিল তাকে। অভ্রি আজ তাকে দূরের ভেবেছে,

হয়তো নিজের যন্ত্রণায় নিজেকেই দোষী করছে ও—আর কেউ তার জন্যে ভাববে কেন! অদ্রি জানে না, নিজের অপমান আর হতাশায় জ্বালাতন হতে হতেও একটা মানুষ ওকে বাঁচাবার জন্যেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে এখন!

রোজালিন ফিরে আসছিল। দেখল, সিঁড়ির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে ডরোথি।

'মাইকেল না! কোথায় গেল ও।'

'তুমি কী করে জানলে!'

'গলা শুনলাম যেন!'

'ওঃ, মা!' রোজালিন মাথা নেড়ে বলল, ' তুমি কি ডিটেকটিভ!'

দ্য ব্রেভ ইজ দ্য ব্রেভ

অনেকদিন পরে সেদিন রাত্রে মদে আর আমোদে গমগমে হয়ে উঠল আর্থার পাইবাসের বাড়ি। রবিনরা যাবার আগে একবার হয়েছিল, তারপর এই প্রথম।

মাইকেল শুধু অলোককেই ধরে আনেনি, সঙ্গে চারপাঁচ বোতল বিয়ার আর এক গুচ্ছের কাবাবও নিয়ে এসেছিল বুদ্ধি করে। অনেক দিন পরে নেশার ঘোরে গলা ছেড়ে গান ধরল আর্থার—

দ্য ব্রেভ ইজ দ্য ব্রেভ
হু ব্রেভস থ্রু দ্য নাইট;
ও গড, গিভ আস ইয়োর কাইন্ডনেস—
অ্যান্ড গিভ আস ইয়োর লাইট।

সকলেই শুরু করেছিল একসঙ্গে। কে কখন থেমে গেল কেউই খেয়াল করেনি। স্তব্ধতার মাঝখানে এক সময় ওদেরই কেউ কেউ লক্ষ করল, চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে অশীতিপর, লোলচর্ম ও জরাগ্রস্ত এক বৃদ্ধের মুখ। কণ্ঠ থামছে না তবু; বরং আরও উদাত্ত ও উদ্বেল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আরও বেশি অন্ধকারের দিকে।

৫

এবার শীত পড়ল তাড়াতাড়ি। অক্টোবরের শেষ থেকেই চোরা হাওয়া যখন-তখন কাঁপুনি দিয়ে যাচ্ছিল গায়ে, সরসর করত চামড়া। ডিসেম্বরের শেষ দিকে জাঁকিয়ে বসল। তাপাঙ্ক নামতে নামতে এমন জায়গায় পৌঁছুল যে, খবরের কাগজে হিসেব করে লেখা হল গত আট বছরের মধ্যে কলকাতা শহরে এমন শীত পড়েনি। রোদ ওঠে দেরিতে। দিনের বেলায় আর দুপুরে হালকা রোদ্দুরে চারদিক মনোরম হয়ে থাকলেও সন্ধের পর কালি জোবড়া তুলোর আঁশের মতো কুয়াশায় ভারী আকাশটা ক্রমশ নেমে আসে নীচে।

রাত্রে বিছানায় শুয়েও রোজালিনের মন পড়ে থাকে রিপন স্ট্রিটে।

আর্থারের শোবার ঘরের একটা জানলার ছিটকিনি জং ধরতে ধরতে খসে পড়েছে ক'দিন হল, কপাটদুটো টেনে বসালেও জায়গায় থাকে না, হাওয়ার ঝটকায় খুলে যায় দুড়দাড় করে। কাছাকাছি কোথাও একটা ছুতোর মিস্ত্রি খুঁজে পায়নি ডরোথি। পেতে হলে সেই মল্লিকবাজার। কে যাবে! স্যামুয়েলের বন্ধু জোহান আসত মাঝে মাঝে, হঠাৎই আসা বন্ধ করেছে ছেলেটা। এমনই আলগা সম্পর্ক ওর সঙ্গে যে ঠিকানাটাই জানা হয়নি কোনও দিন। এ জন্যে নিজেকে অপরাধী করে রীতিমতো মনোকষ্টে আছে ডরোথি। পাশের শিশি-বোতলঅলাকে জিজ্ঞেস করেছিল জোহানকে এদিক দিয়ে যাতায়াত করতে দেখেছে কি না। লোকটা বলল থানায় গিয়ে খোঁজ করতে। তার কাছে খবর আছে, পার্ক স্ট্রিটের হোটেলের সামনে আফিমের বড়ি বিক্রি করতে গিয়ে এই অঞ্চলের কয়েকটা ছেলে ধরা পড়েছে পুলিশের হাতে। ওর মধ্যে জোহানও থাকতে পারে। ছেলেটাকে দেখে কোনও দিনই তার আফিমখোরের বেশি কিছু মনে হয়নি।

ডরোথির বর্ণনা শুনে রোজালিন বুঝতে পারেনি, জানলার ছিটকিনি না জোহান কোনটা নিয়ে তার বেশি মাথাব্যথা।

পরে ভেবেছিল, পুলিশ জোহানকে ধরে নিয়ে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই; ধরলে ধরতেও পারে; কারণ থাক বা না থাক। তাদের কি সত্যিই দাঁড়াবার জায়গা আছে কোথাও? রবিন আর স্যামুয়েলকে নিয়ে কী হয়েছিল, ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে কাউকে বলতে না বলে সে-গল্প নিজেই তার কাছে করেছে ডরোথি। মার্গারেটের ছেলে ভাল ক্রিকেট খেলে, সেঞ্চুরি-টেঞ্চুরিও নাকি করেছে; মার্গারেট বলছিল সেদিন, এত ভাল পারফরমেনস হওয়া সত্ত্বেও কিসের যেন ট্রায়াল থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে ওকে—'ইউ নো, দ্য কোচ হ্যাড হিজ ওন ক্যানডিডেট! এত ভাল রেকর্ড থাকা সত্ত্বেও, বুঝলে, আমার ছেলেকে কেন নেওয়া হল না তা নিয়ে কেউ একটিও কথা বলল না!' রোজালিন অবিশ্বাস করেনি। নিজেদের অফিসেও তো দেখছে। আগে পি-বি-এক্স-এ ক্লদিয়া ছাড়াও ছিল ক্যারিনা আর এলিজাবেথ। ক্যারিনা চলে গেছে লন্ডনে, এলিজাবেথও রিটায়ার করেছে বছর দুয়েক হল। ওদের জায়গায় এসেছে অন্য দুটি মেয়ে; তারা কেউই অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান নয়। রোজালিন সারার জন্যে চেষ্টা করেছিল, হয়নি; এমনকী এলিজাবেথের মেয়ের চাকরিটাও হতে হতেও হয়নি। এগুলো কি পক্ষপাত? রোজালিন জানে না। তবে এর ওর কথা শুনে মনে হয় তাদের জোরটা কমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। মাইকেলের চাকরিতে গোলমাল হবার পরও ওর মনে হয়েছিল যোগ্যতা নয়, ওকে প্রোমোট না করার ব্যাপারে আর কোনও কারণও থাকতে পারে।

ডরোথিকে বুঝিয়েছিল, জোহান জুটে গিয়েছিল বলেই ভাবা হচ্ছে জোহানের কথা, না জুটলে কী হত! সময় করে একদিন সে নিজেই গিয়ে ধরে আনবে ছুতোর। তারপর কাজ চালানোর মতো করে দড়ি দিয়ে জানালাটা বেঁধে দিয়েছিল রোজালিন। সেই থেকে বন্ধই আছে। আর্থার গজগজ করে—এভাবে সারাদিন বাতাস আটকে রাখা পছন্দ করে না সে। তবু খোলেনি ডরোথি।

পলকা দড়ির বাঁধন দিয়ে কতক্ষণ আর আটকে রাখা যাবে কপাট দুটো। রোজালিনের ভয় যে-কোনও সময় ছিঁড়ে যাবে ওটা আর হাড়-জমানো শীতে কুঁকড়ে উঠবে বুড়ো-বুড়ি।

আর্থারের ঠাণ্ডা লাগার ধাত আছে, একটুতেই সর্দি ধরে নেয়—শ্লেষ্মার শব্দে ঘড়ঘড় করে নিঃশ্বাস। এসব ভাবতে ভাবতেই একটা দৃশ্য দ্যাখে রোজালিন, বিছানার ওপর কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে প্রবল শীতে হি হি করে কাঁপছে আর্থার, আর খোলা কপাটদুটোকে বাগে আনবার জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করে যাচ্ছে ডরোথি। একটা দৃশ্যই ডেকে আনে আরও অনেক দৃশ্য। ঘুমোতে পারে না।

মন খারাপের সূচনা

রোজ সকালে পৌনে ন'টা নাগাদ ট্র্যান্সপোর্ট ভ্যান এসে অফিসে তুলে নিয়ে যায় রোজালিনকে। তার আগে ডোনাল্ডকে তৈরি করে দিতে হয় স্কুলের জন্যে। ডেইজির স্কুল দেরিতে; মাইকেলও সাড়ে ন'টা পৌনে দশটার আগে বেরোয় না কোনও দিন। সোফিয়া আসে আটটা নাগাদ। তার আগের সমস্ত ঝক্কি রোজালিনের।

ব্যস্ততা সত্ত্বেও ঘড়ির কাঁটা ধরে চলতে চলতে অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ব্যাপারটা।

একদিন তবু উৎসাহে টান পড়ল রোজালিনের। মাইকেলকে বলল, 'আজ একটু দেরিতে বেরুবো ভাবছি। তুমি কি পৌঁছে দিতে পারবে আমাকে?'

কফিতে চুমুক দিতে দিতে খবরের কাগজ পড়ছিল মাইকেল। চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'হঠাৎ!'

'এমনিই। কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে।'

রোজালিনের সৌন্দর্যে লাবণ্যের অভাব নেই। দু' এক মুহূর্ত তাকিয়েই আজ সেখানে এক অপ্রত্যাশিত বিষণ্ণতা লক্ষ করল মাইকেল।

'বেশ তো, যেয়ো।' মাইকেল বলল, 'শরীর খারাপ নয় তো?'

'নাঃ।'

কাগজ থেকে চোখ সরিয়ে খানিক বাইরে তাকিয়ে থাকল মাইকেল। আজ কুয়াশা বেশি, নাকি মেঘও করেছে? রাস্তামুখো জানলাটা নিচু। উল্টোদিকে একটা মাল্টিস্টোরেড ওঠার পর থেকে আকাশ দেখা যায় না।

রোজালিনকে অফিসে পৌঁছে দেবার জন্যে ট্যাক্সিতে উঠেও ওর মুখচোখে কোনও পরিবর্তন খুঁজে পেল না মাইকেল। কথার উত্তরে কথা বলছে, না হলে না; এক ধরনের অন্যমনস্কতা যেন দূরে সরিয়ে রেখেছে ওকে। এত কী ভাবছে ও?

প্রশ্নটা ছুঁয়ে থাকল মাইকেলকে। রোজালিন নেমে যাবার আগে, অন্য কোনও কথার অভাবে বলল, 'দিস ডেডিকেসন টু অফিস ইজ রিয়্যালি ব্যাড। ক'দিন ছুটি নাও না কেন!'

'ছুটি নেবার কী হল!' রোজালিন হাসল অল্প, 'জুনেই তো ছুটি নিয়েছিলাম, মনে নেই? রবিনরা যাবার সময়—'

'ওকে। সি ইউ ইন দ্য ইভনিং।'

'বাই।'

মাইকেল চলে যাবার পরেও অনির্দিষ্ট মনে খানিকক্ষণ রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল

রোজালিন। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে গেল লিফটের দিকে।

ও নিজের জায়গায় গুছিয়ে বসতে না বসতেই ঠাট্টা করে মার্গারেট বলল, 'বস মার্কেটিংয়ের লোক হলে সেক্রেটারিদের কত সুবিধে হয় তোমাকে দেখেই বুঝতে পারছি—'

'কেন!'

'আমাকে দেখছ না! সকাল থেকেই এক গাদা ব্রিফ টাইপ করতে বসেছি। দ্য সলিসিটর সিমস টু হ্যাভ ভমিটেড অল দ্যাট হি নিউ।' মার্গারেট বলল, 'এ লোকটাও তেমনি!' অফিসটাকে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। না যায় ছুটিতে, না যায় ট্যুরে!'

বিরক্তি ছাপিয়ে উঠল ওর ভাষা আর গলার ধারে। লোকটা বলতে মিস্টার রোহাতগী, এই কোম্পানির সেক্রেটারি। ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট নয়।

সোমদেব প্রায়ই ট্যুরে যায়। সেই সময়টায় কিছু রুটিন কাজ করতে হলেও যাকে চাপ বলে সেরকম কিছু থাকে না রোজালিনের। এটা ওদের ঈর্ষার কারণ। একবারও ভেবে দ্যাখে না সোমদেব থাকলে কতটা চাপের মধ্যে থাকতে হয় তাকে। আজ আসবে না সোমদেব, কালও আসবে কিনা ঠিক নেই। তবে মার্গারেট যা ভাবছে তা নয়। কিছুদিন থেকেই স্ত্রীর অসুস্থতা নিয়ে সোমদেব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত—আজ বোধহয় কোনও অপারেশন আছে মহিলার।

কিন্তু, সোমদেব আসবে না জেনেই কি সে দেরিতে এসেছে?

সাধারণত যে-কোনও ধরনের খোঁচাই হালকা মেজাজে নেয় রোজালিন। আজ পারল না। বলল, 'কী কববে! তোমার কপাল মন্দ। মিস্টার রোহাতগীর সেক্রেটারি হবার ধান্ধাটা তোমারই ছিল—এখন আফশোষ করলে কী হবে!'

মার্গারেট অস্বস্তি বোধ করল। কাজ থামিয়ে বলল, 'তুমি কি আমার কথাতেই রাগ করলে, না রাগ নিয়েই এসেছ?'

রোজালিন জবাব দিল না। মার্গারেট এইরকমই, থামতে জানে না। এরপর রোজালিন কিছু বললে তারও উত্তর থাকবে। বরং চুপ করে থাকাই ভাল।

'আই অ্যাম সরি, রোজি।' উত্তর না পেয়ে মার্গারেট বলল, 'তুমি যে বদমেজাজে আছ তা ভাবতেই পারিনি।'

'বদমেজাজে নেই।' রোজালিন সহজ হবার চেষ্টা করল, 'তোমার কাজ বেশি থাকলে আমাকে দিতে পারো।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ডার্লিং। তুমি উপকার করবে জানলে সকাল আটটায় এসে হাজির হতাম না।'

খাপছাড়া শব্দ তুলে টাইপরাইটারের রোলার সরাল মিস লাহিড়ী। মার্গারেট সম্পর্কে এলার্জি আছে ওর, পারতপক্ষে কথা বলে না দু'জনে। এইভাবেই বিরক্তি জানাচ্ছে। শামিম নেই। ক'দিনের ছুটি নিয়ে হায়দ্রাবাদে গেছে ওর বাপ-মা'র কাছে।

মোটা শরীর নিয়ে রোজালিনের কাছে উঠে এল মার্গারেট। তোষামোদের ধরনে বলল, 'অনেস্টলি, তোমাকে আসতে না দেখে চিন্তায় পড়েছিলাম। লাঞ্চ টাইমে একবার মার্কেটে যাবে আমার সঙ্গে? আমার ননদ এসেছে বোম্বাই থেকে—ওর দুই মেয়ের জন্যে কিছু কেনাকাটা করব। তুমি তো জানো, আমার পছন্দ একেবারেই যা তা।'

রোজালিন বলল, 'দেখি। এখনই তো আর যাচ্ছ না!'

টেবিলের ওপর সোমদেবের নামে পাঠানো একগাদা চিঠিপত্র। ওগুলো পড়ে বাছাই করতে হবে, সম্ভাব্য ক্ষেত্রে অ্যাকশনও নিতে হবে। অল্প কিছু টাইপের কাজও ধরা আছে।

রোজালিন মনস্ক হবার চেষ্টা করল। কিন্তু, সত্যি-সত্যিই, কী হয়েছে আজ তার। কেন এমন খাপছাড়া লাগছে নিজেকে!

ক'দিন ধরেই অনুভূতিটা টের পাচ্ছিল রোজালিন। কাজকর্মে মন নেই, কথা বলতে ভাল লাগে না কারও সঙ্গে, নিঃশ্বাসের ওঠানামায় স্মৃতি জড়িয়ে যায় স্মৃতিতে। নিজেকে নিয়ে আগে কখনও এমন বিব্রত হয়েছে মনে পড়ে না।

নিজের পক্ষে নিজেকে জানা সম্পূর্ণ হয় না কখনও; তবু, নিজের ভাল লাগা মন্দ লাগাগুলোকে চিনতে অসুবিধে হবে কেন! রোজালিন জানে, অন্তত জেনে এসেছে এতদিন, বেঁচে থাকায় আনন্দ বই দুঃখ নেই। জীবন যা দিয়েছে তাকে তার চেয়ে কম দিলেও দিতে পারত। তার কি শামিমের মতো ভাগ্য হতে পারত না? কিংবা, অদ্রির মতো? কিন্তু, সে রূপ পেয়েছে, স্বাস্থ্য পেয়েছে, সাচ্ছল্য পেয়েছে মোটামুটি—স্বামী সন্তানে ভরপুর এক সংসারও পেয়েছে। এসব কি কম! নিজেব সম্পর্কে নিরাপত্তার বোধ থেকেই সে চেষ্টা করেছিল একেবারে নিজস্ব চৌহদ্দির বাইরে যারা তাদেরও যতটা পারে টেনে আনতে ভালবাসায়, বিশ্বাসে, বেঁচে থাকার আগ্রহে। নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার ব্যাপারেও কার্পণ্য করেনি কোনও। ইদানীং সন্দেহ হচ্ছে, তার শুভেচ্ছার দাম আছে কি না। বাইরে থেকে তেমন স্পষ্টভাবে ধরা না পড়লেও নিজের আশপাশ ও পরিচিত মুখগুলির দিকে তাকালে মনে হয়, আড়ালে কেউ যেন অঙ্ক কষে যাচ্ছে কে কতটা পাবে, কে কতটা পাবে না. অন্ধকার থেকে আরও বেশি অন্ধকারে তলিয়ে যাবে কে! অদৃশ্যের এই হিসেবের সামনে বড় অসহায় লাগে নিজেকে।

রিপন স্ট্রিটে বড়দিন

পরশু ছিল বড়দিন। পরের দিন রবিবার থাকায় আরও একটা দিন ছুটি পাওয়া যাবে ভেবে শনিবার সকালে গির্জায় যাওয়া থেকে শুরু করে পুরো দিনটাই ছেলেমেয়ে নিয়ে রিপন স্ট্রিটে আর্থার, ডরোথির সঙ্গে কাটাল রোজালিন। এবার রবিন-সারা-স্যামুয়েল নেই, লরাও নেই। অনেকখানি তফাত ওদের থানা না-থাকার মাঝখানে—না-থাকাটা ওই দিনই যেন বেশি করে ধরা পড়ছিল।

আর্থার, ডরোথির জন্যে এবার বাড়তি কিছু নতুন পোশাক কিনে এনেছিল রোজালিন। আর্থার খুব খুশি। রোজালিনের পীড়াপীড়িতে সঙ্গে সঙ্গেই নতুন পোশাক গায়ে তুলতে হল তাকে। ফিটফাট হয়ে আহ্লাদিত ভঙ্গিতে রোজালিনকে জড়িয়ে ধরল সে।

'ঈশ্বর করুণাময়।' ডরোথিকে শুনিয়ে আর্থার বলল, 'কিছুই হারায়নি। হারাঁবে না।'

গত রাতে বাড়ি শূন্য হয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করেছিল আর্থার। সেই থেকে ডরোথিও চলে গিয়েছিল স্মৃতিতে। এখন আর্থারের মুখে হাসি ফুটতে দেখে বলল, 'নিজেকে বোঝাও। আমি কি অনুযোগ করেছি!'

'বুড়িটা কখনও সোজা ভাষায় কথা বলে না।' আর্থার যেভাবে বলে সেইভাবেই বলল, 'শুধু পা-টা গোটা থাকলে আজ রোজালিনের সঙ্গে নাচতে পারতাম।'

রোজালিন বুঝতে পারছিল আর্থারের আনন্দে জোর নেই কোনও। নেই বলেই জোর খাটাচ্ছে নিজের ওপরে।

অদ্রিও এসেছিল দুপুরে। তবে একা। এসেই ফিরে যাবার তাড়া দেখাল, অলোকের সঙ্গে বেরুতে হবে কোথাও। সারাদিন হই-হট্টগোলে যাবে বলে গতকাল রাত্রেই কালীঘাটে শ্বশুরবাড়িতে রেখে এসেছে পুলককে। একটা কেক ছাড়া সঙ্গে আর কিছুই আনতে পারেনি অদ্রি। ওকে বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। আজকাল ও কথাবার্তা বলেই না প্রায়। বিকেল থাকতে থাকতেই ফিরে গেল।

বালিগঞ্জের ট্রামে অদ্রিকে তুলে দিতে গিয়েছিল রোজালিন। রাস্তায় বেরিয়ে অদ্রি বলল, 'রোজি, তোর মনে আছে, ছোটবেলায় স্কুল থেকে ফেরার সময় একদিন আমরা সিমেট্রিতে গিয়েছিলাম?'

অদ্রির গলা বিষণ্ণ; কথাগুলোও এমন ভাবে বলল যেন প্রস্তুতিটা আগেই ছিল মনে।

একটু ভেবে রোজালিন বলল, 'মনে পড়ছে। হঠাৎ এ কথা মনে পড়ল কেন!'

'মনে পড়ার কি কারণ থাকে কোনও!' অদ্রি হাসল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'কেন গিয়েছিলাম মনে পড়ে?'

অদ্রির ভাবনা কোনদিকে যাচ্ছে অনুমান করা যায় না। রোজালিন চুপ করে থাকল।

'পূর্বপুরুষের সমাধি খুঁজতে।' অল্প কৌতুক মেশানো গলায় বলল অদ্রি, 'ড্যাড বলত ড্যাডের ঠাকুরদার সমাধি আছে ওখানে। ড্যাডের বাবা তো মারা গিয়েছিল ব্যাঙ্গালোরে—'

বড়দিন হলেও কোনও উদ্যম নেই কোথাও। ছুটির দিনের আলস্য ছায়া ছড়িয়েছে রোদ্দুরেও। অনেকটা এসে মোড়ের রেস্তোরাঁর সামনে জরি ও চুমকি লাগানো বড় একটা তারা ঝুলতে দেখল রোজালিন—দু'পাশ দিয়ে ওপর থেকে নীচে লাল নীল কাগজের অক্ষরে 'মেরি ক্রিসমাস' ঝোলানো। ওই রেস্তোরাঁটার জায়গায় আগে মিস্টার এব্রাহামের বেকারি ছিল। নিজের হাতে পাঁউরুটি তৈরি করত এব্রাহাম আঙ্কল—এ পাড়ায় সকলেই ছিল তার খদ্দের। স্কুল থেকে ফেরার রাস্তায় প্রায়ই আগুনের ভাপ লাগা কাঁচা ময়দার মিষ্টি গন্ধ পেত ওরা, গন্ধের লোভেই মন্থর হয়ে আসত পা। ক্রিসমাসের দিন সকালে বেকারিতে গেলে সান্তা ক্লজ-এর মুখের ছাপ-মারা পেস্ট্রি খাওয়াত এব্রাহাম আঙ্কল। কত বছর আগে? অদ্রির কি মনে পড়ে কিছু?

সেই অদ্ভুত মানুষটি

অদ্রি বলল, 'আমি আর তুই যখন খুঁজে খুঁজে হন্যে, কোনও ফলকেই ডোমিনিক পাইবাস নামের কাউকে পাচ্ছি না—সেই সময় কোদাল কাঁধে একটা আধবুড়ো লোক এসে দাঁড়িয়েছিল আমাদের সামনে। একমাথা কাঁচাপাকা চুল, মুখভর্তি দাড়ি, খালি গা, বাঁকানো নাক আর কোটরে ঢোকা দুটি চোখ। লোকটা জিজ্ঞেস করল, কী খুঁজছ তোমরা? তুই কি? হ্যাঁ, তুই-ই, আমি নয়—তুই বেশ সাহসী ছিলি—বললি, গ্র্যান্ড পা'র সমাধি খুঁজছি। লোকটা খুব হাসতে লাগল আমাদের দিকে তাকিয়ে। তারপর বলল, ঈশ্বর যাঁকে গ্রহণ করেছেন

তাঁকে তোমরা খুঁজে বেড়াচ্ছ কেন।

অদ্রি এমন ভাবে বলছিল যেন সেই দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখনও।

রোজালিন বলল, 'কী বলছিস আজেবাজে গল্প!'

'তোর আজেবাজে মনে হচ্ছে?'

অদ্রি তাকিয়ে থাকল দূরে। দৃষ্টি না ফিরিয়েই একটু পরে বলল, 'কাল রাত্রে আমি সেই লোকটাকে স্বপ্ন দেখেছি। একই রকম চেহারা। কোদাল চালিয়ে গর্ত খুঁড়ছে। খুব বড় একটা গর্ত—একটা কফিন ঢুকে যেতে পারে। ঘুম ভেঙে গেল। তারপর আর ঘুমোতে পারিনি। যা হয় আর কি, নানা বদ চিন্তা ঘুরতে লাগল মাথায়। কিন্তু—'; দম নিয়ে বলল অদ্রি, 'শেষ পর্যন্ত যেটা ভাবলাম, এই যে ড্যাড বা মমের কাছে আসি আমি, কিংবা তোদের সঙ্গে দেখা হয়—এর কোনও মানে হয় না। এই পৃথিবীতে যখন আমরা থাকব না, তখনও তোরা একসঙ্গে থাকবি। মানে মাটির নীচে। কিন্তু, আমি তোদের সঙ্গে থাকব না।'

গলার স্বর জড়িয়ে গিয়েছিল অদ্রির। কথা শেষ হবার পরেও বলার আবেগে ওঠানামা করছিল ওর কণ্ঠনালী।

আড়ে তাকিয়ে ওর মুখ দেখল রোজালিন। কী বলবে সে। দিনের পর দিন নিজের চারপাশের নির্জনতা অনুভব করতে করতে আজই হয়তো প্রখর হয়ে উঠেছে ওর অনুভূতি, স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে অভিজ্ঞতা। বড় ভাবনা হয় দলছাড়া এই মেয়েটাকে নিয়ে। এমন কি হতে পারে যে, নিজেকে নিয়ে ক্লান্ত হতে হতে এখন ও মৃত্যুরই কথা ভাবছে!

'স্বপ্ন স্বপ্নই।' ট্রাম লাইনের ওপর ঝিলিক দিচ্ছে রোদ্দুর। দেখতে দেখতে রোজালিন বলল, 'কিছু হবার পর কে কোথায় যাচ্ছে কে তা ভাবে!'

অদ্রি জবাব দিল না। ওয়েলেসলির দিক থেকে একটা ট্রাম আসতে দেখা যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে থাকল খানিক। তারপর বলল, 'রোজি, চাকরির বাজার এখন কেমন?'

'চাকরি! করবি?'

'পেলে তবে তো! পেলে বেঁচে যেতাম।' নিজের মনেই হাসল অদ্রি, 'ছেলেটাকে দেখেছিস তো। জ্বালাতন পর্যন্ত করে না! কী করে সময় কাটে বল?'

ট্রাম এসে পড়েছিল। এগোতে এগোতে অদ্রি বলল, 'খোঁজ পেলে জানাস তো।'

একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল রোজালিন। এটা অফিস, তবু ভাবনার মধ্যে সে তখনও দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তায়, একা। ট্রামের বেয়াদপ ঘটাং-ঘট শব্দটা ঠোকাঠুকি করছিল মাথায়।

অপ্রত্যাশিতের আবির্ভাব

একটা টেলিফোন এল। রিসিভার তুলে মিস লাহিড়ী বলল, 'রোজালিন, তোমার—'

নিজের টেবিলের কানেকশান তুলে কথা বলবার আগে একটু সময় নিল রোজালিন।

'মিসেস পিয়ার্স—'

'রোজি, ইট্‌স মাইকেল।'

মাইকেল। মাইকেল কেন। কবজি তুলে সময় দেখল, প্রায় সাড়ে বারোটা। অনেকটা সময় গেছে ইতিমধ্যে। খেয়াল করেনি। নিজেকে এখনও জড়তামুক্ত করতে পারল না রোজালিন। কানে রিসিভার ছুঁইয়ে বসে থাকল চুপচাপ।

'রোজি, ইউ জাস্ট লিসিন টু হোয়াট আই সে।' মাইকেলের গলা ভারী, থেমে থেমে, সময় নিয়ে উচ্চারণ করছে শব্দগুলো। বলল, 'আমি তোমার অফিসের নীচে আসছি। মিনিট দশেকের মধ্যে। তুমি প্যাক করে নেমে এসো।'

'প্লিজ, মাইকেল। কী হয়েছে বলবে তো।'

'দেখা হলে বলব।'

ফোন ছেড়ে দিল মাইকেল।

খানিক হতভম্ব হয়ে থাকল রোজালিন। নড়তে পারল না। শীতল জ্বালার মতো একটা কম্পন শুরু হয়েছে শরীরে। নিজেকে মনে হচ্ছে প্রোথিত।

হঠাৎ মনে হল, সময় চলে যাচ্ছে। মাইকেল যেটুকু সময় দিয়েছে তারও কিছুটা চলে গেছে ইতিমধ্যে। তখন উঠে দাঁড়িয়ে ঝটপট নিজেকে গুছিয়ে নিল সে। মার্গারেটকে বলল, 'সরি, ম্যাগি। আমাকে চলে যেতে হচ্ছে—। সরি, স্বপ্না।'

আদ্যন্ত আচ্ছন্ন, লিফটের জন্যে অপেক্ষা না করে সিঁড়ি ধরল রোজালিন; দ্রুত নেমে এল নীচে। মাইকেলের কণ্ঠস্বরই একটা নিশ্চিত ধারণার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল তাকে; এই মুহূর্তে অন্য কিছু ভাবল না।

কে হতে পারে। শরীরময় উদ্গত আবেগ প্রশমিত করতে করতে রোজালিন ভাবল, অড্রি কি? না, অড্রি নয়—অড্রি হতে পারে না। তাহলে কি আর্থার? ডরোথি? না, ডরোথিও হবে না। মাইকেলের জন্যে অপেক্ষা করতে করতেই অনিশ্চয়তা থেকে ক্রমশ একটা স্পষ্টতায় পৌঁছে গেল সে—আর্থার, নিশ্চয়ই আর্থার।

মাইকেল এসে পড়ল কিছুক্ষণের মধ্যে। সঙ্গে গাড়ি এনেছে। সম্ভবত অফিসের গাড়ি। দরজা খুলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে এসে বলল, 'এসো। গাড়িতে ওঠো। একটা খারাপ খবর আছে—'

নিজেকে যতটা সম্ভব সংযত রেখে গাড়িতে উঠল রোজালিন। চাপা, সন্ত্রস্ত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'হু ইজ ইট। ড্যাড?'

'ড্যাড!' মাইকেলের ঠোঁটে রেখা ফুটল। হাসি কিংবা বিস্ময়ের। ড্রাইভারকে নিজের বাড়ির দিকে যাবার নির্দেশ দিয়ে তাকাল রোজালিনের মুখে। তারপর নিঃশ্বাস নিয়ে বলল, 'ইউ নো—রবার্ট—আই মিন সারা'জ ব্রাদার—। রবার্ট ফোন করেছিল সিডনি থেকে—'

বলতে বলতেই থেমে গেল মাইকেল। আবার নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'সারা মারা গেছে। ক্রিসমাসের দিন রাতে আত্মহত্যা করেছে ও—'

রোজালিন আগেই ভাঙতে শুরু করেছিল, এখন আরও ভাঙবে। ওকে যথেচ্ছ হবার সুযোগ দিল মাইকেল।

৬

এই ঘটনার দু' মাস আঠাশ দিন পরে আকস্মিক হৃদরোগে মৃত্যু হয় আর্থার পাইবাসের। একেবারে অনাড়ম্বর মৃত্যু, ঘুমের মধ্যে।

এর আগে পাইবাস পরিবারে কাউকে মরতে দ্যাখেনি রোজালিন। ভোরবেলা শিশি-বোতলঅলার মুখে খবর পেয়ে মাইকেল আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে রিপন স্ট্রিটে আর্থার পাইবাসের বাড়ির সামনে এসে নিস্তব্ধ বাড়িটার দিকে তাকিয়ে একটু খটকা লাগল তার। চারদিকে কোথাও কেউ নেই; এত ফাঁকা ও জনশূন্য যে বিশ্বাসই হয় না। তারপরই অবশ্য মনে হয়, কে থাকবে!

সিঁড়ির দরজাটা খোলা ছিল। আস্তে আস্তে ওপরে উঠে এল ওরা। দেখল, বিছানার পাশে ডরোথি বসে আছে চুপচাপ, তার পাশে আরও চুপচাপ মিসেস অলিভার। উলটোদিকের বাড়ির জানালায় কখনও-সখনও চোখে পড়লেও রোজালিন মনে করতে পারল না শেষ কবে এ বাড়িতে দেখেছে বৃদ্ধাকে। ও আর্থারকেই দেখতে লাগল।

মৃত্যুর স্মৃতি বলতে রোজালিনের মনে আর কিছুই নেই।

এর কিছুদিন পরে রবিন আর স্যামুয়েল এসে ডরোথিকেও নিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়ায়।

ডোনাল্ডের প্রশ্ন

রিপন স্ট্রিটে আর তাদের যাবার দরকার হয় না। তবু, একলা মনে হঠাৎ কখনও আর্থারের মৃত্যুদৃশ্য ভেসে উঠলে আরও একটা দৃশ্য মনে পড়ে যায় রোজালিনের। মনে পড়ে ডোনাল্ডের মুখ।

সেদিন আর্থারের ঘর থেকে কখন যে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিল ডোনাল্ড খেয়াল করেনি রোজালিন। খুঁজতে খুঁজতে শেষ পর্যন্ত বাড়ির পরিত্যক্ত পিছন দিকটায় পাওয়া গেল তাকে—মাঝখান থেকে ওপরের দিকে ভেঙে-পড়া ঘোরানো লোহার সিঁড়ির ধাপে বসে আছে একা। আর্থারের সঙ্গে ওরই ভাব ছিল বেশি। সম্ভবত মৃত্যু কি বুঝতে পারেনি এখনও।

'তুমি এখানে কেন!' রোজালিন বলল, 'চলো, আমরা ওপরে যাই—'

ডোনাল্ড তবু নড়ল না। বিস্মিত রোজালিনের মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'টেল মি, ওয়াজ আর্থার আ রিয়্যাল সোলজার?'

'হি ওয়াজ।' রোজালিন প্রশ্নটা বুঝতে পারেনি ঠিকঠাক। বলল, 'কেন!'

ডোনাল্ড কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'আর্থার বলত, সত্যিকারের সোলজাররা মরে গেলে স্যালুট পায়—অনেক লোক থাকে তার পাশে। হি লুকস ব্রেভ। কিন্তু, আর্থারকে এত সাধারণ দেখাচ্ছে কেন!'

রোজালিন জবাব দিতে পারেনি সেদিন। আজও সে জানে না, কেন এমন সাধারণ হয়ে গেল আর্থার।

দিন কেটে যায়।

একদিন অফিসে বেরুবার আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল ব্রাশ করতে করতে হাত থেমে গেল রোজালিনের। কপালের ডান দিকে চুলের গোড়ায় চিকচিক করছে রুপোলি রেখা। খুঁজে খুঁজে তিনটি পাকা চুল বের করে আনল সে। বিশেষ কিছু মনে হল না।

মাইকেলের চোখ খবরের কাগজে। পিছন থেকে ওকে দেখতে দেখতে রোজালিন বলল, 'দ্যাখো, কী হয়েছে!'

'কী হয়েছে!' না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করল মাইকেল।

'বোধহয় বুড়ো হয়ে যাচ্ছি! স্টার্টেড গ্রেইং!'

'ইউ আর নট এলিজাবেথ টেলর। আর ইউ? চিরকাল খুকি থাকবে না কি!' মাইকেল ঠাট্টা করল। তারপর বলল, 'ডেইজিই বড় হয়ে গেল কত! ডোনাল্ডও। এবার ওকে ছ'সাইজের জুতো কিনে দিতে হয়েছে।'

রোজালিন একটা নিঃশ্বাস চাপল এবং ভাবল, এইরকমই হয়। আরও কয়েক বছর পরে সে কি ক্রমশ ডরোথির চেহারা পাবে? ভাবল, অড্রিও চেষ্টা করছে, শেষ পর্যন্ত ও-ও কি চলে যাবে অস্ট্রেলিয়ায়?

স্মৃতিই অন্যমনস্ক করে রাখে।

তখন আরও একটা কথা মনে হয় রোজালিনের। জানত না বলেই সেদিন সে ডোনাল্ডের প্রশ্নের জবাব দিতে পারেনি। আজও জানে না। তবে ডোনাল্ড বড় হচ্ছে; হাবভাব ভঙ্গিতে এরই মধ্যে এসে গেছে এক ধরনের গভীরতা। আরও বড় হতে হতে হয়তো নিজেই একদিন উত্তরটা খুঁজে পাবে সে।

ঢেউ

উৎসর্গ:
প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা
শ্রীচরণেষু

১

এরকম হয় কখনও, বৃষ্টিঝরা আকাশের দিকে তাকালেও হঠাৎ ধাঁধা লাগে চোখে, মনে হয় বৃষ্টি নয়, রোদ্দুরই ঢুকে পড়েছে চোখে। তখন থমকে দাঁড়াতে হয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টির আর্দ্রতা ঘন চুলের মধ্যে দিয়ে অনুভূতিতে পৌঁছুতে সময় নেয়, তারও আগে স্পর্শ টের পায় কপাল, ঘাড়ের আশপাশ, কাঁধে বিস্তৃত জামার অংশ এবং হাত দুটি। ইচ্ছে করে চোখ তুলে তাকাতে, ইচ্ছে করে ভিজতে। অনেকটা তেমনি, কিছু বা অন্যমনস্ক ফুটপাথে নেমে একই ইচ্ছেয় জড়িয়ে গেল অপূর্ব।

কলকাতা। পার্ক স্ট্রিট। বেলা বারোটা হবে। ঘড়ি না দেখেও সময় আন্দাজ করা যায়। অপরেশ গুপ্ত'র চেম্বারে ঢুকেছিল সাড়ে এগারোটা নাগাদ। তার হাত থেকে রেজিগনেশনের চিঠিটা নিয়ে পড়তে পড়তেই বাজার টিপে বেয়ারা ডেকেছিল অপরেশ। এরপর কফি আসে। অপূর্ব না করেনি। জানত, এটা শুধুই দেওয়া নেওয়ার ব্যাপার হবে না। চিঠিটা ড্রাফ্‌ট্ করতে তার যতটা সময় লেগেছে, ঠিকঠাক শব্দ দিয়ে স্পর্শ করতে হয়েছে ভিতরের রাগ, অভিমান, জ্বালা এবং অবশ্যই অপমান, সেটা নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে সময় লাগবে না অপরেশের তা হয় নাকি! তবে অপরেশের ঠোঁটের চাপা হাসিটা ভাল লাগেনি অপূর্বর। নাক-উঁচু, যেন অনেক উঁচু থেকে দেখছে তাকে। ভেবেছিল, তার রেজিগনেশন দেওয়ার ব্যাপারটাকে আদৌ কোনও গুরুত্ব দিচ্ছে না অপরেশ।

অপূর্ব অপেক্ষা করতে লাগল। চুপচাপ, যদিও ক্বচিৎ দাঁতে আঙুলের নখ কাটার অভ্যাস থেকে নিরস্ত হয়নি। অপরেশের চেম্বার তার অচেনা নয়। কিন্তু, বেশ কিছুদিন পরে ভিতরে ঢুকে মনে হল লে-আউট পাল্টেছে ইতিমধ্যে। ডানদিকের দেয়ালের অয়েল পেন্টিংয়ে চক্ষুহীন নারীমূর্তি। সিঁদুরে ব্যবহৃত রঙে বিবাহের চেয়ে বেশি বেশি ভাঙার সঙ্কেত, কিংবা হঠাৎ ঝড়ের, কখনও যেমন দেখা যায় আকাশে। চোখ থাকলে সীতা বলে ভাবা যেত। অপূর্ব নতুনই দেখছে। আগে কী ছিল মনে করার চেষ্টায় চোখ সরে গেল ব্লাইন্ড-বসানো জানলার পর্দায়। একই রঙ সেখানেও। পাশের দেয়ালে রোজ-উডের বুক সেল্‌ফ্ উঠে গেছে প্রায় সাত ফুট উচ্চতায়। মাঝখানে টি-ভি বসানো। দুই দেয়ালের সংযোজক র‍্যাকের ওপর ফুলদানিতে তিনটি অসমান পাতার সাহচর্য থেকে মুখ তুলেছে একটিই গোলাপ। রঙটা আনইউজুয়াল। ঠিক কী রঙ চিনে ওঠবার আগে চোখ আটকে গেল ওরই নীচে ফ্রেম-করা বোর্ডে—'আই নো ইউ আর রাইট, বাট আর ইউ সিওর ইউ হ্যাভ আ পয়েন্ট টু মেক?' ঝকঝকে টাইমস রোমানে ছাপা কথাগুলো অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। একেবারে উল্টোদিকের দেয়ালে লাগানো এয়ার কন্ডিশনারের একটানা মৃদু শব্দ ছাড়া এই মুহূর্তে, অপরেশের

ওপ্রান্তে আর কোনও শব্দ ছিল না।

অপরেশ মুখ তুলল এবং সোজাসুজি তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ডিসিসন নিয়েই ফেলেছ?'

'না নিলে দিতাম না।'

'এটা ইমপালসিভ হতে পারে। আই মিন—'

অপরেশ নিজেই থামল, নাকি এই সময় ট্রে-তে কফি নিয়ে বেয়ারা ঢুকল বলে, বোঝা গেল না। লোকটিকে বেরিয়ে যাবার সময় দিল। তারপর ঘষা কাচের জানলার মেঘাচ্ছন্নতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এনিওয়ে, হ্যাভ ইওর কফি—'

আত্মরক্ষার মধ্যেই আক্রমণ সাজিয়ে রাখে অপরেশ। এরকম আগেও হয়েছে, অপূর্ব জানে কার গুটি কোনদিকে হাঁটবে আগেভাগেই তা টের পেয়ে যায় অপরেশ। সেইখানে পৌঁছে অপেক্ষা করে। লক্ষ করে এবং ভাবে। আর, ফ্রেমের কথাগুলো যেহেতু ওর নিজের জন্যে নয়, সুতরাং, অপূর্ব ভাবল, তাকেই সতর্ক হতে হবে।

কৃতী শোম্যান বলতে যা বোঝায় অপরেশ তাই। অক্সফোর্ডে পড়াশোনা করেছিল এবং দুরন্ত কায়দায় ইংরিজি বলে বলেই নয়; ঈষৎ মোটা গড়নের, মাঝারি উচ্চতার এবং গোলমুখের ফর্সা এই লোকটির চোখ মুখ ব্যবহারে এক ধরনের ঔজ্জ্বল্য আছে যাকে ব্যক্তিত্ব বলে ভুল করা যায়। টাকমাথা লোকদের সম্পর্কে সামান্য অ্যালার্জি আছে অপূর্বর—সম্ভবত নিজের বাবাকে দেখে, কিন্তু অপরেশকে দেখে মনে হয় মাথার চকচকে টাকই ব্যক্তিত্ব দিয়েছে ওকে। কাজেও পটু। বছর পাঁচ-ছয় আগে যখন গিলবার্ট মরিসন হিকস-এর চাকরি ছেড়ে নিজেই খুলে ফেলল অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, তখন ছোটখাট একটা আলোড়ন উঠেছিল বাজারে; কেউই ভাবতে পারেনি সাফল্যকে এমন ছকে বেঁধে ফেলবে অপরেশ, এত তাড়াতাড়ি; অ্যাকশন গ্রুপ অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং অ্যাসোসিয়েটস এমনকী গিলবার্ট মরিসনের কাছেও হয়ে উঠবে পজিটিভ থ্রেট। কুড়ি লাখ দিয়ে শুরু করে পাঁচ বছরে পৌঁছেছে দেড় কোটিতে। অফিস খুলেছে দিল্লিতে, ব্যাঙ্গালোরেও খুলবে। এ বছরের টার্গেট দুই কুড়ি। ব্যাপারটা জলভাত। শুধু অপূর্ব নয়, অ্যাকশন গ্রুপের চুয়াল্লিশ জন কর্মচারীও জানে সেটা। অপূর্বর হঠাৎ মনে পড়ল সংখ্যাটা লাস্ট রিক্রুট সীতা চৌধুরীকে নিয়ে চুয়াল্লিশ নয়, পঁয়তাল্লিশ—রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্টেড হলে আবার চুয়াল্লিশে দাঁড়াবে। সীতা অবশ্য এখনও রহস্য, সে ঠিক জানে না, তাকে রিক্রুট বলা যাবে কি না।

অপরেশ বলল, 'সীতা সম্পর্কে তোমার রিঅ্যাকশনের কথা আমি জানি। ব্যাপারটা ঠিক হয়ে যেত. তার জন্যে এই রেজিগনেশনের দরকার ছিল না—'

'ছিল কি ছিল না, বুঝতেই পারছেন, আমি বুঝব। বিকজ ইট ইনভলভড মি।' অপূর্ব স্পষ্ট হতে চাইল, 'আমার লেখা কপি ক্লায়েন্টের পছন্দ না হলে আই ক্যান ডু দ্যাট অ্যাগেন। বাট সি ওয়াজ ইনকরিজিবল, যে-ভাষা উনি ব্যবহার করেছেন—। আই কান্ট অ্যাকসেপ্ট ইনসালটস লাইক দিস।'

'আই নো, আই নো। আই নো ইউ আর রাইট। সো আর ইওর রিঅ্যাকশনস। অপমান লাগতেই পারে। কিন্তু, সেজন্যে রেজিগনেশন দিতে হবে কেন। সীতা এই এজেন্সিতে নতুন। কিন্তু তুমি তো প্রায় গোড়া থেকেই আছ। তাই না।'

এটাই অপরেশের ধরন। রাগ-টাগ থাকলে জল ঢেলে দাও প্রথমেই, ট্যাপসাকে বলো

সুন্দর। কাম ব্যাক টু জিরো। এসব মুহূর্তে পরবর্তী চাল কী হবে ধরা যায় না। অপূর্বও পারল না।

'তোমাকে আমিই এনেছিলাম। ইউ আর ইয়াং, ইউ হ্যাভ আ ফিউচার হিয়ার।' অপরেশ বলল, 'এগুলো ভেবে দেখা উচিত।'

সোজাসুজি অপরেশের মুখের দিকে তাকাল অপূর্ব। যেমন দেখেছিল, তেমনিই, মুখে ব্যক্তিত্বের আড়াল। অন্য কোনও তারতম্য নেই। কপালের ওপর দিকে একটি আলগা চুল, সাদা; সিলিংয়ের কৌণিক আলোয় দেখার ভুলও হতে পারে। অপরেশের বক্তব্য মেনে নিলে এরপর যা ঘটবে তা প্রত্যাশিত। রেজিগনেশনের চিঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে আসবে অপূর্ব। একটি উত্তেজক ও সম্ভাবনাময় ঘটনার যাকে বলে ভ্যাদভেদে পরিণতি।। এরপর, কাল কিংবা পরশু, কোনও কারণে দেখা করতে চাইলে হয়তো বলবে, নিশ্চয়ই আবার রিজাইন করতে চাইছ না।

এই ভাবনাই চাবুক মারল পিঠে। নিজেকে টান করে অপূর্ব বলল, 'আমি মনঃস্থির করে ফেলেছি। মিসেস চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অ্যান্ড আই বিলিভ সি ইজ মোর ইমপর্ট্যান্ট টু ইউ?'

অপরেশ হাসল, ঠোঁটের কোণে। এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম।

'উত্তর চাও?'

অপূর্ব চুপ করে থাকল।

'আমার মনে হয় তুমি ঠিকই বলেছ। আমি না চাইলেও অ্যাকশন গ্রুপে সীতাকে প্রয়োজন আছে। অ্যাট লিস্ট ফর সাম টাইম—'

তার মানে এও হতে পারে, 'তোমার চেয়ে বেশি।' কথাগুলোর ভিতরের অর্থ অপূর্বকে বোঝাল আপসের রাস্তা নেই। আত্মসম্মানের কথা ভাবলে, ফেরাও। কাকে দরকার, কাকে ততটা নয়, তা নিয়ে সারাক্ষণ কমপিউটার চালাচ্ছে অপরেশ। জানে বলেই জানাতে দ্বিধা করল না।

'আমার রিকোয়েস্ট, এটা আপনি অ্যাকসেপ্ট করে নিন।'

সামান্য নড়ে উঠল অপরেশ। টেবিলে কাচের নীচে পিকাসোর পোস্টকার্ড, সেদিকে তাকিয়ে থাকল খানিক। তারপর মুখ তুলে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি অন্য কোথাও অফার পেয়েছ?'

'না। এখনও নয়। তবে—', গায়ের জোরে অপূর্ব বলল, 'অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে। এটা থাক আমার কাছে। ভাবো। তিনদিন পরে জানিও আমাকে। আমার বিশ্বাস এটা তোমাকে ফেরত দিতে পারব।'

অপূর্ব উঠে দাঁড়িয়েছিল। অপরেশও। কার্পেটে শব্দ হয় না। অপূর্ব প্রায় দরজার কাছে পৌঁছুবার পর অপরেশ বলল, 'আই থিংক ইউ নিড টাইম টু রিল্যাক্স। অ্যান্ড থিংক। দু দিন ছুটি নিতে পারো।'

'এখন চলে যেতে পারি?'

'এখনই।' কব্জিতে চোখ বোলাল অপরেশ। হেসে বলল, 'জরুরি কিছু না থাকলে ইয়েস। আর এই ঘটনার কথা কেউ জানে না—আমিও না—'

আধঘন্টার স্মৃতি পেরোতে আধ মিনিটও লাগে না। অপরেশ তাকে রিল্যাক্সড হতে

বলেছিল। তার পরিবর্তে ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে প্রায় উদ্দেশ্যহীন যে অনুভূতি এল তার নাম শূন্যতা। বস্তুত, অপূর্বর মনে হল, এই মুহূর্তে মন তাকে অতীতে যেতে দিচ্ছে না, ভবিষ্যতেও না। মুখেও নিশ্চয়ই ছাপ পড়েছে এই অনিশ্চয়তার। এই মুহূর্তে হঠাৎ কেউ যদি তার দিকে তাকায় তাহলে কী ভাববে? নিঃসঙ্গ? অপমানিত? কর্মচ্যুত? ভবিষ্যৎহীন? কিংবা, সত্যি, এরকম কোনও ধারণাও কি সে সৃষ্টি করতে পারছে?

অপূর্ব চোখ তুলে তাকাল। প্রথমে সামনে, তারপর আশপাশে, পিছনে। থেমে দাঁড়াল একটু। আকাশ দেখতে গিয়ে কপাল, নাক ও চোখের পাতায় নেমে এল বৃষ্টি। হর্ন ফেঁসে-যাওয়া কোনও গাড়ির একটানা আওয়াজে চিড় খাচ্ছে স্তব্ধতা। আবার হঠাৎই থেমে যেতে ফিরে এল অন্যান্য শব্দ। প্রায়ই দেখা বেলা বারোটার পার্ক স্ট্রিটের চেহারা এখন অন্যরকম। রাস্তায় প্রাইভেট গাড়ি কিংবা ট্যাক্সির যাতায়াত থাকলেও লোকজন কম। আধভেজা ধুলোর গন্ধে মিশেছে অবর্ষিত মেঘের গন্ধ। চাকার দাগ অসমান ছাপ ফেলে যাচ্ছে রাস্তায়। পাশাপাশি বই, চশমা ও ফোটোগ্রাফির দোকানের সামনে জড়ো হয়ে বৃষ্টি বাঁচাচ্ছে একদল লোক। ন্যাড়ামাথা দুই 'হরেকৃষ্ণ' মার্কা বিদেশি ঠিকানা খুঁজছে সাইনবোর্ডে। টায়ারের বিশাল হোর্ডিংয়ের নীচে নির্বিকার দাঁড়িয়ে আছে এক ভিখারি; তার বাঁদিকের হাঁটুর নীচে থেকে ট্রাউজার্সের পা নেই, বগলে রোল-করা, সম্ভবত, খবরের কাগজ। উন্মাদও হতে পারে। উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে জেব্রা ক্রশিং ধরে ছুটে এল এক যুবতী—চমৎকার মুখ তার, রঙে ও শরীরের গড়নে বৃষ্টি এনে দিয়েছে সদ্যোজাত স্নিগ্ধতা। যুবতী তাকে পেরিয়ে ঠেসে গেল ফোটোগ্রাফির দোকানে। যারা জড়ো হয়েছিল তারা জায়গা করে দিল; অপূর্বর দৃষ্টি যুবতীকে অনুসরণ করল এবং দেখল, তার সাদা হাতের ছন্দোময় আলোড়নে খুলে যাচ্ছে কাচের দরজা, তাকে দেখে ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে উঠল কাউন্টারের গম্ভীর-মুখ মধ্যবয়সী লোকটি; ঘাড় থেকে চমৎকার নামা খোঁপা ও খয়েরি পিঠের নীচে কোমরের চার ইঞ্চি বেড়ে সেই একই রঙ, একই মাংসের সুষমা।

হতে পারে কিছু লোক ওই যুবতীর মতোই শান্ত, পরিতৃপ্ত ও দুশ্চিন্তাহীন। অপূর্ব যে দীর্ঘশ্বাস ফেলল তা ওই যুবতীর জন্যেই নয়। আবার নিঃশ্বাস নিয়ে ভাবল, মানুষও দ্রব্য কিংবা প্রোডাক্ট, মানুষেরও আছে উপযোগিতা এবং টিকে থাকার সময়সীমা। সুতরাং, ওকে পাবার জন্যে কেউ না কেউ দাম দেবে; ওকে স্পর্শ করার, চুম্বন করার, ওর মাংসের স্বাদে ও সৌন্দর্যে সঞ্জীবিত হবার জন্যেই ভাগ্যবান হবে সে। ইত্যাদি চিন্তায়, হাঁটতে হাঁটতে, একটি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে দিল অপূর্ব। কুকুরটি হঠাৎই তারস্বর হওয়ায় সচকিত হল এবং পাশ কাটিয়ে এল, দ্রুত। মোড়ে দাঁড়িয়ে সে যখন রাস্তা পার হবার কথা ভাবছে তখন দেখল সে যেদিক থেকে এল সেদিকেই ছুটে যাচ্ছে একটি সাদা অ্যামবাসাডর। দূর থেকে যতটা দেখা যায় তাতে পিছনের সিটে বসা সীতা চৌধুরীকে চিনতে ভুল হল না। অস্পষ্ট একটা শব্দ বেরুল মুখ দিয়ে, যদিও সে জানত না ঠিক কী বলতে চেয়েছিল। চোয়ালে কাঠিন্য। অপরেশের সঙ্গে যেরকমই কথাবার্তা হোক না কেন, অপূর্ব না ভেবে পারল না, আসলে এই যে সে ফুটপাথে এসে দাঁড়িয়েছে থাকা এবং না-থাকার সম্ভাবনায়, তার জন্যে দায়ী ওই মহিলা। মহিলা? আর কোনও ক্লাসিফিকেশন কি আছে এই না-বুঝতে-পারা বয়স ও রহস্যের মেয়েদের জন্যে। ইংরিজিতে উয়োম্যান বলতে যেমন নন-পজিটিভ পজিটিভ কিছু বোঝায়। শৌনিক বলতে পারে, ও এখনও কবিতা লেখে মাঝে মাঝে। মনে পড়ল, মাস

চার-পাঁচ আগে অপরেশ যেদিন তাকে নিজের চেম্বারে ডেকে পরিচয় করিয়ে দিল সীতার সঙ্গে, সেদিন সে নড়তে পারেনি। সীতার চুম্বকে একরকম গেঁথে রাখা ছিল, অপূর্ব বুঝতে পারেনি আকর্ষণটা ঠিক কোথায়। সীতার সৌন্দর্যে? আহ্লাদিত যৌবনে? নাকি ওর ঝকঝকে দাঁতের হাসিতে, ঈষৎ খসখসে কিন্তু এলানো কণ্ঠস্বরে, চোখের চাহনিতে, কিংবা, এর সমস্তই মেলানো এক আড়াল-করা ব্যক্তিত্বে, প্রথম দেখায় যা, হয়তো, যে-কোনও পুরুষকেই ধাক্কা দেবে। সে জানে না, জানতেও পারেনি। অবশ্য ক্রমশ বুঝতে পারছিল তার আপাতদৃষ্ট সহজ ভাবভঙ্গি দিয়ে সীতা যা করতে চায় তার পিছনে আর কোনও উদ্দেশ্যও থাকতে পারে। অপরেশ কী ভাবে জানা যায়নি। আজ অবশ্য বুঝিয়েই দিল এই এজেন্সিতে, অ্যাকশন গ্রুপে সীতাকেই দরকার।

অপূর্ব বিষণ্ণ বোধ করল। ছোট, বড় ছোট লাগছে নিজেকে। এখন আর খাপছাড়া নয়। বৃষ্টিতে জোর আসতেই দ্রুত হেঁটে সামনের রেস্তোরাঁয় ঢুকে পড়ল সে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লাঞ্চ টাইমের ভিড় শুরু হবে, তার আগে এই জায়গা খুঁজে পাওয়া মন্দের ভাল। আকাশের ঘোর দেখে মনে হয় এই বৃষ্টি সহজে থামবে না।

বৃষ্টির জন্যেই সম্ভবত তিন চারটে টেবিল এখনও খালি। সেগুলি এড়িয়ে সে এগিয়ে গেল কাচের দেয়ালের পাশে রাস্তার দিকের টেবিলগুলোর একটির দিকে। এক পাজামা-পাঞ্জাবি পরিহিত ভদ্রলোক কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে একটি বিদেশি ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল, সেই একই টেবিলে অপূর্বও গিয়ে বসতে ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ চোখে গোটা রেস্তোরাঁর চারিদিকে চোখ বুলিয়ে সামান্য অস্বস্তি নিয়ে তাকাল অপূর্বর দিকে। 'সাইট অ্যান্ড সাউন্ড', এবার ম্যাগাজিনটার নাম পড়তে পারল সে এবং অনুমান করল লোকটি ফিলমের সঙ্গে যুক্ত, ফিলম ক্রিটিকও হতে পারে। হয়তো কারুর জন্যে অপেক্ষা করছে, হয়তো যে আসবে সে অপূর্ব এখন যেখানে সেইখানেই বসত। ক'দিন আগে, এখানে নয়, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কফি হাউসে, সেদিন শৌনিক ছিল সঙ্গে, প্রায় এইরকম একটি লোককে দেখেছিল চেয়ার আগলে বসে থাকত। তারপর একটি অপরিণত মুখের বড় মেয়ে এসে বসল তার সামনে। লোকটি নিজের জন্যে কফির অর্ডার দিলেও মেয়েটির জন্যে পাকৌড়া, রুটি-মাখন, ওমলেট ইত্যাদির অর্ডার দিল এবং মেয়েটি তার বড় হাঁ-এর মধ্যে কাঁটার পরিবর্তে হাত দিয়ে খাবারগুলো দ্রুত সাঁটাতে শুরু করলে লোকটি ঝুঁকে তার সঙ্গে কী আলাপ চালায় বোঝা যায় না। তখন, কী কথায় শৌনিক বলল, খাইয়ে দাইয়ে তৈরি করে নিচ্ছে, কিন্তু লোকটার খিদে আরও বেশি। এবার মেয়েটাকে খাবে। বুঝলে, তারপর আবার ওরা আসবে এখানে, অন্য জামা পরে, অন্য শাড়ি পরে। রোগ? না রূপকথা? শৌনিক এইভাবেই বলে। তবে, এই লোকটির দৃষ্টি দেখে অপূর্বর মনে হল, কিছু লোক থাকে যারা পৃথিবীটাকে অধিকার করে বসে থাকতে চায়, হতে পারে সেইরকমই একজন। এমনও হতে পারে তার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। বাস্তব বলে সে নিজে কারও জন্যে অপেক্ষা করছে না, লোকটিকে কোনও ভাবে বিরক্ত করাও তার উদ্দেশ্য নয়। এই জায়গাটিতে সে এসে বসেছে শুধুই রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকার জন্যে। দেয়ালের কাচের ভিতর দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখল বৃষ্টি নেমেছে বড় বড় ফোঁটায়, ফোঁটাগুলো একাকার হয়ে গেল মুষলধারায়, মাঝেমধ্যের হাওয়ার ঝাপটায় ব্যালে ড্যান্সারের পা ছোড়ার তৎপরতা; পর পর, একই ধরনে, সেই ভঙ্গি এগিয়ে যাচ্ছে চৌরঙ্গির দিকে। বেয়ারা অর্ডার নিতে এলে অন্যমনস্ক,

প্রথমে চা বলল অপূর্ব; তার পরেই মনে হল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই মনোজ ও রাধাকৃষ্ণের সঙ্গে লাঞ্চে যেরুত সে, সম্ভবত কোনও সাউথ ইন্ডিয়ান রেস্তোরাঁয়, সে ধোসা পছন্দ করে, গতকাল লাঞ্চে বিয়াত্রিচে তাদের হ্যাম স্যান্ডউইচ খাইয়েছিল, কিন্তু আজ সে রিল্যাক্স হবার জন্যে একা। দ্বিতীয় চিন্তায় বিন অন টোস্ট অর্ডার দিল সে।

কাজটা কি ঠিক হল? জানে না। প্রশ্নই পৌঁছে দিচ্ছে দ্বিধায়।

অপরেশকে অবশ্য বিশ্বাস করা যায়। তিনদিন সময় দিয়েছে, এমনকী বলল রেজিগনেশন দেওয়ার ব্যাপারটা যেন আর কেউ না জানে। যদি এমন হয় যে সে আজই—, না, আজ নয়, হতে পারে কাল, দুঃখ প্রকাশ করে ফেরত নেয় চিঠিটা, তাহলে, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

রেড সস মেশানো বিনের গোটাগোটা স্বাদ জিবে পৌঁছুতে নিজের দাঁতের ধার টের পেল অপূর্ব এবং ভাবল, ঠিক হওয়াটা আপেক্ষিকও হতে পারে। যদি এমন হয় যে তারপর ক্রমশ মুখ থাকবে, দাঁত থাকবে না। অপরেশ জানেই, এবং যেভাবে 'আই নো, আই নো' করল, তাতে সীতাও জানবে না এটা কি সম্ভব? আজ সকালে অফিসে পৌঁছুনোর পর থেকে সীতাকে দ্যাখেনি, ক্লায়েন্ট মিটিংয়ে বেরিয়েছিল। একটু আগে, সে যখন রাস্তায়, ফিরে যেতে দেখেছে সীতাকে। পাশাপাশি চেম্বার, বস্তুত সীতার জন্যে আলাদা চেম্বার করাতে গিয়ে নিজেরটাও সাজিয়ে নিয়েছে অপরেশ। আর কেউ বলতে অপরেশ নিশ্চয়ই সীতাকে ধরেনি। তার মানে এইরকমই দাঁড়ায়, সীতা অফিসে পৌঁছুনোমাত্র অপূর্বর রিজাইন করার ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়েছে অপরেশ। এরপর উইথড্র করলেও প্যাচ-আপের জায়গাটায় দগদগ করবে তার ব্যর্থতাবোধ, সে যা করতে চেয়েছিল এবং যা করতে পারেনি, ভবিষ্যতে অপরেশ কিংবা সীতা ঠিকঠাক মনে রাখবে তা। মনে পড়বে। মনে পড়বে।

তাছাড়া, খোলাখুলি অফিসে কাউকে কিছু না বললেও এসব ঘটনা অন্যদের পক্ষেও অনুমান করা কঠিন নয়। সে যে অপরেশের চেম্বারে গিয়েছিল এবং যাবার আগে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়ে বলেছিল 'পার্সোনাল', সেটা ক্রিয়েটিভ কিউবিক্‌লে বসে শুনেছে রাধাকৃষ্ণন; আর্ট ডিরেক্টর মনোজ নন্দীও ছিল ওখানে, বিয়াত্রিচেও। অপরেশের কথায় মাথা নেড়ে বেরিয়ে এলেও নিজের জায়গায় ফিরে কলেজে মালবীকে ফোন করেছিল সে। মালবী ক্লাস নিচ্ছিল, অসময়ের ফোন পেয়ে ছুটে এসে বলল, 'কী ব্যাপার। এখন হঠাৎ।'

অপূর্ব তখনই বুঝেছিল হঠকারিতা হয়েছে। সামলে নিয়ে বলল, 'সরি। বিকেলে যদিও দেখা হবে—আই মিন, একটা ক্রাইসিস সাডেনলি ডেভলপ করেছে অফিসে—'

'ক্রাইসিস। তোমার?'

মালবীর গলায় সন্দেহ আতঙ্ক, যেরকম হতে পারে; দু'মাস হল লিভ ভ্যাকানসিতে কলেজে পড়াচ্ছে সে এবং কিছুদিনের মধ্যেই অপূর্বর সঙ্গে তার বিয়ে হবার কথা।

এরপর কিছু বলতে হলে খুলেই বলতে হয়। কানে রিসিভার ধরে রেখে আশপাশে তাকিয়ে ভদ্রতা চিনেছিল অপূর্ব। অপরেশের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও জানাজানি হবার ভয়ে গলার স্বর পাল্টে বলল, 'অত সিরিয়াস হচ্ছ কেন। যাক— পরে বলব। বিকেলেই বলব।' ফোন রেখে দিল তাড়াহুড়ো করে। মালবীকে কি টেনসনে রাখা হল? হয়তো। তবু, খোলাখুলি বলে সকলের জানার সুযোগ করে দেওয়ার চেয়ে এই ভাল।

এখন মনে হচ্ছে এই ধরনের এলোমেলো ব্যবহার ও কথাবার্তা থেকেই ওরা অনুমান

করতে পারবে, অন্তত সন্দেহ করবে। কেউই বোকা নয়। পরশু কিউবিক্‌লে দাঁড়িয়ে সীতা যখন কপি নিয়ে তছনছ করছে তাকে তখন রাধাকৃষ্ণন এবং বিয়াত্রিচেও ছিল সামনে। আজও, খানিক আগে, রিলাক্স হবার জন্যে অফিস থেকে বেরিয়ে আসবার আগে ওদের সম্বোধন করে সে বলেছিল, 'কাল আসছি না। হয়তো পরশুও না।' এই ধরনের অস্পষ্টতায় ইঙ্গিত থেকেই যায়।

জোর বাড়ছে বৃষ্টির। জোলো ঝাপটায় মেশা হাওয়ার দাপটে অস্থির শব্দ উঠছে মাঝে মাঝে, কাচের দেয়ালে অবিরত জল। বাইরে দৃশ্য বলে এখন আর কিছুই নেই, কিংবা দৃশ্য বলতেই কুয়াশা যেমন। খুঁটি চাপা পড়া কুকুর ছানার অস্পষ্ট ডাকের মতো কচিৎ কখনও ভেসে আসছে গাড়ির হর্নের শব্দ। সেই শব্দে দূরত্ব এত বেশি যে মনে হয় বাইরে নয়, এর জন্ম নিজেরই ভিতরে। অনেকটা সময় কেটে গেলেও রেস্তোরাঁর সমাগমে পরিবর্তন হয়নি কোনও। যারা ছিল তারাই বসে, অর্ডার না থাকায় পরিবেশনের ব্যস্ততা নেই। অপূর্ব দেখল, ঢোকার দরজার সামনে জড়ো হয়ে বৃষ্টি দেখছে পাঁচ ছ'জন বেয়ারা এবং আটকে পড়া আরও কেউ কেউ। দেখল, ওদেরই পিছনে তার টেবিলে বসে থাকা সেই পাজামা পাঞ্জাবি পরিহিত লোকটি, বস্তুত সে খেয়ালই করেনি কখন উঠে গেছে। ম্যাগাজিনটা পড়ে আছে সিটের ওপরে। নিতে ভুলে গেছে ভেবে তাড়াতাড়ি সেটা তুলে কাপে চামচ ঠুকে নিকটবর্তী বেয়ারাকে ডেকে বইটা 'উয়ো পাজামা পিনা হুয়া সাব'কে দিতে বলল অপূর্ব। বেয়ারার প্রশ্নে লোকটি কিছু বা অবাক চোখে পাশ ফিরে তাকাল তার দিকে, তারপর নিচু গলায় বলল কিছু, বেয়ারা ফিরে এসে ম্যাগাজিনটা টেবিলের ওপর রেখে দিয়ে বলল, 'উনকা নেহি। ঔর কিসিকা হোগা।' নিশ্চিত ফেলে গেছে কেউ, ভাবতে ভাবতেই নতুন ধন্ধে জড়িয়ে গেল অপূর্ব। এরকম কেন হয়! হাতে ফিলম-সংক্রান্ত ম্যাগাজিনটা দেখেই লোকটির সম্পর্কে একটা ধারণায় পৌঁছে গিয়েছিল সে, কিন্তু এখন নিশ্চিত লোকটি অনুরূপ কেউ নয়। তাহলে কি সে যা ভাবছে, যেমন করে এবং যেসব অনুষঙ্গ জড়িয়ে, সমস্তই ভুল। যেমন অপরেশ সম্পর্কে, কিংবা সীতা সম্পর্কে, সকাল থেকে যা যা ঘটেছে সেসব সম্পর্কে?

কোথাও কিছু নেই, অদ্ভুত অনিশ্চয়তায় নিজের মধ্যেই টলে গেল সে।

ঠিক এমনিই হয়েছিল বছর তিনেক আগে। সেটা বৃষ্টির দিন না হলেও এপ্রিলের মাঝামাঝি, এখন মে। বিমলকৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে সে বলেছিল, 'ছেলে বলেই তোমার সবকিছু আমি মেনে নেব না। লোকে তোমায় করাপ্ট বলে, কেরিয়ারিস্ট বলে—। ইলেকশান জেতার জন্যে তুমি যা করছ তা তোমাকে নেতা করবে, কিন্তু সম্মান দেবে না—'

ইত্যাদি। আবেগ এইভাবেই বলিয়েছিল। তখন তার চব্বিশ। তিন বছর পরে তিন তলা থেকে সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত ও ছন্নছাড়া নামতে নামতে, শূন্য কাপে পট থেকে চা ঢালতে গিয়ে অপূর্ব দেখল, নেই; ভেজা পাতা সমেত কালো কয়েক ফোঁটা লিকার কাপের ভিতরের সাদা শূন্যতাকেই প্রকট করে দিল আরও।

চওড়া খাটের বিছানায় আধশোয়া হয়ে বসেছিলেন বিমলকৃষ্ণ। চেক লুঙ্গি আর ইজিপসিয়ান কটনের গেঞ্জিতে পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্নতেও বলবান। মেদ ও কানের পাশে কাঁচাপাকা অল্প কিছু চুলসহ মাথার টাকে যদিও বয়স্ক দেখায়। পুরু ফ্রেমের চশমায় ঢাকা পড়েছে মুখের লম্বাটে ধাঁচ; রোজ-কাটা গোঁফ থেকে চিবুক পর্যন্ত অহঙ্কার চিনতে ভুল হয় না। অচঞ্চল ভঙ্গিতে যেভাবে বিলিতি সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন এবং ধীরেসুস্থে আগুন

জ্বালালেন লাইটারে তাতে মনে হবে ছেলে নয়, তাঁর সামনে অরুণাচল প্রদেশে রাস্তা কাটার কন্ট্রাক্টের সুপারভাইজার দাঁড়িয়ে। মুখে ক্ষমা ছিল না।

ধোঁয়ার ভিতর থেকে তাকালেন বিমলকৃষ্ণ, 'নক্সালদের বিপ্লব তো বহুকাল আগে শেষ হয়ে গেছে। তুমি কোন বিপ্লব করতে এসেছ।'

পাশাপাশি দাঁড়ালে একই চেহারা। মুখের আদলে তফাত নেই। তবে, অপূর্ব জানে, মা'র ধরনে সে কিছুটা লম্বা, কিছুটা রোগা, কিছুটা ফর্সা। মুখের গড়নে আরও কিছুটা টিকালো। মাথায় টাক কিংবা চোখে চশমা নেই।

'এসব পাশ কাটানো কথা। চালাকি। টাকা তোমাকে অন্ধ, ইনকরিজিবল, অ্যাবসার্ড করে তুলেছে—'

'জানি না।' বিমলকৃষ্ণ ভাববার সময় নিলেন। সিগারেটে টান দিতে গিয়েও দিলেন না। তফাত বলতে ঠোঁটের কোণে কোঁচকানো রেখা। হঠাৎ বললেন, ইংরিজি অনার্স পড়াতে দু'জন প্রফেসর রাখতে হয়েছিল। টাকা দিয়েই। ফুটানির খই সেইজন্যেই ফুটছে। ইনকরিজিবল। গাড়ি চড়ছ, মাসে আট শো, হাজার টাকার ফ্যানসি বই, প্লেনে চড়ে আজ কাঠমাণ্ডু কাল গোয়া—এগুলোও টাকা। তোমার ওই অ্যাডভার্টাইজিং ট্রেনির হাজার টাকায় এসব হয় না। আমার টাকা আছে বলেই হয়—'

'আর ওই মেয়েমানুষ নিয়ে কেলেঙ্কারি?'

এই কথাই সে বলেছিল, সঙ্গে সঙ্গে; এর পরেও যা বলতে পারত তা বলবার আগেই থেমে যেতে হয়। যে চোখে এরই মধ্যে তাকালেন এবং সিগারেট মুঠো করে উঠে দাঁড়ালেন বিমলকৃষ্ণ, তাতে শারীরিক আক্রমণও অসম্ভব ছিল না। পরিবর্তে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা ঘিরে থাকল তাঁকে। কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'শাটাপ্!'

ডিনামাইট কিংবা টাইমবোমা, অপূর্ব কি ভেবেছিল? হয়তো; হয়তো নয়। কিন্তু সেই চিৎকারের আলোড়ন অবশ্যই তাকে উপড়ে দিয়েছিল জমি থেকে। এমনিতে শান্ত, স্বল্পভাষী বাবাকে এর আগে কখনও এভাবে চ্যাঁচাতে শোনেনি।

বুকের প্রবল ওঠানামা নিয়ে নিরস্ত হলেন বিমলকৃষ্ণ। ফিরে গিয়ে খাটে বসলেন, মাথা ঝুঁকিয়ে। সম্ভবত গায়ত্রীকে দেখেই। অপূর্ব নিজেও লক্ষ করেনি কখন পিসিমা এসে দাঁড়িয়েছেন দরজায়। স্তম্ভিত। তখনই বুঝেছিল, এটা তার চলে যাবার সময়।

'দাঁড়াও—'

বিমলকৃষ্ণের দৃষ্টি দেয়ালে। চার ফুট বাই তিন ফুট রমার অয়েল পেন্টিংয়ের দিকে। সেদিকে তাকিয়েই বললেন, 'খবরের কাগজের রিপোর্টে যে বাবা তাকেই তুমি চিনেছ। তোমার জন্মদাতাকে নয়। তবে, এই বয়সে তোমার আদর্শ চরিত্র হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—'

অপূর্ব চুপ করে থাকল।

'তোমার পিসিমা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর সামনেই বলছি। আমার কাছে খবর আছে তোমার বন্ধু শৌনিক কম্যুনিস্টদের হয়ে খাটছে; তুমিও একদিন ওর সঙ্গে ভোটার লিস্ট নিয়ে ঘুরেছ। যথার্থই ছেলের কাজ। মাতৃহারা ছেলে তুমি, আমার পার্টির ছেলেরা কমপ্লেন করলেও এতদিন কিছু বলিনি। আজ বলছি, হয় তুমি সংযত হও, না হলে—ওয়েল—

সাবালকের সাহস দেখাও—'

সিঁড়ির পর সিঁড়ি। পিছলে পিছলে নামা, কখনও বা ফসকে; সত্য না হলেও তখনকার অনুভূতি এইরকম। চায়ের কাপটা হেলিয়ে ধরতে এক দাগ মিক্সচারের মতো চলতে উঠল তলানি। পিসিমা বাধা দেয়নি, অপূর্ব ভাবল, কী যেন শব্দটা? হ্যাঁ। কিংকর্তব্যবিমূঢ়-ই হবে। ওই শব্দটাই প্রযোজ্য হতে পারে এখানে, দিলে বাংলা সিনেমার মতো হত।

এসব প্রায়ই মনে পড়ে; তবে এভাবে নয়। টেলিফোনে গায়ত্রীর সঙ্গে কথা বললে কিংবা বিমলকৃষ্ণের অনুপস্থিতিতে কখনও সখনও লাউডন স্ট্রিটের ওই বাড়িতে গেলে মনে পড়ে মা এখানে ছিল। মনে পড়ে শ্মশানে, মুখাগ্নির পর, ষোলো বছরের তাকে কাছে টেনে নিয়ে মাথাটা বুকের মধ্যে চেপে ধরেছিল বাবা। এ তো স্বাভাবিকই ব্যাপার। কিন্তু, বিমলকৃষ্ণের হৃৎপিণ্ডের শব্দে এবং শরীরের অপরিচিত আলোড়নের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করতে করতে অপূর্বর মনে হয়েছিল তাকে আশ্বস্ত করতে গিয়ে নিজেরই আশ্রয় খুঁজছেন বিমলকৃষ্ণ। ক্ষীণ জ্যোৎস্নামণ্ডিত আকাশের নীচে কালীগঙ্গায় নেমে স্নান করার পর গায়ে শীত ঢুকছিল হা-হা করে। তার চব্বিশ বছর বয়সের ডিসেম্বরে মা'র মৃত্যুর দিনটি ঠিকই মনে পড়ে যায় অপূর্বর; সেদিন সে একাই কেঁদেছিল। হতে পারে বাবা তত খারাপ লোক নয়।

মুষলধারা থেমে এখন পরিণত হয়েছে গুঁড়িগুঁড়িতে। কাচের দেয়াল এখনও ঝাপসা থাকলেও রাস্তা চোখে পড়ে, উল্টোদিকের ফুটপাথ এবং দোকানগুলিও। আটকে থাকা মানুষজন আবার নেমে পড়েছে রাস্তায়। পুব থেকে পশ্চিমে, পশ্চিম থেকে পুবে, গাড়িগুলো ছুটছে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি স্পিডে, তেমনি শব্দও, বিচিত্র ও পরস্পরবিরোধী, এতক্ষণের বৃষ্টিতে বানচাল সমস্তই যেন হারানো মুহূর্তগুলি মেকআপের চেষ্টায় ব্যস্ত। দুটো বাজে প্রায়। রেস্তোরাঁয় নতুন নতুন লোকের ঢুকে পড়ার আওয়াজে ভিতরে চোখ বুলিয়ে হঠাৎই আলোর স্বল্পতা টের পেল অপূর্ব। লোডশেডিং। ফুলহাতা সাদা সার্টের সঙ্গে কালো রঙচটা টাই-পরা, ক্ষয়া ও ন্যুব্জ চেহারার একটি লোককে দূরের টেবিলে উদাসীন বসে থাকতে দেখল সে, ঈষৎ বিষণ্ণ, উকিল বা অ্যাডভোকেট হবে। গলার টাইটা এখানে প্রতীক। তেমনি একজন ডাক্তারকেও সে চিনতে পারবে যদি গলায় অথবা হাতে স্টেথসকোপ থাকে। একজন এঞ্জিনিয়ারকে কীভাবে চেনা সম্ভব? কিংবা, অপূর্ব আবার ফিরে এল ধন্ধে, একজন খুনিকে? মনে হয় খুবই কঠিন তেমন কাউকে চিনে ফেলা যে পিতা-পুত্রের সঙ্গত সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত, বা, যে দাঁড়িয়ে থাকে চাকরি থাকা বা না-থাকার সম্ভাবনায়। না, পারা যায় না। বুকের ভিতর হৃৎপিণ্ড লুকিয়ে হাঁটার মতো প্রতিটি মানুষই সম্ভবত গোপন করে রাখছে তার সেই মুহূর্তের পরিচয়। তফাতটা কোল্ড অ্যানাটমি আর অ্যাবস্ট্রাকসনের মধ্যে যেরকম; সত্যি বলতে, হৃৎপিণ্ড যে বুকের ভিতরেই থাকে এটা ঘটনা, সবাই জানে। মুখ প্রতারণা করতে পারে, দৃষ্টিও। চাক্ষুষ ঘটনাও। উঠে গিয়ে ওই উকিল ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করলে হয়তো বলতে পারে যে সে উকিল নয়; কেন, কালো টাই কি আর কেউ পরতে পারে না! সঙ্গে স্টেথসকোপ থাকলেই ডাক্তার? খুনি নয় কেন। না, বোঝা যায় না।

একটা ঘোঁট পাকানো চিন্তাধারা থেকে চোখ তুলে অপূর্ব দেখল, বিভিন্ন রঙের বুশসার্ট পরা তিনটি লোক ঢুকল রেস্তোরাঁয়। তারা ঠিকঠাক জায়গা খুঁজে নেবার আগেই এক দুরন্ত, স্যুট-পরা যুবকের সঙ্গে একজন নীল জিনস ও স্কিন-কালার পাতলা কুর্তা পরা বিদেশিনীকে

ঢুকতে দেখল, যুবতীটিকে দেখে বোঝা যায় বৃষ্টিতে ভিজেছে দুজনে। যেখানে অপূর্ব বসে সেদিকেই এগিয়ে এল ওরা। টেবিল ধরে, অপূর্ব যেমন চাইছিল তেমনি, যুবকটি তার দিকে পিছন করে বসায় যুবতী মুখোমুখি হল। দূরত্ব সামান্যই। যুবকটি যুবতীকে সিগারেট ধরানোয় সাহায্য করছে, লাইটারের ক্ষণিক শিখায় উদ্ভাসিত তার মসৃণ ত্বক। এসব পুরোপুরি দেখার আগেই অপূর্বর চোখ চলে গেল যুবতীর বুকে, বৃষ্টিতে ভেজা কুর্তার নীচে প্রায় পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে তার ছোট কিন্তু সুডৌল স্তন, বৃন্ত ও চাঁদরেখা; দেখতে দেখতেই নিজের শরীরে এক ধরনের শিহরন ও কাঠিন্য অনুভব করল সে। লোকটি যেরকম স্বচ্ছন্দ তাতে মেয়েটির সঙ্গে শুতেও পারে। অপূর্ব একই সঙ্গে ফোটোগ্রাফির দোকানে ত্বরিতে ঢুকে পড়া সুন্দরী মেয়েটি এবং মালবীর কথা ভাবল এবং যেন কিছুই দেখছে না এমন উদাসীনতা নিয়ে তাকিয়ে থাকল অদূরে শ্বেতাঙ্গিনীর দিকে। এই সময়, তার দিকে না তাকিয়েও, যুবতী ঝুঁকে বসল, ঈষৎ কাত হয়ে, বাঁ হাত গালে, কনুই টেবিলের ওপর নামানো, যাতে তার দেখায় বাধার সৃষ্টি হয়। তখন বেয়ারা এল এবং জিজ্ঞেস করল, 'সাব, ঔর কুছ?'

চটপট উঠে দাঁড়াল অপূর্ব। ভিড় বাড়ছে, সুতরাং বেয়ারাদের তৎপরতাও। বিল আগেই মিটিয়ে দিয়েছিল। দরজার কাছ থেকে পিছনে তাকালে চোখে পড়ে প্রায় ভিজে জামার নীচে যুবতীর বাদামি পিঠ, এলানো খয়েরি চুল হেলায় ন্যস্ত সেখানে। তিন বছরের পরিচয়ে মালবীকে চুমু খেয়েছে কয়েকবার, একবার জোর করে ওর স্তনও স্পর্শ করেছিল, গোটা পায়রার উষ্ণতা মুঠোয় পাবার মতো। যাই হোক, যখনই সে এমন করেছে মালবীর চোখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছে সে আরও কিছু চায়। কিন্তু মুখে 'না, না', 'আর না', 'এ কী অসভ্যতা', 'বিয়ের আগে এসব ভাল্লাগে না' ইত্যাদি বলায় অপূর্ব ভাবতে বাধ্য মালবী যেমন আদর্শের কথা বলে তাতে কথাগুলো সত্যিও হতে পারে। চোখ শরীরের সঙ্গে যুক্ত হলেও মন, মনোভাব, আলাদা হওয়া অসম্ভব নয়। মালবী চাকরিতে পার্মানেন্ট হতে চায়। সম্ভবত হবে। কাল দেখা হয়নি। কিন্তু, পরশু, সন্ধ্যা পেরুনো রাতে, সরলা রায় মেমোরিয়াল হল থেকে বার্গম্যানের 'সাইলেনস' দেখে ফেরার সময়, সে বলেছিল, মালবীর চাকরির সঙ্গে তাদের বিয়ে করার সম্পর্ক নেই কোনও, তাদের এজেন্সির যা অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে শীগ্রি প্রোমোশন পাবে সে, মোটা ইনক্রিমেন্টও, একটা ওয়ান বেডরুম ফ্ল্যাটও আছে তার পাম অ্যাভিনিউয়ে, সুতরাং চলে যাবে। সুতরাং বিয়ে করার অসুবিধে কোথায়। তখন ফুটপাথ বদলের জন্যে অপেক্ষা করছিল তারা, মালবী জবাব দেয়নি, শুধু ঘেঁষে এসেছিল সামান্য। সীতা তখনও পিকচারে আসেনি। ওটা কাল সকালের ঘটনা।

ইতিমধ্যে থেমে গেছে বৃষ্টি। আকাশে আবছায়া, যদিও মেঘ নেই, রোদের আভাসও নেই। ময়দানের শেষ প্রান্তে, যেখানে সম্ভবত রেড রোড, ফোর্ট, খেলার মাঠ, কিংবা আরও একটু দূরেও হতে পারে, যেখানে নদী, সেখানে পেটের তলার মতো ক্রমশ ঢালু হওয়া সন্ধিতে হালকা লাল আভা ফুটতে গিয়েও ফোটেনি। ভোর হলে ভাবা যেত ক্রমশ নির্দিষ্ট রূপ পাবে ওই রঙ। হাঃ। সম্ভবত একটু কাব্যিক হয়ে পড়ছে সে। আলোয় মেঘের ছায়া থাকলেও বস্তুত এখন খটখটে দুপুর। ডেভিলস ডেনই ভাবায় এরকম।

ভাবতে ভাবতেই গাড়ি-বারান্দার নীচ দিয়ে কিছুদূর এসে সেই এক পায়ে হাঁটুর নীচে অদৃশ্য ট্রাউজার্স-পরা পাগলটিকে দেখল অপূর্ব, দু' আঙুলে একটা নিবে যাওয়া সিগারেটের টুকরো টিপে ধরে ঠোঁটে লাগাচ্ছে এবং বের করে আনছে, বগলে খবরের কাগজের তাড়া,

নিজের মনে কথা বলছে কী সব। পাশ দিয়ে পেরিয়ে যেতে যেতে কিছু কথা কানে এল, 'সো হোয়াট?' 'সো হোয়াট?' বলায় ভুল নেই কোনও, শুধু বোঝা যায় না কথাগুলো কেন, প্রশ্নটাই বা কাকে।

কারণ থাকে না, তবু অন্যের প্রশ্নই কখনও ফাটা শিশির মতো অস্পষ্ট তরল ছড়াতে থাকে মনে। অন্যমনস্ক ও বেপরোয়া ভঙ্গিতে, যেভাবে রাস্তা পেরিয়ে চীনে রেস্তোরাঁর সামনে ফুটপাথে উঠে এল অপূর্ব তাতে চাপা পড়ার আশঙ্কা থাকে। হঠাৎ আলোয় রোদ ওঠার সঙ্কেত।

সেবার, অবশ্য তখন ছিল সন্ধে, এমন দুপুর নয়, বিমলকৃষ্ণের কথা শুনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার পর, আর ফিরবে না ঠিক করে রাস্তায় নেমে ভেবেছিল যাবে কোথায়! লাউডন স্ট্রিট থেকে লোয়ার সার্কুলার রোড, নার্সিংহোম ও পার্ক পেরিয়ে কলকাতার পরিচিত সন্ধের দৃশ্যের পরিবর্তে চোখ টেনেছিল আকাশ। মনে হয় শূন্যতা থেকে অনন্তকাল ধরে আকাশে তারা ফোটা লক্ষ করেছিল সে; বুকের মধ্যে অপমান নাকি অভিমান, বুঝতে পারেনি। রাস্তারও মজা আছে, ঠিকই চিনিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।

বেকবাগান ছুঁয়ে পার্কসাকার্স বাজারের সামনে দিয়ে ঝাউতলা রোডে শৌনিকের বাড়ি। যাক, রাতটা অন্তত কাটানো যাবে ভেবে, সার্টের কলার টেনে, মাথার চুলে হাত বুলিয়ে খানিকটা ধাতস্থ, শৌনিককে দেখে অপূর্ব বলল, 'কী করছিস?'

দরজায় শৌনিক। সবুজ দড়ি ঝুলছে পাজামায়, গায়ের বুক-খোলা সার্টটা ঝুলে ছোট, ট্রাউজার্সের সঙ্গে যেতে পারে। হাতে ধরা মোটা ব্রাশটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোর বাপের শ্রাদ্ধ।'

'মানে?'

'ঠাট্টা করলাম। রাগ করিস না। যদিও মানে একটা আছে—।' শৌনিক হাত বাড়িয়ে টেনে নিল ওকে, 'ভেতরে আয়। বলছি।'

ভিতরেই নিয়ে গেল। পুরনো ধাঁচের বাড়ি, পুরনো গন্ধেরও। সদরের চৌকাঠ পেরোতে অনেক দিন পরে শীতের পোশাকের ট্রাঙ্ক খুললে যেমন, গন্ধটা উঠে এল নাকে। বারান্দায় পর পর দুটো ঘর। প্রায় বার লাইব্রেরি একটা, চার দেয়ালে আইনের বই ঠাসা; মারা যাবার আগে পর্যন্ত শৌনিকের জ্যাঠা বসত ওখানে। পাশেরটা এখনও চেয়ার ও ডিভানপাতা বৈঠকখানা, চৌকোনা টেবিলের ওপর ক্যারামবোর্ড পাতা। কোণে শিকল তোলা টয়লেট-কাম-বাথরুম, দরকার পড়লে কখনও সখনও ঢুকেছে অপূর্ব। তারপর সিঁড়ি, দোতলা এবং তিনতলা। ওদিকে না গিয়ে উঠোনে নামল শৌনিক, যেখানে রান্নাঘর ও ভাঁড়ার, এখন যদিও সবই উঠে গেছে দোতলায়। সিলিং থেকে ঝোলা অ্যালুমিনিয়ামের চোঙা থেকে বেশ নিচু পর্যন্ত টানা তারে বাল্ব ঝুলছে। মেঝের ওপর সতরঞ্চিতে বসে দুটি ছেলে, অচেনা, একজন মুখ তুলতে যুবকই দেখালো, ছাঁচে ব্রাশ বুলিয়ে লাল কালির পোস্টার তুলছে সাদা কাগজে। শৌনিক বলল, 'কারখানা। কাল সকালের মধ্যে শ তিনেক সাপ্লাই দিতে হবে। কেন ঠাট্টা করলাম বুঝলি তো।'

তখনও 'শাটাপ' লেগে আছে কানে। অপূর্ব চুপ করেই থাকল। শৌনিক একটা পোস্টার কুড়িয়ে এনে মেলে ধরল নিজের চোখের সামনে, এমন ভাবে যাতে অপূর্বও দেখতে পায়। তারপর অন্যরকম গলা করে চেঁচিয়ে পড়ল, 'কাগজ যাকে চরিত্রহীন বলছে তাকেই কি

আপনারা ভোট দেবেন?'

মিউজিয়ামের সামনে দিয়ে উদ্দেশ্যহীন হাঁটতে হাঁটতে নিজের তিন বছর আগেকার গলা, স্বরের বিক্ষোভ চিনতে পারল অপূর্ব।

'এসব স্ক্যান্ডাল করার কী মানে হয়? এগুলো মিথ্যে! ব্লাটান্ট লাইজ!'

'মিথ্যে তো বটেই। তবে—', জোর দিয়ে বলতে বলতে অপূর্বর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল শৌনিক। হাতের পোস্টারটা হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে বলল, 'পলিটিক্সে আবার সত্যি মিথ্যে কি? পার্টি অফিসেও এ নিয়ে জোর বিতণ্ডা হয়েছে। দেখছিস না, কারা ইস্যু করেছে তা লেখা নেই।'

সম্ভবত নিজেই বিব্রত বোধ করছিল শৌনিক। সময় দিয়ে এবং নিয়ে, অপূর্ব কিছু বলছে না দেখে বলল, 'একটা সিচ্যুয়েসন ডেভলাপ করেছে, তারই সুযোগ নেওয়া হল। এখনও সাতদিন সময় আছে, মেসোমশাইও কিছু ছাড়বেন হয়তো—'

অপূর্ব জবাব দিল না। খবরের কাগজের রিপোর্টে যে বাবা তাকেই তুমি চিনেছ, কথাগুলো ফিরে এল যথাযথ। অপূর্ব জন্মদাতাকে চিনছিল।

তখন ছোট ছেলেটিকে লক্ষ করে শৌনিক বলল, 'এই কেষ্ট, যা তো। মালবীদিকে বল তিন চার কাপ চা পাঠিয়ে দিতে। বলবি বন্ধু এসেছে—'

নামটা শুনল সেই প্রথম। মামাতো বোন। এম-এ পড়ছে যাদবপুরে। বাবা, মা হরিদ্বারে গেছে বেড়াতে, বাড়িতে তালা। কদিন এখানেই থাকবে।

চাপা রোদ্দুরে সম্মত চারদিক। মালবী নিজেই চা নিয়ে এল। বৈঠকখানাব স্প্রিং বসে যাওয়া সোফায় বসে ততক্ষণে অনেকটাই বলে ফেলেছে অপূর্ব; ফিরবে না সে-কথাও। নেভি ব্লু ট্রে-তে চায়ের কাপ নিয়ে দাঁড়ানো মালবীকে দেখে থামতে হল। সেদিন চায়ে চুমুক দিয়ে একই নিঃশ্বাসে অনুভব করেছিল নারী মানেই শরীর, সুগন্ধ শরীরেই থাকে।

এখানে মশা হয়। শৌনিকের খাটের পাশে নেয়ারের খাট, মশারি টাঙাতে মালবীই এল। শৌনিক কোথাও বাইরে। তোষকের নীচে মশারি গুঁজতে গুঁজতে জিজ্ঞেস করল, 'মৌরি খাবেন?'

ঘাড় নাড়তেই মুঠো খুলল, মুঠোরই ভিতরে।

'হাতেই ছিল নাকি?'

'না। আকাশে ছিল। আমি ম্যাজিক জানি কি না, মন্ত্র পড়ে আনলাম।'

মালবী চলে গেল একেবারে উল্টোদিকে, মাথার পিছনে, গোঁজা তুলে নতুন করে গুঁজতে। অপূর্ব জানে না তাকাতে হয় কি না। একই সুগন্ধ ঘোরাফেরা করছে, আশপাশে, ধরা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। তাহলেও, সুগন্ধেরই মতো।

'অপূর্ব নামের ছেলেরা কি একটু পাগলাটে হয়?'

'কেন?'

'কেন আবার কি। এই যে রাগ করে চলে এলেন বাড়ি থেকে, এটা কি ঠিক হল?'

তখন শৌনিক ঘরে ঢুকল। মালবী বেরিয়ে গেল। গিয়েও ফিরে এল এবং দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'টেবিলের ওপর জল আছে—গ্লাসে—'

সেদিন সারারাত সে ভালোবাসা শিখেছিল।

অনেক দিন কলকাতা দেখা হয়নি। অনেকদিন এভাবে হাঁটা হয়নি। ফুটপাথে জল জমে

আছে এখানে ওখানে; নামেই জল, সচেতন হয়ে তাকাতে ছাই রঙ ট্রাউজার্সের তলার দিকে কাদার ছিটে চোখে পড়ল। আরও কিছুক্ষণ এইভাবে হাঁটলে ডিজাইন ফুটবে।

না, গাড়ি সে আজকাল চড়ে না। অফিস যাবার সময় পুল-কার তুলে নেয়—সে, রাধাকৃষ্ণন আর মনোজ, কোনও কোনও দিন বিয়াত্রিচেও থাকে। গুরুসদয় দিয়ে না গিয়ে সেদিন ঘুরতে হয় পার্কসার্কাস ময়দানের দিকে। ঝাউতলা রোড দিয়ে যেতে যেতে মালবী বলে, মৌরি খাবেন? খটখটে রোদ্দুরেও কখনও সখনও ছায়া কেটে যায় মশারির জাল। ফেরা যেদিন যেমন, নিজের ইচ্ছে। বই এখনও কেনে, তবে অনেক বেছেবুছে। ওঠো বাবা, বেলা যায়, কোথায় যেন পড়েছিল। সত্যি, দেখতে দেখতেই কেটে গেল এতটা সময়।

বেলা আড়াইটের তন্ময়তা হঠাৎই সচেতন করে দিল অপূর্বকে। তিন বছর আগে যা হয়েছিল, তিন বছর পরেও যে তার পুনরাবৃত্তি হবে এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। এখন ফেরা মানেই পাম অ্যাভিনিউয়ের সেই একলা ফ্ল্যাটে। যদি তেমন কিছু হয় এবং চটপট আরও একটা চাকরি না জোটে, মালবী ভাবতে পারে বিয়েটা পিছিয়ে গেল। ভালোবাসায় ঢুকে পড়বে অনিশ্চয়তা। শৌনিক বলেছিল, পলিটিক্সও একটা খেলা, সেটা মাঠেই হয়। বাড়ি পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে এই কনফ্রনট্রেসনের দবকার ছিল না। কথাগুলো থমকে দিয়েছিল অপূর্বকে। ওদের ঝাউতলার বাড়িতে তখন সে চার দিনের পুরনো। শৌনিক কি ভেবেছিল অপূর্ব বন্ধুত্বের সুযোগ নিচ্ছে? হতে পারে, এসব থেকেই বেড়ে গিয়েছিল না-ফেরার জেদ। একটা স্যুটকেসে যা আঁটে ইতিমধ্যে এক ফাঁকে পিসিমার কাছ থেকে তা চেয়ে আনালেও বাড়ি ফেরার জন্যে বাবার কাছ থেকে কোনও ফিলার পায়নি। জেদটা বেড়ে যায়।

ইলেকশানে বিমলকৃষ্ণই জিতলেন। সেদিন বিকেলে, ট্রেজারি অফিসে কাউন্টিংয়ের পর জিপ নিয়ে যে হুল্লোড় প্রসেসন বেরোয়, তাতে বিমলকৃষ্ণ ছিলেন না। ড্রাইভারের পাশে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল সেই মহিলা, কাগজ যাকে প্রাক্তন মন্ত্রী অম্বর মুখার্জির বিধবা, শীলা মুখার্জি বলে চিনিয়েছে—একদিন ভোরবেলা বারাসতের এক বাগানবাড়ি থেকে একই গাড়িতে বেরোতে দেখা গিয়েছিল বিমলকৃষ্ণের সঙ্গে। বাড়িতেও দেখেছে দু একবার, সোজা উঠে আসত তিনতলায়। জিপে দাঁড়ানো তার গোল, আঁটোসাটো কালো মুখ ও পাথুরে স্বাস্থ্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই বমি পায় অপূর্বর; লক্ষ করেছিল মহিলার আহ্লাদে ব্যক্তিত্ব নয়, যা ফুটেছে তার নাম শরীর। খুব গতানুগতিক হলেও, মনে পড়ে, মার মুখ ভেসে উঠেছিল চোখে। বিশ্বাস করেনি। ভেবেছিল হতেও পারে। বাবা এখন অনেক দূরের মানুষ।

তখন থেকেই একা। শৌনিক এবং হতাশ দলটির সঙ্গে পার্টি অফিসে যেতে যেতে আলাদা হয়ে গিয়েছিল অপূর্ব, এখন যেমন তেমনি ইতস্তত ভাব এসেছিল রাস্তার টেলিফোনের সামনে দাঁড়িয়ে।

বার কয়েক এনগেজড সাউন্ড পেরিয়ে লাইন পেল। অপরিচিত গলা।

'কাকে চান?'

জবাব না দিয়ে নাম্বারটা ঠিক কিনা জিজ্ঞেস করল অপূর্ব।

'হ্যাঁ। কাকে চান?'

'বিমলকৃষ্ণ—?'

'উনি অসুস্থ। কারুর সঙ্গে কথা বলছেন না।'
'হ্যালো! হ্যালো—!'
'বললাম তো!'
'আমি ওঁর ছেলে বলছি। পিসিমা থাকলে ডেকে দিন—'
'ধরো।'
তার মানে পরিচিত। রিসিভার সরিয়ে রাখা এবং গায়ত্রীর এসে পৌঁছনোর মধ্যে এক যুগ না কী বলে, হ্যাঁ, কেটে যায়। তারতম্য ফেটে পড়ে নিঃশ্বাসে। কেওড়াতলা শ্মশানে, মুখাগ্নির পর, মাথাটা টেনে নিয়েছিল বুকের মধ্যে। এসব অনেক দিন আগেকার কথা। চব্বিশ বছর বয়সে যখন তখন চোখ জ্বালা করত।
'কে? অপু?'
'হ্যাঁ, পিসিমা। বাবার জেতার খবর পেয়ে—'
'তুই কোথায়?'
'এই তো, রাস্তায়—'
গায়ত্রী চুপ করে গেলেন।'
'পিসিমা!'
'তোর বাবার শরীরটা ভাল নেই মনে হচ্ছে—'
'কী হয়েছে!'
'না, না, ভাবিস না। ডাক্তার দেখে গেছে, সেরকম কিছু নয়।' গায়ত্রীর গলা নেমে এল একটু, 'সকাল থেকেই চুপচাপ ছিল। মনে হল জেতার খবর পেয়ে খুশি হয়নি। ঘরে গিয়ে শুয়েছে, কথা বলছে না কারুর সঙ্গে—'
হারলে খুশি হত কিনা পিসিমা বলল না। হয়তো তা নয়। হয়তো এগুলো শুধুই ধারণার কথা, পিসিমা ঠিকঠাক বলছে না। অপূর্ব পরের কথাটা খোঁজে।
'তুই কথা বলবি?'
'না। থাক।'
'অপু—অপু—?'
কথাগুলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত নৈঃশব্দ্য টেনে রাখল অপূর্ব। শুনল, অনেকটা অপেক্ষার শেষে রিসিভার নামিয়ে রাখছেন গায়ত্রী। হয়তো বলবেন বিমলকৃষ্ণকে। হারতেই চেয়েছিলেন? টেলিফোন ছেড়ে দিলে সম্পূর্ণতা এসে যায় ছিন্নতায়। অপূর্ব ভেবেছিল, কিন্তু কেন?
বৃষ্টি বন্ধ হওয়া ফুটপাথে পসরা নামাচ্ছে ফুচকাঅলা। সদর স্ট্রিট থেকে এলোমেলো যে মেয়ে দুটি বেরিয়ে এল পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে করতে তারা কি বেশ্যা? কাগজে দেখেছিল লাইসেনসড নয় এমন মেয়ের সংখ্যাই কয়েক হাজার। মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বস্তি থেকে আসা, এমনকী চাকরি-করা স্বামীর বউরাও আছে এর মধ্যে। এরা কোথা থেকে আসে, কোথায় যায়, কেউই জানে না। তবে ট্রেনে চড়েও আসে, কিংবা বাসে। বজবজটা কোনদিকে, কিংবা সোদপুর? বাসস্টপে অন্যান্যদের সঙ্গে মিশে দাঁড়ালে চেনা যায় না; তাই সাধারণত একটু আলাদা হয়ে দাঁড়ায়। অসংখ্য অলিগলি ময়দান নিয়ে কলকাতার বুক বেশ চওড়া। সর্ট অফ আ ক্যানসারাস গ্রোথ—, লিখেছিল। হলদে শাড়ি পরাটি যেভাবে রাস্তায়

নেমে 'আয়রে খানকি, ইদিকে আয়—' বলে চ্যাঁচাচ্ছে এবং ফুচকাঅলার পাশে দাঁড়িয়ে নীল শাড়ি যেরকম বেআব্রু, প্রকাশ্য ফুটপাথে দাঁড়িয়েই ক্ষিপ্ত হাতে তলপেট ও উরু চুলকোচ্ছে, তাতে অন্য কিছু ভাবা যায় না। ক্ষুধা কি খেলায় পরিণত?

ওদেরই পাশ দিয়ে হেঁটে এসে দোকানের ক্যাশ কাউন্টারে বসা লোকটির দিকে তাকাল অপূর্ব। তারপর এগিয়ে গেল।

'মে আই ইউজ দ্য টেলিফোন প্লিজ?'

'টু রুপিজ—'

হিপ পকেট থেকে ওয়ালেট বের করতে গিয়ে দেখল ছিটে লেগেছে পাছাতেও। তাহলে শেষ যে গাড়িটা ওভারটেক করে চলে গেল ফুটপাথ ঘেঁষে, তারই কাজ। নোট হাতে নিয়ে ফোনটা তুলে তার দিকে ঘুরিয়ে দিল লোকটি।

একই নাম্বার। এই সময় বিমলকৃষ্ণের বাড়িতে থাকার কথা নয়; গায়ত্রীও সম্ভবত ঘুমিয়ে। একাগ্রতার মধ্যে এরকম বেজে যাওয়া হঠাৎই রাত এনে দেয় সামনে। অপূর্ব অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ্যালো!'

হ্যাঁ, গায়ত্রীই। নিশ্চিত ঘুমিয়েছিলেন।

'পিসিমা, আমি অপু।'

'অপু! কী খবর তোর?'

'বাবা বাড়িতে?'

'না। মিটিংয়ে গেছে। বোধহয় রাত হবে।' হাই তোলার ছোট শব্দ এড়াতে পারলেন না গায়ত্রী। পরে বললেন, 'তুই কি অফিস থেকে?'

'অফিস! ও, হ্যাঁ, অফিস থেকেই। তবে হাতে কোনও কাজ নেই। বলো তো আসতে পারি। অনেক দিন দেখিনি তোমাকে—'

'আসবি? সত্যি বলছিস!'

'সত্যি।'

'তাহলে আয়—'

অদ্ভুত ব্যবহার গায়ত্রীর। বলতে না বলতেই ছেড়ে দিলেন ফোনটা। সম্ভবত বুদ্ধিহারা, তাল কেটে গেলে যেমন হয়।

একটা হাসি খলবল করে উঠল অপূর্বর বুকে। হাসতেই যাচ্ছিল; কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে ফোনটা টেনে নিল লোকটি, তাতেই থেমে গেল। নির্বিকার মুখ; অপূর্ব কেউ নয়, এখন তাকিয়ে আছে অদূরের কাউন্টারে দাঁড়ানো কাস্টোমার, দুই মোটা চেহারার মহিলার দিকে। লোকটিকে লক্ষ করতে করতেই একটা কাঠিন্য এসে গেল চোয়ালে।

আবার ওয়ালেট বের করল অপূর্ব। খুচরো নেই। একটা দশ টাকার নোট তুলে কাউন্টারে রেখে লোকটির কিছু বা অবাক মুখের দিকে তাকিয়ে ফোনটা টেনে নিল নিজের দিকে।

চেনা নাম্বার। ডায়াল করতেই অবিশ্বাস্য দ্রুততায় পি-বি-এক্স থেকে সাড়া দিল মার্টিনা।

'অ্যাকশন গ্রুপ।'

ভাবনাগুলোকে গুছিয়ে নিয়েছিল অপূর্ব। ভারী, সুতরাং অন্যরকম, গলায় বলল, 'মিসেস

সীতা চৌধুরী প্লিজ।'

'হু'জ স্পিকিং?'

'আ ফ্রেন্ড।'

'আ ফ্রেন্ড! ও-কে। স্পিক হিয়ার—'

'মিসেস চৌধুরী—'

সীতারই গলা। মুহূর্তের জন্যে অস্বস্তি বোধ করল অপূর্ব। রেখে দেবে কিনা ভাবল। তারপর আরও ভারী গলায় বলল, 'হাউ আর ইউ?'

'হু ইজ ইট প্লিজ?'

'গেস হু?'

'আই কান্‌ট। হ্যালো।' সীতা অসহিষ্ণু, 'হ্যালো—হ্যালো—! ইজ ইট অপূর্ব! হ্যালো—'

অপূর্ব! তাহলে কি ধরা পড়ে গেল সে? সেই তীব্র জিজ্ঞাসা জিইয়ে রেখে আস্তে আস্তে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল অপূর্ব।

২

ঘুমের ধাত বরাবরই কম অপরেশের। দুপুরে তো নয়ই, এমনকী রাতেও সহজে আসে না। অপরেশ জানে, অ্যালকোহলই কাজ করে ঘুমের। অভ্যাস বড় মারাত্মক; উসকানি দিলে জাঁকিয়ে বসে—প্রতিজ্ঞার চিবুক নেড়ে, উপেক্ষার হাসি হাসায় জুড়ি নেই তার। রাতের পরিচ্ছন্ন ঘুমের ক্রেডিট, সুতরাং, সেই শক্তিরই প্রাপ্য, যার নাম মদ, জেনারিক নামে হুইস্কি, জিন, ভোদকা, রাম যা-ই বলা হোক না কেন। হুইস্কিই পছন্দ। তবে যখন যেমন বলে কথা আছে একটা, ককটেলে জুত হলে এক সময়ের পর সব প্রেফারেনসই যায় গুলিয়ে। তিনরঙা জাতীয় পতাকার মাঝখানে বসানো অশোকচক্রটির মতো অভ্যাসের এই নির্ভুল ছাপ চিনে নিতে ভুল হয় না কোনও।

মাঝে, তা প্রায় দু বছর হল, জন্ডিসের উপক্রম হতে ডাক্তারের পরামর্শে মদ খাওয়া ছাড়তে হয়েছিল কিছুদিন। তখনই বুঝতে পেরেছিল চালে ধান বেশি; মদ্যপানবর্জিত প্রস্তাবে হলুদের প্রভাব হয়তো কমবে, কিন্তু টিকে থাকা যাবে না। বলা যায় না আরোগ্যই হয়তো এনে দেবে নতুন অসুখ। কড়া ডোজের ঘুমের বড়ি গিলে কিছুদিন চালালেও সারাক্ষণ খিঁচ ধরে থাকত উৎসাহে। শরীরের সর্বত্র ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলে ইচ্ছেমতন ঘোরাফেরা করত হাই। সঙ্গে ম্যাজমেজে ভাব, অন্যান্য জড়তাও ছিল। নিষেধ সত্ত্বেও, সুতরাং, লুকিয়ে এবং আস্তে আস্তে আবার শুরু করেছিল সে। একরকম দার্শনিকতা এসে গিয়েছিল মনে। জীবন একটাই, ভেবেছিল, বাঁচা কিংবা মরা, তাও একবারই। পক্ষপাত দেখানো কাপুরুষের কাজ। তবে বাঁচাটাই যেহেতু অনুভব করা যায়, স্বাদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে চকচকে করে রাখে ভিতরটা, তখন বাঁচার দিকেই দু পা এগিয়ে রাখা ভাল। তার পরেও যে ঠিকঠাক বেঁচে গেল এবং কোনওরকম হ্যাফা ছাড়াই, হপ্তা তিনেকের মধ্যেই দিব্যি গেঁথে গেল কাজকর্মে, যা তার ভালোবাসা, সেজন্যে ডাক্তারকে যত না ধন্যবাদ দেয় অপরেশ তার

চেয়ে বেশি দেয় সুখে দুঃখে অদ্বিতীয়, এক তরল অগ্নিকে।

আসক্তি সত্ত্বেও অবশ্য তাকে কেউ দোষারোপ করতে পারবে না। আজ পর্যন্ত বেচাল হয়েছে কচিৎ, বেসামাল কখনওই নয়। জানে তো শোম্যানশিপের প্রধান শর্ত নিয়মমানা সপ্রতিভতা, ডিসিপ্লিন আর সোফিস্টিকেসন। এগুলো নিয়েই তার ব্যক্তিত্ব, দৌড়, খ্যাতি ও সাফল্য।

আজ দুপুরেই হঠাৎ অন্যরকম লাগছে। ঘুম-ঘুম, মাথার ভিতরটা কেমন যেন ঘোলাটে, শরীর জুড়ে টিসটিসে ভাব; চেয়ারে বসলে ইচ্ছে করছে ঘাড়ে চাপ পড়ুক, মাথাটা এলিয়ে যাক পিছনে। কিংবা বিশুদ্ধ বাঙালি মতে টেবিলের ওপর নামানো দুই কনুইয়ে 'ভি' শেপ এনে জোড়া হাতের তালুর পিঠে মাথাটা নামিয়ে রাখা। অবস্থা অনুমান করে লাঞ্চের শেষে এক প্রস্ত ব্ল্যাক কফি খাবার পরও হ্যাঙ্গোভার কাটেনি, অফিসে ফিরে কফি চেয়েছিল আবার। তাতে ঢেঁকুর উঠল বার দুয়েক, অস্বস্তিতে তারতম্য হল না কোনও।

কিন্তু, আজ শুক্রবার। কাল অফ, পরশুও। সোমবার ব্যাঙ্গালোরে যেতে হবে দিন দুয়েকের জন্যে। সামনের শুক্রবার হাইগ্রেন ব্যাটারির ক্যাম্পেন প্রেজেনটেসন। আজই শুনেছে বম্বে থেকে থটশপও স্পেকুলেসনে নামছে। ওদের ভিস্যুয়াল কাজ খুবই ইমপ্রেসিভ, ডিজাইন দিয়েই মাত করতে পারে। হাইগ্রেনের মার্কেটিং ডিরেক্টর শিবাজী রাও অবশ্য খুবই প্রফেসনাল লোক, অপরেশের ওপর আস্থা রেখেই গিলবার্ট মরিসন থেকে অত বড় এবং এতকালের পুরনো অ্যাকাউন্ট তুলে এনে দিয়েছে অ্যাকশন গ্রুপকে। এর মধ্যে থটশপ ঢুকে পড়ল কী করে! ওদের নতুন ব্র্যান্ড ম্যানেজার রঞ্জন গিলানি বম্বের ছেলে; ওরই সুপারিশে নয় তো? এমন কি হতে পারে যে রাও সবই জানে, কিন্তু চেপে যাচ্ছে তার কাছে!

যাই হোক, অপরেশ ভাবল, এত সব ঝামেলার মধ্যে বসে বসে ঝিমুনো তার কাজ নয়। নো। ইউ কান্ট অ্যাফোর্ড টু হ্যাভ দ্যাট কাইন্ড অফ লাক্সারি।

এই ভেবে জড়তা কাটানোর জন্যে উঠে দাঁড়িয়েছিল অপরেশ। সিগারেট খাওয়া প্রায় ছেড়েই দিয়েছে আজকাল, ভালোও লাগে না। তবু মাঝে মধ্যে ইচ্ছে হলে, কিংবা কেউ এলে দেবার জন্যে, ড্রয়ারে রাখে। হ্যাঙ্গোভার কাটাতে খানিক আগেই ধরিয়েছে একটা। গত দু দিন বৃষ্টি না হলেও যখন তখন মেঘলা হয়ে যাচ্ছে আকাশ। রোদের বদলে তখন যে-দৃশ্য একাকার ছড়ায় তা শুধুই চোখের আরাম নয়, সাত তলার ওপর থেকে এই ঘেয়ো কলকাতা শহরটাকে করে তোলে সুপার্ব। নয়ন-লোভন না দৃষ্টিনন্দন কী একটা কথা আজকাল প্রায়ই দেখা যায় বাংলা কপিতে, তা-ই। বর্ষা নামে জুনের মাঝামাঝি, তার মানে এখনও দেরি আছে মাসখানেক। আপাতত চেম্বারের মধ্যে পায়চারি করতে করতে চওড়া জানলার ব্লাইন্ড তুলে বাইরের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থাকল অপরেশ। এটা পূর্বদিক। সোজাসুজি তাকালে কবরখানা ছাড়িয়ে চোখ যায় অনেক দূর পর্যন্ত। অনেক দূরে, দিগন্ত ঘেঁষে, মেঘ যেখানে কিছুটা ঘন এবং কালচে, বাঁক নিচ্ছে একটা প্লেন। এয়ারপোর্ট, সম্ভবত, দূরে নয়।

অনির্দিষ্ট খেয়ালে কিছুটা ধোঁয়া গলার মধ্যে ধরে রেখে রিং পাকিয়ে কাচের ওপর ছুড়ে দিতে একজিমার দাগ ফুটল। আবার মিলিয়ে গেল আস্তে আস্তে। মনে হচ্ছে ফিটনেস ফিরে আসছে। চাপ পড়ছে তলপেটে। তখন টয়লেটে গিয়ে কমোডের সামনে দাঁড়িয়ে হাসি টের পেল শরীরে।

লাঞ্চে বেরিয়েছিল লাডলীমোহন সরকার, এম-এস-সি'র সঙ্গে। বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। 'ক্রেজ' সাবানটা বাজারে লেগে যাবার পর বোরোক্রিম ছেড়েছিল, ফেসিয়াল মেক-আপ, সেটাও হিট। অথচ মালে কিছু নেই। নিতান্তই বোরিক পাউডার মোলায়েম করে জুঁইয়ের সুবাস মেশানো। দুটো প্রোডাক্টই চটপট লেগে যাওয়ায় এখন প্যাকেজের দিকে ঝুঁকছে, বলছে ফ্রেঞ্চ ফরমুলেশন নিয়ে আরও তিনটে প্রোডাক্ট ছাড়বে শীগ্রি। খবরটা সীতাই এনেছিল। অপরেশ হিসেব করে দেখল, প্রেস, টি-ভি নিয়ে লাখ কুড়ি-পঁচিশ হেসেখেলে খরচ করবে। ওখানে এখনও প্রফেসনাল লোকজন নেই তেমন; যারা আছে তারা নামেই ম্যানেজার, কাজে ক্লার্ক। লাডলিই সব। গত সপ্তাহে গিয়েছিল সীতাকে নিয়ে। খুঁটি পাকা করার জন্যে আজ লাঞ্চে ডেকেছিল ক্যালকাটা ক্লাবে।

মদ খেতে ভালোবাসে লাডলীমোহন, খেতেও পারে। মেদবহুল ছোটখাটো চেহারায় ওথলানো ভুঁড়ি. বেল্ট নেমে যায় নীচে; সিরিঞ্জ ফুটিয়ে টানলে রক্তের বদলে মদই বেরুবে।

প্রথম দুটো পেগ শেষ করল মিনিট কুড়ির মধ্যে। তারপর চোখ ছোট করে বলল, 'দেখুন মশাই, মিস্টার অপরেশ গুপ্ত, বাঙালি ব্যবসা জানে না এটা ভুল কথা। বাঙালির প্রোব্লেমটা হল গিয়ে মোরাল। ওই ব্যবসা কথাটিতেই অ্যালার্জি। আমি তো সায়েন্সের স্টুডেন্ট, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিলাম। কেমিস্ট। তারপর ভাবলাম মাড়োয়ারি কোম্পানিতে থেকে কী করব। এ তো অন্যের ধুনুচি নিয়ে নেচে নিজের চোখে জ্বাল দেওয়া। বুঝলেন, দেন আই টুক ইট অ্যাজ এ চালাঞ্জ—'

'আপনি একসেপসন—'

বলতে বলতেই নিজের দ্বিতীয় এবং লাডলীমোহনের তৃতীয় ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিয়েছিল অপরেশ।

নীচের পাটির সামনের একটি দাঁত নেই লাডলীর, সম্ভবত সেইজন্যেই যে-কোনও উচ্চারণে হাওয়া ঢুকে পড়ে। কুড়ি লাখের আগ্রহ অপরেশকে সহ্য করতে শেখাল।

'একসেপসন। নো।' গ্লাসে চুমুক দিল লাডলী, প্রায় আধমুঠো কাজু একসঙ্গে পুরে দিল মুখে। দ্রুত চিবোতে চিবোতে বলল, 'নো, নো, নো সার। ইউ আর ট্রাইং টু বি জানারাস। আই অ্যাম ওর্ডিনারি, মোস্ট ওর্ডিনারি। বাট আই অ্যাম এ প্রাউড বাঙালি—'

অদূরে দাঁড়িয়ে হাসছিল ওয়েটার। অনেক ভেবেচিন্তে একটি নিরাপদ কোণ বেছে নেওয়া সত্ত্বেও অপরেশের সন্দেহ হল, সম্ভবত সে নিরাপদ নয়। গলা ক্রমশ চড়ছে লাডলীর, ভঙ্গির নাটকীয়তাও। ক্লায়েন্ট হ্যান্ডলিংয়ে তুখোড় হওয়া সত্ত্বেও আগে কখনও এমন একটি লোকের সান্নিধ্যে এসেছে বলে মনে পড়ে না। তফাত এইটুকু, বিউটি প্রোডাক্টস এখনও ছোট, লাডলীমোহনকেও চেনে না বিশেষ কেউ। পরিচিত হবার আগে ঘায়েল করতে পারলে আখেরে কাজ দেবে।

'ইউ আর রাইট। অ্যাবসোলিউটলি রাইট।' সামনে ঝুঁকে অপরেশ বলল, 'বাঙালিদের সম্পর্কে আপনার ধারণাটা খুবই কারেক্ট।'

'কারেক্ট নয়। বলুন।'

অপরেশ হাসল।

কালো মুখের ওপর সরু সোনালি ফ্রেমের চশমায় ভারী দেখাচ্ছে লাডলীমোহনকে। বাদামের প্লেটের দিকে হাত বাড়িয়েও তুলল না আর, পরিবর্তে কাঁধ চমকে হেঁচকি তুলল।

ব্যাকব্রাশ করে চেপে বসানো চুলের গোড়ায় চিকচিক করছে ঘাম। অপরেশকে লক্ষ করতে করতে লাডলীমোহন বলল, 'ইউ আর অলসো কারেক্ট। দ্যাটস হোয়াই আপনাকে দেবো বলে ঠিক করেছি।'

নিচু গলায় অপরেশ বলল, 'সো কাইন্ড অফ ইউ।'

'আরে না, না। আপনাদের কাজ তো আমি দেখেছি। ভেরি গুড, ভেরি পোফেসনাল।' অল্প থেমে গলা চুলকাল লাডলীমোহন। মুখ মোছার জন্যে পকেট থেকে রুমাল বের করে বলল, 'তবে, মশাই, আমাদের সবই বিউটি প্রোডাক্ট। ফর ফিমেল ফোক। আপনি আমি এসব বুঝব না। আপনাদের ওই মিসেস চৌধুরী, সি উইল আন্ডারস্ট্যান্ড। আন্ডারস্টুড?'

'নিশ্চয়ই।'

লাডলীকে তৃতীয় গ্লাসটি শেষ করতে দেখে ইশারায় ওয়েটারকে ডাকল অপরেশ, নিজের জন্যেও বলবে কি না ভাবল। লোকটির মুড এসে গেছে, এখন যতক্ষণ নিজে থেকে ব্যস্ততা না দেখায় ততক্ষণই সঙ্গ দিয়ে যেতে হবে। অন্তত তিনটে পর্যন্ত। তার আগে অর্ডার নেওয়া বন্ধ হবে। তাতে আপত্তি নেই, যদি না ক্রমশ ন্যুইসেনসে পরিণত হয় লোকটি। এসব ভেবে আরও এক দফা অর্ডার দিয়ে মেনু আনতে বলল অপরেশ। গরম লাগছে; গুমোট নাকি এয়ারকন্ডিশনারেরই ভোল্টেজ কমানো বুঝল না ঠিকঠাক। অভব্যতা হলেও সম্ভবত এখন সে টাইয়ের নটটা একটু আলগা করে নিতে পারে।

চোখ থেকে চশমা খুলে টেবিলের ওপর রাখল লাডলীমোহন। ডান হাতের উল্টোপিঠে চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'বিউটিফুল ওম্যান, বিউটিফুল প্রোডাক্টস। আচ্ছা মশাই, আপনাদের ওই, কী বলে, মিসেস চৌধুরীকে মডেল করলে কেমন হয়?'

'হ্যাঁ, এটাও ভাল আইডিয়া।' বলার জন্যেই বলল অপরেশ, 'তবে ক্যাম্পেন করার সময় হলেই এসব ভাবা যেতে পারে—'

'আ-রে, ক্যাম্পেন আপনারা পেয়েই গেছেন ধরে নিন। নেক্সট উইকটা বাদ দিয়ে আসুন একদিন, পাকা কথা বলে নেবো। বাট ইট ইজ ডান।'

ডান বলতে ডানই। ইতিমধ্যে অন্য কোনও ফ্যাসাদ না জুটলে বিউটি প্রোডাক্টস অ্যাকাউন্টের মোটা অংশ পাচ্ছেই ধরে নেওয়া যায়। কিন্তু, এখন, নিরপেক্ষতার মধ্যে দাঁড়িয়ে লাডলীর কথাবার্তা আগাগোড়া অনুসরণ করতে গিয়ে অপরেশের মনে হল অ্যাকশন গ্রুপের প্রতি ওর আগ্রহের পুরোটাই ব্যবসার স্বার্থে নাও হতে পারে। অপরেশের চেষ্টা ছিল হালকা আলাপের মধ্যে দিয়ে ওদের ভবিষ্যৎ মার্কেটিং পরিকল্পনার কিছু কথা জেনে নেওয়া, যাতে কাজে নামার আগেই মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পারে। লোকটা সেদিক দিয়েই গেল না। মনে হচ্ছে সীতার প্রতি আলাদা আকর্ষণ তৈরি হয়েছে একটা, সেটাই সব; সেই আকর্ষণ থেকেই আগ্রহ। এমনকী ওকে মডেল করার কথাও তুলল। দ্যাটস ব্যাড ইনডিড। যদি সেরকম কোনও মতলব থেকে থাকে লাডলীর তাহলে এই অ্যাকাউন্ট নেওয়া আদৌ সঙ্গত হবে কি না তা ভেবে দেখা দরকার। এরকম হতে থাকলে সীতাও তার সুযোগ নিতে পারে। সেটা হতে দেওয়া উচিত হবে না। অ্যাকশন গ্রুপে সীতাকে যখন নিয়েছিল তখনই অবশ্য জানত কাজকর্মে দক্ষ এবং অ্যাগ্রেসিভ হওয়া ছাড়াও ওর মুখ এবং চেহারার চটকও কিছুটা হেল্প করবে এজেন্সিকে। কিন্তু, এভাবে নয়। ব্যক্তি যেখানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বড় হয়ে ওঠে সেখানে প্রতিষ্ঠান বাঁচিয়ে রাখাই দায় হয়ে দাঁড়ায়

শেষ পর্যন্ত। এ ধরনের ব্যবসায় অবশ্য সে-ভয়টা থেকেই যায় শেষ পর্যন্ত। তার নিজের বেলাতেও তাই হয়েছিল। নিজে এজেন্সি খোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে গিলবার্ট মরিসন থেকে অন্তত তিনটি বড় অ্যাকাউন্ট সরিয়ে আনতে পেরেছিল তার কারণও ক্লায়েন্টদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সম্পর্কের জোর। কিন্তু সেটা ছিল প্রফেসনাল এবিলিটি, সেই সূত্রেই ক্লায়েন্টদের আস্থা অর্জনের ব্যাপার। এক্ষেত্রে দক্ষতা দেখানোর সুযোগই হল না কোনও, কিন্তু ইতিমধ্যেই ধারণা সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে রূপ, সৌন্দর্য নিয়ে। না, অপরেশ খুব দৃঢ়ভাবে ভাবল, বিউটি প্রোডাক্টসের অ্যাকাউন্ট নিলেও সীতাকে সামনে রাখা ঠিক হবে না। মেয়েদের ব্যবহার্য জিনিস হলেই তার বিজ্ঞাপন পরিকল্পনার জন্যে মেয়েদেরই দরকার হবে, লাডলীর এই ধারণাটা ভেঙে দেওয়া দরকার। আর, তা যেভাবেই করা হোক, সীতাকে বুঝতে দেওয়া যাবে না। এমনিতেই মেজাজি সীতা; নিজেরটা ছাড়া আর কারুরও যে দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে কোনও সেটা বুঝতে চায় না সহজে। অন্যকে ভুল বোঝাতেও সীতার জুড়ি নেই।

কিছুটা আত্মগত হয়ে পড়েছিল অপরেশ। টেলিফোনে রিং হতে সরে এসে রিসিভার তুলল।

'গুপ্তা—'

পি-বি-এক্স থেকে মার্টিনা বলল, 'মিস্টার মিত্র ফ্রম গিলবার্ট মরিসন ওয়ান্টস টু স্পিক টু ইউ।'

উত্তর দেবার আগে একটু ভাবল অপরেশ। মিত্র মানে কি ধনঞ্জয়, না অমিত! ধনঞ্জয় হলে চাকরির কথা তুলবে। এক সময়ের সহকর্মী, কিন্তু ওকে আর কীভাবে নেওয়া যাবে এখানে। সোজাসুজি কথাটা বলতে না পারায় কদিন ধরেই এড়িয়ে যাচ্ছে অপরেশ। পুরো নামটা জানতে পারলে ভাল হত।

ইতস্তত করে লাইন দিতে বলল।

ধনঞ্জয় নয়, অমিতই। মরিসনের ক্রিয়েটিভ চিফ। গলার ভাবই চিনিয়ে দেয়।

'হাই, অমিত! কী খবর?'

'খবর তো তোমার। অল রোজ অ্যান্ড হানি—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।' অপরেশ প্রসঙ্গে আসতে চাইল, 'বলো?'

অমিত বলল, 'একটা খবর কনফার্ম করতে চাইছিলাম।'

'কী?'

'অপূর্ব বসু কি তোমার এজেন্সি ছেড়ে দিয়েছে?'

'অপূর্ব! নট দ্যাট আই নো অফ। হোয়াই?'

'ডোন্ট গেট সো কাট আপ, অপরেশ! এরকম একটা কথা শুনলাম। তাই তোমার কাছেই ঠিক খবরটা জানতে চাইলাম।'

'ছেড়ে দিলে নেবে?'

'ইট ডিপেন্ডস।' অমিত ভাঙল না পুরোপুরি। কিছুটা চেপে রেখে বলল, 'ফ্র্যাঙ্কলি, আই নিড সামবডি ইমিডিয়েটলি। গোমসকে তো চেনো। ওকে বম্বেতে ট্রান্সফার করা হয়েছে। রিপ্লেসমেন্ট দরকার। তাই ভাবছিলাম—'

'অপূর্ব কি তোমাকে অ্যাপ্রোচ করেছে?'

'আরে না, না। হি ইজ ইয়েট টু কাম ইনটু দ্য পিকচার।'

অপরেশ গম্ভীর হল। তারপর বলল, 'তাহলে এটা রিউমারই। অপূর্ব আমার এখানেই আছে। আই বিলিভ, থাকবেও।'

'যাক। জানা গেল।' অমিত একটু থামল এবং বলল, 'কপিরাইটার হিসেবে তো ও ভালই? তুমি কি বল?'

'অ্যাকশন গ্রুপে খারাপ কে! আই ডোনট হায়ার ব্যাড ট্যালেন্টস।' আলোচনাটা ঘোরাবার চেষ্টা করল অপরেশ, 'শোনো, তোমার যদি সত্যিই কপিরাইটারের দরকার হয় তাহলে ক্রিয়েটিভ অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মনীষা দত্তকে ট্যাপ করতে পারো। ও কিছুদিন আগে আমাকে অ্যাপ্রোচ করেছিল—'

'অ্যান্ড ইউ রিজেকটেড হার!'

'নো। ইটস নট দ্যাট, অমিত। সি ইজ গুড। বেশ ভাল। তবে আমার ছোট এজেন্সি, এখানে এখনই ওপনিং নেই।'

'ও-কে। লেট মি সি।' কথা শেষ করার ভূমিকা করল অমিত, 'হাউ ইজ এভরিথিং?'

'নট ব্যাড। থ্যাঙ্কস।'

'বাই।'

অমিত মিত্রের সঙ্গে কথা বলবার সময়েই নিজের মধ্যে অগোছালো বোধ করতে শুরু করেছিল অপরেশ; এখন প্রায় হতাশ। একটা রাগের ভাবও এসে যাচ্ছিল মনে। হঠাৎই খেয়াল হল, অপূর্বর সঙ্গে কথা হয়েছিল মঙ্গলবার—সেদিন ও রেজিগনেশন দেয়, আজ শুক্রবার। তাৎক্ষণিক অভিমান ও রাগ থেকেই করেছে এরকম, ভেবেছিল, একান্তে নিজেই বুঝতে পারবে হঠকারিতা। ছেলেটি ভাল, কিন্তু বয়সের তুলনায় একটু অপরিণত, একটু বেশি সেনসিটিভও। লেখার হাত চমৎকার, কল্পনাশক্তি আছে; তার চেয়ে বড় কথা চট করে ঢুকে পড়তে পারে পয়েন্টে। অভিজ্ঞতায় পালিশ বাড়বে ক্রমশ। অ্যাকশন গ্রুপের এই কয়েক বছরে যে তিন চারজনের ওপর এমনকী তার মতো ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট লোকেরও দুর্বলতা জন্মেছে কিছুটা, অপূর্ব তাদের একজন। ফুট কোন্ বেল্ট এর সঙ্গে কোলাবোরেশন পাকা হলে বছরে দুজনকে লন্ডনে ট্রেনিংয়ে পাঠানোর ব্যবস্থা করা যাবে—মোটামুটি ধরে রেখেছিল অপূর্ব যাচ্ছেই, আর একজন কে হতে পারে ভেবে ওঠেনি এখনও। ইতিমধ্যে গোলমাল পাকিয়ে গেল। তিনদিন ভাবনার সময় দিয়েছিল অপূর্বকে, বস্তুত ছুটি, তাহলে আজও ও এল না কেন! অমিত কি সত্যি বলল, নাকি এরই মধ্যে যোগাযোগ করেছে অপূর্বর সঙ্গে। কিছু একটা না ঘটলে ব্যাপারটা জানাজানিই বা হল কী করে!

চিন্তাগ্রস্ত ভাবে ড্রয়ার টানল অপরেশ। সেদিন আলগোছে রাখা অপূর্বর চিঠিটা পাবার সঙ্গে সঙ্গে সিগারেটের প্যাকেটটাও তুলে নিল হাতে। রুচি না থাকলেও আরও একটা ধরাল। ভাষায় অস্পষ্টতা নেই কোনও, গুরুত্ব দিলে মেনেই নিতে হয়। চিঠিটায় চোখ বোলাতে বোলাতে রাগ হল সীতার ওপরে। সিনিয়ারিটির একটা আলাদা দায় থাকে। তা ছাড়া, যে-কোনও মানুষই স্বতন্ত্র; একজন যেটা কিছু না ভেবেই হজম করে নেবে আর একজন তাতে রিঅ্যাক্ট করতে পারে। ওর বোঝা উচিত ছিল অপূর্বর টেম্পারামেন্ট আলাদা, হি ইজ সেনসিটিভ।

ইউ কান্ট টেক এভরিবডি ফর আ রাইড। অপূর্ব চলে গেলে ক্ষতি অ্যাকশন গ্রুপেরই। আজই সকালে স্টুডিয়োতে গিয়ে হাইগ্রেন ব্যাটারির ক্যাম্পেনের ফিনিশড কাজ দেখতে

দেখতে অপরেশের মনে হয়েছিল অপূর্ব হ্যাজ ডান আ ড্যাম গুড জব।

অস্বস্তি থেকে এক ধরনের বিমূঢ়তা এসে গিয়েছিল মনে। আর কাউকে ডেকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করার অর্থ নিজের দুর্বলতা দেখানো। সেটা ঠিক হবে না। স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্যে টান পড়ায় ইন্টারকমের বোতাম টিপে সেক্রেটারি মিসেস সান্যালকে খুঁজল।

'অপূর্ব কি এসেছিল আজ?'

'না। আমি অন্তত দেখিনি।'

'ঠিক আছে। ডিপার্টমেন্টে খোঁজ করুন তো। আর শুনুন, ওর রেসিডেন্সে কোনও টেলিফোন আছে কি না দেখুন।'

'আই উইল ডু দ্যাট। মিস্টার গুপ্ত—'

'মিসেস চৌধুরী কি অফিসে?'

'হ্যাঁ।'

'যদি ব্যস্ত না থাকেন, বলুন আমি খুঁজছিলাম।'

'ও-কে। মিস্টার গুপ্ত—?'

'ইয়েস?'

'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। মিস্টার সুধীন চ্যাটার্জি—'

'সুধীন চ্যাটার্জি? চিনি বলে তো মনে পড়ছে না। এনিওয়ে, হোয়াট ডাজ হি ওয়ান্ট?'

'অ্যাকচুয়ালি, উনি অপূর্বর খোঁজে এসেছিলেন। না পেয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন। হি সেড ইটস ইমপর্ট্যান্ট অ্যান্ড আর্জেন্ট।'

ভুরু কুঁচকে সামান্য সময় নিল অপরেশ। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া সাধারণত কারুর সঙ্গে দেখা করে না সে। এ ক্ষেত্রেও করত না। অসুবিধে হল, অপূর্ব নামটাই এখন জরুরি মনে হচ্ছে। ভেবেচিন্তে বলল, 'ঠিক আছে। পাঠিয়ে দিন।'

বাইরের কল। ইন্টারকম ছেড়ে ব্যস্ত হাতে রিসিভার তুলে নিল অপরেশ।

'গুপ্তা।'

'গুড আফটারনুন। গিলানি হিয়ার।'

'ইয়েস, মিস্টার গিলানি, গুড আফটারনুন। ফরমাইয়ে।'

কথার মধ্যেই দরজা ঠেলে ঢুকল মিসেস সান্যাল। সঙ্গে এক যুবক। ঈষৎ রোগা ও লম্বা, কিছু বা রুক্ষতা মেশানো মুখ। ব্রণের দাগের জন্যেই সম্ভবত। পরনে চোস্ত এবং গলা-উঁচু খদ্দরের পাঞ্জাবি। হাত তুলে নমস্কার করতে ইশারায় তাকে বসতে বলল অপরেশ। চাপা একটা দুর্গন্ধ উড়ে এল নাকে। সম্ভবত কিছু মাড়িয়ে এসেছে; আর কোনও কারণেও হতে পারে।

গিলানি বলল, 'সামনের শুক্রবার প্রেজেনটেশন হচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ। পাক্কা। আমি একটা চিঠিও দিয়েছি কনফার্ম করে। পেয়ে যাবে। ফ্রাইডে, থ্রি পি-এম।'

'নিশ্চয়ই। চমৎকার!' গিলানি তার বাংলা জ্ঞান দেখাল। তারপর সিরিয়াস গলায় বলল, 'দ্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর ওয়ান্টস টু বি প্রেজেন্ট।'

'ও! দ্যাটস লাভলি! উই আর অনারড।'

'থ্যাঙ্কস দেন।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

গন্ধটা ভাসছিল তখনও। এড়াবার জন্যেই প্রায় শেষ হওয়া সিগারে জোরে টান দিয়ে টুকরোটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল অপরেশ।

'বলুন?'

সোজাসুজি অপরেশের চোখের দিকে তাকাল যুবক।

'বিমলকৃষ্ণ বসুর ছেলে অপূর্ব বসু এখানে কাজ করেন?'

'হ্যাঁ। কেন বলুন তো?' প্রশ্নটা করেই কথা ঘোরাবার চেষ্টা করল অপরেশ, 'উনি কদিন ছুটি নিয়েছেন—'

'আমি অবশ্য ওঁকে চিনি না।' পাঞ্জাবির পাশ-পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা বড় ভাঁজ-করা কাগজ বের করতে করতে যুবক বলল, 'আমার নাম সুধীন চ্যাটার্জি। মিস্টার বসুর বাবা—মানে বিমলকৃষ্ণ বসু—আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন—'

'আই সি! কী ব্যাপার বলুন তো?'

কাগজের ভাঁজ খুলতে খুলতে সুধীন বলল, 'মে মাসের এন্ডে আমাদের পার্টির স্টেট কনফারেন্স। আমরা কলকাতার কাগজগুলোতে ফুলপেজ অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাই।'

'দ্যাটস ভেরি ইন্টারেস্টিং!' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল অপরেশ, যাতে দু এক মুহূর্তের জন্যেও অন্তত অস্বস্তিকর গন্ধটা এড়ানো যায়। তারপর সুধীনের বাড়ানো হাত থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে দ্রুত চোখ বুলিয়ে বলল, 'কিন্তু, এ তো অনেক টাকার ব্যাপার?'

'টাকাটা প্রব্লেম নয়। যদি কপিটা ঠিকঠাক করে দেন এবং ঠিক কত টাকা খরচ পড়বে জানান—'

এই সময় সীতা এল। ভিজিটার আছে দেখে ঈষৎ থমকিয়ে বলল, 'সরি। আমি পরে আসব।'

'নো, নো। প্লিজ কাম ইন।'

সুগন্ধই চিনিয়ে দেয় ক্রিস্টিয়ান দিওর। গত মাসে লন্ডন থেকে ফেরার ফ্লাইটে মনে পড়েছিল সীতাকে, তখনই কিনেছিল। মনে হচ্ছে এই মুহূর্তটির কথা ভেবেই। সীতা বুঝবে না। আপাতত স্বস্তি আড়াল করে অপরেশ বলল, 'আলাপ করিয়ে দিই। মিসেস সীতা চৌধুরী, মাই কোলিগ। আর ইনি, সুধীন চ্যাটার্জি।'

সীতা 'হ্যালো' বলতে নমস্কারের ভঙ্গিতে হাত জোড় করে উঠে দাঁড়াল সুধীন। দাঁড়িয়েই থাকল।

এর বেশি সময় দেওয়া যায় না। যুবক কী চায় এরই মধ্যে তা জেনে নিয়েছে অপরেশ। এটাও বুঝতে পারছিল টাকা প্রব্লেম হবে না—বিশেষত সুপারিশটা যখন অপূর্বর বাবার। তেমন বুঝলে অ্যাডভান্সও চেয়ে নিতে পারে। কাজও সামান্য। যতটা চাইছে ততটা সত্যি-সত্যিই খরচ করলে কমিশন থেকেই স্ট্রেট উঠে আসবে পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা। উইন্ডফল! মে বি। এটা ঠিক অপূর্ব এখানে আছে জেনেই কাজটা অ্যাকশান গ্রুপে পাঠানো; অন্য কোনও এজেন্সি পেলে লুফে নিত। থ্যাঙ্ক ইউ, অপূর্ব, সুধীনকে কিছু বলার আগে মনে মনে বলল অপরেশ, আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ। নিজেও উঠে দাঁড়াল।

'ঠিক আছে, মিস্টার চ্যাটার্জি। ভাল করে দেখে নিই, আফটার অল আপনাদের কাজে স্পেশাল কেয়ার নিতে হবে। খুব তাড়া নেই তো?'

'তাড়া মানে—', চেয়ার ছেড়ে বেরিয়ে আরও একবার সীতাকে দেখে নিয়ে সুধীন বলল, 'দিন পনেরো সময় আছে। কিন্তু কাজটা তো আগে করতে হবে!'

'হ্যাঁ, অবশ্যই।' সীতার পিছন দিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে এল অপরেশ, 'ধরুন সোমবার? অ্যারাউন্ড দিস টাইম?'

'হ্যাঁ, তাহলেই হবে।'

'আমি একটু বাইরে যাচ্ছি দিন দুয়েকের জন্যে। তাতে অসুবিধে হবে না। আপনি মিসেস চৌধুরীকে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। যদি বলেন, উনিও কন্ট্যাক্ট করতে পারেন আপনাকে। ফোন কি আপনার পার্টি অফিসেই?'

'হ্যাঁ। কিন্তু—', অল্প ইতস্তত করে সুধীন তাকাল সীতার দিকে, 'আমিই আসব। আপনি থাকবেন তো? এই সময়?'

সরাসরি জবাব না দিয়ে অপ্রস্তুত দৃষ্টিতে একবার যুবকটিকে, তারপর অপরেশকে লক্ষ করল সীতা।

'হোয়াট ইজ দিস অল অ্যাবাউট? আমি তো কিছুই জানি না।'

'আই উইল টেল ইউ হোয়াট।' অপরেশ তৎপর হল, 'যদি কোনও কারণে না থাকেন উনি, আপনাকে জানিয়ে দেবেন।'

'আচ্ছা। নমস্কার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। বিমলকৃষ্ণবাবুকে আমার রিগার্ডস জানাবেন।'

বিমলকৃষ্ণকে প্রত্যক্ষ ভাবে না চিনলেও, অপরেশের মনে হল, কথাটা এইভাবেই বলা উচিত। তবে একেবারেই চেনে না তা নয়। উপলক্ষের স্মৃতি নেই; অপূর্বর নিমন্ত্রণে একবার গিয়েছিল ওঁর বাড়িতে, সম্ভবত ডিনারে। সম্ভবত বীথিও ছিল সঙ্গে। এমনও হতে পারে কোনও উপলক্ষ ছিল না, এমনিই। ঠিকঠাক উপলক্ষের অভাবে অনেক জীবন্ত ঘটনাই হারিয়ে যায় ক্রমশ।

দরজাটা খুলে ধরেছিল অপরেশ। নিঃশ্বাস আটকানো। যুবকটি বেরিয়ে যেতে পিছন থেকে খুব মনোযোগ দিয়ে ওর চলন্ত পা দুটি লক্ষ করল। কোলাপুরি চটি। পায়ের চেটো চেপে হাঁটায় তেমন কিছু নজরে পড়ে না, এমনকী গন্ধটা আছে কি নেই তা পর্যন্ত বোধগম্য হল না। ভিতরে এসে সুধীন যেখানে বসেছিল কার্পেটের সেই জায়গাটায় ঝুঁকে তাকাল। না, যা ভেবেছিল তা নয়, নষ্ট হয়নি। কাঁচা ও মেটে রঙের তালমিছরির গুঁড়োর মতো কিছু চোখে পড়ল অবশ্য, তবে সেটা অন্য কেউও এনে থাকতে পারে। ব্যস্ত হবার কারণ নেই।

ওই বিচিত্র ভঙ্গিতে অপরেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সীতা জিজ্ঞেস করল, 'হোয়াটস রং। কী খুঁজছ?'

'কী খুঁজছি?' অপরেশ সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর হেসে বলল, 'দ্য স্মেল অফ ফিফটি থাউজেন্ড রুপিজ। বুঝলে, পঞ্চাশ হাজার টাকার গন্ধ!'

'মানে!'

'বোসো। বলছি।'

নিজের চেয়ারে ফিরে গিয়ে সুধীনের রেখে যাওয়া কাগজটা তুলে সীতার দিকে এগিয়ে দিয়ে অপরেশ বলল, 'পড়ে দ্যাখো। বিজনেস ওয়ার্থ ফোর, ফাইভ ল্যাকস। ফুল পেজ ইন অল নিউজ পেপারস। পেইমেন্ট ইন অ্যাডভান্স—'

সীতা বসেনি। কাগজটাই পড়ছে।

'ইন্ডাস্ট্রির আর কী টাকা! টাকা এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর হাতে। অ্যান্ড দে ডু নট হ্যাভ এনি প্রফেসনাল ডিম্যান্ড।'

বলতে বলতেই একরকম হাসি ছড়িয়ে পড়ল অপরেশের মুখে। খুশির নয়, ব্যঙ্গেরও নয়; বরং দুই-ই মেশানো। এখন দেখলে বোঝা যাবে না খানিক আগে হ্যাঙ্গোভারে ভুগছিল। খোলা গলায়, প্রায় বলার জন্যেই বলল, 'দার্শনিকেরা রিপাবলিকের ব্যাখ্যা করেছেন, পাবলিকের নয়। পাবলিক মানেই মুখ নেই, চোখ নেই, কান নেই, পেট নেই, খিদে নেই। সুতরাং, পাবলিকের টাকা নিয়ে তুমি যা ইচ্ছে করতে পারো—'

'ফিলজফি!' সীতার পড়া হয়ে গিয়েছিল। ঈষৎ পরিহাস মিশিয়ে বলল, 'তাহলে পঞ্চাশ হাজার টাকাই তোমাকে দার্শনিক করে তুলতে পারে?'

'ঠাট্টা নয়, সীতা। এটাই বাস্তব।'

'তাতে তোমার কী এসে যায়! বরং কলকাতার ক্লায়েন্টদের একটা গ্র্যান্ড পার্টি দেবার কথা ভাবছিলে, এই টাকায় সেটা প্ল্যান করতে পারো। উই ক্যান ট্রিট দেম উইথ শিভাস রিগ্যাল। কিংবা, ধরো, ক্যান্ডিতে সাতদিন—'

অপরেশ গম্ভীর হল। সীতার এই সমানে সমানে কথা বলার চেষ্টা, ঠাট্টা, ইয়ার্কি মাঝে মাঝে অস্বস্তিতে ফেলে দেয় তাকে। মনে হয় ডোমিনেট করার চেষ্টা করছে। এখন ভাবল, অ্যাকশন গ্রুপের পক্ষে সীতা কি এতই জরুরি! নাকি ওর প্রগলভতার দায় তারই, জড়িয়ে পড়ছে নিজেরই দুর্বলতার জালে! সবটাই ব্যবসার স্বার্থে? একই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল সেদিন অপূর্বর সঙ্গে কথা বলবার সময়; অপরেশ কি বলেছিল আমি না চাইলেও অ্যাকশন গ্রুপে সীতার প্রয়োজন আছে? যা বলেছিল তা কি সত্য!

সীতা বসেনি। অপরেশের হঠাৎ অন্যমনস্কতা এবং গাম্ভীর্য তাকেও চিন্তিত করে তুলেছিল হয়তো। আঁচলটা যেভাবে সরাল তাতে অধৈর্যই ফোটে। অপরেশকে দেখতে দেখতে বলল, 'দিস ম্যান, চ্যাটার্জি, এখানে এল কী করে?'

'অপূর্বর বাবা পাঠিয়েছেন।'

সীতার ভুরু ও কাঁধ সঞ্চালনে অবজ্ঞার ভাব। চোখ বাইরে। না তাকিয়েও অপরেশ অনুমান করল মেঘ এখন অনেক ঘন, সম্ভবত বৃষ্টি হবে।

'তুমি কি চেনো তাঁকে?'

'শুনেছি। এম-এল-এ।'

অপরেশ কথা বাড়াতে চাইল না। সীতাকে ডেকে পাঠিয়েছিল অপূর্বর ব্যাপারটা আলোচনা করবার জন্যে; মাঝখান থেকে সুধীন চ্যাটার্জি এসে পড়ায় প্রসঙ্গ পাল্টে গেল।

নৈঃশব্দ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে ক্রিস্টিয়ান দিওরের সুগন্ধ। তার খানিকটা নিশ্বাসে টেনে নিয়ে অপরেশ বলল, 'আমি রাধাকৃষ্ণকে বলছি কপিটা প্রেজেনটেবল করে দিতে। মনোজ ক্যান ড্র ইট। কলকাতার সব ডেইলিগুলোকে নিয়ে মিডিয়া কস্টের একটা এস্টিমেট দিতে হবে। প্লিজ অর্গানাইজ এভরিথিং। সোমবার দুপুরে কি তুমি ফ্রি থাকছ?'

'ডোন্ট ওয়ারি।' সীতা বলল, 'আই উইল ম্যানেজ ইট।'

কিছুক্ষণ আগেকার উজ্জ্বলতা নেই। আড়ে তাকালে নাভির চিহ্ন চোখে পড়ে। কোমরের উন্মুক্ত মাংস জুড়ে সোনালি আভা। কোমরের ঘেরে চেপে বসা পিকক ব্লু'র মসৃণ ও

রহস্যময় ঢল মনে পড়িয়ে দেয় বীথিকে, তার প্রায়ই-রুগ্‌ণ স্ত্রী—অকালেই বুড়িয়ে যাওয়া, কিন্তু নীরব ও কর্তব্যপরায়ণ। কিছু বা সন্দেহগ্রস্তও, যদিও মুখ ফুটে বলে না কিছুই। দাম্পত্যজীবনের উদাসীন অভ্যাস থেকে অপরেশ বুঝতে পারে, নিজের অসহায়তা লুকোনোর কোনও চেষ্টাই বীথির নেই। মেয়ে, সুজাতা, আঠারোয় পড়ল; মায়েরই মতো ঠাণ্ডা ও চুপচাপ সে। যাদের আচরণে বিরুদ্ধতা নেই, যাদের প্রতিপক্ষ ভাবা যায় না, নৈতিক দায়িত্বটা বোধহয় তাদের জন্যেই বেশি করে বোধ করতে হয়।

নিঃশ্বাসের ভার নামিয়ে সীতাকে দেখল অপরেশ এবং বলল, 'দিস ম্যান ওয়াজ অ্যান ইনটারাপশান। আমি তোমাকে ডেকেছিলাম অন্য কারণে—'

'বলো।'

সীতার স্বর গম্ভীর, কিছুটা *ঠেলে* বেরুল। মুখের লাবণ্যে ছায়া; হালকা আইল্যাশ নারকেল পাতার জাফরি মনে পড়ায়। ওর আকস্মিক বৈপরীত্যের কারণ বুঝতে পারল না অপরেশ।

মুহূর্তের জন্যে চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল সীতা। আলগা হয়ে আসা আঁচলের প্রতি এখন আর মনোযোগ নেই, ওর লো-কাট স্লিভলেস ব্লাউজ অনেকটাই দেখায়। সুগঠিত বুকের ওঠানামা চিনিয়ে দেয় নিঃশ্বাস এখন স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত। একটা চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ, সেই চেয়ারটিতেই বসতে পারত। তা না করে সরে গেল ডানদিকে। অয়েল পেন্টিংয়ের নীচে সোফায় গিয়ে বসল।

ওকে লক্ষ করতে করতেই দরজার বাইরে 'এনগেজড' লাইটের সুইচ অন করে দিল অপরেশ, যাতে এমনকী মিসেস সান্যালও ঢুকতে না পারে।

'কফি খাবে?'

'নো। থ্যাঙ্কস।'

অপরেশ হাসল। সীতা সম্ভবত আঁচ করেছে কিছু—সে প্রস্তুত হবার আগেই প্রস্তুত করে নিচ্ছে নিজেকে। এতে টেনশন বাড়ে, যে-কোনও কথাতেই যুক্ত হতে পারে বাড়তি অর্থ। এসব ভেবে তখনও টেবিলের ওপর পড়ে থাকা প্যাকেটটা তুলে নিল সে। অফারের ধরনে সিগারেট বের করে বলল, 'দেন হ্যাভ আ ফ্যাগ অ্যান্ড রিল্যাক্স—'

'কী ব্যাপার! সিডিউস করবে নাকি!'

সীতা সীতাই। এই মুহূর্তে, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়, ওর ঠোঁটে যে হাসি বিচ্ছুরিত হল, 'টাইম' ম্যাগাজিনের ক্যাপশনে তাকেই মিলিয়ন ডলার স্মাইল বলে। এরকম ও-ই হাসতে পারে। বলতে পারত, সিডিউস। তোমাকে। বলল না। বরং অপরেশ খুশি হল বাড়ানো প্যাকেট থেকে সিগারেট নেবার জন্যে ওকে উঠতে দেখে। তখন নিজেও উঠল এবং কিছুটা ঝুঁকে ওর চিবুক থেকে মাপা দূরত্বে লাইটার জ্বেলে দু আঙুলের মাঝখানে ধরা সিগারেটটা ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'একটা ব্যাপার হয়েছে। ভাবলাম তোমার সঙ্গে ডিসকাস করি। অ্যাজ ইউ নো ইউ, অলওয়েজ শেয়ার আওয়ার ভিউজ—'

সীতা জবাব দিল না। বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে যথার্থই রিল্যাক্সড হবার ভঙ্গিতে এলিয়ে বসে টান দিল সিগারেটে।

'সমস্যাটা অপূর্বকে নিয়ে—।' অনেকক্ষণ পরে ঠিকঠাক বক্তব্যে চলে এল অপরেশ, অ্যাশট্রেতে ছাই ঝেড়ে বলল, 'গিলবার্ট মরিসন সম্ভবত ওকে নিচ্ছে। আই অ্যাম নট ভেরি

সিওর। তবে, আমাদের চিন্তিত হবার কারণ আছে।'

সীতা নড়ে বসল সামান্য।

'অপূর্ব জানিয়েছে?'

'না। অন্তত আজ ওর আসা উচিত ছিল। আসেনি দেখে মনে হচ্ছে ও ওর রেজিগনেশনটাকেই ফাইনাল ধরে নিয়েছে—'

কয়েক মুহূর্ত অপরেশের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল সীতা। সামনে ধোঁয়া ছড়ানো। তারপর জ্বলন্ত সিগারেটটা কাচের টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ফেলে দিয়ে বলল, 'তুমি কি এর জন্যে আমাকে ব্লেম করতে চাইছ?'

'নো। নট দ্যাট। এটা কাউকে ব্লেম করার ব্যাপার নয়।' নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অপরেশ বলল, 'অপূর্ব কী ভাবছে না ভাবছে আমি জানি না। তবে তুমিই বোধহয় ওকে বোঝাতে পারো—'

'আমি? আমি কেন!'

সীতার গলায় ঝাঁঝ। যা বলতে চাইছে তা বলা উচিত কিনা ভাবল অপরেশ, এরই মধ্যে সীতার মনের বাধা টের পেয়েছিল সে। তখন জোর দিয়েই বলল, 'লেট আস বি ফ্র্যাঙ্ক। ওর সঙ্গে তোমার কী হয়েছিল তা জানি না। তুমি এক কথা বলেছ, অপূর্ব আর এক। বাট হি ফেল্ট ইনসালটেড—ভেরি মাচ ইনসালটেড। অপমানবোধ সকলের একরকম হয় না—'

সীতা চুপ করে থাকলেও চোখমুখের অস্বস্তি এড়াতে পারল না।

'তুমিই এক সময় অপূর্ব সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলে। তোমার ঘরে অনেক দিন আমি ওকে বসে থাকতে দেখেছি। ইনডিড ইউ ওয়্যার ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। সেদিন তাহলে এমন কী ঘটেছিল—'

কথাটা শেষ করল না অপরেশ। সীতাও আগের মতো; নতমুখে, গম্ভীর, চেপে রাখা আবেগের জন্যেই কি না কে জানে স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে মুখে।

অ্যাকশান গ্রুপে এ পর্যন্ত যারা এসেছে তারা কেউই ছেড়ে যায়নি। অপূর্ব চলে গেলে সেটা অস্বস্তিকর হবে। তাছাড়া—', অপরেশ বলল, 'যদি ও ভুলও করে থাকে, ও তোমার চেয়ে বয়সে ছোট, লাইক ইওর ব্রাদার—'

'কী বলতে চাইছ!' সীতা উঠে দাঁড়াল। শরীরের ঝটকায় আঁচল খসে পড়েছে গা থেকে; দেয়ালের চক্ষুহীন নারীর অয়েল পেন্টিংয়ের অনেকটাই আড়াল করে, কনুই থেকে ঈষৎ সামনের দিকে তোলা হাতের মুঠোয় জোর এনে বলল, 'ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু টেক হিম অন মাই ল্যাপ অ্যান্ড কিস হিজ ফেস!'

এই প্রতিক্রিয়া আশা করেনি অপরেশ। সুতরাং, থমকে গেল। এমনও হতে পারে রাগ নয়, অপূর্ব সম্পর্কে খবরটাই বিচলিত করেছে সীতাকে, মনে মনে নিজেকে দোষী ভাবলেও অপরেশের খবরদারি মেনে নিতে পারছে না। কারণ যা-ই হোক, এতটা অসংযত হওয়া ভাল নয়।

সীতাকে ধাতস্থ হবার সময় দিয়ে দৃঢ় কিন্তু সংযত গলায় অপরেশ বলল, 'উইমেন আর নট মেড ফর ল্যাপিং অ্যান্ড কিসিং ওনলি। আমার মনে হয় তুমি ওভার রিঅ্যাক্ট করছ। প্লিজ, আমি তোমার সাহায্যই চাই।'

ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছিল সীতা। যেখানে বসেছিল আবার সেইখানেই বসে আঙুল বুলিয়ে চোখের কোণ মুছতে লাগল। দেখে মনে হবে নিজেরই ভিতরে, মগ্ন, অপরেশ কী বলেছে না বলেছে ঠিকঠাক শোনেনি।

'সেনসিটিভ ছেলে। তুমি দুটো মিষ্টি কথা বললেই কাজ হবে। ফ্র্যাঙ্কলি, অপূর্বর ব্যবহার এতই চাইল্ডিশ যে আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াতে চাইছি না।'

অপরেশ থামল একটু। তারপর বলল, 'অফিসিয়ালি, দ্যাট উড বি টু মাচ।'

সীতা জবাব দিল না। না-নেভানো সিগারেট থেকে ধোঁয়া উঠছে এখনও, দৃষ্টি সেদিকে। দাঁত ঘষছিল ঠোঁটে। দেখতে দেখতেই ঝুঁকে আঙুলের ডগায় তুলে ঘষে ঘষে নেভাল সিগারেটটা। উঠে দাঁড়াল চকিতে। সম্ভবত বেরিয়ে যাবে। যেতে যেতেই থেমে এবং ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলব—'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল সীতা। ক্রমশ তার সুগন্ধও।

একা চেম্বারে দু হাতের আঙুলগুলো পরস্পর জড়িয়ে শরীর টান করল অপরেশ। একটা ঝক্কি গেল যা হোক। জানে সীতার গোঁ আছে, তার কথায় যা-ই ভেবে থাকুক, বলেছে যখন তখন নিশ্চয়ই কথা বলবে অপূর্বর সঙ্গে এবং ফিরিয়েও আনবে ওকে। তবে অপূর্বকেও ধমকানো দরকার। যদি সত্যি-সত্যি অ্যাকশন গ্রুপে আর না থাকার ইচ্ছে থাকে ওর, তাহলেও তার সঙ্গে দেখা করে ইতিমধ্যে বলে যেতে পারত কথাটা, ফোনও করতে পারত। এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকজন নিয়ে কোম্পানি চালানো যায় না। যদি এমন হয় যে সীতা কথা বলল, বোঝাল , এবং তা সত্ত্বেও নিজের রোখ ছাড়ল না অপূর্ব, তাহলে, অপরেশ ঠিক করল, সে নিজেই ওর রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করে চিঠি পাঠিয়ে দেবে। আপাতত সে ধরে নিচ্ছে এটা সীতা এবং অপূর্বর নিজেদের ব্যাপার।

এনগেজড লাইটের স্যুইচ অফ করতে গিয়ে শীত অনুভব করল অপরেশ। প্রায় পাঁচটা। এর পর ছুটি হবে। তার আগে রাধাকৃষ্ণনকে ডাকা দরকার। অ্যানাউন্সমেন্টের কপিটা বুঝিয়ে দিয়ে বলবে সীতার সঙ্গে কথা বলতে। যা করার সীতাই করবে।

আবার ইন্টারকম তুলল অপরেশ। মিসেস সান্যালকে বলল রাধাকৃষ্ণনকে পাঠিয়ে দিতে। তখনই শুনল অপূর্ব এখন যেখানে থাকে সেখানে টেলিফোন নেই। 'এনিওয়ে, ফরগেট ইট—', বলল; সীতার সঙ্গে আলাপের পর ফোন থাকা না-থাকাটা এখন আর খুব জরুরি নয়।

সত্যিই শীত-শীত লাগছে। এয়াকন্ডিশনার অ্যাডজাস্ট করার জন্যে উঠে দাঁড়িয়ে দেখল বৃষ্টি নেমেছে। তেমন জোরে না হলেও নেমে আসা মেঘে এবং ধোঁয়ায় ঝাপসা চারদিক। হঠাৎ চোখে পড়ল মেঘের ভিতর থেকে বেরিয়ে দিকভ্রান্ত একটা চিল ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সোজা এগিয়ে আসছে তার জানালার দিকে। সামান্য সন্ত্রস্ত, বড় পুঁতির মতো কালো ও জ্বলজ্বলে তার চোখ দুটো দেখতে পেল অপরেশ, অন্তত দেখতে পাচ্ছে বলে মনে হল তার—জানলা পর্যন্ত উড়ে এসেও কাচে ঠোক্কর খাবার আগে নখ খুলে, ধারালো ঠোঁট ও জিব দেখিয়ে, ডানা ঝাপটে ফিরে গেল আবার।

অনেক দূর পর্যন্ত চিলটাকে অনুসরণ করল অপরেশ। এবং হারিয়ে ফেলল।

সামনে সীতা। সাত-আট বছর আগে একদিন সন্ধ্যায় ওদের বিডন স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে গিয়ে শুনেছিল ডিভোর্সের মামলা ফাইল করেছে রমেন। এখন আর সীতার সঙ্গে থাকে না।

গিলবার্ট মরিসনে একই সঙ্গে কাজ করত সে আর রমেন—অ্যালকহোলিক হয়ে পড়েছিল, অপরেশ কিছু জানত না তা নয়। তবু, বুঝতে পারেনি কার পক্ষ নেবে। লিভিং ও ডাইনিং রুমের মাঝখানের পার্টিশনে ওদের যুগ্ম ছবিটা তখনও টাঙানো। দু আড়াই বছরের ছেলে বাবলুকে দেখিয়ে সীতা বলেছিল, 'কিছু একটা তো করতেই হবে—'

সেদিন অবশ্য সীতাকে কনভেন্ট এবং লরেটোয় পড়া তুখোড় মেয়ে বলে মনে হয়নি। রূপে চোখ ধাঁধানোর চেয়ে বেশি ছিল অসহায়তা। মাঝে মধ্যের যোগাযোগও কমে আসছিল দেখতে দেখতে। পরে শুনেছিল চাকরি নিয়েছে বিদেশি এয়ারলাইনসে। আরও পরে হঠাৎই দেখা হয়ে গেল আগাগোড়া বদলে যাওয়া এক সীতার সঙ্গে—কোনও খবরের কাগজের দেওয়া ককটেলে কি? হতেও পারে। না, হুইস্কি নয়; যতদূর মনে পড়ে, হাতে ছিল অ্যাপেল জুসের বেঁটে গ্লাস। নিজেই এগিয়ে এসে বলেছিল, 'চিনতে পারো?' ততদিনে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সিতে জয়েন করেছে সীতা—অ্যাবসোলিউটলি ড্যাজলিং অ্যান্ড মাচ ইন ডিম্যান্ড। 'দেখা হবে' বলতে বলতেই চলে গেল বলরুমের আর এক দিকে। রমেন কোথায়, কী অবস্থায়, জানবার সাহস হয়নি। তবে মনে হয়েছিল, ডিভোর্স হতই।

মানুষ বদলে যায়। বহু দূর ব্যাপ্ত বিষণ্ণতার দিকে তাকিয়ে অপরেশ ভাবল, সে নিজেও কি কম বদলেছে!

৩

আজ খুব রোদ। এরকম বর্ণময় কিন্তু নিরুত্তাপ রোদ সচরাচর ওঠে না। কিংবা, যেহেতু সকাল মানেই ব্যস্ততা, অন্তত তার, ছোট ব্যালকনিতে দড়ি বেঁধে ছুড়ে দেওয়া খবরের কাগজটা কুড়োতেই বাইরে আসা এবং তারপর কোনও রকমে সেটায় চোখ বুলিয়ে, দাড়ি কামানো, স্নান করা এবং পুল-কারের জন্যে অপেক্ষা করা ইত্যাদি, উঠলেও চোখে পড়ত না। শনি, রবিবার হলে আলাদা কথা; ছুটি ও সময় অফুরন্ত বলে বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে অসুবিধা হত না। সময় অফুরন্ত বলেই রোদের দিকে কিংবা রোদের ভিতরের ছায়ার দিকে তাকিয়ে থাকা, এমন স্বপ্ন পাগল ছাড়া আর কেউ দ্যাখে নাকি!

কিন্তু গত ক'দিনেই অপূর্বর মনে হচ্ছে গোলমাল হয়ে গেছে সব হিসেব। একরকম থেমে থাকার মধ্যে দাঁড়িয়ে, প্রবাহিত জলরাশির মধ্যে নিস্তরঙ্গ পাথরের মতো, একক উপমা হয়ে, সময় ও চারপাশ সম্পর্কে নতুন অনুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে মনে। ঠিক কী রকম তা বুঝে ওঠা যায় না যদিও। ইচ্ছাধীন, ধরা যায় একটা বিরাট পাহারা বসানো বাড়ির একা বাসিন্দা ছিল সে, অন্তর্বর্তী যা-কিছু তা-ই নিয়েই গড়ে উঠেছিল প্রতিদিন, অভ্যাস, অভিজ্ঞতা। বাইরের কেউ, কিছুই ঢুকত না সেখানে—বাইরের সবকিছুই তার পক্ষেও ছিল নিষিদ্ধ। এখন সমস্তই উন্মুক্ত, সুতরাং একাকার।

ততটাই সচেতন ভাবে না হলেও, অপূর্ব টের পায় ইচ্ছাধীনতায় ক্রমশ ঢুকে পড়েছে এতদিন সম্পর্কশূন্য নানা অনুভব। কোথাও যেন টান নেই কোনও; নেই কী হবে'র ভাবনা। ভাল লাগা এবং না-লাগার মধ্যে তফাত থাকে একটা, বুঝতে পারে; কিন্তু কীভাবে আলা

যাবে এই তফাতটা তা ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই মাথার ভিতরে, মুখের ত্বকে, ঠোঁটের কোণে, নাকের পাটায়, চোখের তলায়, কপালে—প্রায় গোটা শরীর জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এক উদাসীন অন্যমনস্কতা। তারপর দুঃখ থাকে না কোনও।

আজ শনিবার। ছুটির দিন। ছুটি? বস্তুত নিয়মভাঙা সকালে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে দিনটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল মনে। তাহলে সেই মঙ্গলবার দুপুর থেকে এর আগের দিনগুলোকে কী বলা যাবে? বরং শুরু হল আর একটা দিন; জানলার পর্দার স্বল্প ফাঁক দিয়ে ঈষৎ কম্পমান কৌণিক আলোর রেখা পৌঁছে গেছে বেডরুমের খাট পর্যন্ত—এই ভেবে ও দেখে টয়লেটে গেল অপূর্ব। সেখানে থাকতে থাকতেই বেল বেজে উঠল দরজায়। এর অর্থ প্রৌঢ়া যে-মহিলা সকালের চা, টোস্ট, ওমলেট ইত্যাদি চটপট করে দেয় তাকে, ওয়ান বেডরুম এই ফ্ল্যাটের মোছাপোছা করে; গেঞ্জি, রুমাল, আন্ডারওয়্যার কাচে কিংবা লন্ড্রিতে যায়, সে পৌঁছে গেছে; আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুরে এসে হাত দেবে কাজে। শুনেছে বীণাদি—ওই নামেই ডাকে সে—তিলজলার ওদিকে বস্তিতে থাকে। অপূর্ব কখনও তাকে ওইদিক থেকে আসতে কিংবা ওইদিকে যেতে দ্যাখেনি। তবে এখন, টয়লেট থেকে বেরিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো দেখতে পেত তিনতলার ফ্ল্যাটের জন্যে ব্রড স্ট্রিটের মিল্ক বুথ থেকে দুধের বোতল নিয়ে ফিরছে বীণাদি। ওই ফ্ল্যাটে থাকে এক রোগা এবং প্রায় ছ' ফুট ভদ্রলোক, লেটারবক্সে নাম দেখেছে অম্বিকা চৌধুরী, চিবুকে ছুঁচলো দাড়ি, এবং মিস্টার চৌধুরীর প্রায় কাঁধ-সমান লম্বা, কিন্তু বেশ টাইট, মোটাসোটা, ফর্সা, লেপচা ধরনের মুখের স্ত্রী। নাম সম্ভবত মল্লিকা। সম্ভবত, কারণ, গত বছর একদিন গাঢ় ইনফ্লুয়েঞ্জায় অফিসে যেতে পারেনি সে, সকালে কাজ করতে এসে অবস্থা দেখে বীণাদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তিনতলার মল্লিকাবৌদিকে খবর দেব?' কেন মল্লিকাবৌদি তা বুঝতে না পেরে মাথা নেড়েছিল অপূর্ব। দিন তিনেক পরে একদিন সিঁড়িতে মুখোমুখি হলে হেসেছিলেন মহিলা; কিন্তু এইরকম পরিস্থিতিতে সিঁড়িতে থেমে দাঁড়িয়ে হাসি ফেরত দেওয়া যায় কিনা ভাবতে না ভাবতেই মহিলা নেমে গেলেন তরতর করে। স্পিডে ডিফিটেড এবং সিংক্রোনাইজেসনের অভাব থেকে চোখ তুলে অপূর্ব লক্ষ করল পিছনে মিস্টার চৌধুরী। গম্ভীর, তাকালেন না পর্যন্ত। এর পরেই আর একদিন বাড়ি থেকে কিছু দূরে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে পুল-কারের জন্যে অপেক্ষা করছিল অপূর্ব, হঠাৎ একটা অ্যামবাসাডর এসে থামল সামনে। স্টিয়ারিংয়ে মিস্টার চৌধুরী; অপূর্বর দিকের জানলা থেকে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনদিকে যাবেন?' অপূর্ব 'নো, থ্যাঙ্কস, আমার গাড়ি আসবে—' বলতে না বলতেই তার দিকে একবারও না তাকিয়ে ঘ্যাঁ-ঘোঁ করে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেরিয়ে গেলেন মিস্টার চৌধুরী। তবে, এক-একদিন রাত্রে, ঘুম না এলে কিংবা শরীর টান-টান হলে মালবীর মুখ ভাবতে ভাবতে মহিলাকে মনে পড়ে অপূর্বর, তখন টানভাব আড়াল করে পাশ ফিরতে ফিরতে মনে হয় বীণাদির প্রশ্নের উত্তরে সেদিন সে হ্যাঁ বললেও পারত; তবে ইনফ্লুয়েঞ্জা এমনই একটা রোগ যা আবারও হতে পারে। এ বাড়ির আরও দুটো ফ্ল্যাটে যারা থাকে—সিং এবং সিনহা, তাদের ঠিকঠাক চেনে না অপূর্ব। দারোয়ান কিংবা কেয়ারটেকার সুদর্শনকে চেনে অবশ্য। বস্তুত, তার ফ্ল্যাট এমনই অর্ধেক আর একটেরে যে একবার দরজা বন্ধ করলে কে কোথায় বোঝা যায় না। এটার খোঁজ পেয়েছিল কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে, টেলিফোনে। ব্যাচেলার অর কাপল্স উইথ গুড রেফারেন্স প্রেফারড। বীণাদি

এসে গেল তার কিছুদিন পরে। মাসে যাট টাকা। রোজ প্রায় একই সময়ে বেল দেয় দরজায়; তার শোয়াবসার সঙ্গে তাল রেখে এটাই হয়ে গেছে নিয়ম।

ডোরবেল বেজে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যে নীচে রাস্তা থেকে 'পেপার' ও সাইকেলের ঘন্টির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হকারের হাঁক ও ব্যালকনিতে রোল-করা খবরের কাগজ আছড়ে পড়ার শব্দ পেল অপূর্ব। তখন, টয়লেটের চৌকোনা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে ভাবল, কম্পিউটারেরও আগে সৃষ্টি হয়েছে কিছু-কিছু নিখুঁত নিয়মানুবর্তিতা, যেমন এই হকার-জনিত সবকিছু, আশ্চর্য পারফেকশান তার, আজ যা করল গত তিন বছরে তার চেয়ে কম কিংবা বেশি কিছু করেনি। মাসের প্রথম রবিবার সকাল ন'টা থেকে দশটার মধ্যে আবির্ভূত হয় লোকটি, বেল দেয়, দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নমস্কার করে, প্রাপ্য অঙ্কটা বলে, টাকা গুনে নেয়, নমস্কার করে এবং লোকটি যখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায় তখন একই রকম জোরে পা ফেলার শব্দ শুনতে পায় অপূর্ব। এই মুহূর্তে সেই সিঁড়ি-নামার শব্দটি কানে তুলে আয়নায় তাকিয়ে অস্বচ্ছতা টের পেল কাচে। ঝটপট তোয়ালে বুলিয়ে পরিষ্কার করে তিন দিনের জমে ওঠা দাড়ির চেয়ে আরও বেশি কিছু লক্ষ করল মুখে, চোখের কোনায় এবং কপালে। দু পা পিছিয়ে এসে ভাবল, এমন কি হতে পারে যে ইচ্ছাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পাল্টে যাচ্ছে তার মুখের গড়নও? অবশ্য তার দাড়ি যথাযথ নয়; চিবুকে ও জুলপির নীচে যতটা ঘন, গালে ততটা নয়—হাত বোলালে সেসব জায়গায় মসৃণতা নিজেকেই অবাক করে।

হয়তো মালবীকেও করে। মালবীও বলেছিল একদিন, 'কী ভাবছ, যিশুখ্রিস্ট হবে?'

চিবুকের ডগায় চোরা ব্রণ কেটে, সেপটিক হবার ভয়ে ইঞ্জেকশন নিয়েছিল অপূর্ব; এক তিল রক্তক্ষরণ ও অস্পষ্ট জ্বালা থেকে হঠাৎই যন্ত্রণা শুরু হওয়ায় দাড়ি কামানো দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছিল। মালবীর সঙ্গে দেখা হয়নি ক'দিন; সুতরাং, বলাও হয়নি। গঙ্গার ধারে রেস্তোরাঁর দোতলায় উঠে সবে নৌকো ও দূরে জাহাজ দেখতে পেয়েছে, মাঝখানে টেবিল রেখে মুখোমুখি বসা হয়নি তখনও, বিস্তারিত জলের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে উঠে আসা হাওয়ায় হঠাৎই আঁচল উড়ে আড়াল করে দিয়েছে মালবীর মুখের তিন ভাগ। সেই এক ভাগের দিকে তাকিয়ে অপূর্ব বলল, 'যিশুখ্রিস্ট!'

আঁচল নামাবার আগে একটিই চোখে হাসল মালবী।

'দাড়ি রেখেছ কেন!'

'ও! দাড়ি?' ওর বুকে চকিত দৃষ্টি ফেলে সামলে নেওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে অপূর্ব বলল, 'ভাবছি রাখব। কেন, খারাপ লাগছে?'

'মাকুন্দ, মাকুন্দ--'

প্রায় ঝুঁকে জল দেখতে লাগল মালবী। অপূর্ব ওকে—ওর আঙুলে আঙুল জড়ানো, তারপর হঠাৎ হাত তুলে বাঁ কানের পাশ থেকে উড়ে যাওয়া চুল সমান করা, আবার জলের দিকে তাকানো।

'মাকুন্দ কী!'

'জানো না!' যেন জলের সঙ্গেই কথা বলছে মালবী, তার দিকে না তাকিয়ে পাতলা হাসিতে চমৎকার হয়ে বলল, 'আধা পুরুষ।'

'আধা পুরুষ কী!'

'আধা পুরুষ কী, গোটা পুরুষ কী, ডাবল পুরুষ কী—সবই বলে দিতে হবে। তাহলে পরে কী জানবে!' চোখের তারায় দৃষ্টি এনে সোজাসুজি তাকাল মালবী, 'তুমি তো এমনিতেই ভাল—'

ব্রণ সেপটিক হবার কথাটা অপূর্ব এবার বলে ফেলায় মালবী বলল, 'কী আশ্চর্য। এতক্ষণ বলোনি।'

তখন ওকে কলেজে পড়ায় বলে মনে হয়নি। মালবীর ভালোবাসা পাখির সমান, একটু বা রোম্যান্টিক হয়ে অপূর্ব ভেবেছিল, যথেচ্ছ উড়ে গেলেও ঠিকই ফিরে আসে।

এবারের ব্যাপারটা ব্রণটন নয়, এমনিই—ইট গ্রোজ লাইক দ্যাট, জাস্ট লাইক দ্যাট। সত্যিই, সবই কি ঠিকঠাক চলে? ইচ্ছেমতো, হিসেবমতো, অপরেশের ক্যালকুলেটরের অ্যাকুরেসির মতো? সম্ভবত নয়। লাইক হোয়াট আই থট জাস্ট নাও, বীণাদির কথা শুনে সেদিন যদি মাথা নাড়ত, তাহলে—, কিন্তু ওভাবে হয় না। যদি সীতার ওই গায়ে জ্বালা-ছড়ানো কথাগুলো হজম করে নিত, যদি বারাসতে না যেতেন বিমলকৃষ্ণ, কিংবা যদি ওইভাবে, হঠাৎ ম্যানেনজাইটিস হয়ে দেড়দিনের মধ্যেই মারা না যেত মা। জীবন, সম্ভবত, কোথাও কিছু অস্পষ্টতা রেখে যায়, ঘটনা ঘটে এবং তারপর ভাবতে হয়, যদি—।

বীণাদিকে দরজা খুলে দিয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে কাগজটা কুড়িয়ে নিল অপূর্ব। এখন ঠিক ক'টা বাজছে তা অনুমান করা যায় মাত্র, রোদ অন্যরকম ভাবায়। ওপরে চোখ তুলে মেঘময় ঔজ্জ্বল্যে হারিয়ে গেল সে। তাপ অনুভব করল না কোনও। ক'মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে রাস্তায় তাকাল অপূর্ব। গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দুটি অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা বলছে সুদর্শন দারোয়ান, একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে গেল, স্কুলের ইউনিফর্ম পরা বাচ্চা দুটি মেয়েকে নিয়ে ছুটে যাচ্ছে রিক্সা, দূরে টিউবওয়েলের সামনে বালতি ও ভিড়, স্টেশনার্সের লোকটি তালা খুলছে দোকানের, তার সামনে অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে সবুজ শাড়ি পরা কালো যুবতী, ইতস্তত কয়েকজন, অদূরে গলি থেকে বেরিয়ে লুঙ্গি পরা ও খালি পা একটি লোক ভাঙা ডাস্টবিনের পাশে ঝুড়ি করে নিয়ে আসা জঞ্জাল উপুড় করার সঙ্গে সঙ্গে ফাইটার প্লেনের ধরনে তির সাজিয়ে তিনটি কুকুর ছুটে গেল সেই দিকে। অন্যমনস্ক; ঘরে ফিরে আসার সময় ট্রাম চলে যাবার শব্দ শুনল অপূর্ব। যেরকম শোনা যায় রাতে, প্রায় ঘুমের মধ্যে। ট্রাম লাইন অবশ্য এখান থেকে অনেকটা দূরে; এমনও হতে পারে ডাবলডেকারের শব্দ। নাকি এটা শুধুই মনে হওয়া, স্মৃতিতেই উঠল শব্দটা। হতে পারে। কলকাতা এইভাবেই ফিরে আসে।

অভ্যাস থেকে প্রথমেই খেলার পাতায় চলে গেল অপূর্ব। তেমন কোনও খবর নেই। চায়ের কাপে প্রথম চুমুক চনমনে স্বাদ এনে দিল জিভে। স্বাদটা জিইয়ে রেখে ঝুঁকে পড়ল জন ম্যাকেনরো'র পারফরমেন্স খারাপ হবার অজুহাতে—এর মধ্যে এসে গেছে ট্যাটাম ও' নীল নামে হলিউডের এক অভিনেত্রীর সঙ্গে প্রেম। কেমন ন্যাকা-ন্যাকা লাগে। তবে এসব হয়। 'স্নিগ্ধা' গায়ে মাখার সাবানের জন্যে মডেল বাছা হয়েছিল টালিগঞ্জের এক উঠতি অভিনেত্রীকে; এর সঙ্গেও এক ফুটবলারকে জড়িয়ে খবর ছাপা হয়েছিল বাংলা কাগজে, অফিসে দেখেছিল। তো বিক্রম দাসের স্টুডিয়োতে ছবি তোলার সময় মনোজ যখন বলল ব্রা দেখা গেলে চলবে না, বাস্টলাইনেরও এক্সপোজার চাই, তখন সাজানো বাথটাব থেকে উঠে দাঁড়িয়ে দু হাতে বুক আড়াল করে মেয়েটি বলল, 'ও মা, অ্যাত্তো দ্যাখাতে হবে। তাহলে কিন্তু আরও এক হাজার বেশি চাই।' শুনে দাঁত চেপে কী একটা মন্তব্য করল

মনোজ, বলল, 'ঠিক আছে, আরও দুশো।' তখন বুক থেকে হাত সরিয়ে এলানো গলায় মেয়েটি বলল, 'না, দেখুন, প্লিজ, অন্তত পাঁচশো। আমার একটা রেট আছে তো।' এইভাবেই হয়। কারপভ, না কাসপারভ? অনেক ব্যাটিংয়ের স্ট্রেন নিয়েছে সুনীল গাভাসকার, এখন এনজয় করতে চায় ক্রিকেট—কারেন্ট অ্যামবিশান একশটা ক্যাচ। খেলা খেলা নেই, রেজাল্টও নেই।

অপূর্ব চলে গেল প্রথম পাতায়। কলাকার স্ট্রিটে গায়ে কেরোসিন ঢেলে মরেছে আরও একটি বউ। জাতীয় সংহতির স্বার্থে যে-কোনও অ্যাকশান নিতে প্রধানমন্ত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাঞ্জাবে একই দিনে ছ'জন খুন। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে পার্লামেন্টারি ইলেকসানের ক্যান্ডিডেট বাছাই। এখান থেকে হাইকম্যান্ডের কাছে কোন নাম রেকমেন্ডেড হয়েছে কিনা সে-খবর দেয়নি।

বাথরুম থেকে উঠে আসছে থুপথুপ শব্দ। তার মানে কাজ শেষ হয়ে এল বীণাদির, এবার যাবে। অসময়ে হাই উঠতে মনে পড়ল বাড়তি চা রাখা আছে ফ্লাস্কে। কাল অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়েছে শৌনিকের সঙ্গে, বেশ কিছুদিন পরে, হঠাৎ ইচ্ছে হলে যেমন হয়। বেরুবার জন্যে তৈরি হচ্ছিল শৌনিক, বলল, 'চল না, ব্রেশটের নতুন নাটক, অ্যাকাদেমিতে—।' কোথাও না কোথাও যেতই, সুতরাং না বলেনি। সেখান থেকে নিয়ে গেল সুদেষ্ণার বাড়িতে। যাবার কিংবা ফেরার জায়গা না থাকলে যেমন হয়, একা; ক্রমশ রাত হল। 'শৌনিকের এত বন্ধু, তাহলে আগে আলাপ হয়নি কেন।' সুদেষ্ণা বলল, 'এরপর চলে আসবেন—।' তাপর সুদেষ্ণার স্বামী অজয় আর ওই বাংলা-জানা পাঞ্জাবি ছেলেটি, কুলতার, যখন কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে, একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে হুইস্কির বোতল আনতে ভিতরে গেছে সুদেষ্ণা, তখন চাপা গলায় শৌনিক জিজ্ঞেস করল, 'তোর বাবা কি দিল্লির টিকিট পাচ্ছেন?' অপূর্ব কিছুই জানে না, সুতরাং বলতেও পারেনি। খবরটা ভুলও হতে পারে ভেবেছিল, পাবার কি কথা ছিল? শৌনিক খায়নি। স্টেশন ওয়াগনে তুলে কুলতার যখন পৌঁছে দিল তখন একটা। দেড়টাও হতে পারে। কাল? না আজ? বুকের কোনওখানে আছে নিভৃত, যখন টানে তখনই ভারী হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস।

পর্দা সরিয়ে দেওয়ার ফলে রোদ এসে গেছে অনেকটা। ওরই মধ্যে অদৃশ্য কিছুর ছায়া কেঁপে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কাগজটা সরিয়ে রেখে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল অপূর্ব। বাঁদিকের কার্নিশ বাদে এখানে সমস্তই ছায়া, কিন্তু চারদিকের রৌদ্রময় উজ্জ্বল ভাবটা চোখ এড়ায় না। শান্ত একরকম হাওয়া ছুঁয়ে যাচ্ছে কপাল, শুষে নিচ্ছে ঘামের সম্ভাবনা। অনির্দিষ্ট দৃষ্টি গতানুগতিকতার বাইরে আর কিছুই দেখায় না। গতি ও পরিবর্তন থাকলেও, মনে হল স্থিরচিত্র। শব্দ আর শব্দের মধ্যে এলোমেলো শব্দগুলোই শুধু উঠে আসতে লাগল চারদিক থেকে।

মঙ্গলবার, হ্যাঁ, মঙ্গলবারই, টেলিফোনে বানানো গলায় কথা বলার চেষ্টায় সীতা তাকে চিনে ফেলেছে ভেবে অপ্রস্তুত, ফুটপাথে নেমে এরপর পিসিমার কাছে যাবে কি যাবে না ইত্যাদি ভাবতে ভাবতে ট্যাক্সি পেয়ে গেল। তখন আর কিছু না ভেবেই ট্যাক্সির সিটের পিছনে মাথা হেলিয়ে, ক্লান্ত, চলে এল গায়ত্রীর কাছে। মালবীর সঙ্গে দেখা হতে হতে সন্ধে ছ'টা, তার আগে অনেকটা সময়। যেতে যেতেই অপরিচিত লেগেছিল নিজেকে—সে কি অপূর্ব এবং বাড়িই যাচ্ছে? রামেশ্বর পুরনো লোক, দাঁড়িয়েছিল গেটে, 'কী দাদাবাবু, ভাল

তো? যান, পিসিমা আছেন ওপরে—'

একই সিঁড়ি। তেতলায় উঠে ডানদিকে বাবার ঘর, বাঁদিকে পিসিমার। তারটা দোতলায় ছিল। কথাটা কি ঠিক, ছিল? ঘরের দরজার বাইরে থেকে বারান্দার দিকে এমন ভাবে হেঁটে এলেন পিসিমা এবং হাত চেপে ধরলেন, যেন বাস্তব নয়, এই দৃশ্যটি কীভাবে অভিনীত হবে তা আগেই ব্রিফ করা ছিল। রেকাবে নারকেল নাড়ু রাখা ছিল, কুচো নিমকিও; পাথরের গ্লাসে জল। নিজের খাটে বসিয়ে যেভাবে এগিয়ে দিলেন তাতে মনে হবে টেলিফোনে কথা নয়, অর্ডারই দিয়েছিল সে।

'জানো পিসিমা, আসতে আসতেই গ্যাম্বেল করছিলাম একটা। এই নারকেল নাড়ু নিয়ে। থাকবে কি থাকবে না!'

'দেব আর!' ব্যস্ততা দেখিয়ে বললেন গায়ত্রী, 'কালই বানিয়েছি, অনেক আছে—'

'না, না। আর না।' যাবার সময়ে সঙ্গে কিছু নিয়ে যাবে কি না ভাবতে ভাবতে অপূর্ব বলল, 'এসব বানাও এখনও। কে খায়?'

'কে আর খাবে! বিমলের কাছে লোক আসে, তারাই খেয়ে শেষ করে। মাসি পিসির অভ্যেস কি বদলায়, বাবা!' আবেগই বাড়িয়ে দিল ছুঁয়ে দেখার প্রবণতা। কপালে ঝুঁকে পড়া চুল সরিয়ে দিয়ে গায়ত্রী বললেন, 'এভাবে কদ্দিন আলাদা হয়ে থাকবি, অপু! তোর বাবা লোকটাও তো একা হয়ে গেছে—'

গায়ত্রী নিজের কথা বললেন না। যা বললেন তার ভারেই বসে পড়লেন পাশে। সাদা, নরুন পাড় ধুতিতে শুভ্রতার গন্ধ, কিছু বা বয়সের, গোড়ায় সাদার ছিটে লাগা চুলের, গোল টিনের নারকেল তেলের। পুজোর ঘরের।

বিধবা হবার সময় মা বেঁচে। গায়ত্রী শ্বশুরবাড়িতেই থাকবেন। পিসেমশাইয়ের ভাই এল একদিন সকালে। সেই পুরনো কথা, 'জানেনই তো দিনকাল—একটা লোক পুষতে আজকাল অনেক খরচ।' কাছাকাছি ছিল বলেই কথাগুলো কানে এসেছিল আবছা।

পুরোপুরি রেগে ওঠার আগে সময় নেওয়া বিমলকৃষ্ণের পুরনো স্বভাব। সেই সময়টুকু নিয়েই লোকটির কপালে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'দিদিকে তাহলে আপনারা পুষছেন!'

'না, না! তা নয়। ওটা কথার কথা বললাম—'

'শুনুন, আমি এখনও মরে যাইনি।' যেভাবে তেতে উঠলেন তাতে মনে হবে সময় এই কথাগুলিই গেঁথে দিয়েছিল বিমলকৃষ্ণের মাথায়। নিঃশ্বাসের উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে মুখেও। বললেন, 'ঈশ্বর তাকে কিছুই দেননি। একটা স্বামী দিয়েছিলেন, তাও গেছে। কিন্তু, আমি ওর ভাই। আমি আপনাদের এনটায়ার ফ্যামিলিকে পুষতে পারি—'

স্মৃতি একাকার হয়ে যায়, সময়ের সঙ্গে। কথার মধ্যেও ঢুকে পড়ে অন্যমনস্কতা। স্পষ্ট মনে পড়ে, বিকেলে রামেশ্বরকে সঙ্গে দিয়ে তাকেই পাঠালেন গাড়িতে, আহিরিটোলার গলি থেকে তুলে আনতে পিসিমাকে। আত্মগোপনকারীকে পুলিস খুঁজে বের করলে যেমন হয়, গোটা গলি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল আশপাশ থেকে। গাড়িতে তার হাতে পিসেমশাইয়ের বাঁধানো ছবিটা তুলে দিয়ে গায়ত্রী বললেন, 'এটাও নিয়ে এলাম। এ মানুষটা তো কোনও দোষ করেনি। যদি আর না ফিরি!'

অপূর্ব ছবিটাই দেখছে। বালিশে মাথা রাখলে সামনের দেয়ালে চোখ যায়। পুরনো, ক্ষয়া

ফ্রেমের ভিতর থেকে গোটা মানুষটিই হয়তো নেমে আসে তখন।

এ সবের মধ্যেই ডুবেছিল। দরজার পর্দা সরে গেল হঠাৎ। বিকেলের আলো আড়াল করে বিমলকৃষ্ণ দাঁড়িয়ে, চোখ তারই দিকে। তবে নড়লেন না একটুও।

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছিল তারা। অপূর্বর মনে হয়েছিল আয়তনে বাবা তার চেয়ে অনেক বড়, চেষ্টা করলেও পাশ কাটিয়ে বেরুনো যাবে না।

'রামেশ্বর বলল তুমি এসেছ, তাই এলাম।' বিমলকৃষ্ণ বললেন, 'শোনো এদিকে?'

না এগিয়ে উপায় ছিল না। কাছে পৌঁছুতেই কাঁধে হাত রাখলেন বিমলকৃষ্ণ, কথা হারিয়ে তাকিয়ে থাকলেন মুখের দিকে। স্পর্শে শ্মশানের দৃশ্য। অনুভূতিও একই। অপূর্ব চোখ নামিয়ে নিল।

'একটা কথা বলতে চাই। বাড়িটা আমার যতখানি তার চেয়ে বেশি তোমার। এখানে লুকিয়ে আসার দরকার নেই—'

কাঁধ থেকে হাতটা তুলে নেবার আগে সামান্য কাঁপলেন বিমলকৃষ্ণ। এবং চলে গেলেন।

অপূর্বও থাকেনি আর। দেখা হলে মালবীকে বলেছিল, 'আজ অনেক অভিজ্ঞতা হল। যে-লোকটা গেট আউট না বলে শাটাপ বলেছিল, সেই লোকটারই গলা কাঁপছে! যে-চাকরিটা সকালেও ছিল, এখন সেটা নেই—'

'নেই!'

'না থাকারই মতো। হয়তো আমিই ছেড়েছি—'

কথাটার অর্থ বুঝে মালবী বলল, 'বাস্তব চেনো। শুধু নিজের চোখ দিয়ে না দেখে অন্যের চোখ দিয়েও দ্যাখো—'

হতে পারে এটা একটা বক্তব্য; হতে পারে যা বলেছে তা না বলে অন্য কিছু বোঝাতে চেয়েছিল মালবী। অপূর্ব জানে না। শীতের হাওয়া এক একজনকে এক একভাবে বিদ্ধ করে।

রোদ সরে যাচ্ছে ক্রমশ। আলগা পাঞ্জাবি ও পাজামায় ঢাকা শরীর থেকে অনেকটা দূরে, অপূর্ব দেখল, সরতে সরতে এখন তা জড় গয়েছে রেশনেব দোকানের সামনে। ওখানে কিছু লোক। একটা ট্যাক্সি ও একটা প্রাইভেট কার পরস্পরের বিপরীত দিকে যাতায়াতের আড়াল সরে গেল দাঁড়িপাল্লার সামনে বসা মোটা, খালি গা এবং অপরিচ্ছন্ন লোকটিকে চোখে পড়ল, তার রোমশ ও বড়সড় ভুঁড়ির ওপর থেকে রোদ পিছলে যাচ্ছে দাঁড়িপাল্লার ওঠানামায়। একটা খালি ট্রাকের চলে যাওয়ার উদ্দাম শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও ভাসতে লাগল চারপাশে। এক ভদ্রলোক, সঙ্গে সম্ভবত স্ত্রী, মহিলার কাঁধে ঘুমন্ত শিশু। দুজনেই সুবেশ ও পরিকল্পনাপ্রসূত, আশপাশের ঠিকানা দেখতে দেখতে ভদ্রলোকের হাঁটার ধরনে মনে হয় এক বছর পরে দুপুরের নেমন্তন্ন পেয়েছেন কোনও আত্মীয়-বাড়িতে, শ্বশুরবাড়িতেও হতে পারে; পাড়াটা অচেনা। ব্রড স্ট্রিটের দিকে ব্যাক করতে গিয়ে একটা গাড়ি আঘাত করেছে কোনও কুকুরকে, তার চিৎকার সামনে এগিয়ে এসে পিছু হটতে লাগল থেমে থেমে। আরোহীহীন রিক্সা। ঘরের ভিতর থেকে উঠে আসা শব্দে মনে হয় খবরের কাগজটা উড়ে গেল মেঝেয়। গেরুয়া পরিহিত দুজন, না তিনজন, আনন্দমার্গীর পাশ দিয়ে বেরিয়ে আসছে একটা চকোলেট কিংবা স্টিল গ্রে ফিয়াট—রোদই চিনতে দেয় না ঠিকঠাক, ফুটপাথের পাশে গাড়িটা স্লো হয়ে দাঁড়িয়ে পড়তে পুরোপুরি দেখা দিল আনন্দমার্গীর দলটি। মুহূর্তের মধ্যে

ফিয়াটটা এগিয়ে এল আবার।

সচকিত হয়ে কিছু মনে করার আগেই অপূর্ব দেখল গাড়িটা থামছে তাদেরই গেটের সামনে। ড্রাইভার একজন মহিলা। জানলা দিয়ে মুখ বের করতেই চিনতে পারল। সীতা। আগে চিনেছে বলেই তার দিকে বাড়ানো সাদা ও শিহরন-জাগানো হাতটা নড়ে উঠল স্বচ্ছন্দে।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত দাঁড়িয়ে থেকে আকস্মিকতা সহ্য করে নিল অপূর্ব। বিশ্বাস্য না হলেও সীতাই। আদ্যন্ত মেরুন, গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে তাকাতে হাতের ইশারায় গেটটা দেখিয়ে দিল সে। ঘরে এল। মেঝে থেকে কাগজটা কুড়িয়ে চেয়ারে রাখতেই সেটা ওড়ার চেষ্টা করল আবার। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে টের পাওয়া যায়নি হাওয়ায় এত জোর। তখন ওদিকের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খোলার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেল অপূর্ব।

সিঁড়ির মাঝামাঝি সীতা।

'হাই!'

'হাই!' অপূর্ব হাসল না, সীতাকে বাকি তিন চারটে সিঁড়ি উঠতে দিয়ে বলল, 'হোয়াট মেকস ইউ কাম হিয়ার!'

'হোয়াই!' ভঙ্গিতে গেটক্র্যাশ করার ধরন; চাপা কিন্তু স্পর্শকাতর একটা গন্ধ ছুঁয়ে গেল অপূর্বকে। ফ্ল্যাটের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত পৌঁছে সীতা বলল, 'খুশি হওনি?'

অপূর্ব জবাব দিল না। দরজাটা বন্ধ করবে কি না ভাবল। ওপরের সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। অবশ্যই পুরুষ কেউ। তখন বন্ধই করে দিল।

সীতা ফ্ল্যাট দেখছে; ছোট লিভিং রুম, বেতের সোফা পেরিয়ে কিচেনের দিকে গেল, তারপর বেডরুমের পর্দা সরাল। অপূর্ব ওকে। ওই চুল, ওই ঘাড়, ওই পিঠ, ওই কোমর থেকে ঔদ্ধত্য দেখিয়ে নামা নিতম্বের ঢল—আগেও দেখেছে, তবে এভাবে নয়। এই মাত্র ঘড়িতে দেখেছে দশটা। দায়সারা, দোমড়ানো এই পোশাকটা ইতিমধ্যে বদলানো উচিত ছিল তার।

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাসল সীতা. মেরুনে মসৃণ ও ঝকঝকে, খাদ নেই কোনও। যেন এই প্রথম লক্ষ করল অপূর্ব, সীতা হাসলে ওর শরীরও হাসে।

'কেউ আছে বাড়িতে?'

'কে থাকবে!'

'গড! তুমি একা!'

উত্তরের অপেক্ষা না করে বেডরুমে ঢুকে পড়ল সীতা, এদিক ওদিকে তাকিয়ে হাতের ব্যাগটা ছুড়ে দিল খাটের ওপর। নড়াচড়ায় শব্দ তুলছে চপ্পলের হিল। হাতল ঘুরিয়ে টয়লেটের দরজা খুলল এবং বন্ধ করল, তারপর ছিটকিনি খুলে ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। হাওয়ায় টান-টান, ঘরের ভিতর থেকে ওর উড়তে- চাওয়া আঁচলের ভঙ্গিমা দেখে অপূর্ব বুঝল, এক হাতে বুকে আঁচলের খানিকটা ধরে রেখেছে সীতা। না হলে এতক্ষণে তার মুখে এসে লাগত। খবরের কাগজটা আবার উড়ে যেতে সেটা কুড়োতে কুড়োতে এক ধরনের শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করল সে, যদিও কেন, বুঝতে পারল না ঠিক। সে কি নার্ভাস হয়ে পড়ছে? না, তা নয়। বরং অপ্রস্তুত থাকার জন্যেই হতে পারে এটা। সীতার হঠাৎ

আবির্ভাবের উদ্দেশ্য অনুমান করা যায়। হয়তো অপরেশই পাঠিয়েছে ওকে। যদি তা-ই হয়, তাহলে ওকে প্রত্যাখ্যান করাই সঙ্গত হবে।

ব্যালকনি থেকে সরে এসে নিজেই দরজাটা বন্ধ করে দিল সীতা।

'বিউটিফুল ফ্ল্যাট। তোমার! আমার ইচ্ছে করছে থেকে যেতে—'

অপূর্ব হাসল। জানে, ভূমিকা করছে সীতা—বলার কথাটা গুছিয়ে উঠতে পারেনি এখনও। রুমাল বাঁধা খোলা চুলের গোছা ঘাড় থেকে নামিয়ে ও খাটে গিয়ে বসছে দেখে নিজে চেয়ারটার পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সীতাকে দেখতে দেখতে বলল, 'ঠাট্টা করার আরও অনেক ব্যাপার আছে—'

'ঠাট্টা!' ভুরু তোলায় নিখুঁত হয়ে সীতা বলল, 'কী বলতে চাও? আমি তোমাকে ঠাট্টা করার জন্যে এসেছি!'

'হোয়াট এলস!' দৃঢ় হবার চেষ্টায় অপূর্ব বলল, 'যদি অফিসের ব্যাপার হয়, তাহলে বলে দিই আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। আই অ্যাম নট গোয়িং টু টক শপ উইথ ইউ। মাই রেজিগনেশন ইজ কমপ্লিট।'

সীতা জবাব দিল না। খানিক অবাক হয়ে অপূর্বর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'এভাবে বলছ কেন, অপূর্ব! এটা কি তোমার অফিস!'

'হয়তো নয়। কিন্তু—', সম্বোধনটা কী ছিল মনে করার চেষ্টা করল অপূর্ব। ইউ শব্দটায় ঝামেলা নেই। তবে, অফিসে যেমন হয়, সীতা শুরু থেকে এবং সেও, প্রায়ই, তুমি-ই বলত। দূরত্ব আছে বলেই সন্দেহ। আড়ষ্টতা কাটিয়ে বলল, 'ইনসাল্ট আমি ভুলি না। কী বলেছিলে, মনে আছে!'

'না। নেই। থাকলে আসতাম না।'

সীতা হঠাৎই উঠে এল কাছে। দৃষ্টি অন্যরকম, বদলে গেছে মুখের ভাব। আঁচলের ভার নামতে শুরু করেছে কাঁধ থেকে। দু হাতে অপূর্বর দু কাঁধ চেপে ধরে বলল, 'কী মনে হয় আমাকে। খুব খারাপ। বলো!'

সীতার আচরণের কতটা সত্যি, কতটা নয়, এই মুহূর্তে অপূর্বর সামনে তা প্রশ্ন; সীতার ভিতরের নারী নয়। স্পর্শ যত না চেনায় তার চেয়ে বেশি টেনে নেয় রহস্যে। ওর চোখে তাকিয়ে নিজের ভিতরেও এক উত্তেজিত থেমে থাকা অনুভব করল অপূর্ব, মনে হল এতক্ষণ যা ছিল তার চেয়ে একেবারে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে সে, একই অনুভূতি আরও বেশি করে সঞ্চারিত হচ্ছে শরীরে—দৌড় শুরু করার আগে বন্দুকের সম্ভাব্য শব্দ-সঙ্কেত যেরকম টান করে রাখে। সে কি হেরে যাবে!

ভাবামাত্র নিজেকে সামলে নিল অপূর্ব। মালবী এল এবং ফিরে গেল। সেই মুহূর্তের আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে সীতার হাত দুটো নিজের কাঁধ থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বলল, 'এসব নাটকের দরকার কি! যা বলবার সোজা বললেই পারো!'

'কী বলব!' একটুও বিচলিত না হয়ে সীতা বলল, 'আর ইউ বিহেভিং!'

অপূর্ব চুপ করে থাকল।

'আমার মনে হল হয়তো আমার কথাতেই তুমি অফিস যাওয়া বন্ধ করেছ, রিজাইন করেছ।' সীতা বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, অপূর্ব, একেবারে ছেলেমানুষ। এতটা ইমপর্ট্যান্স আমাকে দিলে কেন!'

'কেন!' প্রায় দূর থেকে, একটু বা অবজ্ঞা মিশিয়ে অপূর্ব বলল, 'বিকজ ইউ আর ইমপর্ট্যান্ট।'

এতক্ষণে আবার খাটে বসেছে সীতা। বুকে আঙুল ঠেকিয়ে বলল, 'আমি!'

'মিস্টার গুপ্ত অন্তত তাই ভাবেন—'

'কী!'

'কী আর!' গা ঝাড়া দিয়ে বলল অপূর্ব, 'লেটস ফরগেট ইট।'

'অ্যান্ড ফরগিভ! সেটা তো বললে না!'

অপূর্ব জবাব দিল না। বস্তুত, দিতে গিয়ে মনে হল একটা অবাস্তব, আষাঢ়ে ঘটনায় ঢুকে পড়ছে সে। কী দরকার। সীতা সীতাই এবং সেও অপূর্ব, ইচ্ছে বা অজুহাত যার যার নিজের। অপমানের বিষয়টা এরপর ভুলে যেতে পারে। বরং বাড়িতেই যখন এসেছে, এত দূরে, ফ্ল্যাটের ঠিকানা খুঁজে, তখন সে সাধ্যমতো একটু আধটু ভদ্রতাও দেখাতে পারে সীতাকে। সেদিন অসহ্য লেগেছিল, কিন্তু সেদিনেব আগে আরও অনেকগুলি দিন ছিল একেবারেই অন্যরকম; সেসব মনে পড়ায় এমনকী আজও কেমন একটা টান এসে যাচ্ছে ভিতরে।

হঠাৎ রোদের আভায় আলোকিত ঘরে সীতাকে দেখাচ্ছে রানির মতো। অন্য কোনও তুলনা মনে এল না। প্রশ্ন করেছিল বলেই ঘাড়টা এখনও ঈষৎ বাঁকানো, চোখে ঝিক; কিন্তু নরম হয়ে এসেছে মুখের রেখা। চিবুক ছুঁয়ে নেমে আসা শ্বেত-পিতলের গলা ও বুকের উপত্যকা যেমন হলে নিখুঁত হয়ে ওঠে বর্ণনা, ঠিক তেমনি; মেরুন শিফনের আড়াল থেকে ঔদ্ধত্য চেনাচ্ছে সামান্য ভারী দুটি স্তন। সমস্তই এলোমেলো করে দেয় নিঃশ্বাস। ঠিক জানে না কেন, একটু আগে, সীতা যখন দু হাতে কাঁধ চেপে ধরেছিল তখনও এসব চোখে পড়েনি। এখন পড়ছে বলেই অস্বস্তি। এই মুহূর্তে নিজের ভিতরের কাঠিন্য ও তাপ দুটোই বিব্রত করে তুলল অপূর্বকে।

এভাবে তাকানো শোভন নয়; ভাবল, চা আছে ফ্লাস্কে, অন্তত চা দিয়ে ভদ্রতা করা যায় সীতার সঙ্গে। খুঁজলে বিস্কিটও পাওয়া যেতে পারে। একজন ব্যাচেলারের কাছে এর বেশি আশা করা যায় না।

কথাটা বলেই ফেলল অপূর্ব।

'চা খাবে?'

'চা!' সীতা বলল, 'কে বানাবে? তুমি!'

না। আছে। ফ্লাস্কে—', সীতার হাসি লক্ষ করে অপূর্ব বলল, 'আই ট্র্যু উইল হ্যাভ ইট। দুজনের হয়ে যাবে।'

'দুজনের!' এরই মধ্যে ভঙ্গি পাল্টিয়ে ভর রেখেছিল দু হাতে। ঈষৎ পিছনে গড়িয়ে গিয়ে সীতা বলল, 'তুমি কি সুন্দর কথা বল, অপূর্ব!'

'স্টপ দিস মাস্কারা। খাবে কি না বল?'

'সত্যি! ইউ আর মার্ভেলাস। গো, অ্যান্ড সি ইওর ফেস!'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে গালে হাত বোলাল অপূর্ব; উল্টোদিকে রেজর টানার মধ্যে, তিনদিনের শুষ্কতা ছাড়া আর কিছু লাগল না হাতে। নাকি অন্য কোনও কারণে? হতে পারে। মাকুন্দ, মাকুন্দ—, মনে পড়ল; জলের শূন্যতায় চোখ রেখে মালবী একদিন বলেছিল তাকে।

'হোয়াই!'

'ইউ নো হোয়াই।' সামনের শূন্যে পা দুটো টান-টান করে এক পাটি চপ্পল হেলায় ফেলে দিল সীতা। তার দিকেই তাকিয়ে বলল, 'রাগ করছ, ভয় পাচ্ছ, অথচ ভাল বাসবে কি না বুঝতে পারছ না।'

কথাগুলো আচমকাই এল। চপ্পলটা আবার পায়ে গলিয়ে নেবার জন্যে সীতাকে ঝুঁকতে দেখে নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে অপূর্ব বলল, 'লোকে তোমাকে ফ্লার্ট বলে— এই জন্যেই—'

সীতা তখনও ঝুঁকে। শিফনের পিছল নেমে যাচ্ছে কাঁধ থেকে, চুলের গোছায় ঢাকা পড়েছে পিঠ। আকস্মিক হাসিতে দুলে উঠল গলার নীচের মাংসের ঢল।

'বলে না কি!'

'ইউ নো!' নিজের জায়গা থেকে সরে দরজার দিকে কিছুটা এগিয়ে গেল অপূর্ব। তারপর সিরিয়াস হবার চেষ্টায় বলল, 'বোসো। আমি নিয়ে আসছি—'

'ওয়েট, অপূর্ব!' সোজা হয়ে বসে আঁচলটা কাঁধে তুলে নিল সীতা, 'যা জিজ্ঞেস করলাম তার রিপ্লাই এখনও দাওনি!'

'মানে!'

'সোমবার তাহলে আসছ? অফিসে?'

'ও- অফিসে? ওয়েল—', গাল চুলকে দায়সারা হল অপূর্ব, 'এখনও জানি না--'

তারপর হঠাৎই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। কিচেনের দিকে।

ফ্লাস্কটা চেনা। হিসেব করে একটাই কাপ রেখে গেছে বীণাদি। দেখে ব্র্যাকেট থেকে আর একটা কাপ, প্লেট নামিয়ে নিল। দুই উরুর মধ্যিখানের অনিশ্চয়তা অসহায় করে তুলেছে পায়ের পাতা দুটো। মেঝের তাপে ভিন্নতা। এমন কী হতে পারে কংক্রিটে মশলা মেশানোর হেরফেরে বেডরুম আর কিচেনের মেঝেতেও ঘটে গেছে তাপের পার্থক্য, এতদিন অনুভব করেনি সে! তাহলে কানের তলায়, কিংবা হাতের চেটোয়, কিংবা তলপেটে ও হাঁটুতে অন্যরকম অনুভূতি কেন!

পাশাপাশি দুটো কাপ সাজিয়ে বিস্কিটের কৌটোটা খুঁজল অপূর্ব; একটায় না পেয়ে হাত বাড়াল অন্যটার দিকে। ততক্ষণে বুঝে গেছে সে সময় নিচ্ছে, এটা প্রায় অজুহাত—আসলে সীতার সামনে থেকে দূরে থাকতে চেয়েছিল, অন্তত কিছুক্ষণ। এরপর কী কী প্রশ্ন করবে সীতা এবং কী কী জবাব হতে পারে সে সম্পর্কে ভেবে নিচ্ছিল। সত্যি বলতে, সীতার জন্যেও নয়, গত তিন চারদিনে নিজের ভবিষ্যৎ, এরপর কী করবে না করবে এসব নিয়ে নিজেও কম ভাবেনি। মর্নিং স্টার-এ দু তিনটে ছোট লেখা ছাপা হয়েছে এর আগে, পরশু বেলার দিকে ফোন করেছিল ওদের এডিটর আহমেদকে। একই কলেজে তিন ক্লাস সিনিয়র ছিল আহমেদ, ভেরি ট্যালেন্টেড আর হঠাৎই নাম করে ফেলেছে; বলল, 'ইয়েস, ইয়েস। পাঠিয়ে দাও লেখা। থিংক সামথিং নিউ। মে বি সেক্স ইন অ্যাডভার্টাইজিং?' তো ফোন ছেড়ে দেবার পর থেকে শুধু এই লেখাটাই নয়, অপূর্ব ভাবছিল শৌনিকের সঙ্গে সেও যাবে আইজলে, তার আগে কথা বলে নেবে আহমেদের সঙ্গে। হাউ অ্যাবাউট মেকিং জার্নালিজম আ কেরিয়ার! তাদের সঙ্গেই পড়ত টুনু, তুহিন রায়, প্রায় যে-কোনও ইস্যুতেই প্রতিবাদ করে চিঠি লিখত খবরের কাগজে। পাশ করার পর সাংবাদিক হয়ে গেল। এখন দিল্লিতে, প্রতি সপ্তাহে ডেসপ্যাচ পাঠায় নিজের ক্রেডিট লাইনে। নো, হি ওয়াজ নেভার আ ব্রিলিয়ান্ট চ্যাপ। মাঝে দেখা হয়েছিল কলেজ স্ট্রিটের কফি হাউসে—সঙ্গে নিয়ে কলকাতা চেনাচ্ছে

নিউ ইয়র্ক টাইমস না কোথাকার এক করেসপনডেন্টকে। আগের চেয়ে অনেক বেশি স্মার্ট আর ক্যাজুয়াল, মনে হল ভাল আছে খুব। সে কি ভাল আছে?

সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অপূর্ব। সাড় পেল সীতার গলায়। দু হাতে কিচেনের দরজা আগলে ধরে দাঁড়িয়ে।

'কী করছ?'

'কিছু না। জাস্ট চা-টা ঢালব।'

অপূর্ব ফ্লাস্কটা হাতে নেবার আগেই ভিতরে ঢুকে এল সীতা। পরিসর স্বল্প। গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'সরো—'

'না, কেন। এটা সিমপল কাজ। রেডিই আছে—'

'কিন্তু তুমি রেডি নেই।' চোখের কোণ দিয়ে তাকিয়ে সীতা বলল, 'আছ?'

কথাটার মানে কী অপূর্ব তা বুঝে ওঠার আগেই হাতের আলতো ঠেলায় ওকে পিছিয়ে দিল সীতা। ঢাকনা খুলে ফ্লাস্কটা তুলে ধরল নিজের নাকের কাছে।

'নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ আগে করা। ঠাণ্ডা হয়ে গেছে—'

'আই প্রেফার কোল্ড টি।'

'ডু ইউ।'

অপূর্ব থেমেই থাকল।

পাতলা ধোঁয়ার ভাপে ভিজে ভাব ছড়িয়েছে নাকের ডগায় ও চিবুকে; ঠোঁটে চাপা হাসি নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে অপূর্বকে লক্ষ করতে করতে সীতা বলল, 'তোমাকে দেখে আমার ছেলের কথা মনে পড়ছে। বাবলু। একই স্বভাব। কিচ্ছুটি পারে না করতে, আবার আমাকেও করতে দেবে না।'

চা-টা দুটো কাপে ভাগাভাগি করে ঢেলে ফেলল সীতা।

'গরম করে দেব?'

'না।'

'তোমার মতোই। সুইট।'

প্রায় এক চুমুকেই সীতাকে চা-টা শেষ করতে দেখে অস্বস্তি বোধ করল অপূর্ব। এতক্ষণে ঠাণ্ডা না হোক, বিস্বাদ হয়ে যেতে পারে, এটা তার বোঝা উচিত ছিল। সেজন্যে নয়, অস্বস্তি বাবলুর কথা তোলায়। তখন নিজেরটাও শেষ করে নামিয়ে রাখল কাপটা। জলজ্যান্ত এই নারী প্রতি মুহূর্তে বদলে নিচ্ছে নিজেকে—কখন কী বলবে, তা বলার এক মুহূর্ত আগেও ধরা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। বাবলুকে সে চেনে। রোগা, সাদাটে ও চুপচাপ, কেমন যেন বিষণ্ণ, হঠাৎ হেসে ফেলে কখনও সখনও। স্কুল হস্টেলে থাকে। শনি, রবিবার কাছে নিয়ে আসে সীতা। অ্যাকশন গ্রুপে জয়েন করার পর এক রবিবার খেতে ডেকেছিল তাদের ক'জনকে। তখনই দেখেছিল দশ-এগারোর ছেলেটিকে। অপূর্ব ওকে আলাদা ডেকে নিয়ে আলাপ করার পর, জড়তা কাটিয়ে, বাবলু জিজ্ঞেস করেছিল, 'ডু ইউ প্লে চেস?' তা সীতার ছেলে সীতারই, অপূর্ব বুঝতে পারল না কেন সে তুলনীয় হবে বাবলুর সঙ্গে। আর নট ইউ টেকিং লিবার্টি।

কোল্ড ফিরে এল আবার। অপূর্ব ভাবল, কথাবার্তা যা হবার হয়ে গেছে, এবার সীতার চলে যাওয়া উচিত। সুতরাং তাকাল না। নিজেই বেরিয়ে এল।

দূরত্বে এসে, বেডরুমে ঢুকতে ঢুকতে টের পেল এতক্ষণ সে একটা সুবাসের মধ্যে ছিল। মন্থর, আলস্য জড়ানো; কিন্তু আলাদা করা যায়। সম্ভবত শরীরজাত। সম্ভবত প্রত্যেক নারীরই থাকে এমনি, অন্তত কারও কারও—গন্ধের তারতম্যেই তাদের চেনা যায় আলাদা করে। মালবীর সংস্পর্শে প্রায়ই এসে যায় বৃষ্টির গন্ধ, কিংবা শিশির-ছোঁয়া ঘাসের। জল থাকেই। এই গন্ধটা কেমন বুঝতে পারছে না ঠিক। মেঘে কি গন্ধ থাকে কোনও? কিংবা, পুরুষের শরীরেও, কেউ কি টের পায় আলাদা করে?

রোদ এখন দূরে সরে গেলেও আলো যায়নি। বরং জানলার সামনে দাঁড়ালে বোঝা যায় আরও জোরালো মাত্রা পেয়েছে ঔজ্জ্বল্য। পর্দার মৃদু কাঁপুনি চিনিয়ে দেয় চাপা হাওয়া। আকাশের নীলে ইতস্তত সাদা মেঘের ছোপ, ভ্রাম্যমাণ থেকেই সামান্য কালো রঙ ধরে নিচ্ছে কোনও কোনওটা। যদিও বর্ষা এসে গেছে, তবু এই মেঘ বৃষ্টি আনে না। অন্তত এখনই বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। এখানে দাঁড়িয়েই কিচেন থেকে ভেসে আসা টুকটাক শব্দ পেল অপূর্ব। বেডরুমের পর্দাটা স্থিরভাবে ফেলা, সুতরাং ধরেই নিল, সীতা ওখানেই। কী করছে জানা নেই। মেয়েমানুষ কি নিজের জায়গা খুঁজে পেল।

গলায় হাই উঠতে উঠতে নেমে যেতে অনুভব করল অবসাদ ভার আনছে শরীরে। দূরে, নিচু একতলা, বিক্ষিপ্ত দোতলা, ঘিঞ্জি টালি ও টিনের ছাদ পেরিয়ে, অপূর্ব দেখল, একটা উঁচু বাড়ির ছাদে টি-ভি'র অ্যানটেনা লাগাচ্ছে দুটি লোক। একটি মোটা চেহারার যুবতী ঘোরাঘুরি করছে, আশপাশে, খোলা চুল ঝাপটা দিয়ে সরিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে—এইমাত্র অ্যানটেনার জায়গাটার পাশে দাঁড়িয়ে রেলিং থেকে নীচে ঝুঁকল। একটা শব্দ কানে এল, 'জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ'। জানলা থেকে রাস্তা দেখা যায় না। সুতরাং কিছুই চোখে পড়ল না। স্লোগান তেমন জোরালো নয়; কাছাকাছি এসে ক্রমশ মিলিয়ে যাবার পর অনুমান করল মিছিল। ধর্মঘট চলছে বক্তেল গেটের দিকে কোনও কারখানায়—কালও জন পনেরোর একটি শক্তিহীন দলকে প্রায় অভ্যাসে স্লোগান তুলে হেঁটে যেতে দেখেছিল, তারাও হতে পারে। বাঙালিরা পুরোপুরি মজদুর হতে পারে না, কোন প্রসঙ্গে মনে নেই, শৌনিক বলেছিল একদিন, মিছিলে স্লোগান দিতে গিয়েও ইমোশনাল হয়ে পড়ে, ইত্যাদি। দেখল, অ্যানটেনা দাঁড়িয়ে গেছে, কিন্তু দূরের ছাদে সেই যুবতীটি বা আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না আর।

অপূর্ব ভাবল বেরিয়ে গিয়ে দেখবে কি না। নিশ্চয়ই কয়েক মিনিটের বেশি সময় যায়নি এর মধ্যে, তবু সীতার অতক্ষণ কিচেনে কাটানোর কারণ নেই। নাকি তার কাঠ-কাঠ ব্যবহার দেখে চলেই গেল? লিভিং রুমে?

খবরের কাগজটা ইতিমধ্যে হাতে তুলে নিয়েছিল অপূর্ব, দেখবে কি না ভেবে দু পা এগিয়ে থেমে গেল আবার। না; ব্যাগটা পড়ে আছে খাটের ওপর, রুমালটাও। আগে, সীতা যখন বসেছিল এখানে, পরিষ্কার মনে আছে, রুমালটা গোঁজা ছিল কোমরে। এই মুহূর্তে সেটার দিকে তাকিয়ে কেমন সম্মোহন বোধ করল শরীরে, সংস্পর্শে আসবার আগেই নিঃশ্বাস জড়িয়ে গেল অদ্ভুত সুগন্ধে।

এগিয়ে গিয়ে রুমালটা তুলে নিল অপূর্ব; নাকের সামনে ধরে আস্তে আস্তে বসে পড়ল খাটে। এই খাট, এই বিছানা তার নিজের, রাত্রেও শুয়েছিল এখানে, আজ সকালে পর্যন্ত। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে অপরিচিত, ভীষণ অপরিচিত।

'আই হ্যাভ অ্যান আইডিয়া—', বলতে বলতে ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়াল সীতা, 'কী

ব্যাপার। শুয়ে পড়লে যে।'

'নো। আই অ্যাম অলরাইট।' চোখের ওপর টানা হাতটা সরাল না অপূর্ব। সীতা কত দূরে তা মোটামুটি আন্দাজ করে নিয়ে বলল, 'ইনভেসটিগেশন শেষ হল?'

'কিসের ইনভেসটিগেশন।'

'আমার কী আছে না আছে।'

'তোমার কী আছে না আছে তা কি তুমি নিজেই জানো।'

সীতাই বলছে। দুটি কথার মাঝখানে যে-নৈঃশব্দ্য তা পেরিয়ে আসবার আগেই নিজের শরীরের খুব কাছে সেই শরীরের স্পর্শ পেল অপূর্ব যা তাকে শুধুই কল্পনায় রেখেছিল এতক্ষণ, কখনও স্মৃতি, কখনও বা সম্মোহন। নিজে স্বয়ংক্রিয় হবার আগেই সীতার একটি হাত চোখের ওপর আড়াআড়ি রাখা তার হাতটা সরিয়ে দিল। গলার ভিতরে ও জিবে শুষ্কতা টের পেল অপূর্ব; কণ্ঠনালীর ওঠানামা সীতা টের পাবে ভেবে থামিয়ে দিল নিজেকে। পাশে যেটুকু জায়গা সেখানেই বসে, কিছুটা ঝুঁকে, অপলকে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সীতা। দৃষ্টি ঘোলাটে, ঠোঁটের আর্দ্রতা ছড়িয়ে পড়েছে মুখেও, তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে যে-অনুভূতি তা অবশই করে রাখে।

সীতাই বলল, 'আমি জানি কেন তুমি এমন বিহ্বল করছ।'

'কী বলতে চাও।'

অপূর্বর গলায় ভেঙে পড়া স্বর ক্ষীণ কিন্তু তৎপর হাসি ফোটাল সীতার মুখে। আরও একটু ঝুঁকে, হাতটা অপূর্বর কপাল ছুঁইয়ে মাথার চুলে বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'তুমি আমাকে চাইছ—ভীষণভাবে চাইছ।'

'অ্যাবসার্ড।' চকিতে উঠে বসে অপূর্ব বলল, 'তুমি নিজেকে খুব দামি ভাবো—ভাবো সবাই শুধু তোমাকেই চায়।'

'চায়।' সীতা ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'তুমি জানো না। চায়।'

'সো হোয়াট।'

চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎই দু হাত বাড়িয়ে অপূর্বর দু কানের পাশ দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে সীতা বলল, 'কিন্তু ভাল কেউই বাসে না। তুমি একটু ভালবাসো, অপূর্ব। অনেক দিন কেউ আমাকে ভালবাসেনি—'

অপ্রত্যাশিত; নিঃশ্বাসের অসহিষ্ণুতা সামলে ওঠার আগেই গালে, কপালে, চোখে, ঠোঁটে সীতার ঠোঁটের স্পর্শে অদৃশ্য হয়ে গেল অপূর্ব এবং অনুভব করল, শরীর জুড়ে ব্যাপ্ত রক্তে টইটম্বুর অসংখ্য শিরা আকস্মিক বিস্ফোরণের শব্দে যেমন হয় তেমনি, কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে দিশেহারা, ছুটছে এলোপাথাড়ি। স্মৃতিও অনিশ্চিত; বারাসাতের কোনও বাগানবাড়ি থেকে অন্ধকার গাড়িতে বেরিয়ে আসতে দেখল বিমলকৃষ্ণকে, রোদ ঢুকে পড়ল চোখে, একবার জোর করে মালবীর স্তন স্পর্শ করতে গিয়ে গোটা পায়রার উষ্ণতা উঠে এসেছিল মুঠোয়—বিয়ের আগে এসব ভাল্লাগে না, ঘন হয়ে বলেছিল মালবী; অনুভূতি যা দিয়েছিল চোখ তার কিছুই দেখায়নি। দৃষ্টি ও অনুভূতির একাগ্রতা নিয়ে এই প্রথম নিজের পৌরুষ চিনতে গিয়ে সে অনুভব করল সীতার আগ্রহে তঞ্চকতা নেই। একটু আগে বাবলুর সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে নরম যে-মুখ দেখিয়েছিল, এখনও সেই মুখ; কাছে টানার প্রবণতায় রেখাগুলিই ক্রমশ পাল্টে যাচ্ছে শুধু।

সীতা নিজেকে খুলে দিল। মেরুনের পাকে জড়ানো গহনার বাক্স—অপূর্ব জানে না স্তনের উত্তাল এরকমই হয় কি না, উরুর মসৃণ পেলবতা এই ভাবেই ভেঙে যায় কিনা, স্মৃতি ক্রমশ বিস্মৃতি এবং নারীর সুগন্ধ ক্রমশই অন্ধকারে টেনে নেয় কিনা।

গভীর দুটি হাতে অপূর্বর মাথাটা নিজের বুকে চেপে ধরে অস্ফুট গলায় সীতা বলল, 'লাভ মি, অপূর্ব। লাভ মি—'

৪

চাকরিটা শেষ পর্যন্ত ছেড়েই দিল অপূর্ব। বোধের মধ্যে এগিয়েই ছিল কয়েক পা, ইতিমধ্যে এবং এর আগে এমন কোনও সিদ্ধান্ত নিলেও নিতে পারত—সে জানে না যে-কোনও কাজের পিছনে নির্দিষ্ট কোনও কারণ থাকতেই হয় কি না। তবে ভাল লাগছিল না। ধন্ধটা আরও বেশি করে দেখা দিল যখন সে একদার অপমানবোধ থেকে পুরোপুরি মুক্ত; অপরেশ ভাল, সীতা ভাল, চাকরিতে তার ক্রমশ হয়ে ওঠার অভিজ্ঞতাকে মর্যাদা দিচ্ছে অ্যাকশন গ্রুপ, এরকম একটা ধারণা দানা বেঁধে গেছে মাথায়। এখন হালকা এবং দায়িত্বের অভাবে শূন্য লাগছে নিজেকে; কিন্তু ব্যর্থ নয়। এই শহরের শব্দ ও শব্দহীনতার মধ্যে, রোদ কিংবা বৃষ্টির সংস্পর্শে থাকতে থাকতে হঠাৎ কখনও গলায় হাই উঠে এলে প্রায় অর্থহীন ভাবে যে-কথাগুলো তার মাথায় ঘোরাফেরা করে তার অর্থ দিন কেটে যাচ্ছে।

বস্তুত অনেকগুলি দিনই কেটে গেল। এ সময় জাঁকিয়ে বর্ষা আসার কথা। কোথায়! জুনের গোড়ায় ক'দিন বৃষ্টির দাপট দেখা দিলেও আকাশ ফর্সা হয়ে গেল হঠাৎ। ওয়েদার রিপোর্টে পড়েছিল এরকম হয় কখনওসখনও, আগেও হয়েছে।

তবে যা-ই হোক, স্পষ্ট বুঝতে পারে অপূর্ব, সে যা ছিল এখন আর তা নেই। নিজেকে অনুভব করার চেষ্টায় মনে হয় হঠাৎই বেড়ে গেছে বয়স, একটা পরিবর্তন এসে গেছে শরীরে, মনে এবং এসব নিয়ে সারাক্ষণের অবচেতনায়। মনে হয় কিছু আছে, কিছু ছেড়ে গেছে তাকে, আর সেই ছেড়ে যাওয়া জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছে অপরিচিত কিছু। কী, তা ভাবতে ভাবতে ফিরে যেতে হয় পুরনো দৃশ্যে।

ভাবলে হাসিও পেয়ে যায় কখনও কখনও। তখন মনে হয় উধো-বুধোর প্রবাদটা নিতান্তই আজগুবি নয়। এর পিণ্ডি ওর ঘাড়ে কখন চাপবে—তখন হ-য-র-ল-ব'তে যেমন, ছিল রুমাল, হয়ে গেল একটা বেড়াল! কোথায় কি না মালবীর সঙ্গে—, না সীতা এসে তুলে নিল তাকে! একেবারে চশমা কিংবা চন্দ্রবিন্দু!

যেমন এর আগে একদিন, মনে পড়ল, কী কারণে ছুটি ছিল অফিস, অনেক দিন পরে কফিহাউসে গিয়েছিল সেদিন। চেনাশোনা কেউ আসেনি তখনও। একা কফি নিয়ে বসে থাকতে থাকতে দেখল বেশ লম্বা আর খসখসে একজন, ঘামে জ্যাবড়ানো মুখ, গায়ে পুরনো কাটের সাফারি স্যুট, হাতে চামড়ার ব্যাগ, নিজের মনেই হাসতে হাসতে ঢুকছে ঘাড় কাত করে। লোকটিকে দেখে চেনা লাগল অপূর্বর; পরে খেয়াল হল তাদের এজেন্সিতে কখনও এসেছে হয়তো, দেখে থাকতে পারে। কিংবা, এই কফিহাউসেই কি?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কাউকে খুঁজতে খুঁজতে তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল লোকটি এবং চিনতে পারার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'আ-রে! কী খবর?' অপূর্ব 'ভাল। থ্যাঙ্ক ইউ—' বলতে না বলতেই উল্টোদিকের চেয়ারটা টেনে বসে পড়ল লোকটি, 'চিনতে পারছেন তো? সদাশিব রায়। সেই যে—!'

তেমন করে কিছু মনে না পড়ায়, বস্তুত সে চেষ্টাও করেনি, অপূর্ব 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ভাল আছেন?' বলতে লোকটি বলল, 'সেভেনটি পার্সেন্ট নর্মাল বলতে পারেন। মাঝখানে প্রসট্রেট অপারেশন হল, অনেক ব্লাড নিতে হয়েছে। অন্যের রক্ত তো, বুঝতেই পারছেন, ডাক্তার বলেছে পুরোপুরি নিজের শরীরে মিশে যেতে সিক্স উইকস লাগবে—'

সদাশিব রায় কী বলতে চাইছে এবং কেন তা বোধগম্য না হওয়ায় অস্বস্তি নিয়ে তাকাতে আকর্ণ হাসি ছড়িয়ে লোকটি তার মিশিমাখা দাঁত দেখাল এবং বলল, 'আমাকে দেখে মনে হচ্ছে না খানিকটা অ্যাবনরমাল? এটা ওই ফরেন এলিমেন্টের জন্যে। আমি অবশ্য সবাইকেই বলে দিচ্ছি ব্যাপারটা, যাতে থার্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট করে নেয়। এসব ব্যাপারে অনেস্ট হওয়াই ভাল, কী বলেন!'

লোকটি তার উত্তরের অপেক্ষা করেনি। খুব সদাশয় হেসে এবং কিছু গোপন রেখে বলল, 'আমি এসেছিলাম মিস্টার চ্যাটার্জির খোঁজে। দেখেছেন নাকি? অবশ্য আপনাকেও কফি খাওয়াতে পারি—', ইত্যাদি।

সদাশিব থেকে চ্যাটার্জি এবং সে কফি খাচ্ছে দেখেও আবার কফি খাবার অফার নিয়ে কনফিউসন থেকে বেরুবার আগেই নতুন তিন চারজন ঢোকায় লোকটি হঠাৎ 'ঐ তো মিস্টার চ্যাটার্জি—', বলে উঠে গেল। অন্য টেবিলে বসে পা নাচাতে নাচাতে হাসতে লাগল তার দিকে তাকিয়ে।

এরকমও হতে পারে। ওই লোকটি—সদাশিব রায়ই কি? —যেমন বলেছিল, হয়তো তারও মধ্যে আস্তে আস্তে ঢুকে পড়ছে বিজাতীয় কিছু, ফরেন, বোধের ভিতর এনে দিচ্ছে এক খাপছাড়া অনুভূতি।

এর মধ্যে শৌনিকের সঙ্গে আইজল ঘুরে এল ক'দিন। শৌনিক বলেছিল চুংগা নামে একটি মিজো যুবকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তার, রাজনীতি করে ওখানে, ন্যাশনাল ফ্রন্টের অ্যাকটিভিস্টদের চেনে। ব্যাপারটা বুঝতে হবে। অনেক দিন হল এখানে রাজনীতিতে ঘটছে না কিছুই, সুতরাং যাবে। অপূর্ব ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি ঠিক, হঠাৎ মিজোরাম কেন। শৌনিক ভাঙল না কিছু, হয়তো চায়ওনি। হয়তো আজকাল অবিশ্বাস করে তাকে। রাজনীতি থেকে এখন সে অনেক দূরে। কিছুদিন ওদের সঙ্গে ঘোরাঘুরি করে, লিটারেচার পড়ে, স্লোগান দিয়ে এবং গা ঘষে বুঝেছিল দ্যাটস নট মাই কাপ অফ টি, তারপর আস্তে আস্তে সরিয়ে নিয়েছিল নিজেকে। শৌনিকও বুঝেছিল সম্ভবত, তাই জোরজার করেনি আর। ঘটনাটা প্রায় এই রকম—একদিন সকালে উঠে অপূর্ব দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে ব্যালকনিতে কিংবা ফুটপাথে, কিংবা বসে আছে রেস্তোরাঁর টেবিলে, সঙ্গে মালবী কিংবা আর কেউ থাকলেও থাকতে পারে, আর রাস্তা দিয়ে মিছিল নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে শৌনিক। বাস, ট্রাম, শব্দ ইত্যাদি যেমন যায় তেমনি, যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। হ্যাঁ, একবার অন্তত ঘটেছিল এরকম। তো সেদিনই, চেনা শব্দগুলো অন্য রকম ধ্বনি নিয়ে ঢুকেছিল কানে—ফাঁপা, পিতল-বাজানো ও গতানুগতিক, অভ্যাসে চ্যাঁচানো। মনে হচ্ছিল এই মুহূর্তে কেউ যদি ধ্বনিগুলো কেড়ে নেয়

ওদের মুখ থেকে, থামিয়ে দেয় উত্তোলিত হাতের ভঙ্গি, লোকগুলো তাহলে মরে যাবে পটাপট। তখন কংগ্রেস বা কম্যুনিস্টদের লরি এসে, একক কিংবা যৌথভাবে, ডাঁই করে তুলে নিয়ে যাবে। দলবদ্ধ এই যাওয়া, ধ্বনি কিছু দিক না দিক, এগুলোই কি বাঁচিয়ে রাখছে।

পরে এসব শুনে রীতিমতো ক্ষুব্ধ, শৌনিক বলেছিল, তুমি রিঅ্যাকশানারি, বুর্জোয়া; যে-ক্লাসে বিলং করো সেখান থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে না এলে বিরোধ কোথায় তা-ই বুঝতে পারবে না। ষাট-সত্তরেও হয়েছিল এরকম—কিছু ভুসিমালের রোমান্টিক অ্যাডভেনচারিজম একটা জেনুইন আন্দোলনকে পাতলা করে দিল, ইত্যাদি। আর একদিনও বলেছিল, সুদেষ্ণার বাড়িতে, ঠিক এই কথা না হলেও এই ধরনের কথা। বিজনেসের ব্যাপারে কোথায় যেন ট্যুরে গিয়েছিল ওর স্বামী অজয়, গুনগুন করে কী একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে শৌনিকের চুলে বিলি কেটে দিচ্ছিল সুদেষ্ণা, অপূর্ব লক্ষ করে প্রকৃতপক্ষে শৌনিকের মাথাটা নিজের বুকে নিয়ে খেলা করছে সুদেষ্ণা—এক সময় ঝুঁকে শৌনিকের চুলে নাক ডুবিয়ে বলল, 'কী সুন্দর গন্ধ গো তোমার চুলে।' তখন শৌনিক খেপে গিয়ে বলল, 'কী হচ্ছেটা কী।'

শৌনিকের বলার কথা অনেক, শুনতে ভাল লাগে। যেমন একদিন, মালবীদের বাড়ি টি-ভিতে—সেদিন দুজনেই একসঙ্গে গিয়েছিল যাদবপুরে শৌনিকের মামাবাড়িতে, হাজার হাজার কালো মেয়ে-পুরুষের উত্তেজিত সমর্থনের মধ্যে মার্টিন লুথার কিং-এর সম্মোহিত কণ্ঠস্বর শুনে লেগেছিল। কেমন একটা তাপও এসে যায় শরীরে; মনে হয় কিছু করতে হবে, কিছু একটা করা উচিত।

এসব আগেকার কথা। এখন গা গরমও হয় না। তবে, বন্ধুত্বটা থেকে গেছে শৌনিকের সঙ্গে, সেই কলেজে যেমন ছিল কিংবা তার পরেও—অপূর্ব জানে তার বন্ধু নেই। শৌনিকের সঙ্গে সম্পর্কটা অবশ্য আলাদা। এখনও যে চিড় ধরেনি তার একটা কারণ মালবীও হতে পারে।

আইজল যাবার প্রস্তাবটা লুফে নিয়ে মর্নিং স্টার অফিসে দেখা করতে গিয়েছিল মিস্টার আহমেদের সঙ্গে। একটা স্টোরি করতে প্রস্তাব দিল, মে বি ইন টু, থ্রি পার্টস, তাতে ন্যাশনাল ফ্রন্টের কথাও থাকবে। মিস্টার আহমেদ কি রাজি হবেন? যদি হন, দিস উইল বি আ গুড ব্রেক। ইদানীং লিখতে ভাল লাগছিল তার। সেক্স ইন অ্যাডভার্টাইজিং বিষয়ে প্রায় দেড় হাজার শব্দের লেখাটা লিখেছিল মোটামুটি এক বেলায়, ছাপাও হল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। তখনই মনে হয়েছিল পারবে।

দুপুর। একজন ভদ্রলোক এবং একজন ভদ্রমহিলা বসেছিলেন আহমেদের সামনে। চেহারায় অবাঙালি। স্লিপ পাঠানোর পর দরজা ঠেলে অপূর্ব যখন ভিতরে ঢোকে তখন তিনজনেই হাসছিল, কফির কাপগুলোও প্রায় ভর্তি। হাসি থেমে গেল। অপূর্বর মনে হল ভদ্রলোকের ছবি দেখেছে কাগজে। চিনতে পারল না।

অদূরবর্তী আড়ালে তাকে বসতে বলে নিজেও সেখানে উঠে এল আহমেদ। পরিকল্পনা শুনে বলল, 'অ্যাডভার্টাইজিং থেকে মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট অনেকটা রাস্তা। এনি আইডিয়া, এর মধ্যে কোথায় তুমি দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

'কেন।'

আহমেদ তাকাল তার মুখের দিকে। হাসল না, বিরক্তিও দেখাল না। নীচু গলায় বলল,

'লুক, কিছু প্রশ্ন করতেই হবে, কিছু অ্যানসারও দিতে হবে। ফার্স্ট টু ইওরসেলফ। আমার মনে হয় তোমার জন্যে কলকাতাতেই অনেক স্টোরি আছে। হোয়াই নট ট্রাই দেম!'

'আপনি কি বিশ্বাস করতে পারছেন না আমাকে!'

'এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার নয়, সাবজেক্টের ইমপর্ট্যান্সের ব্যাপার। অ্যাকটিভিস্টরা জোকার নয় যে তুমি গেলে আর দেখা করতে চলে এল। নো, নট দ্যাট। এতে রিস্কও আছে—'

কী বলবে ভেবে না পেয়ে চুপ করে থাকল অপূর্ব।

'যাচ্ছ যাও।' ব্যস্ততা দেখিয়ে আহমেদ বলল, 'বাট গো অ্যাজ আ ট্যুরিস্ট। আমি যাইনি কখনও, শুনেছি জায়গাটা বিউটিফুল। রাইট ইফ ইউ ফাইন্ড এনিথিং ইন্টারেস্টিং।'

অপূর্ব কি নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিল? হয়তো। সব শুনে শৌনিক বলল, 'অত প্ল্যান এঁটে যাবার কী আছে। গিয়ে দেখা যাবে কি হয়—।' তারপর বলল, 'শিয়ালদার ত্রিপুরা মেসে বিপ্লব আদিত্যর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সেদিন, আগরতলায় ফিরে গেছে। ও বলেছে সঙ্গে যাবে। বিপ্লব লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝে—'

শৌনিকের বন্ধুর অভাব নেই, কথায় কথায় নাম ছাড়তে পারে। শিয়ালদা বলতে দার্জিলিং মেল ছেড়ে যাওয়া, অপূর্ব জানত না এর কাছেপিঠে কোথাও আছে এক এঁদো গলি ও ত্রিপুরা মেস—সেখানে শৌনিকের সঙ্গে দেখা হয় বিপ্লব আদিত্য নামের কারুর সঙ্গে যে মিজো ভাষা বোঝে।

বাজে বলেনি। আগরতলা থেকে বিপ্লবই নিয়ে গেল। তাদের চেয়ে সামান্য বড়ই হবে হয়তো, কিংবা একবয়সী, মোটা নাকের নীচে ঝুলো গোঁফে টগবগে ও টাটকা; শৌনিকের চেয়ে কিছু কম জানে না। পায়ে গামবুট, মাথায় প্লাস্টিক মোড়া হ্যাট, প্রায় শিকারির পোশাক তিনজনের পরনে। পাহাড়ি রাস্তায় জিপে যেতে যেতে মাওতাং-থিংতাং-এর গল্প করল বিপ্লব, মিজো পার্বত্য অঞ্চলে এই 'র‍্যাট-ফেমিন' বড় সাংঘাতিক ঘটনা। ইঁদুরের সংখ্যা বেড়ে যায় ভীষণ ভাবে। আগে প্রতি ছত্রিশ বছরে হত এমন, ইদানীং আর শোনা না গেলেও ইঁদুর আছে।

চুংগাকে পাওয়া গেল না। শৌনিককে দেওয়া ওর ঠিকানায় পৌঁছে শুনল অনেক দিন দেখা যাচ্ছে না তাকে। তবে উত্তর দিকে মিশনারি এলাকা পেরোলে যে-বস্তি, সেখানে ডিকি থাকে, সম্ভবত ওর বউ, ওখানে পাওয়া যেতে পারে।

জিপে উঠে বিপ্লব জিজ্ঞেস করল, 'স্মাগলার নয় তো?'

'স্মাগলাররা পলিটিকাল হিস্ট্রি মুখস্থ করে না—', আকস্মিক প্রশ্নে বিভ্রান্ত, শৌনিক বলল, 'গিয়েই দেখি না!'

বিপ্লব ড্রাইভারকে জিপ ঘোরাতে বলল।

এখানে খাড়াই বেশি। ঝলমলে রোদে শুকোচ্ছে পাহাড়তলি; বন্যতা মেশানো বাঁশ গাছ আর কালচে সবুজ বুঝিয়ে দেয় বৃষ্টি হলে ভয়ঙ্কর। বাঁশ কিংবা কাঠের তৈরি ছোট ছোট বাড়িগুলো ছোট দেখায় আরও। কুয়াশার মতো ধোঁয়া ক্রমশ পাতলা হয়ে উঠে যাচ্ছে ওপরে।

ওখানে জিপ যাবে না। ভিতর-ভিজে মাটিতে কোথাও কোথাও পা পড়ছে অসমান হয়ে। অচেনা গাছগাছালি ঘেরা, কখনও বা ন্যাড়া, সরু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা ধরে বিপ্লবকে সামনে

রেখে পর পর তিনজন উঠতে লাগল ওপরে।

গির্জার পোশাকে একজন মিশনারি নেমে আসছিল ওপর থেকে। সে-ই দেখিয়ে দিল।

সমতল মতো জায়গায় পর পর কয়েক সারি খুপরি। সামনে প্রায় নিকানো জমিতে ছোট বাজার বসেছে। হলদে টম্যাটোর মতো একরকম ফল, আলু ও চালের পসরার আশপাশে স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা ইঁদুর। ইতস্তত ছড়ানো থ্যাবড়ামুখ, বাদামি রঙ মেয়ে পুরুষ বাচ্চার কয়েকজন তাদের দেখে এগিয়ে এল। কী বলছে বোঝা যায় না কিছু। বস্তির শেষ প্রান্তে কবরখানার মতো কয়েকটা ক্রশ। খয়েরি রঙের, রোমহীন একটা বেঁটে কুকুর সেদিক থেকে ছুটে এসে চিৎকার জুড়ে দিল হঠাৎ।

ডিকিকে পাওয়া গেল সেখানে। হাতে কাঠের থালার মতো কিছু, একটা খুপরির নিচু দরজার ভিতর থেকে বেড়িয়ে এল রঙচঙে বার্মিজ পোশাক-পরা এক যুবতী; তার পেট ও কোমরের স্থূলতা চোখ এড়ায় না। ঈষৎ কটা, ভুরুহীন চোখ মেলে যুবতী তাকিয়ে থাকল তাদের দিকে।

বিপ্লব কি জিজ্ঞেস করল বোঝা গেল না। মাথা নেড়ে গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ডিকি। তারপর আরও কিছু জিজ্ঞেস করায় হঠাৎই আং-মাং-দামিস্কো-দামিস্ক বলে চ্যাঁচাতে শুরু করল। হাতের থালাটা ফেলে দিয়ে পুরু গোছার পা-তুলে ঠুকতে লাগল মাটিতে।

ওরা থ। বিব্রত মুখে শৌনিকের দিকে তাকিয়ে বিপ্লব বলল, 'কেস ঝামেলার। চলুন, কেটে পড়ি। চুংগা ওর পেট করে দিয়ে ভেগে গেছে দামিস্কো না কোথায়—উল্টে আমাদের কাছেই খোঁজ চায়—'

কথাগুলো বলেই বুক পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে ডিকির দিকে ছুড়ে দিল বিপ্লব এবং পিছন ফিরে হাঁটা শুরু করল।

একই রাস্তায় নীচে। জিপে উঠে গম্ভীর মুখে শৌনিক জিজ্ঞেস করল, 'দামিস্কো কোথায়?'

'বার্মা বর্ডারে।' বিপ্লব বলল, 'আমার সন্দেহ লোকটা স্মাগলার। এসব এলাকায় স্মাগলার যত, প্রস্টিটিউটও তত। কোনও পেট করে দেওয়া অসহায় মেয়েকে ওইভাবে চ্যাঁচাতে শুনেছেন!'

শৌনিক চুপ। অপূর্ব শোনেনি; দ্যাখেওনি। জিপ আবার আইজল শহরের দিকে ফিরে আসায় যে-দৃশ্য তা দেখতে দেখতে কলকাতা ভেসে ওঠে চোখে। মনে আছে, অবশেষে সীতার শরীর থেকে সে যখন সরে এল এবং দেখল খানিক আগে সে যেমন, তেমনি চোখের ওপর আড়াআড়ি হাত ঢেকে শুয়ে আছে সীতা, ঈষৎ ফাঁক দুই ঠোঁটের ভিতর থেকে উঁকি দিচ্ছে দাঁতের সাদা; এলোমেলো, বিস্ময় আর ইচ্ছে জাগাচ্ছে না কোনও, তখন নাকের নীচে ও চিবুকের খাঁজে ঘাম নিয়ে সেও ভেবেছিল, কিছু কি হয়ে যেতে পারে! পরে মনে হয় হওয়া না-হওয়াটা সীতার সমস্যা। আফটার অল, সি ইজ আ মাদার; এরকম আগেও শুয়েছে।

ভেবেছিল এক, হল আর এক। আইজলের অভিজ্ঞতা নিয়ে স্টোরিটা হয়ে গেল একেবারে অন্য রকম। 'চুংগার সন্ধানে আইজলে' নাম দিয়ে যা লিখল তাতে অ্যাকটিভিস্টদের কথা না থাকলেও আইজল থাকল, চুংগা থাকল, ডিকি থাকল আর থাকল ইঁদুরসহ অন্যান্য ঘটনা নিয়ে পুরো ভ্রমণ কাহিনী। দুপুরে বেরিয়ে, রাস্তায় চাইনিজ লাঞ্চ এবং

অনেকটা সময় নিয়ে কফি খেয়ে, লেখাটা এইমাত্র দিয়ে এসেছে মর্নিং স্টার অফিসে।

আহমেদ আজ একাই ছিল। বেশ খোলামেলা আর খোশমেজাজে। বলল, 'ভাবছিলাম মিজোরাম গিয়ে তুমি নিজেই অ্যাকটিভিস্ট হয়ে গেলে কি না।'

আজকাল প্রায়ই দুই উরুর মাঝখানে অস্বস্তি বোধ করে অপূর্ব। এটা কি নার্ভাসনেসের লক্ষণ? ইতস্তত করে বলল, 'ক'দিন আগরতলাতেও ছিলাম, সেই জন্যেই—'

'এনেছ?'

দুটো ছবিসহ টাইপ-করা কপিটা এগিয়ে দিতে সেটা হাতে নিয়ে আহমেদ বলল, 'বাই দি বাই, তোমার অ্যাডভার্টাইজিং নিয়ে লেখাটা বেশ অ্যাপ্রিসিয়েটেড হয়েছে। কিছু চিঠি পেয়েছি, ইনক্লুডিং সাম প্রোটেস্ট। আমরা ছাপছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

বেয়ারা ডেকে চা দিতে বলল আহমেদ। তারপর কপির ভাঁজ খুলে তখনই পড়তে শুরু করে দিল লেখাটা।

দাঁতে নখ কাটতে কাটতে অপূর্ব ওকে লক্ষ করছিল। ওর ভুরু কোঁচকানো, তারপর স্বাভাবিকতায় ফেরা—পাশের হোল্ডার থেকে ডটপেন তুলে নিয়ে কী একটা কারেকশান করল, পাতা ওল্টাল, তারপর চা খেতে খেতে, চতুর্থ পৃষ্ঠায় এসে, চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ল মুখে। সম্ভবত ভাল লাগছে লেখাটা, মাঝে মাঝে পেন-চালানো সেটাই বোঝায়। আশ্বস্ত হয়ে দু চুমুকে অনেকটা চা গিলে ফেলল অপূর্ব।

'ভেরি গুড। বেশ ফান আছে লেখাটায়।' আহমেদ স্বতঃস্ফূর্ত হল। আবার ছবি দুটো দেখতে দেখতে বলল, 'নো ডিকি?'

'না। ওর ছবি তোলার কথা খেয়াল হয়নি। বিসাইডস—'

'আই আন্ডারস্ট্যান্ড। দেয়ার ওয়াজ সাম রিস্ক। তবে তুলতে পারলে ভাল হত—।' একটা ছবি বেছে নিয়ে প্রিন্টের পিছনে কী লিখে মুখ তুলল আহমেদ, 'এরপর যখনই কোনও স্টোরি করবে, জাস্ট গো অন ক্লিকিং। কোনটা যাবে না যাবে আমরা বেছে নেব। অ্যান্ড উই উইল পে ফর দ্য ফোটোগ্রাফস।'

টেলিফোন তুলে বাইরের কোনও লাইন চাইল আহমেদ। অপূর্ব উঠবে কি না ভাবছে, বলল, 'চাকরির কী হল?'

'ছেড়েই দিয়েছি, তবে, একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে—'

'মিনস?'

'মিস্টার গুপ্ত, আই মিন মাই বস, বলেছেন অ্যাসাইনমেন্ট বেসিস কাজ করতে—এক্সক্লুসিভলি ফর হিজ এজেন্সি। সেজন্যে রিজিডলি অফিসে না গেলেও চলবে।'

'তার মানে উনি তোমাকে ছাড়তে চান না। রেজিগনেশন অ্যাকসেপ্ট করেছেন?'

'অফিসিয়ালি, না।' আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে অপূর্ব বলল, 'কিন্তু সো ফার অ্যাজ আই অ্যাম কমসার্নড, ছেড়ে দিয়েছি—'

ওপর থেকে নীচে মাথা নেড়ে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকল আহমেদ। কয়েক মুহূর্ত। তারপর বলল, 'নেক্সট উইকে একবার দেখা কোরো। আমরা কিছু নতুন ফিচারের কথা ভাবছি—। ও-কে?'

সিঁড়ি। রাস্তা। পাঁচটা বাজেনি এখনও। বিষণ্ণ কিন্তু খুশি-খুশি এক রকম রোদ আশপাশের

উঁচু বাড়িগুলোর ওপর ছুঁয়ে ছায়া চেনাচ্ছে নীচে। একই দৃশ্য ও শব্দ। ওরই মধ্যে লাইন দিয়ে রাস্তা পার হল স্কুল ইউনিফর্মপরা চীনা ছেলেমেয়ের একটি দল। পিছনে গাউন-পরা দুটি বড় মেয়ে। টিচারই হবে; সম্ভবত আগে আগেও ছিল একজন। মেট্রো রেলের খোঁয়াড় থেকে একদলা মাটি তুলে একশো মিটারের দৌড় শেষ করার ভঙ্গিতে ডাবলডেকার তুচ্ছ করে ফুটপাথে উঠে এল একটি বছর তিন-চারের শিশু, ফুটপাথে দাঁড়িয়েই অনায়াসে পেচ্ছাপ করতে লাগল রাস্তায়। উঁচু ক্রেন থেকে নেমে আসা পাইলিংয়ের শব্দটা এই সময় গেঁথে গেল মাথায়। অ্যাম্বুলেন্স; পুলিতে বিদ্যুতের ঝিলিক দিয়ে চলে যাচ্ছে ট্রাম। সামনে রোদ। গা-ঘেঁষা ভিড় পেরিয়ে চৌরঙ্গির ফুটপাথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, একটি ক্ষয়া চেহারার যুবতীর 'আমাদের মাস রিলিফ ফান্ডে কিছু সাহায্য করুন'-এর কৌটো নাড়া এড়িয়ে, অপূর্ব লক্ষ করল রোদ নরম হলে ছায়াও শিথিল হয়ে আসে।

এখন মালবীর কাছেই যাবে। সকালে লেখাটা টাইপ করানোর জন্যে গড়িয়াহাটে গিয়েছিল, ঘণ্টা দেড় দুই পরে ফ্ল্যাটে ফিরে এসে একটুকরো চিঠি পেল লেটারবক্সে— 'অফিস তো নেই, যাও কোথায়। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করে ফিরে গেলাম। কলেজ আছে। বিকেল পাঁচটার পর বাড়িতে এসো। অবশ্যই এসো। না এলে—'। কী হবে তা লেখেনি। ট্যাক্সির অপেক্ষায় বাস স্টপে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে ভাঁজ-করা টুকরোটা বের করে অপূর্ব দেখল, না, লেখেনি। সম্বোধন নেই, এমনকী নামটাও লেখেনি নীচে। জানে বুঝে নেবে অপূর্ব। জানে? তবে কি এটাই ঠিক, কোনও কোনও অনির্দিষ্টের মধ্যেই থেকে যায় গভীর বিশ্বাস—না লেখা কিংবা না বলার মধ্যেই রেখে যায় প্রত্যক্ষ, পরিচয় ও সম্ভাবনা। স্মৃতিই চেনায়।

ট্যাক্সির দেখা নেই। আসছে, দাঁড়াচ্ছে, চলে যাচ্ছে বাস, মিনিবাস। সময়ও। পাশ থেকে একটি লোক 'দাদা, এটা কি যাদবপুর যাবে—?' বলে চেঁচিয়ে উঠতে অপূর্ব দেখল পাঁচ নম্বর, এই সময়ের পক্ষে আশ্চর্যজনক ভাবে ফাঁকা। তখন লোকটির পিছনে পিছনে, প্রায় রিফ্লেক্স অ্যাকশনে, সেও দৌড়ুল এবং উঠে পড়ল; জায়গাও পেয়ে গেল বসবার। মিউজিয়ামের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে নানা রঙের মানুষ। পার্ক স্ট্রিট পেরিয়ে যেতে যেতে মনে পড়ল বৃষ্টি, উল্টোদিকের ফুটপাথ থেকে জেব্রা ক্রশিং ধরে পড়ি-কি-মরি করে এদিকে ছুটে এসে দ্রুত ফোটোগ্রাফির দোকানে ঢুকে পড়ল এক সুন্দরী যুবতী। এক পায়ের হাঁটুর নীচে অদৃশ্য ট্রাউজার্স-পরা পাগলটা বলল, 'সো হোয়াট?'

স্মৃতি কি সম্পর্কও চেনায়?

মালবী যেতে চেয়েছিল বলেই ওকে গায়ত্রীর কাছে নিয়ে যাবার কথা ভেবেছিল অপূর্ব। সেদিন বিমলকৃষ্ণ কলকাতায় নেই, জিজ্ঞেস করল, 'যাবে?'

'কোথায়।'

'পিসিমার কাছে। একটা সারপ্রাইজ দেওয়া যেত।'

এক পায়ে উঠে দাঁড়াল মালবী।

'বলেছ আমার কথা?'

'না। এখনও নয়। বলব।'

'কী বলে পরিচয় দেবে?'

'জাস্ট ফ্রেন্ড। বান্ধবী—'

'তা-ই।' মালবী হতাশ হল নাকি ঠাট্টা করল বোঝা গেল না। বলল, 'শুধুই বান্ধবী।'

সেদিন, মাত্র কিছুক্ষণের অনুমানে মহাভারত পড়ে ফেলেছিলেন গায়ত্রী। চিবুক ধরে যেভাবে চুমু দিলেন মালবীর সিঁথিতে, মনে হবে সই দিচ্ছেন উইলে। বললেন, 'যাক, এই খ্যাপা ছেলেটারও তাহলে কেউ আছে।'

তিনতলা থেকে দোতলায়। তারা নামছে। পিছনে তাকাল মালবী। নীচে এসে পাশাপাশি, লাউডন স্ট্রিট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অপূর্ব দেখেছিল বিমলকৃষ্ণের ঘরের জানলায় এসে দাঁড়িয়েছেন গায়ত্রী। মালবী বলল, 'তুমি কেমন মানুষ!'

বিশ্বাস? আজ সকালে গড়িয়াহাটে আসার জন্যেই দেখা হয়নি মালবীর সঙ্গে; টাইপের দোকান পেরিয়ে যেতে যেতে অপূর্ব ভাবল, কার প্রতি কার? মালবী এখনও আটকে আছে 'ভাল্লাগে না' আর বিয়ের পরে-র স্নিগ্ধতায়; জানে না এর পর বিয়ের আগে হলেও নতুন লাগবে না অপূর্বর।

নিঃশ্বাসের ভার নেমে যেতে বদলে যায় দৃশ্যও। চোখের মধ্যে ঢুকে পড়ে রোদ।

পিঠের পিছনে দেয়াল হলেই হেলান দিয়ে বসা। অপরাধবোধ নয়, গ্লানিও নয়; এক সর্বাংশ শূন্যতা সেদিন হতভম্ব করে রেখেছিল অপূর্বকে।

চোখের ওপর থেকে হাত সরিয়ে, ঈষৎ ঘাড় তুলে প্রথমে নিজেকে দেখল সীতা, আঁচল টেনে মেলে দিল বুকের ওপর। পা দুটো এমনভাবে মুড়ল যাতে হাঁটু ও পায়ের গোছা এমনিতেই ঢাকা পড়ে। চোখে যে গাঢ় ঘুম থেকে জেগে ওঠা দৃষ্টি তা অপূর্বর কাছে অন্তত নতুন, পাতলা ঠোঁটের না-ফোঁটা হাসিটুকুও। অপূর্ব চোখ নামিয়ে নিতে পাশ ফিরে ওর হাতটা চেপে ধরল সীতা, তারপর ছেড়ে দিয়েও ছুঁয়ে থাকল জায়গাটা।

'কী হল!' সীতা বলল, 'এমন চুপ করে গেলে কেন!'

অপূর্ব চুপ করেই থাকল।

তখন উঠে বসে ব্রা, ব্লাউজ আঁটতে আঁটতে সীতা বলল, 'এরকম হয়। কিছু করলে আমিই করেছি, তুমি ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন। বি চিয়ারফুল, অপূর্ব।'

উচ্চারণে টান ছিল, যেন হাত না বাড়িয়েও তাকে গভীর থেকে টেনে তুলল সীতা। ব্যাগ খুঁজে, ব্রাশ বের করে চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, 'একেবারে নভিস! বাব্বা! ডিড ইউ নো ইউ ওয়্যার লাইক দ্যাট!'

'স্টপ ইট!' পাশ কাটিয়ে খাট থেকে নেমে পিছনে চলে গেল অপূর্ব। দু হাতের নিখুঁত ভঙ্গিমায় চুলের গোছায় রুমাল বাঁধছে সীতা, দেখতে দেখতে অপ্রস্তুত গলায় বলল, 'ইউ মেক মি ফিল—'

কথাটা শেষ করার আগেই থেমে গেল অপূর্ব। ঘাড় ফিরিয়ে একই হাসি নিয়ে তাকিয়ে আছে সীতা। গুছিয়ে নেওয়ার ঔজ্জ্বল্যে প্রায় যেমন ছিল তেমনি, সামান্য ভুরু তুলে বলল, 'হ্যাপি বলতে চাও? না আনহ্যাপি? জোর করে সেলফিস হোয়ো না!'

হয়তো ঠিকই বলেছিল সীতা; হয়তো বুঝতে পারেনি সব অনুভূতির অর্থ পাওয়া যায় না—কোনও কোনও ভাল লাগায় ঢুকে পড়ে না-বোঝা বিষাদ, অপরাধবোধ এবং আত্মঘৃণা।

স্টেশন এলাকা পেরিয়ে এল। এইখানে নামা। বাঁ দিকে কোনাকুনি রাস্তায় এগোলে সেন্ট্রাল পার্ক। মালবীদের বাড়ি। বড় একটা আসেনি অপূর্ব; তেমনি, মালবীও যে কতবার গেছে তার ফ্ল্যাটে তা গুনে বলা যায়। অফিস থাকতে টেলিফোন ছিল, মালবীর বাড়িতেও

আছে, তেমন-তেমন দরকার হলে ফোন করা যেত ওর কলেজেও। দেখা হতই। তাহলে তিনটে বছর কেটে গেল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে, রেস্তোরাঁয় বসে, সিনেমা কিংবা থিয়েটারে, ছুটির দিনে কখনও বা দুপুরের ট্রেনে চড়ে বজবজ, কল্যাণী কি ডায়মন্ডহারবার। তঞ্চকতা ছিল না কোথাও। ছিল না?

সেদিনও বিকেলে দেখা হতে সন্দেহবশত কথাটা নিজেই তুলেছিল অপূর্ব। চোরের মন বোঁচকার দিকে, কথাটা কি তাই? হবেও বা। পরিকল্পনার বাইরে সীতার সঙ্গে প্রায় বিকেল পর্যন্ত কাটালেও সতর্ক ছিল যাতে দেরি হয়ে না যায়। মালবীর একটিই ভয়, লজ্জাও, ছাত্রীরা কেউ দেখে না ফেলে; সুতরাং রাস্তা বা একান্ত হবার জায়গা বাছাইয়ের লুকোচুরিতে দায় নিতে হয় তাকেও। এর মধ্যে অপেক্ষার সময় কমানোও পড়ে। তো, অপরাধবোধ থেকে আড়াল খোঁজার যুক্তি নিয়ে অপেক্ষার জায়গায় আগেই দাঁড়িয়েছিল অপূর্ব এবং যেমন ভেবেছিল, প্রথম সুযোগেই বলে ফেলল।

'আজ একটা সিন হল।'

'সিন! কোথায়?'

'বলছি—'

বলতে গিয়ে আবার নিজেকে অগোছালো করে ফেলল অপূর্ব। অথচ, সীতা যখন তাকে নিয়ে গাড়িতে ওঠে, বাবলুর স্কুলে যায়, তারপর হস্টেল থেকে বাবলুকে তুলে বিডন স্ট্রিটে, নিজের ফ্ল্যাটে, নিজেই রান্না করল এবং খাওয়াল, তখন, এই সমস্ত প্রক্রিয়ার মধ্যেই মালবীকে সামনে রেখে বলার কথাগুলো তৈরি করে রেখেছিল সে। মুখোমুখি বসে সবই তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

আবার নিজেকে গোছাতে গোছাতে অপূর্ব বলল, 'সীতা এসেছিল সকালে—'

'সীতা!' মালবী চোখ তুলল, 'সীতা আবার কে!'

'আমাদের অফিসের। তোমাকে আগেও বলেছি, মিসেস চৌধুরী—'

'যে-মহিলা তোমাকে অপমান করেছিলেন?'

মালবী থেমে আছে আগের বর্ণনায়। ওকে দেখতে দেখতে সতর্ক হল অপূর্ব এবং বলল, 'হ্যাঁ, ওই ব্যাপারেই—'

'ফ্ল্যাটে?'

'হ্যাঁ। অপিসে আমার ওই একটাই ঠিকানা—'

অপূর্বর গলার স্বরে কিছু ছিল যা মালবীকে চুপ করিয়ে রাখল।

'আমার ধারণা মিস্টার গুপ্তই পাঠিয়েছিলেন ওকে। অনেক কথা বলল। ইন ফ্যাক্ট, সি ওয়াজ ভেরি অ্যাপোলজিটিক—'

'তুমি কী বলেছ? যাবে?'

'দেখি—'

এ সময় প্রায়ই খিদে পায় অপূর্বর। এতদিনে মোটামুটি ওর ধাতটা বুঝে গেছে মালবী, জানে এখন খাইয়ে দিলে রাতের খাওয়া বাদ দিলেও ক্ষতি নেই। যা বাউণ্ডুলে।

আজ চিকেন দোপেঁয়াজি আর পরোটার অর্ডার দিয়েছিল। সার্ভ করার পরও কেটে গেছে কিছুটা সময়। কাঁটাটা হাতে তুললেও অপূর্ব ছোঁয়নি তখনও। সে ছোঁয়নি বলে মালবীও ছোঁয়নি। অপূর্ব বুঝতে পারছিল মালবী তার দ্বিধা ও অন্যমনস্কতার কারণ খুঁজছে।

'দেখার কী আছে।' সরল বিশ্বাসে মালবী বলল, 'একটা মিটমাট হয়ে যাওয়াই ভাল। শুধু শুধু চাকরি ছাড়বে কেন।'

অপূর্ব শুনেও শুনল না। দাবার গুটি সরানোর মতো কাঁটা ও ছুরি নিয়ে সাজাতে লাগল নানা ভঙ্গিতে।

ওকে তখনও অন্যমনস্ক দেখে মালবী বলল, 'এত কী ভাবছ বল তো।'

যা মনে রাখার তা হারায় না। বোতাম টিপলেই কোঁ-কোঁ করে ওঠে ক্যাসেট। মুখে চিকেন দোপেঁয়াজির স্বাদ নিয়ে তারপর ক্রমশ অন্য কথায় জড়িয়ে যেতে যেতে অপূর্ব ভেবেছিল, সে না জানালে মালবীও জানবে না। আজ সন্দেহ করলেও কাল করবে না। পরশু সবই স্বাভাবিক হয়ে যাবে। এরকমই হয় হয়তো।

আজ সকালেও হয়েছিল। বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে ঘরের ভিতর থেকে সীতাকে আবারও ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনেই হয়নি ওই শারীরিক স্থিরতায় লুকিয়ে আছে ঝড় ও অন্ধকার। রোদ ততক্ষণে সরে গেছে অনেকটা, আলোয় দুপুর। একটু আগেকার কোনাকুনি তাকানো ও ঠাট্টায় এরই মধ্যে এসে গিয়েছিল বিষণ্ণতা। এবারের চা-টা সীতা নিজেই করল এবং বলল, 'তুমি কি আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে? চলো না?' তারপর, বেরিয়ে, তাকে স্কুল কম্পাউন্ডের বাইরে গাড়িতে বসিয়ে রেখে হস্টেল থেকে ছেলেকে তুলে আনতে গিয়েছিল সীতা, ফিরল বাবলুকে সঙ্গে নিয়ে, হাতের উল্টোপিঠে চোখের কোণ মুছতে মুছতে। অবাক হলেও কিছু জিজ্ঞেস করেনি অপূর্ব। তবে, পিছনের সিটে বাবলুকে বসিয়ে সেলফ ঘুরিয়ে স্টার্ট করার আগে সীতা যখন গাড়ির আয়না ঠিক করছে, তখন আয়নাতেই ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝেছিল, কান্না কিংবা কান্নাজনিত আবেগ ছাড়া চোখে অমন রঙ ফোটে না। স্বাভাবিকের চেয়ে জোরে ড্রাইভ করছিল সীতা। তখনই মনে হয়েছিল এবং এখন, মালবীকে এড়িয়ে যেতে যেতেও মনে হল একাকিত্ব আছে, যা ব্যক্তিগত তা ভাগ করে নেওয়া যায় না—শরীর দিয়ে না, ভালবাসা দিয়েও না।

অন্যমনস্কই ছিল। মালবী বলল, 'তিরিশটা পয়সা দাও তো?'

'হঠাৎ।'

'তোমার জন্যে তিনটে রুমাল এনেছি। এমনি দিলে ঝগড়া হয়।'

খানিক আগে আহমেদের সঙ্গে কথা বলে বেরিয়ে আসার সময় যেমন হালকা লাগছিল নিজেকে এখন আর তা নেই। স্মৃতিই টেনে রাখে।

বাসে আসতে অনেকটা সময় লাগলেও বেলা যায়নি এখনও। অপূর্ব ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। টিনের জিব বের করা এক সাজানো কালীকে নিয়ে রগড় করছে কয়েকজন। কোনও কোনও বিকেল সিঙাড়া ভাজার গন্ধে ভারী হয়ে ওঠে। জল এসে যায় জিবে। দোকানের পিছনে আলকাতরা মাখানো টিনের দেয়ালে পেচ্ছাপ করতে করতে থেমে গেল পাজামা পরা একটি মাঝবয়সী খেঁকুড়ে চেহারার লোক, সম্ভবত তাকে দেখেই নয়; অপূর্ব দেখল পাশের বাড়ির দোতলার জানলা থেকে একটি হাত ও আঁচল সরে যাচ্ছে। লোকটা আবার শুরু করল। হর্ন দিতে দিতে এগিয়ে আসছে একটি সাইকেল রিক্সা। শহর ছাড়ানো এদিকটায় হাওয়াও বেশি। ছোট বাড়ির সামনে যাতায়াতের রাস্তা বাদ দিয়ে যেটুকু জায়গা সেখানেই বাগান। গাঁদা ও চন্দ্রমল্লিকা চেনা যায়। গেটের পাশে পাঁচিলের ওপর দিয়ে লতিয়ে ওঠা গাছেও অনেকটা তফাতে তফাতে সাদায় বেগুনির আভা লাগা এক ধরনের

ফুল। ওটা কোন ফুল?

দরজা খুললেন নিভা। একই মুখ, পুরনো; কিন্তু একই ধরনের হাসি।

'এসো। মালবী বলে রেখেছে তুমি আসবে।'

আগের দিন যা দেখেছিল তার চেয়ে অন্যরকম লাগছে ঘরটা। নিশ্চিত একটা অদলবদল হয়েছে সাজানোয়, দেয়াল অনেক বেশি উজ্জ্বল, আয়তনও পাল্টে গেছে অনেকটা।

'ফেরেনি এখনও?'

'এই তো, একটু আগে। চানে গেল। তুমি বোসো?'

'হ্যাঁ। বসছি।'

টি-ভি'র মুখোমুখি হেলানো বেতের চেয়ারে বসে সামনের তেপায়ার তলা থেকে দেশ-এর কপিটা হাতে তুলে নিল অপূর্ব। মালবী মাসিমা'য় রাজি, ওর যত আপত্তি তা ওই মেসোমশাই সম্বোধনে। গোড়াতেই বলেছিল, তখন সদ্য টান আসছে মনে; কেন, অপূর্ব কি আকছার মিস্টার বলছে না। অমন নরম চেহারার নিভাকে মিসেস বলা যায় না। জুত না হওয়ায় দুটো সম্বোধনই যখন যেমন পারে এড়িয়ে যায়। নিভা দাঁড়িয়ে আছেন দেখে জিজ্ঞেস করল, 'উনি বাড়ি নেই?'

'কে? ওর বাবা?' নিভা বললেন, 'ব্যারাকপুরে কেস আছে আজ। ফিরবেন এইবার—'

নিভার কথাতেই পরিষ্কার হল রহস্য। শেষ যেবার এসেছিল, অন্তত তিন, চার মাস আগে, তখনও এই ঘরের দেয়াল ঘেঁষে আইনের বই ঠাসা আলমারি ছিল দুটো। সরিয়ে ফেলায় বড় লাগছে ঘরটা।

'তুমি অনেক দিন পরে এলে—'

ভিতর থেকে ছিটকিনি খোলার শব্দ এবং মালবীর গলা পেল। নিভাকেই ডাকছে। তোলা গলা। অপূর্ব যে এসে গেছে সম্ভবত তা টের পায়নি এখনও।

'বোসো। আসছি—'

পর্দা সরিয়ে নিভা চলে যেতে গা ছড়িয়ে বসল অপূর্ব। যথেচ্ছ ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে চোখ আটকে গেল বিজ্ঞাপনে। ক্যাম্পেনটা নতুন বলেই মনে হচ্ছে। সালোয়ার-কামিজ পরনে ছুটে আসছে এক প্রাণবন্ত কিশোরী, ব্যাকগ্রাউন্ডে আবছা সমুদ্র, মুখে ও দাঁতে ঝলমলে হাসি। নীচে, ডানদিকে, প্রোডাক্টের প্যাক, স্যানিটারি টাওয়েল; বাঁ দিকে অসমান লাইনে কপি। নাথিং আনইউজুয়াল। হেডলাইন বলছে, 'মাসের সব দিনই এখন ওর কাছে সুন্দর ও আরাম।' পুরো ফিগার না দেখিয়ে ক্লোজ-আপে শুধুই মুখ দেখালে টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনও হতে পারত। তা নয়। কিন্তু, এইভাবেই বলে নাকি? সুন্দর ও আরাম? আরাম কি অ্যাডজেকটিভ? কে জানে। তার বাংলা জ্ঞান কম। মালবীকে জিজ্ঞেস করা যায় না, তবে শৌনিক বলতে পারে। শৌনিক মানে কী? কিংবা, মালবী? আহমেদ বলেছিল তার আগের লেখাটা নিয়ে কিছু প্রতিবাদের চিঠিও এসেছে। মেয়েদের কাছ থেকে? শরীরে সেক্স আছে, কিন্তু শরীরই সেক্স নয়, সে লিখেছিল, প্রায়ই তা সৌন্দর্য। যেমন মিকেলেঞ্জেলোর ভাস্কর্যে, দ্য ফিগার অফ 'ডন' ইন দ্য টুম্ব অফ লরেঞ্জো দ্য মেডিসি। জানলে ভাল হত।

পর্দার হাওয়ায় কেঁপে যায় চোখের পাতা। ভাবনাও।

মালবী বলল, 'ঠিক এসে গেছ তো!'

'কেন।'

দু হাতে পর্দা সরিয়ে দরজার ফ্রেমে দাঁড়িয়ে ছিল মালবী। এগিয়ে এল।

'কখন ফিরবে কী করে জানব। এখন তো ছাড়া গরু।'

অপূর্ব হাসল। বুকের ওপর আঁচলটা এ কাঁধ ও কাঁধ ছুঁয়ে জড়ানো; এইমাত্র স্নাত মুখের সজল ভাব যায়নি এখনও; জল সিঁথির গোড়ায় ও কানের পাশের চুলে, নির্দিষ্ট রেখায় গড়িয়ে আসছে চিবুকের তল বেয়ে গলার দিকে। অপূর্ব জলের গন্ধ পেল। এমন আটপৌরে চেহারায় আগে কি কখনও দেখেছে মালবীকে?

'অমন হাঁ করে তাকিয়ে আছ কেন।'

মালবী আশপাশ দেখে নিল, মাথা গলিয়ে পর্দার পিছনেও।

'দেখছি।' আগের কথার জের টানল অপূর্ব, 'ছাড়া গরুই বটে। গলার দড়িটা ঠিকই আছে, দড়ির সঙ্গে উপড়ে আনা খুঁটিটাও। চলতে গেলেই লটকে যাচ্ছে পায়ে—'

'তা-ই!' মালবী বলল, 'আহা রে!'

খোলা দরজার দিকে ওকে এগোতে দেখে হাতের ম্যাগাজিনটা যথাস্থানে রেখে দিল অপূর্ব। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল, মালবীকে পাশ কাটিয়ে ছায়া ঢুকছে ঘরে। এরই মধ্যে কমে গেছে দেয়ালের ঔজ্জ্বল্য। তখন বলল, 'বাড়িতে ডেকেছ কেন?'

'কেন ডেকেছি বল তো।'

মালবীকে উচ্ছল লাগছে, কিছু বা অস্থিরও। যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে সরে এসে বসল উল্টোদিকের চেয়ারে; দু কাঁধের ওপর দুই আঁচলের ডগা আরও একটু টেনে নিয়ে বলল, 'নিজের জন্যে নয়। অনেক দিন আসো না, মা বাবার ভয় ব্যাটা ভেগে গেল কি না। ক'দিন থেকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করছিল তোমার কথা, দেখা হয় কিনা—এইসব। তাই বললাম, দেখিয়ে দিই।'

'এই জন্যে। আমি ভাবলাম অন্য কিছু।'

'অন্য কিছুও আছে। পরে বলব।' আনমনা খুশিতে চোখে চোখ রাখল মালবী, 'কী খাবে বলো?'

'কী আর। চা।'

'শুধু চা।'

'আজ লাঞ্চ করেছি দেরিতে। চাইনিজ। এই সময় আর কী খাব!'

'তুমি যা খেতে চাইবে—'

কানের পাশ দিয়ে গড়ানো জলের বিন্দু দুলছে ঝরে পড়ার অপেক্ষায়। যেন ইচ্ছে করেই জল ধরে রেখেছে মালবী। মুখে শেষ বিকেলের আলো। খুব কাছেই সম্ভবত খেলার মাঠ আছে—রাস্তার ওপারেও হতে পারে, নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কখনও বলে শট মারার শব্দ, টুকরো টুকরো কথা ও চিৎকার, কখনও বা হুইসিলের শব্দ ভেসে আসছিল।

অপূর্ব হঠাৎই চকিত হয়ে উঠল।

'আমি কী খেতে চাই জানো না!'

'জানি—'

একটু আগেই বলেছে অন্য কিছুও আছে, পরে বলবে। এখন ঠোঁটে অর্ধেক হাসি ফুটিয়ে ওকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাতে দেখে অপূর্ব ভাবল, এই ঘরে ফেরার আলোয় বসে ঠাট্টার ছলে

মালবী সেই কথাটিই বলবে যা ও প্রায়ই এড়িয়ে যেতে চায়। ওর ঠোঁটের স্ফুরণও তেমনি ভাবাল।

মালবী বলল, 'নখ।'

অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাড়াতাড়ি দাঁত থেকে আঙুলটা নামিয়ে নিল অপূর্ব। কোন ফাঁকে অভ্যাসে জড়িয়ে গিয়েছিল খেয়াল করেনি। হেসেও ফেলল।

'আবার হাসা হচ্ছে।' অধিকার দেখিয়ে মালবী বলল, 'আমার ছেলে হলে আঙুলে উচ্ছে বেঁধে রাখতুম।'

তখন সন্ধে হয়ে এল।

এবার নিভাই ডাকছেন। উঠে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালল মালবী। ভিতরে যাবার আগে বলল, 'তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাব। পাঁচ মিনিট বসবে? আমি এক্ষুনি তৈরি হয়ে নিচ্ছি। টি-ভি খুলে দেব? দেখবে?'

'না। আই অ্যাম কোয়াইট কমফর্টেবল।'

আগে চোখে পড়েনি, এখন দেখল দু একটা মশা ওড়াউড়ি করছে ঘরের মধ্যে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে উল্টোদিকের বাড়ির ছাদ ও অ্যানটেনা চোখে পড়ে। কোথায় যাবার কথা বলল মালবী? দূরে শাঁখ বেজে ওঠার শব্দটা স্মৃতিতে ধরে রেখে অপূর্ব ভাবল, বদল আস্তে আস্তেই হয়, হঠাৎ একদিন মনে হয় আগে অন্যরকম ছিল। এখন যেখানে অ্যানটেনা, পাঁচ কি সাত বছর আগে সেখানে কি রেডিওর এরিয়েল ছিল? এখান থেকে ওখানে ছড়ানো উঁচু দুই খুঁটিতে লম্বা করে বাঁধা ফিতে; হাওয়ায় অবাধ লাট খাওয়া ঘুড়ি একবার আটকালে হতাশা এসে যেত বুকে, এমন অনেকবারই হয়েছে। মা বলত, 'আজ থাক, আজ সন্ধে হয়ে গেছে। ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতেই ফর্সা মুখ কালি হয়ে গেল!' মুখ মুছে দেওয়া আঁচলে মায়েরই গন্ধ। সেদিন কি বিশ্বকর্মা পুজো ছিল? তাই-ই হবে। রাজাবাজার থেকে এক ডজন ঘুড়ি, বড় লাটাই আর নীল মাঞ্জার সুতো এনে দিল বাবা; মেঝেয় বসে ময়ূরপঙ্ক্ষী ঘুড়িতে তেকোনা সুতো বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আস্কারা তো ছেলেকেই দিতে হয়। আমার ছোটবেলায় ঘুড়ি কেনার পয়সা ছিল না, এখন ওর মধ্যে দিয়েই সাধ মিটিয়ে নিচ্ছি।' ঘুড়ি তো নয়, রেসের ঘোড়া; কখনও লাট খেয়ে, কখনও গোঁত্তা খেয়ে আবার ওপরে উঠতে উঠতে শাসিয়ে বেড়াত আকাশ। তখনও টাক পড়তে শুরু করেনি বিমলকৃষ্ণের মাথায়। লাউডন স্ট্রিটের বাড়ির অনেকখানি জায়গা জুড়ে এখনও আছে গাছপালা, এক সঙ্গে অনেক পাখির ডাল কাড়াকাড়ির শব্দ কি শোনা যায় এখনও?

দীর্ঘ হুইসিল দিয়ে খেলা শেষ হল। একসঙ্গে অনেকগুলি বালক-কণ্ঠের কোলাহল শুনে উঠে এসে দরজায় দাঁড়াল অপূর্ব। কেউ আগে কেউ পরে, দেখল, ঘামে ভেজা জামা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কয়েকটি বালক ও কিশোর। একজন তখনও ড্রিবল করছে পায়ে বল নিয়ে। উল্টোদিক থেকে হর্ন বাজিয়ে ছুটে আসা সাইকেল রিক্সাটা বেরুবার জায়গা না পেয়ে থেমে দাঁড়াল ওদের সামনে এসে।

এরকমই কি হয়। অপূর্বর মনে পড়ল, সেদিন, সীতার ফ্ল্যাটে, বাবলুর সঙ্গে ভাব জমাবার ইচ্ছে থেকে এক ফাঁকে রাস্তায় বেরিয়ে দুটে টেবল টেনিসের র‍্যাকেট এবং বল কিনে এনেছিল সে। বাবলু পিছিয়ে গিয়ে বলল, 'আমি পিংপং খেলি না। আই প্লে চেস ওনলি—'

'বাবলু': প্রায় শাসন-করা গলায় সীতা বলল, 'রিফিউজ করবে না। অপূর্বদা এনেছে,

নাও। ইটস ব্যাড টু রিফিউজ এনিবডি লাইক দ্যাট।'

'অলরাইট।' রোগা হাত বাড়িয়ে অপূর্বর হাত থেকে একটা র‍্যাকেট টেনে নিল বাবলু, বলটাও নিল। জড়তা কাটিয়ে বলল, 'তুমিও খেলবে?'

'নিশ্চয়ই।'

'ওয়েট আ বিট, ওয়েট আ বিট।' সীতা বলল, 'বাস্কেটটা সরিয়ে নিতে দাও—'

বড় মাপের ডাইনিং টেবলের ওপর থেকে ফলের ঝুড়ি আর টুকিটাকি যা ছিল সরিয়ে নিল সীতা। দেখাদেখি চেয়ারগুলোকেও দেয়ালের দিকে সরিয়ে রাখল অপূর্ব।

'বাবলু, স্যাল উই প্লে?'

'নেট কোথায়!'

'ধরে নাও নেট আছে। আর—', একটু ভেবে এইমাত্র সরিয়ে রাখা জিনিসগুলোর মধ্যে থেকে নুন আর মরিচের কৌটো দুটো নিয়ে এসে টেবলের দু দিকে জায়গা মতো বসিয়ে দিল অপূর্ব, 'এখন ভাবতে হবে মাঝখানে নেট আছে—'

'অলরাইট।'

খেলা জমে উঠল। দেখতে দেখতে ধারাবাহিকতা এসে গেল খেলার শব্দে।

সীতা ব্যস্ত। আসছে, যাচ্ছে, দাঁড়িয়ে পড়ে দেখছে মাঝে মাঝে। এখন অনেক স্বাভাবিক। প্রেসারকুকারের ঝিক থেকে উঠে আসছে আদা-রসুনে সিদ্ধ চিকেনের গন্ধ।

খানিক খেলে হাল ছেড়ে দিল বাবলু। ক্লান্ত। বেলাও হয়েছে। ওকে বাথরুমে ঢুকিয়ে ফিরে এল সীতা।

'তুমি কখনও সমুদ্রে গেছ, অপূর্ব?'

'অনেকবার। হোয়াই?'

স্টিম বন্ধ করে বউলে মাংস ঢালছিল সীতা। বলল, 'আমি কখনও দেখিনি।'

'অ্যাবসার্ড!'

'বিলিভ মি। কখনও মনে হয় ছোটবেলায় গিয়েছিলাম। ফ্র্যাঙ্কলি, আই ডোন্ট রিমেমবার। বাট আই লাইক সি। সমুদ্র। ঢেউ। ঢেউয়ের পর ঢেউ—।' বলতে বলতেই থেমে গেল সীতা। ন্যাপকিনে হাত মুছে বলল, 'যেতে ইচ্ছে করে—'

'এ আর এমন কী ইচ্ছে।'

'যাবে একবার?' যেখানে ছিল সেখান থেকেই ঘাড় ফেরাল সীতা। আবার ব্যস্ত হতে হতে বলল, 'আমি, তুমি আর বাবলু। হি ইজ পুওরার দ্যান মি। কিছুই দ্যাখেনি—'

এক সীতাকে দেখেছিল, এখন আর একজনকেও দেখছে। এত সহজে বদলে যায় কী করে।

'এসো, অপূর্ব।' পিছনে ট্রে হাতে নিভা। বললেন, 'কম লোকজনের বাড়িতে এই-ই হয়। তোমাকে একলা বসিয়ে রেখেছি।'

ফিরতে ফিরতে অপূর্ব বলল, 'করেছেন কি। লুচি!'

'খাও না?'

'পেলে ছাড়ি না। কিন্তু—', সম্বোধন এড়িয়ে যাবে বলেই থেমে, সময় নিয়ে অপূর্ব বলল, 'এত নয়!'

'খাও আস্তে আস্তে। ঠিক পারবে। আমি চা-টা নিয়ে আসছি।'

নিভা চলে যেতে মালবী এল। তাঁতের ডুরে শাড়িতে, কপালের খয়েরি টিপে আর ঘাড়ের কাছে এলানো খোঁপায় একেবারে পাল্টানো। চোখের দৃষ্টিতে প্রথম দিন। তোশকের তলায় মশারি গুঁজতে গুঁজতে মালবী বলল, 'মৌরী খাবেন?'

অপূর্ব চোখ তুলল এবং নামিয়ে নিল। না, সেসব আর হবে না। শুধু ডুরে শাড়িটাই যা টেনে রাখছে।

'খাচ্ছ? না ভাবছ?'

'কেন!'

পর্দা সরিয়ে নিভা। চা-টা এগিয়ে দিয়ে বসলেন সামনে; সুতরাং কথা এগোলো না।

রাস্তায় বেরিয়ে মালবী বলল, 'আজকাল তোমাকে দেখে মনে হয় অ্যাকশন হারিয়ে গেছে, সারাক্ষণই ভাবো।'

'মানুষই ভাবে—'

খোঁপায় ফুল গুঁজেছে মালবী, সেই সাদায় হালকা নীলের আভা লাগা, অপরাজিতা কি? আলোর তারতম্যে বেগুনি লাগছে এখন। একটা নয়, দুটো। পাটভাঙা শাড়ির খসখস নিয়ে খানিকটা হেঁটে এসে বলল, 'কখন কোথায় যাও কাউকে বলে যেতেও তো পারো। সকালে অতক্ষণ দাঁড়ানোই সার হল। গিয়েছিলে কোথায়?'

'আসবে জানলে থাকতাম।' অপূর্ব অভিমান চিনল। হেসে বলল, 'কাল রাত জেগে শেষ করলাম লেখাটা। বেশ বড়। টাইপ করাতে গিয়েছিলাম—'

'সেই আইজল নিয়ে? ডিকি না কী যেন।'

'হ্যাঁ।' জোরে টি-ভি খুলেছে কোনও বাড়িতে। পুরুষ কণ্ঠের ঘোষণা, 'আসলে এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদেরই বোঝা উচিত। কারণ—'। এমনও হতে পারে যে বলছে তার চেহারাও মোটা, গায়ে বুশ শার্ট থাকবে। চশমা? থাকতেও পারে। শব্দগুলো পেরিয়ে এসে অপূর্ব বলল, 'দুপুরে দিয়ে এলাম মর্নিং স্টারে, মিস্টার আহমেদকে। তখনই পড়ল। ছাপবে—'

'খারাপ কিছু লেখোনি তো?'

'খারাপ!'

আড়ে তাকিয়ে হাসল মালবী। এখন প্রায় গায়ে গায়ে; হাত ছুঁয়ে যাচ্ছে সোনার বালা।

'দ্যাখো, ওই ডিকি না কে, তাকে নিয়ে সেদিন তুমি খুব খারাপ খারাপ কথা বলেছিলে। পেট-টেট কী সব! ওসব লেখোনি তো? আমার কোলিগদের দু একজন তোমার আগের লেখাটা পড়েছিল, এবার যদি অসভ্য কিছু লেখো—'

'প্রেগনানসি কি জীবনের বাইরের ঘটনা!' মালবী শেষ করার আগেই জবাব খুঁজে পেল অপূর্ব, 'এরকম ডিচিংয়ের ঘটনাও ফ্যাক্ট। যা সত্যি তা আড়াল করে লিখতে গেলে বানিয়ে লিখতে হয়—তোমার কোলিগদের খুশি করার জন্যে—বলতে হয় মেয়েদের জামা-কাপড়ের নীচে যেগুলো থাকে সেগুলো ফলস, তাদের কোনও রোল নেই—'

মালবী হঠাৎ অপূর্বর হাত খিমচে ধরে বলল, 'অসভ্য। দেখাচ্ছি তোমাকে। খালি খারাপ খারাপ চিন্তা। মেয়ে ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না।'

'তাহলে তো তোমাকেও ভুলে যেতে হয়।'

মালবী আজ দমবে না বলেই ঠিক করেছে। বড় রাস্তায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে বলল,

'পারবে?'

'পারলে বলতে পারব।'

বাঁ দিক থেকে একটা ডাবলডেকার আসছিল, উল্টোদিক থেকে ট্যাক্সি। সময় মেনে রাস্তা পেরুবার জন্যে ওর কব্জি চেপে ধরল মালবী। অপূর্ব বাসস্টপের দিকে এগোবার চেষ্টা করতে ওকে টেনে রেখে বলল, 'ওখানে নয়। ট্যাক্সিতে যাব।'

'কোথায়!'

'পরে বলব।'

'কী ব্যাপার!' ফাঁকা একটা মিনিবাস স্টপের দিকে এগোতে তার পিছনের ট্যাক্সিটা লক্ষ করে হাত তুলল অপূর্ব। না, ভিতরে প্যাসেঞ্জার। অন্ধকার ও আলোর গোঁজামিলে বোঝা যায়নি আগে। তখন বলল, 'আছে, বলব—সারাক্ষণ রহস্য করে যাচ্ছ।'

ঘন চোখ তুলে ওকে দেখবার চেষ্টা করল মালবী। দৃষ্টি যা বোঝায় তার চেয়ে বেশি আড়াল করে রাখে। এখন আর ওকে উচ্ছল লাগছে না, বরং গভীর; কখনও কখনও যেমন হয়ে ওঠে।

'না হয় একটু সাসপেনসেই থাকলে।'

'লাইক ইন আ ফিলম! হিচকক স্টাইল! আ ম্যান অ্যান্ড আ উয়োম্যান—!'

পরের ট্যাক্সিটা নিজেই এসে দাঁড়াল সামনে। উঠে, অপূর্ব ওর দিকে তাকাতে, মালবী বলল, 'সোজা যাবেন—'

মিটার নামানোর টুংটাং এবং গিয়ার চেঞ্জ করার শব্দ থিতিয়ে এলে অপূর্ব বলল, 'সোজাই যাচ্ছে। মে বি টুওয়ার্ডস হনুলুলু অর ম্যাডাগাস্কার। অর ইজ ইট টুওয়ার্ডস ইটারনিটি! অনন্ত না কী বল!'

মালবী হাসল না, বললও না কিছু। বরং, সাধারণত যা করে না, ট্যাক্সির আড়ালে হাত বাড়িয়ে হাত স্পর্শ করল অপূর্বর, আঙুলে আঙুল। আবেগ বুঝিয়ে অপূর্বর আঙুলগুলো নিজের নাকের কাছে নিয়ে এসে ঠোঁট ছোঁয়াল পরোক্ষে; দু এক মুহূর্ত, সেইভাবেই নামিয়ে রাখল নিজের কোলের ওপর। তাকিয়ে থাকল বাইরে।

'মা কাল তোমাদের বাড়ি যাবার কথা বলছিল—'

'কেন!'

'জানোই তো কেন! সবাই সবকিছু জেনে ফেলার পর প্রশ্নটা থাকে না।'

ব্রিজ থেকে নেমে গোলপার্কের দিকে। মালবীই নির্দেশ দিল, 'পূর্ণদাস রোড দিয়ে রাসবিহারী, কালীঘাটের দিকে যাবেন—'

এই রাস্তায় আলো কম, লোকজনও নেই বললেই হয়। টিমটিম করছে বাঁ-হাতি বস্তির আলোগুলো। বাচ্চা কোলে একটি বউ বেরিয়ে এসে হাতের আবর্জনার ঠোঙাটা ছুড়ে দিল রাস্তায়।

অপূর্ব বলল, 'সম্পর্কটা জানেন?'

'কিসের!'

'এই, আমাদের। বাবা—। পিসিমা অবশ্য আছেন। কিন্তু, হাউ ডাজ সি ম্যাটার! আমার আবার বাড়ি কি! আমি তো একা—একাই—'

আঙুলের ভিতর আঙুল, মালবী এমনভাবে চাপ দিল যেন তাপ নেওয়া জরুরি। ভাববার

সময় নিয়ে বলল, 'সমস্তই তোমার মনের ব্যাপার। কী করলে, কেন করলে, কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। কম দিন তো হল না।'

অপূর্ব চুপ করে থাকল।

'পিসিমাকে দেখেছি। বাবার গল্পও তুমিই করেছ।' সামান্য থেমে, জোর দিয়ে বলল মালবী, 'বাধা কোথায়। তুমি ইচ্ছে করলেই কাটিয়ে নিতে পারো।'

আলগা বোধ করায় হাতটা টেনে নিল অপূর্ব। কোনও কারণে নয়। একই আঙুলে কপাল চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'বাধা সঙ্গে সঙ্গে না ভাঙলে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়—'

'টপকানোও তো যায়।'

'জানি না। যায় হয়তো। আমি পারিনি।' অপূর্বর গলা ভারী। হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল এবং বলল, 'একটু আগে তোমাদের বাড়িতে বসে মা'র কথা ভাবছিলাম, বাবার কথাও। দেন আই থট, সবাই যদি ভাল হয়, তাহলে এসব ঘটে কেন। নিশ্চয়ই কেউ খারাপ, ভুল চালে খেলছে। হয়তো আমিই রেসপনসিবল। আই ডোন্ট নো।'

'তুমি কেন খারাপ হবে।' মালবী আবার ওর হাতটা টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখল, অন্য হাতে চিবুক ধরে মুখটা তার দিকে ফিরিয়ে এনে বলল, 'পাগল। কেউ বলে এভাবে।'

চোখের আর্দ্রতা সামলে খানিক মালবীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অপূর্ব। হাতটা এখনও নিজের বুকে ধরে রেখেছে মালবী—সেখানে শুধুই ওঠানামা। স্তনের আগ্রহ নেই, পরিবর্তে এক অসমান ঢেউ কোথাও যেন পৌঁছুবার চেষ্টায় আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে আবার। অনুভূতিই চিনিয়ে দেয় অনুভবের সততা। সেই প্রথম দিনই পাগল বলেছিল, আজও বলছে। তবে, তফাত আছে দুটো বলায়। অনেক দিয়েছে মালবী, নেয়নি প্রায় কিছুই। আজ কি ওর দুখানি হাতই পাতা।

অপূর্ব বলল, 'যে জন্যে ওঁরা ওয়ারিড সেজন্যে বাড়িতে যাবার দরকার কী। রেজিস্ট্রি করে নিলেই হয়।'

মালবী অপূর্বকেই দেখছে। বলল, 'তুমি তৈরি নও বলেই এসব—। বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে, অপূর্ব।'

ট্যাক্সির ভিতরের আবছায়ায় অন্যরকম দেখাচ্ছে মালবীর মুখ। উন্মুখ ও মায়াবী, যেন এখনই ভেঙে পড়বে। উল্টোদিক থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা একটা গাড়ির হেডলাইটের তীক্ষ্ণ ও চকিত আলো যত না দেখায় আড়াল করে রাখে তার চেয়ে বেশি। নিঃশ্বাস এসে পড়ে হাতের ওপর।

অপ্রত্যাশিত, তাই কোনও জবাব দিল না অপূর্ব। কথাগুলো ছড়িয়ে গেল অনেক দূর পর্যন্ত, নৈঃশব্দ্যে, যেভাবে যায়।

রাসবিহারীর মোড় অব্দি পৌঁছে ট্যাক্সিওলা জিজ্ঞেস করল, 'কালীঘাটে কোথায় যাবেন?'

'মন্দিরে—'

মালবী শান্ত। গম্ভীরও। ভাবা যায় শেয়ারে উঠেছে দুজনে।

অপূর্ব বলল, 'কী ব্যাপার। মন্দিরে।'

'যেতে নেই।'

'কিন্তু—', রহস্য বুঝবার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে হালকা গলায় অপূর্ব বলল, 'এখনই বিয়ে

করতে বলবে না তো!'

'কোনও দিনই বলব না। হয়েছে!'

ট্যাক্সিটা মন্দিরের বাইরের চত্বরে এসে পৌঁছুতে ব্যাগ খুলতে যাচ্ছিল মালবী, অপূর্ব বলল, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও। আমিই দিচ্ছি—'

মালবী নেমে পড়েছিল। ভাড়া মিটিয়ে ওর পাশে এসে দাঁড়াল অপূর্ব।

'দিস ইজ ট্যু মাচ! প্লিজ, বলব বলব করতে করতে অনেক দূর এনেছ!'

'কী নাছোড় রে বাবা!'

ওদের দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশপাশ থেকে ছুটে এল কয়েকটি ভিখিরি। মালার ফেরিওয়ালাও। সরে এসে মালবী বলল, 'পার্মানেন্ট হয়েছি। কাল হঠাৎ প্রিন্সিপাল ডেকে বললেন—'

'এই খবরটা সাপ্রেস করে রেখেছিলে!'

'সেজন্যে পুজো দিতে আসিনি।'

'তবে!'

মালবী ওর কনুই ধরে টানল। পাণ্ডা গোছের একটি বিরক্তিকর লোকের পিছনে লেগে থাকা এড়িয়ে, এগোতে এগোতে বলল, 'তোমার জন্যে—'

'আমার তো কিছু হয়নি! বিসাইডস—'

কথাগুলো কানে নিল না মালবী। দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, মন্দিরের দরজায় ঢুকবার আগে থেমে দাঁড়িয়ে বলল, 'পরশু একটা স্বপ্ন দেখলাম। তোমাকে নিয়ে। তখনই ভেবেছিলাম পুজো দেবো—'

'স্বপ্ন দেখে! বলবে তো কী!'

'না। বলব না।' পিঠের ওপর ফেলে রাখা আঁচলটা গলার পাশ দিয়ে টেনে পুরোপুরি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে মালবী বলল, 'এসব স্বপ্ন বলতে নেই। এসো—'

আজ মঙ্গলবার। ভিড়। ভিতরের গিজগিজ, দেয়ালে কপালে ঠোকা, জয় মা, মা গো ও ঘণ্টাধ্বনির অপরিচিত বৈচিত্র্যে হঠাৎই হারিয়ে গেল অপূর্ব। এর আগে আসেনি কখনও, বিশ্বাসও করেনি। আজই এল। উপলক্ষ মালবী হলেও একবারও না বলেনি। তা হলে কি সেও বদলে যাচ্ছে?

৫

বর্ষা চলে যাচ্ছে। জুনের শেষে এবং প্রায় গোটা জুলাই মাস ধরে যেরকম প্রবল এবং ধারাবাহিক, কলকাতা-ভাসানো হয়ে নেমেছিল, আগস্টে পৌঁছেই তার জোর গেল কমে। জেরও। হঠাৎ কখনও দু এক পশলা নেমে এলেও পৌঁছয় না স্মৃতি পর্যন্ত, রাস্তা ভিজতে না ভিজতেই শুষে নেয় রোদ। আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন, গুমোটও লাগে না; ক্বচিৎ হাওয়ায় মিশে থাকে ভুলে যাওয়া এবং মনে পড়া।

একদিন সকালে গাড়িতে নিউ আলিপুর থেকে অফিসে আসতে আসতে যখন

চিড়িয়াখানার কাছে ব্রিজের ওপরে, অল্প জ্যাম জমেছে সামনে, তখন আকাশের দিকে অন্যমনস্ক চোখ পড়ায় অপরেশ লক্ষ করল চমৎকার নীলে ছায়া ছড়িয়েছে শরতের সাদা। প্যাটার্ন তৈরি করে খুব দূর থেকে ক্রমশ উড়ে আসছে অচেনা পাখির ঝাঁক। কখনও বা দলছুট দু-একটি পিছন-ফেরা হয়েও চকিতে মন বদলে ফিরে এসে আবার মিশে যাচ্ছে দলে। তার মানে কি শীত এবার তাড়াতাড়ি পড়বে?

দৃষ্টি একাগ্র হবার আগেই সুরেলা ও কর্কশ হর্নের মিশ্র শব্দ পেরিয়ে চলে এল রেসকোর্সের দিকে। বহুদূর বিস্তৃত সবুজের মসৃণতা গায়ে মেখে, চোখে পড়ল, পিঠে জকি নিয়ে নিপুণ ছন্দে দৌড়ে যাচ্ছে এক গাঢ় বাদামি ঘোড়া। স্লো-মোশানে যেমন দেখায়। নিঃশব্দ খুরের গতি তাকে সুদূর করে নিয়ে যাচ্ছে রোদ থেকে আরও বেশি রোদের ভিতরে। সে যেখানে পৌঁছয় ও হারিয়ে যায় ক্রমশ, তারই ওপর দিয়ে আকাশে নিচু হয়ে পশ্চিমমুখো উড়ে যাচ্ছে একটা এয়ারোপ্লেন। আকৃতি দেখে ও আওয়াজ শুনে মনে হল ফ্লাইং ক্লাবেরই হবে।

নিরপেক্ষ ভাবে এসব দেখতে দেখতে ভারী হয়ে এল বুক। নিঃশ্বাস সহজ করার জন্যে আলগা হয়ে বসল সে। এভাবে নিঃশ্বাস পড়ে না। আজই পড়ল। থেমে থেমে, কিন্তু প্রতিবারই নতুন ভার নিয়ে। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে অনেক দিন হল, অপরেশ ভাবল, এই বয়সে শুধুই যাওয়া থাকে, কিংবা থেমে পড়া; ফেরা কখনই নয়। নতুন করে শুরু করা কিংবা ইচ্ছেমতো নিজেকে বদলে নেওয়াও নয়। সাফল্যের পিছনে অনেক ছোটা হল এত দিন, এখন দায়বদ্ধ সাফল্যেরই কাছে; সাফল্যই ছোটাচ্ছে। মাঝে মাঝে নাকের দড়িতে টান পড়লে পিঠের ওপরে আহ্লাদে বসে থাকা জকিটাকে প্রায়ই চিনতে পারে সে। রোদ নয়।

কিছুদিন থেকেই ভালো নেই মনটা। কারণে হোক বা অকারণে, টেনস লাগে সব সময়। অ্যাকশন গ্রুপের ব্যবসায় হঠৎই কোনও উপদ্রব ঢুকে পড়ল নাকি। এটা ঠিক হলে ওটা হচ্ছে না, কিংবা, যদি এমন হয় যে সবই হিসেবমতো হল, এবার এগোনো যায় নির্ভাবনায়—কোথাও কিছু নেই, ঠিক তখনই চলে এল উইথহোল্ড-এর পরোয়ানা। এমন নয় যে এসব ব্যাপার নতুন; প্রায় তিরিশ বছরের প্রফেসনাল কেরিয়ারে ওঠা এবং নামা দুটোই আগাপাস্তালা দেখেছে অপরেশ। এপিঠ ওপিঠ নিয়ে টাকা যেমন, জানে দুটো নিয়েই ভারসাম্য। দেয়ার ইজ নো সান উইদাউট শ্যাডো, ঠিকই; অন্ধকার না চিনলে হারিয়ে যায় আলোরও নিশানা। তা বলে পৃথিবী মেরুপ্রদেশ হয়ে উঠবে কেন।

এই ক'মাসে বিজনেস ডেভলপমেন্ট বলতে কিছুই হল না প্রায়। নতুন অ্যাকাউন্ট একটাও আসেনি, পুরনো অ্যাকাউন্টগুলোতেও গ্রোথ দেখা যাচ্ছে না কোনও। অ্যাপ্রুভ হয়ে যাবার পরও বাজেট কাট হয়েছে কোথাও কোথাও। ইতিমধ্যে লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা সবাইকেই যেন টিপে দিয়েছে, বুঝে সমঝে চলো। পলিসি পাল্টাতে পারে, সুতরাং অপেক্ষা করো নতুন বাজেট না আসা পর্যন্ত। এমনও হতে পারে টাকা চলে যাচ্ছে ইলেকসান ফান্ডে। এই অবস্থায় আগস্ট পর্যন্ত যে-টার্গেটে পৌঁছুবার কথা ছিল তার চেয়ে পিছিয়ে আছে কুড়ি পারসেন্ট মতো—সামনের চার মাসে এই ডেফিসিট মেকআপ করে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব, যদি না ইতিমধ্যে পেয়ে যায় কোনও মিরাকল অ্যাকাউন্ট। দিল্লি ব্র্যাঞ্চও বাড়ছে না একটুও। বরং নামছে। আট লাখ টাকা পেমেন্ট না পাওয়ায় ট্যুরিজম অ্যাকাউন্টে নতুন ইনভেস্টমেন্টের দায়িত্ব নিতে মানা করেছিল, তাতে প্রায় অর্ধেক টাকা আদায় হলেও ওরা

নতুন ক্যাম্পেন রিলিজ করাচ্ছে দিল্লিরই এক ছোট এজেন্সিকে দিয়ে। পুজো, দেওয়ালি এবং শীত আসছে—এ সময়েই লোকে বেড়ানোর পরিকল্পনা শুরু করে; সুতরাং, জানিয়ে দিল, ওরা বিজ্ঞাপন করতে বাধ্য।

তার মানে ব্যবসাটা হাতছাড়া হল, তার চেয়ে বড় কথা ভাল সম্পর্কের মধ্যেই খিঁচ ধরে গেল একটা। এক সময় মনে হয়েছিল অপরেশের ডিসিসনটা বোধহয় ঠিক হয়নি। কিন্তু, করাই বা যেত কী। ব্যাঙ্ক থেকে ওভারড্রাফট নিয়ে মিডিয়ার প্রাপ্য মেটাতে গেলে সুদের টাকা গুনতে গুনতেই মার খেয়ে যায় প্রফিট। আর এজেন্সিও গজাচ্ছে চারদিকে ব্যাঙের ছাতার মতো; অল অ্যাঙ্গলারস, ছিপ ফেলে বসে আছে কার জাল ছিঁড়ে কখন কোন মাছ বেরিয়ে পড়ে এই আশায়। এথিকস বলে কিছু নেই। কেউই বোঝে না আজ অ্যাকশন গ্রুপ ঘা খেলে কাল তুমিও খাবে। নো, ইউ ক্যান নট কল ইট হেলদি।

ধাক্কা আরও এল। মাথার ওপর দিয়ে ব্রেকারের মতো বেরিয়ে গেল হাই গ্রেন ব্যাটারির ব্যবসার একটা বড় অংশ। তার শক্ত ঘাঁটি কলকাতাতেই। বম্বের এজেন্সি থটশপ স্পেকুলেটিভ প্রেজেনটেসনে নামলেও অ্যাকাউন্টটা শেষ পর্যন্ত অ্যাকশন গ্রুপেই থেকে গিয়েছিল, কিন্তু রোনিক্স-এর সঙ্গে হাইগ্রেনের টাই-আপ ক্যাম্পেনটা চলে গেল থটশপে। এক দানেই বারো লাখ টাকা। অপরেশ অনুযোগ করায় হাইগ্রেনের মার্কেটিং ডিরেক্টর শিবাজী রাও বলল, 'এটা নতুন বিজনেস। তোমার শেয়ার কেটে দেওয়া হয়নি। ডেমোক্রেসি অফন ডিম্যান্ডস ডেভিয়েসান ফ্রম হোয়াট ইজ অ্যাকসেপ্টেড। তাছাড়া, এটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্টও নয়। ভাবছ কেন? উই আর উইথ ইউ—', ইত্যাদি। নিতান্তই স্তোকবাক্য। অপরেশ জানে বন্যার জল তলা থেকেই কাটে, ভাবছ কেন বললেই ভাবনা শেষ হয়ে যায় না।

এখন ভরসা বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেড আর লাডলীমোহন সরকার। তিরিশ লাখ টাকার একটা টোটাল ক্যাম্পেন প্রেজেন্ট করেছিল প্রেস, ফিলম, আউটডোর, পয়েন্ট অফ সেল নিয়ে—প্রায় ফিনিশড ক্যাম্পেন; অপূর্ব আর মনোজের পরামর্শে স্টোরিবোর্ড না দিয়ে দুটো শটও তুলে দিল টি-ভি'র জন্যে। চমৎকার এসেছিল ভিডি-ও-তে। লাডলীমোহনের মুখচোখ দেখে মনে হল এই অভিজ্ঞতা নতুন; সুতরাং নেবেই। প্যারিসে যাচ্ছে ক'দিনের জন্যে, বলল ফিরে এসে জানাবে, ততদিনে প্রোডাকসান আর সাপ্লাইয়ের দিকটাও গুছিয়ে নিতে পারবে। ওখানে আর কোনও এজেন্সি স্টেক করেছে বলে জানা নেই। হয়তো আজকালের মধ্যেই ও-কে হয়ে চলে আসবে।

মাঝে মাঝে আত্মবিশ্বাসই বলে দেয় অপরেশকে, ক্রাইসিস থাকবেই এবং পেরোতেও হবে। গিলবার্ট মরিসন থেকে শেষ যেদিন বেরিয়ে এসেছিল অ্যাকাউন্ট সেটল করে, কোম্পানির গাড়ির চাবিটাও ফেরত দিয়ে, হেঁটে, কারও কোনও অনুরোধে কান না দিয়ে, সেদিন, খোলা আকাশের নীচে, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে, দু হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে স্বাধীন, হঠাৎই ওপরে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠেছিল নিঃশব্দে, ঈশ্বর, তোমাতে বিশ্বাস নেই আমার—তবু যদি আমি তোমারই সন্তান হই, তাহলে আমাকে সেই আত্মবিশ্বাস আর দক্ষতার শীর্ষে নিয়ে চলো যা যে-কোনও চ্যালেঞ্জকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। কথা দিলাম, আমি আছি, থাকব। ফাঁকা বলেই বুকের অনেকটা জায়গা জুড়ে ভরে উঠেছিল প্রতিজ্ঞা। না, সে ব্যর্থ হয়নি।

সেজন্যে নয়। সম্প্রতি সবচেয়ে বড় ধাক্কাটা এসেছে এমনই জায়গা থেকে, যেখানে ন্যাড়া সমতল ছাড়া আর কিছুই নেই। নিজেরই বাড়ি থেকে। মেয়ে সুজাতার কাছ থেকে, তারপর বীথির কাছ থেকে। এমনই অপ্রত্যাশিত ভাবে যে, ঘটনা ঘটে যাবার কয়েকদিন পরেও, অফিসে বসে, কাজকর্মে মন দিতে গিয়ে বার বার বিভ্রান্তি এসে যাচ্ছে মাথায়, মনে হচ্ছে সুসময়-অসময় বা ভাগ্য বলে কোনও ব্যাপার থাকলেও থাকতে পারে—অফিস আর ব্যক্তিগত জীবন, দুটোকে সে যতই আলাদা করে দেখুক, দুটো সমস্যাই আসলে একই সমগ্রতার অংশ। আলাদা করবে কী করে।

কফিতে চুমুক দিতে দিতে দিনের ডায়েরিটা খুঁটিয়ে দেখে নিল অপরেশ। বিয়াত্রিচেকে বলার ছিল পি-আর বুকলেটের রিভাইজড কপি নিয়ে অক্সিজেনে যেতে, সেটা হয়ে গেছে। জ্যোতি টি-ভি সীতাই হ্যান্ডেল করে, সেপ্টেম্বরের এক তারিখে ব্রেক করবে ওদের ডিলার্স ক্যাম্পেন। কাল বিকেলে ওরা ফোন করায় সীতাকে বলবে ভেবে নোট করে রেখেছিল; সন্ধেবেলায় বেরুবার সময় দেখা হল সীতার সঙ্গে, বলেছে ঘুরে আসবে। বিউটি প্রোডাক্টস! সে কি ফোন করবে? না, থাক। আরও দু একদিন দেখা যেতে পারে। বারোটায় অপূর্ব। অ্যাগ্রো ইনডাস্ট্রিজ পাবলিক ইস্যুতে নামবে; গত সপ্তাহে কথা হয়েছিল। ইস্যুটা উপলক্ষ, আসলে ডাইভারসিফিকেশন প্ল্যান কার্যকর করার আগে ওরা একটা করপোরেট ক্যাম্পেন রিলিজ করতে চায় ন্যাশনাল লেভেলে। কিছু লাইসেন্স বের করতে অসুবিধে হচ্ছে, যদি লবিইংয়ের দরকার হয় এবং কথা ওঠে পার্লামেন্টে, তাহলে এই ক্যাম্পেনটা কাজে দেবে। ব্রিফ নিজেই নিয়েছিল অপরেশ। ইন্টারপ্রেট করার পর থিমও অ্যাপ্রুভড; ঠিক করেছে ডেভলপ করার পুরো দায়িত্ব অপূর্বকেই দেবে। দিস চ্যাপ হ্যাজ আ ট্রিমেনডাস ফ্লেয়ার ফর বিইং ডিফারেন্ট! একদিন হয়তো কিছু একটা হয়ে উঠত, কিন্তু, কী যে পাগলামি ঢুকে গেল মাথায়! এখন ঝুঁকেছে জার্নালিস্ট হবার দিকে। স্বাধীনতা চায়, কোনও অফিসিয়াল ডিসিপ্লিনের মধ্যে ধরে রাখতে চায় না নিজেকে। এই করতে গিয়ে একদিন হয়তো জড়িয়ে পড়বে পুরোপুরি বিশৃঙ্খলায়। হু নোজ! জীবনের একটা মানে আছে এবং সেটা, সম্ভবত, শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়েই ধরা পড়ে। তিরিশ বছরে নিজেও কম দ্যাখেনি অপরেশ। 'কে আছ?' মনে পড়ে গিলবার্টের রিসেপশনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছেন ঋতিকবাবু, পা টলছে ঘুমে কিংবা নেশায়, 'কে দিতে পারো পঞ্চাশটা টাকা?' তারপর রমেন; ব্রিলিয়ান্ট, ওরকম শার্প ইনটেলেক্টের লোক না হলে সীতাকে টানত না। যেন ইচ্ছে করেই এলোমেলো করে দিল নিজেকে। অ্যালকহোলিক, সিরোসিস অফ লিভার, ক্যানসার। কিন্তু অ্যামবিশান ছিল; লক্ষ্যে ঠিকঠাক আর বেঁচে থাকলে আজ হয়তো গিলবার্ট মরিসনের চিফ হত।

মাঝে মাঝে মনে হয় সীতার সঙ্গে ওর মনোমালিন্যের ব্যাপারটাও ছিল ওই বিশৃঙ্খলারই সৃষ্টি, বানানো—নিজেই বলেছে সীতা গিয়েছিল ওর কাছে, আসলে চাকরি ছাড়ার একটা অজুহাত খুঁজছিল অপূর্ব। হতে পারে। বয়স কম। সাতপাঁচ ভেবে ওর সঙ্গে একটা রফা করে নেয় অপরেশ; হয়তো সাংবাদিকতার মোহও কেটে যাবে একদিন, ভেবেছিল, ফিরে আসার রাস্তাটা খোলা থাক। কিন্তু, স্বীকার করতেই হয়, হিজ আইজল স্টোরি ওয়াজ সুপার্ব।

ভাবতে ভাবতেই নতুন চিন্তায় জড়িয়ে পড়ল অপরেশ। সামনে ইলেকসান, কাগজে পড়ছিল কংগ্রেস নাকি ম্যাসিভ ক্যাম্পেনে নামবে এবং প্রচার পরিকল্পনার জন্যে অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সির সাহায্য নিতে পারে। যদি সেরকম কিছু হয়, ডু উই স্ট্যান্ড আ

চাল? বিমলকৃষ্ণবাবু কি কোনও সাহায্য করতে পারেন? কিছুদিন আগে, মনে আছে, একজনকে—ওয়াজ ইট সুধীন চ্যাটার্জি?—পাঠিয়েছিলেন একটা অ্যানাউন্সমেন্ট রিলিজ করার জন্যে; সীতা কী বুঝিয়েছিল কে জানে, লাখ চারেকের সম্ভাবনাই শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল সাতে। টাকা পেতে ঝামেলাও হয়নি কোনও। কথা হল অপূর্বকে বলে কোনও কাজ হবে কি না। কেন, কী হয়েছে বলা মুশকিল, অনুমানও করা যায় না কিছু; কিন্তু, অপরেশ জানে, বিমলকৃষ্ণের সঙ্গে ওর সম্পর্কটা এখনও সেই আগেরই মতো, দূরত্বপূর্ণ। সম্ভবত বাক্যালাপও নেই।

কেন এমন হয়। পৃথিবীতে নির্ভর করার মতো সম্পর্ক, অবলম্বন, আশ্রয়, ক'টাই আর থাকে! চেনাশোনার মধ্যে এগুলোই; মা, বাবা, সন্তান, স্ত্রী, হয়তো ভাইবোন, হয়তো দু একজন বন্ধুও। দেখা যাক না যাক, নদীর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই চোখে পড়ে সেতু। সম্পর্কই পার করে দেয়। অভিজ্ঞতা ওইভাবেই ভাবায়। তবু এমন গোলমাল হয়ে যায় কেন।

কফিতে আবার চুমুক দিতে বিস্বাদ লাগল। নিঃশ্বাসে একই ভার। চোখ চলে গেল চক্ষুহীন নারীর প্রতিকৃতিতে। দগদগে হয়ে আছে সিঁদুর। প্রথম দিন এগজিবিশনে গিয়েই থমকে দাঁড়িয়েছিল সামনে; বোঝা যায় অথচ যায় না—এক অদ্ভুত তাৎপর্য এসে কড়া নাড়ছিল অনুভবে। দ্য পোর্ট্রেট অফ দ্য আননোন। চটপট কিনে ফেলে। কিন্তু, আজও বুঝে উঠতে পারেনি কী মানে ওই অন্ধতার, ওই রক্তবর্ণ ঔজ্জ্বল্যের। কার পোর্ট্রেট ওটা, কোন অজানার? নারীই বা কেন? কোন রহস্যের ইঙ্গিত এখানে? কোনও সম্পর্কের কি? নাকি, বস্তুত, মানুষেরই প্রতিচ্ছবি, অন্ধতায় তার বিবাহ জানে না প্রজননের অর্থ।

বার বার একই দৃশ্য। বাড়ি। সুজাতা। বীথি। মূক দাঁড়িয়ে থাকা সে নিজে। পরশুর ঘটনার জের টেনেছিল কাল; আজও টানছে।

হাত-পা বাঁধা এক অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল অপরেশ। ইচ্ছে করলেই এখন সে যেতে পারবে না এই চেম্বারের নিয়ন্ত্রিত তাপের বাইরে এর, ওর, তার কাছে; কিংবা, অনেকদিন আগে যেমন করত, চেয়ারের বদলে কারও টেবিলের ওপরেই বসে নাক গলাতে পারবে না আড্ডায়, আলোচনায়, পরচর্চা ও খিস্তিতে, যাতে হয়তো, হালকা হওয়া যায় কিছুটা। সে আলাদা, তার হাঁটায় আছে সময়ের পরিমাপ—অফিসের যে-কোনও জায়গায় হঠাৎ গিয়ে পড়লে যে-কেউই বুঝতে পারবে লোকটা কাজ নিয়েই এসেছে; মন্তব্য করবে, নির্দেশ দেবে এবং চলে যাবে। কথার জায়গায় এসে পড়বে হাশ-হাশ ভাব। এখানে ব্যক্তিগত বলে কিছু নেই অপরেশ গুপ্তর—শোক, দুঃখ, আনন্দ, সুখের একটা মেকানিক্যাল প্রসেস কাজ করে হয়তো, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে সেগুলো ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ? না, নেই। স্বাধীনতা নিয়ে যারা কথা বলে তারা জানে না সে নিজে আরও বেশি বন্দি; এই ঘরের চতুঃসীমায় ঘেরা তার গণ্ডি আরও ছোট।

টানা জানলার সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়ে একই আকাশ। তবে, সকালে অফিসে আসতে আসতে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে বেশি পরিচ্ছন্ন। স্থির সমতায় ছড়িয়ে আছে হলুদবর্ণ রোদ, হাওয়াও যে আছে তা বোঝা যায় দূরে দূরে গাছ কি পাতার মৃদু আলোড়ন দেখে। কাচের স্বচ্ছতা দেখানোতেই অভ্যস্ত, পৌঁছয় না অনুভূতিতে। কুষ্ঠরোগ খেয়ে গেছে আঙুলগুলো। উল্টোদিক থেকে কেউ দেখলে শো-কেসের ভিতরে ডামি চোখে পড়ত। নাম—অপরেশ গুপ্তা; পেশা—বাণিজ্য; লক্ষ্য—সাফল্য, সাফল্য, সাফল্য। নাথিং

সাকসিডস লাইক সাকসেস, কেউ কি বলেছিল?

বীথি বলেছিল, 'তুমি কি মানুষ!'

পরশু, সন্ধের ফ্লাইটে দিল্লি থেকে ফিরে বীথিকে দেখে এবং সুজাতাকে সামনা-সামনি না দেখে অনুমান করেছিল কিছু একটা হয়েছে। দু দিন অগেই ফেরার কথা ছিল তার। কাজকর্মে ফেঁসে গেল। ব্যস্ততার মধ্যে বাড়ির লাইন না পেয়ে অফিসে মিসেস সান্যালকে ফোন করে বলেছিল বাড়িতে জানিয়ে দিতে। পরের দু দিন কেটে গেল আরও বেশি টানাপড়েনে, হচ্ছে হবে করে। এই ফ্লাইটটাও মিস করত হয়তো। ভাগ্য ভাল ডিলেড হয়েছিল কোনও কারণে। টেক-অফ-এর আগে সে-ই ছিল শেষ প্যাসেঞ্জার।

অভ্যাস মতো দু পেগ শেষ করে ডিনার টেবলে গিয়েছিল অপরেশ। বীথি কিংবা সুজাতার প্রায় নৈঃশব্দ্য তখনও কিছু বোঝায়নি। রাত্রে, সুজাতার ঘরে আলো জ্বলছে তখনও, তার মানে পড়াশুনা করছে, বীথি ভাঙল, সুজাতা কাল বিকেলে বেরিয়েছিল, রাত্রে ফেরেনি। ফিরেছে আজ সকালে।

'কেন!'

'কেন, তা মেয়েকে জিজ্ঞেস করো—'

চাপা গলায় কথা বলছিল বীথি। উৎকণ্ঠায় হাঁফ মিশিয়ে।

অপরেশ বলল, 'তার মানে! তুমি কিছু জানো না!'

মেয়েকে দুরস্ত করার জন্যে পিয়ানো শেখাচ্ছে অপরেশ। ছেলেটির নাম দিলীপ ব্যানার্জি, ইয়াং, ক্লাবের মিস্টার সাপ্রুর রেকমেন্ডেশনে এসেছিল। সোমবার-শুক্রবার সন্ধেয় শিখিয়ে যায় বাড়িতে এসে। গতকাল আসবে না আগেই জানিয়েছিল, বীথি বলল, তারপর বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়ে যায় সুজাতা। সন্ধে নাগাদ ওর বন্ধু উর্মি ফোন করে জানায় ওরা সিনেমায় যচ্ছে, গাড়িতে, বীথি যেন চিন্তা না করে। তারপর সারা রাত আর ফেরেনি সুজাতা। বীথি ঠিকানা জানে না, ফোনও পায়নি, সুতরাং এ ঘর ও ঘর করেছে সারারাত, জানলায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে কখনও। কেলেঙ্কারির ভয়ে জানাতেও পারেনি কাউকে। সকালে উর্মির সঙ্গেই ফিরে এল সুজাতা, নাকি উর্মির বাড়িতেই থেকে গিয়েছিল, টেলিফোনে শুধুই এনগেজড বেজে গেছে। উর্মি তা-ই বলল।

বীথির সন্দেহ ঘটনাটা সাজানো। আসলে সুজাতা দিলীপের সঙ্গেই ছিল, কেন, জিজ্ঞেস করায় বলল, এর আগে একদিন স্নানের জন্যে বাথরুমে ঢুকেছিল সে, বেরিয়ে, পিয়ানোর শব্দ না শুনে এদিকে এসে ঘরের পর্দা সরিয়ে হঠাৎই দেখতে পায় সুজাতাকে চুমু খাচ্ছে দিলীপ। ওরা দ্যাখেনি। তবে, পরে ধমক দিয়েছিল মেয়েকে। সুজাতা অবশ্য সমস্ত ব্যাপারটাই অস্বীকার করেছে। দিলীপ এরপর আর আসেনি।

দু পেগই তখন আট পেগ হয়ে কাজ করছিল মাথায়। ভাববার সুযোগ নেয়নি অপরেশ। পড়ার টেবিল থেকে চুলের গোছা ধরে টেনে তুলল মেয়েকে এবং বীথি ছুটে এসে বাধা দেবার আগেই সজোরে থাপ্পড় কষাল সুজাতার গালে।

'মারলে ওকে!' বীথি হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠে বলল, 'তুমি কি মানুষ!'

সুজাতার স্তম্ভিত ও ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়েই অপরেশ বুঝতে পেরেছিল সম্ভবত জীবনের সবচেয়ে ভুল সিদ্ধান্তটি একটু আগে কার্যকর করেছে সে। সংশোধনের সুযোগ নেই।

'কী করেছ তুমি ওর জন্যে? কী করেছ তুমি আমার জন্যে?' বীথি যেন ফিরে গিয়েছিল তার পুরনো হিস্টিরিয়ায়। বাঁশপাতার কাঠামোয় কাঁপছে শরীর, রক্তোচ্ছ্বাস মুখের ত্বকে। চেঁচিয়ে বলতে লাগল, 'সেক্রেটারিকে দিয়ে বাড়িতে ফোন করিয়েই দায়িত্ব শেষ করো। তোমার কি একবারও মনে পড়েছে পরশু ওর জন্মদিন ছিল।'

অপরেশের স্বভাবে নাটকীয়তা নেই। একই দৃশ্যের পুনরভিনয় এখন তাকে মনে করিয়ে দিল, সেই মুহূর্তের আবেগ ও চেতনায় ফিরে আসা তাকে দিয়ে যা যা করিয়েছে তার সবটুকুই ছিল স্বভাববিরুদ্ধ এবং নাটকীয়—তা না হলে সে মেয়েকে ওইভাবে টেনে নিত না বুকে, তা না হলে সে নিজেও চেঁচিয়ে উঠত না, 'ক্ষমা চাইছি, আমি ক্ষমা চাইছি।'

এসব ঘটনার ব্যাখ্যা আকাশে, কিংবা নিজের সীমাহীনতায় তাকিয়ে পাওয়া যায় না। প্রশ্নের পর প্রশ্নে নিজেকে বিক্ষত করে তুললে যা পাওয়া যায় তার অর্থ শূন্যতা। অর্থহীনতাও।

তার পরে আর কিছু না ঘটলেও অপরেশ জানে, তার সঙ্গে সুজাতার, সুজাতার সঙ্গে বীথির এবং বীথির সঙ্গে তার যে-সম্পর্ক ছিল, এখন আর তা নেই। কেউই আর রিঅ্যাক্ট করেনি। মা ও মেয়ের মধ্যে কী কথা হয়েছে, কিংবা, আদৌ কোনও কথা হয়েছে কিনা তা সে জানে না। বীথির প্রশ্নগুলো এবং সুজাতার স্তব্ধতা সারাক্ষণ ঘোরাফেরা করেছে মাথায়।

কিন্তু, পরের দিন বিকেলে, অনেকদিন পরে এবং নিজের ইচ্ছে থেকেই, সে যখন ওদের গাড়িতে নিয়ে বেরোয় তখন, এতগুলো বছর ধরে কখনও কখনও যেমন হয়েছে তেমনি, বীথি তার পাশে এসে বসে এবং সুজাতা উঠে যায় পিছনে। তারপর, সে যখন বলল, 'মা-মণি, তুমি আমার পাশে এসে বোসো—', তখন বীথি নিজেই সুজাতাকে টেনে নিল মাঝখানে। অপরেশের হঠাৎ মনে পড়েছিল সেইসব দিন যখন সুজাতা ছিল না, কিন্তু তার আসার সম্ভাবনায় ভরে থাকত তার ও বীথির মাঝখানের জায়গাটুকু। সাড়ে তিন হাজারে কেনা লঝঝড়ে হিলম্যান, অপরেশ না কিনলে পরের ক্রেতা হত মল্লিকবাজার। গাঁট থেকে খসে গিয়ার পড়ত উল্টোপাল্টা, ঠেলে ফুটপাথের পাশে দাঁড় করাতে হত প্রায়ই। অপরেশ যেহেতু অপরেশ গুপ্ত হয়ে ওঠেনি তখনও, সুতরাং, বীথিও ছিল অন্যরকম। লজ্জা পেয়ে কিংবা স্বামীর ভার হালকা করার জন্যে নেমে আসতে চাইত গাড়ি থেকে। অপরেশ না-না করায় একদিন বলেছিল, 'আমি কি আর নিজের ওজনে আছি! আর একজনের ভারও বইতে হচ্ছে—'

এইভাবে, কিছু মনে পড়া এবং কিছু ভুলে যাওয়া নিয়ে ব্যারাকপুরে গান্ধীঘাট অব্দি যাওয়া এবং ফিরে আসা; গার্ডেন কাফেতে ডিনার এবং বাড়ি ফেরা। জীবন যেমন ছিল তেমনিই স্বাভাবিক, তবু, অপরেশের মনে হয়েছিল এমনিতেই স্রোতহীন তার পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে ঢুকে পড়েছে স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি স্তব্ধতা। এরকম না হয়ে আরও ব্যাপক কিছু ঘটলে সে হয়তো আরও সহজ, আরও নিঃশঙ্ক হতে পারত। বীথি চেঁচিয়েছিল শুনেছে, কিন্তু সুজাতা কেঁদেছিল কি না জানে না। সে নিজেও খুঁজছে এখনও। পাবে কি? জানে না। হয়তো সম্পর্কের স্বভাবে কোথাও আছে জরায়ুর কাঠিন্য—যখন রাখে আদরেই রাখে, কিন্তু একবার নিক্রান্ত করলে আর ফেরত নেয় না।

বিপর্যস্ত বোধ বেশি দূর এগোতে দিল না অপরেশকে। কাল থেকেই ভাবছে সমস্ত ব্যাপারটা বিশ্বাসের ওপর ছেড়ে দেওয়া ভাল। আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে নিজের

ভালমন্দ বুঝবে না, এলোমেলো করে ভাসিয়ে দেবে নিজেকে, এমনই কি হয়? তাছাড়া বীথি নিজেও মেয়ে, সন্দেহ থেকেই পৌঁছে যাবে সত্যে। দরকার বুঝলে নিশ্চয়ই বলবে তাকে। আপাতত তার সমস্যা সুজাতা কী করেছে না করেছে তা নিয়ে নয়, সমস্যা বীথির প্রশ্নগুলো নিয়ে। বড় কঠিন এইসব অভিযোগ, সে নিজেও কি পারে উড়িয়ে দিতে?

টেলিফোন। পি-বি-এক্স-এর লাইন তুলতে গিয়ে অপরেশের খেয়াল হল কলটা এসেছে ইন্টারকমে। ওদিকে মিসেস সান্যাল। সাড়া দিতে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি আসব?'

অপরেশ ভাবল একটু। সকালের এই সময়টায় অন্যদিন সে জরুরি চিঠিপত্র ডিক্টেট করে, নিজেই ডেকে নেয় মিসেস সান্যালকে। আজ ডাকেনি। এখনও মনের সায় না পেয়ে বলল, 'নো। থ্যাঙ্কস। পরে ডাকব।'

'একটা চিঠি এসেছে।' মিসেস সান্যাল বলল, 'মার্কড প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেন্সিয়াল—'

'কে পাঠিয়েছে?'

'বিউটি প্রোডাক্টস থেকে।'

'ও-কে। পাঠিয়ে দিন।'

'দিচ্ছি। আর—', অল্প থেমে মিসেস সান্যাল বলল, 'মিসেস চৌধুরী দেখা করতে চেয়েছেন। শুড আই আস্‌ক হার টু সি ইউ?'

'পরে। আমিই ডাকব।' অপরেশ বলল, 'চিঠিটা দিয়ে যান আগে—'

বিউটি প্রোডাক্টস। তাহলে কি ফিরে এসেছে লাডলীমোহন এবং ক্যাম্পেন অ্যাপ্রুভ করে পাঠিয়ে দিল চিঠি? এতক্ষণের যাবতীয় দুশ্চিন্তা পাশ কাটিয়ে দ্রুত রাস্তার ফিরে আসতে আসতে অপরেশ অনুভব করল, অনেকগুলো বছর প্রফেসনে থেকেও সে উত্তেজনার টেন্ডেনসি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

মিসেস সান্যাল নিজেই এল এবং চিঠিটা অপরেশের হাতে দিয়ে বেরিয়ে গেল আবার।

লম্বাটে খামের ওপর অ্যাকশান গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঠিকানা। পিছনে সেলোটেপ আঁটা। সাবধানে খুলে টাইপ-করা চিঠিটা বের করে পড়তে পড়তে ক্রমশ চোয়াল কঠিন হয়ে উঠল অপরেশের। ছোট চিঠি—ক্যাম্পেন এখনই ব্যবহার করতে পারছে না বলে দুঃখিত, ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে জানাবে। তবে ক্যাম্পেন তৈরি করতে যে খরচ-খরচা হয়েছে তার বিল পাঠিয়ে দিলে অবিলম্বে পেমেন্ট পাঠিয়ে দেওয়া হবে, ইত্যাদি।

হতাশা নয়, রাগ ও বিরক্তিতে ক্রমশ ছেয়ে এল মাথা। বার কয়েক চিঠিটা পড়ল অপরেশ এবং ক্রুদ্ধ হয়ে লক্ষ করল, নিজে লেখার ভদ্রতাটুকু পর্যন্ত দেখায়নি লাডলীমোহন। সই করেছে ম্যানেজার পদাধিকারী কোনও এক চ্যাটার্জি, অপরেশ যাকে চেনে বলে মনে করতে পারল না।

পণ্ডশ্রম? হয়তো। চাঞ্চল্য থেমে গেলে এক ধরনের হাসি ফুটে উঠল অপরেশের মুখে; নিজের ভুলটা অন্য কেউ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে যেমন হয়। ড্রয়ার খুলল এবং বন্ধ করল, কী ভেবে আবার খুলল—সিগারেটের প্যাকেটটা বের করে দেখল একটাই আছে। ধীরে সুস্থে ধরাল সেটা। ধোঁয়া টানল এবং মাথা পর্যন্ত ঘুরিয়ে নিয়ে বের করে দিল আবার। স্বাদ পেল না কোনও।

এখন হতাশাই আসছে। ভাবনা নিজের জন্যে যতটা তার চেয়ে বেশি পুরো স্টাফ, পুরো ইউনিটের জন্যে। যতই তুচ্ছ হোক, কলকাতা এবং দিল্লিতে আপসেট হবার পর গোটা

অ্যাকশন গ্রুপেই এসে গিয়েছিল সতর্কতা, তাহলে কি কম্পিটিশনের বাজারে মার খাওয়া শুরু হল। এই ডিমর‍্যালাইজেশনের মধ্যে বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেডের অ্যাকাউন্টে কাজ শুরু হতে গোটা টিমটাই যেন উঠে পড়ে লেগেছিল, টু গিভ দেয়ার বেস্ট; ডেডলাইন মিট করার জন্য মনোজ আর ওর স্টুডিওর স্টাফ দু দিন অন্তত কাজ করেছে রাত জেগে; রাধাকৃষ্ণন, বিয়াত্রিচেও ছিল, অপূর্বও এসেছিল একদিন। প্রেজেনটেশন ভাল হয়েছে শুনে সেদিন সন্ধেয় অপরেশের পারমিশান নিয়ে অফিসেই বিয়ারের বোতল খুলেছিল ওরা। গড! ফর দিস! এখন ওদের ফেস করবে কী করে!

অথচ, কমিট করেছিল লোকটা! কালো মুখের ওপর সরু, সোনালি ফ্রেমের চশমা, বেল্টের ওপর দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওথলানো ভুঁড়ি। সিরিঞ্জ ফুটিয়ে টানলে জল কি রক্তের বদলে মদই বেরুবে। লাডলীমোহন সরকার। শব্দের ব্যবহারে সাধারণত সংযমী অপরেশ দু আঙুলের ভাঁজে সিগারেটের টিপটা ধরে ঠোঁটের ওপর ঘষতে ঘষতে মৃদু গলায় উচ্চারণ করল, 'বাস্টার্ড!' তারপরেই ভাবল, আপসেট বোধ করার সত্যি-সত্যিই কি আছে কিছু? দিস ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ ইন দ্য গেম। বিজনেসটা ছিলই না, সুতরাং এটাকে ক্ষতি বলে ধরা যাবে না। বরং ভাবা যেতে পারে মৃত্যু হল একটি সম্ভাবনার—একটা থ্রিলের, পিঠ চাড়া দিয়ে দাঁড়িয়ে ওঠার একটা সুযোগের। তাতেই বা হল কী! শূন্য থেকে শুরু করে সে যদি এতটা এগোতে পেরে থাকে, তাহলে আবারও পারবে। এটাই বোঝাতে হবে সকলকে।

কিন্তু হঠাৎ এমন ডিসিসান ওরা নিলই বা কেন। তাহলে কি অন্য কোনও এজেন্সি ঢুকে পড়েছে এর মধ্যে? কোনও এক্সট্রা ফেসিলিটি, কিংবা, কাট-এর অফার? হতে পারে। তবে, যাই হয়ে থাক, এই ন্যাস্টি চিঠি পাবার পর খোঁজ করার মানে হয় না কোনও। বিল চেয়েছে, পাঠাবে; হ্যাঁ, মোটা টাকারই। তার আগে দরকার রিপোর্ট, আর্টওয়ার্ক, ফিলম, মিডিয়া প্রোপোজাল ইত্যাদি ফিরিয়ে আনা। দ্য ম্যান ইজ চিকেনিশ; বলা যায় না, তাদের ক্রিয়েটিভ কাজই হয়তো ব্যবহার করবে পরে। দে শুড নট বি অ্যালাউড টু ড্যু দ্যাট।

এখুনি একটা চিঠি করে জিনিসগুলো ফেরত পাঠাবার নির্দেশ দেবার কথা ভেবে মিসেস সান্যালকে ডাকতে যাচ্ছিল অপরেশ। কিন্তু, ইন্টারকমের রিসিভার তুলতে গিয়ে মনে হল, এত তাড়াহুড়ো করা ঠিক হবে না। অফিসে জানাজানি হবার আগে দরকার আরও কিছু চিন্তার, হয়তো কিছু গোপন তথ্যেরও। এ ব্যাপারে পরামর্শ করা যায় কারও কারও সঙ্গে। কিন্তু, কার সঙ্গে? অফিসিয়াল লেভেলে তার সঙ্গে অন্যদের ব্যবধান এমনই দুস্তর যে হতাশ বোধ না করে ঠাণ্ডা মাথায় ঠিকঠাক পরামর্শ হয়তো কেউই দিতে পারবে না—এই চেম্বার থেকে বেরিয়েই কানাঘুষো করবে নিজেদের মধ্যে। ক্রমশ অন্য এজেন্সিতেও পৌঁছে যেতে পারে খবরটা, ক্লায়েন্টরাও জানবে। না, সেটা হতে দেওয়া যায় না।

এসব ভাবনাই এনে দেয় উদভ্রান্তি। লোকে বলে অ্যাকশন গ্রুপ বেসিক্যালি ওয়ান-ম্যান শো। সমস্যাটা কি তাহলে তার ব্যক্তিগত?

হঠাৎই মনে হল, সম্ভবত সীতাকেই কনফিডেন্সে নিতে পারে। ওর ব্যাকগ্রাউন্ড আলাদা, অভিজ্ঞতাও। এই অ্যাকাউন্টটার খবরও সীতাই এনেছিল, গোড়ার দিকে লাডলীমোহনের সঙ্গে মিটিংগুলোতেও উপস্থিত ছিল তার সঙ্গে। প্রেজেনটেসনেও ছিল। ইউ ক্যুড হ্যাভ বিন হার বেবি, হার হেডেক। কিন্তু, ক্যালকাটা ক্লাবে সেই লাঞ্চের পর, সীতা সম্পর্কে লাডলীমোহনের বাড়তি উৎসাহ লক্ষ করে অপরেশ সিদ্ধান্ত নেয়, কাজ করবে

অ্যাকশন গ্রুপ—অ্যাজ আ প্রফেসনাল টিম; এর মধ্যে কোনও ক্লায়েন্টকেই ব্যক্তিগত পছন্দ, অপছন্দ, আকর্ষণজনিত পক্ষপাতের সুযোগ দেওয়া যায় না। সীতাকে বুঝিয়েছিল, 'তুমি সিনিয়ার, তোমার এবিলিটি উঁচু দরের; যেসব ক্লায়েন্টের প্রফেসনাল ডিম্যান্ড বেশি, তুমি সেখানেই কাজ করবে। বিউটি প্রোডাক্টস লিমিটেড, ইনক্লুডিং লাডলীমোহন, তা নয়; ক্যাম্পেন অ্যাপ্রুভ হয়ে গেলে যে-কোনও জুনিয়র এক্সিকিউটিভ হ্যান্ডেল করতে পারবে এই অ্যাকাউন্ট। অবশ্য, ওভার অল সুপারভিসনের রেসপনসিবিলিটি আমিই নেব।' অপরেশ বলেছিল, 'অ্যাজ মাচ অ্যাজ আই ক্যান। তুমি তো আছই।'

সীতা মেনে নিয়েছিল। অন্তত অখুশি হয়েছে এমন কিছু ধরা পড়েনি ওর পরবর্তী ব্যবহারে। হ্যাঁ। সীতাকেই বলতে পারে।

মনে পড়ল মিসেস সান্যাল জানিয়েছিল সীতা দেখা করতে চায়। আপাতত সেক্রেটারির থ্রু দিয়ে না গিয়ে নিজেই কথা বলতে চাইল অপরেশ। দূরত্বই দূরত্ব বাড়ায়; ভাবল, ওকে কাছে টানা দরকার।

'ইয়েস?'

'সরি সীতা। তুমি কিছু বলতে চেয়েছিলে?'

'ইয়েস।' মুহূর্তের সময় নিল সীতা, 'তুমি কি ফ্রি হয়েছ?'

'ফর ইউ, ইয়েস। প্লিজ ড্যু কাম।'

সীতা লাইন ছেড়ে দিতে মিসেস সান্যালকে ডেকে অপরেশ বলল, 'এক প্যাকেট সিগারেট পাঠিয়ে দিন তো—'

সীতা। ঢোকার ধরনে ব্যস্ততা। কিছু বা থমথমে, অপরেশ লক্ষ করল, এমনকী বিষণ্ণতার মুহূর্তেও চাপা হাসির যে-বিচ্ছুরণ ছড়িয়ে থাকে ওর মুখে এখন তা নেই। নিজেই চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'তুমি কি বিউটি প্রোডাক্টস থেকে কোনও চিঠি পেয়েছ?'

'হোয়াই!' প্রশ্নের ধরনে কথাটা ছুড়ে দিয়ে পেপারওয়েট চাপা দেওয়া খামটার ওপর চোখ রাখল অপরেশ।

'আই হ্যাভ সামথিং টু শো ইউ।'

দৃষ্টি ওর মুখের ওপরেই ছিল; আগে লক্ষ করেনি অপরেশ, সীতার হাতেও কিছু আছে। একইরকম লম্বা ভাঁজের একটা কাগজ ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সীতা বলল, 'উই হ্যাভ লস্ট দ্য অ্যাকাউন্ট!'

হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিয়ে ভাঁজ খুলল অপরেশ। ওপর, নীচ দেখতে দেখতেই ভুরু কুঁচকে উঠল তার। প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনসিয়াল লেখা একই চিঠি, কিন্তু, কপি মার্ক করেছে মিসেস সীতা চৌধুরীর নামে, মূল চিঠিতে যার কোনও ইঙ্গিতই ছিল না।

ইতিমধ্যে নতুন সিগারেটের প্যাকেট এসে গিয়েছিল টেবিলে। সেটার দিকে তাকাতে গিয়ে সীতাকেই দেখল অপরেশ এবং চোখ সরিয়ে নিতে নিতে অনুভব করল তার নিজস্ব প্রস্তুতি ভেঙে যাচ্ছে, চাপ পড়ছে চোয়ালে, মৃদু যন্ত্রণার মতো তিরতিরে একটা অনুভূতি কেঁপে যাচ্ছে ঘাড়ের পিছনে। নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় সিগারেটের প্যাকেটটা কাছে টানল সে, খুলল না। চিঠির কপিটা প্রায় অবহেলায় সীতার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ। পেয়েছি—'

'কী করবে? ভেবেছ কিছু?'

'কী আর করব!' অপরেশ নড়ে বসল, পরের কথাগুলো বলবার আগে সিগারেট ধরাল আবার। তারপর সোজাসুজি সীতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'টেল মি, অ্যাকশন গ্রুপের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে লেখা প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনসিয়াল চিঠির কপি ওরা তোমাকে পাঠাল কেন!'

মুখ দেখে মনে হবে এমন হঠাৎ এই প্রশ্নটা আশা করেনি সীতা। অপ্রস্তুত; শুধু চোখের দৃষ্টিতেই নয়, বসার ভঙ্গিতেও পরিবর্তন এনে বলল, 'আমি কী করে জানব! বিসাইডস, আমি তা ডিসকাস করতে আসিনি।'

'ডাজনট ম্যাটার।' জোর দিয়ে বলল অপরেশ, 'আমি এটাই ডিসকাস করতে চাইছি।'

কয়েক মুহূর্ত কুঁকড়ে থাকল সীতা। তারপর পিছিয়ে যাওয়া গলায় সামান্য শ্লেষ মিশিয়ে বলল, 'তোমার অহঙ্কারে লেগেছে।'

'অহঙ্কারে? না—', অপরেশ হাসবার চেষ্টা করল, 'ফার ফ্রম দ্যাট। লেগেছে সেন্‌স অফ প্রফেসনাল ডিসিপ্লিন—ডিগনিটিতে—'

সীতা এখনও অবাক। বাঁ হাত টেবলের ওপর এলানো, ডান হাতটা সতর্কতায় আঁকড়ে আছে চেয়ারের হাতল, আঁচল ইতস্তত, বুকে ভঙ্গিমা আছে বলেই চেনা যায় নিঃশ্বাসের আলোড়ন। ঈষৎ বাঁকানো ভঙ্গিতে বসে অপরেশকেই দেখছে।

'আমার মনে হচ্ছে লাডলীমোহন—দ্যাট আগলি জোকার—তোমাকেই ইমপর্ট্যান্ট মনে করে, এজেন্সিকে নয়। ওয়েল, ইউ আর ইমপর্ট্যান্ট। কিন্তু, অর্গানাইজেশনের চেয়ে বেশি নয়।' বলতে বলতে থামল অপরেশ এবং বলল, 'ফ্রাঙ্কলি, আমিও তা নই—'

'কী বলতে চাইছ!'

'বললাম তো। এর বেশি—'

অপরেশ কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই কোঁ-কোঁ শব্দ উঠল। রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতে মিসেস সান্যাল বলল, 'মিস্টার গুপ্ত, অপূর্ব এসেছে—'

'আই উইল কল হিম।' ব্যস্তভাবে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার সীতার দিকে তাকাল অপরেশ। নিঃশ্বাস সামলে, নিজেকে সংযত করে বলল, 'লিভ ইট। উই হ্যাভ ফেলড টু গেট দ্য অ্যাকাউন্ট, দ্যাটস অল। কী বলতে চাইছিলে, বলো?'

অপরেশের কথার চাপে ইতিমধ্যেই পাল্টে গিয়েছিল সীতার মুখের রেখা। চোখের দৃষ্টিও। যত না হতচকিত, তার চেয়ে বেশি অপমান এখন ছায়া ফেলেছে ওর মুখে। অভ্যাসবশত আঁচলটা কাঁধের ওপর গুছিয়ে নিতে নিতে কিছু বলতে হয় বলেই বলল, 'ডিসিসান তোমার। তবে, যদি চাও, আমি দেখা করতে পারি মিস্টার সরকারের সঙ্গে। সম্ভবত কিছু একটা করা যাবে—'

'বাই সেলিং ইওরসেলফ? ইওর চার্ম। নিজেকে ছোট করতে তোমার ভাল লাগে, সীতা?'

মুখে নতুন অস্বস্তি ফুটলেও জবাব দিল না সীতা।

অপরেশ বলল, 'সীতা, এর চেয়ে ভাল ক্যাম্পেন অ্যাকশন গ্রুপ দিতে পারত না। ইনডিড, উই গেভ আওয়ার বেস্ট। এজেন্সির কাজই যদি রিজেক্টেড হয়, তা হলে তোমার পার্সোনাল ট্রিক্স সেল করে ওই অ্যাকাউন্ট আমি পেতে চাই না। আজ নয়, পরেও নয়।'

সীতা স্ফুরিত; চোখ নামিয়ে বসে থাকল খানিক। তারপর হঠাৎই উঠে দাঁড়িয়ে বলল,

'তাহলে আর বলার কী আছে।'

'আই অ্যাম সরি, সীতা।' ওকে যেতে দেখে অপরেশ বলল, 'ফর এভরিথিং—'

সীতার চলে যাওয়ায় স্বাভাবিক ব্যস্ততা নেই। ওর পিছনে দরজাটা বন্ধ হচ্ছে আস্তে আস্তে, বন্ধ হল; কার্পেটের প্রান্তে এসে যেখানে নিথর, সেইখানে থেমে আছে সুগন্ধও। ক্রিস্টিয়ান দিওরের নয়। তবে নিশ্চিতভাবে সীতারই—নিভিয়ে দেওয়া পোড়া সিগারেটের গন্ধ ছাপিয়ে বেরুবার রাস্তা খুঁজছে এদিকে ওদিকে। নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে যতটা পারে টেনে নিল অপরেশ। অপূর্ব এসে অপেক্ষা করছে খবর পেয়েছিল, তবু ডাকল না।

ঠোঁটের ওপর দাঁতের হারিকিরি করতে করতে নিজেকে হঠাৎই ভূমিকাহীন মনে হয়। কাজটা কি ঠিক হল? একটু বেশি রূঢ় হয়ে গেল কি তার কথাবার্তা, যাতে সীতার মনে হতে পারে চিঠিটা অজুহাত, কোনও কারণে তাকে অপদস্থ করার সুযোগ খুঁজছিল অপরেশ, উপলক্ষ পেয়ে ঝাল মিটিয়ে নিল। যদি ভাবে, ভুলই করবে। হয়তো রূঢ় হয়েছে সে, হয়তো কথাগুলো স্পষ্ট করেই বলতে চেয়েছিল সে এবং বলেওছে; কিন্তু, রমেনের স্ত্রী থেকে শুধুই সীতায় পরিণত হতে হতে এতদিনে নিশ্চয়ই সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সীতা যা থেকে বুঝতে পারবে অজুহাতের অর্থ থাকে—যা বলেছে তার চেয়ে আরও স্পষ্ট করে বলা যায় না কিছু। তুমিই তোমার শত্রু, সীতা, আমি নই; অন্য কেউও নয়। তোমার দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে।

কিছুই ঠিকঠাক চলছে না; নিজের কথা ভাবতে গেলে এটাই সত্য। না ঘরে, না বাইরে। বীথি এখনও শনিপুজোর পয়সা ফেলে থালায়—নিজে না পারলে ড্রাইভারের হাত দিয়ে; কোন বিশ্বাসে তা অপরেশ জানে না। তার পরেও ঘটনা ঘটে। এসবে অবিশ্বাস সত্ত্বেও ঘটনা তার সামনেও ঘটছে। যদি ধরে নেওয়া হয় ঘটনা ঘটেই, তা হলেও প্রশ্ন থাকে। প্রায় ঘটনাবিহীন তার জীবনযাপনে হঠাৎই এতগুলো এবং প্রতিটিই খারাপ ঘটনা পর পর এবং একসঙ্গে ঘটবে কেন! কোনও জ্যোতিষীর কাছে যাবে নাকি?

চেম্বার থেকে বেরিয়ে টয়লেটে গেল অপরেশ। হালকা হতে হতে ভাবল, সম্ভবত সীতাকে আরও বুঝিয়ে বলার দায়িত্ব এসে গেছে তার। বোঝাতে পারে 'উই হ্যাভ লস্ট' কথাটা সব সময়েই অত জোর দিয়ে বলবার দরকার নেই। কোনও কোনও হার স্বেচ্ছায় মেনে নিতে হয়; তোমার নিজের জন্যে যেমন, তেমনি অন্যের জন্যেও।

চেম্বারের দিকে ফিরতে গিয়েও কিছু ভেবে দাঁড়িয়ে পড়ল অপরেশ। দ্রুত হেঁটে, দরজা ঠেলে উঁকি দিল সীতার ঘরে। দেখল, এক হাতের মুঠোয় আঁচল জড়ানো, জানলার সামনে চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে আছে সীতা। সম্ভবত একই ভাবে অনেকক্ষণ, এমনই আত্মস্থ যে অপরেশের উপস্থিতিও টের পায়নি। সামনে একই আকাশ ও দৃশ্যের বিস্তার, যা অপরেশও দেখে থাকে। তবু তার দাঁড়িয়ে থাকায় আছে অভাবিত কিছু। অসহায়তা?

সীতা নয়, অপরেশ রমেনের স্ত্রীকেই দেখছিল। দু-এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, 'আমি দুঃখিত, সীতা। দেয়ার ওয়াজ নাথিং পার্সোনাল ইন হোয়াট আই সেড, হয়তো বুঝতে পারবে আমি ঠিকই বলেছি।'

'তোমার দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই।' পাশ ফিরে ক্রমশ নিজের টেবলের দিকে হেঁটে এল সীতা। তাকাল না। বলল, 'একজন ঠিক হলে আর একজনকে ভুল হতেই হয়—'

স্রোতের তলার ঘূর্ণির মতো সীতার কথাগুলো; বোঝা যায় না, কিন্তু সন্দেহ করা যায়।

অপরেশও করল। আর-কিছু না বলে চলে এসে নিজের চেম্বারে ঢোকার আগে মিসেস সান্যালকে বলল, 'ডাকুন অপূর্বকে—'

প্রায় সাড়ে বারোটা। ছায়া কাঁপছে রোদের ঔজ্জ্বল্যে, তার খানিকটা তেরছা হয়ে এগিয়ে এসেছে সোফা পর্যন্ত। সূর্য ঠিক কোনখানে গেলে এরকম হয়? ভাবতে ভাবতেই প্রশ্নটাকে জোর করে থামিয়ে দিল অপরেশ। অকাজ আজ সকাল থেকেই অনুসরণ করছে তাকে। বারোটার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পিছিয়ে গেল সাড়ে বারোটায়। রক্ষে এইটুকু, গত হপ্তা থেকেই ঠিক করা গিলানির সঙ্গে লাঞ্চটা ক্যানসেল হয়েছে—ওর স্ত্রী অসুস্থ, অফিসে আসেনি; সে অফিসে পৌঁছবার আগেই জানিয়ে দিয়েছিল মিসেস সান্যালকে। না হলে অপূর্বর সঙ্গে বসবার সময় পাওয়া যেত না।

অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের ব্রিফ আর রেফারেন্স মেটিরিয়াল রাখা ছিল টেবলে। সেগুলো টেনে নিয়ে দেখতে দেখতেই অপূর্ব এল।

'কাম।' অপরেশ স্বাভাবিক হতে চাইল, 'আছ কেমন?'

'ভাল। থ্যাঙ্ক ইউ। ব্রিফটা রেডি আছে?'

'আছে। বোসো।' অপরেশ বলল, 'ইউ সিম টু বি ইন আ হারি। এত তাড়া কিসের?'

'তাড়া নেই। আসলে খুব খিদে পেয়েছে—'

'সিম্পটম অফ গুড হেলথ। কিছু আনিয়ে দেব?'

'নো, থ্যাঙ্কস। বাইরেই খাব। বরং কাজটা তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যাক।'

অপূর্বর তাড়াতেই সকাল থেকে এতটা সময়ের মধ্যে প্রকৃত কাজে মন দিল অপরেশ। টাইপ-করা ব্রিফের প্রতিটি পয়েন্ট ধরে আলোচনা করল, উত্তর দিল খুচরো কিছু প্রশ্নের। জানে, ঠিকই বুঝছে। অপূর্ব বলল সে এখন ফ্রি-ই আছে, দিন চারেকের মধ্যে হেডলাইন ও কপি ডেভলপ করে দেখাতে পারবে মনে হয়। কাজটা চ্যালেঞ্জিং, সুতরাং ধীরেসুস্থে করতে হবে।

অপরেশ আবার অমনোযোগী হয়ে পড়ল। বিউটি প্রোডাক্টস, সীতা—জড়ানো কিছু চিন্তা ফিরে এল মাথায়। অপূর্বকে কি বলবে? না, থাক; হতাশ বোধ করতে পারে। এই অ্যাকাউন্টে ছেলেটা নিজেও কম খাটাখাটি করেনি, বস্তুত ওর আগ্রহ দেখে একবারও মনে হয়নি কাজটা ওর কাছে শুধুই একটা অ্যাসাইনমেন্ট। সততা এক একজনকে এক একভাবে চেনায়। এমন কি হতে পারে সীতার আগ্রহ এবং উদ্বেগের মধ্যেও এমন কিছু ছিল যা সে ঠিকঠাক ধরতে পারেনি। হয়তো। হয়তো নয়। উত্তরটা যা-ই হোক, লাডলীমোহন বদলাবে না তাতে।

অপূর্ব উঠছে। অপরেশ জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় লাঞ্চ খাবে? কারুর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ নাকি?'

'না। কেন।'

'ইন দ্যাট কেস আই ক্যান টেক ইউ আউট।' অপরেশ বলল, 'যাবে?'

অপূর্ব মনে করতে পারল না খুব কাছাকাছি সময়ে আর কখনও অপরেশ এইভাবে ডেকেছে কি না। যতদূর মনে পড়ে, শেষ ডেকেছিল কয়েক মাস আগে—হাইগ্রেন ব্যাটারির ব্রিফিং ছিল সেদিন, ক্লায়েন্টের লোকজন ছিল সঙ্গে, এদিক থেকে অপরেশ, সে, সীতা। বাড়িতে অবশ্য বেশ কয়েকবার ডেকেছে, ডিনারে; তাও কয়েকজনের সঙ্গে। কিন্তু,

এইভাবে, শুধু তাকেই? মনে পড়ল না। বস্তুত অপরেশের স্বভাবে এক ধরনের ফিটফাট সৌজন্য আছে যা শ্রদ্ধা জাগায়, আকর্ষণও করে, কিন্তু, এগোতে দেয় না। তাপটা অনুভব করা যায় তবু। আজ, এই মুহূর্তে, ওর বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা অপূর্বকে ভাবতে বাধ্য করল, তাগিদটা অপরেশেরই। ক্লান্তির ছাপ চোখে মুখে, এমনকী অন্যমনস্কতারও। কারণ বুঝল না। এমনও হতে পারে এই করপোরেট ক্যাম্পেন সম্পর্কেই আরও কিছু বলার আছে ওর, আরও কিছুক্ষণ আটকে রেখে সেরে নিতে চায় কাজটা। আর, নিজেই যখন ডাকছে তখন নিশ্চয়ই এমন কোথাও নিয়ে যাবে যেখানে খাবারটা ভাল। কচিৎ কখনও বাদ দিলে দিনের পর দিন যত্রতত্র হাবিজাবি খেতে খেতে ক্ষুধা এখন তার কাছে শুধুই প্রয়োজনীয় অনুভূতি, উৎসাহ কিংবা স্বাদ নয়। ভাবনাই কল্পিত স্বাদ এনে দিল মুখে।

অপূর্ব রাজি হয়ে গেল।

ড্রাইভারকে ছেড়ে দিয়ে নিজেই স্টিয়ারিং ধরল অপরেশ। গম্ভীর, একাগ্র, সাবধানী। সেলফ ধরে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কোনও প্রেফারেন্স আছে নাকি?'

'মানে।'

'কোনও বিশেষ রেস্তোরাঁ, কোনও বিশেষ ধরনের খাবার?'

'নট রিয়েলি।'

'তাহলে ক্যালকাটা ক্লাবেই যাওয়া যাক?'

'ফাইন।'

কোর্ট ইয়ার্ড থেকে পার্ক স্ট্রিটে নেমে অপূর্বর খেয়াল হল আজ সে সীতার সঙ্গেও দেখা করবে ভেবেছিল। হল না। বারোটা নাগাদ যখন অ্যাকশন গ্রুপে এসে পৌঁছয়, সীতা তখন অপরেশের সঙ্গে। বিয়াত্রিচের সঙ্গে কিছুক্ষণ কাটাতে কাটাতেই ডাক এল। তখন ঠিক করে অপরেশের সঙ্গে কাজ সেরে দেখা করবে। ব্রিফ নিয়ে আলোচনা, লাঞ্চে যাবার প্রস্তাব এবং অপরেশ সঙ্গে থাকাতেই পয়েন্টটা অফ হয়ে গেল মাথা থেকে। সীতা জানবে এবং মাইন্ড করতে পারে। তা হলে কি ফিরে আসবে আবার?

রাসেল স্ট্রিট ঘুরে ক্যামাক স্ট্রিট। এর পর কি থিয়েটার রোড, না লোয়ার সার্কুলার রোড? অপরেশের দুটি হাতই স্টিয়ারিংয়ে, চোখ সামনে; কথার অভাবে মন ঠিক কোথায় তা বোঝা মুশকিল। এরকম যাওয়ায় অস্বস্তি থাকে। মনে হয় লাঞ্চে যাবার প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছে বলেই অপরেশ যাচ্ছে, না হলে, কিংবা এখনও উপায় থাকলে, উইথড্র করে নিত। কিন্তু, সে কি ঠিক ভাবছে!

অপূর্ব রোদ দেখতে লাগল। রাস্তাও। থিয়েটার রোডের ক্রশিং-এ জ্যাম। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে এক ট্যাক্সিওলার সঙ্গে বচসা করছে ট্রাফিক কনস্টেবল। নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে। বিভিন্ন গাড়ির বিরক্ত হর্নের শব্দ কি কানে পৌঁছচ্ছে না লোকটির, নাকি ইউনিফর্মের সঙ্গে যথেচ্ছ কানে গোঁজার তুলোও দেওয়া হয় ওদের? লোকটিকে দেখতে দেখতেই বিরক্ত থেকে মনে পড়ার ধরনে হাসি উঠে এল অপূর্বর ঠোঁটে। সেদিন, মালবী কালীঘাটে পুজো দেবার পর, হাজরা পার্কের দিকে এমনিই হেঁটে আসছিল দুজনে; তো, পার্কের সামনে ছোটখাটো জটলা দেখে ও চ্যাঁচামেচি শুনে সেও দাঁড়িয়ে পড়েছিল। দেখল, একটি ছোকরা মতো রোগা-প্যাংলা যুবকের শার্টের কলার চেপে ধরে দাঁড়িয়ে আছে এক কনস্টেবল আর উঁচু কপালের, কালো ও গাট্টাগোট্টা চেহারার হলদে শাড়ি পরা একটি মেয়ে 'অসভ্য, ইতর

কোথাকার, জানোয়ার। বাড়িতে মা, বোন নেই। ইত্যাদি বলে চ্যাঁচাচ্ছে খুব। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে মেয়েটি নিজের পিঠে ও কোমরের পিছনে কী দেখছিল যেন। ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলল, 'থানায় নিয়ে যান, দু চার ঘা পড়লেই সিধে হয়ে যাবে—।' তখন নতুন আসা আর একটি লোক 'কী হয়েছে, পুলিসদাদা?' জিজ্ঞেস করায়, কনস্টেবলটি একগাল হেসে খুব মজা পেয়েছে এমন গলায় বলল, 'মেয়েছেলের পাছায় কালি ছিটিয়েছে—।' মালবী আগেই কয়েক পা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, কথাগুলো কানে যাওয়ায় ওইখান থেকেই বলল, 'তুমি কি আসবে?' পরে, এগিয়ে যেতে যেতে বলল, 'মেয়েটাও খারাপ।'

জ্যাম ছাড়েনি এখনও। অপূর্ব দেখল, বুশশার্ট পরা এক ভদ্রলোক ফিয়াট থেকে নেমে কনস্টেবলটি যেখানে দাঁড়িয়ে বচসা করছে ট্যাক্সিওলার সঙ্গে সেখানে গিয়ে হাত নেড়ে নেড়ে কী বলতে লাগল লোকটিকে। সম্ভবত ধমকাচ্ছে, কিন্তু চারদিকের আওয়াজ এত বেশি যে কিছুই শোনা যায় না।

অপরেশ বলল, 'অ্যাবসার্ড। শহরটা যে কী হচ্ছে দিনে দিনে।'

স্বগতোক্তির ধরনে বলা। অপূর্ব কিছু বলা প্রয়োজন মনে করল না। আজই জ্যাম নিয়ে একটা রিপোর্ট বেরিয়েছে কাগজে। ডিটেল পড়েনি সে। যত দূর মনে পড়ে, তখনই, চা দিতে দিতে বীণাদি বলেছিল, 'তিনতলার বৌদি নার্সিংহোমে যাবে। কাল আসতে দেরি হবে—'

অপরেশের গাড়ি ও তার পাশের গাড়ির মাঝখানের স্বল্প ফাঁক দিয়ে গা ঘষতে ঘষতে সামনের রাস্তায় যাবার চেষ্টা করছে স্কার্ট-পরা এক মোটা মহিলা; তার পিছনে পিছনে, প্রায় একই ভাবে ঢ্যাঙা ও ঘাড়কুঁজো এক খাড়া চুলের ভদ্রলোক। দেখে মনে হয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান। বিয়াত্রিচে আজ শাড়ি পরে এসেছে অফিসে; বলল, মিস্টার গুপ্ত আভাস দিয়েছে বিউটি প্রোডাক্টস-এর ক্যাম্পেন থ্রু হলে অ্যাকাউন্ট সার্ভিসিংয়ের কাজে লাগানো যেতে পারে তাকে। ওখানে সবাই বাঙালি, 'ইউ নো, বেঙ্গলিজ আর ভেরি পারটিকুলার অ্যাবাউট শাড়িজ।' এটা তার ধারণার কথা, ঠাট্টা করে বলেছিল অপূর্ব, 'হু সেড বেঙ্গলিজ আর নট ইন্টারেস্টেড ইন লেগস।' শুনে ভ্রূকুটি করল বিয়াত্রিচে; তারপর বলল, সে যতদূর শুনেছে বিউটি প্রোডাক্টস অ্যাকাউন্টটা মিসেস চৌধুরীর আনা। অপূর্ব কি জানে কেন সীতাকে এই অ্যাকাউন্টে জড়ানো হল না? অপূর্ব জানে না। বলতেও পারেনি কিছু। একটু চুপ করে থেকে বিয়াত্রিচে বলল মনে হয় একটা টেনশান চলছে অফিসে। আজকাল মিসেস চৌধুরীকে খুব অ্যালুফ দেখায়।

জ্যাম কাটতে শুরু করেছে। হর্নের শব্দ এখন আরও জোরালো। অপূর্ব লক্ষ করল, এর মধ্যে একবারও হর্ন ব্যবহার করেনি অপরেশ। স্থির চোখে তাকিয়ে আছে, সামনে, ফাঁক পেয়ে গিয়ার চেঞ্জ করে এগিয়ে গেল কিছুটা। টেনশান?

পর পর ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির সারি, যেভাবে এগোচ্ছে তাতে পাঁচ মিনিটের রাস্তা পেরোতে পঁচিশ মিনিটও লাগতে পারে। পুলিসের একজন সার্জেন্টকে দেখা যাচ্ছে এখন—এদিকে ওদিকে তৎপর ইশারা করে পার করে দিচ্ছে গাড়িগুলো। স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে, টানা হর্ন দিয়ে বাঁ দিকে কাটিয়ে পাশের লেনে ঢুকে পড়ল অপরেশ। ওকে টেনস দেখাচ্ছিল।

হয়তো বিয়াত্রিচের কথাই ঠিক। গত হপ্তায়—বুধবার, না বেস্পতিবার?—বেস্পতিবারই, বিকেলের দিকে অ্যাকশন গ্রুপে এসেছিল সে। শুনল, জরুরি কল পেয়ে

দিল্লি চলে গেছে অপরেশ, বলে গেছে অপূর্ব সোমবার এলে ভাল হয়। তখন সীতাকেই মনে পড়ে।

দরজায় টোকা দিতে 'কাম-ইন'; সীতা আর্টওয়ার্ক দেখছে, ওকে ঢুকতে দেখে সেটা সরিয়ে রেখে বলল, 'তুমি কি অনেকদিন বাঁচবে?'

'কেন!'

'একটু আগেই তোমার কথা ভাবছিলাম—'

অপূর্ব চেয়ারটা টেনে নিল। বসতে বসতে বলল, 'কেন!'

'কেন, কেন, কেন! দ্যাট সিমস টু বি ইওর ফেভারিট কোয়েশ্চেন!'

চেয়ারের পিঠে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে হাসল সীতা, 'কেন! মনে পড়তে নেই!'

সীতা তাকেই দেখছে। কিছু বা বিষণ্ণ। ওর চোখ থেকে নাক, ঠোঁট ও চিবুক ছুঁয়ে দুই স্তনের মধ্যেকার রেখার আভাসে নেমে এল অপূর্ব; আজও মেরুনই পরেছে। তবে একই শাড়ি নাও হতে পারে। ব্লাউজটাও স্লিভলেস নয়। স্তনদ্বয়ের সাদা উত্তালতা থেকে মুখ তুলে নিল সে, আবার নামিয়ে রাখার জন্যে। হাঁটু দুটো জোড়া করে ছাড়িয়ে নিল আবার।

'তাকিয়ে রইলে যে!' হাসিটা বিস্তৃত করে আর্টওয়ার্ক ও অন্যান্য কাগজপত্র বাঁ দিকে সরিয়ে রাখতে রাখতে সীতা বলল, 'ইউ জাস্ট হ্যাভ মেড ইট। চলে যাব ভাবছিলাম—'

বিষণ্ণতার অর্থ দিন শেষের ক্লান্তিও হতে পারে। অপূর্ব বলল, 'এত তাড়াতাড়ি?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সীতা। উঠে গিয়ে জানলার পর্দাটা সরিয়ে দিল। বাইরে তাকিয়ে বলল, 'ডোন্ট নো। ফিলিং আউট অফ শর্ট। কথাটা কী, বেখাপ্পা?'

এই সময়ের আলোয় সূর্য থাকে না। ট্রেন ছেড়ে যাওয়া প্ল্যাটফর্মের মতো অর্থহীন দেখায় সমস্ত আয়োজন। প্যাঁচে কাটা একটা সবুজ-সাদা ঘুড়ি নেমে আসছে ভাসতে ভাসতে। হাওয়ায় প্রতিরোধহীন, সরে গেল খানিকটা, ধরনটা দিক বদলানোর; তারপরেই আবার ফিরে এল নামার দিকে। এত দূর উচ্চতা থেকে উড়তে উড়তে শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পড়বে বলা যায় না। সে যা দেখছে সীতাও কি তা-ই দেখছে? বোঝা যায় না। শরীর যা দেখায় তার সঙ্গে প্রোফাইলের মিল নেই কোনও।

অপূর্ব বলল, 'আর ইউ আনওয়েল?'

'না।' সীতা ওখান থেকেই বলল, 'এমনিই। কখনও কখনও এরকম লাগে। শুধু কাজই কি এনগেজড রাখতে পারে মানুষকে। ভাবছিলাম বাড়ি চলে যাব।'

মুখ ফেরাল না। অপূর্ব দেখল, ঘুড়িটা হারিয়ে গেছে। তার পরেই আকাশ। সীতাকে দেখতে দেখতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে এল ও। প্রায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে বলল, 'চলো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে—'

সামনে লোয়ার সার্কুলার রোড। ট্রাফিকে থেমে, রুমাল বের করে মুখ মুছতে মুছতে পাশে তাকিয়ে হাসল অপরেশ, সম্ভবত গাড়িতে ওঠার পর এই প্রথম, এবং বলল, 'তোমাকে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারতাম। পার্ক স্ট্রিটেই। ইউ মাস্ট বি ফিলিং ভেরি হাংরি?'

'নট রিয়েলি।'

'আমারই ভুল—।' ট্রাফিকের জট ছাড়তে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল অপরেশ, 'এই রুটটা অ্যাভয়েড করা উচিত ছিল—'

সীতা ঘুরে দাঁড়াল। মুখোমুখি। দৃষ্টি সোজাসুজি চোখে। চকিতে ডান হাত বাড়িয়ে দু

আঙুলে ধরে অপূর্বর নাক নেড়ে দিয়ে সরে গেল ওর নিজের চেয়ারের দিকে। বসে বলল, 'আজ নয়।'

অপূর্ব কথাটার মানে খুঁজছিল। জানালার বাইরে যেটুকু জায়গা সেখানে উড়ে এসেছে একটা শালিক। খানিক বসে থেকেই উড়ে গেল আবার।

চেয়ারের পাশে বুককেসের ওপর রাখা ওর ব্যাগটা খুলে কিছু দেখতে দেখতে সীতা বলল, 'কখনও কখনও একাই ভাল লাগে—'

'ফিলজফি!'

'না। ফ্যাক্ট!' মুখ তুলে হাসল সীতা, 'দুজন মানুষের ভাবনা এক হয় না। হয়?'

গাড়িটা ক্লাবের গেটের দিকে ঘুরিয়ে নিল অপরেশ। পার্কিং প্লেসের দিকে এগোতে এগোতে ঘড়ি দেখে বলল, 'পাক্কা কুড়ি মিনিট।'

সীতার প্রশ্নে রহস্য ছিল। বলার ধরনেও। উত্তর খুঁজে পায়নি অঙ্গপূর্ব।

সিঁড়ি দিয়ে একসঙ্গেই নামা। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে 'বাই' বলার পরেও তবু মুখ বাড়াল সীতা, 'খুব ইচ্ছে করছে আসতে?'

'না।' অপূর্ব কি বলেছিল? ফাঁকায় দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল, সীতা সাবধানী নয়।

অপরেশের আচরণে তাড়া নেই কোনও। দুটো লার্জ ব্লাডি মেরির অর্ডার দিয়েছিল; স্টুয়ার্ডের পরামর্শে যেভাবে চাইনিজ লাঞ্চে সায় দিয়ে ফেলল তাতে মনে হল নিজেও পছন্দ করে। অফিস থেকে বেরুবার পর এবং ক্লাবে আসবার সময়, রাস্তায়, গাড়ি চালাতে চালাতে, যেমন দেখেছিল তার চেয়ে খোলামেলা লাগছে এখন। কিছুটা ব্যক্তিগতও। ইতিমধ্যে তার লেখালেখির খবর নিয়েছে—'ড্যু দে পে ইউ ওয়েল?' এমনকী বিয়ে করার কথা ভাবছে কি না তা পর্যন্ত জিজ্ঞেস করল। জীবন কাষ্টখণ্ড নয় যে শুধুই ভেসে বেড়াবে, বরং তা জাহাজ কিংবা নৌকার মতো, গায়ে কোথাও না কোথাও পৌছুবার ঠিকানা লেখা, ইত্যাদি। এভাবেও বলে কেউ কেউ—পুরনো, ছেঁদো, বহুবার বলা কথাতেও শব্দ ও উপমা প্রয়োগের হেরফেরে আনতে চায় তাৎপর্য। অপূর্বর মনে হল মাল ছুঁতে না ছুঁতেই মাতাল হবার দিকে এগোচ্ছে অপরেশ; তার পরেই ভাবল এটা তাকে এজেন্সিতে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাও হতে পারে, সেইজন্যেই হতে চাইছে অন্তরঙ্গ। এমনও সন্দেহ হল তাকে সামনে বসিয়ে নিজেকেই নিজে বোঝাচ্ছে কি না অপরেশ। জাহাজ কিংবা নৌকা এবং পৌঁছুনোর ঠিকানা। উপমা হিসেবে দুটোই সত্য; কিন্তু, আরও সত্য জল ছুঁয়ে থাকা এবং ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভেসে আসার অভিজ্ঞতা। সুড়ঙ্গের আগে পরে আলো থাকে। মাঝখানটা জানা যায় না। মাঝখানের ওই অপরিচয়ই কি মন, একজন থেকে আলাদা করে দিচ্ছে আর একজনকে? ফিরিয়ে দিয়েও তাকে, দ্বিধান্বিত, ডেকেছিল সীতা; কেন, তা বলেনি। মালবীও বলেনি কোন স্বপ্ন ভরিয়ে দিয়েছিল তাকে—'বিয়ে তো আমাদের হয়েই গেছে, অপূর্ব।' কী হয়েছিল, সেও কি বলেছে? চৌরঙ্গিতে একদিন মনে পড়ল, ফুটপাথ দিয়ে সে তখন হাঁটছে বিপরীত দিকে, দেখল, পার্ক স্ট্রিটের ট্রাফিকে থেমে দাঁড়ানো অনেক গাড়ির মধ্যে একটা সাদা অ্যামবাসাডরের পিছনের সিটে বসে একটি লোক অপলক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে তাকে; অনেকটা বিমলকৃষ্ণের মতো দেখতে। সুতরাং, ঠোঙায় চিনেবাদাম নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক, সেও দেখতে লাগল লোকটিকে। কয়েক মুহূর্তের ঘটনা। তারপর যখন সে এগিয়ে গেছে এবং গাড়িগুলোও দ্রুত চলে যাচ্ছে পর পর, তখন হঠাৎ, থেমে দাঁড়িয়ে,

খেয়াল হল লোকটি বিমলকৃষ্ণই, তার জন্মদাতা, বাবা; এইভাবে তাদের সম্পর্কের মধ্যে 'মতো' ঢুকে পড়ল কী করে। এইসব।

অপরেশের কথার উত্তরে যেটায় যেমন দরকার হ্যাঁ-হুঁ করে যাচ্ছিল অপূর্ব। সত্যি-সত্যিই আর কী করতে পারে, কী-ই বা সম্পর্ক তার সঙ্গে!

ঠোঁটে ও জিবে ব্লাডি মেরির তরল ও নুনের স্বাদ অন্যরকম অনুভূতি আনছে শরীরে। স্মৃতিও। ভাবনায় ঢুকে পড়ছে পেলবতা। সীতা থেকেই চলে এল মালবীতে। গায়ত্রী বললেন, 'হ্যাঁ রে, রেজিস্টিরি বিয়েও বিয়ে তো?' চোখের জল ধুয়ে দিতে চায় সংস্কার। হয়তো অসহায়তাও। অনেকদিন দেখা হয়নি শৌনিকের সঙ্গে, সম্ভবত ইলেকসানের প্রস্তুতি নিয়ে ব্যস্ত। কুলতারের সঙ্গে মোটরবাইকে যেতে যেতে লরির সঙ্গে ধাক্কা লেগে মৌলালি না কোথায় অ্যাক্সিডেন্ট করেছে অজয়; মালবী সুদেষ্ণাকে চেনে, যদিও পছন্দ করে না তেমন, ওই বলেছিল, চোট লেগেছে মাথায়, মালটিপল ফ্রাকচার হয়েছে হিপবোনে এবং পায়ে, এখন হাসপাতালে। সম্ভবত একদিন দেখতে যাওয়া উচিত ছিল তার। ছিল না কি? কখনও মনে হয় সম্পর্ক থাকা এবং না-থাকার মধ্যে ঢুকে পড়ছে এক ধরনের সম্পর্ক-শূন্যতা। মাঝরাতে, ঘুম না আসার মধ্যে, যদি বা কখনও মনে পড়ে কারও কারও মুখ ও কথা, কিছু প্রতিশ্রুতিও হয়তো, বাস্তব সরিয়ে রাখে দূরে। কৌতূহলের মধ্যেই এসে যায় নিরপেক্ষতা। সে কি স্বার্থপর হয়ে উঠছে ক্রমশ? নাকি জীবন মানেই এই, গতানুগতিকতার মধ্যে শুধুই যেটুকু নিজস্ব তার বেশি কিছুই আর নিতে দেয় না।

চোখাচোখি হতে অপূর্ব বুঝল অপরেশ তাকেই দেখছে। ঠোঁট থেকে গ্লাস নামাতে নামাতে বলল, 'তোমাকে আনমাইন্ডফুল লাগছে!'

'হোয়াই!' অভ্যাস থেকেই কথাটা এসে গিয়েছিল মুখে, সাড় পেল ভিতরের চমকে। বদলে নিয়ে অপূর্ব বলল, 'নো। নট দ্যাট। আপনি কিছু বলছিলেন—'

'বলছি।' অপূর্বকে গ্লাসে চুমুক দেবার সময় দিল অপরেশ, 'আর একটা ড্রিঙ্ক নাও?'

'না। থাক।'

'নাও! আমিও নেব।'

আরও দুটো ব্লাডি মেরি আনতে বলে সামনে ঝুঁকে এল অপরেশ। কোণের দিকে মুখে চড়া মেক-আপ নেওয়া বিগতযৌবন যে দুজন মহিলা বসেছিলেন তারা আসবার আগে থেকেই, মাঝে মাঝেই কানে আসছিল তাঁদের পরস্পরকে টেক্কা দেওয়া কথাবার্তা, তাঁরা উঠে যেতে, ঘাম ও এসেন্সের হঠাৎ-গন্ধ পেরিয়ে অপরেশের কাঁধের পিছন দিয়ে অপূর্বর চোখ চলে গেল লনে। মনে হচ্ছে অনুষ্ঠান আছে কোনও, সবুজে চোখ রাখতে গিয়েও দৃষ্টি ফিরে এল সামিয়ানার রঙিন ঐক্য ও ঝালরে ঘা খেয়ে। একই রঙ কি দেখেছিল আইজলে, ডিকির পোশাকে? দেখল, লনের সবুজে কাঠবিড়ালীর মতো ছুটোছুটি করছে ইঁদুরেরা। মাথায় হ্যাট, পায়ে গামবুট, তারা তিনজন। নামছে।

'বিমলকৃষ্ণবাবু কেমন আছেন? আই মিন ইওর ফাদার?'

'ভালোই তো মনে হয়। মাঝে মাঝে নাম দেখি কাগজে—'

অপরেশ হাসল। সঙ্গে সঙ্গে বলল না কিছু। সিগারেট ধরিয়ে গুছিয়ে নিল নিজেকে।

'তুমি কি জানো কংগ্রেস ইলেকসান ক্যাম্পেনের জন্যে এজেন্সি সার্ভিসেস হায়ার করার কথা ভাবছে?'

প্রশ্নটা এমনই আকস্মিক যে অপূর্ব জবাব দেবার কথা ভাবল না। প্রশ্ন নিয়েই তাকিয়ে থাকল অপরেশের মুখের দিকে।

'ইফ দ্যাট হ্যাপেনস, তুমি কি কিছু হেল্প করতে পারবে?'

নতুন দুটো ব্লাডি মেরির গ্লাস নামিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারা। টম্যাটোর রঙে মিশেছে বরফের জলীয় সাদা, গ্লাসের বৃত্ত ঘিরে নুনের কারুকাজ। অপূর্ব বলল, 'আমি!'

'এমনও হতে পারে—', অপরেশ সিরিয়াস, 'আই ডোন্‌ট রুল দ্যাট আউট, গোটা ব্যাপারটা দিল্লি থেকেই হবে। কিন্তু, আমি খবর নিয়েছি, একটা লোকাল বাজেটও থাকতে পারে, থ্রু প্রদেশ কমিটি। ইউ নো হোয়াট ইট মিনস। বিজনেস ওয়ার্থ সেভারেল ল্যাখস। যদি ম্যানেজ করা যায় তাহলে উই উইল মোর দ্যান মেক-আপ দ্য শর্টফল। তুমি কি তোমার বাবাকে বলতে পারবে?'

'আমি।' ইতিমধ্যে গ্লাসটা তুলে নিয়েছিল হাতে, চুমুক দিয়ে ঈষৎ তাচ্ছিল্যের গলায় অপূর্ব বলল, 'আপনি তো জানেনই, মিস্টার গুপ্ত, বাবার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই—'

'ওটা বাজে কথা।' অপরেশ বলল, 'কিছুদিন আগে উনিই একটা বিজনেস দিয়েছিলেন। অন হিজ ওন, ইউ নো দ্যাট। তুমি আছ বলেই দিয়েছিলেন।'

আগ্রহ তৈরি হয়ে আছে অপেক্ষায়, চোখেমুখে। অপরেশ জবাব চায়। এই জন্যেই কি লাঞ্চে ডেকেছিল? অপূর্ব ভাবল। অবশ্য এটা নিছকই ব্যবসার কথা, যেমন বলে কখনও সখনও, লাঞ্চে না ডাকলে অফিসেও বলতে পারত। তখনও একই গলা শুনত।

অপূর্ব ভাববার সময় নিল। তারপর বলল, 'সীতাকে বলছেন না কেন?'

'সীতাকে। সি ডাজনট কাম ইনটু দ্য পিকচার।'

'সি ডাজ। ইফ ইউ রিমেমবার, লাস্ট অকেশনে সীতাই হ্যান্ডেল করেছিল ব্যাপারটা। আমি নই। সীতা বাবাকে ভালভাবেই চেনে—'

'আই ডোনট থিংক সো।'

'আমি জানি। সীতাই বলেছে, ওই অকেশনে একদিন আমাদের বাড়িতেও গিয়েছিল—'

অপরেশ হঠাৎই গম্ভীর হল। চোখ নামানো, প্লাস্টিকের স্টিকে গাঁথা চেরিটা নাড়াচাড়া করছে গ্লাসের ভিতর।

'বিসাইডস—', থেমে গিয়েও কথাটা বলে ফেলল অপূর্ব, 'বাবা মেয়েমানুষ পছন্দ করে—'

অপরেশ সম্ভবত কথাটা আশা করেনি। চোখ তুলে কিছু বা ব্যঙ্গ ফুটিয়ে বলল, 'কে না করে।'

'বাবা কে নয়।'

এরই মধ্যে কাঠিন্য এসে গেছে অপূর্বর মুখে; এই মুহূর্তের চিন্তায়, নাকি ব্লাডি মেরির উত্তাপে, বোঝা যায় না। গলা নামিয়ে অপরেশ বলল, 'সম্পর্কটা নর্মাল করার চেষ্টা করো, অপূর্ব। বাবা কারও ঘৃণার পাত্র হতে পারে না—'

'কে বলেছে আমি ঘৃণা করি।' চোখের তারা বিস্ফারিত করে, যেন বা অপরেশ লক্ষ্য হলেও দৃষ্টি আরও দূরে, অপূর্ব বলল, 'ঘৃণা করি না, শ্রদ্ধাও করি না। আই ডোন্‌ট নো হোয়াই। মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করি নিজেকে, কেন কোনও ফিলিং নেই আমার মনে। ঘৃণা করার কারণ আছে, কিন্তু, হোয়াই আই ফেল টু হেট হিম ইভন।'

গলার স্বরে বিহ্বলতা, চোখ আর্দ্র; বিভ্রান্তি অপূর্বকে ডাঙার দিকে টানছে। ড্রিঙ্কসের অনভ্যাসই কি টান দিয়েছে শিকড়ে। কোন কথা থেকে চলে এল কোন কথায়, কী বলছে না বলছে হয়তো এই মুহূর্তে সে-সম্পর্কে ধারণাই নেই কোনও।

'ও-কে, ও-কে!' তাড়াতাড়ি ওর হাতে চাপ দিয়ে অপরেশ বলল, 'আমি সীতাকেই বলব। প্লিজ!'

হাতটা টেনে নিল অপূর্ব। জবাব দিল না। নিজের স্বর এখন ফিরে আসছে নিজেরই কানে—অনেক দূর থেকে, গড়াতে গড়াতে। যেভাবে আসে।

৬

যেভাবে যায়। সময়ের সহজতায় বিভ্রম নেই কোনও। দিন ছোট হয়ে আসে; সন্ধে হবার আগেই বিবর্ণ হতে থাকে চারদিক। খুব দূর দিয়ে চলে যায় ট্রাম, বাস, ট্রেন, যেমন যেত; বৈচিত্র্যহীন সেই যাওয়ার শব্দে সঙ্কেত থাকে না কোনও। হাওয়ায় টান দেখে একদিন ভাবতে হয় তাহলে শীতও এসে গেল। অগোচরের ধুন-ধুন শব্দে তুলো পেঁজার ইচ্ছে; নতুন লেপ-তোশকে, বালিশে, ধরা দেবে উত্তাপ। যে যার মতো করে ছড়িয়ে রাখছে জাল। বাচ্চা কোলে গাড়িতে উঠতে উঠতে সলজ্জ হয়ে ওঠে তিনতলার বৌদি।

কলকাতার ভিখিরিদের নিয়ে যে-লেখাটা লিখেছিল অপূর্ব, সেটা ছাপা হল প্রথম পাতাতেই। সঙ্গে পিঠের কুঁজে মাথা ঢুকে পড়া, পেটের ভিতরে সেঁধিয়ে যাওয়া ল্যাঙলেঙে দুটি পা এবং দৃশ্যত একটিই হাতে অ্যালুমিনিয়ামের বাটি মেলে ধরা এক বিকলাঙ্গর ছবি, নীচে ক্যাপশন, 'ডেড, অর ডাইং?' জোরালো লেখা। আহমেদ বলল, 'কনগ্র্যাচুলেসন, অপূর্ব। আজ অ্যাসেমব্লি তোলপাড় হয়েছে তোমার লেখা নিয়ে। ব্রেভো। কিপ আপ!'

আত্মবিশ্বাসে ভরে ওঠে মন। অপূর্ব টের পায় তার ক্রমশ হয়ে ওঠা। একই সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা। রাস্তা। রোদে গাঁদাফুলের রঙ, ক্রমশ নিভৃত হয়ে উঠছে ছায়া। আরও কি পুরনো হয়ে গেছে, আশপাশের বাড়িগুলো। হাঁটতে হাঁটতেই ফেলে আসে পাইলিংয়ের শব্দ, লাইনবদ্ধ ট্রামের চতুর শব্দ। জ্যাম। হর্ন। ভিড়। পতাকার তিনটি রঙ বলে দেয় প্রধানমন্ত্রী আসছেন, 'ব্রিগেডে চলুন'। ভিড়ে সংশ্লিষ্ট হয় বাদাম তেল আর ঘিয়ের মিশ্র গন্ধ। মেট্রোর সামনের গিজগিজ থেকে একটু তফাতে দাঁড়িয়ে উরু চুলকোয় একটি বড় মেয়ে। কাত হয়ে বসে তার খোঁড়া পায়ের ক্ষত চাটে এক বয়স্ক কুকুর। ক্যাসেটে জ্যাজ, এক উদাত্ত কণ্ঠের ক্রমশ দূরে যাওয়া। ফুটপাথে ডাঁই-করা উলের জামা নিয়ে সহাস্য ভুটানি যুবতী। ল্যাম্পোস্টে ক্রশ করে বাঁধা লাল পতাকার নীচে জড়ো হচ্ছে কৌতূহলপ্রিয় মানুষ। মাইকের সদর্প কথাগুলো থামিয়ে দেয় পা, শৌনিক না। টুলের ওপর দাঁড়ানো; মাইকের মধ্যে দিয়ে বলা বলেই অচেনা লাগে। দেখতে দেখতে কার্জন পার্কের দিক থেকে এসে অর্ধ বৃত্তাকারে চৌরঙ্গির দিকে এগিয়ে যায় ডাবলডেকার, মিনিবাস, সি-সি মার্কা গাড়ি, ট্যাক্সি। ভিড়। আরও এগোতে গিয়েও তবু অ্যালুমিনিয়ামের বাটির ভিতরের ঝঙ্কারে থমকে দাঁড়ায় অপূর্ব। সেই একটিই হাত উঠে আছে সামনে, ডেড, অর ডাইং? হঠাৎ শীতে কুঁকড়ে ওঠে গা। একটা

চাপা শব্দ গুড়গুড় করে মাথার ওপরে, আকাশে। টেনে নেয়। লাল-সবুজ আলোর জ্বলা নেভা নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে পুবের দিকে দ্রুত উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন।

একদিন ভোরবেলায় দরজায় আচমকা শব্দ শুনে জেগে উঠল অপূর্ব। এই ভোরে কে! বীণাদিই কি? তাড়াতাড়ি উঠে দরজা খুলেই অবাক।

মালবী। পরিচ্ছন্ন ঘুম থেকে হাসি ফুটিয়ে বলল, 'হাঁ হয়ে গেলে তো!'

'তুমি!'

দুড়দাড় করে জানলার পর্দা সরাল মালবী। ব্যালকনির দরজা খুলে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল খানিক, চোখ বোলাল রাস্তায়। আবার ঘরে ঢুকে, আলো যেখানে চেয়ার ছুঁয়েছে সেখানে দাঁড়িয়ে গায়ের স্টোল নামিয়ে নিতে নিতে বলল, 'সিনেমায় ওমনি বলে—'

'কী!'

'ওই যে বললে, তুমি! যেন আট বছর পরে দেখলে! কাল বিকেলে যার সঙ্গে ছিলে, সে কে!'

'কখনও তো আসোনি এই সময়ে!'

'এলাম।' হাতের মুঠোয় মৌরি ধরে রাখা গলায় মালবী বলল, 'এতদিন তোমার তর সইছিল না। এখন আমার—।' বলতে বলতেই থামল, তারপর কোমরে আঁচল গুজে বলল, 'যাও। আমি চা করে দিচ্ছি। আছে তো সব?'

'দ্যাখো—'

ভোর ভাবলেই ভোর। বাথরুমে ঢুকতে ঢুকতে ঘড়ি দেখেছিল অপূর্ব, আসলে সাতটা। কুয়াশার মতো কিছু আড়াল করে রেখেছে রোদ, শেষ বিকেল মনে হয়। চোখেমুখে জলের ঠাণ্ডা মেখে তোয়ালেয় মুখ মুছতে মুছতে আয়নায় তাকিয়ে অপূর্বর মনে হল অনেক দিন পরে দেখছে নিজেকে—হাত বাড়ানো দূরত্বে কেউ ভাবলে অনুভূতি এমন পাল্টে যায় কেন! সাতদিন পরে রেজিস্ট্রি হবে তাদের, তখন তারা স্বামী, স্ত্রী। তখন, এইরকম ভোরে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, সে কি একই অনুভূতির কথা ভাববে!

দরজায় টোকা পড়ছে, 'কী হল! এত দেরি কেন!'

বেরুতে বেরুতে অপূর্ব বলল, 'বিখ্যাত লোকেদের অনেকেই বাথরুমে বসেই ভাবে।'

'অনেক পাগলও তা-ই করে—। দ্যাখো, ঠাণ্ডা হয়ে গেল বোধহয়।'

মালবীর বাড়ানো হাত থেকে চা নিতে গিয়ে মনে পড়ল বিজ্ঞাপন, এইভাবেই দেয়। পরে, খুঁটিয়ে দেখে মনে হল, না, তা নয়; কব্জির পেলব ছুঁয়ে থাকা দুটি চুড়িতে ঝরে পড়ার অপেক্ষায় দুলছে জলের বিন্দু। ছবি এভাবে দেখাবে না।

দৃষ্টি ধরে রাখা গেল না। নীচে থেকে 'পেপার' শব্দের সঙ্গে সঙ্গে উড়ে এল রোল-করা খবরের কাগজ।

'কেন এলাম জিজ্ঞেস করলে না তো!'

'কেন?'

'চা-টা খেয়ে নাও। তারপর উঠে দাঁড়াতে হবে।'

ঝাঁকুনি দিতে দিতে চলে যাওয়া মিল্ক ভ্যানের শব্দের পিছু ধাওয়া করে ট্যাক্সির ভেঁপু। দূরে, কে যেন ডাকছে কাকে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে ডাস্টবিনের পাশ থেকে একা কুকুরের বেড়াল-তাড়ানো গলার ধমক। প্রায় এই সময়, নাকি আরও পরে? একটা মিছিল হেঁটে যেত

সামনের রাস্তা দিয়ে; এখন আর যায় না। ভাবতে ভাবতেই আবার কাপে চুমুক দিল অপূর্ব এবং ভাবল, হয়তো সত্যিই পরিবর্তন আসছে একটা। সকালের প্রথম চা-টা এই প্রথম আর কেউ দিল।

তখন বেল পড়ল দরজায়। মালবী তাকাতে অপূর্ব বলল, 'বীণাদি। এটা ওয়ার্নিং। এখনই আসবে না।'

ব্যাগ হাতড়ে টেপ বের করল মালবী। অপূর্বর খুব কাছে এসে বলল, 'দেখি কী হয়েছ? মোটা, রোগা, না লম্বা?'

'কী ব্যাপার!'

ওর কাঁধ থেকে কোমর অব্দি ফিতে নামিয়ে মাপ নিতে নিতে মালবী বলল, 'কাল রাত্রে হঠাৎ খেয়াল হল, কীরকম স্বার্থপর হয়ে গেছি আমি! শীত পড়ে গেল, অথচ এবার তোমার জন্যে বুনলাম না কিছু! রাত্রেই প্যাটার্ন ঘেঁটেছি।'

'দিতেই হবে নাকি!' মালবীর চুলের গন্ধে নিঃশ্বাস নিতে নিতে অপূর্ব বলল, 'গতবারেরটা এখনও নতুনই আছে। হ্যাঙ্গারে দ্যাখো—কাল রাত্রে শীত-শীত করছিল, পরেছিলাম—'

'তাহলেও—', অপূর্বর পিঠের পিছন দিয়ে বুকের মাঝামাঝি পর্যন্ত ফিতেটা টেনে এনে হাসল মালবী, 'ইচ্ছে কি সামলানো যায়! প্রেমিকের জন্যে এই আমার শেষ বোনা। এরপরে কার জন্যে বুনব কে জানে!'

'কেন!'

'কেন আবার কি! তোমাকে না হয় চিনি। আর একজন কেমন হবে কী করে বুঝব!'

মালবী যেন ইচ্ছে করেই আদর খেলছে; একই খেলা গলার স্বরেও। সরে যাচ্ছিল, অপূর্ব টেনে ধরতে বলল, 'আবার! না, এবার আমি যাব। কলেজ আছে—'

'কতক্ষণ লাগে!'

'তুমি বড় লোভ দেখাও!'

নিজেই ঘন হয়ে এল মালবী। ঠোঁটের স্বাদ ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে; পায়ের তলা থেকে উঠে আসছে এলিয়ে পড়ার ইচ্ছে। বুকে ও কোমরের নীচের এই স্পর্শকাতরতা সে চেনে। আরও বেশি ইচ্ছেয় জড়িয়ে পড়ার আগেই নিজেকে সরিয়ে নিল মালবী।

'সারাক্ষণ শুধু এই একটিই ইচ্ছে!'

'খারাপ লাগে?'

হাতের উল্টো পিঠে ঠোঁটের কোণ মুছল মালবী। ফিতেটা গুটিয়ে নিতে নিতে বলল, 'বলি, তারপর বিপদে পড়ি! নিজেকে জিজ্ঞেস করো না কেন!'

ওদের কথার মধ্যেই আবার বেল পড়ল দরজায়। এগোতে এগোতে অপূর্ব বলল, 'ভাববে রাত্রেও ছিলে—'

'ভিতু!'

মালবীও এল পিছনে পিছনে। দরজা খুলে অপূর্ব বলল, 'এই হল বীণাদি।'

'তোমার গার্জেন!'

হকচকিয়ে যাওয়া থেকে মালবীকেই দেখল বীণাদি। তারপর কিচেনের দিকে যেতে-যেতে পিছন না ফিরে বলল, 'এসেছিল তো একদিন। নীচে দাঁড়িয়েছিল। আমি দেখেছি—'

'হয়ে গেল!' মালবী ভুরু কোঁচকাতে অপূর্ব বলল, 'আগেই দেখেছে। আজ বুঝে নিল। যেদিন আসবে, গোটা পাড়া ওয়েলকাম করবে তোমাকে।'

তখন দপ করে রোদ উঠল। কুয়াশার ছেড়ে যাওয়া চারদিক থেকে ছুটে এল শীত-ছোঁয়ানো হাওয়া।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মালবী বলল, 'এর মধ্যে একদিন পিসিমার কাছে নিয়ে যাবে?'

'কেন!'

মালবী এড়িয়ে গেল; গভীর ও আড়াল-করা, এখন আবার নিজের মতো হয়ে উঠছে। রাস্তায় এসে বলল, 'বললে রাগ করবে, আমার কিন্তু তোমার বাবার কাছেও যেতে ইচ্ছে করে। প্রায়ই মনে হয়, ঘটনাটা খারাপ, তবু সেদিন ঘটনাটা না ঘটলে তুমি কি আসতে ঝাউতলার বাড়িতে। তুমি হয়তো বলবে কোইনসিডেন্স!'

অপূর্ব জবাব দিল না। রোদ্দুরে মিশে যাওয়া হাওয়া কাড়াকাড়ি করছে তাপ নিয়ে, কখনও বা পিছলে যাচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে। ঘাড় তুলে আকাশ দেখতে গিয়ে দেখল, তিনতলার জানলা থেকে একদৃষ্টিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছেন গায়ত্রী। সাদা অ্যামবাসাডরের পিছনের সিটে বসে বিমলকৃষ্ণের মতো একটি লোক, দৃষ্টি তারই দিকে। মা বেঁচে থাকলেও কি এসব হত। তাহলে মা'র মৃত্যুও হঠাৎ-ঘটা ঘটনা। তখন বলল, 'হ্যাঁ, কোইনসিডেন্সই। এরকম কাকতালীয় ঘটনা হামেশাই ঘটছে। তার আগে ঝাউতলার বাড়িতে তুমি আসবে বলে তোমার বাবা-মাকে হরিদ্বারে পাঠাতে হয়েছিল—'

'আ-রে! অদ্ভুত তো!' বাস স্টপের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। মালবী বলল, 'এতও মনে আছে তোমার!'

বাস এল এবং চলে গেল। চলে যাবার পর খেয়াল হল মালবীর ছেড়ে যাওয়া জায়গায় এখন অন্য লোক—ময়লা ধুতি ও সার্ট পরা, গালে পোড়া-পোড়া দাগ, হাতের চটের থলি থেকে উঁকি দিচ্ছে করাতের মতো কী একটা। সম্ভবত ছুতোর। সরে এসে, উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসা ট্রামটাকে দেখতে দেখতে রাস্তা পার হল অপূর্ব। এখন তার কাজ নেই কোনও। তবে যাবার জায়গা আছে চারদিকে, এই ট্রাম এসপ্ল্যানেড অব্দি যাবে, সেই পর্যন্ত, অন্য কোথায়ও। উঠে পড়ল। অফিসের ভিড় শুরু হতে দেরি আছে এখনও। বসবার জায়গায়ও পেল।

রোদে ঝকমক করছে যাওয়া। তাপহীন আলো এসে পড়েছে ট্রামেরও ভিতরে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে স্মৃতি। আরও একটু এগোলে ডানদিকে ঝাউতলা, বাঁদিকে পার্কসার্কাস বাজার, বেকবাগান। মালবীর কথা ধরে নিলে এই তাদের ভালবাসায় পৌঁছুনোর রাস্তা। যেখানে পৌঁছুবে সেখানে গুনগুন করে মশা, ঝুপ করে নেমে আসে মশারি।

স্মৃতিই ধরে রাখে।

'তুই কী রে! একেবারে ম্যাদা মেরে গেছিস!' শৌনিক বলল, 'আমার বাড়িতে বসে প্রেম করলি আমারই বোনের সঙ্গে, আবার জিজ্ঞেস করছিস, তোদের বিয়েতে সাক্ষী দেব কি না। বলিস তো পুরো দল নিয়ে গিয়ে সাক্ষী দেওয়াব। বক্তৃতা করতে হবে না কি?'

তাড়া ছিল শৌনিকের, অজয়কে দেখতে যাবে হাসপাতালে। নিজেকে স্বার্থপর লাগায় শৌনিকেরই সঙ্গ ধরে চলে গিয়েছিল নীলরতন। শৌনিকই বলল, বাঁ পা-টা বাঁচানো যায়নি

অজয়ের। কেটে বাদ দিয়েছে হাঁটুর তলা থেকে। এরপর ক্রাচ নিয়ে হাঁটবে।

চারদিকের ওষুধ-ওষুধ গন্ধের মধ্যে একা বেঞ্চিতে বসে আছে সুদেষ্ণা। শৌনিককে দেখে উঠে এল।

'রাত্রে খবর নিয়েছিলাম। ভালই তো আছে।'

'এই কি ভাল থাকা!' সুদেষ্ণা হঠাৎই ভেঙে পড়ল, 'কেন এমন হল, শৌনিক। তুমি বল, কেন এমন হল। আমার জন্যে। আমার পাপে।'

অপূর্ব দেখল, বুক চওড়া করে সুদেষ্ণার সেই ভয়ঙ্কর হাহাকারে ভরা মুখটা নিজের বুকে টেনে নিচ্ছে শৌনিক, 'ভেঙে পোড়ো না। ভেবে দ্যাখো তো, ওর বেঁচে থাকাটাই জরুরি ছিল কিনা।'

হ্যাঁ, ছিল। দৃশ্য থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে অপূর্ব ভেবেছিল, অজয়ের মৃত্যুজনিত শূন্যতা হয়তো গান কেড়ে নিত ওর গলা থেকে। শুধু বুঝতে পারেনি, কোন পাপের কথা বলল সুদেষ্ণা। কেন।

সামনেই পার্ক স্ট্রিট। এখানে নেমে কবরখানার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে দিব্যি চলে যাওয়া যায় অ্যাকশন গ্রুপের অফিসে। কাল মিসেস সান্যালকে ফোন করে জেনেছিল দুটো চেক রেডি আছে, গেলেই পাবে। টাকাটা দরকার। দেখতে দেখতে চলে এল অনেকটা, এই সাতটা দিনও দেখতে দেখতেই যাবে। অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের করপোরেট ক্যাম্পেনটা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই থ্রু হয়ে গিয়েছিল, এরকম উচ্ছ্বাস এর আগে কখনও লক্ষ করেনি অপরেশের মধ্যে। একাই গিয়েছিল প্রেজেন্ট করতে, ওরা অপেক্ষা করছিল, ফিরে এল টাই আলগা করে, পরিচ্ছন্ন হাসিতে মুখ ভাসিয়ে। শুধু ক্যাম্পেনই নয়, পুরো বাজেটও অ্যাপ্রুভ করে দিয়েছে, 'ফর অ্যারেঞ্জিং ইমিডিয়েট রিলিজ।' তখন সবাই নেচে উঠল। অনেক দিন পরে কনফিডেন্স ফিরে পাবার মতো একটা উপলক্ষ পেয়েছে অ্যাকশন গ্রুপ—'মনোজ, হোয়াই ডোন্ট ইউ অর্গানাইজ সাম বিয়ার? অপূর্ব আছে, আই অলসো উইল জয়েন ইউ।' আলাদা করে তাকে চেম্বারে ডেকে নিয়ে গিয়ে অপরেশ বলল, 'দ্য ক্রেডিট গোজ টু ইউ, অপূর্ব। ফর দ্য ব্রিলিয়ান্ট কপি। এই কাজটার জন্যে তোমাকে আমি ব্ল্যাঙ্ক চেক দেব। কী নেবে বলো?'

কৃতজ্ঞতা ছিলই, সাফল্যই এনে দিল ঔদার্য। 'জাস্ট ইওর ব্লেসিংস', বলেছিল। অপরেশের ঘর থেকে বেরুবার সময় তবু মনে পড়েছিল সীতা নেই।

নামল না। এখনই অ্যাকশন গ্রুপে যাওয়া আর্লি হয়ে যাবে একটু, অন্তত অপরেশের সঙ্গে দেখা হবে কি না ঠিক নেই। শুধু চেক নেওয়াই নয়; বিয়ের খবরটাও দিতে হবে অপরেশকে, অন্যদেরও বলতে পারে। উই ক্যান হ্যাভ অ্যান ইভনিং টুগেদার, ইয়েস; সে এখন কোথাও নেই, এটাই ঠিক; থাকলে অ্যাকশন গ্রুপেই আছে। বরং এসপ্ল্যানেডে পৌঁছে কফি খেয়ে নেবে কোথাও। খিদেও পাচ্ছে। তারপর যাবে।

স্মৃতি এক এক ভাবে দেখায়। আজও বুঝতে পারেনি সীতা কেন ছেড়ে দিল অ্যাকশন গ্রুপ। সেদিন অপরেশের সঙ্গে লাঞ্চ সেরে ফিরে এসে দেখেছিল সীতার ঘর ফাঁকা। কেউই বলতে পারল না কোথায়। চার কি পাঁচদিন পরে অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজের কপি নিয়ে আবার দেখা করতে গিয়েছিল অপরেশের সঙ্গে। অপরেশই বলল, 'হ্যাঁ, ও ছেড়েই গেছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ অ্যাকসেপটেড হার রেজিগনেশন।'

'বাট হোয়াই!'

'হোয়াই নট।' অপরেশ আদৌ উত্তেজিত নয়। তার পরে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'এখন নিজেই এজেন্সি খুলবে। হাতে রেডি বিজনেস আছে, এনটায়ার বিউটি প্রোডাক্টস অ্যাকাউন্ট, অ্যান্ড দ্য ব্লেসিংস অফ লাডলীমোহন। শুভেচ্ছা, টাকা, সীতা যা চাইবে। মে বি, অন্য বিজনেসও পেতে পারে। তুমিই তো বলছিলে ওর কানেকশানস আছে—'

কথার ইঙ্গিত ধরতে পারলেও ঘটনাটা তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না অপূর্ব। সুতরাং চুপ করে থাকল।

'কেন, তোমাকে অ্যাপ্রোচ করেনি এখনও?'

'হোয়াট ড্যু ইউ মিন।'

'করতে পারে। মনোজকে অলরেডি কবেছে, মিডিয়ার সুশান্তকেও—'

বুকের মধ্যে হঠাৎই ফিরে এল সীতার ঘর, একটি শালিকের উড়ে আসা এবং উড়ে যাওযা। অপূর্বর মনে হয়েছিল, হলেও হতে পারে। অপবেশের কথার ভিতরের চাপা ক্ষোভটুকু বাদ দিলে যা ধরা পড়বে তার নাম ট্যালেন্ট। সীতা কি এখানেও প্রমাণ করেনি নিজেকে?

'আই হ্যাভ মেড আ মিসটেক।' অপরেশ হঠাৎ বলল, 'আই কুডনট ফরগেট হার পাস্ট। ওর অতীতই আমাকে দুর্বল করে দিত। তুমি বোধহয় জানো, ওর হাসব্যান্ড, রমেন চৌধুরী—এখন মারা গেছে অবশ্য, ডিভোর্সও হয়ে গিয়েছিল—একসময় আমার কোলিগ ছিল গিলবার্ট মরিসনে। একটা ওবলিগেশন ফিল করতাম—'

বলতে বলতেই আবেগ প্রচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল অপরেশের গলায়, এর বেশি বলেনি। অপূর্বও জানতে চায়নি। পরে মনোজের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল, সীতা বিউটি প্রোডাক্টসেই বসছে, এখন অপারেটরকে নাম বললে পাবে। বস্তুত, অপূর্বর মনে হয়েছিল, যা শুনেছে তার মধ্যেও খাদ আছে কোথাও, সীতা হয়তো অন্য কিছু বলবে। তা ছাড়া তাব কী, ঠিকঠাক ভাবলে সে তো অ্যাকশন গ্রুপেরও কেউ নয় এখন, যা ব্যক্তিগত এবং ভাল লাগার, তা নষ্ট করবে কেন! তখন ফোন করে।

'তোমাকেই জানাইনি শুধু।' অপ্রস্তুত আনন্দে জড়ানো গলা সীতার, তখনও কাঁপছে, বলল, 'কী করে জানাব! তোমার তো ফোন নেই!'

'দ্যাটস বিকজ আই অ্যাম অর্ডিনারি।' অপূর্বও ছাড়ল না, 'ফোন না থাকলেও অ্যাডড্রেস আছে একটা! একদিন নিজেই খুঁজে গিয়েছিলে!'

সীতা চুপ করে থাকল।

অপূর্ব বলল, 'সে সামথিং!'

'তুমি আসতে পারো না?' সীতা বলল , 'এসো না! যে-কোনও দিন, সন্ধেবেলা। তুমি তো জানোই আমি একাই থাকি।'

'দেখি—'

'বাবলু একদিন তোমার কথা বলছিল—', সীতা বলল, 'আসবার আগে ফোন করবে? তাহলে ব্যবস্থা করে রাখব। বলেছিলাম না খাওয়াব একদিন!'

'দেখি।'

ভুল একটাই করেছিল; ওয়েলেসলি পেরিয়ে ট্রামটা মোড় ঘুরছে ধর্মতলা স্ট্রিটে, সার্কাসের হোর্ডিংয়ের দিকে তাকিয়ে অপূর্ব ভাবল, ফোন করেনি। অত ফর্মালিটির কী আছে! কয়েকদিন পরে, হঠাৎ ইচ্ছে থেকে, সন্ধে পার করে যখন সে সত্যিই বিডন স্ট্রিটে;

আর একটু এগোলেই সীতার ফ্ল্যাট, বার বার মনে পড়ছে ফোন করার কথা; তখন আর একটা কথাও ভেবেছিল, কী আর হবে। যদি না থাকে কোনও কারণে, ফিরেই আসবে। বরং ফিরে আসার কথাটাই বলতে পারবে ফোনে। এই ভেবে সে একতলা থেকে দোতলায় উঠল এবং সীতার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে বেল দিল দরজায়।

দরজাও খুলল। সীতা নয়, অপূর্ব দেখল, আয়া মতন একজন, বয়স্ক হলেও আঁটো, পাহাড়ি-পাহাড়ি চেহারা। আগের দিন দ্যাখেনি। জিজ্ঞেস করতে বলল, 'দিদি এখন ব্যস্ত। নাম কী?'

অপূর্ব নাম বলতে যাচ্ছিল; তার আগেই সীতা এল এবং স্তম্ভিত চোখে ক'মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আজই এলে!'

'কেন! আসতে বলোনি!'

'না, অপূর্ব। ইটস নট দ্যাট—'

অপূর্ব সীতাকেই দেখছে। কালো সিলকে জড়ানো শরীরে ও মুখের সৌন্দর্যে খাদ নেই কোনও। মনে হয় যতটা না সাজলেও চলে তার চেয়ে বেশি সেজেছে, পারফিউমের গন্ধ ছড়াচ্ছে শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে। চোখে শঙ্কা না থাকলে এই সীতা লোভই দেখায়। দেখতে দেখতেই লক্ষ করল, মেক-আপের নীচে কোথাও একটু ক্লান্তিও রয়েছে, লোভও যা আড়াল করতে পারে না।

'আর ইউ আনওয়েল?'

'না। কেন!' বিব্রত গলায় সীতা বলল, 'আজ ক'জনকে ডেকেছি। বিজনেস ফ্রেন্ডস। তুমি এমব্যারাসড ফিল করতে পারো—'

অপূর্ব চুপ করেই থাকল।

সীতা এগিয়ে এল। হঠাৎই ওর হাত চেপে ধরে বলল, 'কাল আসবে? এসো না। আমি একাই থাকব।'

'ও-কে। আই আন্ডারস্ট্যান্ড। ঠিক আছে।'

আর দাঁড়ায়নি। নীচে এসে, ভাবনা তখন এলোমেলো, ভাবতেই হয়েছিল এরপর কোথায়? তখনই চোখে পড়ে দু'দিকের ফুটপাথের গা ঘেঁষে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দাঁড়ানো তিন চারটে গাড়ির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে একটা সাদা অ্যামবাসাডারও। অন্ধকার একপেশে হয়ে থাকলেও নাম্বার প্লেটের শেষের দুটি সংখ্যাই বুঝিয়ে দিল অনুমানে ভুল হয়নি কোনও। সীতা ঠিকই বলেছে, সে অপ্রস্তুত বোধ করত।

তখন যে-কোনও দিকেই ফেরা যায়। অপমান, অভিমান, রাগ, ঘৃণা—একসঙ্গে এতগুলো আলোড়ন কী ভাবিয়েছিল মনে নেই। শুধু এটুকু মনে পড়ে, শারীরিক অস্বস্তি থেকে ওয়াক তুলে, রাস্তার ধারেই বসে পড়ে, সেদিন, অনর্গল বমি করেছিল সে।

কেন, তা বুঝতে পারে না আজও।

ছেড়ে- যাওয়া ট্রাম যেদিকে যায়, মাথার ভিতরে শুধু রেখে যায় শব্দ, সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে অপূর্ব ভাবল, সত্যিই কি কোনও মানে ছিল তার এমন অদ্ভুত ব্যবহারের! সীতার প্রত্যাখ্যান? নাকি অন্য কিছু? মানুষই মানুষের কাছে যায়, হয়তো প্রতিটি যাওয়ার পিছনেই থাকে আলাদা আলাদা অর্থ। সে কী জানে। সেও তো গিয়েছিল, তাহলে বিমলকৃষ্ণের যাওয়া তাকে এমন উদভ্রান্ত করেছিল কেন!

জানুয়ারির গোড়ায় একদিন দুপুরে টিপটিপ বৃষ্টি নামল হঠাৎ। থামতে থামতে সন্ধে। কলকাতা কুঁকড়ে উঠল শীতে। দূরাগত হাওয়ায় হিম জড়ানো, মুখ পাতলে ফাল ফাল হতে চায় ত্বক, নিঃশ্বাসে মিশে যায় জোলো গন্ধ। লোকজন কমে এল রাস্তায়; চারদিকের আবহে যেন কার্ফুর স্তব্ধতা। এসবের মধ্যে দিয়ে প্রায় ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরল অপূর্ব। গায়ে মালবীর দেওয়া সেই সোয়েটার, সেটাও ভিজেছে; হাতে খাবারের বাক্স।

'কাবাব এনেছি, আর পরোটা।' অপূর্ব বলল, 'আজ তোমাকে রান্নাটান্না করতে হবে না। বাপস, বাপের জন্মে এমন শীত দেখিনি। আজ তাড়াতাড়ি শোবো।'

প্যাকেট খুলে কী এনেছে না এনেছে দেখতে দেখতে মালবী ঠাট্টা করল, 'সেই উপলক্ষেই খাবার নাকি!'

আড়ে তাকিয়ে অপূর্ব দেখল, বলার টানেই কেমন কথার মানে পাল্টে দেয় মালবী, এত চেনার মধ্যেও চট করে এনে ফেলে রহস্য।

ততদিনে অল্প একটু পুরনো হয়ে গেছে তারা; জানে কিসে কী হয়, আর কেমন করে। ডিসেম্বরের টানা ছুটির পরে কলেজ থেকে আরও দিন দশেকের বাড়তি ছুটি নিয়ে তাদের ছোট ফ্ল্যাটটাকে যতটা সম্ভব সংসার করে তুলেছে মালবী। আজ বিকেলে, অপূর্ব তখন বাড়ি নেই, বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার মনে পড়েছিল যাদবপুরে সেন্ট্রাল পার্কের বাড়িতে নতুন কুঁড়ির গোলাপ গাছগুলো ভিজবে। অসময়ের বৃষ্টি, ভাল কি মন্দ জানা নেই।

সেদিন রাতটা এল চাপা ভয়ের মতো। শীত ভিতরেও। অন্ধকারে শরীরের আহ্লাদে ছেড়ে যাওয়া বীজের সংক্রমণ অনুভব করতে করতে অবসাদে চোখ জড়ানো, মালবী হঠাৎ শুনল খুব দূর দিয়ে চলে যাচ্ছে অস্পষ্ট ট্রেনের শব্দ। ডাকতে ডাকতেই থেমে গেল কয়েকটা কুকুর। তারপরের স্তব্ধতায় কান রেখে লেপটা আরও ভাল করে জড়িয়ে মালবী টের পেল অপূর্বর নিঃশ্বাসে কী যেন আছে কী যেন নেই ভাব, পড়ছে থেমে থেমে। বিয়ে মানুষকে স্বামী কিংবা স্ত্রী করে দেয়—তাতে অপূর্ব কিংবা মালবী কীভাবে বদলাল বুঝতে পারে না; এই মুহূর্তে তবু স্বামী কথাটা বড়ই ভালবাসায় জড়ানো মনে হয়। তখন পাশ ফিরে, চিৎ হয়ে শোওয়া অপূর্বর বুকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে হাত বোলাল সে, তারপর সেখানে নিজের চিবুক পেতে ডাকল, 'অপু!'

ঘুম থেকে সাড়া দিল অপূর্ব, 'বলো, শুনছি।'

'একটা শব্দ চলে গেল শুনলে?'

'ট্রেনের। কিছু লোক এই সময় বাড়ি ফেরে।। আমি রোজই শুনি।'

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে মালবী বলল, 'তুমি কি বরাবরই এরকম ছিলে?'

'কীরকম!'

'তুমিও জানো না। আমি দেখেছি—হঠাৎ-হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যাও কেমন, কী যে ভাবো, বুঝতে পারি না।'

'কী আর ভাবব!' নড়ে শুয়ে লেপটা নিজেদের গায়ে ভালভাবে জড়িয়ে নিল অপূর্ব। মালবীর কপালে কপাল ছুঁইয়ে বলল, 'সকলেই কিছু না কিছু ভাবে। সারাক্ষণ। তুমি ভাবো না!'

'কী ভাবব।'

'এই, সাতপাঁচ! ট্রেনের শব্দ। তারপর আমি আগেও এরকম ছিলাম কি না, কিংবা মানুষ কাবাব কিনে বাড়ি ফেরে কেন—।'

'তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।'

'না—'

দুই স্তনের মাঝখানে অপূর্বর মাথাটা টেনে নিয়ে ঘন হয়ে এল মালবী।

'তোমার কি এখনও একা লাগে, অপু?'

'কেন।'

'জানি না। মনে হল।' ক'মুহূর্তের নৈঃশব্দ্য রেখে মালবী বলল, 'এই যে বিয়ে হয়ে গেল আমাদের—, বিয়ে মানুষকে কী দেয়?'

'কেন, এখন যা দিচ্ছে! পরেও কিছু দেবে হয়তো। জানি না।'

'তুমি কী ভাবো, বলো না কেন?'

অপূর্ব হেসে বলল, 'ভাবনা কি একটা! কখন কী ভাবি পরে আর মনে থাকে না। তবে অদ্ভুত অদ্ভুত সব কথা মনে হয়।'

জানলার যেটুকু খোলা ও পর্দায় ঢাকা, তারই মধ্যে দিয়ে ভেসে আসছে বাইরের শীত ও স্তব্ধতা। ককিয়ে কাঁদছে তিনতলার বাচ্চাটা। সেই শব্দে কান রেখে আরও একটু জড়িয়ে এল মালবী। অপূর্বর নিঃশ্বাস পালকের মতো হালকা ছোঁয়া বুলিয়ে যাচ্ছে বুকে। বিয়ের আগেই তার পীড়াপীড়িতে দাড়িটা কামিয়ে ফেলেছিল, তবু সারা দিনে যা জমে চিবুক থেকে তার খসখসে স্পর্শ মনে করিয়ে দিচ্ছে এগুলোও পাওয়া—জীবন বদলে গেছে, এরকম আরও অনেক অনুভূতি নিয়ে যাচ্ছেও হয়তো। অপূর্ব যেমন বলল, পরে কী ঘটবে সে নিজেও কি জানে! এসব ভেবে নিঃশ্বাস সামলাল মালবী এবং বলল, 'সবই কি আর ভুলে যাও?'

'তোমার ঘুম পাচ্ছে না?'

'পাবে। স্বার্থপর! খাওয়া, বৌকে নিয়ে শোওয়া, তারপরেই ঘুম!'

অপূর্বর হাই উঠল। মাথার চুলে মালবীর বিলিকাটা হাত। ইতস্তত সেই স্পর্শ অনুভব করতে করতে বলল, 'এই যে ট্রেনটা চলে গেল, এটা সত্যি। কিন্তু, মাঝে মাঝে মনে হয়, এই যাওয়ার শব্দটা কী যেন বোঝায়! ওই ট্রেনে কেউ একজন বসে আছে যার সত্যি-সত্যিই যাবার জায়গা নেই কোনও, খুবই করুণ মুখ, তবু যেতে হচ্ছে। তখন ভাবলাম, ট্রেন পৌঁছুবেই, কিন্তু স্টেশনে নেমে কোনদিকে যাবে সে?'

'সত্যিই এইসব ভাবো! না বানিয়ে বলছ!'

'বানাব কেন! তারপর ধরো, একটু আগে ওপরের বাচ্চাটা যখন কাঁদছিল, মনে হল ডিকিরও তো এতদিনে বাচ্চা হয়ে যাবার কথা। তখন দেখলাম, আইজলের বাজারের রাস্তায় বাচ্চা কোলে দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করছে ডিকি। চুংগা নামে যে-লোকটার কথা লিখেছিলাম সে আর ফেরেনি। অথচ, আমার লেখাটা পড়ে সবাই বলল ফানি, হিলারিয়াস!'

বিলি-কাটা হাতে হঠাৎই স্তব্ধতা এসে গেল মালবীর।

'যা অদৃশ্য তার জন্যে এত ভাবনা কেন! এমনও তো হতে পারে—এরপর যদি কখনও যাও ওখানে— দেখবে, সেই চুংগা না কী, সে বসে আছে ছেলে কোলে করে, আর ডিকি তোমাকে চা এনে দিচ্ছে।'

অপূর্ব সাড়া দিল না। শৌনিকের দেওয়া ঘড়ি টুং-টাং শব্দ করে প্রতি ঘণ্টায়। এখনও করছে। সময় নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাও হতে পারে। ভাবছি একটা উপন্যাস লিখব—এইসব নিয়ে। আমাদেরই নিয়ে। তাতে আবার আইজলে যাব, তুমি যেভাবে বললে, সেইভাবে—'

'বুঝেছি। আবার আমার ঝামেলা বাড়বে।'

'না। বাড়বে না।' অপূর্ব আবার পাশে ফিরল, চকিতে চুমু খেল মালবীকে, 'আবার আমাদের বিয়ে হবে—'

'লিখো। আস্তে আস্তে।' যেন সত্যি-সত্যিই উপন্যাসের কিংবা নাটকের দুটি চরিত্র তারা, গলায় গভীরতা এনে মালবী বলল, 'আরও কোনও কোনও চরিত্রও আসতে পারে। তাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো।'

কথার শেষে হাই উঠল মালবীরও। মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, 'শুয়ে পড়ো। যা শীত! একটু আগে জানলা বন্ধ করতে গিয়ে দেখলাম থিকথিক করছে কুয়াশা! বোধহয় বৃষ্টিও পড়ছে—'

আরও একটা দিন বয়স বেড়ে গেল তাদের। এই নতুন সম্পর্কেরও।

দিন যায়। যেতে যেতেও আবার নতুন করে ফিরে আসে শীতের হাওয়া। তবে বোঝা যায় দিন বড় হচ্ছে ক্রমশ।

ভোর-ভোর ঘুম ভেঙে যায় মালবীর। চা করে ডেকে তোলে অপূর্বকে। কাগজ পড়তে পড়তেই সংসারের শব্দ শুনতে পায় অপূর্ব, রাস্তার শব্দও; কলেজে বেরুবার আগে যতটা পারে নিজেকে গুছিয়ে নিচ্ছে মালবী। এখন বীণাদি আর ওয়ার্নিং দেয় না। বেল পড়লে বোঝা যায়, বীণাদিই এসেছে।

সকালে শীত থাকলেও আগেকার মতো তীব্র নয়। রোদ উঠেছে হালকা। দরজায় বেল পড়তে কাগজ থেকে চোখ তুলে ঘড়ির দিকে তাকাল অপূর্ব। সাতটা পঁয়ত্রিশ, বীণাদিই হবে। তখন আবার ঝুঁকে পড়ল কাগজে।

'এই শোনো।' ব্যস্তভাবে ঘরে ঢুকে মালবী বলল, 'দ্যাখো তো, মনোজদা এসেছেন। তোমাকে এক্ষুনি ডাকছেন।'

'মনোজ! হঠাৎ!'

পাজামার দড়িটা টাইট করে বাঁধতে বাঁধতে তাড়াতাড়ি লিভিং রুমে বেরিয়ে এল অপূর্ব। মনোজ দাঁড়িয়ে। হাতে সিগারেট, অপরিচ্ছন্ন গাল, মুখ গম্ভীর।

'কী ব্যাপার! বোসো!'

'না। বসব না।' মনোজ বলল, 'একটা খারাপ খবর দিতে এলাম তোমাকে। মিসেস চৌধুরী মারা গেছেন—'

ততক্ষণে মালবীও এসে দাঁড়িয়েছে পাশে। স্তম্ভিত, অবিশ্বাসের গলায় অপূর্ব বলল, 'কী বলছ!'

'হ্যাঁ, সীতাই!' খবর পৌঁছে দেবার দায় সম্ভবত ভার সৃষ্টি করেছিল মনোজের বুকে, সেটা নামিয়ে দিয়ে ধাতস্থ করল নিজেকে। বলল, 'মিস্টিরিয়াস ডেথ। রেড রোডের কাছে কোথাও—ওর সেই ফিয়াট নিয়ে ধাক্কা মেরেছে গাছে—'

অপূর্বর চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নিল মনোজ। সিগারেটে টান দিতে গিয়ে দেখল নিভে গেছে। আচরণে ইতস্তত; বসবে না বলেও বসে পড়ল। দেশলাই জ্বেলে, নিভে যাওয়া

সিগারেটটা আবার ধরিয়ে নিয়ে বলল, 'বডি পি-জি'তে। গাড়িতে একাই ছিল। কখন হল কেউ জানে না, তবে পুলিশ বলছে শেষ রাতে—'

অপূর্বর দৃষ্টি মনোজের সিগারেট থেকে উড়ে আসা ধোঁয়ায়। ধোঁয়াটা ক্রমশ এগিয়ে আসতে লাগল তার চোখের দিকে।

'মিস্টার গুপ্ত তোমাকে জানাতে বললেন। মিসেস চৌধুরীর ব্যাগে টেলিফোন বুক ছিল, সেখান থেকেই নাম্বার নিয়ে পুলিশ ফোন করেছিল ওঁকে। আমি হসপিট্যাল থেকেই আসছি।' মনোজ আবার সিগারেটে টান দিল, শীতের হাওযাতেই সম্ভবত আগুনটা নিভে গেছে আবার। তখন অস্বস্তিতে পোড়া টুকরোটা, অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে বলল, 'যাবে তো? ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে রেখেছি—'

হ্যাঁ কিংবা না, কিছুই বলল না অপূর্ব। মুখ দেখে বোঝা যায় না মনোজের দেওয়া এতগুলো খবরের মধ্যে ঠিক কোনটার পর সে আর এগোয়নি। অন্যমনস্কতা নিয়ে সে তাকাল দূরে, যতটা দেখা যায়, আকাশের অপরিমেয়তায় যেখানে অনিশ্চিত হয়ে আছে শীতের রোদ। তারপর আস্তে আস্তে হেঁটে গেল বেডরুমের দিকে; ওই ব্যালকনিটাও নতুন। আকাশটাও। স্মৃতি যা চেনায় তার সঙ্গে দৃশ্যের সম্পর্ক নেই কোনও; সম্পর্ক নেই বোধ কিংবা অনুভূতিরও। অবিশ্বাসকে ঠেকা দিয়ে রেখেছে বাস্তব। একটি মেরুন শাড়ি তবু ঘুরে বেড়াচ্ছে আশপাশ দিয়ে। চারদিকে অদ্ভুত সুগন্ধ। 'তুমি একটু ভালবাসো, অপূর্ব।' দুকানের পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে চেপে ধরেছে মাথা, দশটি আঙুলের সমগ্রতায় ফুটে উঠেছে ভাষা, 'অনেকদিন কেউ আমাকে ভালবাসেনি!' তার আগে তুলনা করেছিল বাবলুর সঙ্গে। একদিন একাই থাকতে চেয়েছিল; ভাল লাগে বলে? 'খুব ইচ্ছে করছে আসতে?' গাড়িটা চলে যাবার পর মনে হয়েছিল সাবধানী নয়। তাহলে কি নিজেই গেল।

একটা আবেগ আসতে আসতেও ফিরে গেল। অভ্যাসবশত আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঝাপসা, ঝটপট নিজেকে তৈরি করতে করতেই অপূর্ব অনুভব করল, আবার আসছে— ল্যান্ডিংয়ের সিগন্যাল না পেয়ে উড়োজাহাজ যেভাবে ঘুরে বেড়ায় আকাশের শূন্যতায়, যায় এবং ফিরে আসে, আবার ফিরে যেতে। ঠোঁটে দাঁতের চাপ দিয়ে অপূর্ব বলল, নো, ইউ নেভার ডিজার্ভড ইট! নৈঃশব্দ্য নেমে গেল বুকের দিকে।

এই অপূর্ব অপরিচিত। ওকে লক্ষ করতে করতে মালবী বলল, 'চলো। আমিও যাব।'

এমন হাওয়ায় শান দেওয়া যায় ছুরিতে। ফ্ল্যাটের ভিতরে থাকতে এতটা টের পাওয়া যায়নি। হাওয়ার বিরুদ্ধে ছোটার জন্যেও হতে পারে। সামনে, ড্রাইভারের পাশে, মনোজ, পিছনে দুজনে। অপূর্ব বলল, 'মনোজ, একটা সিগারেট দাও তো?'

'তুমি! খাবে!'

মালবী দেখল, সিগারেট উঠছে অপূর্বর অনভ্যস্ত ঠোঁটে। তখন জিজ্ঞেস করল, 'ওর ছেলে? সে কি জানে?'

'খবর নিশ্চয়ই গেছে—।' আরও কিছুটা এগিয়ে মনোজ বলল, 'হসপিট্যাল থেকে বেরিয়ে আমি যখন ট্যাক্সি খুঁজছি, মনে হল তোমার বাবাকে যেতে দেখলাম—'

অপূর্ব বলল না কিছু। মালবী তার দিকে তাকাতে চোখ ফিরিয়ে নিল।

'মনে হয় স্টিয়ারিংয়ের ধাক্কাতেই গেছে।' মনোজ বলল, 'ফেস দেখে মনে হয় না কিছু হয়েছিল—'

'আমি শুধু ওর ছেলেটার কথা ভাবছি।' মালবী নিজেও রাস্তা দেখছে। বলল, 'আচ্ছা, ওর কেউ নেই যে দায়িত্ব নিতে পারে?'

'গড নোজ।'

সিগারেটটা শক্ত করে চেপে ধরল অপূর্ব। ধোঁয়া টানতেই জ্বালা খরখর করে উঠল গলায়। নিঃশ্বাস জড়ানো। সেই একই অনুভূতি; মাথা থেকে বুকে, কখনও বা চোখে—আসছে এবং ফিরে যাচ্ছে। মনে পড়া মেলায় না কোথাও।

প্রত্যাখ্যাত, ফ্ল্যাটের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার 'ঠিক আছে' বলায় কি প্রতিজ্ঞা ছিল, নাকি ঘৃণা?

রেজিস্ট্রি হয়ে যাবার ক'দিন পরে গ্র্যান্ডের গার্ডেন কাফেতে পার্টি দিল অপরেশ। বীথি ছিল, সুজাতাও; সঙ্গে অফিসের ক'জন। বীথি কী? হ্যাঁ, বীথিই দেখেছিল আগে, তারপর পিছন ফিরে সে, মালবী এবং ক্রমশ অন্যরাও। কাফের কাচের দরজা ঠেলে বিমলকৃষ্ণের সঙ্গে ভিতরে ঢুকেছে সীতা। মেরুন কালো হয়, তারপর সবুজ; সৌন্দর্যই জানে কীভাবে সাজলে অহঙ্কার ধরা পড়ে। উল্টোদিকে বলেই এদিকে তাকানোর কথা নয়। পাশাপাশি হেঁটে গেল দূরের টেবিলে।

কোইনসিডেন্স? অপরেশ অন্তত তাই বলেছিল। ক্রোধে এবং কুণ্ঠায় তখন ছোট হয়ে যাচ্ছে অপূর্ব; তাকে সহজ করার জন্যেই সম্ভবত, বলল, 'কোইনসিডেন্স ছাড়া আর কী! আই নো সি কামস হিয়ার ভেরি অফন। আমার সঙ্গেও এসেছে—'

তখন এবং আস্তে আস্তে, সবাই চলে গেল অন্য কথায়।

হাজরা মোড়ের ট্রাফিক পেরিয়ে দ্রুত হরিশ মুখার্জি রোডে বাঁক নিল ট্যাক্সিটা। কে দিয়েছে এত জোরে চালাবার নির্দেশ!

সীতা হঠাৎই উঠে এল তাদের টেবিলে।

'হাই অপরেশ!'

'হাই! কাম, জয়েন আস—'

'নো, থ্যাঙ্কস! বীথি, কেমন আছ?'

'তুমি?'

'খুব ভাল। দেখে মনে হচ্ছে না!'

খাবারের প্লেটে হাত থেমে গিয়েছিল আগেই। চোখ নামানো। সীতা বলল, 'আমাকে চিনতে পারছ না, অপূর্ব!'

'ইয়েস! হোয়াই নট! ইউ লুক গরজাস!' সামলে নিয়ে, সে কি বলেছিল?

'বিয়ে করেছ শুনেছিলাম। তোমার বউ দেখতে এলাম।' সীতা মালবীকেই দেখছিল, অদ্ভুত সম্পন্ন সেই দৃষ্টি; দেখতে দেখতেই বলল, 'বাঃ! ভারী সুইট তো!'

যেমন এসেছিল, তেমনিই চলে গেল আবার। আরও কি বলেছিল কিছু? সেই মুহূর্তের মানসিকতা ধরে রাখার চেয়ে ফেলে দেওয়াতেই ব্যস্ত ছিল বেশি। তবে, মনে আছে, বীথি বলেছিল, 'সিঁদুর দেখলাম যেন! বিয়ে করেছে নাকি?'

'তুমি একটু বেশি দ্যাখো!' অপরেশ অপ্রস্তুত, সামান্য বিরক্তও, 'আমি তো কিছুই দেখলাম না!'

'ইয়েস অ্যান্ড নো!' মনোজ বলেছিল, 'ওটা মেক-আপও হতে পারে। অ্যাকটিংটা ভালই

করে গেলেন।'

নিঃশ্বাসে জড়িয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। সামনে গোল-গলার রঙিন পুলওভারের ওপর চকচক করছে মনোজের ঘাড়ের সাদা অংশ। দুই আঙুলের ভাঁজে প্রায় শেষ হয়ে আসা সিগারেটের আগুনটা দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবল, সেদিন তার নিজের ব্যবহারেও কম অভিনয় ছিল না। ফেরার সময় একান্ত, মালবী বলল, 'অপু, তুমি সীতা চৌধুরীকে নিয়েই ভাবছ। একবারও অন্তত আমাকে নিয়ে যেতে পারতে তোমার বাবার কাছে! কীরকম সম্পর্ক তোমাদের! আমার এত অস্বস্তি লাগছিল!'

'পারতাম হয়তো। আমারও মনে হয়েছিল—', অপূর্ব বলল, 'জানি না। বাবা একটা শব্দ, সম্পর্কটা হয়তো ওইখানেই থেমে গেছে!'

এমারজেন্সি ওয়ার্ডের সামনের খোলা জায়গায় ট্যাক্সিটা দাঁড় করাল মনোজ। এরই মধ্যে ভিড় শুরু হয়ে গেছে ওয়ার্ডে। শীতের হাওয়ায় এলোমেলো উড়ছে কিছু শুকনো পাতা, ছেঁড়া কাগজ আর চাপা রাসায়নিক গন্ধ। স্কুটারের পিছনে একটি আঁচল-ওড়ানো মেয়েকে বসিয়ে আরও ভিতরের দিকে চলে গেল একটি হেলমেট পরা যুবক। গাছের কাছে সদ্যোজাত শিশুকে কাঁথায় জড়িয়ে বিষণ্ণ মুখে দাঁড়িয়ে আছে কমবয়সী রক্তাল্প চেহারার একটি বউ, যার আসবার কথা সম্ভবত সে এসে পৌঁছয়নি এখনও। অ্যাম্বুলেন্স। ওয়ার্ডের ভিতর থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সির সামনে দিয়ে দৌড়ে গেল একজন নার্স।

মনোজ ভাড়া না মেটানো পর্যন্ত ট্যাক্সির ভিতরেই চুপচাপ বসে থাকল অপূর্ব। ঢুকে দেখল, পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে অপরেশের সঙ্গে কথা বলছেন বিমলকৃষ্ণ। তাকাল না। ওদের সামনে দিয়েই মনোজ যেদিক যাচ্ছে সেদিকেই হেঁটে গেল অপূর্ব। তারপর বাঁ দিকে। ওখানে দরজার সামনে একজন কনস্টেবল। পাশের দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে রাধাকৃষ্ণন, সুশান্ত এবং আরও একজন, কে তা চিনল না ঠিক। ভেজানো দরজা ঠেলে মনোজ বলল, 'এসো—'

এগোতে গিয়েও তবু কী ভেবে থেমে দাঁড়াল অপূর্ব। সামনে কি ক্লাসরুম? হয়তো। সারি সারি ডেস্ক ও বেঞ্চি; তারই একটিতে চুপচাপ বসে আছে বাবলু, তেমনিই রোগা ও ফ্যাকাশে, দৃষ্টিতে কিছুই নেই—যেন তার বসে থাকা বাধ্যতামূলক। ওর পিঠের ওপর হাত দিয়ে আগলে রেখেছে বীথি, অন্য পাশে সুজাতা, মিসেস মান্যাল; ওদের পিছনে আরও এক ভদ্রলোক, অপূর্ব চিনল না, এবং বিয়াত্রিচে।

তাকে দেখে এগিয়ে এল মিসেস সান্যাল, চাপা গলায় বলল, 'ঠিক সময়েই এসেছ। ওরা বডি নিয়ে যাবে এখুনি। পোস্টমর্টেম হবে বলছে—'

মনোজ বলল, 'যাও। বাঁ দিকে—'

অপূর্ব এগোলো না। এখনও বাবলুকেই দেখছে। ও কি জানত এরকমই হবে!

ইতিমধ্যে অপরেশ কাছে এসে দাঁড়াল এবং বলল, 'মিস্টার বাসু পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। বডি তো এখানেও রাখা যাবে না—আপাতত কোল্ড রুমে। পোস্টমর্টেম বাঁচানো যাবে কি না সন্দেহ আছে। তারপর ফিউনারালের ব্যবস্থা। সময় লাগবে। পারহ্যাপস উই ক্যান গো নাউ—।' বলতে বলতেই অপূর্বর মুখের দিকে তাকাল অপরেশ, 'সরি, অপূর্ব। ইটস অল ওভার। আই ডোন্ট নো—সি মাস্ট হ্যাভ কিলড হারসেলফ। সুইসাইড ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারছি না। কাল ফোন করেছিল, কিছু

বলতে চায়। ব্যস্ত ছিলাম, বলেছিলাম, কাল আসতে। কাল মানে আজ—! তোমার সঙ্গে কি দেখা হয়েছিল, রিসেন্টলি?'

অপূর্ব জবাব দিল না। মাথাটা নাড়ল সামান্য। দেখল, দেয়ালের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে তারই দিকে তাকিয়ে আছেন বিমলকৃষ্ণ। ঈষৎ লম্বাটে মুখ, মাথায় টাক, চোখে চশমা। ধুতির কোঁচা পাঞ্জাবির পকেটে গোঁজা। দৃষ্টি যা দেখায় তার চেয়ে বেশি বোঝাতে চায় কিছু। মনে হয় বয়স বেড়ে গেছে; হয়তো তাকেই দেখছেন না।

তখন নিজেই দরজা পেরিয়ে গেল অপূর্ব। বাঁ দিকে তাকিয়ে চোখে পড়ল ট্রলির ওপর সাদা চাদরে ঢাকা সেই শূন্যতা, স্থির; মুখটাই ভেসে আছে শুধু।

আস্তে আস্তে কাছে গিয়ে দাঁড়াল অপূর্ব। পাশে মালবী। মুখের ওপর না ঝুঁকেও নাকের ফুটোয় এবং ঠোঁটের কোণে গোঁজা তুলো দেখতে পেল সে; মানুষ এইভাবেই কিছু সত্য আড়াল করে রাখে; তবু সীতা সীতাই। সেই একই মুখ, লাবণ্য এখনও ছুঁয়ে আছে তার অস্পষ্ট বিষাদ। 'যাবে একবার? আমি, তুমি আর বাবলু!' সেই মুহূর্তে অন্তত আর কারুর কথাই ভাবেনি।

তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বিস্মৃত আবেগটা খুঁজে পেল অপূর্ব, পরিষ্কার অনুভব করল কিছু একটা আসছে, ঢেউয়েরই মতো, সারা শরীর আলোড়িত করে, ক্রমশ প্রচণ্ড হয়ে আছড়ে পড়ছে তার ওপর। দেখতে দেখতেই ভেঙে পড়ল সে এবং নিজের ভাঙাচোরা মুখটা নামিয়ে আনল সীতার বুকের সেই কাঙাল, দুটি সাদা হাতের টেনে আনা আগ্রহে যেখানে আশ্লিষ্ট হতে হতে একদিন সে ভরে উঠেছিল পূর্ণতায়। আজও তা-ই খুঁজছে!

'নো, ইউ কানট গো লাইক দিস! ইউ কানট গো লাইক দিস—!' চাপা থেকে ক্রমশ সরব, বড়ই নাটকীয় কিন্তু অপ্রকৃতিস্থ হাহাকারে ভরা অপূর্বর সেই কান্না হঠাৎই অপ্রস্তুত করে দেয় সকলকে। যে শোনে সেও সংবরণ করতে পারে না। যেন সীতার মৃত্যুর সম্পূর্ণতা এরই অপেক্ষায় ছিল!

'কী করছ, অপু!' মালবী ওকে সরিয়ে আনার চেষ্টায় বলল, 'এমন পাগলের মতো করে নাকি কেউ!' তবে সেই স্বর অপূর্বর কানে পৌঁছচ্ছে বলে মনে হল না। মনোজ, অপরেশও এগিয়ে এল। সকলেই দেখছে, কিন্তু কেউই বুঝতে পারছে না কোথায় এর উৎস; পরস্পর সম্পর্কহীন একটি মানুষ আর একটি মানুষের জন্যে এভাবে মথিত হয় কেন!

ব্যতিক্রম শুধু একজন। বিমলকৃষ্ণ। অবিচলিত; অভিজ্ঞতায় স্পষ্ট, এক সূক্ষ্ম মায়াময় হাসি এখনও তাঁর ঠোঁটের কোণে। প্রায় সকলেই যখন অপূর্বর কান্নায় শোকার্ত ও বিব্রত, তখন আর একটি বিস্মিত বালকের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি। ঝুঁকে এলেন, তার মুখের সামনে।

'বাবলু, বলেছিলাম না নিয়ে যাব একদিন আমার বাড়িতে! উই উইল প্লে চেস? এসো, এবার আমরা যাব—'

যেভাবে বাবলুকে টেনে নিলেন বিমলকৃষ্ণ, সবল দুই হাতে তুলে নিলেন কোলে, তাতে মনে হবে দুজনের মধ্যে যেন অনেকদিনের সম্পর্ক; এরকমই হবার কথা। তারপর এগিয়ে গিয়ে হাত রাখলেন মালবীর পিঠে, 'সরো তো, মা। ওকে আমি চিনি। আমারই তো ছেলে!'

বলতে বলতেই তাঁর বয়স্ক হাত বাড়িয়ে অপূর্বর মাথায় রাখলেন বিমলকৃষ্ণ। কিছু বা কম্পিত গলায় বললেন, 'শান্ত হ, অপু। আয় আমার সঙ্গে—।'

বিমলকৃষ্ণ দাঁড়ালেন না। শুধু এক মুহূর্ত মালবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এসো, বৌমা।'

সত্যিই কি জাদু ছিল তাঁর কথায়! অপস্রিয়মাণ সেই পুরুষের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকল মালবী, মনে হল সে জীবনে নেই।

অপূর্ব মুখ তুলল। কান্না তার অনেকটাই নিয়েছে। তার চিহ্ন চোখের আভায়। আরও একবার সীতার মুখের দিকে তাকিয়ে প্রায় শূন্য ঘরটায় চোখ বোলাল সে। মৃতদেহ সরিয়ে নিয়ে যাবার কথা শুনেছিল, হয়তো এখনই শুরু হবে সেই প্রক্রিয়া।

ওর হাতটা টেনে ধরে মালবী বলল, 'চলো। সবাই যাচ্ছে—'

চুপচাপ, নিজেই ক্রমশ ঘর থেকে বেরিয়ে এল অপূর্ব। হেঁটে এল সেইখানে যেখানে একটু আগে ট্যাক্সি থেকে নেমেছিল তারা। দাঁড়াল।

রোদের স্বচ্ছতা কাটিয়ে ক্রমশ বিস্ময় ফুটে উঠেছে চোখে। অনতিদূরের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে তার জন্মদাতা, অপছন্দ করতে করতে এতদিন যাকে সে ঘৃণাই কবে এসেছে। তবু কী অসীম মমতায় নিজের শক্ত হাতে একটি সব-হারানো, ছোট মানুষকে আগলে রেখেছেন তিনি! কীভাবে সম্ভব হল এটা? কী সম্পর্ক ছিল তাঁর সীতার সঙ্গে? গভীর-গভীর কিছু? যদি তা-ই হয়, তাহলে মৃত্যুই কেন আশ্রয় হয়ে উঠল সীতার? নাকি সীতাও কোনও বিষয় নয়; মৃত্যুর অমোঘ সংস্পর্শই কখনও বা চিনিয়ে দেয় জীবনকে, সম্পর্কগুলোকে উল্টেপাল্টে আবার সাজিয়ে দেয় নতুন করে?

অপূর্ব জানে না। বুঝতেও পারে না। সে শুধুই তাকিয়ে থাকে নিজের ভিতরের অদৃশ্যের দিকে—যা তাকে ঠেলে দিয়েছিল হাহাকারের মধ্যে, যা তাকে টেনে তুলছে হাহাকাব থেকে; এতদিন ধরে যা তাকে শুধুই টেনে নিয়ে গেছে রহস্যের দিকে।

স্বপ্নের ভিতর

উৎসর্গ:
আশীষ বর্মন-কে

১

বিশাখা স্বপ্ন দেখে না। কিংবা, দেখলেও এমন কোনও স্বপ্ন দেখে না, রাতের গাঢ় ঘুম ও আচ্ছন্নতার মধ্যে যা জাগিয়ে তুলবে হঠাৎ, শোক কিংবা সুখের রেশ তার পর থেকে অনেকক্ষণ নতুন এক আচ্ছন্নতায় ডুবিয়ে রাখবে তাকে। এরকমই হয় শুনেছে, অনেকেরই হয়। এই যে দেখা, কেউ কেউ ধরেও রাখে তাকে।

এই তো; কিছুদিন আগে এক দিন কলেজে কমনরুমে বসে গল্পগুজব করতে করতে কী যেন কথায় বাসবী বলল প্রায় রোজই নতুন একটা স্বপ্ন দেখে সে—মজার-মজার, হাসির, সুখের, কখনও বা গা শিরশির-করা লজ্জার; মনে হয় হাই তুলতে তুলতে ঘুমোতে যাবার আগে যখন সে ঘরের আলো নেভাতে যায়, সেই অদ্ভুত সময়ে কেউ তার বালিশের নীচে রেখে যায় আস্ত একটা স্বপ্নের মোড়ক। এসব শুনলে মনে হয় বাস্তবেই সৃষ্টি হচ্ছে রূপকথা। বাসবীর স্বভাবে অবশ্য এক ধরনের আহ্লাদেপনা আছে, কোন কথার কতটা সত্যি কতটা বানানো তা ধরা যায় না ঠিকঠাক।

স্বপ্ন নেই তা বিশাখাই বা বলবে কী করে! সেবার, মনে আছে, এক বৃষ্টির ভোরে, তখনও অন্ধকার ছুঁয়ে থাকা ঘরের বিছানায় তার পাশে শুয়ে থাকতে থাকতেই হঠাৎ এমন ভাবে জেগে উঠেছিল মা যেন সাপ হেঁটে গেছে পায়ের ওপর দিয়ে। প্রায় আতঙ্কিত মুখ নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ বসেছিল বিছানায়। একটু পরে চোখেমুখে জল দিয়ে এসে ধূপ জ্বালাল ঘরে, দেয়ালে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির সামনে কিছুক্ষণ থমথমে মুখে তাকিয়ে থেকে বলল, 'একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলাম, জানিস! বড্ড ভয় করছে—'

স্বপ্নটা যে কী মা তা বলেনি মুখ ফুটে। 'এসব কি বলতে আছে—!' বলেছিল; চিন্তা ও বিষাদে তখন পাল্টে গেছে মুখের ভাব। বিশাখার আজও মনে পড়ে জানলা দিয়ে মা'র সেই মুষলধারার দিকে অনির্দিষ্ট চেয়ে থাকা, অন্যমনস্কতার মধ্যে কড়ে আঙুল ঘষে ঘষে ঘন ঘন সিঁথি চুলকানো। বয়সের সিঁদুরে এক ধরনের মরচে পড়ার মতো দাগ ধরে সিঁথিতে। তখনও বুঝতে পারেনি স্বপ্ন থেকেই ক্রমশ একটা বাস্তবে পৌঁছে যাবে মা।

আগের রাতে ট্যুরে ব্যাঙ্গালোরে গেছে বাবা। স্বাস্থ্যবান, স্বচ্ছন্দ মানুষ। পরের দিন খবর এল হঠাৎ হার্ট-অ্যাটাক হয়ে ভর্তি হয়েছে হাসপাতালে। বাবার অফিস থেকেই ব্যাঙ্গালোরের প্লেনে তুলে দিয়েছিল তাদের। আত্মীয়স্বজন বলতে একটা মামাবাড়ি আর দুই জেঠতুতো দাদা থাকলেও সম্পর্কগুলোয় জোর ছিল না কোনও, হঠাৎ-বিপর্যয়ের মধ্যে মনেও পড়েনি কারও কথা। শুধু একজনের ছাড়া। তাদের দিক থেকে তাড়াহুড়োর সমস্ত ব্যাপারটা একাই সামলেছিল সিদ্ধার্থ। এখনও মনে আছে বোর্ডিং কার্ড হাতে তারা যখন এগোচ্ছে

এয়ারক্র্যাফটের দিকে তখন ভিজিটরস গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে সিদ্ধার্থর সেই হাত নেড়ে বিদায় জানানো।

এটা বিশাখার থমকানোর জায়গা। এই এক স্মৃতি, স্বপ্নে না হোক, কেন যে ফিরে আসে বার বার! তখন কে জানত, সেদিন সিদ্ধার্থ যে-জায়গায়, ভূমিকা পাল্টে একদিন সে-ও দাঁড়াবে সেখানে—দমদম এয়ারপোর্টের ওই ভিজিটরস গ্যালারিতে! তবে সে শুধুই তাকিয়ে থেকে হাত নাড়া দেখেছিল সিদ্ধার্থর, নিজে পারেনি—এমন বিদায়ে এক ধরনের স্তব্ধতা থাকে যা ক্রমশ অবশ করে দেয় শরীর। তখন চোখের সামনে সবকিছুই ঝাপসা, থম স্মৃতিতেও; সে কি ভেবেছিল আমেরিকা আর ব্যাঙ্গালোরের দূরত্ব এক নয়! মনে নেই। অনেকটা পরে খেয়াল হয়, সিদ্ধার্থ চলে গেছে, বন্ধ হয়ে গেছে এয়ারক্র্যাফটের দরজা, হঠাৎ শুরু হওয়া এঞ্জিনের শব্দের ভিতর থেকে প্লেনে ওঠার সিঁড়িটা নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ড স্টাফ।

স্বপ্নের ভাবনায় এসে গেল স্মৃতি। নিঃশ্বাসে অসঙ্গতি। আজো তো ভোরবেলা, যদিও বৃষ্টি নেই, শীত আসছে বলে অদ্ভুত রঙে পাল্টে যাচ্ছে ভোরবেলার আলো। ক্বচিৎ হাওয়ায় ভাল-লাগা মেশানো। এই আলো, তৃপ্তিকর এই হাওয়ায় ইচ্ছে করে শুধুই ভাসিয়ে রাখতে নিজেকে। তবু পারছে কই! ওরই মধ্যে হারিয়ে যেতে-যেতেও ফিরে আসছে ভোরের স্বপ্নের রেশ। আজই হল এমন। সে যে স্বপ্ন দেখে না, কিংবা দেখলেও মনে থাকে না স্বপ্নের কথা, এই ধারণাটুকুও তা হলে বদলাতে হবে আজ থেকে!

চাকুরে মেয়েদের বসবাসের জন্যে এই বাড়ি। হস্টেলই বলা যায়। দোতলার রেলিং-ঘেরা টানা ও সরু বারান্দায় দাঁড়ালে আকাশ যদি বা দেখা যায়, সামনের প্রায় সবটাই আড়াল হয়ে গেছে নতুন পুরনো নানা ছাঁদের বাড়ির আড়ালে। নানারকম শব্দের মেশানো দূরত্বে কান পাতলে বোঝা যায় রাস্তা আছে ওদিকে। বড় রাস্তা থেকে বাঁক নিয়ে ছোট রাস্তা যেখানে আরও একবার বাঁক নেবে উত্তরে, তারই মুখে দোতলা এই বাড়ির সামনের দিক। গেটের পাশে ছোট্ট বোর্ডে পরিচয় জানানো—'দক্ষিণী। ওয়ার্কিং উইমেনস্ রেসিডেনসিয়াল হোম। এনট্রি বাই পারমিশান ওন্‌লি।'

বিশাখা জানে, হয়তো আরও·কেউ কেউ জানে, বাধ্যতামূলক এই পরিচয়ে স্বস্তি নেই কোনও; আত্মপরিচয়ের ভিতর যেটুকু আড়াল ও নিরপেক্ষতা থাকা দরকার তার অনেকটাই যেন কেড়ে নিয়েছে ওই ঘোষণা। 'দক্ষিণী নাম দিল কেন!' বোধহয় অর্পিতাই বলেছিল একদিন, 'রেফিউজি ক্যাম্প বা বন্দিশিবির টিবির দিলেই পারত, তা হলেই মানাত!' ভুল বলেনি। সে নিজেও এইভাবেই ভাবে। অস্বস্তি লাগে। যাতায়াতের সময় ছাড়া বাড়ির সামনেটা তাই যতটা সম্ভব এড়িয়ে যায় বিশাখা। গেটের সামনে, টুলে, কিংবা সিঁড়িতে বসে থাকা দারোয়ানকে দেখলেই কেমন চকিত হয়ে ওঠে পা দুটো। বাড়ির পিছন দিকটা তবু একান্ত, সেইজন্যেই নিজস্ব। এখানে দাঁড়ালে ঠিকঠাক কেউই জানতে পারছে না তুমি কে।

এক ভাবনা থেকে আর এক ভাবনায় স্থানান্তরিত হতে হতে, রেলিংয়ে হাত রেখে দাঁড়িয়ে, বিশাখা দেখল আর ভোর নেই, ক্রমশ ঔজ্জ্বল্য বাড়ছে আলোয়। দূরে, অজানা টিনের শেডের গা-ঘেঁষা গাছটা পাতা ঝরাতে ঝরাতে প্রায় ন্যাড়া হয়েও ফুটিয়ে রেখেছে লাল একরকমের ফুল। শীত উত্তর থেকেই আসে; কিন্তু ওদিকটা দক্ষিণ, স্পর্শে বোঝা যায় হাওয়াটা আসছে ওই গাছেরই ওপর দিয়ে।

শুনেছে মানুষের মনে কখনও বা তারতম্য ঘটিয়ে যায় প্রকৃতি; সংস্পর্শ দিয়ে যায় কিছু। তা হলে এই আলো এই হাওয়ায় তারও তো চমৎকার বোধ করার কথা। তা নয়, যেন এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটির অস্তিত্বই নেই কোনও—সে শুধুই জড়িয়ে যাচ্ছে স্মৃতিতে! মনে পড়ছে বছর আটেক আগেকার ব্যাঙ্গালোরের সেই দুঃসহ দিনটি। বাবা মারাই গেল শেষ পর্যন্ত, আর কফিনে বডি নিয়ে ফেরার সময় মা'র সেই হঠাৎ, হতচকিত প্রশ্ন, 'আমি তো বিধবা হলাম! এই রঙিন শাড়ি, সিঁদুর, নোয়া নিয়ে কি ফেরা উচিত?'

এসব প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। এমন সন্দেহ হয় মা'র কথাগুলো প্রশ্নই ছিল কি না। বিশাখাও জবাব দিতে পারেনি। শুধু বিষাদ জড়ানো খুব আলগা এক অনুভূতির মধ্যে বুঝেছিল, বোধহয় মেয়ে হয়ে জন্মানোর একটা আলাদা অর্থ আছে। সেই বোধহয় কিংবা হয়তো থেকে আজও সে এগোতে পারেনি বেশিদূর। স্বপ্নের কথা মা আর বলেনি কখনও। তারপর তো বছর দুয়েকের মধ্যে, এম-এ পাশ করে সে তখন কলেজে ঢুকেছে, নেফ্রাইটিস না কী হয়ে মা-ও চলে গেল হঠাৎ।

মা নয়, এই ভাবনাতেই আবার ফিরে এল সিদ্ধার্থ। একা বাড়িতে, মাথা মুখ গোঁজবার জন্যে সেদিন একটি বুকের দরকার ছিল বিশাখার; হয়তো ততদিনে জমে ওঠা অধিকারবোধই তাকে ঠেলে দিয়েছিল সিদ্ধার্থর দিকে।

'আমার আর কেউই রইল না সিদ্ধার্থ!'

তখন আশপাশে আর কেউ ছিল কিনা মনে নেই। সিদ্ধার্থই বলেছিল, 'কেন আমি! আমি কেউই নই!'

এই সেদিনও ইউনিভার্সিটি ক্যান্টিনে, কফিহাউসে, ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কিংবা ডায়মন্ড হারবারের ট্রেনে যেতে যেতে একসঙ্গে হয়েছে তারা। কত আর বড় হবে সিদ্ধার্থ তার চেয়ে, বছর দু-তিনের? তবু ওরই বুকে ছিল অভিভাবকের আশ্রয়, আড়াল। কতদিন আগেকার কথা? এটা স্বপ্ন নয়, তার ব্যক্তিগত, জ্যান্ত বাস্তবেরই একটা টুকরো। কিন্তু, আজ, এখন, সেই বাস্তবকে টেনে আনতে গিয়ে কেমন যেন অবিশ্বাসে ভরে উঠছে মন। মনে হচ্ছে এটাও স্বপ্ন।

দূরে কোথাও ভোঁ দিচ্ছে কারখানায়। সকাল ছ'টা নাগাদ শোনা যায় শব্দটা, প্রায়ই। সাধারণত তার একটু আগেই ঘুম ভাঙে বিশাখার। আজও তাই হত হয়তো, স্বপ্নের মধ্যে হঠাৎ সিদ্ধার্থকে দেখে ঘুম ভেঙে গেল আচমকা। ঠিক কখন খেয়াল করেনি, পাঁচটা-টাঁচটা হবে, দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দেখেছিল হালকা আঁধার ছড়িয়ে আছে চারদিকে। তারপর থেকে অনেকটা সময় একভাবে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সে। এখনও নৈঃশব্দ্যে টান পড়েনি। এর পর আস্তে আস্তে সরব হবে চারদিক, এই বাড়িটাও জেগে উঠবে প্রতিদিনের পরিচিত দৃশ্য নিয়ে। কে আগে বাথরুমে যাবে তা নিয়ে টানাটানি, চায়ের জন্যে ছটফটানি। কম দিন হল না এখানে। ভাবতে ভাবতে বিশাখা এখন অনেক দূর যেতে পারে।

ভোঁর শব্দটা ঠিক কোনদিক থেকে আসছে অনুমান করতে আশপাশে তাকিয়ে বিশাখা দেখল, একই বারান্দার ডানদিকে শেষের ঘরটার সামনে রেলিংয়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে হালকা নীল শাড়ি পরা একটি রোগা চেহারার মেয়ে। গায়ে আঁচল জড়ানো, কালো ফিতেয় বাঁধা বেণীটা পিঠের ওপর ফেলা। বিশাখার তাকিয়ে থাকার মধ্যে মেয়েটিও তাকাল এদিকে। রং চাপা হলেও পানপাতা গড়নের মুখে একটা আলগা শ্রী মাখানো, চোখদুটিও

টানা-টানা, দেখে মনে হয় বয়স কুড়ি-বাইশের বেশি হবে না। সব মিলিয়ে স্মার্ট ভাবটা চোখ এড়ায় না তবু।

মেয়েটির মুখে সামান্য অস্বস্তি মেশানো হাসি।

বিশাখাও হাসল। সময় নিয়ে বলল, 'এসো এদিকে। কবে এসেছ এখানে?'

'পরশু সন্ধেবেলায়।'

মেয়েটি এগিয়ে এল। সামনাসামনি দেখার পর বিশাখা বুঝল আপাতদৃষ্টিতে রোগাটে মনে হলেও একে স্বাস্থ্যহীন বলা যাবে না। শরীরে মেদের ভার কম, এই যা। মাথায় তার চেয়ে সামান্য লম্বাই হবে।

বিশাখা ওর শরীর থেকে চোখ তুলে নিল।

'শুনেছিলাম একজন এসেছে। কাল ডাইনিং রুমে। এখানে সবাই এত ছাড়া-ছাড়া। খাবার সময় দেখা না হলে দেখা হয় না—'

মেয়েটি চুপ করে থাকল। দৃষ্টি দূরে।

'নাম কী? ছন্দা, না? ঠিক বললাম?'

'হ্যাঁ। ছন্দা দত্ত। আপনি অর্পিতাদি?'

'না। অর্পিতা আমার রুমমেট।' সামনের পর্দা টানা দরজাটার দিকে ইশারা করে বিশাখা বলল, 'আমার নাম বিশাখা। বিশাখা বসু—'

'ও! আপনিই কলেজের প্রফেসর!'

'ওই আর কি। লেকচারার। কে বলল তোমাকে?'

'শুক্লাদি—'

'প্রথম আলাপেই তুমি বলছি। রাগ করলে না তো!'

'বাঃ! রাগের কী হল! আমাকে তুমি-ই বলবেন।'

চারদিকের ঔজ্জ্বল্য বাড়তে বাড়তে পরিণত হয়েছে রোদে। এখান থেকে কোনাকুনি, দূরে, শ্যাওলা-ধরা গোলাপি রঙের বাড়ির ছাদের কার্নিশ থেকে দোতলার বারান্দা পর্যন্ত আলাদা হয়ে আছে রোদের আভায়। প্রায় জ্যামিতিক দৃশ্য। চোখে পড়ে টি-ভি'র অ্যানটেনা। ওরই পাশ দিয়ে হেঁটে এসে কার্নিশে ভিজে কাপড় মেলে দিচ্ছেন মোটাসোটা এক মাঝবয়েসী। শাদা শাড়ি, শায়া। সম্ভবত বিধবা। আরও একটু বেলা হলে এই বারান্দাতেও শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, ব্রেসিয়ার শুকোতে দেখা যাবে। এসবও চেনায়।

বিশাখা ছন্দাকেই দেখছে।

'বেশ লাকি তুমি। এসেই ওপরতলায় ঘর পেয়ে গেলে—শুক্লার সঙ্গে—'

'না, না। তা নয়। এটা একেবারেই টেম্পোরারি। ছন্দা বলল, 'আসলে আমার জায়গা নীচে। সুলেখা ভদ্র না কী যেন নাম, ওঁর সঙ্গে। পরশু যখন আসি উনি ফেরেননি তখনও। ঘরে তালা বন্ধ ছিল। সুপারিনটেনডেন্ট বললেন রুমমেটের সঙ্গে ইনট্রোডিউস না করিয়ে ঢোকানোর নিয়ম নেই—ওপরতলায় একটা সিট খালি আছে, আপাতত এখানেই থাকতে। কাল সন্ধেবেলা পর্যন্ত নীচের ঘরের মহিলা ফেরেননি—'

'মিসেস ভদ্র নার্সিংহোমে অ্যাটাচ্ড্। নার্স। ডিউটিতে আটকে পড়েন মাঝে মাঝে—'

ছন্দার কথার জের টেনেই কথাগুলো বলতে শুরু করেছিল বিশাখা, হঠাৎ মনে হল নতুন আসা এই মেয়েটিকে এত কথা না বলাই ভাল। বিশেষত সুলেখা ভদ্র সম্পর্কে। প্রায় তিন

বছর এখানে কাটিয়ে দিলেও সুলেখার সঙ্গে তার নিজের সম্পর্ক এখনও মুখচেনার বেশি এগোয়নি। আর কারুর সঙ্গেও সুলেখার তেমন ঘনিষ্ঠতা আছে বলে মনে হয় না। তবে ওকে নিয়ে কখনওসখনও কানাঘুষো চলে এখানে। পরচর্চায় বিশাখার রুচি নেই, কিন্তু সুলেখাকে দেখে মনে হয় ওর ভিতরে কোনও একটা কমপ্লেক্স কাজ করে, সেইজন্যেই অন্যদের সঙ্গে মেলামেশার গরজ দেখায় না কোনও।

'ওপরে থাকাই তো ভাল।' কথা ঘুরিয়ে বিশাখা বলল, 'শুক্লার ঘরের ওই সিটটা খালি পড়ে আছে। আলো হাওয়া পাবে। নাকি ওটা আর কারুর জন্যে রেখে দিয়েছে?'

'ভাড়া বড্ড বেশি।'

কথাগুলো বলার পরেই ছায়া ছড়াল ছন্দার মুখে। যেন হঠাৎই বলে ফেলেছে, এইভাবে গুটিয়ে নিল নিজেকে।

বিশাখা অনুমান করল এটা সমস্যা হতে পারে। দোতলার সিটের জন্যে মাসে তিরিশ টাকা বেশি ভাড়া গুনতে হয়। দেড়শো টাকার ওপরে ওই টাকাটা দিতে ছন্দার অসুবিধে হবে হয়তো। এর পরেও আছে খাওয়া-দাওয়ার খরচ। এখানে সকালের জলখাবার আর রাতের খাবার কমপালসারি, না খেলেও টাকা নেবে। দুপুরে খেলে অর্ডার দিতে হয় আগে। এক দিক থেকে অবস্থাটা ভাল, ছাইপাঁশ যা-ই দিক, নিয়ম আছে বলেই গিলতে হয়। না হলে অপছন্দ থেকে খাবার জন্যে রাতবিরেতে ছুটতে হত বাইরে। ওটা পুরুষরা পারে। মুখ পাল্টানোর জন্যে সে আর অর্পিতা অবশ্য মাঝেমধ্যে চাইনিজ খেয়ে আসে বাইরে। ঘরবাড়ি ছেড়ে বা অন্য কোনও কারণে যারা এখানে এসে থাকছে তাদের ঘরবাড়ি নেই বলেই ধরে নেওয়া যায়। অসহায়তা ঘোচাতে কার কতটা সংস্থান সে কী করে বুঝবে!

তবে, বিশাখা ভাবল, এই মুহূর্তে ছন্দার অস্বস্তি কাটানোর দায়িত্বটা তারই।

'নীচেটাও খারাপ নয় অবশ্য। একই তো! বরং ডাইনিং রুম কাছে পাবে। গোড়ার দিকে আমিও মাসতিনেক ছিলাম নীচে। ভালই ছিলাম। রত্নাদি নামে একজন ছিলেন তখন—ফুড কর্পোরেশনে কাজ করতেন, রিটায়ার করে মেদিনীপুরে চলে গেছেন—।' বিশাখা থামল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি নিশ্চয়ই চাকরি করো?'

ছন্দা মাথা নাড়ল।

'কোথায়?'

'ঠিক চাকরি নয়।' ইতস্তত ভাব করে ছন্দা বলল, 'রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট—'

'রিসার্চ করো। বেশ তো! কী বিষয়ে?'

'বিষয় নয় ঠিক। মানে, ওই—একটা মার্কেট রিসার্চ অর্গানাইজেশনের হয়ে ডোর-টু-ডোর স্যাম্পেল সার্ভে—যখন যা হয়—'

কথাগুলোয় দ্বিধা আছে, সামান্য সন্দেহের অবকাশও। বিশাখা চেপে যাবার কথা ভাবল।

'ইন্টারেস্টিং তো। খাটনি আছে নিশ্চয়ই?'

'রেগুলার কাজ থাকলে খাটনি থাকে। তবে গায়ে লাগে না। তখন রেগুলার ইনকাম থাকে।'

'যখন থাকে না তখন কী করো?'

'তখনই মুশকিল হয়। বেকার।' মুখে হাসি ফুটিয়ে বেশ স্বচ্ছন্দ গলায় ছন্দা বলল, 'তবে এখন প্যানেলে নাম উঠে গেছে, প্রায়ই কাজ থাকে। বলেছে বিজনেস বাড়লে পার্মানেন্ট

করে নেবে—'

রোদ লাগছে গায়ে। অল্প তাপের অনুভূতিও। কাছেই কোথাও একটা দাঁড়কাক এসে বসেছে, ডাকছে। ওদের ঘর থেকে শুক্লাকে মুখ বাড়িয়ে আবার সরে যেতে দেখে বিশাখা ভাবল, এইখানেই ইতি টানা উচিত। ছন্দা এদিকে তাকিয়ে থাকার ফলে শুক্লাকে দেখেনি, শুক্লা কি ভাববে অপরিচিতা একটি মেয়ের সঙ্গে এত কি কথা বিশাখার! ভাবুক না ভাবুক, নতুন আলাপে আর কী-ই বা বলবার থাকে! বাড়ির খবর? না; ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল বিশাখা; অন্য কোনও প্রসঙ্গও। নিতান্তই একা ছিল সে, ছন্দাও, মনের তাৎক্ষণিক ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যেও কিছুটা; না হলে প্রায় আট-দশ মিনিট সদ্য-পরিচিতা এই মেয়েটির সঙ্গে—, বিশাখা যে কথা কম বলে এটা অনেকেই জানে এখানে।

'বেশ। এলে এখানে—', বিশাখা বলল, 'এর পর তো রোজই দেখা হবে।'

'আচ্ছা। আসি—'

ছন্দা চলে যাবার পর পর্দা সরিয়ে নিজেও ঘরে এল বিশাখা। ভেবেছিল অর্পিতা তখনও ঘুমিয়ে, তা নয়; অর্পিতা বিছানায় নেই, ঘরেও নেই। নিশ্চিত বাথরুমে। ভোরে শীত-শীত করায় নিজেই ফ্যানটা অফ করে দিয়েছিল বিশাখা। এখন তাপ বোধ করায় চালিয়ে দিল আবার। বিছানায় বসল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অনুভব করল, কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে নিজেকে। অসহিষ্ণুও।

ভিতরের বারান্দা থেকে শঙ্করীর গলা, 'দিদি, চা দেব?'

'এসো—'

বিশাখা আবার উঠল। পর্দা সরিয়ে ট্রে হাতে ভিতরে আসতে দিল মেয়েটিকে। দুটি কাপ, সঙ্গে টি-পট, একটি প্লেটে চারটি থিন অ্যারারুট বিস্কুট। যেমন দেয়। অর্পিতার টেবিলে মৃদু টিকটিক করে যাচ্ছে অ্যালার্ম ঘড়িটা। ছ'টা দশ। বাইরের রোদ হঠাৎই উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

শঙ্করী চলে যাবার পর আবার পর্দাটা টেনে দিল বিশাখা। চা ঢালবে ভেবেও ঢালল না। অর্পিতা আসুক, একসঙ্গেই খাওয়া যাবে। তার বদলে নিজের টেবিলের ওপর থেকে ব্যাগটা টেনে নিয়ে আকাশি রং এয়ারোগ্রামটা বের করল। সিদ্ধার্থের চিঠি। গতকাল এসে পৌঁছেছে কলেজের ঠিকানায়। সন্দেহ কী,·এই চিঠিটাই বাসবীর সেই স্বপ্নের মোড়ক, চিঠিটা না এলে কি কাকভোরে ঘুম ভেঙে জেগে উঠত সে।

এই ভাবনায় গোটা শরীরে একটা শিহরন খেলে গেল বিশাখার। হঠাৎই শিরশির করে উঠল নীচের ঠোঁট। আড়াআড়ি ডান হাত তুলে ভুল স্পর্শে ভরা ঠোঁটদুটোর ওপর বুলিয়ে নিল সে। কাল চিঠিটা পেয়ে যে অভিমান হয়েছিল, সে যে ঘুমের মধ্যে এমন নির্লজ্জ হয়ে দেখা দেবে কে জানত!

ম্যাসাচুসেটস্ থেকে দশদিন আগে লেখা। মাঝখানে শনি, রবি থাকায় পৌঁছেছে দেরিতে। কিন্তু, সিদ্ধার্থ কি জানত না, যে দিন ও লিখেছে, যে তারিখে, ঠিক সে দিনই চিঠিটা পেলে কত ভাল লাগত বিশাখার!

আত্মীয়হীন, নির্বান্ধব এই বত্রিশ বছর বয়সে চোখের পাতা ভেজে না। তবু, দু হাতে ধরা চিঠিটায় আরও একবার চোখ বোলাতে গিয়ে বিশাখার মনে হল সে অস্বচ্ছ দেখছে।

'বিশাখা,

তিনজন বন্ধুর সঙ্গে উইকএন্ড কাটাতে নিউ ইয়র্ক থেকে ম্যাসাচুসেটস্-এ এসেছি। হঠাৎ

মনে পড়ল আজ তোমার জন্মদিন। কী জানাব, বেস্ট উইশেস অ্যান্ড লাভ? আর যা জানাতে পারতাম, সেটার জন্যে কাছে থাকা দরকার। নিশ্চয়ই বুঝে নেবে।

উপলক্ষটা চেপে রাখতে পারলাম না। বন্ধুদের বললাম। ওরা খুব চেপে ধরেছে সেলিব্রেট করতে। আজ রাত্রে আমাকে স্পেশাল ডিনার থ্রো করতে হচ্ছে। তার আগে তোমাকে এই চিঠি লিখছি।

আমার বন্ধুদের মধ্যে একটি মেয়ে আছে, আমাদের সঙ্গেই কাজ করে। নাম শার্লি। বেশ খোলামেলা আর চটপটে মেয়ে। ওদের চোখে দেখলে সুন্দরীই মনে হবে। ও বলল তোমার ছবি দেখাতে। সে কি আর পারা যায় সঙ্গে সঙ্গে! তোমার যে তিন-চারটে ছবি আছে সবই নিউ ইয়র্কের অ্যাপার্টমেন্টে। আর একটাও আছে অবশ্য—সঙ্গে সঙ্গে মনে। শার্লিকে সে-কথা বলতেই হেসে উঠল, জিজ্ঞেস করল তুমি সে-খবর রাখো কি না। আমার এক বন্ধু জন এই এয়্যারোগ্রামটা জোগাড় করে এনে দিয়ে বলল এখনই যেন তোমাকে চিঠি লিখি, না হলে ওরা ডিনারে পার্টিসিপেট করবে না। ঠিকানার হাতের লেখা নিশ্চয়ই অবাক করবে তোমাকে, ওটা কলিন্সের, যে কবিতা লেখে; ওর কথা আগেও লিখেছি তোমাকে। শার্লি বলেছে চিঠির ঠিকানা লেখা হলে ও ঠোঁট ছুঁইয়ে দেবে—যাতে সকলের শুভেচ্ছাই বয়ে নিয়ে যায় এই চিঠি।

সপ্তাহ দুয়েক আগে একটা চিঠি দিয়েছি তোমাকে আমার খবর জানিয়ে। আর নতুন কোনও খবর আপাতত নেই। কলকাতায় কি শীত এসে গেছে? এখানে এখনই বরফ আর কুয়াশা।

আর কী! যা আগে জানিয়েছি তাই আরও একবার জানালাম। ইতি।

তোমার

সিদ্ধার্থ'

চেপে রাখা অস্থিরতা থেকে উঠে আসছে একরকম আবেগ। জ্বালা চোখেও। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে নিজেকে প্রশমিত করল বিশাখা। তাড়াহুড়ো করে চিঠিটা বন্ধ করে আবার ব্যাগে রাখতে রাখতে ভাবল, হয়তো এটা ছিঁড়েই ফেলা উচিত। কাল ঠিক ধরতে পারেনি, প্রথম অনুভূতি অভিমান থেকে আবেগে জড়িয়ে পড়ে ভেবেছিল, সিদ্ধার্থ কি জানে না জন্মদিনের শুভেচ্ছা জন্মদিনেই পেতে ভাল লাগে। ও কি জানে কোনও শুভেচ্ছাহীন জন্মদিন কাটানোর মতো কষ্টকর আর কিছুই নেই, তখন বুকের ওপর কী ভীষণ ভাবে চেপে বসে মানসিক দৈন্য আর নিঃসঙ্গতার বোধ! সিদ্ধার্থ জানে না, সন্ধে থেকে ঘরে আলো নিভিয়ে সেদিন সে বিছানায় কাটিয়ে দিয়েছিল এ-বছরের দীর্ঘতম রাত, উপোস করে, নিজের নিঃশ্বাসের শব্দ নিজেই শুনতে শুনতে! অর্পিতা জানত না কিছু, মা'র কাছেই গিয়েছিল সম্ভবত, দেরিতে ফিরে ওকে ওইভাবে শুয়ে থাকতে দেখে ঘাঁটায়নি আর।

কালকের অভিমানে ভালবাসা ছিল। কিন্তু আজ হঠাৎ মনে হচ্ছে, জেনেশুনে না হোক, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে দিতে ওর এই বারোয়ারি চিঠি পাঠানোয় বিশাখা যে খেলো হয়ে গেল কতটা সেটা আদৌ মাথায় ঢোকেনি সিদ্ধার্থর। যাদের সে চেনে না, জানেও না—যারা তাকে চেনে না, জানেও না, তাদের খামখেয়ালি উইশ করাকে এত গুরুত্ব দিয়েছে কেন সিদ্ধার্থ। শার্লি সুন্দরী কি না তা জেনে বিশাখার কী লাভ। আর ওই কলিন্স না কে, ওকে দিয়ে ঠিকানা লেখানোও কি জরুরি ছিল খুব! যে-সিদ্ধার্থ তার ব্যক্তিগত, এই চিঠিতে সে

কোথায়?

এটা এক ধরনের অপমান। জন্মদিনের কথাটা হঠাৎই বা মনে পড়বে কেন! সে তো ঠিক জানে কবে সিদ্ধার্থর জন্মদিন। পুজো আচ্চায় তার মন নেই তেমন, তবু সেপ্টেম্বরের আট তারিখে ভোর-ভোর স্নান করে ঠিকই চলে গিয়েছিল কালীঘাটে, পুজো দিয়েছিল সিদ্ধার্থর নামে; যদিও এ সব কিছুই লেখেনি চিঠিতে। বিকেলে কলেজ-ফেরত গিয়েছিল ওদের এলগিন রোডের বাড়িতে। সিদ্ধার্থর মা-বাবা, দাদা-বৌদি, বোনের সঙ্গে দেখা করতে—এভাবে যেতে লজ্জা লাগে, তবু। তারও দু সপ্তাহ আগে বার্থ-ডে কার্ড লিখে পাঠিয়ে দিয়েছিল নিউ ইয়র্কের ঠিকানায়। তা হলে কি বদলে যাচ্ছে সিদ্ধার্থ!

চোখের কোণ দুটো দু আঙুলে চেপে ধরে নিঃশ্বাস সংবরণ করল বিশাখা। মনের মধ্যে এতখানি দূরত্ব, এমন অসহায়তা অনেকদিন বোধ করেনি সে। এমনকী হতে পারে, ভাবল, সে যা ভাবছে এবং যেভাবে, তার মধ্যে সত্য নেই কোনও—ক্রমশ বেড়ে ওঠা দূরত্বের বোধই সিদ্ধার্থ সম্পর্কে অসহিষ্ণু করে তুলছে তাকে!

'কী ব্যাপার!' অর্পিতা ঘরে ঢুকে বলল, 'মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন!'

'কিছু না।' বিশাখা সামলে নিল নিজেকে, 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। এইমাত্র চা দিয়ে গেল।'

এগিয়ে গিয়ে বারান্দার দিকের দরজার পর্দাটা পুরো সরিয়ে দিল অর্পিতা। এই ঘরের একমাত্র জানলাটা বিশাখার খাটের ওদিকে। বাইরে তাকালে তিন চারটে ছোট মাথার বাড়ি পেরিয়ে দেখা যায় তেতলা, সেখানে চিলেকোঠার ঘরে উটকো মতো লোক থাকে একটা—জানলা খোলা দেখলেই ছাদে দাঁড়িয়ে অঙ্গভঙ্গি করে নানারকম; কিছু না করলেও এদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ঠায়। এত দূর থেকে তার মুখচোখ কেমন তা বোঝা যায় না ঠিক। কিন্তু অস্বস্তি লাগে, কেমন বেআব্রু মনে হয় নিজেদের। জানলার পর্দাটা তাই সরায় না ওরা। এখন কী ভেবে জানলাটার দিকে এগিয়ে গেল অর্পিতা, মাথা তুলে দেখে সরিয়ে দিল পর্দাটা। শাড়ির আঁচলটা কোমরে গুঁজে ফিরতে ফিরতে বলল, 'আমাদের প্রেমিকটির বোধহয় কিছু হয়েছে—'

ওর কথা শুনে জানলার দিকে তাকাল বিশাখা। অভ্যাসের গলায় বলল, 'কেন!'

'কাল দেখেছি, আজও দেখছি চিলেকোঠার জানলা বন্ধ। নেই।

বিশাখা হাসল। চুপচাপ।

'ওরও বিয়ে হয়ে গেল নাকি! হায়, হায়! আমাদের কী হবে?'

বিশাখা অর্পিতাকে দেখছিল। এটাই ওর ধরন; যেন সব সময়েই দাঁড়িয়ে আছে স্টেজে। এক একদিন নাইটি পরে শোয় ও, তখন একরকম লাগে, আজ আর একরকম লাগছে। মাপা স্বাস্থ্য। লম্বা, টান টান চেহারায় যৌবন যেমন, তেমনি ওর ঈষৎ লম্বাটে মুখ, বড় পাতার চোখ, ওপর-তোলা নাক ও পুরু ঠোঁটদুটিতে এমন এক আকর্ষণ আছে যার সঙ্গে শরীরের সম্পর্কই বেশি। তেমনি উচ্ছলও। কখনও সখনও একটু মুডি হয়ে পড়ে, এই যা। কনফিডেন্সিয়াল সেক্রেটারির কাজ করে স্টুয়ার্ট মর্গানে। মনে হয়, অর্পিতার স্মার্টনেসের অনেকটাই ওর চাকরির পরিবেশ থেকে পাওয়া। খসখসে গলা, কথায় কথায় ইংরিজি বলে, বলার ব্যাপারে লুকোছাপি নেই, একটু বা ঠোঁটকাটা। তবে, বিশাখা যেটুকু বোঝে, মনটা সাচ্চা। স্বাধীন। ভবানীপুরে পৈতৃক বাড়ি থাকতেও চলে এসেছে এখানে। বনিবনা হত না

দাদা-বৌদির সঙ্গে। বৃদ্ধা মা'র সঙ্গে দেখা করতে যায় মাঝে মাঝে। একদিন গিয়েছিল ওর সঙ্গে। সেদিনই বুঝেছিল মা পড়ে থাকেন এক কোণে, কর্তৃত্বটা ওর দাদা-বৌদিরই। বিশাখার অনুমান অর্পিতা আর তার বয়স একই, বরং গ্র্যাজুয়েশনের সাল ধরলে অর্পিতা এক আধ বছরের ছোটও হতে পারে।

পট থেকে কাপে চা ঢেলে বিশাখার দিকে বাড়িয়ে দিল অর্পিতা। ক'পলক খুঁটিয়ে দেখল ওকে। তারপর নিজের চা-টা নিয়ে চেয়ার টেনে বসতে বসতে বলল, 'সত্যি বলো তো কী হয়েছে?'

'আ-রে! বললাম তো কিছু হয়নি।'

অর্পিতা একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকল ওর দিকে। বিশাখা চোখ নামিয়ে নিতে বলল, 'বিশু মাস্টার, মনের ভাব যারা লুকিয়ে রাখতে চায় তাদের অমন ফরসা রং আর ঢলঢলে মুখ হলে চলে না। দেখে তো মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিস, টুসকি দিলেই পড়ে যাবি!'

অর্পিতার সম্বোধনে 'তুমি' আর 'তুই' যখন তখন জায়গা বদল করে। এখনও তাই। অনেকদিন পরে এবং হঠাৎ ওর মুখে ওই 'বিশুমাস্টার' সম্বোধন শুনে বিশাখা না হেসে পারল না। বলল, 'মাস্টারদের কি মন বলে কিছু থাকে! সেখানে শুধুই শাসন আর প্রশাসন—'

'ইউ আর ট্রাইং টু অ্যাভয়েড মি, মাই ডিয়ার!'

'অ্যাভয়েড করব কেন!' উচ্চারণে ভার চাপিয়ে নিঃশ্বাস নিল বিশাখা, 'মাঝে মাঝে কিছু পুরনো কথা মনে পড়ে যায়। মা'র কথা, বাবার কথা—'

অর্পিতা ওকে লক্ষ করছে দেখে থেমে গেল বিশাখা। সিদ্ধার্থর কথা অর্পিতা প্রায় জানেই না, ওকে কিছু বলাও উচিত হবে না।

চা-টা তেমন গরম ছিল না। কোনওরকমে শেষ করে পটের ঢাকনা খুলে আর আছে কি না দেখে নিল অর্পিতা।

'তুমি আর নেবে?'

'না। থাকলে তুমিই নাও।'

তখন পটটা নিজের কাপের ওপর উপুড় করে ধরল অর্পিতা।

ভিতরের বারান্দায় শুক্লার গলা, বেশ উত্তেজিত ভাবে শঙ্করীকে ডাকছে। বোধহয় চা দিতে গোলমাল হয়েছে কোনও। মেয়েটি দেমাকি, ধৈর্য কম, অল্পেই তেতে ওঠে। যে-কোনও ব্যাপারেই চায় স্পেশাল ট্রিটমেন্ট। সদর স্ট্রিট না থিয়েটার রোডের কোন হোটেলে রিসেপশনিস্টের কাজ করে। ওর এই উগ্র স্বভাবের জন্যে প্রায়ই খিটিমিটি লাগে সুপারিনটেনডেন্ট কমলা দাশের সঙ্গে। এই নিয়ে তুমুল তর্ক হয়েছিল মাসখানেক আগে। 'এটা হোটেল নয় যে বেল টিপে সব কাজ হবে—' মিসেস দাশ বলেই ফেলেন, 'কই, অন্যরা তো এত কমপ্লেন করে না!'

মিসেস দাশ বিধবা। ওপর ওপর কড়া হলেও একটু বা ভিতুও। চাকরির দায় সামলাতে হিমসিম। তবু রাগতে ওঁকে কমই দেখেছে। অর্পিতা অবশ্য বলে, মিসেস দাশের পলিটিকাল কানেকশান আছে, কংগ্রেসের এক হোমরা-চোমরা নেতার খুঁটি ধরে এসেছিল এখানে—অনেক ব্যাপার আছে এর মধ্যে। এখন নাকি এ অঞ্চলের কম্যুনিস্ট এম-এল-এ'র সঙ্গেও আঁতাত করে ফেলেছে। ওঁর চাকরি যাবে না।

হতে পারে। অর্পিতা এখানে এসেছে ওরও আগে, অনেক খবর রাখে। বিশাখা কোনও দিনই বাড়তি উৎসাহ দেখায়নি। সে জানে এই রেসিডেন্সিয়াল হোমের একটি কমিটি আছে, তারাই চালায়। কচিৎ কখনও সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা পাকা চুল ও সরু চশমার এক শৌখিন চেহারার ভদ্রলোককে গাড়ি নিয়ে আসতে দেখে, বীরেশ্বর মিত্র না কী নাম যেন; ছোট অফিস ঘরে বসে মিসেস দাশের সঙ্গে কী কথাবার্তা বলে তা কে আর জানছে! এ বাড়ির সঙ্গে তাদের সম্পর্ক সকালটুকু আর রাত্রির—মাঝের সময়টা এলোমেলো, অপরিচিত। এমনকী রবিবার বা ছুটির দিনেও যে যার ইচ্ছেমতো চলে। পারস্পরিক পরিচয় থাকলেও এর সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা হয় না তেমন। কেন হয় না তা বুঝতে পারে না বিশাখা। যে যার নিজের নিজের আড়াল আঁকড়ে থাকতেই ব্যস্ত যেন। তার ভাগ্য ভাল, রুমমেট হিসেবে শেষ পর্যন্ত অর্পিতাকেই পেয়েছিল।

বারান্দার দরজায় রোদ এসে পড়েছে। ঠিক রোদও নয়, রোদের আভা কিছুক্ষণ থেকে চলে যাবে। এই মাত্র কিচিরমিচির করতে করতে দুটো শালিক উড়ে এল, এখন হাঁটছে বারান্দার রেলিঙের ওপর দিয়ে। জোড়া শালিক দেখা নাকি সৌভাগ্যের লক্ষণ। তার আর কী ভাল হবে!

অর্পিতাও ওই দিকেই তাকিয়েছিল। কান, সম্ভবত, শুক্লার গলায়। কী হয়েছে কে জানে, মনে হচ্ছে শঙ্করীকে ঘরের ভিতর ডেকে ধমকাচ্ছে এখনও। ওর গলার রেশ মিলিয়ে যাবার পর অর্পিতা জিজ্ঞেস করল, 'নতুন মেয়েটির সঙ্গে এত কী কথা হচ্ছিল?'

'তুমি কী করে জানলে?'

'জানব না।' দ্বিতীয় দফার চা-টাও শেষ করে বিশাখার হাত থেকে কাপটা টেনে নিয়ে ট্রে-তে রাখল অর্পিতা, 'তুমি দরজা খোলার পরই ঘুমটা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। কিছুক্ষণ পরে কিচিরমিচির শুনে ভাবলাম কেরে বাবা! উঁকি দিয়ে দেখি ওই মেয়েটা—ছন্দা—'

বিশাখা হেসে ফেলল।

'হাসছ যে!'

'উঁকি দিয়েছ শুনে।' বিশাখা বলল, 'এখানে সবাই এত উঁকি দেয় কেন!'

'আর কে দিল!'

'শুক্লা। আমরা কথা বলছিলাম। মুখ বাড়িয়েই টেনে নিল, যেন চেনেই না। ভোরবেলায় একটু উইশ করবে তো!'

'তাই বলো।' উঠে দাঁড়িয়ে দুটো হাত দুই স্তনের নীচে এনে ম্যাসাজ করার ধরনে ওপরে ঠেলতে ঠেলতে বলল অর্পিতা। ব্রেসিয়ার না পরায় উত্তাল মাংসপিণ্ডের ওঠানামায় আড়াল নেই। সকালের দিকটা ও করে এরকম, রোজই; বিছানার বালিশ সরিয়ে খানিক পরেই শুরু হবে যোগব্যায়াম। বিশাখার সামনে লজ্জা নেই কোনও। খুবই ফিগার-সচেতন। ওইভাবেই বলল, 'শুক্লা ওই মেয়েটার ওপর খুব খেপে আছে—'

'কেন!'

'কাল ফেরার সময় দেখা হল। বলছিল। তুমি পড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলে, তাই বলিনি।'

'কী হয়েছে?'

'ওই ছন্দা মেয়েটার নাকি ঘুমের দোষ আছে। মাঝরাতে শুক্লার বিছানায় উঠে এসে ওর গা ঝাঁকুনি দিতে দিতে উল্টোপাল্টা বকছিল। শুক্লা ফায়ার—'

'আহা। নতুন এসেছে, এরকম হতেই পারে।'

'ওই ঘুমের মধ্যে উঠে এসে ঝাঁকুনি দেওয়া। গড। আমি হলে ওখানেই ঠাস করে একটি চড় কষাতাম। ভূতে পাওয়া নাকি রে!'

'যদি ছন্দা না হয়ে কোনও পুরুষ হত!'

বিশাখার হঠাৎ রসিকতায় থ মেরে গেল অর্পিতা। তারপর বলল, 'খুব যে! তোমার মুখে এসব কথা!'

বিশাখা এড়িয়ে গেল । সত্যিই তো, ক্বচিৎ কখনও ছাড়া এরকম কথা সে বলে না, অর্পিতা অবাক হতেই পারে। হাসির জের টেনে বলল, 'গোড়াতেই বেচারাকে দমিয়ে দিয়ে লাভ নেই। কথা বলে বুঝলাম, ছন্দা মেয়েটা খারাপ নয়। ব্যাকগ্রাউন্ড জানি না তো, তবে কোথায় যেন একটা সেনস অফ ইনিসিকিউরিটি আছে। রোজগারের প্রব্লেমও।'

'কীরকম!'

'কোনও পাকা চাকরি করে না বোধহয়—'

অর্পিতা চুপ করে থাকল।

বিশাখা বলল, 'ঘুমের ঘোরে কী করেছে তাই নিয়ে শুক্লার আপসেট হবার কারণ নেই। ছন্দা ও ঘরে থাকবে না, ও নীচে চলে যাবে—সুলেখার ঘরে। আমাকে তাই বলল। শুক্লাকে বলে দিয়ো, নতুন এসেছে, এ নিয়ে যেন আর হাত পা না ছোড়ে।'

অর্পিতার ফ্রি-হ্যান্ড চলছে এখনও। শাড়ির ঘের নাভির নীচে নামিয়ে পেট ম্যাসাজ করতে করতে বলল, 'শুক্লার আইডিয়া অন্যরকম। কী বলছিল জানো, পুরো ঘরটা ওকে ছেড়ে দিলে নিতে রাজি আছে—'

'সেটা কি সম্ভব!'

'ও বলছিল, কেন নয়! ঘর ভাড়া, এমনকী খাওয়ার খরচ—সমস্তই দিতে রাজি আছে!'

'আচ্ছা!' বিশাখা খাড়া হয়ে বসল, 'ওর ইনকাম কি এতই বেশি! খরচ করতে পারছে না!'

'তা নয়। সবটাই শো-অফ। নিজেকে একটু আলাদা করে দেখাতে চায়।' সামান্য ক্ষণ চুপ করে থেকে কিছু মনে পড়ার ধরনে অর্পিতা বলল, 'যে হোটেলে কাজ করে সেটা স্মাগলারদের আড্ডা। শুনেছি অনেক শেডি ব্যাপারও চলে। সি মাস্ট বি ম্যানেজিং আ লট ফ্রম দেয়ার—'

'ওটা ওর নিজের ব্যাপার। কিন্তু একা একটা ঘর নিয়ে থাকবে, স্রেফ টাকার জোরে। এখানেও কিছু রুলস আছে তো!'

কপালে, গলায়, চিবুকে ঘাম ফুটেছে অর্পিতার। শরীরচর্চা ছেড়ে এবার ও নিজের খাটে বসল। কোমর থেকে আঁচল খুলে ঘাড় গলা মুছতে মুছতে বলল, 'এমন হলে আই উইল বি দ্য ফার্স্ট পার্সন টু প্রোটেস্ট। নো জোক। আমিও আলাদা ঘর চাইব।'

'সে কি! তুমিও!' মুখে বিস্ময় ফুটিয়ে ঠাট্টার ধরনে বিশাখা বলল, 'তা হলে এই ঘরে আমার থাকাটা তোমার পছন্দ হচ্ছে না বলো!'

বিশাখার কথার অর্থ বুঝতে সময় নিল অর্পিতা। তারপর অপ্রস্তুত ভাবে বলল, 'লেগপুল কোরো না। অ্যাজ আ ম্যাটার অফ প্রিন্সিপল্ বলছিলাম। ব্যাপারটা আমাদের নিয়ে নয়—'

খাট ছেড়ে উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল অর্পিতা। এমনিই যেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফিরে

এসে, একটু বা ভারী গলায় বলল, 'একা থাকার ফিনানসিয়াল স্ট্রেন্‌থ্‌ কি তোমারও নেই, বিশাখা। তবু, আই ডোন্‌ট্‌ নো, একা একা কাটাতে হবে ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয় কেমন।'

এই সময় শঙ্করীর মা, তারা, খবরের কাগজ নিয়ে এল। ভাগাভাগি করে একটা ইংরিজি আর একটা বাংলা কাগজ রাখে দুজনে। দরজায় দাঁড়ানো তারার হাত থেকে কাগজদুটো নিয়ে স্টেটস্‌ম্যানটা অর্পিতার দিকে বাড়িয়ে দিল বিশাখা। নিজে আনন্দবাজারটা নিয়ে খাটে বসল।

'আপনারা ব্রেকফাস্ট খাবেন কখন?' তারা জিজ্ঞেস করল, 'আজ লুচি আর ভাজা আছে—'

অর্পিতা বলল, 'ন'টায় আমাকে লুচি দেবে না। ওমলেট আর টোস্ট।'

'আমি লুচিই খাব।' বিশাখা বলল, 'এই ন'টাতেই। কী ভাজা গো?'

'বেগুন—'

'এখন কি বেগুন সস্তা যাচ্ছে?' অর্পিতা বলল, 'কাল রাতেও তো বেগুন খাইয়েছ!'

'আমায় বলছেন কেন, দিদি। সুপারিন যা বলে দিচ্ছে তাই করা হচ্ছে—'

'না, তোমাকে বলিনি কিছু।' কাগজে চোখ রেখেই অর্পিতা বলল, 'রাত্রে বেগুনের তরকারি ছাড়া আর কী করবে?'

'রাতে বেগুন নেই। মাংস আছে। কিছু ইচ্ছা থাকলে বলুন না? মহেশ বাজারে যাবে, ওকে বলছি সুপারিনকে বলতে—'

বিশাখা বলল, 'তুমি এমনভাবে বলছ যেন আমরা বললেই সব হয়ে যাবে।'

'দিদি, টাকা দিয়ে খাচ্ছেন আপনারা—বলবেন না কেন।' নাটুকে ভঙ্গিতে বাইরেটা দেখে নিয়ে তারা বলল, 'মহেশ কাল বলছিল বাজারে ভাল মৌরলা উঠিছে। তো আমি বললাম, ঘর ছেড়ে মেয়েগুলান আছে এখানে, আনলেও তো পারো। তা নয়, রোজ রোজ কাতল আর কাতল—'

'তুমি বুঝি মৌরলা খেতে ভালবাসো?'

'অর্পিতা, কী হচ্ছে!' ফোড়নে বাধা দিয়ে বিশাখা বলল, 'আমরা কিছু বলব না। রুই, কাতলা সবাই খায়। মৌরলাও কি খাবে! অন্যদেরও জিজ্ঞেস করে নিও—

তারা চলে গেল । হাসতে হাসতেই স্বগতোক্তির ধরনে অর্পিতা বলল, 'ছিল কালী, হয়ে গেল তারা।'

এটা এখানের পুরনো রসিকতা। কথায় কথায় শঙ্করী একদিন বলে ফেলেছিল তার মা'র বিয়ের আগের নাম ছিল কালী, কিন্তু বাবার নাম কালীপদ হওয়ায় নামটা বদলে ফেলেছে পরে। গল্পটায় আবহমান মজা পেয়ে গেছে অর্পিতা। প্রায়ই বলে এরকম। 'বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি—', লাইনটা মনে পড়ে গেল বিশাখার।

মনে পড়ল পর পর আরও কিছু। আজ ফার্স্ট পিরিয়ডেই ক্লাস আছে তার। আড়াইটেয় ন্যাশনাল লাইব্রেরি; ভারত ইতিহাসের বিদ্রোহী মহিলাদের নিয়ে যে-রিসার্চ করছে, সে-সম্পর্কে নোটস নিতে হবে কিছু। সহকর্মী তমাল ব্যানার্জি একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'সাবজেক্টটা ভাল, কিন্তু কোন বিদ্রোহের কথা বলবেন? ব্যক্তিগত, না রাজনৈতিক?' বিশাখা জবাব দিতে পারেনি; দিতে চায়নি বলাই ভাল। তমাল নিজে রাজনীতি করত একসময়ে, ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময়ে জেলটেলও খেটেছিল কিছুদিন। এমনিতে বুদ্ধিমান ও

উদার; কিন্তু বিদ্রোহ ও মহিলা শব্দ দুটিকে মেলাতে পারেনি সম্ভবত। তার কাজ তাকেই করে যেতে হবে, বিশাখা ভেবেছিল, তর্ক করে লাভ কী।

খবরের কাগজে চোখ থাকলেও অন্যমনস্ক, একান্ত থেকে ক্রমশ উঠে এল সিদ্ধার্থ। তার চিঠি, চিঠির শব্দ ও অক্ষরগুলো। সম্বোধন থেকে শেষ পর্যন্ত সর্বস্ব গেঁথে আছে মনে। একটু আগে ওর মধ্যে অপমান খুঁজেছিল বিশাখা; ভেবেছিল ছিঁড়ে ফেলবে চিঠিটা। এখন মনে হচ্ছে যা লিখেছে তা না লিখে সিদ্ধার্থ যদি তার মন-ভোলানো কিছু লিখত, তা হলে সে এভাবে ভাবত না। কিন্তু, তখনও সে জানতেই পারত না শার্লি, জন আর কলিন্স-এর সঙ্গে তারই জন্মদিন নিয়ে এত কাণ্ড করেছে সিদ্ধার্থ। যা ব্যক্তিগত তাকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে ভুল একটু করেছে হয়তো, কিন্তু, এমনও তো হতে পারে বিশাখাকে জড়িয়ে নিজের আনন্দেই স্বতঃস্ফূর্ত হতে চেয়েছিল সিদ্ধার্থ—যা সত্যি তা-ই লিখেছে চিঠিতে! তিন বছরের ওপর দেখা হয়নি ওর সঙ্গে। গত জুনে মাসখানেকের জন্যে আসবে লিখেও আসেনি। লিখেছিল নতুন একটা প্রোজেক্টে জড়িয়ে পড়েছে, এর পর আসতে আসতে সেই সামনের জুন। আসবে কি?

এক একটা প্রশ্ন এইভাবেই এসে যায় কখনও, উত্তর না খুঁজে থেমে থাকে অদ্ভুত স্থিরতায়। এগোতে দেয় না। এখন যেমন হল। খুঁজতে গিয়ে বহুবার দেখা সেই একই দৃশ্যের পরম্পরায় আটকে গেল বিশাখা—সে দাঁড়িয়ে আছে এয়ারপোর্টের ভিজিটরস গ্যালারিতে, দরজা-বন্ধ এয়ারক্র্যাফটের সামনে থেকে উঁচু সিঁড়িটাকে নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে গ্রাউন্ডস্টাফ। এঞ্জিনের নিষ্ঠুর শব্দ। দৃশ্য ও শব্দের সম্মেলনে ব্যতিক্রম নেই কোনও। সে'ই শেষ; তার পর থেকে আর কখনও এয়ারপোর্টে যায়নি সে। মাঝখানের একটি ফিরে আসা হয়তো নতুন কিছু দৃশ্য যোগ করতে পারত স্মৃতিতে।

ব্যস্ত হাতে কাগজের পাতা ওলটাচ্ছে অর্পিতা। খরখর শব্দে চোখ তুলে বিশাখা দেখল চেয়ারে বসা অর্পিতার মুখ কাগজের আড়ালে সম্পূর্ণ ঢাকা। মেঝেয় রাখা পা দুটির একটি দুলিয়ে যাচ্ছে অভ্যাসে। গোড়ালি থেকে আঙুল পর্যন্ত মসৃণ পায়ের পাতা, রাখার দোষেই সম্ভবত ডান পায়ের বুড়ো আঙুল ও অন্যান্য আঙুলগুলির মধ্যে ফাঁকটা একটু বেশি চোখে লাগে। ওই পা পর্যন্ত এসে থমকে আছে রোদ-মাখানো আলো। তবে খানিক আগে দেখা ঔজ্জ্বল্য আর নেই। নিজের দিকের জানলা দিয়ে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে দূরের চিলেকোঠা, ছাদ; ওখানে কেউ নেই বলেই মনে হচ্ছে আকাশটা যেন হঠাৎই নেমে এসেছে নীচে। অল্প কিছু ভাসমান মেঘে হলুদ আভা, বর্ষা বা শরতের মেঘের সঙ্গে এর সাদৃশ্য নেই কোনও।

শুধু এইটুকুই, এ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না বিশাখার। ভাবনাশূন্য, একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে হিমশীতল এক স্পর্শে হঠাৎই গোটা শরীর কেঁপে উঠল তার—অসতর্কতার মধ্যে মনে হল, যেন এই অনুভূতি অনেকক্ষণ ধরেই জড়ো হয়েছিল তার চারপাশে, অপেক্ষায় ছিল, অন্যমনস্কতার সুযোগে আক্রমণ করল তাকে।

আধশোয়া ভঙ্গি থেকে উঠে বসে শাড়ির আঁচলটা গায়ে জড়িয়ে নিল বিশাখা। আর একজনের ভাবান্তর নেই কোনও। মাথার ওপর পাখা ঘুরলেও স্পিড এমন কিছু বেশি নয় যে কাঁপুনি লাগবে গায়ে। অনেকক্ষণ ধরে একদৃষ্টিতে একই ভাবে, এত মগ্ন হয়ে কী পড়ছে অর্পিতা।

'আজ সকাল থেকেই কেমন যেন শীত-শীত করছে—'

'শীত!' মুখের সামনে থেকে কাগজটা সরিয়ে পুরোপুরি দেখা দিল অর্পিতা। খানিক বিশাখার দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমি তেমন বুঝছি না। তবে, কাগজে লিখেছে শীত এবার তাড়াতাড়িই আসবে। এই দ্যাখো না, ছবি—এসপ্ল্যানেডে ভুটানি মেয়েরা উলের পোশাক নিয়ে বসে গেছে—'

বিশাখা জবাব দিল না। এই যে অনুভূতি, এটা তার একার। অর্পিতা কি বুঝবে!

নীচে থেকে ভেসে আসছে লুচি ভাজবার গন্ধ। তার মানে এরই মধ্যে কেউ পৌঁছে গেছে ডাইনিং রুমে। কে হতে পারে? একটু ভাবতেই মনে পড়ল, হয়তো একতলার সুবর্ণা। স্কুলে পড়ায়, এখান থেকে বাস ধরে যাবে সেই মতিঝিলে। ছোটখাট চেহারার মিশুকে মেয়েটি, একতলায় বিশাখা আগে যে ঘরে ছিল তার পাশের ঘরটিতেই থাকে। তখন প্রায় ঘরে এসে গল্প করে যেত। বিশাখা ওর অনেকটাই জানে—বর্ধমানের মেয়ে, বি-এ পাশ করার পর বাবা মারা যায়, বাধ্য হয়েই নিয়েছে চাকরিটা। এর মধ্যে বি-টি পাশ করেছে। এখান থেকে টাকা পাঠায় মা-কে। ছোট একটি ভাইও আছে বোধহয়। প্রাইভেটে এম-এ দেবে বলে তৈরি হচ্ছিল সুবর্ণা, সেইরকমই বলেছিল, কতটা এগিয়েছে কে জানে।

এক হিসেবে তার আর সুবর্ণার ভাগ্যটা একইরকম, বিশাখা ভাবল, বাবা, বিশেষত মেয়েদের জীবনে, একটা ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়। এর সঙ্গে—এই যে একসঙ্গে আছে তারা—অর্পিতাকেও জড়িয়ে নিয়ে ভাবা যায়, যদি আমাদের বাবা বেঁচে থাকত, তা হলে কী হত। সম্ভবত তাদের দেখা হত না কখনও। একটা ছাদ থাকত মাথার ওপরে, থাকত আশ্রয়, স্নেহ, দুটি সতর্ক চোখের পাহারা, নিরাপত্তা।

কিন্তু, সে কি ঠিক ভাবছে? সত্যিই কি একইরকম ভাগ্য তাদের! আর্থিক যে-দৈন্য থেকে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হল সুবর্ণা, চাকরি নিল, তার কিংবা অর্পিতার তো সেরকম কিছু হয়নি। হঠাৎ চলে গেলে বাবারই জন্যে অফিস থেকে বেশ মোটা টাকার প্রভিডেন্ট ফান্ড পেয়েছিল মা, তার প্রায় পুরোটাই ফিক্সড ডিপোজিট করে দিয়েছিল ব্যাঙ্কে। সে তো জানে, কেন। মা-র গয়নাগাটিও কম পায়নি সে। কখনও ব্যাঙ্কে গেলে, লকার খুললে, হঠাৎ ঐশ্বর্যে ধাঁধিয়ে যায় চোখ। টাকা একটা বড় ফ্যাক্টর, মনে হয় কারুর কাছে হাত পাততে হবে না ভাবলে এমনিতেই ঝরঝরে লাগে।

বিশাখা শুধরে নিল নিজেকে। সুবর্ণার মধ্যে নিজেকে দেখার এই প্রবণতায় ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নেই।

অর্পিতা উঠে দাঁড়িয়েছে। আড়মোড়া ভাঙার ধরনে কাঁধের দু দিকে দুটি হাত ছুড়তে ছুড়তে হাই তুলল। হাসল বিশাখার দিকে তাকিয়ে।

'আজ কেমন লেথার্জিক লাগছে। আলস্য'।

'কেন! বেশ তো ঘুমিয়েছ!'

'ঘুমই কি সব, মাই ডিয়ার!' বিশাখার টেবিল থেকে বাংলা কাগজটা তুলে নিয়ে প্রথম পৃষ্ঠায় যথেচ্ছ চোখ রেখে অর্পিতা বলল, 'সব নয়—সব নয়—'

বিশাখা ওর হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তার কিছুই বুঝল না। আলস্য তাকেও ঘিরে রেখেছে আজ। ভোরের স্বপ্ন থেকেই এক ধরনের মন্থরতায় আটকে পড়েছে যেন, ভাবনার মধ্যে তার পর থেকে যা আসছে সবই নিজেকে নিয়ে। চোরা শীত-মেশানো আবহাওয়ার জন্যেও হতে

পারে। কিন্তু, অর্পিতা নিশ্চয়ই তার মতো ভিতর-খোঁজা নয়, সে হঠাৎ আলস্য বোধ করবে কেন।

বিশাখা প্রশ্নই করত। তার আগেই কাগজটা রেখে দিয়ে অর্পিতা বলল, 'ধরো, যদি হঠাৎ একটা কিছু করে ফেলি—এই বিয়েটিয়ে আর কি, কেমন হয়?'

'করবে? ভাবছ?'

'ভাবলেই কি বিয়ে হয় নাকি!' ঘরের মেঝেয় টান-টান দাঁড়িয়ে, চোখের কোণ দিয়ে বিছানায় বসে থাকা বিশাখাকে দেখতে দেখতে অর্পিতা বলল, 'আগে ইচ্ছাটাকে চিনতে হয়। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ো—'

অর্পিতা হাসছে দেখেও বিশাখাও হাসল এবং বলল, 'তাই বলো! ইচ্ছেটা এসে গেছে। পাত্র খুঁজতে হবে? নাকি সেটাও পেয়ে গেছ?'

অর্পিতার মুখে হাসি। জবাব না দিয়ে বিছানা পরিপাটি করতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

অনেকদিন একসঙ্গে থাকার ফলে অফিসে রওনা হবার আগে ও কী কী করবে তা মোটামুটি জানে বিশাখা। এর পর ঘরের দরজা বন্ধ করে যোগব্যায়াম করবে খানিক। দেয়াল-আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জোড়া আঙুল টেনে টেনে ম্যাসাজ করবে মুখের ত্বক। অফিসে যায় ঘড়ি ধরে। তার আগে যতটা পারে ভালবেসে নেয় নিজেকে। তখন ওকে কেমন যেন ছেলেমানুষ লাগে। কদিন আগে একটা ফ্রিল দেওয়া ব্রেসিয়ার এনে বলল, 'সুন্দর না! জাপানি জিনিস। আমার এক কোলিগ ওর হাসব্যান্ডের সঙ্গে হংকং-এ গিয়েছিল, এনে দিয়েছে।' অর্পিতা যে মুগ্ধ, ওর মুখচোখ দেখেই তা বোঝা যাচ্ছিল। 'সুন্দরই তো।' বিশাখা বলেছিল, 'তবে, ভাই, বন্যেরা বনে সুন্দর—, এর প্রশংসা আমি কী করব।'

এখনও দেখছে সেই একই অর্পিতাকে। হাসি-হাসি, খুঁজে পাওয়া ভঙ্গি। তফাত এইটুকু, সে নিজে সেদিনের, সেই সময়ের মনটা হারিয়ে ফেলেছে।

নিজের টেবিলের দিকে এগোলো বিশাখা। ক্লাসের নোট, লাইব্রেরি থেকে ধার করা বই দুটো গুছিয়ে নিল চটপট। সকালে কলেজ থাকলে কী পরবে না পরবে তা আগের রাতেই ঠিক করে রাখে সে, না হলে শাড়ি ব্লাউজ ম্যাচ করাতেই সময় যায় অনেকটা। বাস-ট্রাম পাওয়া যায় না ঠিকমতো। আজও বেলা বাড়ছে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে স্নানে না গেলে দেরি হয়ে যেতে পারে।

'আমার বসের টেবিলে দু একটা বিলিতি ম্যাগাজিন আসে। কাল একটা আর্টিকল পড়ছিলাম, উইমেন্স্ লিব নিয়ে। রাইটারের নামটা মনে পড়ছে না—, সিমন্স্ না কী, তবে তিনিও মহিলা। এক জায়গায় লিখেছে, ঈশ্বর মেয়েদের সৃষ্টি করেছে বন্ধ ঘরের তালার মতো করে, চাবিটা দিয়েছে পুরুষের হাতে। ঘরে কী আছে তা মেয়েরাও জানে, বোঝে, ফিল করে; কিন্তু তার ফুলফিলমেন্ট আসে খুলে দেখানোয়—'

'পুরনো কথা।' কলমে কালি ভরতে ভরতে দায়সারা ভাবে উত্তর দিল বিশাখা, 'এর জন্যে বিলিতি ম্যাগাজিন পড়তে হবে কেন!'

'তা ঠিক। কিন্তু—,' খেই হারানো গলায় অর্পিতা বলল, 'ঠিক বোঝাতে পারছি না। কী ছিল বলো তো কথাগুলোয়!'

'কী আর থাকবে! নিবের কালি মুছে ব্যাগে কলমটা রাখতে গিয়ে চোখে পড়ল সিদ্ধার্থর চিঠিটা। ঠাণ্ডা হাতে মুখ বন্ধ করতে যতটা সময় লাগে তা নিয়ে, কথার পিঠে কথা সাজানোর

ভঙ্গিতে বিশাখা বলল, 'কেউ তালাটা নিজেই ভেঙে ফেলার চেষ্টা করে, কেউ চাবিঅলা ডেকে আনে—'

অর্পিতা জিজ্ঞেস করল, 'কোনটা রাইট?'

'কী করে বলব!' বিশাখা বুঝতে পারছিল এই আলাপের সবটাই ফাঁকা, তবু অর্পিতা ক্ষুণ্ণ হতে পারে ভেবে বলল, 'প্রশ্নটা ওই তালাচাবির লেখিকাকে পাঠিয়ে দাও। দ্যাখো কী জবাব দেন।'

অর্পিতা চুপ করে গেল।

ভিতরের বারান্দায় দরজা খোলা এবং বন্ধ হবার পরস্পরবিরোধী শব্দ। বিশাখা অনুমান করল, কেউ বেরুল বাথরুম থেকে, কেউ ঢুকছে। ঘর থেকে বেরিয়ে না দেখলে বোঝা যাবে না কে বেরুল, ঢুকলই বা কে। ওই নতুন মেয়েটি, ছন্দাকে ধরলে দোতলার তিনটি ঘরে এখন তারা পাঁচজন। মাঝের ঘরের মমতাদি বয়স্কা ও বিবাহিতা; একটেরে, চুপচাপ মানুষ। চাকরি করেন কর্পোরেশনে। চার-পাঁচ বছর আছেন এখানে। বোঝা যায় না হাতে শাঁখা ও কপালে সিঁদুর নিয়েও কেউ কেন পড়ে থাকে এই হা-ভাতে আস্তানায়! একদিন তাকে একা পেয়ে বলেছিলেন, 'লেখাপড়া শেখাটাই আসল। তাই না!' একটি সরল সত্যে একই সঙ্গে প্রশ্ন ও দুঃখ মেশালে অর্থ পাল্টে যায় কথাগুলোর; বিশাখার সন্দেহ মমতাদি অন্য কিছু বলতে চেয়েছিলেন। তখনই আর কেউ এসে পড়ায় গুটিয়ে নিয়েছিলেন নিজেকে। গায়ে পড়ে কথা বললে হয়তো জানা যেত আরও। কিন্তু, বিশাখা ভেবেছিল, যে এগোতে চায় না তাকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া করে লাভ কী!

মমতাদির পাশের খাটটা রমার। রমা ঘোষ। কালো, পেটানো স্বাস্থ্য; আঁটোসাঁটো চেহারা দেখে বয়স কত অ আন্দাজ করার উপায় নেই। চল্লিশ-টল্লিশ হবে হয়তো। এখনও পালিশ আছে মুখে। হাবড়ার দিকে কোথাও হেলথ ভিজিটরের চাকরি করে রমা। ও অন্তত তা-ই বলে। কাজটা কী অনুমানে ধরা যায় না ঠিক। সরকারি চাকরি, নাকি গ্রামের ভিতরে গিয়ে ফ্যামিলি প্ল্যানিং নিয়ে বক্তৃতা দেয়, বার্থকন্ট্রোল বোঝায় মেয়ে বউদের। রমা আজ নেই; থাকলে দোতলার সংখ্যাটা ছ'য়ে দাঁড়াত। কাজের জায়গা দূরে বলে সোমবার সকালে বেরোয়, ফেরে শুক্রবার রাতে কি শনিবার। ওখানে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। তা হলে এই বুড়ি ছুঁয়ে থাকা কেন, ওখানেই তো থেকে যেতে পারত! নাকি কলকাতায় থাকার মোহই ওকে বেঁধে রাখছে এখানে!

মুখগুলি ঘোরাফেরা করে যখন তখন। কেন কে জানে, আজ একটু বেশিই করছে। অন্যমনস্কতার মধ্যেই বিশাখা ভাবল, ঠিকঠাক পরিচয় কিংবা অন্তরঙ্গতা থাকলেও কি হত এরকম?

'আমার কি মনে হয়, জানো?' মাঝে মাঝে যেমন হয় তাদের মধ্যে একদিন এসব নিয়ে গল্প করতে করতে অর্পিতা হঠাৎ বলল, 'এখানে যারা থাকে তাদের প্রত্যেকেরই একটা হিস্ট্রি আছে—মিস্ট্রিও—'

'প্রত্যেকেরই!'

'অন্তত কারও কারও!' বিশাখার সন্দেহের অর্থ বুঝে অর্পিতা বলল, 'গোয়েন্দা লাগালে বোঝা যেত। কিংবা, লেখক হলে ইমাজিনেশন খাটিয়ে খুঁজে বের করত।'

অর্পিতা একটু থামল, কিছু ভেবে নিল যেন। তারপর বলল, 'এই ধরো, রমা ঘোষ। এক

দিন ভাবছিলাম, এমন কী হতে পারে যে ও এমন কারুর সঙ্গে থাকে ওখানে, যার একটা আলাদা সংসার আছে—ধরো খড়্গাপুর কি রামপুরহাটে, উইকএন্ডে লোকটা সেখানে যায় বলেই রমা ফিরে আসে এখানে?'

'এটা আনফেয়ার। কল্পনারও সীমা থাকে একটা!' বিশাখা বলল, 'আয়ান ফ্লেমিং আর জেমস হেডলি চেজ পড়ে পড়ে তুমি এখন যার তার মধ্যে মিস্ট্রি খুঁজছ!'

'শুধুই কি মিস্ট্রি বললাম!' বাধা পেয়ে অর্পিতা বলেছিল, 'হিস্ট্রিও বলছি। ওটা তোমার সাবজেক্ট।'

বিশাখা এগোয়নি আর। অর্পিতার কথায় শ্লেষ থাকলেও, ভেবেছিল, সত্যিই তো, তার নিজেরও একটা ইতিহাস আছে, এত কাছাকাছি থেকেও অর্পিতা তার কতটুকু জানে। সেও কি ঠিকঠাক জানে অর্পিতাকে! হয়তো ওর কথাই ঠিক। আলাদা এই ঘরে রুমমেট হয়েছে বলেই পরস্পরকে খুব কাছের ভাবছে তারা। কারণ থাক বা না থাক, এই যে যখন তখন কথা বলছে যে-কোনও বিষয় নিয়ে, ছাড়া-ছাড়া, প্রায়ই পারম্পর্য থাকছে না কোনও, এরও একটা মানে আছে সম্ভবত। না হলে শুধুই বিছানা, চারটে দেয়াল আর কচিৎ আকাশের সংস্পর্শে ভারী হয়ে উঠত নিঃশ্বাস। পরচর্চা কিংবা অন্যরা কে কী করছে তা নিয়ে কথা বললে কি নিজেদের আড়ালটাই পাকা হয়ে ওঠে! যদি সব ঘরগুলোই দেয়াল ভেঙে একত্র করে দেওয়া হয় তাদের, তা হলে যাদের নিয়ে এই আড়াল করা কথাবার্তা, কল্পনা, তারাও হয়ে যাবে কাছের। হয়তো পারস্পরিক বাধ্যতাবোধই করে দেবে এমন। হঠাৎ নেমে আসা ঝড়বৃষ্টিতে যেমন হয়—সেই মুহূর্তের দুর্যোগ থেকে বাঁচতে যে যার মতো চারদিক থেকে ছুটে এসে আশ্রয় নেয় গাড়িবারান্দার নীচে। কেউ কাউকে চেনে না। কেউ কথা বলে না। কেউ জানে না কে কোথায় যাবে। নিরপেক্ষ থেকে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের অসহায়তাগুলোকেই চিনিয়ে দেয় শুধু।

একার ভাবনায় নিরাপত্তা নেই কোনও। আর পাঁচজনের মধ্যে নিজেকে রেখে ভাবলে একা লাগে আরও। কেমন নির্জনও।

সকাল আটটা পেরিয়ে এই যে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে ঘরে, এই যে নিজের শরীর, মন, বত্রিশ বছর বয়স, মনে হয় এর গভীরে কোথাও বিস্তৃত হয়ে আছে এক ভীষণ স্তব্ধতা। শরীরে শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ সচল আছে জানলে চেনা যায় বর্তমানটাকে, জানতে পারছে না কোন কোষ থেকে তারা ছুটে যাচ্ছে আর কোন কোষের দিকে, কোন ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করে আছে কোথায়? তাকে ও মাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে, 'সাবধানে থেকো—' বলতে বলতে এক সন্ধ্যায় বাবা যখন নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে, তখন একবারও মনে হয়নি, এই বলেই মানুষটা চিরদিনের মতো চলে যাবে সাবধানের বৃত্ত ছেড়ে। তারপর মা, মা যখন গেল, হঠাৎ শুরু হওয়া কোমার মধ্যে, ঘুমোতে ঘুমোতে, ঠিক তার কিছুক্ষণ আগেই ডিউটি বদল হয়ে রাত জাগার জন্যে ঘরে ঢুকেছে নতুন নার্স। হঠাৎ ঘটনায় মূক, সেদিন হাসপাতালের খোলা জানলা দিয়ে জ্যোৎস্নায় সাজানো আকাশের দিকে তাকিয়ে শুধুই স্তব্ধতা অনুভব করেছিল বিশাখা; একবারও ভাবেনি এই বাড়িটার কথা, অর্পিতার কথা, কিংবা এখানের আর কারও কথা। অথচ এই মুহূর্তে এ-সবই সত্য। এর ওর মধ্যে ইতিহাস খুঁজেছিল অর্পিতা, রহস্যও, তা কি নিজেকে আলাদা করে রাখার জন্যে! অর্পিতা নিজেও কি জানে ঠিক কোনদিকে যাবে সে? কে বলতে পারে।

গলার ভিতর ছোট ছোট হাইয়ের ঢেউ ভাঙতে ভাঙতে উঠে আসছে অনেকক্ষণ চেপে রাখা নিঃশ্বাস। প্রায় জোর করেই নিজেকে সংবরণ করে নিল বিশাখা। মনে মনে বলল, খুব যে! সারাক্ষণ শুধু ভেবে গেলেই চলবে! একই জেরে পাশে তাকিয়ে দেখল, বেডকভার বিছিয়ে বিছানা পরিপাটি করে রাখলেও যেটা আশা করা গিয়েছিল, অর্পিতা তার প্রতি দিনের অভ্যাসে যোগ শুরু করেনি এখনও। ওর পক্ষে অস্বাভাবিক, খাটের ধারে বসে চুপচাপ তাকিয়ে আছে বাইরে। মুখে গাম্ভীর্য মেশানো। কী ভাবছে ও?

এর মধ্যে বাথরুম খালি হয়েছে নিশ্চয়ই। ওদিকে যাবার আগে অর্পিতাকেই দেখল বিশাখা। হাসল।

'কী হল তোমার! আজ বডি-কালচার হবে না?'

অর্পিতা বিশাখার দিকে তাকাল। বলার কথাটা বলতে সময় নিল একটু। তলপেটে আলগা হাত বুলিয়ে বলল, 'অসুবিধে আছে—'

ব্যাপারটা বুঝে আর ঘাঁটাল না বিশাখা। শুধু জিজ্ঞেস করল, 'আজ তোমার প্রোগ্রাম কী? কখন ফিরবে?'

'ইউজুয়াল। সাড়ে ছ'টা, সাতটা। তুমি?'

'হয়তো আগেই।' বিশাখা বলল, 'কলেজ থেকে ন্যাশনাল লাইব্রেরি যাব। ভাবছি আজ অনেকটা কাজ করব।'

অর্পিতা জবাব দিল না। অন্যমনস্ক।

ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে বাইরে বারান্দার দিকে তাকাল বিশাখা। এর মধ্যে আরও খানিকটা রং পাল্টেছে আলো, খুব অস্পষ্ট ভাবে কী যেন কাঁপছে সেখানে। হাওয়া কি? হয়তো। শীত আসার আগে এরকমই হয়।

২

দুপুরের দিকে একটা ফোন পেল অর্পিতা। অফিসে। 'হ্যালো' বলতে ওদিক থেকে ভেসে এল নারীকণ্ঠ, 'কী, ব্যস্ত খুব?'

ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কে। সুতরাং ভুরু কোঁচকাল।

'হু ইজ ইট প্লিজ?'

'হু ইজ ইট!' ওদিকের গলা থমকাল একটু। তারপর বলল, 'বিশাখা। এবার বুঝতে পারছ!'

'আ-রে!' সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গ হল অর্পিতা, 'ভেরি সরি। কী ব্যাপার!'

'শোনো, তাড়াহুড়োয় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি তোমাকে—'

বিশাখার কাছে তার অফিসের এবং তার কাছে বিশাখার কলেজের ফোন নাম্বার থাকলেও শেষ কবে তারা কথা বলেছে টেলিফোনে তা মনে করতে পারল না অর্পিতা। দিনের অর্ধেকের বেশি সময় যাদের একসঙ্গে কাটে, গা-ছোঁওয়া দূরত্বে , একই ঘরে, টেলিফোনে তাদের মধ্যে কথা বলার প্রয়োজন হবে কেন।

অর্পিতা কিছুই অনুমান করতে পারল না।
'কী কথা বলো তো?'
'মনে পড়ছে না?'
নিজের ভিতর সামান্য ঘন হয়ে এল অর্পিতা। ভেবে বলল, 'না তো।'
'তুমি ক্রমশ ভুলো হয়ে পড়ছ।' বিশাখা হাসল যেন, 'আজ বুধবার। মনে পড়ছে এবার? রাতে বাইরে খাবার কথা হয়েছিল—'
'ও। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সরি!'
কথাটা হয়েছিল রবিবার। সেদিনই ওরা বেরুবে ভেবেছিল। ভর সন্ধেয় তুমুল এক পশলা বৃষ্টির পর শীতের হাওয়া এমনই কনকনে হয়ে উঠল যে তখন আর বেরুবার কথা ভাবা যায় না। হোমের ডাইনিং রুমে কোনওরকমে মাংস-ভাত পেটে পুরে ছুটেছিল বিছানায়। সেদিনই কথা হয়েছিল, তা হলে বুধবার সন্ধেয় বেরুবে। এটা গতকাল বা আজ ঝালিয়ে নিতে পারত। দক্ষিণীতে ইতিমধ্যে যা গেল তার ঠেলা সামলাতেই ভুলে গেছে বেমালুম।
অর্পিতা জিজ্ঞেস করল, 'যাবে তো?'
'ইচ্ছে তো ছিল।' বিশাখা ইতস্তত করল অল্প, 'কিন্তু—'
'কী?'
'আমার এক কোলিগ, তমাল ব্যানার্জি, ডেঙ্গু না কী হয়েছে। সামনে পরীক্ষা। ওর ক্লাসগুলো আমাদের ভাগাভাগি করে নিতে হবে। এক গাদা টিউটোরিয়ালের খাতা পাঠিয়ে দিয়েছে—'
'তা হলে থাক। আর একদিন যাব।'
'সেই ভাল—'
অর্পিতার মনে হল কী যেন বাদ যাচ্ছে কথা থেকে। ধরতে পারল না। তখন বলল, 'এখন কি অফ পিরিয়ড?'
'অফই ছিল। তোমার অফিসের লাইন পাচ্ছিলাম না কিছুতেই—' বিশাখা বলল, 'তুমি তা হলে হস্টেলেই ফিরে আসছ?'
'দেখি। বস্ ফিরেছে ট্যুর থেকে। কী বলবে না বলবে তা তো জানি না। একটু দেরি হবে হয়তো।'
'কী শীত গো আজ!'
'সত্যি! মোটে তো নভেম্বরের শেষ। এরপর ডিসেম্বর, জানুয়ারি আছে—'
'তা হলে রাখছি—'
'ও-কে, বিশাখা। বাই—'
অভ্যাসের উচ্চারণ থেকে রিসিভারটা আস্তে নামিয়ে রেখে ক' মুহূর্ত চুপচাপ বসে থাকল অর্পিতা। কেমন যেন খাপছাড়া লাগছে নিজেকে। কেমন যেন স্মৃতিশূন্য।
সামনে ইলেকট্রিক টাইপরাইটারে ইনভিটেশন কার্ড চাপানো। 'মিস্টার অনুপ রায়, ডিরেক্টর, স্টুয়ার্ট মর্গান (ইন্ডিয়া) লিমিটেড রিকোয়েস্টস দ্য প্লেজার অব দ্য কোম্পানি অফ—। খানিক সেদিকে তাকিয়ে থেকে কার্ডের আইভরি শূন্যতায় আমন্ত্রিতের নাম টাইপ করার জন্যে আবার ব্যস্ত হল সে। আরও দুটো কার্ড ও খাম টাইপ করলেই লিস্ট অনুযায়ী

এই কাজটা শেষ। অনুপ এলে, জিজ্ঞেস করে, ডেলিভারির ব্যবস্থা করবে।

অর্পিতা নিয়ম মেনে চলে। সেক্রেটারির ট্রেনিং তাকে শিখিয়েছে আদেশ মানবে কিন্তু প্রশ্ন করবে না কোনও। কিংবা, প্রশ্ন তখনই করবে যখন কাজের দায়িত্বটা তোমাকেই দেওয়া হল, কিংবা বুঝতে পারছ না কিছু, কিছু জানতে চাও। এসব ব্যাপারে তার এফিসিয়েন্সি নিয়ে প্রশ্ন করেনি কেউ। এই যে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই চাকরিতে উঠে এল এতটা— অনুপ রায়ের লেভেলের একটা ইনফ্লুয়েনসিয়াল লোক নিজেই বেছে নিল তাকে, অর্পিতা জানে এর জন্যে কোনও কাঠখড় পোড়ায়নি সে, ধরাকরা করেনি কাউকে। কিন্তু তার নিজের কৌতূহল কে আর নিবৃত্ত করছে!

ডিনারের এই ইনভিটেশনটা অনুপের বাড়িতে বা ক্লাবে নয়, হোটেলে। সেটা কিছু নয়। কিন্তু নতুন ছাপানো কার্ডগুলো হাতে আসার পর থেকেই অর্পিতা ভাবছে, কার্ডে হোস্টের নামের জায়গায় মিস্টার অ্যান্ড মিসেস অনুপ রায়ের পরিবর্তে শুধুই মিস্টার অনুপ রায় ছাপা হল কেন! গত দেড় বছরে, যত দূর মনে পড়ে, এরকম দ্যাখেনি সে। এমনও নয় যে এই পার্টিটা বিশেষ। আমন্ত্রিতদের নামগুলি তার সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাদের তো ঠিকই ডাকা হচ্ছে সেই মিস্টার অ্যান্ড মিসেস দিয়ে, জোড়ে জোড়ে। যেমন হয়। তা হলে কি এমন কিছু ঘটেছে ইতিমধ্যে, যাতে আপাত-অস্বস্তিকর এরকম একটা ডিসিসন নিতে বাধ্য হল অনুপ। হতে পারে। এমনও হতে পারে ওর স্ত্রী, চন্দ্রা, অসুস্থ কিংবা থাকবে না সে দিন, অথচ পার্টিটা দেওয়া জরুরি। অর্পিতা দেখেছে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আর স্টেট গভর্নমেন্টের জন চারেক সিনিয়র অফিসারের নাম নতুন যুক্ত হয়েছে এবারের লিস্টে। কারণ যা-ই হোক, তার পক্ষে জানা সম্ভব নয়—অন্তত যতক্ষণ না অনুপ ডিকটেট করছে তাকে।

কাজ সেরে উঠে দাঁড়াল অর্পিতা। মেরুন শালটা ভাল করে জড়িয়ে নিল গায়ে। ঘরের ঠাণ্ডায় হিম স্পর্শ লাগছে পায়ের পাতায়, কোমরে, পিঠের অনাবৃত অংশে, মুখের ত্বকে। দু হাতে গাল চেপে শরীরের শীতলতা পরখ করল সে; তারপর এগিয়ে গিয়ে এয়ার কন্ডিশনারের নব ঘুরিয়ে কুলার বন্ধ করে ফ্যানটা চালিয়ে রাখল শুধু। শীত পড়লেও মেশিন চালু না রাখলে এয়ার-টাইট এই ঘরটা ভ্যাপসা লাগে কেমন, চালু করার পর আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে যায় ঠাণ্ডাটা। আজ অসুবিধে লাগছে।

কাচের জানলার ওদিকে ময়দান। ঋতুর হিসেবমতো এ সময় পাতা ঝরতে থাকে, শিমূল না পলাশ কী ফোটে যেন। না কি এখনও নয়, আরও পরে, সেই বসন্তে? গোটা কতক নাম বাদ দিলে অর্পিতা ফুল চেনে না, গাছও না। ছোটবেলা থেকে বাড়ি আর বাড়ি আর মোটরগাড়ি আর ট্রাম-বাস-ট্যাক্সি আর ডিজেল, ধোঁয়া, ধুলো, শব্দ দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে প্রকৃতি ব্যাপারটা থেকে গেছে শুধু হঠাৎ-দেখা দৃশ্যে। গাছ, ফুল, মেঘ, বৃষ্টি, ঝড় যখন যেমন আসে চেনা যায় শুধু। দাঁড়ায় না। এড়িয়ে যায়। আজ, এই মুহূর্তে তবু মনস্ক হল সে। সামনে, যতদূর দেখা যায়, সবুজ নিষ্পত্র নয় কোথাও। নরম রোদ যেখানে আকাশটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে মিশিয়ে দিয়েছে দিগন্তে, বিশেষত সেখানে শীতের শুষ্কতার বদলে যেন আরও ঘন আর কালচে হয়ে সমস্ত আড়াল করে দিয়েছে সবুজ। নাকি ভুল। দূর থেকে দেখা সবকিছুর মধ্যেই থেকে যায় বিভ্রম।

আরও কাছে, হঠাৎ চোখে পড়ল, রাস্তা থেকে মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছে এক জোড়া মানুষ। যুবক, যুবতী। হাওয়ায় উড়ছে মেয়েটির লাল শাড়ির আঁচল। সামলাতে গিয়ে জিনস

পরা ছেলেটির এগিয়ে যাওয়া হাত চেপে ধরল মেয়েটি। একান্ত এই দৃশ্য চেনাল না কিছু।

এখানে শব্দ ঢোকে না। কিন্তু কাচে মুখ ঠেসে, নীচে তাকিয়ে জ্যামে আটকে পড়া অসংখ্য গাড়ির পাশ দিয়ে একটা ডাবলডেকারকে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ওভারটেক করতে দেখে অর্পিতার মনে হল তার নিজেরই নৈঃশব্দ্য থেকে হুবহু উঠে আসছে জ্যামের পরিচিত শব্দগুলো।

অশ্রুত, কিন্তু অনুভবে পরিষ্কার, ওই শব্দই চিত্রার্পিত করে রাখল তাকে।

বিশাখার ফোনটা আসার বেশ কিছুক্ষণ আগে ফোন করেছিল চন্দ্রা। অনুপের স্ত্রী। শুধু প্রশ্ন আর অনুযোগ; কাটা-কাটা কথা শুনে মনে হল চন্দ্রা ধরে নিয়েছে বসের সেক্রেটারি বসের স্ত্রীরও সেক্রেটারি। অনুপ অবশ্য এভাবে বলে না।

অথচ ঘটনাটা সামান্য। গত রাত্রেই ট্যুর থেকে ফেরার কথা ছিল অনুপের। টেলেক্সে জেনেছিল ফিরছে না, আজ সকালের ফ্লাইটে ফিরবে। এসব ক্ষেত্রে যা করা উচিত, তখনই বাড়িতে ফোন করে মিসেস রায়কে জানিয়ে দিয়েছিল অর্পিতা। তার পরেই, আজ, যথেষ্ট সময় যেতে না যেতেই কেন যে অমন উগ্র গলায় ফোন করলেন মহিলা তা বোঝা যাচ্ছে না। যেন ট্যুর থেকে অনুপের সময়মতো না ফেরার দায়িত্ব অর্পিতারই! না হলে 'আপনিও জানেন না!', কথাগুলোর মানে কী। চন্দ্রা কি ধরে নিয়েছিল এয়ারপোর্ট থেকে বাড়িতে না গিয়ে সোজা অফিসে এসেছে অনুপ, জেনেশুনেও ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছে অর্পিতা, মিথ্যে কথা বলছে। কত কারণে ফ্লাইট ডিলেড হতে পারে; বিশেষত এই শীতে, যখন অনেকটা বেলা পর্যন্ত চারদিক থিকথিক করে কুয়াশায়, আকাশ দেখা যায় না। আজই সকালে কাগজে পড়ছিল কুয়াশার জন্যে ক'টা ফ্লাইট ছাড়তে দেরি হয়েছে, বাতিল করা হয়েছে কোনও কোনও ফ্লাইট। ন্যাগিং, সি ইজ অ্যাবসোলিউটলি ন্যাগিং!

এসব কথা অনুপকে বলা যাবে না, অর্পিতা ভাবল, তবু ভাল, লাঞ্চের আগে বাড়ি থেকেই ফোন পেল অনুপের, 'আই অ্যাম ব্যাক'। কখন আসবে অফিসে, আজ আদৌ আসবে কি না, তা অবশ্য জানায়নি। কণ্ঠস্বরে ব্যস্ততা ছিল, সামান্য ক্লান্তিও। চন্দ্রার ওই ফোনের পর অর্পিতাও বাড়তি কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পায়নি। শেষপর্যন্ত না এলে জানাবে নিশ্চয়। জানাক, না জানাক, অফিস আওয়ার্স শেষ না হওয়া পর্যন্ত তার ছুটি নেই।

এসব ভাবনায় এমনিতেই এসে যায় ক্লান্তি। কিছু বা অসহায়তাও। ইচ্ছে করলেই এখন সে ডিরেক্টর এবং ভাইস-প্রেসিডেন্ট, মার্কেটিং, অনুপ রায়ের অফিস থেকে বেরিয়ে এই অফিসেরই অন্যত্র গিয়ে কারুর টেবিলের সামনে বসে গল্প করতে পারবে না। পুরুষদের কথা বাদ দিলেও একই ছাদের নীচে কাজ করছে সাত-আটটি মেয়ে, প্রত্যেকেই চেনা। দেড় দু বছর আগেও বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল ওদের সঙ্গে। তখনও ডালহৌসি পাড়ার হেড অফিস থেকে আলাদা হয়ে অনুপ রায়ের আন্ডারে মার্কেটিং ডিভিসন উঠে আসেনি চৌরঙ্গির এই নতুন ঝকঝকে অফিসে। জায়গা কম থাকায় বেশ গায়ে গায়ে লেগে কাজ করত সকলে। তারও প্রোমোশন হয়নি। প্রোমোশন হওয়া এবং এখানে উঠে আসাই ওলটপালট করে দিল সব। এখন নিজের আড়ালে আবদ্ধ থাকা ডেকোরাম মানতে মানতে, অর্পিতা জানে, ওদেরও সে দূরে সরিয়ে দিয়েছে অনেকটা। সামনাসামনি দেখা হলে মুখে আহ্লাদ ফোটালেও বুঝতে পারে ওটা সাজানো, স্বতঃস্ফূর্ত নয়। ঈর্ষা? সমীহ? নাকি ভয়? যদি এ সব না হত, তা হলে, সকলেই তো জানে অনুপ এখন কলকাতায় নেই, এর মধ্যে কেউ না কেউ এসে কিছুক্ষণ

আড্ডা দিয়ে যেত তার সঙ্গে। বুঝতে পারত খুব প্রয়োজন ছাড়া পাঁচটি মিনিটও নিজের জায়গা ছেড়ে বেরুনো তার পক্ষে কত অসুবিধের। না, কেউই আসেনি; আসে না। শুধু নিবেদিতাই যা আসে কখনও সখনও, দু এক মিনিটের উঁকি দিয়ে চলে যায় আবার। ওর দোষ নেই। রিসেপশনিস্টের দায় আরও বেশি, অর্পিতা জানে, জায়গা ছেড়ে নড়বার উপায় নেই, যখন তখন লোক আসছে, রিসিভ করতে হচ্ছে চিঠিপত্র, অপেক্ষমাণ ভিজিটরদের সামনে হাসিমুখ, সারাক্ষণ সাজিয়ে রাখতে হচ্ছে নিজেকে। একটাই সুবিধে, রিসেপশন থেকে পা বাড়ালেই ডিরেক্টরের অফিস।

একভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই টেলিফোনের শব্দে সচকিত হল অর্পিতা। তাড়াতাড়ি এসে রিসিভার তুলল। ইম্‌পর্ট্যান্ট কেউ নয়। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় এসেছে এস স্বোয়ামীনাথন নামে কেউ, তাদের প্রোডাক্টস-এর সোল এজেন্সি নিতে ইচ্ছুক, সেই সুবাদে দেখা করতে চায় অনুপের সঙ্গে। বলল অনুপ তাকে চেনে। অর্পিতা ভাবছিল কলটা ট্রান্সফার করে দেবে সেলস ডিপার্টমেন্টে, শেষের বাক্যটিই নিরস্ত করল তাকে। ভদ্রলোকের ফোন নাম্বার নিয়ে বলল মিস্টার রায় ফিরলে কথা বলে জানাবে।

কথার মধ্যেই দেখল দরজা ঠেলে অর্ধেক ভিতরে অর্ধেক বাইরে রাখা তেরছা ভঙ্গিতে এসে দাঁড়িয়েছে সুধীর খান্না। রিজিওনাল সেল্‌স্ ম্যানেজার হিসেবে কিছুদিন হল জয়েন করেছে স্টুয়ার্ট মর্গানে। বয়স বেশি নয়; বস্তুত ওর বায়োডাটা দেখে অর্পিতা জেনেছিল তার চেয়ে বছরখানেকের ছোট। ছেলেটি চটপটে ও পরিপাটি, স্মার্ট বলতে যা বোঝায়, হাঁটাচলা ও আদব কায়দায় নিজেকে দেখানোর চেষ্টাটা চোখ এড়ায় না কারও। এই দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা যেমন। প্রথম আলাপেই বলেছিল মিস্টার খান্না না বলে তাকে সুধীর নামে ডাকতে। অর্পিতা পারেনি, আমলও দেয়নি; কিন্তু লক্ষ করেছিল সুধীর তাকে অর্পিতা নামেই সম্বোধন করছে, মিস মজুমদার নয়। একটু গায়ে-পড়াও। এটা নিবেদিতারও ধারণা; বলেছিল, 'মিস্টার রায়কে ম্যানেজ করতে হলে তোমাকে খুশি করতে হবে, ও সেটা জানে। না হলে অ্যাকসেস পেতে অসুবিধে হবে। হি ইজ আ টিপিকাল নিউ জেনারেশন ম্যানেজার। ওকে একেবারে পাত্তা দিও না—'

সামান্য অন্যমনস্ক, সুধীরের দিকে তাকিয়ে নিবেদিতার কথাগুলোই ভাবল অর্পিতা।

যে-কোনও পুরুষ সম্পর্কে চট করে ধারণায় পৌঁছে যেতে পারে নিবেদিতা। হয়তো ওর নিজের অভিজ্ঞতাই শিখিয়েছে এইসব। এ অফিসে ওকে নিয়েও কম গুজব নেই। অর্পিতা জানে ওর ডিভোর্স হয়ে গেছে স্বামীর সঙ্গে, মেয়েকে নিয়ে একাই থাকে। তবু সরু করে সিঁদুর পরে বাঁ-দিক ঘেঁষা সিঁথিতে। 'এই চিহ্নটার একটা দাম আছে—', অর্পিতা কৌতূহল দেখানোয় বলেছিল একদিন, 'ইউ ফিল সেফ্। না হলে অনেক পুরুষই ভেবে নেয় ভাড়া বাড়ি, টু-লেট—।'

নিবেদিতার বলায় কান্না ছিল, যদিও ভাঙেনি নিজেকে। রেস্তোরাঁয় অর্পিতার সঙ্গে বসে, মুখ ফিরিয়ে, হাতের তালুতে গাল পেতে এমন ভাবে তাকিয়েছিল দূরে যে সামনাসামনি বসেও একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিল দুজনের মধ্যে। অর্পিতা বুঝতে পারেনি নিবেদিতার ধারণা কতটা সত্যি, কিংবা, মিথ্যে সিঁদুরের আঁক ডিভোর্স হয়ে যাওয়া এই মেয়েটিকে সত্যিই কোনও নিরাপত্তা দিয়েছে কি না। এই যে আত্ম-প্রতারণা, এ কি সত্যিই কোথাও নিয়ে যাচ্ছে নিবেদিতাকে?

ফোন ছেড়ে, সুধীর তাকেই দেখছে লক্ষ করে শালটা যথাযথ করে নিল অর্পিতা।

'ইয়েস, মিস্টার খান্না?'

'নাইস টু হ্যাভ ইওর অ্যাটেনশন!' নাটকীয় ভঙ্গিতে ভুরু তুলে চোখদুটো গোল করে সুধীর বলল, 'বসের কোনও খবর আছে? কখন আসছেন?'

'কেন! ওঁর সঙ্গে কাজ আছে কিছু?'

'ও ডিয়ার! কাজ ছাড়া কি মানুষ খবর নিতে পারে না!'

ওর বলার ধরনে হেসে ফেলল অর্পিতা।

'ফিরেছেন। যে-কোনও সময়ে এসে পড়বেন। দেখা করতে চাও?'

সুধীর তাকেই দেখছে, নাকি এইভাবে দেখার ছলে ছুতো খুঁজছে তা বুঝতে পারল না অর্পিতা। চোখ নামিয়ে নিল।

আসল প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে সুধীর বলল, 'ইয়েস অ্যান্ড নো। তুমি কেমন আছ দেখতে এলাম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ—'

'এত গম্ভীর কেন! লাঞ্চ খাওনি মনে হচ্ছে!'

এটা নিছকই ফিচলেমি; অনুপ না-থাকার সুযোগ নিচ্ছে সুধীর। চোখ না তুলেই বোঝা যায় ওর তাকানোর ধরনটা ভাল নয়। এই শরীর, বুকের এই ভঙ্গিমা নিয়ে যতই গর্ব থাক তার, বড় অস্বস্তিতে পড়তে হয় মাঝে মাঝে। আপাতত কড়া করে পাল্টা দেবে ভেবেও থেমে গেল অর্পিতা। সুধীরের দৃষ্টির লক্ষ্য অনুমান করে শালটা গলার কাছে আরও একটু টেনে নিয়ে বলল, 'প্রশ্নটা লাঞ্চের আগে করলেই ভাল হত না?'

'সরি। ইটস মাই ল্যাপস। আই—'

সুধীর খান্না আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেলিফোন বেজে উঠল আবার। রিসিভার তুলে, মুখ চাপা দিয়ে, দ্রুত গলায় অর্পিতা বলল, 'সো নাইস অফ ইউ, মিস্টার খান্না। মিস্টার রায় এলে তোমাকে জানাব—'

সুধীর চলে যেতে দরজাটার আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাওয়া দেখতে দেখতে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসল অর্পিতা। রিসিভার কানে দিয়ে রেসপন্ড করল। বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড খবরের কাগজের অফিস থেকে খুঁজছে অনুপ রায়কে—বেবি প্রোডাক্টস রেঞ্জ নিয়ে স্টুয়ার্ট মর্গান যে বাজারে নামার পরিকল্পনা করেছে, সে-সম্পর্কে ইন্টারভিউ করতে চায়। রিপোর্টার ভদ্রলোকের নাম জেনে নিয়ে অর্পিতা বলল অনুপের সঙ্গে কথা বলে সে জানিয়ে দেবে। হ্যাঁ, অবশ্যই। কালই।

রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ মিলিয়ে যাবার পরও অনুরণন তুলছে কানে। ডায়েরিতে কলটা নোট করে কব্জি তুলে সময় দেখল অর্পিতা। পৌনে তিনটে। চকিতে হাই উঠে এল গলায়। অনুপের ফোন এসেছিল একটার কিছু আগে; কেজো, অফিস-পাগল মানুষ বাড়িতে লাঞ্চ-টাঞ্চ সেরে এর মধ্যেই এসে যেতে পারত। কিছু হল নাকি? ভাবল, তার কি ফোন করা উচিত ছিল ইতিমধ্যে? কিন্তু, যদি এমন হয় যে ক্লান্ত, বিশ্রাম নিচ্ছে, তা হলে ডিসটার্ব করা হবে। এমনও হতে পারে, ফোন ধরবে চন্দ্রা— । না, থাক। অন্তত চারটে পর্যন্ত দেখা যেতে পারে।

চেয়ারটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বাইরে তাকাল অর্পিতা। খানিক আগে যেমন দেখেছিল

তার চেয়ে অন্যরকম, কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আছে আকাশ। শীতের বেলা, ক্লান্ত রোগীর মতো হঠাৎ কখন পাশ ফেরে রোদ, ঢলে পড়তে চায় ঘুমে, টের পাওয়া যায় না। তার পরেই দ্রুত এগিয়ে আসে অন্ধকার। কাল সে আগেই বেরিয়েছিল অফিস থেকে, মিনিবাস ধরে যখন দক্ষিণীতে পৌঁছল তখন সবে সাড়ে পাঁচটা। কালও দেখেছিল এরকম।

দৃশ্যের স্মৃতিই টেনে নিল বাস্তবে; অন্য এক দৃশ্যে। কাল দক্ষিণীতে ফিরে যা দেখেছিল, আগে কখনও তা দেখেছে বলে মনে করতে পারল না অর্পিতা। সাধারণত অফিস থেকে সে যখন ফেরে তখন প্রায় দিনই বন্ধ হয়ে যায় অফিসঘর, তালা লাগিয়ে সুপারিনটেনডেন্ট মিসেস দাশও ঢুকে পড়েন নিজের ঘরে। তারপর কারও কিছু দরকার হলে কিংবা কিছু ঘটলে দেখবেন বা শুনবেন কি না তা নির্ভর করে তাঁর মর্জির ওপর।

কাল অফিস খোলা ছিল। গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকেই অফিসঘর থেকে ভেসে আসা কোলাহল শুনেছিল অর্পিতা। কাছে গিয়ে দেখল, একটা চেয়ারে মাথা নিচু করে বসে আছে ছন্দা, আর থেমে-থমকে এক-একটা প্রশ্ন ওর দিকে ছুড়ে দিচ্ছেন মিসেস দাশ। শুধু ওই দুজনই নয়, ঘরের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সুলেখা, মমতাদি, সুবর্ণা, এমনকী বিশাখাও। অর্পিতাকে দেখে মিসেস দাশ বললেন, 'এই যে, অর্পিতা, তুমিও এসো। আমি তোমাদের সবাইকেই ডেকেছি—যাতে তোমাদের সামনেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়—'

হঠাৎ এসব শুনে অর্পিতা বুঝতে পারছিল না কী হয়েছে, কেনই বা উত্তেজনা।

সে কিছু বুঝে ওঠবার আগেই ঘরে ঢুকল শুক্লা, মেক-আপ নিয়ে ফিটফাট, মনে হল বেরুচ্ছে কোথাও। বলল, 'এখনও মিটিং শেষ হয়নি! ছন্দা যখন সময় চাইছে দু তিনদিন, দিচ্ছেন না কেন!'

'সময় অনেক দেওয়া হয়েছে ওকে। প্র্যাকটিক্যালি দু মাস!' মিসেস দাশ বললেন, 'এখানে থাকার একটা নিয়ম আছে, সেটা সবাইকেই মেনে চলতে হবে। আমাকে কমিটির কাছে জবাবদিহি করতে হয়!'

অর্পিতা ছন্দাকে দেখছিল। এমনিতেই ফ্যাকাশে ওর মুখখানি নীরক্ত লাগছে আরও, যেন খুব ভয়ের মধ্যে আছে, মাঝে মধ্যে দাঁত ঘষছে ঠোঁটে। ওর তাকিয়ে থাকার মধ্যেই মেয়েটির গাল বেয়ে জল গড়াতে লাগল।

'শুনুন, কমলাদি—', চুপচাপ মানুষ মমতাদি বললেন, 'নিশ্চয়ই মেয়েটা অসুবিধায় পড়েছে—'

'আপনারা একই কথা বারবার বলছেন কেন! সুবিধে অসুবিধে আমিও বুঝি!' মমতাদির মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন মিসেস দাশ। তারপর অন্যান্য মুখগুলির দিকে তাকিয়ে নিয়ে সোজাসুজি চোখ রাখলেন ছন্দার মুখের ওপর, 'তাছাড়া, পার্মানেন্ট চাকরি ছাড়া এখানে কাউকে থাকতে দেওয়া হয় না। আমি ওর অফিসে ফোন করে জেনেছি, ওটা পার্মানেন্ট চাকরি নয়। ও জাল সার্টিফিকেট দিল কেন!'

'বিশ্বাস করুন, আমি জাল সার্টিফিকেট দিইনি।' ছন্দা ডুকরে উঠল এবার। সেইভাবেই, ভাঙাচোরা মুখ নিয়ে বলল, 'আমি ওদের একটা সার্টিফিকেট দিতে বলেছিলাম। ওরা যা দিয়েছে তা-ই সাবমিট করেছি—'

'দ্যাখো বাপু! কান্নাকাটি কোরো না।' মিসেস দাশ বললেন, 'আমারই ভুল। বিশ্বাস করে আমাকে ঠকতে হল। কিন্তু, এসব আমি অ্যালাউ করব না।'

এতক্ষণে ব্যাপারটা কিছুটা আঁচ করতে পারছিল অর্পিতা। বিশাখার সঙ্গে চোখাচোখি হতে ইশারা টের পেল এবং বলল, 'দোষটা তা হলে যারা সার্টিফিকেট দিয়েছে তাদের। ও কী করবে। তা ছাড়া আজকাল এ ধরনের চাকরি অনেক হয়েছে—ছন্দা নিশ্চয়ই ওয়ার্কিং উয়োম্যান ক্যাটাগরিতে পড়ে—'

'আমি এটা আগেই বলেছি।' ফোড়ন কাটার ধরনে শুক্লা বলল, 'কে শুনছে!'

'দ্যাখো, এভাবে বলবে না!' চাপা ক্ষোভ মিসেস দাশের গলায়। নিজের কোণঠাসা অবস্থাটা টের পেয়েই সম্ভবত ঝাঁজ মেশালেন পরের কথাগুলোয়, 'ওয়ার্কিং, কিন্তু রোজগার নেই—দু মাসের টাকা বাকি, এদিকে সব ফেসিলিটিজ এনজয় করেছে! তোমরা কি সে-খবর রাখো! এটা কি দানছত্র!'

কমলা দাশের কথায় কিছু ছিল। প্রায় নিরুপায় ভঙ্গিতে এ ওর মুখের দিকে তাকাল ওরা। কেউই কিছু বলল না।

'ঠিক আছে।' মিসেস দাশ বললেন, 'কালকের দিনটা সময় দিচ্ছি। কালকের মধ্যে ডিউজ ক্লিয়ার না করলে আমি নাচার। পরশু সকালে ওকে চলে যেতে হবে—'

এর পরের ঘটনার জন্যে কেউই প্রস্তুত ছিল না। সকলেই দেখল, টেবিলে মাথা রেখে, সামনে হাত ছড়িয়ে, প্রায় নিঃশেষিত ভঙ্গিতে ছন্দা বলছে, 'আমাকে তাড়াবেন না! আপনার পায়ে পড়ছি—আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই—'

'ছন্দা!'

বিশাখা এতক্ষণ চুপচাপ ছিল, যেমন থাকে। ছন্দার শেষের কথাগুলি এবং কান্নাই ওকে নাড়িয়ে দিল সম্ভবত। নিজের স্তব্ধতা থেকে বেরিয়ে ধমক দিয়ে উঠল হঠাৎ। তারপর, একটু থেমে, মিসেস দাশকে লক্ষ করে বলল, 'আপনি কী করবেন না করবেন পরে দেখা যাবে। তবে সকলের সামনে ওকে এভাবে টরচার করাটা ঠিক নয়।'

'টরচার! আমি টরচার করছি!'

'টরচার ছাড়া কী!' পিছন থেকে ছন্দাকে টেনে তুলে ওকে সুস্থির করতে করতে পিঠের আঁচলটা ঠিক করে দিলেন মমতাদি। সেদিকে তাকিয়ে বিশাখা বলল, 'ডিসিসন যখন নিয়েই ফেলেছেন ওকে থাকতে দেবেন না—তখন শেষ মুহূর্তে আমাদের ডেকে এনে এই প্রহসন করার মানে ছিল না!'

'এটা প্রহসন!' ঘাবড়ে গিয়ে মিসেস দাশ বললেন, 'তোমরা যাতে জানতে পারো—পরে আমাকে ব্লেম না করো—সেই জন্যেই—'

'সেটা একমাস আগে করলেন না কেন! আমরা ওকে বোঝাতে পারতাম!'

'একস্যাক্টলি!' শুক্লা বলল, 'এটা ইনসাল্ট।'

শুক্লার কথা নয়, যেন বিশাখার প্রতিক্রিয়াই অস্বাভাবিক লাগল মিসেস দাশের কাছে। হতচকিত ধরনে ক' মুহূর্ত ওর মুখের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বললেন, 'তুমিও যখন একথা বলছ, বিশাখা, তখন আমার আর কিছুই বলবার নেই। ছন্দাকে আমিই নিয়েছিলাম। তোমাদের কারও সুপারিশে নয়। আজ তোমরা আমাকে দুষছ! বেশ তো, তোমরা একটা জয়েন্ট পিটিশান দাও যে ও যা করেছে ঠিকই করেছে, আমি কমিটিকে পাঠিয়ে দেব। কমিটি যা করবার করবে। দরকার হলে সরিয়ে দেবে আমাকে—'

পাতলা হয়ে আসা কাঁচাপাকা চুলের নীচে ছোট, সাদা কপাল এবং নাকের ওপর আলগা

হয়ে বসা সরু ফ্রেমের চশমা, মিসেস দাশের অভিজ্ঞ মুখে ছায়া পড়ল হঠাৎ। চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে দু হাতের উল্টোপিঠে চোখ রগড়াতে শুরু করলেন। মনে হয় বিরক্ত, অপমানিতও। যা বলেছেন তার বেশি বলতে পারবেন না বলেই নিজের অভিব্যক্তি আড়াল করছেন এখন।

'আপনি ভুল বুঝছেন।' বিশাখা বলল, 'দোষ আপনাকে কেউই দিচ্ছে না।'

মিসেস দাশ আর কিছু বললেন না। আর কেউই না।

অর্পিতা বুঝতে পারছিল, মূল ঘটনা থেকে সরে এসে আলোচনাটা যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে ছন্দার সমস্যার সমাধান হবে না। বিপদগ্রস্ত একজনকে এভাবে চোখের সামনে হেনস্থা হতে দেখলে যে-কারুরই খারাপ লাগবার কথা। বিশাখার বা তাদের প্রতিক্রিয়াও সেইজন্যেই। তা বলে মিসেস দাশও যে ভুল করেছেন তা বলা যাবে কি! বোঝাই যাচ্ছে আড়ালে অনেকবার ছন্দাকে ওয়ার্নিং দিয়েছেন তিনি। এখানের নিয়ম অনুযায়ী মেয়েটিকে সরিয়ে দিলে কারুরই কিছু বলবার থাকত না। সে-অধিকার অবশ্যই আছে মিসেস দাশের। এমনও হতে পারে চাকরির দায়িত্বের সঙ্গে নিজের পক্ষে সমর্থন খুঁজছিলেন তিনি; মাঝখান থেকে অন্যরকম হয়ে গেল সবকিছু।

ঘটনাটা হঠাৎই স্তব্ধতা এনে দিল দক্ষিণীতে।

'কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!' ঘরে এসে বিশাখা বলল, 'ও এখন যাবে কোথায়?'

অর্পিতাও একই কথা ভাবছিল। মেয়েটা এক ধরনের সেন্স্ অফ ইনসিকিউরিটিতে ভোগে, ছন্দা এখানে আসবার পর পরই বলেছিল বিশাখা। তারপর অবশ্য ওকে নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয়নি কোনও। দিন দুয়েক শুক্লার ঘরে থেকে নীচে সুলেখার ঘরে চলে যাবার পর থেকে দেখাসাক্ষাৎ হতই না প্রায়; হলেও জড়োসড়ো, এড়িয়ে যেত, একটুখানি নার্ভাস হাসি দেখানো ছাড়া আলাপের আগ্রহ ছিল না ছন্দার। কারণটা বোঝা যাচ্ছে এখন।

'ও একটা কথা বলল, নিশ্চয়ই শুনেছ, যাবার জায়গা নেই?' পুরো ব্যাপারটা নিয়ে এলোমেলো ভাবতে ভাবতে অনেকক্ষণ পরে অর্পিতা বলল, 'কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে। ফর্ম ফিল-আপ করার সময় লোকাল গার্জেনের নেম, অ্যাডড্রেস দিতে হয়—'

'হয়ই তো। আমরাও দিয়েছি!' অনিচ্ছায় হাসল বিশাখা, 'সেগুলো যাবার জায়গা হলে এখানে আসব কেন!'

অর্পিতা জানে এটাই প্রশ্ন। উত্তরটাও আছে প্রশ্নেরই মধ্যে। তখন দুজনেই চুপ করে গেল।

কথাটা উঠেছিল আবারও। রাত্রেই ওরা ঠিক করেছিল ছন্দার কী হবে না হবে সেটা ছন্দাই ভাববে; এরকম কারও দায়িত্ব নেওয়া কি সত্যিই সম্ভব তাদের পক্ষে? তবে, আপাতত অন্তত এক মাসের টাকা ওরা ভাগাভাগি করে দিয়ে দিতে পারে, যাতে এখনই ওকে চলে যেতে না হয়। ও সময় পাবে, মিসেস দাশও অ্যাকশন নিতে বাধ্য হবেন না। 'ওঁকে রেসপনসিবল করাটা লজিকাল নয়।' অর্পিতাই বলেছিল, 'আফটার অল এটা অরফ্যানেজ বা ওয়েলফেয়ার হোম নয়—'

'ও কি আর তা জানে না!'

আজ সকালে শঙ্করীকে দিয়ে ছন্দাকে ঘরে ডেকে পাঠিয়েছিল বিশাখা। যা ভেবেছিল তা নয়, দরজার পর্দা সরিয়ে ছন্দা ঘরে ঢোকার পর অর্পিতা দেখল, কালকের বিধ্বস্ত ভাবটুকু

এরই মধ্যে কাটিয়ে উঠেছে ও, চোখমুখও বেশ পরিচ্ছন্ন। এমন অপমানের পর রাত্রে ঘুম না হবার কথা। ওকে দেখে কিন্তু মনে হচ্ছে ভালই ঘুমিয়েছে, মুখের লাবণ্যে ক্লান্তি নেই, তবে দাঁড়ানোর ধরনে সঙ্কোচ চোখ এড়াল না।

'এসো।' ছন্দাকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বিছানায় বসল বিশাখা, 'একটা কথা বলব বলে ডাকলাম তোমাকে। সকলের সামনে বলা যেত না—'

সোজাসুজি তাকিয়ে একবার বিশাখাকে দেখল ছন্দা, তারপর অর্পিতাকে। চোখ নামিয়ে নিল।

অর্পিতা আগেই বলে রেখেছিল সে কিছু বলবে না। মোটামুটি একটা হিসেব কষে নিজের অংশের টাকাটা দিয়ে দিয়েছিল বিশাখাকে। এর পরের দায় বিশাখার। নিজের বিছানায় আধশোয়া হয়ে খবরের কাগজটা টেনে নিল অর্পিতা।

'কাল আমাদের সকলেরই খারাপ লেগেছে—।' বিশাখা বলল, 'তবে মানুষের সুখ, দুঃখ, সমস্যা তো থাকেই, ভেঙে পড়লে চলবে কেন!'

ছন্দা জবাব দিল না। চোখও তুলল না।

বিশাখা বলল, 'তোমার চাকরির আনসার্টেনিটির কথা বলেছিলে। নতুন কোনও ঝামেলা হয়েছে নাকি?'

গলা পরিষ্কার করে নেওয়ার ধরনে একটু কাশল ছন্দা। চোখ তুলল এবং নামিয়ে নিল। তারপর ঈষৎ কাঁপা গলায় বলল, 'রিসার্চের তিন চারটে প্রোজেক্ট ক্যানসেল হয়ে গেছে। কবে কী হবে কিছু বলছে না—'

'এরকমই ভাবছিলাম। পার্মানেন্ট চাকরি না হলে এই অনিশ্চয়তার ভাবটা থেকেই যায়। তুমি কি কিছু ভেবেছ?'

ছন্দা চুপ করে থাকল।

'কিছু মনে কোরো না। আমরা তোমার চেয়ে বয়সে বড়—ভাবলাম তোমাকে যদি সাহায্য করতে পারি, মানে—'

বিশাখা নিজেও ইতস্তত করছিল। ঠিকঠাক কথার অভাবে খানিক থেমে থেমে, নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'আমরা তোমাকে একমাসের মতো টাকা দিচ্ছি। ধরো, ধারই দিচ্ছি। তুমি এখানের কিছু ডিউজ মিটিয়ে দাও। তারপর না হয়—'

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়েছিল। টাকাটা আছে ওর ব্যাগে। এখনই বের করে দিতে পারে।

তার আগেই ছন্দা বলল, 'টাকার দরকার নেই, বিশাখাদি।'

'কেন!' বিস্ময়বোধক প্রশ্নটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশাখা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি চলে যাবে?'

খুব দ্রুত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল ছন্দা, যার অর্থ 'না'।

কিছুটা অবাক ভাব নিয়ে অর্পিতা নিজেও উঠে বসেছে ততক্ষণে। বলল, 'আমাদের কাছ থেকে নিতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। তুমি চাওনি, আমরাই দিচ্ছি।'

'সেজন্যে নয়। আসলে—।' বলতে বলতে থেমে গেল ছন্দা, পরে বলল, 'টাকা লাগবে না এখন। আসলে—আপনারা বলবেন না কাউকে—কাল রাত্রে শুক্লাদি ডেকেছিল আমাকে। আমি নিতে চাইনি, জোর করেই টাকাটা দিল আমাকে। সবটাই।'

'শুক্লা দিল!'

অর্পিতা দেখল, বিশাখা গুটিয়ে নিচ্ছে নিজেকে। পরের কথাগুলো খুঁজে পাচ্ছে না। বস্তুত সে নিজেও বুঝতে পারেনি সাহায্যের প্রস্তাবটা এইভাবেই ঘা খাবে। তখন বলল, 'শুক্লা দিয়ে দিল! জাস্ট লাইক দ্যাট! তুমিও নিয়ে নিলে।'

'না, তা নয়।' অপ্রস্তুত, কিছু বা সঙ্কুচিত হয়ে ছন্দা বলল, 'উনি তো জানতেন না কিছুই। কালই জেনেছেন। আমাকে বললেন, হোটেলে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে, ওঁর কাছে চাকরিরও খোঁজ আছে—'

'হোটেলে চাকরি!'

'হোটেলে কি না জানি না। অন্য কোথাও হতে পারে।'

বিশাখা আগেই চুপ করে গেছে। অর্পিতা বুঝতে পারছিল না এর পরেও কিছু বলবার আছে কি না। দু এক মুহূর্ত ছন্দার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ব্যস্তভাবে বলল, 'তা হলে আর প্রব্লেম কি! ঠিক আছে, যাও।'

ছন্দা তৈরিই ছিল। 'যাও' বলতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

কিছুক্ষণ পর্দার দিকে তাকিয়ে থেকে বিশাখার দিকে চোখ ফেরাল অর্পিতা।

'কী ব্যাপার বলো তো! হঠাৎ শুক্লা এমন জেনারাস হয়ে উঠল কেন!'

'আমি কি সাইকোলজিস্ট যে কে কী করছে, কেন করছে, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারব!' হেসেই বলল বিশাখা, 'আমরাও তো চেয়েছিলাম জেনারাস হতে। কেন চেয়েছিলাম! হিসেব এইভাবেই উল্টেপাল্টে যায়।'

'আমার কিন্তু উল্টোপাল্টাই লাগছে। বিশেষ করে চাকরি দেবে শুনে—'

'দেয়নি তো এখনও। আগে দিক। বলা যায় না—দিতেও পারে। মেয়েটার একটা গতি হবে তা হলে।'

হাসতে হাসতেই এগিয়ে গিয়ে টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে নিল বিশাখা। জিপ টেনে বলল, 'তোমার টাকাটা ফেরত দিয়ে দিই। এ ঘরের হিসেবটা অন্তত ঠিক থাক।'

'দেয়ার ইজ সামথিং ইন দিস ডিল। তোর কি মনে হয় ছন্দাকে আমাদের সাবধান করে দেওয়া উচিত?'

'না। হয় না।'

ভাগের টাকাটা অর্পিতার টেবিলে চাপা দিয়ে রেখে সরে গেল বিশাখা। জানলা খুলল। সহসা হাওয়ায় তারতম্য ঘটছে এতক্ষণ আড়াল-করা ঘরের তাপে। শীতের রোদ উঠি-উঠি করেও ওঠেনি এখনও।

অর্পিতা বিশাখাকেই দেখছিল।

জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বিশাখা বলল, 'আমাদের কাছে শুক্লা যা ছন্দাও তা। কাকে কতটুকু জানি! হেলপ করতে চেয়েছিলাম, ছন্দা নিল না, ব্যস! আমাদের আর কোনও দায়িত্ব নেই। এডাল্ট মেয়ে, ও যা ভাল বুঝবে তা-ই করবে।'

বিশাখা এইরকমই। সারাক্ষণ গণ্ডি কেটে রাখছে নিজের চারদিকে; একবার এই গণ্ডির ভিতর ঢুকে পড়লে মাঝখানের দূরত্ব হঠাৎই বেড়ে ওঠে যেন। এগোনো যায় না।

এই মুহূর্তে, যখন অনুপের অফিসে আসার অপেক্ষায় সময় গোনা আর মাঝেমধ্যে টেলিফোন অ্যাটেন্ড করা ছাড়া কাজ নেই কোনও, তখন নিজের নির্জনতায় বসে গতকাল

এবং আজ সকালের ঘটনাগুলো মনে করতে করতে অর্পিতা অনুভব করল বিশাখা আমল না দিলেও ছন্দা সম্পর্কে তার মনে খটকা থেকে গেছে এখনও। এমনও মনে হল, ছন্দা যতটা বলেছে তাদের কাছে এড়িয়ে গেছে তার চেয়ে বেশি, এর মধ্যে আরও কিছু থাকতে পারে। শুক্লাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেত হয়তো। কিন্তু, সত্যি, যেত কি? মনে হয় বিশাখার কথাই ঠিক, তাদের কাছে শুক্লা যা ছন্দাও তা-ই। কার হাত ধরে কে এগোবে, কোনদিকে যাবে, কে বলতে পারে! কে জানে, শুক্লাই হয়তো ভাগ্য ফিরিয়ে দেবে ছন্দার! হয়তো—

দরজা নড়ে উঠতে ছেদ পড়ল ভাবনায়। হয়তো অনুপ, ভেবে চকিত হয়েছিল অর্পিতা। দেখল, এক তাড়া চিঠিপত্র নিয়ে পিওন রামেশ্বর ঢুকছে। নিবেদিতাই রিসিভ করেছে এসব। অর্পিতার টেবিলে ওগুলো নামিয়ে রেখে রামেশ্বর বলল, 'উপাধ্যায় মেমসাব কফি বোলি হ্যায় উধর। আপসে বোলনে কে লিয়ে কহা। আসবেন তো?'

রামেশ্বর উত্তরপ্রদেশের লোক। বহু দিন আছে এ অফিসে। বাংলা জানে, বলেও প্রায়ই। তবে নিবেদিতা এবং আরও কেউ কেউ যেহেতু হিন্দিতেই কথা বলে ওর সঙ্গে, সেজন্যে কার সঙ্গে কোন ভাষায় কথা বলবে তা গুলিয়ে ফেলে মাঝে মাঝে।

তিনটে, সওয়া তিনটে নাগাদ এমনিতেই কফি দিয়ে যায় এখানে। নিবেদিতা জানে অর্পিতা একা, সেইজন্যেই ডেকে পাঠিয়েছে। রিসেপশন ছেড়ে এখন ওর পক্ষে উঠে আসা সম্ভব নয়।

রামেশ্বর অপেক্ষা করছে উত্তরের জন্যে। অর্পিতা ভাবল একটু। অনুপ যে-কোনও সময়েই এসে পড়তে পারে, এসেই তার সেক্রেটারিকে রিসেপশনে দাঁড়িয়ে কফির কাপে চুমুক দিতে দেখলে অর্পিতার পক্ষে অন্তত দৃশ্যটা শোভন হবে না। কিন্তু পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই যে এসে পড়বে লোকটা তারও কোনও নিশ্চয়তা নেই। এদিকে ইচ্ছে করছে বেরুতে, ইচ্ছে করছে কথা বলতে কারুর সঙ্গে।

সাত-পাঁচ ভেবে অর্পিতা বলল, 'ঠিক আছে, দাও ওখানে। তাড়াতাড়ি দাও। আমি আসছি।'

রামেশ্বর চলে যাবার পর অপারেটরকে ফোন করল অর্পিতা। সে কিছুক্ষণ সিটে থাকবে না, বলল, ইতিমধ্যে কোনও কল এলে যেন রিসেপশনে দেওয়া হয়। তারপর বেরিয়ে এল।

ফাঁকা রিসেপশনে বসে সিগারেট টানছে একটিই লোক। গায়ে কটকটে নীল শার্টের ওপর ছাইরং জ্যাকেট, টাই না পরায় কেমন উদাসীন এবং বেখাপ্পা লাগে। কার ভিজিটর কে জানে। প্রায় একা বসে পুরনো 'টাইম' ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল নিবেদিতা। রামেশ্বরের উপাধ্যায় মেমসাব। বাতিল হয়ে যাওয়া পদবীটা বদলায়নি এখনও। অর্পিতাকে দেখে বলল, 'কাল নিজেই এসেছিলে। আজ খবর পাঠাতে হল কেন।'

'কাল বস ছিল না। আজ আসছে। যে-কোনও সময়েই এসে পড়তে পারে—।' অর্পিতার স্বচ্ছন্দ লাগছিল নিজেকে, অপেক্ষমাণ লোকটির দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় নিবেদিতাকে জিজ্ঞেস করল, 'কার ভিজিটর?'

'খান্নার। কাল দেখা করেনি। আজ ওয়েট করতে বলে বসিয়ে রেখেছে আধঘণ্টার ওপর।' নিবেদিতা বলল, 'খান্না ইজ লাইক দ্যাট।' অর্পিতা আবারও লোকটির দিকে তাকাল। বসে আছে মাথা নিচু করে। যেন খুব চিন্তিত; হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিয়ে আর একটি ধরাল। আগেও কি দেখেছে কোথাও? মনে পড়ল না ঠিক।

নিবেদিতা যেখানে বসে তার কাছেই সোফা আছে একটা। বসবে ভেবেও বসল না অর্পিতা। বরং কাচের দরজার দিকে মুখ করে দাঁড়াল, যাতে অনুপ এলেই দেখতে পায় এবং চলে যেতে পারে নিজের জায়গায়। এখান থেকে বাইরেটা দেখা যায় আংশিক। তামার টবে পাতাবাহার। তার পাশে টুলে বসে আছে ইউনিফর্ম পরা নেপালি দারোয়ান। অনুপ এলে ওই লোকটাই উঠে দাঁড়াবে প্রথম।

রামেশ্বর কফি দিয়ে গেল।

'বসবে না?'

'না।' কফিতে চুমুক দিয়ে অর্পিতা বলল, 'সকাল থেকে বসে থেকে থেকে হাই উঠছে। ফ্র্যাঙ্কলি, আই ওয়াজ ফিলিং ক্লামজি।'

'কেন!'

'এই সাস্‌পেন্‌স্‌! আসবে, কিন্তু কখন আসবে জানো না। নিজেকে নিয়ে কোনও প্ল্যান করা যায় না।'

কফির কাপ নাকের সামনে এনে ঠোঁট ও চিবুক আড়াল করে অর্পিতাকে দেখল নিবেদিতা। চোখে হাসি। কাপটা নামিয়ে বলল, 'ফোন করেনি?'

'করেছিল। শুধু ফিরেছে জানাল। কখন আসবে বলেনি।'

অর্পিতা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখান থেকে দৃষ্টি একটু এদিক ওদিক হলেই চোখ পড়বে ভিজিটরের দিকে। অসাবধানে সিগারেটের ছাই পড়েছে লোকটির ট্রাউজার্সের ওপর, ঝেড়ে ফেলার জন্য মুখ ফেরাতে চোখে পড়ল ঠোঁটের ডানদিকে জড়ুলের দাগ। এরপর চোখাচোখি হবার সম্ভাবনায় মুখ ঘুরিয়ে নিল অর্পিতা।

'মিসেস রায় ফোন করেছিল সকালে—।' নিবেদিতা বলল, 'লাইন ট্রান্সফার করে দিয়েছিলাম তোমাকে। পেয়েছিলে?'

'তোমাকে ফোন করেছিল!' বিস্মিত গলায় অর্পিতা বলল, 'কেন!'

'মিস্টার রায় অফিসে এসেছে কি না জানতে চাইল।'

'স্ট্রেঞ্জ! তোমাকে কেন জিজ্ঞেস করছে! আমাকেও তো একই কথা—', বলতে বলতে থেমে গেল অর্পিতা, আর এগোবে কি না ভাবল। তারপর ভিতরের উত্তেজনা চাপা দিতে দিতে বলল, 'সি মাস্ট হ্যাভ বিকাম আ মেনটাল পেশেন্ট!'

'তা-ই। আমিও তো ওকে জানি কিছুটা। ভদ্রলোকের জন্যে মায়া হয়।'

অর্পিতা জবাব দিল না। অনুমানে বুঝল ছাইরং জ্যাকেট পরা লোকটির দৃষ্টি এখন তারই দিকে। অভ্যাসের হাতে গায়ের শালটা ঠিকঠাক করতে করতে আগের চেয়ে আরও একটু সরে দাঁড়াল ও, যাতে নিজেকে যতটা সম্ভব আড়াল করে রাখা যায়। চেনে না, অথচ চেনা-চেনা লাগছে, মনে পড়ছে না আর কোনও সূত্র; এমন বিব্রত সে কমই হয়েছে।

কাচের দরজা ঠেলে শার্ট ও ধুতি পরা, খুব সাধারণ চেহারার একটি লোক ঢুকল এবার। পকেট থেকে একটা চিঠি বের করে বাড়িয়ে দিল নিবেদিতার দিকে। তাদেরই অফিসের লেটারহেডে টাইপ-করা চিঠি। দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিবেদিতা লোকটিকে ভিতরে গিয়ে মিস্টার ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে বলে আবার তাকাল অর্পিতার দিকে।

'আসলে কি জানো, কখনও কখনও বয়স একটা প্রব্লেম হয়ে দাঁড়ায়। ছেলেপুলে হয়নি, হাসব্যান্ড সময় দিতে পারে না—সি মাস্ট বি ফিলিং লোনলি। এর থেকে কমপ্লেক্স গ্রো

করে। এক্সকিউজ খোঁজে, ন্যাগিং হয়ে পড়ে—'

'এরকম একজন হাসব্যান্ড—এমন স্বামী—ওর নিজেকে ধন্য মনে করা উচিত।'

এতক্ষণের নিচু গলার কথাবার্তার মধ্যে অর্পিতার কথা শুনে হাসিতে সরব হয়ে উঠল নিবেদিতা। আবার গলা নামিয়ে ঠাট্টার সুরে বলল, 'তুমি যে তোমার বসকে একটু বেশি পছন্দ করো সেটা এ অফিসের সবাই জানে। দ্যাখো মিসেস রায়ও জানে কি না।'

কথাগুলো হঠাৎই এল। নিবেদিতার সঙ্গে তার যথেষ্ট হৃদ্যতা থাকা সত্ত্বেও এর আগে কখনও এমন কথা শোনেনি। ঠাট্টার ছলে বলা কথার জবাব ঠাট্টাতেই দিতে হয়, অর্পিতা নিজেও কিছু অপটু নয়; কিন্তু, এখন জুতসই কিছু ভাবতে গিয়ে টের পেল ভিতরের বাধায় অগোছালো হয়ে পড়ছে সে। নিবেদিতা নিজের কথা বললে একরকম মানে হত, ওই 'সবাই' কথাটার জোরই এই মুহূর্তে তাকে ছত্রাখান করে দিল।

টেলিফোনের শব্দ। রিসিভার তুলে 'ইয়েস' বলল নিবেদিতা, তারপর 'ও-কে'। সেই ভাবেই চোখ তুলে তাকাল অপেক্ষমাণ ভিজিটরের দিকে এবং বলল, 'মিস্টার ঘোষ, ইউ ক্যান সি মিস্টার খান্না। দিস ওয়ে। প্লিজ টার্ন রাইট, দেন সেকেন্ড ক্যাবিন—'

বিব্রত অবস্থার মধ্যেই অর্পিতা লক্ষ করল, স্পষ্ট চোখে তাকে দেখতে দেখতেই লোকটি চলে গেল অফিসের ভিতরে।

নিবেদিতা হাসছে এখনও। এই ঘোষ লোকটি কে হতে পারে ভেবে মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হল অর্পিতা। তারপর হেসেই বল-া, 'লেগপুল করার মানে হয় কোনও! এসব যারা বলে তারাও জেলাস। বোধহয় ঈর্ষা করে আমাকে। কোম্পানি আমাকে মাইনে দেয় কি বসকে অপছন্দ করার জন্যে!'

'অত সিরিয়াসলি নিচ্ছ কেন! আমি ঠাট্টাই করছিলাম।'

'আমিও ঠাট্টাই করছি।'

দুজনেই দেখল পরস্পরকে, হাসল এবং চুপ করে গেল। অর্পিতা জানে এটা অভিনয় ছাড়া কিছু নয়। এইরকম এক-একটা সময় এসে যায় হঠাৎ, যখন মনে হয় যাকে কাছের বলে ভাবছে সে বস্তুত কাছের নয়—বোতাম-টেপা স্প্রিংয়ের ছুরির মতো, লুকোনো জায়গা থেকে নিমেষেই বেরিয়ে আসতে পারে ঝকঝকে ইস্পাত। নাকি যে-কোনও সম্পর্কের মধ্যেই থাকে এই দূরত্ব, অদৃশ্য টানাপড়েনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে কোনও অজানা মুহূর্তে হঠাৎই ধরা পড়ে মাঝখানের ফাঁক, গহ্বর, শূন্যতা!

কফি খাওয়া হয়ে গেছে। এবার সে চলে যেতে পারে। ইত্যাদি ভাবলেও নড়ল না অর্পিতা। নিবেদিতা ঠাট্টা করছিল বললেও তার এখনই চলে যাওয়ার অন্য কোনও মানে করবে হয়তো। এ অফিসে এমনিতেই তার বন্ধু প্রায় কেউই নেই, কী লাভ যে আছে তার সঙ্গেও মান-অভিমান সৃষ্টি করে!

কাচের দরজা ঠেলে ভিতরে এল দুই মহিলা। রীতিমতো ঘষামাজা ও বিন্যস্ত চেহারা ও পোশাক; বয়স কি পঁয়ত্রিশের ওদিকে হবে না? সরাসরি নিবেদিতার সামনে এসে দাঁড়াল ওরা। অনুপ রায়ের খোঁজ করছে, কোনও উইমেনস অ্যাকশন কমিটি না কীসের সদস্যা। ওদের আলাপে কান রেখে অর্পিতার নিজের মনেই প্রশ্ন উঠল, যে-কোনও মেয়ে বা মহিলাকে দেখলেই কেন সে প্রথমেই তার বয়স অনুমান করার চেষ্টা করে। আগে এমন ছিল না, ইদানীংই টের পাচ্ছে প্রবণতা। তার মানে কি সে নিজেরই বয়স এবং সময় পেরিয়ে

যাওয়া সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে ক্রমশ। ভাবতে ভাবতেই অন্যমনস্ক, কান চলে গেল ওদের কথায়—অ্যানুয়াল কনভেনশন হচ্ছে কলকাতায়, বিজ্ঞাপন চায় শুভেনিরে। এ ব্যাপারে স্টুয়ার্ট মর্গানের মতো কোম্পানির সাহায্য তারা নিশ্চয় আশা করতে পারে।

অর্পিতা ভেবেছিল নিবেদিতা তাকেই দেখিয়ে দেবে। তা করল না, বরং শুনে আশ্বস্ত হল নিবেদিতা ওদের কাল টেলিফোনে মিস্টার রায়ের সেক্রেটারির সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিতে বলছে। আপাতত ওরা ফর্ম রেখে যেতে পারে।

মহিলা দুটির মধ্যে যে বেঁটে তার চুলের ওপর একটা মাছি উড়ে উড়ে জায়গা বদল করছে ক্রমাগত। বসছে, উড়ে যাচ্ছে, ফিরে এসে জায়গা খুঁজছে আবার। অলস ভাবনায় মজা এনে দেয় দৃশ্যটা।

স্টুয়াট মর্গানের অফিসে মাছি ঢোকে না। এমনই মসৃণ এর ফাইন প্লাইউডের দেয়াল, এমনই পরিচ্ছন্ন এর মেঝে, আর সিলিংয়ের ভিতরে লুকোনো আলোর প্রক্ষেপণে স্নিগ্ধ অথচ উজ্জ্বল এমনই সতর্ক এক প্রহরা যে যথেষ্ট ছড়ানো জায়গায় চেয়ার, টেবিলে বসে কাজ-করা মানুষগুলোর মধ্যেও এসে গেছে পরিচ্ছন্নতার প্রতি অদ্ভুত এক টান। দশতলা এই হালে-তৈরি বিল্ডিংয়ের কমন লিফ্ট্ ধরে সাততলায় এসে তাদের অফিসের চওড়া কাচের দরজা আর ঝকমকে তামার টবে সবুজের ওপর বেগুনি ও গোলাপি ছিটে-লাগা পাতাবাহারের সামনে দাঁড়িয়ে ভিতরে তাকালে মনে হবে পরিচ্ছন্নতা আর সৌন্দর্য ছাড়া এখানে যা আছে তার নাম নৈঃশব্দ্য। না, এই পরিবেশে মাছি ঢোকে না। তা হলে কি ওই মাছিটা ওদের সঙ্গে সঙ্গেই এল। থেকে যাবে?

হ্যাঁ এবং না-এর মধ্যে দাঁড়িয়ে মাছিটাকেই লক্ষ করতে লাগল অর্পিতা। ওরা চলে যাচ্ছে। দেখল, নিবেদিতার টেবিলের ফুলদানির পাশের সাদা শূন্যতায় মাছিটা বসে আছে তখনও। স্তব্ধ। ওদের রেখে যাওয়া ফর্মটা নিবেদিতার হাতে। একবার সেটায় চোখ বুলিয়ে বাড়িয়ে ধরল অর্পিতার দিকে।

'এটা তুমিই রাখো তা হলে। প্লেস কোরো বসের কাছে। দে ওয়ান্ট টু লিবারেট আস—নির্যাতিত মেয়েদের জন্যে ফাইট করছে—'

অর্পিতা বলল, 'মাছিটার কী হবে?'

'মাছি!'

আঙুল তুলে মাছিটাকে দেখাল অর্পিতা। নিবিষ্ট চোখে দেখলে বোঝা যায় স্তব্ধতার মধ্যেও ফরফর করছে ডানা। বলল, 'দ্যাট শর্ট উয়োম্যান। ওর সঙ্গেই এসেছিল।'

নিবেদিতা মাছিটাকেই দেখছে। দেখতে দেখতেই আলগোছে হাত বাড়িয়ে ডান দিকের কোণ থেকে লেটারহেডের প্যাডটা তুলে নিল।

'মাছিটার লিঙ্গ কী বলতে পারো?'

'লিঙ্গ কথাটা অবসিন—'

'ও-কে, ও-কে। জেন্ডার।'

অর্পিতা হেসে ফেলল। বলল, 'মাছির আবার জেন্ডার কি!'

'আছে।' নিবেদিতা বলল, 'আমার মনে হয় এটা মেয়ে মাছি। মেয়েদের সঙ্গ পছন্দ করে—'

'মেয়েরা কি মেয়েদের সঙ্গই পছন্দ করে!'

নিবেদিতা তাকাল অর্পিতার দিকে। জবাব দিল না। তারপর লেটার-প্যাড ধরা ডান হাতটা সতর্ক ভঙ্গিতে মাছিটার ওপর তাক করতে করতে বলল, 'লেট মি লিবারেট হার—'

নিবেদিতার হাতের চাপড়ে মরা মাছিটা উঠে এল প্যাডের পিছনে। ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটের ওপর ঝাড়তেই খসে পড়ল টুপ করে। প্রথমে প্যাডের পিছনে, তারপর টেবিলের যেখানে মাছিটা বসেছিল সেদিকে তাকিয়ে নিবেদিতা বলল, 'আশ্চর্য। একটুও রক্ত ছিল না গায়ে! সো অ্যানিমিক!'

শুধু মজাই নয়, কথায় পেয়েছে নিবেদিতাকে। খবরের কাগজ পড়ে মাঝে মাঝে যেমন বলে, হয়তো এরপর বলবে কোনও কোনও মেয়ে এইভাবেই মরে। যখন বেঁচে থাকে ডানা ফরফর করে, মরার পর দেখা যায় রক্ত ছিল না গায়ে। এসব আদিখ্যেতার মতো শোনায়। তখন বোঝা যায় না একটিই অঘটন থেকে কীভাবে ও চলে যায় কোনও-কোনওতে। নিবেদিতা কি নিজের অভিজ্ঞতা জড়িয়েই বলে এসব!

'তুমি গবেষণা করো। আমি চলি।' রিস্টওয়াচে চোখ রেখে চলে যেতে যেতে অর্পিতা বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ফর দা কফি।'

নিজের জায়গায় ফিরে এসে খানিক আগে দিয়ে যাওয়া চিঠি ও মেল দেখতে দেখতে অর্পিতা স্পষ্টই অনুভব করল অনুপমকে জড়িয়ে নিবেদিতার ঠাট্টাটা এখনও হজম করতে পারেনি সে। আলটপকা বলে ফেললে এক কথা, কিন্তু এই ধরনের মন্তব্য সত্যিই কি কেউ করে ফেলতে পারে হঠাৎ! তা ছাড়া, নিবেদিতা শুধু নিজের ধারণার কথাই বলেনি, বরং ওর ইঙ্গিতটা ছিল খুবই পরিষ্কার—নাকি অনেকেই জানে ব্যাপারটা। এর মানে কি তার অজান্তেই এরকম কানাঘুষো চলে অফিসে। যদি তা-ই হয়, কারণ কী। নিবেদিতা যতটা বলল তার পরেও কিছু আছে নাকি?

নিঃশ্বাসের ভার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে গিয়ে ভারী লাগল আরও। কেন কে জানে, কেমন এক শারীরিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে তার মধ্যে। তখনই ভাবল, কাজকর্ম কথাবার্তার মধ্যে সে কি অনুপ সম্পর্কে বেশি আগ্রহ দেখিয়ে ফেলেছে? কিংবা, দুর্বলতা? অফিসের বসের সঙ্গে প্রেম! সে তো সিনেমাতেই হয়, আর বিশাখা যেমন বলেছিল একদিন, বাংলা উপন্যাসে! বাস্তব এখানে বসকে মানুষ হিসেবে দেখছে না। তা হলে তাকে নিয়ে যে-গুজবের কথা বলল নিবেদিতা, সেটা হয়তো নিছক ঠাট্টা ছিল না—এক ধরনের ব্যঙ্গ কিংবা খোঁচাও হতে পারে। কিন্তু অনুপকে জড়িয়ে কেন। অনুপের দিক থেকেও কি লক্ষ করেছে কিছু!

অনুপ রায় কাজের লোক। ফ্ল্যাসি বা চাবুকে বলতে যা বোঝায় তা নয়, বরং আত্মমুখী; সামান্য এলোমেলো। কিন্তু ওর সাফল্য মাপলে বোঝা যায় মাথার ভিতরের দাবার ছকে সারাক্ষণ জায়গা বদল করছে গুটিগুলো। ছ'বছর আগে সেলস ম্যানেজার হিসেবে যখন স্টুয়ার্ট মর্গানে এল, তখন ওর লম্বা, একটু বা ভারী চেহারার ওপর বসানো প্রায় গোল কিন্তু চোয়াল-জাগা মুখ, পুরু ভুরুর নীচে দুটি ছোট চোখ, খাড়া নাক এবং গালরেখায় মিশে যাওয়া চিবুকের দিকে তাকিয়ে তেমন কিছু ইম্প্রেসিভ মনে হয়নি অর্পিতার। ওয়াই-ডব্লু-সি-এ'র ট্রেনিং নিয়ে সে তখন সেক্রেটারিদের পুল থেকে বেরিয়ে সদ্য যুক্ত হয়েছে পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে। অনুপের কাজ করত পুলেরই একজন, মিস রডরিগস্। গোয়ার মেয়ে। তারপর একসঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল। বিয়ে করবে বলে চাকরিতে রিজাইন করে গোয়ায় চলে

গেল রডরিগস্, আর গোলমেলে ধরনের জন্ডিসে ভুগে প্রায় মাস দুয়েক বসে গেল পার্সোনেল ম্যানেজার সোমেন দত্ত। তাকে জুতে দেওয়া হল অনুপ রায়ের সঙ্গে। তখনই কাছ থেকে দেখেছিল অনুপকে, মাসখানেকের জন্যে, ওর বাড়িতেও গিয়েছিল একদিন ট্যুর পেপারস্-এর ফাইল নামাতে, আলাপ হয়েছিল বউ চন্দ্রার সঙ্গেও।

স্মৃতি ধরে টানলে একে একে উঠে আসে সবই। ডালহৌসি পাড়ার সেই লোক-গিজগিজ অফিসের পিছনের জানলায় দাঁড়িয়ে অর্পিতা এখন গঙ্গা দেখছে। নীচে আড়াল থাকায় শূন্যে ঝুলে আছে হাওড়া ব্রিজ। আকাশের নীল বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে সাদা টুকরো টুকরো মেঘে। রাস্তা দেখা যেত না। গ্রিল ছাড়া জানলায় দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখবার চেষ্টা করলে যেভাবে এবং যতটা ঝুঁকতে হত তার চেয়ে আরও একটু বেশি ঝুঁকলে যে-কারুরই শরীরে ফুটে উঠতে পারে আত্মহত্যার ভঙ্গি।

আরোগ্য হয়ে ফিরে এল পার্সোনেল ম্যানেজার সোমেন দত্ত। সঙ্গে সঙ্গে সেও ফিরে গেল পুরনো জায়গায়। হ্যাঁ, সোমেন দত্তও তাকেই চাইত। পুলের নতুন রিক্রুট রীতা গাঙ্গুলি গেল অনুপের কাজ করতে। সবই মনে পড়ে।

একদিন লাঞ্চের সময় রীতার সঙ্গে ডাব খেতে বেরিয়েছিল রাস্তায়। রীতাই জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিছুদিন মিস্টার রায়ের সঙ্গে কাজ করেছিলে না?'

'হ্যাঁ। কেন!'

রীতা বলল, 'ওঁকে কি কখনও আনহ্যাপি—আই মিন, অন্যমনস্ক মনে হয়েছে?'

'নট রিয়েলি। কেন! তোমার মনে হয়?'

'আই গেস সো।' রীতা বলল, 'পার্সোনাল লাইফে গণ্ডগোল থাকতে পারে কিছু। লোকটা অফিসে সময় কাটাতে কিংবা ঘন ঘন ট্যুরে যেতে ভালোবাসে—'

'জানি না।' একটু ক্ষণ চুপ করে থেকে, গলায় অল্প দার্শনিকতা এনে অর্পিতা বলেছিল, 'পার্সোনাল লাইফ বলে কিছু থাকলে মানুষ হ্যাপি বা আনহ্যাপি হতেই পারে। তবে আমার বসের কাছে শুনেছি, দিস ম্যান ইজ গোয়িং টু বি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট—'

আসলে সেটা এমনই একটা সময় যখন নিজেই নিজেকে নিয়ে অস্বস্তি বোধ করছে অর্পিতা। বাড়িতে বিয়ের চাপ; সম্বন্ধ আসছে এবং প্রত্যাহৃত হচ্ছে, কেন কে জানে সাতাশ ছুঁলেও সে তখনও মনঃস্থির করে উঠতে পারেনি। যাকে-তাকে বিয়ে করাতেও ছিল ঘোরতর আপত্তি। ভাবত, পছন্দের লোকটিকে নিজেই খুঁজে পাবে একদিন। ইতিমধ্যে সম্বন্ধ এল বৌদির এক দূর সম্পর্কের মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে। নাকি সিভিল এঞ্জিনিয়ারিংয়ের ভাল ছাত্র ছিল, বিদেশে পড়াশুনো করে ফিরে এসে কনসালটেনসি ফার্ম খুলেছে পার্টনারশিপে। নিউ আলিপুরে বাড়ি। থাকার মধ্যে বুড়ো বাপ আর একটি বোন। চেহারায় চটক না থাকলেও ঘাটতি নেই পুরুষালি ভাবে। দেখেশুনে দোমনা ভাব থেকেই রাজি হয়ে গেল অর্পিতা। বিয়ের দিনটিনও পাকা। হোক অপরিচিত, অর্পিতা ভেবেছিল, কিন্তু সিকিউরিটি বলতে যা বোঝায়, এই লোকটি, চিরজিৎ বিশ্বাস, তা দেবে। বয়স সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ, তা হোক; অর্পিতার বরাবরই মনে হত বয়সই এনে দেয় ম্যাচুরিটি, নির্ভরযোগ্যতা।

তার ভাবনায় কি ভুল ছিল কোনও, কিংবা হঠকারিতা? কে জানে! একান্তে এসব নিয়ে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করলে কেমন একটা ধোঁয়া ছড়িয়ে যায় মাথায়। আঁশ-ছড়ানো মাছের মতো ন্যাড়া-ন্যাড়া লাগে নিজেকে। তবে, ভুল ঠিক যা'ই হোক না কেন, সম্বন্ধ সে নিজেই

ভেঙেছিল। না ভাঙলে কী হত এতদিনে।

যা হয়নি, হবেও না কোনও দিন, তা নিয়ে কী হতে পারত; চিন্তা করলে ছাইভস্ম কিছুই মনে পড়ে না। অবশ্য নিজেকে নিয়ে ঠাট্টার ছলে কখনও সে ভেবেছে, কী আর হত ওই বিয়েটা হলে—হয় গৃহবধূ হত্যা বা স্ত্রীকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করার জন্যে স্বামী গ্রেফতার শীর্ষক খবরের কাগজের এককোণে ছাপা একটি খবর, কিংবা ডিভোর্স, কিংবা, যদি সে লোকটিকে ভালবেসে ফেলত, বা কেউ কেউ যেমন করে, মানিয়ে নিত, গোটা তিনেক আণ্ডাবাচ্চা—চ্যাঁ-ভ্যাঁ-হিসি।

অর্পিতার আজও মনে পড়ে সেই দিনটি, বিয়ের দিন পঁচিশ আগে যেদিন হবু স্বামীর সঙ্গে মেলামেশা করার জন্যে প্রথম বেরুল সে। প্রস্তাবটা বৌদিই দিয়েছিল। 'মডার্ন মেয়ে, বিয়ের পিঁড়িতে বসবার আগে মানুষটাকে একেবারে চিনবে না, জানবে না, এ কেমন কথা!' বৌদি বলেছিল, 'আমারও বিয়ে হয়েছিল সম্বন্ধ করে। কিন্তু, বাড়ির কেউই জানত না বিয়ের আগে তিনমাস আমি তোমার দাদার সঙ্গে কোর্টশিপ চালিয়েছি—!' বৌদির কথায় রহস্য ছিল। অর্পিতা তখন তৈরি হচ্ছে মনে মনে, ভেবেছিল, জড়তা কাটাতে দোষ কি! জ্যাকলিন বিসেটের একটা ছবি চলছিল নিউ এম্পায়ারে, 'দা ডিপ' কি? সেই ছবি দেখা, রাতে কোথাও ডিনার, চিরজিতের সঙ্গে মেলামেশা করার মোটামুটি এইরকম ছক ছিল একটা। অর্পিতা বলেছিল তাকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাবার দরকার নেই, শো-এর আগে চিরজিৎ হলের সামনে অপেক্ষা করলেই হবে। এইজন্যেই একদিন অফিস না করা বাড়াবাড়ি।

সেইরকমই হয়েছিল। কৌতূহল, উৎকণ্ঠা ও উত্তেজনায় তার সমস্ত স্মার্টনেস কুরে-খাওয়া লজ্জা নিয়ে, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই অফিস থেকে মুখে পাফ বুলিয়ে বেরিয়ে নিউ এম্পায়ারের সামনে পৌঁছে গিয়েছিল অর্পিতা। খানিক নিউ মার্কেটে ঘোরাঘুরি করে, বার দুয়েক দূর থেকে উঁকি দিয়ে—সত্যি, সাতাশ বছরেও কী ছেলেমানুষি ছিল তার স্বভাবে আচরণে!—অপেক্ষমাণ চিরজিতের সামনে যখন পৌঁছল তখন ছবি শুরু হয়ে যাবার কথা। মনে পড়ছে, চিরজিৎ একা ছিল না; সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে কথা বলছিল একটি লোকের সঙ্গে, লোকটির ঠোঁটের পাশ থেকে গালের অনেকটা অংশ জুড়ে বড় একটা জড়ুল ছিল—এই লোকটিই কি, যাকে সে খানিক আগে সুধীর খান্নার অপেক্ষায় বসে থাকতে দেখেছিল রিসেপশনে! না হলে হঠাৎ তার চেনা-চেনা লাগবে কেন। হতে পারে, নাও হতে পারে। যা-ই হোক, তাকে দেখে 'হ্যালো' বলে এগিয়ে এসেছিল চিরজিৎ, তারপর 'নিশ্চয়ই অসুবিধে হল আসতে—', বা এরকম কোনও কথা। উত্তরে ওর চোখে চোখ না রেখে, শুধুই হেসে আগুপিছু তাকানো চিরজিৎকে অনুসরণ করে খুব দ্রুত হলের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল অর্পিতা। সত্যিই ছবি শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন, অ্যাকশনের ওপর টাইটেল পড়ছিল পর্দায়। টর্চের আলো অনুসরণ করে চিরজিতের পাশে সে যখন বসছে তখন গতিময় হয়ে উঠেছে সামনের দৃশ্য। সেদিকে তাকিয়ে ক্রমশ নিথর, ওপরের অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে থাকা অল্প কিছু লোকের সংস্পর্শে নির্জনতা প্রত্যক্ষ করতে করতে অর্পিতা অনুভব করছিল পর্দার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে তার সংযোগ নেই কোনও, থাকার কথাও নয়, পাশে অচেনা যে-লোকটি কিছুদিনের মধ্যেই হয়ে উঠবে তার সবচেয়ে কাছের জন, তার সঙ্গে পরিচয় করার জন্যে এরকম একটা দমবন্ধ অন্ধকারের দরকার ছিল কি? কী হত যদি এমনিই রাস্তায় ঘুরে বেড়াত তারা, কিংবা কোনও রেস্তোরাঁয়,

মুখোমুখি, সামনে চা কিংবা কফি নিয়ে—

টেলিফোন। শব্দে চমক ছিল বলেই স্বাভাবিকের চেয়ে দ্রুত হাতে রিসিভার তুলল অর্পিতা। গলার বিশুষ্ক অংশে জল টেনে রেসপন্ড করল।

'সুধীর হিয়ার—'

'ইয়েস, মিস্টার খান্না?'

'হ্যাজ হি কাম?'

'নো।'

সুধীর খান্না হাসছে। ধরনটা রসিকতার, এরপর হয়তো এমন কিছু বলবে যা ওর কাছে মজার হলেও অর্পিতার কাছে নয়। বোঝা যাচ্ছে না সেই জড়ুল-গাল লোকটি এখনও ওর সামনে বসে আছে কিনা।

বিরক্তিতে, যা কখনও করে না, রিসিভারটা হঠাৎই নামিয়ে রাখল অর্পিতা এবং ভাবল, আজ দিনটাই খারাপ। সকাল থেকে যা যা ঘটেছে, এখনও ঘটছে, তার মধ্যে দৈন্য ছাড়া আর কিছুই নেই। এমন নয় যে অনুপ রোজই অফিসে থাকে—অনুপ থাকে বলে কাজও থাকে, সুতরাং স্মৃতি থাকে না, মনে পড়ে না কিছু, কাজের স্বয়ংক্রিয়তাই সে যা তার থেকে আলাদা করে রাখে তাকে। না, তা নয়। এরকম প্রায়ই হয়, টেলিফোন ও টাইপরাইটার সামনে রেখে একা তার দায়িত্ব পাহারা দিয়ে যায় সে, স্বচ্ছন্দে। অভ্যাসই চালিয়ে নিয়ে যায়। খারাপ লাগে না। আজ দিনটাই খারাপ।

এসব ভাবনায় ঘাম ঢুকে পড়ে রক্তে। অস্বস্তি থেকে হঠাৎই এসে যায় স্থিরতা।

সেদিন, সিনেমা হলের অন্ধকারে, ঠিক কতক্ষণ পরে মনে নেই, তার হাতের ওপর একটা হাতের আকস্মিক স্পর্শে খেয়াল হয় হাতটা চিরজিতেরই। এটা স্বাভাবিক কি না বুঝতে না পেরে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখায়নি অর্পিতা। শুধু অনুভব করেছিল নিঃশ্বাস চেপে রাখার জন্যে অপরিচিত কিছু শব্দ ঠোকাঠুকি করছে বুকে। তার স্তব্ধতাই কি সাহস জুগিয়েছিল চিরজিৎকে? হয়তো। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই গায়ে গায়ে লেগে এসে আড়াআড়ি তার হাতটা তুলে নিয়ে প্রবল ভাবে তার ওপর নিজের ঠোঁট, নাক ঘষতে থাকল লোকটি, ততক্ষণে লজ্জা থেকে শঙ্কায় উপনীত, অর্পিতা অনুমান করতে পারছিল এরপর কী ঘটবে, কী ঘটতে পারে। লোকটির স্পর্শ তখন ঘৃণা ফোটাচ্ছে সর্বাঙ্গে। অসহায় ভাবে পিছনে তাকিয়ে অর্পিতা লক্ষ করেছিল প্রোজেক্টারের ধোঁয়াটে আলোয় প্যাসেজ ও একজিট দেখা যাচ্ছে, আশপাশে ছড়ানো অন্ধকার মুখগুলি নিশ্চিত ভাবে পর্দার দিকে ফেরানো। তখন, কানের পাশে চিরজিতের নিঃশ্বাস মাংসময় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে, নিজেকে ঝাঁকুনি দিয়ে সরিয়ে নিয়েছিল অর্পিতা। একইরকম দ্রুততায় উঠে দাঁড়িয়ে কীভাবে যে বেরিয়ে এসেছিল বাইরে, তারপর সিঁড়ি ভেঙে নীচে ও রাস্তায়, তারপর বাড়িতে, তা মনে পড়ে না ঠিকঠাক। লোকটিও কি উঠে এসেছিল তার পিছনে পিছনে? মনে পড়ে না। তবে ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে। বাড়ি ফেরার পরেও অনেকক্ষণ সে বুঝতে পারেনি কী হয়েছে। বৌদি এবং মা'র প্রশ্নের উত্তর দেয়নি কোনও, দাদার বিস্মিত চোখের সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছিল বাথরুমে, স্নান করেছিল অনেকক্ষণ ধরে এবং একার বদলে রাত্রে শুয়েছিল মা'র সঙ্গে।

বিয়েটা ভেঙে যায়। বিয়ে ভাঙলেও অর্পিতা ভাঙেনি।

ধাতস্থ হবার পর ক্রমশ এক ধরনের জোর এসে গিয়েছিল মনে। দাদা ও বৌদির

অস্বস্তিকর প্রশ্ন ও রাগারাগির মধ্যে দাঁড়িয়ে শুধু একটিই কথা বলেছিল সে, 'কারণ বলতে হবে কেন। ডিসিসনটা আমার। লাইফ, ফিউচার—এগুলোও। এর সঙ্গে তোমাদের মান-সম্মানের কী সম্পর্ক!'

দাদা বলেছিল, 'কার্ড ছাপানো হয়ে গেছে! অনেককেই জানানো হয়ে গেছে!'

'এগুলোই তোমার মান-সম্মান!'

উপযুক্ত জবাবের অভাবে খানিক চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল দাদা। অবশ্যই ক্ষুব্ধ। পরে বলেছিল, 'তা হলে কি কেরিয়ার গার্ল হয়েই থাকবে!'

'দরকার হলে থাকব।'

'তা হলে আমাদের সঙ্গে নয়—'

অর্পিতা জানে, ভুল জায়গায় অধিকার খাটাচ্ছিল দাদা। তখনও মা বেঁচে, বাড়িটাও মা'র নামে। সে নিজেও রোজগার করে। হয়তো রাগের মাথাতেই বলেছিল দাদা, এসব না ভেবেই। কিন্তু, চোয়ালের হাড়ের মধ্যে থেকে বেরুনো দাদার কথাগুলো ভুলতে পারেনি অর্পিতা। কেন যেন মনে হয়েছিল যা ঘটেছিল এবং ঘটছে তার সমস্ত কিছুর মধ্যেই একটা ধরে নেওয়ার ব্যাপার আছে। চিরজিৎ ধরে নিয়েছিল সে যা করছে তা-ই ঠিক; এখন দাদাও নিচ্ছে।

কেন এমন হয়! একটিই তো দাদা তার! এর আগে কখনও এমন কোনও ঘটনা ঘটেনি যা থেকে মনে হতে পারে দাদা খারাপ কিংবা স্বার্থপর। বরং বাবা মারা যাবার পর থেকে আগের চেয়ে একটু বেশিই যেন ভালবাসত তাকে। তবে! অহঙ্কারবোধ?

অর্পিতা জানে না। শুধু এটুকু জানে, ঘটনা ঘটনাই; ঘটনা যেদিকে নিয়ে যাবে সেও সেদিকেই যাবে। অন্য কিছুই অন্য কোনও দিকে ফেরাতে পারবে না। ভাইফোঁটার দিনে চোখের পাতা ভিজলেও—, না। সামনে দেয়াল আছে, শাঁখ বেজে ওঠে চারদিকের বাড়িগুলোতে, তখন সকলের চোখ এড়িয়ে যা দেবার তা ওই দেয়ালকেই দিতে হয়।

গোলমাল ওখানেই থামেনি। তার জেদ দাদা-বৌদিকেও শক্ত করছিল, অর্পিতা লক্ষ করছিল মা'ও কোণঠাসা হয়ে পড়েছে ক্রমশ। তখনই সিদ্ধান্ত নেয় সে আলাদা হয়ে যাবে। এবং হলও। চেনাশোনা ছিল, ওয়াই-ডব্লু-সি-এ-তে একটা টেম্পোরারি অ্যাকোমোডেশন পেতে অসুবিধে হয়নি। অফিসের মিতা মল্লিক থাকত ওয়ার্কিং উইমেন্‌স্ রেসিডেনসিয়াল হোম-এ; সমস্যাটা জানত, ও-ই এক দিন নিয়ে গেল 'দক্ষিণী'তে। বিশাখা তখন কোথায়? মমতাদির সঙ্গে এক ঘরে ছিল সে। বিবাহিতা; অদ্ভুত আচরণ ছিল তাঁর। মাথার পিছনের তাকে মা কালীর ছবি। প্রথম দিনই রাতে শোবার আগে জোড়া হাতে প্রণাম সেরে, ঘরের আলো নিবিয়ে, অন্ধকারে বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে বলেছিলেন, 'আমার না হয় সবাই থেকেও কেউ নেই। তুমি কেন এখানে এলে, ভাই! মুখ দেখে তো মনে হয় বড় ঘরের মেয়ে, আদরে মানুষ হয়েছ!'

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়েছিল অর্পিতা। কিছু বলতে হয় বলেই জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কালীপুজো করেন নাকি?'

'পুজো কি আর করি! শুধু প্রণাম করি। এই ঘুমোতে যাবার আগে একবার, আর সকালে একবার।' মনে হচ্ছিল কোনও মানুষ নয়, অন্ধকারই বলছে। ক্ষণিক নৈঃশব্দ্য রেখে মমতাদি বললেন, 'আমার একটা ছেলে আছে। সেও একাই থাকে। আগে যখন এরকম হয়নি, রোজ

রাতে ঘুমোতে যাবার আগে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। এখন তো আর পারি না; তাই খুব চিন্তা হয়। তাই ঘুমোবার আগে রোজ ঠাকুরকে ডাকি—যেন ছেলেটা ঠিকঠাক ঘুমোয়, ঠিকঠাক জেগে ওঠে—'

অন্ধকারে হারিয়ে গেলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। নতুন পরিবেশে, একটি নতুন মানুষের সান্নিধ্যে নিজেকেও নতুন লাগছিল কেমন। সে ভগবান-টগবান মানে না, পুজোটুজোও করে না। তবু মনে হয়েছিল অর্পিতার, যে-দুঃখ একাকার, যে-অসহায়তা এই অন্ধকারের মতোই নিশ্ছিদ্র, সেখানে ও তার মধ্যে নিঃশ্বাস নিতে নিতে কিছুই বুঝতে না-পারা কিন্তু দুঃখী এই মানুষটির প্রার্থনায় সে নিজেও অল্প একটু জুড়ে দিতে পারে।

তখন শব্দ করে হাই তুলে মমতাদি বললেন, 'রাত হয়েছে। এবার ঘুমিয়ে পড়ো।'

পাঁচ বছরের স্মৃতি পেরোতে পাঁচ মিনিটও লাগে না। ভিতরের অস্পষ্টতা থেকে তবু আলাদা করা যায় না নিজেকে।

অর্পিতা উঠে দাঁড়াল আবার। জানলার সামনে এসে তাকিয়ে থাকল নীচে।

শীতের বেলা ফুরোতে ফুরোতে অনেকটাই ঢাকা পড়েছে এখন। অনুজ্জ্বল আলোয় রং পাল্টে ফেলেছে রাস্তায় থেমে থাকা গাড়িগুলোও। প্রায় সারাক্ষণই জ্যাম লেগে থাকে এই জায়গাটায়। বাঁদিকে এবং ডানদিকে যতটা পারে তাকিয়ে দেখল, মোটর, ট্যাক্সি, বাস, মিনিবাস পর পর কিন্তু অদ্ভুত বিশৃঙ্খলা নিয়ে দাঁড়ানো। একটা ট্যুরিস্ট বাসের জানলা থেকে মুখ বাড়িয়ে ক্যামেরা উঁচিয়ে ছবি তুলছে এক মেমসাহেব। বাইরে নিশ্চয়ই হাওয়া আছে, না হলে তার সোনালি চুলের ঝাপটা বার বার উড়ে আসত না সামনে। জ্যামের মধ্যে দিয়েই চৌরঙ্গির দিক থেকে একটা স্কুটার ফাঁক গলে গলে এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণে। হেলমেট ও পুলওভার-পরা যুবকের কোমর আঁকড়ে ধরে বসে আছে লাল কার্ডিগান-পরা এক যুবতী। প্রেমিক-প্রেমিকা, নাকি স্বামী-স্ত্রী? সিঁথি দেখলে বোঝা যেত। তবে অনেক বিয়ে হওয়া মেয়েই সিঁদুর পরে না আজকাল। যেমন জয়ন্তী। তাদেরই অফিসের। ওর বিয়ে হওয়া এবং না-হওয়ার মধ্যে সাতদিনের ছুটি ও একদিন তাদের ক'জনকে ডেকে স্বামীর সঙ্গে পরিচয় করানো ও খাওয়ানোর ব্যাপারটা না থাকলে বোঝাই যেত না বিয়ে হয়েছে ওদের। তারও আগে সেলস ডিপার্টমেন্টের সুবোধ ঘোষের সঙ্গে একটা অ্যাফেয়ার ছিল জয়ন্তীর, সকলেই ধরে নিয়েছিল প্রেম চলছে, ওদের বিয়ে হবে। হয়নি। পরে শুনেছিল সুবোধও বিবাহিত। এখনও অফিস ছুটির পর সুবোধের সঙ্গে বেরোয় জয়ন্তী, গায়ে গায়ে হাঁটে, পরস্পরের দিকে তাকিয়ে একই ভাবে হাসে। বোঝা যায় না সম্পর্কটা কেমন; কে কার আড়াল, কার কাকে না হলেই চলে না। মিতা মল্লিকের জন্যেও একজন মোটরবাইক নিয়ে অপেক্ষা করত কাউনসিল হাউস স্ট্রিটের মোড়ে। ওরা কোথায় যেত অর্পিতা জানে না। সন্ধে গড়ানোর অনেক পরে দক্ষিণীর ঘরে বসে দূর থেকে ভেসে আসা বাইকের গর্জন শুনলে বুঝত মিতাই ফিরছে। তো সেই লোকটিই, কী যেন নাম? হ্যাঁ, শুভাশিস একদিন বরাবরের মতো তুলে নিয়ে গেল মিতাকে। ও সিঁদুর পরতে ভালবাসত, শাঁখা এবং নোয়াও। বিয়ের কিছুদিনের মধ্যেই বাচ্চা এসেছিল পেটে। চাকরিটা ছেড়ে দিল। কোন সম্পর্কের মধ্যে কে যে কী পায় তা কে বলবে!

যুবক-যুবতীকে নিয়ে স্কুটারটাও এখন আটকে পড়েছে জ্যামে। এতক্ষণে লক্ষ করল অর্পিতা, দক্ষিণ থেকে ট্রাম-লাইন বরাবর এগিয়ে আসছে লাল ফেস্টুন-ধরা এক মিছিল।

মিছিলের গোড়ায় দু তিনজন পুরুষ থাকলেও তাদের পিছনে দু সারি লাইন দিয়ে যারা যাচ্ছে তাদের সকলেই মহিলা, মাঝে মধ্যে কোনও-কোনও হাতে প্লাকার্ড ধরা। ওতে কি লেখা আছে এতটা ওপর থেকে তা পড়া যায় না ঠিক। সম্ভবত নারীদেরই কোনও মিছিল, সামনের পুরুষগুলি না থাকলে নিশ্চিত ধরা যেত। অর্পিতা মিছিলটাকেই অনুসরণ করতে লাগল।

কতক্ষণ জানে না। জুতোর শব্দ শুনে পিছনে তাকিয়ে দেখল, কোনওদিকে না তাকিয়ে ব্যস্তভাবে নিজের চেম্বারের দিকে হেঁটে যাচ্ছে অনুপ। দরজার হাতল ঘোরাল এবং ঢুকে পড়ল।

নিজেকে সামান্য গুছিয়ে নিল অর্পিতা। অনেকক্ষণ কুলার বন্ধ করে রাখায় আস্তে আস্তে কখন যে নষ্ট হয়ে গেছে ঘরের ঠাণ্ডা খেয়াল করেনি। এখন গরম না লাগলেও ভ্যাপসা ভাব টের পেল স্পষ্ট। মিডিয়াম পয়েন্টে রেখে আবার কুলারটা অন করে দিল সে।

চারটে বাজে প্রায়। অনুপ দেরিতে এল বলেই সন্দেহ, না হলে আর কতক্ষণই বা অফিসে থাকতে হত তাকে! সাড়ে-পাঁচটা, বড় জোর ছ'টা। নিজে অনেক দিন দেরি পর্যন্ত থাকলেও সাধারণত তাকে আটকে রাখে না অনুপ, নিজেই চলে যেতে বলে। অবশ্য ফেরার তাড়া তারই বা থাকবে কেন! ফেরা মানেই তো সেই দক্ষিণীতে। একই রাস্তা, একই গেট, একই বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় ওঠা; বিশাখা আগে এসে না পড়লে ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ঘরের তালা খোলা, সুইচ টিপে অন্ধকার তাড়ানো। রাত্রে বিশাখার সঙ্গে খেতে বেরুবার কথা ছিল আজ, সেটাও ক্যানসেল হয়ে গেছে। এর পরেই থেমে থাকা। অর্পিতা থামল এবং ভাবল, অনেকদিন মা'র কাছে যাওয়া হয়নি। তাড়াতাড়ি বেরুতে পারলে আজ সে মা'র কাছেই যাবে।

অনুপ চেম্বারে হন্তদন্ত হয়ে এল; দরজা ঠেলে ভিতরে ঢোকার আগে মিনিট পাঁচেক সময় অন্তত দিতে হবে ওকে; যাতে ধীরেসুস্থে সহজ হয়ে বসতে পারে। ইতিমধ্যে দরকার হলে বেল বাজালেই হল, কিংবা ইন্টারকমেও ডাকতে পারে তাকে। অর্পিতা তৈরিই আছে। তা ছাড়া অনুপ ট্যুরে থাকার সময় জরুরি যেসব কাগজপত্র জমা হয়েছে সেগুলো ফাইলবদ্ধ করে লাঞ্চের আগেই রেখে এসেছিল টেবিলে। তার পরে যা এসেছে তার মধ্যে এমন কিছু নেই যা এখনই পেশ না করলেই নয়। দু তিনদিনে ফোন এসেছিল কয়েকটা, সমস্তই নোট করা আছে কলবুকে—সুবিধেমতো সেটা মেলে ধরলেই হবে। আর, হ্যাঁ, ইনভিটেশন কার্ডগুলো। জানা দরকার ওগুলো ডেসপ্যাচ করবে কি না।

প্রায় ঘড়ি ধরে পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করল অর্পিতা। এতক্ষণের কাজ-না-থাকা ভাবনাগুলো পাশ কাটিয়ে গেলেও তাকে ও অনুপকে জড়িয়ে নিবেদিতার কথাগুলোই মনে পড়ল আবার। মনের প্রতিক্রিয়া ভারী অদ্ভুত; সত্য হোক বা অসত্য, একবার উসকে দিলেই ধোঁয়ার মতো ছড়াতে থাকে আচ্ছন্নতা। এই মুহূর্তে অর্পিতা ভাবল, সে নিজেকে জানে, অনুপকেও জানে--, তা ছাড়া তার চাকরিটাই এমন যে কারণ থাক না থাক রটনা হতেই পারে। এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর মানে হয় কিছু!

কলবুক হাতে নিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজায় টোকা দিল অর্পিতা। তারপর বন্ধ দরজার হাতল ঘুরিয়ে আস্তে ঢুকে পড়ল ঘরে। দেখল, মোটা গদির চেয়ারটা পিছনে ঠেলে, টেবিলের তলায় পা ছড়িয়ে, সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে আছে অনুপ। এই ভঙ্গি শুধু ক্লান্তিই চেনায় না; মনে হয় শারীরিক অবস্থানের বাস্তবটুকু বাদ দিলে সে এখন অফিসে

নেই। উদ্‌ভ্রান্ত এবং অন্যমনস্ক, এমন কিছু ভাবছে যার সঙ্গে কাজকর্মের সম্পর্ক নেই কোনও।

ওইভাবেই চোখ ফিরিয়ে অর্পিতাকে দেখল অনুপ। মন্থর হাসিতে হাসি থাকল না।

কখনও কখনও অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেও এর আগে কখনও ওকে এমন হাত-পা ছাড়া হতে দেখেনি অর্পিতা। অবাক লাগল। অস্বস্তিও। কেন, তা বুঝতে পারল না। তখন বাধ্য সেক্রেটারির মতো গতানুগতিক হয়ে বলল, 'কফি বলব?'

'বলবেন?' অনুপ তাকেই দেখছে। একই ভঙ্গিতে বলল, 'আচ্ছা, বলুন—'

কলবুকটা অনুপের টেবিলে রেখে বেরিয়ে যাচ্ছিল অর্পিতা। অনুপ ডাকল আবার। ততক্ষণে চেয়ারটা টেনে এনেছে টেবিলের কাছে। কনুই নামানো দুটি হাতের চারটি করে আঙুল সমানভাবে রেখা টানছে কপালের মাঝখান থেকে দুদিকে। দৃষ্টি নামানো।

'আই ডোন্‌ট্‌ ফিল লাইক—। কফি থাক এখন।' অনুপ বলল, 'হেড অফিসে এম-ডি'র ডিরেক্ট লাইনে ফোন করে দেখুন তো পান কি না।'

অর্পিতা অপেক্ষা করল একটু। এই নির্দেশ পাল্টায় কি না দেখল। তারপর বেরিয়ে এসে, নিজের জায়গায় বসে, অনুপের চাওয়া নাম্বারটা ট্রাই করতে লাগল।

এনগেজ্‌ড্‌। দ্বিতীয় চেষ্টাতেও তাই। সম্ভবত কথা বলছেন কারুর সঙ্গে। এখানের টেলিফোনের যা অবস্থা, অকারণও হতে পারে। চার পাঁচদিন কথা বলেনি এই লাইনে। এমনকী হতে পারে যে ডেড্‌ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে? যদি ডেড হয়, বিরক্তিকর এই এনগেজ্‌ড্‌ সাউন্ডের পৌনঃপুনিকতা থেকে আত্মরক্ষার জন্যে ঠিক কতক্ষণ পরে সে খবরটা দিতে পারে অনুপকে?

কয়েক সেকেন্ডের জন্যে রিসিভার নামিয়ে রেখে আবার সেটা তুলে নিল অর্পিতা।

বিরক্তি চিনতে পারছে। সেইসঙ্গে সমস্ত ঘটনার অসংলগ্নতাও। সাধারণত ভাববাচ্যে কিংবা ইংরিজিতে 'ইউ' বলা অনুপের সম্বোধন ইদানীং বেশ কিছুদিন তুমি-ই থাকত। বয়সে বড়, পজিশনেও; তা ছাড়া অনেকদিন একসঙ্গে কাজ করতে করতে হৃদ্যতা গড়ে ওঠে এক ধরনের, সেজন্যেও হতে পারে, অর্পিতা ব্যাপারটাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিল। কিন্তু আজ যে দু চারটে কথা বলল তার মধ্যেই দগদগে হয়ে উঠল 'আপনি' শব্দটা। গত চার পাঁচদিনে এমন কী ঘটেছে যে সম্বোধন পাল্টে ফেলল অনুপ! এমন কিছু কি ঘটেছে যে-জন্যে নিজেকে, নিজের ব্যবহৃত সম্বোধন ও সম্পর্কগুলোকে পাল্টাতে চাইছে ও! নাকি তখন ঘরে ঢুকে যেমন দেখেছিল, উদ্‌ভ্রান্ত, মানসিকতায় হঠাৎ কোনও বিভ্রম ঘটলে যেমন হয়, এটা তারই জের!

চেষ্টা করতে করতেই পেয়ে গেল। ওদিকে এম-ডি'র গলা। নিজেকে সংযত করে কিছু বা নার্ভাস গলায় অর্পিতা বলল, 'গুড আফটারনুন, স্যার। প্লিজ স্পিক টু মিস্টার রায়—'

ব্যস্তভাবে কলটা অনুপকে ট্রান্সফার করে দিল অর্পিতা। অনুপ রেসপন্ড করার পর রিসিভার নামিয়ে ক্রমশ থেমে এল নিজের মধ্যে।

কেমন খেই হারানো লাগছে নিজেকে। নির্দিষ্ট বলতে এখন আর কোনও ভাবনা নেই। কল শেষ হবার সঙ্কেত ফিরে আসতে যান্ত্রিক ওই ধ্বনির রেশের দিকে তাকিয়ে একই সঙ্গে অর্পিতা ভাবল এবং অনুভব করল, আপনি কিংবা তুমি, এর কোনওটার সঙ্গেই তার সম্পর্ক নেই কোনও, তবু অস্পষ্ট ঘামের অনুভূতিতে ছেয়ে যাচ্ছে শরীর। কেন! কেন মনে হচ্ছে

নিজের অজান্তে একটা অধিকার পেয়ে গিয়েছিল সে, সেই অধিকার থেকেই এখন বঞ্চিত করা হল তাকে।

ইন্টারকমে শব্দ। অনেকটা স্বাভাবিক গলায় অনুপ বলল, 'এখন কোনও কল এলে আমাকে দেবার দরকার নেই।'

'ও-কে।'

'খান্না আমার রেসিডেন্সে ফোন করেছিল। আই ডোন্ট্ নো হোয়াই। যদি কিছু থাকে, কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করতে পারে। আজ নয়—'

'আই উইল চেক দ্যাট—'

কথা শেষ হলেও লাইন ছাড়েনি অনুপ। হয়তো আরও কিছু আছে, ভাবছে। অর্পিতা অপেক্ষা করতে লাগল।

'কোনও অ্যানালজেসিক আছে কাছে? ট্যাবলেট?' শেষ পর্যন্ত অনুপ, 'ফ্রাঙ্কলি, আই অ্যাম হ্যাভিং আ টেরিব্‌ল হেডেক্—'

'দেখছি—'

'প্লিজ!'

ব্যাগটা টেনে নিল অর্পিতা। হঠাৎ শরীর খারাপজনিত কারণে মাথাটাথা ধরলে কি অম্বলভাব দেখা দিলে দরকার পড়তে পারে জেনে দু একটা অ্যানালজেসিক কি অ্যানটাসিড ট্যাবলেট, লবঙ্গ-টবঙ্গ সঙ্গেই থাকে তার। তবে অনেক দিন ব্যবহার করেনি, এখন আছে কি না জানে না। আপাতত ব্যাগ থেকে চিরুনি, ছোট মেক-আপের বাক্স, ডায়েরি ইত্যাদি বের করে অ্যানালজেসিক খুঁজতে খুঁজতে অর্পিতার মনে হল অনুপের উল্টোপাল্টা আচরণের একটা কারণ সম্ভবত খুঁজে পাচ্ছে সে। ট্যাবলেটটা যদি নিজের কাছে না পায় তা হলে রামেশ্বর বা আর কাউকে ডেকে আনিয়ে নেবে। কাছাকাছি ড্রাগস্টোর বলতে পার্ক স্ট্রিটে। পান-সিগারেটের দোকানেও পাওয়া যেতে পারে। আনতে সময় লাগবে না। নিবেদিতা বা আর কারুর কাছে খোঁজ করবে? না। যে-কোনও ঘটনা থেকেই চটপট মানে খুঁজে নেয় ওরা। নাটকের রিহার্সাল দেওয়ার মতো, হয়তো এই কথাটিই ঘুরেফিরে কানে আসবে, কিছু বা শ্লেষ মিশিয়ে, যে, বাড়িতে না থেকে তার সেক্রেটারির কাছে মাথা ধরার ট্যাবলেট খুঁজতেই এই অবেলায় অফিসে এসেছে অনুপ রায়। নাটকই তো! বস্তুত হঠাৎই যেন একটা রহস্য ও উত্তেজনার সৃষ্টি করে দিয়েছিল অনুপ।

দ্রুত অনুপের ঘরে ঢুকে অর্পিতা দেখল, চেয়ার ছেড়ে উঠে অনুপ এখন সোফায় গিয়ে বসেছে। মাথাটা পিছনে হেলানো, চোখ বন্ধ, পুরু হাতলের দুদিকে ঝোলানো লম্বা হাতদুটো কার্পেট স্পর্শ করেছে প্রায়। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ঘরে তার উপস্থিতি লক্ষ করেছে কি না। তা ছাড়া, ঈষৎ উদ্বেগ নিয়ে অর্পিতা ভাবল, শুধুই মাথা ধরার কারণে একটি পোড়-খাওয়া, প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ এমন এলিয়ে পড়তে পারে না। এমনও হতে পারে অন্য কোনও অস্বস্তিতে ভুগছে ও। সে কি জিজ্ঞেস করবে? অফিসেই ডাক্তার আছে একজন। খবর দেবে?

লোকটিকে দেখতে দেখতে কেমন একটা মায়া এসে গেল মনে। একসঙ্গে অনেক ঘটনা মনে পড়ল অর্পিতার। সকালে চন্দ্রার ফোন, নিজের ফেরার খবরটুকু দিয়েই অনুপের টেলিফোন ছেড়ে দেওয়া, নিবেদিতা বলেছিল তাকেও ফোন করেছিল চন্দ্রা। যাকে নিয়ে এত প্রশ্ন, কেউ জানে না তার পরের এতটা সময় পর্যন্ত কী অবস্থায় ছিল সে; সত্যি-সত্যিই

অসুস্থতা বোধ করা সত্ত্বেও বাড়িতে বিশ্রাম না নিয়ে এই অবেলায় কেন চলে এল অফিসে।

হাতের তালুতে ট্যাবলেটটা নিয়ে সাইড-ব্যাগ থেকে জলের গ্লাসটা তুলে নিল অর্পিতা। এগিয়ে গেল ওর কাছাকাছি।

'নিন। অ্যানালজেসিক এনেছি।'

অনুপ চোখ খুলল। তারপর হাত বাড়াল।

ট্যাবলেটটা ওর হাতে দিল অর্পিতা। জলের গ্লাসও। বলল, 'বেশি অসুস্থ লাগলে বলুন। ডাক্তার ব্যানার্জিকে ডাকতে পারি—'

দু আঙুলে ট্যাবলেটটা ঠোঁটের কাছে ধরে রেখেছে অনুপ। মাথা নাড়ল। তারপর ক্লিষ্ট হেসে বলল, 'ডোনট ওয়ারি। আই উইল বি অলরাইট—'

অর্পিতা জানে, উত্তর না থাকলে এইভাবেই সেজে নেয় মানুষ। ভাবতে হয় না।

কোঁ-কোঁ করে জল গিলছে অনুপ। তৃষ্ণার অদ্ভুত ছায়া ছড়ানো মুখের রেখাগুলো কাঁপছে থিরথির করে। সম্ভবত এখনও অন্যমনস্ক, না হলে ঠোঁটের কষ বেয়ে গড়ানো জলের ফোঁটাগুলো চিবুক ছুঁয়ে শার্টের ওপর, ট্রাউজার্সের কোলে পড়ত না। ওর কণ্ঠনালীর মসৃণ ওঠানামা থেকে অর্পিতার চোখ নেমে এল শার্টের ভিতর থেকে উঁকি-দেওয়া কচিৎ সাদা-মেশানো বুকের রোমে। দেখতে দেখতেই কেমন একটা শিহরন এসে গেল শরীরে।

'থ্যাঙ্ক ইউ—'

শূন্য গ্লাসটা অনুপের হাত থেকে ফেরত নেবার সময়ও ওর মুখ থেকে চোখ ফেরাতে পারল না অর্পিতা। হয়তো খারাপ দেখাবে, ভাবল; তবু ছোট্ট একটা প্রলোভন সামলাতে পারল না সে।

কোমরের ঘের থেকে নিজের রুমালটা বের করে হঠাৎই হাত বাড়িয়ে অনুপের ঠোঁটের পাশে ও চিবুকে লেগে থাকা জলের দাগ মুছে দিতে দিতে বলল, 'অসুস্থ শরীরে অফিসে আসা কি খুবই জরুরি ছিল। নাকি ভেবেছিলেন কেউ একজন থাকবে, যে ট্যাবলেট আর জলের গ্লাস এগিয়ে দেবে—মুখ মুছিয়ে দেবে রুমালে—'

স্বগতোক্তির ধরনে বলা এইসব কথা, নিজের স্বরের আচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে ফিরে আসছে নিজেরই কানে, ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে গাঢ় অনুভূতিতে টইটুম্বুর নিজেরই শরীরে। অর্পিতা জানে সে এমন কিছু করবে না যা নিজের কাছেই ছোট করে দেয় নিজেকে। বরং অপেক্ষা করবে।

অনুপের নিঃশ্বাসের গন্ধের সম্মোহন থেকে প্রাণপণ নিজেকে দূরে ঠেলতে লাগল সে।

৩

এবারের মতো শীত অনেক দিন পড়েনি কলকাতায়। গোটা ডিসেম্বর-জানুয়ারি জুড়েই চলল হিমেল হাওয়ার মাতন। সন্ধের পর থেকে সারা রাত আর সকালে কুয়াশা কাটিয়ে রোদ না ওঠা পর্যন্ত ঠোকাঠুকি লাগত হাড়ে। তীব্র, কনকনে, রক্তে ছিপ ফেলে রাখা শীত। যেমন জাঁকিয়ে এসেছিল তাতে মনে হচ্ছিল এর জের চলবে অনেক দিন। কিন্তু, ফেব্রুয়ারির

গোড়া থেকেই ঠাণ্ডা কমে গেল আস্তে আস্তে। ঠিক গরম না পড়লেও হাওয়ার এলোমেলো খামখেয়ালি ভাবই বুঝিয়ে দিল বসন্ত আসছে। ক্রমশ রং বদলাতে লাগল আকাশ। রোদ্দুরও।

মার্চের এক দুপুর গড়ানো বিকেলে কলেজের টিচার্স রুমে বসে সিদ্ধার্থকে চিঠি লিখছিল বিশাখা। খানিকটা এগিয়েছে, এমন সময় কোকিলের ডাক শুনে থেমে এল হাত। চোখ তুলে দেখল, উল্টোদিকে, সায়েন্স বিল্ডিংয়ের সামনের মাঠের ওপর দিয়ে হাওয়া ছুটে যাচ্ছে পাঁচিলের গায়ে লাগানো গাছগুলির দিকে। হাওয়া যেদিকে ঠিক সেদিকেই হেঁটে যাচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীর একটি বিচ্ছিন্ন দল। ডাকটা ওইদিক থেকেই আসছিল।

ডট পেন নামিয়ে রেখে আঙুল মটকাল বিশাখা। সামান্য উতলা লাগল নিজেকে।

এইবার ডিসেম্বরে, বড়দিনের ছুটিতে ছাত্র-ছাত্রীদের ক'জনকে নিয়ে পুরী বেড়াতে গিয়েছিল ওরা। প্রতি বছরই যাওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যায় বলে পালা করে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদেরও কাউকে কাউকে যেতে হয় সঙ্গে। এবার সে ছিল, তমাল ব্যানার্জিও ছিল। উদয়গিরি খণ্ডগিরি দেখতে গিয়ে ওরা যখন রাস্তার ধারে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে, তখন হঠাৎই এরকম সুদূর ডাক ভেসে এসেছিল কানে। সমুদ্রের কাছাকাছি জায়গায় শীত পড়ে না তেমন, তবু, এটা কি কোকিল ডাকার সময়! অবাক হয়ে বিশাখা যখন আশপাশের পাহাড়ি গাছগাছালির দিকে তাকাচ্ছে, ওর মনোভাব আঁচ করে তমাল বলল, 'সব কোকিলই কি গাছে থাকে! ওই দেখুন—'

তমালের তুলে ধরা আঙুল অনুসরণ করে বিশাখা দেখেছিল, চায়ের দোকানের পিছন দিকে ঝোলানো বাঁশের খাঁচায় ঘুরে ঘুরে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা কালো পাখি। কোকিলই।

বিশাখা যেখানে বসে সেখান থেকে খানিকটা দূরে জটলায় বসে আড্ডা দিচ্ছে বাসবী আর প্রণতি, সঙ্গে ইংরেজির মালতীদি। একটু আগে তমাল ব্যানার্জি এবং আরও কেউ কেউও ছিল এখানে। পাঁচমিশেলি গলার খুচরো কথাবার্তায় সৃষ্টি হচ্ছিল একরকম শব্দ। এমন ভিড়ের মধ্যে নিজের নিভৃতি খুঁজে একান্ত আপন কাউকে চিঠি লেখায় মনঃসংযোগ করা যায় না। নতুন ক্লাসের শুরুতে কয়েকজন বেরিয়ে যেতেও নিশ্চিন্ত হওয়া গেল না।

ওইভাবে আলাদা বসে ওকে খাম বের করে চিঠি পড়তে দেখে এগিয়ে এল বাসবী। ঘাড়ের ওপর মুখ এনে বলল, 'কী ব্যাপার তোমার! প্রায়ই দেখি ব্যাগ খুলে নীল চিঠি বের করে খুব মন দিয়ে পড়ছ! কে পাঠায় গো!'

তাড়াতাড়ি চিঠিটা আড়াল করলেও বিরক্তি দেখাল না বিশাখা। নীল চিঠি শব্দদুটো ততক্ষণে গেঁথে গেছে মনে। ঈষৎ এলানো গলায় রহস্য এনে বলল, 'কে পাঠায়! হয়তো সে-ই, রোজ রাত্তিরে যে তোমার বালিশের নীচে স্বপ্ন রেখে যায়—'

'তাই বলো! ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ!'

কথায় মানে থাক না থাক, বাসবী এইভাবেই বলল। সামনের জুলাইয়ে বিয়ে ওর; খুব খুশি। ইদানীং সারাক্ষণ আহ্লাদে জড়িয়ে রাখে নিজেকে।

বাসবী হয়তো আরও কিছু বলত। সেই সময় ইকনমিক্সের দেবেন গুহকে ঢুকতে দেখে সরে গেল। বয়স্ক, গম্ভীর এবং সাতে-পাঁচে না থাকা মানুষ দেবেনবাবুর উপস্থিতি এমনিতেই নম্র করে দেয় গলার স্বর। ওঁকে উল্টোদিকে জানলার দিকে পিঠ ফিরিয়ে বসে টিউটোরিয়ালের খাতা চেক করতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল বিশাখা। এই নিরাপত্তাটুকুই

দরকার ছিল তার।

ডটপেনটা আবার তুলে নিল বিশাখা। সাত আট লাইন লিখেছে মাত্র, এখনও এয়্যারোগ্রামে জায়গা পড়ে আছে অনেকটা। এর পর কী লিখবে!

আজ আর ক্লাস নেই। ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারত। তবু ভাবল, যে করেই হোক আজই লিখে ডাকে দেবে চিঠিটা। চার পাঁচদিন হল চিঠি এসেছে সিদ্ধার্থর, জবাব দেবে বলে এয়্যারোগ্রামও কিনেছিল তাড়াহুড়ো করে, কিন্তু আজ লিখব কাল লিখব করে লেখা হয়নি শেষ পর্যন্ত। কী যে গড়িমসি ভাব হয়েছে আজকাল, কলেজ আর চাকরির দায়িত্বটুকু ছাড়া আর যে-কোনও কাজেই আলস্য লাগে কেমন। তা হলেও সিদ্ধার্থর চিঠির জবাব দিতে আলস্য বোধ করবে কেন! এ নিয়ে অস্বস্তি লাগছিল। তবে কি উৎসাহ হারিয়ে ফেলছে সে!

বস্তুত, কাল অনেক রাত পর্যন্ত অন্ধকার মুখে নিয়ে জেগে থাকতে থাকতে ও ভেবেছিল এই চিঠি পাওয়া এবং চিঠির উত্তর দেওয়ার মধ্যে একটা অভ্যাস এসে গেছে যেন-—কাগজ-কলমের সম্পর্কের মধ্যে জমে উঠতে উঠতে তারা দুজনেই হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ, হয়তো বা হারিয়ে গেছে এরই মধ্যে! চিঠি জানায় তারা বেঁচে আছে; সিদ্ধার্থ তার কাজকর্ম নিয়ে, আর বিশাখা নিজেই জানে কলেজে পড়ানো আর রিসার্চের ভাবনাটুকু আছে বলেই টিকে আছে সে, না হলে সত্যি-সত্যিই ফুরিয়ে যাবার কথা ভাবতে হত তাকে।

এই ধরনের চিন্তা এর আগে কখনও উঁকি দেয়নি মনে। আশঙ্কা থেকে সন্দেহ হয়েছিল সিদ্ধার্থও কি এইভাবেই ভাবে। কী এত কাজ ওখানে যে আজকাল চিঠিও লেখে বেশ দেরিতে দেরিতে! 'সপ্তাহে দুটো তিনটে চিঠি লিখছি তোমাকে, এর থেকে যদি ভাবো চিঠি লেখাটাই আমার মনের মতো কাজ, তা হলে ভুল করবে। ইচ্ছে করে রোজই লিখতে। আসলে এই হাজার-হাজার মাইল দূর বিদেশে কী যে নিঃসঙ্গ লাগে নিজেকে—', এসব, এমন সুন্দর-সুন্দর কথা কি সিদ্ধার্থ লিখেছিল একদিন! কত বছর আগে! বছরের হিসেবে বেশি নয় হয়তো, কিন্তু কিছু নিশ্চয়ই ছিল সেসব কথায় যা শব্দের অর্থ ছাড়িয়ে ঢুকে পড়ত বোধে আর অনুভবে।

শেষ পর্যন্ত বিশাখা ভেবেছিল, এমনিতেই দেরি করে চিঠি দেয় আজকাল, এর পর সে জবাব দিতে দেরি করলে সেটাই সিদ্ধার্থর অজুহাত হয়ে দাঁড়াবে। এমনও হতে পারে যে ওর ব্যস্ততা, সময়ের অভাব, সবই সত্যি। তার নিজের তো অফুরন্ত সময়!

কিন্তু, এখন, লিখতে গিয়ে, যা লিখেছে তার বেশি কোনও কথা মনে এল না বিশাখার। অস্বস্তি থেকে লাইন গুনে দেখল, মোটে সাতটি লাইন, শব্দ গুনলে ষাট-সত্তরে দাঁড়াবে। এরপর কি কলকাতায় বসন্ত এসেছে, এই চিঠি লিখতে লিখতে হঠাৎই শুনতে পেয়েছিল কোকিলের ডাক—এইসব লিখবে! যাকে ভালবাসে, যার অপেক্ষায় থাকতে থাকতে ক্রমশ বুড়িয়ে যাচ্ছে সে, কেন তার জন্যে কিছু আবেগ, কিছু উত্তাপ শব্দ হয়ে ফুটে উঠছে না মনে!

এই মুহূর্তে অসহায়তাই আর্দ্র হয়ে উঠল চোখে। আশপাশে কে আছে না আছে, কেউ তাকে লক্ষ করছে কি না খেয়াল করে সিদ্ধার্থর চিঠিটাই আবার চোখের সামনে খুলে ধরল বিশাখা। আলগা দাঁতে নীচের ঠোঁট ছুঁয়ে মনে মনে বলল, কত হাজার মাইল দূরে আছ তুমি। ওখান থেকে দেখতে পাচ্ছ কি আমি কেমন আছি, কীভাবে সবই আস্তে আস্তে ছেড়ে যাচ্ছে আমাকে!

'বিশাখা,

তোমার চিঠি পেয়েছি। চিঠিতে তারিখ দাওনি, তাই ধরতে পারলাম না কবে লিখেছ। ডাকটিকিটের ওপর ছাপ দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে আমি পাবাব আগে বেশ ক'দিন কেটে গেছে। ঠিকানায় পৌঁছলেও যদি ঠিকানার লোকটিকে খুঁজে পাওয়া না যায়, তা হলে চিঠির দোষ নয়। আসলে আমি ক'দিন ঠিকানায় ছিলাম না। অ্যাপার্টমেন্ট রেনোভেট করতে হল, তাই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল যত্রতত্র। ফিরে দেখলাম একেবারে নতুন লাগছে সবকিছু। আমেরিকানদের স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য যা পুরনো তার প্রতি ওদের কোনও মায়া নেই, মোহও নেই। ওরা ফেলে দিতে অভ্যস্ত।

যাই হোক, বাঁধনছাড়া হয়ে ক'দিন নিজেকে ঝালিয়ে নিলাম। নিউইয়র্কে আছি এতদিন, কিন্তু শহরটাকে সামান্যই চিনতাম। আগে তোমাকে লিখেছিলাম খুঁজে নিতে পারলে এখানে বাঙালির অভাব নেই। এখন দেখছি চামড়ার সাদা দেখেই যদি যে-কাউকে আমেরিকান ভাবি তা হলে ভুল করব। ইউরোপিয়ান ইমিগ্রান্টস এখানে এত বেশি যে কে পোলিশ, কে গ্রিক, কে আমেরিকান তা খুঁটিয়ে খোঁজ না করলে বোঝা যায় না। সেদিন আপার ওয়েস্ট সাইড ম্যানহাটানের ব্রডওয়ে রেস্তোরাঁয় দল বেঁধে কফি খেতে ঢুকেছিলাম। কাগজের তৈরি কফির কাপ উল্টে দেখি তাতে বিখ্যাত পার্থেনন-এর ছবির ছাপ। পার্থেনন যে গ্রিসীয় তোমাকে তা বোঝাতে হবে না। এই রেস্তোরাঁটা গ্রিকরাই চালায়, তাই ওই ছাপ। কথায় কথায় বেরিয়ে পড়ল নিউইয়র্কের অধিকাংশ কফিশপের মালিকই গ্রিক। এটা জানতাম না।

আরও মজার কথা, ব্রডওয়ের কাছাকাছি এক ভারতীয় রেস্তোরাঁ খুঁজে পেয়েছি, যার নাম 'বিট অফ বেঙ্গল'। মাথায় সাদা পাগড়ি বেঁধে যারা সার্ভ করছে তারা সর্দারজি বা অন্য কোন প্রদেশীয় বোঝা যায় না। এরই পাশে ওয়াং-এর জুতো মেরামতির দোকান। লোকটি কোরিয়ান। ভাঙা ভাঙা ইংরিজি বলে, বোঝে আরও কম। কিন্তু ডলারের হিসেব বুঝতে পাকা। একই রাস্তা ধরে আরও একটু এগোলে তাসিতা-দা-ওরো নামে একটি রেস্তোরাঁ। এটি চাইনিজ-কিউবান মেনুর জন্যে বিখ্যাত। কোথায় চীন, কোথায় কিউবা! কৌতূহল মেটাতে একটা ডিশ অর্ডার করে খেয়ে দেখি পাকা কলা ভাজার সঙ্গে শুয়োরের মাংস আর নুডলস মিশিয়ে তৈরি করেছে বেশ সুস্বাদু একটি ঘণ্ট। এসব দেখতে দেখতে কেমন একটা নেশায় পেয়ে গেছে, ভাবছি আস্তে আস্তে আবিষ্কার করে নেব এই শহরটাকে। এবারে আরও বেশি লিখলে জায়গায় কুলোবে না।

তুমি কেমন আছ লেখোনি কিছু। ধরে নিচ্ছি ভালই আছ। থাকবে না কেন! তুমি তো পায়ে বেড়ি-পরানো অধিকাংশ বাঙালি মেয়ের মতো নও। তুমি স্বাধীন।

রিসার্চের প্রোগ্রেস কি?

ভাল কথা, বেশ কিছুদিন বাড়ির চিঠি পাইনি। তোমার সঙ্গে কি যোগাযোগ হয়েছে? মা বা বৌদি বা সুদেষ্ণার সঙ্গে?

চিঠি দিও।

সিদ্ধার্থ'

একবার পড়লে আবারও পড়তে হয়। শব্দগুলির মধ্যে বিশাখা এখন নিজেকেই পড়ছে। পড়তে পড়তেই পাল্টে যাচ্ছে অর্থ। তাৎক্ষণিক আবেগ থেকে রক্ত-মাংস-হৃদয়-হৃৎপিণ্ডময়

বিশাখাকে ছিঁড়ে বের করে তার জায়গায় ইতিহাসের লেকচারারকে বসালে সেও পারবে হাতে লাল কালির কলম নিয়ে টিউটোরিয়ালের খাতা দাগাতে। মগ্ন হতে ভুল সত্য আবিষ্কারে।

'ওরা ফেলে দিতে অভ্যস্ত', কত স্বচ্ছন্দে লিখেছে কথাগুলো! তুমিই কি আমেরিকান হয়ে গেলে সিদ্ধার্থ, পুরনো মায়া ভুলতে নিজেকেও রেনোভেট করে ফেলেছ! নাকি পোলিশ, গ্রিক, কিউবান, কোরিয়ানদের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলেছ নিজেকেও! পাকা কলা আর শুয়োরের মাংসের সঙ্গে নুডল্‌স্ চিবোতে চিবোতে কেমন সুন্দর ভাবে আমার পায়ের বেড়ি খুলে স্বাধীন করে দিলে আমাকে! ভুলে গেছ কি কোনও দিন ঠোঁটের স্বাদ নিতে নিতে কী বলেছিলে তুমি! জোর করা ইচ্ছে থেকে বুকে মুখ রেখেও সরিয়ে নিয়েছিলে নিজেকে; আমার লজ্জা, ভয় আড়াল করতে করতে বলেছিলে, 'তোমার চেয়ে বেশি ভয় তো আমিই পাচ্ছি—মনে হচ্ছে বিশাখাও নও, নারী নও, তুমি এক অচেনা মহাদেশ, খুঁজতে গেলে হারিয়ে ফেলব নিজেকে!' কী হল, কোথায় হারিয়ে গেল তোমার সেই মহাদেশ! মন থাকলে বুঝতে বেড়িটা ঠিক কোথায়, কেন কেউ সেটা খুলতে চায় না, দাগে দাগে রক্ত ও জ্বালা দগদগে হয়ে উঠলেও না!

কালো কালির আঁচড়ের ভিতর থেকে ক্রমশ ফুটে উঠছে বেগুনি আভা। ধরে রাখা নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সেই বেগুনি আভাও ক্রমশ হারিয়ে ফেলল বিশাখা। পরিবর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠল শূন্যে ভাসমান বুদ্বুদের মতো অস্পষ্ট সাদা কয়েকটি বিন্দু। সাতটি লাইন যেখানে এসে থেমেছিল, অভিমানই জুগিয়ে দিচ্ছে তার পরের ভাবনাগুলো। ডটপেন সচল করলে এখন সেখানে প্রশ্নই ফুটবে। কে চায় এসব জানতে! ম্যানহাটান, ব্রডওয়ে, তাসিতা-দা-ওরো—এই শব্দগুলো জুড়লেই কি তৈরি হয়ে যাবে আমার হাজার হাজার মাইল দূরত্ব পেরুনোর সেতু! তুমি কি রবীন্দ্রনাথ, এইভাবেই ভরে তুলছ ছিন্নপত্রের পাতা!

একার চিন্তা কখনও বা আরও একা করে দেয় নিজেকে। তখন মনে হয় আশেপাশে কেউ নেই, ছিলও না। সময় থেমে আছে একারই মধ্যে; এখন যে-সময় তার আগে কিছু ছিল না। পরেও থাকবে না হয়তো।

চোখ তুলে বিশাখা দেখল উল্টোদিকে বসে জলের গ্লাসে চুমুক দিতে দিতে তাকেই দেখছেন দেবেনবাবু। খাতাগুলো একপাশে ঠেলা। চশমা টেবিলের ওপর নামানো। চোখাচোখি হতে বললেন, 'কেমন আছ, বিশাখা?'

'ভাল। আপনি?'

'আমিও ভাল। যতটা থাকা যায় আর কি!' চশমাটা তুলে পরতে পরতে দেবেনবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাস আছে নাকি আরও?'

'নাঃ। যাব এইবার—'

'হ্যাঁ। রেস্ট নাও। তোমাকে ক্লান্ত লাগছে—'

দেবেনবাবু উঠে পড়লেন। সঙ্গে খাতাগুলো। ওর ছেড়ে যাওয়া জায়গা দিয়ে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিশাখা দেখল ছাত্র-ছাত্রীর যে-দলটিকে খানিক আগে হেঁটে যেতে দেখেছিল তারাই ফিরে আসছে আবার। কোথায় গিয়েছিল ওরা? ওদিকে কি বেরুবার রাস্তা আছে কোনও? থাকতেও পারে। ওরা কোনাকুনি এসে বাঁ দিকে সরে যেতে

শুধুই মাঠ পড়ে থাকল সামনে। কাছেই কোনও ক্লাস থেকে ভেসে আসছে চেঁচিয়ে পড়ানোর গলা। ঘরের ওদিকে, এখনও জানলার দিকে মুখ করে নিচু গলায় কথা বলছে মালতীদি আর প্রণতি। বাসবী কখন বেরিয়ে গেছে খেয়াল করেনি। ওর ক্লাস থাকার কথা। হয়তো ফিরবে।

সিদ্ধার্থর চিঠিটা ভাঁজ করে ব্যাগে রাখল বিশাখা এবং ভাবল, বস্তুত 'চিঠি দিও' ছাড়া এই চিঠির মধ্যে এমন কিছু নেই যে-জন্যে ব্যস্ত হতে হবে তাকে। পরেও লিখতে পারে। সিদ্ধার্থ ভাল আছে, বোঝাই যায়, দুদিন পরে চিঠি পেলেও ভাববে না কিছু। বরং তার নিজেরই পক্ষে ভেবে দেখা দরকার সাতটি লাইনসুদ্ধু এই এয়্যারোগ্রামটা ছিঁড়ে ফেলে নতুন আর একটা ব্যবহার করবে কিনা। সম্ভব অসম্ভবে মেশা এই হেঁয়ালির জের না টেনে স্পষ্ট ভাষাতেই কয়েকটা কথা লেখা যায় সিদ্ধার্থকে। তোমার ভাল হোক আমি তো তা-ই চাই, সিদ্ধার্থ; কিন্তু তুমি কি আমার কথাও ভাববে একটু? পরিষ্কার বুঝতে পারছি যে-মনটা একদিন ছেড়ে দিয়েছিল তোমাকে আবার ফেরত নেবার জন্যে, সেই মনের অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছি আমি। এই কথা, এইরকম কিছু কথা, যন্ত্রণাময় অপেক্ষার কথা। কিন্তু, যদি জবাব না দেয় সিদ্ধার্থ, যদি এড়িয়ে যায়, যদি অন্য কিছু লেখে!

বিশাখা জানে, তার জোরে ভঙ্গুরতা নেই, তবু ভয় পেল।

সাড়ে তিনটে বাজে প্রায়। চিঠিটা আজই লিখতে হবে ভেবে থেকে গিয়েছিল এতক্ষণ; কাজের কাজ কিছুই হল না, মাঝখান থেকে সময় নষ্ট হল কিছুটা। নষ্ট হল? নাকি সত্য এই যে অকাজের মধ্যেও খানিকটা সময় পার করে দিতে পারল সে! এখন অবশ্যই বেরিয়ে যেতে পারে কলেজ থেকে। কোথায়? লাইব্রেরিতে? নিতান্তই যদি কিছু করার না থাকে তা হলে নিশ্চয়ই যেতে পারে সেখানে—অ্যালকভ খালি পেলে নিস্তব্ধ পরিবেশে কিছুক্ষণ বই ঘাঁটাঘাঁটি করা, নোট নেওয়া—সময় কেটে যেত। কিন্তু, কালই লাইব্রেরিতে ঘণ্টা চারেকের কাটানোর পর আজ আবার সেখানে গিয়ে করবে কী! মন-মেজাজও সায় দিচ্ছিল না। যেতে পারে দক্ষিণীতে, নিজের ঘর খুলে চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারে বিছানায়। সকালের খবরের কাগজদুটো পড়তে পারে তন্ন তন্ন করে। সে থেমে আছে বলে থেমে আছে গোটা পৃথিবী, কোথাও সৃষ্টি হচ্ছে না কোনও খবর, এমন তো নয়! কিন্তু, ইচ্ছে করছে না ওখানে যেতে। আজকাল প্রায়ই মনে হয় ওই জায়গাটায় গ্লানি আছে, ওই জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে ভাল হত।

সে একাই নয়। অর্পিতাও পা বাড়িয়ে আছে যাবার জন্যে। মাঝখানে পরামর্শ দিয়েছিল বিশাখা, কোথাও ছোট একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে থাকতে পারে দুজনে। বয়স্কা, নির্ঝঞ্ঝাট কোনও মহিলাকে রেখে দিলে সে-ই চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে তিনজনের সংসার। একটার পর একটা মাল্টিস্টোরেড উঠছে চারদিকে, শুনেছে কেউ কেউ ভাড়া দেবার জন্যেই ফ্ল্যাট কিনে ফেলে রাখছে। ওরকম কোনও ফ্ল্যাটেরও চেষ্টা করা যেতে পারে।

কথাটা শুনেও শুনল না অর্পিতা। ভাবার সময় নিয়ে বলেছিল, 'ফ্ল্যাটে উঠে গেলেই কি আমাদের সমস্যা মিটে যাবে, বিশাখা?'

অর্পিতা এগোয়নি আর। ইদানীং এমনিতেই কেমন বদলে গেছে ও। আগেকার চঞ্চল, ছটফটে ভাবটুকু দেখা যায় না; মনমরা না হলেও আত্মমগ্ন, কী যেন ভাবে সারাক্ষণ। প্রায়ই দেরি করে ফেরে অফিস থেকে। কখনও বা ফিরে বেরিয়ে যায় আবার। তার পরেও

অদ্ভুত-অদ্ভুত সব কাণ্ড। একদিন সন্ধেয় পার্টিতে যাচ্ছে বলে সেজেগুজে বেরুবার আগে যুঁইফুলের এসেন্স স্প্রে করছিল নিজের গায়ে, হঠাৎই তার খানিকটা ছিটিয়ে দিল তারও মুখে, গলায়, বুকে। এত আহ্লাদের কারণ কী বুঝতে পারেনি বিশাখা। এর মধ্যে চার পাঁচদিনের জন্যে হায়দ্রাবাদ গিয়েছিল। হঠাৎই বলল, সুটকেস গোছাল এবং চলে গেল। শুধু বলল অফিসের কাজে যাচ্ছে, আর কেউ কেউও যাচ্ছে সঙ্গে। ওখান থেকে একটা পিকচার পোস্টকার্ড পাঠিয়েছিল তাকে—'আই লাভ ইউ' লেখা, নীচে 'অর্পিতা'। বান্‌জারা হিল্‌স্-এর হোটেল বান্‌জারা থেকে পাঠানো। অর্পিতা ফেরার পর বিশাখা লক্ষ করেছিল, কেমন ভরা-ভরা, আদুরে-আদুরে লাগছে ওকে। ঢল এসেছে গলার স্বরেও। অফিসের কাজে কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাওয়াই কি এভাবে বদলে দিতে পারে কাউকে!

হয়তো পারে। কারণ থাকলেই পারে। কে আর জানছে! মুখ দেখতে দেখতে, কথা শুনতে শুনতে যে-ধারণাটা হয় তা যে সত্যি নয়, অন্তত সব সময়ে নয়, বিশাখা অন্তত জানে তা। একটু আগে দেবেনবাবু তাকে ক্লান্ত দেখেছিলেন, তারও আগে বাসবী এসে ঠাট্টা করে গেল, 'ডুবে ডুবে জল খাচ্ছ' বলে। দুটোর কোনওটাই তো মিথ্যে নয়। তবু, ওরা কেউই জানে না, কেন। কেন সে ক্লান্ত, কেন সে ক্রমাগত আড়াল করে যাচ্ছে নিজেকে! শুধু অনুমানের ওপর নির্ভর করেই কি এগোনো যায়?

না, যায় না। নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তেই সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেল বিশাখা।

গত শনিবার রাত্রে আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের কোন বাড়ির ফ্ল্যাটে আনলাইসেনস্‌ড্ বেশ্যা ধরার জন্যে রেড করেছিল পুলিশ। চার পাঁচটি মত্ত পুরুষের সঙ্গে তিনটি যুবতীও ধরা পড়ে ওখানে। ধরা পড়ার সময় ওদের গায়ে পোশাক ছিল না। পুলিশ বলেছে এরকম প্রাইভেট ব্রথেলের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে কলকাতা শহরে। রবিবার সকালের কাগজে খবরটা দেখে ওরা যখন পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে আরও অন্য খবরের দিকে, তখনও জানত না কিছুক্ষণের মধ্যেই সাদা পোশাকের পুলিশ এসে জেরা করবে হোমের সুপারিনটেন্ডেন্ট কমলা দাশকে। যুবতী তিনজনের মধ্যে একজনের নাম ছন্দা দত্ত, বয়স তেইশ, ঠিকানা এই বাড়ি। পুলিশ অবশ্য ঝামেলা করেনি বেশি; ছন্দার দেওয়া বিবরণ সত্যি কি না জেনে নিয়েই চলে যায়।

ওরা চলে যাবার পর দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে অর্পিতা বলল, 'তখনই গেস করেছিলাম এরকম কিছু হবে। পুলিশ শুক্লাকেও ধরছে না কেন!'

'শুক্লাকে জড়াচ্ছ কেন!' বিশাখা বলেছিল, 'ও কী করবে?'

'ও-ই রেসপন্‌সিবল। ও সেদিন চাকরি দেবে বলে টেম্পট্ না করলে—'

'এটা একটা অনুমান। তার আগে যদি ছন্দাকে তাড়িয়ে দেওয়া হত এখান থেকে, তা হলেও ও কোথাও না কোথাও যেত। অবশ্য তখন ঠিকানাটা বদলে যেত—'

অর্পিতা জবাব দেয়নি। একটু পরে বিশাখা বলল, 'যে বাঁচতে জানে সে আত্মরক্ষাও করতে জানে। আমরাও তো ডেকেছিলাম ওকে—, তেমন অসুবিধে হলে আমাদের কাছেও আসতে পারত। এত তাড়াতাড়ি এত নীচে নেমে গেল কী করে!'

এসব ভাবতে ভাল লাগে না। জোর করে ফিরিয়ে আনতে হয় নিজেকে, নিজেরই বৃত্তে।

বিশাখার হঠাৎ মনে পড়ল, এই মুহূর্তে যাবার মতো জায়গা হয়তো আরও একটা আছে। সিদ্ধার্থ লিখেছিল, অনেক দিন বাড়ির খবর পায়নি। ওপর ওপর ওকে কিছু জানানো ঠিক

হবে না। সেও তো অনেক দিন যায়নি ওদের বাড়িতে! যে নেই তার ছুতো ধরে যেতে লজ্জা লাগে; কিন্তু আজ যদি যায়, স্পষ্টই বলতে পারবে সিদ্ধার্থর চিঠির কথা। তার আগে ফোন করে নিতে পারে। আজ ওদের সঙ্গে কথা হলে কাল সিদ্ধার্থকেও জানিতে দিতে পারবে।

বিশাখা গুছিয়ে নিল নিজেকে। বাসবী ফিরে এসেছে ঘরে, দূর থেকেই ওকে দেখে বলল, 'আমাকে তো বেশ শুনিয়ে গেলে! নিজে কতটা জলে, মাপতে পেরেছ?'

অনেকক্ষণ পরে বিশাখাকে খোলামেলা হতে দেখে ওরাও নড়ে উঠল। প্রণতি বলল, 'বাঁচালে! বাসবী ভাবছিল হার্ট হয়েছ, তাই হঠাৎ গুম মেরে গেলে!'

'না। হার্ট হব কেন!' বিশাখা বলল, 'একটা চিঠি এসে পড়ে আছে অনেকদিন ধরে, কিছুতেই উত্তর দেওয়া হয়ে উঠছে না। লিখতে গিয়ে দেখছি কী লিখব কিছুতেই মাথায় আসছে না—'

'ওটা ইতিহাসের মাস্টারদের বরাবরের প্রব্লেম।' মালতীদি বললেন, 'আমার কর্তাকেও দেখছি তো! এদের কাছে গল্প করছিলাম, নতুন কোথাও বেড়াতে যাবার কথা তুললেই আগে কবে কোথায় গিয়েছিলাম, সেখানে কী কী হয়েছিল, সেই গল্প ফেঁদে বসে! এই করতে করতে এবার গরমে কোথায় যাব ঠিক হল না এখনও।'

বিশাখা উঠে পড়েছিল। বাসবী বলল, 'যাচ্ছ?'

'না। একটা ফোন করতে হবে। তারপর যাব।'

টেলিফোনটা অফিসে। খালিই ছিল। সিদ্ধার্থের এলগিন রোডের বাড়ির নাম্বারটা মনে মনে ঝালিয়ে নিয়ে রিং করল বিশাখা এবং ওদিকে শব্দ বেজে উঠতে অনুমান করতে লাগল কে ধরবে। পার্থদা অফিসে, তার ধরার প্রশ্নই ওঠে না। বাকি থাকে জয়াবৌদি, সিদ্ধার্থর মা এবং বাবা, বোন সুদেষ্ণা। শেষের তিনজন থাকে দোতলায়। টেলিফোন তেতলায়। সুতরাং জয়াই ধরবে।

মিনিটখানেক রিং হবার পরেও কেউ ধরছে না দেখে অধৈর্য বোধ করল বিশাখা। রেখে দিয়ে আবার রিং করল। এবারেও পরিষ্কার রিং হবার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে; মাঝরাতে ঘুমের মধ্যে শুনলে যেমন লাগে তেমনি, প্রতিটি মুহূর্তেই যেন নৈঃশব্দ্য গাঢ় হয়ে উঠছে আরও। রেসপন্‌স্ নেই কোনও। যতটা সময় গেল তার মধ্যে জয়া না থাকলেও দোতলা থেকে উঠে আসতে পারত কেউ। তা হলে কি কেউই নেই বাড়িতে?

কেমন যেন হেরে যাওয়া লাগছে নিজেকে। মনে হচ্ছে তার কপালে দক্ষিণীই নাচছে, শেষ পর্যন্ত ওখানেই যেতে হবে। আরও একবার চেষ্টা করবে ভেবেও থেমে থাকল বিশাখা। এবং শুনল ক্লাস শেষ হবার ঘণ্টা বাজছে। ভারী ও ধাতব, পিতল-কাঁসা মেশানো সেই শব্দ লেগে থাকল কানে।

ওইভাবেই চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মরিয়া হয়ে বিশাখা ভাবল, শেষ চেষ্টা করা যায় পার্থর অফিসে ফোন করে। বাড়িতে যাওয়া হোক না হোক, অন্তত ওরা কলকাতায় আছে কি নেই, থাকলেও কেমন আছে, সেটুকুও অন্তত জানা যাবে। সিদ্ধার্থ খবরই চেয়েছিল।

টেলিফোন ডাইরেক্টরি খুঁজে রাইটার্স বিল্ডিংয়ের নাম্বার বের করল বিশাখা। বার তিনেক রিং হতেই সাড়া দিল অপারেটর। নাম ও ডিপার্টমেন্ট বলতে ওদিকে যার গলা পেল তাকে পার্থ বলেই মনে হচ্ছে। ব্যস্তভাবে অর্পিতা বলল, 'একটু পার্থ রায়চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলতে

পারি?'

'হ্যাঁ। পার্থ রায়চৌধুরী বলছি—'

রিসিভারটা দ্রুত হাতবদল করে কানের ওপর সেঁটে আনল বিশাখা।

'পার্থদা, আমি বিশাখা বলছি—'

'বিশাখা!' অল্প থামল পার্থ। তারপরেই গলার স্বর পাল্টে বলল, 'ও, বিশাখা! অধ্যাপিকা বিশাখা বসু! ঠিক বলছি তো?'

পার্থর অন্তরঙ্গতাই সহজ করে দিল অনেকটা। শব্দ না ফুটিয়ে হাসল বিশাখা।

'কেমন আছেন আপনারা?'

'এমনি ভালই। তবে বাবা-মা নেই এখানে। সুদেষ্ণাও নেই। দিল্লিতে আমার জ্যাঠার ওখানে—বেশ কিছুদিন হল। তুমি কেমন আছ বলো? অনেকদিন খবর পাই না!'

কী বলবে না বলবে ভাবতে ভাবতেই অসাবধান হয়ে পড়ল বিশাখা।

'খবর নেন আপনারা!'

সামান্যক্ষণ চুপ করে থাকল পার্থ। তারপব বলল, 'নিইনি, এটাই সত্যি। নেওয়া উচিত ছিল। জয়া অন্তত নিতে পারত। আমার ব্যাপারটা তো জানোই—কীরকম ব্যস্ত থাকি!'

কানের মধ্যে যে-স্বর আসছে, ধরনে-বলনে তা সিদ্ধার্থরই। চেহারাতেও দুজনে প্রায় এক। ভাবতে ভাবতেই বাম বুকে স্পন্দন অনুভব করল বিশাখা। ফিউজ হয়ে যাওয়া বালবের তারের মতো কিছু একটা কাঁপছে সেখানে।

নিজেকে সামলে নিল সে।

'বৌদির সঙ্গে কথা বলার জন্যে ফোন করেছিলাম। আজ যাব ভাবছিলাম। কিন্তু রিং হয়ে যাচ্ছে শুধু—'

'ফোন তো খারাপ। সেইজন্যেই পাওনি।' পার্থ বলল, 'জয়া বাড়িতেই আছে। যাও না, ভালই তো। কখন যাবে? সন্ধে পর্যন্ত থাকলে আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে যেতে পারে। অবশ্য আমার ফেরাটা আনসার্টেন। মন্ত্রী ডাকবেন বলেছেন—'

এরপর নামিয়েই রাখতে হয়। এতগুলো কথার মধ্যে পার্থ একবারও সিদ্ধার্থর নাম উচ্চারণ করল না। সম্পর্কটা জানে বলে? সঙ্কোচে? সম্ভাব্য ভাসুরের দূরত্ব রাখতে? পার্থ তোলেনি বলে বিশাখাও তুলল না। শুধু বলল, 'তা হলে রাখছি—'

'আচ্ছা। তুমি যেও তা হলে—'

পার্থ রিসিভার নামিয়ে রেখেছে। শব্দটা ফিরে এল কানে। বিশাখা ভাবল, সে একাই শুধু ব্যস্ত নয়।

টিচার্স রুম ঘুরে বেরুতে বেরুতে অনেক হালকা লাগল নিজেকে। কোথাও যাবার জায়গা নেই থেকে জায়গা তৈরি হয়ে গেল একটা, সে-জায়গাও যে-সে নয়, সিদ্ধার্থর কাছেই যাচ্ছে। যেভাবে যেত আগে। একা নয়, সিদ্ধার্থই নিয়ে যেত। কিংবা সিদ্ধার্থ থাকত বলেই একা চলে যেতে পারত সে, স্বচ্ছন্দে। তিনতলার যে-ঘরে জয়া-পার্থরা থাকে এখন, তখন ওটাই ছিল সিদ্ধার্থর ঘর। বড় অগোছালো ছিল সিদ্ধার্থ। বিশাখা মনে করতে পারে না ঘরটা কোনও দিন গোছানো দেখেছে কি না। ওখানে তো একা থাকতে হয়। রেনোভেসনে মন দিলেও স্বভাবটা কি পাল্টেছে ওর?

কলেজের গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই দুরন্ত হাওয়া ছেঁকে ধরল চারদিক থেকে।

কিছু বা উত্তাপ মেশানো, কিন্তু গরম নয়, মনে হয় পড়ন্ত বেলার রোদের সংস্পর্শের জন্যেই এরকম। পুরীতে যেমন পেয়েছিল; এমনই উচ্ছল যে হঠাৎ ঝাপটায় ভেঙে দিতে পারে আলগা করে জড়ানো খোঁপা; শক্ত হাতে আঁচল চেপে ধরলেও কোন দিকে গুঁজবে ঠিক করা যায় না। অনেকটা সেইরকম, তবে তত জোরালো নয়। ছোট ছোট ধুলোর ঘূর্ণি উঠতে উঠতেও থেমে যাচ্ছে, সেইসঙ্গে কিছু কিছু শুকনো পাতাও; পরিত্যক্ত একটি সন্দেশের বাক্সর শব্দ ঘষটাতে ঘষটাতে চলে গেল ডাবলডেকারের চাকার তলায়, এবার চাকার সঙ্গেই লেপটে ফিরে যাচ্ছে তার পুরনো দিকে। বাসের সামনে দিয়ে বিপজ্জনক ভঙ্গিতে দৌড়ে রাস্তা পার হচ্ছে দুটি মেয়ে, তাদেরই কলেজের ছাত্রী, চেনে না ঠিক। যে পারেনি, সেই তৃতীয়জন হতাশ মুখে এদিক ওদিক তাকিয়ে, আরও একটু পিছিয়ে ফুটপাথে উঠে এল। কোনটা ঠিক কে বলবে!

ব্লাউজের হাতা ও কাঁধের আঁচল ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিয়ে বাসস্টপের দিকে এগোতে এগোতে বিশাখার মনে পড়ল, সিদ্ধার্থ চলে যাবার পর যে ক'বার গেছে ওদের এলগিন রোডের বাড়িতে, তার মধ্যে শুধু একবার ছাড়া কখনও সে তেতলার ঘরে যায়নি। সেবার জয়াই নিয়েই গিয়েছিল অদলবদল দেখাতে। এমন দেখায় বিষাদ থাকে। মুখে প্রশংসা করলেও, বিশাখা জয়ার রুচির পারদর্শিতা লক্ষ করেনি, শুধু অনুভব করেছিল অগোছালো এক সৌন্দর্য বাষ্প হয়ে উঠে আসছে গলায়। ওদের বসার ঘর বা ড্রইংরুম বলতে যা বোঝায় সেটাও দোতলায়। এর পর থেকে সে যত বার গেছে তা ওই দোতলা পর্যন্ত, বড়জোর সিদ্ধার্থর মা'র ঘর পর্যন্ত।

বাসস্টপে কয়েকজন। এর পরের ক্লাসটা শেষ হলে ভিড় বাড়বে। ইতস্তত যে পাঁচ ছজন দাঁড়িয়ে তাদের মধ্যে তমাল ব্যানার্জিকেও দেখল বিশাখা। একটা মিনিবাস এসে দাঁড়াল, স্কুল-ইউনিফর্ম পরা একটি বাচ্চার হাত ধরে নেমে এল এক বিবাহিতা যুবতী, স্টপে দাঁড়ানো একমাত্র মহিলা ও তার সঙ্গী, সম্ভবত স্বামী, উঠে যাবার পর গিয়ারের বিশ্রী শব্দ তুলে ছেড়ে দিল। অকারণ হর্ন বাজাতে বাজাতে বাসস্টপ ঘেঁষে চলে যাচ্ছে একটা খালি ট্যাক্সি। বিশাখা দেখল, তমালই চেনা।

তমাল হাসছে। বিশাখাকে আরও একটু এগিয়ে আসার সুযোগ দিয়ে বলল, 'দেরি কেন! আপনার ক্লাস তো আগের পিরিয়ডেই শেষ হয়ে গেছে!'

'কাজ ছিল একটু। সেরে এলাম।'

হাওয়ায় উড়তে চাওয়া আঁচলটা পাকিয়ে মুঠোর মধ্যে নিয়ে এল বিশাখা। তমালের চোখ তারই মুখে। চোখাচোখি হতে মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

'কোনদিকে যাবেন? সাউথে, মানে—সেই হস্টেলে?'

'সাউথেই। তবে ওখানে নয়। এলগিন রোডে।' চোখ তুলে, ঈষৎ মনে পড়া মিশিয়ে বিশাখা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো দমদমে থাকেন? এই ফুটপাথে কেন!'

'বাউণ্ডুলের আবার ফুটপাথ!' তমাল হেসে ফেলল। গাল ছড়িয়ে। কথা ও হাসি দুইয়ের মধ্যেই কেমন একটা তৈরি-থাকা ভঙ্গি। তারপর বলল, 'আমিও দক্ষিণে যাব। টি-ভি সেন্টারে। একটা ট্যাক্সি পেলে আপনাকে নামিয়ে যেতে পারতাম—'

বিশাখা বলল, 'বাসই তো ভাল। এখন ভিড় থাকবে না—'

তমাল একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। ঘড়ি দেখল এবং বলল, 'বাসে গেলে এসপ্ল্যানেডে

চেঞ্জ করতে হবে আবার।'

বিশাখা বুঝতে পারল তমাল ভেবেচিন্তেই বলছে। ট্যাক্সিতে যাবার পরিকল্পনা থাকলে বাসস্টপে এসে দাঁড়াত না, কিংবা অল্প আগে যে-ট্যাক্সিটা চলে গেল সেটাতেই উঠে পড়তে পারত। তার জন্যেই এইসব। এত বুদ্ধিমান, পড়াশুনোয় তুখোড়, কলেজে এত নামডাক, মোটামুটি সুদর্শনও, তবু, মিথ্যে জেনেও, তার প্রতি দুর্বলতাটুকু কাটাতে পারেনি আজও। নাকি কাটানো যায় না! এখন দেখা হয়ে যাওয়াটা কাকতালীয় হলেও, ট্যাক্সিতে যাবার আইডিয়াটা নিশ্চয়ই আলাদা করে তার সঙ্গ পাবার জন্যে। বেচারা! ওকে এভাবে বলাটা ঠিক হল না বোধহয়।

দূরে তাকিয়ে বাস আসছে কি না দেখে নিল বিশাখা। পুরনো চিন্তায় ফিরতে ফিরতে ভাবল, এখনও পুরোপুরি বিকেল হয়নি, একা বাড়িতে জয়া যদি ঘুমিয়ে পড়ে থাকে, তা হলে তার হঠাৎ আবির্ভাবে বিরক্ত হবে কি? ডোরবেলটা কোথায় বাজে, দোতলায়, না তেতলায়? একতলার ভাড়াটেদের খয়েরি রঙের অ্যালসেশিয়ান ছিল একটা, গেট খোলার শব্দ পেলেই জানলায় এসে গাঁক-গাঁক করত। সেটা কি এখনও আছে?

বাসের দেখা নেই। স্বাভাবিক হবার চেষ্টার পরিষ্কার চোখ তুলে তমালকে দেখল বিশাখা।

'টি-ভি সেন্টারে কেন?'

রুমালে মুখ মুছছিল তমাল। হাত নামিয়ে বলল, 'স্টুডেন্টদের ওপর একটা প্রোগ্রাম হবে। ডিসকাস করতে ডেকেছে—'

পরের কথাটা খুঁজে পাবার আগেই বিশাখা দেখল উল্টোদিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা ট্যাক্সি। গতি তেমন জোরালো নয়, প্যাসেঞ্জার না থাকলে যেমন যায়। মিটারও তোলা। তখনই সিদ্ধান্ত নিল এবং ট্যাক্সিটা সামনাসামনি আসতে চেঁচিয়ে ডাকল, 'ট্যাক্সি—ট্যাক্সি—'

প্রায় ফাঁকা রাস্তায় ব্রেক কষে 'ইউ' টার্ন নিয়ে ট্যাক্সিটা সামনে এসে দাঁড়াতে বিশাখা বলল, 'চলুন। আপনার কাজটা আমিই করে দিলাম।'

তমাল এগিয়ে গেল আগে। দরজা খুলে সরে দাঁড়িয়ে বলল, 'উঠুন—'

'আমি তো আগে নামব!'

'শিভালরির অভাব দেখেছেন কখনও!'

বিশাখা জবাব দিল না। এদিক ওদিক তাকিয়ে উঠে পড়ল সে, মাঝখানে জায়গা রেখে সরে গেল, যতটা সম্ভব কোণের দিকে। তমাল বুঝবে কোন ভঙ্গির কী মানে হয়। উঠেই, সোজা এলগিন রোডে যাবার নির্দেশ দিয়েছে। ভিতরের নৈঃশব্দ্য চাপা দিয়ে ট্যাক্সিটা এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কাচতোলা জানলা দিয়ে বিশাখা রাস্তা দেখছে বলে তমালকেও তাই করতে হবে। ট্যাক্সিতে ওঠার আগেও কি ও জানত এসব! তা সত্ত্বেও ইচ্ছেটা হল কেন!

ট্রাফিকে গাড়ি দাঁড়াতে আশপাশ দিয়ে মানুষ ও গাড়ির শব্দময় পারাপার দেখতে দেখতে জনশূন্য হয়ে গেল বিশাখা। বিকেলের সমুদ্রের সামনে একভাবে অনেকক্ষণ বসে থাকলে ঢেউ ভাঙার মধ্যেও এসে যায় এক ধরনের স্তব্ধতা। সেদিন পুরীতে, ছাত্র-ছাত্রীরা যখন দূরে, সৈকতের ঈষৎ আর্দ্র বালির ওপর পাশাপাশি বসার মধ্যে কাকতালীয় ঘটনা ছাড়া আর কী ছিল! ভাবতেও পারেনি একদা রাজনীতি-করা স্বভাব-সিরিয়াস তমাল হঠাৎই অমন আপ্লুত

হয়ে উঠবে!

'এই অনন্ত সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বসে থাকতে ভাল লাগে না?'

প্রশ্নই করেছিল তমাল; কিন্তু শেষের দিকে গলা কেঁপে যাওয়ায় বিশাখা বুঝতে পেরেছিল বলতে শুরু করার পর বলার ইচ্ছে থেকে পাশাপাশি শব্দটা বাদ দিয়েছে ও।

তমাল ডানদিকে। অবিরল হাওয়ার খল থেকে শাড়ি-শায়া বাঁচিয়ে, দুই হাঁটুর ওপর আড়াআড়ি রাখা বাঁ হাতের ওপর চিবুক পেতে ডান হাতে বালির ওপর দাগ কাটছিল বিশাখা। ঘাড় ফিরিয়ে, হেসে, বলেছিল, 'সমুদ্র অনন্ত, বসে থাকাটা নয়—'

বুদ্ধিমানরা এর বেশি হিন্ট চায় না। তমালও চায়নি। কিন্তু তার পরে এবং তারও পরে, পুরীতে যে দুদিন ছিল, তমালের মুখ ও জোর করে ফর্মাল হওয়ার চেষ্টা দেখে বিশাখার অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি, বেফসকা কথাগুলো বলে ফেলার জন্যে ও এখন আক্ষেপ করছে। পুরনো সেই জড়তা এখন অনেকটা কেটে গেলেও পুবোপুরি স্বচ্ছন্দ হয়নি। বুঝতে দেয় না, এই যা। কাকে বুঝতে দেয় না? ওই ঘটনার এবং কথাবার্তার কোনও সাক্ষী তো ছিল না!

ট্যাক্সিটা চলে এসেছে অনেক দূর। মুখ ফিরিয়ে বিশাখা বলল, 'আপনি কি প্রায়ই প্রোগ্রাম করেন না কি? টি-ভিতে?'

'প্রায়ই নয়। মাঝে মাঝে। যখন ডাকে আর কি।'

'এই প্রোগ্রামটা কবে হবে?'

'ঠিক জানি না। রেকর্ডিং হোক। ওখানে গেলে বুঝতে পারব।' তমাল এবার সোজাসুজি তাকাল, 'আপনি টি-ভি দ্যাখেন?'

'না। বললে দেখতে পারি। সুপারিনটেনডেন্টের ঘরে সেট আছে একটা—অসুবিধে হবে না।' বিশাখা সোজা হয়ে বসল, মাঝখানে রাখা ব্যাগটা কোলের ওপর টেনে নিয়ে বলল, 'আমাকে ওই ট্রাফিক পোস্টের কাছে নামিয়ে দিলেই হবে—'

'এটা তো ল্যান্সডাউন রোড! এলগিন রোড বলেছিলেন না?'

'সামনেই তো। রাস্তাটুকু পেরোতে হবে শুধু—'

'আমি কিন্তু পৌঁছে দিতে পারতাম!'

'বলেছি পারতেন না!' বিশাখা হাসি লুকাল না, 'পারবেন না বললে জোর করতাম। কোলিগ, বন্ধুদের ওপর সেটুকু জোর সব সময়েই খাটানো যায়—'

'যায় কি!'

'নিশ্চয়ই যায়।'

বিশাখা নিজেই ড্রাইভারকে থামবার নির্দেশ দিল। তমাল নেমে দাঁড়াতে নেমে এসে বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ বলতে হবে?'

'না, না। কী আশ্চর্য!'

ট্যাক্সিটা চলে যেতে ডানদিক বাঁদিক দেখে রাস্তা পেরুল বিশাখা। এলগিন রোডের ফুটপাথে এসে ভাবল, তমালের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠে ভালই করেছে। এরপর অন্তত ওর স্বচ্ছন্দ হয়ে ওঠা উচিত। টানের সামনে দাঁড়ানো অসহায় মুখ দেখতে কারই বা ভাল লাগে! কিন্তু, সে একজনই, একজনের দিকেই এগোতে পারে। না ডাকতেই এই যে তার জয়ার সঙ্গে দেখা করতে ছুটে আসা, এর মধ্যেও কি অসহায়তা নেই! তফাত এইটুকু, সে জানে,

তমাল জানে না। আগেও জানত না।

গেটের হুক ছাড়াতে শব্দ হল লোহায়। ভাড়াটেদের জানলায় চোখ রেখে কুকুরটাকে দেখতে পেল না বিশাখা, ডাকও নেই। পরিবর্তে এক বৃদ্ধার মুখ উঁকি দিল জানলায়, শরীরটা আড়ালে, চুল এমনই সাদা যে মনে হয় উইগ পরেছে। মিশমিশে কালো, কোঁচকানো মুখ। ওখান থেকেই বলল, 'বাড়িতে কেউ নেই, বাছা। সব সিনেমা গেছে। আমি এখন দরজা খুলতে পারব না—'

বুড়ি নিশ্চিত ভুল করেছে। জবাব না দিয়ে গাড়িবারান্দার দিকে এগিয়ে গিয়ে পাশাপাশি দুটি দরজার বাঁ দিকেরটা এড়িয়ে গিয়ে ডানদিকের ডোরবেল টিপল সে। রাস্তা থেকেই দেখেছিল তেতলার সামনের দিকের জানলাগুলি বন্ধ, দোতলার একদিকে খোলা। ওটা বসবার ঘর। ওইখান থেকেই প্রশ্ন এল, 'কে?'

জয়ার গলা। সরে এসে ওপরে তাকাল বিশাখা।

'ওমা! তুমি!'

জয়া সরে গেল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিঁড়িতে চপ্পলের শব্দ তুলে নেমে এল নীচে। দরজা খুলল।

'এসো এসো। ভাবতেই পারিনি তুমি!' দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি তুলতে তুলতে জয়া বলল, 'কলেজ থেকে?'

'হ্যাঁ। ঘুমোচ্ছিলে না তো!'

যত দূর মনে পড়ে আগের বার যা দেখেছিল তার চেয়ে একটু ভারী হয়েছে জয়া। পিঠের ওপর খোলা চুল ছড়ানো। চুল যেখানে নেমে থেমেছে, পরিবর্তনটা সেইখানেই চোখে পড়ে বেশি। উঠছেও যেন নিজেকে তুলতে তুলতে।

জয়া বলল, 'না গো, ঘুমুইনি। একটু পরেই ছেলে ফিরবে স্কুল থেকে। কাজের লোকটাও বেরিয়েছে।'

বসার ঘরেই নিয়ে গেল। রেগুলেটর ঘুরিয়ে জোর করে দিল পাখাটা। পার্থদার পাশে বেঁটে লাগলেও মুখের ডৌল, রং আর আশ্চর্য কালো দুটি চোখের দৃষ্টি মিলিয়ে বোঝা যায় এককালে সুন্দরী ছিল জয়া। বাড়তি মাংসের ভারটুকুই যা চোখে লাগছে।

'ফোন করেছিলাম। বেজেই গেল।' সোফার কোণে বসতে বসতে বিশাখা বলল, 'আছ কি নেই জানতে শেষ পর্যন্ত পার্থদাকে ফোন করলাম।'

'তাই!' একই সোফার অন্যদিকে বসে জয়া বলল, 'কোনও খবর আছে নাকি?'

'না। অনেক দিন দেখা হয় না। তাই ভাবলাম—'

'খুব ভাল করেছ। চা খাবে তো?'

'তোমাকে করতে হবে?'

'তাতে কি। নিজেও খেতাম।' ঘাড়ের পিছনে দু হাত বাড়িয়ে এলোচুল খোঁপা করে নিল জয়া। বলল, 'ঠিক সময়ে এসেছ। আমার খুড়তুতো বোনের একটা অপারেশন হয়েছে পরশু। পি-জিতে। একটু পরেই বেরিয়ে যেতাম। ভালই আছে অবশ্য—'

একটু পরে মানে কতক্ষণ পরে? ঠিক কখন তার উঠে পড়া উচিত? প্রশ্নগুলো আসতেই নিজেকে গোটাতে শুরু করল বিশাখা। সিদ্ধার্থকে চিঠি লেখার আগে খবর নেবে ভেবেছিল। যা জানার পার্থই জানিয়েছে। পার্থকে জয়ার সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিল

বলেই আসা। এল, দেখা হল, এগুলোও জানানো যাবে সিদ্ধার্থকে। এর পর জয়ার সঙ্গে আর কী দরকার থাকতে পারে!

না, আরও একটা কারণ ছিল। এখনই মনে পড়ল বিশাখার, সময় কাটানোর জন্যে একটা যাবার জায়গা খুঁজতে খুঁজতেই জয়াকে ফোন করার কথা মনে পড়ে তার।

'আমিও বেশিক্ষণ বসব না, বৌদি। এক কোলিগের বাড়ি এসেছিলাম, কাছেই। ভাবলাম দেখা করে যাই।' বিশাখা বলল, 'পাঁচটার মধ্যে আমাকেও ফিরতে হবে। এক ছাত্রী পড়তে আসবে—'

'একটু বোসো। চা-টা খেয়ে যাও অন্তত!'

'বেশ! চা খাব। দেখা তো হয়ে গেল!'

জয়া উঠে দাঁড়িয়েছিল। চা করতে যাবে। তার আগে বলল, 'সিদ্ধার্থর চিঠি পেয়েছ?'

বিশাখা হাসল।

'আমরাও পেয়েছি। কাল—,' জয়া বলল, 'বোসো। আসছি—'

জয়া ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল বিশাখা। নতুন কোনও ভাবনা মাথায় এল না। ব্যাগ খুলল এবং বন্ধ করল। চিবুকের নীচে, গলায় ঘাম জমেছে অল্প, শিরশির করছে বুকের খাঁজে। ঠিক কখন থেকে হাতের মুঠোয় রুমালটা ধরে আছে মনে নেই। আঁচল সরিয়ে বুকের মধ্যিখানে হাত ঘষে, রুমালে গলা মুছতে মুছতে টের পেল গোটা শরীরে ঢেউ ছড়িয়ে পর পর উঠে আসছে হাই। তখন হাতের উল্টোপিঠে ঠোঁট চাপা দিতে দিতে ভাবল, মাঝখানের তিন চারটে বছর কোনওরকমে এড়িয়ে যেতে পারলে এই সময়—যখন হাই উঠছে, হঠাৎই অসম্ভব ক্লান্ত লাগছে নিজেকে—নিজস্ব অধিকারবোধ থেকেই সে উঠে যেতে পারত তেতলায়। অধিকারবোধ থেকেই সিদ্ধার্থর ঘরটা তারও ঘর হত, নিশ্চয়ই সাজানো-গোছানো, পরিপাটি হয়ে থাকত আরও। সুতরাং স্বচ্ছন্দে গড়িয়ে পড়তে পারত বিছানায়। নিরাপত্তার চেয়ে নিশ্চিন্ত ঘুম আর কীসে আসে! কিন্তু, তখনও কি ক্লান্ত লাগত নিজেকে!

দু হাতে দু কাপ চা নিয়ে ফিরে এল জয়া। সামনের তেপায়ায় বিশাখার কাপটা নামিয়ে রেখে পুরনো জায়গায় গিয়ে বসল।

'কিছু খাবে?'

'না।' বিশাখা কাপটা তুলে নিল, 'নীচে একটা অ্যালসেশিয়ান ছিল না?'

'তোমার মনে আছে দেখছি!' হালকা ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে তাকাল জয়া, 'সেটা মরে গেছে, জানো! কী স্যাড! আমাদেরও কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল—'

দু চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল বিশাখা। মাথায় সাদাচুলের উইগ, কালো কোঁচকানো মুখ নিয়ে বুড়িটা উঠে এল জানলায়। না তাকিয়েও অনুমান করতে পারল বিশাখা, জয়ার দৃষ্টি তার মুখের ওপরেই নিবদ্ধ। খুঁটিয়ে দেখছে।

'তুমি কিছু ভাবলে?'

'কোন ব্যাপারে!'

'ব্যাপার তো একটাই।' জয়া বলল, 'বিয়ের ব্যাপারে?'

বিশাখা ভাবতে পারেনি জয়া এমন সরাসরি জিজ্ঞেস করবে। সময় নিয়ে বলল, 'ও না ফিরলে কী করে বলব! জুনে আসবে জানিয়েছিল। দেখি—'

কোলের ওপর ডান হাতের তালু পেতে বসে থাকল বিশাখা।

'এভাবে অপেক্ষা করতে ভাল লাগে! তোমার নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই?'

'থাকলেই বা কী! বেড়াতে তো যায়নি, কাজে গেছে। ওর দিকটাও ভাবতে হচ্ছে।'

বাইরের যেটুকু আলো তা জানলাগুলো পর্যন্ত এসেই থেমে গেছে যেন। লম্বা, বড়সড় ঘরের যে-জায়গাটায় ওরা বসে সেখানে আস্তে আস্তে ঘন হচ্ছে ছায়া। এখনই দরকার ছিল না, তবু উঠে গিয়ে আলো জ্বালল জয়া।

'কিছু মনে কোরো না। আমার মনে হয় রাশটা তুমি অনেক আগেই আলগা করে দিয়েছ।' জয়া একটু থামল। তারপর বলল, 'না হলে সিদ্ধার্থ ওখানেই সেটল করার কথা ভাববে কেন?'

কথাগুলো আশা করেনি বিশাখা। অবাক হয়ে বলল, ' তাই লিখেছে!'

'লেখেনি। ওর দাদার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছিল একদিন, ওকেই বলেছে। বিয়েটিয়ে করার কথা অবশ্য বলেনি কিছু।'

বিশাখা চুপ করেই থাকল। দৃষ্টি মেঝের দিকে নামানো।

জয়া বলল, ' তুমি এখানে পড়ে আছ কেন! একটা চিঠি লিখে সোজা উড়ে যাও। ওখানে ওর অ্যাপার্টমেন্ট আছে। হয় নিয়ে এসো, না হলে বিয়ে-থা করে নিজেও সেটল হয়ে যাও ওখানে। কোয়ালিফায়েড মেয়ে, এখানে আর কীসের পিছুটান তোমার! আমি বলছি তোমাকে—সামনাসামনি জোর না খাটালে পুরুষরা অনেক সময় পেয়ে বসে।'

বিশাখা রহস্য চিনছে। অসহায়তাও। কিছু লজ্জা, কিছু অস্বস্তি, কিছু বা অপমান মেশানো মুখ তুলে বলল, 'জবরদখলের ইচ্ছে থাকলে তো আগেই পারতাম, বৌদি! ও-ও আভাস দিয়েছিল। তখন ভাবলাম যে নিজেই জানে না কী করবে, কোথায় থাকবে, তার বার্ডেন হয়ে লাভ কী! ও তো ফিরেই আসবে। ততদিন অপেক্ষা করব।'

বলতেই বলতেই শরীর জুড়ে আবেগ টের পাচ্ছিল বিশাখা, নিঃশ্বাসের আলোড়নও। প্রায় সংযত গলায় কথাগুলো শেষ করলেও চোখের জ্বালা এড়াতে পারল না।

এই সময় ডোরবেলের শব্দ হতে উঠে দাঁড়াল জয়া।

'একটা প্র্যাকটিকাল কথা বললাম। এতে আপসেট হয়ে পড়ছ কেন!'

'না। আপসেট হইনি।' অজুহাত আগেই খাড়া করে রেখেছিল, সুতরাং নিজেও উঠে দাঁড়াল বিশাখা। চোখের কোণে আলতো আঙুল টেনে বলল, 'আমি যাই আজ—'

'যাবে?'

বিশাখার প্রতিক্রিয়া দেখে জয়াও সম্ভবত অস্বস্তি বোধ করছিল। বাধা দিল না।

বিশাখা আগে। ওর পিছনে পিছনে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জয়া বলল, 'চিঠিতে এসব কিচ্ছু লেখেনি। আমি যা বললাম তোমার দাদাও তাই বলছিলেন। ভবিষ্যতের ব্যাপারে তোমার একটা ডিসিশান নেওয়া উচিত।'

'ভবিষ্যৎ তো মানুষের সঙ্গে সঙ্গে যায়, বৌদি!' সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে, সামান্য হেসে বিশাখা বলল, 'ডিসিশন নেবার পর যা হবে সেটাও ভবিষ্যৎ।'

জয়া দরজা খুলল। ওর ছেলে, বাবলু। বলল, 'মাসিকে চেনো তো?'

বাবলু ঘাড় নাড়ল। হাত বাড়িয়ে ওর মাথার চুল ঘেঁটে দিয়ে বিশাখা বলল, 'তুমি অনেকটা লম্বা হয়ে গেছ!'

'বাবা-কাকার ধাত, বোঝাই যাচ্ছে।' দরজা ধরে দাঁড়িয়ে জয়া জিজ্ঞেস করল, 'তুমি আবার কবে আসবে? সামনের সপ্তাহে মা-বাবারা ফিরবেন। এসো না?'

বিশাখা দরজাটাই দেখছিল। পুরনো আমলের ভারী কাঠের তৈরি, অনেকটা উঁচু। দেখতে দেখতেই নিঃশ্বাস চাপল এবং ভাবল, ভবিষ্যৎ বলে একটা ব্যাপার আছে, এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে কী করে জানবে, শেষবারের মতো দরজা দিয়ে সে বেরিয়ে যাচ্ছে কি না!

বাবলু আগেই উঠে গেছে ওপরে। জয়ার পাশ দিয়ে হেঁটে দরজার বাইরে এসে বিশাখা বলল, 'দেখি। ছেলে ফিরেছে, তুমি ওপরে যাও।'

যেভাবে এসেছিল তার চেয়ে অনেক দ্রুত, আর কোনও দিকে না তাকিয়ে গেট পেরিয়ে রাস্তায় পা দিল বিশাখা।

এখন রোদ নেই, চাপা হলুদের ছোঁয়া লাগা সুন্দর এক ধরনের আলো সমানভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে চারদিকে। দেখেই মনে হয় আরও অনেকক্ষণ থাকবে। তেমনি হাওয়াও। লুকোচুরির খেলার ধরনে আসছে, যাচ্ছে, ক্ষণিক থমকে থাকার মধ্যে আড়াল হয়ে যাচ্ছে কখনও। ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে মুখ তুলে আকাশ দেখল বিশাখা। ফ্যাকাশে নীলের কোথাও অসমতা নেই। হঠাৎ চোখে পড়ল, স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি উঁচু দিয়ে নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। আকাশেরও দিক থাকে হয়তো, কিন্তু এতদূর দূরত্ব থেকে বোঝা যায় না ঠিক কোনদিকে। তখন চোখ নামিয়ে ভাবল, বাস, মিনিবাস কিছু একটা ধরবে, নাকি হেঁটেই যাবে?

ভাবতে ভাবতেই রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ফুটপাথে উঠল। পর পর আসছে দুটো মিনিবাস, ওরই পেছনে একটা ডাবলডেকারও দেখা যাচ্ছে। ঠিক করল যে-কোনও একটায় উঠে পড়বে।

ভাবতে ভাবতেই পৌঁছে যায় অভ্যাসে। ভাল লাগে না, খারাপও লাগে না। স্মৃতি জুড়ে চলাচল করে শূন্যতা, গাড়ি, মানুষ, শব্দ। একাও লাগে না।

বাস রাস্তা থেকে অভ্যস্ত পায়ে হেঁটে এসে দক্ষিণীতে ঢুকে পড়ল বিশাখা। অফিস খোলা আছে এখনও। থাকারই কথা অবশ্য, আজ সে অনেক তাড়াতাড়ি ফিরেছে। সাড়ে পাঁচটা বেজেছে কি বাজেনি। পেরিয়ে যাচ্ছিল, পিছন থেকে মিসেস দাশ ডাকলেন, 'বিশাখা? শোনো—'

বিশাখা দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, ব্যস্তভাবে অফিস ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছেন মহিলা।

'কিছু বলবেন?'

'ভিতরে এসো। বলছি—'

মিসেস দাশের মুখে চিন্তার ছায়া। সামান্য আতঙ্কগ্রস্ত যেন। বিশাখাকে ভিতরে এনে দরজার আধটানা পর্দাটা টেনে দিলেন পুরোপুরি। ইঙ্গিতে বসতে বলে চেয়ার এগিয়ে দিলেন ওর দিকে। নিজের জায়গায় না গিয়ে বিশাখার পাশের চেয়ারটা এমনভাবে আড়াআড়ি ঘুরে নিয়ে বসলেন যাতে দরজার দিকে চোখ রেখেও ওর সঙ্গে কথা বলা যায় স্বচ্ছন্দে।

তখনও ঘোর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি বিশাখা। গোটা ব্যাপারটাই অবাক করছিল তাকে।

'মনে হচ্ছে একটা বিপদ আসছে!' কোনও ভূমিকা না করে চাপা গলায় বললেন মিসেস

দাশ, 'কী করি বলো তো।'

'কী হয়েছে?'

'আজ দুপুরে আবার পুলিশ এসেছিল। সুলেখা তখুনি ফিরেছে, খাচ্ছে—থানায় নিয়ে গেল।'

'মিসেস ভদ্রকে!' অবিশ্বাসের গলায় বিশাখা বলল, 'উনি আবার কী করলেন!'

'জানি না। পুলিশের লোকেরা সেদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল ছন্দা দত্তের ঘরে আর কে থাকে। নাম, পেশা, সব জেনে নিয়েছিল। আজ হঠাৎ এল—ধরে নিয়ে গেল—'

সহসা শোনা বলেই এখনও দাগ কাটছে না তেমন। কিন্তু গুরুতর কিছু যে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই কোনও। বিশাখা গম্ভীর হল। চিন্তিতও।

'এখনও ছাড়েনি?'

'মিনিট পনেরো আগে ফিরেছে।' শঙ্কা থেকে হাঁফাচ্ছেন মিসেস দাশ। দম নিয়ে বললেন, 'চেহারা দেখে ভয় হল। পুলিশ নাকি যা তা প্রশ্ন করেছে ওকে, অপমানও করেছে। বলল আত্মহত্যা করবে। সেই যে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছে, কত ডাকলাম, খুলছে না।'

এতক্ষণ ধরে রাখা নিঃশ্বাসের চাপ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল বিশাখা। অস্পষ্ট চিন্তার মধ্যে ফিরে এল জয়ার কথাগুলো; সিদ্ধার্থও। নিজেকে প্রশ্ন করা এবং উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলো প্রশ্ন ঘোরাফেরা করছে মাথায়। পুলিশ কি এই বাড়িটাকেও ব্রথেল ভাবতে শুরু করেছে? না হলে মিসেস ভদ্রকে তুলে নিয়ে যাবে কেন? আর, এমন একটা সময়ে, যখন প্রায় সকলেই যে যার কাজে বাইরে, প্রতিবাদ করার বা বাধা দেবার মতো কেউই নেই! ওরা কি নজর রাখছে? কিছু জেরা করার থাকলে তো এখানেই করতে পারত, কমলাদির সামনে। এটা কি পুলিশের অধিকারের মধ্যে পড়ে? আইনসিদ্ধ? প্রশ্ন প্রশ্নেই থেকে গেল।

'ওই ছন্দা দত্তই যত নষ্টের গোড়া!' মিসেস দাশ বললেন, 'সেদিন ওর এগেনস্টে অ্যাকশন নিতে চেয়েছিলাম, তখন বের করে দিলে এসব কিছুই হত না। তোমরাই বাধা দিলে। কত কথা শোনালে আমাকে! এখন আমি কী করি!'

কথা শেষ করার আগেই ভেঙে পড়লেন মিসেস দাশ। বিশাখা দেখল, প্রায় সেই একই ভঙ্গি—একটিই চুড়ি-পরা রোগা ডান হাতটা টেবিলের ওপর ছড়ানো, সে যেদিকে তার উল্টো দিকে মুখ করে মাথাটা হাতের ওপর রেখে ফোঁপাচ্ছে কমলাদি। চশমার ডাঁটিটা উঠে গেছে কান থেকে ওপরে। সাদা ব্লাউজের আড়ালে মাংসহীন পিঠের কুঁজদুটো কেঁপে উঠছে মাঝে মাঝে। বাইশ-তেইশের যুবতী আর বয়স্কা বিধবার আচরণে তফাত থাকবেই, কারণও আলাদা। তবে দুটোই কান্না।

'সেদিন কী হয়েছিল না হয়েছিল তা ভেবে হাত কামড়ে লাভ কী, কমলাদি।' বিশাখা বলল, 'আপনি বড্ড নার্ভাস। আপনার উচিত ছিল পুলিশকে বাধা দেওয়া, পাল্টা ডায়েরি করানো। কমিটির ওই ভদ্রলোক—ওকেও জানাতে পারতেন। পুলিশ এল, ধরে নিয়ে গেল, ব্যস!'

'কী বলছ তুমি, বিশাখা!' নিজেকে তুলতে তুলতে মিসেস দাশ বললেন, 'এতগুলো মেয়ের দায়িত্ব নিয়ে থাকতে হয় এখানে—পুলিশকে খ্যাপাব!'

'তাহলে আর হা-হুতাশ করে লাভ কী। আজ মিসেস ভদ্রকে নিয়ে গেল, কাল আর

কাউকে নিয়ে যাবে।'

বিশাখা উঠে দাঁড়িয়েছিল। দেখাদেখি, কিছুটা বিব্রত ভঙ্গিতে, মিসেস দাশও উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। ঘরের পর্দা সরিয়ে বিশাখা বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে বললেন, 'একটু দ্যাখো না। যদি বোঝাতে পারো সুলেখাকে।'

জবাব না দিয়ে হেঁটে এল বিশাখা। সুলেখার খোঁজ নেওয়ার কথাটা আগেই ভেবেছে ও, বিশেষত 'আত্মহত্যা করবে' কথাগুলো শোনার পরেই, যদিও জানে আত্মহত্যা করব বললেই করে না কেউ। সম্ভবত অপমানবোধ ও জ্বালা থেকেই সুলেখা হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে। একটা মানুষের সঙ্গে যতটুকু অন্তরঙ্গতা না হলে তাকে চেনা যায় না, বোঝা যায় না, সেটুকু অন্তরঙ্গতা তার কোনও দিনই হয়নি ওর সঙ্গে। সামনে সুলেখাদি, আড়ালে মিসেস ভদ্র, এরকমই চলে আসছে এতদিন, সুলেখা কেমন ও জানে না। মাঝেমধ্যে, শুনেছে, মহিলাকে নিয়ে হাসিঠাট্টাও হয়েছে কখনও সখনও। ও যে মেলামেশা করতে চায় না কারও সঙ্গে, বরং যতদূর সম্ভব এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে, ওসবও দৃষ্টি এড়ায়নি। কিন্তু, এখন ভাবতে গিয়ে মনে করতে পারল বিশাখা, এতদিনের মধ্যে কখনও বেচাল হতে দেখেনি ওকে; ওই হাসি-মস্করাটুকু বাদ দিলে কোনও অনুযোগ শোনেনি কারও মুখে। একা মানুষ সব সময়েই কৌতূহলের বিষয় হয়ে ওঠে। টার্গেটও। সেরকম গোলমেলে হলে অনেক আগেই টের পাওয়া যেত। ছন্দাকে চিনতে কত দিন লেগেছিল। পাঁচ-ছ' মাস? কমলাদির কথা ঠিক হলে ছন্দার রুমমেট ছিল বলেই বোধহয় এমন হেনস্থা সহ্য করতে হল ওকে।

সুলেখার দরজায় টোকা দিতে দিতে দেখল পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন মিসেস দাশ। দরজা খুলছে না। ঘুমিয়ে পড়েনি তো? চিন্তাটা মাথায় আসবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশাখার খেয়াল হল, সুলেখা পেশায় নার্স, সারাক্ষণ ওষুধপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে; এমনও তো হতে পারে ঘুমের বড়িটড়ি কাছেই রাখে। আত্মহত্যার সম্ভাবনা সত্যিই উড়িয়ে দেওয়া যায় কি।

প্রায় ভয় পেয়ে এবার মুঠো শক্ত করে জোরে দরজায় আঘাত করতে লাগল বিশখা।

'মিসেস ভদ্র! ও সুলেখাদি! সুলেখাদি! দরজা খুলছেন না কেন। খুলুন। প্লিজ। সুলেখাদি, আমি বিশাখা—'

শব্দ ও গলার স্বরে জোর ফুটেছিল। মুখে অস্বস্তি।। খুব নার্ভাস লাগলে যেমন হয়। বিশাখা দেখল, রান্নাঘরের দিক থেকে শঙ্করী ও তারা এসে জুটেছে, অনতিদূরে ডাইনিং রুমের সামনে দাঁড়িয়ে হতবাক তাকিয়ে আছে মহেশ। এইমাত্র স্কুল থেকে ফিরছে সুবর্ণা, সেও দাঁড়িয়ে পড়ল। এরপর একে একে অন্যরাও ফিরবে, দেখবে। বিপদের কথাটা কি জেনেশুনেই বলেছিল কমলাদি। কী করা যায় ভেবে পাচ্ছিল না বিশাখা।

তখনই ঘরের দরজায় ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। দরজার একটা কপাট আড়াল করে অন্য কপাটের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বিরক্তি ও ঝাঁঝ মেশানো গলায় সুলেখা বলল, 'কী চাই। কেন ডিসটার্ব করছেন আমাকে।'

স্বস্তি হলেও সুলেখার চোখের দিকে তাকিয়ে থমকে গেল বিশাখা। ওই চোখে রাগ নেই। বরং ঈষৎ লালচে, চোখের জলে মাখামাখি হয়ে আছে চৌকো ধাঁচের অতি সাধারণ, শ্যামবর্ণ মুখখানি।

মিসেস দাশ ও অন্যদের ওখান থেকে চলে যেতে বলে হাত বাড়িয়ে দরজার খোলা পাটটা আরও একটু খুলে ধরল বিশাখা। তারপর সুলেখার হাতের আড়াল সরিয়ে দ্রুত

ভিতরে ঢুকে নিজেই বন্ধ করে দিল দরজাটা।

এরই মধ্যে সন্ধের ছায়া ছড়িয়েছে ঘরে। বিছানা এলোমেলো, দেখে বোঝা যায় সুলেখা শুয়েই ছিল এতক্ষণ। ওদিকের খাটটা ন্যাড়া। ছন্দা যাবার পর নতুন কেউ আসেনি। খাটের তলায় একটা ট্রাঙ্ক এবং কিছু খুচরো জিনিসপত্র চোখে পড়ল, একজোড়া লাল চপ্পলও। সম্ভবত ছন্দারই। পিছনের আলনায় একটা হলুদ তাঁতের শাড়ি; কালো ব্লাউজ, কালো রঙের ব্রেসিয়ার—এইসব। তখন মনে পড়ল, আমির আলি অ্যাভিনিউয়ের কোনও ফ্ল্যাট থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল ছন্দাকে, এখানে ফেরার সুযোগ পায়নি। কখনও ফিরবে কি?

স্যুইচ টিপে আলো জ্বালল বিশাখা। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা সুলেখার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কমলাদি আমাকে বলেছেন সব। এটা অন্যায়, অত্যন্ত অন্যায়—'

সুলেখা কথা বলল না। বিশাখাকেই দেখছে। শূন্য সেই দৃষ্টি, চোখের মধ্যে ধরে রাখা জলের স্তব্ধতা এইবার গড়িয়ে পড়ল গালের ওপর, আস্তে নামতে লাগল নীচে।

বাঁ হাতটা সুলেখার পিঠের ওপর রেখে ওকে বিছানার দিকে নিয়ে এল বিশাখা। বসাল। তারপর বলল, 'আমরা আছি। এত ভেঙে পড়ার কী আছে। কী হয়েছে বলুন তো?'

সুলেখা কী ভাবল কে জানে, হঠাৎ কপাল চাপড়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ে বলল, 'ওরা অপমান করেছে—খুব অপমান করেছে। বলল, এমন নার্স অনেক দেখেছে—আসলে আমি বেশ্যা। অন্য মেয়েদের ধরে নষ্ট করছি—লাইনে নামাচ্ছি। হা ভগবান!'

হিস্টিরিয়া রোগীর তীব্রতায় সুলেখা হঠাৎ বিশাখার হাতের কব্জি চেপে ধরল। কথা থেমে গেছে। বিছানায় মুখ গুঁজে এখন ও হাঁফাচ্ছে। শরীরটা দুলে উঠছে মাঝে মাঝে।

নিজের হাতটা সরিয়ে নিল না বিশাখা। তার স্বভাবে রাগ নেই; তবু, এই মুহূর্তে অনুভব করল, রাগের মতোই কিছু ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। তপ্ত হয়ে উঠেছে কানের লতি, শুকিয়ে উঠেছে গলা। নিজেকে কোনওরকমে সংযত করে জিজ্ঞেস করল, 'গায়ে হাত দেয়নি তো?'

সুলেখা মাথা নাড়ল, যার অর্থ 'না'। দু'-এক মুহূর্ত পরে আবার উঠে বসতে বসতে বলল, 'বিশ্বাস করো, ছন্দাকে আমি বকেছিলাম। এটুখানি মেয়ে কেন এত রাত পর্যন্ত বাইরে থাকে! উল্টে আমাকে চোপা করল। বলল, নিজের চরকায় তেল দাও। ছি, ছি!'

'বুঝতে পারছি, ওর রুমমেট বলেই ওরা আপনাকে এমন করেছে। আমার রুমমেট হলে আমাকেও হ্যারাস করত।'

'তা বলে এইভাবে!'

সুলেখা নিজেকে সামলে নিয়েছে অনেকটা। গায়ের কাপড় গোছাতে গোছাতে বলল, 'কী কপাল। পঁয়তাল্লিশ হয়ে গেল। আঠারোয় বিধবা হয়েছি, তারপর কাজ শিখে নার্স হলাম। এই সাত্তাশ আঠ্‌ঠাস বছরে কত প্রেলোভন। কোনও পুরুষকে ঘেঁষতে দিই নাই কাছে। আমার তো জীবন নাই। আছে কি? শরীরটা আছে । সেটা খেতে চায়। এই কাজ না করলে খাব কী। আমি তো লেখাপড়া শিখি নাই!'

হাসি-ঠাট্টা, কানাঘুষোর মধ্যে বসে বিশাখা এখন থ। যে-জীবন নেই, যে-জীবন শুধুই ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্যে, তাকিয়ে আছে সেই জীবনের দিকেই। কী বলবে সে।

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধ বসে থেকে বিশাখা বলল, 'আমার মনে হয় ব্যাপারটা আপনার মেনে নেওয়া উচিত নয়। থানায় চলুন, একটা কমপ্লেন্ট অন্তত লেখানো উচিত। লোকাল এম-এল-একেও জানাব—'

'না, ভাই। ওসব কোরো না।' সুলেখা আবার হাত চেপে ধরল বিশাখার। বলল, 'আমার বড্ড ভয় করছে! ওরা সব পারে। দেখছ না, ওই মেয়েটাকে কোথায় খালাস করে দিল।'

বিশাখা চুপ করেই থাকল। জোরে ব্রেক কষতে কষতে থেমে গেল একটা গাড়ি। কানে এল মিটার নামানোর টুং-টাং শব্দ। তার মানে ট্যাক্সি। চপ্পলের শব্দ ঘষটে কেউ হেঁটে যাচ্ছে বারান্দা দিয়ে। অর্পিতা কী? অন্য কেউও হতে পারে। অনুমান করে লাভ নেই; সব অনুমানই তো উল্টেপাল্টে যাচ্ছে! ভয়ঙ্কর অপমানের জ্বালায় আত্মহত্যা করতে চেয়েছিল সুলেখা, বাঁচার ইচ্ছেই এখন ওকে টানছে অপমান ভুলে ভয়ের দিকে। কে ভেবেছিল?

তার ও সুলেখার মাঝখান দিয়ে ওড়াওড়ি করছে একটা মশা। মিহি সুতোর মতো একটা শব্দ জাল বুনছে কানের পাশে। সেই শব্দটাকেই আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে শুনল বিশাখা। এ সময়ের নিঃশ্বাস জোরেই পড়ে।

বাইরে শঙ্করীর গলা, 'দিদি, আপনাদের চা—'

বিশাখা উঠল। দরজার দিকে এগোতে এগোতে লক্ষ করল, আঁচল বুলিয়ে মুখ মুছছে সুলেখা। তখন ভাবল, সিদ্ধার্থ যদি না-ই ফেরে, যদি সত্যি-সত্যিই সেটল করে যায় ওখানে, তা হলে কি সত্যিই জোর খাটানোর জন্য উড়ে যাবে সে? যদি না যায়, যদি সিদ্ধার্থ নিজেই এগিয়ে না আসে, জীবন কি তা হলে একেবারেই ব্যর্থ হয়ে যাবে?

চায়ের কাপ হাতে নিয়ে সুলেখার দিকে এগিয়ে দিল বিশাখা। নিজেও নিল। এবং চুমুক দিতে দিতে ঠিক করল, যে-আশঙ্কা থেকে চিন্তিত হয়ে ধাক্কা দিয়েছিল সুলেখার দরজায়, এখন আর তা নেই। আদৌ ছিল না হয়তো। ক্লান্ত লাগছে, চা-টা শেষ করেই সে উঠে যেতে পারে।

সুলেখা এখন স্বাভাবিক। ভেজানো দরজার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে চোখ রাখল বিশাখার মুখে।

' চানাচুর খাবে? আছে আমার কাছে—'

'না। 'চা'ই ভাল।'

সুলেখার বিপর্যস্ত মুখে হাসি ফুটল এতক্ষণে। বলল, 'তোমার প্রাণে খুব দয়া। যেভাবে ডাকছিলে, আমি ভাবলাম, কে!'

হাসি দিয়েই ওর সরল কথাগুলি এড়িয়ে গেল বিশাখা।

চা শেষ করে কাপটা খাটের নীচে নামিয়ে রাখল সুলেখা। স্বগতোক্তির ধরনে বলল, 'আজ পুলিশের লোক যখন আমাকে অকথ্যি-কুকথ্যি বলছিল, কেমন যেন পাথর হয়ে গেলাম। জানো! এইরকমই হয়েছিল একবার—সেই আমার ফুলশয্যির পরের দিন, যেদিন আমার বরটা মরে গেল। দ্বারভাঙ্গা জিলায় ওই যে কুশী নদী—ওই নদীতে জল মাপার ছোট ওভারসিয়ারবাবু ছিল লোকটা। কী বিষ্টি, কী বন্যা সেবার! কপাল! ফুলশয্যির পরের দিনই দুপুরে ডেকে নিয়ে গেল। আমাকে বলল, স্টিমারে যাবে আর আসবে। কোথায় কী! জল মাপতে নাকি অনেকটা ঝুঁকেছিল। ব্যস, ঝপাং! শুনে আমি পাথর। পরে ভাবলাম, আমিও ঝাঁপ দেব। কই! ভয় গো ভয়! ওই লোকটাও যদি ভয় পেত সেদিন, যদি না যেত—'

যেমন হঠাৎ শুরু করেছিল, তেমনি হঠাৎই চুপ করে গেল সুলেখা। খাটে পা ঝুলিয়ে বসে আত্মমগ্ন, সম্ভবত এখন দক্ষিণীতে নেই, কুশীর বন্যায় হারিয়ে যাওয়া মানুষটিকেই খুঁজছে।

বিশাখা উঠে দাঁড়াল। বলল, 'আপনি রেস্ট নিন। আমি চলি—'

৪

জুনের শেষদিকে একদিন রাতে ভেঙে পড়ল আকাশ। তুমুল বৃষ্টি, সঙ্গে ঘন ঘন মেঘের ডাক। দরজা জানলা বন্ধ থাকলেও বুঝতে অসুবিধে হয় না বিদ্যুতে ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে দশ দিক। বৃষ্টির ঝাপটায় জানলার নীচের অদৃশ্য ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল ঘরের মেঝে। পুরনো তোয়ালে গুঁজে কোনওরকমে অবস্থাটা সামাল দিল বিশাখা। শুতে যাবার আগে পাখার হাওয়ার জোর কমাতে রেগুলেটর কন্ট্রোল করতে করতে বলল, 'একেই বলে আষাঢ়ে বৃষ্টি! দ্যাখো কতক্ষণ চলে।'

বিশাখার ভাবনায় প্রায় সময়েই দৃষ্টিভঙ্গি থাকে; অর্পিতা এভাবে ভাবে না। ভাবতেও পারে না। তবু কী ছিল ওই কতক্ষণ শব্দটির মধ্যে! অন্ধকার ঘরে বিছানায় শুয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে অর্পিতার মনে হচ্ছিল ওই শব্দের মধ্যে বিশাখা যেন রেখে দিয়ে গেল অনন্ত এক সময়ের ধারাবাহিকতা, যেখানে সম্মিলিতের মধ্যে থেকেও একা হয়ে যাচ্ছে সে, যেখানে প্রত্যক্ষ বলে কিছু নেই; যেখানে অন্ধকারের মধ্যেই অ্যাকোরিয়ামে বন্দি ছোট্ট মাছের মতো মুখ নাড়ছে অদৃশ্য কোনও স্পন্দন। অনুভূতি প্রখর করেও ধরা যায় না তাকে। তবু সে আছে, ঘুমের মধ্যেও ছড়িয়ে যাচ্ছে অস্পৃষ্ট স্বপ্নের অস্বস্তি।

কখনও জোরে, কখনও বা অল্প রাশ টেনে, বৃষ্টি থামল শেষ রাতে। সকালে আলোর আভাস দেখা দিলেও আকাশ জুড়ে ঘোরাফেরা করতে লাগল উল্টোপাল্টা মেঘ। হাওয়া তত জোরালো না হলেও আর্দ্রতা মেশানো, স্যাঁতসেতে। বারান্দা ঘুরে এসে বিশাখা বলল, 'বৃষ্টিটা ধরেছে মনে হচ্ছে। এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়তে পারলে হয়। প্রিন্সিপাল আজ স্পেশাল মিটিং ডেকেছেন সকালে, না গেলেই নয়।'

চা-টা শেষ করলেও গড়িমসি ভাব নিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে বিছানায় বসে, 'ফেমিনা'র পাতা ওল্টাচ্ছিল অর্পিতা। বিশেষ একটি ফিচারে চোখ বুলিয়ে মিলিয়ে নিচ্ছিল নিজের অনুভূতিগুলোকে। মুখ না তুলেই বলল, 'যেতে হলে তৈরি হয়ে নাও। এরপর কেউ বাথরুমে ঢুকলে—'

অর্পিতা বুঝতে পারছিল বারান্দার দরজায় দাঁড়িয়ে তাকেই লক্ষ করছে বিশাখা। ওখান থেকেই বলল, 'তোমার শরীর কেমন? আজ যাবে?'

'দেখি—'

চোখ তুলে তাকিয়ে সামান্য হাসল অর্পিতা।

বিশাখা বলল, 'কী হয়েছে তোমার বলো তো! কাল অফিসে গেলে না। আজও দেখছি মুড অফ।'

'কী আর হবে। কিছু না।'

বিশাখা একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'যদি সেরকম কিছু হয় ডাক্তার দেখিয়ে নিলে পারো। কাল রাতেও ভাল ঘুমোওনি দেখেছি।'

'তুমি জেগেছিলে?'

'জেগে কি আর ছিলাম। মাঝে একবার ঘুম ভেঙেছিল, তখনই মনে হল।' ঘরের ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে ভিতরের দিকের বারান্দার পর্দা সরিয়ে কিছু দেখল বিশাখা। বলল, 'আজ কাগজ দিতে দেরি করছে—'

অর্পিতা অনুমান করল, মমতাদির ছেলের খবরটা দেখবার জন্যেই ছটফট করছে বিশাখা। না হলে সাধারণত ব্যস্ত হয় না। বলল, 'ভোর পর্যন্ত এমন বৃষ্টি। কাগজ হয়তো দেরিতেই দেবে আজ।'

'তাই মনে হচ্ছে।' বিশাখা নিজের টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে বলল, 'কাল যখন বৃষ্টি হচ্ছিল, কেমন ভয়-ভয় করছিল। আমার মায়ের একটা অদ্ভুত অভ্যেস ছিল, এইরকম ঝড়ঝাপটে কপালে হাত ঠেকিয়ে কী যেন বিড়বিড় করত, যাতে দুর্যোগ কেটে যায়। হঠাৎ মনে হল, আমাদের এই বাড়িতে এই দুর্যোগের মধ্যেও একটি মানুষ আজ নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।'

'মমতাদি?'

'হ্যাঁ। কত বছর পরে জানি না। মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ যদি একটা হাজার বছরের পুরনো মূর্তি পাওয়া যায়—গায়ের ওপর চেপে বসা ধুলো মাটি ধুয়ে দেখা যায় আসলে একটা নতুন ইতিহাসই খুঁজে পাওয়া গেল, তেমনি, মমতাদির ব্যাপারটা যেন সেইরকমই হল।' বিশাখা থামল একটু, যেন এইমাত্র বলা কথাগুলো কতটা ঠিক তা ভেবে নিচ্ছে। পরে বলল, 'আমি জানতাম না ওর ছেলে এত বড়। কথা তো বলতেন না। এক আধদিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছেন, লেখাপড়া শেখাটাই আসল কথা, তাই না। কী বলতেন, কেন বলতেন, বুঝতাম না। কাল যেন মাটির তলা থেকেই বেরিয়ে এল গোটা একটা ইতিহাস।'

'ইতিহাসই তো।' আলস্যে হাই তুলল অর্পিতা। সময় নিল। অন্যমনস্কতা মেশানো গলায় বলল, 'রামায়ণও বলতে পারো। এই বাড়িটা। কত কী যে হচ্ছে। শুক্লার ঘরে যে নতুন মেয়েটা এসেছে—পমপম দাশগুপ্ত, কাল তাকে দেখলাম জিনস আর সার্ট পরে বেরুচ্ছে। এটাও নতুন এখানে—'

বিশাখা বাথরুমে যাবার জন্যে তৈরি। পেটিকোট, ব্রা, ব্লাউজ তুলতে তুলতে বলল, 'শুক্লার চলে যাওয়া কি পাকা?'

'বলেছে যখন, নিশ্চয়ই তাই। বড় হোটেলে চাকরি পেয়েছে, ওর রিসোর্সও ভাল। আলাদা ফ্ল্যাট পেতে পারে।'

'আমরাই শুধু পড়ে থাকলাম।'

বিশাখা বেরিয়ে গেল। অর্পিতা জানে, এরপর ও যা যা করবে সবই যান্ত্রিক নিয়মে। ঘড়ি ধরে। কলেজে মিটিং না কী আছে বলল। বেরিয়েও যাবে।

ম্যাগাজিনের আধপড়া পাতার ওপর আবার ঝুঁকে পড়ল অর্পিতা। কিন্তু মনোনিবেশ করতে পারল না। দরজার পর্দার মাঝখান দিয়ে যেটুকু দেখা যায়, দেখল, আড়াল হয়ে থাকা সূর্যের চাপা যেটুকু আলো এতক্ষণ ছড়িয়ে ছিল বাইরে, তাও যেন মুছে যাচ্ছে ক্রমশ।

অসংখ্যবার টাইপের ধকল সহ্য করা ক্ষয়া কার্বন পেপারের মতো একটা রং ফুটে আছে সেখানে। বিশাখার দিকের জানলা দিয়ে তাকালে দেখা যায় আরও দূর পর্যন্ত। বাড়ি, ছাদ, টি-ভির অ্যান্টেনা। আরও দূরে ভিজে হাওয়ার সংস্পর্শে অল্প অল্প দুলে যাচ্ছে একটা বড় গাছ। সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজে এখন নিশ্চয়ই অনেক পেলব হয়েছে পাতাগুলো। এত দূর থেকে রংটা সবুজ না কালো বোঝা যায় না ঠিক। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে পড়ল অর্পিতার, ওই ছাদে এসে দাঁড়িয়ে থাকত একটা লোক, জানলা খোলা থাকলে এবং তাদের দেখলে অঙ্গভঙ্গি করত প্রায়ই; বহু দিন হল আর দেখা যায় না তাকে। কোথায় গেল লোকটা! সেও কি ইতিহাসের মতো কিছু একটা হয়ে গেল নাকি! ঠিকই বলেছিল বিশাখা, অর্পিতা ভাবল, আমরাই শুধু পড়ে থাকলাম!

পর মুহূর্তেই অবশ্য মন পাল্টাল সে। অন্যের ভাবনায় ভেসে যাওয়ার মধ্যেও একরকম যাওয়া থাকে। তার কতদূর সত্যি! বিশাখার সঙ্গে যে জড়িয়ে আছে সে একজন অর্পিতা, বাস্তব জানে আরও একজন অর্পিতা জন্ম নিয়েছে ইতিমধ্যে, যে এখান থেকে চলে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে ক্রমশ। সময়টা জানে না, তবে যাবেই। ঘটনা এইভাবেই ঘটে? হয়তো। ঘটে যাবার পর তার গা থেকে ধুলো মাটি ধুয়ে চমকে উঠতে হয় আবিষ্কারে।

ভাবনাটা চমক এনে দিল শরীরে। প্রায় ঘোরের মধ্যে শক্ত দাঁতে নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে এবং চোখ বন্ধ করে একটি রোমশ বুক ও দুটি চওড়া কাঁধের ঘ্রাণ নিতে নিতে অর্পিতা নিজেকে ঠিক সেইভাবেই উন্মোচিত করল যাতে বিদ্যুতের আকাশ চিরে ছুটে যাওয়ার মতোই যন্ত্রণা ও রোমাঞ্চে ফালা ফালা হতে পারে শরীর—স্তনের কাঠিন্য থেকে ঢল নেমে যায় পায়ের পাতা পর্যন্ত, কোমর ও উরুদ্বয়ের ক্রমশ শান্ত হয়ে আসা চিৎকারে ভিজে যায় চোখের পাতা। অনুভূতি বলে দেয় এরই নাম পূর্ণতা। এর মধ্যে বৈধ নেই, অবৈধও নেই। এই অনুভূতির জন্ম তার নিজেরই আকাঙ্ক্ষায়; অদ্ভুত এক নিরাপত্তার বোধে ঘুমের আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ে স্নায়ুর শেষ পর্যন্ত।

ক্রমশ নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিল অর্পিতা। আকাঙ্ক্ষায় ভুল নেই কোনও, তবু কিছুদিন থেকে নিজেকে এত একা লাগছে কেন! মাঝে মাঝে কেন মনে হচ্ছে এমনকী অনুপের সান্নিধ্যেও এসে গেছে এক ধরনের যান্ত্রিকতা, আশ্বাস সত্ত্বেও ফিরে পেতে ইচ্ছে করছে নিজের সেই অচেনা অস্তিত্বকে, যার রূপ কোনও দিনই প্রত্যক্ষ করতে পারেনি সে!

বিশাখা চলে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। তখন বৃষ্টি ছিল না। আবার নেমেছে। ঠিক ঝিরঝিরে নয়, দু'চার মিনিট বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেই ভিজে যেতে পারে। তবু এই বৃষ্টিতে শব্দ নেই কোনও। আকাশের ঘোর দেখে মনে হয় আজ এইরকমই চলবে।

এমন বিচ্ছিরি আবহাওয়ার দিকে তাকিয়ে সারাক্ষণ বসে থাকতে হবে না কি? শরীর খারাপের জন্যে কাল সে অফিসে যায়নি। অনুপ আজকাল ঘন ঘন ট্যুরে যাচ্ছে, কেন কে জানে! এখনও বাইরে। এই অবস্থায় এক দুদিন ছুটি নিতেই পারে। এখন ঠিক করল, অনেকটা দেরি হয়ে গেছে, তবু যাবে।

জোর করেই শরীরে প্রতিক্রিয়া আনল অর্পিতা। উঠে দাঁড়াল। যতটা সম্ভব দ্রুত নিজেকে তৈরি করে নিয়ে রাস্তায় নামল। হাতে জাপানি ছাতা ধরা, তবু হাওয়ার দমকায় বৃষ্টির ছাট লাগছে গায়ে। ফুটপাথ ধরে হাঁটলেও প্যাচপেচে কাদা থেকে শাড়ির পাড় বাঁচানো যায় না। এদিক ওদিক গাড়ির ছোটাছুটিতে রাস্তার খোঁদলে জমে থাকা জল ছিটকে আসতে চাইছে

গায়ে। অফিসের সময় যেমন হয় এখন তা নয়, রাস্তায় লোকজন কম। দোকানের গায়ে কিংবা বাড়ির ঝুলবারান্দার নীচে আশ্রয় নিয়েছে কেউ কেউ। ওরই মধ্যে একটি শিশুকে আড়াআড়ি বুকে জড়িয়ে রোগা চেহারার মাঝবয়েসি একটি মেয়েকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ছুটে যেতে দেখল উল্টোদিকে। কাদায় লুটোচ্ছে নোংরা শাড়ির আঁচল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কোনও। সম্ভবত পাশের বস্তি থেকেই ছুটে এল। শিশুটি কি অসুস্থ? ইতিমধ্যেই মৃত? কোথায় যাচ্ছে! যেতে যেতেই একবার পিছনে তাকিয়ে ফুটপাথ বদল করল অর্পিতা। ঘরে থাকতে বোঝা যায়নি এতটা, এখন দেখল বৃষ্টিটা জোরেই পড়ছে। আরও একটু এগিয়ে মোড় থেকে অল্প দূরে দাঁড়িয়ে একটা ট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বৃষ্টির নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ক্রমশ আরও এক শব্দের অনুরণন শুনতে পেল সে; অস্ফুট, অদেখা অন্ধকারেব মধ্যেই কিছু একটা কেঁপে যাচ্ছে যেন!

একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল অদূরে, ফুটপাথ ঘেঁষে। দেখতে ভুল হয়নি। ট্যাক্সির পিছনে বসে আছে খুব মোটা চেহারার এক ভদ্রলোক, মিটার না নামিয়ে পিছনে মুখ ফিরিয়ে তার হাত থেকে টাকা নিচ্ছে ড্রাইভার। এটা খালি হওয়ারই লক্ষণ।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠল পা দুটো। 'ট্যাক্সি—', বলে হাত তুলে ও চেঁচিয়ে ড্রাইভারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে অনুভব করল অনেকক্ষণের নীরবতা গলায় স্তব্ধতা এনে দিয়েছে কেমন, স্বর বেরুল না। ছুটেই এল। কিন্তু কপাল খারাপ, উল্টোদিক থেকে ছুটে আসা চার পাঁচটি লোক প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে পৌঁছে ঘিরে ধরল ট্যাক্সিটাকে। মোটা লোকটি গাড়ির দরজা খুলে শরীরের আধখানা নামাবার আগেই সামনের দরজা খুলে একজন উঠে পড়ল চটপট।

এ কী! অর্পিতা ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'আমি আগে ডাকলাম। আমাকে যেতে দিন!'

'আগে ডেকেছেন মানে!' সামনের সিটের যুবকটি বলল, 'আপনি আগে ডাকলে আমি এখানে বসে থাকব কী করে!'

'ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করুন না!'

গাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে মিটার নামাতে নামাতে যুবকটির দিকে তাকাল ড্রাইভার। তারপর অর্পিতাকে দেখিয়ে বলল, 'উনিই হাত দেখিয়েছিলেন আগে।'

'যাঃ বাবা! মেয়েছেলে দেখেই গলে গেলেন নাকি?'

খোঁচা দেওয়া গলায় বললেও অর্পিতা লক্ষ করল, লালা-মেশানো অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে যুবকটি। নিজের সিটে ফিরে গিয়ে ময়লা ঝাড়ন দিয়ে সামনের কাচের জল মুছছে ড্রাইভার। ইতিমধ্যে বন্ধ করা ছাতাটা আগলে, বৃষ্টিভেজা শাড়ির আঁচল ঠিকঠাক করতে করতে দেখল, আর যারা ছিল তাদের তিনজন চটপট উঠে পড়ল পিছনের সিটে। দলের মধ্যে থাকলেও অন্য লোকটি সম্ভবত একাই এসেছিল; হাতে অ্যাটাচি, দুরন্ত পোশাক, টাইয়ের নট ঠিক করতে করতে চলে যাবার আগে অর্পিতাকে শুনিয়ে বলল, 'আপনার প্রতিবাদ করা উচিত।'

অর্পিতা তখনও দাঁড়িয়ে আছে দেখে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'আপনি যাবেন কোথায়?'

'যেখানেই যাই না। আমি আগে ডেকেছি—আপনি অন্য প্যাসেঞ্জার নেবেন কেন!'

'ম্যাডাম, আমরা দেড়ঘণ্টা ধরে বৃষ্টিতে ভিজছি। অফিসে লেট হয়ে গেলাম।' পিছনের সিটের একজন বলল, 'আপনি অপেক্ষা করুন। পেয়ে যাবেন ট্যাক্সি—'

ট্যাক্সি ছেড়ে দিল। স্তম্ভিত অর্পিতা, খানিক অপমানিতও, ছাতা খুলতে খুলতে ভাবল, সেও কি অফিসে যাচ্ছে না, সেও কি অপেক্ষা করছে না অনেকক্ষণ। ড্রাইভার না হয় ঝামেলায় জড়াতে চায়নি। কিন্তু, ওই লোকগুলিই বা কেমন। অন্তত খোঁজ করতে পারত সে কোথায় যাবে, কিংবা একই দিকে যাবে কি না—তিনজনের একজন সামনে চলে এলে অনায়াসে তার জায়গা হয়ে যেত পিছনে।

তখনই অনুভব করল, শরীরে অভিমান ঠেলে উঠে আসছে গা গুলানো বমির ভাব। কদিন ধরে প্রায়ই হচ্ছে এমন। ম্যাজমেজে অস্বস্তিকর কেমন একটা ভার যেন থমকে আছে শরীরে। কাল রাতে বিশাখা তার জেগে থাকা দেখেছিল, বমির শব্দ শোনেনি তো।

কোনওরকমে সামলে নেবার চেষ্টায় শরীর টানটান করেও নিজেকে আগলাতে পারল না অর্পিতা। লোকের চোখ বাঁচিয়ে, বাঁ হাতে বুক চেপে ঝুঁকে দাঁড়াল ফুটপাথের ধারে। ওয়াক তুলল। এরকম দু তিনবার হবার পর খানিকটা তরল এসে গেল মুখে, আর কিছু নয়। থুথু ফেলার মতো সেটা উগরে দিয়ে, নিঃশ্বাস স্বাভাবিক করে, রুমালে ঠোঁট মুছে নিল সে। আরও কয়েক মুহূর্ত থমকে থেকে, এগোতে লাগল বাসস্টপের দিকে।

সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। এখান থেকে দেখে যা বোঝা যায় বাসগুলো তেমন খালি না হলেও মিনিবাস প্রায় ফাঁকাই যাচ্ছে। স্টপে খালি হতে পারে আরও। ট্রামে গেলে অনেকটা ঘুরপথ; পার্ক স্ট্রিট কিংবা ধর্মতলায় নেমে আবার চৌরঙ্গির দিকে ফেরা। হয়রানির একশেষ। নাকি ট্রামেই যাবে? তা হলে ঝাঁকুনিটা অন্তত কম হত।

শেষ পর্যন্ত ট্রামে যাওয়াই ঠিক করল অর্পিতা। বৃষ্টিটা ধরেছে সামান্য। অজ্ঞাত কারণে পরপর দুটি ট্রাম একই সময়ে এল, পিছনেরটা যাচ্ছে বি-বি-ডি বাগের দিকে। সেটাতেই উঠল এবং সিটও পেয়ে গেল জানলার ধারে।

অসমান হাওয়ায় ছেঁড়া ছেঁড়া সুতোর মতো উড়ে যাচ্ছে বৃষ্টির রেণু। আলো পরিষ্কার হচ্ছে ক্রমশ। থেমেও না থামা এই খেয়ালি বৃষ্টি অগ্রাহ্য করে ছাতা ছাড়াই কেউ কেউ নেমে পড়েছে রাস্তায়। ভিড় বাড়ছে ট্রামে। স্কুল ইউনিফর্ম পরনে ফর্সা যে-কিশোরটি এতক্ষণ বসেছিল পাশে সে উঠে যেতে খাঁকি ট্রাউজার্স ও নীল সার্ট পরা দশাসই একটি লোক ঘামের গন্ধ নিয়ে প্রায় তাকে কোণঠাসা করে বসে পড়ল পাশে। আড়ে তাকিয়ে দেখল লোকটি স্বাস্থ্যবান নয়, মোটা, সামনের সিটের গা পর্যন্ত এগিয়ে আছে ভুঁড়িটা । আজ এত মোটা লোক দেখছে কেন। খানিক আগে ট্যাক্সিতেও দেখেছিল একজনকে। অদ্ভুত ছিল তার নামার ধরন। প্রথমে বাঁ পা-টা বের করল, তারপর ডান পা-টা বের করে বাঁ পায়ের বরাবর নিয়ে এল, তারপর কোমরের ওপরের অংশ সামনে পিছনে করতে করতে মাথা ও ঘাড় বের করে দুদিকে হাত বাড়িয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল যেন সামনে গভীর জল, ডাইভ দেবে। এখন মনে হচ্ছে ওই লোকটি আগে নেমে পড়লে সে হয়তো সামনের কিংবা পিছনের যে-কোনও একটি দরজা দিয়ে আগেই উঠে পড়তে পারত ট্যাক্সিতে। লোকগুলি তার হাত ধরে টানাটানি করত না নিশ্চয়ই; তা হলে এমন ভাবে অপমান সহ্য করতে হত না। এইসময় পাশের লোকটি নড়েচড়ে উঠতে দেখল বছর চার-পাঁচের একটি শিশুর হাত ধরে সামনে দাঁড়িয়ে আছে কৃশ চেহারা, ক্লান্তমুখ এক যুবতী। লোকটি উঠে যেতে যুবতী বসল, কোলে তুলে নিল বাচ্চাটিকে। ছেলেই। শিশুটি মুখ তুলে হাত বাড়িয়ে যুবতীর চিবুক ঠেলে বলল, 'মা, বাবা আজ আসবে তো?' এক পলক শিশুটির মুখের দিকে তাকিয়ে যুবতী বলল, 'চুপ

করো।' অর্পিতা দেখল, অদ্ভুত উদাসীন তার মুখ, ঠাণ্ডা গলায় ধমক দেবার পরও বাচ্চাটিকে এঁটে ধরল গায়ে, বৃষ্টি বহু দূরে। একটি সরল প্রশ্নের উত্তরে এ কেমন রহস্য!

হয়তো বিশাখার কথাই ঠিক। নিঃশ্বাস ফিরিয়ে নিয়ে অর্পিতা ভাবল, হয়তো অধিকাংশ মানুষই ঘুরছে ধুলোমাটি মেখে, নিজস্ব অন্ধকারে, বাস্তব আড়াল করে।

অর্পিতা এখন পরিষ্কারই দেখছে। কাল, বিকেলে, গড়িমসি ভাব নিয়ে দক্ষিণীতে নিজের ঘরে শুয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎই শুনেছিল কান্নাটা। অদ্ভুত সেই স্বর, প্রায় চিৎকারের মতো উঠেই থেমে গেল, তারপর একটানা হয়ে ছড়াতে লাগল থেমে থেমে। এই বাড়ির আপাত-শান্ত পরিবেশে এমন অদ্ভুত কান্না আর কখনও শোনেনি সে। কিছু আশঙ্কা, কিছু বা কৌতূহলে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে এসে দেখল লোকজন ভর্তি অফিস ঘর, নিজের সিটে বিষাদ মাখানো হাসিমুখে বসে আছেন মিসেস দাশ, সামনে এক বয়স্ক ভদ্রলোক। এর আগে কখনও দেখেনি। দরজা ঘেঁষে ঈষৎ থমকানো মুখে দাঁড়িয়ে আছে বিশাখা আর সুবর্ণা। ওরা এখনই ফিরেছে মনে হয়। তার চেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, টেবিলের ডানদিকের একটি চেয়ারে বিভ্রান্ত মুখ নিয়ে বসে আছে একটি চশমা-পরা কিশোর। পাশের চেয়ারে বসে কিশোরটিরই কাঁধে মুখ রেখে চাপা শব্দ তুলে ঘুনঘুন করে কেঁদে যাচ্ছেন মমতাদি।

দৃশ্যটা যে শোকের নয় তা মুখগুলির বিভিন্ন অভিব্যক্তি দেখলেই বোঝা যায়। তবে সকলেই যেন বিব্রত, অপ্রস্তুত; বিশেষত ওই কিশোরটি, আড়ষ্টতা থেকে হাত তুলে মাঝেই মাঝেই বুলিয়ে যাচ্ছে মমতাদির পিঠে।

'এসো, অর্পিতা।' মিসেস দাশই কথা বললেন প্রথম, 'খুব আনন্দের খবর। মাধ্যমিকের রেজাল্ট বেরিয়েছে আজ—মমতার ছেলে স্ট্যান্ড করেছে। ইনি ওর স্কুলের মাস্টারমশাই, ধীরেনবাবু—'

অর্পিতা হকচকিয়ে গেল। বিশাখার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে ও বলল, 'আমরা তো এই আসছি। এসেই দেখি, এই—। কলেজেই অবশ্য শুনেছিলাম আজ রেজাল্ট বেরিয়েছে—'

বিশাখার গলা ধরে এল।

অর্পিতা কিশোরটির দিকে তাকাল এবং নিজেকে ভুলে গিয়ে বলল, 'এ তো ফ্যানটাস্টিক খবর। কান্নার কী আছে!'

'না। কাঁদতে দিন ওঁকে।' আবেগের গলায় ধীরেনবাবু বললেন, 'আমি জানি এই কান্নার অর্থ। ওঁর জীবনের সমস্ত বঞ্চনা, সমস্ত কষ্টের অবসান হল আজ। চন্দন আরও বড় হবে। অমন মায়ের সন্তান পিছিয়ে থাকে না—'

ঘরের আবহাওয়া ভারী হয়ে উঠল কেমন। ধীরেনবাবুর কথাগুলো মমতাদির কানে পৌঁছেছে বলে মনে হল না। ঘুনঘুন শান্ত হলেও কান্নার রেশটা থেকে গেছে এখনও, মনে হচ্ছে ছেলের কাঁধে ও বুকে মাথা রেখে আস্তে আস্তে ঘুমিয়ে পড়ছেন মমতাদি।

অর্পিতার হঠাৎ মনে পড়ে গেল এই হোমে তার প্রথম রাতের কথা, মমতাদিরই রুমমেট ছিল সে। সেদিনই শুনেছিল ওঁর একটি ছেলে আছে, যার নিরাপত্তা প্রার্থনায় রোজ রাত্তিরে ও ভোরে মা কালীর ছবির দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠেকান তিনি। একেবারেই চুপচাপ মানুষ; আর কিছু বলেননি কখনও, শোনেওনি কারও কাছে।

কাল কিছুটা বুঝলেও, অনেকটাই আড়ালে থেকে গেছে এখনও। চন্দনের মাস্টারমশাইয়ের কথায় আবেগ ছিল, কেমন যেমন আদর্শ-আদর্শ শোনাচ্ছিল, তা হলেও

কোন বঞ্চনা, কোন কষ্টের কথা বলেছিলেন তিনি। কেউ কি জানে?

ধর্মতলায় ট্রাম থেকে নেমে ট্যাক্সি পেয়ে গেল অর্পিতা। কখন বৃষ্টি থেমে গিয়ে হালকা রোদ উঠেছে চারদিকে, খেয়াল করেনি। আর সবই ঠিকঠাক আছে। রোদ আর একটু চড়া হলে জলের দাগগুলোও শুকিয়ে যাবে ক্রমশ। তখন ট্যাক্সির সিটে গা এলিয়ে ব্যাগ থেকে লবঙ্গ বের করে মুখে দিল সে এবং অফিসের দিকে যেতে যেতে ভাবল, জানা কি সহজ! এক শীতের বিকেলে তাৎক্ষণিক আবেগবশত সে যখন এগিয়ে গিয়েছিল অনুপের দিকে, তখনও কি জানত যে এগোচ্ছে সে আর ফিরবে না, জীবন বদলে যাবে এইভাবে!

লিফট থেকে বেরিয়ে কাচের দরজা ঠেলে স্টুয়ার্ট মর্গানের অফিসে ঢুকেই মুখোমুখি হল নিবেদিতার।

'হাই, অর্পিতা!'

'হাই!'

সামান্য হেসে ভিতরে চলে যাচ্ছিল অর্পিতা, পিছন থেকে ডাকল নিবেদিতা। অর্পিতা দাঁড়াতে রিসেপশন কাউন্টার ছেড়ে নিজেই উঠে এল প্যাসেজে।

'আর ইউ আনওয়েল?'

'নো। হোয়াই?'

'কাল আসোনি। ভাবলাম—'

সোজাসুজি চোখ তুলে তাকে খুঁটিয়ে দেখছে নিবেদিতা। অস্বস্তিতে চোখ ফিরিয়ে নিল অর্পিতা। কাউন্টারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এমনিই। আসিনি। আজও আসতাম না। তারপর ভাবলাম—'

কিছু না ভেবেই কথাগুলো বলল অর্পিতা এবং খেই হারিয়ে ফেলল।

'আই হ্যাভ টু টেল ইউ সামথিং—'

'কী?'

'মিসেস রায় কাল থেকে সাত আটবার খুঁজেছে তোমাকে।' ব্যস্তভাবে বলল নিবেদিতা, 'অপারেটরও বলবে তোমাকে—'

'আমাকে কেন!' অর্পিতা বলল, 'ও জানে না ওর হাসব্যান্ড এখন ট্যুরে! তিন চার দিনের আগে ফিরবে না!'

'আমাকে বলছ কেন! তুমিও জানো জানে কিনা!' একটু বা বিরক্তির ভাব দেখিয়েও সামলে নিল নিবেদিতা। বলল, 'আমি বলেছি, ইউ আর আনওয়েল। চন্দ্রা তোমার অ্যাডড্রেস, ফোন নাম্বার চাইছিল। আমি অ্যাভয়েড করে গেছি।'

অর্পিতা নার্ভাস বোধ করতে শুরু করেছিল। চুপ করে থাকল।

'আমার মনে হয় তুমি ওকে ফোন করো একটা। বিফোর সি ডাজ ইট এগেন—'

'আচ্ছা। দেখি—'

ঘরে এসে খানিক চুপচাপ বসে থাকল অর্পিতা। সকাল থেকেই কুলার চালিয়ে রেখেছে সম্ভবত, এখানে এসে বুঝেছে বাইরে তাপ ও গুমোট ছিল। ভাবল, নিবেদিতা যেমন বলল, সে কি ফোন করবে চন্দ্রাকে? অনুপের বাড়িতে? যদি করে, কী বলবে? চন্দ্রাই বা তাকে খুঁজছে কেন? অনুপের স্ত্রী সে, যা বলার অনুপকেই বলতে পারে! যদিও জানে, অন্তত এবার যাবার আগে সেই রকমই আভাস দিয়ে গেছে অনুপ, যে, সেপারেশন ও ডিভোর্সের কথা

সে বলেছে চন্দ্রাকে। উত্তরে হ্যাঁ বা না কিছুই বলেনি চন্দ্রা। এরপরও যদি কিছু বোঝাপড়া করার থাকে, সেটা অনুপের সঙ্গেই করুক চন্দ্রা। তার সম্পর্কটা অনুপের সঙ্গে, চন্দ্রার স্বামীর সঙ্গে নয়। চন্দ্রা নিশ্চয়ই বলবে না জোর করে কিছু করেছে সে! তার দুর্বলতা ছিল হয়তো, দিনে দিনে ডেভলাপ করেছিল, প্রকাশ করে ফেলেছিল খানিকটা; কিন্তু একটি বয়স্ক, বিবাহিত, বিবেচক পুরুষের কাছে এই দুর্বলতার দাম কতটুকু? বিশেষত অনুপের কাছে, যে এড়িয়ে যেতেই অভ্যস্ত! প্রলোভন জাগানো? চন্দ্রা কি ভেবেছে অর্পিতার আত্মসম্মানবোধ নেই, নিজের আখের গোছানোর জন্যে এক ভবিষ্যৎহীন শরীরখেলায় ছেড়ে দেবে নিজেকে!

এসব ভেবেও কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পারল না অর্পিতা। ফোন করবে, নাকি এড়িয়ে যাবে? রামেশ্বর কফি দিয়ে যাবার পর কাপটা তুলতে গিয়ে দেখল হাঁত কাঁপছে। শুধু যে নার্ভাস লাগছে তা নয়, বস্তুত এখন সে ভয়ও পাচ্ছে। কেন যেন মনে হচ্ছে যুক্তি দিয়ে দাঁড় করানো যাবে না ভাবনাগুলোকে। চন্দ্রার দাঁড়াবার জায়গা আছে, অনুপেরও আছে, কিন্তু সে কোথায়?

অন্যমনস্কতা নিয়ে কাগজপত্র ঘাঁটাঘাঁটি করতে লাগল অর্পিতা। সেই অবস্থাতেই অনুভব করল অনুভূতিটা আসছে, কিছুক্ষণ আগে ট্যাক্সিটা তাকে প্রত্যাখ্যান করে চলে যাবার পর যেমন এসেছিল; আসতে আসতেও ফিরে যাচ্ছে। সমস্যা শুধু চন্দ্রাকে নিয়ে নয়। একটু আগে কথা বলবার সময় যে-দৃষ্টিতে তাকে দেখছিল নিবেদিতা, তাতে মনে হয় সন্দেহ করছে কিছু। এরপর অফিসেও জানাজানি হবে। তখন!

টেলিফোনের শব্দ। একটুক্ষণ সন্দেহের চোখে যন্ত্রটার দিকে তাকিয়ে থেকে হাত বাড়িয়ে রিসিভার তুলল অর্পিতা এবং ভাবল, এটা তার কাজের জায়গা, দায় দায়িত্ব আছে। হাত গুটিয়ে বসে থাকলেই কি বাঁচতে পারবে!

'হ্যালো' বলতে পি-বি-এক্স থেকে অপারেটর রোহিনী দাস বলল, 'এসেছেন আপনি!'

'হ্যাঁ—'

'মিস মজুমদার, মিসেস রায় ফোন করেছিলেন আপনাকে। জরুরি।' রোহিনী বলল, 'লাইনটা কানেক্ট করে দেব?'

'নো, থ্যাঙ্কস্।' অর্পিতা বলল, 'এখন না। পরে—'

রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্পিতা ভাবল, উপায় একটাই আছে। সে এখন চলে যেতে পারে। এর পরের কয়েকটা দিনও আসবে না। যা হবার অনুপ ফিরে এলেই হবে। সে একা দায়িত্ব নেবে কেন! অফিস? কাজের দায়িত্ব? যদি এমন হত যে সে সত্যিসত্যিই অসুস্থ হয়ে পড়ল, তা হলেও কি অফিস চলত না?

দূর থেকে এগিয়ে আসছে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়রার ডানা ঝাপটে উড়ে যাওয়ার শব্দ। পিছনে তাকিয়ে দেখল, রোদ অদৃশ্য, ধোঁয়াটে শূন্যতা থেকে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা এসে আছড়ে পড়ছে কাচের জানলায়। একত্র হতে হতে ফোঁটাগুলো ক্রমশ পরিণত হল অবিচ্ছিন্ন ধারায়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হল অর্পিতার, সম্পর্কের ভিতরে যদি কোনও সত্য থাকে, তা হলে সে পালাবে কেন!

চিন্তাটা জেদ এনে দিল মনে। না, সে কথাই বলবে।

পি-বি-এক্স-এর থ্রু দিয়ে গেলে আর কেউ কান লাগাতে পারে। সুতরাং ডিরেক্ট লাইন। নাম্বার ডায়াল করার সঙ্গে সঙ্গে রিং হতে লাগল। রিসিভারটা কানে এঁটে ধরল অর্পিতা।

এবং ভাবল, অধিকার ছাড়বে কেন!

ওদিকে চন্দ্রারই গলা।

'আমি অর্পিতা বলছি—।' তাৎক্ষণিক জড়তা কাটিয়ে অর্পিতা বলল, 'মিস্টার রায়ের সেক্রেটারি—'

'সেক্রেটারি —'

অল্প শ্লেষ মেশানো থাকলেও চন্দ্রার গলায় জোর নেই কোনও। এড়িয়ে গিয়ে অর্পিতা বলল, 'আপনি খোঁজ করছিলেন?'

'হ্যাঁ।' একটু থেমে চন্দ্রা বলল, 'তোমার শরীর খারাপ শুনলাম!'

'ও কিছু নয়।' অর্পিতা ব্যস্ততা দেখাল, 'কী বলবেন, বলুন!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল না চন্দ্রার। মনে হয় ভাবছে। অনেকটা সময় নিয়ে বলল, 'আমি একটু দেখা করতে চাই তোমার সঙ্গে। আজই। কখন দেখা করব বলো?'

'দেখা!' বাঁ হাতে রিসিভার, ডান হাতে চিবুকের ঘাম মুছে নিল অর্পিতা। বলল, 'টেলিফোনেই বলুন না!'

'তুমি দেখা করতে চাও না!'

অনুযোগহীন, অদ্ভুত ঠাণ্ডা গলা চন্দ্রার। একটু বা এলানো, যেন ঘুমের মধ্যে বিছানায় পাশ ফিরতে ফিরতে বলছে। এটু অনুপেরই বাড়ির নাম্বার এবং চন্দ্রাই ধরেছে না জানলে চেনা যেত না।

উত্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে থাকল অর্পিতা।

'তা হলে—শোনো—।' কয়েক মুহূর্ত থেমে থেকে নিঃশ্বাসের শব্দ চাপতে চাপতে চন্দ্রা বলল, 'আমি তোমার কাছে দয়া চাইছি, অর্পিতা। একটু দয়া করো আমাকে—!'

'কী বলছেন এসব!'

'ঠিকই বলছি। আমি—।' বলতে বলতেই বাধায় জড়িয়ে গেল চন্দ্রা। তারপর ভাঙা-ভাঙা, কাতর, কিন্তু আগের চেয়ে জোরালো গলায় বলল, 'আমি জানি আমি হেরে গেছি। আমি সব জানি। তোমাদের সম্পর্ক—তোমরা কতটা এগিয়েছ—। ও বলেছে। যেটা বলেনি সেটা ওর মুখ দেখেও বুঝতে পারি—'

চন্দ্রা থেমে গেল হঠাৎ। কিছু শোনার অপেক্ষা না করেই ফিরে এল আবার।

'পুরুষমানুষের তৃপ্তি ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায়। আমি পারিনি—পারবও না। শুকনো গাছের মতো এই শরীর নিয়ে তো মেয়েমানুষ হওয়া যায় না! কী দিতে পারলাম ওকে! কিছুই না। তুমিই দিয়েছ—'

একটানা বললেও কণ্ঠস্বরের তারতম্যই চিনিয়ে দিচ্ছে দ্রুত ভেঙেচুরে যাচ্ছে চন্দ্রার মুখের রেখাগুলো। ওর কথায় কান রেখে, ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে নিজেরও অস্থিরতা চিনল অর্পিতা। সম্ভবত রিসিভার নামিয়ে রাখা উচিত তার।

'ডিভোর্স চাইলে দেব। কিন্তু—', চন্দ্রা হঠাৎ বলল, 'মেয়েমানুষ হিসেবে একটাই অধিকার ছিল আমার। কারুর স্ত্রী হয়ে থাকার অধিকার। সেটা তুমি কেড়ে নিচ্ছ কেন!'

এবার স্পষ্টতই ভেঙে পড়ল চন্দ্রা। আর কিছু বুঝে ওঠার আগেই খাপছাড়া একটা শব্দ ফিরে এল অর্পিতার কানে। লাইন কেটে গেছে।

রিসিভারটা নামিয়ে রাখল অর্পিতা। স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর আস্তে

আস্তে হেঁটে গেল জানলার দিকে। দেখল, বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে সমানে। অঝোর ধারায় ঝাপসা হয়ে আছে জানলার কাচ। কিছুই দেখা যায় না।

নির্ভরতা পাবার আশায় ওই কাচের ওপরেই নিজের মুখ চেপে ধরল সে।

ঠাণ্ডা। ভীষণ ঠাণ্ডা। মনে হচ্ছে কারুর হিমশীতল হাত এসে পড়েছে মুখের ওপর। নিঃশ্বাস কাড়তে কাড়তে অনুভূতিটা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে শরীরে। বোধ জুড়ে শূন্যতা। ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে সে শুধু ভাবল, আমি কি রক্ষিতা হয়েই থাকব! চন্দ্রা অধিকারের প্রশ্ন তুলেছিল। ওকে ফিরিয়ে দেব? ওর অধিকার।

৫

ফিরিয়েই দিল।

দিন দুয়েক পরে একদিন সন্ধ্যায় ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে হ্যারিংটন স্ট্রিটের এক নার্সিংহোম থেকে ক্লান্ত, বিচ্ছিন্ন অর্পিতাকে বাইরে দাঁড়ানো ট্যাক্সির দিকে নিয়ে যেতে যেতে অসীম বেদনায় আচ্ছন্ন ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশাখা অনুভব করল, সকালে যাকে নিয়ে এসেছিল এ সে নয়; তবু নিজেকে বঞ্চিত করেও কী যেন বুঝিয়ে গেল ও। কী? এখনও মমত্ববোধ মরেনি, মানুষও কি মরে গেছে! যদি যেত তা হলে ওই বিষাদময় মুখের সৌন্দর্যও কি হারিয়ে যেত না!

এখন মনে হচ্ছে সবই স্বপ্ন। পরশু রাতের অন্ধকারে তার কোলে মুখ গুঁজে অর্পিতার ভেঙে পড়া, ওকে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে শান্ত করা, বোঝানো, সকলে ঠিকঠাক ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা দেখে নিয়ে অন্ধকারের মধ্যেই তার নিঃশব্দে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসা, দরজায় টোকা দিয়ে সুলেখার ঘুম ভাঙানো—এসব কি ঘটেছিল? কে জানত, যাকে হেয় করতে করতেই দূরে সরিয়ে রেখেছিল এতদিন, যাকে নিয়ে কানাঘুষো করেছে সকলে, সেই সুলেখাই শেষ পর্যন্ত ধাত্রী হয়ে উঠবে!

সুলেখাও এল সঙ্গে সঙ্গে। অর্পিতা ট্যাক্সিতে উঠছে, ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল, 'মন খারাপ কোরো না। এরকম তো কতই হচ্ছে—'

অর্পিতা দাঁড়াল একটু। তাকাল। কথা বলল না কোনও।

'আজ একটু বমি-বমি করবে। ওষুধগুলো খেও। কাল ঠিক হয়ে যাবে।'

অর্পিতা ওঠার পর বিশাখাও উঠল। সুলেখা ট্যাক্সির দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে দেখে বলল, 'এ কী, আপনিও আসবেন তো!'

'না গো। তুমিই নিয়ে যাও ওকে।' সুলেখা বলল, 'আমাকে তোমাদের সঙ্গে দেখলে কেউ সন্দেহ করতে পারে। কী দরকার! আমি বাসেই যাব।'

বৃষ্টিতে মনোরম হয়ে উঠেছে কলকাতা। ফ্লুরোসেন্ট আলোর ঔজ্জ্বল্যের মধ্যে দিয়ে উড়ে যাচ্ছে আঁধার মেশানো অসংখ্য জলের রেখা। শব্দে মিশে যাচ্ছে শব্দ। আর একটু পরেই আরও অনেক গাড়ি, বাস, ট্যাক্সির জটলায় তাদের ট্যাক্সিটা হারিয়ে যেতে বিশাখা ভাবল, তফাত কোথায়! আর যে-কোনও ট্যাক্সির মতোই এই ট্যাক্সিটাও; অন্য যে-কোনও ট্যাক্সির

ভিতরে এইভাবে দুটি যুবতীকে যেতে দেখলে মনে হবে তারাই যাচ্ছে।

এতক্ষণ পিঠ সোজা করে বসেছিল অর্পিতা। ওকে সিটের পিছনে মাথা হেলাতে দেখে ওর ডান হাতটা নিজের কোলে তুলে নিল বিশাখা। 'শরীর খারাপ লাগছে?'

'না। ভালই লাগছে।' সামনের সিটের দুদিকের জানলা দিয়ে ছুটে আসা জোলো হাওয়ার আবেশে চোখ বুঁজে অর্পিতা বলল, 'ক'দিন খুব ভার-ভার লাগছিল। এখন বেশ হালকা লাগছে—'

বিশাখা মুখ ঘুরিয়ে নিল। রাস্তাই দেখছে। দেখতে দেখতেই ফিরে পাচ্ছে নিজেকে। কোলের ওপর ধরা অর্পিতার হাতটা নিজের হাতে জড়িয়ে রেখে, অন্য হাতে তার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বিশাখার মনে পড়ল, তিনমাস হয়ে গেল, তার চিঠির কোনও উত্তর দেয়নি সিদ্ধার্থ। আর কি দেবে? সিদ্ধার্থ দেয়নি বলে সেও লেখেনি। জুন শেষ হয়ে এল, এই জুনেই না আসবার কথা ছিল তার! নাকি জয়ার কথাই ফলে গেল শেষপর্যন্ত!

'জানিস, বিশু মাস্টার!' একই ভঙ্গিতে স্থির থেকে প্রায় স্বগতোক্তির গলায় বলল অর্পিতা, 'আজ যখন অ্যানাসথেটিস্ট সামনে এসে দাঁড়াল, হঠাৎ মনে হল, চেঁচিয়ে উঠি! বলি, বাচ্চাটা তো আমার! ও তো কারও অধিকারে হাত বসায়নি! ওকে কেন মেরে ফেলবে! পারলাম না—বলতে—'

চলমান ট্যাক্সির আলো-আঁধারিতে মুখ দেখা যায় না ভাল করে। একবার তাকিয়েই মুখ ফিরিয়ে নিল বিশাখা। অর্পিতার হাতটা আরও একটু শক্ত করে চেপে ধরল শুধু। ওষুধ-এসেন্স-পাউডারে জড়ানো একটা গন্ধ পাচ্ছে, হয়তো অর্পিতার শরীরের। তবু মনে হল, যে আসেইনি এবং যে এসেও চলে গেল, সেই অনাঘ্রাত দুই স্বপ্নের ঘ্রাণ লাগছে তার নাকে। নিঃশ্বাসের অস্বস্তি ছড়িয়ে পড়ছে গোটা শরীরে। হাতটা কি কাঁপতে শুরু করেছে?

চকিত বিভ্রম থেকে জোর করেই নিজেকে নিরস্ত করল বিশাখা। জানে, বড় সংক্রামক এই কম্পন—যে-হাতে সে ধরে আছে অর্পিতাকে তাতে সংক্রমিত হলে অর্পিতাও কাঁপবে। তা সে হতে দেবে না।

বাকি রাস্তাটা ওরা কেউই কোনও কথা বলল না।

দক্ষিণী'র সামনে ট্যাক্সি থামার পর ভাড়া মিটিয়ে নেমে এল বিশাখা।

অর্পিতাও নামল। পিঠের ওপর বিশাখার হাত, ঘিরে ধরার চেষ্টা করছে ওকে। একটু থেমে, সেই হাতে নিজের হাতটাও রেখে বিশাখার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল অর্পিতা। বলল, 'ধরার দরকার নেই। আমি নিজেই যেতে পারব—'

বিশাখা দেখল, অর্পিতা এগিয়ে যাচ্ছে। একটু মন্থর, একটু বিমর্ষ; তবু পা ফেলায় ভুল নেই কোনও।

অন্তর্ধান

উৎসর্গ:
শ্রীপান্থ
নিখিল সরকার-কে

১

প্রায়ই হয় এরকম। ডায়ালটোন থাকে না; কিংবা, দু তিনবার চেষ্টা করতে করতেই ডেড হয়ে যায়। তখন অপেক্ষা করতে হয়। অপেক্ষার সময়টা নির্ভর করে টেলিফোনেরই ওপরে। কখনও পাঁচ মিনিট, কখনও বা তারও বেশি। পরে রিসিভার তুললে দেখা যায় ঠিকই আছে। নাম্বার ধরে রিং করলে কখনও রং নাম্বার এবং প্রায়ই এনগেজড। শেষ পর্যন্ত লেগেও যায় ঠিক।

কিন্তু, অন্যদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আজ যেন কিছুই মিলছে না। এমনিতে বোঝা যাচ্ছে না কিছু, ডায়ালটোনও আসছে ঠিকঠাক। তা সত্ত্বেও, গত পনেরো মিনিট ধরে যতবারই রিং করছেন ডাবল-ফাইভ নাম্বারটা, ততবারই হয় একটা উদ্ভট শব্দ করে ফিরে আসছে ডায়ালটোন, না হয় টানা বেজে যাচ্ছে এনগেজড সাউন্ড। ওয়ান ডাবল-নাইন ঘোরালেও সেই একই ব্যাপার। এনগেজড। টেলিফোনটাই খারাপ হয়ে গেল নাকি!

বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে সুশোভন বললেন, 'নাঃ। পাব বলে মনে হচ্ছে না।'

একটু আগে এ ঘরে ছিলেন লীনা। সুশোভনের ক্রমাগত রিং করার চেষ্টা একটা চাপ সৃষ্টি করছিল তাঁরও মনে। তখন থেকেই শুরু হয়ে যায় নিজেকেও আগলে রাখার চেষ্টা।

রাতের খাবার খাওয়ার আগে ইদানীং একটা ট্যাবলেট খান সুশোভন। ওঁকে ওষুধ ও জল এগিয়ে দিয়ে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে যান লীনা, চা ও বিস্কুটের কৌটো খুলে কতটা কী আছে না আছে দেখে, দোকানে পাঠান মন্টুকে। ওর পিছনে পিছনেই নেমে আসেন একতলার দরজা পর্যন্ত। একতলার ভাড়াটে আলোক মিত্তিররা গরমের ছুটিতে বেড়াতে গেছে দিন সাতেকের জন্য, নিজেদের দিকের দরজা খুলে আলো জ্বালিয়ে সব ঠিকঠাক আছে কি না রোজই তা দেখে নেন একবার। আজও তা-ই করে, সিঁড়ির আলো নিবিয়ে ওপরে উঠে এসে দেখেছিলেন সুশোভন তখনও টেলিফোন নিয়ে ব্যস্ত। তখন ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বসেছিলেন বারান্দায়। মনটা তাঁরও ভাল নেই। শেষ দুপুরে খবরটা পাবার পর থেকেই একটা আশঙ্কা থম ধরিয়ে রেখেছে বুকে, সারাক্ষণই মনে হচ্ছে কী যেন হতে পারে। স্বামীর কথা চিন্তা করে স্থির রেখেছেন নিজেকে।

'অত ব্যস্ত হয়ে পড়ছ কেন!' সুশোভনের হতাশ কণ্ঠস্বর শুনে বারান্দা থেকেই বললেন লীনা, 'ঘণ্টাখানেক আগেই তো ফোন করেছিল পুতু। তখনও ঠিক ছিল। তেমন কিছু হলে নিশ্চয়ই জানাত।'

'ফোন পেলে তো। দরকারের সময়েই যদি কাজে না দেয়—।'

হতাশা ও বিরক্তি ছাড়াও গলায় মিশেছে আরও কিছু। কথাগুলো বলতে বলতে ঘর

থেকে বেরিয়ে এলেন সুশোভন। খাপছাড়া ভঙ্গিতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

দোতলার গ্রিল-দেওয়া বারান্দার আলো নেবানো। তিনটি বেতের চেয়ারের সবচেয়ে দূরেরটিতে লীনা। তাঁর কথার উত্তর দিলেও এখন ওঁকে চুপচাপ লাগছে, সামান্য অন্যমনস্কও। চওড়া খয়েরি পাড় শাড়ির অনেকটা অংশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে আকাশের আলো, মুখের একদিকে আঁধার; সেই আলো গ্রিলের ছায়াসুদ্ধ তেরছাভাবে এসে পড়েছে দেয়ালে। ঘরে আলো না জ্বললে হয়তো আরও দূর পর্যন্ত দেখা যেত।

'ঘণ্টাখানেক? না তারও আগে?' লীনার কাছাকাছি খালি চেয়ারটা বাদ দিয়ে পরেরটায় বসতে বসতে বললেন সুশোভন, 'তখন টি-ভিতে বাংলা খবর চলছিল—'

'ওকে তো বলাই আছে খবর দিতে। তা ছাড়া ভাল থাকলে হয়তো চলেই আসবে।'

সুশোভন চুপ করে থাকলেন। ঘরের আলো থেকে বেরিয়ে এসে দৃষ্টি ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে প্রায়ান্ধকারে। সামনে রাস্তা। তার ওদিকে পাঁচিল-ঘেরা জমি পেরিয়ে তিনতলা বাড়ির পুরো তেতলাটা অন্ধকার। নিষ্প্রভ একটা আলো জ্বলছে চিলেকোঠায়। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা ট্যাক্সির আসা, থেমে যাওয়া এবং মিটার নামানোর টুংটাং শব্দ শুনলেন সুশোভন। একসঙ্গে অনেকগুলো গলার স্বর পরস্পরকে টেক্কা দিতে দিতে চলে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। সম্ভবত লাইব্রেরির ছেলেগুলো। শব্দগুলো মিলিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত কান খাড়া করে রাখলেন। তারপর নিঃশ্বাস গভীর করে বললেন, 'এত অল্প সময়ের মধ্যে পর পর দুটো অ্যাটাক। এখন কেমন আছে কে জানে।'

আড়ে মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে দেখলেন লীনা। কিছু বলবেন ভেবেও ঠিক কী বলবেন বুঝতে পারলেন না। সম্ভবত ভুল করে ফেলেছেন একটা। অর্জুনের টেলিফোন পেয়ে শুধু মেয়েকে না পাঠিয়ে সকলেই একসঙ্গে বাগবাজারে চলে গেলেই হয়তো ভাল হত। চোখের সামনে ঘটনা ঘটতে দেখলে, কিংবা কাছে থাকলে, আর পাঁচজনের সান্নিধ্যে আশঙ্কায় এমন ছটফট করতেন না সুশোভন। কিছুদিন থেকেই শরীর ভাল যাচ্ছে না মানুষটার। লো প্রেসারের সঙ্গে মাঝে-মধ্যে ঘুসঘুসে জ্বর মিশে কাহিল করে তুলেছিল। এর সঙ্গে জুটে গেল নতুন বিপত্তি। ক'দিন আগে এক সন্ধ্যায় ডাক্তার দেখিয়ে ফেরার সময় বড় রাস্তায় ইনাকে একটি অপরিচিত যুবকের সঙ্গে ট্যাক্সি থেকে নামতে দেখে বাড়ি ফিরে চোটপাট করেছিলেন খুব। কম কথার রাশভারী মানুষ, সহজে উত্তেজিত হন না। সেদিন হলেন। পরে সামলে নিলেও লীনা বুঝতে পেরেছিলেন এই উত্তেজনা ওঁর শরীর ও মনের পক্ষে ভাল নয়।

আড়ালে ইনাকে বুঝিয়েও ছিলেন লীনা, 'পুতু, বাবার কথাও ভাবিস একটু। তোকে আগেও বলেছি, এই বয়সের মেয়ের অমন যার তার সঙ্গে ঘুরে বেড়ানো ভাল নয়—।' ইনাও কম অপ্রতিভ হয়নি। বলল, 'ঘটনাটা সামান্যই, মা। বরুণদা গড়িয়ায় যাচ্ছিল, রাস্তায় পড়ে বলে নামিয়ে দিয়ে গেল। কিছু না বুঝে বাবা এমন চ্যাঁচামেচি করল।'

লীনা ছেলেটিকে চেনেন। ঝুমুর লীনার বন্ধু, একসঙ্গে পড়ে। ওরই দাদা। ঝুমুরের সঙ্গে একদিন এসেছিল বাড়িতে। ভদ্র, স্মার্ট চেহারা, কথাবার্তা ভাল। চেতলার দিকে থাকে। সুশোভন এসব জানেন না, তাঁর কাছে ব্যাপারটা দৃষ্টিকটু লাগতেই পারে।

এসব দিন পনেরো আগেকার ঘটনা। ভিতরে ভিতরে যে চিড় খেয়েছেন একটু, সুশোভনকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল তা। শুকনো, দুর্বল দেখাচ্ছিল, মাঝে মাঝে অন্যমনস্কও। আজ দুপুরে চিন্মোহনের আবার হার্ট অ্যাটাকের মতো হয়েছে খবর পেয়ে সাত-পাঁচ ভেবে

মেয়েকেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন লীনা। ইনা ওর জ্যাঠার খুব প্রিয়, ভেবেছিলেন আগে ও গিয়ে দেখুক কী হয়েছে, কতটা বাড়াবাড়ি, তারপর অবস্থা বুঝে এবং দরকার হলে সুশোভনকে সঙ্গে নিয়ে তিনি নিজেও যাবেন। ওখানে পৌঁছে মেয়ে ফোন করে জানাল, ডাক্তার আছে, বড়দা, ছোড়দারা আছে, এখনই ভয়ের কিছু নেই। খানিক পরে সে আবার ফোন করবে। সুশোভনকে তবু দুশ্চিন্তামুক্ত করা যায়নি।

'এরকম তো কতজনেরই হয়। আবার ঠিকও হয়ে যায়।' লীনা বললেন, 'তুমি বড্ড চিন্তা করো।'

'করব না। পিতৃকুলের তো আর কেউ নেই। বাবা মারা যাবার পর দাদাই তো—'

সুশোভনের গলা ভারী হয়ে এল।

কাছেই কোনও বাড়িতে টি-ভি চলছে খুব জোরে। কী দেখানো হচ্ছে কে জানে, শব্দ শোনা গেলেও ভাষা বোঝা যায় না। একদল কুকুর চিৎকার করছে বেশ কিছুক্ষণ ধরে। সন্ধের পর এমনিতেই এদিকটা নীরব হয়ে আসে। তবে এতটা নয়। আজ শনিবার। খবরের পরও যতক্ষণ বাংলা সিনেমা চলছিল ততক্ষণ আশপাশের বেশ কয়েকটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল টি-ভির আওয়াজ। এখন ওই একটি বাড়িতে, একটিই শব্দ।

লীনার ভাবনার মধ্যেই অবশ্য জেগে উঠল আরও দুটি শব্দ। দূরে, বড় রাস্তায় কর্কশ শব্দে ব্রেক কষতে কষতে থামছে কোনও বাস। আর পিছনের যতীন চৌধুরীদের বাড়িতে শিশুর কান্না। যতীনবাবুর মেয়ের মাস তিনেকের বাচ্চা, কালই শুনেছেন হাম হয়েছে। থেকে থেকে কেঁদে ওঠে। আর সব শব্দ চাপা দিয়ে কান্নাটাই ছড়াতে লাগল এখন।

সুশোভন চুপ করে আছেন দেখে লীনাও কথা বাড়ালেন না। কিছু কিছু আবেগ থাকে যা নিজের মনেই আড়াল খোঁজে। সান্ত্বনা চায় না। একাও হতে চায় সম্ভবত। বর্তমানের অবস্থান ভবিষ্যৎ ভুলে ফিরে যেতে চায় অতীতে। বিকেল থেকে তাঁর নিজেরই হচ্ছে এরকম। ওঁর হবে না কেন। সুশোভনের মা মারা যান ওঁদের অল্প বয়সে, আরও কয়েক বছর পরে বাবাও। চিন্মোহন তখন সদ্য চাকরিতে ঢুকেছেন, বিয়ে করেননি; সেই অবস্থা থেকেই লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করেছেন ভাইকে। লীনা জানেন, এ ধরনের সম্পর্কে শ্রদ্ধা, ভালবাসার সঙ্গে কৃতজ্ঞতাও যুক্ত হয়। হারাবার ভয় স্বভাবতই বিচলিত করে বেশি।

এর পর কখন কী খবর আসে বলা যায় না। লীনা ভাবলেন, সময় থাকতে খাইয়ে দেবেন ওঁকে। রাত বাড়ছে। ইনা ফিরবে, নাকি ওখানেই থেকে যাবে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে।

জুন মাস। বর্ষা শুরু হয়ে গেলেও জাঁকিয়ে নামেনি এখনও। কদিন চুপচাপ থাকার পর আজ দুপুরে হঠাৎই মেঘ করে তুমুল বৃষ্টি হয়ে গেল এক পশলা। তার পরেও ঘোর কাটল না আকাশের। চারদিকে একটা হলদেটে আলো ফুটে থাকলেও রোদ দেখা যায়নি। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেল চিন্মোহনকে নিয়ে টানাপড়েন। কখন যে মেঘ সরে গেল, কখনই বা আকাশ ভরে উঠল জ্যোৎস্নায়, খেয়াল হয়নি তা, ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এসে ব্যাপারটা টের পেয়েছিলেন লীনা। রোদ, বৃষ্টি এড়ানোর জন্যে বারান্দার পরেও আছে এক ফুট চওড়া কংক্রিটের আড়াল। বসে থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা যায় না। তবু স্বামীর থেকে অল্প দূরত্বে বসে লীনা টের পেলেন আকাশের আলো ক্রমশ সাদা হয়ে উঠছে আরও, ব্যাপ্ত হচ্ছে, যেন অদ্ভুত এক মুগ্ধতাবোধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

সুশোভন উঠে দাঁড়ালেন হঠাৎ। এগিয়ে গিয়ে গ্রিল ধরে দাঁড়ালেন। তাকিয়ে থাকলেন সামনের দিকে।

বয়স বাষট্টি পেরোলেও প্রায় ছ' ফুট লম্বা, মেদহীন কাঠামোয় টান আছে এখনও। তীক্ষ্ণ নাক, চওড়া কপাল, পুরু ঠোঁট এবং ব্যাকব্রাশ-করা কাঁচাপাকা চুলে ব্যক্তিত্ব ধরা পড়ে। প্রায় ছত্রিশ বছর অধ্যাপনা করার পর রিটায়ার করেছেন দু বছর হল। এখনও সপ্তাহে তিন দিন ক্লাস নেন টিউটোরিয়ালে। এই বয়সে মানুষকে বার্ধক্যে ধরে, ক্রমশ জীর্ণ হতে থাকে শরীর। লীনা এমন অনেককেই দেখেছেন। বলতে নেই, সে-তুলনায় এখনও টাল খাননি সুশোভন। দু বেলা হাঁটাহাটি করেন অনেকটা, যাতায়াত করেন বাসে, মিনিবাসে, একদিন অন্তর নিজেই বাজারে যান। কথা কম বললেও আড্ডা দেন সমবয়সী, অল্পবয়সীদের সঙ্গে। বছর পাঁচেক আগে বাড়ি করে এ পাড়ায় উঠে আসার পর থেকে পরিচয়ের পরিধি বেড়েছে। বস্তুত তাঁকে চেনে না এমন লোক এ অঞ্চলে কমই আছে। পছন্দও করে। দুর্গাপুজোর কমিটিতে প্রেসিডেন্ট হন, একটা লাইব্রেরিও করে দিয়েছেন পাড়ায়। মাঝে মাঝে লীনার মনে হয়, মানুষটির ভিতরের চাপা তেজি ভাবটুকুই ওঁর বয়স্ক শরীরে টান রেখেছে এখনও। এই বয়সে ওঁর থেকে আট বছরের বড় চিন্মোহন বুড়ো হয়ে গিয়েছিলেন অনেকটা—ব্লাডপ্রেসার, ব্লাডসুগার, মাঝে মাঝে হাঁফানির ঝোঁক, এই সব নিয়েই বিব্রত থাকতেন সারাক্ষণ। চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর সাবধানে রাখত ছেলেরা। মাস পাঁচেক আগে অ্যাটাক হয়ে গিয়েছিল একটা। তারপর আজ, আবার। ঠিক কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে, শেষ পর্যন্ত যদি কিছু হয় তা হলে এই মানুষটিও ভাঙবেন।

জ্যোৎস্নার আলোয় অন্যরকম লাগছে সুশোভনের মুখ। চোখে চশমা নেই। পরনে লুঙ্গি ও স্যান্ডো গেঞ্জি, দুটো হাতই গ্রিলের ওপর, মুখ সামান্য ওপরে তোলা। ওইভাবেই দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কি পূর্ণিমা?'

'আজ কি?' লীনা ভাবলেন একটু, 'না, আজ নয়। কাল।'

'এই পূর্ণিমা, অমাবস্যার দিনগুলো বড় গোলমেলে লাগে—'

'কেন।'

'মা পূর্ণিমায় গিয়েছিলেন, বাবা অমাবস্যায়। আমার এক পিসি ছিল, অল্প বয়সেই—'

লীনার কাছে এসব বৃত্তান্ত নতুন নয়। সুশোভনকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো তোমার। এসব সংস্কার তো আগে ছিল না।'

ওইখান থেকে স্ত্রীর দিকে তাকালেন সুশোভন। জ্যোৎস্না বিস্তৃত হতে হতে উঠে এসেছে ওঁরও মুখে। গোল, একটু বা চাপা, ফর্সা মুখ এবং ঈষৎ মেদবহুল ছোটখাটো চেহারায় ভরাট লাগছে লীনাকে। দেরিতে বিয়ে করেছিলেন, বয়সেও দুজনের মধ্যে প্রায় দশ বছরের তফাত। তবু কর্তৃত্বে, শাসনের ধরনে মাঝে মাঝে বয়সের চেয়ে বেশি বয়স্ক লাগে ওঁকে। সুশোভনের হঠাৎ খেয়াল হল, মুখের ডৌলে এবং গায়ের রঙে ইনাও মোটামুটি তার মায়ের ধরন পেয়েছে, গড়নটাই শুধু একটু লম্বা। পার্ট ওয়ানে পড়ছে, কিন্তু এরই মধ্যে বেশ চটপটে। চিন্মোহনের কিছু হলে শক্‌ড্ হবে মেয়েটা। আজ খবরটা আসবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল মুখ, নিজেই বলল যাবে। লীনাও ওকেই পাঠাল।

মেয়ের কথা ভাবতে ভাবতে বিমর্ষ বোধ করলেন সুশোভন। সে দিন বকাবকিটা বোধহয় একটু বেশিই হয়ে গিয়েছিল, তার পর থেকেই চুপচাপ হয়ে গেছে কেমন। সম্ভবত ওকে

কিছু না বলে লীনাকেই বলতে পারতেন কথাগুলো। সেদিন কে ছিল ওর সঙ্গে, ট্যাক্সিতে? লীনার কথা কি সত্যি, না কি ইনা যা কিছু বুঝিয়েছে তা-ই মেনে নিয়েছে ও? সহপাঠিনীর দাদা হলেও ট্যাক্সিতে উঠতে হবে কেন। অনেকদিন ধরেই একা-একা যাতায়াত করে ও, তা ছাড়া বাসটাসও চলছিল তখন, সবে সন্ধে হয়েছে। নিজেই চলে আসতে পারত।

জোর করে চিন্তাটা পাশ কাটিয়ে গেলেন সুশোভন। স্ত্রীর ধমক তখনও লেগে আছে কানে। অল্প হেসে বললেন, 'সংস্কার কেন হবে। কিছু হেরিডিটারি ব্যাপারও থাকে।'

'এগুলোর সঙ্গে হেরিডিটারির কোনও সম্পর্ক নেই।' সুশোভন কী ভাবছেন না ভাবছেন, যা বলছেন তা-ই ভাবছেন কি না, লীনার কাছে তা স্পষ্ট নয়। হাসিটা আড়ালও হতে পারে। তবু, ওঁকে হালকা করার চেষ্টায় লীনা বললেন, 'তোমার বাবার মাথায় টাক ছিল না, দাদার হল। তোমার বাবা-মা কারুর ডায়াবিটিস ছিল, এমনও তো শুনিনি।'

'বাবা একাম্নোয় মারা যান। ফার্স্ট অ্যাটাকেই। কী ছিল না ছিল কে বলবে।'

'তা হলেই দ্যাখো। ভগবান করুন কিছু না হোক, দাদা তো সত্তর পেরিয়ে গেলেন।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন সুশোভন। তারপর বললেন, 'আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন একশো তিন বছর বেঁচে ছিলেন। দাদাই গল্প করেছিল। কবে? হ্যাঁ, ওই ফার্স্ট অ্যাটাকের পর। নার্সিংহোমে। বলল, দেখিস, আমিও কাছাকাছি যাব—'

'মনের জোর একটা বড় ব্যাপার।'

দীর্ঘ হুইসল বাজিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। শব্দের গতি অনুসরণ করলে মনে হয় শিয়ালদার দিকে। বেয়াড়া হর্ন বাজাতে বাজাতে একটা রিক্সা চলে গেল বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে। ওই দুটি শব্দের সূত্র ধরেই লীনা খেয়াল করলেন কিছুক্ষণ আগে শোনা টি-ভির শব্দ এখনও থামেনি।

সুশোভনের চোখ এখনও রাস্তার দিকে। আগের কথাবার্তার খেই হারিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মণ্টুকে কোথাও পাঠিয়েছিলে নাকি?'

'কেন?'

'ফিরছে—'

'চা শেষ হয়ে গিয়েছিল। কাল সকালে আনালেও চলত অবশ্য—।' লীনা তাঁর ব্যস্ত হবার কারণটা এড়িয়ে গেলেন, 'চা খাবে? করে দেব?'

'নাঃ। ইচ্ছে করছে না।'

'তা হলে বরং খেয়ে নাও?'

'এখন!' গ্রিলের কাছ থেকে সরে এলেন সুশোভন। চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, 'হিন্দি নিউজ শুরু হল মনে হচ্ছে। ন'টা বাজতে চলল পুতু এখনও ফিরল না।'

'ফিরবে। অতটা রাস্তা।' একটু থেমে, নিজের ভাবনার জের টানলেন লীনা, 'না ফিরে বরং থেকে গেলেও পারে—'

'একটা খবর দেবে তো!'

আবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন সুশোভন। বারান্দা থেকে উঠে গেলেন ঘরে। টেলিফোনের সামনে। দু বার ডায়াল করে বিরক্ত গলায় বললেন, 'ইমপসিবল! সারাক্ষণ এনগেজড— এনগেজড—এনগেজড—!'

ততক্ষণে লীনাও উঠে এসেছেন ঘরে।

'অসুখ-বিসুখের বাড়ি। হয়তো ফোন করছে কাউকে।'

'এতক্ষণ ধরে!' রিসিভারটা শব্দ করে নামিয়ে রাখলেন সুশোভন, 'পুতুরও তো একটা সেনস অফ রেসপনসিবিলিটি থাকবে! ওর বোঝা উচিত আমরা ভাবব।'

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও উদ্বিগ্ন হলেন লীনা। সুশোভন স্বভাবে ধীর। নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন না সহজে। আজ ওঁকে অন্যরকম লাগছে, সামান্য কথাতেও ফুটে উঠছে অধৈর্য। সত্যিই সমস্যা হল। যেরকম শুরু করেছেন তাতে দাদার খবর কিংবা পুতুর ফিরে আসা— দুটোর একটা না হলে অস্থিরতা বাড়বে ক্রমশ।

লীনা অন্য কথা ভাবলেন। বলবেন না ভেবেও বললেন, 'ওদেরই টেলিফোন খারাপ হল না তো!'

'নাও। এও আর এক পাজল। হতে পারে—। কলকাতায় সবই সম্ভব।' চশমার ফ্রেমটা কানের ওপর ঠিকঠাক বসাতে বসাতে ভাবনার সময় নিলেন সুশোভন। তারপর বললেন, 'যতীনবাবুর বাড়িতে যাই একবার। কী বলো? নাকি ওদের ফোনও খারাপ?'

'শোনো, অত ছটপট করার কিছু নেই।' দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন লীনা, 'এখনও ন'টা বাজতে দেরি আছে। গেলে পনেরো বিশ মিনিট পরে যেও। দশটার আগে ওঁরা ঘুমোন না।'

সুশোভন জবাব দিলেন না। চিন্তিতভাবে এসে বসলেন খাটে।

'আমি বলি তুমি খেয়ে নাও। তারপর যা করার কোরো। আমাকে তো পুতুর জন্যে অপেক্ষা করতেই হবে।'

'ঠিক আছে, দিয়ে দাও।'

রুটিন মানার জন্যে ডাইনিং টেবিলে বসলেও সুশোভনের খাওয়ার ধরনেই বোঝা গেল রুচি নেই, ইচ্ছেও নেই। মাংসের স্টু দিয়ে দুটো রুটি খেলেন, তৃতীয় রুটিটা খাবার আগে স্বভাববিরুদ্ধ ভাবে হাত বাড়ালেন জলের গ্লাসের দিকে। দৃষ্টিও অন্যমনস্ক।

ঠিক সেই সময় ঘরের মধ্যে টেলিফোন বেজে উঠল।

একবার, দুবার। বাজছে। শব্দটায় কান রেখে হঠাৎ স্তব্ধতা ছড়িয়ে পড়ল দুজনেরই মুখে। যেন কেউই ধরার ভরসা পাচ্ছেন না।

তারপর, সুশোভন খেতে খেতেই উঠছেন দেখে লীনা বললেন, 'তুমি বোসো। আমি দেখছি—'

রিসিভার তুলে খুব চাপা গলায় কথা বলছেন লীনা। কী বলছেন তা শোনা যায় না এখান থেকে। খানিক কান খাড়া করে রেখে, সামনে আর কিছু না পেয়ে জলের গ্লাসে হাত ডুবিয়ে সুশোভনও উঠে এলেন ঘরে। পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার ফোন?'

'তুমি দ্যাখো তো।' রিসিভারের মুখ চাপা দিয়ে লীনা বললেন, 'কে বলছে বুঝতে পারছি না। এখুনি যেতে বলছে।'

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন সেখান থেকে প্রায় দৌড়ে এসে লীনার হাত থেকে রিসিভারটা নিয়ে কানে চেপে ধরলেন সুশোভন।

'হ্যালো!'

'—'

'হ্যালো। জোরে বলুন।'

উদ্বিগ্ন মুখে রিসিভারটা কান বদল করতে করতে লীনার দিকে তাকালেন সুশোভন।

'—'

'হ্যাঁ, আমিই সুশোভন মুখার্জি—'

'—'

'হ্যাঁ, বলুন। পাশের বাড়ি। বুঝেছি।'

'—'

'আমার মেয়ে, ইনা—'

'—'

'আমার দাদা—'

'—'

'খুব ক্রিটিকাল?'

'—'

'ও, আচ্ছা। আমরা আসছি কিছুক্ষণের মধ্যে—'

'—'

'না। নার্ভাস হইনি। আচ্ছা, ধনবাদ।'

রিসিভারটা আস্তে নামিয়ে রাখলেন সুশোভন। দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপচাপ। যেন এখনও কান পাতা আছে টেলিফোনের আলাপে। কপালে চিকচিক করছে ঘাম। মনে হয় ঠোঁটও কাঁপছে। চশমাটা চোখ থেকে খুলে গেঞ্জির আগায় কাচ মুছতে মুছতে তাকালেন স্ত্রীর দিকে।

'চলো। যাওয়াই যাক। দাদার কন্ডিশান একটু ডেটরিয়েট করেছে—'

'কে ফোন করল?'

'নরেশ। পাশের বাড়িতে থাকে। অর্জুনের বন্ধু—'

লীনাব গলার স্বর পাল্টে গেল হঠাৎ। ঢোঁক গিলে বললেন, 'খারাপ অবস্থা?'

'না। তা বলেনি। দুজন ডাক্তার আছে। নার্ভাস হতে মানা করল।'

সুশোভন দাঁড়ালেন না। সম্ভবত আড়াল করতে চাইছেন নিজেকে—নার্ভাসনেসের জন্যে যতটা না, তার চেয়ে বেশি আবেগে। বারান্দায় বেরিয়ে আবার দু-হাতের মুঠোয় গ্রিল ধরে তাকিয়ে থাকলেন আকাশের দিকে।

অবস্থা ক্রিটিকাল নয়। মানা করেছে নার্ভাস হতে। তবু যেতেও বলেছে। কথাগুলো জুড়লে একটা অর্থ দাঁড়ায়। লীনা সেই অর্থটাই খুঁজলেন। এবং ভাবলেন, এসব খবর দেবার সময় লোকে কমিয়েই বলে। খবরটা দাদার দুই ছেলে, অশোক বা অর্জুন, কিংবা ইনা জানালে গলার স্বর শুনে বোঝা যেত কতটা সিরিয়াস। এক্ষেত্রে নরেশ না কে ফোন করল, সে তো বাইরের লোক। খবরটুকুই দিয়েছে। তার মানে কি সিরিয়াস?-

পিছন থেকে সুশোভনকে দেখতে দেখতে দরজায় দাঁড়িয়ে লীনা জিজ্ঞেস করলেন, 'পুতু কি ওখানে?'

'আর কোথায়। বাড়ির টেলিফোনে পাচ্ছে না, তাই ওকে খবর দিতে বলেছে—'

সুশোভন ফিরে দাঁড়ালেন। এরই মধ্যে বদলে গেছে মুখের চেহারা। বললেন, 'জামাকাপড় দাও। মন্টুকে বলো ট্যাক্সি ডাকতে। অনেকটা রাস্তা।'

সওয়া ন'টা নাগাদ যাদবপুরে নিজেদের বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে উঠলেন দুজনে। তাড়াহুড়োয় পায়জামা পরেছেন সুশোভন, গায়ে সকালে পরা খদ্দরের পাঞ্জাবি। লীনা যা পরেছিলেন তা-ই। গোড়ার দিকে বসবার ধরনে যে-চাঞ্চল্য ছিল, কিছু দূর যেতে না যেতেই শান্ত হয়ে এল তা। ট্যাক্সিটা গুরুসদয় রোডে বাঁক নেবার সময় সুশোভন শুধু বললেন, 'বলেছিলাম না, পূর্ণিমা অমাবস্যা বড় খারাপ।'

হাত বাড়িয়ে স্বামীর মুঠোটা চেপে ধরলেন লীনা।

'আগে থেকেই খারাপ ভাবো কেন।'

'কী করব! মন বলছে—'

গলা বুজে এল সুশোভনের। ওঁর মুখের আলো-আঁধারির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজের চোখেও জ্বালা অনুভব করলেন লীনা। শ্বশুর, শাশুড়িকে দেখেছেন ছবিতে। শ্বশুরবাড়ি বলতে স্মৃতির সবটাই জুড়ে আছেন চিন্মোহন। বিয়ের পরদিন বলেছিলেন, 'সুশোভন আমার ছোট ভাই। লোকে বলে আমি ওর বাবার মতো। তা তুমিও ওর মতোই ভেবো। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন যেন তোমাদের সুখী দেখি।'

রাস্তার দিকে তাকাবার সুযোগে শাড়ির আঁচল তুলে চোখ মুছলেন লীনা। আশ্চর্য, এতগুলো বছর কেটে গেল, প্রায় যুবক চিন্মোহনকে ক্রমশ বুড়োও হতে দেখলেন, কিন্তু আলাদা ভাবে কখনও মনে হয়নি মানুষের বয়স বাড়ে, মানুষ রোগে ভোগে, মানুষেরই মৃত্যু হয়। ভগবান না করুন, তবু চিন্মোহনের কিছু হলে তাঁদের জীবনও কি পাল্টে যাবে না অনেকটা! বয়স তো সুশোভনেরও হয়েছে। বেশি বয়সের বিয়ে, সন্তানও এসেছে দেরিতে। চিন্মোহনের খুব ইচ্ছে ছিল ইনার বিয়েটা দেখে যাবেন। সেই সাধ কি পূর্ণ হবে না!

সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে অনেকটা এগিয়ে এসে ট্যাক্সিটা কোনাকুনি ডানদিকের রাস্তা ধরতে সচকিত হলেন দুজনে। অন্ধকারে কব্জি তুলে ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করলেন সুশোভন। ভঙ্গিতে উৎকণ্ঠা। যেন যা দৃশ্য নয় তাকেও তুলে আনতে চাইছেন দৃষ্টিতে।

এখান থেকে দেখা যাচ্ছে বাড়িটা। সামনে গোটা দুয়েক গাড়ি দাঁড়ানো। ওঁরা পৌঁছুবার আগেই একটি ট্যাক্সি এসে থামল ওখানে, দুজন মহিলা এবং একটি যুবক তাড়াতাড়ি ঢুকে গেল বাড়ির ভিতরে। কারা যেন বেরিয়ে আসছে, গাড়িতে তুলে দিচ্ছে একজনকে। চাপা গলায় সুশোভন বললেন, 'অর্জুন না?'

লীনারও মনে হল অর্জুনই। জবাব দিলেন না।

আরও দুজন বেরিয়ে আসছে ভিতর থেকে। একজন থেমে দাঁড়িয়ে হাত রাখল অর্জুনের কাঁধে। ওখান পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই সুশোভন বললেন, 'ব্যস, ব্যস। বাঁদিকে।'

আস্তে হতে হতে ট্যাক্সিটা তবু বাড়ির সামনে গিয়েই থামল।

একটু আগেও সুশোভনের মধ্যে যে-উৎকণ্ঠা দেখা গিয়েছিল এখন আর তা নেই। এমনও হতে পারে চেষ্টা করেই সংযত রাখছেন নিজেকে। ভাড়া জানলেন। টাকা বের করে দিলেন গুনে গুনে। দরজা খুলে নামতে নামতে বললেন, 'এসো—'

ওদের দেখে এগিয়ে এল অর্জুন। ট্যাক্সি থেকে নেমে ওপরে তাকিয়ে লীনার চোখে পড়ল দোতলার জানলায় মুখ ঠেসে নীচে তাকিয়ে আছে অর্চনা। অর্জুনের স্ত্রী। চোখাচোখি হতেই সরে গেল।

এসব দৃশ্য কি বোঝায় কিছু? কিছুটা এগিয়ে যাওয়া সুশোভনকে অর্জুন কী বলল শোনা

গেল না; কিন্তু নিজের জায়গা থেকেই দেখলেন এক হাতে সুশোভনের হাত জড়িয়ে ধরেছে অর্জুন, পিছনে তাকিয়ে অপেক্ষা করছে তাঁরই জন্যে। সুশোভনের মুখ দরজার দিকে ফেরানো।

'এসো, কাকিমা। দশ মিনিট হল—'

কথা শেষ করল না অর্জুন।

এগোতে এগোতে হঠাৎই অদ্ভুত গলায় বলে উঠলেন সুশোভন, 'আজ তো পূর্ণিমা নয়। তা হলে এত তাড়া কেন! আমার জন্যে অপেক্ষাও করল না।'

দোষটা সম্ভবত তাঁর। ভাবলেন লীনা। তখন সুশোভনকে আটকে রাখার জন্যে ইনাকে না পাঠিয়ে যদি নিজেরাই চলে আসতেন, তা হলে সুশোভনের এই আক্ষেপ শুনতে হত না। মনে হচ্ছে এখন ওঁর সমস্ত ভাবনা ঘোরাফেরা করছে একটিই বৃত্তে। হয়তো এইরকমই করবে।

দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে অর্জুনের কাঁধে মুখ গুঁজে নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করছেন সুশোভন। কান্না নয়, অনুচ্চ একটা গোঙানি জড়িয়ে কাঁপছে পিঠটা। ওই অবস্থাতেই ওঁকে ধরে ওপরে উঠতে লাগল অর্জুন। ওদের পাশ কাটিয়ে নেমে আসছে অর্চনা। দেখতে দেখতে ডানদিকে আড়াল হয়ে গেল ওরা। আর কয়েক পা এগোলেই দাদার ঘর। শেষ দেখা হয়েছিল দিনে আষ্টেক আগে। সকালে। ওই ঘর থেকেই বেরিয়ে এসেছিলেন খবরের কাগজ হাতে।

সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন লীনা। বড়দিকে মনে পড়ল। জবা চিন্মোহনের স্ত্রী। এখন কোথায়? সিঁথিতে শিরশিরানি অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো জলে ভরে উঠল লীনার। দাঁড়িয়ে পড়লেন রেলিং ধরে। অর্চনা এসে ওঁর হাত ধরে টানতেই বললেন, 'আমি ঠিক আছি, মা। তোমরা ওঁকে দ্যাখো। শেষ দেখাটাও হল না!'

কয়েক মুহূর্ত ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকলেন লীনা।

অর্চনা দরজার দিকে এগিয়ে গেল। বাইরে তাকিয়ে কী খুঁজল যেন। ওখান থেকেই জিজ্ঞেস করল, 'ইনা এল না?'

'ইনা!' সারা শরীরে শিহরন ছুটে গেল লীনার। রেলিংটাকে আরও শক্ত করে ধরার চেষ্টায় ঘোমটা ভেঙে পড়ল পিঠে। স্থির দৃষ্টিতে অর্চনার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পুতু তো এখানে!'

'না তো!' অর্চনা বলল, 'আপনারা চিন্তা করবেন বলে ও তো সন্ধের আগেই চলে গেল। ও নিজে উঠিয়ে দিয়ে এসেছে বাসে!'

'কী বলছ, বৌমা!' পরের কথাগুলো আটকে গেল লীনার গলায়। কোনওরকমে ঢোঁক গিলে বললেন, 'সন্ধে কি এখন হয়েছে!'

২

চিন্মোহন মারা গেছেন এবং ইনা কোথায় জানা যাচ্ছে না ঠিক, দুটি ঘটনার মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি, কিছুক্ষণ কেউই তা বুঝতে পারল না। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে লীনা ও অর্চনার কথোপকথনের পরেই শুরু হয়ে গেল চাঞ্চল্য।

সন্ধে নাগাদ যে-মেয়ে রওনা হয়েছে, বাসস্টপ পর্যন্ত গিয়ে নিজেই যাকে বাসে তুলে

দিয়েছে অর্জুন, এখান থেকে যাদবপুরে পৌঁছুতে তার এক ঘন্টা কি সওয়া ঘন্টার বেশি সময় লাগার কথা নয়। শনিবার বিকেলের পর রাস্তা ফাঁকাই থাকে প্রায়; আজ কোনও মিছিল-টিছিলেরও খবর ছিল না। সুতরাং জ্যামে আটকে পড়বে এমন সম্ভাবনাও নেই। একটাই ব্যাপার। বাসটা যেত বালিগঞ্জ স্টেশন পর্যন্ত, অর্থাৎ ইনাকে নামতে হত গড়িয়াহাটে, সেখান থেকে বাসে বা মিনিবাসে যাদবপুর। এমন কী হতে পারে যে গড়িয়াহাটে নেমে ইনা আর কোথাও গেল, কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়ি, সেখান থেকেই ফিরতে দেরি হয়েছে— ইতিমধ্যে ফোন পেয়ে বাগবাজারের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন সুশোভন ও লীনা, তাই দেখা হয়নি মেয়ের সঙ্গে?

অর্চনা এইভাবেই যুক্তি সাজাবার চেষ্টা করল।

প্রাথমিক আশঙ্কা কাটিয়ে লীনা ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন নিজেকে। অর্চনাকে বললেন, 'এই অবস্থায় এত দেরি করবে! তা ছাড়া তোমাদের পাশের বাড়ি থেকে যে ফোন করে খবর দিল—'

'ফোন করেছিল! কে?'

'কী যেন নাম! নরেশ কি?'

'কতক্ষণ আগে?'

সঠিক সময়টা আন্দাজ করবার চেষ্টা করে লীনা বললেন, 'ন'টা নাগাদ—'

'নরেশবাবু? আপনাদের ফোন করেছিলেন?'

'না হলে জানব কী করে যে এমন অবস্থা!'

সোজা চোখে লীনার এরই মধ্যে ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল অর্চনা। ধরনটা কিছু আঁচ করার। তারপর বলল, 'আপনি ওপরে চলুন, কাকিমা। ইনা বাড়িতেই গেছে। অত চিন্তিত হবার কিছু নেই। আমি ওকে বলছি, খোঁজ নিয়ে দেখুক। কাকাকে এখন কিছু বলবার দরকার নেই।'

ওরা ওপরে গেল।

সত্তর-পেরুনো পরিণত বয়সে একজনের মৃত্যু হলে সংসারে যতটা শোকের আবহাওয়া থাকা উচিত, এ ক্ষেত্রেও তার বেশি নেই। তফাত এইটুকু, বদলে গেছে বাড়ির হাবভাব, প্রয়োজনের বাইরে কেউই কথা বলছে না কোনও। স্তব্ধতা চেনা যায়।

যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন সাধ্যমতো সংসারের হাল ধরেছিলেন চিন্মোহন। মধ্যবিত্ত জীবন তাঁর, আস্তে আস্তে গুছিয়ে তোলার মধ্যে দিয়ে ক্রমশ এগিয়েছিল পূর্ণতার দিকে। দেখে মনে হত না আক্ষেপ ছিল কোনও। নিজের বাড়ি। দুই ছেলেই প্রতিষ্ঠিত এবং বিবাহিত। নাতি-নাতনি এসে গেছে, অবসর জীবনের শেষদিকে বেশিটা সময়ই কাটত এদের নিয়ে। স্ত্রী জবারও বয়স হয়েছে, স্বভাবে এসেছে বয়সোচিত মন্থরতা। এই পরিস্থিতিতে বিদায় চিহ্নিত হয় শুধুই স্মৃতির কষ্টে, নিঃসঙ্গতার বোধে। শোকও হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত। স্বভাবে দুই ছেলেরই বাবা-কাকাদের ধরন—যে-বাস্তব মেনে নেওয়া উচিত ধীরস্থির ভাবে, ওদের এই মুহূর্তের আচরণে তা নিয়ে বাহুল্য নেই কোনও। বরং সুশোভনকেই হঠাৎ ভেঙে-পড়া লাগছে। যত দুর্ভাবনাই থাক, বাড়ি থেকে রওনা হবার সময়েও ভাবেননি শেষ মুহূর্ত আসন্ন। সম্ভবত সেইজন্যেই।

সুশোভনকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসিয়েছে অশোক। সঙ্গ দিচ্ছে। বিমূঢ় সুশোভনের

মনে ইনা সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই দেখা দিল না।

লীনাকে চিন্মোহনের ঘরে নিয়ে গেল অর্চনা। যে-বিছানায় শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন চিন্মোহন সেখানেই শায়িত তিনি। মুখে কোথাও নেই সামান্য যন্ত্রণার চিহ্ন। গলা থেকে পা পর্যন্ত চাদরে ঢাকা। বুকের ওপর একটা ছোট, লাল মলাটের গীতা। ধূপ জ্বলছে ধূপদানিতে। মৃতের আশপাশে সাধারণ যে ওষুধের গন্ধ মেশানো এক ধরনের পাঁশুটে গন্ধ থাকে, এ ঘরে তা নেই। থাকবার কথাও নয়। অসুখে ভোগেননি, দুপুর পর্যন্তও ঠিক ছিলেন চিন্মোহন; তারপর হঠাৎই শুরু হল টানাপড়েন। রাত দশটা বাজতে না বাজতেই শেষ।

পাশের খাটের মাথার দিকে বালিশে ঠেস দিয়ে বসে আছেন জবা। তাঁকে ঘিরে জবার ছোট বোন শোভা ও তার মেয়ে—লীনার মনে পড়ল একটু আগে এদেরই নামতে দেখেছিলেন ট্যাক্সি থেকে। অশোকের স্ত্রী বনানীও ছিল এ ঘরে, ব্যস্তভাবে বেরিয়ে গেল। লীনা দেখলেন দৃষ্টি স্থির হয়ে আছে জবার, কথা বলছেন না একটিও। ছিপছিপে চেহারা ও টিকালো মুখের গড়নে একদা যে সৌন্দর্য ছিল এখন তার অল্পই আছে, বার্ধক্যের রেখা পড়েছে মুখে, পাক ধরেছে চুলে। আটপৌরে শাড়ির আঁচল এলোমেলো ভাবে কাঁধের ওপর ফেলা। চুল খোলা। সকালে পরা সিঁদুর এখনও টাটকা হয়ে আছে সিঁথিতে। তাঁকে দেখে হতাশ ধরনে মাথাটা নাড়লেন শুধু।

লীনা জবার পাশে গিয়ে বসলেন। ওঁর এলানো হাতটা টেনে নিলেন নিজের কোলে, সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে হাত বোলাতে লাগলেন হাতে। একটা আবেগ আসতে গিয়েও এল না। শুধু মনে পড়ল, প্রায় আঠাশ বছরের সম্পর্ক তাঁদের। বিয়ের পর লীনা যেদিন সুশোভনের স্ত্রী হয়ে এলেন মুখার্জি পরিবারে, সেদিন জবাই বরণ করেছিলেন তাঁকে। তখন থাকতেন শ্যামপুকুর স্ট্রিটের ভাড়া বাড়ির একতলায়; চারটি ঘর, রান্নাঘর ও উঠোন নিয়ে। অশোক তখন কিশোর, অর্জুনও খুব ছোট নয়। সুশোভন পড়ান বর্ধমানের কলেজে। সকালে বেরুতেন, রাত হত ফিরতে ফিরতে। ডেলি প্যাসেঞ্জার। চিন্মোহন ছেলেদের সঙ্গে সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে শুতে চলে গেলেও সুশোভনের ফেরার অপেক্ষায় বারান্দায় বসে থাকতেন দুই জা। কত যে গল্প। গায়ে গা ঘেঁষে বসার সেইসব অন্তরঙ্গ মুহূর্তে এক একদিন চাঁদ নেমে আসত কোলে। বস্তুত দিনশেষের ওই সখ্যের সময়টুকুই যেন ভিতরের বাঁধনে বেঁধে রাখত দুজনকে। সুশোভন ফিরলে একসঙ্গে খাওয়া। রান্নাঘরের মেঝে নিকিয়ে, দরজার শিকল তুলে শুতে যেতেন জবা। কত বছর কেটে গেল।

এ বাড়িটা চিন্মোহন কেনেন বছর বারো আগে। অশোকের বিয়ে হয়নি তখনও। তারপর অশোকের বিয়ে হল। অর্জুন ফিরে এল আমেরিকা থেকে, বিয়ে হল তারও। পুতু তখনও ছোট। নিজেরা বাড়ি করে উঠে যাবার আগে এই ঘরটাতেই থাকতেন তাঁরা। চলে গেলেও আসা বন্ধ হয়নি। সুশোভন আসতেন প্রতি সপ্তাহেই, মাঝে মাঝে তিনিও। বেশি আসত ইনা। আট-দশমাস আগে পর্যন্তও শনিবার রবিবার থেকে যেত এখানে। ইদানীং কমে গিয়েছিল আসা; প্রায় ঠেলেই পাঠাতে হত মাঝে-মধ্যে। লীনার মনে হয়েছিল কৈশোরের আকর্ষণ ফিকে হয়ে আসে যৌবনে—মেয়ে বড় হচ্ছে, সাজগোজে মন দিচ্ছে, আশপাশের টান বাড়ছে ক্রমশ, বাড়ছে বন্ধুর সংখ্যা, এই সময় স্বাভাবিক নিয়মেই ঢিলে হতে শুরু করে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক।

এসব ভাবলেও শোক আচ্ছন্ন করতে পারল না লীনাকে। নিজেকে বার বার বিষাদের

অনুভূতিতে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা সত্ত্বেও ধূপের গন্ধ, চিন্মোহনের মৃতদেহ এবং জবার ম্লান সংস্পর্শজনিত সান্নিধ্য তেমন ভাবে স্পর্শ করল না তাঁকে। ঘরে থেকেই বুঝতে পারছিলেন কেউ কেউ আসছে, দরজা থেকে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। এরা পাড়ার লোক হতে পারে। অর্জুন বলেছিল মিনিট দশেক আগে মারা গেছেন চিন্মোহন; দশ মিনিটের মধ্যে খবর পৌঁছয় না সর্বত্র, রাতও একটা সমস্যা। হিসেবমতো তাঁদের কাছে যখন খবর পৌঁছয় তখনও চিন্মোহন জীবিত। প্রায় ফাঁকা রাস্তায় ট্যাক্সিটা বাধাহীন ছুটে এলেও এতটা রাস্তা আসতে কম করেও আধঘণ্টা, চল্লিশ মিনিট সময় লাগে—হতেও পারে এই সময়ের মধ্যে ইনা ফিরে গেছে বাড়িতে। মণ্টু আছে, দরজা খুলে দেবে। বাড়ি ফিরে অবশ্যই জানতে পারবে তাঁরা বাগবাজারে এসেছেন, বেরুবার আগে সেইরকমই বলে এসেছেন মণ্টুকে। এই খবরটা পেলেও চিন্মোহনের মৃত্যুর খবর পাবে না। ওকে কি জানানো উচিত? তাঁরা কি এখন এখানেই থাকবেন, নাকি ফিরে যাবেন যাদবপুরে? যদি না ফেরেন, তা হলে, চোদ্দ পনেরো বছরের মণ্টু যদিও বিশ্বস্ত ও সরল স্বভাবের, তবু একা বাড়িতে শুধু মণ্টুর হেফাজতে ওই বয়সের মেয়েকে ফেলে রাখা কি ঠিক হবে?

প্রশ্নগুলো উঠে আসছিল পর পর। মাঝপথে থেমে গিয়ে লীনা ভাবলেন, এই প্রশ্নগুলো পরের। তার আগে সত্যি-সত্যিই ইনার বাড়ি ফেরা দরকার।

গোলমালটা এইখানেই লাগছে। অর্চনা বলল বাড়ির টেলিফোন খারাপ। পাশেই থাকে অর্জুনের বন্ধু নরেশ, দরকারে ওদের বাড়ি থেকেই ফোন করছে তারা। ঘটনা মিলে যাচ্ছে। সুশোভনকে যে ফোন করেছিল তারও নাম নরেশ। বলেছিল চিন্মোহনের ক্রিটিক্যাল অবস্থা সম্পর্কে ইনাই তাঁদের জানাতে বলেছে, যাতে তাড়াতাড়ি চলে আসেন। ইনা না বললে একটি অপরিচিত লোক হঠাৎই তাঁদের নার্ভাস হতে মানা করবে কেন! এদিকে অর্চনা বলল সন্ধের আগেই ফিরে গেছে ইনা। লোকটা কি বানিয়ে বলল তা হলে। নাকি সুশোভনই ভুল শুনেছেন। যে ফোন করেছিল তার গলার স্বর পরিষ্কার শোনা যাচ্ছিল না, মনে হচ্ছিল আশপাশে আরও কেউ কেউ কথা বলছে—নিজে ফোন ধরে ঠিকঠাক বুঝতে না পেরে রিসিভারটা সুশোভনকে এগিয়ে দিয়েছিলেন লীনা।

কিন্তু প্রশ্নটা তারও আগের। এই ফোনটা পাবার প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগে ইনা জানিয়েছিল ভয় পাবার কিছু নেই, সেই কল তিনি নিজেই ধরেছিলেন। তখন টি-ভিতে বাংলা খবর চলছিল। তার মানে ইনার ফোন এসেছিল সাড়ে সাতটারও পরে। সে-সময়টাকে 'সন্ধের আগে' বলা যাবে না। তা হলে ওই সময় কোত্থেকে ফোন করল ইনা? এমনকী হতে পারে যে বাস থেকে নেমে কোনও বন্ধু-টন্ধুর কাছে গিয়েছিল পুতু, তাঁদের নিরুদ্বিগ্ন করতে ফোনও করেছে সেখান থেকে?

সেটাই বা কীরকম ব্যাপার! ও যে বাগবাজার থেকে চলে এসেছে, বন্ধুর বাড়িতে, ফিরতে দেরি হবে, এসব জানাল না কেন! তাঁদের উদ্বেগ কি শুধু চিন্মোহনের জন্যেই! পুতুও জানে তা নয়।

দিন পনেরো আগে যেদিন চ্যাঁচামেচি করলেন সুশোভন, সেদিনও মেয়েকে ভাল-মন্দ বোঝাতে বোঝাতে লীনা বলেছিলেন, 'কোথায় যাচ্ছ না যাচ্ছ জানিয়ে যাবে সবসময়। যেখানেই যাও সন্ধের আগে বাড়ি ফিরবে। বাবার বয়স হয়েছে, শরীর ভাল নয়, একটুতেই চিন্তা করেন, এগুলো ভুলে যেও না।'

'তুমি এমনভাবে বলছ, মা, যেন আমি যখন-তখন বেরিয়ে যাই—রোজই রাত করে ফিরি।' ইনা বলেছিল, 'যাওয়ার মধ্যে তো টুংকাদের বাড়ি, কিংবা ঝুমুরের বাড়ি। টুংকা তো পাশেই থাকে। ওকে ডেকে জিজ্ঞেস করো না।

'মাত্র দুটো জায়গা। সেদিন কলেজ থেকে সল্টলেক না কোথায় গিয়েছিলি?'

'হ্যাঁ। ইন্দ্রাণীর বাড়ি। ওর বার্থ-ডে ছিল। একা যাইনি, দল বেঁধে।' ক্ষুণ্ণ গলায় ইনা বলল, 'সব মনে থাকে। খাতায় টুকে রাখো নাকি। টুংকাদের গাড়ি পৌঁছে দেয়নি বাড়ি পর্যন্ত?'

টুংকার কথায় লীনার মনে হল, এটা একটা সম্ভাবনা হতে পারে। তাঁদের বাড়ি থেকে কয়েক পা এগিয়ে বড় রাস্তায় পড়ার মুখে অ্যাডভোকেট বীরেন দত্তের বাড়ি। টুংকা বা শর্মিলা বীরেনবাবুর মেয়ে, পুতুর সঙ্গে পড়ে। দুজনে একসঙ্গে কলেজে যায়, ফেরেও একসঙ্গে। যখন-তখন যাতায়াত করে এ-ওর বাড়ি। মাঝে যখন তাঁদের টি-ভি খারাপ হয়ে গেল—পিকচার টিউব বদলাতেই লেগে গেল একমাসের ওপর, তখন 'বুনিয়াদ' বা অন্য কোনও সিরিয়াল দেখার জন্যে পুতু প্রায়ই চলে যেত টুংকাদের বাড়ি। ফিরত সিরিয়াল শেষ হয়ে যাবারও বেশ কিছুক্ষণ পরে। দেরি দেখে ডেকে আনার জন্যে প্রায়ই পাঠাতে হত মণ্টুকে।

একদিন রাগ করে বলেছিলেন লীনা, 'বাড়ির গায়ে যতীনবাবুর বাড়ি, ওখানে গিয়ে দেখলেই পারিস। রত্নাদিও তো যেতে বলেন কতবার!'

'বুড়ি তোমার বন্ধু, আমার নয়।' ইনা বলেছিল, 'আমি আমার বন্ধুর বাড়িতেই যাব।'

মেয়ের জবাব শুনে হেসেছিলেন সুশোভন। যতীনবাবু ও তাঁর স্ত্রী দুজনেই কথা বলেন অনর্গল, টি-ভি দেখতে দেখতেও পর্দায় কী ঘটছে না ঘটছে রানিং কমেন্টারি দিয়ে যান। কী কাজে একদিন সন্ধেয় ওঁদের বাড়ি গিয়ে নিজেও ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন সুশোভন। ওঁদের সঙ্গ ইনার পছন্দ হবার কথা নয়। বলেছিলেন, 'যাক, টুংকাদের ওখানেই যাক। দূরত্ব তো উনিশ বিশ। তবে লোডশেডিং হলে একা ফেরার চেষ্টা করিস না। আমি গিয়ে নিয়ে আসব।'

এটাই সম্ভাবনা। বাসস্টপের কাছেই টুংকাদের বাড়ি। হঠাৎ দেখাও হয়ে যেতে পারে দুজনে এবং তারপর—

লীনা আবারও আটকে গেলেন। যদি বাস থেকে নেমে টুংকাদের বাড়ি যায় এবং ওখান থেকে ফোন করে থাকে, তাহলেও, যতই আড্ডা দিক, সাড়ে-আটটা ন'টার মধ্যে বাড়ি ফেরা উচিত ছিল ওর, সুশোভন খেতে বসবার আগেই। আসেনি। তাঁরা যখন ট্যাক্সিতে ওঠেন তখন সওয়া ন'টা বেজে গেছে।

এখন ঠিক ক'টা?

ছটফটে দৃষ্টিতে ঘরের চারদিকে তাকালেন লীনা। টাইমপিসটা সাধারণত যেখানে থাকে সেখানে নেই, তার বদলে জায়গা নিয়েছে কয়েকটা ওষুধ, ইঞ্জেকশনের বাক্স। চিন্মোহনের ডানদিকে দেয়াল ঘেঁষে অক্সিজেন সিলিন্ডার দাঁড় করানো। হাঁফানি ছিল, হার্ট অ্যাটাক ছাড়াও নিঃশ্বাসের অসুবিধা দেখা দিয়েছিল হয়তো। কিন্তু, এখন সময় কত? তাঁরা এসে পৌঁছবার পরেও পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেছে সম্ভবত। নাকি আরও বেশি। হতে পারে। মৃত্যুজনিত স্তব্ধতা কি সময়ও থামিয়ে রাখবে। অর্চনা চিন্তা করতে মানা করল, বলল অর্জুনকে বলছে। বারণ করল সুশোভনকে কিছু জানাতে। কিন্তু, চিন্মোহনের হঠাৎ মৃত্যুতে যতই কাতর হোন সুশোভন, ঘটনাটা কি জানানো উচিত নয় তাঁকে? বাড়িতে যেমন ব্যস্ত

হয়ে উঠেছিলেন, তাতে ওঁরই তো আগে খোঁজ করবার কথা। কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হল না তো মেয়েটার।

হঠাৎই ঘোর কেটে গেল লীনার। দ্রুত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। এতক্ষণ ধরে যা-কিছু ভেবেছেন সবই সাধারণ ভাবনার জের টেনে—যে-কোনও সূত্রকেই মনে হচ্ছিল কমজোর, ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সুতরাং ধন্দও বাড়ছে। কিন্তু এইমাত্র যা মনে পড়ল, অ্যাক্সিডেন্ট—এই একটি সম্ভাবনাই দাঁড়াতে পারে শেষ পর্যন্ত। সমাধান করে দিতে পারে সব প্রশ্নের। কে কখন কোথা থেকে ফোন করল তা নিয়ে তাঁর মাথা ঘামানোর কিছু নেই। চিন্মোহনকে নিয়ে যে উদ্বেগ ছিল মৃত্যুতেই শেষ হয়েছে তার—শোক, হা-হুতাশ, সৎকারের ব্যবস্থা, এখন সবই চলবে নিয়ম ধরে। এই মুহূর্তে এসবের চেয়ে বড় সঙ্কট ইনাকে নিয়ে। তাঁরা যাদবপুর থেকে রওনা হবার পর থেকে এখন পর্যন্ত কী ঘটেছে তা জানা যাচ্ছে না। কিন্তু ইনা যদি এখনও না ফিরে থাকে বাড়িতে, তা হলে ধরে নিতে হবে—

এর পরে কী করণীয় তা বুঝতে না পেরে জবুথবু বোধ করলেন লীনা। অপরিচিত তাপে ছেয়ে যেতে লাগল মাথা।

সেই সময় বনানী ঘরে ঢুকল। হাতে সরবতের গ্লাস। জবার সামনে এসে বলল, 'মা, এটুকু খেয়ে নিন—'

জবা কিছুই বললেন না। ভঙ্গিতেও পরিবর্তন হল না কোনও।

'খেয়ে নিন। বিকেল থেকে তো কিছু খাননি।'

মাথায় এখন ইনা ছাড়া কিছু নেই, তবু, ওদের কথাবার্তা শুনে লীনা ভাবলেন, তাঁর এমন উদাসীন হয়ে পড়া কি ভাল! তাঁরও কি কিছু বলা উচিত নয়?

নিজের দুশ্চিন্তা পাশ কাটিয়ে লীনা বললেন, 'বড়দি, খেয়ে নাও। সামান্য সরবত তো!'

'ইচ্ছে করছে না।' অনেকক্ষণের জড়তা কাটিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন জবা, 'সকালে কাগজ পড়তে পড়তে বলেছিলেন মাংসের স্টু খেতে ইচ্ছে করছে কয়েকদিন থেকে। বলেছিলাম রাত্রে করে দেব। ফ্রিজে মাংস ছিল। কী যে ভীমরতি হল—বললাম রাত্রে করে দেব। মুখ ফুটে তো কখনও কিছু বলতেন না!'

জবার কান্নায় উথলে ওঠা নেই। কথাগুলো যেখানে শেষ করার সেখানেই শেষ করে আঁচল চাপা দিলেন চোখে। মাথাটা ঝুঁকিয়ে আনলেন সামনে।

'তোর তো তবু ভাগ্য, দিদি।' শোভা বলল, 'হঠাৎ হল, কোনও কষ্ট পেতে হল না জামাইবাবুকে। আমার কথা ভাব!'

শোভা নিজেও চোখ মুছছিল। নিজেকে সংযত করে নিয়ে হাত বাড়িয়ে শোভার হাতে চাপ দিলেন জবা। ভঙ্গিতে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা। লীনার খেয়াল হল অল্প বয়সে বিধবা হয়েছে শোভা, পাকস্থলীর ক্যান্সারে বহুদিন ভুগেছিলেন ওর স্বামী জীবনলাল। শেষদিকে এমন অবস্থা হয়েছিল যে জবা-চিন্মোহনই চিকিৎসার খরচ জোগাতেন। এই মেয়ে, তনু তখনও স্কুলের পাট শেষ করেনি। এখন চাকরি করে। ছেলে রতনও বছর দুয়েক হল ঢুকেছে চাকরিতে। ভাগ্য বলতে শোভা হয়তো দুই বোনের অবস্থার পার্থক্যটা বোঝাতে চাইল। যত বয়সই হোক, প্রিয়জনের চলে যাওয়া কখনওই ভাগ্যের ব্যাপার হতে পারে না; তবু, হয়তো ঠিকই বলেছে শোভা, লীনা ভাবলেন, চিন্মোহন-জবার জীবনে কোনও দিনই অনিশ্চিতি আসেনি—শান্তির জীবন থেকে শান্তিতেই চলে গেলেন চিন্মোহন।

লীনার দৃষ্টি মৃত চিন্মোহনের মুখের ওপর স্থির হয়ে থাকল।

বনানী তখনও দাঁড়িয়ে। ওর হাত থেকে শরবতের গ্লাসটা নিয়ে শোভা বলল, 'আমাকে দাও। আমি খাইয়ে দিচ্ছি।'

বনানী চলে যাচ্ছিল। হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ধরনে থেমে দাঁড়াল।

'কাকিমা, ঠাকুরপো একবার ডাকছিল আপনাকে—'

লীনা তখনই উঠলেন। বনানীর পিছনে পিছনে ব্যস্তভাবে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

'কাকিমা, আপনারা তো খেয়ে আসেননি?' বাইরে এসে বনানী জিজ্ঞেস করল, 'অল্প কিছু খেয়ে নেবেন?'

'উনি কোথায়?'

'আমাদের ঘরে। আমার দাদা এল এইমাত্র। কফি দিয়েছি সকলকে।'

'উনি খেয়ে এসেছেন।' লীনা বললেন, 'আমি খাব না, মা। মেয়েটাকে নিয়ে ভাবনা হচ্ছে।'

'শুনেছি। ঠাকুরপো বলছিল। মনে হয় মাঝপথে গিয়েছিল কোথাও, আপনারা বেরুনোর পর ফিরেছে। বিকেলে আমাকে যেন বলল একবার, কোন বন্ধুর সঙ্গে কোথায় যাবার কথা ছিল। বাবার অবস্থা জেনে ছুটে এসেছে।'

'নাম বলেছে?'

'আমাকে?' বনানী কী ভাবল একটু। তারপর বলল, 'না। তখন যা চলছিল বাড়িতে! ডাক্তার, অক্সিজেন। পুতুল যে কখন চলে গেল তা পর্যন্ত খেয়াল করিনি।'

লীনা চুপ করে থাকলেন।

'শুনছি সকালেই নাকি কাজ হবে। এখন বরফ দিয়ে রাখবে।' বনানী ব্যস্ত, অন্য কথায় চলে গেল। সম্ভবত বুঝতে চাইছে না তাঁকে, ঘটনার গুরুত্বও আঁচ করতে পারছে না। বলল, 'ওরা ওখানে। যান। চা খাবেন তো?'

'না।'

খাবার জায়গার সামনে পর্যন্ত লীনাকে এগিয়ে দিয়ে রান্নাঘরের দিকে হেঁটে গেল বনানী।

ডাইনিং টেবিলে বসেছিল অর্জুন। সঙ্গে আরও একজন। ওরই বয়সী, তবে চেহারায় ছোটখাটো, কৃশ। চোখে পুরু ফ্রেমের চশমা। একটু বা বিমর্ষ মুখ। লীনার মনে হল একে আগেও দেখেছেন কোথাও।

'এসো, কাকিমা।' অর্জুন বলল, 'অর্চনার কাছে শুনলাম। এ আমার বন্ধু, নরেশ। পাশের বাড়িতে থাকে—। বোসো না?'

অর্জুন চেয়ার এগিয়ে দিল লীনাকে।

লীনা দাঁড়িয়েই থাকলেন। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ; নরেশকেই দেখছেন।

'তুমিই ফোন করেছিলে?'

'না, কাকিমা।' অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে নরেশ বলল, 'আমি খুব অবাক হচ্ছি। ইনাকে দেখেছিলাম বিকেলে। এখানেই বসেছিল। অশোকদাও ছিলেন। এদের টেলিফোন আউট অফ অর্ডার। ডাক্তার ব্যানার্জি এসেছিলেন, বললেন ডাক্তার সেনকেও খবর দিতে একবার। অশোকদাই যাচ্ছিলেন, আমি বারণ করলাম। তারপর ডাক্তার সেনকে ফোন করতে উঠে গেলাম। তারপর তো আর দেখিনি ওকে। আপনাদের বাড়িতে কেউ আমাকে ফোন করতে

বলেনি। নাম্বারও জানি না।'

এমন বিচলিত ভাবে এবং এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল নরেশ, যেন তাকেই অপরাধী ভাবা হচ্ছে, সুতরাং কৈফিয়ত দেওয়া জরুরি। অর্চনার সঙ্গে কথা হবার পরও অর্জুনকে না দেখে লীনা ভেবেছিলেন এরা ইনাকে নিয়ে ভাবছে না, দেরিও করছে। নরেশের কথা শুনে মনে হল ওরা এরই মধ্যে আলোচনা করেছে ব্যাপারটা নিয়ে। কিন্তু, এসব কথা শুনে তাঁর কী লাভ।

লীনা বসেই পড়লেন। অসহিষ্ণু গলায় বললেন, 'তুমি না করলে কে করেছে। পরিষ্কার নাম বলেছে, নরেশ, পাশের বাড়িতে থাকে।'

লীনা থামলেন। কিন্তু ভিতরের চাপ সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎই গলার স্বর বদলে গেল তাঁর। কনুইয়ের ওপর ভর করা হাতের তালুটা কপালে ঠুকে বললেন, 'তা হলে কোথায় গেল পুতু! অর্জুন, তোর কাকাকে ডাক। জানা সব। বল মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।'

'কাকিমা, প্লিজ!' নিজের জায়গা থেকে উঠে এসে লীনার গা ঘেঁষে দাঁড়াল অর্জুন। ঝুঁকে এল একটু। তারপর চাপা গলায় বলল, 'এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন! কাকাকে একটু আপসেট মনে হচ্ছে, এখনই জানিও না। আমি নরেশের বাড়ি থেকে ফোন করে দেখছি। পুতুল তো চেষ্টা করলেও আমাদের লাইন পাবে না।'

লীনার মুখ ফ্যাকাশে। হতভম্ব চোখে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাক্সিডেন্ট-টেন্ট হল না তো! হাসপাতালে—'

'কী সব বলছ, কাকিমা!'

মাস তিনেক হল বাচ্চা হয়েছে অর্চনার। মেয়েকে দেখে ওদের কথার মধ্যেই ফিরে এল। লীনার কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'ওরা যা ভাবছে তা-ই। দেরিতে ফিরেছে। এ বাড়ির ফোন খারাপ, ও জানে। জানাবে কী করে। তোমরা যাও না, দেরি করছ কেন। বাড়িতে ফিরেছে জানলেই তো হল। আমি কাকিমার কাছে থাকছি।'

বিব্রত ভঙ্গিতে একবার স্ত্রীকে দেখে লীনার দিকে মুখ ফেরাল অর্জুন। ইশারায় ডেকে নিল নরেশকে। তারপর বলল, 'আমরা আসছি—'

লীনা জবাব দিলেন না। দুটি হাতই সামনে এনে মুখ চাপা দিলেন তাতে। সেইভাবেই বললেন, 'বড়ঠাকুর বড় ভালবাসতেন মেয়েটাকে। আজ তুমি ফোন করার পর নিজেই আসবার জন্যে ব্যস্ত হল। আমিও ছেড়ে দিলাম। কী ভুলই যে করেছি।'

কথাগুলো শুনতেই শুনতেই নরেশকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে এল অর্জুন। পা দিল সিঁড়িতে।

'কী ঝামেলা বলো তো। এদিকে বাবার এই, তার ওপর—'

'আমার কিন্তু ব্যাপারটা খুব মিস্টিরিয়াস লাগছে, অর্জুন।' নরেশ বলল, 'আমার নাম করে পাশের বাড়ি পর্যন্ত বলে কে ফোন করতে যাবে। আমাদের বাড়িতে আমি ছাড়া ব্যাটাছেলে বলতে পরেশ। সেও তো আজ সকালে টাটায় গেছে টিমের সঙ্গে।'

অর্জুন জবাব দিল না। ফুটপাথে নেমে চিন্তিত মুখে আকাশ দেখল। কালোর সঙ্গে অদৃশ্য হলুদের আভা মিশিয়ে অনেকটা জায়গা জুড়ে থমকে আছে মেঘ। তার দেখার মধ্যেই ক্ষণিক ঝিলিক দিয়ে সরে গেল একটা বিদ্যুতের রেখা। ইনাকে বাসে তুলে দেবার পর সে

গিয়েছিল শ্যামবাজারের চেনা কেমিস্ট শপে অক্সিজেন সিলিন্ডার আনতে। ওখানে না পেয়ে ট্যাক্সি নিয়ে ছুটেছিল চৌরঙ্গি রোডে, ফ্র্যাঙ্ক রশ-এ। যেতে যেতেই মনে হয়েছিল চৌরঙ্গি পর্যন্ত আসতে হবে জানলে পুতুলকে ওখানেই বাসে না তুলে এগিয়ে দিতে পারত চৌরঙ্গি অব্দি। বাসস্টপের দিকে যেতে যেতে দু-তিনবার কব্জি উল্টে ঘড়ি দেখেছিল মেয়েটা, যেন কোথাও যাবার তাড়া আছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে। এটা এখনই মনে হল, তখন হয়নি। ডাক্তার ব্যানার্জির পরামর্শমতো কত তাড়াতাড়ি অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে বাড়ি ফেরা যায়, এই ভাবনাই তখন অস্থির করে রেখেছিল তাকে। সিলিন্ডার নিয়ে যখন ফেরে তখন হঠাৎই চোখে পড়েছিল জ্যোৎস্নায় ধুয়ে যাচ্ছে আকাশ। এরই মধ্যে বদলে গেছে আবার। সম্ভবত বৃষ্টি হবে। কাল সকালে সৎকার করার ডিসিসন নিয়ে ভালই করেছে দাদা। বাবা চলে গেল। দেহটাই পড়ে আছে শুধু। যতক্ষণ আছে, থাক।

উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসটা চাপা দিল অর্জুন। এর মধ্যে কী যে কাণ্ড বাধিয়ে বসল মেয়েটা!

নিজেদের দরজার সামনে এসে ডোরবেলে চাপ দিল নরেশ। অপেক্ষা করতে করতে বলল, 'অ্যাক্সিডেন্টের কথাটাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আমার মনে হয় পুলিশে একটা খবর দেওয়া উচিত। অন্য কিছুও হতে পারে!'

'দেখা যাক।' গম্ভীর গলায় অর্জুন বলল, 'আগে কাকার বাড়িতে ফোন করে দেখি।'

৩

শোকের স্তব্ধতা শেষ পর্যন্ত ফেটে পড়ে শব্দে। অলক্ষ্য থেকে হঠাৎ ফুঁসে ওঠা মেঘের গর্জন শুরু হতে না হতেই বৃষ্টি নামে। তুমুল সেই বৃষ্টিতে শাসন থাকে না কোনও।

চারদিক ঝাপসা। এমনকী এক হাত দূরত্বেও কী আছে না আছে বোঝা যায় না ঠিক। অবিরাম জলে ধুয়ে যাচ্ছে গাড়ির কাচ। ওয়াইপার সক্রিয় থাকলেও কাজে লাগছে না কোনও, শুধু তার ওঠানামায় ধপ ধপ শব্দ হচ্ছে একটা। জল জমতে শুরু করেছে এখানে-ওখানে। ওরই মধ্যে যত দূর সম্ভব সাবধানে অ্যাম্বাসাডর গাড়িটা বাগবাজার থেকে এগিয়ে চলল যাদবপুরের দিকে।

বনানীর দাদা বিনয়কুমার থাকে আলিপুরে। চিন্মোহনের বাড়াবাড়ি অবস্থার খবর যখন পায় তখন ড্রাইভার চলে গেছে, সাত-পাঁচ ভেবে কর্তব্যরক্ষার খাতিরে নিজেই ছুটে এসেছিল গাড়ি নিয়ে। মৃত্যু প্রত্যাশিত থাকলেও তার পরের ঘটনা সম্পর্কে আদৌই কিছু ভাবেনি। এমনকী অশোকের ঘরে বসে যখন কথা বলছিল সুশোভনের সঙ্গে, তখনও জানত না অদ্ভুত একটা ঘটনায় এর পর জড়িয়ে পড়বে সে।

একে রাত হয়েছে, বৃষ্টি কখন থামবে তার ঠিক নেই, কচিৎ একটা-দুটো গাড়ির হেডলাইট জ্বেলে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না রাস্তায়—এরকম অবস্থার মধ্যে মেয়ের খবর শুনে লীনা এবং সুশোভন, দুজনেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন বাড়ি ফেরার জন্যে। এ বাড়িতে ওঁরা এসে পৌঁছুবার পর আধঘন্টাও গেছে কি যায়নি, কিন্তু এরই মধ্যে অনুযোগ করেছেন সুশোভন, তাঁকে আগে জানানো হয়নি কেন! তা হলে বৃষ্টি শুরু হবার

আগেই বেরিয়ে পড়তে পারতেন। লীনা এমনই থ বনে গেছেন যে জবাবটুকু পর্যন্ত দিতে পারলেন না।

সুশোভনের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেননি ব্যাপারটা। ওপর ওপর একটা স্থৈর্যের ভাব দেখালেও এবং ভেঙে-পড়া লীনাকে স্তোক দেবার চেষ্টা করলেও ফেরার জন্যে এমনই বদ্ধপরিকর হলেন যেন এ সব মিথ্যে, ইনা বাড়িতেই আছে। কিংবা, না থাকলেও সে যে নেই সেটা তাঁর স্বচক্ষে দেখা দরকার। এমনকী নিজেই একবার পাশের বাড়িতে গিয়ে ফোন করবেন বলে জেদ করলেন। অশোক বাধা দিয়ে বলল, 'কী দরকার, কাকা। ফোনে কী জানবে সেটা তো অর্জুনই জেনে এসেছে—'

'কী দরকার সেটা কি তোমরা বুঝতে পারছ! ওর মাকে দ্যাখো। ওই মেয়ে ছাড়া আমাদের আর কে আছে!'

উত্তর হয় না। সুতরাং সকলেই চুপ করে থাকল।

ঘটনা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিনয়কুমার নিজেও সংকট বুঝে ওঠার চেষ্টা করছিল। চিন্মোহন ও সুশোভনকে সে দেখেছে একই সময় থেকে। ইনাকেও চেনে। ওঁরা যাদবপুরে বাড়ি করার পর গৃহপ্রবেশের দিন সেও গিয়েছিল সপরিবারে; তার পরেও গেছে দু-তিনবার। সম্পর্কটা নিছকই দায়সারা কুটুম্বিতার। তা ছাড়া, কোথাও কিছু নেই, ওই বয়সের একটি মেয়ের কোনও কারণ ছাড়াই এত রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় যেসব সন্দেহ উঁকি দেয় মনে, তার প্রত্যেকটির সঙ্গেই জড়িত আছে কোনও না কোনও অন্ধকার এবং বিপদের সম্ভাবনা। এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে নানা গোলমেলে তথ্য। এই অবস্থায় বাস্তবের প্রয়োজন এড়িয়ে যাওয়া অনুচিত হবে।

শেষ পর্যন্ত নিজেই বলল বিনয়, 'ভাবছেন কেন। আমাকে তো ওদিকেই যেতে হত। আমিই পৌঁছে দিচ্ছি আপনাদের।'

অর্জুন এবং অর্চনাকে সঙ্গে যেতে বলল অশোক। রাত ভোর হতে এখনও অনেক দেরি। সকাল আটটা সাড়ে-আটটার আগে শ্মশানে যাবার প্রশ্ন নেই। তার আগে আত্মীয়স্বজন কারও কারও জন্যে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু, ইনাকে নিয়ে ইতিমধ্যে থানা-পুলিশ করার ব্যাপার থাকতে পারে। কাকা এমনিতেই আপসেট, একা পারবেন না। ঘটনা কোন দিকে মোড় নেবে, কত দূর গড়াবে কে বলতে পারে! কাকিমার যা মনের অবস্থা, তাঁকেও একা ফেলে রাখা উচিত হবে না। অর্চনাও যাক। বাড়িতে আর কী দরকার এখন। যদি তেমন কোনও প্রয়োজন হয় তা হলে সে আর বনানী সামলাতে পারবে। এ ছাড়াও নরেশ থাকছে, আছে কাছেপিঠের আরও দু-চারজন। নৈহাটি থেকে জবার ছোটভাই মোহন এবং তাঁর স্ত্রীও এসে পড়েছেন ইতিমধ্যে। ওরা যাক। ভোরের মধ্যে ফিরে এলেই চলবে।

এখন মাঝ রাস্তায়। বিনয়ের পাশে অর্জুন। পিছনের সিটে অর্চনা, লীনা, সুশোভন। বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। সামনে স্টিয়ারিং হাতে বিনয়ের একাগ্র হবার চেষ্টা এবং অর্জুনের মাঝে মাঝে রুমাল দিয়ে সামনের কাচে জমে ওঠা বাষ্প মুছে দেওয়া ছাড়া আর কোনও প্রতিক্রিয়া নেই গাড়িতে। থাকবার কথাও নয়। বিচলিত থাকার কারণেই কি না কে জানে, থেকে থেকে কেশে উঠছেন সুশোভন। প্রবল বৃষ্টির ঝাপটা সত্ত্বেও একটু হাওয়ার জন্যে নিজের দিকের কাচটা অল্প নামিয়ে দিল বিনয়।

ইনা সম্পর্কে শেষ খবর পাওয়া গেছে টেলিফোনে।

নরেশদের টেলিফোন থেকে সুশোভনের বাড়িতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনবার ফোন করে অর্জুন। প্রথমবার ফিরে আসে এনগেজড সাউন্ড। দ্বিতীয়বার কানেকশন পেলেও রিং হয়ে যায়। শব্দটা এমনই নিঃসঙ্গ যে মনেই হয় না রিসিভার তোলার জন্যে কেউ আছে বাড়িতে। এমনও হতে পারে, অর্জুন ভেবেছিল, এটা ভুল কানেকশনের ফল। তৃতীয়বারের চেষ্টাতেও সেইরকম হতে আতঙ্কের ছায়া ছড়াতে শুরু করেছিল অর্জুনের মুখে, সেই সময় ওদিক থেকে আকস্মিক গলার শব্দ পেল—

'হ্যালো!'

'হ্যালো! এটা সুশোভন মুখার্জির বাড়ি?'

'হ্যাঁ। সুশোভন মুখার্জি। আপনি কে?'

'আমি বাগবাজার থেকে বলছি। মণ্টু নাকি?'

'হ্যাঁ। আমি মণ্টু। আপনি কে?'

'আমি ছোড়দাবাবু, অর্জুন কথা বলছি। বাগবাজার থেকে—'

'মা, বাবু, সব আপনাদের ওখানে গেছে। বাগবাজারে।'

'ইনা আছে? দিদি?'

'না। দিদিও বাগবাজারে—'

অর্জুন একটু থমকাল। তারপর শেষ আশা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'এখনও ফেরেনি?'

'না। ফেরেনি। দিদি আগেই গেছে। বিকেলে।'

'ও। আচ্ছা।'

রিসিভারটা নামিয়ে রাখতে যাচ্ছিল অর্জুন। ওদিক থেকে মণ্টুর উৎসাহী গলা ভেসে এল, 'ফিরলে কিছু বলতে হবে?'

এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না। জবাব নেইও। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে অসহায় চোখে নরেশের দিকে তাকাল অর্জুন।

'ফেরেনি।'

বেতের সোফাটার ওপর বসে পড়ল অর্জুন। থমথমে মুখ। দরজার কাছে দাঁড়ানো নরেশের স্ত্রীকে দেখে বলল, 'একটু জল খাওয়াবেন?'

'আনছি।'

'বলেছিলাম না, মিস্টিরিয়াস!'

নরেশও বসল। জানলার পর্দার ওপর দিয়ে তাকাল বাইরে। মাঝখানে হাত আষ্টেক জায়গা বাদ দিলে অর্জুনদের বাড়ি। কোনাকুনি তাকালে পর্দা টাঙানো জানলা দেখা যায়। ওটা অজয়ের ঘর। ওই ঘরে বসে আছেন অর্জুনের কাকা সুশোভনবাবু। ওর কাকিমা সম্ভবত এখনও ডাইনিং টেবিলে। এখনই তাদের ফিরে যেতে হবে ওঁদের সামনে। বলতে হবে। দায়িত্ব অর্জুনের হলেও মহিলা যেভাবে জেরা করলেন তাকে, তা শুনে প্রথমে রাগ হলেও এখন আর তা নেই। এখন মনে হচ্ছে তারও দায়িত্ব এসে যাচ্ছে খানিকটা। পাশাপাশি বাড়িতে থাকলেও এবং অর্জুনের বন্ধু হলেও ওদের বাড়িতে সে যায় না বড় একটা। ওরা দু ভাই-ই তাদের চেয়ে বেশি শিক্ষিত। চেহারাতেও লম্বা। সামনাসামনি হলেই কেমন ছোট লাগত নিজেকে। সুতরাং এড়িয়ে যেত। দেখা-সাক্ষাৎ যা হবার তা দুজনের বাড়িতে ঢোকার কি বেরুবার পথেই হয়। পুরনো বন্ধুদের নিয়ে কখনও-সখনও তাসের আড্ডা বসে তার

বাড়িতে, অর্জুনও এসে পড়ে মাঝেমধ্যে, এক দু হাত খেলে। টেলিফোন খারাপ বলে আজ দুপুরে এসেছিল ফোন করতে—চিন্মোহনবাবুর অসুস্থতার খবরটা তখনই পায়, তখন থেকেই যাতায়াত করছে সেও। বিকেলে দেখেছিল ইনাকে। বেশ সুন্দরী, টান-টান হয়ে আছে স্বাস্থ্যে। একবার পাশাপাশি হওয়ার সুযোগে লক্ষ করেছিল, মেয়েটির হাইট তার চেয়ে বেশি। দেখেই কেমন একটা হীনম্মন্যতা ঢুকে পড়ে মনে। যতই সুন্দরী হোক, কোনও মেয়ে তার চেয়ে লম্বা হবে এটা সে সহ্য করতে পারে না। এরপর সে ডাক্তার সেনের ফোন নাম্বার নিয়ে চলে আসে বাড়িতে।

অর্জুনের আকণ্ঠ জল খাওয়া দেখতে দেখতে ঘটনার ভিতরে ঢুকে পড়ল নরেশ এবং ভাবল, যদি পুলিশ কেস হয় তা হলে—তার নাম করেই যেহেতু কেউ ফোন করেছিল বলে বললেন মহিলা—ওরা তাকেও জড়াবে। ইচ্ছে করে না জানালেও ঘটনার বর্ণনায় এসে পড়বে সে। আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল। নিখোঁজ না হয়ে মেয়েটার সত্যিই যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়, হাসপাতালে গিয়ে থাকে—ওর মা যেরকম সন্দেহ করছে, তা হলে অবশ্য সে বেঁচে যায়। অ্যাক্সিডেন্ট একটা স্ট্রেট ফরোয়ার্ড ব্যাপার, অনেকেই সাক্ষী থাকবে, সুতরাং তার সঙ্গে কার বাড়িতে ফোন করা বা না করার সম্পর্ক থাকছে না কোনও। কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হল কি না সে খবরই বা জানা যাবে কী করে!

নিজেকে নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ল নরেশ। দু আঙুলে ফ্রেম টিপে চশমাটা এঁটে বসাল চোখে। তারপর ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে বেঁটে আলমারির মাথা থেকে টেলিফোন ডিরেক্টরিটা টেনে নিয়ে পাতা ওলটাতে লাগল। একটা পাতায় থেমে, খুঁটিয়ে দেখে, আবার নিজের জায়গায় ফিরে এসে রিসিভার তুলল আবার।

অর্জুন চুপচাপ। এখানে আসবার আগে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও সে যা যা ভেবেছিল তার মধ্যে ছিল হয় সুশোভনের বাড়ির লাইন পাবে না, না হয় ইনাকে পাবে। দ্বিতীয় অনুমান ঠিক হলে শুধু নিজেই আশ্বস্ত হত না, আশ্বস্ত করতে পারত কাকা কাকিমাকেও। কোনও কারণে লাইন না পেলেও জিইয়ে রাখা যেত আশা। এখন 'ফেরেনি' শব্দের ভয়ঙ্করতা কাবু করে ফেলল তাকে। পরিষ্কার বুঝতে পারছিল কাকা কাকিমার সামনে গিয়ে দাঁড়ানোর মানসিকতাটুকু পর্যন্ত হারিয়ে ফেলছে। এইমাত্র পুরো এক গ্লাস জল গেলার পরেও শুকনো লাগছে গলা।

শব্দ করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে বিরক্ত গলায় নরেশ বলল, 'টেলিফোন চালু থাকা না-থাকা একই ব্যাপার!'

'কাকে খুঁজছ?'

'অ্যাক্সিডেন্টের কোনও খবর আছে কি না দেখছি।'

'না, না।' ত্রস্ত ভঙ্গিতে অর্জুন বলল, 'এখনই পুলিশ টুলিশে ফোন করার দরকার নেই।'

'পুলিশ নয়।' নরেশ বলল, 'আনন্দবাজারে। ওখানে রিপোর্টিংয়ে আমার চেনা একজন আছেন। একবার আমাদের এম-ডির কাছে এসেছিলেন। তখন আলাপ হয়। ওরা খবর পায়।'

অর্জুনের জবাবের অপেক্ষা না করে আবার টেলিফোনের ওপর ঝুঁকে পড়ল নরেশ। নাম্বারও পেয়ে গেল।

'হ্যালো! আনন্দবাজার?'

'রিপোর্টারদের কাছে দেবেন কাইন্ডলি।' রিসিভারে মুখ চাপা দিল নরেশ, 'তুমি তখন আমেরিকায়। পরেশের এক বন্ধু হঠাৎ নিখোঁজ হয়। আহিরিটোলার ছেলে, দমদমে দিদির বাড়ি যাচ্ছে বলে বেরিয়েছিল। আর পাওয়া—'

নরেশ থামল এবং বলল, 'হ্যালো! বাসুদেববাবু আছেন?'

'—'

'বেরিয়ে গেছেন? ও। আচ্ছা—। একটা খবর পাওয়া যেতে পারে?'

'—'

'একটি মেয়ে বাড়ি ফেরেনি। কোনও অ্যাক্সিডেন্টের খবর—'

'—'

'জানি। কিন্তু লালবাজারের লাইন পাচ্ছি না। যদি আপনাদের কাছে—'

'—'

নরেশ আবারও রিসিভারের মুখ চাপা দিল। বলল, 'আট বছর হয়ে গেছে। পুলিশ কিছু দিন খুঁজেছিল। তারপর জানিয়ে দিল কোনও হোপ নেই। যদি নিজে ফিরে আসে—, হ্যালো! হ্যাঁ, হ্যাঁ—'

'—'

'সিঁথির মোড়ে বাস চাপা পড়ে! নাম—'

'—'

'ও। আচ্ছা। স্কুটারে যাচ্ছিল? মেয়ে নয়?'

'—'

'না, না। মেয়ে হলে খুশি হবার ব্যাপার নয়—'

'—'

'ও। আচ্ছা। ধন্যবাদ।'

নরেশের মুখে হতাশা। কয়েক মুহূর্ত অর্জুনের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'ওরা দশটা পর্যন্ত খবর পেয়েছে। একজনই মারা গেছে। রতন বণিক। স্কুটারে যাচ্ছিল। লরি চাপা পড়ে। ওর সঙ্গীও ইনজিওরড্। পুরুষ। হাসপাতালে নিয়ে গেছে। অ্যাক্সিডেন্ট হলে তো দশটার আগেই হবে। ইনা তো সন্ধের আগেই বাসে—'

অর্জুন উঠে দাঁড়াল।

'অ্যাক্সিডেন্টই হয়েছে ধরে নিচ্ছ কেন!'

'ধরছি না। হলে সিওর হওয়া যেত।'

'আমি যাই। ওরা নিশ্চয়ই ইমপেসেন্ট হয়ে পড়েছে—'

অর্জুনের পিছনে পিছনে এগিয়ে এল নরেশ।

'আমি বাড়িতেই থাকছি। খাওয়া-দাওয়া করে নিই। দরকার হলে ডেকো।'

দৃশ্যগুলো উঠে আসছে পর পর। একা বাড়িতে ফিরে অর্জুন বুঝেছিল ইনাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। সুশোভনও জেনেছেন। কয়েক জোড়া চোখের সামনে দাঁড়িয়ে অপ্রস্তুত; নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে সে শুধু বলল, 'মণ্টু ফোন ধরেছিল। ফেরেনি এখনও—'

এখন তারা যাদবপুরে সুশোভনের বাড়িতেই যাচ্ছে। গাড়ির ভিতরে প্রায় অসহনীয় স্তব্ধতার মধ্যে বসে অর্জুন ভাবল, রাস্তা ফাঁকা, তার ওপর দুর্যোগ। যখন সব ঠিকঠাক ছিল, তখনও যখন ফেরেনি ইনা, এরপরেও ফিরবে না। বাগবাজার এবং যাদবপুর, দুই প্রান্তের মধ্যে তফাতটা গড়ে দিয়েছেন চিন্মোহন। পুরনো হতে শুরু করেছে তাঁর মৃত্যুর ঘটনাও। বাবার অমন ম্যাসিভ হার্ট অ্যাটাক না হলে এই ঘটনা শুনেই হত হয়তো।

পরে মনে হল অ্যাটাকটাই আগে হয়, তারপর সে নরেশের বাড়ি থেকে খবর দিতে যায় সুশোভনকে; খবর পেয়েই বাগবাজারে পাঠানো হয় ইনাকে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না চিন্মোহন সুস্থ থাকলেও ইনা নিখোঁজ হত কি না। এমনকী হতে পারে যে, তা হলেও হত? সে-সম্ভাবনাও কি উড়িয়ে দেওয়া যায়! যদি সেরকমই হয়, তা হলে আরও জটিল হয়ে উঠবে ব্যাপারটা। যে নিজেই হারিয়ে যায় সে ফিরে আসার জন্যে ব্যস্ত হবে কেন!

যেতে যেতেই ধরে এল বৃষ্টি। ঝমঝম শব্দের একটানা আধিপত্য ছিঁড়ে ক্রমশ বেরিয়ে এল দূরে কাছে গাড়ির হর্নের শব্দ, তাড়া খাওয়া ঘেয়ো কুকুরের চিৎকার। এতক্ষণ আবছা হয়ে থাকা চারদিক থেকে আস্তে আস্তে স্বচ্ছ হয়ে উঠছে এক ধরনের আলো। বিনয়ের অ্যামবাসাডরটাকে প্রচণ্ড স্পিডে ওভারটেক করে বেরিয়ে গেল একটা ফাঁকা বাস। হেডলাইটের আলোয় অর্জুন দেখল ভিজে পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে গড়াতে গড়াতে সমান্তরাল রেখায় এগিয়ে চলেছে ভারী চাকার দাগ। একটি নারীকে আগলে ধরে ট্রামলাইন পেরিয়ে উল্টো দিকের ফুটপাতের দিকে এগোচ্ছে একজন পুরুষ। বিপরীত দিকে গাড়ির হর্ন শুনে থেমে দাঁড়াল ওরা।

'বৃষ্টিটা নর্থেই বেশি হয়েছে মনে হচ্ছে।' গড়িয়াহাট রোডে পৌঁছে অনেকক্ষণের মধ্যে এই প্রথম নিশ্চিন্ত গলায় বিনয় বলল, 'এদিকটা তো বেশ পরিষ্কার!'

নির্দিষ্ট কারও উদ্দেশে বলা নয়। সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না কেউ। শুধু ফ্লুরোসেন্ট আলোর পোস্ট পেরুতে পেরুতে, কারুর কিছু বলা উচিত ভেবে, হাতের ঘড়ি দেখে অর্জুন বলল, 'সাড়ে এগারোটা বাজে প্রায়।'

গাড়িতে ওঠার পর থেকে একটিও কথা বলেননি সুশোভন। মাঝে কাশছিলেন শুধু। আবহাওয়ার দুর্যোগ কেটে যেতেই সম্ভবত খানিকটা স্বস্তিবোধ করলেন তিনি। বললেন, 'তোমাকে হয়রান করা হল, বিনয়।'

'কী বলছেন, মেসোমশাই! হয়রান কেন হব!'

'তবু—।' কিছু বলতে গিয়ে থেমে গেলেন সুশোভন। কাশলেন আবার। নিজের দিকের কাচটা আধা-আধি নামিয়ে দিয়ে বললেন, 'দাদা চলে গেলেন। কোথায় তার জন্যে কাঁদব, না এখন মেয়ের খোঁজে ঘুরছি! এ না হলে সন্তান!'

সুশোভনের গলা বুজে এল।

'এখন তুমি এইসবই বলবে!' জড়তা থেকে লীনা বলে উঠলেন, 'মেয়েটার কী হল ভাবছ না একটু!'

'ভাবছি। ভাবছি বলেই বলছি। ছেলে হলে এতটা ভাবতাম না।' ক্ষুব্ধ স্বর সুশোভনের, 'ক'দিন আগেই বলেছিলাম তোমাকে—মেয়ে মেয়ের মতো থাকবে। তুমি তখনও আমল দাওনি!'

'জানি। এখন আমাকেই দোষ দেবে! আমারই দোষ—'

লীনার গলা কাঁপছিল। পিছনে তাকিয়ে অর্জুন দেখল, লীনাকে শান্ত করার চেষ্টা করছে অর্চনা। মাথাটা টেনে নিয়েছে প্রায় নিজের কাঁধে। এই মুহূর্তে ওঁরা যে-ভাষায় কথা বললেন তা তার, অর্চনার বা বিনয়ের বোধগম্য হবার কথা নয়। কিন্তু, সন্দেহ হচ্ছে, এতক্ষণ ওরা যা ভেবেছিল এবং যেমন করে, তা সম্পূর্ণ নয়, ইনাকে নিয়ে এমন কোনও ঘটনাও থাকতে পারে যা শুধু লীনা এবং সুশোভনই জানেন।

কী সেই ঘটনা? কেন তা আড়ালে থাকবে? মৃত চিন্মোহনকে ফেলে রেখে এই যে ওরা ছুটে এল, তার কি কোনও মূল্য নেই। বস্তুত, বাবা শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পর ডাক্তার সেন যখন বললেন, 'সরি। আর কিছু করবার নেই', সেই মুহূর্তে বাবার বিছানার পাশে কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর জবার নিস্পন্দ মুখের দিকে তাকিয়ে সেই যে সে বেরিয়ে এসেছিল ওই ঘর থেকে আর ঢোকেনি সেখানে। সম্ভবত মা'র কাছে কিছুক্ষণ বসা উচিত ছিল তার। তা না করে এই যে সে চলে এল, অর্চনাকেও টেনে আনল সঙ্গে, তা তো শুধুই কাকা কাকিমার কথা ভেবে, ইনার কথা ভেবে। সম্পর্কে বিনয় তাদের চেয়ে দূরের লোক; সেও যাচ্ছে। যদি ইনাকে খুঁজে পাওয়াই লক্ষ্য হয়, তা হলে ঘটনাটার মধ্যে কোনও আড়াল রাখা উচিত নয়। খোলসা করে বললে একটা ক্লু পাওয়া যেতে পারে—সেই সূত্র ধরেই এগোনো যায়। সুশোভন ও লীনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে ইনার এভাবে উধাও হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে তা আগেই আন্দাজ করেছিলেন ওঁরা। কিন্তু কি ঘটেছিল বাড়িতে? কোনও অ্যাফেয়ার ট্যাফেয়ার ছিল না তো।

অর্জুন হঠাৎ অধৈর্য বোধ করল।

'কাকা, থানাটা বোধহয় যাবার রাস্তাতেই পড়বে। আগে ওখানে গিয়ে একটা এফ-আই-আর করলে ভাল হত না?'

'থানায়—?' সুশোভনের অসম্পূর্ণ প্রশ্নে দ্বিধা ফুটে উঠল।

'যদি বাড়ি না ফিরে থাকে, অ্যাক্সিডেন্ট বা অন্য কোনও ব্যাপারও হয়—', ইতস্তত করে বলল বিনয়, 'আই মিন, আমি তো ঠিক জানি না—, কিন্তু বিফোর ইট ইজ ট্যু লেট, পুলিশে রিপোর্ট করাই ভাল মনে হয়।'

সুশোভন জবাব দিলেন না। অনিশ্চিতির কারণেই সম্ভবত প্রশ্নটা এড়িয়ে যেতে চাইছেন।

গাড়িটা ব্রিজের ওপর উঠে এল।

'কাকিমা, কাছেপিঠে পুতুলের কোনও বন্ধুটন্ধু থাকে না?' অর্চনা জিজ্ঞেস করল, 'ওদের কাছে খোঁজ করলে হয় না? মানে, পুলিশের কাছে যাবার আগে—'

'বন্ধুদের বাড়ি গিয়ে থাকলে জানাত না।' লীনার উত্তরের অপেক্ষা না করেই অর্জুন বলল, 'বন্ধুদের গার্জেনরাও কি এতই ইরেসপনসিবল যে একটা মেয়ে চলে এসেছে, বাড়িতে জানিয়ে এসেছে কি না জানতে চাইবে না।'

'আমি কী বলছি তুমি তা বুঝতে পারছ না।'

'কী বলছ?'

'একটা ভদ্র পরিবারের মেয়ের খোঁজে পুলিশের কাছে যাবার অর্থ কী জানো।' বলবে না ভেবেও কথাটা বলে ফেলল অর্চনা, 'রাত্রে ফেরেনি বলে সকালেও ফিরবে না তার কী মানে আছে। রাত হয়েছে দেখে যদি কোনও বন্ধুর গার্জেন আটকে দিয়ে থাকে, তা হলে ঠিকই

করেছে।'

'খবর না দিয়েও ঠিক করেছে বলছ?' অর্জুন দেখল, গাড়িটা যোধপুর পার্ক পেরিয়ে গেল, এখন ইউনিভার্সিটির সামনে দিয়ে যাচ্ছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে সুশোভনের বাড়ি। অবাস্তবে বিশ্বাস করলে দেখবে ইনা ফিরে এসেছে। তার সম্ভাবনা কম। তারপর কী হবে, আর এক প্রস্ত উত্তেজনার সৃষ্টি হবে কি না, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। এসব ভাবতে ভাবতেই বলল, 'আমার মনে হয় না ব্যাপারটা এত সোজা। সবচেয়ে মিসটিরিয়াস—নরেশের নাম করে কে ফোন করল।'

'তোমরা কি থামবে একটু।' ক্ষোভে বলে উঠলেন সুশোভন, 'আমি বুঝতে পারছি, আমার মাথার ওপর ছাদ ভেঙে আসছে। আমাকে একটু একা ভাবতে দাও!'

৪

বাড়ি ফিরে ইনাকে পাওয়া যাবে না, কমবেশি সকলেই সেটা জানত। মণ্টুও নতুন কিছু বলল না। বস্তুত অপ্রত্যাশিতের অভাবে এই পর্বে এমন কিছুই ঘটল না যা বিশদযোগ্য মনে হতে পারে।

শুধু লীনাই ভেঙে পড়লেন। গাড়িতে আসতে আসতে দু চারটে অভিমানের কথা বললেও সারাক্ষণই ছিলেন চুপচাপ। বাড়ি ফিরে ইনা ফেরেনি শুনে তাঁর গোটা শরীরে ও মুখে কান্নাহীন এমন একটা অভিব্যক্তি দেখা দিল যে কেউই বুঝতে পারল না এরপর তিনি কী করবেন।

অর্চনা পাশে পাশেই ছিল, সে ও অর্জুন লীনার ঈষৎ ভারী শরীরটাকে ধরে সিঁড়ি উঠিয়ে নিয়ে এল ওপরে। বসিয়ে দিল বিছানায়। সেইভাবেই অবসন্ন ভঙ্গিতে খানিক মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকলেন তিনি—ধরনটা ভাগ্য মেনে নিয়ে স্মৃতিতে ডুবে থাকার মতো; চিন্মোহনের মৃতদেহ সামনে রেখে প্রায় একই ভঙ্গি দেখা গিয়েছিল জবার বসে থাকায়। তফাত এইটুকু, চিন্মোহনের মৃত্যু ছিল প্রত্যক্ষ; কিন্তু ইনা সম্পর্কে এই মুহূর্তের ধারণা কোনও নিশ্চিত ভাবনায় পৌঁছুতে দেয় না।

অল্প পরেই আস্তে আস্তে বিছানায় এলিয়ে পড়লেন লীনা। আঁচলটা মুখের ওপর টেনে তার ওপর হাত চাপা দিয়ে শুয়ে থাকলেন চুপচাপ।

যেটা আশ্চর্যের, যে-মানুষটি একটু আগেই মাথায় ছাদ ভেঙে পড়ার কথা বলেছিলেন, সেই সুশোভনকেই দেখা গেল হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠতে।

বাথরুমে গেলেন, সেখান থেকে বেরিয়ে জল দিলেন চোখেমুখে, টেবিল থেকে জলের গ্লাস তুলে প্রবল তৃষ্ণার্তের মতো খেয়ে ফেলবেন সবটা। তারপর ইনার ঘরের আলো জ্বেলে দেয়ালে টাঙানো মেয়ের গত জন্মদিনে তোলা ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন ক'মুহূর্ত। দৃষ্টি স্থির, ঠোঁটের কোণ কুঁকড়ে আছে অল্প। ক্রমশ চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল তাঁর। বিকেলে পাতা পরিপাটি বিছানা, গোছানো আলনা, জন্মদিনেই কিনে দেওয়া আলাদা ড্রেসিং আয়না এবং প্রসাধনের টুকিটাকি জিনিসগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে হেঁটে গেলেন ইনার পড়ার

টেবিলের দিকে। স্বভাবে গোছানো ছিল মেয়েটা, পড়ার টেবিলও সেই সাক্ষ্য দিচ্ছে। আলাদা ভাবে পড়ে থাকা এক্সারসাইজ খাতাটা তুলে দ্রুত পাতা উল্টে গেলেন সুশোভন, আবার সেটা রেখে দিয়ে ড্রয়ার ধরে টানলেন। চাবি দেওয়া। কয়েক সেকেন্ড দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপচাপ। তারপর বন্ধ জানলাটা খুলে বাইরে তাকিয়ে কিছু ভাবতে লাগলেন যেন।

দরজায় দাঁড়িয়ে সুশোভনকে লক্ষ করছিল অর্জুন। দোতলার বারান্দায় বসিয়ে রাখা হয়েছে বিনয়কে। একলা হবার সুযোগে সিগারেট ধরিয়ে অন্ধকার দেখছে ও। বাড়ি পর্যন্ত এদের পৌঁছে দেবার কথা ছিল, দিয়েওছে; কিন্তু এই মুহূর্তে ঘটনা এমনই যে চলে যাবার কথা ভাবতে পারেনি। অর্জুন জানে, বিনয়কে চলে যাবার কথা বলতে হলে সুশোভনই বলবেন। কিন্তু কখন? তারাই বা করবে কী? এখন পুলিশে খবর দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায়ই তো মাথায় আসছে না।

অর্জুন ব্যস্ত হয়ে উঠল।

'কাকা, আমার মনে হয় এখনই পুলিশে জানানো উচিত। বিনয়দার গাড়ি আছে—আর দেরি না করে—'

'আমিও তা-ই ভাবছি।' পিছন ফিরে আবার মেয়ের ছবির দিকে তাকালেন সুশোভন। বললেন, 'ওর এক বন্ধু থাকে কাছেই। অ্যাডভোকেট বীরেন দত্তে মেয়ে। ওর কাছে যাব একবার। পুলিশে গেলেই তো আইনে পড়ব। বীরেনবাবুর সঙ্গেও পরামর্শ করা দরকার।'

'এখনই লোক জানাজানি করবে?'

'জানাজানির আর বাকি কী আছে!' সুশোভন থামলেন অল্প। তারপর বললেন, 'ছ'টায় বেরিয়েছিল তোদের বাড়ি থেকে। এখন প্রায় বারোটা। সর্বনাশ যদি হবার থাকে এর মধ্যেই হয়ে গেছে। ঢেকে রেখে লাভ কি!'

'এতটা বাড়িয়ে ভাবার কিছু নেই, কাকা।' অর্জুন বলল, 'নিজের ভাল-মন্দ বোঝার বয়স ওর হয়েছে।'

'হয়ে থাকলে মঙ্গল। না হয়ে থাকলেও কিছু করার নেই।' অর্জুনকে দেখতে দেখতে হাতের উল্টোপিঠে চিবুকের ঘাম মুছে সুশোভন বললেন, 'এটাই আমার সিদ্ধান্ত। বীরেনবাবুকে জানাব, তুইও চল আমার সঙ্গে। বিনয়কে কি ছেড়ে দেব। ও বেচারা—'

'কত দূরে?'

'বড় রাস্তায়—'

'চল তা হলে। ওঁকেও নিয়ে যাই। নিজেদের লোক। কানেকশন আছে। থানা পর্যন্ত চলুন অন্তত।'

'অর্চনাকে বল তোর কাকিমাকে সামলাতে। নাড়ির জ্বালা কী ও-ই বুঝছে!'

বারোটা নাগাদ বীরেন দত্তের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেন সুশোভন। সঙ্গে অর্জুন ও বিনয়।

রাস্তা থেকেই দেখা যাচ্ছিল দোতলার কোণের ঘরে আলো জ্বলছে। সামনের দিকে চেম্বার। এই রাস্তায় যেতে আসতে দেখা যায় মক্কেলদের ভিড়; বিশেষ সন্ধের পর, একান্তে, টেবিল পর্যন্ত নামানো ল্যাম্পের ছায়ায় বসে আলোচনা করছেন বীরেনবাবু। এত রাতে সদরের দরজা খোলা থাকার কথা নয়। পাশের গেট দিয়ে ঢুকে খানিকটা হেঁটে ভিতরের

দরজার সামনে এসে ডোরবেল খুঁজলেন সুশোভন। কাঁপা হাতের অনুমানে চাপ দিলেন বেলে।

এখন আকাশে মেঘ নেই। চাঁদ কোন দিকে দেখা না গেলেও ছায়াচ্ছন্ন আলোয় মায়াময় হয়ে আছে চারদিক। অন্যমনস্ক ভাবে অপেক্ষা করতে করতে সুশোভন ভাবলেন, আগামী কাল আজ হয়ে যাচ্ছে। সন্ধেবেলায় লীনা যা বলেছিল তা মিলিয়ে নিলে হয়তো বা আজই পূর্ণিমা। এসব কথা যখন হয় তখনকার সম্ভাবনায় কাকতালীয় ছিল; যুক্তি দিয়ে, দৃষ্টান্ত দেখিয়ে লীনা বোঝাতে চেয়েছিল ঘটনায় বংশপরম্পরা বলে কিছু নেই, থাকেও না। বাবা মা অল্প আয়ুতে চলে গেলেও চিন্মোহন পেরিয়ে গেছেন সেই আশঙ্কা। আর কখনও কি এসব কথা বলবার সুযোগ পাবে! দাদা গত। কাল সকালে লীন হবে ভূতে। তা হলেও দাঁড়াচ্ছে না কিছু। পরম্পরায় কি কোনও দিন মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার দৃষ্টান্ত ছিল? কিংবা, এক ভাই যেতে না যেতেই আয়ুর তলানিটুকু এসে টলটল করবে আর এক ভাইয়ের গলায়! পুতু, কী দোষ করেছিলাম আমরা? আমি? তোর মা? রোজ রাত্তিরে তুই ঠিকঠাক ঘুমিয়েছিস কি না, ঘরের আলো নিবিয়েছিস কি না দেখবার জন্যে আমি যে গিয়ে দাঁড়াতাম তোর দরজার সামনে, আজ সেই আমাকেই তুই কোথায় এনে দাঁড় করালি!

কাশির দমক উঠে আসায় বাঁ হাতে মুখ চেপে ধরলেন সুশোভন। স্থির থাকার চেষ্টা করা সত্ত্বেও কেমন একটা অনুভূতি ক্রমাগত জায়গা বদল করছে বুকের মধ্যে। নিজেকে সামলাবার প্রাণপণ চেষ্টায় চন্দ্রাহতের মতো চোখ তুলে তাকালেন আকাশে। তাকিয়েই থাকলেন।

সুশোভনকে বিচলিত দেখে অর্জুন এগিয়ে গিয়ে আবার ডোরবেলে চাপ দিল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্বলে উঠল সিঁড়ির আলো। বাইরেরও। মনে হল কেউ যেন নেমে আসছে সিঁড়ি দিয়ে। তারপরেই দরজা খুলল।

বীরেন দত্তের ছেলে নকুল। পরনে পায়জামা পাঞ্জাবি, সিগারেট জ্বলছে ঠোঁটে। সামনে সুশোভনকে দেখে তাড়াতাড়ি সিগারেটটা নামিয়ে আড়াল করে নিল হাতে।

'স্যার, আপনি?'

'হ্যাঁ, আমিই। বাধ্য হয়েই এলাম।' সুশোভনের গলা কেঁপে গেল, 'বীরেনবাবু কি শুয়ে পড়েছেন?'

'একটু আগেই চেম্বার থেকে উঠে এলেন—। দাঁড়ান, দেখছি।'

পিছন ফিরে সিঁড়িতে পা রেখেও কী ভেবে আবার থেমে দাঁড়াল নকুল, 'আপনারা বরং ভেতরে এসে বসুন।'

একদিকে সিঁড়ি, অন্যদিকে প্যাসেজ। হেঁটে গেলে দরজা। নকুল ঠেলতেই দরজা খুলে গেল। আলো জ্বেলে, ফ্যান চালিয়ে দিল।

একতলায় শুরুতে ড্রইংরুম, শেষে মক্কেলদের বসবার ঘর। মাঝখানে বীরেন দত্তের চেম্বার। এ পাড়ায় বাড়ি তুলতে আসা উপলক্ষে প্রথম যাদের সঙ্গে পরিচয় হয় সুশোভনের, বীরেন দত্ত তাদের একজন। সুশোভনের ছাত্র বিমলেন্দু তখন যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে লেকচারার হয়ে ঢুকেছে, নকুল বি এ পড়ে, নাম করেছে ক্রিকেটার হিসেবে। নাকি ফার্স্ট ডিভিশনে খেলত। সুশোভন স্পোর্টসের কিছুই বোঝেন না; এতদিন পরে সব মনে থাকারও কথা নয়। একতলার ছাদ পেটানো হচ্ছে তখন, গ্রীষ্মকাল, মাথায় ভিজে তোয়ালে চাপিয়ে

দাঁড়িয়েছিলেন মাঠে, বিমলেন্দু এল নকুলকে সঙ্গে নিয়ে। ওখান থেকেই চলে এসেছিলেন বীরেন দত্তের বাড়ি। ছ'সাত বছর আগেকার ঘটনা। সিমেন্টের আকাল চলছিল, জোগাড় করে দিলেন। দুঁদে, কিন্তু ভদ্রলোক। 'বিমলেন্দু নকুলের মাস্টারমশাই, আপনি বিমলেন্দুর মাস্টারমশাই—', বলেছিলেন, 'আপনাকে খাতির না করে উপায় আছে।' পুতু টুংকার বন্ধু হয় অনেক পরে।

মিনিট চার পাঁচের মধ্যেই স্লিপিং স্যুট পরনে নেমে এলেন বীরেন দত্ত। চোখে চশমা নেই, কানের দু পাশে চুল খানিকটা এলোমেলো, টাক পড়তে শুরু করা চওড়া কপালের নীচে ভারী মুখ। চেহারায় উচ্চতার তুলনায় প্রস্থ বেশি। বাঁ হাতের পাথর বসানো আংটি পরা দুটি পুরুষ্টু আঙুলের ফাঁকে সিগার ধরা। মনে হয় বিছানা ছেড়েই উঠে এসেছেন। ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালেন। তিনজনকেই দেখলেন।

'কী ব্যাপার, সুশোভনবাবু! এত রাত্রে!'

চারজনই দাঁড়িয়ে। হতাশায় মাথা নাড়লেন সুশোভন।

'বিপদ, দত্তমশাই। কী আর বলব! দাদা মারা গেলেন আজ। এদিকে মেয়েটা সন্ধে থেকে বাড়ি ফেরেনি।'

'বলেন কি।' অবিশ্বাসের চোখে কয়েক সেকেন্ড সুশোভনের দিকে তাকিয়ে থেকে অর্জুন ও বিনয়কে খুঁটিয়ে দেখলেন বীরেন দত্ত, 'ওঁরা?'

'এটি আমার ভাইপো, অর্জুন। আর ইনি বিনয়—আমার বড় বৌমার দাদা।'

'বসুন আপনারা।'

বীরেন নিজেও বসলেন। টান দিলেন সিগারে। প্রায় নিবে যাওয়া সিগারের মুখটা আস্তে আস্তে জ্বলে উঠল।

'ফেরেনি মানে!'

'নিখোঁজ—।' দু হাতে মুখ ঢাকলেন সুশোভন। ঠিক এতটা ভঙ্গুর হতে এর আগে দেখা যায়নি তাঁকে।

'কাকা ভীষণ আপসেট হয়ে পড়েছেন।' অর্জুন বলল, 'আমি বলছি—'

যতটা সম্ভব গুছিয়ে পুরো ঘটনাটাই বর্ণনা করল অর্জুন। সময়ের হিসেব দিয়ে। এমনকী নরেশের নাম নিয়ে কেউ যে টেলিফোন করেছিল সুশোভনকে, সে-তথ্যও বাদ দিল না।

সুশোভন তখনও মুখ ঢেকে বসে। ওঁকে দেখতে দেখতে অর্জুন বলল, 'আমরা পুলিশে ডায়েরি করতে যাচ্ছিলাম। কাকা বললেন আপনাকে কনসাল্ট করে যাবেন। আপনার মেয়ে—'

'হ্যাঁ। ইনার সঙ্গে পড়ে। খুবই স্বাভাবিক চিন্তা।' অর্জুনের কথা কেড়ে নিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বললেন বীরেন দত্ত, 'ইনাকে তো আজ সকালেও দেখেছি মনে হচ্ছে। কলেজ ছিল না? দাঁড়ান, মেয়েকেই জিজ্ঞেস করি।'

দরজা পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েও আবার দাঁড়িয়ে পড়লেন বীরেন দত্ত। বললেন, 'এর মধ্যে কোথাও মিসিং লিংক নেই তো? আর কাউকে কিছু বলে গেছে, আপনারা জানেন না, এমন কিছু। বাড়িতে অমন একটা বিরিভমেন্টের কেস থাকলে কারুরই মনমেজাজ স্থির থাকে না।'

'আর কাকে বলবে!' সুশোভন মুখ তুললেন একবার, 'থাকার মধ্যে আমি আর ওর মা। বাড়িতেই ছিল। কোথাও যাবে এমন কথাও তো বলেনি। দাদার খবর পেয়ে আমরাই

পাঠিয়েছিলাম বাগবাজারে—'

বীরেন জবাব দিলেন না। কিছু চিন্তা করে 'বসুন' বলে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

অর্জুন ঘড়ি দেখল। বারোটা দশ। সুশোভনের হাত দুটো দুই হাঁটুর ওপর জড় করা। ঝুঁকে বসবার ফলে শরীরের ওপরের অংশ নুয়ে এসেছে সামনে। বিনয়ও চুপচাপ। যত দূর মনে পড়ে শেষ কথা বলেছিল গাড়িতে, সুশোভনের বাড়িতে আসবার সময়। অর্জুনের মনে হল সঙ্গে সঙ্গে থাকলেও ভেবেচিন্তেই যেন কোনও মন্তব্য করা থেকে ও বিরত রাখছে নিজেকে। অবশ্য বরাবরই কম কথা বলে বিনয়। বছর তিনেক আগে ওর স্ত্রী ক্যানসারে মারা যাবার পর থেকে চুপচাপ হয়ে গেছে আরও। নিজেকে নিয়েই থাকে। সন্ধের পর চিন্মোহনের অবস্থা বাড়াবাড়ির দিকে যাওয়ায় বনানী বলেছিল ওকে খবর দিতে। তখন বাড়িতে ছিল না। পরে মেসেজ পেয়ে ছুটে আসে। এখনই মনে পড়ল অর্জুনের, বিনয়কে যখন ফোন করে তখন আরও একবার সুশোভনকে ফোন করার কথা মনে হয় তার। কিন্তু ইনা বাড়ি ফিরেই সুশোভনকে জানাবে, সুতরাং যে-কোনও সময়ে এসে পড়বেন সুশোভন, ইত্যাদি ভেবে আর করেনি। করলে হয়তো তখনই জানা যেত ইনা অনেকক্ষণ আগে বাড়ির দিকে রওনা হলেও বাড়ি ফেরেনি। অন্তত ঘন্টা দুয়েক আগে—সন্দেহজনক ওই কল পৌঁছুবার আগেই ধরা পড়ে যেত ব্যাপারটা। কিন্তু, তাতেও কি লাভ হত কিছু?

মাঝরাতের নিশুতি ঢুকে পড়েছে ঘরে। শব্দের মধ্যে একটা অ্যালসেসিয়ান অনেকক্ষণ ধরেই ডেকে যাচ্ছে কোনও বাড়িতে। ভাঙাচোরা বডির বেখাপ্পা শব্দ তুলে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে লরি বা ট্রাক। শব্দটা দূরে মিলিয়ে যেতে না যেতেই ফিরে এল আরও একটা শব্দ—হর্ন দিয়ে লরির বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসছে একটা গাড়ি। স্পিড কমিয়ে বাঁক নিল। সম্ভবত সুশোভনদের বাড়ির রাস্তাতেই। আজই চোখে পড়েছে, পাড়াটা আগে যতটা ফাঁকা ফাঁকা লাগত এখন আর তা নেই। নতুন বাড়ি উঠেছে অনেকগুলো। সব মিলিয়ে বদলে গেছে অঞ্চলটার চেহারা। নিশ্চয়ই ক্রমশ। আজকাল বড় একটা আসা হয় না। ভাবতে গিয়ে মনেই করতে পারল না অর্জুন শেষ কবে এসেছিল। আজ বিকেলে, পুতুলকে যখন বাসে তুলে দিতে যাচ্ছে, বলেছিল, 'বাবা একটু সামলে নিলে একদিন রবিবার টবিবার দেখে আসব তোদের বাড়ি—'

'এসো না, এলে বাবা মা কত খুশি হয়!' বাসস্টপে দাঁড়িয়ে, সামান্য ঘাড় এলিয়ে পুতুল বলল, 'তুমি তো আসোই না আজকাল!'

'বাবা মা! তোর কোনও গরজ নেই মনে হচ্ছে! এককালে তো ছোড়দা ছাড়া নড়তিস না!'

'তখন তুমি সাহেব হওনি। এতটা বদলে যাওনি।' নিটোল রেখার ভুরু তুলে হাসল পুতুল, 'আমিও অবশ্য বদলে গেছি—'

পুতুলের কথায় দূরত্ব ছিল। দূরত্বই চেনাল। সেই সময় বাসটা এসে পড়ায় আর কিছু না বলে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল পুতুল। একজন পরিপূর্ণ যুবতী, পিছন থেকে অচেনা লাগছিল ওকে। মানুষ বদলে যায়, সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কও, ওকে দেখতে দেখতে ভেবেছিল অর্জুন। তখন পুতুলের হেঁয়ালিপূর্ণ কথাবার্তার মধ্যেই কি চলে যাওয়ার ইঙ্গিত ছিল?

না। ওগুলো কথার কথা। বলবার জন্যেই বলা। এর থেকে কোনও উদ্দেশ্য বের করা যায় না।

অন্যমনস্কতার মধ্যেই অর্জুনের নিঃশ্বাসে মৃতদেহের গন্ধ উঠে এল। পুতুলকে হয়তো

পাওয়া যাবে—বীরেন দত্ত যাকে মিসিং লিংক বললেন, হয়তো সেইরকমই কোনও সূত্র ফিরিয়ে দেবে ওকে। কিন্তু, চিন্মোহন আর ফিরবেন না। এটা সত্য জেনেও সকলে এত উদাসীন হয়ে পড়ল কেন!

বীরেন দত্ত ফিরে এলেন।

'টুংকা আসছে। ঘুমিয়ে পড়েছিল। ওর মা'ও বললেন দুপুরে বৃষ্টি থামবার পর ইনাকে বাসস্টপের দিকে যেতে দেখেছিলেন—'

'হ্যাঁ, ওই সময়েই বেরোয়।' সুশোভন বললেন, 'অর্জুনের ফোনটা এসেছিল তারই আগে।'

'তা নিয়ে ডিসপিউট নেই।' বীরেন এবার চশমা পরে নেমেছেন। এখন আর সিগার নেই হাতে। বললেন, 'ইনি—মানে আপনার ভাইপো, ওকে বাসে তুলে দেওয়া পর্যন্ত কোনও ডিসপিউট নেই। একটাই খটকা লাগছে, ওই মেল ভয়েসটা কার? যে আপনাদের টেলিফোন নাম্বার জানে, দাদা অসুস্থ ছিলেন তাও জানে, ইনাকেও চেনে—'

'আমি নরেশের ভয়েস চিনি না। চিনলে বলতে পারতাম নরেশই ফোন করেছিল কি না।'

'সন্দেহ করার কোনও কারণ নেই, কাকা।' অর্জুন হঠাৎ বলল, 'নরেশ পিকচাবেই আসে না।'

'না, না। সন্দেহ করছি না।'

সুশোভনের কথার মধ্যেই ঘরে ঢুকল টুংকা। মেয়েটি মাথায় মাঝারি, ছাড়া স্বাস্থ্য, রং শ্যামলা হলেও বয়সের ঔজ্জ্বল্যে পরিষ্কার। মুখের গড়ন লম্বাটে। তবে ভুরু ঘন এবং ঠোঁট বেশ পুরু। অনেকটা বীরেন দত্তেরই আদল। ঘুম থেকে উঠে আসার কারণে চোখ দুটি বিহ্বল, নাকে ও গালে জলের দাগ লেগে আছে এখনও। নকুলই নিয়ে এল।

'বোসো।' বীরেন দত্ত মেয়েকে বললেন, 'মা বলেছে ইনা বাড়ি ফেরেনি এখনও?'

সুশোভন পরিচিত হলেও ঘরের মধ্যে বসে থাকা অন্য দুজনকে দেখে হকচকিয়ে গিয়েছিল টুংকা। অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে ওদের লক্ষ করতে করতে চোখ ফেরাল বাবার দিকে।

'আমি তো জানি না ও কোথায়!'

'তুই যে জানিস না তা সবাই জানে।' মেয়েকে আশ্বস্ত করে বীরেন বললেন, 'সুশোভনবাবুর চিন্তা হচ্ছে এত রাত্রে কোথায় গেল মেয়েটা। কোনও বন্ধু-টন্ধুর বাড়ি গিয়ে থাকতে পারে। তুই জানিস কিছু?'

'কলেজে দেখা হয়েছিল। তারপর আর দেখিনি।'

'ও। তা হলে কলেজে গিয়েছিল।'

'ফার্স্ট পিরিয়ডটা করেছিল।' টুংকা কী ভাবল একটু। প্রাথমিক জড়তা থেকে এখন সে অনেকটা মুক্ত। বলল, 'সেকেন্ড পিরিয়ড অফ ছিল। আমরা কমনরুম গেলাম। ও ঝুমুরের সঙ্গে রাস্তার দিকে গেল। থার্ড, ফোর্থ পিরিয়ডে দুজনের কেউই ছিল না।'

সুশোভন, অর্জুন, বিনয়, তিনজনেরই দৃষ্টি টুংকার ওপর নিবদ্ধ। কথা বীরেন দত্তই বলছেন।

'ঝুমুর কে?'

'আমাদের সঙ্গে পড়ে। চেতলায় থাকে।'

অর্জুন বলল, 'তা হলে ওই মেয়েটির কাছেই খোঁজ করলে হয়। ওর সঙ্গেই যখন

বেরিয়েছিল—'

'না। ও মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই কিছু।' বীরেন বললেন, 'আপনারাই বলছেন কলেজ থেকে বাড়ি ফিরেছিল, দুপুরে বাড়িতেই ছিল। তা হলে সকালে কলেজ থেকে কোনও বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিল, দুটো ক্লাস করেনি—এগুলো কোনও ফ্যাক্টর হতে পারে না। স্টুডেন্টদের মধ্যে এটা কমন হ্যাবিট।'

বীরেন দত্তের যুক্তি সকলকেই থামিয়ে দিল।

টুংকাও চুপ। দাঁড়ানোর ধরনে অস্বস্তি। এর আগে বীরেন দত্ত বসতে বললেও বসেনি। এখন চলে যাবে কি না স্থির করতে পারল না।

এতক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনছিল নকুল। সকলে চুপ করে গেছে দেখে সুশোভনকে লক্ষ করতে করতে জিজ্ঞেস করল, 'স্যার, ঠিক কখন থেকে ও মিসিং? এতটা রাত হল, আপনারা নিশ্চয়ই অনেক আগেই টের পেয়েছেন?'

সুশোভন উত্তর দিতে পারলেন না। ঠোঁট দুটো অল্প নড়ে উঠল শুধু।

'তুই ব্যাকগ্রাউন্ডটা জানিস না।' বীরেন বললেন, 'একটা আনফরচুনেট ইনসিডেন্ট ঘটে গেছে। সুশোভনবাবুর দাদা আজ হঠাৎ হার্টফেল করে মারা গেছেন। বিকেলে ওঁদের বাড়িতেই গিয়েছিল ইনা। বাগবাজারে। ছ'টা নাগাদ ওর এই দাদা—জেঠতুতো দাদা—বালিগঞ্জের বাসে তুলে দিয়েছিলেন। লাস্ট উইটনেস উনিই—'

'ছ'টা নাগাদ!' অনির্দিষ্ট দৃষ্টিতে ক'মুহূর্ত দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকল নকুল। তারপর বীরেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কিন্তু, আমি তো ইনাকে সাড়ে সাতটা নাগাদ গড়িয়াহাটেই দেখেছি।'

বীরেন ও অর্জুন একই সঙ্গে বলে উঠল, 'সাড়ে সাতটায়!'

'হ্যাঁ, ওইরকমই হবে। গড়িয়ার মিনিবাসে বাড়ি ফিরছিলাম। ট্রাফিকে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়িগুলো। দেখলাম ডোভার লেনের কাছাকাছি ট্রামলাইন পার হচ্ছে। সঙ্গে মেরুন টি-শার্ট পরা একটি ছেলেও ছিল—'

নকুল হয়তো আরও কিছু বলত। তার আগেই টুংকা জিজ্ঞেস করল, 'কীরকম দেখতে বলো তো?'

'মোটামুটি টল। হ্যান্ডসাম। আমাদের মতোই রং। ব্যাকব্রাশ করা চুল—'

'অনেকটা টাইগার পতৌদির মতো, না?'

টুংকার আকস্মিক উচ্ছ্বাসে অপ্রতিভ বোধ করল সকলেই। নকুলও। সহসা গম্ভীর হয়ে সে বলল, 'কার মতো জানি না। যা দেখেছি তাই বললাম।'

'ও তো বরুণদা!' ঘটনার গুরুত্ব ভুলে হাততালি দেওয়া গলায় বলে উঠল টুংকা, 'ঝুমুরের দাদা—'

টুংকার শেষের কথাগুলো ঠিকঠাক শুনলেন না সুশোভন। এতক্ষণ ক্লান্তি কুরে খাচ্ছিল তাঁকে। তা সত্ত্বেও মৃদু জ্বালার মতো একটা অনুভূতি ঘোরাফেরা করছিল মাথার মধ্যে। উৎসাহ পাচ্ছিলেন না এসব আলোচনায়। এরই মধ্যে ভাবতে শুরু করেছিলেন, বীরেন দত্তের শরণাপন্ন না হয়ে অর্জুনের কথা শুনে সরাসরি যাদবপুর থানায় গিয়ে ডায়েরি করালেই বোধহয় ভাল হত। মেয়েকে ঘুম থেকে তুলে এনে বীরেনবাবু এখন যা করছেন তা প্রায় কোর্ট বসানোর সামিল। কিছুই কি এগোচ্ছে? মাঝখান থেকে সময় চলে যাচ্ছে দ্রুত,

আটকে পড়েছে বিনয়, অর্জুন, অর্চনারা। ওরকম একটা বিপদ ঘটে যাবার পর ওদের এভাবে ধরে রাখা কি ঠিক? মেয়ে তাঁর, দায়িত্বও তাঁর। ওদের কেন বিব্রত করা! ভাগ্য মানুষকে সবসময় একদিকে নিয়ে যায় না, চেনা রাস্তায় নিয়ে যেতে যেতে ছিটকেও দেয় কখনও কখনও। সম্ভবত এটাই নিয়তি। দাদাকে নিয়ে গেল; পুতুকে হারিয়ে দিয়ে এমন একটা জায়গায় তাঁকে এনে ফেলল, যেখানে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে অমোঘ। এখন একেই মেনে নিতে হবে। নিখোঁজ না হয়ে মেয়েটা যদি দুর্ঘটনায় পড়ত, কিংবা আরও বড় কিছু হত, তা হলেও তো মেনে নিতে বাধ্য হতেন তিনি।

ইত্যাদি ভাবনার মধ্যেও নকুলের বর্ণনায় শিরদাঁড়া কেঁপে গেল তাঁর।

টল, হ্যান্ডসাম, গায়ের রং নকুলের মতো হলে পরিষ্কারই বলতে হবে। ব্যাকব্রাশ করা চুল। বর্ণনাই ফিরিয়ে দিল স্মৃতিতে। ট্যাক্সি থেকে নামবার পর অন্তরঙ্গ মুহূর্তের জন্যে দৃষ্টি আড়াল হয়ে যায় তাঁর। পরে লক্ষ করেন ইনা বাড়ির রাস্তার দিকে হেঁটে যাচ্ছে দ্রুত। যেতে যেতে এগিয়ে যাওয়া ট্যাক্সিটার দিকে পিছন ফিরে হাত নাড়ল। যুবকটিও যেহেতু হাত নাড়ছিল ট্যাক্সি থেকে, সুতরাং পুরোপুরি প্রোফাইল লক্ষ করতে অসুবিধে হয়নি সুশোভনের। বাড়ি ফিরে তিরস্কার করেন মেয়েকে। লীনাকেও।

এসব ভাবতে ভাবতে মাথা হেঁট হয়ে গেল সুশোভনের। ইনা ফেরেনি, ইনা নিখোঁজ, অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারের মধ্যে দিয়ে তাঁর এতক্ষণের মনোভাবে যে দুশ্চিন্তা ও বিষাদ গড়ে উঠেছিল, নিমেষেই ভেঙে গেল তা। ভাগ্য বা নিয়তি নয়, এখন মনে হল ইনাই নিয়ন্ত্রণ করছে তাঁকে। মনে হচ্ছে ও বাড়িতে ফোন করে গড়িয়াহাটে পৌঁছে, টি-ভিতে তখন বাংলা খবর চলছিল। দাদার যায় যায় অবস্থা, তবু জানায় চিন্তা করার কিছু নেই। এই মেয়ের জন্যে সকলকে বিব্রত করে বীরেন দত্তের বাড়িতে এসে হা-হুতাশ করছেন তিনি। মধ্যরাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলছেন সকলকে। এরপর তাঁর সারা জীবনের সম্মান, মর্যাদা কোথায় দাঁড়াবে!

সন্ধের আগে যে-মেয়ে বাসে উঠেছিল বাগবাজার থেকে, সাড়ে সাতটা নাগাদ তাকে প্রত্যক্ষভাবেই দেখা গেছে গড়িয়াহাটে, একটি যুবকের সঙ্গে—চেহারার বর্ণনায় যাকে ধরে নেওয়া হচ্ছে ইনা ও টুংকার সহপাঠিনী ঝুমুরের দাদা হিসেবে, এ তথ্য সুশোভনকে বিচলিত করলেও বীরেন দত্তকে কোনও ধারণায় পৌঁছুতে দিল না। ঠোঁটের কোনা চুলকোতে চুলকোতে অর্জুনের দিকে তাকালেন তিনি।

'কিছু মনে করবেন না। ন'টা নাগাদ যে-ফোনটা এসেছিল সুশোভনবাবুর কাছে, সেটা যে আপনার পাশের বাড়ির নরেশবাবু করেননি, এ সম্পর্কে আপনি সিওর হলেন কী করে?'

অর্জুন বুঝতে পারেনি প্রশ্নটা তাকেই করা হচ্ছে। বুঝতে পেরে বলল, 'ও নিজেই যখন বলছে তখন অবিশ্বাস করার কারণ কী! তা ছাড়া, ঘটনাটা আমাদের নিয়ে, ওর তো এ ব্যাপারে কোনও ইন্টারেস্ট থাকার কথা নয়।'

যুক্তি সাজাবার চেষ্টা করলেও গলার ক্ষোভ আড়াল করতে পারল না অর্জুন।

'আপনি রাগ করছেন।' বীরেন দত্ত নরম হবার চেষ্টা করলেন, 'আমি নিজেও কিন্তু একবারও ভাবছি না যে উনিই ফোনটা করেছিলেন। কিন্তু, ঘটনাটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে এইখানে এসেই। ওই কলটাও যদি ইনাই করত, তা হলে ধরে নিতাম—'

কথা অসম্পূর্ণ রেখে ব্যস্তভাবে পকেট হাতড়ালেন বীরেন দত্ত। সম্ভবত সিগারের

খোঁজে। সিগার ছিল না। তখন আবার মেয়ের দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'এই বরুণকে তুমি চিনলে কী করে?'

'বাঃ! চিনব না কেন! ঝুমুরের বাড়িতে আমরা অনেকেই গেছি। বরুণদা মাঝে মাঝেই ঝুমুরকে কলেজে পৌঁছে দেয়, তখনও দেখেছি—'

'ওদের টেলিফোন আছে?'

টুংকা মাথা নাড়ল। নেই।

'বাড়িটা কোথায়?'

'চেতলায়। অহীন্দ্র মঞ্চ না কি আছে, তার সামনের রাস্তায়।' আরও নিশ্চিতভাবে মনে করবার চেষ্টা করল টুংকা। ভেবে বলল, 'সবুজ রঙের দোতলা বাড়ি। পাশে একটা স্টেশনারি দোকান আছে—'

মাঝখানে যেমন সহজ লাগছিল টুংকাকে এখন আর তা নেই। বরং একটা ভয়ের ছায়া যেন ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। মাথা নিচু করে তাকিয়ে থাকল মেঝের দিকে।

'ঠিক আছে, তুমি ওপরে যাও।' বীরেন বললেন, 'এ নিয়ে কারও সঙ্গে আলোচনা করবে না।'

টুংকা চলে যেতে নৈঃশব্দ্য ফিরে এল ঘরে। চেঁচিয়ে কথা বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে দুজন বা তিনজন, সম্মিলিত গলার সেই আওয়াজ মিলিয়ে গেল রিক্সার ভেঁপুর শব্দে। এসব ছাপিয়ে অ্যালসেসিয়ানের এক নাগাড়ে গলার চিৎকার ভেসে আসছিল।

'সুশোভনবাবু, থানায় ডায়েরি করানোটাই সেফ।' বীরেন দত্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমার যদিও মনে হচ্ছে ও আটকেই পড়েছে কোথাও, সকালে ফিরে আসতে পারে। এরকম অনেক কেস দেখেছি। তবু, তার আগে ওই মেয়েটির বাড়িতে একবার খোঁজ নিয়ে দেখা যাক। ফোন থাকলে ফোন করে দেখা যেত—'

বীরেনকে উঠতে দেখে ওরাও উঠে দাঁড়াল।

'যদি ওখানে না গিয়ে থাকে—', অর্জুন বলল, 'ওরা একসেপসন নিতে পারে কি?'

'একসেপসন্! কীসের একসেপ্‌সন?'

'ভাবতে পারে ওদের সন্দেহ করা হচ্ছে।'

'তাই বলুন!' অল্প একটু হাসি বেঁকে গেল বীরেনের ঠোঁটে। সেটাকে মিলিয়ে যেতে দিয়ে দৃঢ় গলায় বললেন, 'নিলে নেবে। একটা মেয়ে বাড়ি ফেরেনি, খোঁজাখুঁজি হবে না। এটা আমাদের রাইটের মধ্যে পড়ে।'

অর্জুনের দ্বিধা কাটল না। ক' মুহূর্ত স্থির ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থেকে বলল, 'আমি বোধহয় ঠিক বোঝাতে পারছি না আপনাকে। একটা স্ক্যান্ডাল হবার ভয় আছে। আপনি আপনার মেয়ের মুখ বন্ধ করে রাখতে পারেন, কিন্তু ওই মেয়েটি, ওদের পরিবারের লোকজনের মুখ বন্ধ করতে পারবেন। এর মধ্যে যদি ও ফিরে আসে, তা হলেও ওয়াইল্ড ফায়ারের মতো ছড়িয়ে যাবে কথাটা। মেয়েটার একটা ভবিষ্যৎ আছে—'

'ভবিষ্যৎ! এখানে দাঁড়িয়ে কি দেখতে পাচ্ছেন তা!' বীরেন দত্ত রূঢ় গলায় বলে উঠলেন, 'এসব আপনাদের মধ্যবিত্ত ভয় ছাড়া কিছু নয়।'

আকস্মিক ধমকে কুঁকড়ে গেল অর্জুন। বিব্রত ভঙ্গিতে বিনয়ের দিকে তাকাল সে। তারপর সুশোভনের দিকে। যেন চাইছে কেউ তার সমর্থনে এগিয়ে আসুক।

বিনয় এ পর্যন্ত কোনও কথা বলেনি। এবার অর্জুনের পিঠে আলতো হাত রেখে বলল, 'ওঁর কাছে যখন এসেছি, ওঁর পরামর্শটাই শোনা ভাল, অর্জুন।'

'এটা পরামর্শ নয়।' বীরেন নিজেকে সংযত করে নিলেন। বললেন, 'অর্জুনবাবু, আমিও মেয়ের বাপ। আপনাদের সাইকোলজি বুঝতে পারি। কী ভাবছেন, ওই বরুণ ছেলেটির সঙ্গে জড়িয়ে স্ক্যান্ডালের কথা তো! কিন্তু আমি অন্য সব পসিবিলিটি নিয়েও ভাবছি। এমনও হতে পারে—বরুণ কোনও ফ্যাক্টর নয়, ইনাও ইনোসেন্ট! ওই ধরনের কোনও স্ক্যান্ডালও নেই এর ভিতরে। মেয়েটার কী হল, কোথায় গেল, এসবও চিন্তা করা দরকার। ওকে খুঁজে বের করা দরকার। স্ক্যান্ডাল হলেও বাপ মা কি সন্তানকে ফেলে দিতে পারবেন!'

বীরেন দত্ত যে উত্তেজিত ওঁর কথার ধরনেই তা স্পষ্ট। ঝোঁকটা বেশি বলবার দিকে। ওঁর শেষের কথাগুলো শুনতে শুনতে অর্জুনের মনে হল, এসব যুক্তি একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এইমাত্র বরুণ নামে যে-যুবকটি বর্ণিত হল, তাকে পরিষ্কারই ইনা-টুংকার সহপাঠিনী ঝুমুরের দাদা বলে সনাক্ত করা গেছে। ওর নাম শুনে টুংকা যেভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তাতে মনে হয় ওই সময় ওই জায়গায় ওই যুবকের সঙ্গে ইনাকে দেখা না গিয়ে টুংকাকেও দেখা যেতে পারত। বস্তুত, মিনিবাস থেকে নকুলের এক ঝলক দেখা ওই দৃশ্য কিছুই প্রমাণ করে না; কিংবা, শুধু এইটুকুই প্রমাণ করে যে বাগবাজারের বাস ইনাকে ঠিকই পৌঁছে দিয়েছিল গড়িয়াহাটে। তখন সাড়ে-সাতটা। সামান্য আগে পরেও হতে পারে। এরপর কোথাও গেছে কিনা সন্দেহ হলে ঝুমুরের কথাই মনে হবে। থানায় রিপোর্ট করতে গেলে পুলিশও জানতে চাইবে ঝুমুর বা ওর দাদা বরুণের কাছে খোঁজ নেওয়া হয়েছিল কি না। যদি ঝুমুরের ওখানেই পাওয়া যায় ইনাকে তা হলে চুকে যায় ব্যাপারটা। না পাওয়া গেলে—

অর্জুন এই পর্যন্ত পৌঁছেই থেমে গেল এবং ভাবল, বরুণ কোনও ফ্যাক্টর নয়, ইনা ইনোসেন্ট, এসব চিন্তার পিছনে আর কোন সম্ভাবনা কাজ করতে পারে?

দেরি হয়ে যাচ্ছে। আরও দেরি করার অর্থ অজ্ঞাত সম্ভাবনাগুলোকেই সুযোগ দেওয়া। কিন্তু, কে নেবে এই সিদ্ধান্ত? বীরেন দত্তের কাছে আসার সিদ্ধান্ত সুশোভনই নিয়েছিলেন, এখনও তাঁকেই নিতে হবে। এদিকে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই আবার বসে পড়ে সুশোভন এমনই চিন্তামগ্ন যে সন্দেহ হয় বীরেনের কথাগুলো শেষ পর্যন্ত শুনেছেন কি না।

অসহায় দৃষ্টিতে সুশোভনের দিকে তাকাল অর্জুন।

'কাকা, উনি যা বলছেন—'

'শুনেছি।' উঠে দাঁড়িয়ে সুশোভন বললেন, 'চেতলাতেই যাব। দত্তমশাই আপনিও যদি—'

'হ্যাঁ, আমিও যাব সঙ্গে। নকুলও যাবে। আপনাদের সঙ্গে গাড়ি আছে, না—?'

'আমি গাড়ি এনেছি।' ঘড়ি দেখে বিনয় বলল, 'পৌঁছেও দিতে পারব।'

'পাঁচ সাত মিনিট সময় দিন তা হলে। আমি ওপর থেকে আসছি।'

বীরেন দত্ত বেরিয়ে গেলেন। নকুলও। পায়ের শব্দ শুনলে বোঝা যেতে ঠিক ক'টা সিঁড়ি উঠতে হয়।

অর্জুন দেখল দু হাতে মাথার চুলে আঙুল চালিয়ে ঘাড়টা পিছন দিকে ঠেলে দিয়েছেন সুশোভন। কী ভাবছেন বোঝা যায় না। কিছু জিজ্ঞেস করতেও ভরসা হয় না। বিনয়ও

অন্যমনস্ক। একা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে পুরনো দৃশ্য ফিরে এল অর্জুনের চোখে: সে দাঁড়িয়ে আছে বাসস্টপে। পাশে ইনা। অপরিচিত কেউ দেখলে এমন সরল দৃশ্যেও খুঁজে পেত সম্ভাবনা। বাস এল। চকিত হেসে ব্যস্তভাবে এগিয়ে গেল ইনা। তখন মনে হয়নি এই মেয়েটিই একদা ফ্রক পরত, হাতিবাগানের মোড়ে ফুচকাঅলার কাছে নিয়ে যাবার জন্যে প্রায় বিকেলেই তোষামোদ করত তাকে।

তাড়াতাড়িই ফিরে এলেন বীরেন। এখন তাঁর পরনে ধুতি-পাঞ্জাবি—সেগুলোও ধোপদুরস্ত নয়, মনে হয় সন্ধেয় ব্যবহাব করে ছেড়ে রেখেছিলেন, আবার গায়ে তোলার সময় ভেবে দেখেননি। হাতে সিগার। নকুল যেমন ছিল প্রায় তেমনিই, শুধু চুলটাই যা আঁচড়ে নিয়েছে। তাকেও রীতিমতো গম্ভীর লাগছিল।

'আসুন, সুশোভনবাবু।' বেরুবার আগে সুশোভনের গায়ে-গায়ে হলেন বীরেন, 'আপনার ওয়ারিজ বুঝতে পারছি। কী করবেন! এসব ঘটনা মানুষের জীবনেই ঘটে, ঠিকও হয়ে যায়। দৈব, মশাই। আমার স্ত্রীকে বলছিলাম, দৈব না হলে একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটবে কেন। তবে ভেঙে পড়বেন না।'

'না।' আকস্মিক গলায় সুশোভন বললেন, 'ভাঙিনি।'

গেট পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল পাঁচ জনে।

সামনে অনেক দূর পর্যন্ত পিচের রাস্তা, জনমানুষ নেই কোথাও, শূন্যতা দেখিয়ে জ্বলতে থাকা রাস্তার আলোগুলো যেন অদৃশ্য অন্ধকারই স্পষ্ট করছে আরও। আকাশে বিক্ষিপ্ত কোদালে মেঘের ভিতর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে অপরিস্ফুট জ্যোৎস্না। কাছেই স্টেশন, রেল লাইন। শব্দ শুনে মনে হল একটা মালগাড়িই বুঝি এগিয়ে চলেছে গড়াতে গড়াতে। অর্ধেক ঝাঁপ ফেলা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে খালি গায়ে বসে বিড়ি টানছে একটি মাঝবয়েসী পুরুষ। ভিতরের উনুনে কিছু ফুটছে সম্ভবত, ভাতের গন্ধ ভেসে এল। ওদের দেখে টেলারিং শপের সামনে কুঁকড়ে শুয়ে থাকা দুটো কুকুর উঠে দাঁড়িয়েছিল, তারপর নিরাপদ ভেবেই যেন এক পাক ঘুরে শুয়ে পড়ল আবার। গড়িয়ার দিক থেকে প্রচণ্ড স্পিডে এগিয়ে আসা একটা খালি বাস তাদের পেরিয়ে যেতে যেতে নিমেষে হারিয়ে গেল দূরে।

বীরেনের পাশাপাশি গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে নিজের বাড়ির রাস্তায় চোখ পড়ায় গোটা শরীরে একটা শিহরন ছুটে গেল সুশোভনের। মাথা ভার, দবদব করছে ঘাড়ের শিরা, বুদ্ধিও প্রায় বিলুপ্ত। ওদের কথাবার্তার মধ্যেই একটা সময় মনে হয়েছিল কিছুই ঢুকছে না মাথায়, সাড় নেই স্মৃতিতেও—ঘটনা যে ইনাকে নিয়ে, ইনা যে তাঁরই সন্তান, এই বোধও নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। রাস্তার নৈঃশব্দ্য আবার তাঁকে ফিরিয়ে আনল বাস্তবে। শৃঙ্খলায় আবদ্ধ জীবন তাঁর। শোয়া, বসা, খাওয়া, বাড়ি থেকে বেরুনো এবং বাড়ি ফেরা সমস্তই ঘড়ি ধরে। আজকের বিশৃঙ্খলা সবই চেনাচ্ছে নতুন করে। বেশ কয়েক বছর থাকা হল এ পাড়ায়, তবু রাতের এই চেহারা এর আগে কখনও চোখে পড়েনি। পরিচিত রাস্তা কি এতখানি শূন্যতা নিয়ে বদলে যেতে পারে! এর এক প্রান্তে পড়ে আছে লীনা। অর্চনা সঙ্গে থাকলেও কেমন আছে ও, কী ভাবছে, এখন তা জানা সম্ভব নয়। আর এক প্রান্তে পুতু। সেই প্রান্তটা কোথায়? এমনকী হতে পারে যে যে-পুতুর কথা ভেবে এতক্ষণ লজ্জায় মুখ নামিয়ে বসেছিলেন তিনি, ভাবছিলেন নিজের সম্মান ও মর্যাদাহানির কথা—যার ভবিষ্যতের কথা ভেবে পিতৃশোকের মধ্যেও বীরেন দত্তের সঙ্গে তর্ক করে গেল অর্জুন, সেই পুতু আর কোনও দিনও জানতে

আসবে না তাঁদের উদ্বেগের কথা! ফেলে দেবার কথাটা উঠল কেন! কাকে ফেলে দেবেন? পুতুকে?

সুশোভনের নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে উঠল।

বিনয়ের পাশে অর্জুন। পিছনে বীরেন, সুশোভন, নকুল। চেনা রাস্তায় এগোতে লাগল গাড়িটা। দ্রুত চালালেও সতর্ক লাগছে বিনয়কে। থানা পেরিয়ে পেট্রোল পাম্পের সামনে দিয়ে ব্রিজের সামনে এসে পড়ল। গোলপার্ক থেকে সাদার্ন অ্যাভিনিউ ধরবে সম্ভবত, তারপর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে বাঁদিকে। আবার ব্রিজ। আলিপুরে থাকে, এটা ওরই এলাকা। টুংকা যে-বর্ণনা দিয়েছিল তা থেকে বাড়িটা চেনা কঠিন হবে না, অর্জুন ভাবল, তারপর কী হবে জানে না। সম্ভাবনা সম্ভাবনাতেই থেকে যাচ্ছে।

'অর্জুনবাবু—', ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর এসে বললেন বীরেন দত্ত, 'আপনার বাবার বয়স কত হয়েছিল?'

'একাত্তর।'

'এমন আর কি বয়স! আমার বাবা এখনও বেঁচে, দিল্লিতে থাকেন দাদার কাছে। নব্বুই ক্রশ করেছেন—'

অর্জুনের কিছু বলার ছিল না। চিন্মোহনের মুখ মনে করবার চেষ্টা করল সে। ওইটুকুই। নতুন কোনও অনুভূতির সঞ্চার হল না। জবাকে মনে পড়ল। তারপর ভাবল, কাল থেকে অন্যরকম হয়ে যাবে বাড়িটা। নিজেই বুঝছে এগুলো কোনও চিন্তা নয়। দাহ থেকে শ্রাদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত কতগুলো অশান্ত দিন যাবে। এর মধ্যে যদি ইনাকে পাওয়া না যায় তা হলেও কি সব ঠিকঠাক চলবে?

'স্যাড। ভেরি স্যাড। ওদিকে বাবা, এদিকে বোন—'। বলতে বলতেই থেমে গেলেন বীরেন, যেন নিজেরই সন্দেহ হল কথাগুলো ঠিক বলা হল কি না। দ্রুত সংশোধন করে নিয়ে বললেন, 'অবশ্য দুটোই এক ব্যাপার নয়।'

বিনয় সাদার্ন অ্যাভিনিউই ধরল। স্টেডিয়াম পেরোতে পেরোতে জিজ্ঞেস করল, 'মিস্টার দত্ত, আপনার মেয়ে কি বাড়িটার ঠিকানা দিয়েছে?'

'ডেসক্রিপসন যা দিয়েছে তা-ই যথেষ্ট।'

'নাম্বার জানে না।' নকুল বলল, 'পরমহংস দেব রোড না লেন। আমার মনে হয় রাস্তাটা চিনি।'

'যা জানা গেছে এনাফ। সবুজ রঙের দোতলা বাড়ি, পাশে স্টেশনারি দোকান আছে।'

শববাহকের একটি ছোট দল চাপা হরিধ্বনি দিতে দিতে এগোচ্ছে শ্মশানের দিকে। সেদিকে তাকিয়ে একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন বীরেন। তারপর পাশে চুপচাপ বসে থাকা সুশোভনকে দেখে নিয়ে বললেন, 'আমরা খুঁজে না পেলেও পুলিশ ঠিকই পাবে। এই কলকাতাতেই গড়ে প্রতিদিন কুড়ি থেকে পঁচিশ জন লোক নিখোঁজ হচ্ছে, তাদের সবাই যদি নিখোঁজই থাকত, তা হলে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট উঠে যেত। মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে গিয়ে খোঁজ করুন, নাম্বারটা জানতে পারবেন। অধিকাংশই পেটি কেস। বাপ-মা'রা আগেই নার্ভাস হয়ে—'

মুহূর্তের জন্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিনয়। জোরে ব্রেক কষল হঠাৎ। তা সত্ত্বেও ঝাঁকুনি খেয়ে লাফিয়ে উঠল গাড়িটা।

'সরি।' বিনয় বলল, 'জল জমে জায়গাটা ঝাপসা হয়ে আছে। স্পিড ব্রেকার বুঝতে পারিনি।'

'আপনার আর দোষ কি!' ঝাঁকুনিতে সকলেই সচকিত হয়ে উঠলেও তেমন কিছু হয়নি। সোজা হয়ে বসতে বসতে বীরেন বললেন, 'কলকাতায় এখন যত না রাস্তা তার চেয়ে বেশি স্পিড ব্রেকার।'

বিনয় ওঁর কথায় কান দিল না। গাড়ির স্পিড আগেই কমিয়ে নিয়েছিল, মন্থর গতিতে পার্কের সামনে দিয়ে এগোতে এগোতে বলল, 'সামনে অহীন্দ্র মঞ্চ—'

গাড়ির ভিতর থেকেই দু পাশে উঁকিঝুঁকি দিল নকুল।

'হ্যাঁ, এইখানেই দাঁড় করান।'

পার্কের শেষ প্রান্তে ফুটপাথ ঘেঁষে বিনয় গাড়িটা দাঁড় করাতেই তাড়াহুড়ো করে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল নকুল। ভিজে রাস্তা। মনে হয় একটু আগেও বৃষ্টি হয়ে গেছে এদিকে।

সুশোভনও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বীরেন ওঁর হাঁটুতে চাপ দিয়ে বললেন, 'আপনি নামবেন না। আমরাই খোঁজ করে আসছি। বিনয়বাবু, আপনিও থাকুন গাড়িতে। অর্জুনবাবু, আপনি আসুন আমাদের সঙ্গে।'

'আমি ঝুমুরকে চিনি।' সুশোভন অধৈর্য হয়ে বললেন, 'আমি ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই—'

'না। আপনি গাড়িতেই থাকুন।' বীরেন বললেন, 'চিনি তো আমরাও। ওই বরুণ ছেলেটিকে আমি আপনি চিনি না। নকুল যাচ্ছে, ও-ই আইডেনটিফাই করতে পারবে। আপনার যাওয়াটা আমি উচিত মনে করছি না।'

'আপনি গাড়িতেই থাকুন, কাকা।' অর্জুনও সায় দিল, 'এমনিতেও তো টায়ার্ড!'

দুর্গাপুর ব্রিজের দিক থেকে ঘুরে হেডলাইট জ্বেলে একটা লরি আসছিল। সেটাকে যেতে দিয়ে রাস্তা পেরিয়ে বাঁ দিকে গেল ওরা। আলো কম। মেন রোডের আলোর সীমানা পার হতে না হতেই ঘন হয়ে উঠল ছায়া, ঘিঞ্জি বাড়িগুলোর আড়ালে হারানো জ্যোৎস্নায় অন্ধকারও। সামনের দুটি ল্যাম্পপোস্টের একটিতে আলো জ্বলছে না; অন্যটিতে লুজ কানেকশন হয়ে কখনও জ্বলছে, কখনও নিবছে। রাস্তার ভিতর থেকে দু তিনটি কুকুর বেরিয়ে এসে দূরে দাঁড়িয়েই চিৎকার জুড়ে দিল। আরও দূরে, অনেকগুলি বাড়ির পিছনে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি মাল্টিস্টোরিড—ওপরের দিকের কোনও ফ্লোরে চার পাঁচটি জানলা জুড়ে আলো জ্বলছে। ওখান থেকেই ভেসে আসছে বিলিতি বাজনা। নিশ্চিত জায়গাটা এখান থেকে দূরে, বীরেন অনুমান করবার চেষ্টা করলেন, কোর্টের পিছন দিকে কোনওখানে। আলোজ্বলা জানলাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কিছু মেয়ে পুরুষকে দেখা যাচ্ছে ঘোরাফেরা করতে। পার্টিফার্টি চলছে বোধহয়।

'ওই তো!' রাস্তার দুদিকে চোখ রেখে এগোতে এগোতে হঠাৎ থেমে দাঁড়াল নকুল, 'কমলা স্টোর্স। স্টেশনার্স।'

দেখাদেখি দাঁড়িয়ে পড়লেন বীরেন দত্ত। অর্জুনও। খুঁটিয়ে পড়ল সাইনবোর্ডটা। কোনওকালে হয়তো গ্যারাজ ছিল, এখন সামনে কোলাপসিবল গেট। ডান দিকের বাড়িটা তিনতলা সমান উঁচু হলেও তেতলাটা অসম্পূর্ণ, রাস্তা থেকে বাঁশের ভারা তুলে কাজ চলছে

এখনও, ফুটপাথে পাহাড় করা বালি গড়িয়ে এসেছে রাস্তাতেও। বাঁদিকের বাড়িটা অবশ্যই দোতলা, তবে রোদ জল খাওয়া পুরনো রঙে সবুজ কি না বোঝা যায় না। রাতের অস্পষ্টতায় মনে হয় নীল ঘেঁষা। ছাদের টি-ভির অ্যানটেনার পাশ দিয়ে একটা লতানে গাছ নেমে এসেছে একতলার জানলার সানশেড পর্যন্ত।

তিন জনেই খানিকক্ষণ পর্যবেক্ষণ করল বাড়িটা। টুংকার বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে স্টেশনারি দোকানের লাগোয়া দোতলা বাড়ি এই একটাই।

'এই বাড়িই হবে। একতলায়।'

'একতলা কখন বলল?'

'আমি পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম।' বীরেনকে নিশ্চিন্ত করার জন্যে নকুল বলল, 'টুংকা একতলাই বলেছে, গ্রাউণ্ড ফ্লোর। সবই তো মিলে যাচ্ছে। দরজার সামনে রেলিংও আছে।'

'তা হলে যাও। দ্যাখো বেলটেল আছে কি না!'

নকুল এগিয়ে গেল। ওর পিছনে অর্জুন ও বীরেন। বাড়ি এবং স্টেশনারি দোকানের মাঝখানে শান-বাঁধানো সরু গলি, সম্ভবত এই বাড়িরই দোতলায় যাবার রাস্তা। যেমন হয়। গলির মুখে দু ধাপ সিঁড়ি, তারপর ফুট তিনেক উঁচু রেলিং দেওয়া ছোট বারান্দা, রাস্তামুখো দরজা এবং জানলা। দুটোই বন্ধ।

বারান্দায় উঠে এসে একটু ইতস্তত করে এদিক ওদিক তাকাল নকুল। বেলটেল খুঁজে পেল না। বারান্দার শেডে আড়াল হয়ে ঘুটঘুটে দেখাচ্ছে দরজার ওপর দিকটা। যেটুকু দেখা যায়, পুরনো ধরনের দুটো কড়া লাগানো আছে দুই পাল্লায়। সেই কড়া ধরেই আস্তে নাড়া দিল একবার। তারপর আবার, জোরে। মেন রোড থেকে এদিকেই আসছে একজন সাইকেল আরোহী, পিছনের ক্যারিয়ারে একটা বড় কাঠের বাক্স বসানো। তাদের দেখতে দেখতেই চলে গেল রাস্তার আরও ভিতরে।

সিঁড়ির কাছে, বীরেনের পাশে দাঁড়িয়ে অর্জুন লক্ষ করল, গভীর রাতে কেউ এসে দরজায় বেল দিলে বা আচমকা কড়া নাড়লে ভিতরের প্রতিক্রিয়া প্রায় একই রকমের হয়। দৃশ্যেও তারতম্য থাকে না কোনও। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হল না।

জানলার খড়খড়ি থেকে হঠাৎ চুঁইয়ে পড়া আলোর রেখা দেখে বোঝা যায় আলো জ্বেলেছে কেউ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি পুরুষ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কে?'

তৎপর গলায় নকুল বলল, 'দরজাটা খুলবেন একটু?'

দরজা খুলল না। পরিবর্তে জানলার ছিটকিনি নামানোর শব্দের সঙ্গে একটা পাল্লা খুলে এল বাইরের দিকে।

ওদিকে যে দাঁড়িয়ে আছে সেও বয়সে যুবক। বেশ লম্বা, রং ফর্সা, ছোট করে ছাঁটা এক মাথা চুল, নাকের নীচে সরু কিন্তু ঘন গোঁফ। বিরক্তি মেশানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে চাই?'

'এটা কি বরুণ লাহিড়ীর বাড়ি?'

যুবকটির দৃষ্টি নকুলের মুখে। অন্য দুজনকেও দেখল।

'আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?'

'যাদবপুর থেকে।'

আরও কয়েক সেকেন্ড তিন জনকেই খুঁটিয়ে দেখল যুবকটি। তারপর জানলা থেকে

সরে গিয়ে দরজা খুলে দাঁড়াল।

'কী দরকার বলুন তো।'

'বরুণ লাহিড়ী বাড়ি আছে কি না সেটা আগে বলুন।' বীরেন বললেন এবার, 'দরকার না থাকলে কি এত রাতে বিরক্ত করতে আসব!'

'উনি এখানে থাকেন না।'

'থাকেন না!'

'না। এটা ওঁর দাদার বাড়ি।'

'আপনি?'

'আমি ওঁর ছোট ভাই।'

ঘাবড়ে যাওয়া দৃষ্টিতে অর্জুনকে দেখলেন বীরেন দত্ত। যেভাবে দু হাতে দরজা আগলে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যুবকটি, তাতে মনে হয় ভদ্রতা করার কোনও অভিপ্রায়ই নেই। তখন বাধ্য হয়েই বললেন, 'ঝুমুর আছে? ওকে বলুন ওর বন্ধু টুংকার বাবা এসেছেন—কথা বলতে চাইছেন—'

মনে হল কাজ হয়েছে। বিরক্তির ভাব সরে গেল যুবকটির মুখ থেকে। বীরেনকেই দেখছে।

'ঝুমুরও তো বাড়ি নেই এখন। দাদা-বৌদির সঙ্গে নৈহাটি গেছে। পরশুর আগে ফিরবে না।'

'ফিরবে না।' অর্জুন এতক্ষণ কথা বলবে না ঠিক করে রেখেছিল। হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি ঘটায় জিজ্ঞেস করল, 'ওর বন্ধু ইনা কি এসেছিল এখানে? জানেন আপনি?'

'বলতে পারব না। আমি দুর্গাপুরে থাকি। উইক এন্ডে আসি।' যুবক বলল, 'আমি আসবার পরেই ওরা বেরিয়ে যায়। আমি কাউকেই দেখিনি।'

'আপনার নাম কী?'

'অরুণ। অরুণ লাহিড়ী।' উপহাসের দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে তাকাল যুবকটি। অল্প হেসে বলল, 'মনে হচ্ছে আমার কথা বিশ্বাস করছেন না! ভেতরে আমার বুড়ি মা আছেন, ঘুমোচ্ছেন। তাঁকে ডেকে দেব? আপনারা ভেতরে এসে বসুন না!'

'না। তার দরকার নেই।' বীরেন বললেন, 'তা হলে এটা আপনার দাদার বাড়ি?'

'হ্যাঁ, তাঁর নাম তরুণ লাহিড়ী।' অরুণ হঠাৎ আঙুল তুলে দরজার ওপরের চৌকাঠ দেখিয়ে বলল, 'নেমপ্লেটেও তা-ই লেখা আছে।'

অন্ধকারের কারণে নেমপ্লেটটা কেউই লক্ষ করেনি আগে। এখন দেখল। কিন্তু, এর পরে আর কী প্রশ্ন থাকতে পারে? অরুণের কথাবার্তার ধরনেও মনে হচ্ছে যা বলবার সবই বলা হয়ে গেছে, এখন তাকে অব্যাহতি দিলেই ভাল।

বীরেন মরিয়া হয়ে বললেন, 'বরুণ লাহিড়ী এখানে না থাকলে কোথায় থাকেন?'

'ভবানীপুরে। একটা মেসে।' অরুণ জিজ্ঞেস করল, 'তাকে খুঁজছেন কেন? মেজদা তো এখন কলকাতায় নেই!'

'নেই মানে!' প্রায় ক্রুদ্ধ গলায় নকুল বলল, 'সন্ধেবেলায় ছিল, এর মধ্যেই নেই!'

'দেখুন, এসব প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারব না। আমি তো বলেইছি আমি দুর্গাপুরে থাকি, আজই ফিরেছি। আপনারা বরং পরশু এসে খোঁজ করুন। দাদারা এলে বলতে

পারবে।'

বিমূঢ় ভঙ্গিতে বাবার দিকে তাকাল নকুল। বীরেন দত্তও চুপ। ওঁর বাড়িতে যাবার পর থেকে যে-দাপট দেখা যাচ্ছিল আচরণে ও কথাবার্তায়, এখন আর তা নেই। আত্মবিশ্বাসও চিড় খেয়ে গেছে যেন। বিহ্বল দৃষ্টিতে খানিক যুবকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা, ধন্যবাদ।'

আগে আগে বীরেন দত্ত, মাঝখানে অর্জুন, শেষে নকুল। পরপর রাস্তায় নেমে এল তিনজন। এগোতে লাগল মেন রোডের দিকে।

মেন রোডে পৌঁছে পিছনে তাকিয়ে নকুল দেখল, খোলা দরজা দিয়ে ছিটকে বেরুনো ঘরের আলো আড়াআড়ি ঝুলে আছে বারান্দায় এবং রেলিঙে। দরজা ছেড়ে বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে যুবকটি, তাদেরই দেখছে। ওরা ডানদিকে ফেরাব সঙ্গে সঙ্গে আড়াল হয়ে গেল বাড়িটা।

নকুল বলল, 'মেসের ঠিকানাটা জেনে নিলে হত!'

'বলতে পারত না। চেপেও যেতে পারত। এত রিলাকটান্ট!'

বীরেন দত্ত এখন আগের চেয়েও গম্ভীর। চিন্তিতও দেখাচ্ছে। দূর থেকে ভেসে আসছে বিলিতি বাজনা। আলিপুরের দিক থেকে বেরিয়ে এসে একটা অ্যামবাসাডর দুরন্ত গতিতে ছুটে গেল ব্রিজের দিকে। রঙিন কাচের আড়াল থাকায় ভিতরে কে আছে না আছে দেখা গেল না। নাম্বার প্লেট থেকে বোঝা যায় এদিকের লাইসেন্স নয়, এম-এন-জি, সম্ভবত মহারাষ্ট্রের। পিছিয়ে পড়া অর্জুনকে কাছে আসাব সুযোগ দিয়ে নকুলের পাশাপাশি হলেন তিনি।

'মিনিবাস থেকে তুই কি ইনাকেই দেখেছিলি? না ইনার মতো কাউকে?'

'ভুল হবে কেন!'

'এক ধরনের চেহারার অনেক লোকই তো থাকে। দৃষ্টিভ্রমও হয়—'

চোখ তুলে বীরেনকে দেখল নকুল। জবাব দিল না।

'এমনও হতে পারে, ইনা যখন ট্রামলাইন পার হচ্ছিল তখন আর কেউও পার হচ্ছিল। তার মানে এই নয় যে সে ইনার সঙ্গেই ছিল—'

ছাড়া ছাড়া মিহি জলের ফোঁটা একটা দুটো করে নেমে আসছে কপালে, হাতে। আবার কি বৃষ্টি শুরু হল!

চোখ তুলে অর্জুন দেখল চন্দ্রালোক অদৃশ্য, ঘন কালো আবরণে ছেয়ে আছে আকাশ। মেঘও দেখা যায় না। উত্তর-পশ্চিমে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে থেকেই চমক দিচ্ছে বিদ্যুৎ। ঘড়ি না দেখেও অনুমান করা যায় একটা বাজে প্রায়, বেশিও হতে পারে। এই সময়ের বৃষ্টিতে সচরাচর ধারাবাহিকতা থাকে; একবার নামলে সহজে থামবে না। গাড়ির পিছন দিকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে বিনয়, ওর আড়ালে আড়াল হয়ে আছেন সুশোভন। এখন কী বলা হবে ওঁকে? এখানে পৌঁছুবার আগে, কেন জানে না, ক্ষীণ একটা আশা ছিল তার নিজেরও মনে—বরুণকে না পাক, ঝুমুরকে অবশ্যই পাবে। এমনও ভেবেছিল বিনয়কে বলবে গড়িয়াহাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে, সেখান থেকে ট্যাক্সি নিয়ে সে আর অর্চনা ফিরে যাবে বাগবাজারে। আর কি সম্ভব হবে তা? সে কি সুশোভন ও লীনাকে বলবে, এখানে থেকে লাভ নেই, মণ্টু আছে থাক, তাঁরা চলুন বাগবাজারে, বাবার কাজ চুকে গেলে ফিরে আসবেন আবার?

না, বললেও রাজি হবেন না ওঁরা। মৃত্যু তো ঘোষিত ব্যাপার, সৎকারও সংস্কার। বাড়ি না ফিরেই ইনা বুঝিয়ে দিচ্ছে জীবনের দাম অনেক বেশি।

বিষাদগ্রস্ত, এক ধরনের দার্শনিকতা ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছিল অর্জুনকে। বীরেন দত্ত ও তাঁর ছেলের কথাবার্তায় উৎসাহ পাচ্ছিল না তেমন। হঠাৎ নকুলের কথা শুনে শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল তার।

'আমি ভুল দেখিনি।' বীরেনের সন্দেহের জের টেনে নকুল বলল, 'সুশোভনবাবুর সামনে বলতে পারছিলাম না, আমি স্পষ্ট দেখেছি ট্রামলাইন পেরিয়ে ওরা ট্যাক্সিতে ওঠে—'

বীরেন দত্ত জবাব দিলেন না। তবে গতি মন্থর করে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে একবার অর্জুনকে দেখে নিয়ে আবার মুখ ফেরালেন ছেলের দিকে।

'লুকিয়ে লাভ কী! মেয়ে সুশোভনবাবুর, ভোগান্তি তাঁরই।'

নকুল চুপ করে থাকল।

'কোনদিকে গেল?'

'কে?'

'ট্যাক্সিটা?'

'তা কী করে জানব!' নকুল বলল, 'গড়িয়াহাট ধরেই এগিয়ে যায়, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির দিকে। মিনিবাসটা ছেড়ে দেয় তখন—'

এসব কথাও যে এসে পড়বে এর মধ্যে, এতক্ষণ তা অনুমান করতে পারেনি অর্জুন; শুনতেও ভাল লাগছিল না। ওকে রাস্তা পেরুবার জন্যে ব্যস্ত হতে দেখে হাত ধরে টানলেন বীরেন দত্ত।

'দেখে হাঁটুন। ট্রাক আসছে।'

ডানদিকে চোখ তুলতেই হেডলাইটের তীক্ষ্ণ আলোয় দৃষ্টি ধাঁধিয়ে গেল অর্জুনের। একটা নয়, মনে হচ্ছে পরপর কয়েকটা ট্রাক সার বেঁধে এগিয়ে আসছে পশ্চিম দিক থেকে। ও সরে দাঁড়াল।

'আমি আগেও একদিন ওদের দেখেছি একসঙ্গে। কোয়ালিটিতে ঢুকছিল। সেদিন অবশ্য এই মেয়েটাও ছিল সঙ্গে—ঝুমুর—'

নকুলের কথা শুনে এইমাত্র ছেড়ে আসা রাস্তাটার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে কিছু ভাবলেন বীরেনবাবু। তারপর অর্জুনকে লক্ষ করে বললেন, 'সুশোভনবাবুর এসব জানবার কথা নয়। আপনি কি এরকম কোনও ঘটনার কথা জানেন? আই মিন, কোনও অ্যাফেয়ার-ট্যাফেয়ার?'

'না।' নিজেকে সংক্ষিপ্ত করে অর্জুন বলল, 'জানলে ওঁরাই জানতেন। আমি শুনিনি।'

রাস্তা পেরিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে এগোতে বীরেন দত্ত বললেন, 'পুলিশকে সবই জানানো উচিত।'

ওরা গাড়ির সামনে এসে পৌঁছুল। চুপচাপ। কেউই কিছু বলবার প্রয়োজন বোধ করল না। বিনয় আগেই উঠে এসেছে নির্দিষ্ট আসনে। সুশোভনের চোখে চোখ পড়ায় অর্জুন লক্ষ করল অদ্ভুত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছেন কাকা। কিছুই বলবার ছিল না। সুতরাং মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

যে যার জায়গায় বসবার পর বীরেন দত্ত বললেন, 'থানাতেই চলুন। যাদবপুরে—'

বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। তবে জোরে নয়, গুঁড়ি গুঁড়ি। সামনের কাচের ওপর সাদা পোকার মতো দাগগুলো জমতে না জমতে মুছে যাচ্ছে নিমেষে। ওয়াইপারের ঢপ ঢপ শব্দের মধ্যে

দিয়ে রাস্তা চিনতে অসুবিধে হয় না। গন্তব্য নির্দিষ্ট জেনে বিনয়ের চালানোতেও দ্বিধা নেই কোনও, মনে হচ্ছে থানাতেই যেতে হবে শুনে ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে যাওয়া সময়টা মেক-আপ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। ভিতরের ও বাইরের নিশ্ছিদ্র স্তব্ধতায় কচিৎ হর্ন এবং ভিজে রাস্তায় ঘষটে যাওয়া চাকার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যায় না।

সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের মাঝামাঝি এসে তবু একটা নতুন শব্দের আবির্ভাবে সচকিত হল অর্জুন। পিছনে তাকিয়ে দেখল, প্রায় বিনয়ের পিঠের কাছে সিটের ওপর মাথাটা নামিয়ে এনেছেন সুশোভন। পিঠটা কাঁপছে, সেখানে সান্ত্বনা দেবার ধরনে ঘোরাফেরা করছে বীরেনের হাত—নাক ও মুখ থেকে নির্গত আবেগ চেপে রাখার চেষ্টায় একটা বিহ্বল শব্দ জড়িয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে।

অস্বস্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে বিনয় অর্জুনের দিকে তাকাতে চোখ সরিয়ে নিল অর্জুন। অস্পষ্ট বোধের ভিতর কেঁপে গেল সামান্য। অব্যক্ত এই শব্দ সে নতুন চিনছে না। বেশ কয়েক বছর আগে, মনে পড়ল, আমেরিকা যাবার সময় এয়ারপোর্টে সিকিউরিটি চেক-এর জন্যে নির্দিষ্ট এনক্লোজারে ঢোকবার আগে সে যখন বাবাকে প্রণাম করতে এগিয়ে গেল, তখন হঠাৎই তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধে মাথা রেখে ঠিক এইভাবেই নাক মুখ অবরুদ্ধ অদ্ভুত শব্দে কেঁপে উঠেছিলেন চিন্মোহন; ভাষা ছিল না, কিন্তু বুকের অনেক গভীর থেকে ছিঁড়েখুঁড়ে বেরিয়ে আসা সেই ধ্বনি যেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিল কিছু। প্রায় অননুভব্য সেই আবেগের অর্থ বুঝতে পারলেও মূক হয়ে গিয়েছিল সে নিজেও।

পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সুশোভন। কাকাই সামলেছিলেন বাবাকে, 'ও তো আবার ফিরে আসবে, দাদা! তিন বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এত উতলা হয়ে পড়ছ কেন!'

নিজেকে সংযত করতে করতে বাবা বললেন, 'কখনও তো ছেড়ে থাকিনি!'

স্মৃতিই ফিরে আসছে এখন। তখন এবং তার পরের।

নিজের অসহায়তা আড়াল করতে চোয়াল দৃঢ় করে অর্জুন ভাবল, না, দুটোই একই ব্যাপার হবে কী করে! মুখ গোঁজার জন্যে তখনও চিন্মোহনের সামনে কাঁধ পেতে রেখেছিল অর্জুন, সেই মুহূর্তে যাওয়াটা সত্য হলেও তার ফিরে আসার মধ্যে অনিশ্চিতি ছিল না কোনও। পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন কাকা।

আজ সবই অন্যরকম। সমস্ত'র অভাবে গভীর অনিশ্চয়তা নিয়ে এই মানুষটি এখন মাথা গুঁজেছেন অনম্য শূন্যতায়। সামলাবার জন্যে বাবাও তো পাশে নেই!

ক্রমশ ঝাপসা হয়ে এল অর্জুনের চোখ দুটো।

৫

যাদবপুর থানায় সুশোভন যে-ডায়েরি করিয়েছিলেন তাতে ইনার নিখোঁজ হওয়া ছাড়াও ছিল বরুণ লাহিড়ী সম্পর্কে সন্দেহ। পরামর্শটা বীরেন দত্তের। লোকটি যে এ ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে জড়িত এমন কিছু ভাববার কারণ এখনই নেই; তবে ঘটনা অনুসারে ইনাকে শেষ দেখা গিয়েছিল ওরই সঙ্গে, গড়িয়াহাট থেকে ট্যাক্সিতে উঠতে। প্রত্যক্ষদর্শী নকুল। এর

পরের ঘটনা সম্পর্কে এ-পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।

ততক্ষণে বাস্তব বুঝতে শুরু করেছেন সুশোভন। খটখটে হয়ে উঠেছে ক্লান্ত চোখ দুটো। এই বৃত্তান্তে গ্লানি আছে জেনেও না করলেন না তিনি।

বস্তুত, চিন্মোহনের বাড়ি থেকে যাদবপুরে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসে যেসব সন্দেহ তাঁর মনে দেখা দেয় তার একটি বরুণকে জড়িয়ে। এরকম কিছু ঘটে থাকলে এবং ইনা যদি স্বেচ্ছায় গিয়ে থাকে, তা হলে তাঁর ও লীনার কথা ভেবে কিছু লিখে যেতে পারে, এই অনুমান থেকে ওর পড়ার টেবিল হাতড়েছিলেন তিনি। সামনে কিছু না পেয়ে ড্রয়ার টানেন, সেটিও ছিল তালাবন্ধ; তখন মনে হয় যে-শিক্ষায় মেয়েকে মানুষ করেছেন এতদিন তাতে এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা কম। তিনি নিজে জেদি, কিছু একটা ঠিক করে নিলে সেটা চট করে নামাতে পারেন না মাথা থেকে। মাঝেমধ্যে মেয়ের মধ্যেও এই ধাতটা দেখে খুশিই হতেন। ধরেই নেওয়া যায় বরুণের সঙ্গে তেমন-তেমন সম্পর্ক গড়ে উঠলে সম্পর্কটা পাকা করবার জন্যে জেদ করতে পাবত ইনা। তাঁরা মানতেন কি মানতেন না সেটা পরের কথা। সেরকম কোনও ইঙ্গিতই কখনও পাওয়া যায়নি ওর কাছ থেকে। সুতরাং, একদিনের একটি অন্তরঙ্গ দৃশ্য কিছুই কি বোঝায়? পিতৃত্বের স্বাভাবিক অধিকার থেকে সেদিন একটু বকাঝকা করেছিলেন তিনি; শুধু পুতুকেই নয়, লীনাকেও। তাইতেই মিটে যায় ব্যাপারটা। লীনা অবশ্য পরে তাঁকে বলেছিলেন, 'আজকালকার ছেলেমেয়েরা অমন একটু মেলামেশা করেই থাকে। বন্ধুর দাদা, একেবারেই অচেনা কেউ তো নয়। এরকম হয়েই থাকে।'

এরপর বীরেন দত্তের বাড়িতে নকুল যখন বলে ইনাকে সে সাড়ে সাতটা নাগাদ দেখেছে গড়িয়াহাটে, তখন লজ্জিত বোধ করলেও ভাবতে পারেননি তার পরেও আছে ট্যাক্সিতে চড়ার ঘটনা। থানাতেই ক্রমশ জানতে পারলেন সন্ধের পর থেকে ঝুমুরও নেই বাড়িতে— ওর দাদা বউদির সঙ্গে গেছে নৈহাটিতে, যুবকটি চেতলায় থাকে না, থাকে ভবানীপুরের কোনও মেসে এবং ওর ছোট ভাই অরু, যে দুর্গাপুরে থাকে, কোনও ব্যাপারেই কিছু জানে না বলে হাঁকিয়ে দিয়েছে বীরেনদের। এই ছেলেটিকে আগাগোড়াই মনে হচ্ছিল বিরক্ত। বলেছে কারও বিষয়ে কিছু জানবার থাকলে সোমবার সকালে গিয়ে খোঁজ করতে।

'সোমবার?'

'তাই তো বলল!'

'ও-সি কল্যাণশঙ্কর রায় বীরেন দত্তের মুখচেনা। মাঝ বয়েসী, স্মার্ট চেহারা, সামান্য ঝুলো গোঁফ এবং অমসৃণ চুলের ছাঁটে একটু ধূর্ত দেখায়। আগে মুচিপাড়া থানায় ছিল, তখনই পরিচয় হয়েছিল একটা মার্ডার কেসের সূত্রে। বীরেনের কথা শুনে হেসে বলল, 'তার মানে চল্লিশ ঘণ্টা। ওই সময়ের মধ্যে কলকাতা থেকে ভারতবর্ষের যে-কোনও জায়গায় পৌঁছুনো যায়—'

'আপনি কি বলছেন ছোকরা জেনেশুনেই বলেছে! মেয়েটা—'

'না। তা বলছি না। মেয়েটি এখনও হয়তো কলকাতাতেই আছে। এখন না থাকলেও সোমবার সকালের আগেই ফিরে আসতে পারে। হয়তো কাল সকালে—'

অর্জুন ঝুঁকে পড়ে বলল, 'কী সন্দেহ করছেন একটু খুলে বলুন না! আমার কাকা কাকিমার অবস্থা বুঝতেই পারছেন!'

'আমি পসিবিলিটিগুলোর কথা ভাবছি। সন্দেহ পরে হবে।'

বীরেন দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'যেমন?'

'যাকে প্রাইম সাসপেক্ট ভাবা হচ্ছে সে হয়তো এখানে ক্যাজুয়াল রোল প্লে করেছে।' ও-সি বলল, 'প্রফেসর সাহেবের মেয়ে তার বন্ধুর—কী বললেন মেয়েটির নাম? হ্যাঁ, ঝুমুর—ওদের সঙ্গে নৈহাটিতে গেছে কি না সেটা দেখতে হবে। তার আগে দেখা দরকার নৈহাটি যাবার ঘটনাটা সত্যি কি না!'

'অ্যাবসার্ড! আপনি তো মশাই সুকুমার রায়ের গেছোদাদার গল্প ফেঁদে বসলেন!' ক্ষুব্ধ গলায় বললেন বীরেন দত্ত, 'জ্যাঠা মরছে, আর সে যাবে নৈহাটি বেড়াতে! এটা কি নর্মাল।'

'নর্মাল সিচ্যুয়েশনে কেউ কি মিসিং হয়, স্যার। তা ছাড়া, আপনারাই বলেছেন মেয়েটি যখন বাগবাজার ছেড়ে যায় তখনও ওর জ্যাঠার কন্ডিশন স্টেবল ছিল। মারা যাবেন তা ভাবেইনি।' বীরেন দত্তকে থামিয়ে দিল ও-সি। মুখে লড়ে জেতা হাসি। বলল, 'ওয়ার্স্ট, সে ওই বরুণ ছোকরার সঙ্গেই আছে, কলকাতাতেই। বরুণের বাড়ির লোকেরা সত্যিই কিছু জানে না। অবশ্য ওটা মেস কি না জানা দরকার। থার্ড পসিবিলিটি ওই ট্যাক্সি চড়া। ওটা এমনই একটা সময় যখন কলকাতা থেকে বেরিয়ে যাবার অনেকগুলো চ্যানেল খোলা থাকে। এনিথিং ইজ পসিবল।'

'আমার তা মনে হয় না।' বিনয় বলল, 'সুশোভনবাবু বলছেন ন'টা নাগাদ একটা ফোন পান বাড়িতে, নরেশের নাম করে। অথচ নরেশ—'

'ফোনটা—কিছু মনে করবেন না, আমার বিশ্বাস এই মেয়েটি, ইনা মুখার্জিরই চেনা কেউ করেছিল। হয়তো বরুণই—'

'তা হলে তো', কোনও ক্লু খুঁজে না পেয়ে ভুরু জুড়ে এল বীরেন দত্তের, 'এরকমই বা করবে কেন! এই ফোনটা?'

'এটাই সাসপিসনের মেন পয়েন্ট। হয়তো আগেই গেস করেছিল আপনারা খোঁজাখুঁজি করবেন। কনফিউজ করে দিয়ে সময়টা বাড়িয়ে নিল। কিন্তু—'

ও-সি এবার চিন্তিত ভঙ্গিতে দেখল সুশোভনকে।

'মুখুজ্যেমশাই, আপনাদের বাগবাজারে যাওয়া এবং ফিরে আসার মধ্যে আপনার মেয়ে বাড়িতে আসেনি, কিছু নিয়ে-টিয়ে যায়নি, এটা আপনি সিওর?'

'আমি আর কী বলব! বাড়ি ফিরলে জানাই যেত। মণ্টু ছিল। ও মিথ্যে বলবে না।'

ও-সি চুপ করে গেল। খানিক পরে গম্ভীরভাবে বলল, 'ঠিক আছে। আমরা দেখছি কী করা যায়। এ সব স্পেকুলেশন করে কোনও লাভ নেই। কংক্রিট কোনও ইনফরমেশন পেলে কাল জানিয়ে দেব। আপনারা এখন—'

ওরা উঠে পড়ার আগে বিনয় বলল, 'আপনি কি শিবদাস মল্লিককে চেনেন?'

ও-সি নিজেও উঠে দাঁড়িয়েছিল। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা টুপিটা তুলে নিয়ে সোজা চোখে তাকাল বিনয়ের দিকে।

'কে শিবদাস মল্লিক!'

'আই-জি, ক্রাইম।'

'আপনি চেনেন নাকি?' ও-সি হাসল; অর্থপূর্ণ, সরু হাসি। বলল, 'তা হলে তো আসল লোককেই চেনেন। আমরা ফেল করলে ওঁর কাছেও যেতে পারেন। আত্মীয় নাকি?'

'না, না।' বিনয় কথাটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করল, 'যা করবার আপনিই করুন।'

লোকটি আর সময় নষ্ট করতে চাইল না। চোখ রাখল হাতের ঘড়িতে।
'এফ-আই-আর নাম্বারটা কাজে লাগবে। ওটা হারাবেন না।'

দু সপ্তাহ কেটে গেল। ইনা ফিরল না। এমনকী তার সম্পর্কে এমন কোনও খবর পাওয়া গেল না যা থেকে কী হল মেয়েটার, কোথায় গেল, জীবিত না মৃত, এ সব বিষয়ে সামান্যতম আন্দাজও পাওয়া যায়।

লীনা প্রায় স্তব্ধ। সান্ত্বনা দেবার কিছু নেই, তবু বুঝতে পারছিলেন সুশোভন ভিতরের ক্ষয় ক্রমশ কুরে খাচ্ছে ওঁকে। এতদিন চমৎকার ও হৃষ্ট স্বাস্থ্য ছিল লীনার; শরীরের জোরেই সরিয়ে রাখতেন রোগবালাই। স্বভাবে চাপা হলেও মুখে হাসি লেগে থাকত সব সময়। ইনার অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাসিটাই হারিয়ে গেল প্রথমে। কান্নাকাটি করছেন না, প্রশ্নও নেই কোনও, কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ। সুশোভনের সামনে যেটুকু না করলেই নয় সেটুকু বাদে ছেড়ে দিয়েছেন খাওয়াদাওয়া। কৃশ হয়েছেন, চোখের কোলে পড়েছে বাড়তি বয়সের ছাপ। সিঁথির পাশের চুলে হঠাৎই দেখা দিল পাকার চিহ্ন।

এর সঙ্গে দেখা দিল নতুন উপসর্গ। যখন-তখন শুয়ে পড়েন বিছানায়; কিংবা, সন্ধের পর চুপচাপ বসে থাকেন গ্রিল-দেওয়া বারান্দায়। অন্ধকারে। মাথা বুকের দিকে নামানো। এই দুটো সময়েই দেখা যায় পুরো মুখটাই ঢেকে রেখেছেন আঁচলে। যখন শুয়ে থাকেন তখনও, সুশোভন দেখেছেন, সেইরকমই আঁচলে ঢাকা মুখ, তার ওপর আড়াআড়ি হাত চাপা দেওয়া। সেই প্রথম দিন বাগবাজার থেকে ফিরে, খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে, যেভাবে শুয়ে পড়েছিলেন বিছানায়। জেগে না ঘুমিয়ে তা পর্যন্ত বোঝা যায় না।

চিন্মোহনের শ্রাদ্ধ চুকে গেল। শ্মশানে যেতে পারেননি, শ্রাদ্ধের দিন একাই বাগবাজারে গিয়েছিলেন সুশোভন। লীনাকে নড়ানো যায়নি।

নিয়মভঙ্গের পর দিন সুশোভন আবিষ্কার করলেন লীনা মাছ-মাংসও ছুঁচ্ছেন না। ব্যাপারটা লক্ষ করে কিছু বলবেন ভেবেও নিরস্ত করলেন নিজেকে। বেসিনে হাত মুখ ধুতে গিয়ে খুব ভাল করে নিজেকে লক্ষ করলেন আয়নায়। আমি কি বদলেছি? কই, সেরকম তো বোঝা যায় না কিছু! তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তবু একটা কাঁটাফোটা যন্ত্রণায় টনটন করে উঠল গলা। বাষ্পে আচ্ছন্ন হয়ে গেল চোখ দুটো। আমি এখনও বেঁচে আছি, পুতু, তবু এ কোন বৈধব্যে তুই ঠেলে দিচ্ছিস তোর মাকে।

লীনাকে দেখতে দেখতে নিজেকেও বুঝতে পারছিলেন সুশোভন। ইনার বাপ-মা হওয়া ছাড়া এতদিন তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি স্বামী-স্ত্রী, এখন হয়ে গেছেন শুধুই বাপ-মা। যত দিন যাচ্ছে ততই অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন এই সম্পর্কে। ইনার জায়গাটা ক্রমশ ভরে উঠছে শূন্যতায়।

জুলাইয়ের গোড়ায় হঠাৎই শুরু হয়ে গেল প্রবল বৃষ্টি। চলল একটানা তিন দিন। বিশেষত রাতগুলো যেন অস্থির হয়ে উঠেছিল মেঘের গর্জন আর বৃষ্টির শব্দের কাড়ানাকাড়ায়। চকিত বিদ্যুতের আলো ছুটে আসে ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত, চিরে দেখায় অন্ধকার।

আচমকা একটা শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল সুশোভনের। পাতলা ঘুম, এমনিতেই ভেঙে যায় মাঝে মাঝে। তবে আজ যেন অভ্যাসের ঘুমে জড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি। কিছুক্ষণ আচ্ছন্ন থেকে অন্ধকারেই আস্তে আস্তে নেমে এলেন বিছানা ছেড়ে। আন্দাজে সিঁড়ি বুঝে

নীচে। মণ্টু ঘুমোচ্ছে বোঘোরে। নীচের তলার ভাড়াটে অলোক মিত্তিররা ফিরে এসেছে ক'দিন হল। ওদিকটাও নিঃশব্দ।

বেরুবার দরজার ছিটকিনি ও ল্যাচ খুলে ফেললেন সুশোভন। হাট করে দিলেন দরজাটা। বৃষ্টি। শুধুই বৃষ্টি কালো পর্দা নামিয়ে রেখেছে সামনে। এক হাত দূরত্বও অদৃশ্য। কালো জলের ঝাপটায় ভিজে গেলেন তিনি।

দরজা বন্ধ করে আবার উঠে এলেন ওপরে। শোওয়ার ভঙ্গিতে তারতম্য নেই লীনার। জেগে না ঘুমিয়ে বুঝবার উপায় নেই। সাবধানে দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন বারান্দায়। এখন তাঁর দৃষ্টি অনেক স্বচ্ছ। হঠাৎই মনে হল কেবিনে আবদ্ধ, জাহাজটা ক্রমশ তলিয়ে যাচ্ছে চারপাশের জলে। তবুও এগিয়ে গিয়ে দু হাতে গ্রিল চেপে ধরে দাঁড়ালেন সুশোভন, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে চলে গেলেন বৃষ্টির ভিতরে।

স্বপ্ন নয়। সার্চলাইটের মতো আবছা একটা আলো যেন ঘোরাফেরা করছে রাস্তায়। রাস্তাই খুঁজছে। অস্পষ্ট হতে হতে হারিয়ে গেল ক্রমশ।

বৃষ্টির ছাঁটে চেয়ারগুলোও ভিজে। সরে এসে বসলেন একটায়।

তখনই গলা পেলেন লীনার।

'এভাবে আর কতদিন কাটবে! দিন রাত্তির সবই তো এক হয়ে গেল!'

বারান্দায় বেরিয়ে এলেও এক হাতে দরজার পাল্লাটা ধরে রেখেছেন লীনা। প্রশ্ন না বিস্ময় বোঝা যায় না ঠিক। তবে অনেক দিন পরে এত দূর স্পষ্টতায় কথা বলতে শুনলেন স্ত্রীকে।

'থানা থেকে খবর দেবে বলেছিল । একটা গাড়ির শব্দ শুনলাম। মনে হল এখানেই—'

'রোজই কি একই শব্দ শোনো!'

'রোজ! না তো!'

গভীর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ এড়াতে পারলেন না লীনা। অন্ধকার ও বৃষ্টি ঠিকরে বেরিয়ে আসা চমকানো বিদ্যুতের আলোয় ওঁর তখনও অনাবিষ্কৃত মুখের রেখাগুলো দেখা না দিয়েই হারিয়ে গেল।

'এসো না!' স্নেহে ডাকলেন সুশোভন, 'বোসো আমার পাশে।'

বেঁকে থাকা চেয়ারটা নিজেই সোজা করে দিলেন সুশোভন। লীনা বসবার পর আলতো হাত বুলিয়ে দিলেন ওঁর আঁচলস্খলিত মাথার পিছনে। সত্য আড়াল করা যায় না, তবু সহজেই আড়াল করলেন তাড়াহুড়ো করে উঠে আসা নিঃশ্বাস।

'মিথ্যে বলছি না। একটা গাড়ি সত্যিই এসেছিল এদিকে। ফিরে গেল।'

'তোমার ধারণা সে গাড়ি চড়েই আসবে!'

সুশোভন জবাব খুঁজে পেলেন না।

'রোজই তো থানায় যাচ্ছ একবার করে। কী বলে তারা তোমাকে!'

'এখনও খুঁজছে। ধরপাকড়, জেরা করছে। গোপন ব্যাপার। সবই কি বলবে আমাকে! তবু পুতু বেঁচে আছে এখনও। পুলিশই বলছে।'

'কোথায়। কীভাবে। সে কি আর পুতু আছে!'

দু হাতে মুখ ঢেকে ফেললেন লীনা।

হাতে মুখ ঢাকলে যে-অন্ধকার, সেই একই অন্ধকার উঠে এল সুশোভনেরও চোখে। একই প্রশ্ন আঁচড় কেটে গেল মাথায়, পুতু কি বেঁচে আছে? থাকলে কীভাবে?

শুধু থানাতেই কি যাচ্ছেন তিনি! পুতু যতদিন কাছে কাছে ছিল ততদিন রুটিনে আবদ্ধ তাঁর যাবার ঠিকানাগুলোও ছিল নির্দিষ্ট। অবাধ চারদিকে এখন যাবার রাস্তা খোলা। ঠিকানারও অভাব নেই। ইদানীং পড়ানো চলে গেছে মাথা থেকে। টিউটোরিয়ালেও যান না। তবুও যাচ্ছেন, হঠাৎ-হঠাৎ মনে পড়ে যাচ্ছে যাবার জায়গা।

এর মধ্যে বিনয় একদিন নিয়ে গিয়েছিল শিবদাস মল্লিকের কাছে। আই-জি, ক্রাইম। গম্ভীর, কথা বলেন কম, কিন্তু ভদ্র ও অমায়িক।

'আপনার মেয়ের কেসটা আমরা জানি, মুখার্জি সাহেব। বিনয় আগেও বলেছিল আমাকে। যতদূর জানি, ইনভেস্টিগেশনের প্রোগ্রেস ভালই। শুধু কলকাতাতেই নয়, প্রত্যেক স্টেটে খবর গেছে। এখন ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের ডি-আই-জি রতন ভটচায নিজে তদন্ত কবছেন।'

'কবে ফিরে পাব ওকে?'

'আশা করছি, শিগ্রিই। এসব ক্ষেত্রে ভিকটিম নিজে কোঅপারেট কবলে কাজ সহজ হয়ে ওঠে। কিন্তু—। দেখা যাক—। আপনি নিশ্চিত থাকুন, আমাদের তরফ থেকে কোনও ত্রুটি থাকবে না।'

'ও বেঁচে আছে তো?'

'হোপফুলি ইয়েস।' ভদ্রলোক গুটিয়ে নিলেন নিজেকে, 'আপনাব অবস্থা বুঝতে পারছি। তবে আমরা যতক্ষণ না আশা ছাড়ছি, ততক্ষণ আপনিও আশা ছাড়বেন না। মিস্টার ভটচায শিগ্রিই যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।'

এসব আশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়া যায়, কিন্তু বিশ্বাসে পৌঁছুবার আগেই হারিয়ে যায় তাৎপর্য। শিবদাস মল্লিকের কথা শেষ হবার পরও ফ্যালফ্যাল করে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন সুশোভন।

'একটা প্রশ্ন ছিল।'

'বলুন।'

বলবাব জন্যে তৈরি হয়েও দ্বিধায় জড়িয়ে গেলেন সুশোভন। তাবপর বললেন, 'ওকে ফ্লেশ ট্রেডে চালান করে দেয়নি তো?'

'ফ্লেশ ট্রেড!' হেলানো অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলেন শিবদাস। অস্বস্তি ভরা চোখে তাকালেন এতক্ষণ চুপচাপ বসে থাকা বিনয়ের দিকে। তাবপর হঠাৎ সামনে ঝুঁকে এসে ডান হাতের মুঠোয় পেপারওয়েটটা চেপে ধরে বললেন, 'আপনি কি খবরের কাগজের রিপোর্ট দেখে ইনফ্লুয়েন্সড হচ্ছেন! ওরা ওসব লেখে, সন্দেহ করে, জট পাকায়। আপনার মেয়ে ফ্লেশ ট্রেডে যাবে কেন!'

সুশোভন জানেন না কেন। ইনা নিখোঁজ হবার দিন চারেক পরে ছোট্ট একটা রিপোর্ট বেরিয়েছিল কাগজে—'অষ্টাদশী তরুণী নিখোঁজ'। তাতে এরকম সম্ভাবনার কথা ছিল, ছিল একই সময়ে নিখোঁজ হওয়া আরও দুটি মেয়ের কথা। সেসব দেখে নয়। বলতে পারলেন না কিছু ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে তাঁর নিজেরই মনে, অনুভবে। ধারণাই নিয়ে যাচ্ছে আশঙ্কায়।

'প্রত্যেক ভিকটিমেরই কিছু নিজস্ব ক্যারেকটারেস্টিক থাকে। ইনভেস্টিগেশনের সময় আমরা সেগুলো স্টাডি করে দেখি। আপনার মেয়ে সম্পর্কে আমরা যেটুকু জেনেছি, সি ইজ নট ভালনারেবল অ্যাজ আ টাইপ। রেজাল্ট ভাল, সি ইজ ইনটেলিজেন্ট অ্যান্ড

ওয়েলভিহেভড। ওর কলেজের প্রিন্সিপালও বলেছেন তো। তবে ভুল নিশ্চয়ই করেছে—'

এর পরের কথাগুলো বলেননি শিবদাস। কী ভুল তাও বলেননি। সুশোভনও ভরসা পাননি জিজ্ঞেস করতে। সঙ্কোচ ও দ্বিধা একই সঙ্গে চাপ দিচ্ছিল তাঁর গলায়।

বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেছিলেন বিনয়কে।

'ইনি ঠিক কতটা জানেন, কতটা বললেন আমাকে?'

'সবই তো শুনলেন, মেসোমশাই।'

'হ্যাঁ, শুনলাম। সেই একই কথা, আশা ছাড়বেন না। থানার ও-সি যা বলছে, পুলিশের বড়কর্তাও তাই। বলতে পারো, এর মাঝখানে কী আছে?'

দীর্ঘ দেহ সুশোভনের। কিছুটা পাকিয়ে যাওয়ার জন্যে দীর্ঘ লাগছে আরও। ক্লান্তও। সিঁড়ি নামছিলেন সাবধানে, রেলিং ধরে ধরে। কিছু বা অন্যমনস্কও। যেন মনের মধ্যেও নামছেন এক ধাপ থেকে আর এক ধাপে। যদি নিজের ভিতর থেকেই উঠে আসে উত্তরটা।

কথা বাড়াল না বিনয়। পুলিশের ওপর মহল পর্যন্ত তাঁর মেয়েকে নিয়ে চিন্তিত, অনুসন্ধান চলছে, শুধু এটুকু আশ্বাস পাইয়ে দেবার জন্যেই সুশোভনকে নিয়ে এসেছিল এখানে। শিবদাস আশ্বাসই দিয়েছেন, তার বেশি এগোননি। কিন্তু, বিনয় জানে রহস্য আরও গভীরে। হয়তো গভীরতর হবে।

সে নিজেও আরও একবার আশ্বাস দিতে পারত সুশোভনকে। দিল না। ভাবল, লাভ কী!

স্ত্রী শিখা বছর তিনেক আগে ক্যানসারে মারা যাবার পর থেকে আশা, আশ্বাস শব্দগুলো অর্থহীন মনে হয় বিনয়ের কাছে। এও জানে জীবন অপ্রত্যাশিতে ভরা, যা হোক কিছু ঘটে যেতে পারে যে-কোনও সময়ে। মনে হয় হাড়পাঁঠা ছাড়া যে কেউই জানে তা, দেখতেও পায় শঙ্কার ফাটলগুলো। নিজেরাই আঁশপাঁশ গোঁজে সেখানে, তারপর পিছন ফিরে ভাবে, নেই, দেখা যাচ্ছে না কিছু। ফুর্তিতে বুড়বুড়ি কাটে অ্যাকোরিয়ামের মাছের মতো। সে নিজেও কি তা-ই করেনি দীর্ঘকাল! এখন আর উৎসাহ নেই। নিজেই বুঝতে পারে বেঁচে যাচ্ছে বাঁচার তাগিদে। একমাত্র সন্তান রাজীব দিল্লির জে-এন-ইউ থেকে বেরিয়ে আসবে সামনের বছর। মোটামুটি কৃতী ছেলে; ওর জন্যেও ভাবে না। চাকরির দায় মেটানো ছাড়া এখন ওর যা ভাল লাগে তা ড্রাইভিং, শুধুই গাড়ি নিয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়ানো। শিখা যাবার পর পার্টিফার্টিও ছেড়ে দিয়েছে। জুত পায় না তেমন।

তবু সেদিন রাতে, গাড়িতে, সুশোভনের কান্না টলিয়ে দিয়েছিল তাকে। কোনও কোনও মানুষের জন্যে কিছু করার থাকলে করা উচিত এই বোধ থেকে শিবদাস মল্লিককে ডেকেছিল ক্লাবে। পুরনো পরিচয়, পছন্দও করেন তাকে, মাঝেমধ্যে খোঁজ নেন টেলিফোনে।

লনের একান্তে মুখোমুখি। সামনে হুইস্কির গ্লাস। চুমুক দিলে ভাবুক লাগে শিবদাসকে।

'আঠারো বছরের একটা মেয়ে যখন ত্রিশ-বত্রিশের একটা ছেলের সঙ্গে স্বেচ্ছায় চলে যায়, তখন বোঝাই যায় যার সঙ্গে যাচ্ছে সে তার কাছে সবচেয়ে বেশি ইমপর্ট্যান্ট। বাপ-মা'র কষ্ট? হ্যাঁ, সেগুলো আছে। তবে পুলিশ ইনভেস্টিগেশনের আওতায় পড়ে না। ছেলেটা যেভাবে নাচাবে মেয়েটাও সেইভাবে নাচবে। ফেরার চেষ্টা করবে মোহভঙ্গ হলে। ট্র্যাজেডিটা এইখানে। এটা সিম্পল, তোমরা যাকে বলো লায়লা মজনুর গল্প, তা নয়। তা হলে আসত দু তিনদিনের মধ্যেই, বলত ভালবাসি, বিয়ে করেছি। কেসটেস হলে হত। উই

আর নট বদারড অ্যাবাউট দ্যাট। এই বরুণ লাহিড়ী সম্পর্কে এ পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি তাতে মনে হয় না ইটস গোয়িং টু বি আ ভেরি সিম্পল কেস। এর মধ্যে আরও কোনও ব্যাপার থাকতে পারে। আই মিন, বিয়ন্ড দা টু। এ ধরনের কমপ্লিকেটেড কেস বাড়ছে ক্রমশ। দেখা যাক।'

শিবদাস আর ভাঙেননি। বিনয়ও ভাঙাতে চায়নি। অশোক এবং অর্জুনকে বলেছিল খুলে।

কেউই অবাক হয়নি।

'এখন ফিরে এলেই বা কী হবে!' অশোক বলল, 'বিয়েটিয়ে করে ফেললে হয় দুজনকেই মেনে নিতে হবে, না হয় সম্পর্ক ত্যাগ করবেন। কিন্তু যতক্ষণ না ফিরছে, নিশ্চিত কিছু জানা যাচ্ছে, টেনশনটা থাকবেই। ছটফটানিও কমবে না। মেয়ে কারুর সঙ্গে পালিয়ে গেছে— কাকা কাকিমার কাছে ঘটনাটা এখানেই থেমে থাকতে পারে না।'

'যা করার পুলিশই করবে। ওরাই করতে পারে।'

'পারে কি?' অর্জুন বলল, 'করছি আর অ্যাকচুয়ালি করা দুটোই এক ব্যাপার নয়, বিনয়দা। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে উনি এর মধ্যে অ্যাফেয়ার ছাড়াও আরও কিছু আছে ভাবছেন। তা থাক না। খুঁজে বের করতে পারছে না কেন। খোঁজার ব্যাপারে পুলিশ কতটা সৎ? কাগজে দেখছিলাম, মে মাসে এই কলকাতাতেই নিখোঁজ হয়েছে ছ শো সাত জন, তার মধ্যে হদিশ পাওয়া গেছে এক শো পঁয়ত্রিশ জনের। বাকিরা কোথায় গেল! পুলিশের কাজ কি শুধু এফ-আই-আর লেখা?'

'আমি পুলিশে কাজ করি না। দু একজনকে চিনি, এই পর্যন্ত। তবে—', বিনয় বলতে বাধ্য হল, 'শিবদাস মল্লিক সৎ মানুষ। ওঁকে সন্দেহ করার কারণ নেই।'

অশোক বলল, 'ড্যামেজ যা হবার হয়ে গেছে। পুলিশের ওপরই যখন ডিপেন্ড করতে হবে তখন এসব আলোচনায় গিয়ে লাভ নেই। কাকা রেস্টলেসের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এ সময় একটু ভরসা যদি পান। তুমি ওঁকে একবার মিস্টার মল্লিকের কাছে নিয়ে যাও। ওটা অক্সিজেনের কাজ করতে পারে।'

তা-ই করেছিল। এখন সুশোভনকে দেখে মনে হল, ইনি অক্সিজেনের পেসেন্ট নন। ভিতরে যা জমে আছে তা-ই ঠেলে উঠছে মাঝে মাঝে, উগরে দিচ্ছেন সমস্ত স্তোকবাক্য। বিনয় খুঁটিয়ে দেখেছিল, প্রশ্নটা করার আগে অদ্ভুত দৃষ্টিতে শিবদাসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সুশোভন; ওকে ফ্লেশ ট্রেডে চালান করে দেয়নি তো? নিজের মেয়ে সম্পর্কে এমন প্রশ্ন কোনও বাপের মুখে চট করে উঠে আসে না; এ প্রশ্নের পিছনে জড়িয়ে থাকে দৃশ্যও। জায়গাটা দেখিয়ে দিলাম, যেন বলছিলেন শিবদাসকে, ওকে তুলে আনো, ফিরিয়ে দাও আমাকে। স্পষ্ট লক্ষ করেছিল, খবরের কাগজের অজুহাত তুলে ধমক দেবার আগে মুহূর্তের জন্যে হলেও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল শিবদাসের মুখ। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার জন্যে পেপারওয়েট চেপে ধরেন মুঠোয়। তখন অর্জুনের প্রশ্নটাই ফিরে আসে।

ঘাড় তুলে আকাশ দেখলেন সুশোভন। পরিষ্কার নীলে ছড়িয়ে আছে কয়েক খণ্ড সাদা। পড়ন্ত সূর্যের আলো চশমায় প্রতিফলিত হয়ে বদলে দিয়েছে মুখের রেখাগুলো। এয়ার কন্ডিশানড ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে না আসতেই অস্পষ্ট ঘামের জালি পড়েছে ঘাড়ের পিছনে। পাঞ্জাবিটা ময়লা, নিশ্চিত কয়েকবার পরা, ফেঁসে আছে গলার কাছে।

'প্রিন্সিপালের সার্টিফিকেট শুনলে?'

বিনয় জবাব দিল না।

'কত বছর ছাত্র পড়ালাম। পড়াতে পড়াতে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলাম অক্ষরে। সত্য সত্যই, তার আর একটা অর্থ মিথ্যা নয়। এখন সবই গুলিয়ে যাচ্ছে। প্রিন্সিপালের কাছে আমিও গিয়েছিলাম। মহিলা আধঘণ্টা বসিয়ে রাখলেন বাইরে, বেঞ্চিতে। তারপর ডেকে কী বললেন জানো?'

উত্তরটা নিজেই দেবেন। বিনয় ওঁর চোখ দুটোই দেখল।

'হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে দিলেন। আমার মেয়ে ইনা মুখার্জির জন্যে কলেজের রেপুটেশন নষ্ট হয়ে গেছে। অভিভাবকদের কাছ থেকেও কমপ্লেনট আসছে। ওর দৃষ্টান্ত অন্য মেয়েদেরও খারাপ করতে পারে, এই আশঙ্কায় কলেজ থেকে খারিজ করে দিচ্ছে ওকে।'

সুশোভনের গলা কাঁপল না। দৃষ্টিও ঝাপসা হল না। শুধু নিঃশ্বাস ছাড়ার জন্যেই সময় নিলেন একটু।

'যে নিজেই খারিজ হয়ে গেছে, তাকে নতুন করে খারিজ করে লাভ কি। ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া। আসলে খারিজ হয়ে গেলাম আমিই। এর পর যদি কোনও মেয়ের ওরকম ইনসিডেন্ট হয়, আমার শুধুই মনে হবে, আমিই রং, আমার মেয়েই কালপ্রিট!'

'ফেস সেভিংয়ের জন্যে অনেকেই অনেক কিছু করে, মেসোমশাই। এগুলোকে ইমপর্ট্যান্স দেবেন না।'

'দিলেই আর কি!' সূক্ষ্ম রেখায় হাসলেন সুশোভন। বললেন, 'পুতু ফিরে এলে একটা কথাই জিজ্ঞেস করতাম। আমার ভুলটা কোথায়? আমাদের? না ফিরলে কে জানাবে!'

ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিলেন নিজের মধ্যে। বিনয় ওঁকে বাড়ি পৌঁছে দেবে।

'এঁদের ওপরে কে?' গাড়িতে ওঠার আগে শুধু জিজ্ঞেস করলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী? অন্তত বডিটাও যদি ফিবিয়ে দিত, একটু হালকা হতে পারতাম।'

পাশে লীনা। সামনে বৃষ্টি এবং অন্ধকার। অনুভূতিতে চারপাশের জলের মধ্যে ডুবে যাওয়ার নৈঃশব্দ্য। ভাবতে ভাবতে নিজের কথাতেই ফিরে এলেন সুশোভন এবং আবারও ভাবলেন, লীনাকে বলা যাবে না; কিন্তু জীবিত না হোক, ওর মৃতদেহটাও যদি এনে দিত কেউ।

'রাত হয়েছে। শুয়ে পড়ো।'

'রাত কি শুধু আমারই হয়েছে!' অন্ধকারে মুখ দেখা যায় না ভাল করে, অনেকদিনের না-বলা অভ্যাসে দীর্ঘশ্বাস মেশালেন লীনা, 'আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না।'

'তবু বাঁচতে তো হবে।'

'কার জন্যে। সে কি আর ফিরবে!'

'জানি না। হয়তো নিজেদের জন্যেই। এ বয়সে আত্মহত্যা করলে লোকে সামনে সহানুভূতি দেখাবে, আড়ালে হাসবে।'

'এখনই হাসছে।'

ঘাড় ফিরিয়ে স্ত্রীকে দেখলেন সুশোভন। স্বরটুকুই চিনলেন শুধু, অর্থ বুঝলেন না। হঠাৎই মনে হল, যদি লীনাও চলে যায়।

নৈঃশব্দ্য জুড়ে ফিরে এল বৃষ্টির শব্দ।

আস্তে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। তারপর সংযত গলায় বললেন, 'ভাবনা ভাবনাই বাড়ায়। কী করবে। ভাগ্যে থাকলে আগেই মরতাম।'

৬

কিছুদিন আগেও ভোরে ওঠার অভ্যাস ছিল সুশোভনের। ভাল লাগত প্রত্যুষের সৌন্দর্যে নিজেকে জড়িয়ে রাখতে। চারদিকে অন্ধকার আবছা হয়ে এলেও আলো ফুটত না, নানা বিচিত্র রঙে বর্ণময় হয়ে উঠত আকাশ, ক্রমশ একত্র হত পুব দিগন্তে। একটার পর একটা নতুন বাড়ি ওঠার ফলে এ তল্লাটে গাছগাছালি কমে এসেছে, তবু ভোরের এই সময়টায় চারদিক থেকে জেগে উঠত অসংখ্য পাখির ডাক। হাওয়ার মসৃণতায় জুড়িয়ে যেত মন। গরম গুমোটের দিনেও মনে হত প্রসন্নতায় ছেয়ে আছে চারদিক। অনেকদিন বাঁচা হল, কর্মজীবনও শেষ হয়ে গেল; তা সত্ত্বেও কে যেন জড়িয়ে রাখছে পৃথিবীর মায়ায়।

ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তেন রাস্তায়। যাদবপুর পেরিয়ে যোধপুর পার্কের রাস্তা ঘুরে লেকের দিকে। কাঁধে ঝোলা থাকত একটা। তাতে দুধের বোতল আর কার্ড। হন হন করে হাঁটা। এক চক্কর দিয়ে যখন ফিরতেন তখন সদ্য খুলেছে মিলক বুথ, ভিড় থাকত না, পাশেই পাঁচমিশেলি দোকানে সদ্য ডেলিভারি হওয়া পাঁউরুটি থেকে বেরুত টাটকা ময়দার গন্ধ। ফিরতে ফিরতে ছ'টা, সওয়া ছ'টা। তাপ ফুটতে শুরু করেছে রোদে।

খুব শীত কিংবা বৃষ্টি-বাদলা ছাড়া ভোরই টেনে নিয়ে যেত বাইরে। তবে এসব দিনেও কান-মাথা ঢেকে কিংবা ছাতা নিয়ে দুধটা, পাঁউরুটিটা নিয়ে আসতেন নিজেই।

ইনার অন্তর্ধানেব পব ছেদ পডল অভ্যাসে। এখন ঘুমের সময় অসময় নেই। প্রায়ই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে বসে থাকেন বারান্দায়, কিংবা পায়চারি করেন নিঃশব্দে। পবে ঘুমিয়ে পড়লেও দেরি হয় বিছানা ছাড়তে। আলস্য লাগে। ইচ্ছেও করে না।

এর সঙ্গে দেখা দিল নতুন অস্বস্তি। লেকে কিংবা দুধের ডিপোর সামনে দেখা হত চেনা বা মুখচেনা কারও কারও সঙ্গে। দু পাঁচটা কথাও হত। ইনা চলে যাবার পর আস্তে আস্তে চাউর হয়ে গিয়েছিল খবরটা। ঠিক কী হয়েছে না জানলেও মূল তথ্যে ভুল ছিল না কোনও, যে যার মতো করে ভেবে নিচ্ছিল। চোখে প্রশ্ন থাকলেও মুখ ফুটে কেউই জিজ্ঞেস করত না কিছু।

সেদিন সন্ধের পর হঠাৎ ফোন পেলেন একটা।

'আপনি কি মিস্টার মুখার্জি?

'হ্যাঁ।'

অপরিচিত, একটু ভারী গলা। সুশোভন জানতে চাননি কে। লোকটিও নিজের পরিচয় দিল না। শুধু বলল, 'আমাকে চিনবেন না। এইমাত্র আপনার মেয়ের ছবি দেখলাম টি-ভিতে—'

পুলিশ ছবি নেবার পর থেকেই জানতেন এরকম হতে পারে। আশঙ্কা থেকে টি-ভি দেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন ইদানীং। জানতেন না দেখিয়েছে।

শুনে কথা জোগাল না মুখে। নিরুদ্দেশ সম্পর্কে ঘোষণায় যাদের কথা জানানো হয় তাদের পিতৃ-পরিচয় দেওয়া হয় না কখনও, এ ক্ষেত্রেও অবশ্যই দেয়নি। তা হলে যে ফোন করছে সে তাঁকে স্পট করল কীভাবে! এ নিশ্চয়ই তাঁকে চেনে।

আবার জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি ওর রিসেন্ট ছবি?'

জবাব না দিয়ে ফোনটা সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিলেন সুশোভন। এ প্রশ্নও যে কেউ করবে তা ভাবতে পারেননি। মানুষের কৌতূহল কি এভাবেও প্রকাশ পায়!

পরে ভাবলেন, এটা হ্যাজার্ড। একের কৌতূহল অন্যের দুঃখ স্পর্শ করে না। এরকম হতে পারে। হলে সহ্য করে নিতে হবে।

চুপচাপ হয়ে গেলেও স্বভাবে সতর্কতা বাড়ছে লীনার। সুশোভনকে হঠাৎই আরও বেশি গম্ভীর হতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'কার ফোন?'

'কারুর নয়। রং নাম্বার।'

লীনা আশ্বস্ত হলেন না তবু। খানিক স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'মণ্টু নীচে গিয়েছিল। মিত্তিরদের ছেলে বলেছে পুতুর ছবি দেখিয়েছে টি-ভিতে—'

'দেখাতেই পারে। পুলিশ যা যা করার করবে। প্রতিদিনই তো কত হারিয়ে যাওয়া মানুষের ছবি দেখায়। পুতুও হারিয়ে গেছে।'

লীনা চুপ করে গেলেন।

এই ঘটনার দু-তিনদিন পরে একদিন দুধের ডিপোর সামনে দাঁড়িয়ে দেখলেন অদ্ভুত দৃষ্টিতে এক বেঁটে, টাক-মাথা প্রৌঢ় তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। টিয়াপাখির ঠোঁটের মতো বাঁকানো নাক, ছোট চোখ দুটি অনেকটা ভিতরে ঢোকা, কিন্তু তীক্ষ্ণ। লোকটিকে আগেও দেখেছেন এখানে, তবে পরিচিত নয়।

সুশোভন চোখ সরিয়ে নিচ্ছিলেন। লোকটি ছাড়ল না। এক হাট মেয়ে-পুরুষের সামনে প্রশ্ন করে বসল, 'মেয়ের খবর পেলেন কিছু?'

ধক করে উঠল বুকের ভিতরটা। তবু মাথা নাড়লেন তিনি।

'যুবতী মেয়ে একবার কাটলে ভাসতে ভাসতে কোথায় যায় তার কি ঠিক থাকে কিছু!' লোকটি মাতব্বরের ঢঙে বলল, 'দেখুন খুঁজে—'

সুশোভনের স্বভাবে রাগ কম। কিন্তু আজ রাগই হল। পরিষ্কার অনুভব করলেন রাগে শিরশির করছে কপাল, কাঠিন্য জমছে চোয়ালে। মেয়ে আমার, তার ভাল মন্দ আমিই বুঝব, বলতে চাইছিলেন, আপনি মন্তব্য করার কে?

স্বর বেরুল না গলা দিয়ে।

তাড়াহুড়ো করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে সিদ্ধান্ত নিলেন, দুধ তাঁকেই আনতে হবে তার কী মানে আছে! মণ্টুই আনবে। ন'টা, সওয়া ন'টার মধ্যে কলেজে বেরুত ইনা, তখন ব্যস্ততা ছিল। মণ্টু ঘুম-কাতুরে। দেরিতে উঠে লীনার সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ত জোগাড়ে। নিজেকে সচল রাখার জন্যে ভোরের কাজগুলো নিজেই আগ বাড়িয়ে সেরে রাখতেন তিনি। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে এখন। বাড়িতে থেকেই বুঝতে পারেন অদ্ভুত স্তব্ধতা এসে গেছে সকালের শব্দে। সিঁড়ির মুখে বসে চা-পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে মাঝে মাঝে বিহ্বল চোখে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে মণ্টু। নিজের কাজটুকু নিজেই করে নেয় নিঃশব্দে। এগুলোও পারবে।

ভোরে বেরুনো ছেড়ে দিলেন তিনি।

জীবন বদলে যাচ্ছে। পরিচয়ও। একান্ত মুহূর্তের বিষাদে কখনও বা ঠেসে আসে বুক, ঘোর লাগে চোখে। অভিজ্ঞতার মধ্যে তালগোল পাকাতে থাকে বিশ্বাস। প্রায় চল্লিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন, শুধু জটিল অঙ্কের সমাধানেই ব্যস্ত রাখেননি নিজেকে, পূর্ণতর হবার আকাঙ্ক্ষায় জড়িয়েছেন ইতিহাস, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্যের নানা বিষয়ে। মুখগুলি মনে পড়ে আবছাভাবে। যুবক বয়স থেকে এই সেদিনও, অবসর নেবার আগে পর্যন্ত, পার হতে দেখেছেন কয়েক হাজার ছাত্রকে। তারা কোথায় গেল! কোথায় হারিয়ে গেল এত বছরের ধারাবাহিকতা! কেন! এই দুঃসময়ে, যখন সব হিসেবই গুলিয়ে যাচ্ছে, কেউ কি এগিয়ে এসে বলতে পারে না, এইখানে, এইখানেই সমাধান! এ কেমন পরিণতি তাঁর! সব পরিচয় ভুলে লোকে এখন তাঁকে চিনছে শুধুই এক হারিয়ে যাওয়া মেয়ের বাপ হিসেবে! হারিয়ে যাওয়া? না পালিয়ে যাওয়া? কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর! কোনটা সত্য, পুতু?

মাঝে মাঝেই আসে অশোক, বনানীরা। অর্জুন, অর্চনাও। এক শোক কাটতে না কাটতে আর এক শোকে জবাও নিশ্চল।

একদিন জোর করল অর্জুন। কিছুদিন ওদের ওখানে গিয়ে থাকলে মনটা ভাল থাকত। কেন যাচ্ছেন না তাঁরা! গেলে মা'রও ভাল লাগত।

আগ্রহে সত্য চেনা যায়। চিন্মোহনের ছেলেরা বাপের মতো পুরনো, রাশ-আলগা নয়। কথার মধ্যে তবু মাঝেমধ্যে উঁকি দিয়ে যান তিনি।

অর্জুনের বলার ধরনে বড় দুঃখে হেসে উঠলেন সুশোভন। নিঃশব্দ সেই হাসি ছড়িয়ে পড়ল কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে চোখ দুটিতেও।

'মন কি আর শরীর থেকে আলাদা রে, বাবা! যেখানেই যাই, সঙ্গে সঙ্গে যাবে।'

অর্জুন চুপ করে থাকল।

'আমাদের জীবন তো শেষ হয়ে গেছে। তোদের এখনও অনেক বাকি। আমরা সামনে থাকলে তোদেরও কষ্ট বাড়বে। এখানেই থাকি। যদি ফিরে আসে—'

'পুতুল তো আমাকে সবই বলত।' অর্চনা বলল, 'এটা কেন বলল না! বললে আমি বলতাম আপনাদের!'

'কী বলতে!' অর্জুন বলল, 'ঘটনা কী, তুমি তো জানো না এখনও!'

'না। জানি না। কিছুই জানি না। জানতেও চাই না।'

অর্চনা নিজেকে চাপতে পারল না। নারীত্বের সহজাত বোধ থেকেই চলে গেল গভীরে।

মেয়েটিকে দেখতে দেখতে দুঃখে কুঁজো লাগল নিজেকে। ফিরে গেলেন মনে পড়ায়।

পছন্দ অর্জুনেরই ছিল। বনানীর মুখে খবর পেয়ে পরিবারটিকে চিনতে জবা পাঠালেন তাঁকে আর লীনাকে। সঙ্গে বনানী। পুতু বায়না করেছিল, সুতরাং ওকেও নিতে হল।

স্পষ্ট মনে আছে সুশোভনের, অর্চনা সামনে এসে দাঁড়াতেই আলো হয়ে গেল ঘর। পিঠের ওপর খোলা চুলের ঢল, ফেটে পড়ছে রং। তেমনি মুখ চোখ আর গড়ন। গাঢ় হলুদ পাড় ডুরে শাড়ি আর হলদে রঙের ব্লাউজে আটপৌরে করে রেখেছে নিজেকে। ডাকের সাজ পরালে একেই প্রতিমা লাগত।

ট্যাক্সিতে ফিরতে ফিরতে ফাজিল গলায় পুতু বলল, 'কী তুলতুলে, মা! মনেই হয় না কখনও বাড়ির বাইরে বেরিয়েছে।'

সামনের সিটে বসে হেসেছিলেন সুশোভন। পুতুর তখন বাড়ের বয়স, মাঝেমধ্যে শাড়ি পরে, ধরন চিনতে শুরু করেছে। ভুল বলেনি।

রাত্রে খাবার সময় চেপে ধরলেন জবা।

'ওদের তো পছন্দ হয়েছে। পুতুও লাফাচ্ছে। তুমি কিছু বলছ না, ঠাকুরপো?'

চিন্মোহন সামনে। আট বছরের ব্যবধানটাকে বাড়িয়ে তুলেছেন আঠাশে, কিন্তু কান এদিকে। ইচ্ছে করেই সেদিন একটু প্রগলভ হয়েছিলেন সুশোভন।

'অর্জুনের লক্ষ্য কি কখনও ভুল হয়, বউদি! ও পছন্দ না করলে আমিই জোর করে নিয়ে আসতাম ঘরে।'

'নাম কি?' খাওয়া থামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন চিন্মোহন।

'অর্চনা।'

'আদ্যক্ষরের মিল নাকি শুভ হয়।' চিন্মোহন বললেন, 'তা হলে দ্যাখ।'

নতুন মা-হওয়া অর্চনার চোখে জল দেখে মুচড়ে উঠল স্মৃতি। একজন, একজনই দায়ী এর জন্যে। আড়ালে গিয়েও ফিরে আসছে বার বার। আড়াল থেকেই মারছে।

লীনা উঠে গেলেন সামনে থেকে।

'তোমাকে কি বলত, মা! সে নিজেই কি জানত!' অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন সুশোভন, 'আজ কুড়ি দিন ধরে নিজেকে ছিঁড়ছি আর জোড়া দেবার চেষ্টা করছি। লাগছে না, ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সব সময়েই হারিয়ে যাচ্ছে একটা দুটো টুকরো—'

কেন বলছেন, কী বলছেন, বলতেই বলতেই তাব পারম্পর্য হারিয়ে ফেললেন সুশোভন। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অর্চনা, অর্জুনের দিকে। তারপর হঠাৎই বললেন, 'নিজের সন্তানকে এত অচেনা লাগে কেন!'

সেই মুহূর্তের সমস্ত আবেগ চাদর বিছানোর মতো আড়াল কবে দিলেন সুশোভন। আবার ফিরে এল স্তব্ধতা।

শোকের আয়ু থাকে। আয়ু থাকে কান্না এবং তাৎক্ষণিক যন্ত্রণারও। আয়ুর শেষে শুকনো ক্ষতে হাত বুলোতে বুলোতে যেসব উপলব্ধি ফিরে আসে, ঘটনা ঘটার মুহূর্তের অনুভূতিগুলোকে ফিরে পাওয়া যায় না তার মধ্যে। আনমনা হয়ে যায় দৃষ্টি এবং ভাবনাগুলো। বলার কথাগুলোও হয়ে যায় অন্যরকম। মাত্র একদিনের ঘটনাই ছড়িয়ে জড়িয়ে নিয়ে আসে এক বিশাল সময়ের সম্পর্ক। ধরা যায় না ঠিক কোনখানে এর শুরু, শেষই বা কোথায়। কখনও স্পষ্ট, কখনও অস্পষ্ট স্মৃতির মধ্যে থেকে তখন জন্ম নিতে থাকে নতুন এক সংকল্প।

সুশোভন এখন সেই সংকল্পই চিনছেন। ক্রমশ।

ওদের এগিয়ে দিতে এলেন নীচে পর্যন্ত। বাড়ির সীমানা পেরিয়ে রাস্তায়। সেখানেই দাঁড়ালেন। পশ্চিমে হেলে পড়া সূর্যটাকে খুঁজলেন কিছুক্ষণ। দিনশেষের আলো তামাটে হয়ে পড়েছে মুখে, চশমার আড়ালে স্পষ্ট চোখ দুটোর কোণে শুকনো নুনের মতো এঁটে আছে কিছু। ঠোঁটের রেখা ঝুলে এসেছে পাশে।

'আমি ছাড়ব না, অর্জুন। যতদিন না ওর অন্য কোনও খবর পাচ্ছি, ততদিন জানব ও বেঁচে আছে। আমিও খুঁজব।'

অর্জুন ওঁর হাতটা চেপে ধরল। যেন কিছু বলতে চায়। পারল না। মুঠোর মধ্যে

আলাদাভাবে উঠে এল দবদবে শিরার স্পর্শ।

সুশোভন বললেন, 'যা তোরা এবার। কাকিমার খোঁজখবর নিস। ওকে নিয়েই ভাবনা।'

অর্জুনরা চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন রাস্তায়। একা। একটা অসহায়তার বোধ ছড়িয়ে যাচ্ছে শরীরে। একটু আগেই জোর গলায় বলেছেন অর্জুনকে, আমি ছাড়ব না, আমি খুঁজব। মনের এই আক্রোশ ও রোখটা চিনতে পারছেন এখনও। কিন্তু কাকে ছাড়বেন না তিনি, খুঁজবেনই বা কাকে!

বাড়ি ফিরবেন ভেবেও আরও খানিকটা এগিয়ে বড় রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন সুশোভন। দাঁড়িয়েই থাকলেন। অন্যমনস্ক চিন্তার মধ্যেই দেখলেন সন্ধে নামছে, জ্বলে উঠছে রাস্তা ও দোকানের আলো। ভিড়ের রাস্তায় যেমন কে তেমন পারাপার করছে বিভিন্ন চেহারা, বয়স ও পোশাকের মেয়ে, পুরুষ, শিশু। ডাবলডেকারকে ওভারটেক করে ছুটে যাচ্ছে ট্যাক্সি, হর্ন দিচ্ছে মোটর, ফুটপাথের গাড্ডায় পড়ে বিপজ্জনক ভাবে লাফিয়ে উঠছে রিক্সা। লাউডস্পিকারে লটারিতে ভাগ্য ফেরাবার ঘোষণা। সবই এক হয়ে মিশে যাচ্ছে ভিড়, শব্দ ও ব্যস্ততার খেলায়। যেন ঠিক এরকমভাবে এর আগে কখনও চারপাশকে দেখেননি তিনি। নাকি জীবনের এই ধারাবাহিকতা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন বলেই আজ আলাদা লাগছে সব!

হবে। হতে পারে। এখন অচেনা লাগছে নিজেকেও।

ভাবতে ভাবতেই দীর্ঘশ্বাস উঠে এল সুশোভনের। মানুষ কি এইভাবেই চিন্তা করে! এইভাবে, নিজেকে সর্বশক্তিমান ভেবে! না হলে কেন এই আক্রোশ, কেনই বা পুতুকে খুঁজে পাবার রোখ!

কুড়ি দিন হয়ে গেল। সেই প্রথম দিনেই থানার ও-সি বলেছিল, চল্লিশ ঘণ্টায় পৌঁছে যাওয়া যায় দেশের যে-কোনও জায়গায়। চল্লিশ ঘণ্টাতেই যদি এই, তাহলে—। হিসেবে পৌঁছুনোর প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও ধাঁধায় জড়িয়ে গেলেন তিনি। মাথার মধ্যে হারিয়ে গেল অঙ্ক। ভারী হয়ে এল চোখের পাতা।

দূর থেকে আরও বেশি দূরে সরে যাচ্ছে হারিয়ে যাবার জায়গাগুলো। থানা, পুলিশ, আই-জি, ডি-আই-জি—এই ক'দিনে কোথায় না ঘুরেছেন! কী হল তাতে! বীরেন দত্তের পরামর্শে নিজে গিয়ে এফ-আই-আর নাম্বারসহ প্রার্থনা ধরিয়ে এসেছেন ডি-আই-জি, ডি-ডি রতন ভট্টাচার্যের হাতে—'আমি একজন শিক্ষক। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে সততার সঙ্গে শিক্ষাদান করেছি কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীকে। স্বাধীন ভারতবর্ষের একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমি কি এটুকুও আশা করতে পারি না যে, তাঁরা একটু তৎপর হোন, যে-অবস্থাতেই হোক খুঁজে দিন আমার মেয়েকে, আমার একমাত্র সন্তানকে?'

খুব মন দিয়ে চিঠিটা পড়েছিল রতন ভট্চায। গোল ধরনের, সাফল্যে চকচকে মুখ। চাপা হাসিতে টোল পড়ল গালে।

'আপনি যে সিজনড অধ্যাপক চিঠির ভাষাতেই তা বোঝা যায়, স্যার।' বলল, 'কিন্তু আমাদের দোষী করে লাভ আছে কিছু! এরকম নিখোঁজের কেস শয়ে শয়ে আসে আমাদের কাছে, তারাও কারও না কারও সন্তান। অবশ্য সবাই আপনার মতো বিশিষ্ট নাগরিক নন।'

হাসিটা জিইয়ে রাখল ভটচায। চোখে চোখ রাখল কয়েক সেকেন্ড। তারপর বলল,

'আপনি তো ভাগ্যবান। খোদ আমার ওপরওয়ালা মল্লিক সাহেবকে দিয়ে তাগাদা দিইয়েছেন। কী করা যাবে! গভীর জলের মাছ। ধরতে সময় লাগবেই। চেষ্টায় ত্রুটি নেই। কী অবস্থায় পাবেন জানি না, তবে খুব শিগগিরই হয়তো খবর পাবেন মেয়ের। আমরা খবর পেলেই জানাব।'

'আশা দিচ্ছেন তো?'

অনভ্যাসে শরীর নড়ে না। তবু অনুনয়ের ভঙ্গিতে দুটি হাত এগিয়ে গিয়েছিল রতন ভট্চাযের হাত দুটো ধরার জন্যে।

ধরা না দিয়ে পিছিয়ে গেল ভট্চায।

'আমরা আশা দেবার কে! আমরা চেষ্টাই করতে পারি। করছিও। এর বেশি আর কিছু বলতে পারি না।'

ফেরার রাস্তায় ঘেমে উঠেছিল অপমানিত হাত দুটো। ধসা লাগছিল নিজেকে। ক্লান্তও। যেন একসঙ্গে কয়েক বছর বয়স বেড়ে গেল আজ।

গভীর জল! হ্যাঁ, তা-ই। হাত-পা বাঁধা। ক্রমশ নিজেও তলিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তা হলে কি হারিয়েই থাকবে পুতু?

না। কে যেন নাড়া দিয়ে গেল সুশোভনকে। দুঃখ সত্য, অসহায়তাও সত্য, তবু সংকল্পে বিচ্যুত হয়ো না। এত তাড়াতাড়ি মেরে ফেলো না তোমার ভিতরের মানুষটিকে।

বাড়ি ফিরে দুটো চিঠি পেলেন সুশোভন। ডাকে এসেছে। একটি টিউটোরিয়াল কলেজের মাইনের চেক। অন্যটিও খামে। ভুল বানানে, অপরিচিত হাতে নাম, ঠিকানা লেখা।

উল্টেপাল্টে দেখে খামের মুখ ছিঁড়ে চিঠিটা বের করলেন তিনি। ভাঁজ খুলে মেলে ধরলেন চোখের সামনে। প্রেরকের ঠিকানা নেই কোথাও। সম্বোধন একটা আছে, কিন্তু স্বাক্ষর নেই কোনও। পড়তে পড়তেই মেরুদণ্ড খাড়া হয়ে উঠল তাঁর—

'মহাশয়,

আপনার কন্যা ইনা মুখার্জি সম্পর্কে এই পত্র। সে বাড়ি ছাড়িয়াছে নিজের ইচ্ছায়, কাহারও প্ররোচনায় নহে। কেহ তাহাকে জবরদস্তি করে নাই। বরুণ লাহিড়ীর সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, ইহা আপনি এবং আপনার স্ত্রী জানিতেন। কিন্তু আপনি পুলিশের কাছে মিথ্যা এফ-আই-আর করাইয়াছেন যে বরুণ তাহাকে ইলোপ করিয়াছে। আপনি এবং আপনার পরামর্শদাতারা পুলিশের মনে এরূপ ধারণা সৃষ্টি করিয়াছেন যে, এই ঘটনার সহিত বরুণের দাদা তরুণ লাহিড়ী এবং তাঁহার স্ত্রী, ভাই, বোন সকলেরই যোগসাজস ছিল। ইহার ফলে পুলিশ অন্যায়ভাবে ইহাদের সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ ও হয়রানি করিতেছে, ইহাদের পারিবারিক জীবনও বিষময় করিয়া তুলিয়াছে। বরুণের বন্ধুদেরও হয়রান করিতেছে।

এতগুলি লোককে অকারণ ঝামেলায় ফেলিয়া আপনি যদি ভাবিয়া থাকেন আপনার স্বার্থসিদ্ধি ঘটিবে তাহা হইলে ভুল করিবেন। বেশি বাড়াবাড়ি করিলে আপনার কন্যা ইনাকে তো ফিরিয়া পাইবেনই না, আপনার নিজেরও ক্ষতি হইবে। পুলিশ শুধু আপনারই নাই। পুলিশ কিছুই করিতে পারিবে না। আপনাকে জানানো হইতেছে, নিজের স্বার্থ বিবেচনা করিয়া এই ডায়েরি অবিলম্বে প্রত্যাহার করিয়া লউন। আপনার কন্যা জীবিত আছে এবং এই পরামর্শ মানিলে লাভবানই হইবেন। নচেৎ আপনার কন্যার ক্ষতি হইবে।

লীনা এখন পুজোর ঘরে। সহজে উঠবেন না।

চিঠিটা লুকিয়ে ফেলার আগে আরও একবার পড়লেন সুশোভন। খামের ওপর ডাকছাপ অস্পষ্ট। শুধু পড়া যাচ্ছে আজকের তারিখটা। কে লিখতে পারে এই চিঠি? উদ্দেশ্যই বা কী? ভয় দেখানো? হুমকি?

প্রশ্নগুলো থেকে গেল। এখনই কি থানায় যাবেন একবার? ভাবলেন, নাকি বীরেন দত্তের কাছে? প্রশ্নে জড়িয়ে যাচ্ছে দ্বিধা। কেউ কি মজা করে লিখল? যে-ই লিখুক, সে নিশ্চয়ই শুভাকাঙ্ক্ষী। না হলে পুতু বেঁচে আছে এ খবরই বা জানাবে কেন!

৭

বৃষ্টিটা ধরেছে ক'দিন। একটানা রোদ পেয়ে রং পাল্টে ফেলেছে আকাশ। হাওয়াও দিচ্ছে থেকে থেকে। কচিৎ কোথাও দেয়ালের সোঁদা শ্যাওলার দাগগুলো বাদ দিলে ঝরঝরে লাগে চারপাশের বাড়িঘর।

বীরেন দত্ত ব্যস্ত। লোক আছে চেম্বারে। সুশোভনকে দেখে উঠে এলেন চেয়ার ছেড়ে।

'পাঁচ মিনিট সময় দিন। জরুরি কথা আছে আপনার সঙ্গে।'

'আমি বসছি।'

'একটু ক্লান্ত লাগছে যেন!'

'না। ঠিক আছে। আপনি কাজ সেরে নিন।'

বসবেন বলেও বসলেন না সুশোভন। বেরিয়ে এলেন ঘরের বাইরে, বারান্দায়। রাস্তা দেখতে দেখতে অভ্যাসেই চোখ চলে গেল ওপরে। আকাশে গাধা-রং মেঘের টুকরোয় মিইয়ে আসা রোদ্দুরের পাড় বুনে থমকে আছে বিকেল। মেঘের কোল ছুঁয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা প্লেন। দক্ষিণ থেকে আরও দক্ষিণে মিলিয়ে যাবার পরেও চাপা শব্দ রেখে গেল পিছনে।

আজ আগস্টের আঠারো। বাংলায় কোন মাস? ভাদ্র? তা হলে কি শরৎকাল পড়ে গেল? এবার পুজো কবে?

প্রশ্নগুলো এল এবং ফিরে গেল। শুধু তারিখটাই জড়িয়ে গেল সুশোভনের নিঃশ্বাসে।

পাঞ্জাবির বুক পকেট হাতড়ে সরকারি ছাপমারা লালবাজারের খামটা বের করার চেষ্টায় একগাদা কাগজ বেরিয়ে এল। কী একটা পড়ে গেল মেঝেয়। ঝুঁকে দেখলেন, রেলের রিজার্ভেশন টিকিট। তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখে ফেলে দেবেন ভেবেও আবার রেখে দিলেন পকেটে। খামটাও খুলে দেখার ইচ্ছে হল না আর।

মনটা উতলা লাগছে বড়। আশঙ্কায়, না ভয়ে, বুঝতে পারছেন না ঠিক। কখন যে শুরু হল এই অনুভূতি, তাও ঠিকঠাক মনে পড়ে না এখন। তবে অনুমান করতে পারেন।

জামশেদপুর থেকে খড়্গাপুরে পৌঁছুতেই অনেক লেট করে ফেলেছিল ট্রেনটা। পিপাসা পেয়েছিল প্রচণ্ড। খড়্গাপুরে ট্রেন থামতে জলের খোঁজে নেমে এসেছিলেন প্ল্যাটফর্মে। 'ড্রিঙ্কিং ওয়াটার' লেখা কলের সামনে মুখ বাড়িয়ে জল খেলেন কোঁ কোঁক করে। ভিজে

হাতটা বুলিয়ে নিলেন মুখে, মাথায়, ঘাড়ে।

স্বস্তির ভাব নিয়ে চোখে চশমা এঁটে মুখ ফেরাতেই চোখে পড়ল।

হাত দেড়েক দূরত্বে দাঁড়িয়ে আছে লোকটা। ধোপদুরস্ত ট্রাউজার্স আর বুশসার্ট পরা, দোহারা, পেটানো চেহারা। ইষৎ মোটা নাক, ময়লা মাজা-মাজা রং, উঁচু কপালের ওপর ক্রিম দিয়ে পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। চোখে সোনালি ফ্রেমের গগলস। চিবুকের নীচে আধপাকা ব্রণ। কুটিল একটা হাসি লেগে আছে ঠোঁটে।

নিশ্চিত জল খেতে আসেনি। ভাল করে দেখতে চোখে পড়ল জ্বলন্ত সিগারেট আড়াল করে রেখেছে বাঁ হাতের মুঠোয়।

'আপনি প্রফেসর সুশোভন মুখার্জি?'

জোরালো, একটু বা খসখসে গলা। দৃষ্টি দেখা যাচ্ছে না।

সন্দেহে সঙ্কুচিত হলেন সুশোভন।

জবাবের অপেক্ষা না করেই লোকটি জিজ্ঞেস করল, 'যাদবপুরে থাকেন?'

'আপনি কে?'

'আমাকে চিনবেন না। চেনার কারণ নেই।'

সেই সময় ট্রেন ছাড়ার ঘণ্টা বাজতেই লোকটি আর কিছু না বলে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল। চা আর ম্যাগাজিনের স্টল পেরিয়ে চোখের পলকে সেঁধিয়ে গেল ভিড়ের মধ্যে।

কম্পার্টমেন্টে উঠে নিজের জায়গায় বসে ক্রমশ পিছিয়ে যাওয়া প্ল্যাটফর্মের বিভিন্ন অনির্দিষ্ট মুখের দিকে তাকিয়ে সুশোভন ভাবলেন, একেবারে অচেনা লাগছে না তো! কোথায় দেখেছেন একে? কলকাতায়? নাকি জামশেদপুরেই? যাবার সময়, ট্রেনে?

মনে করতে পারলেন না। কিন্তু হঠাৎই একটা আশঙ্কা ঢুকে পড়ল বুকে। লোকটা কি ফলো করছে তাঁকে? না হলে ওখানে, অতখানি নিশ্চিতভাবে তাঁকে লক্ষ করে অমন বেয়াড়া ও অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো করবে কেন!

সরু সোনালি ফ্রেমের একটা গগল্‌স্‌ ট্রেনের দোলার সঙ্গে দুলতে দুলতে সঙ্গ ধরল তাঁর।

সতর্ক হবার জন্যেই ট্যাক্সিতে না উঠে বাস ধরলেন হাওড়ায়। পাঁচ নম্বর। যাদবপুরের রাস্তা ধরেই যাবে।

তারপর বাড়ি ফেরা। লালবাজারের চিঠি। লীনা খবর দিলেন, 'বীরেন দত্ত ফোন করেছিলেন। নকুল খুঁজে গেছে দুবার। জরুরি দরকার।' বলতে বলতে ঘন চোখে তাকালেন সুশোভনের মুখের দিকে, 'তোমাকে এমন দেখাচ্ছে কেন!'

'কেমন!'

'কী জানি! খবর পেলে কিছু?'

টাইম। হিলার। ঝট করে শব্দ দুটো গেঁথে গেল মাথায়। সত্যিই কি সময়ে সহজ হয়ে যায় সব কিছু! তা না হলে কেন মনে হবে লীনা আগের গলাতেই কথা বলছে, আগেরই শঙ্কা মিশিয়ে! সত্য একবার গোপন করতে শুরু করলে মিথ্যাই হয়ে ওঠে আশ্রয়। এখনও হচ্ছে। জেনেশুনেই আড়াল খুঁজলেন সুশোভন।

'জানতামই পাব না। পুলিশের ভাঁওতা কিনা বুঝলাম না।'

'বলেছিলে আইডেনটিফাই করতে ডেকেছে!'

স্ত্রীর চোখে চোখ পড়তেই নিজের মধ্যে পিছিয়ে এলেন সুশোভন। ভুলটা তাঁরই। এই মুহূর্তটিকেই সামাল দিতে গিয়ে ভুলে গিয়েছিলেন পরশুর কথাগুলো। লীনা পরশুর ঘটনাতেই আটকে আছে। এগোতে পারছে না। ছাড়িয়ে আনার দায়িত্ব তাঁর।

'তাই-ই ডেকেছিল। দেখালোও একজনকে।' খুব সাবধানে কথাগুলো নামিয়ে দিলেন সুশোভন, 'পুতুরই বয়সের একটি মেয়ে, গোল মুখ, ফর্সা, গালে জডুল ছিল। একেবারেই পুতু নয়।'

'আমি আগেই জানতাম।'

বলতে হয় বলেই বললেন। মুখ জুড়ে জডুলের ছায়া ছড়াতে না ছড়াতেই সরে গেল। আর কোনও প্রশ্ন আছে বলে মনে হয় না।

একটা বাড়তি প্রশ্নের মায়া কাটাতে পারলেন না লীনা।

'কে মেয়েটি? ভদ্রলোকের মেয়ে?'

'চেহারায় কি লেখা থাকে!' আশ্বস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুশোভন, 'অর্জুন কখন গেল?'

'সকালে। বলল সন্ধেয় ফোন করে জেনে নেবে ফিরেছে কিনা। চিঠিটা দুপুরে এসেছে।' খাটের উল্টোদিকে সুশোভনের মুখোমুখি হয়ে বসলেন লীনা। স্বামীকে দেখতে দেখতে বললেন, 'তোমারই হয়রানি গেল!'

'তা গেল। হয়রানি তো আছেই। আশা অবশ্য আমিও করিনি, তবু—। ট্রেনটাও লেট করল।'

এখন নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে চিঠিটা গুরুত্ব পায়নি লীনার কাছে। সরল মানুষ, প্যাঁচ নেই মনে। এমনও ধারণা হয়, যত দিন যাচ্ছে, তাঁর নিজের সন্দেহবোধ যত প্রখর হচ্ছে, ততই যেন স্বাভাবিক মানুষের পক্ষে সহজাত সন্দেহপ্রবণতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে লীনা। তা না হলে খামের ওপর ছাপ দেখেই কিছু না কিছু জিজ্ঞেস করতে পারতেন। মেয়ে হারিয়ে নিজের ভিতরেও কিছু হারিয়ে ফেলছেন না তো!

ভাবতে ভাবতেই সতর্কতায় ফিরে এলেন সুশোভন।

রতন ভটচায বলেছিল খবর দেবে। তেমন কোনও খবর থাকলে চিঠি না লিখে অন্যভাবে যোগাযোগ করত। অসুবিধা এখনও লীনাকে নিয়েই। এখনই খুলে দেখলে লীনাও জানতে চাইবে কার চিঠি, কী লিখেছে। এই যে ওকে সামান্য খোলামেলা আর চাঙ্গা লাগছে আজ, সেটাও চলে যেতে পারে। নাকি এই চাঙ্গা উদ্বেগ কেটে যাবার জন্যে, তাঁর ফিরে আসার কারণেই? যাবার আগে বলেছিলেন নিজে না গিয়ে আর কাউকে পাঠাতে। সুশোভন তখনও মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে; কার ফোন, কী বলেছে, কিছুই জানাননি লীনাকে। ওঁর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সাজিয়ে নিলেন নিজেকে, বললেন, 'নিজের মেয়ে, খুঁজে পেলে আমিই প্রথম দেখব। ব্যাপারটাও গোপন। পুলিশ আমাকেই সঙ্গে যেতে বলেছে—'

লীনা বললেন, 'আমাকে একা ফেলে যাবে?'

পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে এই কণ্ঠস্বর ভালবাসা বোঝাত, আসঙ্গের টানও। এখন ভয়ই চেনায়।

আকস্মিক শূন্যতার অনুভবে তোলপাড় করে উঠেছিল সুশোভনের বুক।

'তিনজনকে নিয়েই ছিলাম আমরা। নতুন করে আর কী একা হবে। যে গেছে সে আরও একা।' জবাব দিতে হবে বলেই বলেছিলেন, 'একটা রাত। অর্জুনকে বলছি, ওরাও কেউ এসে থাকবে। নীচে মিত্তিররা আছে, তেমন দরকার হলে ওদেরও বোলো।'

নতুন কোনও প্রশ্ন তোলেননি লীনা।

ফুল স্পিডে চলা ফ্যানের হাওয়ায় সাত-আট ঘণ্টার ধকল নেমে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। এমনও হতে পারে লীনার সান্নিধ্যই এনে দিচ্ছে শরীরের স্বস্তি। আজকাল ঠিকঠাক অনুভব করতে পারেন না এগুলো। যখন যেমন থাকেন মনে হয় সেটাই স্বাভাবিক। লীনার মতো তাঁরও কি বোধশক্তি হ্রাস পাচ্ছে ক্রমশ?

বাইরে ঝরঝরে আলো। জানলা দিয়ে তাকালে সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে, দূরের তিনতলা বাড়িটা। চিলেকোঠার ছোট জানলায় দাঁড়িয়ে আছে কেউ, গরাদের আড়াল থাকায় চেনা যাচ্ছে না ঠিক। সম্ভবত একটি মেয়ে। হ্যাঁ, মেয়েই। শূন্য থেকে দুলতে দুলতে নেমে আসছে একটা দু-রঙা কাটা ঘুড়ি। যেদিকে যাবার সম্ভাবনা সেদিকে না গিয়ে হাওয়ার টানে ভেসে গেল অন্যদিকে।

'মণ্টুকে দেখছি না!'

'লন্ড্রিতে পাঠালাম। আসবে এখুনি।'

মেয়েটিই ফিরে এল চোখে।

'বীরেনবাবু কেন খুঁজছেন জানাননি?'

'নকুলকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বলল না তো কিছু।'

'তা হলে এখনই ঘুরে আসি।' ঘড়িতে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ালেন সুশোভন, 'বাথরুমে যাব। চা দাও। দুখানা বিস্কুটও দিও।'

'তা-ই যাও। তাড়াতাড়ি ফিরে এসে বিশ্রাম নিও।'

লীনা চলে যাচ্ছিলেন। দরজা পর্যন্ত গিয়ে অভ্যাসে মাথার ঘোমটাটা টেনে নিলেন একটু। তারপর ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'একটা খবর আছে—'

দৃষ্টির অন্যমনস্কতা সত্ত্বেও সুশোভন লীনাকেই দেখলেন।

'যতীনবাবুর শালা পুনাতে থাকে। খুব ভাল কোষ্ঠী বিচার করে। আজ সকালে নিয়ে এসেছিলেন রত্নাদি। পুতুর ছকটা দেখালাম।'

চিঠিটা বুক পকেটে গুঁজে রাখলেন সুশোভন।

'কী বলল?'

'অনেকক্ষণ ধরে দেখল। সবই তো জানে!' সোজা কথায় চলে এলেন লীনা, 'বলল শনি মঙ্গল এক হয়েছিল, রাহুও দুষ্ট ছিল। আমি অবশ্য বুঝলাম না ঠিক। জোর দিয়ে বলল তিন চারদিনের মধ্যেই ভাল সময় পড়বে।'

ফিরবে কিনা তা বললেন না লীনা। হয়তো বলেইনি ওঁকে। তবে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কেন ওঁকে অন্যরকম লাগছে।

'দ্যাখো।' নিঃশ্বাস সংবরণ করে বলেছিলেন সুশোভন, 'কোষ্ঠীতে থাকলে ফিরে আসবে।'

পাঁচ মিনিট বলে প্রায় দশ মিনিট পার করে দিলেন বীরেন দত্ত। আজও চেম্বারের ভিতর দিয়ে নিয়ে গেলেন সেই ঘরটায়, পুতু নিখোঁজ হওয়ার দিন রাতে যেখানে নিয়ে এসেছিল

নকুল। খোলা দরজা দিয়ে সিঁড়িটা দেখা যায়। ফ্যান চালিয়ে দিলেন বীরেন।

'চা খাবেন তো?'

'না। বাড়ি থেকেই আসছি। এখুনি খেলাম।'

বীরেন জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় গিয়েছিলেন বলুন তো? বাড়ি থেকেও ঠিক বলতে পারল না! জামশেদপুরে আবার কী কাজ পড়ল?'

'বলছি। খুঁজছিলেন কেন?'

কয়েক মুহূর্ত অপলকে সুশোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকেও ওঁর গাম্ভীর্যের কারণ খুঁজলেন বীরেন দত্ত। চশমাটা কোলের ওপর নামানো।

'পরশু কাগজে একটা খবর বেরিয়েছে। দেখেছেন?'

সুশোভনের চোখ দুটো উজ্জ্বল হল সামান্য। উত্তর দিলেন না।

'আমি স্টেটসম্যানে দেখেছি। বাংলা কাগজগুলোতেও বেরিয়েছে শুনলাম।'

'বরুণ লাহিড়ী আগেও একটা বিয়ে করেছিল, ডিভোর্স হয়ে যায়!'

'তা হলে তো দেখেইছেন। মেয়েটির নাম সুস্মিতা গুহ, আবার বিয়ে করেছে।'

'দেখিনি। ভাইপো জানাল।' যতটা সম্ভব নিরপেক্ষ হলেন সুশোভন, 'কাগজ পড়লে টেনশন হয়। ভয় আমার স্ত্রীকে নিয়ে। কাগজে মেয়ের ছবি ছাপানোর পর তিনদিন কথা বলেননি।'

সুশোভন থামলেন একটু। চোখ বীরেনের দিকে।

'এসব জেনে আমার কী লাভ, দত্তমশাই! বদলোক, বুঝতেই পারছি। তাতে কি মেয়েকে ফিরে পাব!'

'বোঝা যাচ্ছে পুলিশ বসে নেই। ক্লুর দিকে এগোচ্ছে।' কপালে উড়ে আসা মাছি তাড়াবার জন্যে হাত ঝাপটালেন বীরেন। বললেন, 'ডিটেলে পড়লে বুঝতেন কেন বলছি। মেয়েটি বলেছে লোকটা একটা স্কাউন্ড্রেল। চার্ম দিয়ে ভোলায়। পলিটিকাল, বিজনেস, সব কানেকশানই আছে। কোনও কোম্পানির গেস্টহাউসে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল তাকে, মেয়েটি মতলব বুঝতে পেরে পালিয়ে আসে। পুলিশের সন্দেহ, টাউট। মানে—'

'প্লিজ, দত্তমশাই!' অধৈর্য ভঙ্গিতে বলে উঠলেন সুশোভন, 'এসব ছাপলে কাগজের বিক্রি বাড়ে, বাপ-মায়ের বুক খালি হয়ে যায়। আমি অনেক আগেই পুলিশকে আমার সন্দেহের কথা জানিয়েছি। কী ক্লু পাবে ওরা! ওসব ধাপ্পা!'

বলতে বলতেই পাঞ্জাবির বুক পকেটে জমে ওঠা কাগজের তাড়া বের করলেন সুশোভন। লালবাজার থেকে পাঠানো খামটা খুঁজে প্রায় ছুড়ে দিলেন বীরেন দত্তের দিকে।

'আজই এসেছে। দেখুন পড়ে। আপনার কথাতেই অ্যাপিল করেছিলাম রতন ভটচাযের কাছে। জবাব দিয়েছে।'

ব্যস্তভাবে খামটা কুড়িয়ে চিঠিটা বের করলেন বীরেন দত্ত। কোল থেকে চশমা তুলে নাকের ওপর বসাতে বসাতে ঝুঁকে পড়লেন কাগজটার ওপর। পাঁচ সাত লাইন পড়তে যা সময় লাগে তার চেয়ে বেশি সময় নেবার ফাঁকে পাল্টে গেছে মুখের রেখা। মাছিটা এবার ওঁর হাঁটুর ওপর বসল।

'ভুবনেশ্বরে ধরা পড়েছিল দুজনেই, কলকাতায় ধরে আনবার সময় ট্রেন থেকে উধাও হয়েছে। অ্যাবসার্ড!' উত্তেজনায় ঠোঁট দুটো ফাঁক হয়ে থাকল বীরেন দত্তের, 'পুলিশ কী

করছিল।'

সুশোভন জানেন না। জবাবও দিলেন না। চোখ দুটো আগেই নিবদ্ধ হয়েছে মেঝের মোজেইকের একটা সাদা দুটো কালোর ডিজাইনে। খানিক দূর পর্যন্ত এরকম। তার পরেই ফিরে এসেছে দুটো সাদা একটা কালোয়। মাঝখানে কি তিনটি কালো হওয়া উচিত? ওই জায়গায় চার ফুট মতো ছোট কার্পেটের ওপর সেন্টার টেবিল বসানো।

ধন্ধ থেকেই গেল। সিঁড়ির দিকে দরজার ওপরে ঘড়িতে প্রায় ছ'টা। তার মানে সন্ধে হয়েছে। কাঁচা ড্রেন থেকে উঠে আসা মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্যেই সম্ভবত আগেই জানলাগুলো বন্ধ করে গেছে কেউ। গতকাল এই সময় বিষ্টুপুর বাজারের কাছে চিত্রলেখা স্টুডিয়োর সামনে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। ব্রিজের ওপর থেকে কান ঝালাপালা করা বাজনা বাজাতে বাজাতে নেমে আসছিল একটা মাড়োয়ারি বিয়ের পার্টি। সাদা ঘোড়ার গায়ে রঙিন ঝালর নামানো। পিঠের ওপর পিঠ খাড়া করে বসে আছে মাথায় জরির পাগড়ি ও স্যুট টাই পরা বর। পনেরো বছর আগে দেখা জামশেদপুর চেনাই যায় না। লীনার খুড়তুতো ভাইয়ের বিয়েতে গিয়েছিলেন বরযাত্রী হয়ে। পরে, কী কারণে যেন, বিয়েটা ভেঙে যায়।

'আপনার স্ত্রী জানেন?'

'না। শুনলে হার্টফেল করত।' মনস্কতায় ফিরলেন সুশোভন। রাগ নয়, দুঃখও নয়; মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে এলোমেলো চিন্তা, টুকরো টুকরো ঘটনা। কোনও রকম আবেগ না দেখিয়ে বললেন, 'রতন ভট্‌চাযের সঙ্গে দেখা করেছিলাম আঠাশ জুলাই। চিঠিতে লিখছে তেইশ জুলাই রাত্রের ঘটনা। সেদিন আমাকে কিছু বলেনি। আজ আগস্টের আঠারো। কী বলব! এর মধ্যে ওরা খুঁজে পেয়েছে বরুণ লাহিড়ীর আগের স্ত্রীকে—। আমি কী করব বলতে পারেন! এর চেয়ে যদি জানাত মেয়েটা ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে—'

সুশোভনের গলা কেঁপে গেল।

'এখনও বেঁচে আছে। ছেলেটার সঙ্গেই আছে। পালিয়ে গেছে বলেই কি আবার ধরা পড়বে না! আইন বলে ইনভেস্টিগেশন কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত পুলিশ সব কিছু জানাতে বাধ্য নয়। ভাবছি এটাই বা জানাল কেন! কাউকে অ্যারেস্ট করেছে বলেও শুনিনি!'

যেন নিজেকেই প্রশ্ন করলেন বীরেন দত্ত। থমকানো মুখ। চিঠির ওপর অ্যাশট্রে চাপা দিয়ে উঠে গেলেন চেম্বারের দিকে। টেলিফোন বাজছে। যেমন বাজে। শব্দে আতঙ্ক নেই কোনও।

ফিরে এলেন সিগার মুখে।

'জামশেদপুরে গিয়েছিলেন কেন?'

অল্প হাসি ফুটল সুশোভনের ঠোঁটে। হাসিই পাচ্ছে। খানিকটা নিজের ভিতরে তাকিয়ে, খানিকটা বীরেন দত্তকে দেখে। নিজেই বুঝতে পারছেন কথার পর কথা ডেকে আনছে আরও কথা। কোনও দিকে এগিয়ে দিচ্ছে না কাউকে। তথ্যের ভারে ঘাড় মাথা এক হতে চলল। এর মধ্যে পুতু কোথায়। শেষ দেখেছিলেন চিন্মোহনের মৃত্যুর দিন দুপুরে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে। হালকা সবুজ খোলের চওড়া লাল পাড়ের শাড়ি, ব্লাউজটাও সবুজ। কাঁধের স্ট্র্যাপ থেকে নামানো খয়েরি চামড়ার ব্যাগ। 'মা, আসছি' বলে সিঁড়ি দিয়ে রাস্তায় যাবার তাড়া ফুটে উঠেছিল পা দুটোয়। তবু, বাড়ির সীমানা পেরিয়ে রাস্তায় যাবার আগে থমকে দাঁড়িয়েছিল একটু। ভঙ্গিতে কিছু ভুলে এসেছে পিছনে, মনে পড়ে গেছে হঠাৎ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েও

ছিল যেন। কয়েক সেকেন্ড মাত্র। তার পরেই চলে গেল দৃষ্টির বাইরে।

'মেয়ের খোঁজে।' দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাবার চেষ্টায় নিঃশ্বাসের ভার নামিয়ে দিলেন সুশোভন। সময়ও নিলেন। তারপর বললেন, 'একটা ট্রাঙ্ককল পেয়েছিলাম। সাম এস ব্যানার্জি। জামশেদপুরে চাকরি করে। বলল বিষ্টুপুর বাজারের কাছে চিত্রলেখা স্টুডিয়োয় গিয়েছিল। সেখানে ইনা আর বরুণের মতো দুজনকে দেখেছে। কাগজে ছবি দেখেছিল, তাতেই সন্দেহ হয় । সঙ্গে আরও একজন ছিল। সম্ভবত ফোটো তোলাতে গিয়েছিল স্টুডিয়োতে। বলল—'

'দাঁড়ান, মশাই! আপনার সন্দেহ হল না লোকটি—ওই ব্যানার্জি—আপনার ফোন নাম্বার পেল কোত্থেকে?'

'হয়েছিল। জিজ্ঞেসও করেছিলাম। বলল নাম, বাড়ির রাস্তার নাম সবই তো বেরিয়েছে কাগজে, নাম্বারটা খুঁজে পেয়েছে ক্যালকাটা টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে।'

'হুঁ।'

'নিজের নাম্বারও দিয়েছিল। বলেছিল জামশেদপুরে পৌঁছে খোঁজ করতে, ফারদার কিছু থাকতে পারে। পুলিশকেও খবর দিতে বলেছিল। ভাবলাম নিজেই যাই। পুলিশ যা করছে তার বেশি আর কী করবে!'

বীরেন নিঃশব্দ। সিগারটা নিবে গিয়েছিল। ছাই খুঁচিয়ে দেশলাই জ্বাললেন আবার। চোখ সরালেন না।

'কোথায় কী!' সুশোভন বললেন, 'হোটেল থেকে ফোন করেছিলাম ব্যানার্জিকে। ওটা টিসকোর নাম্বার। অপারেটর জিজ্ঞেস করল, একশোটা এস ব্যানার্জি আছে, ঠিক কাকে খুঁজছি—'

'বলে যান। শুনছি।'

'বলার কিছু নেই, দত্তমশাই। এখন মনে হচ্ছে এও এক ধাপ্পা! যে-জায়গাটা বলেছিল সেখানে চিত্রলেখা নামে একটা স্টুডিয়ো আছে ঠিকই। একটা চোয়াড়ে চেহারার লোক বসেছিল সেখানে। মেয়ের ছবি দেখিয়ে বললাম এরকম কেউ ফোটো তোলাতে এসেছিল কি না। লোকটা বলল সন্ধেবেলায় আসতে। তখন মালিক থাকবে, সে-ই বলতে পারবে। সন্ধেবেলায় গিয়ে দেখলাম ঝাঁপ বন্ধ।

কথার ধন্ধ। কথাই টানছে আবার। বর্ণনায় খুঁত নেই কোনও, খুঁত নেই অভিজ্ঞতাতেও। কিন্তু এখন সেই অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে হঠাৎ খেয়াল হল সুশোভনের, তখনকার অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল আরও কিছু—ছিল অদ্ভুত এক সংশয় ও বিপন্নতার বোধ, যা তাঁকে ভাবতে বাধ্য করেছিল ট্রাঙ্ককলে পাওয়া তথ্যে ভুল নেই; চিত্রলেখা স্টুডিয়োর সামনে যেখানে তিনি দাঁড়িয়ে, অবশ্যই সেখান দিয়ে হেঁটে গেছে পুতু। কাগজে ছবি বেরুনোর পর ইনা এবং বরুণকে শনাক্ত করা কঠিন নয়, কিন্তু, যেটা বুঝতে পারছিলেন না, সঙ্গের তৃতীয় ব্যক্তিটি কে। ওই ব্যানার্জি লোকটি নিজেই কি, তাঁর সম্পর্কে সমস্ত তথ্য জেনে যে তাঁকে টেনে এনেছে এখানে। অর্থহীন টেলিফোন নাম্বারের মতো তার পরিচয়ও কি ভুয়া ছিল! সন্ধের এই আলোকোজ্জ্বল এবং ব্যস্ত সময়ে যখন আশপাশের সব দোকানই খোলা, কেনাকাটা চলছে পুরো দমে, তখন এই ছবির দোকানটাই বা বন্ধ হয়ে গেল কেন! চক্রান্ত? যে এমন করল, কী লাভ হল তার এই বৃদ্ধকে বিপর্যস্ত করে!

সন্দেহই ক্রমশ পরিণত হয় সংশয়ে। জায়গাটা অপরিচিত, এখানে কিছু ঘটলে কেউ চিনতে পারবে না তাঁকে; সাহায্যও করবে না। দুপুরে দেখেছেন কাছে পিঠে, সাইকেলের দোকানের গা ঘেঁষে, পুলিশ চৌকি আছে একটা। দৌড়ে যাওয়া যায় সেখানে। কিন্তু, গিয়েই বা বলবেন কী! বলার কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার মতো কোনও প্রমাণ নেই তাঁর কাছে; সুতরাং পাগল ভাবতে পারে। সেটা আরও অপমানজনক।

সংশয় থেকে ওই জায়গা থেকে দ্রুত হেঁটে ফিরে আসেন হোটেলে। হতাশায় বিমূঢ়। ঝাঁঝাঁ করছে মাথা।

গেরস্থ হোটেলের নীচের তলার ডাইনিং হলে সার সার টেবিল পাতা। অনেকেই খাচ্ছিল। ঘরে ঢোকার আগে তিনিও বসে যান সেখানে। খেতে খেতেই ক্রমশ ফিরে পান নিজেকে। কোনওরকমে রাতটা কাটিয়ে আজ সকালে আবার গিয়েছিলেন চিত্রলেখা স্টুডিয়োর সামনে। তখনও বন্ধ। রিক্সায় ফিরে আসেন স্টেশনে।

নিজেকে হুবহু অনুসরণ করতে করতে চকিতে মনে পড়ে গেল সুশোভনের, খড়্গপুর স্টেশনে অপরিচিত যে-লোকটি উটকো প্রশ্ন করেছিল তাঁকে, হোটেলের ডাইনিং হলেই সম্ভবত দেখেছিলেন তাকে। দূরের একটি টেবিলে বসে সিগারেট টানতে টানতে মাঝে মাঝেই তাকাচ্ছিল তাঁর দিকে। সামনে চা বা কফির কাপ। হ্যাঁ, তা-ই হবে। চোখে গগল্‌স্ ওঠায় পরে আর চিনতে পারেননি।

খটকা লাগল। নাকি আবারও ভুল ভাবছেন। একই ধরনের মুখ চোখ আদলের অসংখ্য লোক থাকে। এতটা নিশ্চিত হওয়া কি ঠিক হবে?

যেখানে থেমেছিলেন সেইখানেই থেমে থাকলেন সুশোভন। চোখ তুলে দেখলেন বীরেন দত্ত তখনও তাকিয়ে আছেন তাঁরই দিকে। ধরনে আরও কিছু শোনার অপেক্ষা।

'এই তো। আর কিছু নয়। তারপর ফিরে এলাম।' অনিচ্ছা কাটিয়ে বললেন সুশোভন, 'হয়তো পুরোটাই ফার্স। বুঝতে পারছি না কে কল করল, তার উদ্দেশ্যই বা কী!'

'আপনার মাথায় পাগলামি ঢুকেছে, মশাই।' গম্ভীর গলায় বললেন বীরেন দত্ত, 'এত বড় রিস্ক মানুষে নেয়! পুলিশকে না জানান, আমাকে জানাতে পারতেন! যারা এভাবে হ্যারাস করছে, তাদের আর কোনও মতলব থাকতে পারে। এই সেদিন একটা থ্রেটনিং চিঠি পেলেন! খুব ভুল করেছেন।'

'সে-চিঠিও তো দেওয়া হয়েছে পুলিশকে।'

'হ্যাঁ, হয়েছে। কিছু হোক না হোক, এইভাবে লাইফ রিস্ক করা ঠিক নয়। আপনি গেলে সবই যাবে।'

বীরেনের মুখে উদ্বেগ এবং আরও কিছু। কী তা ঠিক বোঝা যায় না।

সুশোভন উঠে দাঁড়ালেন।

'ষাট পেরিয়ে গেছি অনেকদিন। এ বয়সে এমনিতেই মৃত্যু এসে যায়। নতুন আর কী হবে!'

'আপনাকে বোঝানো যাবে না।'

বীরেনও উঠলেন। চেম্বারের মধ্যে দিয়েই বেরুবেন। তার আগে চিঠিটা খামে ভরে ফেরত দিলেন সুশোভনকে।

'যে-জন্যে কথা বলতে চেয়েছিলাম তার সবই বদলে দিয়েছে ডি আই জি, ডি ডি-র এই

চিঠিটা।' চিন্তান্বিত ভঙ্গিতে কিছু ভাবলেন বীরেন, দৃষ্টি সারি দিয়ে সাজানো মোটা বইগুলির দিকে। তারপর বললেন, 'সেই ভদ্রলোক, বিনয়বাবু, ওঁর সঙ্গে দেখা হয়?'

'হয়েছিল।'

'আমি তাঁর সঙ্গে শিবদাস মল্লিকের কাছে যেতে চাই। আপনিও চলুন। ব্যাপারগুলো গোলমেলে লাগছে। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

সুশোভন চুপ করে থাকলেন।

'কবে যোগাযোগ করা যাবে? কাল?'

'দেখি। বিনয় প্রায়ই বাইরে যায়। ফোন করে দেখব।'

'দেখুন। জানাবেন আমাকে।' চেম্বারের ভেজানো দরজাটা খুলে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন বীরেন দত্ত, 'পুলিশ না নড়লে অন্য উপায় দেখতে হবে। দরকারে আমরা প্রেসের কাছে যাব। তবে আপনি একটু সাবধানে থাকবেন। আমার সাসপিসন হচ্ছে একটা ভিসাস সার্কল কাজ করছে এর পেছনে, বরুণ লাহিড়ী একা নয়। পুলিশ ধরলে একটা পুরুষ পালাতে পারে, কিন্তু মেয়েটা পালাবে কী করে। এ কি সিনেমা!'

মাথার ভিতর কাজ করে যাচ্ছে একটা শূন্যতার বোধ, কোনও কথাই গাঁথছে না ঠিকঠাক। ফিউজড বালবের ভিতরের ছেঁড়া তারের মতো বুকের ভিতর থেকে দুলে যাচ্ছে একটা চিনচিনে অনুভূতি। জ্বালা চোখেও। কেমন যেন আড়ষ্ট লাগছে চোয়াল দুটো।

ধীর পায়ে রাস্তায় নেমে এলেন সুশোভন। বাড়িই ফিরবেন। লীনা বলেছিল অর্জুন ফোন করতে পারে। চিঠিটার কথা অবশ্যই বলা দরকার ওদের। বিনয়কেও। লীনাও জেনে যাবে হয়তো। জানুক। খবর তো একটাই, মেয়েকে পাওয়া যায়নি এখনও। বেঁচে আছে, ছিল, যে-মেয়ে পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে উধাও হতে পারে সে নিশ্চয়ই সুস্থই আছে। পরোক্ষে এইসব খবরই হয়তো তাকে টেনে নিয়ে যাবে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণীতে। সুসময় আসছে।

আলোর ধাঁধা কাটাতে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে পাঞ্জাবির খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে এই মুহূর্তের যাবতীয় বাস্তব থেকে নিজেকে আলাদা করে নিলেন সুশোভন। তাকালেন ওপরে। মেঘহীন আকাশ যেমন হওয়া উচিত তেমনিই; অনন্ত আলো আঁধারির মধ্যে নিকট ও দূরের জ্যামিতিক সঙ্গতি রেখে ফুটে আছে ছোট বড় অসংখ্য তারা। অনেকগুলিকে নামে চেনেন তিনি। তাঁর আগেও চিনেছেন অনেকে। আড়াল হয়, বদলায় না। অনন্তলোকের এই স্থিরতা মানুষের জীবন স্পর্শ করে না কেন! কেনই বা বদলে যায় সব!

দীর্ঘশ্বাসে কেঁপে গেল গোটা শরীর। পরিচিত দৃশ্যের মধ্যে অপরিচিত নিজেকে ঠেলে নিয়ে যেতে যেতে সুশোভন ভাবলেন, এমন কি হতে পারে যে রক্ত ও নাড়ির যোগ থেকে যায় শুধুই অসহায়ের মধ্যে! না হলে এমন হবে কেন! শূন্য বুক পেতে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা, ক্ষয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে, পুতু কি বুঝল না সেটা! ধরা দিলে সে তো আবার ফিরে আসত নিজেরই জায়গায়! তা হলে আবার হারিয়ে গেল কেন?

সাত সেপ্টেম্বর ভোর রাতে আচমকা ঘুম ভেঙে গেল সুশোভনের। কেমন যেন দুর্বোধ্য লাগছে নিজেকে। গা-ছমছমে একটা অনুভূতিতে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থাকল হাত, পা, মাথা। ঘর জুড়ে অন্ধকার থমকে থাকলেও ভোরের সম্ভাবনায় দূর থেকে ভেসে আসছে ক্বচিৎ কাকের অনিশ্চিত ডাক। মনে হল একটা কুকুরও ডাকছিল কোথাও, তার থেমে যাওয়া চিৎকারের রেশ এখনও থেকে গেছে চারদিকের আবহে।

বারান্দার দিকের খোলা জানলা দিয়ে যেটুকু আলোর আভাস চোখে পড়ে তা অন্ধকারের ঘনত্ব স্পষ্ট করে তোলে আরও। দরজাটা বন্ধ। ফ্যানের হাওয়ায় থেমে থেমে দুলছে ভিতরের দরজার পর্দা। রাতের বেলায় যেমন থাকা উচিত তেমনিই, ওদিকেও দেখা যাচ্ছে না ছিটেফোঁটা আলো। পাশেই বাথরুম। ওখানে যাবার প্রয়োজন হলে প্যাসেজের আলোটা জ্বেলে নেন তাঁরা।

তা হলে কোথায় গেল লীনা?

এই অন্ধকারে একমাত্র স্বচ্ছতা নিয়ে জেগে বিছানার সাদা। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই বুকের মধ্যে অবিশ্বাস ঘন হয়ে উঠল সুশোভনের। আশঙ্কায় বিছানা ছেড়ে উঠে এলেন ঘরের বাইরে। অন্ধকারে।

ইনার ঘর যেমন কে তেমন বন্ধ। আজকাল বড় একটা ও ঘরে ঢোকেন না তাঁরা। দিদিমণি ছিল মন্টুরও বড় প্রিয়, সে জানে কীভাবে তকতকে করে নিকোতে হয় ঘরের মেঝে, ধুলো ঝাড়তে হয় পড়ার টেবিলের, সকলের অলক্ষ্যে সাবধানে মুছে রাখতে হয় দেয়ালের ছবিটা। রান্নাঘরের সামনের খোলা অংশে মৃদু নাক ডাকার শব্দ তুলে এখন সেও ঘুমোচ্ছে বেঘোরে। ডাইনিং টেবিল এবং চেয়ারগুলো যে যার জায়গায় স্থির। প্যাসেজের আলো জ্বেলে বাথরুমের দরজার হাতল ঘুরিয়ে দেখলেন সেখানেও নেই। জানলা দিয়ে ছুটে এল বিপীরতে আবদ্ধ হাওয়া।

ক'মুহূর্ত সময় নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি এবং স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, আধখোলা হয়ে হলদে পাঁচিলের ওপরের কাঁটাতার দেখাচ্ছে দরজাটা। বাঁ দিকে বেরিয়ে যাবার গলি। তা হলে কি? উৎকণ্ঠা শেষ পর্যন্ত ভাবতে দিল না।

তাড়াতাড়ি সিঁড়ি নেমে দরজাটা দিয়ে গলিতে বেরিয়ে এসে একই সঙ্গে অবিশ্বাস ও স্বস্তিতে পাগল হয়ে উঠলেন সুশোভন। গেটের পাশে দেয়াল ঘেঁষে রাস্তার দিকে তাকিয়ে অপার্থিব ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছেন লীনা। এমন অচঞ্চল, যেন ইট কাঠ লোহায় তৈরি স্তব্ধতারই অংশ। বহু বছরের অভিজ্ঞতায় চেনা বলেই চিনতে অসুবিধে হল না।

নিঃশব্দে হেঁটে স্ত্রীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন সুশোভন। নিজেকেও চেনালেন। শব্দ ফুটল না মুখে।

কথা লীনাই বললেন।

'তুমি উঠে এলে। আমি তো নিজেই ফিরে যেতাম।'

এমনভাবে বললেন যেন ঘটনায় অস্বাভাবিকতা নেই কোনও।

আতঙ্ক ততক্ষণে পরিণত হয়েছে আবেগে। বলার কথাগুলো জট পাকিয়ে গেল গলার মধ্যে। নিশ্চিন্ত হবার জন্যে বাঁ হাতটা বিস্তৃত করে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন সুশোভন।

'কী করতে যাচ্ছিলে তুমি।'

'তুমি ভয় পেয়েছ? জেগে যাবে জানলে আসতাম না।'

জবাব না দিয়ে অন্ধকারেই স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালেন সুশোভন। দৃষ্টি গভীরতা খুঁজছে, সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে লীনাকে।

তিনি তাকালেন বলে লীনাও তাকালেন। তাকিয়েই থাকলেন। তারপর হঠাৎই সুশোভনের গেঞ্জিটা মুঠোয় চেপে ধরে অন্যরকম গলায় বলে উঠলেন, 'তোমার মনে পড়ে, এই সময়েই জন্ম হয়েছিল পুতুর? এইরকম ভোরের আগে। আজই তো সাতুই সেপ্টেম্বর। খুব কষ্ট দিয়েছিল। খুব—'

কথা শেষ করতে পারলেন না লীনা। সুশোভনই দিলেন না। ঠিক কত বছর পরে মনে পড়ে না, তবে নিশ্চিত বহু বহু বছর পরে স্ত্রীর অসম্বৃত মুখখানি পুরোপুরি নিজের বুকে চেপে ধরে সহনশীলতার শেষ মুহূর্তে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন তিনি। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হয়ে এল সদ্যোজাতের গন্ধে। ঊর্ধ্বে মুখ তুলে, ঝড়ে ঝাপটানো নিজের বিচ্ছিন্ন শিকড়গুলিকে একত্র করবার প্রাণপণ চেষ্টায়, অনুচ্চারিত প্রতিবাদে চিৎকার করে উঠলেন সুশোভন, 'ঈশ্বর, এ কেমন বিচার তোমার! যার সন্তানকে কেড়ে নাও, কেন তার শরীরে রেখে যাও গর্ভধারণের যন্ত্রণা। এর চেয়ে তুমি একা করে দাও আমাকে। দয়া করো একে।'

কেউই শুনতে পায় না সেই হাহাকার। এর পরের নীরবতা জুড়ে ভোর হতে থাকে ক্রমশ। বেলা হয়। দিন গড়িয়ে যায় রাতে।

আঠারো থেকে উনিশে পা দিল ইনা। যত দিন যাচ্ছে ততই যেন বয়সের চেয়ে বড় দেখাচ্ছে তাকে। এখন আর তাকে নাবালিকা বলা যাবে না।

২০ সেপ্টেম্বর। ইনা মুখার্জির নিখোঁজ সংক্রান্ত ব্যাপারে সংবাদপত্রের রিপোর্টে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা এমনই শোরগোল তুলল যে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে একটা বড় ধরনের রদবদল হয়ে গেল পুলিশে। সাধারণ একটি মেয়ের হারিয়ে যাবার ঘটনা যে এমন তোলপাড় তুলতে পারে চারদিকে, এ শহর কোনও দিন ভাবতেও পারেনি তা।

তার আগে পর পর তিনদিন কলকাতা এবং এমনকী দিল্লি এবং বোম্বাই থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদপত্রে ইনা মুখার্জির নিখোঁজ হওয়া, তাকে খুঁজে পাওয়া এবং তার পুনরায় নিখোঁজ হওয়ার যে-বিবরণ প্রকাশিত হয়, সংবাদের হেডলাইন ধরে তা এইভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে—

উদ্ধার করা তরুণী গোয়েন্দাদের হেফাজত থেকে উধাও

রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে ভুবনেশ্বর থেকে কলকাতায় আসার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে নিখোঁজ অষ্টাদশী (যাদবপুর থানায় এফ আই আর কেস নং ৪১/৬ অনুসারে ১৭ বছর ৯ মাস ৮ দিন) ইনা মুখার্জির সন্ধান পুলিশ তিন মাসেও করতে পারেনি। ইনা মুখার্জির বাবা, কলকাতার একটি বিখ্যাত কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক সুশোভন মুখার্জি রাজ্য পুলিশের আই জি, ক্রাইম শিবদাস মল্লিক, ডি আই জি, ডি ডি রতন ভট্টাচার্য এবং রাজ্য সরকারের অন্যান্য পদস্থ অফিসারদের এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেও কোনও ফল না পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করেছেন। এই ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্রে রতন

ভট্টাচার্যের বয়ানে যে-বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক মুখার্জি তারও প্রতিবাদ করেছেন। ডি আই জি, ডি ডি রতন ভট্টাচার্য তাঁকে ১৬ আগস্ট এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন গোয়েন্দা বাহিনীর হেফাজতে ভুবনেশ্বর থেকে ট্রেনে করে কলকাতায় আসার পথে ইনা এবং তার অপহরণকারী বলে অভিযুক্ত বরুণ লাহিড়ী উধাও (ডিসঅ্যাপিয়ার্ড) হয়। সুশোভনবাবুর কাছে এই তথ্য অবিশ্বাস্য মনে হওয়ায় তিনি রতন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে বিশদ ঘটনা জানতে চান। তখন তাঁকে বলা হয় সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা দল জানিয়েছে কলকাতায় আনার পথে গভীর রাতে এই দুজনেই চলন্ত ট্রেন থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয় এবং সম্ভবত এরা আর জীবিত নেই। সুশোভনবাবুকে আরও জানানো হয় যে ঘটনার যাথার্থ্য অনুসন্ধান করবার জন্য এরপর গোয়েন্দাবিভাগের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট নির্মল চৌধুরী ভুবনেশ্বরে যান এবং তিনিও ফিরে এসে একই রিপোর্ট দিয়েছেন। সুশোভনবাবুকে বলা হয় এ সম্পর্কে তাঁর আরও কিছু জানবার থাকলে তিনি ভুবনেশ্বরে ওড়িশা পুলিশের সংশ্লিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এরপর সুশোভনবাবু এবং তাঁর ভাইপো, রেডিও ফিজিক্সের অধ্যাপক ডক্টর অর্জুন মুখার্জি একাধিকবার ভুবনেশ্বরে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কিন্তু রতন ভট্টাচার্যের বক্তব্যের সমর্থন পাননি। কোনও ফলও হয়নি। গোয়েন্দা পুলিশের কার্যকলাপ এবং পরস্পরবিরোধী বিবৃতিতে ইনার উধাও হওয়ার ঘটনায় জড়িত পুলিশ অফিসারদের চূড়ান্ত গাফিলতির নজির সৃষ্টি হয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত জুন মাসের ১৯ তারিখে। ওই দিন দুপুরে ইনা তাদের যাদবপুরের বাড়ি থেকে বাগবাজারে তার অসুস্থ জ্যাঠামশাই চিন্মোহন মুখার্জিকে দেখতে যায়। ওই দিনই সন্ধ্যার আগে তার জেঠতুতো দাদা অর্জুন মুখার্জি তাকে যাদবপুরে ফেরার জন্যে বালিগঞ্জের বাসে উঠিয়ে দেন। ইনা এরপর আর বাড়ি ফেরেনি। দাদার অসুস্থতার কারণে সুশোভনবাবু এবং তাঁর স্ত্রী সেদিন খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং মেয়ে বাড়ি না ফেরায় ধরে নেন সে বাগবাজারেই আছে। রাত ন'টা নাগাদ তিনি তাঁর বাড়িতে টেলিফোনে খবর পান চিন্মোহনবাবুর অবস্থা খারাপ, তাঁরা যেন অবিলম্বে বাগবাজারে চলে আসেন। সুশোভনবাবু ও তাঁর স্ত্রী পৌঁছুবার আগেই মৃত্যু হয় চিন্মোহনের। বাগবাজারে পৌঁছেই তাঁরা জানতে পারেন ইনা সন্ধ্যার আগেই যাদবপুরে ফিরে গেছে এবং বাগবাজার থেকে ন'টা নাগাদ কেউই ফোন করেননি তাঁদের। বিভ্রান্ত সুশোভনবাবু এরপর তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে যাদবপুরে ফিরে এসে মেয়ের খোঁজ শুরু করলে এক প্রতিবেশী তাঁকে জানান সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা নাগাদ গড়িয়াহাটে ইনাকে তার বন্ধু এবং কলেজের সহপাঠিনী ঝুমুর লাহিড়ীর দাদা বরুণের সঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠতে দেখা গেছে। সুশোভনবাবু এবং অন্যান্যরা তখন চেতলায় লাহিড়ীদের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ করেন, কিন্তু সেখানেও ইনা বা বরুণের কোনও সন্ধান পান না। ওইদিনই রাতে তিনি যাদবপুর থানায় (১) মেয়ের নিখোঁজ হওয়া, এবং (২) বরুণ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে তাকে অপহরণ করার অভিযোগে একত্রে দুটি এফ আই আর করেন।

ওড়িশা গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় ২২ জুলাই ভুবনেশ্বরে ইনা এবং বরুণের খোঁজ পাওয়া যায় এবং কলকাতায় গোয়েন্দা পুলিশকে তা জানানো হয়। গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌সপেক্টর রামচন্দ্র মণ্ডলের নেতৃত্বে চারজনের একটি দল সেইদিনই ভুবনেশ্বরে যান এবং ২৩ জুলাই দুটি পৃথক জায়গা থেকে ইনা এবং বরুণকে গ্রেফতার করে ট্রেনে কলকাতা

রওনা হন।

সুশোভনবাবু অভিযোগ করেছেন: (১) গোয়েন্দা পুলিশের হেফাজতে গ্রেফতার থাকা অবস্থায় ইনা এবং বরুণ চলন্ত ট্রেন থেকে কীভাবে পালাতে পারে? (২) ঘটনাটি ২৩ জুলাই ঘটা সত্ত্বেও ২৮ জুলাই তিনি যখন রতন ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করে তাঁর নিখোঁজ মেয়ে সম্পর্কে জানতে চান তখনই তাঁকে খবর না দিয়ে প্রায় তিন সপ্তাহ পরে জানানো হল কেন? (৩) ইনা ও বরুণ পালাতে গিয়ে মারা গেছে এই রিপোর্টের প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তারা জীবিত নেই বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে কেন? (৪) যাঁদের হেফাজতে থাকার সময় এই ঘটনা ঘটেছে তাঁদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? (৫) গোয়েন্দা পুলিশ নিজেরা প্রকৃত ঘটনার অনুসন্ধান না করে তাঁকে ওড়িশা পুলিশের কাছে পাঠালেন কেন?

গোয়েন্দা বিভাগের এই আচরণ ও অবহেলায় সুশোভনবাবু ক্ষুব্ধ এবং নিজেকে 'ডিফেন্সলেস' মনে করছেন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, ইনা নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে এপর্যন্ত কে বা কারা তাঁকে বরুণ লাহিড়ীর বিরুদ্ধে কেস উইথড্র করে নেওয়ার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে এবং ইনা সম্পর্কে টেলিফোনে নানা বিভ্রান্তিকর খবর দিয়েছে। এ ধরনের দু একটি সূত্রে বিশ্বাস করে তিনি নিজে মেয়ের সন্ধানে গিয়ে ফিরে এসেছেন ব্যর্থ হয়ে। পুলিশকে এসব ঘটনা জানাবার পরেও কোনও ফল হয়নি। তাঁর ধারণা ইনা এখনও জীবিত, কিন্তু রহস্যজনক কারণে গোয়েন্দা পুলিশ এই কেসটি ধামাচাপা দিতে চাইছে।

বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুল সংবাদের বয়ান কমবেশি একই এবং উপরোক্ত ধরনের হলেও প্রত্যক্ষ সূত্রের উল্লেখ না করে কোনও কোনও সংবাদপত্র এর অতিরিক্ত কিছু তথ্যও সরবরাহ করে।

'বিশেষ অনুসন্ধান করে' একটি বাংলা দৈনিক জানতে পেরেছে, বরুণ লাহিড়ীর সঠিক পরিচয় কী, সে কী করত, সে-সম্পর্কে পুলিশ এখনও নিশ্চিত হতে পারেনি। তবে তার পরিবারের লোকজন এবং তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে কথিত ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে যে সে নানারকমের কাজ করত এবং এই সূত্রে কলকাতাসহ ভারতবর্ষের কয়েকটি বিখ্যাত বাণিজ্যিক সংস্থার সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। ভবানীপুরের 'মেস' বাড়ি বলে যে-জায়গায় বরুণ থাকত বলে আগে রিপোর্ট পাওয়া যায়, পুলিশের মতে সেটি একটি ফ্ল্যাট, যার মালিক একজন গুজরাতি ব্যবসায়ী। বরুণ ফ্ল্যাটটি ভাড়া নেয়। ওই ফ্ল্যাটের দরজায় 'বিজনেস কেয়ারটেকার্স' নামে একটি বোর্ডও দেখা যায়। বরুণ এক্সপোর্ট ইমপোর্টের ব্যবসা করত এবং নানা ধরনের লোক আসত তার ফ্ল্যাটে। মাঝে মাঝে বিভিন্ন বয়সের মহিলারাও আসতেন। 'নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক' গোয়েন্দা বিভাগের এক অফিসার জানান, বরুণের ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালিয়ে তাঁরা যেসব কাগজপত্র পেয়েছেন তার মধ্যে আছে একটি টেলিফোনের বই, যাতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সংস্থার বড় ও মাঝারি এক্সিকিউটিভ থেকে শুরু করে খ্যাত রাজনৈতিক নেতাদের নাম ও টেলিফোন নাম্বার আছে। এঁদের একজন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রভাবশালী নেতা।

ইংরাজি সাপ্তাহিক 'দা রেকনার'-এর ওড়িশা প্রতিনিধির সূত্রে প্রাপ্ত খবর, রাজ্য সি আই ডি বিভাগের দুজন গোয়েন্দা অফিসার ও দুজন পুলিশের হেফাজতে ভুবনেশ্বর থেকে

কলকাতায় আনবার সময় বরুণ লাহিড়ী এবং ইনা মুখার্জি উধাও হয়ে যাওয়ায় ওড়িশা পুলিশ বিচলিত। কারণ এই দুজন যে ভুবনেশ্বরেই আত্মগোপন করে আছে এ খবর তাঁরাই দিয়েছিলেন। তাঁদেরও ধারণা ট্রেন থেকে পালানোর ব্যাপারটা সাজানো এবং জি আর পি'র কাছে পরে যে রিপোর্ট করা হয় তাতে অসঙ্গতি আছে। এই ঘটনা ডি আই জি, ডি ডি রতন ভট্টাচার্যকে জানানোর পরে ঘটনাটির প্রত্যক্ষ তদন্ত করার জন্যে ক্রিমিনাল ইনটেলিজেন্সি ডিপার্টমেন্টের অতিরিক্ত সুপারিনটেনডেন্ট নির্মল চৌধুরীকে ঘটনার তিনদিন পরে ভুবনেশ্বরে পাঠানো হয়। অজ্ঞাত কারণে তিনি তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট থাকবার জায়গায় না থেকে ভুবনেশ্বরে একটি পাঁচতারা হোটেলে ওঠেন এবং ওড়িশা পুলিশের গাড়ি ব্যবহার না করে হোটেলের ভাড়া গাড়িতে ঘোরাফেরা করেন। (এই বিলাসের খরচ কে জোগালো তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে।) তদন্ত সম্পূর্ণ হবার আগেই নির্মল চৌধুরী কলকাতায় ফিরে যান এবং রতন ভট্টাচার্যকে তাঁর রিপোর্টে জানান বরুণ লাহিড়ী এবং ইনা মুখার্জির চলন্ত ট্রেন থেকে নদীতে ঝাঁপ দিয়ে উধাও হওয়ার যে রিপোর্ট আগে দেওয়া হয়েছিল তা ঠিক এবং সম্ভবত দুজনেরই মৃত্যু হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক, কারণ নদীতে ঝাঁপ দেওয়ার কারণে মৃত্যু হলে মৃতদেহ খুঁজে পাওয়ার প্রশ্ন ওঠে। ওড়িশা পুলিশ তল্লাশি চালিয়েও এ পর্যন্ত কোনও মৃতদেহের সন্ধান পাননি। তা হলে নির্মল চৌধুরীর এই রিপোর্টের ভিত্তি কী? ওড়িশা গোয়েন্দা বিভাগের উপপ্রধান এ বিষয়ে রাজ্য পুলিশের ডি আই জি, ক্রাইম শিবদাস মল্লিকের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন।

ওই সাপ্তাহিকের প্রতিবেদক প্রশ্ন তুলেছেন, রতন ভট্টাচার্য এবং নির্মল চৌধুরী এই রহস্যের দ্রুত নিষ্পত্তি করার ব্যাপারে এত উদগ্রীব কেন? তা হলে কি এই ঘটনার পিছনে এমন কোনও ঘটনা আছে যা প্রকাশিত হলে আরও বড় কোনও ষড়যন্ত্র ও কেলেঙ্কারি ধরা পড়ে যাবে!

'দা রেকনার'-এর সন্দেহ যে একেবারে অমূলক সম্ভবত তা ধারণা করার কারণ নেই। ২১ সেপ্টেম্বর গোয়েন্দা পুলিশে রদবদলের সংবাদ প্রকাশ করে কোনও কোনও সংবাদপত্র জানায়, ওড়িশা পুলিশের নির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়ে আই জি, ক্রাইম শিবদাস মল্লিক ডি আই জি, ডি ডি রতন ভট্টাচার্যের কাছে এই সংক্রান্ত অভিযোগের কৈফিয়ত ও ব্যাখ্যা চেয়েছেন। রতন ভট্টাচার্য কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা এ পর্যন্ত জানা না গেলেও ইনা মুখার্জির অন্তর্ধান এবং পরবর্তী ঘটনা নিয়ে রাজ্য গোয়েন্দা বিভাগের উপর মহলে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের সূচনা হয়েছে তা স্পষ্ট। রদবদলের পর এমনও শোনা যাচ্ছে যে রতন ভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই ছুটির আবেদন করেছেন এবং শিবদাস মল্লিকের নির্দেশ অনুসারে এই কেসের সমস্ত ফাইল নির্মল চৌধুরীর কাছ থেকে নবনিযুক্ত স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট লোহিত রায়ের কাছে হস্তান্তরিত হয়েছে। লোহিত রায় দক্ষ গোয়েন্দা অফিসার। ইতিপূর্বে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ডাকাতি এবং ব্রেবোর্ন রোডের মালিনী আগরওয়ালের অন্তর্ধান সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর কেস দুটির তদন্ত করেছিলেন।

২৩ সেপ্টেম্বর খবরে প্রকাশিত হল: লোহিত রায়ের সঙ্গে দেখা করে ইনা মুখার্জির অন্তর্ধান সংক্রান্ত কেসের গতিবিধি জানতে চাওয়া হলে তিনি কোনও বিশদ মন্তব্য করতে চান না। তবে গ্রেফতার হবার পরেও ইনা ও বরুণ কীভাবে উধাও হয়ে গেল তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। লোহিত রায় এমন ধারণাও দেন যে ইনা ও বরুণ এখনও জীবিত এবং সম্ভবত

অন্য কোনও রাজ্যে পালিয়ে গিয়ে আত্মগোপন করে আছে। তিনি নিজে এটিকে নিছকই 'প্রণয়ঘটিত' ব্যাপার বলে মনে করছেন না। একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, যে-কোনও কারণেই হোক, এই ঘটনার সঙ্গে কোনও প্রভাবশালী চক্রের যোগাযোগ থাকা অসম্ভব নয়।

আরও একটি প্রশ্নের উত্তরে লোহিত রায় বলেন, শুধু এই রাজ্যে বা এই দেশেই নয়, বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই, বিশেষত অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অন্তর্ধানজনিত ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। অ্যামেনস্টি ইন্টারন্যাশনালের সাম্প্রতিক রিপোর্টও অনুরূপ সাক্ষ্য দেয়। যেটা আরও উদ্বেগের ব্যাপার, অন্তর্ধানজনিত ঘটনার চরিত্রও পাল্টে যাচ্ছে ক্রমশ এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলির সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ জড়িত থাকছে না। অনেক ক্ষেত্রেই এব পিছনে থাকছে বৃহত্তর রাজনৈতিক কিংবা বাণিজ্যিক কারণ।

সংবাদপত্র 'তদন্ত করে' জানতে পারে, গত মাসে কলকাতা শহরে নিখোঁজ হন ৬৭০ জন। এর ৭০ শতাংশই প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং মহিলা এবং ৩০ শতাংশ অপ্রাপ্তবয়স্ক। এব মধ্যে নিখোঁজ অপ্রাপ্তবয়স্ক, শিশু বা কিশোরদের ৩৫ শতাংশের সন্ধান মিললেও প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ২২ শতাংশ।

ইনা মুখার্জির নিখোঁজ হওয়ার ঘটনার সূত্রে এইসব বিবরণ পুরনো হবার আগেই ১০ অক্টোবর একটি বাংলা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় স্টাফ রিপোর্টারের বয়ানে একটি সংবাদ প্রকাশিত হল—

সুশোভন মুখার্জিও হারিয়ে গেলেন?

যাদবপুরে নিখোঁজ যুবতী ইনা মুখার্জির বাবা তেষট্টি বয়র বয়স্ক অধ্যাপক সুশোভন মুখার্জিও কি হারিয়ে গেছেন? ৮ অক্টোবর যাদবপুর থানায় সুশোভন মুখার্জির স্ত্রী লীনা মুখার্জি এবং ভাইপো অর্জুন মুখার্জি এই মর্মে এফ আই আর করেছেন।

এ ব্যাপারে সুশোভনবাবুর যাদবপুরের বাড়িতে যোগাযোগ করা হলে অর্জুন মুখার্জি জানান, তিনি নিখোঁজই হয়েছেন কি না তা এখনই বলা যাচ্ছে না। কিন্তু, ৮ অক্টোবর বেলার দিকে তিনি কারও ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান এবং ঘণ্টাখানেক পরে ফিরে এসে স্নান খাওয়া সেরে বেরিয়ে যান আবার। বেরুবার সময় স্ত্রীকে বলে যান, 'ফিরতে দেরি হলে চিন্তা কোরো না।' রাত আটটা পর্যন্ত তাঁকে ফিরে আসতে না দেখে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করেন। শেষে থানায় রিপোর্ট করেন।

অর্জুনবাবু বলেন, ইদানীং ইনার ব্যাপার নিয়ে সুশোভনবাবু উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রায়ই এইভাবে হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে যেতেন। কিন্তু ফিরেও আসতেন। ওইদিন আর ফেরেননি।

এ সম্পর্কে গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট লোহিত রায়ের সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'শুনেছি। নো কমেন্টস্।'

আদ্যন্ত স্তব্ধতার মধ্যে ১৩ অক্টোবর দুপুরের ডাকে একটি চিঠি পেলেন লীনা। সুশোভনেরই লেখা।

'পরম কল্যাণীয়া লীনা,

আজ তিন দিন হল আমি তোমাকে কিছু না জানিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। কাউকেই জানাইনি। বুঝতে পারি আমার এই অদ্ভুত ব্যবহারের কোনও যুক্তি নেই; বাড়ি ছাড়ার আগে তোমাকে অন্তত জানানো উচিত ছিল। তুমি আমার স্ত্রী; সুখে দুঃখে পরম মমতায় এতদিন দেখেছ আমাকে; জীবনে কখনও এমন ঘটনা ঘটেনি যার আনন্দ, দুঃখ আমরা ভাগ করে নিইনি। বিশেষত দুঃখে, সংশয়ে তুমিই আমার প্রধান আশ্রয়। তোমাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। আমি মরমে লজ্জিত যে জীবনের সায়াহ্নে পৌঁছে তোমার সঙ্গে প্রতারণা করলাম।

বললাম বটে প্রতারণা, কিন্তু আমি নিজেও জানি না এটা প্রতারণা কি না। যদি ফিরে আসি তা হলে আমার এই আচরণেরই অন্য অর্থ দাঁড়াবে। তখন তোমাকে বোঝাতে পারব কেন এরকম করলাম। আমি পাগল হইনি, সুস্থই; তবু বুঝতে পারছি অদ্ভুত এক ব্যর্থতাবোধ সারাক্ষণ ছিঁড়ে খাচ্ছে আমাকে। স্থির থাকতে দিচ্ছে না।

আমার বিশ্বাস অবশেষে আমি পুতুর খোঁজ পেয়েছি। ঈশ্বর যদি সহায় হন তা হলে দু তিনদিনের মধ্যেই তাকে সঙ্গে নিয়ে ফিরব।

কিঞ্চিৎ হয়রানির মধ্যে থাকলেও আমি ভাল আছি। এখন আছি ধানবাদে। হোটেল পরমেশ্বরে। কিন্তু কাল কোথায় থাকব জানি না। এ কথা লিখছি এই কারণে যে কলকাতা ছেড়ে আমি জামশেদপুরে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে এখানে। ঈশ্বরের কাছে বার বার প্রার্থনা করছি যেন এখান থেকেই কলকাতায় ফিরে যেতে পারি পুতুকে সঙ্গে নিয়ে।

প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বর সহায় হলে আজই হয়তো পুতুর সঙ্গে আমার দেখা হত। কিন্তু আমার নিজেরই দ্বিধা ও সন্দেহ আমাকে বঞ্চিত করল। এখন অনুশোচনা হচ্ছে এই ভেবে যে ঈশ্বর আমাকে সাহস দিয়েছেন, কিন্তু দেননি নিজেকে জয় করার সম্পূর্ণতা। দিলে এইরূপ দ্বিধান্বিত হতাম না। আবার এমনও মনে হচ্ছে আমি যা করেছি ঠিকই করেছি। আমার লক্ষ্য তো পুতুকেই খুঁজে বের করা, তাকে আবার আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা। সেই লক্ষ্য পূরণের পথে যদি কোনও সংশয় থাকে তা দূর করে নেওয়াই ভাল। জানি না কোনটা ঠিক, কোনটা ভুল। ভবিষ্যৎই তা নির্ধারণ করে দেবে।

হারিয়ে গিয়ে পুতু এমন পাবলিসিটি পেল যে ভবিষ্যৎ জীবনে হয়তো আমাদের সন্তান হিসেবে তার পবিচয় মুছে যাবে। এমনও আশঙ্কা হয় লোকে তাকে ঘৃণা করবে। পিতা হয়ে নিজের কন্যা সম্পর্কে এরকম চিন্তা করা কল্পনাতীত যে আমাদের আদরের পুতু এতদিন নিরুদ্দিষ্ট থেকেও অক্ষত আছে। ভগবান জানেন সে এতদিন কার কাছে ছিল, কী অবস্থায় আছে। তারা না জানি তার ওপর কী না অত্যাচার করেছে। পুতু যেদিন হারিয়ে যায় সে দিন থেকেই আমার মনে এই সন্দেহ ও চিন্তা যে মেয়েটা ভাল নেই, বড় কষ্টে আছে, আছাড়িপিছাড়ি করছে যন্ত্রণায়। ফিরে আসার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সুযোগ পাচ্ছে না।

আমরা কখনও নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলোচনা করিনি। জেনেশুনেই করিনি। করলে

আমরা নিজেদের কাছেই ছোট হয়ে যেতাম। উপরন্তু, ওর আঘাত কি আমাদেরও অক্ষত রেখেছে; পুতুর জন্মদিনে, যে দিন তুমি রাতের ভয়ানক অন্ধকারে বেরিয়ে গিয়েছিলে, সেদিনই আমি অনুভব করেছিলাম আমরা আর স্বাভাবিক মানুষের মতো নেই, এই ক'মাসে হয়ে উঠেছি অন্ধকারেরই প্রাণী। আমাদের সম্মুখে কোনও দিশা নেই। এই সত্য স্বীকার মৃত্যুরই সমান।

বাপ হয়েও আমি মাঝে মাঝে ওর মৃত্যু কামনা করেছি, প্রার্থনা করেছি ঈশ্বর ওকে মেরে পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে। সেটাও একরকমের বাঁচা হত আমাদের পক্ষে। এমন হলে আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎও নির্ধারণ করে নিতে পারতাম। যে থেকেও নেই তার জন্যে এই দিনের পর দিন অপেক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে ঈশ্বর আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

পরে আমার মনে হয়, বাঁচার আগ্রহে মানুষের স্বাভাবিক অধিকাব আছে। মরতে মরতেও সে বাঁচতে চায়, যে-কোনও রকমের জীবনেই নিতে চায় নিঃশ্বাস। বড় মায়াময় এই পৃথিবী, বড় সুন্দর সুখের স্বপ্নে জড়ানো থাকে মানুষের ভবিষ্যৎ। এই স্বপ্নই মিথ্যাকে সত্য বলে গ্রহণ করতে শেখায়। হতাশা থেকে নিয়ে যায় আশায়। এইরূপ না হলে অন্ধ কী সুখে বাঁচে. বিকলাঙ্গই বা কী সুখে বাঁচে! তাদের সকল দুঃখের মধ্যেও কোনও সুখের আশা নিশ্চয়ই থাকে। আশাই বাঁচিয়ে রাখে মানুষকে। পুতু যে এতদিন বেঁচে আছে তাও নিশ্চয়ই অনুরূপ কোনও আশা থেকে। না হলে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে হয়ে সে কি বুঝতে পাবত না কোন জীবন সে বাহিত করছে এবং এই জীবন মেনে নেওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল! ঈশ্বর করুন, তার সম্পর্কে আমার নিষ্ঠুর ধারণাগুলি যেন মিথ্যা হয়।

আমার আরও মনে হয় পুতু ওই যুবকটির সঙ্গে পালিয়ে গেছে বলে যে-ধারণা সৃষ্টি হয়েছে তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। পুরোপুরি মিথ্যাও হতে পারে। একটি সত্য এই হতে পারে যে সে ভ্রমে পড়েছিল। ভ্রমে পড়ে যাকে বিশ্বাস করেছিল, যার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছিল, সে পুতুর সঙ্গে প্রবঞ্চনা করেছে। বরুণ যুবকটির সঙ্গে তার যে আকর্ষণের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা তুমিও জানো, আমারও অজানা নয়। কিন্তু হৃদয়ের প্রবৃত্তিও তো মানবিক, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক।

অর্জুন মাঝে একটি কথা বলেছিল যা আমার মনে খুব লেগে আছে। অর্জুন বলেছিল যে পুতু তার জ্যাঠামশাই মৃত্যুশয্যায় এবং আমরা সকলেই এ নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও ব্যস্ত দেখে সেই দিনটিকেই অন্তর্ধানের উপযুক্ত মনে করবে এবং সেইমতো অন্তর্ধান করবে, এটা সত্য হতে পারে না। পুতু সেরকম মেয়েই নয়। হৃদয়হীনও নয়। অর্জুন সন্দেহ করে সেই সন্ধ্যায় পুতুকে এমন কিছু বোঝানো হয় বা সে এমন কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যাতে তার উপস্থিত বুদ্ধি লোপ পায়। বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়েই এরপর সে শিকারির ফাঁদে পা দেয়। আমার ধারণা এই শিকারি একজন নয়, বহুজন। যদি একজনই হত তা হলে এভাবে ওর পালিয়ে বেড়ানো এবং আত্মগোপন করে থাকার কোনও অর্থই আমি খুঁজে পাই না। সে যদি বরুণকে বিয়ে করার সংকল্প নিত, তা হলে, এ ঘটনা আমাদের পক্ষে যতই বেদনাদায়ক হোক, আমরা বাধা দিতাম কি। এরকম অনেক ঘটনাই ঘটে এবং মানুষ শেষ পর্যন্ত মেনেও নেয়।

আমি এতই বিপন্ন বোধ করছি যে নিজেকে যতদূর সাধ্য ভারমুক্ত করার জন্য এইসব সন্দেহের কথা তোমাকে লিখে জানাচ্ছি, কখনও বা অর্থহীন ভেবেও লিখছি। আমার ঘুম চলে গেছে, প্রচণ্ড উদ্বেগ, কালকের অপেক্ষায় বসে আছি—অন্তত নিজের অবস্থাটা

তোমাকে জানাতে পারছি ভেবে না লিখেও পারছি না।

পুতু কেন এইরূপ করেছে? সে যদি বেঁচেই থাকে তা হলে এত দিনেও তার বাবা-মা'র কী দশা হয়েছে তা কি জানবার চেষ্টা করত না? তাকে কি এমন কোনও বাধ্যতায় রাখা হয়েছে যে সে এইরূপ না করলে আরও বড় ক্ষতি হতে পারে? এমন সম্ভাবনা কি থাকতে পারে যে আমাদের জীবন সংশয়ের আশঙ্কা করেই সে এমন করছে? কিংবা অন্য কোনও ভয়ে, যা আমরাও ধারণা করতে পারছি না?

আমার মনে এইরূপ প্রশ্নও জাগছে যে আপাত দৃষ্টিতে আমরা যেটাকে প্রত্যক্ষ ভাবছি ও অনুমান করে নিচ্ছি, পুলিশ ও খবরের কাগজগুলিও যেগুলিকে সত্য মেনে টানাহেঁচড়া করছে, সেগুলি কি সত্য? এমনকী হতে পারে যে বরুণ লাহিড়ী নামের ওই যুবকটিকে জড়িয়ে পুতুর যে মানসিক ও শারীরিক সংকটের কথা আমরা ভাবছি, তা আদৌ সত্য নয়— এই ঘটনার মধ্যে উভয়ের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক গৌণ! আসল ঘটনা কি অন্য হতে পারে না! কিন্তু কী সেই আসল ঘটনা তার সন্ধান আমার কাছে নেই। অপ্রত্যক্ষের সন্ধান কে দেবে!

কিন্তু, পুতু যে বেঁচে আছে এ সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ। গত ক'দিনে আমি তাকে সারাক্ষণ প্রত্যক্ষ করছি। সে ঘুরঘুর করছে আমার আশপাশে। সেই শিশু বয়সে যেমন করত, আমার চেয়ারের পিছনে লুকিয়ে জিজ্ঞেস করত, আমি কি তাকে দেখতে পাচ্ছি? আমি বলতাম, না, তুমি হারিয়ে গিয়েছ। আজও আমার মন বলছে, আমি তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছি, বাবা, তুমি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছ? আমি বলছি, হ্যাঁ, হ্যাঁ—। কিন্তু সে হারিয়ে গিয়েছে এ কথা আর বলতে পারছি কই! ইতিমধ্যে পুতু তার শিশুকাল হারিয়েছে, বদলে গেছে তার অবোধ কণ্ঠস্বরের আহ্লাদ। ওই কণ্ঠস্বরে এখন শুধুই ভয়, আতঙ্ক এবং আকুল প্রশ্ন। আমিও বৃদ্ধ হয়েছি, পিতার যে-আত্মবিশ্বাস সন্তানকে সব সময় পাহারা দিয়ে আগলিয়ে রাখে, মস্ত ভাঙচুর ঘটে গেছে তাতে। তুমি ওর মা। নিজের অভিজ্ঞতা দিয়েই তুমি তা বুঝবে।

আমার প্রশ্ন, কেন এমন হল, কে এর জন্যে দায়ী? মানুষে মানুষে স্বাভাবিক সম্পর্কের ভিতর যে-শাশ্বত, কে তাকে এইভাবে বিঘ্নিত করল? সম্পর্কের সত্য যদি নষ্ট হতে থাকে, তা হলে জীবনের সত্য কোথায় আশ্রয় পাবে?

আজ আমি বড় একা বোধ করছি। এই ক'মাসে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রশাসনের দরজায় ঘুরে যে-অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তা বড়ই অপমানজনক। প্রায় কেউই আমাকে শিক্ষকের সম্মান দেয়নি, পিতৃহৃদয়ের হাহাকারও শোনেনি। আমি তোমাকে সব কথা বলিনি। বললে তুমি দুঃখ পেতে।

তবে আত্মবিশ্বাস আর বিশ্বাস এক বস্তু নয়। আমার আত্মবিশ্বাসে ভাঙচুর ঘটলেও বিশ্বাসে চিড় ধরেনি এখনও। বিশ্বাসই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

চিঠিতে সব কথা বলা ঠিক নয়। নিষেধও আছে। এই তিন দিন যে-লোকটি আমাকে পুতুর সন্ধানে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে সে আমাকে বার বার বলেছে আমি যেন পুলিশকে কিছু না বলি। শুরু থেকেই সে আমাকে পুতু সম্পর্কে এমন কিছু প্রমাণ দিয়েছে যা থেকে আমি নিশ্চিত হয়েছি যে একে বিশ্বাস করা যায়—শেষ পর্যন্ত এইই আমাকে পৌঁছে দেবে পুতুর কাছে। হয়তো বা কালই। পুলিশকে জানালে হয়তো পুতুকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিংবা পুতুকে পাওয়া গেলেও এই লোকটির নিজের জীবন সংশয়ের সম্ভাবনা আছে। আমি

তাকে কথা দিয়েছি, না, জানাব না, কেউই জানবে না। এই লোকটি আমাকে বিশ্বাস করেছে, আমিও বিশ্বাসঘাতকতা করব না। একে দেখে আমার বিশ্বাস বেড়ে গেছে মানুষের সহানুভূতিতে । যদিও জানি না এরই বা উদ্দেশ্য কী? নিতান্তই দয়া?

আমি এও জানি আমি কিছু না বললেও পুতু ফিরে আসার পরও পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকবে এমন মনে হয় না। কিন্তু সে-দায়িত্ব আমার নয়।

কাগজে হইচই হবার পর মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে যে রদবদল হল পুলিশে এবং নতুন করে তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানানো হল আমাকে—শিবদাস মল্লিকের সঙ্গে সেই তদন্তের ভার যে-নতুন অফিসারটির হাতে পড়েছে তার নাম লোহিত রায়। বয়স খুব বেশি নয়, অর্জুনদের বয়সী হবে। তুমি তাকে দেখেছ, সাত আটদিন আগে নতুন কিছু তথ্য জানতে এসেছিল আমাদের বাড়ি। লোহিত রায়ের দক্ষতা, সাহস ও সততা সম্পর্কে কাগজে অনেক কিছু লিখেছে। লোহিতের চেহারা ও চোখ দেখলে কড়া বলেই মনে হয়। শিবদাস মল্লিকের অফিসে আমি যেদিন লোহিতকে প্রথম দেখি সেদিন খুব খুঁটিয়ে দেখছিল আমাকে। তখন আমার মনে হয় রতন ভট্টাচার্য বা নির্মল চৌধুরীর মতো এও আর একজন গোয়েন্দা অফিসার, নতুন আর কী করবে!

কিন্তু তার পরেই একটা ঘটনা ঘটে। লোহিত আমাকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে হঠাৎ ঝুঁকে আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলল, স্যার, আপনি আমাকে চিনতে পারছেন না?

আমি চিনতে পারিনি। কিন্তু ওর মুখে 'স্যার' সম্বোধন শুনে ভিতরটা নড়ে যায় কেমন। মনে হয় এ তো পুলিশের গলায় সম্বোধন নয়, নিশ্চিত আমার কোনও ছাত্রেরই কণ্ঠস্বর। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম কোথায় সেই কেঠো চেহারা আর বাজপাখির মতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি! কেমন নরম, নমনীয় লাগছে মুখ, চোখ। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার ক্রমশ মনে হল, হ্যাঁ একে আমি চিনি। কিন্তু কোন কলেজ, কবে, কিছুই মাথায় এল না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম. তুমি কে?

লোহিত আমাকে বলে গেল সব। কোন কলেজ, কোন ইয়ার, এমনকী একবার যে আমি ওর টিউটোরিয়াল খাতা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলাম, তা পর্যন্ত। ওকে দেখতে দেখতেই কী যেন হয়ে গেল আমার মধ্যে। আমার মনে হল যে ছাত্র চরণ স্পর্শ করেছে সে কি আমার মন, আমার যন্ত্রণা স্পর্শ করতে পারবে না! বড় বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম সেদিন।

লোহিত আমাকে কথা দিল পুতুর খোঁজে সে শেষ পর্যন্ত যাবে। তার হাত থেকে কেউ পালিয়ে বাঁচবে না। আমি যেন নিশ্চিত থাকি।

আমি লক্ষ করলাম আবার তার মুখ কেঠো হয়ে উঠেছে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মানুষের মুখ দেখলেই চেনা যায়।

আমি লোহিতের কথা লিখলাম, কেননা সেও আমার বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছে। আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আমি যদি এ যাত্রায় পুতুকে খুঁজে না পাই, তা হলে লোহিত ঠিক খুঁজে বের করবে ওকে। এটাও আশ্চর্যের, এতদিন কিছু হল না, কিন্তু রদবদল হবার সঙ্গে সঙ্গেই হঠাৎ এই লোকটি আমাকে যেচে পুতুর হদিশ দিতে এল কেন?

কিন্তু যারা পুতুকে আড়াল করে রেখেছে তারা আমাকে যে-চোখে দেখবে, পুলিশকেও সেই চোখে দেখবে কেন? আমি তাই লোহিতকে কিছু জানাইনি।

পুতু যে আশপাশেই আছে তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। আমি চাই না ওর এত কাছে

এসেও আমার এই সন্ধান ব্যর্থ হোক। আমার সন্তানকে কাছে পাবার জন্য আমার দুখানি হাতই আছে, পেয়াদা পাঠিয়ে হাতকড়া পরিয়ে তাকে ধরে আনতে হবে কেন?

লীনা, আমার বিশ্বাস কাল না হোক পরশু পুতুকে নিয়ে ফিরতে পারব। এরা টাকাপয়সা চায়নি, আর কোনও দাবিও নেই। শুধু চায় আমি যেন ব্যাপারটা মেনে নিই, কেস উইথড্র করে নিই। আমি বলেছি সব শর্ত মানব, শুধু মেয়েকে একবার দেখতে চাই, দুটো কথা বলতে চাই ওর সঙ্গে। যদি তার পরও সত্যভ্রষ্ট হই, তা হলে তোমরা যারা এতদিন ধরে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছ সকলকে—তোমরা আমাকে মেরে ফেলো। এই বৃদ্ধকে হত্যা করা তোমাদের পক্ষে কঠিন কী!

আমি লোহিতের কথা লিখলাম অন্য কারণে। শুধু একটি সংশয় থেকে। যদি কোনও কারণে তিন-চারদিনের মধ্যে আমি ফিরে না আসি বা আমার কোনও খবর না পাও, তা হলে লোহিতকে জানিও। এখনই জানিও না। কেন তা বলেছি। অবশ্য এই চিঠি কবে তোমার হাতে পৌঁছুবে তাও তো জানি না!

আজ বিকেলে এরা ধানবাদ থেকে কিছু দূরে ঝরিয়ায় আমাকে নিয়ে যেতে এসেছিল। পুতুর সঙ্গে সেইখানেই দেখা করিয়ে দেবে। গাড়ি এনেছিল। কিন্তু গাড়িতে উঠতে গিয়েই আমি লক্ষ করি গাড়ি নিয়ে নতুন যে-দুজন এসেছে তাদের একজনকে আমি আগেও দেখেছি। বড় সন্দেহজনক মুখচোখ তার। তখনই কেমন সন্দেহ হল, ভয়ও হল। সন্ধে হয়ে আসছে, ঝরিয়ার নাম শুনলেও জায়গাটা ঠিক কোথায় তা আমি জানি না। এবং আমি নিরস্ত্র।

আমি তখন গাড়িতে না উঠে হঠাৎ শরীর খারাপের কথা বলি, বুকে ব্যথার ভান করি। যে-লোকটি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সে আমার কথায় বিশ্বাস করল। বলল, ঠিক আছে, আজ থাক। কাল সকালেই যাবেন।

ওরা চলে যাবার পর মনে হল মস্ত একটা ভুল করে ফেললাম না তো? গাড়ির ওই লোকটি সন্দেহজনক বলেই এখনও আমার শত্রু তা ভাবলাম কেন! তা হলে তো যারা পুতুকে এতদিন আটকে রেখেছে এবং এখন ফিরিয়ে দিতে চাইছে, এমনকী যে-লোকটি পুতুর সন্ধান দিয়ে আমাকে নিয়ে এসেছে এত দূর, তারা সকলেই সন্দেহজনক! এই সন্দেহ, এই দ্বিধা সঙ্গে সঙ্গে এলে কেনই বা এলাম এখানে! আমার বয়স হয়েছে, পুতু চলে যাবার পর যে-কোনও দিন মরে যেতে পারতাম। কী দাম এই জীবনের? তা কি পুতুর জীবনের চেয়েও দামি? আমি এখন কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি কালকের সকালটা তাড়াতাড়ি আসুক। জানি এসব শুনে তুমি দুঃখ পাবে। তুমি ভাববে এ কোন মানুষ! এ কেমন কথা! কিন্তু লীনা, দুঃখের চেয়ে বড় সত্যও মানুষের জীবনে আছে, তা আরও কষ্টদায়ক। যদি তা না হত তা হলে আমি তুমি পরস্পরকে নিয়েই বেঁচে থাকতে পারতাম। আজ আমি উপলব্ধি করি পারস্পরিক নৈকট্যের মধ্যেও আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে এক বিরাট শূন্যতা—যা তোমাকে ফিরিয়ে দেয় পুতুর জন্মমুহূর্তের যন্ত্রণায়, নানা সংশয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও যা আমাকে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। এগুলো পাগলের প্রলাপ নয়, সত্য।

হাওড়া স্টেশন থেকে আমি একটা চিঠি পাঠিয়েছিলাম অর্জুনকে। যাতে আমি না ফেরা পর্যন্ত তোমাকে দেখে। হয়তো পেয়েছে।

আজ বিকেলে যে ভয় পেয়েছিলাম তার জেরেই হোটেলের সিঁড়ি উঠতে গিয়ে ধুতিতে

পা জড়িয়ে হোঁচট খেলাম। বেশি চোট লাগেনি। হাঁটুটা ছড়ে গেছে অল্প। আর চশমাটা ছিটকে পড়ে ডানদিকের কাচে চিড় লেগেছে একটু। হোটেলের একজন বেয়ারা আমাকে ধরে ঘরে নিয়ে এল। ডেটল লাগিয়ে দিল ছড়ে যাওয়া জায়গাটায়। নিজেই এক গ্লাস দুধ এনে খাইয়ে দিল। আমি তাকে দুটো টাকা দিতে চাইলাম। নিল না। বলল, বুড়ো মানুষ পড়ে গিয়ে কষ্ট পেয়েছি, সে তার কর্তব্য করেছে, টাকা নেবে কেন।

তার দরিদ্র মুখের এই কথা শুনে মনে বড় ভরসা পেলাম। মনে হল মানুষ কত সুন্দর! সব মানুষই নিষ্ঠুর নয়, হৃদয়হীন নয়, জাল নয়।

হাঁটুতে এখন আর ব্যথা নেই। কাল বেরুবার আগে ওর হাতে ওই চিঠিটা পোস্ট করার জন্যে দিয়ে যাব।

তুমি চিন্তা কোরো না। মনে বল রেখো। আমি ঠিকই ফিরে আসব। আশীর্বাদ জেনো।

সুশোভন'

১০

সুশোভন আজও ফেরেননি। সন্ধান পাওয়া যায়নি তাঁর মেয়ে ইনারও।

মানুষ ও জীবনজনিত নিজস্ব উপলব্ধি যে-বিশ্বাসে পৌঁছে দিয়েছিল সুশোভনকে—যে-স্নেহান্ধ অনন্যতায়, শেষ পর্যন্ত তা তাঁকে কোথায় নিয়ে যায় তা কেউই বলতে পারে না।

তাঁর অন্তর্ধানের পরেও দেখতে দেখতে কেটে গেল প্রায় তিনটি মাস। এখনও মাঝে মাঝে তিনি হয়ে ওঠেন খবরের কাগজের বিষয়।

দোতলার গ্রিল দেওয়া বারান্দায় এখনও অনেকটা সময় একা বসে থাকেন লীনা। থেকে থেকে উঠে আসা শীতের হাওয়া খড়ি বুলিয়ে যায় তাঁর পায়ের পাতায়, হাতে, মুখের ত্বকে। স্পর্শ করে না তেমন। দৃষ্টি শূন্য। সোজাসুজি তাকালে ফাঁকা জমির ওদিকে যে তিন তলা বাড়ি ও চিলেকোঠাটা প্রথমেই চোখে পড়ত, এখন আর সেটা দেখা যায় না। যাদের জমি তারা বাড়ি তুলছে ওখানে। দৃষ্টি আটকে যায় চারতলা কাঠামোয়, বাঁশের ভারায় উঠে মিস্ত্রিদের কর্নিক তুলে সিমেন্ট লাগানোর উৎসাহে। অনেকটা বুড়ি হয়ে গেছেন তিনি। ঘন পাক ধরেছে চুলে। বাসি শাড়ি বদলাতে গিয়েও অনিচ্ছায় বদলান না আর।

তবে, হাজার অন্যমনস্কতার মধ্যেও রোজই নিয়ম করে সিঁদুর পরেন সিঁথিতে। প্রায় অভ্যাসে কখনও বা নাড়াচাড়া করেন হাতের নোয়া ও শাঁখা। যেন অন্তরের কোনও অদৃশ্য সত্য প্রতিনিয়তই স্মরণ করিয়ে দেয় অগ্নির সাক্ষ্য সন্তান ছাড়াও আরও কিছু দিয়েছিল তাঁকে।

কাকিমার সাদা হয়ে আসা সিঁথিতে সিঁদুরের অসীম ঔজ্জ্বল্য দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাস এলোমেলো হয়ে যায় অর্চনার। লীনা বাগবাজারে যাবেন না। স্ত্রী ও মেয়েকে নিয়ে এখন অর্জুনই উঠে এসেছে যাদবপুরে।

নতুন কিছুই ঘটে না।

ক্রমশ থিতিয়ে পড়া এই অন্তর্ধান রহস্যের মধ্যে শুধু একটি মানুষেরই নখ বাড়তে থাকে। নখ বাড়তে থাকে বুকে, চোখে। সংকল্পে। তার নাম লোহিত রায়। ধরপাকড় চলছে, জেরা চলছে, চাপ আসছে নানারকম, কিনারা হতে হতেও হারিয়ে যাচ্ছে সন্ধানের সূত্র। সে তবু আশা ছাড়েনি। সে জানে, যে কোনও সন্ধানেরই শেষে থাকে হয় জীবন, না হয় মৃত্যু। মাঝখানে কিছু নেই। যেভাবেই হোক দুটির একটিতে পৌঁছুতে হবে তাকে।

মাঝে মাঝে তবু অদ্ভুত দার্শনিকতা এসে যায় লোহিতের মনে। গোটা পৃথিবী জুড়ে চারদিকে এত নিরীহ নিরপরাধ মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ-হঠাৎ, তাদের অধিকাংশই ফিরছে না আর, নিখোঁজের সংখ্যা বাড়ছে ক্রমশ। কেন এমন হয়! কেন এমন হচ্ছে? এসব চিন্তায় দিশেহারা লাগে নিজেকে।

তখন নিজের একান্তে ফাইল খুলে যাদবপুরের লীনা মুখার্জিকে লেখা অধ্যাপক সুশোভন মুখার্জির চিঠিটা পড়ে সে। এক একটা জায়গায় এসে আটকে যায় চোখ। ভিজে আসে চোখের পাতা।

অস্বচ্ছতার ভিতর তখন একটিই দৃশ্য ফুটে ওঠে আস্তে আস্তে। শানিত চোখমুখ, তামাটে রং, তার চেয়েও লম্বা এবং পুরু ফ্রেমের চশমা পরিহিত একটি দুঃখী মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। তাকেই দেখছেন মানুষটি। বিস্ময়ে, নাকি আনন্দে তা বোঝা যায় না ঠিক। গলার কুঁচকে যাওয়া চামড়ার ভিতর ওঠানামা করছে অবরুদ্ধ কণ্ঠনালি। যেন কিছু বলতে চান। খুঁজে পাচ্ছেন না বলার ভাষা। তারপর হঠাৎই বলে ওঠেন, 'ছাত্রও তো সন্তান। তুমি নিশ্চয়ই আমার কষ্ট বুঝবে। পারবে না মেয়েটাকে খুঁজে দিতে?'

লোহিত টের পায় জেগে উঠছে তার চোয়াল দুটো। টান পড়ছে মেরুদণ্ডে। নিজেরই কণ্ঠস্বরের অনুকরণ ভেসে আসছে কানে।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত কিছু সংবাদ বিচ্ছিন্ন ও পরিবর্তিত ভাবে ব্যবহার করা হলেও এই উপন্যাসের সব চরিত্র এবং যাবতীয় ঘটনাই কাল্পনিক।

অবৈধ

উৎসর্গ:
সবোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রদ্ধাস্পদেষু

১

বিকেল পাঁচটা নাগাদ অসীম বেরিয়ে যেতে নিজেকে ফিরে পেল জিনা। গতকাল থেকে আজ এতটা সময় পর্যন্ত একটা সন্দেহ ছিল মনে, যাবে বললেও যদি শেষ পর্যন্ত না যায় লোকটা, তাহলে সে যা ভাবছে এবং যেমন করে, তার কিছুই কার্যকর হবে না। যেটা আরও ঝামেলার, অসীম যাবেই ভেবে ইতিমধ্যে আরও একজনকে পাঠিয়ে দিয়েছে সে। অসীমের যাওয়া ভেস্তে গেলে পার্থ ভাবতে পারে তার ব্যাপারে সিরিয়াস নয় জিনা; খেলাচ্ছলে কিংবা খেয়ালে শুধু শুধু হয়রান করাল তাকে। দু-দিকে দু-জনকে নিয়ে এই টেনশন তাকে স্বাভাবিক হতে দিচ্ছিল না।

অবশ্য অসীমকে ঘিরে চেপে রাখা সারাদিনের উত্তেজনা এত তাড়াতাড়ি থিতিয়ে যাবে, খুব স্বাভাবিক ও ঝরঝরে লাগবে নিজেকে, এমনটা সে ভাবেনি। একটা ঘটনাই এতক্ষণ ব্যস্ত রেখেছিল তাকে। ঘটনাটা ঘটে যাবার পর এর পরের ঘটনাগুলো ঠিকঠাক ঘটানো যাবে কি না ভাবতে গিয়ে, যেখান দিয়ে এইমাত্র বেরিয়ে গেল অসীম, সেই দোতলায়, নিজেদের ফ্ল্যাটের দরজায় দাঁড়িয়ে, হঠাৎ ঘোর লাগলে যেমন হয় তেমনি চোখের সামনে হঠাৎই শূন্যে ভাসমান কয়েকটি অস্পষ্ট বিন্দু দেখতে পেল সে। এক মিনিটও নয়, সম্ভবত কয়েক সেকেন্ড। নিশ্চিত এটা নার্ভাসনেসের লক্ষণ, ভেবে, নিজেকে ধাতস্থ করে নিতে নিতে খেয়াল হল, অসীম প্রায়ই ট্যুরে যায় এবং প্রতিবারই যাবার সময় তারা যা যা করে, আজও তার ব্যতিক্রম না ঘটলেও কোথায় যেন আড়ষ্টতা থেকে গেছে তার নিজের ব্যবহারে।

খানিক আগে অফিসের ড্রাইভার এসে দরজায় বেল দেবার পর, চন্দ্রনাথের হাতে স্যুটকেস পাঠিয়ে দিয়ে, 'তাহলে যাওয়া যাক—' বলে ঘরের মধ্যে অসীম যখন তাকে জড়িয়ে ধরে ও চুম্বন করে ঠোঁটে, তখনও অনুভব করেছিল জিনা তার শরীরে অন্যান্যবারের আবেগ নেই, ঠোঁটের ওপর চেপে বসা সিগারেটের গন্ধ-ছোঁয়ানো পুরু ঠোঁট দুটিকে কেমন আকস্মিক ও অবৈধ লাগছে। এটা কেন হল, বা, এমনকী হতে পারে যে একজন নারী মানসিক ভাবে, সুতরাং শারীরিক ভাবেও এক সময়ে একজন পুরুষকেই গ্রহণ করতে পারে! এসব ভাবলেও নিশ্চিত হতে পারেনি।

তবে অসীম যে তার স্বামী, এটা সে ভোলেনি। অস্বস্তি সত্ত্বেও ছেড়ে দিয়েছিল নিজেকে। তারপর 'সাবধানে থেকো' বলে এগিয়ে গেল অসীম। তখন স্বামীকে কিছু বলার পরিবর্তে বাঁ হাতের তর্জনীর পিঠে ঠোঁট মুছতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সে। সেই ভাবেই অসীমের পিছনে পিছনে এগিয়ে যায় দরজা পর্যন্ত। ভাল বা মন্দ কিছুই মনে হয় না। তবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে অসীম যখন পিছন ফিরে তাকাল, তখন কিছু না ভেবেই, খানিকটা দায়িত্ব পালনের

ধরনে অস্পষ্ট ভাবে হেসেছিল সে। অসীম তখন নামার ঝোঁকে। কিছু ফেরত দেয়নি।

ঘটনাগুলো মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত হল জিনা। যতটা না দায়িত্ববোধ থেকে তার চেয়ে বেশি সংশয়ে। সে ঠিক জানে না, বুঝতেও পারছে না, অসীম তার ব্যবহারে কোনও সন্দেহ করেছে কিনা। আজ সকালে অফিস থেকে ফোন করে অসীম যখন জানাল তাদের বম্বে অফিসের ইমপর্ট্যান্ট কে একজন করোনারি অ্যাটাক হয়ে হাসপাতালে গেছে, কনফারেন্সে পার্টিসিপেট করতে পারবে না, ইত্যাদি, সুতরাং যাওয়া অনিশ্চিত, তখন কিছু না ভেবেই জিনা বলেছিল, 'তাহলে স্যুটকেস গোছগাছ করলাম কেন!'

'ও।' অসীম একটু গম্ভীর হয়ে বলল, 'তাহলে যাবার দরকার না থাকলেও আমাকে যেতে হবে!'

'না। তা কেন!'

অসীম ব্যস্ততা দেখাল এবং বলল, 'যাব কি না তা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই জানতে পারব।'

এরপর টেলিফোন ছেড়ে দেবে। ওকে নরম করার জন্যে কুণ্ঠিত গলায় জিনা বলেছিল, 'জানিয়ো আমাকে—'

'ও. কে।'

জিনা এমনিতেই দ্রুত। সারাক্ষণ টান-টান হয়ে থাকে শরীর। কিন্তু এখন, আরও একটা ভুল হয়ে গেছে ভেবে ব্যালকনিতে ছুটে এসে দেখল, অসীমদের অফিসের সাদা অ্যামবাসাডর তাদের বাড়ির নীচে থেকে এগিয়ে গেছে অনেকটা। সামনে আরও কয়েক গজ এগিয়ে মোড় ঘুরবে ডান দিকে, তারপর ক্রমশ এয়ারপোর্টের দিকে।

সরে যাওয়া দৃশ্যটা সামান্য বিমর্ষ করে দিল তাকে। পুনেতে সেলস কনফারেন্সে, অসীম বলেছিল, সে একা যাচ্ছে না—কলকাতার এই অফিস থেকেই যাবে আরও জন তিনেক, সম্ভবত তাদেরই কেউ গাড়িতে আছে অসীমের সঙ্গে। লোকটির মাথায় টাক, সেজন্যেই পাশে বসা অসীমকে চেনা যায় আলাদা করে, ওর গায়ের মেরুন হাওয়াই সার্টটা চিনিয়ে দিল আরও। গাড়িটা অদৃশ্য হবার পর ভাবল, ব্যালকনিতে ছুটে এসেছিল হাত নাড়ার জন্যে। এমনও হতে পারে গাড়িতে উঠে অসীমও অপেক্ষা করেছিল তার জন্যে, যেমন করে; দেরি দেখে চলে যায়। এই মুহূর্তে এ নিয়ে সে যেমন ভাবছে তেমনি অসীমও ভাবছে। ভাববে কি?

বেলা পাঁচটার রোদে বিকেল হয়ে আছে চারদিক। উল্টোদিকের ফুটপাথের বিশাল বাড়িটার আড়ালে থাকায় পশ্চিমমুখো এই ব্যালকনিতে অনাবশ্যক হয়ে আসে রোদ, ঔজ্জ্বল্যটুকুই চোখে পড়ে। সামান্য তাপও ছুঁয়ে যাচ্ছে কপাল। ডান ও বাঁ-দিকে রাস্তা, সেখানে ছায়া। কিছুটা অন্যমনস্ক ভাবে বিভিন্ন গাড়ি ও মানুষজনের যাতায়াত লক্ষ করল জিনা। বাড়ির সামনেই ট্যাক্সি থেমে নামতে নামতে মাথা তুলে তাকে লক্ষ করছে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরা একটি মাঝবয়েসী লোক; ওই ট্যাক্সিটা ধরার জন্যে রাস্তা পেরিয়ে ছুটে এল দুটি যুবতী। মনে হয় অবাঙালি। খুব কায়দা করে সাইকেল চালিয়ে তাদের গা ঘেঁষে চলে গেল এক ছোকরা। হঠাৎই চোখে পড়ল, খাটিয়ায় মৃতদেহ নিয়ে ডানদিক থেকে বাঁদিকে হেঁটে আসছে কয়েকজন শববাহী। শববাহকেরা ছাড়াও চার পাঁচজন হাঁটছে পিছনে পিছনে, খই ছড়াচ্ছে তাদের একজন। কাছাকাছি এলে মৃতের মুখ দেখতে পেল জিনা, কপালে সিঁদুর লেপা, পরনে কোরা লালপেড়ে শাড়ি। তার মানে সধবা। রোগা, কৃশ দুটি

আলতা মাখানো পা চলে যাচ্ছে দুলতে-দুলতে। যত দূর দেখা যায় সেই পা দুটিকে অনুসরণ করল জিনা। দৃশ্যটা হারিয়ে যাবার পরও চোখ ফেরাতে পারল না।

ক্লান্ত, কিছু বা না-বোঝা একটা গন্ধ উঠে আসছিল নাকে। প্রথমে অবজ্ঞা করার চেষ্টা করলেও ক্রমশ নিঃশ্বাসের অসহিষ্ণুতা টের পেল সে। অসহায়তাও। ঠিক বুঝতে পারল না এই মুহূর্তে ওই শবযাত্রা, নাকি অসীমের ওইভাবে চলে যাওয়া, কোনটা তাকে বিমর্ষ করছে বেশি। পার্থকে মনে পড়ল, পরিকল্পনামাফিক এর পর সে কী কী করবে, তাও; কিন্তু নিজেরই সৃষ্ট এই মুহূর্তের বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্ত করতে পারল না নিজেকে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে ভাবল, পরিষ্কার আকাশের এই রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়ায় অসীমের ফ্লাইট ক্যানসেল হবার সম্ভাবনা নেই। যদি কোনও কারণে ডিলেড হয়, যেমন আগেও হয়েছে কখনওসখ-নও, তাহলেও ও এয়ারপোর্টেই অপেক্ষা করবে। তা ছাড়া এবার ও একা যাচ্ছে না, নিঃসঙ্গ বোধ করার প্রশ্ন নেই কোনও। আট-ন' বছরে জিনা জেনে গেছে অসীম লোকটা ঠিক কেমন। ওর স্বভাবের আপাত-কাঠিন্য ও গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে তার বিরক্তির কারণ হয়ে উঠলেও এ সবের মধ্যেই ওকে চেনা যায় দায়িত্ববান ও আত্মবিশ্বাসী বলে। কিন্তু, অসীম কি জানে, যে-স্ত্রীকে সে চুম্বন করে গেল, বলে গেল সাবধানে থাকতে, সেই জিনা এখন তাকে নিয়ে আদৌ চিন্তিত নয়!

স্যুটকেস পৌঁছে দিয়ে নীচে থেকে উঠে এসেছে চন্দ্রনাথ। আপাতত লিভিং রুম ঝাড়পোছ করায় ব্যস্ত। এগুলো রুটিন কাজ। এরপর সাধারণত ও রান্নার জোগাড়ে বসে। অফিস থেকে ফিরে অসীম ক্লাব বা পার্টিতে যেতে ব্যস্ত না হলে দু-চার পদ বেশি রান্নার ব্যবস্থা করতে হয় বাড়িতে। ও খেতে ভালবাসে। সেটা অবশ্য দোষের কিছু নয়, জিনা ভাবল, সকালে ব্রেকফাস্ট করে বেরোয়, লাঞ্চ সারে অফিসে, রাত্রে বাড়িতে খাওয়া বলতে সপ্তাহে তিন কি চার দিন। সেক্ষেত্রে মুখের স্বাদ পাল্টানোর জন্যে একটু অন্যরকম খাবার ইচ্ছেয় অস্বাভাবিকতা নেই। আজ শেষ পর্যন্ত না গেলে ওর জন্যে ব্যবস্থা করতে হত।

এসব অবশ্য সে এখনই ভাবছে। সকাল থেকে ভাবনা বইছিল অন্য দিকে। মনপ্রাণ একাগ্র করে ভাবছিল, হে ভগবান, অসীমের যাওয়া যেন না আটকায়। অভ্যাসের প্রার্থনা। লক্ষ্মী ও কালীর পটের সামনে রোজ সন্ধ্যায় ধূপ জ্বাললেও ভগবান-টগবানে বিশ্বাস নেই তার। বরং ভাবা যেতে পারে ইচ্ছাশক্তির জোরেই এবারের বাধা পেরিয়ে গেল সে। বাকিটাও কি পারবে না!

উত্তেজনা ও আলস্যে মেশা এক অদ্ভুত অনুভূতি থেকে হাই উঠে এল গলায়। ওয়ালক্লকের দিকে তাকিয়ে ঠিক সময়টা দেখে নিল জিনা এবং ভাবল, বাইপাস ধরে গেলেও এয়ারপোর্টে পৌঁছুতে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট লাগবে। তার মানে অসীম এখনও রাস্তায়, পৌঁছে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যে। উড়ে যাবে আরও ঘণ্টা খানেকের মধ্যে। শীত শেষের এই সময়টা না ঠাণ্ডা, না গরম, ওয়েদার ভালই থাকে। না, অসীমের ফিরে আসার কোনও সম্ভাবনাই নেই।

ভাবনার মধ্যেই ফিরে এল পার্থ; সকালে ট্রাঙ্ককলে ও কী বলেছিল, তাও। বিশেষত সাতটার মধ্যে অবশ্যই বেরিয়ে পড়ার কথা, ড্রাইভারের সঙ্গে আর কেউ থাকলে সে-ট্যাক্সিতে না ওঠা এবং ট্যাক্সির নাম্বার যেন অবশ্যই নোট করে নেয়, ইত্যাদি। যেন সত্যিই-সত্যিই এরকম কোনও বিপদ ঘটতে পারে। আরও ভাল হয় যদি সে মাঝপথে প্রথম

ট্যাক্সিটা ছেড়ে অন্য ট্যাক্সি ধরে। ট্র্যাভেল লাইট অ্যান্ড কসাসলি। টিকিট দুটো আছে, দেখে নিয়ে এখনই কি সে ব্যাগে ভরে নেবে? প্রশ্নটা এমন ভাবে করল যেন জিনা টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে ঘরে যায়, টিকিট দুটো ব্যাগে ভরে ফিরে আসে, ততক্ষণ সে রিসিভার ধরে অপেক্ষা করবে। জিনা হাসতে হাসতে বলেছিল, 'ভেব না। টিকিট না থাকলেও ঠিক পৌঁছে যাব।' পার্থ বলল সে সারারাত ঘুমোতে পারবে না। তারপর, তার জন্যে পার্থর আন্তরিকতা অনুভব করে জিনা যখন নিজের মধ্যেই ঘন হয়ে উঠছে, পার্থ হঠাৎ বলল, 'তুমি কি গায়ত্রীদের খোঁজ নেবে একটু? বাচ্চা দুটো কি ভাল আছে?'

এত কথার পর এই প্রশ্নগুলো সামান্য থমকে দিল জিনাকে। এতক্ষণ সে ভাবছিল সে আর পার্থ, দুজনের সম্পর্কের মধ্যে আর কেউ নেই, পার্থ তারই হয়ে গেছে। এমন কী হতে পারে যে এই ট্রাঙ্ককলটা প্ল্যানড, পার্থ আগেই ভেবে রেখেছিল নিজেদের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে গায়ত্রীদের খবরটাও নিয়ে নেবে সে! হতে পারে। তবে ট্রাঙ্ককলে নিজের সন্দেহ, অভিমান প্রকাশ করা ঠিক হবে না। ভেবে বলল, 'সবাই ঠিক আছে। সকালে দেখেছি, ওদের দুজনকে স্কুলবাসে তুলে দিচ্ছে গায়ত্রী—।'

'ফাইন। তাহলে দেখা হচ্ছে। আমি থাকব।' পার্থ ফোন ছেড়ে দিল।

আমি থাকব, আমি থাকব, আমি থাকব। শব্দগুলি ফিরে আসায় এবং তারপর কী হবে ভাবতে গিয়ে এক ধরনের আচ্ছন্নতা এই সময় শিরশির করে গেল শরীরে—ব্লাউজের ওপরের খোলা অংশ থেকে গলার দিকে নিজের বাঁ হাতটা বুলিয়ে নিল সে, চিবুক ও গাল টিপে ধরল, অনুভূতিটা গাঢ় হতে দাঁত বসাল ঠোঁটে। ট্রেন থেকে নেমে পার্থকে সশরীরে দেখে সে ঠিক কীরকম অনুভব করবে! এরকম সিচুয়েশনে এর আগে পড়েনি সে। জিনা মনে করতে পারল, সিনেমায় এসব দৃশ্যে নায়িকা এবং নায়কের পারস্পরিক দূরত্বের জায়গাটা থমকে থাকে নিঃশব্দ আলোড়নে। অবশ্য হিন্দি সিনেমা একটুও পছন্দ নয় তার; একটা বিদেশি ছবি মনে পড়ল, অসীমের সঙ্গে দেখেছিল নাইট শোয়ে, গ্লোবে, নামটা মনে পড়ল না। হল থেকে বেরিয়ে দেখল বৃষ্টি পড়ছে। গাড়িতে উইন্ডস্ক্রিনের ওপর ওয়াইপার চলা সত্ত্বেও সামনেটা ঝাপসা হয়ে এসেছিল ক্রমে, আশপাশও। বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে সত্যিই যাচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছিল না। অসীম আগাগোড়া চুপচাপ দেখে অনেকক্ষণ পরে জিনা জিজ্ঞেস করেছিল, 'এত গম্ভীর হয়ে গেলে কেন!' অসীম বলল, 'আজকাল ফিল্মে ইনফাইডেলিটি ছাড়া আর কোনও সাবজেক্ট থাকে না। ওয়েস্টার্ন সোসাইটিটা যে কোন দিকে যাচ্ছে!' জিনা জবাব দেয়নি—যেন অসীম নতুন কিছু বলল এবং এই ব্যাপারগুলো আগে ছিল না; তার ভাবনার ধরনটা অসীমের মতো নয়। ছবিটা তার ভালই লেগেছিল।

'চন্দ্রনাথ, ঝাড়পোছ পরে হবে। একটু চা করো।'

'আপনি কি এখনই বেরুবেন?'

'কেন!'

'সাহেব বললেন ট্যাক্সিতে আপনাকে পৌঁছে দিতে। আমি বাসে ফিরে আসতে পারব।'

'সাহেবের সব সময়েই ভয়!' উত্তরটা গুছিয়ে নিয়ে জিনা বলল, 'এখান থেকে বেহালা খুব দূর নয়। আমি তো হরদমই একা যাতায়াত করি—'

জবাব না দিয়ে কিচেনে ঢুকল চন্দ্রনাথ। গ্যাস জ্বালবে, চা করবে। বেঁটেখাটো, পরিষ্কার চেহারার এই যুবকটির বয়স কত ঠিক আন্দাজ করা যায় না। দু বছর আগে এখানে নিয়ে

আসার পর অসীম বলেছিল পঁচিশ-টচিশ হবে। অসীমেরই কোলিগ শোভনেশের ওখানে ছিল চার পাঁচ বছর; শোভনেশ হায়দ্রাবাদে ট্রান্সফার হবার পর ডেকে নেয় অসীম। খুব রিলায়েবল, কাজকর্মে চটপটে, ভদ্র, আদবকায়দা জানে। শোভনেশের বাড়িতে কাজ করতে করতে সাহেবদের দরকার অদরকারটা বুঝে নিয়েছে ঠিকঠাক, দরকারে ড্রিঙ্কসও সার্ভ করতে পারে। যেটা ওর বড় গুণ, অন্তত জিনার তাই মনে হয়, কোনও বাড়তি কৌতূহল নেই, কথাও বলে কম।

একদিন দুপুরে, মনে আছে, অসীম জামশেদপুরে গেছে ট্যুরে, ফোনে পার্থর সঙ্গে কথা বলে ওকে ফ্ল্যাটে আসতে বলেছিল জিনা। এভাবে বলায় রিস্‌ক থাকলেও জিনা জানত চন্দ্রনাথকে ম্যানেজ করা অসুবিধা হবে না। যাদবপুরে ওর এক দাদা থাকে, মাঝে মাঝে যেতে চায় ওখানে; আজ যদিও কিছু বলেনি তবু দুপুরের খানিকটা সময় স্বচ্ছন্দে সেখান থেকে ঘুরে আসতে বলা যায় ওকে। সেইরকমই করেছিল।

ফোনে প্ল্যানটা পার্থকে বলায় পার্থ বলল, 'গ্রেট। কিন্তু, এই রিস্‌ক নেওয়া ঠিক নয়, জিনা। যদি গায়ত্রী দেখে ফেলে!'

'গায়ত্রী দুপুরে ঘুমোয়। তুমিই বলেছিলে বাচ্চারা স্কুল থেকে না ফেরা পর্যন্ত—'

হ্যাঁ, কিন্তু—সাপোজ—।' পার্থ যে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না, নার্ভাস, ওর কথার খাপছাড়া ধরনেই তা স্পষ্ট। বলল, 'যদি আর কেউ দ্যাখে, গায়ত্রীকে বলে—মানে, আমি তো এত তাড়াতাড়ি ফিরি না!'

'তাহলে এস না।'

'জিনা, প্লিজ!' পার্থ ভাবল একটু। বলল, 'ঠিক আছে, গাড়ি নেব না। ট্যাক্সিতে যাব। তারপর তিনটে নাগাদ ফিরে আসব—স্কুলবাস চারটের আগে পৌঁছয় না—'

'ভিতু।'

জিনা জেনে গিয়েছিল পার্থ আসছেই। এখন গলার স্বরে নিজেকে এলিয়ে দিতে পারে। পার্থ বলল, 'মেক সিওর, তোমার ওই কেয়ারটেকারটি যেন না থাকে। আমাদের মেড সারভেন্টের সঙ্গে ওর আলাপ আছে—'

'পার্থ, তুমি শুধু আমার কথা ভাবছ না কেন!'

'ভাবছি তো। তোমারই কথা ভাবছি। কাম হোয়াট মে, আমি আসছি।'

ফোন ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল জিনা। চন্দ্রনাথকে আগেই যেতে বলেছিল, ভাবল ও বেরুবার আগে হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিলেই হবে, ইচ্ছে করলে ও মিষ্টিফিষ্টি কিনে নিয়ে যেতে পারে। দাদার বাড়ি ঘুরে আসার প্রস্তাবটা সে দিলেও এমন হতে পারে আজ তেমন ইচ্ছে না থাকলে দাদার বাড়ি না গিয়ে ও সিনেমা দেখবে, সে-জন্যেও দরকার টাকাটা—তাছাড়া অসীম নেই, ফিরবে রাত্রে, এটা ও জানে। আর মেমসাহেব নিজেই যখন পাঠাচ্ছে তখন একটু দেরি হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। চন্দ্রনাথ প্রব্লেম নয়।

পার্থকে আসতে বাধ্য করলেও, জিনা জানে, যেসব কারণে পার্থ ইতস্তত করছিল ও ভয় পাচ্ছিল সেগুলো একেবারে ফালতু নয়। একই মাল্টিস্টোরেডের ন'তলা এবং দোতলায় থাকে ওরা এবং পার্থর ন'তলার ফ্ল্যাট যদিও বাড়ির পিছন দিকে, তাদের সামনে, পার্থর স্ত্রী গায়ত্রী যদিও দুপুরে ঘুমোয়, ওর ছেলেমেয়ে জয় ও শমিতা চারটের আগে স্কুল থেকে ফেরে না, অনির্দিষ্ট কোনও ফ্ল্যাট থেকে কচিৎ কখনও ভেসে আসা ভিডিও চালানোর শব্দ ছাড়া

দুপুরটা এ বাড়িতে নিস্তব্ধই হয়ে থাকে—দারোয়ান, সুইপার, ইলেকট্রিসিয়ানরা আড়ালে গিয়ে তাস খেলে, তবু 'বাই চানস' বলে একটা কথা থাকে এবং সেটাই, যদি তেমন কিছু ঘটে যায়, গোলমেলে হয়ে দেখা দিতে পারে।

কিন্তু, সে-রিস্‌ক পার্থ নেবে না কেন! জিনা মেয়ে হয়েও তো নিচ্ছে! মেয়ে বলে, বিশেষত আর একজনের স্ত্রী বলেই, তার ক্ষেত্রে সংশয় আরও বেশি। তা থাক। জিনা ভেবেছিল কী ভাগ্যিস এখনও তার ছেলেপুলে হয়নি। হলে, চন্দ্রনাথ ছাড়াও, অন্য একটা সমস্যা থেকে যেত। লুকিয়ে কাউকে ভালবাসার মধ্যে এই যে থ্রিল, এটা সে কোনও দিনই অনুভব করতে পারত না। একুশ বছরে বি-এ পাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই তার চেয়ে এগারো বছরের বড় অসীমের সঙ্গে বাড়ির দেওয়া বিয়ে এই থ্রিলটা পেতে দেয়নি তাকে। মন কিংবা শরীর ঠিক কোন কোন অনুভূতিতে কাতর ও আলাদা হয়, সাড়া দিয়ে ওঠে, তা ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই সে অসীমের প্রপার্টি হয়ে গেল।

প্রপার্টিই তো। অসীম হয়তো বুঝবে না কোনও দিন, কিন্তু জিনা বোঝে কথাটার মানে কী। 'দিস ইজ মাই ওয়াইফ' কিংবা 'আমার স্ত্রী', অফিসের পার্টিতে কিংবা অন্য কোথাও খুব অনায়াসে, আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অসীম যখন অন্যদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিত তাকে, তখন, সেই বিয়ের পর থেকেই, জিনার মনে হত তার কোনও অস্তিত্ব নেই। যা আলাদা, যা শুধু তার নিজেকে নিয়েই।

মাঝে মাঝে এই ভাবনাটা হলেও গোড়ার দিকে সে যে খুব চিন্তিত ছিল তা নয়। অসীম ব্যানার্জি তাকে ভোগ করত, যত্নে রাখত, বাস্তবিক এমন কখনও হয়নি যে তার মনে হয়েছে অসীম তাকে বঞ্চিত করছে, আমল দিচ্ছে না তার ইচ্ছা অনিচ্ছাকে। তবে সেটা অসীমের নিজের ইচ্ছা, নিজের তোলা চার দেয়ালের মধ্যেই, দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ থেকে।

এই কিছুদিন আগেই যেমন ভি-সি-আর কিনে আনল বাড়িতে; সে যখন ট্যুরে যায়, জিনা একা থাকে, বাড়িতে বসেই দেখতে পাবে, সময় কেটে যাবে, ইত্যাদি। কিন্তু, জিনার মনে হয়েছিল, অসীম ট্যুরে গেলেই সে যে বিডন স্ট্রিটে তার দাদার বাড়ি, মা'র কাছে চলে যেতে চায়, বস্তুত ধারাবাহিক নিঃসঙ্গতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে, এটা তার প্রতিক্রিয়াও হতে পারে। শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে অসীমের এলার্জি আছে, ও চায় না জিনা ঘন ঘন যাক ওখানে। টাকায় কেনা স্বাচ্ছন্দ্য বুঝতে চায় না মনের ব্যাপারটা। একদিন বলেও ছিল এরকম: 'কিসের অভাব তোমার! ইউ হ্যাভ এভরিথিং!' সত্যি, সত্যিই তো।

কিন্তু, তা সত্ত্বেও কেন এমন হল যে বিয়ের পর ছ সাত বছর কাটতে না কাটতেই জিনার মনে হতে লাগল তার সঙ্গে অসীমের বয়সের ব্যবধানটা ঠিক এগারো বছরের নয়, আরও বেশি। যত দিন যাচ্ছে, যত প্রোমোশন হচ্ছে অসীমের এবং বাড়ছে সাচ্ছল্য ও ব্যস্ততা, ব্যবধানটা ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে আরও।

তো সেদিন, দুপুরে, যেখানে বাঘের ভয় সেইখানে সন্ধে হয় না কী প্রবাদ আছে একটা, তাই হল। পার্থ ঠিকঠাকই এল, ব্যালকনি থেকে ওর আসার দিকে চোখ রেখেছিল জিনা, পরে, নিঃশব্দে দরজা খুলে দাঁড়িয়ে লক্ষ করেছিল পার্থকে কেউ দ্যাখেনি, লিফট এড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসেছে ও। অবশ্য এটাই স্বাভাবিক এবং ভালই করেছিল, না হলে লিফটম্যান দেখত অসময়ে এসেছে পার্থ, ন'তলায় না গিয়ে নেমে যাচ্ছে দোতলায়; কোথায় যাচ্ছে তা নিয়ে কৌতূহলী হতে পারত লোকটা। সে-জন্যে নয়। পার্থ ভিতরে ঢুকবার পর

এই প্রথম দু'জনের উত্তেজনাই এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, কয়েক মুহূর্তের জন্যে পাশাপাশি সোফায় বসার পর পার্থ যখন হাত বাড়িয়ে টেনে নিল তাকে এবং চুমু খেল প্রবল ভাবে, তখন, জিনার নিজের শরীরেই কী যেন হতে শুরু করেছিল যা নিজেও ঠিকঠাক অনুভব করতে পারেনি। আগে এত দূর না ভাবলেও, শরীরে ও গলায় অন্ধতা মিশিয়ে সে নিজেই ওকে ডেকে নিয়ে গেল বেডরুমে। পার্থ সামান্য ইতস্তত করলেও, জিনা নিজেই ওর সার্টের বোতাম খুলে, ওর বুকের রোমে মুখ ঘষতে ঘষতে ক্রমশ জেগে ওঠা অনুভূতিটাকে এমন ভাবে পেতে চাইল যেন পুরুষসঙ্গ বলতে কী বোঝায় তা ও অনুভব করছে এই প্রথম, সর্বাঙ্গ দিয়ে, এই প্রথম পাচ্ছে ভালবাসার স্বাদ।

একা ফ্ল্যাটে এই মুহূর্তের একাকীত্ব ও টেনশন থেকে মুক্ত হবার জন্যে টিভিটা খুলে দিয়েছিল জিনা। সোফায় বসে, চন্দ্রনাথের বানিয়ে দেওয়া চায়ে চুমুক দিতে দিতে স্ক্রিনে পরের পর ছবি না দেখে, শব্দের বিবর্তন না শুনে, নিঃশ্বাসের ভার টের পেল সে, হাত বাড়িয়ে স্পর্শ রাখল সেই জায়গাটায় যেখানে সেদিন বসেছিল পার্থ। সেদিনের ঘটনা ফিরিয়ে আনতে গিয়ে দেখল অবিকল মনে পড়ে যাচ্ছে সব। কিন্তু, সেটা কোনও ব্যাপার নয়, চন্দ্রনাথকে জড়িয়েই যে ভাবছে এসব, তা অন্য কারণে।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই সাফসুতরো হয়ে তারা যখন আবার লিভিংরুমে, কথা বললেও খাপছাড়া, খানিক আগের অনুভূতি থেকে মুক্ত হতে পারেনি, জড় লাগছে নিজেদের, বিশেষত নিজেকে, হঠাৎই বেল পড়ল দরজায়। সন্ত্রস্ত হয়ে কী-হোলে চোখ রেখে জিনা যখন ভাবছে কে না কে, দেখল, মূর্তিমান চন্দ্রনাথ দাঁড়িয়ে আছে বাইরে। আকস্মিক ফ্যাকাশে বোধ করলেও ডিসিসনটা সেই মুহূর্তেই নেয় সে। এটা বসবার জায়গা, বহিরাগত আগন্তুকের মতো দিব্যি ভব্য হয়ে বসে আছে পার্থ, মনে হতে পারে অসীমেরই অপেক্ষায়—অসীম বাড়ি না থাকলে কখনও কেউ আসে না, বসে না, এমন তো হয় না; সুতরাং সরাসরি দরজা খুলে দিলেই বরং সন্দেহের সুযোগ থাকবে না।

চন্দ্রনাথ ভিতরে এসে বলল, 'দাদা বনগাঁয়ে গেছে বাবুদের সঙ্গে।' আর কিছু না বলে, আড়ে একবার অসময়ের আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে, যেন পার্থ কেউ নয় এমন একটা ভঙ্গি করে ঢুকে গেল কিচেনের পিছনে ওর নিজের ঘরে। এর পরে পার্থও চলে যায়।

কিন্তু, ভয়টা যায় না। সেদিন এবং তার পরেও বেশ কিছুদিন আশঙ্কায় ছিল জিনা, কোনও না কোনও ভাবে ব্যাপারটা জানাজানি হলেই হয়েছে! না। অসীম কিছু জানতে পারেনি, এমনকী গায়ত্রীও না।

ওই ঘটনার দিন চার পাঁচ পরে, অসীম অফিসে বেরনোর পর টুকিটাকি কেনাকাটা করতে নীচে নেমেছিল জিনা, স্টেশনার্সের দোকানে দেখা হয়ে গেল গায়ত্রীর সঙ্গে। নিজেই এগিয়ে এসে কথা বলল, সুতরাং সে; যদিও ইতিমধ্যে ফোন করে পার্থ বলেছিল গায়ত্রী 'অ্যাবসোলিউটলি নর্মাল', তবু, বুঝতে পারছিল জিনা, ভিতরে-ভিতরে রীতিমতো আড়ষ্ট বোধ করছে সে।

ফেরার তাড়া ছিল না। গায়ত্রী জোর করল বলেই স্টেশনার্স থেকে গায়ত্রীর সঙ্গ ধরে এরপর তারা যায় কাছেই 'এমব্রয়ডারি-করা' পাঞ্জাবির দোকানে। পার্থর বাড়িতে পরার পাঞ্জাবি নেই, বেছেবুছে দুটো কিনল গায়ত্রী। তার আগে জিনাকে জিজ্ঞেস করল, 'কোন রং দুটো ভাল বলো তো?'

জিনা বলল, 'তোমার বরের কোনটা পছন্দ হবে আমি কী করে বুঝব।'

গায়ত্রী হাসল, 'পছন্দ তো বর করছে না, আমি করছি। তুমি সাজেস্ট করো না!'

জিনা গায়ত্রীর কোমর দেখছিল, ওখানে খাঁজ পড়েছে মাংসে; চামড়াও কেমন ছোপ-লাগা, খসখসে। ম্যাগাজিনে পড়েছিল ছেলেপুলে হলে এবং ঠিকঠাক অলিভ ম্যাসাজ না করলে ওরকম শৈথিল্য আসে। ওর পাছাও বেশ ভারী। এসব মিলিয়ে, যদিও তারা মাথায় মাথায়, গায়ত্রীকে বেশ বড়সড় লাগে। বয়সেও নিশ্চয়ই অনেকটা।

ওকে অন্যমনস্ক দেখেই সম্ভবত, গায়ত্রী জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

বোধহয় ভাবল সে রং নিয়েই ভাবছে। জিনা বলেই ফেলল, কারণ সেদিন সে আখোলা পার্থকে দেখেছে, তার আগে হালকা নীল স্পোর্টস সার্টের ওপর ফুটে বেরুনো ঘামের রেখায় দারুণ লাগছিল ওকে, 'লাইট ইয়োলো আর লাইট ব্লু নাও।'

গায়ত্রী বলল, 'আশ্চর্য তো! আমিও মনে মনে তাই ভাবছিলাম। দুটোই ওর ফেভারিট কালার।'

বিল্ডিংয়ে ফিরে একসঙ্গে লিফটে উঠল দুজনে। জিনা ফার্স্ট ফ্লোরে নেমে যাবার সময়ে গায়ত্রী বলল, 'একদিন এসো না? অনেকদিন আসো না!'

জিনা বলেছিল, 'হ্যাঁ, আসব।'

তখনই ধরে নেয় চন্দ্রনাথ কাউকে কিছু বলেনি, ওকে বিশ্বাস করা যায়।

তবে সে সতর্ক হয়। পার্থই বলেছিল পরে, এরকম রিস্‌ক নেওয়া ঠিক নয়। নেয়ওনি। কিন্তু, জিনা জানে, তার নিজের মধ্যে এসে গেছে এক ধরনের বেপরোয়া ভাব। বিশেষত সেদিন, বিছানায়, শরীরে শরীর, উন্মত্ততার মধ্যে পার্থ যখন বলল, 'জিনা, তোমাকে ছাড়া আর কাউকে চাই না—', তখন, নিঃশ্বাসের আলোড়নে সংশ্লিষ্ট হতে হতে সেও বলেছিল, 'এই দৈত্যটার হাত থেকে আমাকে বাঁচাও, পার্থ। গায়ত্রীকে ডিভোর্স করো।'

মনে পড়ার অসংলগ্ন ধারাবাহিকতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল জিনা। চা-টাও পুরো খায়নি। আবার চুমুক দিতে গিয়ে টের পেল ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, পাতলা তেলের মতো কিছু ভাসছে ওপরে। টিভিতে কী চলছে ঠিকঠাক লক্ষ করেনি এতক্ষণ। মনস্ক হতে গিয়ে দেখল, ছোট বড় অসংখ্য রঙিন মাছ জলের তলায় স্পঞ্জ-গড়ন শাখা-প্রশাখার আড়ালে আসছে, যাচ্ছে, বুড়বুড়ি কাটছে হাঁ করে। প্রাণী-জগৎ নিয়ে একটা সিরিয়াল দেখায় এই সময়, সেটা কি আজই দেখায়? পিছনের কমেন্টারিতে মহিলার গলা। মনস্কতা নিয়েই সেই ভাষ্য অনুসরণের চেষ্টা করল সে, কিন্তু খাপছাড়া শব্দগুলি আবার এলোমেলো করে দিল তাকে।

ঘরের মধ্যে দিয়ে দক্ষিণে তাকালে আকাশ আড়াল করা পাম গাছ চোখে পড়ে। তার পিছনে, শূন্যের আকারহীনতায় রোদ নেই, যেটুকু আলো তা ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসার আভাস দিচ্ছে। সম্ভবত বেশ কিছুক্ষণ সে অন্যমনস্ক ছিল। তা না হলে, এখন যেমন পাচ্ছে, টিভির শব্দ ছাড়াও রাস্তা থেকে উঠে আসা স্পষ্ট, অস্পষ্ট, কখনও বা আকস্মিক, বিভিন্ন শব্দ শুনতে পেত সে।

অসীম কি পৌঁছে গেছে এয়ারপোর্টে? হয়তো। কিন্তু সেদিন, হঠাৎ পার্থর শরীরে সংলগ্ন হতে হতে, আবেগতপ্ত সে অসীমকে দৈত্য ভাবল কেন, কথাটা উচ্চারণই বা করল কী করে। কথাটায় অসীমের প্রতি তার অনাগ্রহ প্রকাশ পেলেও এমনও কি বোঝাল না, অন্তত পার্থ সেইরকমই মনে করে নিতে পারে, যে, অসীম সত্যি-সত্যিই দৈত্য-বিশেষ, তার ওপর

অত্যাচার করে। নিজেকে চেনাতে গিয়ে ওই যে সে বলল তা ঠিক হলে যাবার আগে লোকটা কি তাকে জড়িয়ে ধরত, চুমু খেত, বলত 'সাবধানে থেকো!' তাব পরেও, চন্দ্রনাথ যা বলল, কেনই বা অসীম তাকে বেহালায় তার দিদি, মীনার বাড়িতে ট্যাক্সিতে পৌঁছে দিতে বলবে। ওই চালটাও তো সে নিজেই চেলেছিল, ভেবেচিন্তে। পার্থও সায় দিয়েছিল। মীনারা কলকাতায় নতুন এসে বাড়ি নিয়েছে বেহালায়, ওদের ওখানে টেলিফোন আসেনি এখনও। বিডন স্ট্রিটে মা'র কাছে গিয়ে থাকলে অসীম ফোন করতে পারে পুনে বা বম্বে থেকে, যেমন করে; সুতরাং বলা ভাল যে-তিন চারদিন অসীম থাকবে না, এবার সে কটা দিন সে বেহালায় গিয়ে থাকবে। মীনাও একদিন বলেছিল অসীমকে, 'যখন আপনি ট্যুরে যান, ওকে এখানে পাঠিয়ে দিলেই পারেন!' অসীম বলল, 'ও চাইলেই পারে।' এই কথোপকথন মনে ছিল; অসীম তো সন্ধের ফ্লাইটে ফিরবে, তার আগে, সকালেই, বেহালা থেকে ফিরে আসবে সে। অসীমও আপত্তি করেনি। দৈত্য!

এক ধরনের বিরক্তি, নিজের ওপর রাগ, এই সময় ছেঁকে ধরল তাকে। বাইরের কালচে হয়ে আসা আলোর দিকে তাকিয়ে উঠতে উঠতে—এখন সে চানে যাবে, সাতটার মধ্যেই তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়া দরকার, জিনা ভাবল, সে কি ঠিক করছে? এখনও কি ফেরা যায়? সে কি সত্যিই ভালবাসে পার্থকে, বা পার্থ, যেরকম বলে, তাকে? সে কি ঠিক জানে, এই মুহূর্তে দুজনের মধ্যে পার্থই তার কাছে বেশি জরুরি?

২

পুরী এক্সপ্রেস হাওড়া স্টেশন ছাড়ার পর প্ল্যাটফর্মের গায়ে গায়ে ট্রেনের জানলা ধরে সি-অফ করতে ব্যস্ত যারা তখনও দৌড়চ্ছিল, তাদের দিকে অন্যমনস্ক তাকিয়ে জিনার মনে পড়ল জীবনে এই প্রথম সে কোথাও যাচ্ছে অথচ তাকে বিদায় জানানোর কেউ নেই। কেউ থাকবে এরকম প্রত্যাশা না থাকলেও, এই মুহূর্তের বোধ একরকম শূন্যতা এনে দিল মনে। সামান্য ভয়ও।

এই একক যাত্রার কি কোনও মানে আছে? বাস্তবিক সে যেখানে যাচ্ছে সেখানে পার্থ অপেক্ষা করবে এটা প্রায় নিশ্চিত হলেও যদি এমন হয় যে ট্রেন পৌঁছুল না ঠিকঠাক, কোনও কারণে আটকে পড়ল মাঝরাস্তায়, কিংবা, অ্যাক্সিডেন্ট হল এবং সে বেঁচে রইল, তাহলে কার শরণাপন্ন হবে সে, কী কৈফিয়ত দেবে। এমনও কি হতে পারে যে, ট্রেন ঠিকঠাক পৌঁছুল কিন্তু পুরী স্টেশনে পৌঁছে সে দেখতে পেল না পার্থকে, তাহলে কী করবে সে, কোথায় যাবে, কোন পরিচয়ে!

এরকম হয় কখনও কখনও। তাদেরই বিল্ডিংয়ের মিসেস দত্তর যেমন হয়েছিল—মেয়েকে নিয়ে দিল্লি স্টেশনে পৌঁছে শুনল আগের রাত্রে হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছে স্বামী। দিল্লি থেকে স্বামীর সঙ্গে কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার কথা ছিল। ওঁর স্বামীর অফিসের কোলিগ আর তাঁর স্ত্রী নাকি এসেছিল স্টেশনে। দিল্লিতেই সৎকার হয়। মিসেস দত্ত ফিরে এলেন বিধবা হয়ে।

না, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক হলেও ওই ধরনের ঘটনার সঙ্গে তার এই মুহূর্তে যাওয়ার কোনও তুলনা চলতে পারে না। স্ত্রী স্বামীর কাছে যাচ্ছে এই সত্যে যে সহজ তার সঙ্গে এই ঘটনার দূরত্ব অনেকখানি। কোনও মিলই কি আছে!

বস্তুত, বোঝা যায় না সে এখন ঠিক কোথায়। ফ্লাইট ঠিক সময়ে টেক-অফ করলে অসীম এখন প্লেনে, পার্থ পুরীতে, হোটেলে বা অন্য কোথাও তা অনুমান করা যায় না। সে ট্রেনে। ত্রিভুজের তিনটি বাহু ভেবে নিলেও ছত্রাকার দেশলাই কাঠির মতো বাহুগুলো এখন আলাদা। অদ্ভুত তো! এটাকে ত্রিভুজই বা বলা হয় কেন! জিনা পার্থর সঙ্গে নিজেকে জুড়তে চাইছে জেনে অসীম নিশ্চয়ই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ত্রিভুজ তৈরির জন্যে এগিয়ে আসবে না। পার্থও কি গুটিয়ে নেবে না নিজেকে! এসব, সত্যিই, অবাস্তব ব্যাপার।

ইয়ার্ড ছাড়িয়ে যাচ্ছে ট্রেনটা। লাইন পরিবর্তনের শব্দের সঙ্গে গতির শব্দ মিশে অস্পষ্ট করে রাখছে আশপাশের অন্যান্য শব্দ। জোর হুইসল দিকে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে এল একটা ট্রেন; সমান্তরাল রেখায় পেরিয়ে যাবার সময় কামরার চকিত আলোর মধ্যে বসে থাকা ওই ট্রেনের কোনও মুখই দেখা গেল না—শেষ বগিটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করল দৃষ্টির সামনে খালি হয়ে গেছে অনেকটা জায়গা, দূরে বিলীয়মান কিছু ঘরবাড়ির আলো পেরিয়ে আরও একটু দূরে, অন্ধকারে, ব্যাপ্ত হয়ে আছে আকাশ; একটি দুটি করে ভেসে উঠছে বিচ্ছিন্ন তারাগুলি। গতি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে দুলছে ট্রেনটা। তেমনি জোর বাড়ছে হাওয়ায়। মুখে ঝাপটা লাগায় জিনা জানলার কাচটা নামিয়ে দেবার কথা ভাবল।

তখন, জিনা যখন সিটের ওপরেই কোমর বেঁকিয়ে বসে কাচ নামানোর চেষ্টা করছে, উল্টোদিকের সিট থেকে উঠে এল যুবকটি।

'সরুন, আমি নামিয়ে দিচ্ছি—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

সরে বসে জিনা এই কেবিনের অন্য যাত্রী, মেয়েটির দিকে তাকাল। যুবকটির স্ত্রী। ময়লা রঙের ওপর ঢলঢলে মুখ, আঁটোসাটো স্বাস্থ্য, মেয়েটির মুখ চোখ এবং সিঁথিতে মোটা দাগের সিঁদুর দেখে অনুমান করা যায় সদ্য বিবাহিতা। অবশ্য এটা সে আগেই বুঝেছিল আনকোরা নতুন, বড় মাপের লাল রঙের স্যুটকেস, যুবকটির চকচকে পাম শু এবং মেয়েটির জরি বসানো চপ্পলের দিকে তাকিয়ে। সম্ভবত হনিমুনে যাচ্ছে। রিজার্ভেশন চার্টে নিজের কেবিন খুঁজতে গিয়ে নামদুটো দেখেছিল জিনা; মিস্টার এ সরখেল, মিসেস সরখেল। তখন মনে হয়েছিল বয়স্ক দম্পতি, কেন মনে হয়েছিল জানে না। চার বার্থের এই কেবিনে আরও একজনের থাকার কথা, কী মিশ্র যেন; চার্টে নাম থাকলেও অজ্ঞাত কারণে লোকটি হাওড়া থেকে ওঠেনি। হয়তো খড়্গপুরে উঠবে। যদি না ওঠে, তাহলে ধরে নিতে হবে তারা তিনজনই যাচ্ছে। টিকিট দুটো তার হাতে দিয়ে পার্থ বলেছিল, 'ভয় নেই, হয় লেডিজ কেবিনে দেবে, না হয় ফ্যামিলি আছে এমন কোনও কেবিনে। ইউ উইল বি ইন সেফ কম্পানি।'

কথাগুলো মনে পড়ায় এক ধরনের থমকানো ভাব অনুভব করল জিনা। হাওড়া থেকে পুরী—নিরাপদে এই দূরত্ব পেরুনোর কথাই সম্ভবত ভেবেছিল পার্থ, যেন জিনার মতো মেয়ের একা যাওয়া সেফ নয়। কেন নয়, কিংবা, তার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট আরও অনেকেই যায় এভাবে, একা-একা, শুধু ট্রেনে কেন, এমনকী বিদেশেও পাড়ি দেয় প্লেনে,

এসব ভাবেনি পার্থ। নাকি নিজের অধিকার বোধ থেকেই দুর্বল মনে করেছে তাকে। এটা অসীম ভাবলে একরকম মানে হত। কিন্তু, বাড়ি থেকে ট্যাক্সিতে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছুটে আসার জেরে তখনও অবসাদগ্রস্ত জিনা ভাবল, অসীমের অগোচরে এই দুঃসাহসিক যাত্রা সত্যিই কতটা নিরাপদ! নিরাপত্তা কি শুধু ট্রেন জার্নির সঙ্গেই যুক্ত! আজকের রাতটা কাটলে আরও দু রাত তারা কাটাতে পারবে এক সঙ্গে, পার্থ আর সে, দুটি রাত ও তিনটি দিন, এই দীর্ঘ সময় কতটা নিরাপদ হবে তার পক্ষে! সে পার্থকে ভালবাসে, পার্থই টানছে তাকে— না হলে মাস চারেক আগেও সে ভাবেনি এরকম একটা ঘটনা তার জীবনেই ঘটা সম্ভব। পার্থর আকর্ষণ প্রবল না হলে কখনওই যেত না এভাবে, ঝুঁকি নিত না এতটা। নিশ্চিত জানে, অসীম সম্পর্কে তার নিজের মনে নির্দিষ্ট কোনও বিরাগের সৃষ্টি না হলেও—কিংবা হলেও সেটা অনুভব করতে পারেনি এখনও—অসীম তাকে টানছে না আর। কাঠ-কাঠ, যান্ত্রিক ও একঘেয়ে, নিরুত্তাপ এই দাম্পত্য-সম্পর্কে সে যে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে, আগে তা বুঝতে পারেনি। সংস্পর্শে এসে, উত্তাপ চিনিয়ে, পার্থই বুঝিয়ে দিল সেটা।

কিন্তু, যা চলছিল কলকাতাতেই, নিজের পরিচিত পরিবেশের মধ্যে, গোপনে, তাকে এভাবে বাইরে, অপরিচিতের মধ্যে এনে কী পাবার আশা করছে তারা? সে? পার্থর সঙ্গে এই সম্পর্কে এখনও বৈধ বলে কিছু নেই; মাত্র ক' মাসের ছাড়া-ছাড়া সম্পর্কে কতটুকুই বা চেনে তাকে! যদি এমন হয় যে সে যেটাকে ভালবাসা বলে ধরে নিচ্ছে সেটা ধারণা ছাড়া কিছু নয়, সে যেমন করে ভাবছে পার্থ ঠিক তা ভাবছে না, কিছুদিন পরেই গুটিয়ে নেবে নিজেকে, আর ইতিমধ্যে অসীমও জেনে গেল সবকিছু, তাহলে সে কোথায় দাঁড়াবে' খবরের কাগজে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে এমন ঘটনা—পুরী বা দীঘায়, কোনও হোটেলের ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে কোনও যুবতীকে, যদি সেরকম কিছু হয়, তাহলে, কাগজে পড়ে অসীম কি শনাক্ত করতে পারবে তাকে ! হয়তো পারবে, পরে, এসব ঘটনা ঠিকই জানাজানি হয়ে যায়। বিশেষত জিনা স্পষ্টই যেখানে নিরুদ্দিষ্ট, বিডন স্ট্রিটে মা'র কাছে কিংবা বেহালায় দিদির কাছে যায়নি। চন্দ্রনাথ বলতে পারে বেহালা যাবার জন্যেই স্যুটকেসসহ সে ট্যাক্সিতে তুলে দিয়েছিল জিনাকে। সে কী করে জানবে একটু পরেই জিনা বুড়ো সর্দারজিকে অবাক করে বলেছিল হাওড়া স্টেশনে যেতে। সর্দারজি একটু থমকে গিয়ে বলেছিল, 'বহিনজি, ঠিক কর লেও কিধর যানা হ্যায়।' তখন অনেকবার রিহার্সাল দেওয়া ঘটনার মতো চটপট রিস্টওয়াচে চোখ ফেলে সে বলেছিল, 'বেহালায় গেলে দেরি হয়ে যাবে, হাওড়াতেই চলুন—', এমন ভাবে, যাতে ট্যাক্সি ড্রাইভারের অবিশ্বাস না হয়, পার্থর পরামর্শ ভ্রান্ত করে, মাঝরাস্তায় ট্যাক্সি না বদলে, সোজা হাওড়া স্টেশনে। অসীম এসব জানে না। ভাবতে পারে কী হল, কেনই বা হল। সে কি সন্দেহ করবে পার্থকে?

ভাবনাগুলো আসছিল পর পর, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। ভাবতে ভাবতেই অসহিষ্ণু বোধ করল জিনা। গলা শুকিয়ে এল, স্পষ্টই অনুভব করল চাপা ঘামে আচ্ছন্ন হয়ে যাচ্ছে শরীর।

কেবিনের দুটো ফ্যানই চলছে ফুল স্পিডে। তাছাড়া এখন ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি, ভোরের দিকে কোনও কোনও দিন শীতও করে বেশ। একটু আগে, ট্রেন গতি বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে হাওয়ার ঝাপটায় সে ঠাণ্ডাই টের পেয়েছিল, তখন জানলার কাচ নামিয়ে দেয়। তাহলে হঠাৎ এখন অস্বস্তি লাগছে কেন! আজগুবি, অসম্ভব চিন্তাই কি পর্যুদস্ত করে ফেলছে

তাকে। যার টানে এতটা বেপরোয়া হয়ে উঠল, উৎকণ্ঠা জানিয়ে আজ সকালেও যে ফোন করেছিল তাকে, আশ্বাস দিল, সেই পার্থকে হঠাৎই সে ভিলেন ভাবতে শুরু করল কেন! নাকি পার্থকে ভালবাসে কি না সে-সম্পর্কে সে নিজেই নিশ্চিত নয়! ট্রেন ছাড়ার পর আধঘণ্টা হয়েছে কি হয়নি, এখনই এসব ভাবনা শুরু হলে আরও দশ বারো ঘণ্টা সে কাটাবে কী করে! না ঘুমিয়ে! পার্থ তাকে সারাক্ষণই ফ্রেশ দেখে, 'তুমি এত সুন্দর হলে কী করে', একবারই বলা এই কথাগুলি সারাক্ষণ ঝিক লাগিয়ে রাখে তার চোখে, সেই পার্থর সামনে কোন চেহারা নিয়ে পৌঁছুবে সে! বাধ্য হয়ে এসেছে, ভুল করে, খুশি হয়ে নয়? না, এরকম কোনও ধারণা তো সে দিতে চায় না পার্থকে।

কাচের মধ্যে দিয়ে তাকালে অন্ধকারেও দ্রুত বিলীয়মান ক্বচিৎ আলোর বিন্দু চোখে পড়ে। বাকি সবই ঘষা-ঘষা, অস্পষ্ট। গতির দোলায়, অবসাদে, গলার ভিতরে ঘোরাফেরা করছে হাই, এখন চাপা দিলেও মনে হয় যে-কোনও সময়েই ফিরে আসবে আবার। একটু জল খেতে পেলে ভাল লাগত। আচমকা দীর্ঘ হুইসল দিয়ে উলটোদিকে আরও একটি ট্রেন ছুটে যেতে এতক্ষণের চিন্তার ধারবাহিকতা থেকে প্রায় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল জিনা। সামনে তাকাতেই চোখাচোখি হল সদ্য-বিবাহিতা মেয়েটির সঙ্গে। তাকেই দেখছিল, অপ্রস্তুত বোধ করে কোলের দিকে দৃষ্টি নামিয়ে নিল। মেটে লাল সিলকের শাড়ির জবরজঙ ডিজাইনে স্বাভাবিকের চেয়ে ভারী দেখাচ্ছে, বসার ধরনে উন্মুক্ত হয়ে আছে বাঁ পায়ের পাতা, গোছ, মনে হয় বেরুবার আগে আলতা পরেছে পায়ে, এত টাটকা রং। মুখের ঢলঢলে ভাবে সুন্দর লাগে তবু। কত বয়স হবে? কুড়ি কি বাইশ, তার বেশি হলে ধরা সম্ভব নয়। স্মার্ট নয়; সত্যিই এত চুপচাপ যে মনে হয় এ সেই ধরনের মেয়ে যার বিয়ে হতে হয় বলেই হয়েছে, পছন্দের ব্যাপারে পক্ষপাত ছিল না কোনও, স্বামীর মর্জির ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে নিজেকে৷ যেমন সে নিজেও দিয়েছিল, বিয়ের পর, গোড়ার দিকে। তবে সে আনস্মার্ট ছিল না, লেডি ব্রেবোর্নের সহপাঠিনীরা প্রায় সবাই স্মার্ট বলত তাকে, তাকিয়ে থাকত তার ফিগারের দিকে। ঠাট্টা করে কেউ কেউ বলত, 'তোকে যে পাবে, ছিঁড়ে খাবে—'

কলেজের স্মৃতিতে আলগা একটু হাসি ছড়িয়ে পড়ল জিনার ঠোঁটে। নড়েচড়ে বসল।

মেয়েটি বোধহয় তার হাসির অর্থ বুঝতে পারেনি। চোখ তুলেই নামিয়ে নিল আবার। একটু আগে ওদের চাপা গলার কথাবার্তা শুনেছিল, আড়ে তাকিয়ে লক্ষ করেছিল একটা বড় ক্যাম্বিসের ব্যাগ থেকে কাপড়চোপড় বের করে যুবকটির হাতে তুলে দিচ্ছে মেয়েটি, যুবকটি এরপর দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায়। এখনও ফেরেনি। সম্ভবত পোশাক পালটাতে গেছে। তার আগে যুবকটির পরনে ছিল ক্যাটকেটে হলদে শার্ট ও কালো ট্রাউজার্স, তার চেয়ে বেশি চোখে পড়েছিল গলায় মেরুনের ওপর সাদা ফুলকাটা টাই। জানলার কাচ নামানোর সময় ঝুঁকে আসায় টাইয়ের গোড়া লুটিয়ে পড়ে তার জানুতে, নাকে আসে চুলের গন্ধ। একটা ভাবনা আসতে আসতেই হারিয়ে যায় তখন। জিনার মনে হয়েছিল যুবকটিকে আগেও দেখেছে কোথাও। এখনই মনে পড়ল, না, আসলে সে ভুল করেছিল অসীমদের অফিসের একটি ছেলের সঙ্গে—ক'দিন আগে, রবিবার সকালে এসেছিল ফ্ল্যাটে, প্রায় একই ধরনের চেহারা ও মেরুন টাই পরে, নাম সম্ভবত বিশ্বনাথ, সেলস রিপ্রেজেনটেটিভ, আসানসোলে ট্রান্সফার করে দেওয়ায় দরবার করতে এসেছিল অসীমের কাছে। কথার মধ্যে অসীম জিজ্ঞেস করেছিল, 'ছুটির দিনেও টাই পরো নাকি?' ছেলেটি কী উত্তর দিয়েছিল বেডরুমের

দূরত্ব থেকে তা শোনা যায়নি। তবে এসব ক্ষেত্রে অনুমান করা কী আর এমন অসম্ভব যে ছেলেটি বিব্রত।

সত্যি বলতে, জিনা ভাবতেই পারেনি এমনিতে গম্ভীর অসীম তার চেয়ে অনেকটা জুনিয়র একজনের সঙ্গে হঠাৎই এমন পরিহাসপ্রিয় হয়ে উঠবে! নিজের বউয়ের সঙ্গেই বা ক'টা হাসি-ঠাট্টার কথা বলে! মায়া হল ছেলেটির জন্যে। সম্ভবত অসীমকে ইমপ্রেস করার জন্যেই টাই পরে এসেছিল ছুটির দিন সকালেও, বুঝতে পারেনি বাড়ি আর অফিস এক নয়। এমনও হতে পারে এই ভ্রান্তির জন্যে অসীমই দায়ী, অফিসে ছেলেটিকে কখনও বোঝবারই সুযোগ দেয়নি সেও সহজ হতে পারে। এতদিন একসঙ্গে ঘর করে জিনা নিজেও কি ঠিকঠাক বুঝতে পারে অসীমকে, সে নিজেও কি প্রায়ই অপ্রস্তুতে পড়ে না!

কিন্তু ট্রেনের এই যুবকটি টাই পরে কেন! কাকে ইমপ্রেস করতে চায়! নতুন পাওয়া স্ত্রীকে? ব্যক্তিত্ব দেখানোর জন্যে? যদি তা-ই হয়, তাহলে সম্ভবত কাজও হয়েছে তাতে। মেয়েটির জড়োসড়ো ভাবের সবটুকুই যে নতুন বিয়ের লজ্জাজনিত কারণে তা মনে হয় না।

প্রশ্নটা করেই ফেলল জিনা।

'কত দূর যাবেন আপনারা? পুরী?'

'হ্যাঁ।' অনেকক্ষণ পরে জিনাকে কথা বলতে দেখে উৎসাহে হাসল মেয়েটি, 'আপনি?'

'আমিও।'

গলার শুকনো ভাবটা যায়নি এখনও। হুকে ঝোলানো ওদের নীল পলিথিনের ওয়াটার বটলটা আগেই চোখে পড়েছে, চাওয়া যায় কিনা ভাবল। রীতিমতো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায়, যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতে দ্বিধান্বিত, তাড়াহুড়ো করে বেরিয়ে আসার সময় একবারও মনে হয়নি যে অনেকটা রাস্তা যেতে হবে, একাই যাচ্ছে, সুতরাং সঙ্গে খাবার জল নেওয়া দরকার। কড়কড়ে দুটো টোস্ট আর কফি-মেশানো এক গ্লাস দুধ খেয়ে ভেবেছিল রাত কাটানোর পক্ষে ঢের, হালকার ওপর থাকাই ভাল, এর বেশি কিছু খেলে অম্বল হতে পারে। বেরুবার আগে হ্যান্ডব্যাগ ও স্যুটকেস খুলে যে দুটো জিনিস সে চেক করেছিল তার একটি টিকিট, অন্যটি টু-পিস সুইমিং কসটিউম। এটা আগের দিনই সে কিনে ফেলেছিল লুকিয়ে, পার্থ বলেছিল ওই পোশাকে তাকে দেখতে চায় সে, সমুদ্রের জলে, ব্রেকারের মাথায় এবং জল থেকে উঠে আসার সময়েও, সর্বাঙ্গে ছড়ানো সাদা মুক্তোর মতো ছোট বড় জলের বিন্দুসহ। জিনা সাঁতার জানে না, তাতে কী, পার্থ জানে, এখনও মাঝেসাঝে রোয়িং করতে যায় লেকে; সুতরাং সে-ই সমুদ্রে নিয়ে যাবে জিনাকে। পার্থ চায় না কোনও নুলিয়া-টুলিয়া জিনার বডি টাচ করুক।

কথাগুলো শোনার সময় যতটা রোমাঞ্চিত হয়েছিল এখন তা হল না। বরং চকিত প্রশ্নে দুলে গেল সে। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলোকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছে পার্থ, যেভাবে, ঠিক সেইভাবে জিনার প্রয়োজনের ব্যাপারগুলো ভাবল না কেন! এই ট্রেন জার্নিতে সঙ্গে জল নেবার কথাটা সাজেস্ট করতে পারত পার্থ, বললে নিশ্চয়ই ভুলত না সে। পার্থ কি সেলফিশ, ওর স্বার্থপর চিন্তার আড়ালে সে হারিয়ে যাচ্ছে না তো!

চিন্তায় ভার এসে গিয়েছিল নিঃশ্বাসে। সংবরণ করে জিনা ভাবল, অনুভূতির কথাটা পার্থকে বলতে পারে সে। বলতে পারে দুজনের ধরন আলাদা হলেও জোর খাটানোর ব্যাপারে অসীমের সঙ্গে পার্থর কোনও তফাত খুঁজে পাচ্ছে না সে। কাল সকালে, পৌঁছে।

এখন নিজের ব্যবস্থা নিজেই করতে হবে। তেষ্টা বাড়ছে এবং মেয়েটির কাছে জল চাইতে হলে এখনই চেয়ে ফেলা ভাল। ওর স্বামী, যুবকটি ফিরে এলে অবশ্যই সে সঙ্কোচ বোধ করবে।

'কিছু মনে করবেন না। আমি জল আনতে ভুলে গেছি—'

'খাবেন? খান না!'

মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হুক থেকে ওয়াটার বটল নামিয়ে প্লাস্টিকের গ্লাসে ঢেলে এগিয়ে দিল জিনার দিকে।

'থ্যাঙ্ক ইউ।' গ্লাসটা আলগোছে মুখের সামনে উপুড় করতেই টের পেল স্বস্তিতে ওঠানামা করছে কণ্ঠনালী। আশ্বস্ত লাগছে জিনাকে।

'আর দেব?'

'না। ধন্যবাদ। আলাপ না করেই উপকার চেয়ে বসলাম।'

'ও মা। তাতে কী!' মেয়েটিকে স্বতঃস্ফূর্ত লাগছে। দাঁড়ানোর ধরনেও স্বাস্থ্য চোখে পড়ে। শরীরের ওপরের অংশ ভারী লাগলেও টান আছে চেহারায়। ওয়াটার বটলটা ঝুলিয়ে রেখে নিজের জায়গায় বসতে বসতে বলল, 'আমাকে আপনি বলছেন কেন! আমি অনেক ছোট—'

হাঁটু দুটো মুড়ে সিটের ওপর তুলে আবার নামিয়ে নিল জিনা। এখন সে স্বচ্ছন্দ হতে পারে। অন্তত যতক্ষণ ঘুম না আসে, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়ার সময় হয়, ততক্ষণ কথা বলার সঙ্গী পাওয়া যাবে। সঙ্গের যুবকটি কেমন তা অবশ্য জানে না। তা হলেও।

কিন্তু সে কি ঠিক ভাবছে? ঘুম! আসবে? কে জানে কেন, পার্থর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হবার পর থেকেই হচ্ছে এটা, প্রায়ই ঘুম আসে না। রিল্যাক্সড হবার জন্যে, বিশেষত যেদিন ড্রিঙ্ক করে না, মাঝেমধ্যে কাম্পোজ খায় অসীম। ওরই পরামর্শে ইদানীং সেও ঘুমের বড়ি খাচ্ছিল মাঝে মাঝে। ওখানে গিয়েও এমন হতে পারে ভেবে গোটা চারেক ট্যাবলেট ভরে নিয়েছে ব্যাগে। ঠিক জানে না, আরও একটু রাত না হলে বোঝাও যাবে না, সম্ভবত আজও একটা ট্যাবলেট খেতে হবে তাকে। ক্লান্ত, ধ্বস্ত মুখচোখ নিয়ে পার্থর সামনে দাঁড়াতে পারবে না।

নতুন করে ফিরে আসা চিন্তাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করল জিনা। মেয়েটির মুখ প্রত্যাশায় ভরা; ইতিমধ্যে এক ধরনের পরিচয় হয়ে গেলেও সম্ভবত নিজে থেকে কথা বলার ভরসা পাচ্ছে না। হঠাৎ মনে হল, ফিরে আসতে একটু বেশিই সময় নিচ্ছে যুবকটি।

'নাম কি?'

'আমার? তাপসী।'

'বাঃ। বেশ নাম তো।' জিনা সহজ হবার চেষ্টা করল, 'নতুন বিয়ে বুঝতেই পারছি। কবে হল?'

এই প্রশ্নে সলজ্জ হল তাপসী এবং অভ্যাসবশত বুকের ওপর শাড়ির আঁচল টেনে বলল, 'দিন দশেক। আজ টেনথ ডে—'

'ঠিকই ধরেছি। হনিমুন তো!'

তাপসী এবারও হাসল; এমন ভাবে, যেন হনিমুন ব্যাপারটায় যে-গোপনীয়তা ছিল জিনা তা জেনে ফেলেছে। বসে থাকার মধ্যেই ওর শরীরের সামান্য ছটফটে ভাব চোখ এড়াল না জিনার। এমনকী হঠাৎই যেন মেয়েটির খেয়াল হল ব্লাউজের হাতা থেকে আলাদা হয়ে ব্রা'র

স্ট্র্যাপটা খোঁচা দিচ্ছে কাঁধে, অসহিষ্ণু হাত দিয়ে সেটা আড়াল করে ঢেকে দিল আঁচলে।

জিনা এরপর কী বলবে ভাবতে না ভাবতে তাপসীই শুরু করে দিল।

'আপনার নাম কি?'

'আমার!' ইতস্তত করতে করতে জিনা বলে ফেলল, 'জিনা ব্যানার্জি।'

'পুরী যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ।'

পরের প্রশ্নটা অনুমান করার আগে অসতর্কতা কাটিয়ে নিল জিনা। তাপসীর দৃষ্টি এখন তার কপালে। নিজের প্রবণতা থেকে কী দেখছে তা বুঝতে অসুবিধে হল না। সিঁথি এবং সিঁদুর আছে কিনা। কী দেখবে তাও বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। সিঁদুর বলতে রুপোর কাঠির ডগা দিয়ে সিঁথিতে অল্প একটু ছোঁয়ানো, যাতে শর্ত থাকে কিন্তু বোঝাও যায় না চট করে—এরকম সে করছে গত চার-পাঁচ বছর। কাঠি ছোঁয়ানোর তারতম্যে মাঝে মাঝে এমনও হয় যে আছে কি নেই তা দেখতে সিঁথি চিরতে হয়। এরকমই স্টাইল এখনকার, অসীমের সঙ্গে ক্লাবে গিয়ে দেখেছে বিভিন্ন জনের স্ত্রীকে। থিয়েটার রোডের বিউটি পার্লারের পার্শী মহিলাও বলেছিলেন একদিন, সিঁথিতে দগদগে সিঁদুর রাখলে ডিজাইন মেনে চুল সেট করার অসুবিধা হয়—এটা এক ধরনের ভিস্যুয়াল অবস্ট্রাকসন। জিনা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিল ক্রমশ। অসীম কিছু বলেনি কোনও দিন। এই ব্যাপারে পার্থর সঙ্গে মেলামেশারও সম্পর্ক নেই কোনও। তবে, আজ সকালে যেটা হল, অসীম অফিসে বেরিয়ে যাবার পর পার্থর ট্রাঙ্ককল এল ঠিক সময়েই, তারপর চুল শ্যাম্পু করে সে ভেবেছিল সিঁদুর পরবে না; কিন্তু তারপরেই, অসীম যখন ফোন করে জানাল তার যাওয়া অনিশ্চিত এবং জিনার বেআক্কেলে জবাবে অখুশি হল, তখনই, কেমন ভয় পেয়েই যেন, সিঁথিতে তাড়াতাড়ি সিঁদুর এঁকে নেয় সে, একটু স্পষ্ট করেই, যাতে বাড়ি ফিরে দেখতে পায় অসীম এবং তাকে ফোলানো ফাঁপানো দেখে কোনও সন্দেহ না করে। সেই চিহ্নই থেকে গেছে। তাপসীর চোখ এড়াবে কেন!

সিঁদুর জড়ানো অন্যমনস্কতায় সিঁথি চুলকানোর ধরনে কপালে হাত উঠে গেল জিনার।

তাপসী জিজ্ঞেস করল, 'একা যাচ্ছেন?'

মেয়েটিকে আগে যেমন সলজ্জ ও চুপচাপ মনে হয়েছিল সম্ভবত তা নয়। প্রশ্রয় পেয়ে এখন জড়িয়ে পড়ছে কৌতূহলে। তাকে সাবধান হতে হবে, জিনা ভাবল, একটু আগে একটা ভুল করে ফেলেছে, তাপসীর কাছে সেই খবরের কোনও গুরুত্ব না থাকলেও এমনও হতে পারে যে ওর কৌতূহলের জবাব দিতে গিয়ে আবারও ভুল করে ফেলবে সে। সম্পর্ক যদিও পুরী স্টেশন পর্যন্ত, ট্রেনের সম্পর্ক ট্রেনেই শেষ হবে, তবুও ওদের কোনও সন্দেহের সুযোগ দেওয়া উচিত হবে না।

উদাসীন গলায় জিনা বলল, 'না, ঠিক একা নয়। মানে—'

'ও। আপনার স্বামী আগেই গেছেন ওখানে—'

মেয়েটি কল্পনাপ্রবণ, সে কিছু ভাববার আগেই ভেবে নিচ্ছে নিজের মতো করে। কিংবা, এসব ক্ষেত্রে যা ধরে নেওয়া স্বাভাবিক, তা-ই ওর গলায় উঠে আসছে উত্তর হয়ে।

জিনা বিরক্ত হল। জবাব দেবার আগেই দেখল ঘড়ঘড় শব্দে দরজা ঠেলে কেবিনের মধ্যে ঢুকে পড়েছে তাপসীর স্বামী। তাপসী ও জিনা দুজনকেই লক্ষ করে কিছু আঁচ করল

যেন, ছাড়া পোশাক আলগোছে এগিয়ে দিল স্ত্রীর দিকে। তারপর দরজাটা ঠেলে দিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাদের আলাপ হয়ে গেছে দেখছি। মিসেস মজুমদার, আমার নাম অজয় সরখেল—'

দু হাত জোড় করে নমস্কার করল অজয়, একটু বা নাটকীয় ধরনে। ঢোলা পায়জামা ও খালাসি-নীল রঙের ওপর সাদা সুতোর কাজ করা পাঞ্জাবিতে এখন ওকে দেখাচ্ছে পুজো প্যান্ডেলের মাতব্বরের মতো। বোতাম না থাকায় উপছে আছে বুকের বোমগুলো। হাত দুটো নামাল না।

জিনা নমস্কারের ভঙ্গি করলেও হাসতে পারল না। নিজের মুখমণ্ডলের অপ্রতিভ ভাব অনুমান করতে ভুল হয় না। বিশেষত ব্যানার্জিকে মজুমদার হতে শুনে তাপসীও যে বিভ্রান্ত, আড়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারল তা। গোলমালটা পার্থই করেছে; মিসেস জে মজুমদার নামে রিজার্ভেসন করে টিকিটটা যখন তার হাতে দিল এবং সেও অবাক হল, পার্থ বলেছিল, 'সম্পর্কটা এগিয়ে রাখলাম।' শুনে এলোমেলো কাঁপুনি-ধরা কী একটা জায়গা বদল করছিল বুকের মধ্যে, ঘন লাগছিল চোখ। সে কোনও প্রশ্ন করার আগেই পার্থ বলল, 'হোটেলেও স্বামী-স্ত্রী হিসেবে থাকতে হবে তো। কারুর মনে কোনও ডাউট থাকবে না।' তো, সেদিন থেকেই, অসীম ব্যানার্জির স্ত্রী এবং পার্থ মজুমদারের স্ত্রী দুজনেই একটিই শরীর ও মনে বসবাস করছিল জিনার মধ্যে। সে জানত, আর পার্থও জানত। কিন্তু নিজেরই অসাবধানতায় বাধো-বাধো ভাব থেকে ট্রেনের কামরায় সে যে এমন একটা গণ্ডগোল করে ফেলবে, আগে তা ভাবতে পারেনি।

সিটে বসত বসতে অজয় বলল, 'আপনিও তো পুরী যাচ্ছেন?'

একই কথার জবাব দিতে অস্বস্তি লাগলেও জিনা মাথা নাড়ল। আশ্বস্তও হল সামান্য। অজয়ের চোখ তারই দিকে, তাকেই দেখছে; তাপসীকে দেখলে তার পদবি-বিভ্রাট ধরা পড়ে যেতে পারত।

'এই কামরায় বোধহয় শুধু আমরাই আছি। কন্ডাক্টর গার্ডকে জিজ্ঞেস করলাম, অন্য যে লোকটির যাবার কথা সে আসেনি। বলল খড়্গপুর পর্যন্ত দেখবে—'

এই উত্তরে তার কিছু বলবার থাকতে পারে না। যে যাচ্ছে না, যাকে চোখেই দেখেনি, তাকে নিয়ে ভাববার কী থাকতে পারে। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত এবং চিন্তিত থাকার যথেষ্ট কারণ আছে তার। এমনকী এই কেবিনে যদি অজয়-তাপসী না থাকত, তাহলেই বা কী হত।

না। আগের কথাগুলো ভাবামাত্র সিদ্ধান্তে পৌঁছুল জিনা। ট্রেনের কেবিনে সে একা, নিরাপত্তার জন্যেই দরজা বন্ধ—একটা সিনেমায় যেমন দেখেছিল, সমুদ্রের ভয়াবহতার মধ্যে কাঠের লগ জড়িয়ে ভেসে যাচ্ছে একটি মেয়ে, এরকম একাকিত্ব ভাবা যায় না। সহ্যও হয় না। বাড়িতেও হত না। কোনও কারণে চন্দ্রনাথ বাইরে বেরুলে আরও। পাঁচ ছ মাস আগে, তখন কি বর্ষার শেষ? দুপুরে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, ঘুমের মধ্যেই সশব্দ কিছু একটা তেড়ে আসতে শুনে চোখ খুলে দেখল মেঘে ছোট হয়ে এসেছে তাদের ঘরের আশপাশ, যেন ঘরের ভিতর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছিল কুণ্ডলীকৃত থোকা থোকা হয়ে, তাকে জেগে উঠতে দেখেই সরে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বৃষ্টিহীন মেঘের দিকে। তারপর যেমন ছিল তেমনি, পায়ে চপ্পল গলিয়ে, চাবি নিয়ে, দরজার ল্যাচ টেনে বেরিয়ে এসেছিল রাস্তায়। নিজে নিজে একা এবং অপরিচিত

মানুষজনের মধ্যে একা থাকার তফাতটা বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আধ ঘণ্টা কি তারও কিছু পরে, ততক্ষণে বৃষ্টি নেমেছে, ফিরে এসেছিল ফ্ল্যাটে।

সেদিন সন্ধ্যায়, স্পষ্ট মনে আছে জিনার, অফিস থেকে ফিরে অসীম বলল, 'দুপুরে কোথায় যাও বলো তো?'

'কেন!'

'ফোন করলাম। পাঁচ মিনিট ধরে রিং হয়ে গেল, কেউ ধরল না?'

'কেউ মানে কে? আমিই তো!' কেন কে জানে, সেদিন হঠাৎ অসহিষ্ণু লেগেছিল নিজেকে, নিজেরই দুর্বোধ্যতায় জড়িয়ে গিয়ে জিনা বলেছিল, 'আমি বাড়িতে না থাকলে তুমিই বা ফোন করো কেন!'

'এটাই তোমার উত্তর!' অসীম বলল, 'স্ট্রেঞ্জ!'

স্ট্রেঞ্জ মানে স্ট্রেঞ্জই। জিনা বুঝতে পারেনি যে-বোধ, অনুভব তার পক্ষে সহজ, অসীম সেটার মধ্যে বিস্ময় খুঁজে পাচ্ছে কী করে!

'এই ট্রেনে তাপস পালও যাচ্ছে—'

অন্যমনস্কতা থেকে ট্রেনের শব্দে মেশানো এক ধরনের অস্পষ্টতায় ঢুকে পড়েছিল জিনা। কথাগুলো তার উদ্দেশ্যেই কিনা বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, 'কে?'

'তাপস পাল।' অজয় ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়েছে, ডান পায়ের ওপর ভাঁজ করা বাঁ পা-টা তোলা, অভ্যাসে কোমর নাচানোর ফলে বিসদৃশ ভাবে নাচছে বাঁ পায়ের পাতা। সেইভাবেই বলল, 'এখন ও-ই টপ—'

জিনা গা করল না। মুখ ফিরিয়ে জানলার কাচে দৃষ্টি আবদ্ধ করার আগে দেখল অজয় ও তাপসীর মাঝখানে আধ হাত মতন ফাঁকা জায়গায় পড়ে আছে একটা ডানহিলের প্যাকেট। হতে পারে এটাও পেয়েছে বিয়েতে। ট্রেনটা হঠাৎই হুইসল দিয়ে উঠল জোরে, সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল আলোর আভাস, প্লাটফর্ম। সম্ভবত কোনও ছোট স্টেশন পেরিয়ে গেল।

সেই মুহূর্তে চেপে রাখা নিঃশ্বাসের ভার চকিত করে দিল জিনাকে। নিজের ফ্ল্যাটের কথা মনে পড়ল। যে-বিছানায় তারা শোয়, কালও শুয়েছিল অসীমের সঙ্গে, তার অন্ধকার থেকে উঠে এল মধুবনী প্রিন্টের বেডকভার। বেরুবার আগে জ্বালবে না ভেবেও ধূপ জ্বেলেছিল কালীর পটের সামনে, সেটা নিশ্চয় নিবে গেছে এতক্ষণে। অসীম বলেনি আজই পুনেয় যাবে নাকি রাতটা কাটাবে বম্বেতে। অন্যান্য বার সে কোন হোটেলে থাকছে, নাকি গেস্টহাউসে, জিজ্ঞেস করে নেয়। এবার করেনি। আশ্চর্য, সবরকম সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও এই স্বাভাবিকতাগুলো সে ভুলে গেল কী করে! এখন যে দূরত্ব বাড়ছে, সেটা, পার্থই যদি তার লক্ষ্য হয়, কী দূরত্ব কমছে বলেই ধরে নেবে সে। সত্যি-সত্যিই কতটা আস্থা রাখা যায় পার্থর ওপর? আর, যেরকম ভাবছে যদি সেরকমই হয়, সে আর পার্থ স্বামী-স্ত্রী হল, তাহলে ডিভোর্সের পরে ইচ্ছে করলেই আবার বিয়ে করতে পারে অসীম। কিন্তু গায়ত্রী তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যাবে? ওপর-ওপর পরিচয় ছাড়া সে তো গায়ত্রী বা তার কে আছে না আছে সেসব সম্পর্কে কিছুই জানে না। যদি এমন হত যে সে পার্থকে চিনত না, কিন্তু পার্থ এখন যা করছে সেরকম অসীমও কিছু করত কোনও মেয়ের সঙ্গে, তাহলে তার কী হত!

'ওর খুড়তুত ভাই আর আমি পাশাপাশি টেবিলে কাজ করি। আলাপ আছে। বলল চিল্কায় শুটিং করতে যাচ্ছে—'

'মুনমুনও যাচ্ছে?'

প্রশ্নটা তাপসীর। এমনই সরল আর আকস্মিক যে জিনা তাকাতে বাধ্য হল ওর দিকে। চকচকে মুখ। স্বামী গর্বে, নাকি মুনমুন সম্পর্কে আগ্রহে, বুঝতে পারল না। এটা বুঝতে পারছে, গোড়াতে পরিচয় না হওয়া পর্যন্ত যেমন ছিল তার চেয়ে এখন ওরা অনেক বেশি স্বতঃস্ফূর্ত, এমনকী তার ক্ষণিক অন্যমনস্কতাও ওদের আলাপে বিঘ্ন সৃষ্টি করেনি। তাপসীর কথা জানে না, তবে যেরকম শুনিয়ে শুনিয়ে কথাগুলো বলছে অজয় তাতে মনে হয় লক্ষ্যটা সে-ই, তাপসী নয়।

আপাতত তাপসীর প্রশ্নে হঠাৎ উঠে আসা হাসি চাপতে জিনা বলল, 'তুমি বুঝি মুনমুনের ফ্যান?'

'আপনি চেনেন?'

'না।'

জিনার কথা শুনে হাসল অজয়। জোরে টানা সিগারেটের ছাই খসে পড়ল পাঞ্জাবির ওপর। তবু, যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে, হাঁটু নামিয়ে বাঁ হাতের পিঠে ছাই ঝেড়ে ফেলতে ফেলতে বলল, 'মুনমুন কি আছে এই ছবিতে? জিজ্ঞেস করব হিরোইন কে।'

ঢালিয়াত। অজয়ের সঙ্গে চোখাচোখি হতে দৃষ্টিটা তারও ওপর অনুভব করে জিনা নিজের বুকের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাকার কারণে, কিংবা ট্রেনের দোলাতেও হতে পারে, আঁচল সরে গিয়ে লো-নেক ব্লাউজের অনেকটা উন্মুক্ত। টের পেয়ে তাড়াতাড়ি আঁচল গুছিয়ে রিস্টওয়াচে চোখ রাখল। ট্রেন ছাড়ার সময় থেকে হিসেব করলে পার হয়ে গেছে অনেকটা সময়, ঠিকঠাক ধরলে মিডনাইট আসন্ন, আর কতক্ষণ জেগে থাকতে হবে?

ভাবতে ভাবতেই হাই তুলল সে, ওপরে চোখ তুলে আলোর দিকে তাকাল এবং বলল, 'আলোটা নিবিয়ে দেওয়া যায় না?'

'আপনার ঘুম পাচ্ছে?'

অজয় কথাগুলো বলার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল জিনা। সরাসরি উত্তর না দিয়ে তাপসীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তোমারও তো ঢুলুনি আসছে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ঘুম পেয়ে যাচ্ছে—'

ততক্ষণে দরজার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল জিনা। হাতে হ্যান্ডব্যাগ। দরজা ঠেলে বন্ধ করবে কি না ভেবে ইতস্তত করে বন্ধ করল না। টয়লেটে গেল। এবং ভাবল, ভোর না হওয়া পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকা, নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে থাকা, তার পক্ষে জরুরি। কেবিন থেকে বেরুবার সময়েই দেখেছিল করিডোরের অন্য প্রান্তের সিটে বসে চুপচাপ সিগারেট টানছে কন্ডাক্টর গার্ড, মাঝখানের একটি কেবিনের দরজা খোলা এবং সেই কেবিনের যাত্রীদের পুরুষকণ্ঠের আলাপ শোনা গেলেও অন্য কেবিনগুলি স্তব্ধ। এটা ঘুমোবারই সময়। যদি এমন হয় যে অজয় খড়্গপুর না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করছে, তাহলেও, আলো জ্বেলে জেগে থাকার দরকার কি! দায়িত্ব তাদের নয়।

নিজেকে হালকা করে, বাঁ হাতে বেসিনের ট্যাপ টিপে ধরে ডান হাতে জল নিয়ে চোখে

ঝাপটা দিল জিনা। শক্ত ট্যাপ; হাতের চাপ আলগা হলেই বন্ধ হয়ে যায়, জোর দিলে জলের তোড় ছিটকে আসে গায়ে। আঁচল ভিজল, ব্লাউজেরও খানিকটা। জলের স্পর্শ আরামও চেনাচ্ছে। গলার ভাঁজে, মুখের ত্বকে চাপা ঘাম, ধুলো ও কয়লার গুঁড়ো মিশে চিটচিটে। মনে হচ্ছে এখন পুরো গা খুলে চান করতে পারলেই ভাল হত। যেটুকু মেকআপ ছিল তা ধুয়ে যাবে ভেবে ইতস্তত করেও কপাল ও কানের পাশ দিয়ে হাত ঘুরিয়ে মুখ, ঘাড়, গলা জলে ভেজাল জিনা। তারপর কোমরে গোঁজা রুমাল বের করে সোজাসুজি আয়নায় তাকিয়ে মুখ মুছতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

ধোঁয়ায় মেশা কেমন একটা হলদেটে ভাব ফুটেছে আলোয়। তার জের আয়নার কাচেও। তাহলেও যেটুকু দেখল তাতে অবাক হল জিনা। এ কেমন চেহারা হয়েছে তার! কালচে, চোখের কোল বসা, সুন্দর ছাঁদে সাজানো ন্যাচারাল ভুরুর রোমগুলো কঠিন, গালের পেলবতা হারিয়ে চোয়ালটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কেমন। কখন এমন হল! তাহলে কি উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তা ক্ষয় আনছে শরীরে! এভাবে চললে তো ভোরের আগেই বুড়িয়ে যাবে সে। পার্থ কী ভাববে!

তখনই সিদ্ধান্ত নিল। পুরো রাত পড়ে আছে, রাস্তাও অনেকটা। জেগে থাকলে ভাবনা আসবে এবং কুরে খাবে। এখন ঘুমই বাঁচাতে পারে তাকে।

ভাবামাত্র ব্যাগ খুলল জিনা। ভিতর পর্যন্ত হাতড়ে ঘুমের ওষুধের স্ট্রিপটা বের করল। ওদের কাছে গিয়ে জল চাইলে নতুন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারে। ট্যাপের জল কি খারাপ? ট্রেনে ওঠার পর এক অবাঙালি মহিলাকে দেখেছিল টয়লেট থেকে ওয়াটার বটল নিয়ে বেরুচ্ছে। কী আর হবে।

সাধারণত আধখানাতেই কাজ হয় তার। কিন্তু এখন গোটা একটা ট্যাবলেট জিবে রেখে ট্যাপের সামনে মুখ বাড়িয়ে জল খেল। চুলে চিরুনি চালিয়ে নিজেকে যতটুকু গোছানো দরকার গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে। মনে হচ্ছে গতি কমে আসছে ট্রেনের।

কেবিনের আলো নেবানো। তার বদলে জ্বলছে নরম ছায়া ছড়ানো নীল বালব, চোখ-সওয়া না হওয়া পর্যন্ত অন্ধকারই লাগে। তাকে ঢুকতে দেখে অজয় তাপসীকে বলল, 'তুমি যাও, বাথরুম ঘুরে এসো—'

কথা না বলে জিনার পাশ দিয়েই বেরিয়ে গেল তাপসী।

জিনা বসতে যাচ্ছিল, অজয় বলল, 'বসবেন কেন! বার্থটা নামিয়ে দিই—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

হুক থেকে খুলে ভারী ও চওড়া বার্থটা আস্তে আস্তে নামিয়ে দিল অজয়।

'আপনার তো বিছানা নেই দেখছি।'

'লাগবে না।'

ধুলো আছে কিনা পরখ করে নিয়ে বার্থের ওপরেই বসে পড়ল জিনা। বাইরেটা আলোকিত দেখে এবং লাইন পরিবর্তনের শব্দ শুনে আন্দাজ করল সম্ভবত খড়্গাপুর। স্টেশন ছাড়লেই সে শুতে পারবে।

অজয় বলল, 'আমাদের কাছে এক্সট্রা চাদর আছে—এয়ারপিলোও নিতে পারেন—'

বাচাল যুবকটিকে এখন অন্যরকম লাগছে। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে চকিতে দৃষ্টি নামিয়ে নিল জিনা এবং হঠাৎই ভাবল, যুবক মানে কি, অজয় তার চেয়ে বয়সে বড়ও হতে

পারে, কী যেন আছে ওর তাকানোর ধরনে। সে যখন ছিল না তখন তাকে নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিশ্চয়ই কথাবার্তা হয়েছে। এমনও হতে পারে পদবি-বিভ্রান্তির কথাটা অজয়কে বলে দিয়েছে তাপসী। এসব ঘটনা এক একজন এক এক ভাবে ব্যাখ্যা করে। ওরা তাকে পলাতকা ভাবতে পারে, কিংবা অসহায়, কিংবা এমন কেউ যে, তাদের পক্ষে দুর্বোধ্য কারণে, পরিচয় লুকিয়ে বেড়াচ্ছে।

'আমার কিছু লাগবে না।' জিনা হেসে বলল, 'লাগলে নিতাম।'

ট্রেনটা থেমে আছে স্টেশনে। কানে আসছে চা, খাবারের হাঁকাহাকি, ব্যস্ত ছুটোছুটির শব্দ। লাউডস্পিকারে এই ট্রেন সম্পর্কেই কোনও ঘোষণা। জিনা বাইরে তাকিয়ে থাকল।

'আপনার স্বামী কি স্টেশনে নিতে আসবেন?'

অজয় কেন তার সম্পর্কে এতটা কৌতূহলী তা বোঝা সম্ভব নয়। এড়িয়ে যাবার জন্যে জিনা বলল, 'আসাব তো কথা।'

'আমরা পুরী হোটেলে উঠব—'

অজয় হয়তো আরও কিছু বলত। ওর কথা শেষ হতে না হতে আধখোলা দরজাটা পুরো ঠেলে তাপসী ঢুকল এবং বেশ উত্তেজিত গলায় বলল, 'ওদিকের দরজা দিয়ে একটা ইনভ্যালিড ছেলেকে পাঁজাকোলা করে ঢোকালো, সঙ্গে বুড়ি মতন একজন। ছেলেটা অসুস্থ মনে হল—'

ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। তাপসীর কথায় কান না দিয়ে অজয় বলল, 'উনি চাদর নিচ্ছেন না।'

'কেন।' বসতে গিয়েও বসল না তাপসী। নিজের বার্থের কোণে জড়ো করা কাপড়ের বাণ্ডিল থেকে একটা বেডকভার বের করে এগিয়ে এসে বলল, 'সরুন, পেতে দিচ্ছি। আমার মা বলল ট্রেনে শীত কথবে, সেই জন্যে জোড়া জোড়া দিয়েছে। ট্রেনে তো গরমই দেখছি—'

জিনা আর বাধা দিল না। শুধু বলল, 'তোমাদের জ্বালাতন করা হচ্ছে!'

তাপসী হাসল। জবাব না দিয়ে নিজেদের শোবার জোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

যদি ঠিকঠাক ঘুম এসে যায় এবং ওর দিক থেকে আর কোনও কথা না ওঠে, তাহলে ভোর পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। তারপর আরও ঘণ্টা তিনেক। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। অজয় ইতিমধ্যে জানিয়ে দিয়েছে তারা পুরী হোটেলে, তখনই তাপসী এসে না পড়লে হয়তো আরও কিছু বলত। কী বলত? জিনার কোনও চিন্তা নেই, যেখানেই যেতে চাক, তারা, নাকি সে, নিশ্চিত পৌঁছে দিতে পারবে। তাপসী এসে পড়ার পর গিলে ফেলে কথাটা। তার মানে কি এই যে বিয়ের পর দশ দিন যেতে না যেতেই সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রীর কাছ থেকে নিজেকে লুকোতে চাইছে অজয়, কিছু-কিছু মনোভাব থাকছে যা ও স্ত্রীর সঙ্গে ভাগ করে নিতে পারে না। সব পুরুষই কি এরকম? নাকি জিনাই বাড়িয়ে ভাবছে? এমনও হওয়া সম্ভব যে অজয়, নারীর প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতাবশত, তাকে যতটা সিরিয়াসলি নিয়েছে, তাপসী তা নেয়নি, নিতে চায়ও না। কোথায় কোন পঙ্গু ছেলেকে পাঁজাকোলা করে ট্রেনে তুলতে দেখেছে, তা নিয়ে সে যতটা একসাইটেড, জিনা সম্পর্কে ততটা নয়।

ওরা জানে না জিনারও ওদের সম্পর্কে আগ্রহ নেই কোনও। পার্থ ঠিকই আসবে স্টেশনে। স্বভাবে দায়িত্ব না থাকলে একটা ওষুধ কোম্পানির পুরো ইস্টার্ন রিজিঅনের সেলস-এর দেখাশোনা সামলাতে পারত না। এবারের ট্যুর নিয়েছে ভুবনেশ্বরে। ওর অফিস জানে এবং গায়ত্রীও জানে, যেমন যায় তেমনি ট্যুরেই গেছে পার্থ।

বার্থের ওপর চিৎ হয়ে হাঁটু ভাঁজ করে শুয়ে বাঁ হাতে আড়াআড়ি চোখ চাপা দিল জিনা। ট্রেনের গতিতে অপেক্ষা নেই কোনও, মনে হয় যত এগোচ্ছে জোর বাড়ছে তত। এর পরের স্টেশনগুলোর নাম কি? বছর আটেক আগে একবার গোপালপুর গিয়েছিল অসীমের সঙ্গে, সম্ভবত ম্যাড্রাস মেলে, ভোর-ভোর নেমেছিল বেহরামপুর স্টেশনে, তারপর গাড়িতে বেশ কিছুটা। হোটেল পাম বিচে উঠলেও ওখানে চেনা লোকের ভিড় দেখে একটা প্রাইভেট লজে চলে যায় ওরা। অসীম চেয়েছিল এক্সক্লুসিভ হয়ে থাকতে, যদিও জিনার হোটেলে, একটু ভিড়ের মধ্যেই থাকতে ভাল লাগত। কাদের সঙ্গে যেন দেখা হয়েছিল হোটেলে? মনে করবার চেষ্টা সত্ত্বেও মনে পড়ল না ঠিক। মাথার ভিতর অসাড় বোধ করায় জিনা অনুভব করল ঘুম আসছে। হয়তো শুরু হয়ে গেছে ওষুধের প্রতিক্রিয়া।

পা দুটো টান-টান করে ছড়িয়ে দেবার আগে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত শাড়িতে ঠিকঠাক ঢাকা আছে কিনা দেখবার জন্যে মাথা তুলল জিনা এবং দেখল, সে খেয়াল করেনি, এরই মধ্যে কখন কেবিনের নীল আলোটাও নিবিয়ে দিয়েছে অজয়। কেবিন জুড়ে পুরোপুরি অন্ধকারের মধ্যে খুব আবছা ভাবে দেখা যায় তাপসীকে, দেয়ালমুখো হয়ে শোয়া; তাপসীর দিকের আপার বার্থে চাদর পাততে দেখেছিল অজয়কে, ওঠেনি এখনও, তাপসীরই পায়ের দিকে বসে সিগারেট টানছে। মুখ দেখা যায় না স্পষ্ট। কিন্তু টানের সঙ্গে জ্বলে ওঠা লাল আগুনের বিন্দুই চিনিয়ে দিল ওকে। হাত নামছে, আগুনটা ক্রমশ চাপা পড়ে যাচ্ছে ছাইয়ে।

হঠাৎই সন্দেহ হল জিনার, অজয় কি তাকেই দেখছে! বোঝা যায় না। নিজের সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হবার জন্যে সে পাশ ফিরল, পায়ের ওপর পা চাপা দিল এবং নাকটুকু বাইরে রেখে আঁচলটা টেনে নিল পিঠ ও মাথার ওপর। খানিক আগে একা-একা যাওয়ার চিন্তায় ভয় পেয়েছিল সে, এখন মনে হচ্ছে এরকম অস্বস্তিকর সহযাত্রী পাওয়ার চেয়ে একা যাওয়াই ভাল ছিল। সুবিধে এইটুকু, যদি চটপট ঘুম এসে যায় তাহলে ওর চোখ থেকে দূরে সরে যেতে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। পার্থ তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে তুলবে জানা নেই। ও দুটো হোটেলের নাম বলেছিল, প্রাচী আর তোসালি স্যান্ডস, দুটোই নাকি নির্জন, এবং দুটোর কোনওটাই পুরী হোটেল নয়। সুতরাং ট্রেনে অনেকটা সময় একসঙ্গে কাটল, চাদর-টাদর দিল বলেই যে ঘনিষ্ঠতা হল, আবার দেখা হবে, এমন সম্ভাবনা কম। হলেই বা কী, পাত্তা না দিলেই হবে। ফেরার সময় পার্থ থাকবে তার সঙ্গে।

ট্রেনটা সম্ভবত কোনও ব্রিজ পার হচ্ছে, বিচিত্র আওয়াজ শুরু হওয়ার আগে হুইসল দিল জোরে, নীচে নদী থাকলেও থাকতে পারে—এসব ভাবতে ভাবতে, ঘুম যখন নিঃশ্বাসের আরও কাছে, জিনা ভাবল, কার সঙ্গে দেখা হবে বা হবে না, ঘনিষ্ঠতা হবে কি না তা এত নিশ্চিত করে বলা যায় না? যায় কি?

সেদিন সন্ধ্যায় অসীম বম্বে থেকে ফিরবে, একা-একা ভাল না লাগায় এবং মেঘ জমছে দেখে ড্রাইভার নিয়ে ওকে আনতে গিয়েছিল এয়ারপোর্টে। তুমুল বৃষ্টির মধ্যে ইস্টার্ন বাইপাস দিয়ে ফেরার সময় যখন তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল, বনেট তুলে কী হয়েছে দেখতে না দেখতেই ড্রাইভার ভিজে একসা, তখন, বৃষ্টির মধ্যেই ট্যাক্সি থামিয়ে নেমে এসেছিল পার্থ। ফিরছে গৌহাটি থেকে। তাদের ট্যাক্সিতে ডেকে নিয়ে বলল, 'হেড লাইটের আলোয় গাড়িটা দেখেই মনে হল চেনা কারুর। থামাতে বললাম।' তো, সেদিন, একই ট্যাক্সিতে বিল্ডিংয়ে ফিরে ভারিক্কি গলায় অসীম যখন বলল, 'এক বাড়িতে থাকি অথচ

দেখাসাক্ষাৎ হয় না, উই মাস্ট মিট ওয়ান ডে—' বলে, নিজেকে চেনাবার জন্যেই যেন, ওয়ালেট থেকে নিজের ভিজিটিং কার্ড বের করে পার্থর হাতে দিল, সেটা না দেখেই স্পোর্টস সার্টের পকেটে রেখে দিল পার্থ এবং বলল, 'আপনার মিসেস অবশ্য আমার স্ত্রীকে চেনেন—', ইত্যাদি, তখনও জিনা ভাবতে পারেনি বৃষ্টির মধ্যে ঘটা আকস্মিক ঘটনা আকস্মিকই থাকবে না, একদিন হঠাৎই রাস্তায় দুজনে দুজনকে দেখে থেমে দাঁড়াবে ও কথা বলবে, পার্থর ইচ্ছেয় তারপর তারা হাঁটতে হাঁটতে এগোবে অনেকটা, কফি খেতে ঢুকবে রেস্তোরাঁয়, কফির বদলে জোর করে তাকে আইসক্রিম খাওয়াবে পার্থ, কারণ জিনা বলে ফেলেছিল 'এখানের আইসক্রিম খুব ভাল—'

তারপর মনে আছে, কথা ফুরিয়ে গেলেও জিনা ফেরার তাড়া দেখায়নি। হাতের তালুতে থুতনি পেতে তাকিয়েছিল রেস্তোরাঁর দেওয়ালের কারুকাজের দিকে, বিচ্ছিন্ন তাপে কানের লতি দুটো গরম হয়ে উঠেছিল কেমন এবং পার্থ যখন বলল, 'গায়ত্রী জানতে পারলে ছিঁড়ে খাবে আমাকে', তখন, কে জানে কেন, জিনা বলে ফেলেছিল, 'বাঃ! সে জানবে কী করে! যারা জানার তারাই শুধু জানবে।' তার পরের দিন, দুপুরে, যখন টেলিফোন বেজে উঠল এবং রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতে ওদিক থেকে অসীম নয়, পার্থই কথা বলল—

আচ্ছন্নতার মধ্যেই আগাগোড়া ঘটনাগুলো ফিরিয়ে আনতে আনতে জিনা প্রায় হারিয়ে ফেলেছিল নিজেকে, যেন সে এখনও রিসিভার লাগিয়ে আছে কানে, ওদিকে পার্থ; হঠাৎই চাপা দুটি কণ্ঠস্বর কানে আসায় স্তব্ধ হয়ে গেল তার শরীর। নিঃসাড় শুয়ে ও বুঝতে পারল ওই কণ্ঠস্বর, শব্দের অর্থ কী। সম্ভবত সে ভুল ভেবেছিল এতক্ষণ, সম্ভবত অজয় তার ঘুমিয়ে পড়ার অপেক্ষা করছিল এবং অজয় করছিল বলে তাপসীও। ওরা ধরে নিয়েছে এখন সে গাঢ় ঘুমে অচেতন।

নিঃশ্বাস থামিয়ে, দাঁতে ঠোঁট কামড়ে, কোমর থেকে পা পর্যন্ত কাঠ-কাঠ করে, ট্রেনের শব্দ শুনতে লাগল জিনা।

৩

ট্রেন পুরী স্টেশনে ইন করার আগেই উত্তেজনা ও আশঙ্কা নিয়ে স্যুটকেস হাতে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল জিনা। এটাই লাস্ট স্টপ; অজয় সরখেল বলেছিল ব্যস্ত হবার কিছু নেই। নিজেদের মালপত্র নামাবার জন্যে কুলি তো ডাকতেই হবে, জিনার স্যুটকেসটাও নামিয়ে দেবে সেই সঙ্গে। আরও বলল তার স্বামী যতক্ষণ না আসে ততক্ষণ অপেক্ষা করবে। ওর কথায় আমল দেয়নি জিনা। পাছে কুলির পিছনে দ্রুত ও লাগামছাড়া হয়ে হাঁটতে হয় সে-জন্যে হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সি থেকে নেমে ট্রেনে ওঠা পর্যন্ত স্যুটকেসটা নিজেই বহন করেছিল সে, দু তিনবার হাতবদল করতে হলেও তেমন কিছু ভারী লাগেনি। টুথব্রাশ, পেস্ট, মেকআপের বাক্স ইত্যাদি হ্যান্ডব্যাগেই ছিল, ট্রেনে একবারও স্যুটকেস খোলার দরকার হয়নি। ভোরে ঘুম ভাঙার পর যেটুকু পরিপাটি হবার হয়েছে। সিল্কের শাড়িটা একটু দুমড়েমুচড়ে গেলেও বোঝবার উপায় নেই। তা ছাড়া, নিজেই জানে এই ঝামেলার মধ্যে

অপ্রয়োজনীয় ব্যাপারগুলো নিয়ে এত পিটির-পিটির করলে চলে না।

কাল রাতে অজয়-তাপসী যা করল সেটার অস্বস্তি আজ ভোরেও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। নতুন বিয়ে করা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম ব্যাপার হয় হয়তো, তা বলে আড়াল থাকবে না কেন। যতই অন্ধকার থাক, মাত্র তিন হাত দূরত্বে যে আর কেউ আছে এবং সেও একজন মহিলা ও যুবতী, অস্বস্তি বোধ করতে পারে, এটা ওদের মাথায় এল না কেন। মিশ্র নামে যে-লোকটি বার্থ রিজার্ভ করেও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছয়নি, তার সম্পর্কে অজয়ের উদ্বিগ্ন খোঁজাখুঁজির কারণটা বোঝা যাচ্ছে, সম্ভবত সে-লোকটি থাকলে ওরা এতটা বেপরোয়া হবার সুযোগ পেত না। তাপসীই বা কী। সে মেয়ে, সে বাধা দিতে পারত। নাকি পারত না; অজয়ের যে-কোনও চাহিদা মেটাতে হবে, ইচ্ছাধীন থাকতে হবে, বিয়ে হতে না হতেই এটা জেনে গেছে সে।

বাস্তবিক কেমন যেন অপমানিত লাগছিল নিজেকে, সেই মুহূর্তে এক ধরনের ভয়ও শিরশির করছিল গায়ে। এরপর কোনও এক সময় স্নায়ু শিথিল হয় এবং ঘুমিয়ে পড়ে জিনা, ভোরে উঠে দেখল নীচে তাপসী ও ওপরের বার্থে অজয় বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওঠার পরও এমন ভাব করল যেন কিছুই হয়নি—এর পর ট্রেন থেকে নেমে সোজা চলে যেতে পারবে জগন্নাথের মন্দিরে।

সে যে কিছু জানে বা টের পেয়েছে সেটা ওদের ধারণায় আছে কি নেই তা জানে না, নিজের অস্বস্তিতে নিজেই আড়াল খুঁজছিল জিনা। পুরীর আগের জংশন স্টেশনে অজয় চা-অলাকে ডাকতে মনে মনে খুশি হয়েছিল সে, ঘুমের জড়তা কাটানোর জন্যে দরকার ছিল এটা; কিন্তু তিনজনের চায়ের দাম আগেই বের করে গুজে দিল চা-অলার হাতে যাতে অজয় আবার গায়ে না পড়ে। তারপর জানলা গলিয়ে চায়ের ভাঁড় ফেলে দিয়ে তাপসী যখন বলল, 'বেশ আরামে আসা গেল, তাই না!' তখন—ইতিমধ্যেই আবার পোশাক পাল্টে, টাই লাগিয়ে, পা নাচাতে নাচাতে ডানহিল টানছিল অজয়—জবাব না দিয়ে অল্প একটু হেসেছিল জিনা। সে আগাথা ক্রিস্টির ভক্ত, সময় কাটানোর জন্যে দরকার হতে পারে ভেবে ফ্ল্যাট ছেড়ে বেরুবার আগে দু-তিনবার পড়া '*টেন লিটল নিগারস*' বইটা হাতের কাছে পেয়ে ব্যাগে ভরে নিয়েছিল, সেটাই বের করে মন দিল পড়ায়, যদিও ট্রেন লাইনের পাশের পরিবর্তিত প্রকৃতি, সার সার নারকেল গাছ এবং ঈষৎ ছায়া-মেশানো রোদ্দুর, হঠাৎই গাড়িতে উঠে আসা একটি পাণ্ডা গোছের লোকের না-ছোড় কথাবার্তায় মন বসাতে পারছিল না ঠিক। এলোমেলো চিন্তার মধ্যে মনে পড়ল তাদের ফ্ল্যাটের সামনের নিঃসঙ্গ পাম গাছটির কথা, অসীমের কথাও—ছেলেমেয়েদের স্কুলবাসে তুলে দিতে এসে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে আছে গায়ত্রী। যদি এমন হয় যে বেহালা থেকে মীনা ও তার স্বামী বারীনদা যেমন হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়ে তেমনি আজই এসে পড়ল এবং শুনল অসীম কলকাতার বাইরে, জিনা তাদেরই বাড়িতে গেছে কাল সন্ধেবেলায়, তখন কী হবে। এদিকটা সে ভেবে দেখেনি। পরে ভাবল, এখন পর্যন্ত সে আর পার্থ যা যা ভেবেছে এবং যেমন করে, ঠিক তাই-ই যখন ঘটেছে তখন নতুন করে আর এমন কিছু ঘটবে না যাতে সে ধরা পড়ে যায়। তা ছাড়া, দিদি তো তিন চারদিন আগেই এসেছিল, এর মধ্যে আবার হুট্ করে এসে পড়বে এমন সম্ভাবনা কম। এলে আসবে, জানবে। থানা পুলিশ যা ইচ্ছে হয় করবে। নিজের মনেই কিছুটা যা হবার হবে ভাব এনে জিনা ভাবল, অসীমের সঙ্গে তার সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেছে, টিকছে না, এটা সে নিজেই

যখন জানে, তখন আর কারুর জানা না-জানায় এসে যায় না কিছু। এই জীবনটা তার, এই শরীরটাও—একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই এদের ওপর তার অধিকার হারিয়ে যায়নি।

ট্রেনটা থেমে আসছে ক্রমশ। প্ল্যাটফর্মের মাঝামাঝি জায়গায় পৌঁছে জিনার উদ্বিগ্ন চোখ খুঁজে পেল পার্থকে। চায়ের স্টলের পাশে দাঁড়িয়ে চোখ রাখছে ট্রেনের ওপর। সারা শরীরে হঠাৎ একটা শিহরন অনুভব করল জিনা, সেই একদিন দুপুরের নির্জনে ওকে ফ্ল্যাটের ভিতরে টেনে এনে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে যেমন হয়েছিল। আশ্চর্য, এই মুহূর্তে সেই ঘটনাটাই তার মনে পড়ল এবং আশঙ্কা কমে এলেও দ্রুত হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। পার্থও কি দেখেছে তাকে? সম্ভবত দেখেনি। ট্রেনটা এগোচ্ছে তখনও। দরজায়, তার সামনে ভিড় করে আছে জনা তিনেক পুরুষ এবং একটা বড় ট্রাঙ্ক আগলে বুটিদার ছাপা ভয়েলের শাড়ি পরে এক বেঁটেখাটো মহিলা, নাক পর্যন্ত ঘোমটায় ঢাকা। ওদের পিছনে থেকে এবং ডান হাতটা স্যুটকেসের ভারে জোড়া থাকায় পার্থকে দেখামাত্র ইচ্ছা সত্ত্বেও হাতও নাড়তে পারেনি সে। ইতিমধ্যে আরও ভিড় এসে জড়ো হল পিছনে। দু তিনজন কুলিও ভিতরে ঢোকবার জন্যে ঝুলে পড়ল দরজার রড ধরে।

এটা শেষ স্টপ জেনেও নিজের ব্যস্ততা ধরে রাখতে পারছিল না জিনা। এদিকে না নেমে উল্টোদিকের দরজা দিয়ে নামবে কিনা ভাবতে ভাবতে দেখল, একটা পঙ্গু মতন নড়বড়ে বালককে দু-দিক থেকে ধরে দরজার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কন্ডাক্টর-গার্ড এবং আর একজন, পিছনে 'স্টেডি অশোক, স্টেডি' বলতে বলতে এক বয়স্কা মহিলা। কাল রাতে সম্ভবত এদের কথাই বলেছিল তাপসী।

ট্রেনটা পুরোপুরি দাঁড়াতে অন্য যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে থেকে নিজেকে সরিয়ে নেমে এসে পিছনে তাকাল জিনা এবং দেখল পার্থও এগিয়ে আসছে, ওর হাতেও স্যুটকেস একটা। কী ব্যাপার। ফিরে যেতে এল নাকি! তাদের পিছনের কামরা থেকে নানা বয়সের কয়েকটি ছেলেমেয়েকে সাবধানে নামিয়ে এক জায়গায় জড়ো করছে দুজন মহিলা ও অন্যান্যরা, ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে মনে হয় ওরা সবাই কমবেশি বিকলাঙ্গ, দল বেঁধে এসেছে; তাদের কামরায় যে-বালকটিকে তোলা হয়েছিল সেও সম্ভবত এই দলেরই—হয়তো কোনও কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ফার্স্ট ক্লাসে সরিয়ে আনা হয়েছিল তাকে।

দূর থেকে দ্রুত হেঁটে এসে তার বাহু চেপে ধরল পার্থ; স্যুটকেসটা প্ল্যাটফর্মে নামিয়ে হাত বাড়িয়ে এমনভাবে তার নাক নেড়ে দিল যেন মেয়ে ফিরছে বোর্ডিং স্কুল থেকে। কেন জানে না, হালকা এই স্পর্শ অসীমকেই মনে পড়িয়ে দিল, অসীম কখনও এমন স্বতঃস্ফূর্ত হয়নি।

জিনার হাত থেকে স্যুটকেসটা নিজের হাতে টেনে নিয়ে পার্থ বলল, 'থ্যাঙ্ক গড। তুমি সত্যিই এসেছ!'

'কেন। আসব না ভেবেছিলে?'

পড়ো-পড়ো শাড়ির আঁচলটা গুছিয়ে নিল জিনা। হ্যান্ডব্যাগের স্ট্র্যাপটা কাঁধে গলিয়ে দু হাতে চুল সামলাতে ব্যস্ত হল। সেই অবস্থাতেই দেখল, ট্রেনের কামরা থেকে তাপসীকে হাত ধরে নামাতে নামাতে তাকেই দেখছে অজয়। সামান্য গম্ভীর; সম্ভবত পার্থও লোকটার চোখ এড়ায়নি। হয়তো শেষ পর্যন্ত ভেবেছিল জিনা একাই এসেছে।

দৃষ্টি সরিয়ে পার্থর চোখে চোখ রাখল জিনা। এতক্ষণে মনে হচ্ছে ঘুমের ওষুধ খেয়ে কাজ হয়েছিল। রাতের ক্লান্তি কাটিয়ে এখন বেশ ঝরঝরে লাগছে।

'কাল রাত থেকে একটা পিকিউলিয়ার ফিলিং হচ্ছিল—।' পার্থ তখনও তাকিয়ে আছে তার মুখের দিকে, বলল, 'মিস্টার ব্যানার্জি যায়নি শেষ পর্যন্ত, আর তোমাকেও আটকে দিয়েছে—'

'মিস্টার ব্যানার্জি কে!' ইচ্ছে করেই অবাক হল জিনা।

'রহস্যটা কি? এত স্মার্ট কথাবার্তা বলছ!'

পার্থর ভুরু কোঁচকানো দেখে চাপা হাসিতে ছড়িয়ে পড়ল জিনা। তারপর ব্যাগ থেকে টিকিট দুটো বের করে আঙুলে মেলে ধরে বলল, 'মিসেস মজুমদারকে মিস্টার ব্যানার্জি আটকাবে কেন!'

টিকিট দুটো জিনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে নিজের পকেটে রাখল পার্থ।

'তোমাকে কিন্তু বেশ ফ্রেশ লাগছে। মনে হচ্ছে না ট্রেন জার্নি করে এসেছ!'

'যদি জানতাম তুমি মিস্টার ব্যানার্জির ভয়ে টেনশনে আছ, ঘুমোতে পারছ না, তাহলে আমিও জেগে থাকতাম।'

গলার স্বর যতটা সম্ভব এলিয়ে দিল জিনা। ঘুমের বড়ি খাবার কথা বলল না, এমনকী ট্রেনে তার কী অভিজ্ঞতা হয়েছে, তাও না। বলবে ভাবতে যতটা সহজ লেগেছিল, বলার মুহূর্তে এসে অনুভব করছে সঙ্কোচ তার চেয়ে বেশি। সঙ্কোচের ভিতর থেকেই উঠে আসছে আরও একটা অনুভূতি, যেন এই সময় তার ও পার্থর মধ্যে যেটুকু দূরত্ব তা না থাকলেই ভাল হত। তলপেটের চাপা অস্থিরতা থেকে জিনা অনুভব করল পোশাকের নীচে তরল হতে শুরু করেছে সে।

কিন্তু, এটা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, লোকজন এখনও নামছে ট্রেন থেকে। ফ্ল্যাটের একান্ত নয় যে সে নিজেই টেনে নেবে পার্থকে। সম্ভবত এটাই ভালবাসা। কাল বিকেলে, যাবে কি যাবে না ভেবে যখন নাজেহাল হচ্ছে নিজেরই মধ্যে, অসীমকে নিয়েও দ্বিধান্বিত, তখনও বুঝতে পারেনি কোনখানে তার শিকড়। ভিজে মাটির শুশ্রূষায় সেই শিকড়ই এখন বিস্তৃত হয়ে পড়ছে তার সমগ্র অনুভবে।

ইচ্ছেটা চাপা দিতে পারল না জিনা। পার্থকে বুঝতে না দিয়েই সরে এল ওর আরও কাছে, আঙুল বাড়িয়ে ঘষে দিল ওর ঠোঁটের পাশটা।

'কী!'

'কিছু না। কাগজের টুকরো বোধহয়।'

পাশাপাশি এসে পার্থর শরীরের ঘামের গন্ধ নাকে টেনে নিল জিনা।

'স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে এসেছ কেন?'

'ওহ্। দ্যাটস আ লং স্টোরি।' এক হাতে জিনার স্যুটকেস, অন্য হাতে নিজেরটাও তুলে নিল পার্থ, 'দাঁড়াও। একটা কুলি ডাকি। এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। মুভ করা যাক। সামনে তো কাউকে দেখছি না।'

পার্থ সরে যেতে ধুতি ও গেঞ্জি পরা, কপালে হলুদ-লাল ফোঁটা কাটা একটি মধ্যবয়সী রোগা, কালো লোক জিনার সামনে এগিয়ে এসে বলল, 'পাণ্ডা লাগবে?'

'না।' বলেই তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে নিল জিনা। পুরীতে এলেই ষাঁড়, পাণ্ডা আর

কুষ্ঠরোগীর দেখা পাবে, এরকম শুনেছিল আগে। তার কোনও অভিজ্ঞতা নেই।

লোকটি আবার ঘুরে এল সামনে এবং প্রায় রাগী গলায় বলল, 'না লাগলে সেরকম বলবেন। জগন্নাথ দর্শনে এসে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন, পাপ হবে না!'

লোকটি আর দাঁড়াল না। মালপত্র সমেত পিছন থেকে এগিয়ে আসা একটি বড় পরিবার দেখে তাদের সঙ্গ ধরল।

ভিড় কমতে শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মের। রোদ্দুরের সমতায় এক ধরনের ছায়া-মেশানো আলো, শীতের ঔজ্জ্বল্যে যেরকম হয়। হাওয়ার চমৎকার ধারাবাহিকতায় শীত নেই, উত্তাপও নেই। আজ সকালে কলকাতায় কি এরকম হবে! প্রশ্নটা ছুঁয়ে যেতেই জিনা ভাবল, তাহলে কি অসীমের সঙ্গে তার সম্পর্ক শেষই হয়ে গেল! এখনই সে যদি আবার ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নেয়, তা কি সহজ হবে তার পক্ষে, কিংবা সম্ভব? এভাবে পার্থর সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার আগে কি অসীমকে আভাস দেওয়া উচিত ছিল যে সে ক্লান্ত, স্বামী-স্ত্রীর এই নিয়মবাঁধা সম্পর্ক আর টানছে না তাকে, সুতরাং এরকম হতে পারে! বললে কীভাবে রিঅ্যাক্ট করত অসীম? এমনকী হতে পারে যে অসীম যেভাবে বলে, বলত, ও-কে। কিন্তু আর ইউ সিওর যে দ্যাট ম্যান, পার্থ মজুমদার, তোমাকে বিয়ে করবে? আমার কাছে যা পাওনি বলে মনে হচ্ছে, তার সমস্তই দেবে? ও কি নিজের স্ত্রীকে ডিভোর্স করছে?

পার্থর যাওয়া এবং কুলি ডেকে ফিরে আসার মধ্যে দু-তিন মিনিট কেটেছে কি কাটেনি, এরই মধ্যে জিনা নিজেকে অবিন্যস্ত করে ফেলল। এবং ভাবল, যার জন্যে এতখানি ঝুঁকি নিয়ে বেপরোয়া হয়ে বাড়ি ছাড়ল সে, চলে এল মাইল মাইল দূরত্বে, এই মুহূর্তে তার কথা না ভেবে সে অসীমের কথা ভাবছে কেন!

কুলির পিছনে বেরুবার রাস্তায় এগোতে এগোতে পার্থর ডান দিক থেকে জিনা ওর ডান হাতটা নিজের বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে প্রায় বাম স্তনের ওপর টেনে আনল এবং পার্থ একটু বা অবাক হয়ে তার দিকে তাকাতে বলল, 'তুমি কি সত্যিই ভেবেছিলে আমি আসব না?'

'না। তা ভাবিনি। তবে—' মুখ ফিরিয়ে পার্থ ওর কান স্পর্শ করল আলতো করে, উল্টো দিক থেকে আসা একটা ট্রলিকে পাশ কাটাতে হাত ছাড়িয়ে নিজে বাঁদিকে চলে এসে, দ্রুত হেঁটে যাওয়া কুলিটাকে ধরতে জিনার ডান হাত ধরে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আফটার অল, তুমি মেয়ে। যদি অসীম সত্যিই ট্যুর ক্যানসেল করত, তাহলেও কি তুমি জোর করে আসতে পারতে?'

জিনা বলল, 'কী জানি! ভীষণ ভয় করছে—'

'কেন। তুমি তো বলেছিলে তিনদিনের কনফারেন্স, তার আগে ও ফিরছে না?'

'সেজন্যে নয়।' একটু থেমে জিনা বলল, 'এভাবে তোমার সঙ্গে—এখানে—যদি কেউ দেখে ফেলে!'

'কে দেখবে!'

'জানি না।'

পার্থ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আঁচ করল কিছু। সামনে বেরুবার গেট, পকেট থেকে টিকিটগুলো বের করে চেকারের হাতে দিয়ে জিনাকে বেরুতে দিল আগে, কুলিটাকে 'আস্তে' হতে নির্দেশ দিল, তারপর জিনার পাশে এসে বলল, 'তুমি স্যুটকেসের কথা বলছিলে? জানো কী হয়েছে?'

জিনার চোখ সামনে বুকিং কাউন্টারের দিকে। বড় লাইন পড়েছে ওখানে, কাউন্টারের সামনে কিছুটা উপচে পড়া ভিড়, কে আছে না আছে দেখা যায় না। তবু তাকিয়ে থাকল। পার্থ বলেছিল কলকাতায় ফেরার বুকিং আগেই করে রাখবে। করেছে কি?

কথাটা জিজ্ঞেস করবে ভেবেও করল না জিনা, পার্থ অন্য কিছু ভেবে নিতে পারে। টান ধরা চোখের পাতা সোজা করতে করতে অনুভব করল একটু আগে ঝরঝরে বোধ করলেও এখন হঠাৎই ক্লান্ত লাগছে নিজেকে।

'প্রাচী হোটেলে বুকিং করেছিলাম। কাল রাতে চেক-ইন করে ডিনারে গিয়ে দেখি আমার এক কাজিন—সল্ট লেকে থাকে—ফ্যামিলি নিয়ে এসেছে। এমনিতে দু বছর দেখা হয়নি। সো ডিসঅ্যাপয়েন্টিং! বলল, আজ রাতে কলকাতা ফিরবে। মিনস টু-নাইট। শুনে সকালেই চেক-আউট করে বেরিয়ে এলাম স্যুটকেস নিয়ে। কিছু টাকা লুজ করলাম যদিও—'

'আমার জন্যে?'

পার্থ প্রস্তুত ছিল না। জিনা ঠিক হাসছে না দেখে বিব্রত গলায় বলল, 'কাম অন! তোমার জন্যে কেন হবে! আমার বোকামির জন্যে—'

স্টেশনের বাইরে চত্বরে পৌঁছে গিয়েছিল ওরা। একটু দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক খুঁজল পার্থ। তারপর বাঁ দিকে আউট গেটের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই যে, তোসালি স্যান্ডস-এর বাস দাঁড়িয়ে আছে। কাল রাত্রেই রুম বুক করিয়ে রেখেছি। এই হোটেলটা পুরী থেকে আট দশ কিলোমিটার দূর। হলিডে রিসর্ট। এক্সপেনসিভও। ওখানে কেউ আমাদের চিনতে আসবে না।'

বাস নয়। আকারে মিনিবাস, কলকাতার রাস্তায় যেমন দেখা যায়, কিংবা আরও ছোট, মাথায়ও নিচু। কিন্তু ছিমছাম ও পরিচ্ছন্ন। তারা ছাড়া আর কোনও যাত্রী নেই। ইউনিফর্ম পরা ড্রাইভারের পাশে বসে থাকা কিশোরটি নেমে এসে কুলির হাত থেকে স্যুটকেস দুটো নিয়ে তুলে দিল ভিতরে।

পার্থ কুলির ভাড়া মেটাচ্ছে। ছাতা হাতে প্যান্ট সার্ট পরা একটি গোবেচারা চেহারার লোক, বয়স আন্দাজ করা যায় না, জিনার সামনে এসে জিজ্ঞেস করল, 'পাণ্ডা লাগবে তো? জগন্নাথের মন্দির দেখিয়ে দিব, স্পেশাল ভোগ এনে দিব, ছেলেপিলে, ধন যা চান সকল মনস্কামনা পূর্ণ হবে—'

ট্রেন থেকে নেমেই একবার বিব্রত হয়েছে জিনা। তখন অবশ্য পার্থ ছিল না। কথাগুলো কানে যেতে এবার পার্থই বলল, 'লাগবে না। আমাদের পাণ্ডা আছে।'

'পাণ্ডা আছে!' অবিশ্বাসের চোখে পার্থকে লক্ষ করল লোকটি। তারপর জিনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখনই ট্রেন থেকে নামলেন, এখনই পাণ্ডা কী করে থাকবে! জগন্নাথের জায়গায় এসে মিছা বলবেন না—'

'আছে, বলছি তো। যাও এবার।' ক্ষুব্ধ হয়ে বলল পার্থ, 'ফালতু বিরক্ত কোরো না।'

'ঠিক আছে।' লোকটি পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড গোছের একটা কার্ড বের করে পার্থর দিকে বাড়িয়ে দিল, 'এই কার্ড রাখুন আমার। এখন ব্যস্ত আছেন, পরে তোসালিতে খোঁজ করব আমি। নাম কী?'

লোকটি এমনভাবে কথা বলছে যেন তার পরামর্শ নেওয়া শুধু জরুরিই নয়, বাধ্যতামূলকও। বিরক্তিতে ভুরু কোঁচকাল পার্থ। জিনার পিঠে হাত রেখে বাসে ওঠার

দরজার দিকে এগোতে এগোতে ভাবল কিছু। তারপর লোকটির হাত থেকে কার্ডটা নিয়ে বলল, 'অসীম ব্যানার্জি।'

'নমস্কার। আমার নাম চক্রধর পাণ্ডা। অসীম ব্যানার্জি? নাম মনে থাকল। কখন আসবেন মন্দিরে?'

'ঠিক করিনি।' পার্থ তাড়া দিল জিনাকে, 'ওঠো, উঠে পড়ো।'

জিনা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পার্থ নিজেও উঠল। ড্রাইভারের সঙ্গী দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে দিতে উলটো দিক দিয়ে ঘুরে এসে জানলার পাশে দাঁড়াল চক্রধর পাণ্ডা।

'এক ঘণ্টা পরে ফোন করব?'

'না। বিকেলে—'

বাস ছেড়ে দিল। স্টেশন এরিয়া থেকে বেরিয়ে সরু রাস্তায় পড়তে জিনার গা ঘেঁষে এল পার্থ। বাঁ হাতটা তুলে দিল ওর পিঠের ওপরে। স্পিড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কানের পাশ থেকে উড়ে যাওয়া ওর খুচরো চুলগুলোকে আঙুলে টেনে জায়গায় আনতে আনতে বলল, 'একেবারে নাছোড়বান্দা। পুরীতে পাণ্ডা একটা ইন্ডাস্ট্রি। আবার ভিজিটিং কার্ডও ছাপিয়েছে।'

জিনা পার্থর দিকে চোখ ফেরাল। ওকে হাসতে দেখেও হাসল না।

'তুমি হঠাৎ ওর নামটা বললে কেন!'

'কার?'

'অসীমের?'

'ও, অসীমের। জাস্ট, মনে এল তাই। একটা নাম না বললে বাসে উঠে বসত। তাছাড়া—'

পার্থ থেমে গেল। যেন জিনার প্রশ্নের আলাদা কোনও উত্তর আছে কি না ভাবছে। পরে বলল, 'অসীম ব্যানার্জির জন্যেই তোমার আর আমার যত টেনশন। ওকে পাণ্ডার হাতে ছেড়ে দিলাম। জগন্নাথ দেখিয়ে আনুক।'

পার্থ হাসছিল। দেখাদেখি, অনেকক্ষণ পরে, জিনাও হেসে ফেলল এবং বলল, 'ও বেচারাকে শুধু শুধু ভিলেন খাড়া করছ কেন। ও জানেই না পার্থ মজুমদার কত বীরপুরুষ।'

জিনার কথায় কিছু ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না পার্থ। শুধু হাতটা জিনার অনাবৃত পিঠের ওপর থেকে সরিয়ে এনে নিজের কোলে অন্য হাতের ওপর রেখে, একটু বা গম্ভীর গলায় বলল, 'সত্যি। ওকে ভিলেন ভাবার চেয়ে নিজেকে কাওয়ার্ড ভাবাই বোধহয় বেশি উচিত।'

'কাওয়ার্ড? তুমি!'

'নয়?'

জিনা পার্থকেই দেখছে। কিছু বলতে চায়, কিন্তু কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। বুকের মধ্যে ঘন হয়ে ওঠা নিঃশ্বাসের ভার এই সময় এলোমেলো হয়ে উঠল। ছায়া ফেলল চোখেও। পার্থর তুলে নেওয়া হাতটা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, 'কাল বাড়ি থেকে বেরুবার আগে ভাবছিলাম ঠিক করছি কি না। এখনও বুঝতে পারছি না ঠিক করেছি কি না।'

গলার স্বরের কম্পন আড়াল করার জন্যেই সম্ভবত, রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল জিনা। হাতটা ছাড়ল না।

এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরে, ছোট ছোট বাঁক নিয়ে, গলিঘুঁজির ভিতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে বাসটা। আশপাশের দৃশ্যে সৌন্দর্য নেই। খাপড়ার চাল, মাটির দেওয়ালের গায়ে অপটু হাতে

করা চুনকামের ওপর আঁকা রঙিন দেবদেবীর মূর্তি; পাকা বাড়ি বলতে একতলা, দোকানঘর। অনেকক্ষণের মধ্যে একটিই শ্রীহীন দোতলা চোখে পড়ল। মানুষ বলতে ক্ষয়া চেহারার নারী, পুরুষ, শিশু। খড়ের চালার নীচে ঢেঁকি ভাঙছে এক মাঝবয়েসী মহিলা, ব্লাউজহীন বুক থেকে স্তনদুটি ঝুলে আছে বেআব্রু। চোখ সরিয়ে ব্লাউজের ঘেরে নিজের আঁচলটা গুঁজে নিল জিনা। বাসের গতি হঠাৎই মন্থর হওয়ায় নড়েচড়ে বসল।

উলটোদিক থেকে আসা একটি নীল অ্যামবাসাডর দূরে দাঁড়িয়ে থেকে হর্ন দিচ্ছে, মন্থর হতে হতে তাদের বাসটাও দাঁড়িয়ে পড়ল ঝাঁকুনি দিয়ে। হর্ন দিতে লাগল ঘন ঘন। বেখাপ্পা সেই শব্দের ভিতর থেকে ড্রাইভারের সঙ্গীটি একটা ছড়ি হাতে নেমে গেল রাস্তায়। একটা ষাঁড়। রাস্তা আটকে ঝিমুচ্ছিল বোধহয়, খোঁচা খেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে অনাগ্রহের ভঙ্গিতে হেঁটে গেল বাসের পাশ দিয়ে। চামড়ার ওপর ছ্যাঁকা দিয়ে কী সব লেখা, হয়তো ওড়িয়ায়, জিনা বুঝতে পারল না।

পার্থই কথা বলল।

'মাত্র দুদিন তো! ফিরে গেলে কে আর জানছে!'

পার্থর আঙুলগুলো নিজের আঙুলে জড়িয়ে রেখেছে জিনা। উষ্ণতায় তীব্র সেই স্পর্শ অদ্ভুত শিহরন ছড়িয়ে দিল পার্থর শরীরে। অনুভূতিটা চেনা। জিনাদের ফ্ল্যাটে, কিছুদিন আগে, দুপুরে, কোনও প্রস্তুতি না থাকা সত্ত্বেও আকস্মিকের টানে যেদিন সে ও জিনা লিপ্ত হল পরস্পরের শরীরে, এই মুহূর্তের অনুভূতিতে তার চেয়ে পার্থক্য নেই কোনও। কিন্তু, শরীর আকর্ষণ করলেও এখন, এই বাসের মধ্যে, তারা সেইরকম হতে পারবে না। এসব ভেবে নিজেকে ছড়িয়ে দিল পার্থ এবং উত্তর খুঁজতে লাগল।

গলিঘুঁজি ছাড়িয়ে বড় রাস্তায় বেরিয়ে এল বাসটা। ডান দিকে ঘুরতে জিনার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টায় পার্থ বলল, 'দ্যাখো! দেখতে পাচ্ছ?'

'কী?'

জিনা পিছনে তাকাতে দূরের দিকে দেখিয়ে পার্থ বলল, 'চূড়া দেখা যাচ্ছে। জগন্নাথের মন্দির।'

বাসের পিছনের কাচের ভিতর দিয়ে জিনা তাকিয়ে থাকল খানিক। কোনও তারতম্য ফুটল না মুখে। কানের পাশে রোদ লাগায় ছায়া পাবার জন্যে গোটানো পর্দাটা টেনে দিল একটু।

বড় রাস্তা থেকে বাঁক ঘুরে চকচকে পিচের রাস্তা, বাসটা ছুটছে রীতিমত জোরে। দু পাশে জনবসতি কমতে কমতে স্পষ্ট হয়ে উঠল আধখাপচা শস্যে ভরা মাঠ, জলা, বিক্ষিপ্ত কলাগাছের ঝাড়, নারকেল ও ইউক্যালিপটাসের গাছ, বিদ্যুৎ সরবরাহের বড় ট্রান্সমিশন স্ট্রাকচার। জিনা এসবই দেখছে, আঙুলে আঙুল, অন্যমনস্ক, হাওয়ায় উড়ে যাওয়া খুচরো চুলের ঝাপটায় মাঝে মাঝে আংশিক হয়ে উঠছে কপাল।

'এই থ্রিলটা—' পার্থ নতুন করে শুরু করল, 'তোমাকে এভাবে কাছে পাওয়ার ফিলিংটা যদি চিরকাল থাকত, তাহলে একঘেয়েমি থাকত না। ভাবছি, গায়ত্রীকে বিয়ে করার আগে যদি তোমার সঙ্গে দেখা হত—'

'এখন? গায়ত্রীকে ডিভোর্স করতে খারাপ লাগবে?'

'না। তা নয়।' প্রায় জেরার মুখে পড়ে অপ্রস্তুত গলায় পার্থ বলল, 'ওয়াইফ হিসেবে

গায়ত্রী খুব ডিভোটেড। কোনও এক্সট্রা ডিম্যান্ড নেই ওর। তার ওপর বাচ্চা দুটো—'

একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে দম নেবার জন্যে থামল পার্থ। তারপর হঠাৎ বলল, 'সেদিক থেকে তুমি অনেক ফ্রি—'

জিনা পার্থর দিকে তাকাল, হঠাৎ, অপ্রত্যাশিত কিছু শোনার ধরনে। জবাব দিল না। পার্থর আঙুলে জড়ানো আঙুলগুলো সন্তর্পণে ছাড়িয়ে নিয়ে দৃষ্টি রাখল বাইরে। এক দৃশ্য থেকে অন্য দৃশ্যের তফাত করা যায় না। রোদ কখনও আসছে, কখনও যাচ্ছে; ছায়া ছড়ালে মাঠের ওপর হাওয়ার দৌড় দেখা যায়।

'কিছু বলছ না যে!'

'ভাবছি। আর কত দূর?'

'এই তো—', সামনে তাকিয়ে পার্থ বলল, 'আর মিনিট দুয়েক—'

'এখানে সমুদ্র কোথায়?'

'আছে। তবে একটু দূরে—'

জিনার দৃষ্টি বাইরেই। যেন পার্থর বলা কথাগুলোর নৈকট্য থেকে সে এখন অনেক দূরে। সেইভাবে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'পরশু ফেরার টিকিট করে রেখেছ তো?'

'এখনও হাতে পাইনি। তবে পেয়ে যাব। এই সময়টায় রাশ থাকে খুব। সিজিন তো।'

কথাগুলো বলে বিব্রত ভঙ্গিতে হাসল পার্থ। বেশ কিছুক্ষণ হল জিনা যা যা বলেছে বা প্রশ্ন করেছে সবই বাইরে তাকিয়ে, অন্য কোনও ভাবনায় আচ্ছন্ন থেকে, কথার পিঠে কথা সাজানোর ঢঙে। ব্যাপারটা লক্ষ করে পার্থ এবার বলল, 'মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর ডিপেন্ড করতে পারছ না।'

'কেন!'

জিনাকে মুখ ফেরাতে দেখে পার্থ ওর চোখে চোখ রাখল। বাঁ হাতটা আবার ওর পিঠের ওপর তুলে দিয়ে কাছে টানার ভঙ্গি করে বলল, 'ভাবছ কেন! সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমি আমার জন্যে যতটা রিস্‌ক নিয়েছ, আমি তার চেয়ে বেশি নেব।'

'ভাবলে এভাবে চলে আসতাম!'

শুধু এই কথাগুলিই নয়, জিনা যেন আরও কিছু বলতে চাইছিল। চোখদুটো স্বাভাবিকের চেয়ে বড় হয়ে কিছু খুঁজতে লাগল পার্থর মুখে। ওর পাতলা ঠোঁটের মৃদু কম্পনও চোখ এড়াল না পার্থর। কাল বাড়ি থেকে বেরুনোর পর জিনা এ পর্যন্ত যা করেছে সম্ভবত সবই জেদের বশে, তার কাছে পৌঁছুনোর জন্যে; এখন, কাছে পৌঁছুনোর পর, হয়তো নার্ভাস বোধ করছে।

কিছু না বলে পিঠের ওপর ছড়ানো হাতের আঙুল দিয়ে ওর ঘাড়ের নীচের উন্মুক্ত অংশে আশ্বাসের দাগ কাটতে কাটতে পার্থ ভাবল, এই অনুভূতি স্বাভাবিক। যদি তা না হত তাহলে গতকাল সকালে জিনার কাছে গায়ত্রীরা ভাল আছে শোনার পরেও রাত্রে প্রাচী হোটেল থেকে সে ফোন করত না গায়ত্রীকে। ট্যুরে বেরুলে যেমন করে মাঝে মাঝে। ভাল আছে, চিন্তা করার কিছু নেই—গায়ত্রী এসব বলবার পর কল শেষ করে পার্থ ভেবেছিল, সব ঠিকঠাক আছে কি না জানার জন্যে নয়, আসলে গায়ত্রী কোনও সন্দেহ করেছে কি না এটা বুঝতেই সে হঠাৎ ফোন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তার আগে পর্যন্ত অদ্ভুত বিপন্ন লাগছিল

নিজেকে। এই মুহূর্তে জিনাকে আশ্বস্ত করলেও গায়ত্রীকে ফোন করার কথাটা বলা যাবে না—ট্রেন থেকে নামার পর জিনার জন্যেই তার উদ্বেগের কথা বলেছিল ওকে। এখন অন্য কিছু বললে জিনা ভাবতে পারে তাকে ঘর থেকে বের করে এনেও গায়ত্রীকে ভুলতে পারছে না পার্থ। একটু আগেই গায়ত্রীকে ডিভোর্স করার কথা তুলেছিল জিনা, কী বলবে না বলবে, ভেবে অন্য কথা বলে প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যায় সে। এখনও বুঝতে পারল না, যা ঘটছে সবই শেষ পর্যন্ত তার ও গায়ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদের দিকেই এগোচ্ছে কি না। যদি তা-ই হয়, তাহলে কোন কারণ সে দেখাবে গায়ত্রীকে? জিনাকে কি জিজ্ঞেস করা যায় অসীমকে সে কী বলবে বলে ভেবে রেখেছে? তারা কি সত্যিই অসুখী, বিবাহিত জীবনে ক্লান্ত, বিরক্ত, দীর্ঘ দিন ধরে? যদি তা-ই হয়, তাহলে সে ও জিনা, দুজনেই, হঠাৎ মাত্র ক' মাস আগে পরস্পরের সঙ্গে দেখা ও ঘনিষ্ঠতা হবার পরই এটা বুঝে ফেলল কী করে? না কি তার ধারণা তারই, একার; জিনাকে সে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি!

বাঁ দিকে গেটের মধ্যে দ্রুত বাঁক নিয়ে বাসটা তোসালি স্যান্ডস-এর দেয়ালঘেরা সীমানার মধ্যেকার গাছগাছালি পেরিয়ে রিসেপশনের সামনে এসে দাঁড়াল।

'আমরা এসে গেছি—।' গেটে ঢোকার মুখে জিনার পিঠ থেকে হাতটা ব্যস্তভাবে সরিয়ে নিতে নিতে বলেছিল পার্থ; এখন বলল, 'ভাল নয়?'

অস্পষ্টতা থেকে ততক্ষণে নিজেকে বের করে এনেছে জিনা। শাড়ির আঁচল গুছিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি আমাকে খারাপ জায়গায় আনবে কেন!'

স্টেশন থেকে এতটা রাস্তা, ওই ষাঁড় তাড়ানোর সময়টুকু বাদে, ড্রাইভার ও তার সঙ্গীর কোনও অস্তিত্ব আছে বলে মনে হয়নি। যেন ওরা এই যন্ত্রযানেরই অংশ হয়ে ছিল। এখন দুজনেই নেমে এসেছে। সঙ্গীটি দরজা খুলে ভিতরে এসে স্যুটকেস দুটো তুলে নিল হাতে।

পার্থ ওয়ালেট খুলে দাঁড়িয়েই আছে দেখে জিনা জিজ্ঞেস করল, 'কী হল!'

'খুচরো টাকা দেখছি না। ওদের কিছু দিতে হয়—'

'আমি দিচ্ছি।' কাঁধের স্ট্র্যাপে ঝোলানো ব্যাগ খুলে দুটো দশ টাকার নোট বের করে পার্থর হাতে দিল জিনা, 'এতে হবে?'

'এসেই ধার করা শুরু করলাম।'

'এমনি দিইনি। সুদসমেত ফেরত দেবে।'

জিনাকে সহজ হতে দেখে হারানো স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেল পার্থ। যে-কোনও কারণেই হোক, পিছনের আট-দশ কিলোমিটার রাস্তার প্রায় সবটাই জিনা ছিল আত্মমগ্ন ও দ্বিধান্বিত, শারীরিক স্পর্শের মধ্যেও অন্যমনস্ক। এমন কোথাও ছিল যেখানে পার্থ ছিল না। পরবর্তী কিছুক্ষণের একাকীত্বের মধ্যে পার্থ নিজেও খুঁজেছিল নিজেকে, গায়ত্রীকে, মনে পড়ছিল জয় ও শমিতার মুখ। মাঝখানের দূরত্ব কাটিয়ে সম্ভবত এখন তারা নিজেদের মতো হতে পারবে।

পার্থর সঙ্গে সঙ্গেই রিসেপশন কাউন্টার পর্যন্ত হেঁটে এল জিনা। পুরনো ভারতীয় ধাঁচে খুব মনোরম করে সাজানো ভিতরটা। নিচু সিলিং থেকে দেয়াল পর্যন্ত সর্বত্রই মেটে লাল ইট বের করা ডিজাইন, পোড়ামাটি কিংবা পিতলের তৈরি ওড়িশি মূর্তি, টবের গাছ লুটোপুটি খাচ্ছে মেঝেয়, একদিকের দেয়ালের পর্দায়, নিচু কাঠের চেয়ার বা সোফাতেও অভিন্নতা। ঢোকবার মুখে তেরছা হয়ে আসা রোদটুকু মিশে গেছে ভিতরের চোরা বৈদ্যুতিক আলোয়।

ভিতরে তাকালে আরও অনেকটা দেখা যায়। টানা করিডোর সংলগ্ন কাচের ঘরে, জিনা দেখল, টিভিতে চোখ রেখে বসে আছে জন চার পাঁচ পুরুষ ও মহিলা। শব্দ শোনা যাচ্ছে না। এদিকে ছক-মেলানো লাল, সাদা, হলদে গোলাপের বাগান। জিনা যেদিকে তাকিয়ে ছিল সেদিক থেকে এগিয়ে এল এক বিদেশি দম্পতি, তাদের পিছনে ভারী স্যুটকেস নিয়ে হোটেলের ইউনিফর্ম পরা বেলবয়। সম্ভবত ট্যুরিস্ট, চলে যাচ্ছে। আর কিছু না থাক, এক মুহূর্তেই বুঝে নিল জিনা, এখানে নির্জনতা আছে। বেলা হলেও গরম নেই, বরং মসৃণ এক ধরনের হাওয়া থেকে থেকে রেশম বুলিয়ে যাচ্ছে গায়ে।

চারপাশের পরিবেশের তুলনায় রিসেপশন কাউন্টারে দাঁড়ানো ট্রাউজার্স সার্ট পরা মাঝবয়েসী ভদ্রলোক ও কটকি সিল্কের শাড়িতে রোগা যুবতীটি প্রায় সাধারণ। পার্থ খোঁজ করায় রিজার্ভেশন রেজিস্টার খুলে পাতা ওল্টালেন ভদ্রলোক, তারপর বললেন, 'ইয়েস, মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মজুমদার, ফ্রম ক্যালকাটা। বুকড বাই মিস্টার পটনায়েক?'

আড়ে জিনার দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় পার্থ বলল, 'ইয়েস।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কাউন্টারের নীচে থেকে একটা সাদা ফর্ম বের করে ডটপেনসহ এগিয়ে দিল যুবতী এবং পরিষ্কার বাংলায় বলল, 'স্যার, কাইন্ডলি ফিলাপ করুন।'

ফর্মটা টেনে নিয়ে কিছু লেখার আগে পার্থ বলল, 'প্লিজ গিভ আস আ গুড, লোনলি কটেজ—'

'ইউ উইল গেট ইট, স্যার।' কাউন্টারের ভিতরে, দেয়ালে টাঙানো কী-বোর্ডের সামনে এগিয়ে গেলেন ভদ্রলোক, দশ বারোটা ঝোলানো চাবির মধ্যে থেকে কোনটা তুলবেন ভেবে সময় নিলেন একটু। তারপর মাঝখান থেকে একটা চাবি তুলে নিজের জায়গায় এসে দাঁড়ালেন। চোখ জিনার দিকে।

'পুরীতে এই প্রথম এলেন, ম্যাডাম?'

'না। ঠিক প্রথম নয়।' আকস্মিক প্রশ্নে নিজেকে গোছাতে ভুলে গেল জিনা, 'মানে ছোটবেলায়—'

ভদ্রলোক ওর কথা শুনলেন বলে মনে হল না। যে বেলবয়টি খানিক আগে সাহেবদের স্যুটকেস নিয়ে যাচ্ছিল, শিস দিয়ে তাকে কাছে ডেকে বললেন, 'একশো আঠারো নাম্বার। রেডি হ্যায়।'

পার্থ জিজ্ঞেস করল, 'বিচটা এখান থেকে কত দূরে?'

'দূরে নয়। অ্যাবাউট টেন টুয়েলভ মিনিটস। ওটা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের প্রোটেকটেড এরিয়া—এক্সক্লুসিভ ফর আওয়ার গেস্টস।' এক মুহূর্ত রিস্টওয়াচে চোখ রেখে মুখ তুললেন ভদ্রলোক, 'ইফ ইউ ওয়ান্ট টু গো, আমরা আপনার ট্রান্সপোর্ট অ্যারেঞ্জ করে দেব। কখন যাবেন?'

পার্থ জিনার দিকে তাকাল।

জিনা বলল, 'রোদ হবে না?'

যুবতী বলল, 'এখন এক দু ঘণ্টা কোনও প্রব্লেম নেই। ওয়েদার বেশ প্লেজান্ট।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ও-কে। আপনারা কটেজে যান, ফ্রেশ হয়ে নিন। এক ঘণ্টা পরে আমি রিং করব। ইউ টেল মি, উই উইল অ্যারেঞ্জ।'

বেলবয়ের পিছনে পিছনে কটেজের দিকে যেতে যেতে আকাশে তাকিয়ে চোখ জুড়িয়ে

গেল জিনার। নীলের স্বচ্ছতায় বিস্তৃত হয়ে আছে আলো; রোদ বলতেই যে-তাপের কথা মনে হয়, তার স্পর্শ নেই কোথাও। হাওয়ায় যে-মসৃণতা আগেই টের পেয়েছিল, এখন তা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল সর্বাঙ্গে। ক্লান্ত লাগছে না, মনেই হচ্ছে না গোটা রাতটা কাটিয়েছে ট্রেনে। নির্জন, সত্যিই নির্জন।

রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এসেই ঢালু ছাদের হল চোখে পড়েছিল, বড় বড় কাচের জানলার ভিতর সাজানো চেয়ার টেবিল দেখে রেস্তোরাঁ কি না ভাবছে, ভারী কাঠের কারুকাজ করা দরজার পাশে তখনই 'রেস্তোরাঁ' লেখা বোর্ড চোখে পড়ল। চারদিকে ফুলের বাগান ও মাঝে মাঝে ছাড়া সবুজের মাঝখান দিয়ে সরু পাথরের রাস্তা এগিয়ে যাচ্ছে এঁকেবেঁকে, মাঝে মাঝে গেট, সাদা আলোর ডোম ও নাম্বার লেখা কটেজ নির্দেশিকা; বেলবয়ের পিছনে পিছনে এগোতে লাগল ওরা—সুইমিং পুলের পাশ দিয়ে, বাহারে দোলনা ছাড়িয়ে, সবুজ ও ফুলের মধ্যে বিক্ষিপ্ত একই ধাঁচের ইটরঙ কটেজগুলিকে ডাইনে বাঁয়ে রেখে। ওগুলো কি ফাঁকা, না লোক আছে? একটিই কটেজের বাইরে সাদা চেয়ারে একজোড়া যুবক-যুবতীকে বসে থাকতে দেখল জিনা, আর একটির সামনে চেয়ারে শাড়ি শুকোতে দেখে অস্বস্তি হল—তাদের বিল্ডিংয়ের কোনও কোনও ফ্ল্যাটে যেমন, তেমনি এখানেও নিশ্চয়ই এমন কেউ কেউ এসেছে যারা কোনটা শোভন কোনটা অশোভন সে-সম্পর্কে সচেতন নয় একেবারেই।

জিনার চোখে তাদের মাল্টিস্টোরেড বিল্ডিংটা ভেসে উঠল পুরো। গত বছর বর্ষায় হঠাৎ একদিন রোদ উঠলে ব্যালকনির রেলিংয়ে চন্দ্রনাথ বেডকভার শুকোতে দিয়েছে দেখে খুব বকাবকি করেছিল অসীম, রাস্তা বা অন্য কোনও ফ্ল্যাট থেকে এরকম একটা দৃশ্য দেখা যাক, এটা তার পছন্দ হয়নি। ঘটনাটা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরে স্তব্ধতা অনুভব করল জিনা। অসীম কি এখন পুনেয়? ও কি জানে ওর স্ত্রী, জিনা, এখন ঠিক কোথায়? ওখানে ওয়েদার কেমন? যদি এমন হয় যে এখানে নয়, পুনেতেও নয়, কলকাতায় খুব বৃষ্টি হল আজ, সে জানতেও পারল না, কিন্তু অসীম জেনে গেল এবং পরে জিজ্ঞেস করল, তখন তার হতবাক মুখ দেখে অসীম কী ভাববে? ধরা পড়ে যাবে না তো!

না, সেরকম কিছু হবার আগেই কলকাতায় ফিরতে হবে তাকে। এই দু তিন দিনে কী হয়েছে না হয়েছে সবই কায়দা করে এবং খুঁটিয়ে জেনে নিতে হবে চন্দ্রনাথের কাছে। অসীম ফেরবার আগে বেহালাতেও, মীনাদের ওখানে, তার কি একবার ঘুরে আসা উচিত?

নতুন করে একটা ভয় ছেঁকে ধরল জিনাকে। পার্থ পাশে, একটু আগে পরে হয়ে অনুসরণ করছে বেলবয়কে। হঠাৎই ওর বাহু চেপে ধরে গায়ে গায়ে ঘেঁষে এল জিনা।

'শোনো। বিচে না গিয়ে রিটার্ন টিকিটটার চেষ্টা করলে কেমন হয়?'

'আ-রে!' পার্থ অবাক হয়ে বলল, 'তোমার মাথায় সারাক্ষণ টিকিট ঘুরছে কেন?'

'ওটা পেয়ে গেলে হাত-পা মেলে থাকা যেত।'

পার্থ দাঁড়িয়ে পড়ল। জিনার মনোভাব আঁচ করার চেষ্টা করে বলল, 'কাল থেকেই ঘোরাঘুরি করছি। বলেও রেখেছি। না হয় সন্ধের দিকে যাওয়া যাবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন!'

জিনা তখনই কিছু বলল না। সেই ভঙ্গিতেই, আরও কয়েক পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'পটনায়েক কে?'

'পটনায়েক?'

'রিসেপশনে বললে তুমি?'

'ওহ। আচ্ছা।' যেন কোনও বাচ্ছা মেয়েকে আদর করছে, এইভাবে, নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জিনাকে জড়িয়ে ধরল পার্থ, 'কান খাড়া রেখেছিলে!'

'তোমাকে নার্ভাস লাগছিল—'

'সত্যি!' পার্থ হাসল এবং বলল, 'কাল প্রাচী হোটেল থেকে ফোনে যখন মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মজুমদারের জন্যে কটেজ রিজার্ভ কবতে বললাম, এরা নাম জিজ্ঞেস করল। পদবি ভাঁড়িয়ে বলে দিলাম পট্টনায়েক। ওরা সেটাই টুকে রেখেছিল মনে হচ্ছে। এখন অবশ্য নিজের পরিচয়টা ফিরে পেয়েছি—'

'আমি পাইনি—'

'কেন! মিসেস মজুমদার হতে ভাল লাগছে না?'

'একটুও না। তুমিও তো আমার পদবিটা নিয়ে মিস্টার ব্যানার্জি হতে পারতে!'

জিনা ঠাট্টাই করছে কিনা বুঝতে পারল না পার্থ। সামান্য গম্ভীর হয়ে উঠল মুখ।

'না গো!' জিনা আদুরে গলায় বলল, 'ভাল লাগছে। ভীষণ ভাল লাগছে—'

'এই যে—'। জিনার স্বরের আহ্লাদ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে পার্থ বলল, 'ওয়ান-ওয়ান—এইট—'

'বিউটিফুল! কিন্তু রিসেপশন থেকে অনেক দূরে—'

'বাঃ! লোনলি বললাম কী জন্যে!'

বেলবয় দরজা খুলে দিয়ে স্যুটকেসগুলো নিয়ে যাবার পর জিনাই ঢুকল আগে। ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল কোনটা কী। তারপর কটেজের পিছন দিকের দরজাটা খুলে পাঁচিলের বাইরে বহুদূর বিস্তৃত বালিয়াড়ি ও ঝাউবনের দিকে খানিক একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বলল, 'লাভলি! আমরা কিন্তু এদিকটাতেই বসব। সামনে নয়। চাঁদ উঠলে বিউটিফুল লাগবে—'

বলতে বলতেই লাফিয়ে উঠল জিনা। সরে এসে দেখল, কালো, ছোট বড় অসংখ্য ডেঁও পিঁপড়ে ঘোরাঘুরি করছে মেঝেয়। তারই একটা উঠে এসেছিল পায়ের পাতায়।

'বাব্বা! এত পিঁপড়ে কেন!'

'হয়তো গুড়ের স্বাদ পেয়েছে—'

হালকা গলায় কথাগুলো বলে জুতোর তলায় পিষে পিঁপড়ে মারতে ব্যস্ত হয়ে উঠল পার্থ।

'আ-হা!' জিনা বলল, 'মারছ কেন! কামড়ায়নি তো!'

'বালির জাগ্‌হা, মেমসাহেব। ইয়ে পিঁপড়া কামড়ায় না।' বেলবয় বলল, 'এয়ার কন্ডিশনার চালু কর দিয়া। ঘর বন্ধ্ রাখলে ঠাণ্ডা হবে—'

চলে যাবার জন্যে এগিয়ে গিয়েও থেমে দাঁড়াল লোকটি এবং বলল, 'আপনাদের চা, কফি লাগলে বলুন। টেলিফোনে রেস্টুরেন্ট চাইলেও ভেজ দেবে।'

'হ্যাঁ, কিছু একটা দরকার।' জিনা বারান্দা থেকে ঘরে এলে পার্থ জিজ্ঞেস করল, 'তোমাব খিদে পাচ্ছে না?'

'পাচ্ছে তো—'

পিছনের দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে পার্থ বলল, 'নাকি রেস্তোরাঁয় যাবে?'

'এখনই রেস্তোরাঁয় কেন!' বিছানায় বসে অভ্যাসে মুখে আঁচল বুলিয়ে নিল জিনা। ঘাম

নেই। মেশিনের ঠাণ্ডাও টের পাচ্ছে ক্রমশ। বলল, 'এখানেই দিতে বলো না! যা হোক, অল্প কিছু। আর কফি—'

পার্থ বেলবয়ের দিকে তাকাল। হিপ পকেট থেকে ওয়ালেট টেনে একটা দু টাকার নোট বের করে লোকটির হাতে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'নাম কেয়া তুমহারা?'

'সিকান্দার, সাব। আমি বাংলা বুঝি। মুর্শিদাবাদের লোক।'

'গুড। তুমি আনতে পারবে? টোস্ট, প্লেন ওমলেট আর কফি?'

'আমি বলে দিচ্ছি। রেস্টুরেন্টকা বেয়ারা দিয়ে যাবে—'

'কতক্ষণ লাগবে?'

'পনরা, বিশ মিনিট।'

জিনা বাথরুমে ঢুকছে। দরজা বন্ধ করল। সেই শব্দে কান রেখে পার্থ বলল, 'ঠিক আছে। বিশ মিনিটের বেশি যেন না হয়।'

'ও-কে, সাব। আভি বোল দেগা।'

সিকান্দারের সঙ্গে সঙ্গেই বেডরুমের পাশে ছোট বসবার জায়গাটা পেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল পার্থ। রাস্তার বাঁক ঘুরে ঘুরে লোকটা যেদিকে যাচ্ছে, তাকিয়ে থাকল সেদিকে। মেয়ে পুরুষ বাচ্চার একটি দল হেঁটে যাচ্ছে দোলনার পাশ দিয়ে। সুইমিং পুলটা দেখা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে আছে ওইখানেই। দলের বড় অংশটা পুলের দিকে আড়াল হযে যেতে নীল জিনস ও হলদে ব্লাউজ পরা ছোট চুলের যুবতীটিই দাঁড়িয়ে থাকল ওখানে, ক্যামেরা তুলে ধরল চোখের সামনে। ছবি তুলছে। হাত দুটো উঠে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছিমছাম স্বাস্থ্যের আদল স্পষ্ট হল। সম্ভবত বিবাহিতা নয়; বিবাহিতা হলে কোমর ও নিতম্বের ঢলেই ধরা পড়ত। নাকি ছেলেপুলে জন্মাবার পরই এটা হয়! গায়ত্রীর যেমন; পার্থ জানে না শরীর সম্পর্কে ও এত অচেতন কেন! বয়সে তারা কাছাকাছি হলেও এটাই কোনও স্ত্রীর বুড়িয়ে যাবার বয়স নয়। তুলনায় জিনা—, জিনাকে না জানলে, ওর শরীর ও স্বাস্থ্যের নিখুঁত ঢল দেখে কোনও দিনই বুঝতে পারত না ও বিবাহিতা। অসীম ব্যানার্জি নিশ্চিত তার চেয়ে বড় বয়সে, জিনাই বলেছিল একদিন, দুজনের বয়সের তফাত অনেকটা। লোকটা হিপোক্রিট, জিনার ওকে বিয়ে করা উচিত হয়নি। সম্ভবত তারও বিয়ে করা উচিত হয়নি গায়ত্রীকে। কিন্তু বুকের মধ্যে ঠেলে ওঠা নিঃশ্বাস চাপা দিতে দিতে পার্থ ভাবল, ইটস ট্যু লেট, কিছু করার নেই, এখন ওসব ভেবে লাভ কি!

টাইম ডাজ নট ওয়েট।

দলটা হারিয়ে গেছে। পার্থ দেখল, কটেজের গায়ে লাগানো হলদে-লালের ছোপলাগা একরকম ফুলের গাছের ভিতর থেকে দুটো রঙিন প্রজাপতি উড়ে গেল দূরে, সামনের সবুজের দিকে। পরস্পরের স্পর্শ বাঁচিয়ে ওখানে ওড়াউড়ি করছে আরও কয়েকটা প্রজাপতি। রোদ্দুর থেকে তাপ শুষে নিয়ে ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে নির্জনতা। জায়গাটা এক্সপেনসিভ এবং কোম্পানির অ্যাকাউন্টে এই টাকাটা পাওয়া না গেলেও, পুরী থেকে সরে এসে ঠিকই করেছে সে। এখানে কেউ তাদের খুঁজে পাবে না। জিনাকে খুশি রাখার পক্ষে এর চেয়ে ভাল জায়গা কি পাওয়া যেত!

'এই তোমার স্যুটকেসের চাবিটা দাও তো।' জিনা পাশে এসে দাঁড়াল, 'জামাকাপড় বদলাবে তো?'

খুব ঘন চোখে জিনাকে দেখল পার্থ, যেন অপরিচিতা, যেন নতুন করে চিনছে। তারপর ট্রাউজার্সের পকেট হাতড়ে চাবিটা বের করে ওর হাতে দিয়ে বলল, 'সকালেই চেঞ্জ করে বেরিয়েছি—'

'তখন কি আমি ছিলাম!'

যেটুকু বলল তার চেয়েও বেশি আড়াল করে রাখল দৃষ্টিতে। ক' মুহূর্ত পার্থর চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে ভিতরে চলে গেল জিনা। মুখে, ঘাড়ে, জল দিয়েছে, ব্লাউজের ঘেরে খানিকটা অংশ ভিজে দেখে সেইরকমই অনুমান করল পার্থ, ওর চলে যাওয়ার শূন্যতাটাকে অনুসরণ করে দাঁড়িয়ে থাকল আরও কয়েক মুহূর্ত; দেখল, মেঝে জুড়ে ঘোরাফেরা করছে কয়েকটা ডেঁও পিঁপড়ে, ঠিকঠাক ভাবলে ভঙ্গিতে দিশেহারা—যেদিক থেকে আসছে সেদিকেই ফিরে যাচ্ছে, কিছুটা যেতে না যেতেই ঘুরে আসছে আবার। এসব দেখতে দেখতে নিজেও ভিতরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল পার্থ। আগে যা ভেবেছিল তারই জের টেনে ভাবল, জিনার মুখে অসীম কয়েকদিনের জন্যে কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করতে যাবে শুনে এভাবে দুজনে অন্যত্র কোথাও চলে যাবার পরিকল্পনা তারই মাথায় এসেছিল, জিনাকে বলতে সেও রাজি হয়ে গেল, তার পরের ব্যাপারগুলো ঘটে গেছে দ্রুত ও পর পর। কিন্তু এখন, একান্ত হয়ে ভাবতে গিয়ে বুঝতে পারল না এ সবের আদৌ কোনও দরকার ছিল কি না, যদি থাকে তা-ই বা কেন, জিনাই বা এক পায়ে নেচে উঠল কেন।

জিনা বিছানায় বসে, চাবির রিং তখনও আঙুলে আটকানো, এমনই ভঙ্গি যেন চাবিটা কী উদ্দেশ্যে এনেছিল এখন আর তা মনে নেই। একটু আগে, বাইরে, যেভাবে তাকিয়েছিল তার দিকে, দৃষ্টি তার চেয়ে ঘন। প্রায় অন্যমনস্ক, কী যেন আছে ওই দৃষ্টিতে। পার্থর দিকে তাকাতে অস্পষ্ট হাসিতে ভাঁজ পড়ল ঠোঁটের কোণে। পার্থর মনে হল ওর মুখের ত্বকের ফরসা রঙে ছড়িয়ে পড়ছে অন্য একরকম আভা। সেটা ভিতরের কোনও চিন্তায়, নাকি ঘর ও বাইরের আলোর তারতম্যজনিত কারণে, তা বোঝা যায় না ঠিক।

'এমনভাবে দেখছ—', মাঝখানে থেমে কথাটা শেষ করল জিনা, 'যেন আগে কখনও দ্যাখোনি!'

বলার সঙ্গে সঙ্গে হাতদুটো পিছনে ঠেলে এলানো ভঙ্গি আনল শরীরে।

'দেখেছি কি!' পার্থ বলল, 'তাহলে নতুন লাগছে কেন!'

'ভয়ে।'

'কেন!'

'দেখছি তো! বাইরে এমন ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে ছিলে যেন আমি কেউ নই!'

'এখন?'

যেখানে ছিল সেখান থেকে এগিয়ে এসে পার্থ ওর কাঁধদুটো চেপে ধরতেই সামনে ঝুঁকে এল জিনা; মাথার চুলে পার্থর মুখের স্পর্শ পেয়ে হাত বাড়িয়ে আকর্ষণ করল ওকে। শরীরই কথা বলছে। মুহূর্তের মধ্যে কপালে, তারপর ঠোঁটে পার্থর ঠোঁটের স্পর্শ অনুভব করতে করতে চোখবন্ধ নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিল সে, প্রায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে পা দুটো মেঝে থেকে তুলে নিল খাটের ওপরে। শরীর জুড়ে পার্থর শরীরের ভার; নিজের তৎপর হাতে পার্থর সার্টের বোতাম খুলে ওর বুকের মাংস ও রোমে নিজের মুখ রেখে বুঝতে পারল অধৈর্য হয়ে উঠেছে পার্থ, তাকে তার মতো হতে দিচ্ছে না। বালিশের ওপর তার মাথাটা ঠেসে ধরে

চুম্বনে আত্মহারা, অসহিষ্ণু হাতের দ্রুত ব্যবহারে ব্লাউজ-ব্রা'র বাধা থেকে উন্মুক্ত করে আনল তার বুক; ঠোঁটের উষ্ণতা এখন সেখানে ঘোরাফেরা করে যথেচ্ছ শুষে নিচ্ছে তাকে। প্রচণ্ড সেই অনুভূতির অন্ধকারে ডুবে যাবার আগে মুহূর্তের বিরতি থেকে পার্থকে আরও সক্রিয় হতে সাহায্য করল জিনা। সর্বাঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে শিহরন—নিজের মাথা পিছে ঠেলে পার্থর মাথাটাকে দু হাতে নিজের বুকে চেপে ধরে শরীরের ভিতরে জেগে ওঠা চিৎকার স্তব্ধ করে রাখতে আলতো দাঁতে পার্থর কাঁধ কামড়ে ধরল জিনা। সেই মুহূর্তের উন্মাদনায় মনে হল পিছনের বালিয়াড়িতে ঝড় উঠে আছড়ে পড়ছে দরজায়, ধাতব ধ্বনির মতো কিছু একটা বাজছে কানের কাছে; শব্দটা কাছে আসতে আসতেই মিলিয়ে গেল দূরে। সময়ও স্তব্ধ। পার্থর আগ্রহ পাগল হয়ে উঠতে এপাশে ওপাশে মাথা ছুড়ে এতক্ষণ চেপে রাখা চিৎকারটাই আবেগে অস্ফুট করে তুলল সে, প্রায় অচেতনের মধ্যে মনে হল অসীমের সঙ্গে ন' বছরে যা হয়নি—এর আগে একদিন ফ্ল্যাটের গোপনেও যা হয়নি, অনাস্বাদিত অনুভূতির মধ্যে এখন তা-ই হতে যাচ্ছে। সম্ভবত এবারই সে অন্তঃসত্ত্বা হবে।

পার্থ উঠে যেতে চাইলেও ওকে উঠতে দিল না জিনা। চোখ বন্ধ করে নিজের বুকের ওপরেই ধরে রাখল ওকে। বাঁ পায়ের গোড়ালি থেকে চেটোর দিকে হেঁটে যাচ্ছে শিরশিরে একটা অনুভূতি—সম্ভবত পিঁপড়ে, পা-টা অল্প নাড়তেই খসে পড়ল সেটা। নিঃশ্বাস সহজ হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের আলস্য ছড়িয়ে যেতে চাইছে সর্বাঙ্গে। একই সময়ে, অনধিকার প্রবেশের মতো, প্রশ্নটা ফিরে এল মাথায়, এটা কি ঠিক? একবারের ভুল পরের বারের ইচ্ছায় অবৈধ হয়ে ওঠে না কি? যদি এমন হয় যে এইভাবেই অনেকক্ষণ শুয়ে থাকল তারা, অবৈধের ভাবনা থেকে বিষটিষ খেয়ে এইভাবেই মরে গেল দুজনে, তাহলে অনেকক্ষণ পরে সন্দেহবশত দরজা ভেঙে যারা ঢুকবে, এই অবিন্যস্ত, লজ্জাকর দৃশ্য দেখে নিশ্চিত অস্বস্তিতে পড়বে তারা, কিন্তু সে কিংবা পার্থ দুজনের কেউই তা জানতে পারবে না। কটেজ থেকে তাদের বডি সরিয়ে নিয়ে যাবার আগে পুলিশ ছবি তুলবে হয়তো, ঠিক এই পোজে, সে-ছবি কি চোখে পড়বে অসীম বা গায়ত্রীর? কী ভাববে ওরা। এভাবে মরে না গিয়ে যদি সরাসরি বিদেয় হত দুটোতে, বিয়ে করত, তাহলে এতটা অস্বস্তিতে পড়তে হত না। পার্থ কি—

জিনার ভাবনার মধ্যেই হঠাৎ মাথার কাছে ছোট টেবিলে রাখা টেলিফোনটা বেজে উঠল। পার্থ ছটফট করে দাঁড়িয়ে উঠতে জিনাও উঠে বসল, বেআব্রু পার্থর দিকে চকিতে তাকিয়ে কিছু বা অস্বস্তিতে আঁচলে বুক জড়িয়ে ব্যস্ত হল শাড়ি গোছাতে।

'নিশ্চয়ই রিসেপশনিস্ট।' রিসিভার তোলার আগে পার্থ বলল, 'এক ঘণ্টা হয়ে গেল না কি।'

ওদিকে কে কী বলছে জিনা বুঝতে পারল না। পার্থকে না দেখে, ওর কথায় কান রেখে, খাট থেকে নামতে নামতে পার্থর গলা শুনল, 'সরি। ভেরি সরি। হাম শো গিয়া থা। প্লিজ সেন্ড হিম নাও।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে পার্থ বলল, 'কী কাণ্ড। ইটস অ্যাবসোলিউটলি সিলি।'

'কী হল।'

'রেস্তোরাঁ থেকে ফোন করছে। বেয়ারা কফি নিয়ে এসে ওয়েট করে ফিরে গেছে। কী আশ্চর্য, বেল শুনতে পেলাম না।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জিনা। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুলে চিরুনি চালাতে

চালাতে আয়নার ভিতর দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল পার্থকে, শুধু ওর ট্রাউজার্স ধরা হাতটাই চোখে পড়ল। তখন ঠাট্টার গলায় বলল, 'নিজের ওপর কন্ট্রোল কি এই প্রথম হারালে?'

৪

সময় যে কীভাবে কাটছে তা ভাবতে গেলে ছমছম করে গা। এক ধরনের শিহরন যেন সারাক্ষণই ঘিরে রেখেছে জিনাকে, কখনও আশঙ্কায় ও সন্দেহে, কখনও বা আহ্লাদে। কেন'র উত্তর খুঁজলে ঠিকঠাক কারণ খুঁজে পায় না সে। বরং কোনও কারণে পার্থ যখন তার সামনে নেই, কিংবা, থাকলেও, নিজের মধ্যেই সে হয়ে পড়েছে একা, সেসব মুহূর্তে নিজেকে ঘাঁটাঘাঁটি করে মনে হচ্ছিল আশঙ্কাই যেন তাকে ঠেলে দিচ্ছে আরও বেশি আহ্লাদের দিকে। এমনও মনে হচ্ছে যে, সম্পর্ক একটা অভ্যাস; যখন যার সঙ্গে থাকা তাকে মেনে নিতে পারলে মনে হয় সে-ই সব। যেমন পার্থর সঙ্গে তার এই সম্পর্ক। কলকাতায় যতটা বাধো বাধো ছিল, পারস্পরিক জানাজানির মধ্যেও ছিল আড়াল ও নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা, এমনকী এখানে পৌঁছেও প্রথম দিনের অনেকটা সময় সহজ হবার চেষ্টার মধ্যেও যে-সন্দেহ ঘিরে রেখেছিল তাকে, দেখতে দেখতে পিছনে পড়ে গেল সেসব। ট্রেনে যেতে-যেতে যেমন হয়—সামনের দৃশ্য এসে হারিয়ে দেয় পিছনের দৃশ্যগুলিকে।

অসীমকেও মনে পড়ছিল এইভাবে। মাঝে মাঝেই ছুঁয়ে যাচ্ছিল ভয়। কিন্তু যতটা তীব্রতায় এসব হবার কথা ততটা নয়। বরং খারাপ লাগছিল আবার ফিরে যেতে হবে ভেবে। জিনা জানে না, অনুমানও করতে পারছিল না, আর কত দিন দুই সম্পর্কের দোলায় দুলতে হবে তাকে।

তবে একটা বিষয়ে সে এখন নিশ্চিত। বৈধ, অবৈধ নিয়ে এত দিন সে যা ভেবেছে তা আপেক্ষিক ধারণা মাত্র। তার জীবনটা তার নিজের; একজনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে বলেই নিজেকে বঞ্চিত করে তার জের টেনে যেতে হবে সারা জীবন, তার কী মানে আছে! আর, এ নিয়ে যা কিছু বোঝাপড়া তা অসীমের সঙ্গেই হবে, তার বাড়ির লোকজন কিংবা অসীমের আত্মীয়-স্বজন কী ভাবল তাতে কিছু যায় আসে না।

পার্থও এভাবে ভাবছে কি না জানে না। তবে এরই মধ্যে পার্থর পরিবর্তন লক্ষ করছিল জিনা। গায়ত্রী ও তার ছেলেমেয়ে সম্পর্কে ওর আগ্রহ যেন কমে গেছে আরও। স্টেশন থেকে বাসে আসতে আসতে যে-কথাগুলো বলেছিল—গায়ত্রী খুব ডিভোটেড, ইত্যাদি—বলার ধরনে জিনার হঠাৎই মনে হয়েছিল যে এরকম বলতে পারে, এমনকী বাইরে এসে, তাকে পাশে রেখেও, তার ওপর কতটা নির্ভর করা যায়! পরে আর তেমন বলেনি।

বরং সেদিনই, শরীর নিয়ে খ্যাপামো করতে গিয়ে রেস্তোরাঁর বেয়ারা ফিরে যেতে একটা বিতিকিচ্ছিরি অবস্থা সৃষ্টি হবার পরেও নুলিয়া সঙ্গে নিয়ে হোটেলের জিপে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের নির্জন বিচে চলে গিয়েছিল তারা। বালির ওপর পাতা সতরঞ্চির ওপর বড় ছাতার নীচে বসে, সামনে দুরন্ত সমুদ্র, পিছনে সারিবদ্ধ ঝাউয়ের ঘন দেয়াল, আশপাশে কোথাও কেউ নেই পরিবেশের দিকে তাকিয়ে পার্থ বলেছিল, 'মনে হচ্ছে না বিলিতি

ম্যাগাজিনের ছবিতে যেমন দেখা যায়—হাওয়াই বা বাহামা-র মতো জায়গাটা?'

'ছবি ছবির মতোই দেখতে হয়—।' জিনা তখনও তার স্কিন-কালার টু-পিসের লজ্জা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। শুধুই নীল শর্টস পরা পার্থর গা ঘেঁষে বসে ওর খোলা পিঠে আঙুলের দাগ কাটতে কাটতে বলেছিল, 'আমার এখানেই ভাল লাগছে—'

'বিদেশে গেছ?'

জিনা মাথা নাড়ল।

দূরে, নেমে যাওয়া ঢেউয়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে নুলিয়াটা। একটু আগে ওরা যখন বিচে এসে পৌঁছুল, তখন পিঠে রাইফেল নিয়ে খাঁকি-পরা এক লম্বা, তামাটে চেহারার পাহারাদার এসে সেলাম ঠুকেছিল পার্থকে, বলছিল সামুদ্রিক কচ্ছপের চাষ দেখাবে, পাঁচ টাকা বখশিস পেয়ে বশংবদ ভঙ্গিতে নেমে এসেছিল এই পর্যন্ত। তারপর নুলিয়ার সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কী কথা বলে সেই যে উধাও হল লোকটা, তাকেও আর দেখা যাচ্ছে না। হয়তো উঁচু পাড়ের দিকে আছে কোথাও। তাদের নামিয়ে দিয়ে চলে গেছে জিপটা, ফিরবে ঘণ্টাখানেক পরে। এটা প্রোটেকটেড এরিয়া; দু ধারে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে রাস্তায় ঢোকার মুখে দেখেছিল কাঁটাতারের উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা চারদিক। এখানে ভয় পাবার কিছু নেই। তবু, নির্জনতার নিজস্ব ভয়ে ভিতরে ভিতরে কুঁকড়ে যাচ্ছিল জিনা। অদূরে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে বিপর্যস্ত ফেনা তুলে মাঝে মধ্যেই ফুঁসে ওঠা ব্রেকারের প্রচণ্ড গর্জন আরও সন্ত্রস্ত করে তুলছিল, পার্থর স্পর্শ থেকে সরাতে পারছিল না নিজেকে। এর মধ্যে একবার সমুদ্রে নেমেছিল পার্থর সঙ্গে, অল্প দূর গিয়ে কোনও রকমে মাথা ভিজতে না ভিজতেই উঠে এসেছে। ভয়েই। পার্থকেও যেতে দেয়নি আর। সমুদ্রের হাওয়ায় জল শুকিয়ে গেলেও এখনও নুন-নুন অনুভূতি লেগে আছে সর্বাঙ্গে।

'অসীম ব্যানার্জি তো অনেকবার বিদেশে গেছে শুনেছি—', আগের কথার জের টেনে পার্থ বলল, 'কখনও যাওনি সঙ্গে?'

'সে নিজের কাজে যায়—'

'দ্যাটস ব্যাড।' পার্থ বলল, 'আমিও অবশ্য যাইনি কখনও। তবে—'

'কী?'

'চলো। সামনের জুনে ঘুরে আসি। আই হ্যাভ এনাফ ফর দা টু অফ আস। টাকা জমিয়ে কী হবে!'

জিনা ভাবল এটা কথার কথা, পার্থ সিরিয়াস নয়। ঠাট্টা করে বলল, 'বাব্বা! এত! গায়ত্রী ছাড়বে?'

'গায়ত্রী।' পার্থ জিনার দিকে মুখ ফেরাল। সামান্য ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি বোধহয় ওদের ভুলতে পারছ না!'

পার্থর কথার আকস্মিকতা থেকেই চট করে নিজেকে মুক্ত করতে পারল না জিনা। সময় নিয়ে বলল, 'তুমি কি পেরেছ?'

'না পারলেও পারব। কেন বুঝতে পারছ না, আমাদের ফেরার রাস্তা নেই!'

কোনও জবাব দেবার আগেই ওর কাঁধের ওপর ঝুঁকে আসা পার্থর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেল জিনা। কোমরের ওপর ওর হাতটা এগিয়ে আসতে সরে গিয়ে কৌতুকের গলায় বলল, 'হোটেলে ফেরার রাস্তা তো আছে! যখন-তখন এরকম! দ্যাখো, লোকটা বুঝতে পেরেছে,

দেখছে—'

পার্থ নিজেকে সংযত করে নিল। সামনে তাকিয়ে দেখল তীর ঘেঁষে ঘোরাফেরা করতে করতে নুলিয়াটা কখন চলে এসেছে এদিকে। দূরত্ব একশো গজের বেশি নয়। ওখানে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে তাদেরই দিকে। তখন বিরক্ত গলায় বলল, 'সারাক্ষণ কেউ না কেউ ওয়াচ করছে আমাদের। কখনও অসীম ব্যানার্জি, কখনও গায়ত্রী। এই নুলিয়াটাও—!'

ওর কথার ধরনে নিজেকে সামলাতে পারল না জিনা। হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বলল, 'বেশ হয়েছে! আরও পাগলামি করো!'

সে হাসলেও পার্থ হাসল না। এক মুহূর্ত কিছু ভেবে হাতছানি দিয়ে ডাকল নুলিয়াটাকে। লোকটা কাছে এলে বলল, 'এই, কী নাম তোমার?'

'সুবল, বাবু।'

'বেশ ভাল নাম। রোজ সমুদ্রে নামো?'

'হাঁ, ট্যুরিস্ট টাইমে রোজই হয়। আপনাদের মতো সাহেব মেমসাহেবরা আসে, সমুন্দরে নিয়ে যাই। দশ বিশ টাকা পাই।'

'কত দূর যেতে পারো সমুদ্রে?'

'অনেক দূর, বাবু। যাবেন আপনি?'

জিনা এইসব কথাবার্তার কিছুই বুঝতে পারছিল না। বাধা দিয়ে বলল, 'এই, তোমার মতলবটা কী!'

'আছে, বলছি!' পার্থ লোকটার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, যাও, যতটা পারো গিয়ে দেখাও। আমিও টাকা দেব।'

ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আঁচ করবার চেষ্টা করল লোকটা। তারপর বলল, 'বিশ টাকা দেবেন বাবু। বহুত দূর যাব—'

'ঠিক আছে। তাই হবে।'

জিনা দেখল, সত্যিই সমুদ্রের দিকে এগোচ্ছে লোকটা। একটা বড় ঢেউয়ের ঝাপটা সামলে পিছনে তাকাল, তারপর এগিয়ে গেল আরও অনেকটা। আকস্মিক ব্রেকারের ধাক্কায় মুহূর্তের জন্যে হারিয়ে গিয়েও ভেসে উঠল আবার। ভঙ্গি দেখে মনে হয় অনেক দূর যাবে।

চোয়াল শক্ত করে পার্থ বলল, 'টাকা খরচ করতে পারলে সবই কেনা যায়—'

'এমনিই দিতে পারতে ওকে।'

'এমনিই তো দিলাম।' সামান্য দূরে সরে থাকা জিনার গায়ে-গায়ে এসে পার্থ বলল, 'এখন আর কেউ দেখছে না—'

'না। এখানে নয়—', ওকে নিরস্ত করার চেষ্টা করে জিনা বলল, 'ঘরেই তো পাচ্ছ!'

পার্থ তবু জোর করল। বালির নরমে জিনাকে ছড়িয়ে দিয়ে ওর চিবুকের নীচে, গলায়, তারপর ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে রাখল কিছুক্ষণ। নিঃশ্বাস সামলে জিনা আবার চোখ খুলতে, বলল, 'ঘরেরটা আমাদের ছিল, এখন তুমি গায়ত্রী, আমি অসীম ব্যানার্জি—, ওরাও শোধ নিক।'

'এমন ওয়াইল্ড হয়ে পড়ছ কেন!' নিজের শরীরে পার্থর শরীরের চাপ অনুভব করে অস্বস্তিতে নড়ে উঠে নিজেকে মুক্ত করবার চেষ্টা করল জিনা। শঙ্কা মেশানো গলায় বলল, 'প্লিজ! এখানে নয়। চলো, ফিরে যাই এবার—'

পার্থ শুনল না।

নতুন করে বাধা দেবার চেষ্টায় জিনা অনুভব করল, টু-পিসের আবরণ কোনও আবরণই নয়, বাধা দিতে গিয়েও জোর পাচ্ছে না। বরং নড়াচড়ার মধ্যেই শরীর থেকে উঠে আসছে জ্বরগ্রস্তের তাপ, পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত বালিতে বিজবিজ করা ফেনার মতো শীত ঢুকে পড়ছে শরীরে। সেই অনুভূতিতে সংশ্লিষ্ট হতে হতে ঠোঁট কামড়ে ধরল সে। আবেগের গলায় বলল, 'আমি ফিরব না। আমি এখানেই থেকে যাব—'

এমনিতে কিছু নয়; তাছাড়া পুরুষমানুষ হঠৎ-হঠাৎই কতটা অশান্ত হয়ে উঠতে পারে তা সে নতুন চিনছে না। তবে, বিচের ঘটনাটা মাঝে মাঝেই ফিরে আসছে মনে, কিছুতেই ভুলতে পারা যাচ্ছে না, ওই ঘটনার পরের ঘটনার জন্যে।

পার্থকে বাধা দেবার চেষ্টায় হাত-পায়ের অসাড়তা থেকে নিজেকে বিকলাঙ্গ লাগছিল কেমন। বস্তুত, বেশ কিছুক্ষণ খেয়াল ছিল না কী হচ্ছে না হচ্ছে, এমনকী জায়গাটা কোথায়! উঠে বসার পর দেখল নুলিয়াটা ফিরে এসে দাঁড়িয়ে আছে তীরের কাছে— তাদের দিকে তাকিয়ে বালি ঠেলছে দু পায়ে, আক্রমণের আগে ক্ষিপ্ত ষাঁড় যেমন করে। কখন ফিরে এল সমুদ্র থেকে!

জিনার সন্দেহ হল লোকটা আগাগোড়া লক্ষ রেখেছিল তাদের ওপর, বেশি দূর যায়নি। লজ্জায় চোখে জল এসে গেল তার। ঠোঁটে দাঁত বসিয়ে বলল, 'ছিঃ! লোকটা কী ভাবল!'

নিজের বিব্রত ভাব লুকোতে পারল না পার্থ। ঈষৎ থমকানো ভঙ্গিতে তাকে লক্ষ করতে করতে বলল, 'লোকটা টোটালি আননোন। কী দেখল, কী ভাবল তাতে আমাদের কী যায় আসে!'

'তা বলে নিজেদের এভাবে—'

জিনা কথাটা শেষ করল না। হঠাৎ মনে হল কেউ এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। চকিতে তাকিয়ে দেখল এতক্ষণ অদৃশ্য হয়ে থাকা পাহারাদারটা এগিয়ে আসছে। বড় তোয়ালেটা টেনে তাড়াতাড়ি গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বুকের কাছে মুঠো করে চেপে ধরল জিনা।

তার ওপর থেকে চোখ সরিয়ে, কাছে এসে, পার্থকে লক্ষ করে লোকটা বলল, 'সাব, জিপ আ গয়া—'

ক্রমশ মুখের ভাব বদলে যাচ্ছে পার্থর। সতরঞ্চির ওপর পড়ে থাকা রিস্টওয়াচটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে বলল, 'এতনা জলদি! এখনও তো—'

'না হোক। এখানে আর না—।' জিনা বলল। গা থেকে তোয়ালে ফেলে ব্যস্তভাবে কাফতানটা খুঁজে শরীর ঢাকতে ঢাকতে উঠে দাঁড়াল। ওর দেখাদেখি পার্থও। রাগ, না ভয়, ওর মুখ দেখে চট করে তা বোঝা যায় না।

নুলিয়াটা ইতিমধ্যে এগিয়ে এসেছিল সামনে। ওদের তাড়াহুড়ো করতে দেখে বলল, 'আর নামবেন না সমুন্দরে?'

'না।'

ওয়ালেট খুলে টাকা বের করছিল পার্থ। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে দেখে নুলিয়া বলল, 'আমাকে ত্রিশ টাকা দেবেন, বাবু। অনেক দূর গেলাম। অঙ্গে জ্বালা ধরি গেল। ওই গার্ডকেও কুড়ি টাকা দিন।'

'ওকে তো দিয়েছি আগে!'

' সাব, উয়ো তো বখশিস থা।' পিছন থেকে ঘুরে, সামনে এসে নুলিয়ার পাশাপাশি দাঁড়াল পাহারাদার, 'ইয়ে প্রোটেকটেড এরিয়া হ্যায়। আপলোগকা কোই তকলিফ নেহি হুয়া—'

ওদের হাবভাব দেখে পার্থর গায়ে গায়ে সরে এসে জিনা বলল, 'যা চায় দিয়ে দাও। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না!'

পার্থ আর কিছু বলল না। ওরা যেমন চেয়েছিল তেমনি, গুনে গুনে বের করে দিল টাকা। চোয়ালের কাঠিন্য এখন আগের চেয়ে বেশি। সেইভাবেই, চলে যাবার জন্যে গোছাতে লাগল নিজেকে।

সামনে পাহারাদার। পিছনে গোটানো ছাতা, সতরঞ্চি ও তোয়ালে নিয়ে নুলিয়াটা। ওদের মাঝখানে, পার্থর পিছনে পিছনে, বালিতে পা টেনে টেনে এগোতে এগোতে, অদ্ভুত আত্মগ্লানিতে কান, মুখ জ্বালা করতে লাগল জিনার। মনে হচ্ছে পার্থর সঙ্গে নয়, ওই লোকদুটির সঙ্গেই কিছু হয়ে গেল তার। পার্থর জন্যে, শুধু পার্থর জন্যেই এমন হল। টাকা খরচ করতে পারলে সবই কেনা যায়—, একটু আগে বলেছিল ও, টাকা বের করেই আপাতত শান্ত করল লোকদুটিকে। কিন্তু অপরিচিত, প্রায় বন্য ওই লোকদুটির সামনে তাকে এভাবে বেআব্রু করার অধিকার কে দিল পার্থকে? নাকি পার্থ ভেবে নিয়েছে, ট্রেনের টিকিট জুগিয়ে নিয়ে এসেছে তাকে, রাখছে দামি হোটেলের আরামে—এগুলোও টাকা খরচের ব্যাপার, 'এক্সপেনসিভ', সুতরাং তাকেও সে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে। এই কি ভালবাসা! তাহলে অসীম ব্যানার্জির সঙ্গে এর তফাত কোথায়। সেও তো বলত 'ইউ হ্যাভ এভরিথিং—', যেন অসীমের বোঝা এভরিথিং-এর বাইরে জিনার কিছু পাওয়ার নেই, চাওয়ারও নেই; শুধু দেখিয়ে যেতে হবে এসবের মধ্যে সে কত তৃপ্ত, খুশি, পরিপূর্ণ।

হোটেলে ফেরার পরেও আত্মগ্লানির ভাবটা ছুঁয়ে থাকল জিনাকে। পার্থকে বলল না কিছু, নতুন কোনও অনুযোগও করল না। শুধুই নিজের ভিতরের স্তব্ধতা থেকে বিমর্ষ হয়ে উঠল ক্রমশ।

এখানে এসে কি ভুল করল! ফিরে যাবে? একা? শ পাঁচেক টাকা সেও সঙ্গে এনেছে। ওই টাকায় টিকিট কিনে আজই চড়ে বসা যায় কলকাতার ট্রেনে। কিন্তু টিকিট পাবে কী করে, ওটার ব্যবস্থা যে পার্থই করছে! অবশ্য তেমন দরকারে যে-কোনও একটা কামরায় উঠে দাঁড়িয়ে কি বসে যেতে পারে। একটাই তো রাত, দেখতে দেখতে কাবার হয়ে যাবে। এমন কতজনই তো যায়! কিন্তু, তারপর? ইতিমধ্যে যে-ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে, তাতে পার্থ নিশ্চিত বুঝতে পারছে এটা কলকাতায় ঘটে যাওয়া একদিনের হঠাৎ কোনও ব্যাপার নয়—ওখানে যা হয়েছে হোক, নির্দ্বিধায় এখানে চলে আসার মধ্যে দিয়েই জিনা বুঝিয়ে দিয়েছে পার্থকে পাবার জন্যে সে বেপরোয়া, সুতরাং পার্থরও অধিকার আছে তার ওপর! যদি সেই অধিকার কলকাতায় ফিরেও খাটাতে চায় পার্থ। এমনকী হতে পারে যে, জিনা সম্পর্ক রাখতে চাইছে না বুঝে পার্থ নিজেও বেপরোয়া হবে এবং শোধ তোলার জন্যে কোনও-না-কোনও ভাবে অসীমকে জানিয়ে দেবে সবকিছু? তখন নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্যে অসীম হয়তো চড়াও হবে না পার্থর ওপর, কিন্তু তাকে কি ছেড়ে দেবে? যদি সেরকম কিছু হয়—অসীমই ডিভোর্স করে তাকে, তাড়িয়ে দেয়, তাহলে সে যাবে কোথায়?

পার্থর সঙ্গে সঙ্গে থেকেও গোটা দুপুরটা পার্থর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কাটাল জিনা। সমুদ্র-ফেরত কটেজের বাথরুমে ঢুকে শরীরের ক্লেদ—নিজেকে ক্লেদাক্তই লাগছিল এখন—ধুয়ে ফেলতে ফেলতে আয়নায় তাকিয়ে মূক হয়ে থাকল কিছুক্ষণ, ঠোঁটদুটো কেঁপে উঠল স্বগতোক্তিতে। পান পাতা গড়নের মুখের ওপর এঁকে বসানো কপাল, ভুরু, চোখ, নাক, ঠোঁট, চিবুকের মাপা সৌন্দর্য থেকে লম্বা গলা বেয়ে এখনও নিষ্কম্প যৌবন নেমে গেছে নির্মেদ পাঁচফুট পাঁচ ইঞ্চি শরীরের পায়ের পাতা পর্যন্ত। ত্বকের কোথাও ভাঁজ পড়েনি এতটুকু। কিন্তু কোন দাম সে নিজেই দিয়েছে এই সৌন্দর্যকে! কিসের বিনিময়ে! বাথরুম থেকে বেরিয়েও মনে হচ্ছিল মনের সায় থেকে বিচ্ছিন্ন এই শরীর শুকিয়ে যাবে ক্রমশ, কিংবা শুধুই উদাসীন পড়ে থাকবে পার্থ কিংবা অসীমের শরীরের অবাধ্য খিদে মেটানোর জন্যে। ভালবাসা ভেবে একদিন স্বেচ্ছায় যা দিতে চেয়েছিল পার্থকে, এমনকী আজ সকালেও ভেবেছিল এই দেওয়াই তাকে ফিরিয়ে দিচ্ছে আকাঙ্ক্ষিত পূর্ণতায়, এভাবে হঠাৎ তা শূন্য হয়ে গেল কেন! কেন মনে হচ্ছে পার্থ একাই নয়, বিচের ওই লোকদুটিও যথেচ্ছ নাড়াচাড়া করেছে তাকে নিয়ে—ওইখানেই মরে পড়ে থাকলে ভাল হত! অসীম তাকে আর কিছু না দিক, দিয়েছিল নিরাপত্তা। সেই নিরাপত্তা থেকে এ কোন আশায় আত্মঘাতী হয়ে উঠল সে!

পার্থর সঙ্গে একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় গিয়ে অল্পই মুখে দিল জিনা। অরুচি থেকে স্বাদ পাচ্ছিল না জিবে।

দৃষ্টি ফেরানোর জন্যে জানলা আছে। দৃশ্যেই ঘটে যাচ্ছে দৃশ্যান্তর—অবোধ একটি শিশুকে কাঁধে ফেলে গোলাপ ঝাড়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে হালকা সবুজ সালোয়ার কামিজ পরা এক যুবতী, বেসামাল দোপাট্টা ঝুলে পড়েছে একদিকে, কাঁধে মাথা রেখেই যুবতীর পিছনে ছোট্ট হাত তুলে ঘোরাচ্ছে শিশুটি। গোল-গলা, সাদা গেঞ্জির বুকে লাল হার্টের ছবি ছাপা পোশাকের একটি লম্বা, স্বাস্থ্যবান যুবক এগিয়ে এসে নাড়িয়ে দিল সেই হাতটি। ওরা ফ্রেমের ভিতর থেকে সরে যেতে চড়া রোদে ঢেকে গেল জায়গাটা।

হঠাৎই উঠে আসা নিঃশ্বাস চাপা দেবার জন্যে নড়েচড়ে বসতে চোখাচোখি হল পার্থর সঙ্গে, চোখ নামি য়ে প্লেটের অবশিষ্ট খাবারটুকু শেষ করার ভান করল জিনা। পার্থ অস্বস্তি বোধ করছে দেখেও সাড়া দেবার প্রয়োজন বোধ করল না। ওর সঙ্গেই চুপচাপ উঠে এল রেস্তোরাঁ থেকে, আশপাশের অন্য টেবিলে বসে থাকা অস্পষ্ট মুখগুলির দিকে তাকিয়ে। কটেজে ঢুকল। গ্লানির সঙ্গে শারীরিক ক্লান্তি মেশা আচ্ছন্নতায় সর্বস্বান্ত লাগছিল নিজেকে। পাশাপাশি দুটি বেডের একটিতে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়তেও দেরি হয়নি।

ঘুম ভাঙাল পার্থই। হাতে চায়ের কাপ। বলল, 'চা আনিয়েছি। খেয়ে নাও।'

'আনালে কেন!' জিনা হঠাৎ বলে ফেলল, 'দরকার ছিল না—'

চায়ের কাপটা হাতেই ধরে থাকল পার্থ। দৃষ্টি অপলক। পরে বলল, 'যা হয়েছে তার জন্যে ক্ষমা চাইছি। তোমার বোঝা উচিত, ওরকম একটা ব্যাপার ঘটবে তা আমি বুঝতে পারিনি।'

খানিক মুখ নিচু করে চুপচাপ বসে থাকল জিনা। এইমাত্র বলা কথাগুলো ধ্বনিসমেত ফিরিয়ে আনতে আনতে ভাবল, এর পরের কথাগুলো সে খুঁজে পাচ্ছে না কেন! তাহলে কি পার্থ সম্পর্কে ভুল ধারণা করেছিল সে! পার্থ যেভাবে ভাবছে তারও কি সেইভাবেই ভাবা উচিত নয়?

তবু, মনের মধ্যে এতক্ষণ জমে থাকা বিক্ষোভটা চাপা দিতে পারল না সে।
'যে তোমার স্ত্রী হবে, তাকে একটু আলাদা করে ভাবো না কেন!'
'ক্ষমা চাইলাম। আর কী বলব!'
কথা এগোয়নি। তবে এরপর নিজেকে গুটিয়েও রাখতে পারেনি জিনা।
পিছনের বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে বহু দূর বিস্তৃত বালিয়াড়ির ওপর নরম হয়ে আসা রোদের দিকে তাকিয়ে চা খেতে খেতে পার্থ বলল, 'চট করে তৈরি হয়ে নাও। পাঁচটা নাগাদ বাস যাবে পুরীর দিকে। ওখানের সি-বিচে লোক গিজগিজ করে—আমাকে ভয় করবে না—'
পার্থ সম্ভবত ভুলতে পারছে না নিজেকে। ইচ্ছে করেই শেষের কথাগুলো এড়িয়ে গেল জিনা। বলল, 'ওই লোকের ভিড়ে! যদি কেউ চিনে ফেলে!'
'ফেললে ফেলবে।' পার্থ বলল, 'যা সত্যি তা-ই ভাববে।'
'তোমার কাজিন না কে এসেছে বলেছিলে—'
'দে ডু নট ম্যাটার। তাছাড়া আমরা যখন পৌঁছুব, ওরা তখন স্টেশনে। কলকাতা যাবার ট্রেনটা সন্ধে নাগাদ ছাড়ে—'
এসব মনে পড়লে সন্দেহ হয় নিজেকে নিয়েই।
আরও কিছুক্ষণ পরে, হোটেলের বাসে আরও পাঁচ ছ'জন যাত্রীর সঙ্গে পুরীর দিকে যেতে যেতে জিনা ভেবেছিল, সম্ভবত তার নিজের মনেই আছে স্ববিরোধ, তা না হলে উল্টোপাল্টা ভেবে চার পাঁচঘণ্টা সময় নষ্ট করল কেন!
যার সঙ্গে যাচ্ছে, পাশে বসে, গায়ে গা লাগিয়ে, আপাতত মিটমাট হয়ে গেলেও সে কি ভাববে না, পারস্পরিক অন্তরঙ্গতার মধ্যেও তাদের মাঝখানে আছে গভীর এক দূরত্ব; যেটা কাটানো সহজ নয়! ওই চার পাঁচ ঘণ্টা পার্থ কী ভেবেছিল তা জানা যাবে না, জিজ্ঞেসও করা যাবে না। শরীরের সম্পর্ক মন স্পর্শ করতে পারছে না, দুজনেই থেকে যাচ্ছে দুজনের আড়ালে—এই সম্পর্ক কত দূর নিয়ে যাবে তাদের। পার্থ যেমন বলল, তেমনি সেও কি বলবে আমি দুঃখিত, আমিও ক্ষমা চাইছি?
না; জিনা ভাবল, সেটা ন্যাকামি হয়ে যেতে পারে। গায়ে হঠাৎ পা লেগে গেলে যেমন হয়। মনে পড়ল, তাদের বিয়ের পর পর, অসীম তখনও এখনকার অসীম হয়ে ওঠেনি, একদিন ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে সরে যাবার সময়ে, না কোন সময়ে যেন, পা লেগে গিয়েছিল অসীমের গায়ে। সংস্কারবশত সঙ্গে সঙ্গে ওর পা ছুঁতে ঝুঁকেছিল জিনা। অসীম বাধা দিয়ে বলেছিল, 'রোজ রাত্রেও এভাবে প্রণাম করো নাকি!'
স্মৃতিই হাসি আনল ঠোঁটে।
বাস থেকে নেমে ওরা তখন রিকশায়; বাস, লরি, মোটর, রিকশা, এক্কা ও পথচারীর ভিড়ের মধ্যে দিয়ে এগোচ্ছে। পার্থ কি আড়ে চোখ রেখেছিল তার ওপর। বলল, 'হাসছ যে!'
'নিজের বোকামিতে। কী কাণ্ডটাই করলাম তোমার সঙ্গে।'
'ফরগেট ইট।' পার্থ ওর হাতে চাপ দিয়ে বলল, 'সামনে জগন্নাথের মন্দির। কিছু চাওয়ার থাকলে বলো, নিয়ে যেতে পারি।'
'কী চাইব?'
'যা পেতে চাও—'

'সে-জন্যে মন্দিরে যেতে হবে কেন। তুমিই তো দিচ্ছ।' বলতে বলতেই মন্দিরের চুড়োর দিকে তাকাল জিনা। হঠাৎ কিছু মনে পড়ার ধরনে ফিরে এল সতর্কতায়; নমস্কারের ভঙ্গিতে হাতদুটো ঠেকাল কপালে। তারপর বলল, 'চাওয়া কি সব সময়েই একই থাকে! বদলে বদলে যায়। কিছুদিন আগেও কি জানতাম তোমাকেই চাইব।'

'আমি জানতাম। অনেক আগে থেকেই।' পার্থ বলল, 'যেদিন তোমাকে প্রথম দেখি, সেদিনই জিজ্ঞেস করেছিলাম গায়ত্রীকে, কে এই মহিলা।'

'এই, গায়ত্রী এসে যাচ্ছে আবার—'

পার্থ থেমে গিয়ে বলল, 'একেবারেই আসবে না। তা হয় নাকি! তুমি কি অসীমকে ভুলে গেছ?'

জিনা জবাব দিল না।

গলিঘুঁজি পেরিয়ে, সরকারি এম্পোরিয়ামের চৌমাথা ঘুরে রিকশাটা তখন ঢালু পিচের রাস্তায় নামছে। চকিত হাওয়ার উদ্দামতায় অবাধ্য হয়ে উঠল কাঁধের ওপর পাতা আঁচল। সামনে অনেকটা খোলা আকাশ এবং ঘোলাটে ঢেউয়ের মাথায় সাদা চাঞ্চল্য দেখিয়ে এগিয়ে এল সমুদ্র। শূন্যে ঢ্যাঁড়া কাটার মতো দুটো বড় পাখি পরস্পরকে অতিক্রম করে সরে গেল দুদিকে, কোনটা কোনদিকে বোঝা যাচ্ছে না। সম্ভবত গাঙচিল। রিকশায়, তাদের উল্টো দিকে, স্যুটকেস ও টিফিন ক্যারিয়ার নিয়ে চলে গেল এক মাঝবয়েসী দম্পতি। রৌদ্রহীন আলোর মধ্যে ক্রমশ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল সমুদ্র। সেদিকে চোখ রেখে, আঁচল সামলাতে সামলাতে জিনা বলল, 'তুমি ভুলে গেছ, টিকিটের খোঁজ করতে স্টেশনে যাবে বলেছিলে—'

'মনে আছে।' হালকা গলায় পার্থ বলল, 'এবার যে ফিরে এল তার নাম কি অসীম?'

পার্থর কথার ধরনে হেসে ফেলল জিনা। কৌতুক করেই ওর মাথার পিছনের চুল ঘেঁটে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হয়েছে।'

সামনের দৃশ্য মুহূর্তেই মুক্তি এনে দিল চোখে। সার সার হোটেল এবং হলিডে হোমের রাস্তা কমবেশি ব্যস্ত। ভিড় বিচেও। এসব সত্ত্বেও বার বার দৃষ্টি ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রেই। উতরোল হাওয়ায় চাপাভাবে মিশে আছে কাঁচা ময়দা, ডিম আর মশলা-মশলা গন্ধ। তারতম্য করা যায় না দূর ও কাছের বিভিন্ন শব্দে।

রিকশা থেকে নামবার সময় এতক্ষণ দূরে সরিয়ে রাখা আশঙ্কাটা ফিরে এল আবার। কেউ কি দেখবে? যদি দেখে ফেলে! পর মুহূর্তেই জিনা ভাবল, রিস্‌ক আছেই, কিন্তু এই রিস্‌ক কি সে—এবং পার্থও—জেনেশুনে নেয়নি! সারাক্ষণ এমন ভয়ে ভয়ে থাকলে এলই বা কেন। পার্থ অবশ্য বলেছিল দেখলে দেখবে; বলার পর থেকেই অনেকটা খোলামেলা, নিশ্চিন্ত লাগছে ওকে। এমনকী হতে পারে যে পরিচিত কারুর দেখে ফেলা এবং তাদের এই গোপন, অবৈধ সম্পর্ক জানাজানি হওয়া পরোক্ষে ভালই হবে দুজনের পক্ষে, অন্তত তার পক্ষে। অসীমকে কীভাবে বলবে কথাগুলো তা ভেবে পায়নি এখনও। এভাবেই কথা উঠলে জেরার মুখে বলতে পারবে অসীমকে, হ্যাঁ, সত্যি, যা শুনেছ সবই সত্যি। আমি পার্থকেই চাই। স্বামী-স্ত্রীর এই মিথ্যে সম্পর্কটা ভেঙে যাক। তাছাড়া জবাবদিহিটা তার নিজের কাছে, নিজেরই। সে যেভাবে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভাবছে অসীমকেও সেইভাবে ভেবে নিতে হবে।

চিন্তার ভিতর কখন যে ঢুকে পড়েছে এক বুক নিঃশ্বাস, বুঝতে পারেনি।

পার্থ বলল, 'কিছু ভাবছ মনে হচ্ছে?'

'না।' জিনা নিজেকে আড়াল করে নিল, 'নতুন আর কী ভাবব।'

'আমি জানি কী ভাবছ।'

'কী!'

'পুনে শহরের কোনও এক হোটেলে আছে অসীম ব্যানার্জি নামে একজন। সে কেমন আছে, কী করছে, এইসব!'

'তুমি কি থট-রিডিংও জানো নাকি!'

'কেন! ভুল বললাম?'

'একেবারেই—'

'তাহলে!'

অনিচ্ছায় হাসল জিনা। কাছে দূরের মানুষজনের উপস্থিতি ভুলে হাঁটতে হাঁটতেই আলতো হাতে পার্থর তিনটে আঙুল জড়িয়ে ধরে বলল, 'যে-মনের খবর রাখো না, তার হদিশ পেতে চাও কেন!'

কিছু বা অবাক চোখে জিনাকে লক্ষ করল পার্থ।

'ভাষাটা অন্যরকম লাগছে!'

জিনা জবাব দিল না। হঠাৎই তার মনে হল, প্রসঙ্গে টান পড়ছে; বস্তুত তার ও পার্থর মধ্যে বলবার কথা এত কম কেন!

রাস্তার পাশের সিমেন্টের নিচু গাঁথনি ডিঙিয়ে বিচে নেমে এল ওরা। এখন সামনেই এগোবে।

ক্রমশ তারতম্য ফুটছে আলোয়। কোথাও কিছু নেই, ছায়া ছড়াতে ছড়াতে নানা রঙের বিচিত্র মেলামেশিতে রঙিন হয়ে উঠল আকাশ। তাপ হারানো সূর্যটা সহনীয় লাগছে চোখে, আস্তে আস্তে যেদিকে সরে কমলা আভার আড়াল টেনে নিচ্ছে নিজের চারপাশে, সেদিকটাই পশ্চিম। ওই দিকেই দূর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে উড়ে যাচ্ছে এক ঝাঁক পাখি। জিনা অন্যদিকে চোখ ফেরাল এবং দেখল, বড় যে পাখিদুটোকে আগেও দেখেছিল, এখনও সেইভাবে ওঠানামা করছে তারা। সমুদ্রের জলে ঈষৎ কালচে রং ধরার সঙ্গে সঙ্গে ঢেউয়ের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে সাদার উচ্ছ্বাস। বিভিন্ন দূরত্বে ছড়িয়ে থাকা মাছধরা ডিঙিগুলো তীরের দিকে ফিরতে ব্যস্ত। চকিত শব্দ তুলে একটা হাউই উঠে গেল আকাশের দিকে।

'মিসেস মজুমদার না?'

হঠাৎই গলা শুনে থমকে দাঁড়াল জিনা। দেখল, কাছেই বাঁ দিকে বসে থাকা থেকে উঠে দাঁড়াল একটি লোক। চোখাচোখি হতে এগিয়ে এল তার দিকে। দেখাদেখি সঙ্গের যুবতীটিও।

অন্যমনস্কতাজনিত বিভ্রম থেকে সিঁটিয়ে গিয়েছিল একটু। তার পরেই চিনতে পারল। ট্রেনের সেই দুজন। অজয় এবং তাপসী। ক্যাটকেটে লাল সালোয়ার কামিজের ওপর হলদে ভয়েলের দোপাট্টায় চেনা যাচ্ছিল না তাপসীকে।

সামান্য দূরত্বে পার্থও দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

'পেছন থেকে দেখেই চেনা মনে হল।' অজয় বলল, 'উঠেছেন কোথায়?'

'মানে—।' জিনা বিব্রত হয়ে পড়ল।

উত্তর পাওয়া অজয়ের পক্ষে জরুরি নয়। ট্রেনেও কি এই নীল সার্টটা পরেছিল? পার্থকে দেখে বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার মজুমদার?'

পার্থ উৎসাহ দেখাল না।

'এঁরা ট্রেনে এসেছিলেন আমার সঙ্গে। একই কেবিনে—'

'ও।' পার্থ বলল, 'আমার স্ত্রীর সঙ্গে আগেই আলাপ হয়েছে তাহলে!'

কথাগুলো ছুঁয়ে গেল জিনাকে। কী করে এমন সহজ হয়ে যাচ্ছে পার্থ! সেও ওর মতো হতে পারছে না কেন!

'আমার ওয়াইফ।' তাপসী কথা বলছে না, জিনাকে দেখে হেসেছিল একবার, তারপর থেকেই এড়িয়ে যাওয়া ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে। ওকে দেখিয়ে অজয় বলল, 'বুঝতেই পারছেন, নিউলি ম্যারেড।'

'তাই নাকি! কনগ্র্যাচুলেশন।'

'আপনারা কোন হোটেলে?'

জিনা পার্থর দিকে তাকাল। পার্থ বলল, 'অফিসের গেস্ট হাউসে—'

'আই-টি-সি? না ডানলপ?'

পার্থ মজা পাচ্ছে। প্রশ্নটা পাশ কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা?'

'পুরী হোটেলে।' অজয় বলল, 'পুরীর বেস্ট ফুড ওখানেই পাওয়া যায়, কোয়ানটিটিও ভাল। খুব হোমলি সারাউন্ডিংস।'

'আপনি কি পুরী হোটেলের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে?'

পার্থকে এভাবে বলতে দেখে ওর কনুইয়ে খোঁচা দিল জিনা। অজয় গায়ে পড়ে কথা বলতে অভ্যস্ত, ওরা না থামলে থামবে না। এখন চলে যাওয়াই ভাল।

পার্থর শ্লেষ ধরতে পারেনি অজয়। বলল, 'আমি রেলওয়েজে—ফেয়ারলি প্লেসে—'

'আপনারা বসুন।' ব্যস্তভাবে জিনা বলল, 'আমরা এগোই। আবার দেখা হবে।'

'নিশ্চয়ই হবে। জানেন তো, দি ওয়ার্ল্ড ইজ—'

কথাটায় আটকে গেল অজয়, সম্ভবত ভুলে গেছে; অপ্রতিভ দেখাল ওকে। লক্ষ করে পার্থ বলল, 'ভেরি স্মল—'

'রাইট। ভেরি স্মল।'

আর দাঁড়াল না। ওখান থেকে যথেচ্ছ হাঁটতে হাঁটতে তীরের কাছাকাছি চলে এল ওরা।

পার্থ মজা পেয়েছে। ঠাট্টা করে বলল অজয়ের মতো লোকের স্ত্রীরা সুখী হয়। জিনা 'কেন' জিজ্ঞেস করাতে বলল, কারণ অজয়রা সারাক্ষণ কথা বলতে ভালবাসে, অসীম ব্যানার্জির মতো ভারিক্কি নয়, ব্যস্তও নয়, এবং সারাক্ষণ কথা বলতে হয় বলে তাদের শ্রোতারও দরকার হয়; স্ত্রী ছাড়া আর কেউই যেহেতু এমন বিরক্তিকর সঙ্গ সহ্য করবে না, সুতরাং ওদের স্ত্রীদেরও নিঃসঙ্গ বোধ করার কোনও কারণ নেই।

জিনা চুপ করে থাকল। অজয় যতই হাসির খোরাক জোগাক, পার্থ অনাবশ্যক ভাবে অসীমের তুলনা টেনে আনায় অস্বস্তিই বোধ করল সে। মনে হল, সে ঠিক জানে না অসীমের প্রতি বিরাগবশতই সে পার্থর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে কিনা। আকর্ষণ সত্যি হলেও কারণটা স্পষ্ট নয় এখনও। তা ছাড়া, অজয়ের ঘটনার সঙ্গে তাকেই বা জড়ানো হচ্ছে কেন! পার্থ গায়ত্রীর কথাও ভাবতে পারত। যে-কোনও কারণেই হোক জিনার নিজের মনে

দাম্পত্য-সম্পর্কে অপূর্ণতার বোধ থাকলেও গায়ত্রীর তা নেই। বস্তুত, গায়ত্রীকে দেখে কখনও অসুখী মনে হয়নি জিনার, পার্থ নিজেও স্বীকার করেছে স্ত্রী হিসেবে ও খুব অনুগত। তাহলে পার্থ নিজের কথা ভাবল না কেন, দাম্পত্য-জীবনে অসুখী না হয়েও সে নিজেও কি গায়ত্রীকে ডিভোর্স করার কথা ভাবছে না!

প্রশ্নগুলো তাকে অখুশি ও বিমর্ষ করে তুললেও পার্থকে কিছু বলল না জিনা। হয়তো এইরকমই হয়, ভাবল, সম্পর্কের ভিতরের রহস্যগুলোকে ঠিকঠাক বোঝা না গেলেও মেনে নিতে হয় ঘটনাগুলোকে। এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় ঘটনা সে আর পার্থ—পার্থর ওপরেই নির্ভর করতে হবে তাকে, হয়ত সারা জীবন। এর মধ্যে নতুন কোনও প্রশ্ন তুলে আরও কিছু অস্বস্তিকর মুহূর্ত সৃষ্টি করে লাভ কি! আজ সকালে যা হল তারপর সেরকমই হতে থাকলে সে কার দিকে তাকাবে, কোন দিকে।

এরই মধ্যে পালটে গেছে সমুদ্রের রং। অনেক রঙের বর্ণময়তায় বিচিত্র, ঠিক কীরকম বোঝা যায় না। দূর থেকে চাপা গর্জন তুলে গড়িয়ে গড়িয়ে আসা ঢেউয়ের শেষ ঝাপটায় পায়ের পাতা ভিজে গেল জিনার। চপ্পলের তলা থেকে বালি সরে যেতে যেতেও স্থির হয়ে যাচ্ছে আবার। দূরে, খুব বড় আর মায়াবী সূর্যটা কমলা থেকে লালে পরিণত হতে হতে থমকে আছে দিকচিহ্নহীন জলরাশির ওপরে, যেন কিছুর অপেক্ষায়। এর আগেও সূর্যাস্ত দেখেছে সে, অসীমের সঙ্গে গোপালপুর গিয়েছিল, সেবারেও; দৃশ্য কোনও প্রশ্ন তোলেনি মনে। কিন্তু কী যেন আছে আজকের এই দৃশ্যের মধ্যে। মন খারাপ করে দেয়।

আকস্মিক আরও একটা ঢেউ এসে প্রায় তার হাঁটু পর্যন্ত ছিটকে ওঠায় বেসামাল হতে হতেও তাড়াতাড়ি পার্থকে ধরে ফেলল জিনা। পায়ের নীচে চপ্পল দুটো চেপে রেখে ঠিকঠাক দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতে বলল, 'চলো। এখানে ভাল লাগছে না।'

'কেন!' কিছুটা অবাক হয়ে পার্থ বলল, 'সূর্যাস্তের বিউটি—, এসব দেখতেই তো লোকে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে আসে!'

'আমিও কি বেড়াতে এসেছি!'

পিছনে ফিরে হাঁটতে শুরু করল জিনা। সুতরাং, পার্থও। নির্দিষ্ট কোনও যাবার তাড়ায় নয়।

খানিক আগে যেরকম ভিড় দেখেছিল বিচে, চারদিকে তাকালে মনে হয় এখন তার চেয়ে বেশি। সূর্যাস্তের সময়ের আলোয় এক ধরনের খাপছাড়া সোনালি আভা ফুটেছে বিভিন্ন মুখে—কাঁধে মিষ্টির ভারা নিয়ে হাঁকতে হাঁকতে চলে যাচ্ছে ফেরিওলা, অদৃশ্য কোনও জায়গা থেকে আবার একটা হাউই নাচতে নাচতে ছুটে গেল আকাশে। জ্বলে উঠেছে রাস্তার আলোগুলো। এসব দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে যেতে জিনার মনে হল, সত্যি সত্যিই এত লোকের মধ্যে কে চিনছে তাদের। ভয়টা কি অমূলক। এমন কি হতে পারে যে, ভিড়ের মধ্যে যাদের জোড়ায় জোড়ায় দেখছে, যেন স্বামী-স্ত্রী, তাদের সকলেই অজয়-তাপসীর মতো নয়, কেউ কেউ তাদেরও মতো? কে আর জানছে।

চুপচাপ থাকতে থাকতেই পার্থ ওর হাত টেনে ধরল।

'লুক হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেয়ার।'

ওর কথায় বাঁ দিকে তাকাল জিনা। তারা যেখানে, সেখান থেকে একটু এগিয়ে, ভিড় থেকে সামান্য আলাদা হয়ে প্রায় গোলাকার একটা জায়গায় অদ্ভুত ভঙ্গিতে নড়াচড়া করছে

কয়েকটি অল্পবয়েসী ছেলেমেয়ে। জনা তিনেক মহিলা এবং একজন স্বাস্থ্যবান চেহারার যুবক অল্প দূরে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘিরে রেখেছে তাদের। আশপাশ দিয়ে যারা হাঁটছে তাদের কেউ কেউ দেখতে দেখতেই চলে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে, দেখছে, চলে যাচ্ছে আবার।

বুকের কাছে দুই হাতের কব্জি বেঁকিয়ে টালমাটাল ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছিল একটি বালক, হঠাৎই বালির ওপর মুখ থুবড়ে পড়ল। তাকে তুলে ধরবার জন্যে ছুটে গেল পার্থ। সঙ্গে সঙ্গে ওই মহিলাদের একজন প্রায় ধমকের ভঙ্গিতে চেঁচিয়ে বললেন, 'ডোন্ট টাচ হিম, প্লিজ! ধরবেন না ওকে।'

বলতে বলতেই এগিয়ে গেলেন মহিলা। বালকটিকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে বললেন, 'গেট আপ, জয়ন্ত। ওঠো। উঠে পড়ো—'

মুখে অদ্ভুত শব্দ করতে করতে বালি থেকে মুখ তুলল বালকটি, যেন হাসছে; হাঁটু দুটো সোজা করতে গিয়ে পড়ে গেল আবার, বেঁকানো হাত দুটো বাড়িয়ে ধরতে চাইল মহিলাকে। মহিলা পিছিয়ে গেলেন। মুখে সেই একই কথা, 'গেট আপ। ওঠো। ঠিক পারবে—'

অপ্রস্তুত ভাব কাটিয়ে পার্থ বলল, 'অ্যাবসার্ড।'

'কেন!'

'এই চেষ্টা। ছেলেটা অ্যাবসোলিউটলি ক্রিপলড! ওকে অন্যের ওপর নির্ভর করতেই হবে।'

চোখ তুলে পার্থকে দেখল জিনা। জবাব দিল না। শেষ সূর্যের ম্লান আলোয় সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার কেমন টায়ার্ড লাগছে। একটু বসবে এখানে?'

জিনা বসেই পড়ল। পার্থও।

'হঠাৎ টায়ার্ড লাগছে কেন!'

'জানি না।' হাওয়ায় লবণের স্পর্শ। মুঠোয় আঁচল তুলে মুখের ওপর বুলিয়ে নিল জিনা। তারপর ক্ষীণ হেসে বলল, 'লাগতে নেই!'

'ফিরে যাবে?'

'যাব। একটু পরে।'

হাঁটু দুটো জড়ো করে তার ওপর থুতনি পেতে বসল জিনা। পার্থ যেদিকে বসে তার উল্টোদিকে মুখ করে আঙুলের দাগ টানতে লাগল বালিতে।

'এক্সকিউজ মি।'

জিনা মগ্ন ছিল। চোখ তুলে দেখল, কিছুক্ষণ আগে যে-প্রৌঢ়া মহিলা চেঁচিয়ে নিরস্ত করেছিলেন পার্থকে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি। পার্থকে লক্ষ করে বললেন, 'আমার কথায় কিছু মনে করেননি তো?'

'না।' পার্থ বলল, 'বুঝতে পারিনি আপনারা ট্রেন করছেন। ইটস অলরাইট।'

মহিলা দুজনকেই দেখলেন।

'আপনারা কি কলকাতা থেকে?'

'হ্যাঁ।'

পার্থ উঠে দাঁড়াল। জিনাও। বলল, 'আপনারা আজই এসেছেন, না?'

মহিলা জবাব দিলেন না। বিধবা, নাকি অবিবাহিতা? সিঁথি কিছুই বোঝায় না। একটু

অবাক হয়েই তাকালেন জিনার দিকে।

'মনে হচ্ছে আপনাদের ট্রেনে দেখেছি—'

'তাই বলুন!' মহিলা হাসলেন অল্প। 'আজ এলাম। পরশু সন্ধের ট্রেনে ফিরে যাব। এসব বাচ্চাদের সামলানোর ধকল অনেক। গার্জেনরাও ছাড়তে চান না। তবু তো ক'জনকে আনতে পেরেছি। জগৎটা দেখুক; পরিবেশের বদল ওদেরও বদলায় বইকি।'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মহিলা। তারপর ছেলেমেয়েগুলির দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'এই দেখুন না, কেমন সুন্দর আছে ওরা। মুখ দেখেই বোঝা যায় খুব খুশি।'

'আপনাদের—', ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল পার্থ, 'কোনও স্কুল—?'

'স্কুল নয়। সেন্টার গোছের। খিদিরপুরে। সাত আট বছর চালাচ্ছি—'

জিনা বলল, 'কষ্ট তো আপনাদেরও।'

'কষ্ট মনে করলেই কষ্ট। আর যদি ভাবেন আমাদের চেয়ে ওদের কষ্ট বেশি—'

কথা শেষ হল না। সন্ধের অন্ধকারের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে মহিলা বললেন, 'যাই। একটা বাস ধার পেয়েছি, তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিতে হবে। আলাপ হয়ে ভাল লাগল।'

মহিলা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। রাস্তার ওপর থেকে ফেলা তীব্র আলোয় বিচের অনেকটা জায়গা আবছায়া হয়ে থাকলেও এখন পুরোপুরি সন্ধে। স্বাস্থ্যবান যুবকটি বিকলাঙ্গ একটি মেয়েকে পিঠে তুলে নিয়েছে, আর একজনকে হাতে ধরে আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রাস্তার দিকে। তিনজন মহিলা তখনও দাঁড়িয়ে আছেন অন্যদের ঘিরে। হয়তো সকলকে তুলে নিয়ে যেতে যেতে আরও অনেকটা সময় লাগবে।

চোখের সামনে কব্জি তুলে এনে সময় দেখল পার্থ।

'সাড়ে ছ'টা বাজছে প্রায়। আটটায় হোটেলের বাস দাঁড়াবে পুলিশ ফাঁড়ির সামনে। টিকিটের খোঁজ করব, নাকি আজ ছেড়ে দেব?'

'ছেড়ে দেবে! কেন!'

'তুমি বলছিলে টায়ার্ড।'

'ও কিছু নয়।' জিনা পার্থকে টানল, 'অন্ধকার সমুদ্র কী দেবে! ভয় আর ভয়।'

'ভয়?'

'ভয়ই তো।' জিনা আরও একটু ঘন হয়ে এল পার্থর কাছে। বলল, 'মনে হচ্ছে আমাদের আড়ালে কী যেন ঘটে যাচ্ছে, কিছুই জানতে পারছি না।'

'সে আবার কি!'

'মনে হলে কী করব!'

পার্থ কিছু বলল না।

আবার রাস্তায় ফিরে রিকশায় উঠল ওরা। স্টেশনের দিকে। বিচের সামনে ভিড় থাকলেও খানিক দূরে এসে নির্জনতা পেল। ক্বচিৎ মোটর কিংবা রিকশা, দু-চারজন পথচারী ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। দুজনেই চুপচাপ। অপরিসর রিকশায়, এমনিতেই গায়ে গা এঁটে বসা। তবু হঠাৎই যেন আরও ঘনিষ্ঠতা চাইল জিনা। লজ্জাহীন ভাবে পার্থর হাতটা তুলে এনে ছড়িয়ে দিল নিজের ঘাড়ের ওপর। তারপর অন্যরকম গলায় বলল, 'কী ভাবছ এত? ভুল করলে কিনা!'

লোকটির পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি আর পায়জামা, গলায় সোনার চেন। গোল মুখ, বেঁটেখাটো, কালোর ওপর চকচকে চেহারা। রিজার্ভেশন কাউন্টারের পিছনে ঘরের ভিতর আলাদা টেবিলে বসে পান চিবোতে চিবোতে কথা বলছিল রোগাটে, ক্ষয়া চেহারার এক মহিলার সঙ্গে। হাতের ইশারায় অপেক্ষা করতে বলল পার্থকে। মিনিট দশেক পরে নিজেই এসে ডেকে নিয়ে গেল ভিতরে। পার্থ বলল, 'একটু দাঁড়াও। আসছি।'

প্ল্যাটফর্ম এখন ফাঁকা। তবে কাউন্টারের সামনে বেশ ভিড়, অন্তত পঁচিশ ত্রিশ জন জড়ো হয়েছে ওখানে। প্রায় উদ্দেশ্যহীন দাঁড়িয়ে পার্থর জন্যে অপেক্ষা করতে করতে বিলবোর্ডে ট্যুরিস্ট স্পটের বিজ্ঞাপন দেখছিল জিনা। একটা বুড়ো ভিখিরি পার্থ চলে যাবার পর থেকেই হাত পেতে ঘুরঘুর করছিল আশপাশে, মুখ ফিরিয়ে নিলেও যাচ্ছিল না। ব্যাগ থেকে একটা সিকি বের করে লোকটার হাতে দিতে সরে গেল সামনে থেকে। কাউন্টারের লাইনে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দৃষ্টিটা ভাল নয়। ট্রাউজার্সের ওপর পাঞ্জাবি চড়ানো, চেহারা দেখে মনে হয় বাঙালি। খুঁটিয়ে দেখছে, যেন তার শরীরে কোথায় কী আছে না আছে তা দেখে নেওয়া জরুরি। অস্বস্তিতে জায়গা বদল করে দেয়াল ঘেঁষা ওজন যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল জিনা। কাল থেকে যা টেনশন যাচ্ছে তাতে ওজন কিছুটা কমে যাওয়া বিচিত্র নয়। নিয়ে দেখবে নাকি? তখন দেখল যন্ত্রটার মাথার দিকে খয়েরি কাগজ সাঁটা, তাতে অসমান অক্ষরে লেখা: আউট অফ অর্ডার। তুচ্ছ ব্যাপার। তবু লেখাটার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে উঠল জিনার। বেশ ছিল, কিন্তু হঠাৎই যেন একটা বিরক্তি ছেঁকে ধরেছে তাকে। লোকটা শুধু পার্থকেই ডেকেছিল, ঠিকই; কিন্তু পার্থর কি উচিত ছিল না হাটের মাঝখানে এইভাবে তাকে দাঁড় করিয়ে না রেখে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া?

সেই সময় ফিরে এল পার্থ।

'না, আজও হল না।'

'কেন!'

'বলছে কয়েকজন ভি-আই-পির সোমবার যাবার কথা। ওদের জন্যে দুটো কেবিন রিজার্ভ করে রাখতে হয়েছে।'

'তার মানে! আমরা ফিরতে পারব না!'

জিনার উদ্বেগ লক্ষ করে সচকিত হল পার্থ। সামান্য অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'আমি কি তা-ই বলেছি! আগে কথাটা শোনো!'

ঠিক এই ভঙ্গিতে আগে কখনও পার্থকে কথা বলতে শোনেনি জিনা। অভিমান থেকেই চুপ করে গেল সে।

'ওয়েটিং লিস্টে আমাদের নাম্বার বত্রিশ আর তেত্রিশ। লোকটা বলল সেটা কোনও প্রব্লেম নয়। ভি-আই-পিরা ওরকম রিজার্ভ করে রাখে, শেষ পর্যন্ত যায় না। টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আগে রিজার্ভেশন রিলিজ করে দেয়। যদি দুটোও ছেড়ে দেয় তাহলে আমাদেরই দেবে—'

'অন্য কোনও ট্রেন নেই?'

'তাতেই বা লাভ কী। সেখানেও তো একই ব্যাপার হবে। লোকের গুঁতোগুতি দেখে বুঝছ না!'

'আমি আর কী বুঝব।' হতাশ হতে গিয়েও সামলে নিল জিনা। সময় নিল। তারপর পার্থর চোখে চোখ রেখে বলল, 'ভি-আই-পিরা সকলেই যেতে পারে। তা ছাড়া আমাদের আগেও তো আরও একত্রিশ জন আছে।'

'তাতে কী! কে পেল না পেল তা ওই একত্রিশ জন জানছে না কি। সবই ওই লোকটার হাতে। আগের দিন টাকা দিতে চেয়েছিলাম, নেয়নি। আজ পঞ্চাশ টাকা নিল। হুইচ মিনস, হান্ড্রেড পারসেন্ট সিয়োর। কাল সাতটা নাগাদ আসতে বলল।'

'কাল। আবার!' জিনা বলল, 'রোজ এই করবে নাকি!'

'তুমি এসো না।' বিব্রত ভাব কাটিয়ে এখন খানিকটা সহজ লাগছে পার্থকে। জিনাকে আশ্বস্ত করার জন্যে হাত রাখল পিঠে, স্টেশনের বাইরে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'এত নার্ভাস হলে চলে! কাল সকালে চিল্কায় যাব। বিকেলে ফিরে তুমি রেস্ট নিয়ো। আমি এসে কালেক্ট করে নেব।'

পার্থ রিকশা ডাকল। উঠতে উঠতে জিনা বলল, 'ওই কটেজে আমি একা পড়ে থাকব!'

'এত ভয় পাও কেন! ওখানে সেফটির অভাব নেই। আধঘণ্টা, পঁয়তাল্লিশ মিনিটের তো ব্যাপার! না হয় লবিতে এসে বসে থেকো।'

স্টেশনের রাস্তা ছাড়তেই উসকে এল অন্ধকার। আবার সেই গলিঘুঁজি। আশপাশের ছোট ছোট ঘরবাড়ি বা দোকানগুলোর কোনও কোনওটায় কুপি জ্বলছে, কোথাও বা লণ্ঠন, মাঝেমধ্যে ইলেকট্রিকের আলো চোখে পড়লেও সেগুলো এমনই নিষ্প্রভ যে অন্ধকার আলাদা করা যায় না। জিনা অনুমান করতে পারল না সকালে এই রাস্তা দিয়েই তারা হোটেলে গিয়েছিল কি না। জিজ্ঞেস করবে ভেবেও করল না। পার্থ আশ্বস্ত করলেও ফেরার টিকিটের ভাবনা তখনও কুরে খাচ্ছিল তাকে।

খানিক চুপচাপ থেকে সে বলল, 'কাল ফোনে কথা বলবার সময় এমন ইম্প্রেশন দিলে যেন ফেরার টিকিট হয়ে গেছে!'

জিনার স্বরে অনুযোগ স্পষ্ট। রাস্তার প্রায়ন্ধকারে পার্থ ওর মুখের দিকে তাকাল। একটু পরে বলল, 'তুমি বোধহয় আমাকে বিশ্বাস করতে পারছে না!'

ভাঙাচোরা রাস্তার খোঁদলে পড়ে মাঝে মাঝেই লাফিয়ে উঠছে রিকশা। গতি না এগোবারই মতো, ক্ষীণ স্বাস্থ্যের রিকশাওয়ালা সিটে না বসে প্যাডেলে দাঁড়িয়েই ওঠানামা করে এগোচ্ছে যতটা পারে। সমুদ্রের ধারে যতটা হাওয়া পেয়েছিল এখন তার ছিটেফোঁটাও নেই। বরং গুমোটই লাগছে। পার্থর গলার স্বরে ও এইমাত্র বলা কথাগুলোর অর্থ খুঁজতে খুঁজতে আকাশে তাকাল জিনা এবং ভাবল, সত্যিই সে কতটা বিশ্বাস করে পার্থকে? বিচ্ছিন্ন কয়েকটা তারা চোখে পড়ল, হালকা মেঘের মধ্যে দিয়ে সরে সরে যাওয়া আধখানা চাঁদও। উত্তর পেল না। পরিবর্তে মনে পড়ল কাল ফ্ল্যাট থেকে বেরুবার পর চন্দ্রনাথকে বলেছিল সন্ধের পর কোথাও না যেতে; কে এল না এল, ফোন করল না করল ঠিকঠাক জেনে নিতে। ঠিক করেছে কিনা জানে না। যদি এমন হয় যে সে বেহালায় আছে জেনেও জরুরি কোনও কারণে বাড়িতেই ফোন করল অসীম, বেহালায় তাকে খবর দিতে বলল এবং মীনার বাড়ি গিয়ে চন্দ্রনাথ শুনল জিনা যায়নি সেখানে, তাহলে কী হবে! কয়েকদিন আগে বউদি ফোন

করেছিল, তাকেও বলেছিল ট্যুরে যাবার সম্ভাবনা আছে অসীমের। বউদি বা মা খোঁজ করতে পারে; প্রতিবারের মতো ওখানে না গিয়ে জিনা চলে গেল বেহালায়, অথচ জানাল না কিছু—এটাই বা কেমন ব্যাপার! আশ্চর্য! এই সম্ভাবনাগুলোর কথা তার একবারও মনে আসেনি কেন!

নিজের মনেই দিশেহারা বোধ করল জিনা। টিকিট পেলে এবং ঠিক সময়ে ফিরলেও সম্ভাবনাগুলো থেকে যাবে। হাওড়া স্টেশন থেকে তার বেহালায় যাবার কথা, পার্থ সোজাই ফিরবে। তাতে সমস্যা মিটছে না। জেরায় জেরায় জেরবার হতে হবে তাকেই। এই তিনদিন কোথায় ছিল সে? একা?

নিঃশ্বাসের ভার অসহ্য বোধ হওয়ায় পার্থর হাতে চাপ দিল জিনা। নিজেকে সংবরণ করতে করতে বলল, 'অবিশ্বাস করলে কি এভাবে ছেড়ে দিতাম নিজেকে!'

'না। দিতে না।' পার্থ বলল, 'সেইজন্যেই বলছি, ফেরার কথা ভেবে মুড নষ্ট কোরো না। আজই তো এলে! সোমবারের এখনও অনেক দেরি আছে।'

'লোকটা শুধু অ্যাসিওরই করল! আর কিছু বলল না?'

'আর কিছু!' পার্থ অবাক হল। তারপব, জিনার মন বুঝেই যেন, তরল ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, বলেছে। শুনবে?'

'কী!'

'বলল তোমার মতো সুন্দরী এর আগে কখনও আসেনি পুরীতে। আজ সকালে বিচে আমরা যখন ওসব করছিলাম তখন ঝাউ গাছের আড়ালে লুকিয়ে ও সব দেখেছে—'

'পাজি!' জিনা ওর হাতে চিমটি কেটে বলল, 'আর একটি কথা বললে নেমে যাব এইখানে—'

'এইখানে!'

'হ্যাঁ, এইখানেই। ওসব ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারো না কেন! বিয়ে তো অনেক দিন হয়েছে, দুটো ছেলের বাবা হয়েছ! এখনও সাধ মেটেনি!'

'সাধ আর স্বাদ কি এক!' পার্থ বলল, 'বিশ্বাস করবে, একমাস শুইনি গায়ত্রীর সঙ্গে। সম্পর্কটা প্রায় ভাইবোনের মতো হয়ে গেছে।'

'তার শোধ তুলছ আমার ওপর! যত সব আজেবাজে কথা! আমার এসব শুনতে ভাল লাগে না।'

পার্থর হাসিতে শব্দ ফুটল। বলল, 'একটা দিন চলে গেল। বাকি দুটো দিন না হয় কাজের কথা না-ই বললাম! এই দ্যাখো না, সকালে এখানের এজেন্টকে বললাম ভুবনেশ্বর যাচ্ছি। অফিস জানে কাজ করছি। কী করছি তা জানলে চাকরি যাবে। তোমার জন্যেই সব ভুলে আছি।'

রিকশাটা বেরিয়ে এল বড় রাস্তায়, আলোয়। সেই একই দৃশ্য, বিকেলে যেমন দেখেছিল। সন্ধে পেরিয়ে গেলেও ভিড় কমেনি। দূর থেকে ভেসে আসছে অস্পষ্ট ঘণ্টার ধ্বনি। মন্দিরেই কি? সম্ভবত ঠিক হল না। কাল হবে না; পার্থকে কি বলবে পরশু সকালে একবার জগন্নাথ মন্দিরে নিয়ে যেতে?

হঠাৎই হইহই চিৎকার উঠল। লরির হর্ন শুনে বিচলিত একটা ষাঁড় লেজ তুলে মত্তের মতো দৌড়চ্ছে সামনের দিকে, পাশ দিয়ে যাচ্ছে না; সশঙ্কিত পথচারীরা সরে যাচ্ছে রাস্তার

দুদিকে। দৃশ্যটায় চোখ রেখে জিনা বলল, 'তোমরা ওইরকমই। দুদিন পরে আমাকেও গায়ত্রীর মতো লাগবে।'

'বলছ কি! সমুদ্রও শুকিয়ে যাবে!'

হাসি লুকিয়ে তিরস্কারের ধরনে ভুরু তুলে তাকাল জিনা। তাকিয়েই থাকল।

'ন্যাকামি কোরো না।'

নির্দিষ্ট জায়গায় বাস থেকে নেমে দেখল বাস এসে পৌঁছয়নি। বিকেলে একই বাসে আর যারা সঙ্গী হয়ে পুরীতে এসেছিল, থানার উল্টোদিকে আইসক্রিমের দোকানের সামনে অপেক্ষা করছে তারা। ঘড়ি দেখে পার্থ বলল, 'এখনও আটটা বাজেনি।'

জিনা নিজেও ঘড়ি দেখল। বলল, 'দ্যাখো কখন আসে!'

'খাবে নাকি? আইসক্রিম?'

'না।'

জিনা দোকানপাট দেখছে। স্টেশনার্সের পাশে লাগেজের দোকানের দিকে চোখ রেখে বলল, 'দ্যাখো, ওইরকম একটা ক্যারি-অন ব্যাগের কথা বলছিলাম বিকেলে। স্যুটকেস সঙ্গে নিয়ে তো আর চিল্কায় যাওয়া যাবে না। চেঞ্জের জামাকাপড়, টাওয়েল ধরে যাবে ওতে।'

'গুড আইডিয়া। নিয়ে নাও।' ওকে সঙ্গে নিয়ে এগোতে এগোতে পার্থ বলল, 'আব কি কেনার ইচ্ছে? পাশে সিল্কের দোকান, একটা কটকি নেবে নাকি?'

'আমার জন্যে? নাকি আর কারও ফরমাশ আছে?'

পার্থ বলল, 'ঘুষ দিতে হলে তো অসীম ব্যানার্জিকেও কিছু দিতে হয়!'

'সেটা তুমিই দিয়ো।' লাগেজের দোকানে ঢুকতে ঢুকতে জিনা বলল, 'বউকে ভাগিয়ে আনলে, ঘুষ দেবে না!'

৬

এইভাবে, কথার পিঠে কথা সাজিয়ে, কখনও বা চুপ করে থেকে এবং তার পরেই আবার নতুন কথায় জড়িয়ে, আশঙ্কা ও আহ্লাদের মধ্যে ক্রমাগত পারাপার করতে লাগল জিনা। ঘটনা বলতে তেমন আর কী, তবু অ্যাকোরিয়ামে আবদ্ধ দুই মাছের মতো, একান্তের ভাবনায় পার্থর কাছ থেকে প্রায়ই দূরে সরে গিয়েও সে আবার ফিরে আসছে পার্থরই কাছে। মুখের ভাষার স্তব্ধতা থেকে চিনে নিচ্ছে শরীরের ভাষা।

সেই রাত্রে কটেজের অন্ধকারে পার্থর শরীরে নিজের শরীরের ঘ্রাণ মিশিয়ে দিতে দিতে যখন ঘুম এল, জিনার মনে হল এই ঘুমই চেয়েছিল সে, বছরের পর বছর, এর আগে কখনও ঘুমোয়নি এভাবে। নিজের নিরাবরণ সর্বাঙ্গে পার্থর শরীরের আদ্যন্ত পৌরুষ জড়িয়ে, আর্ত স্তনদ্বয়ে পার্থর বুকের পেশি ও রোমরাজির কোমল স্পর্শ অনুভব করতে করতে, পার্থর নিঃশ্বাসের প্রতিটি উত্থান-পতন নিজের নিঃশ্বাসে মিশিয়ে নিতে নিতে এর আগে অননুভূত নিরাপত্তার বোধে চোখে জল এসে গেল তার। স্পষ্ট অনুভব করল কী যেন সন্তর্পণে ঘোরাফেরা করছে তলপেটের অন্ধকার অভ্যন্তরে, এতকালের অনাদরে ম্লান একটির পর

একটি কোষ ভরে উঠছে নতুন সম্ভাবনায়। এখনও অসীমকে দেখছে সে, দেখছে গায়ত্রীকেও; সে দেখছে বলে ওরাও দেখছে। কিন্তু, নিজের অনুভূতি দিয়েই বুঝতে পারছিল, মাঝখানে দেয়াল আছে, দেয়ালটা কাচের হলেও দুর্ভেদ্য। সম্পর্ক চুকে গেলেও থেকে যায় স্মৃতি; সেইরকমই, মাঝে মাঝে ফিরে আসছে ওরা, এই যা।

রবিবার চিল্কা থেকে ফিরে পার্থ স্টেশনে যাবে টিকিটের খোঁজে, জিনাও সঙ্গ ধরল। কটেজে কিংবা লবিতে একা-একা থাকতে ভাল লাগবে না। বলল, 'বরং কালকের মতো হ্যাটের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখো।'

পার্থ বলল, 'তার বদলে যদি দুজনের কেউই না যাই স্টেশনে, এখানেই থেকে যাই, কী হয়!'

'না। সেটা হচ্ছে না।' জিনা ভেবে বলল, 'চলো, টিকিটটা নিয়ে আসি আগে। এখনও কালকের দিনটা পড়ে আছে।'

'লেস দ্যান টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স।' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল পার্থ, 'যখন ফিরে আসব তখন তাও থাকবে না।'

খুঁটিয়ে পার্থকে দেখল জিনা। আজ সারাদিন যেমন দেখেছিল ওকে, চনমনে ও অফুরন্ত, এখন আর তা নেই। বরং একটা ছায়া পড়েছে মুখে, যেটাকে দুশ্চিন্তার কারণ বলে ভ্রম হয়। সময় চলে যাচ্ছে, এই উদ্দামের শেষ আসন্ন, কাল এই সময় তারা ট্রেনের কামরায়—সেইজন্যেই কি! হতে পারে। কিন্তু এমনই বা হবে কেন! আজ, চিল্কায়, মাঝেমধ্যের কথায় তারা তো ঠিকই করে ফেলেছে যে কলকাতায় ফিরে, জানাজানি হোক না হোক, যে যার মতো করে কথা বলবে অসীম এবং গায়ত্রীর সঙ্গে। সেপারেশন চাইবে। সমস্যা জিনাকে নিয়ে নয়। এরকম একটা সম্পর্কের কথা জানলে অসীম—যেরকম একগুঁয়েমি আর অহঙ্কার ওর স্বভাবে, নিশ্চয়ই আটকাতে চাইবে না তাকে। সমস্যা হবে গায়ত্রী আর পার্থর দুই ছেলেমেয়েকে নিয়ে। জিনা পরামর্শ দিল: সে পার্থকেই চায়, পার্থর আর কিছুতে কোনও দাবি নেই তার; সুতরাং পার্থ তার ফ্ল্যাট, ব্যাঙ্ক ব্যালান্স ইত্যাদি যা কিছু আছে সবই দিয়ে দিতে পারে গায়ত্রীকে; এমনকী ওদের ভবিষ্যতের জন্যে নিয়মিত কিছু সাহায্যও করতে পারে। সে শিক্ষিতা, দরকারে চাকরি করবে। বলতে কি আগেও অনেকবার এরকম ইচ্ছে হয়েছিল তার, অসীম আপত্তি করায় হয়ে ওঠেনি। বিয়ের পর অসীমের মতো পার্থও নিশ্চয়ই তাকে পার্সোনাল প্রপার্টি হিসেবে ট্রিট করবে না! শুনে, পরিহাস করে পার্থ বলল, 'অসীম ব্যানার্জি ভুল করেনি। প্রপার্টি পার্সোনাল হয় নিজের গুণে। তুমি কি ভাবছ, আমি তোমাকে পাবলিক প্রপার্টি হতে এলাউ করব!'

তবু, এই মুহূর্তে পার্থকে দেখে সে নিজেও বিমর্ষ বোধ করল। যতই যা হোক, ঠিক এরকম কি হবে আর কখনও! কলকাতায় ফিরে কি মনে হবে না লুকিয়ে একত্রবাসের মধ্যেই এক ধরনের দাম্পত্য শুরু করেছিল তারা, স্বাদ অপূর্ণ থাকতে থাকতেই ফিরে আসতে বাধ্য হল।

ভাবনাটা এলেও মনে তেমন জোর পেল না জিনা। বলল, 'এখন এমন লাগছে, কাল হয়তো মনে হবে একঘেয়ে। তাছাড়া, তুমি চাকরির অজুহাত দেখাতে পারো, আমি কী দেখাব!'

পার্থর কোনও ভাবান্তর হল না। যেন গভীর কিছু ভাবছে, সুতরাং অন্যমনস্ক; সেইভাবেই

তাকিয়ে থাকল দেয়ালের দিকে।

ওকে লক্ষ করতে করতে জিনা বলল, 'ভুলে যেয়ো না, এখনও আমি আর একজনের স্ত্রী। বাড়ি ফিরে আমাকে না পেয়ে ও যদি পুলিশে খবর দেয়, সব জানাজানি হয়ে যায়, তখন তুমিই বিপদে পড়বে। অত বড় কেলেঙ্কারির মধ্যে গিয়ে লাভ কী!'

জিনা তখনও জানত না কোন সম্ভাবনা অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। সন্ধের ট্রেনের যাত্রীর সঙ্গে স্টেশনে যেতে যেতে অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছিল পার্থকে, কথা প্রায় বলছিলই না। ভিতরে ক্ষোভ জমলেও জিনা ভাবল, হয়তো কারণ আছে। নিজের বিভিন্ন মুহূর্তের ভাবনাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে পারে, সে কী ভাবছে না ভাবছে তাও কি জানতে দিচ্ছে পার্থকে! এখন ওকে নতুন করে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

স্টেশনে পৌঁছে রিজার্ভেশন কাউন্টারের পিছনের ঘরে কালকের সেই লোকটিকে দেখতে পেল না। কাউন্টারে যারা ছিল তাদের একজন বলল লোকটি সকালে এসেছিল, তবে কাজ থাকায় এ বেলায় আসবে না আর। না, রিজার্ভেশন পজিসনে চেঞ্জ হয়নি কোনও। ওরা আগামী কাল সন্ধেবেলায় এসে খোঁজ করতে পারে।

জিনা আজ পার্থর সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। শেষের কথাগুলো শুনে আঁতকে উঠে বলল, 'সে কি! কালই যে আমাদের ফিরতে হবে!'

লোকটি ওর কথায় গুরুত্ব দিল না কোনও। কাজ করতে করতেই কাউন্টারের বাইরে অপেক্ষারত অন্যদের দেখিয়ে বলল, 'সরি, ম্যাডাম। ইয়ে সব লোগই ওয়েট কর রহে হ্যায়। উই কান্ট হেলপ।'

জিনার মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্তন লক্ষ করে পার্থ সরিয়ে আনল ওকে। ভিড় থেকে অল্প দূরে গিয়ে বলল, 'এত আপসেট হবার কী আছে! সবাই দেখছে তোমাকে!'

'দেখুক।' পার্থর হাতটা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিল জিনা, 'তুমি জানতে এরকম হবে।'

'কী বলছ! আমাকেও অবিশ্বাস করছ!'

'হ্যাঁ, তোমাকেও!' ঠোঁটে দাঁত বসাল জিনা। মুখের ত্বকে ছড়িয়ে পড়া রক্তের আভা ফ্যাকাশে হচ্ছে ক্রমশ। নিজেকে সংযত করার চেষ্টায় হাতের মুঠোয় শাড়ির আঁচল চেপে ধরে বলল, 'তুমি জানতে না কাল আমাকে ফিরতেই হবে!'

জিনার গলা চড়তে চুপ করে গেল পার্থ। ওইভাবেই দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'বাসটা ছেড়ে দেবে এখুনি। এখন তো হোটেলে চলো। ওখানে গিয়ে ঠিক করব কী করব না করব।'

বাসে পাশাপাশি বসলেও হোটেলে ফেরার রাস্তায় জানালার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকল জিনা। কিছুটা আড়ষ্ট, বসার ভঙ্গিতেও দূরত্ব, সামান্য নড়াচড়ার চেষ্টাও নেই। যেন তারা পরস্পরের পরিচিত নয়। প্রায় তিনদিন ধরে প্রক্ষিপ্ত ভাবে যে-আশঙ্কা মাঝে মাঝেই আক্রমণ করছিল তাকে—আক্রান্ত হলেও সরিয়ে দিচ্ছিল পার্থর প্রতি আকর্ষণের জোরে, এখন সেই আশঙ্কাই যেন পুরোপুরি গ্রাস করে নিচ্ছে। এমনকী যখন সে প্রাণপণ ভাববার চেষ্টা করল যে ঘটনা যাই ঘটুক, পার্থর প্রতি সে একটু বেশিই রূঢ় হয়ে পড়ছে, কিংবা, এমনও ভাবল যে এই সম্পর্ক এভাবে নষ্ট করা উচিত নয়, তখনও ফেরাতে পারল না নিজেকে। দুর্ভাবনা একসঙ্গে আসে না—একবার আসতে শুরু করলে সঙ্গে নিয়ে আসে অভাবনীয়কেও। না হলে কেন তার মনে হবে আগামী কাল কেন, আজও যদি সে ট্রেনে

উঠত তাহলেও অবস্থার হেরফের হত না। এমন ভাবনায় শিকড় নেই কোনও, তবু জিনার মনে হতে লাগল, যে-কোনও কারণেই হোক সময়ের আগেই ফিরে এসেছে অসীম। কাল ফিরতে পারলেও সে ওকে ফেস করবে কীভাবে!

কটেজে এসে অবশ্য খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল সে। সারাদিনের ক্লান্তি ছিল, তার সঙ্গে দুশ্চিন্তা মিশে নিঃশেষিত লাগছিল শরীর। নতুন করে ফেরার প্রসঙ্গ তুলল না জিনা। পার্থর কথায় একসঙ্গে রেস্তোরাঁয় গেল, স্যুপ ছাড়া আর কিছু নিল না; পার্থ নিজেও দায়সারা হচ্ছে দেখেও উৎসাহ বোধ করল না। একই ভাবে কটেজে ফিরল ওরা। দ্রুত পোশাক বদলে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল খাটে পা ঝুলিয়ে চুপচাপ বসে আছে পার্থ। গ্রাহ্য করল না। নিজের দিকের বেড ল্যাম্পটা অফ করে পাশ ফিরে শুল।

ঘুম এল না। বেডরুমের প্রায়ান্ধকারে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতে থাকতে টের পেল বাথরুমে যাচ্ছে পার্থ, বেরিয়ে এল, পোশাক পাল্টে আলো নিবিয়ে দিল, এখন পাশের ঘরের দিকে যাচ্ছে। পায়ের পাতায় পিঁপড়ে উঠেছে সম্ভবত; গোড়ালিতে সুড়সুড়ি বোধ করায় উঠে বসে বিরক্তি তাড়াল জিনা। ঠিকই ভেবেছে, পার্থ পাশের ঘরেই। একবার ভাবল, তার কি ডাকা উচিত ওকে? এভাবে মুখ ফিরিয়ে থাকা বাস্তবিকই ফল দেবে না কোনও। বরং শান্তিতে কাটুক রাতটা। পরেই মনে হল, কোন শান্তির কথা ভাবছে সে, কোন আশায়! আজ টিকিট হাতে না আসার অর্থ—বিশেষত কাউন্টারের লোকটি যা বলল তার পরে, কালও আসবে না। তার মানে পরশু সকালের মধ্যে সে পৌঁছুতে পারছে না কলকাতায়। যদি এমনও হয় যে তার সমস্ত সন্দেহ শুধুই বিভ্রম, কোথাও কোনও অঘটন ঘটেনি এবং অসীম তার প্রোগ্রাম অনুযায়ীই ফিরবে কলকাতায়, তাহলেও পরশু সন্ধের মধ্যে অসীম পৌঁছে যাবে ফ্ল্যাটে। এবং জিনা তখনও পুরীতে, পার্থর সঙ্গে।

পরম্পরা রেখে কথাগুলো ভাবতে হঠাৎ বরফে শোয়ার মতো একটা শিহরন ছুঁয়ে গেল শরীর। না, সেটা হতে দেওয়া যায় না। যেমন করেই হোক, কাল ফিরতেই হবে তাকে। দরকার নেই কমফর্টের। পার্থকে কি বলবে উইদাউট রিজার্ভেশন যে-কোনও ট্রেনে উঠে পড়তে! কার কাছে যেন শুনেছিল পুরী থেকে বাসও যায় কলকাতায়—সকালে ছেড়ে পৌঁছে যায় সন্ধে নাগাদ। সকালে, মানে কখন! যদি ভোরে হয়, তাহলে তো কালই ভোরে রওনা হওয়া উচিত। বাসেও রিজার্ভেশনের ব্যাপার আছে নাকি?

আশ্চর্য, এই ভাবনাগুলো তাকে ভাবতে হচ্ছে কেন, এগুলো তো পার্থরই ভাববার কথা! বুকিং অপিসের সেই লোকটি না হয় কাজ থাকায় আসতে পারেনি, কিন্তু কালই পঞ্চাশ টাকা ঘুষ নিয়ে টিকিট পাবার ব্যাপারে নিশ্চিত করেছিল তাদের। লোকটার বাড়ির ঠিকানা চেয়ে নিয়ে খোঁজ করে ওকে ধরতে পারত পার্থ। এমনও তো হতে পারে যে লোকটার অনুপস্থিতির সুযোগ নিল কাউন্টারের অন্য লোকগুলো! বস্তুত যে-লোকটি কথা বলল তার গলার স্বরের রূঢ়তাই বুঝিয়ে দিয়েছিল তারা টিকিট পেল কি পেল না তাতে ওদের যায় আসে না কিছু। পার্থও মেনে নিল ব্যাপারটা, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠে ব্যস্ত হল হোটেলে ফেরার জন্যে। সাতটা, সাড়ে সাতটা কোনও রাতই নয়; আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একটা ব্যবস্থা করেই কি ফিরতে পারত না সে!

ক্রমশ নিজের মধ্যে ডুবে যাচ্ছিল জিনা। পায়ের শব্দে বুঝল ও ঘর থেকে উঠে এসেছে পার্থ।

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা ছিল—'

জিনা জবাব দিল না।

'ঘুমিয়ে পড়লে নাকি!'

যেভাবে শুয়েছিল সেইভাবেই জিনা বলল, 'বলো। শুনছি।'

খাটের একদিকে এসে বসল পার্থ। সময় নিল। তারপর বলল, 'কাল সকালে আমাকে একবার ভুবনেশ্বর যেতে হবে—'

'তার মানে!'

'সব কথাতেই রিঅ্যাক্ট কোরো না!'

প্রায় ধমকের স্বর। এই পার্থ তার চেনা নয়। এত রাতে খুব জোরে দরজা বন্ধ করার আকস্মিক শব্দ শুনলেও সে অবাক হত না এতটা। সামনে এখন অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। জিনা অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে থাকল।

'অফিসের কাজে এসেছি। কাল একবার ওখানের হেড কোয়ার্টার্সে যাওয়া দরকার।' পার্থর গলা এখন অনেকটা শান্ত। বলতে বলতে থামল। তারপর বলল, 'ট্রেনে রিজার্ভেশনের ব্যাপারটা গোলমেলে লাগছে। ভুবনেশ্বরে গিয়ে প্লেনের টিকিট কাটব। এক ঘণ্টাও লাগে না। পরশু সকালেই তুমি পৌঁছে যাবে—'

অন্ধকারে পার্থর মুখ আন্দাজ করে তাকাল জিনা।

'ভুবনেশ্বরে কাজ আছে এটা বলোনি কেন আগে!'

'বলতাম। আজই বলতাম।'

'স্ট্রেঞ্জ! আমাকে বলেছিলে ছুটি নেবে!' হঠাৎ অধৈর্য হয়ে উঠল জিনা, 'তুমি আমাকে ব্লাফ দিয়ে নিয়ে এসেছ এখানে—।'

'ব্লাফ দিয়ে! অ্যাজ ইফ তোমার নিজের কোনও ইচ্ছে ছিল না!' পার্থ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'এভাবে আমাকে ব্লেম করার মানে কী! টিকিট না পাওয়াটা একটা মিসহ্যাপ। প্লেনে ফেরার জন্যে অনেকগুলো টাকা জলে যাবে। তোমার জন্যে তাও তো করছি!'

'তোমার সব টাকা আমি শোধ করে দেব। আমি জানি টাকা খরচ করতেই আমাকে এনেছ এখানে!'

'ডোন্ট বি সিলি!'

'স্টপ ইট!' জিনা সামলাতে পারল না। আকস্মিক আবেগে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'আমি ভুল করেছি—সব ভুল করেছি—'

অন্ধকারে জিনার ফোঁপানির শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা গেল না।

খানিক পরে উঠে এল পার্থ। কাছে। বসতে বসতে বলল, 'এসব ছেলেমানুষির কোনও মানে হয়! এখানে এসেছিলাম এনজয় করতে—। জিনা, এসব কী করছি আমরা! কাল ভুবনেশ্বরে না গেলে চাকরি নিয়ে টানাটানি হবে। সকালে যাব, বিকেলের মধ্যে ফিরে আসব। বলছি তো, এয়ার-টিকিট নিয়ে। অ্যাজ সিমপল অ্যাজ দ্যাট। আরও একটা রাত আমরা একসঙ্গে থাকতে পারব—'

'আমি থাকতে চাই না।'

'কাম অন!'

হঠাৎ দু হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টানল পার্থ। ঠোঁটদুটো চেপে ধরল গালের ওপর।

আকস্মিকের ঝাপটা সামলে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল জিনা। তীক্ষ্ণ গলায় বলল, 'এই জন্যেই সব। আমাকে টাচ করবে না।'

'পাগলামি কোরো না।'

'না। টায়ার্ড লাগছে। আমাকে ঘুমোতে দাও।'

জোর করেই পার্থর নাগাল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল জিনা। পাশ ফিরে, শরীর টান-টান ও শক্ত করে মুখ গুঁজল বালিশে। এবং বুঝতে পারল পার্থ উঠে যাচ্ছে।

কিন্তু, নিঃশ্বাস সহজ হবার আগেই অনুভব করল ফিরে এসেছে পার্থ, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘিরে ধরার চেষ্টা করছে তাকে। গলায় ওর হাতের চাপ পড়তে জিনা বলল, 'কী করছ। ছাড়ো।'

'জিনা, প্লিজ। আমাকে এভাবে কষ্ট দিচ্ছ কেন।'

এ আর এক পার্থ, যার সংস্পর্শে কোনও দিনই আসেনি জিনা। বদ্ধপরিকর ওর শরীরের ফিরে আসা থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যে হাত বাড়িয়ে পাঁচ আঙুলে ওর মুখ চেপে ধরে প্রায় ঘৃণায় উচ্চারণ করল জিনা, 'তুমি কি মানুষ একটা।'

পার্থ কিছু বলল না। পরিবর্তে জিনার আঙুলের বাধা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওর ঘাড়ের তলায় হাত গলিয়ে চুলের গোছা খামচে ধরল মুঠোয়, মুখের হাঁ বিস্তৃত করে চেপে ধরল ঠোঁটদুটো—পুরো শরীরের ভার তুলে আনল জিনার শরীরের ওপর। বাধা দেবার শেষ চেষ্টায় ছটফট করতে করতে চোখে জল এসে গেল জিনার। তখনই বুঝতে পারল, সম্ভব নয়—কিছুতেই সম্ভব নয়; সারা শরীরে অসাড় বোধ করলেও সে চলে যাচ্ছে পার্থর অধিকারের মধ্যে। ক্রমশ প্রবল হয়ে উঠছে পার্থ, সেই অবস্থাতেই এলোপাথাড়ি চুম্বন রাখতে লাগল তার কপালে, ঠোঁটে, গালে।

জিনা আর কিছুই বলল না। তখন না, পার্থ নিরস্ত হবার পরেও না।

সময় যত এগোতে লাগল, রাত ও অন্ধকারের যুগ্ম স্তব্ধতা থেকে ক্রমশ তার কানে উঠে এল অদ্ভুত এক শব্দ। নৈঃশব্দের, নাকি ঝড় ছুটে যাচ্ছে পিছনের বালিয়াড়িতে—ঠিক বোঝা যায় না। দুদিনের মধ্যে এই প্রথম কুকুরের ডাক শুনতে পেল সে, চিৎকারের প্রতিটি গমকেই যেন দাগ পড়ে যাচ্ছে অন্ধকারে। পার্থর একটি হাত তখনও তার বুকের ওপর। ঘৃণায় নয়, মমতায়ও নয়, বোধহীন যান্ত্রিকতায় হাতটা সরিয়ে দিতে পাশ ফিরল পার্থ। সামান্য বিরতি দিয়ে ওর ঘুমজড়িত নিঃশ্বাসের শব্দ আরও ভারী ও জোরালো হয়ে ফিরে এল জিনার কানে।

বিছানার ওপর আস্তে উঠে বসল জিনা। সঙ্গে সঙ্গে অনুভব করল কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত কেমন এক অসাড়তা বাধা আনছে শরীরে; প্রায় একই অনুভূতি থেকে জ্বালা বোধ করল নীচের ভিতরের মাংসে। তখন ঘৃণা হতে লাগল নিজেরই ওপরে। খাট থেকে নেমে, পাশের ঘরে গিয়ে, কাচের জানলার পর্দাটা পুরো সরিয়ে দিল সে। সামনে ঘুমন্ত কটেজগুলো, সমান দূরত্বে সাজানো সাদা আলোর ডোম চিনিয়ে দিচ্ছে কোনদিকে গেলে কোথায় পৌঁছুনো যায়। গাছের পাতার নড়াচড়া দেখে বোঝা যায় হাওয়া আছে। আজ আকাশে আলো বেশি; যেন তার দৃষ্টিতে ধরা দেবার জন্যেই অদৃশ্য থেকে ক্রমশ ফুটে উঠছে একটার পর একটা তারা। একটা বড় পিঁপড়ে নীচে থেকে উঠে এল জানলার কাচে, অনেকটা উঠে, আবার নেমে, ঠিক কোনদিকে যাবে ঠাহর করতে না পেরে ডানদিক থেকে বাঁদিকে,

নীচে থেকে ওপরে জায়গা বদলে বদলে ঘুরতে লাগল। আগে লক্ষ করেনি, চাঁদের আলো দরজার পাশের গাছের ফাঁক দিয়ে গলে নির্দিষ্ট প্যাটার্ন তুলে দুলছে কটেজের বাইরের দেয়ালে। পলকহীন দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জিনা ভাবল, পার্থ ভুল বলেনি। ইচ্ছেটা তারও ছিল। হয়তো তারই ছিল। ইচ্ছে না থাকলে সে অসীমের ট্যুরে যাবার সুযোগ খুঁজত না। ইচ্ছে না থাকলে সে পার্থকে অফিসে ফোন করে দুপুরে আসতে বলত না ফ্ল্যাটে। নিজের ইচ্ছে না থাকলে সে কি শুধুই পার্থর আবদারে সায় দিয়ে টু-পিস পরে দ্বিধাহীন ভঙ্গিতে চলে যেতে পারত বিচে। এবং তারই ইচ্ছা পূরণের জন্যে জলের মতো টাকা খরচ করছে পার্থ। গায়ত্রীকে ঠকাচ্ছে, ফাঁকি দিচ্ছে অফিসের কাজে। কোন শর্তে! পরিবর্তে সেও কিছু নেবে। জিনা স্বেচ্ছায় দিলে ভাল, না হলে জোর করে। ভালবাসার পোশাকে আড়াল হয়ে যায় শরীর। কিন্তু শরীর শূন্য হয়ে গেলে আর কী থাকে।

এ কেমন অবস্থা হল তার! বশ্যতার মধ্যে দিয়ে আট ন'বছর ধরে আস্তে আস্তে চিনেছিল অসীমকে; ওর প্রতি অনুগত থাকতে থাকতেই যে একটা বেপরোয়া ভাব এসে গেছে নিজের মধ্যে, সেটা বুঝতে পেরেছিল পার্থর সঙ্গে দেখা হবার পর। একবারও মনে হয়নি কোথাও কোনও আড়াল রাখা দরকার। কিন্তু, এ কোন পার্থকে দেখছে সে! কাল সকালে যখন আবার দেখা হবে তখন তারা কি বদলে যাবে না অনেকটা! তা সত্ত্বেও তাকে নির্ভর করতে হবে পার্থরই ওপর—যে তাকে পরশু সকালের ফ্লাইটে ভুবনেশ্বর থেকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে কলকাতায়; অসীমের কাছে। মড়ার গা থেকে খুলে আনা পোশাকের মতো—ব্যবহৃত, ব্যবহৃত, ব্যবহৃত; যদি এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলে থাকে, যদি কোনও অঘটন না ঘটে, তাহলেও মৃতের গন্ধটা কি ফিরে আসবে না বার বার, তার কাছে! একাকিত্বের কোন হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবে সে।

আরও কিছুক্ষণ একই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল জিনা। বেডরুমের অন্ধকারে ফিরে এসেও আবার ফিরে গেল জানলার পাশে। শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল চন্দ্রালোকিত স্তব্ধতার দিকে। যেন সে দাঁড়িয়ে আছে কোনও নির্দেশের অপেক্ষায়। দৃশ্য বদলে যাচ্ছে ক্রমশ। ভিজে চোখের সামনে নিঃশব্দ উচ্ছ্বাসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে একটার পর একটা ব্রেকার, রাশি রাশি ফেনা শুকিয়ে যাচ্ছে বালিতে। কাল ভয় লেগেছিল। এখন মনে হচ্ছে কী যেন আছে ওই নিরবধির মধ্যে। চোখ ফেরানো যায় না।

ক্রমশ হাই উঠে এল গলায়, প্রকাশ হবার আগেই নেমে গেল বুকে। মনে পড়ল স্লিপিং ট্যাবলেট আছে হ্যান্ডব্যাগে—ট্রেনে আসতে আসতে খেয়েছিল একটা; বাকি রাতটুকু আচ্ছন্ন হয়ে থাকার জন্যে আজও একটা খেতে পারে সে।

সকালে ঘুম ভাঙল দেরিতে। পার্থর অভ্যাস আছে, সে-ই উঠিয়ে দিল। ইতিমধ্যে ভুবনেশ্বর যাবার জন্যে তৈরি হয়ে নিয়েছে নিজে। অর্ডার দিয়েছে ব্রেকফাস্টের। কিছু বা অস্বস্তি নিয়ে বলল, 'কাল রাত্রে বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। কী করব! তুমি এমন পাগল করে রাখো!'

জিনাকে নিঃশব্দ দেখে এগিয়ে এসে হাত রাখল ওর কাঁধে।

'বার বার ক্ষমা চাইতে ভাল লাগে না!'

খাপছাড়া দৃষ্টিতে পার্থর দিকে তাকাল জিনা। সঙ্গে সঙ্গে চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, 'অন্যায় তো কিছু করোনি।'

'ঠিক বলছ তো?'

ব্রেকফাস্ট সারতে ব্যস্ত হয়ে উঠল পার্থ। তারপর বলল, 'বিশ্বাস করো, ভুবনেশ্বর যাওয়াটা জরুরি। তোমাকে লেট ডাউন করব না। যদি ফিরতে দেরি হয়, তাহলেও চিন্তা কোরো না। বুঝবে কালকের ফ্লাইটের টিকিট পেয়ে গেছি। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিরে আসব। আজ আর কোনও ঝগড়া নয়—'

বেরুবার আগে পার্থ আবার টেনে নিল ওকে। ঠোঁটে ঠোঁট রাখার ধরনে অস্বাভাবিকতা নেই কোনও। উদাসীন নিজেকে ওর ইচ্ছায় সমর্পণ করতে করতে নিরপেক্ষতার মধ্যেও ঠোঁটের ভিতরে পুরনো জ্বালাটা অনুভব করল জিনা। এবং দরজায় দাঁড়িয়ে দেখল, পার্থ যেভাবে যাচ্ছে মানুষ সেভাবেই যায়—এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই কোনও। সম্ভবত তার এই দাঁড়িয়ে থাকার মধ্যেও অস্বাভাবিকতা নেই কোনও। দৃশ্যের স্থিরতা এইভাবেই দেখায়। শুধু অনুভব করল, এই স্থিরতায় সে একাই দাঁড়িয়ে আছে। যেমন মনে হত মাঝে মাঝে, অসীমের ফ্ল্যাটের ব্যালকনিতে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে। তফাতটা কোথায়! বাস্তব একভাবে দেখালেও মনেই হচ্ছে না সে অন্য কোথাও। তিনটি রাত কেটে গেল, কেটে যাচ্ছে তিনটি দিনও। কত দ্রুত কেটে যাচ্ছে সময়!

সত্যিই দ্রুত।

বিকেলে একা-একাই পুরীর দিকে যাবার জন্যে হোটেলের বাসে উঠল জিনা। জায়গাটা চেনা। ওখান থেকে রিকশা নিয়ে সহজেই পৌঁছে যেতে পারবে স্টেশনে। লাইনে দাঁড়াবে। টিকিট কাটবে। উঠে পড়বে যে-কোনও কম্পার্টমেন্টে। জায়গা পেলে বসবে, না হলে দাঁড়িয়েই যাবে। একটা ঠিকানা থাকলেও এখন সে নিজের কাছেই ফিরছে। অবৈধের ভয় নেই, সুতরাং কে দেখল না দেখল তাতেও যায় আসে না কিছু।

পার্থ ফেরেনি তখনও। কখন ফিরবে তাও জানে না। ফিরে কি হতাশ হবে, কিংবা বিচলিত? এসব ভেবেও প্রাণপণ নিজেকে নিজের সিদ্ধান্তে বেঁধে রাখল সে। তার জন্যে যে এত খরচ করেছে হোটেলের বিল মেটানোর দায়িত্বও তার; এরকমই তো শর্ত ছিল! জানত, স্যুটকেস নিয়ে চলে যেতে দেখলে রিসেপশন বাধা দিতে পারে। সুতরাং স্যুটকেস খালি করে নিজের যেটুকু যা ছিল ঠেসে ভরে নিল ক্যারি-অন ব্যাগে। পার্থ যাতে অন্য কিছু না ভাবে এবং বিচলিত না হয়, সেজন্যে একটা চিরকুট লিখে রেখে এসেছে খালি স্যুটকেসটার ভিতরে—'আগেকার হিসেব মতো আজ সন্ধ্যাতেই ফেরার কথা ছিল, তা-ই যাচ্ছি। একাই যেতে চাই। নিজের কাছে পরিষ্কার আছি, ঠকাইনি। স্যুটকেসটা ফেলে দিলেই চলবে।'

বাস থেকে নেমে রিকশায়। সেখান থেকে স্টেশনে। মনে পড়ল কাল এই সময় সে চিল্কা থেকে ফিরেছিল পার্থর সঙ্গে। তারও আগে, পরশু দাঁড়িয়ে ছিল সমুদ্রের ধারে। আকস্মিক ব্রেকারের ধাক্কায় পড়ে যেতে যেতেও সামলে নিয়েছিল পার্থকে ধরে। তারও আগে, সকালে, যখন একা-একাই ট্রেন থেকে নেমে পার্থকে দেখে অদ্ভুত অনুভূতিতে ভরে তুলেছিল নিজেকে, তখনও ভাবেনি একাই ফিরবে।

ভাবনায় এলোমেলো হয়ে উঠছে নিঃশ্বাস। মাঝে মাঝেই ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে চোখ। তবু সে রিকশা থেকে নেমে টিকিট কাউন্টারে লাইনের পিছনে দাঁড়াল। রিজার্ভেশনের ভাবনা নেই, টিকিট পাবেই। তাহলে সে সত্যিই যাচ্ছে।

টিকিটটা হাতে পেয়ে স্টেশনের ভিড়ে মিশে গেল জিনা। প্ল্যাটফর্মে ঢুকল। দেখল

যাত্রীরা আসছে ক্রমশ। ভিড় বাড়ছে। দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনটা এরই মধ্যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে, সেইরকমই মনে হল তার। ডানদিকে এগিয়ে আবার ফিরে এল বাঁদিকে, ব্যস্ততার মধ্যে কাঁধ বদল করে নিল ক্যারি-অন ব্যাগটা। যে-কোনও কামরায় একটু জায়গা কি সে পাবে না!

সেই ছুটোছুটির মধ্যেই হঠাৎ একটি কণ্ঠস্বর শুনে থমকে দাঁড়াল সে। পিছনে তাকিয়ে দেখল, প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে সেই বিকলাঙ্গের দলটি। সঙ্গে বিচে দেখা হওয়া সেই মহিলা এবং আরও তিনজন। কাউকে হাঁটিয়ে, কাউকে ধরে, কাউকে বা নিজে হাঁটার জন্যে প্রশ্রয় দিতে দিতে এগিয়ে যাচ্ছে ডানদিকে। মনে পড়ল, মহিলা বলছিলেন আজই ফিরবেন।

একদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ ওদের দিকে তাকিয়ে থাকল জিনা। একটা অনুভূতি আসছে, হাত-পায়ের অসাড়তা থেকে ক্রমশ জেগে উঠছে এক ধরনের চাঞ্চল্য, কেন বুঝতে পারছে না। অস্পষ্ট সেই অনুভূতির মধ্যেই ওরা যেদিকে সেদিকেই যাবার জন্যে এগিয়ে গেল সে।

সিনেমায় যেমন হয়

উৎসর্গঃ
সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ-কে

১

মার্চ মাসের এক বুধবার ভোরে আকাশের দিকে তাকিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল গার্গীর। অদ্ভুত ঘোলাটে হয়ে আছে চারদিক, আলো ফুটলেও অস্বচ্ছতা কাটেনি, আশপাশের ঘরবাড়ি গাছপালা কেমন যেন থম মেরে আছে বিষণ্ণতায়। একটু খেয়াল করতেই বুঝল বৃষ্টিও পড়ছে, তবে থেমে থেমে, এক দু ফোঁটায়। এমন বৃষ্টি নৈঃশব্দ্যে চিড় ধরায় না এতটুকু।

এই সময় সাধারণত পরিষ্কার থাকে আকাশ, ফুরফুরে হয়ে থাকে হাওয়া। বসন্তকালে যেমন হয়, বিশেষত ভোরে আর সন্ধের পরে দিব্যি অনুভব করা যায় চমৎকার সেই হাওয়ার স্পর্শ—তাদের এই দু দিক চাপা একতলার ভাড়া বাড়িতেও। শোবার ঘরের দুটি জানালাব একটি দক্ষিণমুখো; হাত চারেক দূরে আর একটা বাড়ির আড়াল থাকলেও ওই হাওয়া জানলা গলে প্রায়ই ঢুকে পড়ে ঘরে, পাখার হাওয়ার সঙ্গে মিশে স্বস্তি এনে দেয় ঘুমে। দিন দুয়েক ধরে অবশ্য গরম পড়তে শুরু করেছিল, কমে আসছিল হাওয়ার ফুরফুরে ভাবটা। তা বলে হঠাৎ এমন মেঘ করে আসবে, বৃষ্টি শুরু হয়ে যাবে, কে ভেবেছিল।

অন্যদিন হলে ভোর-আকাশের এই ঘনঘটা দেখলে খুশি হত গার্গী। এ সময় ঝেঁপে দু এক পশলা বৃষ্টি হলে গরমটা পিছিয়ে যেত, আরও কয়েকটা দিন কাটানো যেত স্বস্তিতে। বাস্তবিক এই একতলা বাড়ি, গরম আর মাঝেমধ্যে লোডশেডিং মিলিয়ে ভাবলে দীপ্র আর দীপঙ্করের জন্যে কষ্ট হয় তার। বিশেষ করে দীপঙ্করের জন্যে। মনে হয় নিজের জেদ বজায় রাখতে জোর করেই তার স্বামীকে আয়াসে অভ্যস্ত জীবন থেকে এই ক্লেশের জীবনে টেনে এনেছে সে। দীপ্র দীপঙ্করেরও ছেলে, ও-ও কি পারত না বাপের ভাগ্যের অংশীদার হতে! তবে এই শেষের ভাবনাটাকে বিশেষ আমল দেয় না গার্গী। দীপ্র এখনও ছোট, এখন থেকেই যদি অধিকাংশ মানুষের বাস্তবে অভ্যস্ত হতে শেখে তাহলে শরীরে মনে ক্রমশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠবে ও, ভবিষ্যতে যে-কোনও অবস্থার সঙ্গেই মানিয়ে নিতে পারবে নিজেকে।

আজ খুশি হল না, বরং একটা আশঙ্কা ক্রমশ অধিকার করে নিল তাকে। পর পর ভাবল, এখন বৃষ্টি নামা মানে কমলার আসা অনিশ্চিত করা, কমলার না আসার অর্থ দীপ্রকে স্কুলে নিয়ে যাওয়া, ফিরিয়ে আনা এবং সে বা দীপঙ্কর যতক্ষণ না বাড়ি ফেরে ততক্ষণ পর্যন্ত ওকে আগলে রাখার ব্যাপারটা ভেস্তে দেওয়া। অথচ আজ তার অফিসে যাওয়া একান্ত জরুরি। ছেলের জ্বর, ডাক্তার দেখাতে নিয়ে যাবে বলে কাল তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিল কমলা, তখনই ওকে আজকের কথা বলে রেখেছিল গার্গী। কমলা বলেছিল তাহলে একটু আগে আসবে। তার মানে সাতটার জায়গায় সাড়ে ছ'টায়। তার দেরি আছে এখনও।

তাহলে এখন থেকেই দুশ্চিন্তা করার কী মানে হয়।

এই মুহূর্তের উৎকণ্ঠা থেকে জোর করে বেরুবার চেষ্টায় নিজেরই হাসি পেল গার্গীর। ঘরপোড়া গোরু। যতই তাড়াবার চেষ্টা করুক, ফিরে ফিরে আসে আশঙ্কাগুলো। এখন যা ভাবছে, কে জানে কেন, কাল রাতে শুতে যাবার সময়েও একই ভাবনা ছেয়ে রেখেছিল মাথা। ঘুম হয়নি ভাল। এখন আলস্য টের পাচ্ছে।

দিনটা অন্যরকম হলেও চারদিকে ভোর হওয়ার পরিচিত শব্দগুলো ফুটে উঠছে আস্তে আস্তে। কলকাতার দুর দক্ষিণে এই জায়গাটায় শহর ঢুকে পড়লেও কিছু গাছগাছালি আছে এখনও, কিন্তু ক্বচিৎ শোনা যায় কাক ছাড়া অন্য কোনও পাখির ডাক। ভোরের শব্দ বলতে রিকশার ভেঁপু, সাইকেলের ঘন্টি। বেলা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ নিয়মিত হয়ে ধারাবাহিকতায় মিশে যাবার আগে এগুলোকে চেনা যায় আলাদা করে; সামনের রাস্তায় হঠাৎ-হঠাৎ হানা দিয়ে যায় ট্যাক্সি বা মোটর। বাড়িঅলা গোপাল নন্দী খালি পেটে কবরেজি ওষুধ খেয়ে মর্নিং ওয়াকে বেরোন প্রতিদিন, কী ওষুধ কে জানে, তবে দোতলায় খলনুড়ি ঘাঁটার শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ ধরে গড়াগড়ি দেয় তাদের সিলিংয়ে। সিঁড়িতে শোনা যায় পায়ের শব্দ, গোপালবাবু বেরুচ্ছেন, দরজার ল্যাচ বন্ধ হওয়ার শব্দ। এরপর আসবে ওঁদের ঠিকে ঝি টগরের মা, বেল দেবে সিঁড়ির দরজায়। ওখান থেকে কাজ সেরে তাদের দরজায় আসতে আসতে আরও আধঘণ্টা।

ল্যাচ বন্ধ হবার শব্দটা কানে নিয়ে বারান্দা থেকে শোবার ঘরে ফিরে এল গার্গী। সে উঠে পড়ার পর বিছানায় বাড়তি জায়গা পেয়ে ব্যাঙের মতো থ্যাবড়ানো ভঙ্গিতে শুয়ে আছে দীপ্র। সাড়ে চার বছর বয়স হলেও ছেলেটা গায়ে বাড়েনি তেমন, ঘুমোলে আরও ছোট লাগে। এদিকে পাশ ফিরে দীপঙ্কর, ওর মৃদু নাক ডাকার শব্দ বুঝিয়ে দেয় সহজে উঠবে না। পাখা চলছে ফুল স্পিডে। আগে খেয়াল করেনি, ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে এখনই সামান্য ঠাণ্ডা অনুভব করল গার্গী। হয়তো ভিজে আবহাওয়ার জেরে। এমনও হতে পারে রাত থাকতেই শুরু হয়েছে বৃষ্টি, জোরও ছিল। আচ্ছন্নতার মধ্যে সে নিজেও টের পায়নি।

এগিয়ে গিয়ে রেগুলেটব ঘুরিয়ে পাখার স্পিড কমিয়ে দিল গার্গী। ঠাণ্ডা এড়ানোর জন্যে ভেজিয়ে দিল দক্ষিণের জানলার কপাট দুটো। এরপর সে রান্নাঘরে ঢুকবে, চা কববে। রোজ যেমন করে, বসবার ঘরের জানলাগুলো খুলে ডাকবে দীপঙ্করকে।

প্রতিদিনের ব্যস্ততায় নিজেকে জড়াতে গিয়ে আবার অফিসের চিন্তা ফিরে এল মাথায়।

গতকাল দুপুর থেকেই ছুটি চেয়েছিল কমলা। ওকে ছেড়ে দেবার জন্যে সে নিজেই যদি ডুব মারত অফিসে, তাহলে হযতো আজকের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবতে হত না। জ্বর বা অন্য যে-কোনও অজুহাতে আরও একটা দিন কাটিয়ে দিতে পারত বাড়িতে বসে। এই ধরনের প্রয়োজন থাকে ভেবেই প্রাপ্য ছুটিগুলো জমিয়ে রাখে সে। সমস্যা হল, কাল সে ভেবেছিল উলটোদিক থেকে।

জরুরি কতকগুলো স্টেটমেন্ট তৈরি করে নোটসমেত কাল বিকেলের মধ্যে জমা দেবার কথা ছিল সেকশনের ম্যানেজার সোমেশ্বর রায়ের কাছে। ভেবেছিল কথামতো হয়ে যাবে কাজটা। কিন্তু বাধা পড়ল শেষ হবার মুখে। একটা ফাইল আটকে আছে অডিট সেকশনে। যিনি দিতে পারবেন সেই অলক চক্রবর্তী তালাচাবি লাগিয়ে লাঞ্চের আগেই চলে গেছেন ইনকাম-ট্যাক্স অফিসে। আজ আর ফিরবেন না।

গার্গীকে বিপর্যস্ত করে দেবার পক্ষে এই খবরটুকুই যথেষ্ট ছিল। সেকশন আলাদা

আলাদা হলেও একই অফিসের কাজে বেশ কিছু বারোয়ারি ব্যাপার থাকে, এটা ওটা চেক করার জন্যে এ ডিপার্টমেন্ট থেকে ও ডিপার্টমেন্টে ঘোরাফেরা করে ফাইল। এই অবস্থায় কী কারণে স্টেটমেন্টটা আজ শেষ পর্যন্ত তৈরি করা গেল না সোমেশ্বরকে তা বলতে পারত গুছিয়ে। সোমেশ্বর ক্ষুব্ধ হলে তার দায়িত্ব থাকত না। সেজন্যে নয়। গার্গী অস্বস্তিতে পড়েছিল নিজেকে নিয়েই। চারটে সওয়া চারটের মধ্যে তারও অফিস থেকে বাড়ি ফেরার কথা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত অনেকটা সময় বাড়ি থাকে না সে আর দীপঙ্কর, সেই সময়টায় দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনা, জামাকাপড় ছাড়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো এবং বিকেলে পার্কে বেড়াতে নিয়ে যাবার জন্যে রেখেছে কমলাকে। দীপ্রর দেখাশোনা করা ছাড়া অল্পস্বল্প রান্নাবান্নাও করে। মাঝবয়েসী, বিশ্বাসী মেয়ে। গার্গী ওকে পুরো সময়ের জন্যেই রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে সংসার থাকায় রাজি হয়নি কমলা। সাত পাঁচ ভেবে এই ফুরন ব্যবস্থাই মেনে নিয়েছিল সে। দীপ্রকে আগলানোর লোক না পেলে চাকরি ছেড়ে তাকে বসে থাকতে হত বাড়িতে।

সেটা হয় না। গার্গী এখন টাকার মর্ম বোঝে। মাস গেলে হাজার দুয়েক আসবে নিজের হাতে, এই ভাবনায় অনেকটা আত্মবিশ্বাসী লাগে নিজেকে। জোর পায় হাঁটাচলায়।

আর একটা কারণও ছিল। বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কে চিড় ধরায় পারিবারিক ব্যবসা থেকে সরে এসে নিজে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে দীপঙ্কর। ওই একই, সিভিল এঞ্জিনিয়ারিং লাইনে, কনসালটেন্সির কাজে। সংসার খরচের অনেকটাই রোজগার করে আনলেও এখনও নিশ্চিন্তিতে পৌঁছুতে পারেনি। কম্পিটিশন বেড়েছে, আছে আরও নানা ঘাট, একার চেষ্টায় কল্কে পায় না। তখন হতাশা ও বিরক্তিতে ভোগে। মাঝে মাঝে গার্গীর মনে হয়, দলের মধ্যে থেকে কাজ করলে ঠিক আছে, কিন্তু একার উদ্যমে এসব কাজে হয়ে উঠতে গেলে যে-ধরনের মানসিকতার দরকার, তা দীপঙ্করের নেই। ওকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু ওর ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় কি!

বাড়ি ফেরার তাড়া থাকায় যত দ্রুত সম্ভব কাজটা শেষ করার চেষ্টা করেছিল গার্গী। লাঞ্চের জন্যে বরাদ্দ সময়েও নড়েনি টেবিল ছেড়ে। কিন্তু ফাইলটা না পাওয়ায় ঝামেলা বাড়ল, সেই সঙ্গে উদ্বেগও। কাজ সম্পূর্ণ হল না, সে-কথা বলা যায় সোমেশ্বরকে, কিন্তু কী করে বলবে ছেলে আগলাতে তাকেও চলে যেতে হবে তাড়াতাড়ি? শুনে সোমেশ্বর মাথা নাড়বে হয়তো, গার্গী ভেবেছিল, কিন্তু এমন ভাবে তাকাবে যার অর্থ অফিসটাকে আড্ডাখানা করে তুলেছে এরা, কাজ না করার জন্যে একটা না একটা অজুহাত লেগেই আছে।

সাড়ে তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করে মরিয়া হয়ে সোমেশ্বরের ঘরে ঢুকল গার্গী। বলল, 'আমি যদি আজ একটু তাড়াতাড়ি চলে যাই, কোনও অসুবিধে—'

আগে থেকেই গম্ভীর হয়ে ছিল সোমেশ্বর। গার্গীর কথা শুনে আড়ে দেয়ালঘড়ির দিকে তাকিয়ে হাসল একটু। বলল, 'থেকেই বা করবেন কি, আমার কাজ এগোবে না। চলে যান।'

কথাগুলোয় অপমান আছে কি না ভাববার জন্যে সামান্য সময় নিল গার্গী এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছুল, খানিক ক্ষোভ প্রকাশ করলেও সোমেশ্বর তাকে অন্য কোনও ছুতোয় আটকাতে চায়নি। কাজের দায় শেষ পর্যন্ত সোমেশ্বরেরই, একত্রিশ মার্চ ফিনান্সিয়াল ইয়ার শেষ হবার আগে ম্যানেজমেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে হবে ওকে। দু-তিন দিন ধরে তাড়া

দিচ্ছিল, আজও ঠেকে যাওয়ায় হতাশ হওয়া আশ্চর্যের নয়। তখন বলল, 'কাল আর্লি আসব, মিস্টার চক্রবর্তীর কাছ থেকে ফাইল নিয়ে দশটার মধ্যে সব পেপারস রেডি করে দেব আপনাকে।'

'দেখুন পারেন কি না।' সোমেশ্বর উৎসাহ দেখাল না। বলল, 'আপনি আর্লি এলেও মিস্টার চক্রবর্তী যে ঠিক সময়ে আসবেন তার ঠিক কি। ওঁরও ঝামেলা চলছে। যাক গে, আপনার তাড়া আছে, আপনি যান।'

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের যে-জায়গায় তার অফিস, সেখান থেকে যাতায়াতের ট্রান্সপোর্ট পাওয়া সহজ নয়; হয় যেতে হবে চৌরঙ্গিতে না হয় লোয়ার সার্কুলার রোডে। দু'দিকেই দূরত্ব প্রায় সমান, দ্রুত হাঁটলেও আট দশ মিনিট লাগে। বিকেলের এই সময়টায় ট্যাক্সিও পাওয়া যায় না চট করে। তা ছাড়া, ট্যাক্সির যা ভাড়া, যাদবপুর পেরিয়ে বাড়ি পর্যন্ত যেতে কুড়ি-বাইশ টাকা লাগবে। হুটহাট এমন খরচ করতে বড্ড গায়ে লাগে। ভাগ্য ভাল, লোয়ার সার্কুলার রোডে পৌঁছে একটা মিনিবাস পেয়ে গেল। ওই দিকেই যাচ্ছে। তাহলেও দেরি হয়েছিল। কমলার মুখ ভার। দরকারে ছেলের ওষুধ কেনার জন্যে ওর হাতে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে আজকের প্রয়োজনের কথাটা বুঝিয়ে বলেছিল গার্গী। কমলা চলে যাবার পর ভাবল, সে অজুহাতের কথা ভাবতে পারলে কমলা ভাববে না কেন! ছেলের জ্বরের কথাটা সত্যি হলে জ্বর বাড়তেও পারে, তাকে ফেলে কি কমলা গার্গীর ছেলের দায় মেটাতে আসবে!

রান্নাঘরের সরু জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থাকতে থাকতে পুরোপুরি অন্যমনস্কতার মধ্যে গতকালের ঘটনায় ফিরে গিয়েছিল গার্গী। দাঁড়ানোর ভঙ্গি এবং চোখের দৃষ্টি দেখে মনে হবে তিন-চার মিনিট নয়, একই ভাবে পার করে দিয়েছে তিন-চার ঘণ্টা; এর মধ্যে অস্বচ্ছ ভাব কাটিয়ে সামান্য ঔজ্জ্বল্য ফুটেছে আলোয়, তা পর্যন্ত লক্ষ করেনি। হঠাৎ সদর দরজায় বেল পড়তে সচকিত হল।

এত সকালে কে হতে পারে! টগরের মা হলে নিশ্চিত দোতলার সিঁড়ির দরজায় বেল দিত। ওপরের বেলের শব্দ তাদের একতলাতেও শোনা যায় স্পষ্ট, তবে তফাত আছে দুটি শব্দের মধ্যে। তফাতটা চিনতে চিনতে এখন শুধু সে বা দীপঙ্কর নয়, দীপ্রও আলাদা করতে পারে। তাহলে কি কমলা? তাড়াতাড়ি আসতে বলছিল, তাড়াতাড়িই এসেছে! নাকি অন্যমনস্কতাই তাকে এ-রকম শোনাল! গার্গী ঠিক বুঝতে পারল না।

এ পাড়ায় তারা এসেছিল শীতের গোড়ায়। এই চার পাঁচ মাসে প্রতিবেশীদের কারও কারও সঙ্গে মুখ চেনা হলেও প্রত্যক্ষ পরিচয় বলতে যা বোঝায় তেমন কারও সঙ্গেই হয়নি; কেউ যেচে আসবে, আলাপ করবে তেমন সুযোগও ঘটেনি। স্বামী-স্ত্রী তারা দু'জনেই ব্যস্ত, বেশিরভাগ সময়েই বাড়িতে থাকে না। এ-রকম অবস্থায় যা হয়, ঠিকঠাক প্রতিবেশী হয়ে ওঠার উপলক্ষও পায় না। তার ওপর দীপঙ্কর স্বভাবে অমিশুকে। বরাবর বালিগঞ্জের বনেদি পাড়ায় থেকে একটা নাক-উঁচু ভাব এসে গেছে মনে, শহরতলিতে এই বাধ্যতামূলক নির্বাসন মেনে নিতে পারেনি কখনও। অঞ্চলটাকে 'মিডল ক্লাস স্লাম' ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না ও, সেই জন্যে নিজে থেকে কারও সঙ্গে আলাপের গরজ দেখায়নি কোনও দিন। বাড়িঅলা গোপালবাবুর স্ত্রী সুরমা আলাপী মানুষ, ওঁর কাছে মাঝে মধ্যে গেছে গার্গী, মাসান্তে বাড়ি ভাড়াটাও সে-ই দিয়ে আসে। পাড়ায় আলাপ বলতে এইটুকু। তাদের তুলনায় দীপ্র বরং তার বয়েসী ছেলেমেয়েদের কাউকে কাউকে চেনে, পার্কে বেড়াতে গিয়ে কার

কার সঙ্গে দেখা হয়, কে কোন বাড়িতে থাকে, কাদের গাড়ি আছে না আছে সেসব গল্পও করে। এই অবস্থায় পাড়ার কেউ এসে কোনও কারণে দরজায় বেল দেবে মনে হয় না, প্রয়োজনটাই বা কি। দীপঙ্করের আত্মীয়-স্বজনরা এ বাড়ির ছায়া মাড়ায় না, তার নিজের মা-বাবারা থাকেন পার্ক সার্কাসে। এ বাড়িতে কে কত বার এসেছে তা হাতে গোনা যায়।

তাহলে কে আসবে!

ভুল করে কেউ বেল দিয়েছে কি না দেখবার জন্যে আরও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল গার্গী এবং আবারও শুনল শব্দটা, স্পষ্ট, তাদেরই দরজায়।

দ্রুত বসবার ঘরের দিকে হেঁটে গেল গার্গী। এতক্ষণের অন্যমনস্কতার মধ্যে জানলা দুটো খোলা হয়নি, ছোপ ছোপ অন্ধকারে অস্পষ্ট হয়ে আছে ঘরের আসবাব। দরজায় গিয়ে ম্যাজিক আইয়ের ভিতর দিয়ে চোখ গলিয়ে দেখতে পেল না কাউকে। তখন ব্যস্ত হাতে ছিটকিনি এবং খিল দুটোই খুলে এক দিকের কপাট হাট করে তাকাল বাইরে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে হাসছে ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথই। গোড়ার অবিশ্বাস কাটিয়ে চোখে পড়ল গেটের বাইরে রাস্তায় দাঁড় করানো ওর কালো অ্যামবাসাডর।

আগন্তুককে চিনতে পারলেও সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হতে পারল না গার্গী। বরং নতুন একটা ভাবনায় আড়ষ্টতা এসে গেল শরীরে।

ইন্দ্রনাথ এগিয়ে এল। পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ শার্ট, পায়ে স্ট্র্যাপ জুতো। ঠিক সকালের পোশাক নয়।

'ঘুম ভাঙালাম নাকি?'

'না, না। আসুন।' নিজেকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করল গার্গী। দরজার অন্য কপাটটাও খুলে সরে এল ঘরের মধ্যে। তারপর ব্যস্তভাবে জানালাদুটো খুলে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'ইন্দ্রদা, কোনও খারাপ খবর নয় তো? মা বাবা কেমন আছে?'

'ভাল। সবাই ভাল আছে।' ততক্ষণে ঘরের ভিতর ঢুকে এসেছে ইন্দ্র, আঙুলে জড়ানো গাড়ির চাবির রিংটা অভ্যাসবশত ডানদিকে বাঁদিকে চক্রাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে বলল, 'হঠাৎ খারাপ খবরের কথা মনে হল কেন!'

'এত সকালে তো কেউ আসে না। তাই—' কথাটা ঘুরিয়ে নিল গার্গী, 'দরজা খুলতে দেরি হল। আগেও একবার বেল দিয়েছিলেন, তাই না? আমি চা করছিলাম—'

'দ্যাখো, তাহলে সময় বুঝেই এসেছি। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ মনে হল এক কাপ চা খেয়ে যাই। অনেক দিন দেখাও হয় না।'

গার্গী ইন্দ্রকে দেখছিল। সহজ ভঙ্গিতে কথাগুলো বললেও একটা ক্লান্তির ভাব ফুটেছে মুখে। মাঝারি গড়নের স্বাস্থ্যবান পুরুষ, রং পরিষ্কার, মাথার চুল ঘন ও ঈষৎ কোঁকড়ানো, জুলপি ও কানের পাশে পাক ধরেছে সামান্য—সাধারণ ভাবে ইন্দ্রর কপাল, নাক, ঠোঁট ও চিবুকের গড়নে এমন এক ধরনের সামঞ্জস্য আছে যাতে ওকে প্রায় সব সময়েই আত্মবিশ্বাসী দেখায়। কিছুটা সরলও। কথাবার্তাতেও ধরা পড়ে এই খোলামেলা ভাবটা। স্বভাব মেনে কথা বললেও আজ ওকে একটু অন্যরকম লাগছিল।

সম্ভবত একটু বেশিক্ষণই তাকিয়ে ছিল। চোখাচোখি হতে চোখ নামিয়ে নিল গার্গী এবং খেয়াল করল যতটা সম্ভব ভব্য হয়ে থাকলেও এখনও সে রাতের পোশাকেই আছে, ব্রা পরেনি, চিরুনি দেয়নি চুলে। এটা ঠিক বাইরের লোকের সামনে বেরুনোর সাজ নয়।

ইন্দ্র বলল, 'তোমাকে চিন্তিত লাগছে?'

'না। চিন্তিত হব কেন!' শাড়ির আঁচলটা গায়ে পিঠে ভাল করে জড়িয়ে নিতে নিতে রাস্তার দিকে তাকাল গার্গী। চার চাকার গাড়িতে টাটকা সবজি তুলে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে দুটো লোক। বড় রাস্তায় বাজারে গিয়ে বসবে। যেদিক থেকে এল সেদিকে পিচের রাস্তা অনেক দূর এগিয়ে মিশে গেছে আশপাশের চাষের জমি, পুকুর, ও ফাঁকা মাঠ ঘেরা কাঁচা রাস্তায়। ওদিকটায় কিছু খাপড়ার চালের কাঁচা বাড়ি থাকলেও পুরোপুরি বসতি গড়ে ওঠেনি। এখানে আসার পর এক শীতের বিকেলে দীপ্রকে নিয়ে সে গিয়েছিল একদিন। ঠেলাটা পেরিয়ে যাবার পর ইন্দ্রর গাড়ির গা ঘেঁষে একটা সাইকেল রিকশা চলে গেল। দুটি বাচ্চা নিয়ে মাথায় ঘোমটা টানা এক যুবতী। দেখল, গেট খুলে ঢুকছে টগবের মা। হাঁটার ধরনে ব্যস্ততা। সিঁড়ির দরজায় পৌঁছে প্রয়োজনের চেয়ে জোরে বেলে চাপ দিল।

গার্গী ভাবল, ইন্দ্র তাকে চিন্তিত দেখল কেন! এটা ঠিক, কমলা এসেছে ভেবে দরজা খুলে ইন্দ্রকে দেখে একটু হকচকিয়ে গিয়েছিল সে। তাহলে কি তার চোখেমুখে হতাশাও ফুটেছিল, ব্যাপারটা ইন্দ্রর দৃষ্টি এড়ায়নি! কিন্তু এমন হবে কেন! বাস্তবে অনেক দিন পরে ইন্দ্রকে দেখে তার খুশিই হবার কথা। নিজের বউদির দাদা, সম্পর্কটা খুব দূরের নয়, খুব কাছেরও নয়, নিতান্তই আত্মীয়তার। কিন্তু, গার্গী জানে, শুধু এইটুকু সম্পর্কের মধ্যেই ইন্দ্রকে ধরে রাখা যায় না।

জোর করেই এবার মুখে হাসি টেনে আনল গার্গী। ইন্দ্রকে বসতে বলে বলল, 'রহস্যটা ধরবার চেষ্টা করছিলাম। ইন্দ্রদা, এই সকালে ভবানীপুর থেকে হঠাৎ ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে আসতে যাবেন কেন!'

বেতের সোফায় বসতে বসতে ইন্দ্র বলল, 'তোমাদের গোবিন্দপুর পেরিয়েও যাবার জায়গা আছে—। যাকগে, কর্তা কোথায়? ওঠেনি এখনও? ছেলে?'

'সব উঠবে এবার। দীপঙ্করকে চা করে ডাকতে হয়।' কথাগুলো বলবার সময়েই ধক করে গার্গীর মনে পড়ে গেল ইন্দ্রর স্ত্রী অশোকা মানসিক হাসপাতালে, জায়গাটা সোনারপুরের দিকে কোথায় যেন, সেখানেই গিয়েছিল নাকি ইন্দ্রনাথ? আশ্চর্য! নিজের বাব-মা'র খবর নেবার আগে তার তো অশোকার খবর জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল!

কুণ্ঠিত গলায় গার্গী জিজ্ঞেস করল, 'অশোকাদি কেমন আছেন, ইন্দ্রদা? এখনও কি হাসপাতালে?'

'হ্যাঁ, ওখানেই। কাল সন্ধে থেকে হঠাৎ খুব ডেসপারেট হয়ে গিয়েছিল, রাত্রে ওরা ফোন করে ডেকে পাঠাল। গিয়েছিলাম—'

ইন্দ্র আর এগোল না। গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওসব কথা পরে হবে। চা-টা দিয়ে ফেলো এবার। দীপঙ্করকে ডাকো।'

গার্গী আর দাঁড়াল না।

অশোকার রোগটা পুরনো। গার্গী শুনেছে ছোটবেলা থেকেই মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিল ও। এমনিতে স্বাভাবিক; বোধবুদ্ধিহীন নয়, লেখাপড়াতে ভাল, দাদার বিয়ের সম্বন্ধ হবার সময় গার্গী যখন প্রথম দেখে অশোকাকে তখন সুন্দরীই মনে হয়েছিল। তবে স্বভাবে চাপা, কথা বলত না বিশেষ। পরে বউদি শিখার কাছে শুনেছিল ছোটবেলার রোগ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেরে গেলেও হঠাৎ-হঠাৎ বিষণ্ণতা ও খামখেয়ালি ভাবটা কোনও দিনই কাটেনি,

ব্রেনের নার্ভাস সিস্টেমে কী একটা গোলমাল থাকায় ডাক্তাররা বলেছিল যখন তখন এ রোগ ফিরে আসতে পারে। বিয়ের আগে এসব জানা যায়নি, দিল্লির মেয়েকে কলকাতায় এনে প্রায় লুকিয়েই বিয়ে দিয়েছিল অশোকার অভিভাবকরা। ক্রমশ জানাজানি হয় ব্যাপারটা। অদ্ভুত মানুষ ইন্দ্রনাথ। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেও স্ত্রীকে অনাদর করেনি কখনও। চিকিৎসার জন্যে একবার বিদেশেও নিয়ে গিয়েছিল। কাজ হয়নি। গত পাঁচ-ছ বছরে সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে গেছে অশোকা। কখনও একটু ভাল থাকলে বাড়িতে নিয়ে আসে ইন্দ্র, নার্স রেখে দেখাশোনা করে। বাড়াবাড়ি হলে আবার রেখে আসে হাসপাতালে। ইন্দ্রর ধৈর্য ও কর্তব্যবোধ দেখে মনে হয় নিজের দুর্ভাগ্যের আড়ালে কোথাও একটা পাঞ্জা লড়ার মতো ব্যাপারকে ধরে রেখেছে ও। হার মানেনি। বরং বঞ্চনা থেকে এমন এক স্থৈর্যময় শক্তি আহরণ করেছে যা অন্য কোনও সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

চটপট হাতে চা ভিজিয়ে কাপে ঢালবার আগে শোবার ঘরে গিয়ে দীপঙ্করকে ডেকে তুলল গার্গী। ইন্দ্রনাথ এসেছে, খবরটা দিল।

দীপঙ্কর বলল, 'কী ব্যাপার! উনি হঠাৎ।'

'হঠাৎ কেন হবে।' গার্গী বলল, 'হাসপাতালে গিয়েছিলেন স্ত্রীকে দেখতে। ফেরার পথে। মনে হচ্ছে সারা রাত ওখানেই কাটিয়েছেন।'

দীপঙ্কর উঠে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গি ও গেঞ্জি, তার ওপর পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে বাথরুমে যেতে যেতে বলল, 'সকালে তোমাকে মনে পড়ল!'

কথায় ব্যঙ্গ স্পষ্ট। গার্গী ক্ষুণ্ণ হল, কিন্তু জবাব দিল না। বহু দিন ধরেই দেখছে ইন্দ্রকে দীপঙ্কর ঠিক পছন্দ করতে পারে না, এমনকী ইন্দ্রর দুঃখময় জীবনের বৃত্তান্তও ওকে নরম করে না এতটুকু। মাঝে মাঝে গার্গীর মনে হয়, তার বাপের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে একমাত্র ইন্দ্রই প্রতিষ্ঠিত, সচ্ছল এবং উচ্চশিক্ষিত বলে মনে মনে ওকে ঈর্ষা করে দীপঙ্কর। ও জানে ইন্দ্র সম্পর্কে গার্গীও কিছুটা দুর্বল, সেজন্যেও হয়তো।

দীপ্র এখনও গাঢ় ঘুমে। সাধারণত সাতটার আগে ওঠে না ও। ইন্দ্র যদিও ছেলের খোঁজ করেছিল, গার্গী ভেবে দেখল, অসময়ে ঘুম ভাঙালে পরে ঘ্যান ঘ্যান করতে পারে। বরং ঘুমোক।

আলনা থেকে ব্রেসিয়ারটা টেনে নিয়ে, পরে, ব্লাউজের বোতাম এঁটে ব্যস্ত হাতে চুলটা সামান্য আঁচড়ে নিয়ে রান্নাঘরে গেল গার্গী। বাথরুম থেকে বেরিয়ে বসবার ঘরের দিকে যাচ্ছে দীপঙ্কর, সেখানে থেকেই দেখল সে, সকালে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে এখন অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ, মেঘের মধ্যে থেকে কোথাও কোথাও উঁকি দিচ্ছে ধোঁয়াটে নীল। বৃষ্টি নেই। এসব দেখে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করল গার্গী। ইন্দ্র চলে গেলে দীপ্রর স্কুলে যাবার জোগাড় করবে সে। তাড়াতাড়ি আসবে বললেও কমলা যে তাড়াতাড়ি আসবে তার ঠিক কি!

চা নিয়ে বসবার ঘরে এসে দেখল মুখোমুখি সোফায় বসে কথা বলছে দুজনে। কিছু ভেবে দীপঙ্করের কাপটাই আগে এগিয়ে দিল গার্গী, তারপর ইন্দ্রকে দিল, বিস্কুটের প্লেটটা নামিয়ে রাখল সেন্টার টেবিলে। দীপঙ্কর বসেছে লম্বা সোফাটায়, তার কোণের দিকে নিজেও গিয়ে বসল।

'তোমাদের এদিকটা বেশ।' চায়ে চুমুক দিয়ে ইন্দ্র বলল, 'দীপঙ্করবাবুকে বলছিলাম খাস

কলকাতার সবকিছুই বড় ক্লান্তিকর, একঘেয়ে। এদিকে এলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সুবিধেমতো জমি পেলে কিনে রাখতে।'

'ভবানীপুর ঘিঞ্জিই।' দীপঙ্কর সিগারেট জ্বালাতে সময় নিল। তারপর বলল, 'আমাদের ওদিকটা তা নয়। তা ছাড়া শুধু খোলামেলা দেখলেই হবে না, এখানকার লোকজন কেমন সেটাও দেখতে হবে। বাড়িগুলো দেখবেন, কেউ কোনও প্ল্যান করে করেছে বলে মনে হয় না।'

'আপনার চোখ আলাদা। ছোটবেলা থেকেই বাড়ি করা দেখছেন, আপনি তা বলতে পারেন।' পরের কথাটা বলবার আগে ঘড়ি দেখল ইন্দ্র, চায়ের কাপে বড় করে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনার প্ল্যান তো আপনিই করবেন। সেটা খারাপ হবে কেন!'

গার্গী বুঝতে পারল ইন্দ্র ওঠবাব জন্যে ব্যস্ত। দীপঙ্করের সঙ্গে আগে কতটুকু কী কথা হয়েছে জানে না, কিন্তু এখন যা বলছে সবই দায়সারা, কথার পিঠে কথা সাজানো। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না দীপঙ্কব অশোকার কথা কিছু জিজ্ঞেস করেছে কি না। ইন্দ্র যে ধরনের মানুষ, নিজে থেকে ব্যক্তিগত কোনও প্রসঙ্গ তুলবে না।

জলটা একটু বেশিক্ষণ ধরেই ফুটেছিল, চায়ে চুমুক দিয়ে কড়া স্বাদ জিভে লাগায় অপ্রতিভ বোধ করল গার্গী। এখন মনে হচ্ছে ইন্দ্রর জন্যে নতুন করে জল ফোটাতে পাবত। এখনও পারে, কতক্ষণ আর সময় লাগবে। কিন্তু কথাটা তুলতে পারল না। ভেবেচিন্তে বলল, 'ইন্দ্রদা, হাসপাতালে গিয়েছিলেন বললেন, অশোকাদি এখন কেমন আছেন বললেন না তো!'

'পাগলের আর ভাল থাকা মন্দ থাকা আছে নাকি। ডেসপারেসন কাটাবার জন্যে শেষ পর্যন্ত মরফিন দিল। ওয়াচে বেখেছিল। ঘুমিয়ে থাকায় আমাকে চলে যেতে বলল।'

শেষের দিকে ভারী হয়ে এল ইন্দ্রর গলার স্বর। দৃষ্টিতে ঔদাসীন্য। খানিক মেঝেব দিকে তাকিয়ে থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সাড়ে ছ'টা বেজে গেছে, চলি আজ। বিকেলে দিল্লি যাবার কথা আছে—অবশ্য সব ঠিকঠাক চললে—'

ইন্দ্রর দেখাদেখি দীপঙ্করও উঠে দাঁড়িয়েছিল। গার্গী তাকাতে ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে বলল, 'এ দিকে এলে আসবেন আবার।'

'হ্যাঁ অবশ্যই।'

দরজা পর্যন্ত এসে ভিতরে ফিরে গেল দীপঙ্কর।

ব্যাপারটা পছন্দ হল না গার্গীর। খালি পায়ে ইন্দ্রর পিছনে পিছনে গেট পর্যন্ত এগিয়ে এল সে।

'ইন্দ্রদা, এরকম তো আগেও হয়েছে। ভাববেন না বেশি। ঠিক হয়ে যাবেন।'

'কার কথা বলছ? অশোকার?' ইন্দ্রনাথ যেন নিজের মধ্যে ছিল না। পরে বলল, 'কেউ ভাল আছে, সুস্থ হয়ে উঠেছে শুনলে ভাল লাগে। অপ্রকৃতিস্থদের নিয়ে সমস্যা কি জানো, ওরা ভাল আছে না খারাপ সেটা কম্যুনিকেট করতে পারে না। যন্ত্রণাটা কোথায় বোঝাতে পারে না।'

ইন্দ্রর গলার স্বরে এমন কিছু ছিল যা গার্গীকে চুপ করিয়ে রাখল। শুধু ভাবল, লোকটা সারারাত জেগে কাটিয়েছে, নিশ্চয়ই বিপর্যস্ত, তবু ফেরার রাস্তায় সরাসরি বাড়ি না গিয়ে এসেছিল তারই কাছে। শুধু এক কাপ চায়ের জন্যে?

প্রশ্নটা দুলিয়ে দিল তাকে। এই মুহূর্তে তার ও ইন্দ্রর মধ্যে দূরত্ব এক হাতেরও কম, এই নৈকট্যে জোরে নিঃশ্বাস ফেললে শোনা যাবে। কিন্তু, গার্গীর মনে হল, এটাই অনেকখানি, সে কিছু বলবার চেষ্টা করলেও শুনতে পাবে না ইন্দ্র।

গেটের কাছে পৌঁছে একবার আকাশের দিকে তাকাল ইন্দ্র। দৃষ্টিটা ওপরেই নিবদ্ধ রাখল কিছুক্ষণ। তারপর গার্গীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাথাটা যখন একেবারে কাজ করে না তখন প্রায়ই একটা কথা বলে অশোকা। বলে, সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে—সিনেমায় যেমন হয়। কেন বলে, কোন সিনেমার কথা বলে, কিছুই আমার মাথায় ঢোকে না। বিয়ের পর যখন প্রথম বাড়াবাড়ি হল, তখনই শুনেছিলাম। কালও বলছিল। ডাক্তাররাও ভেবে কূলকিনারা পাননি। তাঁদের ধারণা পারসেপসন লেভেলে কোনও রিফ্লেকশন এসে গেছে। মাঝে মাঝে মনে হয় ও শুধু নিজের কথা বলে না—'

'অদ্ভুত তো!'

'হ্যাঁ, অদ্ভুতই—।' ইন্দ্রনাথ হাসল। ক্লেশের হাসি, তবু স্বচ্ছতা আড়াল হল না। গাড়ির দিকে এগিয়ে যাবার আগে বলল, 'চলি। তোমাদের বাড়িতে কিছু বলতে হবে?'

'বলবেন ভাল আছি। দু-চারদিনের মধ্যে যাব।'

সেই সময় আকাশ ফুঁড়ে রোদ উঠল। মেঘভাঙা রোদ, উত্তাপ নেই, শুধু আলোটুকুই দেখা যায়।

গাড়ির দরজা খুলে তাকেই দেখছে ইন্দ্র।

'তুমি কি রোগা হয়েছ একটু? নাকি ইচ্ছে করেই স্লিম হচ্ছ?'

কী জবাব দেবে ভেবে অস্বস্তিতে পড়ল গার্গী। সময় নিয়ে বলল, 'কেউ বলেনি। আপনিই বললেন।'

'মনে হল।'

'আমার কথা থাক, ইন্দ্রদা। আজ আপনাকে দেখে ভাল লাগল না। মনে হচ্ছে নিজেকে নিয়ে ভাবেন না।'

ইন্দ্র জবাব দিল না। ক' মুহূর্ত যাবার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে গাড়িতে উঠল। স্টার্ট নিয়ে ডান হাত বের করে নাড়ল একবার, তারপর দ্রুত উধাও হয়ে গেল।

তখনই গেট থেকে সরে এল না গার্গী। পিচের রাস্তার পাশে ভিজে মাটিতে দাগ বসেছে গাড়ির চাকার, অন্যমনস্ক ভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে জোরে নিঃশ্বাস পড়ল তার। ইন্দ্র যেদিকে গেল সেদিক থেকে সাইকেল ছুটিয়ে আসছে খবরের কাগজের হকার। এখানেই থামবে। ওর হাত থেকে কাগজটা নিয়ে ফেরার সময় গার্গী দেখল ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন সুরমা। হয়তো অনেকক্ষণ; এমনও হতে পারে তার ও ইন্দ্রর কথাবার্তার সবটুকুই শুনেছেন। শুনুন। চেনার জন্যে যেটুকু হাসি দরকার সেটুকুই হেসে ঘরে ঢুকে দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল গার্গী। এবং ভাবল, আকাশ পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও কমলা দেরি করছে কেন!

দীপঙ্কর বারান্দায়। ওর হাতে কাগজটা দিয়ে শোবার ঘরের দিকে তাকাল গার্গী।

'দীপ্র উঠেছে মনে হচ্ছে?'

'হ্যাঁ। বাথরুমে। কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরতে ধরতে দেয়াল ঘেঁষা চেয়ারে বসে দীপঙ্কর বলল, 'লোকটাকে বুঝতে পারি না। একটা ইনসেন ওয়াইফকে ঘাড়ে নেবার কী

দরকার ছিল। ঠিক সময়ে ডিভোর্স করে দিলেই পারত।'

'সবাই কি আর তোমার মতো!'

'তার মানে। আমি কী করলাম।'

মুখ ফসকে বেরিয়ে গিয়েছিল কথাগুলো, গার্গী বুঝতে পাবল এভাবে বলা উচিত হয়নি। নিজেকে সামলাবার জন্যে বলল, 'আমি সে-কথা বলিনি। ডিভোর্স কবাব কথাটা তুমি যত সহজে ভাবলে, ইন্দ্রদা হয়তো তা ভাবতে পারেননি। মহিলাই বা যেতেন কোথায়?'

'কেন? বাপ মা'র কাছে! যারা জোচ্চুরি করে গছিয়েছিল! ভ্যালিড বিজন ছিল!'

গার্গী স্বামীকে দেখল। চোখ কাগজে। কথা বাড়াতে ইচ্ছে কবছিল না তার। দীপ্রর খোঁজে যেতে যেতে সে শুধু বলল, 'কার মন কী ভাবে কে বলবে!'

২

কমলা এল না।

ন'টার মধ্যে অফিসে বেবোয় গার্গী। রোজ একই সময়ে না হলেও মোটামুটি ওটা দীপঙ্করের বেরুবার সময়। দীপ্রর স্কুল সাড়ে ন'টায়। এখান থেকে খুব দূরে নয়, সুতরাং ধীরেসুস্থে পৌঁছে দিতে পারে কমলা—কখনও রিকশায়, কখনও মিনিবাসে, কখনও বা বাসে, যখন যেমন পায়। ও আসবে কি আসবে না নিয়ে ভোর থেকেই শঙ্কায় ছিল, তবু জিইয়ে রেখেছিল আশাটা। সাড়ে আটটাও বেজে যাচ্ছে দেখে চিন্তায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে এল গার্গীর। নার্সারিতে পড়ে, এক দিন স্কুল কামাই করলে কিছু হবে না; কিন্তু বাড়িতেই বা ওকে আগলাবে কে। ছেলেকে পিঠে বেঁধে তো অফিসে যাওয়া যায় না!

দীপঙ্করের বেরুবার তাড়া আছে, আগেই তা বলে রেখেছিল। সকালে গার্গীর উদ্বেগে আমল দেয়নি তেমন। ঘড়িতে সাড়ে আটটা বেজে গেছে দেখে দাড়ি কামাতে কামাতে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'কী করবে?'

গালে চোয়াল এঁটে দীপঙ্করের ব্রেকফাস্ট রেডি করছিল গার্গী। জবাব দিল না।

'আজ না হয় অফিসে না গেলে!'

'আজ কামাই করলে চাকরি যাবে!' অস্বস্তি মেশানো গলায় গার্গী বলল, 'আমি তো আর তোমার মতো নিজেই বস নই!'

দীপঙ্কর বুঝতে পারল স্ত্রীর মেজাজ খারাপ। কিন্তু এই কথাগুলোই কেন বলল তা বুঝতে না পেরে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল।

'চাকরি যাবে মানে!'

'কাল একটা কাজ ইনকমপ্লিট রেখে চলে এসেছি। আজ তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটা শেষ না করলে ক্ষতি হবে। কাজটা জরুরি।'

'বাব্বা! তুমি তো অফিসে বেশ ইমপর্ট্যান্ট লোক দেখছি!'

গার্গী জবাব দিচ্ছে না দেখে রেজরটা হাত বদল করে আবার বাথরুমে ফিরে গেল দীপঙ্কর।

কিন্তু কথাগুলো গেঁথে গেল। কাজে দু হাত জোড়া; ঠোঁটে অল্প শিরশিরানি এবং চোখে জ্বালা অনুভব করে জোর করে নিজেকে এই মুহূর্তের প্রয়োজনে ফিরিয়ে আনল গার্গী। এটা ঝগড়া শুরু করার সময় নয়।

দীপ্রকে আগেই তৈরি করেছিল। এখন খাইয়ে দিলেই স্কুলে যেতে পারে। এই সময়টায় বড্ড নাকাল করে ছেলেটা। যে-কোনও ছুতোয় খেতে দেরি করে, এটা খেলে ওটা ছোঁয় না, এমন ভাব দেখায় যেন মুখে রোচে না কিছু। কমলা ওর ধাতটা বুঝে গেছে, নানা গল্পে ভুলিয়ে ঠিকঠাক বাগে এনে ফেলে। আজ তাকেই কমলার ভূমিকায় নামতে হবে ভেবে মনে মনে গুছিয়ে উঠছিল গার্গী, দীপঙ্করের শ্লেষ-মেশানো কথায় ছড়িয়ে গেল সব প্রস্তুতি।

মনে হচ্ছে কথাগুলো শুধু বলবার জন্যেই বলেনি দীপঙ্কর, হঠাৎও বলেনি। সকালে ইন্দ্র আসার পর থেকেই গম্ভীর। তবে এখন সম্ভবত জের টানছে গত রবিবারের ঘটনার। ওর বাবা রঘুনাথের শরীরটা নাকি ভাল যাচ্ছে না কিছু দিন থেকে। রবিবার সকালে দীপঙ্কর বলেছিল দীপ্রকে নিয়ে গার্গী যেন একবার ঘুরে আসে ওদের বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি থেকে। গার্গী আপত্তি করেনি, তবে ও চেয়েছিল স্বামীও যাক সঙ্গে। দীপঙ্কর, যে-কোনও কারণেই হোক, রাজি হল না। সেই থেকে টানাপড়েন, শেষ পর্যন্ত কথা কাটাকাটি।

দীপঙ্কর যেভাবে বলে, বলল, 'এটা তোমার নিজের বাবা-মা'র ব্যাপার হলে এর মধ্যে তিন বার ঘুরে আসতে।'

'আসতামই তো।' গার্গী বলল, 'তোমার বাবার ব্যাপারে তোমার কোনও গরজ নেই। আমার থাকবে কেন!'

'দ্যাখো, বাড়াবাড়ি কোরো না। নিজের জায়গা থেকে কথা বলো।'

'তাই বলছি। অফিস করতে হবে, রান্না করতে হবে, ছেলে সামলাতে হবে। এর পরে রবিবারটা যে একটু হাত-পা-ছড়াব—'

'ও. কে, ও. কে। তোমার যাবার দরকার নেই।'

পায়ে চপ্পল গলিয়ে, সশব্দে দরজা টেনে বেরিয়ে গেল দীপঙ্কর।

গার্গী থেমে থাকেনি। দীপঙ্কর চলে যাবার পর শান্ত মেজাজে পুরো ব্যাপারটা ভাবতে ভাবতে গার্গীর মনে পড়েছিল আজ রবিবার, দীপঙ্করের বোন তমসার ইউনিভার্সিটি নেই, সকালে আর কোথায় বেরুবে! ওকে একটা ফোন করে জানা যেতে পারে শ্বশুরমশায়ের কী হয়েছে, সত্যিই চিন্তার কিছু আছে কি না। তেমন বুঝলে যাবে, না হলে না—তাতে সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এই ভেবে একটু পরে দীপ্রকে নিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছিল রাস্তায়। বড় রাস্তার মুখে 'আরোগ্য মেডিক্যাল স্টোর্স'-এ টেলিফোন আছে, প্রয়োজনে ব্যবহার করে তারা। ওখান থেকে ফোন করল শ্বশুরবাড়িতে।

তমসাই ধরল। জিজ্ঞেস করতে বলল, 'তেমন কিছু নয়। ব্লাডপ্রেসার বেড়েছিল, একদিন অফিসে যাননি। এখন ঠিক হয়ে গেছে। কে বলল তোমাকে?'

'তোর দাদা।'

'বোধহয় অফিসে ফোন করেছিল, কেউ বলেছে। নিজেও তো একবার দেখে যেতে পারত!'

তমসার অনুযোগ এড়িয়ে গিয়ে গার্গী বলল, 'আমি ভাবছিলাম যাব—'

'এমনি এলে এসো।' তমসা বলল, 'শুধু এইজন্যেই তাড়াহুড়ো করে আসতে হবে না।'

শেষ বাক্যটির অর্থ বোঝা কঠিন নয়। গার্গী নিজের জায়গা চেনে। তবে যেতে হবে না ভেবে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। দুপুরে খেতে বসে তখনও দীপঙ্করকে গম্ভীর দেখে ততোধিক গম্ভীর হয়ে বলল, 'তোমার বাবার ব্লাড প্রেসার বেড়েছিল। এখন ভাল আছেন। অফিসেও যাচ্ছেন।'

খাওয়া থামিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল দীপঙ্কর, কথা না বলে গুটিয়ে নিল নিজেকে। তার পর থেকে চুপচাপ হয়ে গেলেও সম্ভবত রাগটা পুষে রেখেছিল মনে, আজ ফেরত দিল। হতে পারে, অন্য কোনও কারণও থাকতে পারে।

কিন্তু, এই মুহূর্তের সমস্যা বুঝেও কি ও একটু রেহাই দিতে পারবে না গার্গীকে। কেন বুঝছে না দীপঙ্কর, ইমপর্ট্যান্ট নয় বলেই আজ তার অফিস যাওয়া জরুবি। অন্তত আজকের দিনটা যদি ও দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছে দিতে এবং নিয়ে আসতে পারত।

স্নান সেরে বেরিয়ে এসে আবার কথাটা তুলল দীপঙ্কর।

'তৈরি তো করলে ছেলেকে। এরপর কী করবে?'

ভিতরে অসহায় বোধ করলেও গার্গী এরকম একটা সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ভয়ে ভয়ে বলল, 'তুমি পারবে না?'

'কী?'

'আজকের দিনটা ম্যানেজ করতে? আমি না হয়—'

কথা শেষ করল না। গার্গীর মনে হল যা বলতে চায় তা তার নিজের কাছেই স্পষ্ট নয় এখনও।

'এসব দায় যদি আমাকে নিতে হয় তাহলেই গেছি।' রাগ থেকে নয়, বেশ চিন্তিত গলাতেই বলল দীপঙ্কর, 'আমার কাজটাও কম জরুরি নয়। সাড়ে ন'টার মধ্যে আর্কিটেক্টের কাছে যেতে হবে, সেখান থেকে—'

স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল দীপঙ্কর।

কথার অভাবে গার্গীর দৃষ্টি এখন দীপঙ্করের ওপরেই নিবদ্ধ, খুঁটিয়ে দেখছে স্বামীকে। ওর রং ফর্সা, চেহারা লম্বা, কিন্তু মোটা নয়, চওড়া কপালের তুলনায় নাকের নীচের চিবুক পর্যন্ত অংশ সরু মনে হয়, চোখের মণির খয়েরি ভাবে প্রায়ই অসম্পূর্ণতা এসে যায় দৃষ্টিতে। চুল পাতলা হতে শুরু করেছে, চিরুনি চালালে দাঁড়ের টানে চাঁদির খাঁজ দেখা যায়। বিয়ের সময় বা তারও আগে যেমন ছিল তার চেয়ে বদলে গেছে অনেকটা। সত্যিই বদলে গেছে।

দেখতে দেখতেই নিঃশ্বাসের চাপ পড়ল বুকে।

মা ও বাবার এই কথোপকথনের স্তব্ধতায় কিছু আঁচ করল দীপ্র। হঠাৎ বলল, 'আমি আজ স্কুলে যাব না।'

'তা যাবে কেন।' গার্গী বলল, 'আমার অসুবিধে বাড়াতে তোমাকেও কিছু করতে হবে তো!'

'না । যাব না।'

'দীপ্র, একদম বায়না করবে না। তাহলে একা ফেলে যাব।'

'ওকে ধমক দিয়ে লাভ কি।' চিরুনি রাখতে ঘরে গিয়েছিল দীপঙ্কর, ফিরে এসে বলল, 'তুমি ওকে পৌঁছে দাও। স্কুল ছুটি তো বারোটায়। আমি নিয়ে আসব।'

সম্ভবত এটা একটা সমাধান, গার্গী ভাবল, যে এতটা এগিয়েছে এবং নিজে থেকেই,

তাকে আর বেশি চাপ দেওয়া যায় না। বস্তুত, কিছুক্ষণ আগে দীপঙ্করের কথাবার্তা শুনে মনে হয়নি এই প্রস্তাব ওর কাছ থেকেই আসবে।

এখন প্রায় পৌনে ন'টা। গার্গী হিসেব করে দেখল, এখনই বাড়ি থেকে বেরুতে না পারলেও সওয়া ন'টা নাগাদ দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে সে যদি মিনিবাসে ওঠে, তাহলে দশটার মধ্যে অফিসে পৌঁছুনো সম্ভব। কাল 'আর্লি' বলতে সে সওয়া ন'টা থেকে সাড়ে ন'টা ভেবেছিল। তার মানে লেটই হবে। অবশ্য যদি ট্যাক্সি নেয় এবং রাস্তায় জ্যাম না থাকে, তাহলে আরও মিনিট পনেরো বাঁচাতে পারে। সেই মুহূর্তে সোমেশ্বরের মুখ ভেসে উঠল চোখে। বিরক্ত হল নিজেরই ওপরে। কাল সে 'আর্লি' শব্দটা ব্যবহার করতে গিয়েছিল কেন!

'তুমি কি আর চা খাবে?'

দীপঙ্কর ব্রেকফাস্ট সারছিল। বুঝতে পারল ব্যস্ততার মধ্যেও গার্গী দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছে। মাথা নেড়ে না জানাল। তারপর স্কুলের পোশাকে ছেলেকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমি তোমাকে নিয়ে আসব স্কুল থেকে। যতক্ষণ না যাই, কারুর সঙ্গে বেরুবে না।'

'তুমি কি দুপুরেও আমার সঙ্গে থাকবে?'

'হ্যাঁ।'

'মাকেও থাকতে বলো না!'

'আমি আর একদিন থাকব।' দীপ্রর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে স্বগতোক্তির গলায় গার্গী বলল, 'ছেলের জ্বর বলে গেল, এখন ক'দিন কামাই করে দ্যাখো।'

কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলেও এরই মধ্যে নতুন সমস্যায় জড়িয়ে পড়ল গার্গী। দীপঙ্কর সকাল-সকাল বেরুলে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরোয়। দুপুরের খাওয়া যেখানে হোক সেরে নেয়, কিংবা, বাড়ি ফিরবে জানা থাকলে বাড়িতেই ব্যবস্থা থাকে। এদিকটা কমলাই দ্যাখে। আজ দীপঙ্কর ফিরবেই, আজ কী হবে!

এতক্ষণ এসব ভেবে দ্যাখেনি। একটু আগে সে দীপ্রর দুপুরের খাবার রেঁধে তুলে রেখেছে হটবক্সে, সেইসঙ্গে রাতের মাছের ঝোলটাও রেঁধে রেখেছিল। কিন্তু দীপঙ্করের বাড়িতে থাকা মানে তার জন্যেও ভাতের জোগাড় রাখা। আশ্চর্য, কমলা যদি না আসে ভেবে তাড়াহুড়ো করে সব ব্যবস্থা করলেও এই ব্যাপারগুলো তার মাথায় আসেনি কেন! খানিক আগে আগে যখন দীপ্রর জন্যে ভাত করল তখনই তো দীপঙ্করের জন্যেও বাড়তি চাল নিতে পারত!

এসব ভাবনা আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার অফিসে পৌঁছুনোর সময় নিয়ে ভাবতে শুরু করল সে। তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে ঢুকে স্টিলের বাটিতে চাল বের করে ধুয়ে, হাত বাড়াল প্রেসারকুকারের দিকে। সন্তান তার, স্বামীও তার, সুতরাং এ কাজগুলোও তার। দীপঙ্করের জায়গায় যদি তাকেই স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে হত ছেলেকে, তাহলেও করতে হত। তখন অবশ্য ফিরে এসে করলেও চলত।

দীপঙ্কর বেরিয়ে যাচ্ছে। নেভি ব্লু ট্রাউজার্স, হালকা সবুজ সার্ট ও ব্রাউন মোকাসিনে স্মার্টই দেখায়। যাওয়ার ধরনে ব্যস্ততা স্পষ্ট।

রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে মনে করিয়ে দেবার গলায় গার্গী বলল, 'দুজনের খাবারই থাকবে, গুছিয়ে খেয়ে নিয়ো। বাসন নামিয়ে রাখলেই হবে।'

পৌনে দশটায় নয়, দশটায়ও নয়, সাড়ে দশ'টা পার করে অফিসে পৌঁছুল গার্গী এবং লক্ষ

করল, সেকশনের একটি সিটও খালি নেই। আলো ঠিকরোচ্ছে সোমেশ্বরের ঘরের ঘষা কাচের আড়াল থেকে। ট্যাক্সি পায়নি, সুতরাং মিনিবাসে, তারপর প্রায় ছুটতে ছুটতে আসবার কারণে যে-হাঁফ শুরু হয়েছিল বুকে, নিজের চেয়ারের পিঠ ধরে দাঁড়িয়ে সেটা সামলাতে গিয়ে অনুভব করল বহুজনের মধ্যে থেকেও এমন একাকীত্ব সে এর আগে বোধ করেনি। বড় হলঘরের মধ্যে তাদের সেকশনটা এক পাশে, কাজ চলা এবং বিভিন্ন কণ্ঠের কথা বলার মধ্যে শব্দের যে খাপছাড়া ঐক্য থাকে, মনে হল সেটাও শুনতে পাচ্ছে না ঠিকঠাক। কেউই দেখছে না তাকে, তবু সে দর্শনীয় হয়ে উঠেছে। কোনওরকমে চেয়ারে বসে জলের গ্লাসটা তুলবে ভেবেও তুলল না। নিঃশ্বাস সহজ করার জন্যে যেটুকু সময় লাগে নিয়ে ছুটল অডিট সেকশনে মিস্টার চক্রবর্তীর কাছে।

'আমাদের একটা ফাইল আনা হয়েছে এখানে—'

'কোন ফাইল?' প্রশ্নটা করেই গার্গীকে তার সেকশনের সঙ্গে মিলিয়ে চিনতে পারলেন অলোক চক্রবর্তী, 'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সেটা তো রায়সাহেব নিজেই এসে নিয়ে গেলেন সকালে। বলেননি আপনাকে?'

'নিয়ে গেছেন!'

আর কোনও প্রশ্ন ছিল না। পাছে অপ্রতিভ দেখায় এই ভয়ে নিজের জায়গায় ফিরে এল গার্গী। জল খেল। ব্যাগ থেকে চাবি বের করে ড্রয়ার খুলে কাজের জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখতে রাখতে তাকাল পাশের টেবিলে।

'দীপেনবাবু, বস কি খুঁজেছিলেন আমাকে?'

'না তো!'

'আপনি কতক্ষণ এসেছেন?'

'যখন আসি। পৌনে দশটায়।' গার্গীকে লক্ষ করতে করতে দীপেন জিজ্ঞেস করল, 'আপনার দেরি হল?'

অন্য ড্রয়ার থেকে গতকালের অসম্পূর্ণ কাজের কাগজপত্র বের করতে করতে গার্গী বলল, 'ছেলেকে ছেড়ে আসতে হল স্কুলে—'

দীপেন ভট্টাচার্যের দাঁতে কিছু আটকে ছিল, জিবের ঠেলায় খুঁচিয়ে সেটা উগড়ে দিল ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে। মুখ তুলতে তুলতে বলল, 'বড় স্কুলে পড়ানোব এই এক ঝামেলা।'

বয়সে এবং চেহারায় প্রায় প্রৌঢ়, দীপেন এইভাবেই বলে। দীপ্রকে স্কুলে ভর্তি করার সময় ওদের স্বামী-স্ত্রীকেও ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল স্কুলে, গার্গীর মুখে কথাটা শোনবাব পর থেকেই দীপেনের ধারণা এমন স্কুল ভূ-ভারতে নেই। ধারণাটা যখন-তখন প্রকাশ করে ফেলে।

'স্কুলের দোষ নয়।' দীপেনের দিকে তাকিয়ে অশান্তির মধ্যেও কৌতুক খেলে গেল গার্গীর ঠোঁটে, 'কাজের লোক কামাই করেছে, তাই।'

'আপনার বাড়িতেও! কী আশ্চর্য, আমাদের ঝি-টাও ডুব মেরেছে আজ। তার ওপর কোথাও কিছু নেই, বৃষ্টি! দুধ আনতে আমাকেই বেরুতে হল। অন্য দিন ঝি-ই আনে—'

গার্গী ফিরে গিয়েছিল নিজের ভাবনায়। এটা নিশ্চিত, অডিট সেকশন থেকে ফাইলটা এনে নিজের কাছেই ধরে রেখেছে সোমেশ্বর। তাকে ছাড়া আর কাউকে কাজটা দেবে না, কারণ গতকাল পর্যন্ত যতটা এগিয়েছে তার সমস্ত কাগজপত্রই এখনও তার হেফাজতে।

এখন ফাইলটা চাইবার জন্যে তাকে সোমেশ্বরের কাছেই যেতে হবে।

এরপর সে সোমেশ্বরের ঘরে ঢুকল।

'মিস্টার চক্রবর্তী বললেন ফাইলটা—'

সোমেশ্বর চিঠি সই করছিল। গার্গীকে দেখে পাশের র‍্যাকের ওপর থেকে গোলাপি রঙের ফাইলটা তুলে বাড়িয়ে ধরল তার দিকে।

'আর্লি এসে পড়েছিলাম, নিজেই নিয়ে এলাম।'

'সরি!'

'শব্দটা চেনা লাগছে!' না তাকিয়েই বলল সোমেশ্বর। চিঠির টাইপ করা অক্ষরগুলোয় চোখ বোলাতে বোলাতে বোধহয় খেয়াল করল গার্গীর ছায়া লেটারহেডের দূরত্ব পেরিয়ে স্পর্শ করছে তাকেও। ছায়াটা সরানো দরকার। তখন মাথা নিচু রেখেই বলল, 'সবই তো পেয়ে গেলেন! দেখুন আজ কাজটা শেষ করতে পারেন কি না।'

আর কিছু বলবার থেকে না। ফাইলটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল গার্গী। পরিষ্কার অপমানিত লাগছে নিজেকে। দুঃখ প্রকাশ করে লাভ হয়নি। শব্দটাকে যেভাবে চিনে ফেলল সোমেশ্বর, যেমন তৎপরতায়, তাতে মনে হয় আগেই জানত সে দেরি করে আসবে এবং সরি-ই বলবে। ইঙ্গিতটা স্বভাবের দিকে, মাঝখানের ঘটনাগুলোর কোনও দাম নেই। এসব ক্ষেত্রে উত্তরও তৈরি হতে থাকে। আসল বিষ ছিল শেষের কথাগুলোয়।

টেবিলে ফিরে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল গার্গী। অনুভূতির ভিতর নিঃশব্দ আলোড়ন সংযত করতে করতে ভাববার চেষ্টা করল, তিরিশ বছর বয়সে পৌঁছে শুধুই অপমানিতের বোধ থেকে সে বাইশ বছরের যুবতীর মতো সবাক হতে পারবে না। হয়তো পারত যদি নির্ভরতার জায়গাগুলো চেনা থাকত ঠিকঠাক, যদি দীপ্র না হত, যদি মাসে যে পাঁচশো টাকা করে এখনও দিয়ে যাচ্ছে বাবাকে, সেটা দায়িত্বে পরিণত না হত। কিংবা, যদি সে অদূরে বসে থাকা নন্দিতার মতো হতে পারত, যে গাড়িতে আসে এবং ফেরেও গাড়িতে, চাকরি করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে, বলেও তা, ইউনিয়ন না করেও প্রতি মাসে ইউনিয়ন ফান্ডে পাঁচশো টাকা চাঁদা দিতে যার গায়ে লাগে না। সুতরাং ভয় চেনে না; অনিশ্চিতও বোধ করে কি।

শেষ পর্যন্ত সোমেশ্বরের শেষের কথাগুলোকেই চেপে ধরল গার্গী। আজ সে কাজটা শেষ করতে পারবে না কেন! কাজের নব্বুই ভাগ সেরে রেখেছিল কাল; এই ফাইলে তো আছে মাত্র গোটা তিনেক এনট্রি। সেগুলো খুঁজে, টোটাল দিয়ে, পারসেনটেজ অ্যানালিসিস করতে পারলেই হয়ে গেল। বেশিটাই করবে ক্যালকুলেটর। এ কাজে পনেরো মিনিটের বেশি সময় লাগে না।

তবু, কাজে মন দিতে গিয়ে গার্গী বুঝতে পারল স্বভাবের যে-স্থৈর্যের জন্যে এসব কাজে তার ওপরেই বেশি নির্ভর করে সোমেশ্বর, সেটাই হারিয়ে যাচ্ছে; ক্যালকুলেটর যে-অঙ্ক দেখাচ্ছে সেগুলোর রিডিং চাপা পড়ে যাচ্ছে সোমেশ্বরের গলার শব্দে। এয়ার কন্ডিশানারের নিয়ন্ত্রিত তাপের মধ্যে বসেও ঘামের অস্বস্তি ফুটছে কপালে, গলায়, বুকে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র উপায় চোয়াল শক্ত রাখা।

মিনিট কুড়ির মধ্যে পুরো স্টেটমেন্ট ও নোট তৈরি করে সোমেশ্বরের বেয়ারা জগদীশকে ডাকল গার্গী। পুরো কাজটা ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'সাহেবকে দাও। আমি আছি,

ডাকলে যাব।'

কথাগুলো বলতে পেরে খুশি হল। ভারটা নেমে যাচ্ছে। এখন সে যথেচ্ছ হতে পারে।

নিজের সিট ছেড়ে উঠে গিয়ে সেকশনের টেলিফোনে বেশ কিছুক্ষণ ধরে কথা বলছে কনক বিশ্বাস। সম্ভবত ট্র্যাঙ্ককল, বাইরের কোনও পার্টির সঙ্গে। ফোনটা থাকে নন্দিতার টেবিলে। নাকের সামনে খসে পড়া কথার আওয়াজ এড়াতে মাথাটা পিছিয়ে নিয়ে অস্বস্তি ও মজা মিশিয়ে হাসছে নন্দিতা; এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ায় গার্গীও হাসল। তারপর চোয়াল ছাড়াতে ছাড়াতে ভাবল, হলই বা বস, সোমেশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কটা অফিসের এবং কাজের, কাজটা করে দিয়েছে—আজকের মধ্যেই দিয়েছে, ব্যস, চুকে গেল। এমন কোনও নির্দেশ তো নেই যে তাকেই উঠে গিয়ে হাতে করে দিয়ে আসতে হবে।

'তাহলে ধরে থাকুন লাইনটা, দেখে বলছি—।' রিসিভার নামিয়ে রেখে ব্যস্ত ভঙ্গিতে নিজের টেবিলের দিকে হেঁটে গেল কনক বিশ্বাস। নিরুপায়, অথচ বিরক্ত। সেই সময় সোমেশ্বরের ঘরের দরজায় কোঁ-কোঁ শব্দ হল। কনককে অনুসরণ করতে করতে চোখ ফিরিয়ে গার্গী দেখল বেল শুনে উঠে যাচ্ছে জগদীশ। ঘরে ঢুকে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

'সাহেব ডাকছে, যান।'

এত তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠাবে ভাবেনি। আগের ঘটনার জেরে বিরক্তি এড়াতে পারল না গার্গী। চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে ভাবল, দেবার আগে স্টেটমেন্টটা সে খুঁটিয়েই দেখেছে, নোটটাও, ওতে এমন কিছু থাকতে পারে না যাতে ক্লারিফিকেশনের জন্যে এখনই ডেকে পাঠাতে হবে। তাহলে কি ভুল থেকে গেল কোথাও।

তবে এবার সে আত্মবিশ্বাস নিয়েই মুখোমুখি হচ্ছে সোমেশ্বরের।

সোমেশ্বর বলল, 'আপনার একটা কল আছে—'

'এখানে!' অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে টেবিলে নামানো রিসিভারটা তুলে সোমেশ্বরের দৃষ্টি আড়াল করে ঘুরে দাঁড়াল গার্গী, 'হ্যালো!'

'তোমার লাইন পাওয়া এক ঝকমারি। সারাক্ষণ এনগেজড!'

গলার স্বরেই চিনতে পারল দীপঙ্করকে। চাপা গলায় গার্গী বলল, 'কী হয়েছে!'

'প্রব্লেম। আমি দীপ্রকে আনতে যেতে পারছি না।'

'কেন!'

'মিস্টার মল্লিক আজ সন্ধের ফ্লাইটে বম্বে চলে যাবেন। বলছেন এখনই ওঁর সঙ্গে করপোরেশনে যেতে—'

মুহূর্তে রেখা পড়ল গার্গীর মুখে। সে জানে দীপঙ্কর কী বলতে চাইছে, তা সত্ত্বেও হতাশা ও রাগ লুকোতে পারল না।

'এটা সকালেই বলতে পারতে!'

'তার মানে! সকালে জানলে তো বলব!' দীপঙ্করের স্বরে ঝাঁজ স্পষ্ট।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে—।' কথার মানে থাক বা না থাক, অধৈর্য হয়ে পড়ল গার্গী।

'শোনো—', গলা পাল্টে দীপঙ্কর বলল, 'এখনও সাড়ে এগারোটা হয়নি, একটা ট্যাক্সি নিয়ে যদি—'

গার্গী বাধা দিয়ে বলল, 'এইমাত্র অফিসে এসেছি, এখনই যদি বেরুতে হয়—'

'আশ্চর্য! অফিস বেশি ইমপর্ট্যান্ট, না ছেলে! আমি তো চেয়েইছিলাম যেতে! আটকে পড়লে কী করব!'

'আচ্ছা, দেখছি কী করা যায়।'

দীপঙ্কর আর কিছু বলল না। রিসিভার নামিয়ে রাখলে শব্দ শোনা যেত, সেটা পায়নি, তার মানে ধরে আছে এখনও। ওইভাবে বিমূঢ় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তাপ ছড়াতে লাগল গার্গীর কানের পিছনে, হঠাৎই শূন্য মনে হতে লাগল নিজেকে, বুঝতে পারছে না দীপঙ্করের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কী। কিন্তু এভাবে কতক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা যায়, বিশেষত এমন একজনের সামনে যে ব্যক্তিগতকে মূল্য দিতে চায় না!

ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছে 'ছাড়ছি' বলে তাড়াহুড়ো করে রিসিভারটা নামিয়ে রেখে একই ভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল গার্গী।

কিন্তু, দরজা পর্যন্ত পৌঁছুবার আগেই সোমেশ্বরের গলা শুনে থেমে দাঁড়াতে হল তাকে।

'ফোনটা আপনার স্বামী মিস্টার ব্যানার্জির তা আগেই জেনেছি।' এই প্রথম তার মুখের ওপর সোজাসুজি দৃষ্টি রেখে সোমেশ্বর বলল, 'ইউ লুক আপসেট। তেমন দরকার থাকলে চলে যেতে পারেন।'

গার্গী বুঝতে পারল না এই মুহূর্তে ঠিক কোন ছায়া পড়েছে তার মুখে। কিংবা টেলিফোনে দীপঙ্করের সঙ্গে কথা বলবার সময় কতটা প্রকাশ করে ফেলেছে নিজেকে, যাতে কী নিয়ে সমস্যা তা না জেনেও উপযাচক হয়ে তাকে চলে যেতে বলতে পারে সোমেশ্বর। নাকি স্টেটমেন্টটা পাবার পর সকালের ওই খোঁচা দেওয়া কথাগুলো সম্পর্কে অনুতপ্ত বোধ করছিল, এখন সুযোগ পেয়ে শুধরে নিচ্ছে নিজেকে?

কারণ যা-ই হোক, সোমেশ্বরের কথাগুলোই জোর এনে দিল তার নড়বড়ে হাঁটুতে।

বস্তুত, রিসিভার তুলে কলটা দীপঙ্করেরই জানামাত্র সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল সে, নিজেকে নিয়ে বিব্রতও। অফিসের ফোনের এক্সটেনশন নাম্বার দেওয়া ছাড়াও সোমেশ্বরের ঘরের এই বিশেষ নাম্বারটা সে দীপঙ্করকে দিয়ে রেখেছিল যাতে না পেলেই নয় এমন প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারে। তখনকার মানসিক অবস্থায় ভেবেছিল এক্সটেনশন লাইন এনগেজড পেলে দীপঙ্কর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে পারত, সোমেশ্বরের ঘরে কেন! কিন্তু, তাহলেও একই কথা শুনতে হত তাকে—তার পরের সমস্যা অফিস ছেড়ে চলে যাবার কথাটা কীভাবে বলা যাবে সোমেশ্বরকে। এখন মনে হচ্ছে এই লাইনে তাকে ডেকে নিজের অজ্ঞাতেই অনেক ঝক্কি সামলে দিয়েছে দীপঙ্কর। নিজে থেকে তাকে আর বলতে হল না কিছু।

সোমেশ্বরের কথা শুনে অভ্যাসবশত আবার সরি বলতে যাচ্ছিল গার্গী, সামলে নিয়ে বলল, 'আসলে ওঁর ছেলেকে স্কুল থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল, আটকে পড়েছেন—'

'বুঝতে পারছি। দিস ক্যান হ্যাপেন। এখনই বেরিয়ে পড়ুন।'

'ধন্যবাদ।'

সোমেশ্বর হাসল। এখন আর কাঠ হয়ে নেই।

'আপনার স্টেটমেন্টটা দেখেছি। ঠিকই আছে। পরের কাজটা আমি করিয়ে নেব।'

সোমেশ্বরের ঘর থেকে বেবিয়ে কাগজপত্র গুছিয়ে বেরুবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল গার্গী। অপিসে আসবার সময় দুশ্চিন্তার মধ্যে যতটা অসহায় লাগছিল নিজেকে এখন আর

তা লাগছে না। দীপ্রকে স্কুলে ছেড়ে ট্যাক্সির জন্যে প্রায় পনেরো মিনিট এদিক ওদিক ছুটোছুটি করে এবং না পেয়ে প্রায় গোটা রাস্তাটাই দাঁড়িয়ে আসতে হয়েছিল ভিড়ে ঠাসাঠাসি মিনিবাসে, তার পরের ঘটনাগুলোয় আরও খাপছাড়া লাগছিল নিজেকে। সোমেশ্বর সদয় হওয়ায় বেঁচে গেল। এইটাই ভাল হল, জরুরি কাজটা শেষ করার পরেই ফোনটা এল, অফিস বা সোমেশ্বর সম্পর্কে কোনও জ্বালা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে না তাকে।

এখন আর কাউকে কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই। তবু যাবার আগে নন্দিতার টেবিল ছুঁয়ে গেল গার্গী।

'চলে যাচ্ছি। আজ আর ফিরব না।'

'কী হল।'

'ছেলেকে স্কুল থেকে তুলতে হবে। তারপর খাওয়ানো, আগলানো। বুঝতেই পারছ, ঝামেলার একশেষ।'

'এখন বুঝতে পারো বিয়ে না করে কত ভাল আছি!' নিজের ধরনে হাসল নন্দিতা, 'অসুবিধে হবে দীপেনবাবুর। সকালে দেরি দেখে খোঁজ করছিলেন—'

পুরনো রসিকতা। ইচ্ছে কবেই পিছনে তাকাল না গার্গী। ঘড়ির কাঁটায় চোখ বুলিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল সিঁড়ির দিকে। সময়ের হিসেব আগেই কবে রেখেছে, সেটা ঠিক হবে চটপট ট্যাক্সি পেয়ে গেলে। অফিসের সময়ের চাপ কমে গেছে, এই সময়টায় আলস্য লেগে থাকে ট্যাক্সির চাকায়, প্যাসেঞ্জার তোলে যেচে। না পাওয়ার কথা নয়।

ভোরবেলায় বৃষ্টির পর মেঘলা দশা কাটিয়ে স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল আকাশ, রোদের দেখা মিলেছিল, যদিও বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন প্রখর হয়ে ওঠে তেমন হয়নি। রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখল আবার ছায়া ছড়িয়েছে চারদিকে। অনেকটা নীচে নেমে এসে কয়েকটা চিল অর্থহীন ডানা মেলে ওড়াউড়ি করছে ইতস্তত। তবে এই মেঘে বৃষ্টি হয় না, অন্তত এখনই হবার সম্ভাবনা নেই কোনও। গুমোট ভাবটা বাড়তে পারে। রাস্তার মাঝখানে অনড় পড়ে থাকা একটা কাগজের ঠোঙার দিকে খানিক অপলকে তাকিয়ে থেকে গার্গী বুঝল হাওয়াও নেই এতটুকু। কিছু দৈন্য কিছু বা সম্ভ্রান্ত হবার চেষ্টা নিয়ে ফ্রি স্কুল স্ট্রিট যেমন থাকে তেমনি, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উত্তর দিকে তাকালে আরও প্রকট হয়ে ওঠে সামগ্রিক জীর্ণতার চেহারা। তেলেভাজা, মুড়ি-মুড়কি-বাতাসার দোকানের ওপরের দোতলার রংচটা কাঠের রেলিং থেকে ঝুলছে শুকোতে দেওয়া বিবর্ণ শাড়ি ও বহু-ব্যবহৃত ট্রাউজার্স; আরও একটু দূরে সদ্য কলি ফেরানো নতুন টেলারিং শপের ওপরে কার্নিশে অশত্থের চারা নিয়ে দাঁত বের করে আছে পুরনো ছাদ, তার নীচে জানলায় বাচ্চা কোলে শালোয়ার কামিজ পরিহিতা এক ক্ষয়া চেহারার যুবতী, তার পাশের জানলায়—সম্ভবত এটা অন্য বাড়ি—হাঁটু পর্যন্ত পায়জামা তুলে খালি গায়ে দাঁড়ানো পুরুষটি সিগারেট টানছে রাস্তার দিকে তাকিয়ে। মোটরের হর্নের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে রিকশার ঘন্টির শব্দ। ওয়েলেসলির দিক থেকে সরু রাস্তা দিয়ে একপাল ভেড়াকে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে এল দুটো লোক, সম্ভবত হগ মার্কেটে যাবে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে ডান দিকে ঘুরে ছিপটির ঘা খেয়ে এলোমেলো দৌড় দিল দলছুট দু-তিনটি জীব, স্পিডের মাথায় তাদের একটিকে চাপা দিতে গিয়ে অতর্কিত শব্দে প্রচণ্ড ব্রেক কষল একটা নীল রঙের কনটেসা। রাস্তায় পড়ে থাকা কাগজের ঠোঙাটা চাকায় জড়িয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর গার্গী লক্ষ করল সিটের পিছনের কাচে মুখ লাগিয়ে বসে আছে একটা সাদা

রোমশ কুকুর, পাশে এক ববচুলের মহিলা। চিন্তিত অথচ চিন্তাহীন নিরপেক্ষতায় দৃশ্যগুলো পেরিয়ে এল গার্গী। তার কাছে অর্থহীন এসব দৃশ্যের আড়ালে কোনও গভীরতর ঘটনা আছে কি না তা সে জানে না, যেমন উল্টোদিকের ফুটপাথে হাতে ব্রিফকেস নিয়ে স্টিল-গ্রে স্যুট-পরিহিত যে সুদর্শন যুবকটি এইমাত্র এসে দাঁড়াল, এখন তাকেই দেখছে, তার কাছে গার্গী সবুজ ডুরে শাড়ি সবুজ ব্লাউজ পরিহিতা পাঁচ ফিট চার ইঞ্চি উচ্চতার, সুঠাম স্বাস্থ্যের এক যুবতী মাত্র, আরও খুঁটিয়ে দেখলে চোখে পড়বে যুবতীর মুখের ঈষৎ ডিমের গড়ন, টানা চোখ, গায়ের উজ্জ্বল শ্যাম রং এবং এই মুহূর্তের ঔদাসীন্য। তার উদ্বেগ তারই নিজস্ব।

দু-তিন মিনিট ফুটপাথে দাঁড়িয়ে থেকে কোনও ট্যাক্সির দেখা না পেয়ে পার্ক স্ট্রিটের দিকে এগোবে কিনা ভাবছে, ঠিক সেই সময়ে চোখে পড়ল রয়েড স্ট্রিট থেকে মিটার উঁচিয়ে এদিকেই আসছে একটা ট্যাক্সি। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলল সে। ট্যাক্সিটা কাছে এসে দাঁড়াতে উঠেও পড়ল। সোজা রাস্তায় 'নো এনট্রি' থাকায় যেতে হবে চৌরঙ্গি দিয়ে। তা হোক। অভ্যাসবশত ব্যাগ খুলে টাকা-পয়সার ছোট ব্যাগটা আছে কি না দেখে নিয়ে সিটের গায়ে হেলান দিয়ে নিজেকে আলগা করে দিল গার্গী।

ক্লান্তি টের পাচ্ছে। মনে হল ভোরে ঘুম থেকে ওঠার পরে এই এতটা সময় পর্যন্ত সে যা যা করেছে এবং যে-অবস্থায়, তার মধ্যে উদ্দেশ্য ছিল না কোনও; দায়িত্বের সবটাই পালন করেছে প্রায় বাধ্যতামূলক ভাবে। যেটা আরও খারাপ লাগছে এখন, হঠাৎ কাজে আটকে পড়া এক কথা—এমন হতেই পারে—কিন্তু কাজের ছুতো ধরে দীপঙ্কর কী করে তাকে বলল কথাগুলো, অফিস বেশি ইমপর্ট্যান্ট, না ছেলে! সত্যি বলতে, দীপঙ্কর দীপ্রকে আনতে যেতে পারবে না শুনেই গার্গী সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অগত্যা তাকেই যেতে হবে, পরের কথাগুলো এসে যায় আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলোর তিক্ততা ও জ্বালা থেকে। ছেলে কি তার একার! একই কথা তো বলা যেত দীপঙ্করকেও—ওই যে মিস্টার মল্লিক না কি নাম বলল, তাকে বুঝিয়ে কর্পোরেশনে যাবার ব্যাপারটা পিছিয়ে দিতে, কাজটা কি হঠাৎই এত জরুরি হয়ে পড়ল যে একদিনের জন্যে ছেলেকে আগলানোর দায়িত্ব নিতে পারছে না দীপঙ্কর! নাকি সত্যি সত্যি দীপঙ্কর মনে করে তার নিজের কাজটাই কাজ, আর গার্গীর অফিসে যাওয়ার ব্যাপারটা পুরোটাই শখের, সময় কাটানোর জন্যে, সুতরাং ওই ভাষাতেই বলতে হবে কথাগুলো! তাহলে প্রতি মাসে তার অফিস থেকেই মাইনে নামক টাকাগুলো সম্পর্কে কেন এত হিসেবি হয়ে ওঠে দীপঙ্কর, প্রত্যক্ষ ভাবে না হলেও এখনও পরোক্ষে একটা জ্বালা পুষে যায় সে—বিয়ের পরেও কেন গার্গীকে সাহায্য করতে হবে বাবার সংসারে?

ট্যাক্সি যে-রাস্তায় যাচ্ছে সেটা বাস মিনিবাসের রাস্তা নয়। অনেক দিন পরে এভাবে যাওয়া বলেই গার্গী টের পেল আশপাশের বাহারে বাড়ি ও দোকানগুলোই শুধু নতুন হয়নি, অপরিচিত হতে হতে বদলে দিয়েছে একদা পরিচিত রাস্তার পুরনো চেহারাও। বছর ছ' সাত আগে, তখনও তার বিয়ে হয়নি, লর্ড সিনহা রোডের যে মুসলমান দর্জির দোকানে সে ব্লাউজ সেলাই করতে দিতে এসেছিল দীপঙ্করেরই সঙ্গে—বলতে কি ওদের বাড়ির কাজ করে বলে দীপঙ্করই চিনিয়েছিল দোকানটা, আশ্চর্য, তখন ও গার্গীর ব্লাউজের কাট নিয়েও ভাবত—সেই দোকানটা উঠে গেছে, সেখানে আরও অনেকটা জায়গা নিয়ে চালু হয়েছে ঝকমকে হাল ফ্যাশানের ল্যাম্প-শেডের দোকান। নাকি সে ভুল করেছে, দোকানটা ঠিক

ওখানেই ছিল না, আরও একটু পিছনে কিংবা এগিয়ে কোনওখানে। কিন্তু, পিছনের রাস্তায় সেটা চোখে পড়ল না কেন, এগিয়ে যাবার রাস্তাতেও নেই তো। সবকিছু এমন বদলে গেল কবে।

ট্যাক্সির মধ্যেই খাড়া হয়ে বসে সামনে পিছনে তাকিয়ে এমন ভাবে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল গার্গী যেন এখনই সে খুঁজে পেতে চায় স্মৃতিচিহ্নিত জায়গাটা। পেল না। নির্বিকার ট্যাক্সি ড্রাইভার তাকে নিয়ে বাঁক ঘুরল লোয়ার সার্কুলার রোডে।

দ্রষ্টব্য না থাকায় শূন্যতা এসে গেল দৃষ্টিতে। আস্তে আস্তে অভিমানও। গার্গী এখন নিজেকেই খুঁজছে। নিজের মধ্যে যত না, তার চেয়ে বেশি দীপঙ্করের মধ্যে।

পরিচয় থেকে আকর্ষণ বোধ, ক্রমশ ভালবাসা, তারপর বিয়ে। এসব চেনা যায় বইয়ের চ্যাপ্টার বদলানোর মতো সহজে। তবে গার্গী সরকার হওয়া থেকে গার্গী ব্যানার্জি হওয়াটা সহজ হয়নি। বাড়ির দুটি গাড়ির একটি তখন দীপঙ্করই ব্যবহার করে। ক্রিম রঙের সেই ফিয়াটে, পাশে গার্গী, এক রবিবার, বিকেলে, তাদের আমতলার বাগানবাড়ি থেকে ডায়মন্ডহারবার রোড ধরে ফিরতে ফিরতে হঠাৎই বলেছিল দীপঙ্কর, 'বাবা কোনও কথা না বললেও মা একটু আপত্তি দেখাচ্ছে। অবশ্য ওটা কোনও বাধা নয়—'

ভাষা এক না হলেও হতে পারে, তবে বক্তব্যে তফাত ছিল না। একটু আগেই একান্তে শরীর দিয়েছে গার্গী; অনুভূতিগুলোকে তখনও ঠিকঠাক চিনতে না পারার রহস্যে টলটলে হয়ে আছে সর্বাঙ্গ, সঙ্কোচে, কিছু বা ভয়ে এর আগে কখনও দীপঙ্করকে এতটা কাছের মনে হয়নি।

কথাগুলো স্পষ্ট কানে এলেও মনে হয়েছিল দীপঙ্কর তাকে টানতে চাইছে নতুন কোনও খেয়ালে। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

'হয়তো এমনিই। হয়তো ভেবেছিল নিজেই দেখেশুনে ছেলের বউ আনবে।'

গার্গী গতকালে ফিরে গেল। দীপঙ্করদের বাড়িতে নীহারকে প্রণাম করে সে উঠে দাঁড়াচ্ছে। চাকরিতে ইন্টারভিউ দেবার সময়েও নিজেকে এতটা নার্ভাস লাগেনি।

'আমাকে পছন্দ হয়নি?' •

'সেসব নয়। আসলে—', সামনে অনেক দূর পর্যন্ত রাস্তা ফাঁকা দেখে নিয়ে স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে সিগারেট ধরাল দীপঙ্কর। তারপর বলল, 'আমাদের বংশে এর আগে কখনও অসবর্ণ বিয়ে হয়নি।'

এটা গার্গীর থামবার জায়গা। কথাগুলোর অর্থ বুঝে থেমে গিয়েছিল সেদিনও। অবাধ রাস্তার আশপাশের দৃশ্য থেকে চোখ তুলে তাকিয়েছিল কোলের ওপর ফেলে রাখা নিজের হাত দুটির দিকে—এই দুটি হাতের গভীরতম আশ্লেষে শরীরের সমস্ত সংযম ভেঙে একটু আগেই সে গ্রহণ করেছে দীপঙ্করকে, একবারও মনে হয়নি দীপঙ্করের আবেগ শুধু তাকেই নয়, স্পর্শ করছে তার অসবর্ণতাকেও। নিজেকে নিয়ে কখনও যে এভাবে ভাবতে হবে কিছুক্ষণ আগেও তা কল্পনা করতে পারেনি।

ট্যাক্সির মধ্যে, দীপ্রর স্কুলের দিকে যেতে যেতে, অনেক দিন পরে আজ আবার সেই অনুভূতির মধ্যে ফিরে গেল গার্গী। একই দৃশ্যের মধ্যে হুবহু ফিরিয়ে আনল নিজেকে।

তার স্তব্ধতাই সম্ভবত সচেতন করেছিল দীপঙ্করকে। অনেকটা রাস্তা পেরিয়ে এসে বলল, 'এসব নিয়ে ভেবো না। মা'র মনটা বড্ড সেকেলে। বলছিল গুরুদেবকে জিজ্ঞেস

করবে। আমি কী বলেছি জানো?'

গার্গী তাকিয়েছিল দীপঙ্করের দিকে। তবে উত্তর শোনবার জন্যেই নয়।

'বললাম বিয়েটা গুরুদেব করবেন না, আমিই করব। গুরুদেব হ্যাঁ করলেও করব, না বললেও করব। আমার কথায় সায় দিল তমসা। আমার বোন আমার চেয়ে তেজি। বলল এই বিয়ে না হলে সেও অসবর্ণ বিয়ে করবে।'

গার্গী জবাব দেয়নি। তখনকার ঘোরের মধ্যে এসব কথার কোনও অর্থ ছিল না। পাশে বসা লোকটির সংস্পর্শে দূরত্ব বোধ করতে করতে ভাবছিল তখনই কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবে কি না।

দিন কয়েক ভারাক্রান্ত ও সংশয় বোধ করলেও দীপঙ্করের পরবর্তী ব্যবহারে কোনও খুঁত পায়নি। মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কিন্তু অনুতপ্ত লাগছিল ওকে। যতই অপ্রিয় হোক, ক্রমশ ভেবেছিল গার্গী, আড়ালের কথাগুলো বলে ফেলে ভালই করেছে দীপঙ্কর। অন্তত সে সতর্ক হতে পারবে। তা ছাড়া, সম্পর্কটা দীপঙ্করের সঙ্গে, দীপঙ্করের জোর থাকলে সে ভয় পাবে কেন।

আর কখনও এসব কথা ওঠেনি। বিয়েটা হয়ে গেল। রেজিস্ট্রি বিয়ে। সই-সাবুদের পরে তাদের ক'জনকে স্কাইরুমে খাওয়াতে নিয়ে গিয়েছিল ইন্দ্রনাথ। ওদের মতে অসবর্ণ বিয়ে, তবু, একমাত্র ছেলের বিয়ের রিসেপশনে জাঁকজমকে কার্পণ্য করেননি রঘু ব্যানার্জি।

কিন্তু, দীপঙ্কর যতই ভালবাসার জোর দেখাক, তমসা যতই কাছের হয়ে উঠুক, এক দিনের হঠাৎ-শোনা কথাগুলো ভুলতে পারেনি গার্গী। ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাপারটা বুঝতে গিয়ে ক্রমশ একটা জেদও ঢুকে পড়েছিল রক্তে। দাম্পত্য সম্পর্কের স্বাভাবিকতার মধ্যে থেকেও নতুন এই পারিবারিক জীবনে কী যেন ছিল না, হঠাৎ-হঠাৎ বিচ্ছিন্ন মনে হত নিজেকে, আশঙ্কায় সঙ্কুচিত লাগত, চাপা বিক্ষোভে শিরশির করত মেরুদণ্ড। একান্তের এইসব অভিজ্ঞতা থেকে সে ক্রমশ যেসব সিদ্ধান্ত নেয় তার একটি, সচ্ছল পরিবারের বউ, টাকার দরকার নেই, তবু চাকরিটা ছাড়বে না।

শ্বশুর শাশুড়ির কথা আলাদা, ব্যাপারটা দীপঙ্করও মেনে নিতে পারেনি। গোড়ার দিকে তেমন কিছু না বললেও অশান্তি শুরু হল দীপ্রর জন্মের পরে।

'তোমার এই জেদের কারণ বুঝতে পারি না। কী এমন অভাব টাকার!'

'তুমি থাকতে আমার অভাব হবে কেন!'

'তাহলে। শখ!'

'শখ কেন হবে। বিয়ের আগেই তো তোমাকে বলেছিলাম চাকরি ছাড়ব না। তুমি রাজি হওনি?'

'হয়েছিলাম। কিন্তু কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা বলিনি। তখন দীপ্রও হয়নি।'

গলা চড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষাও বদলে যাচ্ছিল দীপঙ্করের। পরের কথাগুলো কোন দিকে যাবে অনুমান করতে না পেরে গার্গী বলল, 'ছেলের কোনও অসুবিধে হলে আমি বুঝতাম না। আমি একাই চাকরি করছি না, আমার মতো আরও অনেকে করে—'

'তাদের প্রয়োজন আছে, তাই করে। তা ছাড়া—', একটু থেমে বলল দীপঙ্কর, 'বাড়িটা তোমার আমার ইচ্ছের ওপর দাঁড়িয়ে নেই। বাবা মা বেঁচে আছেন এখনও, তাঁদেরও একটা মতামত আছে।'

'ওঁদের কোন কথাটা না মেনে চলছি।'

চাপটা কোথা থেকে আসছে অনুমান করতে অসুবিধে হয়নি গার্গীর। এবং বুঝতে পেরেছিল, অন্য কেউ নয়, এখনও দীপঙ্করই তার নির্ভরতার জায়গা। তাকে বিয়ে করার ব্যাপারেও তো ওঁদের সম্মতি ছিল না, জোর দীপঙ্করই খাটায়। ভালবাসার জোর! হয়তো। ওই পরিবারে নিজেকে অসবর্ণ জেনেও সে যে দীপঙ্করকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেনি, সেটাও ভালবাসার জন্যে। তাহলে মনের কথাটা ওকে আরও একটু জোর দিয়ে বলতে পারবে না কেন!

'তোমার কাছে যেটা জেদ বা শখ, আমার কাছে সেটাই প্রয়োজন।' যতটা সম্ভব নরম হয়ে বলল গার্গী, 'আমাদের বাড়ির অবস্থা তো জানো। দাদা মারা যাবার পর আরও খারাপ হয়েছে। বউদি, দাদার দুই ছেলেমেয়ে—সবই এখন বাবার দায়িত্ব। এদিকে সুমিত্রারও বিয়ে হয়নি। কিছু টাকা আমাকে দিতে হবে বাবাকে, অন্তত বাচ্চা দুটোর পড়ার খরচ—'

দীপঙ্কর বলল, 'সেটা তো আমিও দিতে পারি!'

'তোমার দেওয়া ওরা নেবে কেন!'

'কী বলতে চাও!'

ভালবাসা আর দয়া এক জিনিস নয়, কথাগুলো এসে গিয়েছিল গার্গীর মুখে, যাদের তুমি গ্রহণ করতে পারোনি তারা তোমার টাকা নেবে কেন! দীপঙ্করের দৃষ্টির পরিবর্তন লক্ষ করে নিজেকে এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তোমার দায়িত্ব শুধু আমার ভার নেওয়া।'

দীপঙ্কর খুশি হয়নি। গার্গীর শেষের কথাগুলো যে শুধুই আগের প্রশ্ন বা বিস্ময়টাকে আড়াল করার জন্যে, লুডো খেলতে খেলতে স্বামী-স্ত্রীর হালকা আলাপ নয়, বুঝতে পেরেছিল তা।

যত দূর মনে করতে পারে সেদিন ছিল রবিবার। দুপুরের বিছানা থেকে উঠে গিয়ে চিন্তিত ভাবে সিগারেট ধরাল দীপঙ্কর। একটু পরে বলল, 'তোমার বউদির দাদা তো বিরাট চাকরি করেন, গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ান, বিধবা বোনের দায়িত্বটা তো তিনিও নিতে পারতেন!'

স্বামী-স্ত্রীর কথাবার্তার মধ্যে হঠাৎ ইন্দ্রনাথকে টেনে আনায় বিরক্ত হয়ে গার্গী বলল, 'নিচ্ছেন কি না তা তুমি জানছ কী করে!'

'ও! তাহলে সমস্ত ব্যাপারটাই চলছে চ্যারিটির ওপরে!'

গন্তব্যের নির্দেশ দেওয়া ছিল ট্যাক্সিঅলাকে। দীপ্রর স্কুলের রাস্তায় পৌঁছে লোকটি প্রশ্ন করায় সাময়িক আচ্ছন্নতা থেকে নিজেকে আলাদা করে নিল গার্গী। এবার বাঁ দিকে। কবজির ঘড়িতে স্কুল ছুটি হতে আরও তিন-চার মিনিট বাকি। তার মানে জ্যাম ছিল না রাস্তায়, আটকাতে হয়নি কোথাও। রাস্তা দেখতে দেখতে কখন সে নিজেকেই দেখতে শুরু করেছে, এই মুহূর্ত থেকে সরে গেছে পিছনে, খেয়াল করেনি। এখন অফিসের উদ্বেগ নেই, ছেলেকে তুলতে ঠিক সময়ে পৌঁছুবার তাড়াও নেই—এসবের ছেড়ে যাওয়া জায়গাগুলো হঠাৎই যেন ভরে উঠছে অবসাদে।

গলার ভিতর উঠে আসা হাই চাপতে চাপতে গার্গী ভাবল, এরকম হল কেন! পারস্পরিক সম্পর্কের ভিতরটা দেখা যায় না, কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে যে কেউই ভাববে সম্পর্কের এই টানাপড়েনে জটিলতা নেই কোনও, এ শুধুই বড়লোক-গরিবলোক খেলা, সাজানো গল্পের মতো। সিনেমায় যেমন হয়।

ধক করে মনে পড়ে গেল কথাটা। অশোকাদির কথা বলতে গিয়ে আজ সকালেই বলেছিল ইন্দ্রদা। সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ, বুঝতে পারে না গণ্ডগোলটা কোথায়, সুতরাং ধরেই নিয়েছে কথাগুলো তার বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রীর প্রলাপ মাত্র। কিন্তু, বিশেষত এই কথাগুলোই কেন বলে অশোকা? এক সময় তো সুস্থই ছিল ও, ইন্দ্রর সঙ্গে বিয়ের পর বেশ কিছুদিন দেখেছে ওকে, কথাবার্তাও বলেছে, হাবেভাবে কোনও অস্বাভাবিকতা চোখে পড়েনি। তারপর হঠাৎই উল্টোপাল্টা হয়ে গেল সব। এমন কি হতে পারে ওই অসংলগ্ন কথাগুলোর মধ্যেই আড়াল হয়ে আছে অশোকার অভিজ্ঞতার এমন কোনও সত্য যা কোনও দিন প্রকাশ পাবে না; অভিজ্ঞতাটা তারই, একার; একারই থেকে যাবে?

কথাগুলো ভেবে নিজেকে কেমন হতভম্ব মনে হল গার্গীর, যেন সে কোনও দুর্জ্ঞেয়কে স্পর্শ করেছে। বাস্তবিক, বোঝা যায় না জীবনের গতি কোনদিকে, কোথায় অপেক্ষা করে আছে কোন অপ্রত্যাশিত। অশোকার একটা ইতিহাস আছে, তার কথা আলাদা; কিন্তু মাত্র তিনদিনের অসুখে অমরেশ হঠাৎ এইভাবে চলে যাবে কেন! দাদা নিজেও কি ভাবতে পেরেছিল! তার পরেই ভাবল, দীপঙ্করের এত কাছে থেকেও মাঝে মাঝে কেন নিজেকে এত একা লাগে তার!

স্কুলের সামনে ট্যাক্সি থেকে নেমে দ্রুত গেটের দিকে এগিয়ে গেল গার্গী। ছুটি হয়েছে। এ সময়টা স্কুলের সামনে ও আশপাশে অনেকটা জায়গা গিজগিজে হয়ে থাকে ভিড়ে। মর্নিং সেকশন শেষ হয়ে শুরু হয় আফটারনুন সেশন—বাচ্চাদের ফেরত নিতে কিংবা পৌঁছে দিতে আসে বাড়ির লোকজন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে গাড়ি ও রিকশার হুটোপাটি। দীপ্রকে নিয়ে কমলা যাতায়াত করলেও সেটা খুব বেশিদিনের ঘটনা নয়। গোড়ার দিকে, বালিগঞ্জ প্লেসে শ্বশুরবাড়িতে থাকবার সময় সে নিজেই পৌঁছে দিত ছেলেকে, সেখান থেকেই চলে যেত অফিসে। স্কুল থেকে ফেরত নিয়ে যেত বাড়ির ড্রাইভার। কোনও কোনও দিন সঙ্গে আসতেন দীপঙ্করের মা নীহার। ওই গোড়ার দিকেই দু চারদিন ছাড়া দীপ্রকে স্কুলে পৌঁছুতে গার্গী কখনও গাড়ি ব্যবহার করেনি, চলে আসত বাসে বা মিনিবাসে। এ নিয়েও কম অশান্তি হয়নি। দীপঙ্কর শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা গায়ে না মাখলেও কটাক্ষ করেছিলেন নীহার, 'বাড়িতে গাড়ি ড্রাইভার মজুত থাকতেও এই লোক-দেখানো আদিখ্যেতার কী মানে হয়, বউমা! তুমি নিজে যা ইচ্ছে করো, ছেলেটাকে কষ্ট দিচ্ছ কেন!'

'লোক দেখানোর জন্যে করছি না, মা। দূর দূর থেকে কত ছেলেমেয়ে পায়ে হেঁটে আসে, ও-ও একটু অভ্যেস করুক না। আমরাও পায়ে হেঁটে স্কুলে গেছি।'

নীহার বলেছিলেন, 'তুমি এমনভাবে বলছ যেন তোমার বাবার দশটা গাড়ি ছিল!'

এই কথা বা এই ধরনের কথা। উপলক্ষ দীপ্র হলেও, প্রায়ই যেমন হত, বুঝতে অসুবিধে হয়নি নীহারের লক্ষ্য সে-ই। মনে মনে জ্বললেও জবাব এড়িয়ে গিয়েছিল গার্গী। কিন্তু সিদ্ধান্ত বদলায়নি। ছেলের ভাল মন্দ সম্পর্কে ভাববার অধিকার তারই। তা ছাড়া এতে কষ্টর বা কী আছে, দীপ্র তো কোনও অনুযোগ করেনি।

সিদ্ধান্তে ভুল ছিল না, যদিও তখন ভাবেনি ওই বাড়ি ওই গাড়ির পরিবেশ থেকে সত্যিই সরে আসবে কোনও দিন।

স্কুলের আধখোলা গেটের মধ্যে দিয়ে নিজের নিজের লোক চিনে পিলপিল করে বেরিয়ে আসছে বাচ্চাগুলো। স্কুলের পোশাকে দূর থেকে প্রায় সকলকেই একইরকম দেখতে লাগে।

গার্গী দেখল, গেটের কাছের জটলা থেকে খানিক দূরে স্কুল কম্পাউন্ডের ভিতরে আর একটি বাচ্চার পাশে দাঁড়িয়ে গেটের দিকেই চিন্তিত মুখে তাকিয়ে আছে দীপ্র। সম্ভবত দেখতে পায়নি তাকে। নাকি দীপঙ্কর নিতে আসবে ভেবে বাবাকেই খুঁজছে। সঙ্গের বাচ্চাটি বেশ ফরসা ও নাদুসনুদুস চেহারা, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকায় দীপ্রকে রোগাই লাগছে।

নাম ধরে ছেলেকে ডাকল গার্গী, দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে সরে এল সামনে।

মা-কে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল দীপ্র। দারোয়ানের হাত গলে গেটের বাইরে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা আসেনি?'

'বাবা কাজে আটকে পড়েছে, তাই আমি এলাম।' ছেলের স্কুল-ব্যাগ আর ওয়াটার বটলটা নিজের হাতে নিয়ে গার্গী বলল, 'অমন মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলে কেন!'

জবাব না দিয়ে গেটের ফাঁক দিয়ে দূরের বাচ্চাটির কিছু বা হতাশ মুখের দিকে তাকিয়ে টা-টা করার ধরনে হাত নাড়ল দীপ্র, তারপর মা-র হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'চলো।'

'ও কি তোমার সঙ্গে পড়ে?'

'হ্যাঁ। ও-ই তো শান্তনু। তোমাকে বলেছি তো আগে!'

'নাম বলেছ। চোখে তো আজই দেখলাম।'

কয়েক পা এগিয়ে দীপ্র বলল, 'তুমি শান্তনুর মা-কেও চেন। চেন না?'

কথা বলতে ভাল লাগছিল গার্গীর। একটা দ্রুতগামী গাড়ির স্পর্শ বাঁচাতে ব্যস্ত ভাবে ছেলেকে কাছে টেনে বলল, 'কতজনের মাকেই তো দেখি। তারপর গুলিয়ে ফেলি। তুমি চিনিয়ে দিয়ো একদিন।'

'হ্যাঁ, তুমি চেনো। আজ সকালেই তো দেখলে!'

'ও মা! কোন জন?'

'স্কুলে আসবার সময়। তোমার সঙ্গে কথা বলল না!'

দীপ্রর কথায় আবছা ভাবে মনে পড়ল গার্গীর, খুব ফর্সা, মাঝারি গড়নের, একটু বা চাপা মুখের এক মহিলার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তার, প্রায় তারই বয়েসী, কপালের মাঝখানে সিঁদুরের টিপ, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দীপ্রর গাল টিপে দেবার পর তার দিকে তাকিয়ে হেসেছিল সামান্য। তখনই চেনা মনে হয়েছিল, কিন্তু অফিস যাবার তাড়া থাকায় সে গা করেনি। কথা বলেছিল কি না মনে পড়ল না।

'শান্তনু কার সঙ্গে বাড়ি ফেরে?'

'ওর মা-র সঙ্গে। এখনও আসেনি। অন্যদিন আগেই এসে দাঁড়িয়ে থাকে।'

ফুটপাথ ধরে কিছুটা এগোলে মেন রোডে পড়বে। রোদ এখনও আড়াল হয়ে আছে হালকা মেঘে। ট্যাক্সিতে আসবার সময় গতির উলটোদিকে ছুটে যাওয়া হাওয়ায় স্বস্তি ছিল, এখন আবার গুমোট লাগছে। স্কুল ছুটির পর এই সময়টায় দশ পনেরো মিনিট ভিড় থাকে উত্তর এবং দক্ষিণ দুদিকেরই বাস স্টপে, ফাঁকা বাস মিনিবাসগুলো স্টপে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই ভরে ওঠে স্কুল-ফেরতাদের হুড়োহুড়িতে। এখন তাদেরও গিয়ে অপেক্ষা করতে হবে। ভুল হয়ে গেল, দীপ্রর কথায় কান রেখে গার্গী ভাবল, ট্যাক্সিটা ছেড়ে না দিয়ে দু চার মিনিট দাঁড় করিয়ে রাখলে স্বচ্ছন্দে ফেরা যেত।

'এসে যাবেন। নিশ্চয়ই দূর থেকে আসতে হয়, বাসে ট্রামে দেরি হয়ে যায়।' গার্গী বলল, 'এই তো, আমাকেই কত তাড়া করতে হল। ট্যাক্সিতে এলাম।'

'তুমি তো অফিসে যাও!' দীপ্র বলল, 'শান্তনুর মা অফিসে যায় না। ওই যে বারান্দা, ওখানে বসে থাকে সকাল থেকে। স্কুল ছুটি হলে শান্তনুকে নিয়ে বাড়ি যায়।'

সামনের একটা দোতলা বাড়ির দরজার বাইরে সিঁড়ি-সংলগ্ন হাত তিনেক চওড়া বারান্দার দিকে আঙুল তুলে দেখাল দীপ্র।

আগে দেখেছে, এখনও লক্ষ করল গার্গী, নানা বয়স ও চেহারার সাত আটজন জড়ো হয়েছে ওখানে। মনে হয় সকলেই বিবাহিতা। তিন চারজন বসে, বাকিরা দাঁড়িয়ে, নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবে মত্ত। মর্নিং সেকশনে ছুটি হয়ে গেছে, এরা সম্ভবত আফটারনুন সেকশনের কোনও কোনও বাচ্চার মা বা আর কোনও আত্মীয়া, ঘণ্টা তিন চার ওখানেই কাটিয়ে স্কুল ছুটির পরে বাচ্চা নিয়ে বাড়ি ফিরবে। হয়তো সকলেই দূরে থাকে, যাতায়াতেই লেগে যায় তিন চার ঘণ্টা, ওই হয়রানি বাঁচাতে অপেক্ষা করে এখানে। এইভাবে আলাপ হয়ে যায় পরস্পরের সঙ্গে। মনে পড়ল, যে-রাস্তা দিয়ে স্কুলে এল তার পাশেই তেকোণা পার্ক মতন ঘেরা জায়গাটায় গাছের ছায়ায় বসে থাকতে দেখেছিল আরও কয়েকজনকে। সবই ছেলেমেয়েকে ভাল স্কুলে পড়ানোর হ্যাফা। হয়তো স্বপ্ন; ঠিক এইভাবে না হলেও দীপ্রকে ঘিরে এক ধরনের স্বপ্ন কি সে নিজেও দেখছে না! চাকরিটা না থাকলে সে নিজেও হয়তো এইভাবে এসে বসে থাকত, মিশে যেত ওদের সঙ্গে। এসব ভাবতে ভাবতেই গার্গী ভাবল, না, তা বোধহয় নয়; চাকরি না থাকলে এতদিনে তার নিজস্ব কোনও অস্বস্তিও কি থাকত!

বাসস্টপে পৌঁছুবার আগেই দীপ্র বলল, 'ওই তো শান্তনুর মা!'

ভুল দেখেনি। একই ফুটপাথে উল্টোদিক থেকে হন্তদন্ত ভঙ্গিতে যে এগিয়ে আসছে, এক পলক দেখেই তাকে চিনতে পারল গার্গী, একেই দেখেছিল সকালে। হালকা সবুজ খোলের হলদে পাড়ের শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ। ভার আছে চেহারায়।

সামনাসামনি এসে থমকে দাঁড়াল শান্তনুর মা।

'ছুটি হয়ে গেছে!'

'এইমাত্র। আপনার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে।' কথাগুলো বলতে বলতেই নারীত্বের প্রবণতায় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হল গার্গীর। কপালে, গলায়, ঠোঁটের নীচে ঘাম, এটা হয়তো ব্যস্ত ভাবে ছুটে আসার ফল, কিন্তু ছিতরে যাওয়া সিঁদুরের টিপ এবং কাঁধের ওপর বেরিয়ে থাকা ব্রেসিয়ারের স্ট্র্যাপে কেমন যেন ধস্ত ও অন্যমনস্ক। গার্গী বলল, 'দেরি হল!'

'একটা কাজে গিয়েছিলাম।' গার্গীর দৃষ্টি লক্ষ করে সতর্কতা এসে গেল মহিলার ভঙ্গিতে। ব্লাউজের হাতায় ব্রা-র স্ট্র্যাপটা চকিতে ঢেকে অস্বস্তিপূর্ণ হেসে বলল, 'ঘড়িটাও বোধহয় স্লো চলছে। যাই—'

প্রায় দৌড়তে শুরু করল শান্তনুর মা।

ওর চলে যাওয়ার দিকে খানিক তাকিয়ে সেই মুহূর্তের অনুমান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল গার্গী। নিতান্তই অচেনা একজন সম্পর্কে অবান্তর ভাবনার মানে হয় না। দীপ্রর কবজিতে টান দিয়ে বলল, 'দেখছ, কখনও কখনও দেরি হয়ে যায়। শান্তনু কেমন লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি হলে কান্না জুড়ে দিতে!'

দীপ্র বলল, 'খুব দেরি হলে কাঁদতাম।'

'স্কুলের ভেতর থাকলে ভয় পাবার কিছু নেই। কেউ না গেলে ওরা ঠিকানা খুঁজে বাড়ি পৌঁছে দেয়।'

'বাড়িতে যদি কেউ না থাকে?'

গার্গী চুপ করে থাকল।

দীপ্রর প্রশ্নে ভয় আছে। প্রশ্নটা তুলে ও যেন অন্যদের থেকে আলাদা করে নিল নিজেকে। আসবে বলেও আজ শেষ পর্যন্ত আসতে পারেনি দীপঙ্কর। ও তো ফোন করেই খালাস! এর পর সত্যিই যদি এমন হত যে কোনও কারণে গার্গীও পৌঁছুতে পারল না, বা দুর্ঘটনায় পড়ল হঠাৎ, তাহলে কে নিত দীপ্রর দায়িত্ব! স্কুল থেকে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আছে কি না জানে না; যদি দিত তাহলেও বাড়ি পৌঁছে তো কাউকে খুঁজে পেত না ছেলেটা!

ভাবনাটা চিরে গেল গার্গীকে। নিজের আশঙ্কা থেকে ছেলের মনের চাপা আতঙ্ক স্পর্শ করল সে। স্বগতোক্তির গলায় বলল, 'বোকা ছেলে! এমন কখনও হয়! সেরকম হলে আমিও অফিসে না গিয়ে ওদের মতো ওই বাড়িটার বারান্দায় বসে থাকব।'

'শান্তনুর মা ওখানে ছিল না তো! ভাগ্যিস ফিরে এল!'

যেতে যেতে ঘাড় ফিরিয়ে ছেলেকে দেখল গার্গী। জবাব দিল না। জানে, দীপঙ্করকে এসব কথা বললে ও একটাই উত্তর দেবে। কিন্তু, সত্যি সত্যিই যদি তেমন কোনও সমস্যা দেখা দেয়—যদি কালও না আসে কমলা, তার পরেও না আসে, তাহলে কি সে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে বসে থাকবে বাড়িতে!

মাসান্তে হাজার দুয়েক টাকার অভাবে নিঃশ্বাস থমকে এল গার্গীর। বাস স্টপে পৌঁছে, উদাসীন দৃষ্টিতে দূরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে শান্তনুর মা-র দৌড়ে যাবার দৃশ্যটাই ভেসে উঠল তার চোখে। ওর কতটা তাড়াতাড়ি ছেলের কাছে পৌঁছুবার জন্যে, কতটা তাকে এড়িয়ে যাবার জন্যে, এখনও বুঝতে পারছে না ঠিকঠাক। হাতটা ছেড়ে দিয়েছিল। দীপ্র আবার জড়িয়ে ধরল।

'মা?'

'বলো!'

'শান্তনু বলছিল একদিন আমাদের বাড়িতে আসবে—'

'বেশ তো। আসবে। তোমার বন্ধুরা কেউই তো আসে না! শান্তনুকে বোলো আসতে—'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না দীপ্র। একটু পরে বলল, 'তুমি ওর মা-কে বললে পারতে!'

'তুই কি আগে বলেছিলি!' নিজেকে সহজ করে নিয়ে সস্নেহে ছেলের দিকে তাকাল গার্গী, 'ওর মা-কে তো চিনিও না ভাল করে।'

ওপরে মুখ তুলে গার্গীর চোখে চোখ রেখে কিছু বুঝবার চেষ্টা করল দীপ্র। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ওর মায়ের নাম জানো না?'

হেসে মাথা নাড়ল গার্গী। দৃষ্টি আবার রাস্তায়, দূরে। চারদিকে আলোর তারতম্য দেখে মনে হয় মেঘের আড়ালে মাথা চাড়া দেবার চেষ্টা করছে রোদ। পিচের রাস্তায় ফুটবোর্ড রগড়ে একটা ডাবল ডেকার এল এবং চলে গেল। বাসস্টপ হালকা হচ্ছে ক্রমশ। পর পর ছুটে আসছে দুটো মিনিবাস। একটা অবশ্যই তাদের দিকে যাবে।

'শান্তনুর মায়ের নাম গীতশি। গীতশি দে। ওর বাবার নাম সুবোধ দে।'

'গীতশি! না গীতশ্রী?'

'হ্যাঁ।'

'তুই জানলি কী করে!'

'আমাদের আন্টি একদিন জিজ্ঞেস করছিল সবাইকে। তখন। শান্তনুরা সোদপুরে থাকে। ট্রেনে চড়ে যেতে হয়।'

সবজান্তার ধরনে শান্তনু সম্পর্কে জ্ঞাতব্য যাবতীয় তথ্য এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করে গেল দীপ্র। শুনলে মনে হবে না একটু আগেই ভয়ের কথা বলেছে সে, বলেছে স্কুল থেকে ফিরিয়ে আনতে দেরি হলে তার কেঁদে ফেলার সম্ভাবনার কথা, এমনকী বাড়ি ফিরে কাউকে দেখতে না পাওয়ার আশঙ্কার কথা। একরত্তি অস্বস্তি; ওর বয়সে গার্গী বা দীপঙ্কর স্কুলের ছায়া মাড়ায়নি। নিজেকে যেটুকু মনে পড়ে গার্গীর, বোধবুদ্ধিও হয়নি। হাতেখড়ি হয়েছিল পাঁচে পৌঁছে। তারপর বাড়ির কাছেই স্কুলে। তখন অবশ্য থাকত শ্যামবাজারের দিকে। পাড়ার দঙ্গলে মিশে স্কুল থেকে বাড়ি ফিরত এক্কা-দোক্কা খেলার সহজে। মা দাঁড়িয়ে থাকত দরজায়, কখনও মনে হয়নি কেউ থাকবে না।

দীপ্র এই বয়স থেকেই এসব ভাবছে। তাহলে কি স্কুলে গিয়েও ও ভয়ে ভয়ে থাকে সারাক্ষণ!

নিশ্চয়ই থাকে, গার্গী অনুমান করল, হঠাৎ ভাবনা থেকে কোনও শিশু এতটা গুছিয়ে বলতে পারে না। আজ কথা উঠল বলেই বলে ফেলল তরতর করে। সকালে কমলা না আসায় ওকে নিয়ে যখন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে টানাপড়েন চলছে, সেই সময় একবার বেঁকে বসেছিল ছেলেটা, বলেছিল আজ স্কুলে আসবে না। সম্ভবত নিরাপত্তার অভাব থেকে। ওটাকে নিতান্তই জেদ ভেবে ধমক দিয়ে গার্গী বলেছিল স্কুলে না গেলে একা ফেলে যাবে বাড়িতে। দীপ্র চুপ করে যায়। তারপর থেকে স্কুলের গেটে ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত একটি বাড়তি কথা বলেনি। এখন মনে হচ্ছে ধমকটাকেই সত্যি ভেবে ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল ও।

উচিত হয়নি, একেবারে উচিত হয়নি। এর পর ওকে কিছু বলার ব্যাপারে সতর্ক হতে হবে তাকে। ছেলে ভুল বুঝতে শুরু করলে সে দাঁড়াবে কোথায়!

এক ধরনের আবেগে চঞ্চল বোধ করলেও নিজেকে সামলে নিল গার্গী। ঘন চোখে দেখল ছেলেকে। শুকনো লাগছে সামান্য। হয়তো খিদেয়। কমলার কাছে শুনেছে স্কুল থেকে ফিরে ওর ইউনিফর্ম ছাড়ার তর সয় না, খেতে বসে সঙ্গে সঙ্গে। ঘুমিয়েও পড়ে। মানসিক চাপে ক্লান্ত হয়ে পড়ে কি না কে জানে! অনেকদিন পরে স্কুলের দিনে এতটা সময় জুড়ে কাছে পাচ্ছে ছেলেকে। আজ দেখতে হবে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে ওকে কতটা নিশ্চিন্ত করা যায়।

ছেলেকে নিয়ে মিনিবাসে উঠে গার্গী ফিরে এল নিজের মধ্যে। মুহূর্তের আবেগ সেই মুহূর্তটিকেই বড় করে দেখায়; আরও সব মুহূর্ত ও তাদের ভিতরের বাস্তব জুড়ে জুড়ে ব্যাপ্ত যে-সময়, তুচ্ছ হয়ে ওঠে তা। এখন নিজেই বুঝতে পারছে একদিনের স্বাভাবিকতায় জীবন গড়ায় না। গতকাল যেমন সে আজকের দিনটিকে কল্পনাও করতে পারেনি, তেমনি আজ স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা আগামিকাল ওলোটপালট হয়ে যাবে কি না কী করে জানবে! সে নিজেই কি নিরাপদ, কিংবা দীপঙ্কর? এ নিয়ে দীপঙ্করের সঙ্গে কথা হয়নি কখনও, কিন্তু প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করতে পারে, পরস্পরকে জড়িয়ে বেঁচে থাকার আগ্রহ থেকে ক্রমশ প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হয়েছে তারা। কেন এমন হল! যাকে সর্বস্ব দেবে বলে তৈরি হয়ে এসেছিল, তার কাছে হেরে গেলে সে-ই তো খুশি হত সবচেয়ে বেশি। তাহলে দীপ্রকে নিয়েও সংশয়ের সুযোগ থাকত না।

দীপ্রকে আজ অন্যরকম দেখছে। বাড়ি ফিরে খাওয়া-দাওয়া সারল এতটুকু ঝমেলা না করে। কিন্তু, ঘুমোবার লক্ষণ নেই। খানিক এপাশ ওপাশ করল বিছানায়, তারপর উঠে গিয়ে চক্কর দিয়ে এল এ ঘর থেকে ও ঘরে। বহু দিন আগে ওকে একটা রঙিন ছবিঅলা 'ক্যাট অ্যান্ড মাউজ' বই কিনে দিয়েছিল দীপঙ্কর, তখন ওটাই ছিল ওর দিনরাতের সঙ্গী। যেমন হয়, নিজেরই খেয়ালে তারপর ঢুকে পড়েছিল অন্য খেলায়। আজ আবার ওর সেই বইটার কথা মনে পড়েছে। খুঁজে দিতে হবে।

গার্গী মনে করতে পারছিল না শেষ কবে দেখেছে বইটা, রেখেছেই বা কোথায়। ছেলের আবদারে জেরবার হয়ে সম্ভাব্য যতগুলি জায়গা আছে খুঁজে দেখল। কোথাও নেই। যেখানে থাকবার কোনও সম্ভাবনা নেই—যেমন ছোট টেবিলের ওপর গুছিয়ে রাখা দীপঙ্করের ব্যবসার কাগজপত্র ফাইলের মধ্যে, আঁতিপাতি করল সেখানেও। তার সঙ্গে সঙ্গে গায়ে পায়ে ঘুরছে ছেলেটাও। সামান্য বিব্রত বোধ করলেও ব্যাপারটা নিজেও উপভোগ করছিল সে। ছেলের অর্থহীন বায়নায় নিজেকে অবাধে ছেড়ে দেবার এমন সুযোগ বড় একটা হয় না আজকাল। শেষে মনে পড়ল, ঘরের পুরনো জঞ্জাল সাফ করার সময় কিছু জিনিস বিলিয়ে দিয়েছিল কমলাকে, দীপ্রর বাতিল খেলনা, ছিঁড়ে যাওয়া ছবির বইটইও ছিল তার মধ্যে। ক্যাট অ্যান্ড মাউজ-টাও চলে গেছে ওই সঙ্গে।

সত্যি বললে পাছে নতুন কোনও জেদ চাপে, সেই ভয়ে এড়িয়ে গেল গার্গী। দীপ্রর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ক্লান্ত, হাইও তুলল একবার, কিন্তু যে-কোনও কারণেই হোক আজ জেগে থাকতে চাইছে ও। একটা নতুন আর আরও ভাল ছবিঅলা বই কিনে দেবার প্রতিশ্রুতিতে ভুলিয়ে ভালিয়ে ছেলেকে বিছানায় টেনে আনল গার্গী। আজ আর সে অফিসে যাবে না, দীপ্রর প্রশ্নের উত্তরে সেটাও বলতে হল বার কয়েক, এমনকী দীপঙ্কর তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে আজ তারা কোথাও বেড়াতে যেতে পারে, সে-কথাও বলল।

ঘুমে শরীর কাঁই হয়ে থাকলেও কেন ঘুমোবার আগ্রহ নেই দীপ্রর, সেটা বুঝতে পারছে এতক্ষণে। ঘুমিয়ে পড়ার আগে তাকে 'অফিসে যাবার ব্লাউজ' ছেড়ে স্লিভলেস পরতে বাধ্য করল—ইদানীং বাড়িতে থাকলে গার্গী যা পরে, তার পরেও যেভাবে ঘেঁষে এল তার শরীরে তাতে মনে হয় সন্দেহ যায়নি পুরোপুরি।

গাঢ় চোখে ঘুমন্ত ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে, ওর শরীরে নিঃশ্বাসের ওঠানামা লক্ষ করতে করতে গার্গী ভাবল, এতটুকু ছেলের মনে এত অবিশ্বাস কেন! কোনও প্রতিশ্রুতি দিয়েও সে রাখেনি এমন তো হয়নি কখনও! নির্ভরতার ব্যাপারে তাহলে কি ও তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করে কমলাকে!

হয়তো। দীপ্র শিশু, ওকে আর কী বলবে! আজকাল গভীরে গেলে বিশ্বাসের অনেকগুলো জায়গাতেই চোখে পড়ে ফাটল। কিছু বা অস্পষ্ট হলেও চেনা যায় সেগুলো। সম্পর্কগুলো এমন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে কেন!

অন্যমনস্কতার মধ্যে এসব ভাবতে ভাবতে নিঃশ্বাস উঠে এল তার।

বিছানায় শুয়ে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকল গার্গী। চুপচাপ। আকাশের পরিবর্তন হয়নি। বরং বাড়ি ফেরার পর যেটুকু রোদের আভা বাইরের দেয়াল ছুঁয়ে ছিল এখন তাও অদৃশ্য। যেন দুপুরেই বিকেল শেষের আলো থম মেরে আছে চারদিকে। হাওয়া আছে কি নেই বোঝা যায় না, গুমোটও লাগছে না তেমন। যেটা আশ্চর্যের, কাজের দিন দুপুরে পাড়াটা

যে এমন নিঝুম হয়ে থাকে এর আগে কখনও খেয়াল করেনি তা। অনেকক্ষণ পরে একটা রিকশার মন্থর গতিতে চলে যাওয়ার শব্দ শুনল সে। তার পরের শব্দটা দোতলায় কমোড ফ্লাশ করার। শব্দগুলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল স্তব্ধতা। সুতরাং, নিঃসঙ্গতাও।

একটু আগে ভেবেছিল দীপ্র ঘুমোলে সেও ঘুমিয়ে নেবে কিছুক্ষণ। কিন্তু ঘুম এল না। চোখে অনুভূতির শুষ্কতা থেকে মনে হয় এইভাবে দিনের পর দিন জেগে থাকতে পারবে। মনে হল, এই দুপুরের মতোই নিঃশব্দ, বড় গতানুগতিক জীবন তার, হয়তো বা তাদের, মাঝেমধ্যে উটকো ঝামেলা আর টেনসন ছাড়া সেখানে আর কিছুই ঘটে না, যা থেকে পেতে পারে কিছু বৈচিত্র্যের স্বাদ, অন্যরকম হবার সুযোগ।

দীপঙ্কর কখন বাড়ি ফিরবে ঠিক নেই। ছেলের ভার গার্গী নেবার পর সে যথেচ্ছ হতে পারে, হয়তো ফিরবে সন্ধে পার করে, রোজ যেমন ফেরে। তাহলে, একটু আগে দীপ্রকে যেমন বলল, তিনজনে একসঙ্গে বেড়াতে যাবার প্ল্যানটাও ভেস্তে যাবে। তার মানে সামনের চার পাঁচ ঘন্টা সময় বাড়িতে বসে দীপ্রকে পাহারা দেওয়া ছাড়া কিছুই করবার নেই। এই সময়টায় শুধুই শুয়ে বসে বাড়িতে না কাটিয়ে পার্ক সার্কাসে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আসতে পারত। আগে খেয়াল হয়নি; হলে স্কুল থেকেই উল্টোদিকের বাস ধরে চলে যাওয়া যেত ওখানে।

কদিন ধরেই ওঁদের জন্যে চঞ্চল হয়ে আছে মনটা। বিশেষত বাবার জন্যে। প্রমোদ চড়া ডায়াবিটিসের রোগী। হার্ট অ্যাটাকও হয়ে গেছে একবার। পেনসনের টাকা, ইন্দ্রদার সাহায্য, সুমিত্রার স্কুলের চাকরি আর মাসে মাসে তার দেওয়া পাঁচশো টাকা—কুড়িয়ে বাড়িয়ে চলার এই ব্যবস্থা নিশ্চিন্তি দিতে পারেনি বাবাকে; সকাল সন্ধে নিজেও বেরোন টিউসনে। এ যেন ফুটো বালতির জল, যতই কল খুলে রাখো কখনওই টইটম্বুর হয় না। প্রমোদকে দেখে বুঝতে পারে গুঁড়ি-শুকনো গাছের মতো যে-কোনও দিন মাটি উপড়ে মুখ থুবড়ে পড়বেন। সম্ভবত প্রমোদও বুঝতে পারেন সেটা। সত্যি বলতে, আজ ভোরে তাদের দরজায় অপ্রত্যাশিত ভাবে ইন্দ্রকে দেখে প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল গাছটা পড়ে গেছে। ইন্দ্র আশ্বস্ত করলেও চিন্তা যায়নি। সামনাসামনি দেখা হয়নি অনেকদিন। ও বাড়িতে টেলিফোনও নেই যে অফিস থেকে ফোন করে খোঁজখবর নিতে পারে।

মনে মনে হিসেব করল গার্গী, অন্তত তিন সপ্তাহ বাপের বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ নেই কোনও। এর মধ্যে সুমিত্রা এসেছিল একদিন। বিকেলের সেই সময়টায় সে বা দীপঙ্কর কেউই বাড়িতে ছিল না—দীপ্রকে নিয়ে কমলাও বেরিয়েছিল খুচরো বাজার করতে। বুদ্ধি করে ওপরতলায় বেল দিয়ে সুরমাকে খবরটা দিয়ে গিয়েছিল সুমিত্রা। বলে গেছে সকলে ভাল আছে এটুকু জানিয়ে দিতে। সুমিত্রা এমনিই তাদের খোঁজখবর নিতে এসেছিল, নাকি দরকার ছিল কোনও, বোঝা যায়নি। যাব যাব করেও তারপর যাওয়া হয়নি আর।

গার্গী অনুভব করতে পারে শ্বশুরবাড়িতে থাকবার সময় নানা অসুবিধের মধ্যেও ঘোরাফেরায় যতটা স্বচ্ছন্দ ছিল সে এখন আর তা নেই। বালিগঞ্জ প্লেস থেকে তার বাপের বাড়ির দূরত্ব বেশি নয়, যে-কোনও ছুতোয় একবার বাড়ি থেকে বেরুতে পারলে পাঁচ দশ মিনিটের জন্যে ঘুরে আসা যেত। কখনও একা, কখনও দীপ্রকে নিয়ে। এদিকে বাড়ি নেবার পর দূরত্ব বেড়েছে। অফিসে যাওয়া আর অফিস থেকে বাড়ি ফেরা, হিমসিম খেতে হয় দুটো নিয়েই। একটা চাপা টেনসন কুরে খায় সব সময়। এর ওপরে আছে সংসার সামলানোর

ঝক্কি, বাজারহাট করা। থলি হাতে বাজারে বেরুনো বা বাজার থেকে ফেরা দীপঙ্করের ধাতে সয় না—আসলে এসব ও করেইনি কোনও দিন। বাধ্য হয়ে এই কাজগুলোও করতে হয় তাকে।

'আমার অবস্থা দেখে তোমার মায় হয় না।' একদিন বলেছিল দীপঙ্করকে। একটু ভেবে নিয়ে দীপঙ্কর জবাব দিয়েছিল, 'সস্তা মায়া দেখিয়ে লাভ কি। অবস্থাটা তুমি নিজেই তৈরি করেছ।' তারপর, 'যেদিন ভাল লাগবে না বলবে। রাস্তার ধারে নতুন হোটেল খুলেছে, ওখান থেকে ভাত মাছ এনে দেব।'

লাভ নেই জেনে কথা বাড়ায়নি গার্গী।

আজকাল এইভাবেই কথা বলে দীপঙ্কর, ভিতরটা কেমন যেন শক্ত হয়ে থাকে সব সময়। নড়াচড়া যেটুকু না করলেই নয় তার বেশি করে না। মাঝে মাঝে বসবার ঘরে গিয়ে একাই বসে থাকে চুপচাপ, গার্গী ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তখন দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় চারপাশের মধ্যে থেকেও ও ক্রমশ আলাদা করে নিচ্ছে নিজেকে। দীপঙ্কর বাড়িতে থাকলে সেও নড়তে চায় না। কেমন যেন দূরবর্তী, অচেনা লাগে। পাছে ও আরও দূরে সরে যায় এই ভাবনায়।

ওকে সঙ্গে নিয়ে যে পার্কসার্কাসে যাবে এমন সম্ভাবনা কম। দীপঙ্করের উৎসাহ নেই। বরং যত দিন যাচ্ছে ততই যেন শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর অবজ্ঞার ভাব। এটা লক্ষ করে, দীপঙ্কর মুখ ফুটে কিছু না বললেও, নিজের মনেই ঘন ঘন বাপের বাড়ি যাওয়া সম্পর্কে কেমন একটা বাধা এসে গেছে গার্গীর। মনে হয় পছন্দ করবে না ও। সেদিন সুমিত্রা এসেছিল শুনেও কোনও কৌতূহল দেখায়নি। যেন অপরিচিত কেউ, নামটামও শোনেনি!

আসলে, নিজেদের সম্পর্কটা বিশ্লেষণ করে বুঝতে পারে গার্গী, বালিগঞ্জ প্লেসে দীপঙ্করের স্বজনদের মধ্যে সে যতই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করুক, নীহার তাকে যতই অপছন্দ করুন, দীপঙ্কর বিশ্বাস করে দোষ তার স্ত্রীরই। কোনও স্ত্রী বা বাড়ির বউকেই এতটা স্বাধীনতা দেওয়া যায় না। কিছু কিছু ব্যাপার গার্গী যদি মুখ বুঝে সহ্য করে নিত—বিশেষ করে ছেড়ে দিত চাকরিটা, তাহলে এসব ঘটনা ঘটত না।

যে যেমন ভাবে সেই ভাবেই বিশ্বাস করতে চায়। গার্গী জানে, সব বুঝে, অনেকটা নিজের চোখে দেখে এবং কানে শুনেও কেন দীপঙ্কর এখনও আঁকড়ে ধরে আছে নিজের বিশ্বাসটাকে। তাকে ও দেখেছে নিজের স্ত্রী হিসেবে, রঘুনাথ ও নীহারের পুত্রবধূ হিসেবে, ওর ঔরসজাত সন্তান দীপ্রর মা হিসেবে। সংস্কারের এই ছাপগুলো ওর নিজেরই দেওয়া, যাতে শুধু এইসব পরিচয়ের নিয়ন্ত্রণেই বাঁধা পড়ে থাকে গার্গী। এগুলো মিথ্যে নয়, গার্গী নিজেও কি এই পরিচয়গুলোতেই জড়াতে চায়নি নিজেকে! কিন্তু এ ছাড়াও যে একটা আলাদা অস্তিত্ব আছে তার—গার্গী হিসেবে, একজন ব্যক্তি হিসেবে, যার ইচ্ছে অনিচ্ছে আছে, মান অভিমান আছে, এবং, যেটা সবচেয়ে বড় কথা, আছে আত্মবোধ, এগুলো দেখেনি। দেখলে বুঝত, অনুভবও করতে পারত, শুধুই সামাজিক পরিচয়ের অজুহাত দিয়ে মানুষের সহ্যশক্তি বাড়ানো যায় না। মানুষ পরিচয়ের স্বীকৃতিও চায়।

ভাবনার ভার চেপে বসেছিল বুকে। কয়েক মুহূর্তের জন্যে পরিপার্শ্বও হারিয়ে গিয়েছিল যেন। ঘরের পাখা চলছে, তবু বাতাসটা হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগায় খেয়াল করল বৃষ্টি নেমেছে। জোরে নয়, কিন্তু ওপর থেকে নীচে তির্যক ভঙ্গিতে নেমে আসা ঝিরঝিরে রেখাগুলো চোখে

পড়ছে স্পষ্ট। আলো ম্লান হয়েছে আরও। এরপর হয়তো জোরেই নামবে।

গার্গী উঠল। যেরকম বেঘোরে ঘুমোচ্ছে দীপ্র তাতে মনে হয় না চট করে জাগবে। ভিতরের বারান্দার যেদিকটা খোলা সেখানে লম্বা করে টানা তারের ওপর শুকোচ্ছে সকালে কাচা জামাকাপড়, রোদ না পেয়ে স্যাঁতসেঁতে হয়ে আছে এখানও। বৃষ্টির ঝাপটায় ভিজবে ভেবে সেগুলো তুলে বারান্দাতেই জড়ো করে রাখল চেয়ারের ওপর। ডাইনিং টেবিলের ওপর থেকে জ্যামের শিশি চাপা দেওয়া ভাঁজ করা খবরের কাগজটা তুলে নিল। সকালে ওইভাবেই রেখে গেছে দীপঙ্কর। চোখ বোলানোর ইচ্ছে সত্ত্বেও উৎসাহ পেল না। তারপর বসবার ঘরে এসে রাস্তার দিকের জানলা খুলে দাঁড়াল।

ভোরবেলায় যে-চেহারায় দেখেছিল সেই একই চেহারা, গার্গীর মনে হল একই আকাশ দেখছে। পচতে শুরু করা পাতার মতো ঘোলাটে মেঘের মধ্যে গুড়গুড়ে একটা শব্দ উঠতে উঠতে থেমে গেল। বৃষ্টিতে বেগ নেই তেমন, শোবার ঘর থেকে যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে কম। হয়তো থেমেও যাবে এক্ষুনি। চাল-ধোয়া জলের গন্ধের মতো নরম গন্ধ ফুটে আছে চারদিকে। বৃষ্টি বাঁচাতে মাথায় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি কাপড় টেনে ভিজে রাস্তা দিয়ে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে দুজন মহিলা। একজন অল্পবয়েসী, মুখের ঢল এবং গলায় ও হাতে গহনার বহর দেখে মনে হয় বিয়ে হয়েছে নতুন; ওদের আগে আগে হাঁটছে ধুতি পাঞ্জাবি পরা একটি যুবক এবং এক কিশোর। সামনের বাসস্টপ থেকে আব এক স্টপ এগোলে সিনেমা হল, হয়তো ম্যাটিনি শো-র যাত্রী। ওরা যেদিকে গেল সেদিক থেকে গা শোঁকাশুঁকি করতে করতে এগিয়ে এল দুটি কুকুর। পিছনে ট্যাক্সির হর্ন, ট্যাক্সিটা সামনে দিয়ে পেরিয়ে যাবার সময় দেখল ভিতরে যাত্রী নেই কোনও। ছাতা মাথায় এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোচ্ছে ডাক পিওন। বড় রাস্তার দিক থেকে একটা লরি বা ট্রাকের গা ঝাড়ার শব্দ শুনে এদিকেই আসবে মনে হল। এল না। একটা কথা মনে পড়ল, কী সূত্রে যেন অফিসে নন্দিতা বলেছিল একদিন, 'এই যে কানের পাশে সারাক্ষণ কেউ না কেউ বকর-বকর কবছে, ডায়লগ আউড়াচ্ছে—যতই বিরক্তিকর হোক, এগুলোই টেনে রাখে। কত হাবিজাবি গল্প উপন্যাস দ্যাখো না, সংলাপের টানেই তরে যায়! মানুষের গলার শব্দে একটা বাঁচার মোহ থাকে।' কেন মনে পড়ল, জানে না।

বৃষ্টিটা ধরে আসছে। রাস্তা ফাঁকা হয়ে যাবার পর গার্গী একদৃষ্টিতে গেটের বাইরে সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে থাকল যেখানে সকালে গাড়ি রেখেছিল ইন্দ্র। বম্বে না দিল্লি, সন্ধের ফ্লাইটে কোথায় যেন যাবে বলেছিল। মনে পড়ল না। পরিবর্তে দূর থেকে হঠাৎই কাছে এগিয়ে এল অশোকা। সিনেমায় যেমন হয়। এক-একটা শব্দ থাকে, অর্থহীনতায় হারিয়ে গিয়েও হঠাৎ-হঠাৎ ফিরে আসে আবার, যেন কিছু বোঝাতে চায়! সকালে আসতে পারেনি কমলা, জোর করে ভাবল গার্গী, কিন্তু তার পরেও আসতে পারত; ও নিশ্চয়ই জানে দীপ্রকে আগলাবার জন্যে কেউ না কেউ থাকবে বাড়িতে। দেখা যাক বিকেলে টগরের মা এলে ওর মুখে কোনও খবর পাওয়া যায় কি না। কাছের কোনও বাড়ি থেকে পুরুতের ঘন্টি নাড়ার শব্দ কানে এল, শাঁখের শব্দ। এই অবেলায় কে আবার কোন পুজোয় মেতে উঠল! শাঁখের শব্দ মিলিয়ে যাবার আগেই বিশৃঙ্খলা এসে গেল চিন্তার মধ্যে। এর পরের দৃশ্যে উদভ্রান্তের মতো ছুটে আসতে দেখল গীতশ্রীকে। শান্তনুর মা। দীপ্র চিনিয়ে না দিলে সে চিনত না। কিছু ছিল ওর দ্রুত হেঁটে যাওয়ার ধরনে, যা তখন বুঝতে পারেনি, এখনও পারছে

না।

গার্গী দাঁড়িয়ে থাকল। আদ্যন্ত আচ্ছন্নতার মধ্যে এখন নিজেকেই দেখছে।

প্রায় ছ' বছর পরে গুরুদেব আসবেন বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে। খবরটা আগেই দিয়েছিল দীপঙ্কর। বাড়ির সংস্কার মানতে মানসিক ভাবে তৈরি করেছিল তাকে। ঘাট উঁচু বড় রুপোর থালায় জল নিয়ে পা ধুইয়ে আপ্যায়ন করতে হবে গুরুদেবকে। কাজটা বাড়ির বউয়ের। আগে নীহার করতেন। তবে তাদের বিয়ের পর এই প্রথম আসছেন তিনি, এবার নতুন বউকেই করতে হবে। তমসাও বুঝিয়েছিল সেরকম। 'আমার ভাগ্য ভাল', ঠাট্টা করে বলল, 'গুরুদেবঅলা বাড়িতে বউ হয়ে আসতে হয়নি।'

এসব আগে কখনও শোনেনি গার্গী, দেখেওনি। তাদের বাড়িতে ফি বেস্পতিবার লক্ষ্মীপুজো হত বটে, এখনও হয়; পটের সামনে পাঁচালি পড়তে সেও বসেছে কখনওসখনও; এর বেশি নয়। হোক গুরুদেব, একঘর লোকের সামনে একজন অচেনা পুরুষের পা ধুইয়ে দিতে হবে ভেবে অস্বস্তি লাগছিল। শেষ পর্যন্ত ভেবেছিল যে-বাড়ির যে-নিয়ম, এ ব্যাপারে আপত্তি করলে অযথা অশান্তি শুরু হবে। কী লাভ! জীবন একটাই, তিরিশ বছরে পৌঁছে ভাবা যায় তার প্রায় অর্ধেক পার করে এল; বিয়ে, বাচ্চা, সবই হয়ে গেল— ভবিষ্যতের দৃশ্যটা চেনা যায় স্পষ্ট, এখন অন্যরকম হবার চেষ্টায় নতুন কিছুই পাবে না। এসব ভেবে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিল গার্গী। বিয়েতে বাধা না দিলেও এ বাড়িতে বউ হয়ে আসবার পর থেকেই লক্ষ করেছে তার সম্পর্কে নীহারের মনের ধোঁয়া কাটেনি, একটা অসন্তোষের ভাব যেন সারাক্ষণ লেগে থাকে চোখেমুখে। এই একটা সুযোগ, এখন সে বাধ্যতা দেখালে হয়তো ভুল বোঝাবুঝি কেটে যাবে, অন্তত নরম হবেন একটু। দীপঙ্করের মুখের দিকে তাকিয়েও এটা করা দরকার।

কিন্তু, অদ্ভুত ভাবে উল্টেপাল্টে গেল সব। গুরুদেব আসবার আগের দিন হঠাৎই আরও গম্ভীর হয়ে গেল নীহারের মুখ। রঘুনাথ এমনিতে সাতে পাঁচে থাকেন না, সেদিন তাঁকেও অন্যরকম লাগছিল। গার্গী কিছুই বুঝতে পারছিল না।

অফিস থেকে ফিরেছে একটু আগে। তমসা তাকে ডেকে নিয়ে গেল আড়ালে।

'তোমার শুনতে খারাপ লাগবে, বউদি। কিন্তু ব্যাপারটা তুমি মেনে নাও।'

'কী হয়েছে!'

'মা খুব আপসেট।' সামান্য ইতস্তত করে বলল তমসা, 'গুরুদেব বোধহয় তোমার পুজো নেবেন না। জানোই তো, বিয়েতে সম্মতি ছিল না ওঁর—'

তমসা বললেও বুঝতে অসুবিধে হয়নি আসলে এগুলো নীহারেরই কথা। অর্থও খুব পরিষ্কার। আগে যেভাবেই ভেবে থাকুন না কেন, ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তারপর আর এগোবার সাহস নেই তাঁর।

এর চেয়ে স্পষ্টভাবে নিজের জায়গা চেনা যায় না। বিয়ের আগে একদিন আমতলা থেকে ফিরতে ফিরতে যা বলেছিল দীপঙ্কর, আজকের কথাগুলো তার চেয়ে ভারী। অধিকার বলে তার সেদিন কিছুই ছিল না, আজ অধিকারটাই চলে যাচ্ছে।

তখন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাবার সময়। তবু, অপমানবোধের ভিতর শক্ত হল গার্গী। নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যেটুকু সময় লাগে তা নিয়ে বলল, 'আপসেট হবার কী আছে! গুরুদেবটা তোমার মায়ের, তোমাদের। আমার নয়। বাড়ির বউ বলে যা করতে

বলেছিলে তোমরা, তাতেই রাজি হয়েছিলাম। ঘেন্নাটা থেকে গিয়েছিল। এখন বেঁচে গেলাম।'

গার্গীর গলায় ঝাঁঝ ছিল। তমসাকে আরও বিব্রত দেখাল। পরে বলল, 'দাদা এখনও কিছু জানে না। জানলে কী বলবে জানি না।'

ঠোঁটে দাঁত চেপে চুপ করে থাকল গার্গী।

'তুমি দাদাকে একটু বুঝিয়ে বোলো।' তমসা বলল, 'ব্যাপারটা কেমন যেন ঘোঁট পাকিয়ে গেল। এখন গুরুদেবকেও আসতে বারণ করা যায় না, শিষ্য শিষ্যাদের মুখে পাঁচকান হবে। আমি আগেই বলেছিলাম মা-কে—'

'আমি কোনও কথাই বলব না।' তমসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে গার্গী বলল, 'তোমাদের বাড়ির ব্যাপারে আমি নাক গলাতে যাব কেন! ওসব গুরুদেব ফুরুদেবে আমার ইন্টারেস্ট নেই।'

স্মৃতিতে আগে পরে নেই কোনও। সব ঘটনাই ভিড় করে আসছে একসঙ্গে। তবে তখনকার অনুভূতিগুলোকে ধরা যাচ্ছে না ঠিকঠাক। ছ' সাত মাস হয়ে গেল, এখন বিশ্বাস হয় না এমন ঘটতে পারে, এইভাবেই ঘটেছিল সব! পর্দায় সচল বিভিন্ন দৃশ্যের মতো নিজের নির্বাক হাত পা মুখের নড়াচড়া দেখতে লাগল গার্গী।

কথার হেরফের হয়নি। দীপঙ্করকে বলেনি কিছু। ভেবেছিল যা জানাবার তা ও নিজেই জানবে, কোনও সিদ্ধান্ত নেবার থাকলে নিজেই নেবে। বস্তুত এই পরিস্থিতিতে দীপঙ্কর কী বলে না বলে তার কোনও দাম নেই তার কাছে। মনঃস্থির করে ফেলেছিল সে।

পরের দিন সকালেই দীপ্রকে নিয়ে চলে এল বাপের বাড়িতে। তখনকার মানসিকতা একক হয়ে উঠেছিল নিজেকে নিয়ে, দীপঙ্করকেও জানায়নি কিছু। কোনও আবেগ নয়, অভিমানও নয়, বস্তুত একটা অন্ধতা তাড়া করছিল তাকে।

রাত্রে খোঁজ করতে এল দীপঙ্কর। বিব্রত, অবিন্যস্ত; ওকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল।

এবার আর নতুন কোনও মোহে জড়াতে চায়নি গার্গী। বিয়ের আগে একরকম ছিল; বিয়ের পরে এই ক' বছরে শরীর বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে মনটাও গেছে বদলে, যে-কোনও ঘটনাকেই এখন সে খুঁটিয়ে বুঝতে পারে। দীপঙ্কর তেমন করে কিছু বলবার আগেই বলল, 'আমার ভাবনা আমি ভেবে ফেলেছি। ওখানে আর ফিরব না।'

দীপঙ্কর অবাক হল না। তবু হতভম্ব চোখ মেলে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল স্ত্রীর দিকে। তারপর বলল, 'আমাকেও একটু ভাববার সময় দেবে তো!'

'নতুন আর কী ভাববে!' যতই শক্ত হবার চেষ্টা করুক, গার্গী অনুভব করছিল জোর কমে আসছে, ক্রমশ দীপঙ্করের স্ত্রী হয়ে উঠছে সে। কী যেন একটা হচ্ছিল ভিতরে। সেটা সামলে থেমে থেমে বলল, 'তোমাকে তো ছাড়তে পারব না। দীপ্ররও তোমাকে দরকার। যদি মনে করো এসব পেতে গেলে ও বাড়িতেই থাকতে হবে, তাহলে আমাকেই ছেড়ে দেবার কথা ভেবো।'

দীপঙ্করকে সচরাচর এতটা গম্ভীর দেখায় না। সামান্য সময় নিয়ে বলল, 'আমি কী করব সেটা তোমাকে সাজেস্ট করতে হবে না। তোমার ডিসিসন তুমি নিয়েছ। আমারটা আমিই নেব।'

দৃষ্টি দূরে, রাস্তায়; কিন্তু এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে অনায়াসে নিজেকে সেদিনের ঘটনায় ফিরিয়ে

নিয়ে যেতে পারল গার্গী। দীপঙ্কর চলে যাচ্ছে, প্রয়োজনের চেয়ে দ্রুত ওর হাঁটার ধরন— ভুল দরজায় কড়া নেড়ে যেভাবে দ্রুত হয়ে ওঠে অপ্রতিভ কেউ।

পিছন থেকে ওর চলে যাওয়া লক্ষ করতে করতে সংশয়ে ছেয়ে গিয়েছিল গার্গী। বুঝতে পারছিল না স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তারা শেষ কথাগুলো বলে ফেলল কি না।

তখন ভাবতে পারেনি তার আর দীপঙ্করেব চিন্তা এক খাতে বইছে না; আগাগোড়া বাড়িমুখো আয়েসি মানুষটা নিজেই বেরিয়ে আসবে বাড়ি ছেড়ে; বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক না ছাড়লেও তাকে আর দীপ্রকে নিয়ে আলাদা থাকার সিদ্ধান্ত নেবে।

'কী ব্যাপার! আজ অফিস ছিল না?'

সুরমা। কোথাও যাবেন বলে নেমে এসেছেন, জানলায় গার্গীকে দেখে থেমে দাঁড়ালেন। নিঃশ্বাস সামলে হাসল গার্গী।

'ছিল। ছেলে বাড়িতে, পাহারা দিচ্ছি।'

'তাই তো! সকালেই দেখলাম দীপ্রকে স্কুলে নিয়ে যাচ্ছ। কমলা এল না কেন?'

'ছেলের অসুখ—'

'ওদের এই-ই ব্যাপার। একটা না একটা লেগেই আছে!' অভ্যাসে বলা কথা। দরজা ও গেটের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালেন সুরমা। বললেন, 'বৃষ্টিটা ধরল বলে মনে হচ্ছে। যাই, একবার গ্যাসের দোকানে যাব। ওনাকে তিনদিন ধরে ঘোরাচ্ছে।'

আজ সারাদিন ধরে বেশ খেলা দেখাচ্ছে আকাশ। এই আঁধার, এই আলো, দুইয়ের কোনওটাই জমছে না হঠাৎ-হঠাৎ বৃষ্টিতে। সেবার সিমলায় যেমন দেখেছিল। বিয়ের পব-পরই গিয়েছিল দীপঙ্করের সঙ্গে। সিমলায় এক বেলা; তারপর, ওখানে ঘিঞ্জি লাগায়, দীপঙ্কর টেনে নিয়ে গেল বেশ কয়েক মাইল দূরে, কুফরিতে। কাঁচ-বন্ধ গাড়িতে পাক দিয়ে দিয়ে ওপরে ওঠা। কী যেন ছিল হোটেলটার নাম, ওয়াইল্ড ফ্লাওয়ার হল? চারদিকে পাহাড় আর খাদের খাঁজ থেকে উঠে আসা বড় বড় গাছে ঘেরা সেই নির্জনতায় যখনতখন কপাল ছুঁয়ে যাচ্ছিল ভাতের ধোঁয়ার মতো টগবগে কিন্তু ঠাণ্ডায় উপছানো মেঘ, পালা করে আকাশ কাড়ছিল ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর রোদ্দুর। বড় হবার পর সেই প্রথম কোথাও দূরে গেল গার্গী। না, তুলনাটা ঠিক হল না; কোথায় কুফরির স্বর্গ আর কোথায় কলকাতার এই অজ পাড়া। এখানে সৌন্দর্য নেই, এমন আকাশ শুধুই বিষণ্ণ করে দেয়। নাকি আবারও ভুল ভাবছে সে। তখন তারা অন্যরকম ছিল বলেই কুফরির একই বিষাদেও সৌন্দর্য পেয়েছিল!

শোবার ঘরে ফিরে এসে গার্গী দেখল বেঘোরে ঘুমুচ্ছে দীপ্র। মায়াময়, বড় নিশ্চিন্ত লাগছে ওকে। মুখে দীপঙ্করের আদল। ঘুম ভাঙার পরই হয়তো দুপুরে দেওয়া প্রতিশ্রুতির কথা মনে পড়বে। যে করেই হোক, ছবিঅলা বইটা আজই ওকে কিনে দেওয়া দরকার।

গার্গীর নিজেরও ক্লান্তি লাগছিল, থেকে থেকে হাই উঠে আসছিল গলায়। এই অবেলায় ঘুমিয়ে লাভ নেই, তাতে গা ম্যাজ ম্যাজ করবে আরও। বরং আজ যখন বাড়িতেই আছে, দীপ্র আর দীপঙ্করের জন্যে কিছু খাবার-দাবার করে রাখতে পারে। অন্যরকম হতে পারে একটু। দীপ্রকে স্কুল থেকে আনবার সময়টাতেই কাজে আটকে পড়েছিল দীপঙ্কর, বাড়ি ফিরতে যে দেরি হবে এমন কোনও কথা বলেনি। যদি তাড়াতাড়ি ফেরে আর আবহাওয়া গোলমাল না করে, তাহলে সে ওকে বেরুবার জন্যে জোর করবে। যেখানে হোক। দীপ্র

নৌকো দেখতে ভালবাসে, আর ট্রেন, আর এয়ারোপ্লেন। দুটো ঘর আর এক চিলতে বারান্দার আবদ্ধতায় কেমন যেন দম-আটকানো লাগছে। নাকি, সেদিন যা হতে গিয়েও হল না, দীপঙ্করকে বলবে দীপ্র অনেক দিন বালিগঞ্জ প্লেসে যায়নি, সুতরাং তারা একসঙ্গে যেতে পারে। কোন মেজাজে ফিরবে কে জানে! তবে এটা ঠিক, পার্ক সার্কাসের দিকে ওকে নড়ানো যাবে না।

রান্নাঘরে গিয়ে ময়দার টিনটা খুঁজে বের করল গার্গী। তরকারির ঝুড়ি টেনে কী আছে না আছে দেখল। তারপর ব্যস্ত হতে হতে ভাবল, দীপঙ্কর কি ভাবে সেদিন বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি ছেড়ে আসার সিদ্ধান্তে হঠকারিতা ছাড়া আর কিছুই ছিল না, কিংবা গার্গী যদি সেদিন ওরকম না করত, আর একটু সহ্য করে শেষ পর্যন্ত মানিয়ে নিত, তাহলে ও নিজে অন্তত এই দুরবস্থায় পড়ত না।

হয়তো ভাবে। গার্গী ভাবল। কে জানে কেন, ওই ঘটনার পর থেকেই কেমন যেন বদলে গেছে ও, বদলে যাচ্ছে; ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায় প্রসঙ্গটা। কিন্তু অন্যভাবে, অন্য কথায়, এমনকী অকারণেও একটা বিক্ষোভ চাগিয়ে ওঠে মাঝে মধ্যে। কখনও কখনও মনে হয় আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরেছে ওর, তাকে ও দীপ্রকে জড়িয়ে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে বেঁচে থাকার বোধটাও ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে দীপঙ্কর।

কিন্তু, এমন হবে কেন! দীপঙ্কর কি নিজের চোখেই দেখছে না, তাদের ফিরে যাবার ব্যাপারে ও-বাড়ি থেকে কোনও উৎসাহ না দেখালেও এই অবস্থার মধ্যেও শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে যতটা সম্ভব সম্পর্ক রেখে চলেছে গার্গী—নিজেই ঠেলে পাঠাতে চায় দীপঙ্করকে, ওর সঙ্কোচ দেখে ফোন করতে বলে, দীপঙ্কর বলুক না বলুক দীপ্রকে সঙ্গে নিয়ে এই ক'মাসে নিজেই ঘুরে এসেছে তিন চারবার। দিন দুয়েক নেমন্তন্ন করে খাইয়েছে তমসাকে।

এর মধ্যে একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে ফেরার সময় তার অফিসে এসেছিল তমসা। এক সেট জামা প্যান্ট দিয়ে গেল দীপ্রর জন্যে। গার্গী তৈরি ছিল না। নন্দিতার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা ধার করে ফ্লুরিজে চা খাওয়াতে নিয়ে গেল ওকে।

এ-কথা সে-কথার পর তমসা হঠাৎ বলল, 'বউদি, তোমার মুখ দেখে মনে হচ্ছে কিছু বলতে চাইছ?'

জবাব দিতে সময় নিল গার্গী। অস্বস্তি কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। পরে বলল, 'আমি না হয় পর। তোর বাবা-মা তোর দাদার কথা ভাবেন না কেন! ও তো গোঁ ধরে বসে আছে। ওকে বোঝাতে পারতেন আলাদা থাকলেও কাজের জায়গা থেকে আলাদা হবার কোনও দরকার ছিল না।'

তমসা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ফিরে আসতে চাইছ?'

'না। ফিরলে সেই একই ব্যাপার হবে। ছ' বছর তো দেখলাম! আসলে তোর দাদাকে দেখে কষ্ট হয়। ওর জীবনটা তো এমন হবার কথা ছিল না!'

চোখ নামিয়ে কথা বললেও গার্গী বুঝতে পারছিল তমসার দৃষ্টি তার সিঁথিতে নিবদ্ধ। চারদিন পরে আজ সে সিঁদুর পরেছে। কাল রাতে দীপঙ্করের শরীরে ঘন হতে হতে টের পেয়েছিল সময়ের আগেই ক্ষয়ে যাচ্ছে দীপঙ্কর। নিঃশ্বাসে পোড়া সিগারেটের গন্ধ।

'দাদাও এইসব বলে নাকি?'

'বললে তো বোঝা যেত।' গার্গী মুখ তুলল, 'কিছুই বলে না। কিন্তু মনে মনে ভাবে

হয়তো।'

ক' মুহূর্ত চুপ করে থাকল তমসা। তারপর বলল, 'দাদা যা করেছে ঠিকই করেছে। তুমিও ঠিকই করেছ। একটা স্ট্যান্ড নেবার দরকার ছিল, বউদি। তুমি দাদার সুখের দিকটা দেখছ, সম্মানের দিকটা দেখছ না। এই করতে করতে যদি দাঁড়িয়ে যায়, মন্দ কি। ত্যাজ্যপুত্রও তো হয়নি।'

'সবাই সবকিছু পারে না। তা ছাড়া—।' নিজেকে গোছাতে গিয়ে ছড়িয়ে ফেলছিল গার্গী। বলার কথাটা হারিয়ে ফেলে বলল, 'আমার ভয় করছে। আমার জন্যেই এসব হল!'

কাঁটা দিয়ে প্লেটের ওপর আধ-খাওয়া পেস্ট্রি ভাঙছিল তমসা। সম্ভবত ও-ও গুলিয়ে ফেলছে নিজেকে। এখন মুখোমুখি, মাঝখানে টেবিল, কথা থামলেই ফিরে আসছে দূরত্ব। ছাদের কার্নিশ ছুঁয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে এক সময় ওরা কনুইয়ের রং মেলাত।

তমসা সহানুভূতি দেখাল না। গলার স্বরে রাগ মিশিয়ে বলল, 'আর কিছু না পারো, দেমাকের বেলুনটা ফাটিয়ে দিয়েছ। দাদা একা পারত না, কোনও দিনই পারত না। ভাবতে পারো, আমাদের বাড়ির মতো বাড়িও আছে কলকাতায়! বাবা চলছে টাকার জোরে, মা গুরুদেবের জোরে। নিজেদের কিছু নেই। এখন লজ্জায় গুটিয়ে আছে—'

গার্গী চুপ করে থাকল। তমসা নিজের দাদাকে চেনে, তার স্বামীকে চেনে না। সব কথা কি আর খুলে বলা যায়! বললে বুঝতে পারত সে কেন ভয় পাচ্ছে।

'তোমরা ফিরে এলে ভাল হত, বউদি।' পরের কথাটার জন্যে অপেক্ষা করে তমসা বলল, 'তবে নিজে থেকে ফিরো না। দাদা নিজেরটা নিজেই বুঝে নেবে।'

তমসা মেয়েই। সুতরাং গলার ভারে চোখও ভরে উঠল। মুখ জুড়ে থমকে আছে লাবণ্য, এখন দেখলে মনে হয় না গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখলে ও নিজেও ঝোড়ো হয়ে ওঠে।

অবস্থা বুঝে তাড়াহুড়ো করে ওর দেওয়া প্যাকেটটা খুলে দীপ্রর জামা প্যান্ট নাড়াচাড়া করতে করতে গার্গী বলেছিল, 'চমৎকার মানাবে দীপ্রকে। পিসি দিয়েছে শুনলে লাফাবে। ওর হাতে দিলেই পারতিস!'

'তাই দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু তোমরা কখন বাড়িতে থাকো না থাকো—'

বেল পড়ল দরজায়। হ্যাঁ, তাদেরই দরজায়। গ্যাস বন্ধ করে চুল্লি থেকে কড়াইটা নামিয়ে রাখল গার্গী। আঁচলে হাত মুছে দরজা খুলতে এল।

সময় আন্দাজ করে ভেবেছিল টগরের মা, দুপুরের বাসন ধুতে এসেছে। জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখল, দীপঙ্কর।

গার্গী হাসছিল।

'এত তাড়াতাড়ি! কাজ হয়ে গেল?'

'আর কাজ!' দীপঙ্কর হাসল না। স্ত্রীকে পাশ কাটিয়ে যেতে যেতে বলল, 'গেরো লেগেছে কপালে।'

'সে আবার কি!'

জবাব পেল না। সোফায় বসে দীপঙ্কর এখন মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর ফিতে খুলতে ব্যস্ত। গার্গী বুঝতে পারল না দরজাটা লাগিয়ে দেবে কি না।

'দীপ্র কোথায়?'

'ঘুমুচ্ছে—'

দীপঙ্করের আগ্রহ ওখানেই শেষ হল।

নিজের জায়গা থেকে স্বামীকে লক্ষ করছিল গার্গী। টান করে আঁচড়ানো চুলের ফাটলে চাঁদি দেখা যাচ্ছে, রেখা পড়েছে কপালে। বৃষ্টিতে ভিজেছে, নাকি ঘামে; সার্টের ভিজে কাঁধের তলা থেকে ফুটে উঠেছে স্যান্ডো গেঞ্জির হাতা। জুতো খুলতে খুলতে তাকিয়ে থাকল জানলার দিকে।

গার্গী অপ্রতিভ বোধ করল। এতক্ষণ সে উল্টো রাস্তায় হাঁটছিল। তবু বলল, 'অমন চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন! কী হয়েছে বলবে তো!'

'কী আর হবে! ঘুস চায়। না হলে নড়বে না।'

জুতো জোড়া হাতে নিয়ে পর্দা সরিয়ে, ভিতরে চলে গেল দীপঙ্কর। বিরক্ত। সম্ভবত এবার বিছানায় ছুড়ে দেবে নিজেকে।

গার্গী দরজাটা বন্ধ করতে যাচ্ছিল। দেখল টগরের মা আসছে। তখন ভাবল, ও কাজ সেরে চলে না যাওয়া পর্যন্ত দীপঙ্করকে কিছু বলা যাবে না।

কাছে এসে টগরের মা বলল, 'কমলা কাল আসবে না, বউদি। খবর দিয়েছে।'

গার্গী জবাব দিল না। ওকে পাশ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। দীপঙ্করের হতাশা যেন ওকেও অধিকার করে নিচ্ছে।

৩

তিন মাস পরে একদিন সন্ধ্যায় নিজের বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আশঙ্কায় কেঁপে উঠল গার্গী। যতটা আগ্রহ নিয়ে, বস্তুত উৎকণ্ঠা নিয়ে, ছুটে এসেছিল, নিমেষে অন্তর্হিত হল তা। পরিবর্তে এক ধরনের অনুভূতিহীনতায় আড়ষ্ট লাগল নিজেকে।

সুরমাদের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দরজায় একটা তারের জাল-দেওয়া বালব জ্বলে। বহুদিন একই ভাবে আলো দিতে দিতে মলিন হয়েছে কিছুটা, তাদের দরজা অব্দি পৌঁছুবার আগেই ছায়াচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কোনও কারণে আলোটা না জ্বললে অসুবিধে হয় আরও। আশপাশ দেখা যায় না ভাল করে; জ্যোৎস্নার আলোতেও কেমন যেন ভুতুড়ে লাগে। এ বাড়িতে আসবার পর ব্যাপারটা লক্ষ করে ওরা ভেবেছিল বাড়িঅলা গোপালবাবুকে বলবে তাদের দিকেও একটা আলোর ব্যবস্থা করে দিতে, যাতে রাতবিরেতে দরকার হলে জ্বালতে পারে। বলবে বলবে করেও বলা হয়ে ওঠেনি। তার বদলে সন্ধের পর কারও ফিরতে দেরি হলে বা কারও আসবার কথা থাকলে বসবার ঘরের আলোটা জ্বেলে রাখত ওরা। যাতে জানলার মধ্যে দিয়ে অন্তত কিছু আলো এসে পড়ে বাইরে। দরকার অবশ্য হয়নি তেমন। তার দেরি করে ফেরার প্রশ্ন ওঠে না, দীপঙ্করের দেরি হবার সম্ভাবনা থাকলে ছোট টর্চটা নিয়ে যায় সঙ্গে। বাইরের লোক কে আর আসছে! বালিগঞ্জ প্লেসে থাকতে প্রায়ই সন্ধের পরে বেরুত ওরা; নাইট শোয়ে সিনেমা দেখা বা দীপঙ্করের কোনও বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দেওয়া, সপ্তাহে এক দুদিন লেগেই থাকত। দীপঙ্কর গাড়ি নিয়ে ঘোরাফেরা করায় যাতায়াতে অসুবিধে ছিল না। ঠাকুমা বা পিসির কাছে দিব্যি থাকত দীপ্র। এখানে আসার পর

সে-পাট উঠে গেছে। দীপ্রকে আগলানো, যাতায়াতের ঝামেলা, কাজ—এগুলো সামলে বেরুবার সময় কোথায়! ক্লান্তও লাগত। তার চেয়ে বড় কথা, আগের মনটাই যেন হারিয়ে গিয়েছিল। দুজনেরই। অন্তত দীপঙ্করকে দেখে মনে হত উৎসাহ নেই, ইচ্ছে করেই বন্ধুবান্ধব, বাইরের জগতের সম্পর্কগুলো এড়িয়ে চলতে চাইছে ও।

এই মুহূর্তে দরজা বন্ধ দেখেই যে আড়ষ্ট বোধ করল তা নয়। হতাশার কারণ বসবার ঘরের জানলা বন্ধ দেখে। বাতাস ঢোকার জন্যে খড়খড়ি তোলা আছে, কিন্তু ভিতরে আলো জ্বলার চিহ্ন নেই। তার মানে বাড়িতেও কেউ নেই।

তিনদিন একটানা বৃষ্টির পরে আজ আকাশ পরিষ্কার হলেও আলো ফোটেনি। সম্ভবত কৃষ্ণপক্ষ চলছে এখন। মেঘ আছে কি না বোঝা যায় না। মন্থর এক ধরনের হাওয়া স্পর্শ দিয়ে যাচ্ছিল মাঝে-মাঝে।

দরজার সামনে একটু সরে এসে অপরিচ্ছন্ন আলোয় কব্জি তুলে ঘড়ি দেখল গার্গী। সাতটা দশ।

এই যে দেখা, এটার অবশ্য দরকার ছিল না কোনও। বাস থেকে নামবার সময়েই দেখেছিল সাতটা বেজে গেছে। উৎকণ্ঠার শুরু তারও আগে। তবে এমন হবে ভাবেনি।

ব্যাগ হাতড়ে দরজার চাবিটা বের করল সে। ভিতরে ঢুকে সুইচ খুঁজে আলো জ্বালল। আলোকিত এই দৃশ্যের সঙ্গে অন্ধকারের তফাত বোঝা যায় না, মনে হচ্ছে অন্ধকার সঙ্গে নিয়েই এসেছে। দরজাটা বন্ধ করবে ভেবেও করল না। তারপর পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে বারান্দা ও শোবার ঘর ঘুরে আবার ফিরে এসে দরজার কপাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল।

সামনে তাকালে যা যা দেখা যায় তার কিছুই অপরিচিত নয়, তবু অসম্পূর্ণ লাগছে কেমন। এখনই খেয়াল করল আসবার তাড়ায় গেটটা লাগায়নি ভাল করে। গেটের দুদিকে পাঁচিল ঘেঁষে গাঁদা ও দোপাটির চারা লাগিয়েছিলেন গোপালবাবু, ভরা বর্ষার বৃষ্টি পেয়ে তরতাজা হয়ে উঠেছে গাছগুলো, ফুলও ধরেছে। ডানদিকের রাস্তায় একটি রিকশা চলে যাবার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে উল্টোদিক থেকে এগিয়ে এল একটা ট্যাক্সি, তার পিছনে একটা অ্যাম্বুলেন্স। তার পরের শূন্যতার দিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস চাপল গার্গী এবং ভাবল, কোথায় কী হচ্ছে সে যেমন দেখতে পাচ্ছে না, তেমনি তাকেও কেউ দেখছে না।

দীপঙ্কর বলেছিল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে আসবে। এত বাঁধাধরা সময় মেনে চলতে অভ্যস্ত নয় গার্গী, তাছাড়া স্ত্রী স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে, নিজেদেরই বাড়িতে, এর মধ্যে এত সময়ের মাপজোখ আসে কী করে!

দুপুর থেকে তিন বারের চেষ্টায় পেয়েছিল ওকে। ওদের অফিসে, টেলিফোনে। গার্গী বলল, 'সময় বেঁধে দিচ্ছ কেন। তুমি তো তার পরেও থাকবে বাড়িতে—'

'না। সেটাই প্রব্লেম।' দীপঙ্কর বলল, 'সাড়ে সাতটায় আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, চৌরঙ্গিতে। পৌনে সাতটা, সাতটার মধ্যে না বেরুলে পৌঁছুতে পারব না। আমি গাড়ি নিয়েই আসব।'

এ বড় অস্বস্তিকর। গার্গী দেখল তখনই পাঁচটা। এর পর অফিস থেকে বেরিয়ে পার্ক সার্কাসের বাড়ি ঘুরে দীপ্রকে নিয়ে দীপঙ্করের বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে ওখানে পৌঁছুতে সত্যিই এক ঝকমারি। দীপঙ্করকে কি বলা যাবে তার সমস্যার কথা!

গার্গী বুঝতে পারছিল না কেন এমন অস্বস্তি! ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, 'রাত্রে ফিরবে

কখন?'

'রাত্রে! কেন?'

'আজ ওখানেই থাকব। ছেলেটাও ঘ্যান ঘ্যান করছে। এভাবে ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকতে কার ভাল লাগে।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না দীপঙ্কর। ওদিক থেকে ওর গলার কাশির শব্দ পাচ্ছিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, 'ছেলের তো কোনও দোষ নেই! আমি কি ছাড়া-ছাড়া থাকতে বলেছিলাম!'

আবার সেই পুরনো কাসুন্দি। যেন দীপঙ্কর ফিরতে চাইছে সেই জায়গায়, যেখান থেকে গার্গীর চাকরি না-ছাড়ার জেদটাকেই সব নষ্টের গোড়া হিসেবে চেনা যায়।

মনে মনে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও গার্গী সংবরণ করল নিজেকে। আজকাল এমন হয়েছে যে উত্তেজনা এসে যায় সামান্য কথায়, সেটা প্রশমিত করতে চাপা একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ে সর্বাঙ্গে। সাবলীলতা খুঁজে পায় না মন-মেজাজের।

'আমি কি দোষগুণের কথা বললাম!' উত্তাপ এড়িয়ে যাবার চেষ্টায় গার্গী বলল, 'রাত্রে কখন আসবে বলো। আমি না হয় সেই বুঝেই যাব।'

'সেটা একটু আনসার্টেন।'

'কেন! ফিরবে না?'

'ফেরা না ফেরার কথা হচ্ছে না। দেরি হতে পারে, সেটাই বললাম।' কথাগুলো বলে থামল দীপঙ্কর; গলার স্বরে সামান্য পরিবর্তন এনে বলল, 'তুমি ছেলেকে নিয়ে এসে একটা দুশ্চিন্তায় থাকবে, সেটা কি ভাল হবে!'

গার্গী ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছিল না। স্বামীর ফিরতে দেরি হলে স্ত্রী অপেক্ষা করে, জেগে থাকে, বিয়ের পর থেকে তাদের জীবনেও—যেখানেই থাকুক না কেন, এমন ঘটনা নতুন নয়। এর মধ্যে ভালমন্দের প্রশ্ন উঠছে কেন!

অধৈর্য হয়ে গার্গী বলল, 'ঠিক আছে। আমি সন্ধের সময়েই যাব। তারপর থাকব কি না দেখা যাবে।'

ফোন ছেড়ে দেবার পরেও অনিশ্চয়তা গেল না। ফোনটা সে-ই করেছিল; শুধু আজ বলে নয়—গতকাল এবং তার আগের দিনও, দীপঙ্করের তরফে কোনও উদ্যম দেখা যায়নি। দীপঙ্করের কি বোঝা উচিত নয় আর্তি, আন্তরিকতা না থাকলে কেউই এভাবে উপযাচক হয় না। এখন তো আবার ও ফিরে গেছে পারিবারিক ব্যবসায়—অফিস, টেলিফোন সবই নাগালের মধ্যে, গার্গীর ফোনের অপেক্ষা না করে এই তিনদিনের মধ্যে দীপঙ্কর নিজেও তো একবার তার অফিসে ফোন করতে পারত, অন্তত জিজ্ঞেস করতে পারত ছেলেটা কেমন আছে। ছাড়া-ছাড়া হয়ে থাকার কথাটা দীপ্রর সূত্রে বললেও বস্তুত নিজেকেই ব্যক্ত করেছিল গার্গী। এবং অকারণে নয়। কিছুদিন থেকেই মনে হচ্ছে এতদিনের অভ্যস্ত অভিজ্ঞতা থেকে কী যেন সরে গেছে, একটা ফাঁক তৈরি হয়েছে কোথাও, সেখানে সারাক্ষণ খলবল করছে অতৃপ্তি আর অশান্তি। ভাবতে পারেনি তার স্বামী ভুল বুঝবে তাকে, বা কথাটা এমন ভাবে ঘোরাবে যাতে সে আর অনুভূতির গাঢ়তায় ফিরতে না পারে।

বিষণ্ণতা সত্ত্বেও নিজেকে স্থির রাখবার চেষ্টা করল গার্গী। যে বুঝতে চাইছে না তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে লাভ কি! পরে ভাবল. এমনও কি হতে পারে যে, দূরত্ব থেকে,

সান্নিধ্যের অভাবে সে নিজে যেমন অস্থির ও অসংলগ্ন বোধ করছে, রাগও এসে যাচ্ছে কখনও কখনও, তেমনি একই ধরনের অস্থিরতায় জড়িয়ে পড়েছে দীপঙ্করও, নিজস্ব অনুভবের বাইরে আর কিছুই তার কাছে প্রয়োজনীয় মনে হচ্ছে না। হতে পারে। কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটা জানতে চাইলেও যেতে হবে ওরই কাছে।

হাতে ঘণ্টা দেড়েকেরও কম সময়। এর মধ্যে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে যাওয়া, দীপ্রকে তৈরি করা এবং নিজের বাড়ির দিকে রওনা হওয়া, সবটাই সময়সাপেক্ষ। এখন অফিস ছুটির সময়, ট্রাম বাস মিনিবাস সবই গাদাগাদি হয়ে থাকবে ভিড়ে। একটা শিশুকে সঙ্গে নিয়ে এত অল্প সময়ের মধ্যে সে পৌঁছুবে কী করে! যেটা আরও খারাপ লাগছিল, দীপঙ্কর নিজের তাড়াটা বোঝাল, বলল চৌরঙ্গিতে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখবার জন্যে সে গাড়ি নিয়েই আসবে। না হয় নিজের গোঁ বজায় রাখবার জন্যে পার্ক সার্কাসের বাড়িতে এল না, কিন্তু ও কি বলতে পারত না তোমার অত তাড়াহুড়ো করাব দরকার নেই, বালিগঞ্জ ফাঁড়ির মোড়ে কিংবা গড়িয়াহাটে দাঁড়াও, আমি তোমাদের তুলে নেব! ওদের লোয়ার সার্কুলার রোডের অফিস থেকে এই জায়গাগুলো কী আর এমন দূরে! নাকি ও ডুবে ছিল এমনই কোনও চিন্তায় যা সম্পর্কের ভিতরের চেনা জায়গাগুলোকেও সম্পূর্ণ অচেনা করে দেয়!

তাই দিক। গার্গী ভাবল, সেও দেখবে। শেষ পর্যন্ত দেখবে।

পার্ক সার্কাসের বাড়িতে পৌঁছে মন খারাপ বাড়ল। আজ সকালে স্কুলে যাবার আগে ঘ্যান ঘ্যান শুরু করেছিল দীপ্র। যাবার ইচ্ছে নেই, বাবার কাছে যাবে বলে বায়না ধরল, তারপর নিজেদের বাড়িতে ফেরা নিয়ে। এমনকী কমলা কেন আসছে না তা নিয়েও হাত-পা ছুড়ল খানিক। বিবক্ত বোধ কবলেও গার্গীর মনে হচ্ছিল নিজের মতো করে তারই মানসিক টানাপড়েনেব বৃত্তান্ত বর্ণনা করে যাচ্ছে দীপ্র। শেষ পর্যন্ত স্কুলে পৌঁছে দিতে পারলেও তখন ধরতে পারেনি ভিতরে জ্বর পুষে রেখেছে ছেলেটা, এসব ঘ্যানঘ্যানানি শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের জন্যেই। বাড়িতে পৌঁছে শুনল স্কুল থেকে জ্বর নিয়ে ফিবেছে ও। যা খেয়েছিল সব বমি করে ফেলেছে। আজ প্রমোদ আনতে গিয়েছিল ওকে। গায়ে গলায় কপালে হাত দিয়ে রীতিমতো তাপ আছে অনুভব কবে কল দিয়েছিলেন পাড়ার ডাক্তাবকে। ইনফ্লুয়েঞ্জা। পরশু স্কুল থেকে ফেরার সময়.হঠাৎ বৃষ্টিতে ভিজে একসা হয়েছিল, ঠাণ্ডা লেগে যাওয়া অসম্ভব নয়। সারা দুপুর পাশে নিয়ে শুয়েছিলেন সুবর্ণা। স্কুলের চাকরি সেরে বাড়ি ফেরাব পর থেকে সুমিত্রাই সামলাচ্ছে ওকে।

এই অবস্থায় দীপ্রকে নিয়ে বেরুনো যায় না।

গার্গী স্থির করতে পারছিল না সে নিজেও বেরুবে কি না। এটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার—তার এবং দীপঙ্করের, নিতান্তই বাপের বাড়ি থেকে নিজের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সমস্যা নয় যে প্রমোদ বা সুবর্ণার সঙ্গে আলোচনা করবে। তাছাড়া, সে-ই আসতে বলেছে দীপঙ্করকে, না গেলে খারাপ দেখাবে, ওর পক্ষে রেগে যাওয়াও অসম্ভব নয়—একটা ব্যস্ততার মধ্যে আছে জেনেও গার্গী শুধু শুধু তাকে হয়রান করল কেন! প্রশ্নটা খারাপ দেখানো বা ভাল দেখানো নিয়েও নয়, সম্পর্কের, হয়তো বা সম্পর্কের সঙ্কটেরও। বাস্তবিক, সে নিজেই তো উচাটন হয়ে আছে তিন চারদিন দেখা না হওয়ায়। দেখা তাকে করতেই হবে। অবশ্য আজ যে ভাবছিল, ওখানেই রাত কাটাবে, কাল সকালে ওখান থেকেই ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে অফিসে যাবে সে, দীপ্র হঠাৎ জ্বর বাঁধিয়ে বসায় সেটা আর হবে না।

বরং সুযোগ পেলে দীপঙ্করকে বলতে পারে, তার জন্যে না হোক, অসুস্থ ছেলেকে দেখবার জন্যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট সেরে সে একবার আসতে পারে পার্ক সার্কাসে। সকালে বেশ কয়েকবার বাবা-বাবা করেছিল দীপ্র। এমনও হতে পারে, শরীরে জ্বর থাকার জন্যেই সকালে বায়না করেনি ও; দুশ্চিন্তা আগেই ছিল, ভিতরের অভিমান ক্রমশ পরিণত হয়েছে জ্বরে। ওইটুকু ছেলের মন কে আর ষোলআনা বুঝছে!

সময় চলে যাচ্ছে। প্রতিটি মুহূর্তকেই এখন মনে হচ্ছে জরুরি। দীপ্র জ্বরে পড়বে এটা সে জানত না; জানবার পরে দীপঙ্করকেও যে জানাবে এবং বলবে সে যেতে পারছে না— পারলে দীপঙ্করই চলে আসুক, বা, যা ইচ্ছে করুক, সেটাও সম্ভব নয় এখন। তাড়া দীপঙ্করের। ছ'টা নাগাদ পৌঁছুতে চাইলে সে নিশ্চয়ই বেরিয়ে পড়েছে এতক্ষণে। আর যদি ধরেও নেওয়া যায় যে বেরোয়নি এখনও, তাহলেও, জানাবে যে, কোত্থেকে জানাবে! পাড়াটা গলির মধ্যে, কাছেপিঠে তার জানা এমন কোনও জায়গা নেই যেখান থেকে ফোন করা যেতে পারে। এমন দোটানায়, সময়ের বিরুদ্ধ দৌড়নোর এমন প্রতিযোগিতায় গার্গী আগে পড়েনি।

শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিল, যাবেই। দেখা করা এবং ফিরে আসা—সব মিলিয়ে দেড়, দু' ঘণ্টা, এই সময়টা যাদের কাছে আছে তারাই দেখবে দীপ্রকে। এমনিতেই অফিস থেকে ফিরতে তার আরও দেরি হতে পারত।

শিখা চা করতে গিয়েছিল। ভেবেচিন্তে রান্নাঘরে গিয়ে ওকেই ধরল গার্গী। দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে ও-বাড়িতে, ঘণ্টাখানেক কি দেড়ঘণ্টার মধ্যে ফিরে আসবে, এর বেশি কিছু বলল না।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শিখা হয়তো অনুমান করল কিছু। প্রশ্ন করল না। চৌত্রিশ বছর বয়সে হঠাৎ বিধবা হবার পর ওর একদা-উচ্ছল স্বভাবে যেসব পরিবর্তন আয়ত্ত করে নিয়েছে শিখা, প্রশ্নহীনতা তার একটি। শুধু বলল, 'অফিস থেকে ফিরলে, চা-টা খেয়ে যাও অন্তত!'

'না, বউদি। দেরি হয়ে যাবে।' ব্যস্তভাবে বলল গার্গী, 'কেউ জিজ্ঞেস করলে যা বললাম বোলো। দীপ্র যেন না জানে কোথায় গেছি।'

আর দাঁড়ায়নি। বাড়ির দরজা পেরিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল রাস্তায়। সে জানে তার ব্যবস্থা তাকেই করতে হবে। যতই তাড়া থাক, তাকে লিফট দিয়ে এতটা রাস্তা নিশ্চিন্তে পার করে দেবার জন্যে কেউই এগিয়ে আসবে না।

তখন সময় ছিল না। এখন, নিজের বাড়িতে, দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে, গার্গী অনুভব করল সে ঢুকে পড়েছে অনন্ত সময়ে—যেখানে উদ্বেগ, ব্যস্ততা, কারুর কথা ভেবে ছুটে আসা, কিছুই জরুরি নয়। কিংবা, সবই অর্থহীন। খানিক আগে সে কি ভেবেছিল সম্পর্কের সঙ্কটের কথা? সঙ্কট কোথায়? সম্পর্কটাই তো খুঁজে পাচ্ছে না। এখন অনুভূতি বলতে শুধুই একাকীত্বের, যে-সময় চলে গেছে এবং যে-সময় আসছে, দুইয়ের মাঝখানে চিত্রার্পিত দাঁড়িয়ে থাকার। একা এসেছিল, একাই ফিরে যাবে।

বিকল্প কোনও চিন্তা মাথায় আসছিল না। ছেলে সঙ্গে থাকলেও কথা ছিল, দরকার হলে রাতটাও কাটিয়ে যেতে পারত এখানে। টেলিফোনে দীপঙ্করের কথা শুনে মনে হল ও বাড়িতেই ফিরবে, তবে কখন ফিরবে সেটা অনিশ্চিত। তাতে কিছু যায় আসে না; না হয়

অপেক্ষা করত সে। কিন্তু, এখনকার সমস্যা অন্য। দীপ্র এক জায়গায়, সে এখানে, দীপঙ্কর কোথায় তা জানে না। কতক্ষণ অপেক্ষা করতে পারে। শিখাকে বলে এসেছে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে ফিরবে, তারও বেশিটাই চলে গেছে ইতিমধ্যে, দেরি হলে অযথা উদ্বেগ বাড়বে ওদের। তা ছাড়া, স্বামীর প্রতি দায়িত্ব দেখাতে গিয়ে সে কি ছেলের প্রতি দায়িত্বহীন হয়ে পড়ছে না। দায়িত্ববোধটা তো দীপঙ্করও দেখাতে পারত। যার সাতটায় বেরুলেও চলত, স্ত্রী আসবে—এবং গাড়ি কি ঘোড়ায় চড়ে নয়, আসবে ট্রামে-বাসে—জেনেও কি সে আরও দু-দশ মিনিট দেখে যেতে পারত না। সঙ্গে গাড়ি ছিল, না হয় ওর সঙ্গেই ফিরে যেত গার্গী, নেমে পড়ত মাঝপথে। কী এমন অ্যাপয়েন্টমেন্ট তোমার যে একটু দেরি হলে মহাভারত অশুদ্ধ হত! নাকি স্ত্রীকে দেওয়া সময়টাকেও তুমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট ধরে নিয়েছ— এর মধ্যে মায়া-দয়া, আলাদা করে বিবেচনার কিছু ছিল না, সময়টা পার করেই চলে গেছ! তাহলে তোমার সঙ্গে অফিসের সোমেশ্বরের তফাত কোথায়! নাকি পায়ের তলায় জমি খুঁজে পেয়ে ভাবতে শুরু করেছ এরকম বসিং চলে!

একটা অপমানবোধ ধীরে ধীরে তাপ ছড়াচ্ছিল মাথায়। দীপঙ্কর কি ইচ্ছে করেই এই অবস্থার মধ্যে রেখে গেল তাকে?

একা বাড়িব শূন্য সংস্পর্শে এভাবে সময় নষ্ট করে লাভ নেই কোনও। গার্গী ঠিক করল, এখনই চলে যাবে। একাট চিরকুট লিখে যেতে পারে। যখনই ফিরুক, দীপঙ্কর দেখবে। দীপ্রর জ্বর জানিয়ে লিখতে পারে, নিজের স্ত্রী, সন্তানের জন্যে যে দশটা বাডতি মিনিটও অপেক্ষা করতে পারে না সে কেমন মানুষ!

অভিমান থেকেই সন্দেহ এল। এত যে ভেবে যাচ্ছে তার মধ্যে সত্য কতটুকু? এমনকী হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত আসেইনি দীপঙ্কর, আটকে পড়েছে কোথাও? এলে, যেহেতু অপেক্ষা করার সময় নেই এবং চলে যেতে হচ্ছে, সে-ক্ষেত্রে ও নিজেও কি একটা চিরকুট লিখে যেত না।

পূর্বাপর হারিয়ে যাচ্ছে। খানিক অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে গার্গী ঠিক করল দোতলায় যাবে। সুরমাকে জিজ্ঞেস করবে। দীপঙ্কর এসে থাকলে সুরমারা জানতে পারেন, ওঁদের কাছে কোনও খবরও বেখে গেছে হয়তো। যদি না এসে থাকে, তাহলে চিরকুট না লিখে, যা বলবার সুরমাকেই বলে যেতে পারে।

সব ঠিকঠাক আছে কি না দেখবার জন্যে আরও একবার ভিতরে ঢুকল ও। বাথরুমে গেল; চোখেমুখে জল দিয়ে তোয়ালেয় চেপে চেপে মুখ মুছল। শিখার কথা শুনে তখন চা-টা খেয়ে এলেও পারত। কেন যে ভেবেছিল দীপঙ্কর চা খেতে চাইবে, ওর জন্যে চা করে দুজনেই খাবে একসঙ্গে! রান্নাঘরের জানালার ছিটকিনিটা আলগা হয়ে আছে, সেটা ঠিকঠাক লাগাতে লাগাতে ভাবল, আজ দিনটাই খারাপ। সকাল থেকে একটি মুহূর্তও কাটেনি যার মধ্যে স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক বোধ করেছে সে। না, কাটেনি।

শোবার ঘরে গিয়ে দেখল বিছানাটা ধামসানো। মনে হচ্ছে কাল রাতে বেডকভার না তুলেই শুয়ে পড়েছিল দীপঙ্কর। সকালেও পরিপাটি করে রাখার কথা খেয়াল করেনি। বেডকভারটা তুলে ঝেড়ে নিয়ে, আবার বিছিয়ে দিতে দিতে গার্গী ভাবল, না, তা কেন হবে!

তুমুল বৃষ্টিতে কাল জলে ভাসছিল কলকাতা। বিকেলের দিকে বৃষ্টির বেগ কমে আসছে দেখে দীপঙ্করকে ফোন করেছিল সে। দীপঙ্কর পরামর্শ দিল তাড়াতাড়ি পার্ক সার্কাসে ফিরে

যেতে, ওয়েদার ফোরকাস্টে নাকি বলেছে সন্ধের দিকে বৃষ্টি আরও বাড়বে। তারপর, গার্গীকে কিছুটা অবাক করেই বলল, 'আমিও ভাবছি আজ বাড়িমুখো হব না। ব্রিজের নীচে তো সাংঘাতিক জল জমে। একটু আগে বাবা বলল আজকের দিনটা বালিগঞ্জ প্লেসে থেকে যেতে—মানে—।' বলতে বলতে থেমে গেল দীপঙ্কর।

ও থামল বলে গার্গীকেও থামতে হল। সামান্য সময় নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে ভেবেছিল, এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। ওর বাবা যদি আবার ওকে ব্যবসায় টেনে নিতে পেরে থাকেন, তাহলে বাড়িতেও টানবেন। হয়তো আজকের বৃষ্টিও সেই উপলক্ষ তৈরি করে দিল। এটা হতেই পারে। সে নিজেও তো চেয়েছিল আলাদা থেকেও স্বাভাবিক হোক ওদের পারিবারিক সম্পর্ক, তাতে আবার আগের মতো হয়ে উঠবে দীপঙ্কর। তমসাকেও বলেছিল একদিন। বাপ-ছেলের সম্পর্কে সে নাক গলাবে কেন!

এভাবে ভাবলেও হঠাৎই বিষণ্ণ বোধ করল সে। ফোন ছাড়ার আগে বলেছিল, 'সেই ভাল।'

তাহলে কাল নয়, পরশু রাতেই এই বিছানায় শেষ শুয়েছিল দীপঙ্কর। বৃষ্টির জন্যে পরশু থেকে ওরাও আটকে আছে পার্ক সার্কাসে। দীপঙ্কর কি আজ বালিগঞ্জ প্লেস থেকেই অফিসে গিয়েছিল? হবে হয়তো। ওকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবে।

ঘরের আলো নিবিয়ে দরজা টেনে বাইরে এল গার্গী।

আলো জ্বলছে দোতলায়, শোবার ঘর এবং বারান্দা দুটোই আলোকিত, মনে হয় গোপালবাবুও আছেন বাড়িতে। সিঁড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গিয়ে বেল দেবার আগে অস্বস্তি ছেঁকে ধরল তাকে, স্বামীর খবর নিতে স্ত্রীকে অন্যের দরজায় যেতে হবে কেন! ওঁরা কি ভাববেন যত সহজে দীপঙ্কর সম্পর্কে প্রশ্ন করছে গার্গী, ঘটনা তত সহজ নয়! কোনও সন্দেহ করবেন কি? কমলা চলে যাবার পর একদিন রাতে, মনে পড়ল, সে সময়টায় দীপ্র, অফিস আর সংসার সামলাতে হিমসিম খাচ্ছে সে, মন কষাকষি থেকে বিছানাতেই ঝগড়া শুরু হল তাদের। তারপর, যা কখনও হয়নি, দীপঙ্কর গলা চড়াতে সেও ধৈর্য হারাল, রাগের মাথায় দীপঙ্কর বলল ডিভোর্স করবে, গার্গী বলেছিল, 'হ্যাঁ, তা-ই করো। আমারও আর ভাল লাগছে না—', ইত্যাদি। দুজনের কেউই খেয়াল করেনি এসব কথা নৈঃশব্দ্য চিরে দোতলা পর্যন্ত ছুটে যেতে পারে। তার ওপর মাঝে মাঝে দীপ্রর ভয়-পাওয়া গলায় আঁতকে ওঠা। পরের দিন অবশ্য স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল সব। কিন্তু, বিকেলে, গেটের কাছে মুখোমুখি দেখা হতে সুরমা বললেন, 'কাল তোমরা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলে—।' আর কীভাবে ঘুরিয়ে নাক দেখানো যায়! লজ্জায় কথা ফোটেনি গার্গীর মুখে।

দরজা খুলল বাচ্চা কাজের মেয়েটি। সিঁড়ির বাঁকে সুরমাও এসে দাঁড়িয়েছেন।

'ও, তুমি! এসো, এসো—'

'আপনাদের বিরক্ত করলাম।'

'না, এসো।' গার্গী দু তিন ধাপ উঠে আসতে পিছন ফিরে এগোতে এগোতে সুরমা বললেন, 'বিরক্ত হব কেন!'

বসবার জায়গায় ওকে বসিয়ে নিজেও বসলেন সুরমা। ওকেই দেখছেন।

গার্গী চোখ নামিয়ে নিল।

'মাসিমা, ও কি এসেছিল? মানে—'

গার্গী হঠাৎ চুপ করে যেতে সুরমা বললেন, 'দীপঙ্করবাবুর কথা বলছ?'

চোখ না তুলেই মাথা নাড়ল গার্গী।

'কেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি! এই তো গেলেন, কিছুক্ষণ আগে। গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন—'

সুরমার কথায় দুটো ঘটনা স্পষ্ট। দীপঙ্কর এসেছিল এবং তার জন্যে কোনও খবর রেখে যায়নি। এর পরেও কি প্রশ্ন থাকে? গার্গী উঠে যাবার কথা ভাবল।

সুরমা জিজ্ঞেস করলেন, 'চা খাবে?'

'না।'

'খাও না। উনি একটু আগে ফিরেছেন। চা হচ্ছে, আমরাও খাব।'

গার্গী না বলতে পারল না। এবং বুঝতে পারল চা খাবার কথায় মাথা নেড়ে ভুলই করেছে। আরও কিছুটা সময় এখানে কাটাতে হবে তাকে। যেটা জানবার জেনে গেছে, এই বাড়তি সময়টুকু এখানে খরচ করে লাভ কি। এমনও মনে হল, সুরমা যেন আজ তার প্রতি একটু বেশিই আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

কাজের মেয়েটিকে ডেকে দু কাপ চা দেবার কথা বললেন সুরমা। গোপালবাবু কাশছেন। সামান্য হাঁফ-জড়ানো সেই শব্দ উঠেই থেমে গেল। পরিচিত শব্দ। রাত যত এগোবে সেই শব্দটাও বাড়বে তত।

'তুমি কখন এসেছ?'

'এই তো, মিনিট পনেরো।' স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় গার্গী বলল, 'ও বলেইছিল তাড়া আছে, আবার অফিসে ফিরতে হবে। আমার আসতে দেরি হয়ে গেল।'

'দীপ্র কোথায়?'

'আমার মায়ের কাছে। সকাল থেকে জ্বর বাঁধিয়ে বসেছে।'

'তোমার বাপের বাড়ি তো পার্ক সার্কাসে?'

গার্গী আবার মাথা নাড়ল। দৃষ্টি নামিয়ে নিল। আলোয় চকচক করছে সুরমার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলের পাশের আঙুলে লাগানো রিংটা। বাড়ি ভাড়া নেবার জন্যে যেদিন প্রথম এসেছিল দীপঙ্করের সঙ্গে, এবং কথাও পাকা হয়ে গেল, সেদিন সুরমাকে ইমপ্রেস করার জন্যে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিল সে, রিংটা তখনই চোখে পড়ে। ওদিকে তকিয়ে থাকতে থাকতে গার্গীর মনে হল কথা এগোচ্ছে, কথার মধ্যে বিষয় থাকছে না কোনও। স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম লাগছে সুরমাকে। সাড়ে সাতটা বাজতে চলল, এবার তার ফেরা দরকার। চায়ে দু চুমুক দিয়েই সে উঠে পড়বে।

'আজ তাহলে চলে যাবে?'

'হ্যাঁ। ছেলেটা ভাল থাকলে আজই আসতাম।' ইতস্তত করে বলল গার্গী, 'অফিস থেকে ফিরে দেখলাম জ্বর—'

মেয়েটি দু কাপ চা দিয়ে গেল। একটা অবলম্বন পাবার মতো নিজের কাপটা তুলে নিল গার্গী। ভিতরের ঘর থেকে টি-ভি চলার আওয়াজ আসছে। খবর শুরু হল।

সুরমা চিন্তিত, একটু বা অন্যমনস্ক। তার কথা শুনে, নাকি অন্য কিছু ভাবছেন, তা বুঝবার উপায় নেই। গার্গী মনে করবার চেষ্টা করল শেষ কবে সে দোতলায় এসেছিল একদিন, মনের ভুলে দরজার চাবিটা ফেলে এসেছিল ভিতরে—দীপঙ্কর ফিরে না আসা পর্যন্ত

দীপ্রকে নিয়ে অপেক্ষা করেছিল ওপরে। সেদিন অবশ্য সময়ের আগেই বাড়ি ফিরেছিল দীপঙ্কর।

'দীপ্রকে দেখাশোনার লোক ঠিক হয়নি এখনও?'

'না। কোথায় আর পাচ্ছি!' নিঃশ্বাস টেনে, আবার ছাড়তে ছাড়তে অনুতাপের গলায় গার্গী বলল, 'তিন মাস হয়ে গেল। কমলা গিয়ে যে কী বিপদে পড়েছি! দু-তিনজনকে দেখলাম, ওরা চাকরি করার জন্যেই আসছে—বেশি টাকা চায়, সময়ও কম দেবে। তেমন ডিপেন্ডেবল মনে হচ্ছে না।'

'হ্যাঁ। কমলা মানুষটা ভাল ছিল। দীপ্রকে ভালবাসত খুব। আমিও দেখেছি।'

'কিন্তু, কী ভাগ্য দেখুন! কোথাও কিছু নেই, তিন দিনের জ্বরে ছেলেটা মরে গেল!'

'টগরের মা বলছিল ও নাকি দেশে চলে গেছে?'

'হবে। আমি তো বস্তিতে ওর বাড়িতে পর্যন্ত গেছি। কত বোঝালাম। চুপ করে থাকল।'

'কিন্তু, লোক না পেলে তোমারই বা চলবে কী করে!' চায়ে চুমুক দিয়ে কাপ নামিয়ে রাখলেন সুরমা। ভারী চেহারা নিয়ে নড়ে বসলেন সামান্য, 'তুমি এখানে। দীপঙ্করবাবুর নিশ্চয়ই ওখানে অসুবিধে হচ্ছে খুব!'

'না, অসুবিধে আর কি!' বলার তাড়ায় বলে ফেলল গার্গী, 'পরশুর রাতটা ছিল। কাল সারাদিন যা গেল, আসবে ভেবেও আসতে পারেনি। কাল ও নিজের বাবা-মা'র কাছে ছিল। বালিগঞ্জ প্লেসে। হয়তো—'

গার্গী শেষ করতে পারল না। তার আগেই সুরমা বললেন, 'কেন! কাল সন্ধেবেলায় তো উনি এসেছিলেন!'

'এখানে!'

'তুমি জানতে না!' গার্গীর অপ্রস্তুত মুখের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ম রেখায় হাসলেন সুরমা, 'কাল সন্ধের পর। তখন বৃষ্টিটা ধরেছিল একটু। একটা জিপগাড়ি নিয়ে। সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। তোমাদেরই বয়সী। ফর্সা, গোল মতন মুখ, স্বাস্থ্য বেশ ভাল—'

সুরমা থামলেন। দু এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে যোগ করলেন, 'আমরা তো ভাবলাম তুমিও আছ বাড়িতে।'

অনুভূতিটা ফিরে আসছে। স্তব্ধভাবে বসে থাকতে থাকতে গার্গী টের পেল, উত্তেজনা সঞ্চারের মতো একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ছে সর্বাঙ্গে। যেমন প্রায়ই হয় আজকাল। অনুভূতি আড়াল করতে করতেই ও বুঝতে পারল আজ সুরমার আচরণ, কথাবার্তা কেন স্বাভাবিকের চেয়ে অন্যরকম লাগছিল। হয়তো আশা করতে পারেননি সে এমন হঠাৎ এসে পড়বে, নিজেই বেল দেবে দরজায়। তাই, প্রস্তুতি থাকা সত্ত্বেও গোছাতে পারছিলেন না নিজেকে। না এলে সুরমা আজ না হোক কাল নিজেই যেতেন তার কাছে, বলতেন একই কথা। 'তুমিও আছ বাড়িতে' কথাগুলো বানানো। কিন্তু তার আগের কথাগুলো অবিশ্বাস করবে কী করে! খানিক আগে পরিপাটি করে গুছিয়ে আসা বিছানাটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল সে।

এই পরিবেশ অসহ্য লাগতে শুরু করায় উঠে পড়ল গার্গী এবং এই মুহূর্তের সমগ্র লজ্জা ও অসহায়তা থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। ওর এক দিদি বম্বে থেকে এসেছিল। তখন জানত না আমি আটকে পড়েছি, বাড়ি ফিরতে পারব না। এখান থেকে বালিগঞ্জ প্লেসে গিয়েছিল। ওখান থেকেই ফোন করেছিল আমাকে।'

গার্গী সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সুরমা বললেন, 'তুমি জানতে।'

গার্গী জবাব দিল না। সিঁড়ি নামতে নামতে ভাবল, এভাবে না বললেও পারত। কাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে? নিজেকে? দীপঙ্করকে? নাকি তাদের সম্পর্কটাকে? এই সম্পর্কে সুরমারই বা জায়গা কোথায়! কিন্তু, এসব মিথ্যা তো দীপ্রও ধরে ফেলবে।

নীচে এসে একবার পিছনে তাকাল গার্গী। হাসবার চেষ্টা করেও পারল না। সুরমাও নির্বাক। দরজার ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে এসে প্রায় শূন্যতার মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে ভাবল, কাল তাহলে কলকাতা ভাসেনি, ব্রিজের নীচেও জল জমেনি, বাপ-ছেলের নতুন গড়ে ওঠা সম্পর্কের কথা ভেবে সে বৃথাই আশ্বস্ত ও বিষণ্ণ বোধ করেছিল।

অভ্যস্ত রাস্তা। মন দেখায় না কিছু। শুধু পা দুটোই হাঁটছে। একমাথা রাগ, ঘৃণা, অপমান ও অনিশ্চয়তা নিয়ে ফিরে যেতে যেতে ক্রমশ রাগ, ঘৃণা, অপমান ও অনিশ্চয়তাগুলো হারিয়ে আপাদমস্তক অবশ হয়ে উঠল গার্গীর। ক্ষত গভীর অথচ রক্তহীন হলে যেমন হয়, অবরুদ্ধ রক্তের চাপে ফুলে ওঠে আশপাশ, অনেকটা তেমনি, এখনকার অনুভূতি বলতে সেরকম। এইমাত্র কিছু একটা ঘটেছে, সেটা বুঝতে পারলেও আশপাশের অন্য চিন্তা এসে গুলিয়ে দিচ্ছে ঘটনার তাৎপর্য।

সুরমা যা বললেন তার অর্থ খুঁজতে গিয়ে বিশেষ এগোতে পারল না সে।

দীপঙ্করকে কি জিজ্ঞেস করবে? কিন্তু, দীপঙ্কর যদি পুরো ঘটনাই অস্বীকার করে তাহলে অর্থ দাঁড়াবে দুটো। হয় সে সত্যি বলছে, না হয় গোপন করে যাচ্ছে ঘটনা। তাহলে কি দীপঙ্করের প্রবঞ্চনা ধরিয়ে দেবার জন্যে আবার সুরমার কাছে ছুটে যাবে সে, তাঁকে সাক্ষী মানার জন্যে? তার পরেও কি সে আর দীপঙ্কর থাকতে পারবে একসঙ্গে, স্বামী-স্ত্রী হয়ে? ওই বাড়িতে?

প্রশ্নগুলো জট পাকিয়ে গেল।

ফেরার তাড়া থাকলেও এখন আর উপলব্ধি করছে না সেটা। বাসে উঠে গভীর অবসাদে সিটের পাশে জানলার ধাতব ফ্রেমে মাথা লাগিয়ে বসে থাকল চুপচাপ। সন্ধের বাসে যাত্রী কম, বিভিন্ন সিটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে ক'জন বসে ক্রমশ আলাদা হয়ে গেল তাদের থেকে। এমনকী রাস্তার দৃশ্য থেকেও। ভুলটা কি তারই? মাঝখানে দীপ্র না থাকলে কি অভিজ্ঞতা অন্যরকম হত?

প্রায় একই ধরনের চিন্তায় আক্রান্ত হয়েছিল কমলা চলে যাবার পরে। ছেলের অসুখ বলে সে যে গেল, আর ফিরল না। তখন জানত না মারা যাবে ছেলেটা। এমনই ভেঙে পড়বে যে কাজে ফিরবে না আর। গোড়ার দিকে গার্গী ভেবেছিল দুঃখী মানুষ, শোক পেয়েছে, কিছুদিন গেলে ঠিক হয়ে যাবে আবার। বাঁচা আরও শক্ত। টাকার প্রয়োজন, সংসারের অনটনই ফিরিয়ে আনবে ওকে।

ইতিমধ্যে অফিস কামাই করতে শুরু করেছিল গার্গী। লোকও খুঁজছিল। না পেয়ে ছুটি নিল একটানা তিন সপ্তাহ। সেই ছুটিও শেষ হয়ে যাচ্ছে অথচ দীপ্রকে দেখাশোনার লোক পাচ্ছে না দেখে বাধ্য হয়ে একদিন টগরের মা-কে সঙ্গে নিয়ে কমলার খোঁজে ওদের বস্তিতে গেল।

বিকেল বেলা। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে বাঁদিকে। রিকশা অতদূর যাবে না। অগত্যা পায়ে হেঁটে।

দু পাশে খাপড়া কিংবা টিনের চালা। বাঁশ-মাটির দেয়াল, কোনও কোনওটার পাকা গাঁথনিও চোখে পড়ে। মাঝখানের রাস্তা চার ফুটও চওড়া হবে কিনা সন্দেহ। দু দিকের কাঁচা নর্দমার ওপর তক্তা বা চওড়া পাথর পেতে নিচু দরজার ভিতরে ঢোকা। যেখানে সেখানে তোলা উনুন ঘুঁটে কিংবা গুল দিয়ে ধরানো, আগুন আড়াল হয়ে গেছে কাঁচা গলগলে ধোঁয়ায়। বস্তিতে ঢোকার মুখে টিউবওয়েলের সামনে জটলা করছিল পাঁচ ছ'জন মেয়েমানুষ, টগরের মা-র সঙ্গে গার্গীকে দেখে কৌতূহলী হল। লাল ফ্রক-পরা একটি মিশমিশে কালো কিশোরী সঙ্গ ধরল তাদের। তারা যত এগোচ্ছে ততই এ ঘর ও ঘর থেকে বেরিয়ে আসা বিভিন্ন উৎসুক দৃষ্টি ছুঁয়ে যেতে লাগল তাকে।

টালির ছাদ, পাকা গাঁথনির একটা নিচু বাড়ির সামনে এসে থামল টগরের মা। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে হাত দেড়েক পরিসরের লোহার শিক দেওয়া চৌকো জানলাটা খোলা থাকলেও দরজা বন্ধ। টগরের মা দরজার শিকল ঠুকতে 'কে' বলে একটা রোগা, ক্ষয়াটে চেহারার লোক উঁকি দিল জানলা দিয়ে। খালি গা, রং পরিষ্কারের গা ঘেঁষে, ভাঙা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ওরই মধ্যে চোখ দুটি তীক্ষ্ণ। এমন মুখ দেখলেই চেনা লাগে, কিন্তু বয়স আন্দাজ করা যায় না। পঁয়তাল্লিশ হতে পারে, পঞ্চান্নও হতে পারে। কমলা বলেছিল ওর স্বামী ছুতোর মিস্ত্রি, সে-ই হবে।

লোকটি গার্গীকে আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে দেখল। তারপর টগরের মা-র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী চাই!'

টগরের মা ঘাবড়ে গেল। হাবভাব দেখে মনে হল লোকটির সঙ্গে ও খুব একটা পরিচিত নয়। একটু বা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কমলা আছে? ও বাড়ির বউদি এসেছে—'

'কে?'

'ওই, যেখানে ও ছেলে ধরার কাজ করত।'

লোকটিকে প্রসন্ন লাগছে না। 'দাঁড়ান' বলে অদৃশ্য হল আড়ালে।

দরজা খুলল মিনিট দু-তিন পরে। গায়ে গেঞ্জি চড়িয়েছে, পরনে লুঙ্গি। ঘরের তক্তপোষের ওপর বসা কমলাকে দেখতে পাচ্ছিল গার্গী। পাশে আট দশ বছরের একটি মেয়ে। নিশ্চিত কমলার, আদলে চেনা যায়। মনে পড়ল, কী কথায় যেন কমলা একদিন বলেছিল, 'মেয়েটাকে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়ে দেব, বউদি। ওর বাপের ইচ্ছা ছেলেটাকে কলেজে পড়াবে।'

লোকটি বেরিয়ে এসে জায়গা করে দিল।

'যান।'

টগরের মা বলল, 'যাও, ভিতরে যাও। আমি দু মিনিট ঘুরে আসছি।'

গার্গী ইতস্তত করছিল। ঘরে ঢোকা তো দূরের কথা, এর আগে কখনও কোনও বস্তির ছায়া মাড়ায়নি সে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এসে কেউ কেউ তাকে দেখছে দেখে আরও অস্বস্তি। একটা অপরাধবোধও চাড়া দিয়ে উঠল মাথায়। কমলার ছেলে মারা যাবার খবর পেয়েও সে আসেনি; আজ এসেছে নিজের স্বার্থে, দীপ্রর জন্যে। কমলার স্বামীর তার দিকে তাকানোর ধরনে এমন কিছু ছিল যা তাকে আরও বিব্রত করল।

কমলা নেমে এল খাট থেকে। বস্তিতে হলেও ঘরের ভিতরটা পরিচ্ছন্ন; এক কোণ থেকে একটা টুল এনে এগিয়ে দিল তার দিকে।

গার্গী ওকে দেখছিল। আগের চেয়ে কৃশ, কালি পড়েছে চোখের কোলে। চোখ বৃষ্টির পরের গাছের মতো আলগা জলবিন্দুতে ঠাসা, নাড়ালেই ঝরে পড়বে। তখনও তক্তপোষের ওপর বসে থাকা ওর মেয়ের গা ঘেঁষে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। দেখে মনে হয় এই স্তব্ধতা এ ঘরে আগেও ছিল, সে চলে যাবার পরেও থাকবে। কমলা যখন তার বাড়িতে যেত, থাকত, তখন মনে হত ও বাড়িরই লোক। সেই ভরসাতেই এসেছিল। এই পরিবেশে নিজের হতাশাটা চিনতে পারল গার্গী।

'কী হয়েছিল?'

কমলা মাথা নাড়ল। জানে না।

পরের কথাটা সঙ্গে সঙ্গে খুঁজে পেল না গার্গী। ঘরের ভিতর থেকেই বুঝতে পারছিল কমলার স্বামী দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। ঘন হচ্ছে বিকেলের আলো। বস্তির পিছনের রেললাইন ধরে ছুটে যাচ্ছে একটা ট্রেন—শব্দের ভিতরের উৎকণ্ঠা সরব হতে হতে মিলিয়ে গেল দূরে, কোনদিকে বোঝা যায় না। কমলা যেখানে দাঁড়িয়ে তার কাছাকাছি দেয়াল ঘেঁষে একটা চটের থলি চোখে পড়ল। ভিতর থেকে উঁচিয়ে থাকা করাতের দাঁতগুলো এই ঘরের আবছায়াতেও কেমন যেন উজ্জ্বল লাগছে।

'কী করবে! সবই ভগবানের হাতে।' গার্গী এইভাবেই বলতে চাইল, 'বাড়িতে বসে থাকলে আরও মন খারাপ হবে। কাজে এসো।'

কমলা এবারও সাড়া দিল না।

'দীপ্র তোমার কথা বলে। মাঝে মাঝে কান্নাকাটিও করে।' গার্গী একটু থামল এবং অনুনয়ের ধরনে বলল, 'আমি ছুটি নিয়ে বসে আছি। আর ক'দিন থাকব! তুমি আমার অবস্থাটাও বুঝে দ্যাখো।'

গার্গী উঠে দাঁড়িয়েছিল। কমলা উত্তর দিচ্ছে না দেখে কিছুটা বেপরোয়া হয়ে বলল, 'তোমারও তো টাকার দরকার। মাসে দেড়শো টাকা পেতে, না হয় বাড়িয়ে দেব কিছু—'

'আমি কাজ করব না, বউদি।' কমলা হঠাৎ বলল, 'ছেলের জন্যেই দরকার ছিল।'

গার্গী একটা ধাক্কা খেল। ওর হাত পা কাঁপতে শুরু করেছিল। অসহায় ভাবেই বলল, 'আমাকে বিপদে ফেলে তোমার লাভ কী!'

কমলা চোখ নিচু করে থাকল।

সেই সময় ওর স্বামী ঘরে ঢুকল। কমলা, তার মেয়ে এবং গার্গী, পর পর তিনজনকেই দেখে নিয়ে বলল, 'আপনি এবার যান, মা। অন্য লোক খুঁজে নিন। ওকে নিয়ে টানাটানি করবেন না—'

লোকটির দৃষ্টি তারই মুখে নিবদ্ধ। বলার ধরনে সামান্য রুক্ষতা থাকলেও ওর কথায় অভদ্রতা ছিল না। কিন্তু দৃষ্টিতে রাগ, ক্ষোভ অস্পষ্ট নয়। ঘৃণাও কি? টাকার কথাটা বলা ঠিক হয়নি।

এর পর আর দাঁড়ায়নি গার্গী। যেভাবে এসেছিল, ফিরে যাচ্ছিল তার চেয়ে দ্রুত। যেন ওই দৃষ্টিও অনুসরণ করছে তাকে। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে রিকশায় ওঠার আগে টগরের মা বলল, 'লোক না পেলে ছেলেকে বোর্ডিংয়ে রেখে দাও না!'

গোলপার্কের কাছে জ্যামে আটকে আছে বাসটা। নিশ্চয়ই কিছুক্ষণ ধরে, খেয়াল করেনি। জোর ঘণ্টিটা দমকলের। বাজছে, বেজেই চলেছে। খানিক সেই শব্দটায় কান রেখে

পূর্বাবস্থায় ফিরে এল গার্গী এবং ভাবল, এখন দীপ্রর কাছেই ফিরছে সে, মাঝখানে দীপ্র না থাকলে এই ফেরাটাও থাকত না। তখনও বৃষ্টি পড়ত, সে আটকে পড়ত এবং সুরমার বর্ণনা সত্যি হলে, যা যা ঘটবার তা-ই ঘটত। তখন সিঁড়ি নেমে এসে কোথায় যেত সে! নিজেরই বাড়িতে? সিনেমায় যেমন হয়?

স্মৃতিতে ধারাবাহিকতা নেই। ভাবতে গেলে যে-কোনও জায়গা থেকে ছিঁড়ে আসছে পচা গোলার সুতোর মতো। ধরতে পারছে না পরের সূত্রটা কোথায়। গুছিয়ে ভাববার সুযোগ হয়নি কখনও, সেরকম উপলক্ষও আসেনি, কিন্তু এখন অমিল খণ্ডাংশগুলো জোড়া দিতে গিয়ে গার্গীর মনে হল, কিছুই হয়তো আকস্মিক ভাবে ঘটেনি। সে না জানলেও দীপঙ্কর জানত এভাবেই ঘটবে।

বস্তিতে গিয়ে কমলাকে অনুনয় অনুরোধ করার ঘটনা চেপে গিয়েছিল সে। ভয় ছিল দীপঙ্কর চটে যাবে। ভাববে নিজের জেদ বজায় রাখতে এতই বেপরোয়া হয়ে উঠেছে গার্গী যে শোভন অশোভন মানছে না। রঘুনাথ বাঁড়ুজ্যের পুত্রবধূ তাহলে বস্তিতে গিয়ে ঝি-চাকরদের হাতে পায়ে ধরতেও বাকি রাখেনি! এর আগে যেদিন ডিভোর্স করার কথা তুলল, সেদিন ওই কথা বলবার আগে পেডিগ্রি চিনিয়েছিল দীপঙ্কর; নীহারের মতো অসবর্ণ বলেনি, কিন্তু তাদের সম্পর্ক যে তেলেজলে মিশ খায়নি, বংশ-রক্তের পার্থক্য একজনকে টানছে এদিকে, আর একজনকে ওদিকে—সেটা বলতে ছাড়েনি।

টারেটোরে কথা বলার এই ধরনটা গার্গীর চেনা। কোণঠাসা হয়ে বলেছিল, 'তুমি অন্যরকম হবে কেন! মা-কে দেখলেই ছেলে চেনা যায়।'

'চোপ!' দীপঙ্কর চেঁচিয়ে উঠেছিল। হাত দুটো মুঠো করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে প্রশমিত করেছিল নিজেকে। পরে বলল, 'সাধে কি ভাবি ডিভোর্স করব!'

তারপর মিটমাট হয়ে গেলেও কথাগুলো হারায়নি। প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও সময় ফিরে আসত। এরকম পরিস্থিতিতে নতুন কোনও ঝামেলায় জড়িয়ে লাভ কি!

ছুটি শেষ হয়ে আসছিল। আবার ছুটি বাড়াতে গেলে উইদাউট পে হবে। পরের সিদ্ধান্তটা, সুতরাং, নিজেই নিল গার্গী।

'একটা উপায় ভেবেছি।' সুযোগ খুঁজে দীপঙ্করকে বলল, 'এখন থেকে অফিস যাবার সময় আমিই স্কুলে পৌঁছে দেব দীপ্রকে। পার্ক সার্কাস থেকে কেউ এসে নিয়ে যাবে ওকে। ওখানেই খাবে, থাকবে। অফিস থেকে ফেরার সময় আমি নিয়ে আসব।'

'ওঁরা পারবেন?'

দীপঙ্করের সরল প্রশ্নে অবাক হল গার্গী। ভেবেছিল পার্ক সার্কাসের নাম শুনে আরও একটা খোঁচা দেবে ও। বলতে পারে, হ্যাঁ, তোমার চাকরি রাখাটা ওদের পক্ষে খুব জরুরি, বা, ছেলের থাকা খাওয়া বাবদ আরও কত টাকা দিতে হবে ওদের? সেসব দিকে গেল না শুনে আশ্বস্ত হয়ে বলল, 'বাবা বলেছে অসুবিধে হবে না। তা ছাড়া বউদিও যেতে পারে—দুপুরে ওর ছেলেমেয়েরা স্কুলেই থাকে।'

দীপঙ্কর শুনে গেল। হাতে রবিবারের খবরের কাগজ, মাথা ঝুঁকিয়ে ক্লাসিফায়েড কলামে ব্যবসা খুঁজছে। চোখ তুলল না।

'অসুবিধে তোমার হবে।' গার্গী বলল, 'যেদিন দেরিতে বেরুবে বা দুপুরে ফিরবে, সেদিন একা বসে খেতে হবে। আগে ছেলে থাকত, কমলাও থাকত—'

'ওটা কোনও প্রব্লেম নয়। তাছাড়া—।' কথা শেষ করল না দীপঙ্কর। উঠে ঘরে গেল, ফিরল সিগারেট ধরিয়ে। ধোঁয়া গেলার সময় নিয়ে বলল, 'বাবা চাইছেন আমি আবার ব্যবসায় ফিরে যাই। ওঁরও অসুবিধে হচ্ছে, শরীর প্রায়ই ভাল থাকে না।'

'তুমি গিয়েছিলে?'

'না। খবর পাঠিয়েছিলেন। পরে দেখা করলাম।'

ইদানীং স্বামীকে এতটা প্রশান্তির মধ্যে দেখেনি। গার্গী কারণ খুঁজছিল। মনে হচ্ছে যেটুকু বলল তার পরেও আছে কিছু, যেটা এখনই ভাঙতে চায় না। মুখ দেখে বোঝা যায় চেষ্টা করা সত্ত্বেও তেমন কিছু করতে না পারার হতাশা থেকে মুক্তি পাবার সম্ভাবনায় ভার নেমে গেছে অনেকটা। এমন হলে স্বভাব থেকে উৎকণ্ঠাও চলে যাবে আস্তে আস্তে। রোজগার বাড়বে। সম্ভবত আরও একটু সচ্ছল হবে তারা।

গভীর থেকে নিঃশ্বাস উঠে এল গার্গীর। এভাবে ভাবলেও ভাল মন্দ কিছুই বলল না।

'এখনও কিছু ঠিক করিনি।' জবাবদিহি করার গলায় বলল দীপঙ্কর, 'ওখানে ফিরলে আমাকেও ন'টায় বেরুতে হবে। লাঞ্চও অফিসেই খেতে পারি। আমাকে নিয়েও কম ঝঞ্ঝাট যায় না তোমার।'

যেটা সমস্যা মনে হচ্ছিল, এত সহজে যে তার সমাধান হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি গার্গী। নিজের জীবনযাপনের ছকটা নিজেই পাল্টে ফেলল দীপঙ্কর।

কিন্তু, এরই কিছুদিন পরে, গার্গী কি ভেবেছিল, সুরমার বর্ণনায় তার ও দীপঙ্করের মধ্যে একটি অবিশ্বাস্য চরিত্র আবির্ভূত হবে! একটি মেয়ে, যে তারই বয়সী, যার রং ফর্সা এবং স্বাস্থ্য ভাল—যে সঙ্গে থাকলে প্রবল বৃষ্টির জল ভেঙে জিপে চড়ে অনায়াসে বাড়ি ফিরতে পারে দীপঙ্কর এবং সেইজন্যেই, যাতে এরকম একটা ঘটনা ঘটানো সম্ভব হয়, গার্গীকে শুনতে হয় তাড়াতাড়ি পার্ক সার্কাসে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ, ওয়েদার ফোরকাস্টে বিপজ্জনক বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা, বাপের কথায় ছেলের বাধ্য হয়ে ওঠার কথা!

কে হতে পারে? কেন এসেছিল সে? সে কি জানে না দীপঙ্কর বিবাহিত এবং এভাবে আসা শোভন নয়?

নাকি গার্গীই ভুল ভাবছে, সে আসবে এবং তার সংস্পর্শে নিভৃত ও অন্তরঙ্গ হতে পারবে ভেবেই দক্ষ ড্রাফটসম্যান দীপঙ্কর ছকে ফেলেছিল চমৎকার ব্লু প্রিন্ট, যাতে ওই ব্লু-প্রিন্ট ধরেই আস্তে আস্তে ঢুকে পড়তে পারে ঘটনার ভিতরের ঘটনায়।

যদি সেটাই মতলব হয়, যদি সত্যি-সত্যিই দীপঙ্করের কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে ওঠে গার্গী—এমনকী তার শরীরও, তাহলে যার সংস্পর্শে সঞ্জীবিত হতে চায় তাকে নিয়ে খুব সহজে অন্য কোথাও চলে যেতে পারত দীপঙ্কর। ও বাড়িতে কেন! দীপঙ্করের জানা উচিত বাড়িটা তার স্ত্রী গার্গীরও, ওখানে প্রতিটি জিনিস গার্গীর নিজের হাতে সাজানো, ওখানে কে আসবে না আসবে সে-সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার দীপঙ্করের একার নয়, গার্গীরও। এভাবে তাকে অপমান করার সাহস কী করে পেল দীপঙ্কর!

এতক্ষণের মানসিক টানাপড়েন হঠাৎই যেন শারীরিক হয়ে উঠতে চাইছে। দৃষ্টি বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠায় দুই আঙুলে প্রথমে বাঁ চোখ, তারপর ডান চোখ মুছে নিল গার্গী। তাতেও স্বস্তি না হওয়ায় রুমাল খুঁজল। একটা চিৎকার থমকে আছে ভিতরে, যেন তারই চাপে কুঁকড়ে উঠছে হাতের আঙুলগুলো; মাথার পিছন থেকে শুরু হয়ে ঘাড় বেয়ে মেরুদণ্ডের দিকে

নেমে যাচ্ছে অসহায়তার জ্বালা।

ঠোঁটে দাঁত চেপে সেই মুহূর্তের সমস্ত অস্বস্তি ও অসহিষ্ণুতা সহ্য করতে করতে গার্গী লক্ষ করল জ্যাম থেকে বেরিয়ে এসে গড়িয়াহাট পেরিয়ে যাচ্ছে বাস, কোনও সিটই খালি নেই আর, ওপরের রড ধরে দাঁড়িয়েও যাচ্ছে কেউ কেউ। কোলে ব্রিফকেস নিয়ে নীল ট্রাউজার্স ও সাদা বুশসার্ট-পরা সবল চেহারার একটা লোক এসে বসেছে তার পাশে, গায়ে ঘামের উগ্র গন্ধ; ব্রিফকেস খোলার ভঙ্গিতে গায়ে গায়ে হয়ে এল। ইচ্ছে করে, নাকি অসাবধানে? সংস্পর্শ বাঁচাতে নিজেকে সিঁটিয়ে নিল গার্গী। ফুটপাথ দিয়ে যারা যাচ্ছে তারা দ্রুতই হাঁটছে, ওরই মধ্যে একটি লোককে ছাতা খুলতে দেখে সন্দেহ হওয়ায় খুঁটিয়ে দেখল বাইরেটা। বৃষ্টিটা পড়ছে, প্রায় না-পড়ার ধরনে। কে জানে, রাতের দিকে হয়তো জোরে নামবে। শিখাকে বলে এসেছিল দেখা করতে যাচ্ছে দীপঙ্করের সঙ্গে, মাঝখানে প্রায় দু ঘণ্টা কেটে গেল। শিখা হয়তো জিজ্ঞেস করবে না কিছু, কিন্তু আর কেউ যদি জিজ্ঞেস করে— প্রমোদ কিংবা সুবর্ণা, বিশেষত দীপ্র, কী বলবে সে?

প্রশ্নটা দাঁড়াল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভাবল, কাল দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা হলে সে কী বলবে? যে-অবস্থায় তাকে রেখে গেল লোকটা, তার পরেও কি তার সঙ্গে দেখা করা উচিত? যদি না করে, এড়িয়ে যায়, দীপ্রকে কী বলবে?

সমস্যা সেখানেই। দীপ্র কখন কী প্রশ্ন করবে, তার উত্তরই বা কী হবে, সব সময় ভেবে উঠতে পারে না তা। এখনও পাঁচ হয়নি, কিন্তু ছেলের হাবভাব দেখে বা মাঝেমধ্যের কথা বা প্রশ্ন শুনে যত দিন যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে বয়সের তুলনায় ওর মানসিকতা কেমন যেন বেমানান; চুপচাপ থাকতে থাকতেই এমন বেয়াড়া সব প্রশ্ন করে যার জবাব দিতে গিয়ে পড়তে হয় দ্বিধায়, বিরক্তিও এসে যায় মাঝে মাঝে। তখন মনে হয় ওর শৈশব নেই; অজ্ঞাত কারণে ও যেন ওর বয়সের পক্ষে স্বাভাবিক আগ্রহ, প্রবণতা, প্রশ্ন ভুলে কৌতূহলী হয়ে পড়েছে বড়দের জগৎ সম্পর্কে।

বেশিদিনের কথা নয়। দীপঙ্কর কাকে তুলে নিয়ে অফিসে যাবে, বেরুবে অন্যদিনের চেয়ে তাড়াতাড়ি। স্বামীর বেরুবার জোগাড় করতে গিয়ে ছেলেকে তৈরি করতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। এরপর দীপ্রকে পৌঁছুবার জন্যে ট্যাক্সি না ধরলে দেরি হয়ে যাবে স্কুলের। যত তাড়াতাড়ি পারে নিজেও তৈরি হয়ে নিল গার্গী।

তবু আশঙ্কা যায়নি। গার্গী লক্ষ করল দেরি হয়ে গেছে ভেবে দীপ্রও বেশ উৎকণ্ঠ। ট্যাক্সিতে উঠে ঘড়ি দেখে ছেলেকে আশ্বস্ত করার জন্যে বলল, 'মনে হচ্ছে দেরি হবে না। যদি স্কুল বসে যায় আমি তোমার আন্টিকে গিয়ে বলব।'

দীপ্র বলল, 'তাহলে আন্টি তোমাকেও বকবে।'

'না। বুঝিয়ে বললে বকবেন কেন।' ছেলেকে নির্ভয় করতে চাইল গার্গী, 'আন্টিরাও তো আমাদের মতো। বাড়িঘর সামলে আসেন। তাঁদের বুঝি কখনও দেরি হয় না!'

দীপ্র চুপ করে থাকল। অন্য কিছু ভাবছে। খানিক দূর এসে বলল, 'শান্তনু বোধহয় আজও আসবে না—'

'কেন! কাল আসেনি বুঝি?'

দীপ্র মাথা নাড়ল।

'জ্বরটর হয়েছে বোধহয়। থাকেও তো দূরে।'

বসবার জায়গায় কোনওরকমে পাছা ছুঁইয়ে সামনের সিটের পিছনটা দু হাতে আঁকড়ে আছে দীপ্র। ভঙ্গিতে অধৈর্য, যেন ট্যাক্সির সঙ্গে সঙ্গে ও-ও দৌড়চ্ছে। দৃষ্টি উদগ্রীব। খানিক ওইভাবে বসে থেকে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'মা, মা-রা কখনও খারাপ হয়?'

প্রশ্নটা ঠিকঠাক শুনলেও অর্থ বোধগম্য হল না গার্গীর। অবাক, কিছুটা ধমকের গলায় বলল, 'কে তোমাকে বলে এসব কথা!'

ভ্যাবাচাকা খেয়ে পাশ ঘুরে মা-কে দেখল দীপ্র।

'শান্তনু বলছিল ওর মা খারাপ।'

'ছিঃ, দীপ্র! এইসব কথা বলো তোমরা!'

'আমরা বলিনি। শান্তনুর বাবা ওকে বলেছে।'

নিজের মধ্যে থেমে এল গার্গী। মুহূর্ত পরে জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেছে?'

'বললাম তো! খারাপ!' দীপ্র বলল, 'ওর মা কোথায় চলে গেছে! আর স্কুলে আসে না।'

গীতশ্রী। কয়েকবার দেখা হওয়ায় আগেকার অপরিচয় আর নেই। তাহলেও অনেক দিন আগে দেখা একটা উদভ্রান্তির দৃশ্য মনে পড়ে গেল গার্গীর। কপালে সিঁদুরের টিপ ছিতরানো, কাঁধের ওপর বিসদৃশভাবে বেরিয়ে আছে ব্রা-র স্ট্র্যাপ। ছুটে আসার কারণে সমতা ছিল না নিঃশ্বাসের ওঠা নামায়। দৃশ্যটা চোখে রেখেই জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ও স্কুলে আসে কার সঙ্গে?'

'ওর কাকার সঙ্গে!' দীপ্র বলল, 'কাল আসেনি।'

ছেলের কাঁধে হাত রেখে ওকে নিজের কাছে টেনে নিল গার্গী। বস্তুত, এক ধরনের আবেগে পর্যুদস্ত লাগছিল নিজেকে। বলল, 'বোকা! মা কখনও খারাপ হয়! এরপর তো আমাকেও খারাপ বলবি!'

'না, তুমি ভাল।' দীপ্র হঠাৎ গার্গীর আঁচল চেপে ধরল। ওর চোখে চোখ রেখে বলল, 'তোমাকে আমার খুব ভাল লাগে।'

ঘটনাটা নিয়ে এর পরেও ভেবেছে গার্গী। হদিশ পায়নি। তখন ভেবেছিল কে কোথায় কোন জটিলতার মধ্যে দিয়ে হাঁটছে কে বলবে! কী করেছিল গীতশ্রী, কেনই বা সে চলে গেল কোথায়, কেন শান্তনুর বাবা ওইটুকু ছেলেকে বলল অমন সর্বনেশে কথা! কোন ধরনের সম্পর্ক ছিল ওদের! সত্যিই কি আছে এমন কোনও সম্পর্ক যা নিভাঁজ স্বামী-স্ত্রীরই, সেই জন্যেই অভিন্ন, একাত্ম! নাকি সম্পর্কজনিত সংস্কারের আড়ালে যে যার মতো করে হয়ে ওঠে ব্যক্তিগত, কেউ কেউ নিঃসম্পর্কিতও।

সন্দেহই জড়িয়ে ফেলে আরও বেশি সন্দেহে। ভুলে-যাওয়া সাধারণ ঘটনাও ভিতর খুলে দেখায়।

মনে পড়ল, অফিস থেকে ছুটি নিয়ে সে তখন সারাক্ষণ আগলে থাকে দীপ্রকে; আর কোনও কাজ নেই, সুতরাং তাড়াও নেই—ছেলেকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে একদিন অলস ভঙ্গিতে হাঁটছে, পাশে পাশে এগিয়ে এল গীতশ্রী। এখন স্কুল থেকে কিছুটা দূরে দোতলা বাড়ির বারান্দার জটলায় গিয়ে বসবে। অপেক্ষা করবে স্কুল ছুটি না হওয়া পর্যন্ত।

গীতশ্রীই টেনে নিয়ে গিয়েছিল তাকে। কিন্তু নিজে বসল না বেশিক্ষণ। মিনিট পনেরো কুড়ি পরে তাড়া দেখিয়ে বলল, 'আমাকে একটু যেতে হবে, ভাই। আপনি তো আছেন এখানে? ছুটি হওয়ার আগেই ফিরব।'

'কোথায় যাবেন?'

গীতশ্রী ইতস্তত করল। বিরক্ত না হয়েও তার দিকে এমন চাউনি মেলে ধরল যেন এ প্রশ্নটা না করলেই ভাল হত। তারপর বলল, 'চাকরি করতে—'

'চাকরি!'

দৃষ্টিতে তারতম্য নেই। ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটতে গিয়েও ফুটল না। বুকের ওপর শাড়ির আঁচল ঠিক করতে করতে গীতশ্রী বলল, 'কয়েকজন অবাঙালিকে ল্যাংগুয়েজ শেখাই। বাংলা।'

'কোথায়?'

'সে আছে। যদি চান একদিন আপনাকেও নিয়ে যাব।' গীতশ্রী ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটু বা অপ্রতিভ। বাস রাস্তার দিকে তাকিয়ে অন্যরকম গলায় বলল, 'আরও অনেকেই শেখায়। সংসারের জন্যে, নিজের জন্যে কার না দরকার টাকার! এই স্কুলেই কত দিতে হয় বলুন তো!'

স্বগতোক্তির মতো; ওর চেপে চেপে বলার ধরনে গার্গী অনুমান করল গীতশ্রী বানিয়ে বলছে, অন্তত যা বলছে তার পুরোটা সত্যি নয়। সম্ভবত আজও এড়িয়ে গেল।

যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকেই ওকে অনুসরণ করে গার্গী দেখল, বাস রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকে পৌঁছে একটা ছাই রঙের ফিয়াটে উঠল গীতশ্রী। সঙ্গে সঙ্গে উধাও হল গাড়িটা। তখন খেয়াল হল, ফিয়াটটা ওখানে এসে পার্ক করবার পর থেকেই যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল গীতশ্রী। গাড়িটা কি ওর নিজের? না, তা হতে পারে না। ছেলেকে নিয়ে ও আসে সোদপুর থেকে। ট্রেনে। তা ছাড়া, নিজের গাড়ি হলে অত দূরেই বা পার্ক করবে কেন।

বাসটা কি আবার আটকে পড়েছে জ্যামে? হয়তো। চারপাশে বিভিন্ন হর্নের শব্দ এবং যাত্রীদের কথাবার্তা হঠাৎ সরব হয়ে ওঠায় চটকা ভেঙে জানলা দিয়ে দেখবার চেষ্টা করল গার্গী। অন্য সব গাড়ির গতি অবরোধ করে আড়াআড়ি আগুপিছু করছে একটা ডবলডেকার, এগিয়ে এলে সামনেটাই দেখা যাচ্ছে শুধু। সম্ভবত গতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি পাশের রাস্তা থেকে বাঁক নেবার সময়। জট না ছাড়া পর্যন্ত তাকিয়েই থাকল সে। আচ্ছন্ন ছিল; আচ্ছন্নই বোধ করল।

একটা গোটা স্মৃতি পেরিয়ে আসতে বেশিক্ষণ লাগে না। কিন্তু, অন্যমনস্কতা থেকে আবার নিজের মধ্যে ফিরে আসতে আসতে গার্গীর মনে হল সে ঢুকে পড়েছিল অদ্ভুত সময়-শূন্যতায়—যেখানে চেতনা থাকলেও থাকে না অনুভূতি, দেখা ও অদেখায় মেশা রহস্য বুঝতে দেয় না কোন সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে কতটা দূরত্বে! কী আছে সেই দূরত্বের শেষে! এমনকী দীপঙ্করকে জড়িয়ে যে-জ্বালা এতক্ষণ অস্থির ও অবিন্যস্ত করে রেখেছিল তাকে, তার রেশ থেকে গেলেও বুঝতে পারছে না এর পর কী করবে সে, কী করা উচিত। যদি এমন হয় যে, যা ঘটেছে বলে জানালেন সুরমা তার সবটাই দীপঙ্করের আড়ালের খেলা নয়, বস্তুত সে ক্লান্ত, বিরক্ত, নিরাসক্ত হয়ে উঠেছে স্ত্রীর প্রতি—পরোক্ষে এ তার প্রত্যাখ্যানেরই ভূমিকা, তাহলে, সেও কি প্রত্যাখ্যান করবে দীপঙ্করকে?

বিষয়টা ভাবতে গিয়ে এলোমেলো হয়ে উঠল গার্গী। তাহলে আমি দাঁড়াব কোথায়! ভাবল, দীপ্ররই বা কী হবে?

বাড়ির কাছাকাছি বাস স্টপে নেমে মন্থর পায়ে হাঁটতে শুরু করল গার্গী। কিছু অপমান, কিছু বা অভিমানে স্তব্ধ, ঝাঁ-ঝাঁ করছে মাথা। শরীরেও যেন জোর নেই কোনও। বৃষ্টি এখনও পড়ছে, বাস থেকে যতটা মনে হয়েছিল তার চেয়ে জোরে। মুখে, হাতে বৃষ্টির রেণু ভিজে স্পর্শ রাখলেও জোরে হাঁটার আগ্রহ বোধ করল না সে।

রাস্তার দুদিকে ঘন বসতি, তবু সন্ধে হতে না হতে কেমন যেন স্তব্ধ হয়ে পড়ে পাড়াটা। ঝিমুনো আলোয় লোকজন, গাড়ি কি রিকশা এতই কম চলাচল করে যে হাতে গোনা যায়। বৃষ্টির জন্যেই সম্ভবত এখন আরও বিরল। ছাতা মাথায় দুটি যুবক তাকে পাশ কাটিয়ে যাবার পর একা হয়ে পড়ল সে। পিছনে তাকিয়ে দেখল ট্রাম রাস্তা থেকে একটা ট্যাক্সি বাঁক ঘুরল এদিকে, তারপর আবার ডানদিকে। পিছনের সিটে খুব ঘন হয়ে বসে আছে দুটি যুবক-যুবতী; ওই রাস্তা থেকেই বেরিয়ে এল ধুতি পাঞ্জাবি এবং চোখে চশমা পরা এক সাইকেল আরোহী। টিভি-তে কোনও সিরিয়াল চলছে বোধ হয়, একটি গম্ভীর পুরুষ কণ্ঠের সংলাপ ভেসে এল কানে, স্পষ্ট হল না কথাগুলো। বাড়িতে টিভি নেই, মনে পড়ল অনেক দিন সে টিভি দেখেনি।

টুকরো টুকরো এইসব দৃশ্য ও শব্দের ভিতর দিয়ে হেঁটে এসে বাঁদিকের সরু গলিতে ঢোকবার আগে সামান্য সচেতন হল গার্গী। পাঁচিল-ঘেরা পুরনো বাড়ির কম্পাউন্ডের ঝাউগাছের ছায়া পড়ে যে-জায়গাটা প্রায়ই অন্ধকার হয়ে থাকে, সেখানে পার্ক করা আছে একটা অ্যামবাসাডর। কালোই হবে। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে ভিজে জল গড়াতে শুরু করেছে গা দিয়ে। দেখে মনে হল চেনা। ইন্দ্রনাথের গাড়ি নয় তো? তাদের গলিতে পাশাপাশি দুটো গাড়ি যেতে পারে না। ইন্দ্র এলে এখানেই গাড়ি রাখে।

দরজা খুলে দিল শিখা। অনুমানে ভুল হয়নি। ছোট বসবার ঘরে শিখার ছেলেমেয়ে, প্রবাল আর পাখির সঙ্গে গল্প করছে ইন্দ্রনাথ। পাশের ইজিচেয়ারের চওড়া হাতলে চশমা পড়ে আছে একটা। নিশ্চিত বাবার। তার মানে প্রমোদও ছিলেন এখানে।

প্রথম কথাটা শিখাকেই জিজ্ঞেস করল।

'দীপ্র কেমন আছে, বউদি?' ·

'ভাল। জ্বরটা নেমেছে। মা ওকে খাইয়ে দিচ্ছেন।'

'রাস্তায় যা জ্যাম!' অপরাধবোধ থেকে একটা কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করল গার্গী। তারপর ইন্দ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ইন্দ্রদা কখন এলেন?'

'প্রায় ঘণ্টাখানেক। তুমি যে এখানে আছ জানতাম না। এসে শুনলাম।'

শিখা ভিতরে চলে গেল। সেও যাবে। অফিস থেকে ফিরে ছেলেটাকে মুখ দেখিয়েছিল মাত্র, দীপ্রর অভিমান হতে পারে। সাড়ে আটটা বাজে প্রায়। শিখাকে বলে গেলেও দেরি দেখে কে কী ভাবছে কে জানে।

ভিতরে যাবার আগে তবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল গার্গী। ইন্দ্রর সঙ্গে চোখাচোখি হতে দৃষ্টি নামিয়ে নিল।

ইন্দ্র হঠাৎ বলল, 'জ্বর কি শুধু ছেলের? নাকি তোমার?'

'কেন।'

'মুখ দেখে মনে হচ্ছে। ভিজেও এসেছ দেখছি!'

ইন্দ্রর দৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছে তাকে। নিজের মধ্যে সামান্য কেঁপে উঠল গার্গী। তারপর এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'আজ আবার বৃষ্টি নামবে ভাবিনি। আপনি বসুন। আমি ছেলেটাকে একটু দেখে আসি।'

ভিতরে যাবার আগে প্রমোদের চশমাটা তুলে নিল গার্গী।

এমন হয় কী করে! ঘণ্টা দুয়েক আগে দীপঙ্করের সঙ্গে দেখা করবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেরি হয়ে যাবার আশঙ্কা থেকে ভেবেছিল তার তাড়া আছে ভেবে কেউই এগিয়ে আসবে না লিফট দিতে, নিজের ব্যবস্থা নিজেকেই করতে হবে। আসলে তখন মনে পড়েছিল ইন্দ্রনাথকে। অকারণে নয়।

গতকাল দীপঙ্কর যখন তাকে ওয়েদার ফোরকাস্টের কথা তুলে আরও বৃষ্টি নামবে বলে ভয় দেখাল, বলল তাড়াতাড়ি পার্ক সার্কাসে ফিরে যেতে, তখন লোকজন কমে আসা অফিসের জানলা দিয়ে নীচে তাকিয়ে গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না পার্ক সার্কাসেই বা ফিরবে কীভাবে। জল থইথই করছে, ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে। প্রায় হাঁটুজল ঠেলে ধীরে ধীরে এগোচ্ছে রিকশা, মোটর, ট্যাক্সি।

এখানে এমন হলে আশপাশের রাস্তাগুলোতেও জল জমবে, ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তাহলে কি জল ঠেঙিয়ে যেতে হবে তাকে! নন্দিতা থাকলে ওর গাড়িতে একটু এগিয়ে দেবার কথা বলতে পারত। কিন্তু, সেও যে কখন চলে গেল, খেয়াল করেনি। অগত্যা হেঁটেই যাবে বলে মনে মনে তৈরি হচ্ছিল গার্গী, সেই সময় জগদীশ বেয়ারা এসে বলল, 'দিদি, এক সাহেব দেখা করতে এসেছে আপনার সঙ্গে—'

'কোথায়?'

'রিসেপশন থেকে বলল। আমি বলেছি আপনি আছেন। ওয়েট করছেন।'

এই বৃষ্টিতে কে আবার এল তার খোঁজে। কোনও মুখই মনে পড়ল না। বস্তুত সে চেনেই বা ক'জনকে!

তৈরি হয়ে নীচে নেমে এসে দেখল, ইন্দ্রনাথ। রাস্তার দিকে মুখ করে জল দেখছে।

'আ-রে, আপনি!'

'অবাক হচ্ছ তো!' ইন্দ্র বলল, 'দ্যাখো, আমার হাঞ্চটা লেগে গেল কেমন! ফুড করপোরেশনে এসেছিলাম, ফেরার সময় তোমার অফিসটা চোখে পড়ল। ভাবলাম খোঁজ করে দেখি আছ কি না। বাড়ি ফিরবে তো?'

এমনিতে আসবার লোক নয়, গার্গী বুঝল, জল দেখেই এসেছে ইন্দ্র। ফেরার দুর্ভাবনা নেমে যেতে সহাস্য হল সে।

'আজ আমার বাড়ি যাওয়া নেই।'

'কেন!'

'কর্তা ফোন করেছিল। বলল ওদিকে খুব জল, আজ পার্ক সার্কাসে থেকে যেতে।'

'তাহলে তো আরও ভাল। আমি ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের কাছে যাব।'

জমা জল দৈর্ঘ্য বাড়ায় না রাস্তার। গাড়িতে ইন্দ্রর পাশে বসে যেতে না যেতেই ফুরিয়ে গেল যাওয়া। এর মধ্যে শুধু অশোকার খবরটুকুই নিতে পেরেছিল।

ইন্দ্র বলল, 'ও আর কেমন থাকবে! ভাষাটা বুঝলে বুঝতাম কেমন আছে। তবে টিকে আছে এখনও। তুমি লোক পেলে?'

'না। কী টেনসন যে যাচ্ছে।' এরপর মনের কথাটা বলে ফেলল গার্গী, 'এবার আমিও পড়ব। হঠাৎ-হঠাৎ এত টায়ার্ড লাগে।'

জলের রাস্তা পেরিয়ে এসে স্পিড বাড়িয়ে দিল ইন্দ্র।

'এই বয়সে টায়ার্ড লাগবে কেন?'

'জানি না,' গার্গী বলতে যাচ্ছিল, সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

পরের কথাটা মনে পড়ে যাওয়ায় চুপ করে গেল। একটু আগেই অশোকাকে নিয়ে আলোচনা করেছে তারা।

'ব্লাড-সুগার চেক করিয়েছ কখনও? তোমার বাবারও তো আছে!'

গার্গী দেখছিল রাস্তা কমে আসছে। সামনের কাচে চাপা শব্দে হাতুড়ি পিটছে ওয়াইপার। ইন্দ্র শর্টকাট চেনে, জানে কোন রাস্তায় গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুবে।

'আমার চেনা ভাল প্যাথোলজিস্ট আছে। ডক্টর ব্যানার্জি। দরকার হলে বোলো, নিয়ে যাব।'

বাড়ি পর্যন্ত আসেনি ইন্দ্র। ঝাউগাছের কাছে তাকে নামিয়ে দিয়ে বলল, 'কাউকে বোলো না আবার। জানতে পারলে শিখা ভাববে এতটা এসেও এলাম না।'

নিষেধ করবার দরকার ছিল না। গার্গীর ভয় অন্য। দীপ্র জানলে কথায় কথায় দীপঙ্করও জেনে যেত হয়তো। তা ছাড়া, ইন্দ্র তার কথা ভেবেই এসেছিল; একান্তের এই বোধটুকু সে ভাগ করবে কেন।

দীপ্র ভালই আছে। গায়ে হাত দিয়ে তাপের পরিবর্তে ঘামের ছোঁয়া লাগল। তবে চোখের ঘোলাটে ভাব যায়নি।

ওকে বাথরুম থেকে ঘুরিয়ে এনে বিছানায় শুইয়ে দিল গার্গী। তেমন জোরে নয়। পরে মনে হল, শব্দটা কি সত্যিই আছে, নাকি উঠে আসছে তার নিজেরই ভিতর থেকে।

'তুমি কি আমাদের বাড়িতে গিয়েছিলে, মা?' দীপ্র হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বাবার কাছে?'

'কে বলল তোমাকে?'

'কেউ বলেনি। মনে হল।'

গার্গী একটুক্ষণ চুপ করে থাকল। বাড়ি ফেরার পর কেউই কোনও প্রশ্ন করেনি তাকে। প্রমোদের শরীর ভাল নেই, শুয়ে আছেন পাশের ঘরে। সুমিত্রা পরীক্ষার খাতা নিয়ে ব্যস্ত। সুবর্ণা বোধহয় ইন্দ্রর কাছে গিয়ে বসেছেন। নিজের পরিপার্শ্ব নিয়ে ভাবতে ভাবতে উত্তরটা পেয়ে গেল গার্গী। নুয়ে এসে চুমু খেল ছেলের কপালে।

'আমি অন্য জায়গায় গিয়েছিলাম। বাড়ি গেলে তোমাকে নিয়ে যেতাম না!'

হাত বাড়িয়ে কপালের ওপর গার্গীর হাতটা চেপে ধরল দীপ্র। এবং ঘুমিয়ে পড়ল।

গার্গী ফিরে এল বসবার ঘরে। অশোকার চিকিৎসা নিয়ে সুবর্ণার সঙ্গে কথা বলছিল ইন্দ্র। একটু পরেই বলল, 'আজ উঠছি। আর একদিন আসব।'

'বৃষ্টি পড়ছে তো!' জানলা দিয়ে বাইরেটা দেখে নিল গার্গী। তারপর বলল, 'চলুন, ছাতা নিয়ে এগিয়ে দিচ্ছি গাড়ি পর্যন্ত।'

'তুমি আবার ভিজবে কেন!'

জবাব না দিয়ে ব্যস্ত ভঙ্গিতে ঢুকে নিজের ছাতাটা নিয়ে ফিরে এল গার্গী।

'চলুন।'

গলিতে লোকজন নেই। এক পশলা হয়ে যাবার পর থিতিয়ে এসেছে বৃষ্টিও। তবে হাওয়ার জোর বাড়ায় ঝাপটা দিচ্ছে মাঝে মাঝে।

ছোট ছাতার নীচে পাশাপাশি কিছুটা এগিয়ে এসে ইন্দ্র ঠাট্টা করল, 'দুজনেই সুজন হওয়ার চেয়ে একজন দুর্জন হওয়া ভাল। এভাবে দুজনেই ভিজছি। তুমি বরং ছাতাটা নাও।'

'আমি তো ভিজেই এসেছি। দেখলেন না।' ছাতাটা ইন্দ্রর মাথায় বাড়িয়ে ধরতে ওর গায়ে গায়ে সরে এসে গার্গী বলল, 'আসলে আজ আমার বাড়িতে থাকতে ইচ্ছে করছে না। কিছুই ভাল লাগছে না।'

পাশে তাকিয়ে ওর মুখ দেখবার চেষ্টা করল ইন্দ্র। বাদামি গালে লেপটে আছে কয়েকটা চুল; ভিজে না থাকলে হাওয়ায় উড়ত। আবছায়ায় চকচক করছে কানের মুক্তো।

'তোমার কী হয়েছে বলো তো! গোড়া থেকেই থমথমে দেখছি!'

'কী আর হবে!' নিজেকে সংযত করে নিয়ে গার্গী বলল, 'হলে বলতাম।'

দুজনেই চুপ করে গেল। নিঃশব্দে হেঁটে এল ঝাউগাছের অন্ধকার পর্যন্ত।

গাড়ির দরজা খুলে একটু দাঁড়াল ইন্দ্র। তারপর সোজাসুজি গার্গীর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাল বললে টায়ার্ড লাগছে, আজ বলছ ভাল লাগছে না। দেখে বুঝতে পারছি শরীরও ভাল নেই! কী হয়েছে বলো তো?'

ইন্দ্রর প্রশ্নে সহানুভূতি ছাড়াও কিছু ছিল হয়তো, যা মুহূর্তে অবাধ করে দিল গার্গীকে। এই নির্জনতা ও বৃষ্টির মধ্যে ইন্দ্রনাথের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে নিজেকে ভাঙতে ভাঙতে সে বলল, 'ইন্দ্রদা, আপনি বার বার আমার শরীরের কথা জিজ্ঞেস করেন কেন! যার জিজ্ঞেস করার সে তো করে না!'

হাতে ছাতা থাকলেও অরক্ষিত হয়ে পড়েছে গার্গী। মুখ ভেসে যাচ্ছে অস্বচ্ছ আলো আর বৃষ্টিতে। ওই চোখে জল খুঁজে পেল না ইন্দ্র। এখন নিজেকেও অসহায় লাগছে।

ক' মুহূর্ত অপেক্ষা করল গার্গী। তারপর বলল, 'আপনার দেরি হয়ে যাচ্ছে। আপনি যান। আমার কথা আমিই ভাবব।'

আর দাঁড়াল না। ইন্দ্র দেখল, এলোমেলো কিন্তু দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে গার্গী। বৃষ্টিভেজা নির্জন রাস্তা, ততোধিক নির্জন তার হাঁটা। হঠাৎই আড়াল হয়ে গেল গলির বাঁকে।

৪

জীবনযাপনের ধারাবাহিকতায় ছেদ নেই কোনও। বর্ষা গিয়ে পুজোর মরসুম এল এবং চলে গেল। তেমন জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়তে না পড়তে শীতও শেষ হয়ে আসছে। বাতাসে ঠাণ্ডার আমেজ থাকলেও নিষিদ্ধ আকাশে ভুলে ঢুকে পড়ার মতো চকিত চক্কর দিয়ে ফিরে যায় বসন্তের হাওয়া। কৈশোর ও যৌবনে একরকম ভাবে এই পরিবর্তনটা অনুভব করত গার্গী, বিশেষত যৌবনে, দীপঙ্করের সঙ্গে পরিচয়ের গোড়ার দিকে। এই একত্রিশে এখনও সে পরিপূর্ণ যুবতী, তবু কী যেন হয়ে যায় তার, কী যেন হতে থাকে—রোদ বৃষ্টি হাওয়ায়

খুঁজে পায় না কোনও তারতম্য।

জানুয়ারিতে ওপরের গ্রেডে প্রোমোশন পেয়ে প্রায় সাড়ে তিনশ টাকা মাইনে বেড়ে গেল তার। ঘরে ডেকে প্রোমোশনের চিঠিটা তার হাতে দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে সোমেশ্বর বলল, 'এটাই যেন শেষ না হয়। কমপিউটার বসবে খুব শিগগিরি। অঙ্কে আপনার ব্রেন খুব শার্প, ভাবছি ফার্স্ট লিস্টে আপনাকে রেকমেন্ড করব।'

কথাগুলো অদ্ভুত শোনাল কানে। হাসিও পেল। সোমেশ্বরকে বলতে ইচ্ছে করছিল, তা-ই যদি হবে, তাহলে সব হিসেব এমন গণ্ডগোল হয়ে গেল কেন!

গার্গী নিজেও ভেবে পায় না কেন! জীবন বদলে যাবে, এইভাবেই যাবে—বদলে যাওয়ার স্বয়ংক্রিয়তায় তার অপমান থাকবে, অভিমান থাকবে, কিন্তু ভূমিকা থাকবে না কোনও, সে কি ভেবেছিল কোনও দিন!

ভাবেনি। অনুমানও করতে পারেনি। আর ভাবেনি বলেই ঘটনার গতি স্তব্ধতায় জড়িয়ে ফেলল তাকে।

দূরত্ব বাড়ছিল ক্রমশ। জোর খাটিয়ে আপসে পৌঁছুবার চেষ্টায় গার্গী দেখছিল দীপঙ্করের গা নেই তেমন। ভাড়া-করা একটা আস্তানা আছে বলে কিছুটা সময় সেখানে কাটানো, প্রায়ই রাতে বাড়ি না ফেরা, ছেলেটা আছে বলে তার সামনে পিতৃ-পরিচয়ের মোড়ক ঝুলিয়ে রাখা এবং গার্গীর প্রশ্নে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে থাকা—এভাবেই চলছিল দীপঙ্কর। সন্ধের অন্ধকার যেমন আস্তে আস্তে শুষে নেয় বিকেলের আলো, তেমনি, গার্গী অনুভব করছিল তার নিজের ভিতরেও কী একটা ম্লান হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। উপমাটা তার, নিজেরই; নিজেই বুঝতে পারে নতুনত্ব নেই কোনও। যতই টানাপড়েনের মধ্যে থাকুক, এতদিন দীপঙ্কর ছাড়া কিছুই ভাবেনি সে, দু হাতে পিছনে ঠেলেছে অন্য সব ভাবনা। দীর্ঘ দিনের উপেক্ষায় চারপাশের আর সব ভাবনাই ছেড়ে গেছে তাকে, নতুন করে ভাবতে পারে না কিছু।

সুরমা একদিন বেল দিলেন দরজায়। দেবেন, জানত, শুধু দিনক্ষণটিই জানত না গার্গী। ওঁকে যত্ন করে বসালেও আশঙ্কা গেল না।

এ-কথা সে-কথার পরে আসল কথাটা বলে ফেললেন সুরমা।

'তোমরা তো প্রায়ই থাকো না এখানে। শুধু শুধু এতগুলো টাকা ভাড়া গুনছ!'

গার্গী চুপ করে থাকল।

'দ্যাখো, আমাদের কাছে লুকিয়ে লাভ কি! কর্তা গিন্নি যে যার নিজের বাপের বাড়িতেই থাকছ আজকাল। তুমি কখনও আসো, কখনও আসো না, আর উনি—।' সুরমা থেমে গেলেন আচমকা। কথা গিলে বললেন, 'আমি তোমার অবস্থা বুঝি, মা। কিন্তু কী করবে! বাড়িটা ছেড়ে দিতে পারো কি না দ্যাখো।'

রিহার্সাল দেওয়া গলায় কথা বললেন সুরমা। ইচ্ছে করেই দু মাস বাড়িভাড়া ফেলে রেখেছে দীপঙ্কর। সে-কথাটা তুললেন না আর।

সুরমা চলে যাবার পর একার অভ্যাসে ভাবতে বসল গার্গী। দীপঙ্কর চেয়েছিল বলেই এখানে আসা। না হলে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি ছেড়ে যেদিন চলে এসেছিল দীপ্রকে নিয়ে, সেদিন তো ভেবেইছিল, যদি দীপঙ্কর তাকে বুঝতে না পারে, জোর করে ফিরে যেতে, তাহলে যত দিন পারে বাবা-মা-র কাছেই পড়ে থাকবে মুখ গুঁজে। দীপঙ্কর তখন অন্যরকম ছিল বলেই আরও এগিয়ে ভাবেনি। ভাবতেও হয়নি। আলাদা বাড়ি নিয়ে দীপঙ্কর বুঝিয়ে

দিয়েছিল গার্গীকেই তার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন কি আছে আর! তাহলে বাড়িটা রেখেই বা লাভ কি!

এসব ভেবে দীপঙ্করের জন্যে ছোট্ট একটা চিঠি লিখে রাখল সে। সম্বোধন ও স্বাক্ষর ছাড়া লেখা সেই চিঠিতে সুরমা যে বাড়ি ছেড়ে দেবার কথা বলেছেন সে-কথাও লিখল।

দিন তিনেক পরে অফিসে ফোন করল দীপঙ্কর। গার্গী 'হ্যালো' বলবার পর ভেসে এল ওর নিরুত্তাপ গলা।

'আমি বলছি—'

'হুঁ।'

'চিঠিটা পেলাম। আমার মনে হয় মিসেস নন্দী ঠিকই বলেছেন। বাড়ি ছেড়ে দেওয়াই উচিত। তুমি কী বলো?'

'আমি কী বলব!' গার্গী কাঠ হয়ে গেল, 'বাড়ি আমি নিইনি। রাখলে রাখবে, ছাড়লে ছাড়বে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল দীপঙ্কর। তারপর বলল, 'তাহলে ভ্যাকেট করে দেওয়াই ভাল। আমি বাড়িওয়ালার সঙ্গে কথা বলব। তুমি তোমার আর দীপ্রর যা আছে নিয়ে এসো—বাকি সবই তো ভাড়া করা—'

হ্যাঁ, না, কিছুই বলল না গার্গী। রিসিভার নামিয়ে রাখার আগে শুধু ভাবল, সে শক্তই থেকেছে। দীপঙ্কর হয়তো অপেক্ষায় ছিল, অজুহাত পাচ্ছিল না। সুযোগটা করে দিল।

মাসখানেক পরে একদিন বিকেলে অফিস থেকে বাড়ি ফিরে ফরমান পেয়ে গেল গার্গী। বিচ্ছেদ চেয়ে কোর্টে আবেদন করেছে দীপঙ্কর। কারণ স্বচ্ছ। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে-সম্পর্ক থাকা উচিত তা আর নেই তাদের মধ্যে। বেপরোয়া ও অবিন্যস্ত হয়ে উঠে গার্গী তাকে এমনই মানসিক বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলেছে যা তার পক্ষে সহ্য করা কঠিন। তার তরফে নানাভাবে আপস করার চেষ্টায় কাজ হয়নি। এর পিছনে রয়েছে তার তথাকথিত স্ত্রীর বাপ-মা এবং আরও একজন পুরুষের প্ররোচনা, যার সঙ্গে গার্গীর সম্পর্ক আর যা-ই হোক, বৈধ নয়। এই অবস্থায় বিচ্ছেদ প্রার্থনা করা ছাড়া তার আর উপায় নেই।

আইনের ভাষা। খুঁটিয়ে পড়ল সে। পড়তে পড়তেই একটা কাঠিন্য এসে গেল শরীরে। চোখে সামান্য জ্বালা, শরীরে সামান্য আলোড়ন ছাড়া নতুন কোনও বোধে আক্রান্ত হল না। সাত বছরের বিবাহিত জীবন তাকে যত না দিয়েছে, নিয়েছে তার চেয়ে বেশি। নতুন আর কী নেবে! মনে পড়ল তমসার কথা; দাদা নিজেরটা নিজেই বুঝে নেবে, একদিন বলেছিল ও। বুঝেই নিল। জীবন বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে কী আশ্চর্য ভাবে পাল্টে যায় কথারও অর্থ। এর পরেও হয়তো তমসা আসবে। জিজ্ঞেস করতে হবে ওকে।

একার জীবনে অভাব হয় না সময়ের। গার্গী এখন অনেকটা সময় কাটাতে পারে দীপ্রর সঙ্গে।

তবু, বুঝতে পারে সাত বছরের অভ্যস্ত জীবনের সংস্পর্শ ঘুরছে তার সঙ্গে সঙ্গে। এখনকার অপমান ও অসহায়তার বোধ থেকে কিছুতেই পৌঁছুতে পারে না সেই অনুভবে যা তাকে বুঝিয়ে দেয় সত্যিই সে এমন কিছু করেছিল যা এইভাবে ভেঙে দিতে পারে সম্পর্কটাকে। এটুকু বুঝতে পারে, তাকে ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেবার পরই অভিযোগগুলো সাজিয়েছে দীপঙ্কর, হয়তো উকিলের পরামর্শে। কিন্তু, সিদ্ধান্তটা তো ওরই! কেন এমন

সিদ্ধান্ত নিল দীপঙ্কর। সুখে অভ্যস্ত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে নিজের পায়ে নিজের মতো করে দাঁড়ানোর ক্লেশ সহ্য করতে না পেরে। নাকি স্ত্রীর মান রাখতে গিয়ে বড্ড বেশি দাম দিতে হচ্ছিল তাকে। গার্গী কি পুরনো হয়ে গিয়েছিল তার কাছে। নাকি এসব কিছুই নয়, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিকতার মধ্যে কোনও দিনই সেই জোরটা খুঁজে পায়নি দীপঙ্কর, যা টিকিয়ে রাখে সম্পর্ক। তাহলে কি দীপঙ্করকে ঠিকভাবে চিনতে পারেনি সে, সম্পর্কের ভিতরের মোহটাকেই সত্য ভেবে আঁকড়ে ধরেছিল এত দিন।

হয়তো। তার পরের ভাবনাগুলোয় অস্বস্তি বেড়ে ওঠে আরও। ক্লিন্ন লাগে নিজেকে, নিজের শরীরটাকে। এ কেমন বিভ্রম। তাহলে কী দীপ্রও শুধুই মোহ।

না। তা হবে কেন। এলোমেলো নিঃশ্বাস ও অন্যমনস্কতার ভিতর থেকে ক্রমশ নিজেকে ফিরে পেতে পেতে গার্গী ভাবে, তার সত্য, তার অনুভব, তার আকাঙ্ক্ষা একান্ত ভাবেই নিজের; সেখানে ভুল নেই কোনও। দীপঙ্কর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার সিদ্ধান্তও সে নিজেই নেবে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে। দীপঙ্কর নিজের মতো বাঁচতে চায় বাঁচুক, সে বাধা দেবে কেন। নিজেকে আর দীপ্রকে নিয়ে তার যে-জীবন সেটা সে নিজেই সাজিয়ে নিতে পারবে।

সংকল্প চিনলেও অপমান যায় না। সংকল্পের জোরেই আরও একটু শুকিয়ে যায় সে। চেষ্টা করে স্বাভাবিক থাকতে।

পার্ক সার্কাসের বাড়ি থেকে একদিন সকালে জোর করে তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল ইন্দ্রনাথ। বিকেলে রিপোর্ট পেয়ে বলল, 'আগে আমার কথা গ্রাহ্য করনি তো? এখন বুঝছ কোথায় টেনে এনেছ নিজেকে।'

ইন্দ্রর উদ্বেগে ভান নেই কোনও। ওর মুখের দিকে তাকিয়ে মায়া চিনতে চিনতে উদাসীন হয়ে গেল গার্গী। বলল, 'রোগটা চলে গেছে, ইন্দ্রদা। রোগের জেরটাই ধরা পড়েছে রিপোর্টে। আমি একদমই ভাবছি না।'

'নিজেকে ঠকিয়ে লাভ কী, গার্গী?'

'ঠকাব কেন। যা সত্যি তা-ই বললাম।' ওকে আর বিব্রত করতে চাইল না গার্গী। সহজ গলায় বলল, 'ওষুধ খাই। সেরে যাবে নিশ্চয়ই। আপনি ভাববেন না।'

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে ইন্দ্র বলল, 'কিছুদিন নার্সিং হোমে থাকো না?'

'আমি!'

'হ্যাঁ।' ইন্দ্র জোর দিয়ে বলল, 'এতে অবাক হবার কী আছে। শরীরটা তোমার, এর ভালমন্দ তোমাকেই ভাবতে হবে—'

গার্গীর গলায় ঠাট্টা এসে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না।

খানিক ঘাড় তুলে মুখ ভাসিয়ে রাখল হাওয়ায়। তারপর বলল, 'এর চেয়ে যদি বলতেন কোনও মানসিক হাসপাতালে যেতে—অশোকাদির মতো—'

চেষ্টা সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরের কম্পন এড়াতে পারল না গার্গী। সে নিজেও জানে না ঠিক কী বলতে চেয়েছিল। শুধু অনুভব করল, একটা আবেগ আসছে, ঠিক কেন বুঝতে পারছে না। গলার কাছে এসে ছটফট করছে নিঃশ্বাস।

অনেক দিন পরে আজ ব্যস্ততা চলে গেছে ইন্দ্রর সময় থেকে। কাজ নেই, যাবার তাড়া নেই, ফেরারও না। কিংবা এতই বিচলিত যে গুলিয়ে ফেলেছে সব। রাস্তাও। গাড়ি নিয়ে তাই যত্রতত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে বেরুবার রাস্তা।

ওইভাবেই ভিক্টোরিয়ার পাশ দিয়ে রেড রোডে পৌঁছে বলল, 'গার্গী, হতাশ হয়ে, ভেঙে পড়ে লাভ কি! জীবনে সবই কি ঠিকঠাক চলে। সবাই সব কিছু পায় না—।' ইন্দ্র হঠাৎই থেমে গেল। আরও কিছুটা রাস্তা নিঃশব্দে এগিয়ে বলল, 'এসব কথা কাউকে বলতে ভালও লাগে না। সিনেমার ডায়লগের মতো শোনায়!'

পাশে তাকিয়ে ইন্দ্রকেই দেখল গার্গী। ইন্দ্র কী বলতে চেয়েছিল তাকে, কেনই বা থেমে গেল, এখন তার কাছে সবই অস্পষ্ট। একই অস্পষ্টতা নিজের মনেও। বহুদিনের পরিচিত, কিন্তু আজও সে জানে না এই মানুষটির সঙ্গে তার সম্পর্ক কী। মাঝে মাঝে প্রশ্ন জেগেছে মনে, প্রশ্ন থেকেই জেগেছে আরও একটু এগিয়ে যাবার ইচ্ছাও। দ্বিধাই এগোতে দেয়নি। পরে ভেবেছে, সে যেভাবে ভাবে, ইন্দ্রও কি সেইভাবে ভাবে তার সম্পর্কে? উত্তর পায়নি।

আজও উত্তর খুঁজল না গার্গী। শুধু নিজের পাশে ওর উপস্থিতি অনুভব করতে করতে ভাবল, জীবন হয়তো ঠিকঠাক চলে না। কিন্তু, ইন্দ্র ভেঙে না পড়লে আমিই বা ভাঙব কেন।

এর কিছুদিন পরে এক ছুটির বিকেলে দীপ্রকে নিয়ে বেরিয়ে পার্ক স্ট্রিটের কাছে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে রাস্তা পার হবার অপেক্ষা করছিল গার্গী। দুদিক থেকেই ছুটোছুটি করছে গাড়ি। ট্রাফিকের সিগন্যাল পেয়ে গাড়িগুলো থেমে যাবার পর জেব্রা ক্রশিং ধরে রাস্তা পেরোতে গিয়ে আচমকা থমকে দাঁড়াল সে। শক্ত করে আঁকড়ে ধরল দীপ্রর কব্জিটা।

থেমে যাওয়া গাড়িগুলোর মধ্যে নীল অ্যামবাসাডরটাকে চিনতে ভুল হল না। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে দীপঙ্কর। একা নয়। পাশে যতটা দূরত্ব না রাখলেই নয় সেটুকু রেখে শান্তা। সুরমার দেওয়া একদিনের বর্ণনা থেকে এত দিনে আস্তে আস্তে চিনে নিয়েছে সে।

দীপঙ্করই দেখছিল তাকে। চোখাচোখি হতে মুখ ফিরিয়ে নিল গার্গী।

দীপ্র ঠেলা দিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে পড়লে কেন, মা। এখন তো আমরাই যাব!'

দীপ্রর দৃষ্টি অত দূর নাগাল পায়নি। ওর কথাগুলোও এতই সহজ যে অর্থ করারও কোনও মানে হয় না। তবু, অর্থটা এড়াতে পারল না গার্গী।

সামনে চোখ রেখে ছেলের হাত ধরে এগিয়ে যাবার আগে সে বলল, 'হ্যাঁ। চলো—'

গৃহবন্দী

উৎসর্গ:
সোনামন ও শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়-কে

১

গন্ধটা চেনা। অড়হর ডাল, খোসা ছাড়ানো কুমড়ো, বেগুন, জিরে আর ধনে পাতায় সেদ্ধ করা মাংসের। শেষ বিকেলে সমুদ্রের হাওয়া ছাড়লে কোলাবার পার্সি পাড়ার হেঁসেল থেকে উড়ে আসে নাকে। গন্ধের উৎস ফুটপাথের দুদিকের দোকানের ওপরে কিংবা আড়ালে পড়া বাড়িগুলোর কোনওটা, নাকি ইতস্তত ছড়ানো ইরানি রেস্তোরাঁগুলো, তা বোঝা যায় না ঠিক, কিন্তু, জায়গাটা যে কোলাবা তা চিনতে ভুল হয় না। আগে চিনেছে, আজও চিনল রণজয়।

গেটওয়েতে সুশান্তদের হোটেলে যেতে অবশ্য এই রাস্তায় আসা জরুরি ছিল না। মেরিন ড্রাইভ থেকে বাঁক নিয়ে চার্চ গেট স্টেশন পেরিয়ে সোজা রাস্তায় এলেই হত। বাড়ি বা অফিস, যে-কোনও জায়গা থেকেই তাজ হোটেলে যেতে এটাই তার চেনা রাস্তা। কনফারেন্স কিংবা কোম্পানির গেস্ট অ্যাটেন্ড করতে, বা কারও পাল্লায় পড়ে নিছকই কফি খেতে এই রাস্তায় প্রায়ই যেতে হয় ওখানে। আজ বিকেলে অন্যরকম হল। শিবসেনাদের কী একটা মিছিল বেরিয়েছে ওদিকে, লক্ষ্য সম্ভবত মিউনিসিপাল কর্পোরেশন; মাঝ রাস্তায় নো-এন্ট্রি বোর্ড লাগিয়ে গাড়ি ডাইভার্ট করে দিচ্ছে পুলিশ। পৌঁছুনো সহজ হবে ভেবে জিমখানার দিকে না গিয়ে সে কোলাবার রাস্তা ধরেছিল।

তাতেও সুবিধে হল না। এমনিতেই সারাক্ষণ ব্যস্ত এই শপিংয়ের রাস্তায় অফিস শেষের সময়ে গাড়ি চলাচল করে বেশি। কাজে অকাজে মানুষজনও। একসঙ্গে অনেক গাড়ি ঢুকে পড়ায় এখন জ্যামই সৃষ্টি হয়েছে। ধীরগতি এক সময় থমকে গেল স্তব্ধতায়।

সামনে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির পর গাড়ি, ট্যাক্সি, বি-ই-এস-টি'র বাস। অফিসের দেওয়া তার চকোলেট-রং প্রিমিয়ার থেকে বাঁয়ে তাকালে একটা ফিটন দেখা যায়। চোখে বাহারে জরির ঠুলি-আঁটা, সাদার ওপর বাদামির ছোপ-লাগা ঘোড়াটা গতিরুদ্ধ দাঁড়িয়ে বিভিন্ন হর্নের অস্থির শব্দে অধৈর্য হয়ে মাথা নাড়ছে থেকে থেকে। ফিটনের ওদিকে, ফুটপাথে, গ্যাস-বেলুনের হকারকে ঘিরে জমে ওঠা ছোটখাট ভিড়ের মধ্যে থেকে অজ্ঞাত কারণে উড়ে যাচ্ছে একটার পর একটা নানারঙের বেলুন। এর বেশি আর কিছুই চোখে পড়ে না। এমনও হতে পারে এই রাস্তার যেখানে শেষ সেখান দিয়েও পার হচ্ছে কোনও মিছিল। সেটা যতক্ষণ না পার হয় ততক্ষণ এইভাবেই আটকে থাকতে হবে।

অভ্যাসবশত কব্জির ঘড়িতে চোখ রাখল রণজয়। সকালে দু বার ফোন করেছিল সুশান্তকে। সিদ্ধান্ত নেবার পর বাড়ি থেকে, তারপর অফিস থেকে। দ্বিতীয়বার টেলিফোন করার সময় বলেছিল ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টার মধ্যে সে গাড়ি নিয়ে পৌঁছে যাবে হোটেলে। পরে জুড়ে দেয়, 'অবশ্য যদি না ট্রাফিকে আটকে পড়ি।'

'এখানেও ট্রাফিকের সমস্যা আছে না কি?'

'আছে বইকি। তবে একেবারে অনড় নয়।' রণজয় অপেক্ষা করছিল যদি কোনও কারণে রিসিভারটা এইবার পারমিতার হাতে তুলে দেয় সুশান্ত। থেমে বলল, 'চিন্তা কোরো না। ওই সময়ের মধ্যে পৌঁছুব।'

তখন সাড়ে ন'টা। চা কোম্পানির কুপনে দ্বিতীয় পুরস্কারে জেতা তিন রাত চার দিনের ছুটির আরামে ফাইভ-স্টার হোটেলের পড়ে-পাওয়া সৌভাগ্যে বসে ব্রেকফাস্ট খাচ্ছিল সুশান্ত। কথার মধ্যে খসখস করছে চিবনোর শব্দ। বলল, 'সময়টা জানিয়ে ভাল করেছিস। পারমিতাকে রেডি হয়ে থাকার অ্যাডভান্স নোটিশ দেওয়া যাবে—'

'পারমিতাকে দেবে নাকি? আমিই জানিয়ে দিতাম।'

চটপট জবাব দিল সুশান্ত, 'ও তো বাথরুমে—'

এতটা বেলায় পারমিতা বাথরুমে, অথচ 'এই আশপাশে একটু' বেরুবে বলে তার স্বামী অধ্যাপক সুশান্ত চট্টোপাধ্যায় হোটেলের ঘরে বসে একা ব্রেকফাস্ট খাচ্ছে, এটা বিশ্বাস্য নয়। রণজয়ও বিশ্বাস করল না। সেই কারণেই, ওই বয়সের পরিচিতা কোনও যুবতী বাথরুমে আছে শুনলে যেমন হঠাৎ তার শরীর ও স্নানদৃশ্য ভেসে ওঠে চোখে, রণজয়ের তা হল না। সুশান্ত এড়িয়ে গেল, স্বামীর অধিকারবোধ থেকে আড়াল করে রাখল পারমিতাকে, ইত্যাদি ভেবে সামান্য অপ্রস্তুত ভাব নিয়ে সে বলেছিল, 'ও-কে। তাহলে ওই কথাই রইল—'

'ঠিক আছে। আমরা অপেক্ষা করব।'

চল্লিশে পৌঁছে এবং কমার্শিয়াল ফার্মের চাকরির অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত হতে হতে এরকম অস্ফুট অপমান বা অপ্রস্তুত হবার মতো ঘটনা সামান্য বুদবুদ তুলেই হারিয়ে যায়। একটা কেঠো অনুভূতি কিছুক্ষণ শরীর, মন ছুঁয়ে থাকে, এই যা। রণজয়ও হারিয়ে ফেলেছিল। পরে ভেবেছিল সুশান্তর কথা থেকে সে যা আঁচ করবার চেষ্টা করেছে, তা সত্যি নাও হতে পারে। জায়গাটা বাড়ি নয়, হোটেল; অর্ডার পেয়ে গেস্টদের কে বাথরুমে, কে বাইরে ইত্যাদি বুঝে ওরা সার্ভ করবে না। এমন হতেই পারে যে সুশান্ত রেডি হবার পর পারমিতা বাথরুমে ঢোকে, ইতিমধ্যে ব্রেকফাস্ট এসে যায় এবং খেতে শুরু কবে দেয় সুশান্ত। ঠিক তখনই ফোন না করে আরও কিছুক্ষণ পরে করলে হয়তো অন্যভাবে ঘটত ঘটনাটা। এরপর কাজে ডুবে যেতে যেতে বিকেলে পৌঁছুনোর সময়টা মনে ছিল শুধু। আর যা যা, তার বন্দোবস্ত সে আগেই করে রেখেছে।

এখন ঘড়িতে ছ'টাই বাজছে দেখে আশ্বস্ত হল রণজয়। আরও দশ কি পনেরো মিনিট জ্যামে আটকে থাকতে হলেও সময়েব মধ্যে পৌঁছুবে। দশটা মিনিট বাড়তি পেলে ওদেরও তাড়াহুড়ো করতে হবে না।

এপ্রিলের শেষ। চারদিকে পরিষ্কার আলো দেখে বোঝা যায় সন্ধে হতে দেরি আছে। রোদ সরে যাওয়া রাস্তায় ব্যস্ততার মধ্যেও যথেচ্ছ বেড়ানোর প্রবণতা। থেকে থেকে জোরালো হয়ে উঠছে মসৃণ হাওয়া। না দেখেও বলে দেওয়া যায় ভ্রমণেচ্ছুদের ফেলে দেওয়া বাদামের খোসা বা ছোলা ঠোকরাতে গেটওয়ে অব ইন্ডিয়ার সামনের বাঁধানো চত্বরে কি শিবাজি মূর্তির আশপাশে এখন ঝাঁকে ঝাঁকে নেমে আসছে পায়রা, শব্দে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে যাচ্ছে আবার ফিরে আসার জন্যে। আরও দূরে, সমুদ্রের জল কাটতে কাটতে এলিফ্যান্টা-ফেরত যাত্রীদের নিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে আসছে একটি কি দুটি মন্থরগতি

স্টিমলঞ্চ। পাথরের পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যাবার সময় নোঙরে বাঁধা বোট ক্লাবের ডিঙিগুলোকে নড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে জোড়ভাঙা ঢেউ।

উপলক্ষ না থাকলে এসব দৃশ্যে আকর্ষণ থাকে না। আপাতত, জ্যামের মধ্যে, হোটেলে পৌঁছুনোর তাড়ার চেয়ে গন্ধটাই রণজয়কে টানছিল বেশি। ধানশাকের গন্ধ। সম্ভাব্য উৎস আবিষ্কারের চেষ্টায় ডানদিকে একটু পিছনে তাকিয়ে একটা ইরানি রেস্তোরাঁ ও তার ভিতরের পুরনো ধাঁচের চেয়ার টেবিল, নানা ব্র্যান্ডের বিস্কুট ও আরও কী-কীতে ঠাসা শো-কেস এবং তার সামনে আলাদা করে বসানো লস্যির কাউন্টার যদিও বা চোখে পড়ল, তবু রেস্তোরাঁর ভিতরের প্রায়-শূন্যতা দেখে মনে হল না ওইখান থেকেই আসছে গন্ধটা। আরও ওপরে, ফুটপাথ আড়াল দেওয়া বারান্দায় সাদা সালোয়ার কামিজের ওপর কালো ওড়না জড়ানো এক মধ্যবয়সী মহিলাকে দেখল, রং ফর্সা ও চোখা নাকমুখ, রেলিঙ ঘেঁষে উল্টোদিকে মুখ করা বসা গোল কালো টুপি পরা এক রোগা চেহারার বৃদ্ধকে কিছু বোঝাচ্ছে যেন। এই মুহূর্তে রাস্তার জ্যামের প্রতি—হয়তো বা সবকিছুরই প্রতি—ওদের নিস্পৃহ ভঙ্গিতে ফুটে উঠেছে পার্সি বৈরাগ্য। ওদের আড়ালে, অদৃশ্য কোনও ঘরে কিংবা হেঁসেলে আগুনের আঁচে ধানশাক নরম হচ্ছে বলে মনে হয় না।

এমন কি হতে পারে যে এখানে বা কাছেই নয়, গন্ধটা সারাক্ষণ চাপা থাকে পার্সি পাড়ার আনাচে কানাচে! একটু আগে যেমন ভেবেছিল, সূর্য নরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে-হাওয়া ওঠে সমুদ্রে—অন্ধকারে উতরোল হয় আরও, পরিচিত অনুষঙ্গ থেকে তা-ই বয়ে আনছে এই গন্ধ?

হতে পারে, রণজয় ভাবল, খুবই সম্ভব। অনুষঙ্গও চেনায়।

মনে পড়ল, মাস সাতেক আগে, কিছুদিনের জন্যে হেড অফিসে কাটাতে হবে জেনে সে যখন কলকাতা থেকে বোম্বাইয়ে এল, তখন, কয়েকদিনের মধ্যেই একদা কলকাতায় তার সহকর্মী ফারুক ধোতিওয়ালা ডেকেছিল বাড়িতে। কুপারেজ মাঠের উল্টোদিকে একটি ফ্ল্যাটে বসে গল্প করতে করতে সেদিনই প্রথম গন্ধটা পেয়েছিল সে। কথায় কথায় ফারুকের স্ত্রী কিটু বলেছিল, আদি বোম্বাইয়ের নিজস্ব গন্ধ বলে যদি কিছু থাকে তা আছে এই ধানশাকে।

কিটুর কথাগুলোকে পার্সি অহঙ্কারের অঙ্গ ছাড়া আর কিছু ভাবেনি রণজয়। তাদের মতো বাঙাল বাড়িতে ফারুককে সর্ষে ইলিশ খাইয়ে, ফারুকের পছন্দ হয়েছে দেখে যেমন ইলিশের অদ্বিতীয়তা বুঝিয়েছিল তার স্ত্রী, সুতপা; প্রায় সেইরকমই আর কি। আর কখনও ধানশাক খাওয়ার কথা মনে হয়নি। তবে গন্ধটা থেকে যায়।

শুধু ধানশাকের গন্ধই নয়। ম্যাকফারসন হিন্দুস্তানের চাকরিতে ঢোকার পর থেকে গত ছ' সাত বছরে ট্যুরে প্রায়ই বোম্বাই আসতে হলেও শহরটাকে চেনেনি। এবারে একা ও একটানা থাকার অভিজ্ঞতায় অফিসের পরে এবং ছুটির দিনে সময় কাটানোর জন্যে যত্রতত্র গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া থেকে সমুদ্রঘেরা এই শহরটাকে চিনতে চিনতে ক্রমশ সে আবিষ্কার করে শুধু গন্ধ দিয়েই চেনা যায় এর কোনও কোনও অঞ্চল। ডান দিকে ভিলে পার্লে, বাঁ দিকে সান্তাক্রুজকে রেখে, দুধারে কংক্রিটের বড় বড় ললিপপে বিজ্ঞাপন সাজানো এয়ারপোর্টের রাস্তা ছেড়ে বাঁ দিকে মাহিম-এ এলে, কি ওরলি সী ফেস-এর রাস্তায়, কিংবা কাফ প্যারেডে পৌঁছুনোর মুখে প্রায় সারাক্ষণই পাঁকের গন্ধের সঙ্গে মিশে থাকে শুকিয়ে

যাওয়া সামুদ্রিক মাছের গন্ধ। আরও দূরে, বান্দ্রায়, ক্রমশ ফ্যাশনেবল হয়ে ওঠা জমকালো রাস্তার দুপাশে চিনে নুডলসের গন্ধ; চেম্বুরে নারকেল কোরা দিয়ে রান্না করা পমফ্রেটের গন্ধ। ওরা বলে মীন চারুপাচ্চাড়ি। ওদিকটায় দক্ষিণ ভারতীয়দের সংখ্যা বেশি। কোলাবায় ইরানি রেস্তোরাঁর সংখ্যাধিক্য থাকলে ওদিকে উদিপি-র—নারকেলের গন্ধে হঠাৎ-হঠাৎ ভারী হয়ে ওঠে হাওয়া। যেমন জুহু বিচের কাছাকাছি গেলে জোলো হাওয়ায় বালিমাটির গন্ধের সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে উট আর ঘোড়ার গন্ধ। আবার এদিকে, ব্রিচ ক্যান্ডির সম্ভ্রান্ত রাস্তায় মুসুম্বি কি আনারসের গন্ধ প্রায় অবধারিত। চৌপাটিতে ভেলপুরির। এইরকম। আগে জায়গাগুলো চেনার পর গন্ধ শনাক্ত করেছিল, এখন গন্ধই চিনিয়ে দেয়। বোম্বাই শহরের এইসব বিচিত্র গন্ধের সংস্পর্শে নিজেকে জড়াতে জড়াতে প্রায় ছেলেমানুষি আগ্রহে কখনও কখনও মনে হয়েছে রণজয়ের, এমন যদি হয় যে তাকে চোখ বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হল শহর পরিক্রমায়, তাহলে গন্ধই বুঝিয়ে দেবে কখন কোথায়।

গন্ধ নিয়ে তার এই ব্যক্তিগত গবেষণার জের অবশ্য থাকল না বেশিক্ষণ।

জ্যাম নড়েনি। পরিবর্তে পিছনে জমে ওঠা বিভিন্ন শব্দে বুঝতে পারছে শুধু মেন রোডই নয়, ক্রমশ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আশপাশেব আর্টারিগুলোও। এভাবে চললে যে-অবস্থার সৃষ্টি হবে তাতে মিছিল চলে গেলেও থেকে যাবে একটা জটপাকানো ঘোঁট। এমনও হতে পারে যেটা দশ পনেরো মিনিট ভেবেছিল, সেই সময়টাই গড়াবে অনিশ্চয়তায়। ততক্ষণে সন্ধে হয়ে যেতে পারে।

সমস্যা অবশ্য সময় নিয়ে ততটা নয়, যতটা হয়রানির। ঠিকঠাক পার্কিংয়েব জায়গা পাবে কি না বোঝা যাচ্ছে না। যদি না পায় তাহলে অনেকটা দূরে গাড়ি পার্ক কবে তাকে হেঁটে আসতে হবে হোটেল পর্যন্ত। আবার গাড়ি নিয়ে আসার সময়েও তাই। সমস্তই সুশান্ত ও পারমিতার জন্যে। ওরা হঠাৎ বোম্বাইয়ে এসে না পড়লে সে যেমন একা তেমনই থাকত। মাঝখান থেকে নিজের ফ্ল্যাটে ওদের নিয়ে যাওয়া, সন্ধে কাটানো, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা—সত্যিই এগুলো দরকার ছিল কি।

যা ঘটেনি, কিন্তু ঘটতে পারে, তারই জেরে হঠাৎ অধৈর্য বোধ করল রণজয়। জোরে চাপ দিল হর্নে। প্রস্তুতিহীন এই চেষ্টায় হর্নটা বেজে উঠল এমনই হাস্যকর ও খাপছাড়া শব্দে যে, সামনের মেরুন রঙের বড় বিদেশি গাড়ির রিয়ারে বসা দুই মহিলা—বিশেষত ওদের মধ্যে যে কমবয়সী ও চশমা-পরা, পিছনে তাকিয়ে হাসতে লাগল। দুজনেই কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকে দেখছে দেখে মুখ ফেরাবার চেষ্টা করল রণজয়। না পেরে গম্ভীর হল। এই মুহূর্তে তার মুখে যতই ক্ষোভ ফুটে উঠুক, নিশ্চয়ই তাকে কমিক চরিত্র ভেবে নিয়েছে ওরা। কিংবা, কমিকাল না হলেও এমন কেউ, যার দিকে হাসি-হাসি মুখ করে নির্দ্বিধায় তাকিয়ে থাকতে পারে দুজন মহিলা। বিরক্তিতে চশমা-পরা মেয়েটিকে চোখ মারবে কি না ভাবল, তাহলে অন্তত মুখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হবে। অনিশ্চিত মনোভাব থেকে সেরকম কোনও সিদ্ধান্ত নেবার আগেই দেখল দুটি মুখের মাঝখানে লাফিয়ে এল তৃতীয় একটি মুখ। সাদা, রোমশ, কুঁতকুঁতে দুটি চোখ নিয়ে পুডল বা ওই জাতীয় কোনও কুকুর।

অস্বস্তিতে নিজেই চোখ ফিরিয়ে নিল রণজয়। হঠাৎ-পাওয়া গন্ধের সূত্র ধরে এতক্ষণ সে বিচরণ করছিল গন্ধ দিয়ে এই শহরের বিভিন্ন অঞ্চল চেনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়। একটা মজাও পাচ্ছিল যেন। জ্যামে ঢুকে নষ্ট হয়ে গেল সব মুড।

কাল বোম্বাইয়ে এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সুশান্তরা। পরিচয়, বন্ধুত্ব এবং সঙ্গে টেলিফোন নাম্বার থাকলে এরকম করতেই পারে; রণজয় ভাবল, পরিবর্তে সেও হোটেলে গিয়ে দেখা করতে পারত ওদের সঙ্গে। তা না করে আগ বাড়িয়ে আবার নেমন্তন্ন করে বসল কেন! সুশান্ত পারমিতারা ভাল করেই জানে সে এখানে একা থাকে—সুতপা কলকাতায়, তার মেয়েকে নিয়ে; এই অবস্থায় এ ধরনের লৌকিকতা জরুরি ছিল না খুব। তাহলে? নিছক ভদ্রতা? নাকি দেখাতে চাইছিল একা থেকেও খারাপ নেই সে, চমৎকার কেটে যাচ্ছে জীবন—যাতে ফিরে গিয়ে ওরা বলতে পারে সুতপাকে! নাকি এ রকম ঘিনঘিনে কোনও কারণ নয়; এই একঘেয়ে একাকীত্বের দিনযাপনে ক্লান্ত, সুশান্ত-পারমিতাদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে একটা সন্ধে কাটিয়ে কিছুটা অন্যরকম হতে চেয়েছিল সে? শুধুই পারমিতার টানে, সুশান্তর প্রতি ঈর্ষায়? নাকি নির্দিষ্ট কোনও কারণ নয়, সব কারণগুলিই একসঙ্গে প্ররোচিত করেছিল তাকে?

কারণ যাই হোক, মাত্র একটা সন্ধের জন্যে এত সব করা অর্থহীন নয় কী? কাল বাদে পরশু, সুশান্তই বলল, ওরা গোয়ায় চলে যাবে। চার পাঁচদিন ওখানে কাটিয়ে আবার কলকাতায়। এই প্ল্যানের মধ্যে সে উটকো মাত্র। যদি এমন হত যে, যে-সময় ওরা এল তখন রণজয় বোম্বাইয়ে নেই, হঠাৎ প্রয়োজনে বরোদা কিংবা আহমেদাবাদে—যেমন যেতে হয় মাঝে মাঝে, তাহলে তাকে পেত না সুশান্ত, কিন্তু, তাহলেও ওদের প্ল্যানে পরিবর্তন হত না কোনও। তাহলে সে এতটা গায়ে-পড়া হতে গেল কেন!

সময়ের হিসেবে পাঁচ সাত মিনিট হলেও প্রশ্নের পর প্রশ্নে এবং বিরক্তিতে ক্রমশ জ্যামেরই অংশ হয়ে উঠল রণজয়। গন্ধ খুঁজে বেড়ানোর মজার মধ্যে যে-অর্থহীনতা, সেই একই অর্থহীনতার বোধ ছড়াতে লাগল অনুভূতিতে। যেমন হয়, প্রায়ই, নিজের কাছেই নিজেকে লাগে অস্বস্তিকর। অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না দিন কাটার, বা বয়স বেড়ে যাওয়ার। একটু আগে, হর্ন বাজাবার প্রতিক্রিয়ায়, নিজেকে কমিক চরিত্র হওয়া থেকে প্রাণপণে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিল সে। এখন মনে হল, যে-কোনও ধরনের একটা চরিত্র হয়ে ওঠার জন্যে আচরণের যে-ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন তা তার মধ্যে নেই। না হালকা, না গভীর, না জটিল, না স্পষ্ট—তাকে নিয়ে কেউ গল্প, উপন্যাস লেখার চেষ্টা করলে ফ্যাসাদে পড়বে। এই জ্যামের মতোই, সে এগোতে পারে না। এগোনো সম্ভব নয় জেনেও জ্যামজনিত প্রতিক্রিয়ায় নিজের ভিতরে অর্থহীন শব্দ তুলে যায় শুধু। যেন নিজের জোরে নয়, তার বাঁচা, সময় কাটানো, সবই ভর করে আছে কতগুলো নির্ভরতা—বাখারি বেয়ে ওঠা গাছের মতো! নির্ভরতাগুলো সরিয়ে নিলেই টলে পড়বে। মোটামুটি ভাল একটা চাকরি আছে, সুতরাং বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সচ্ছলতার অভাব নেই; চাকরির সূত্রেই একটা গাড়ি আছে বলে ঘুরে বেড়াতে পারে যথেচ্ছ; কোম্পানি একটা কমবেশি ফার্নিশড ফ্ল্যাট দিয়েছে, সুতরাং, নির্বিষ সাপের মতো, যখন ইচ্ছে তখনই ঢুকে পড়তে পারে গর্তে।

নিজেকে এইভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিষণ্ণ বোধ করল রণজয়। ভেসে উঠল স্মৃতিতে।

মাস চারেক আগে শীর অঞ্চলে, এক শনিবার রাতে, এখানকারই পরিচিত এক খবরের কাগজের ভদ্রলোক, হিমাংশু দত্ত, খেতে ডেকেছিল বাড়িতে। রগুড়ে লোক। 'আমার স্ত্রী আমার মতো বুড়োটে নয়, রীতিমতো সুন্দরী। খেয়ে দেখবেন, বন্দনার রান্নার হাতটাও

ভাল।' ফোর্টের একটা বারে বসে তাকে বিয়ার খাওয়াতে খাওয়াতে বলেছিল হিমাংশু, 'আপনাদের গ্র্যান্ট রোড বাজার থেকে অনেক ভাল মাছ পাওয়া যায় খারে।'

রণজয়ের সময়ের অভাব নেই। তা ছাড়া, হিমাংশু যতই বকবকে হোক, পারিবারিক পরিবেশে একজন মহিলার সান্নিধ্যে সময় কাটানোর আগ্রহে সেদিন রাত আটটা নাগাদ হিমাংশুর বাড়ি পৌঁছে দেখল দরজা, জানলা বন্ধ; কেউই নেই। খোঁজ নিতে দোতলা থেকে ডাণ্ডেকর না কী পদবীর এক অবাঙালি ভদ্রলোক নেমে এসে বলল, হিমাংশুর বাবা মারা গেছেন হঠাৎ, ওরা স্বামী-স্ত্রী সন্ধের ফ্লাইটে চলে গেছে কলকাতায়, কাউকে কিছু জানাবার সুযোগ পায়নি, ইত্যাদি।

এটা ঘটনা এবং এমন ঘটনা ঘটতেই পারে। কিন্তু, সেদিন খার থেকে কেমন ভোঁতা ও অন্যমনস্ক মগজে কারমাইকেল রোডে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসতে আসতে রণজয়ের মনে হয়, মৃত্যুর মতোই জীবন বড় অনিশ্চিত। এই অনিশ্চয়তা তার ক্ষেত্রে আরও বেশি, কেন না সে নির্বান্ধব। এটা ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই শীতে আক্রান্ত হয় সে, রোম ফুটে ওঠে সারা গায়ে। গাড়িটা কোনওরকমে পার্ক করে, ছ' তলায় নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে, অন্ধকারে, শরীরের শীতের জন্যেই সম্ভবত, আরও তীব্র এক শৈত্য ছুঁয়ে যায় তাকে। পিছনে দরজাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে সাপ ও সাপের গর্তের উপমাটা ঢুকে পড়ে মাথায়। এরপর আলো না জ্বেলে, জুতো খুলে ও পোশাক বদলে সে শুয়ে পড়েছিল বিছানায়।

সেদিন, সেই সময়ের অন্ধকারের মধ্যে, নিজের বেঁচে থাকার ধরনটাকে পরিষ্কার চিনতে পারে সে। ঘুম আসেনি, খিদে পেলেও উদ্যমী হয়নি।

পীতাম্বর নামে একটি বাধ্য কাজের লোক আছে তার—রান্নাবান্না করে, ফাইফরমাস খাটে, ফ্ল্যাট আগলায়—রাতে কাজকর্মের পর চলে যায় নীচে সারভেন্টস কোয়ার্টার্সে, উঠে আসে ভোরে। যেহেতু রণজয় বাইরে খাবে বলে বেরিয়ে গেছে, ফিরতে রাত হবে, তাই লোকটিও তার জন্যে অপেক্ষা করার কথা ভাবেনি। নীচে, সিকিউরিটিতে, ফোন করে জানালে ওরা পীতাম্বরকে ডেকে দিতে পারত। রণজয় সে চেষ্টা করল না।

ততক্ষণে নিজের ভঙ্গুরতা স্পষ্ট তার কাছে, অভিমানে থমথমে লাগছে নিজেকে। সে ভাবতে শুরু করেছিল এইরকম কোনও মুহূর্তে মৃত্যু এসে গেলে বা মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিলে কেউ জানতে পারবে না। কেউই না। কিন্তু বাস্তবে, সামাজিক পরিস্থিতিতে, সে তো এমন বিচ্ছিন্ন নয়। এই যে দুরকম অস্তিত্ব, এর কোনটা সত্য?

উত্তর পায়নি। তবে, অনেকক্ষণ একই ভাবে অন্ধকার নিয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে রণজয়ের মনে হয়েছিল পরস্পরবিরোধী দুই অস্তিত্ব ক্রমশ এক হয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে; সে পড়ে আছে ল্যাবরেটরির টেবিলে, এক্সপেরিমেন্টের লেবেল-আঁটা বোতলের মতো। এটা কোনও স্বাভাবিক মানুষের অবস্থা কি না জানে না। যদি না তা হয়ে থাকে, সেই না-হওয়ার দায়িত্বও তার। এই যে নিঃসঙ্গ লাগা, হঠাৎ-হঠাৎ নির্বান্ধব বোধ করা—এগুলো শুরু হয়েছে কলকাতা ছেড়ে এখানে আসার পর থেকে, ক্রমশ। ইচ্ছে করলেই কি এসব এড়াতে পারত না সে।

সত্যি বলতে, বোম্বাই পাঠানোর জন্যে হেড অফিস থেকে কলকাতার যে দুজনের নাম সুপারিশ করেছিল তার মধ্যে সে যেমন ছিল তেমনই ফার্স্ট চয়েস হিসেবে অমরেশ গাঙ্গুলিও ছিল। যে-কোনও একজন গেলেই চলত। স্ত্রীর অসুস্থতা, ছেলের পরীক্ষার কথা তুলে

এড়িয়ে গেল অমরেশ। সেও রাজি না হলে কোম্পানি চাপ দিত অমরেশকে।

কিন্তু, অমরেশ রাজি নয় দেখে আরও তৎপর হয়ে ওঠে সে—ভবিষ্যৎ প্রোমোশনের সম্ভাবনা বাড়িয়ে রিজিওনাল থেকে ন্যাশনাল রেসপনসিবিলিটি পাবার জন্যে যতটা না, তার চেয়ে বেশি সুতপার কাছ থেকে দূরে থাকার জন্যে। অনেক দিন ধরেই ভাল লাগছিল না সুতপাকে। শ্যাওলা-ধরা চৌবাচ্চার ঘোলাটে জলের মতো চোদ্দ বছরের এই বিবাহিত জীবন, গা ভেজাতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু চেঁচিয়ে বলতে পারছিল না কথাটা। সুতপা ঠিকঠাক বুঝতে পারেনি তাকে, এমনও আভাস দিয়েছিল যে, যদি দরকার হয় তাহলে মেয়েকে নিয়ে সেও চলে আসবে বোম্বাইয়ে। রণজয় পাত্তা দেয়নি।

বলতে কি, সুতপার আগ্রহ দেখে অবাকই হয়েছিল সে—পার্টি-করা মেয়ের এমন পাতিব্রত্য! তিন চার বছর ধরে ক্রমশ নিরুত্তাপ হতে দেখেও কি সুতপা বুঝতে পারেনি, বৈচিত্র্য চাইছে বলেই একা হতে চাইছে রণজয়, সুযোগ আসার সঙ্গে সঙ্গেই চেপে ধরল।

কিন্তু এখন, এই অবস্থাটার জন্যে দায়ী কে? রণজয় জানে না, বুঝতে পারে না বৈচিত্র্যের ভিতরে কী আছে! শুধু উপলব্ধি করতে পারে, বাইরে যেমনই থাক, নিজের মধ্যে ক্রমশ অর্থহীন হয়ে পড়ছে সে।

এই বোধটা কাটানোর জন্যেই সেদিন জোর করে বিছানা ছেড়ে উঠে জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে। টেলিভিশনের সময় পার হয়ে গেছে, স্টিরিওতে রেকর্ড বা ক্যাসেট চালানোর কথা ভেবেও নিরস্ত হল; সেই মুহূর্তের মানসিকতা থেকে সায় পেল না এসবে। জানলা থেকে দূরের আলো ঝলমলে ফ্লাইওভারের ওপর দিয়ে দ্রুতগতি গাড়ির চলাচল দেখা যাচ্ছিল, আরও নীচে গড়িয়ে আসা সমুদ্রেরও খানিকটা। অবর্ণনীয় আকাশের ব্যাপ্তির নীচে আরব সাগরের কালো জল টের পাওয়া যায় কচিৎ ঢেউয়ের মাথায় লাফিয়ে ওঠা ফসফরাসের সাদা দেখে। চাপা শব্দে শান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটানা হাওয়া। চোখ সরালে স্কাইস্ক্র্যাপারের পর স্কাইস্ক্র্যাপার, অধিকাংশ অন্ধকারের মধ্যে কিছু কিছু খোপে আলো, ঘরের মধ্যে পুরুষ ও নারীর বিভিন্ন ভঙ্গিমা। সে যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তার মধ্যেই বাঁদিকে কোনাকুনি একটি সমান উচ্চতার ফ্ল্যাটের বাথরুমের জানলা দিয়ে এক যুবতীকে ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত করে পোশাক বদলাতে দেখল। কয়েক মুহূর্ত পরেই নিভে গেল আলো; বাথরুমের পরে বেডরুমেরও। ওই চারকোনা নির্দিষ্ট অন্ধকারের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল রণজয়। নিজেও যদিও অন্ধকারে, তবু, তার মনে হয়েছিল, তফাত আছে দুটো অন্ধকারের মধ্যে।

জ্যাম কি ভাঙতে শুরু করেছে? সম্ভবত। বিভিন্ন গাড়ির হর্ন আগে যেমন ছিল তার চেয়ে ব্যস্ত ও জোরালো হয়ে উঠতে সচেতন হল রণজয়। অভ্যাসে গাড়ি স্টার্ট করে এগিয়ে গেলেও উৎসাহ পেল না তত। কিছুটা আচ্ছন্ন, যেন এখনও সে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকার জানলার সামনে। পেডার রোড থেকে উঠে আসা কারমাইকেল রোড ও তার আশপাশের উঁচু-নিচু রাস্তাগুলোয় শব্দ সব সময়েই কম। সমুদ্রের হাওয়া বেগ বাড়িয়ে শহরের দিকে আসতে আসতে শেষ শব্দগুলিকেও তুলে নিয়ে যাচ্ছে যেন। এরপর সে আলো জ্বালে, স্নান করে এবং কিচেনে ঢুকে বিস্কুট চিবোতে চিবোতে নিজেই কফি বানিয়ে খায়। তারপর সকালের খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতে খেয়াল করে ইতিমধ্যেই সে পৌঁছে গেছে আগামী কালে। হিমাংশু দত্তের বাবা মারা গেছেন গতকাল।

খানিক আগে যতটা আলো ছিল এখন আর তা নেই। সন্ধে হবার আগে যেমন হয়, একটা আবছায়া থিতিয়ে আছে চারদিকে। এইরকমই থাকবে আরও কিছুক্ষণ। আলো জ্বলতে শুরু করেছে কোনও কোনও দোকানে। আরও কিছুটা এগিয়ে এসে রণজয় টের পেল মিছিল নয়, জ্যাম হয়েছিল অ্যাকসিডেন্টের জন্যে। সিনেমা হলের উল্টোদিকে প্রায় থেঁতলে যাওয়া একটা ট্যাক্সি ঘিরে পুলিশের জটলা। সামনের রাস্তার অনেকটা জুড়ে ভাঙা কাচের টুকরো। ছড়ি হাতে এক পুলিশ অফিসার গাড়িগুলোকে দ্রুত পেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে।

দৃশ্যটা পেরিয়ে যেতে যেতে রণজয়ের মনে পড়ল চৌপাটি পেরিয়ে পেডার রোডের দিকে বাঁক নেবার মুখে বড় হোর্ডিংয়ে প্রতিদিনই চোখে পড়ে রোড সেফটি অ্যাসোসিয়েশনের দেওয়া পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর হাল-হিসেব। সংখ্যাটা বদলে যাবে কাল। ক'জন ছিল ট্যাক্সিতে? দুর্ঘটনায় যদি তারই মৃত্যু হত, তাহলে হোটেলের ৪০২ নম্বর ঘরে বসে অপেক্ষা করতে করতে কিছুই বুঝতে পারত না সুশান্ত-পারমিতারা। দেরি দেখে দোষ দিত তার দায়িত্ববোধের অভাবকে। সম্পূর্ণ হতাশ হবার আগে ঠিক কতক্ষণ অপেক্ষা করত ওরা? তার পরেও কি ফোন করত ফ্ল্যাটে? পীতাম্বরও তো জানত না কিছু, শুধু এইটুকু ছাড়া যে, কলকাতা থেকে এক মেমসাহেব খেতে আসবে আজ—সেজন্যে সকালে সাহেব নিজে গিয়েছিল রুই, চিংড়ি, চিকেন কিনতে গ্র্যান্ট রোড বাজারে। না, সেও জানত না রণজয় কোথায়; যদি না ইতিমধ্যে ওয়ালেটে অফিসের ভিজিটিং কার্ড দেখে তাকে শনাক্ত কবত পুলিশ, খবর দিত ফ্ল্যাটে। এসব ঘটনা ঘটতে সময় লাগে। সুশান্তদের কাছে বোম্বাই অপরিচিত; ফ্ল্যাটে ফোন করেই যদি দৈবাৎ পেত তার দুর্ঘটনা বা মৃত্যুর খবর, তাহলে ওরা কি ছুটে যাবার কথা ভাবত? এমন কি হতে পারে যে, বিড়ম্বনায় পড়ে, অচেনা এই শহর সম্পর্কে ভয় পেয়ে, কিংবা তাদের গোয়া যাবার প্ল্যান ভেস্তে যেতে পারে ভেবে বিমূঢ়, চুপচাপ বসে থাকত হোটেলেরই ঘরে।

এলোমেলো ভাবনায় ছড়িয়ে যেতে যেতে হঠাৎই নিজেকে খেলো মনে হল রণজয়ের। সম্ভবত আলস্য এসে যাচ্ছে তার মধ্যে। নিজেই বুঝতে পারল এ ধরনের চিন্তায় নতুনত্ব নেই কোনও। একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে নিজেকেও তার মধ্যে ফেলা এবং সুশান্ত, পারমিতা যেহেতু কাছে আছে, তাদের নিয়ে তৈরি হয়েছে সন্ধে কাটানোর উপলক্ষ, সুতরাং আবেগে ভেসে যাওয়া—সে কি বোকা হয়ে পড়ছে ক্রমশ। কোথায় যেন পড়েছিল বাঙালি মরবার আগে শোকের দৃশ্য সাজিয়ে যায়, নিঃসঙ্গ মৃত্যুকে তার বড় ভয়, সেইরকম। তাছাড়া, এতক্ষণ ধরে যা ভাবল তার সবই সম্ভাবনার কথা, যার সঙ্গে এই মুহূর্তের বাস্তবের সম্পর্ক নেই কোনও। অবাস্তব এবং একপেশে। বাস্তবে তেমন কিছু ঘটলে সে যেভাবে ভাবছে সুশান্ত সেভাবে নাও ভাবতে পারে। বাইশ বছরের পরিচয় আপনি থেকে তুমি-তে নেমে এলেও সুশান্ত ঠিক কেমন মানুষ, তা সে আজও জানে না। পুরনো অভিজ্ঞতা থেকে একটা ধারণা করতে পারে মাত্র।

এখন আর যাবার তাড়া নেই তত। আশপাশের স্বাভাবিক দৃশ্য ও ব্যস্ততার মধ্যে খুব সাবলীল ভাবে রণজয় চলে গেল পিছনে; সেই সময়টাকে খুঁজল।

তখন তারা ছাত্র। রাজনীতি করত একসঙ্গে। আদর্শের টানে বেপরোয়া হয়ে উঠেছিল ক্রমশ। বিপ্লব আসন্ন; আন্দোলন, আলোড়ন কোনদিকে যাচ্ছে বুঝতে পারেনি। সুশান্ত বয়সে দু তিন বছরের বড়, পড়তও উঁচুতে, পরীক্ষার প্রতি অবিশ্বাসে পরীক্ষা দিতে বসেনি। চারু

মজুমদার ছাড়া চিনত না কাউকে। সে-ই রাজনীতিতে টেনেছিল তাকে, পারমিতার দাদা অনিন্দ্যকে, জামশেদপুর থেকে আসা বিষ্ণুকে, তাদের ব্যাচের আরও কয়েকজনকে। কুড়ি বছর বয়সের ঝড়ে-খ্যাপা ডালপালা চল্লিশে এসে ন্যাড়া হয়ে যায়—জোর করে ভাবলেও মনে হয় কিছুই ঘটেনি। শুধু মনে পড়ে দিনগুলো সহজ ছিল না।

তারপর হঠাৎই ওলটপালট হয়ে হয়ে গেল সব। দল ভাঙার মুখে যখন ব্যাপক ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশ, নির্বিচারে টেনে নিয়ে যাচ্ছে লকআপে, অত্যাচার, গুলি করে মারছে যত্রতত্র, সেই সময় সুশান্তই গা ঢাকা দিল প্রথম। অবিশ্বাসে? হয়তো। কোথায়, কিছুই বলেনি। তাদেরও বলেছিল কিছুদিনের জন্যে আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে যেতে।

ঠিক কি ভুল, বোঝার সময় সেটা নয়। লাটে উঠেছে পড়াশুনো। আদর্শে যে-আবেগ ছিল সেটই তত দিনে পরিণত হয়েছে ভয়ে। অনিন্দ্য, বিষ্ণুরা কয়েকজন চলে গিয়েছিল রাঁচির দিকে। একসঙ্গে পড়ত সুতপা—রাজনীতির ব্যাপারে পুরোপুরি অন্য দলে থাকলেও টান ছিল তার ওপর। বেগতিক দেখে তাকে কিছুদিন লুকিয়ে রেখেছিল নিজের বাড়িতে, তারপর বর্ধমানে, ওদের পার্টির ট্রেড ইউনিয়ন লিডার তীর্থঙ্কর দে'র গ্রামের বাড়িতে। মাঝে মাঝে দেখা করতে যেত সুতপা। ওর কাছেই শুনেছিল রাঁচির কাছে পুলিশের গুলি খেয়ে মারা গেছে অনিন্দ্য।

কেমন যেন ছিল অনিন্দ্যর চেহারা, চোখমুখ? রণজয় মনে করবার চেষ্টা করল। গোল, ফর্সা মুখের আবছা একটা আদল ভেসে উঠল শুধু। চশমা পরত। আর একটু পরেই দেখা হবে পারমিতার সঙ্গে, সামনাসামনি দেখলে হয়তো আরও কিছুটা মনে পড়বে।

খুব নিচু দিয়ে একটা হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছে সমুদ্রের দিকে। সম্ভবত নৌবাহিনীর। মুহূর্তে অদৃশ্য হলেও শব্দটা লেগে থাকল কানে।

গেটওয়ের সামনে ডুগডুগির আওয়াজে জমে উঠেছে বাঁদর নাচ। নীল শর্টস পরা এক সাহেব ক্যামেরা তাক করেছে সেদিকে। দূরে, জেটির দিকে, সমুদ্র থেকে কেড়ে নেওয়া জমির ওপব বোল্ডার ফেলার ধাতব শব্দ। ভাঙা বৃত্তে আকাশ মাপতে মাপতে সমুদ্রের দিকে উড়ে গেল এক ঝাঁক পায়রা।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এসব দেখতে দেখতে পার্কিংয়ের জায়গা খুঁজে নিল রণজয়।

গাড়ি থেকে নেমে ক' মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল হোটেলের বিশাল বাড়িটার দিকে। ডানদিকে ইন্টারকন্টিনেন্টালের বহুতল; বাঁদিকে পুরনো, বনেদি তাজমহল। ক্রমশ স্থির হয়ে এল দৃষ্টি। ওইখানেই ফোর্থ ফ্লোরের দু নম্বর ঘরে এখন তার জন্যে অপেক্ষা করছে ওরা। কোন ঘরটায়? কুপন প্রতিযোগিতায় জিতে এমন বিলাসবহুল ব্যাপারের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে কেউ। ভাগ্য? অবশ্যই। কিন্তু, কার ভাগ্যে? মনে হচ্ছে পারমিতারই। সুশান্ত যেমনই হোক, আসলে ব্যস্ত মানুষ, চায়ের প্যাকেট কিনে শিকে ছেঁড়ার অপেক্ষায় কুপন জমিয়ে রাখবে না। তাহলে পারমিতারই ভাগ্যে এখানেও এসে পৌঁছল সুশান্ত।

রাস্তা পেরিয়ে হোটেলের সামনে চলে এল রণজয়। কাচের দরজা ঠেলে লবিতে ঢুকে বাঁদিকে এগোল। লিফটটা কোথায় জানে। সটান চলে গিয়ে ৪০২-এ বেল দিলেই হবে। তবু, কিছু ভেবে, রিসেপশন পর্যন্ত গিয়ে মন্থর হল সে। এভাবে সরাসরি যাওয়া কি ঠিক হবে?

সুশান্তর সঙ্গে তার শেষ দেখা হয় আট-ন মাস আগে, সম্ভবত গ্র্যান্ডের আর্কেডে বইয়ের দোকানের সামনে। পারমিতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তারও আগে, আর্জ স্ট্রিটে তাদের

নিজেদেরই একতলায়—অফিস থেকে ফিরে দেখেছিল পারমিতা এসেছে, গল্প করছে সুতপার সঙ্গে। 'আপনি তো খোঁজ নেবেন না, তাই নিজেই এলাম—', এমন ভাবে বলেছিল পারমিতা, যেন সুতপা কেউ নয়, ওর সম্পর্কটা তারই সঙ্গে। বলবার জন্যে বলা। পারমিতার গলায় অনুযোগের ভান ছিল, অভিমান ছিল না। এমন হঠাৎ-হঠাৎ ও আগেও এসেছে, একাই; যেমন, সুতপাও গেছে কখনওসখনও। কাল রাত্রে ফোনে কথা বলবার সময় সুশান্ত বলেছিল তার ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে সুতপা। এমনও হতে পারে বোম্বাই রওনা হবার আগে ওরা আর্ল স্ট্রিটে গিয়ে দেখা করেছিল সুতপার সঙ্গে। রণজয় জানতে পায়নি। এই সম্পর্কে পরিচয় আছে, অন্তরঙ্গতা নেই। এখন আরও দূরত্বপূর্ণ লাগছে।

না, লিফ্‌টে ওঠার আগে রুমে ফোন করে যাওয়াই ভাল।

রিসেপশনের কোনায় হাউস টেলিফোন। খালি নেই। চোস্ত ইংরেজিতে কথা বলছে লম্বা, হালকা নীল রঙের পায়জামা কুর্তা পরা এক বাবরি-চুলের ভদ্রলোক, এমন চেহারা ও পোশাক যাতে বয়স, পেশা কিছুই আন্দাজ করা যায় না। পাশে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে খয়েরি স্কার্ট আর সাদা ব্লাউজ পরা এক সুন্দরী যুবতী, মুখে চড়া মেকআপ, আইল্যাশের জন্যে বিশেষ দৃষ্টি পেয়েছে চোখদুটো। ম্যাচিং হাইহিলের এক পাটির ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা যুবতীর অলস পায়ের গোড়ালির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রণজয়। হোটেলে ঢোকার সময় দেখেছিল ছ'টা কুড়ি। অর্থাৎ দেরি হয়নি।

যুবতী সম্ভবত রণজয়ের দৃষ্টি লক্ষ করেছিল। গোড়ালিটা জুতোর মধ্যে ভরে সামান্য বেঁকে দাঁড়াল। এই ভঙ্গিতে পাতলা ব্লাউজের নীচে তার ব্রা-র স্ট্র্যাপটা ফুটে উঠল স্পষ্ট হয়ে। ঘাড়ের নীচে উন্মুক্ত পিঠের মসৃণতায় চিকচিক করছে সোনালি রোম। লম্বা লোকটা কথা বলে যাচ্ছে এখনও। না-ছাড়া পর্যন্ত তাকেও অপেক্ষা করতে হবে। একটা গন্ধ পাচ্ছিল রণজয়, চাপা কিন্তু অন্যরকম, নিঃশ্বাস নিতেই বুঝল নারী-শরীরের।

অন্যমনস্ক হবার চেষ্টায় কফিশপের দরজা পর্যন্ত ঝকঝকে লবির পুরোটাই দেখতে দেখতে সে ভাবল, অনিন্দ্য ওভাবে মারা না গেলে ঘটনাগুলো অন্যরকমও হতে পারত। হত কি? নিশ্চিত হতে পারল না।

মাস ছয়েক পরে তীর্থঙ্করই বর্ধমান থেকে তাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসে কলকাতায়। 'ভয় নেই। পুলিশ তোমাকে ছোঁবে না। ছুঁলে আমার নাম বলবে,' হাওড়া স্টেশনে ট্যাক্সিতে উঠে বলেছিল, 'এখন কিছুদিন ভাল ছেলে হয়ে থাকো। পড়াশুনো করো, পরীক্ষা দাও। কী লাভ হল এসব ছেলেমানুষি করে। এটা চীন নয়, ভারতবর্ষ। এখানে বন্দুকের নল পুলিশের শক্তির উৎস।'

কথাগুলো মনে আছে বলবার ধরনের জন্যে। নিজেকে তখন ল্যাজকাটা কুকুরের মতো লাগছে, মাছি বসলেও তাড়ানো যায় না। বয়সে হয়তো দশ বারো বছরের বড়, কিন্তু তীর্থঙ্করকে দেখাচ্ছিল বাপ জ্যাঠা কি হেডমাস্টারমশাইয়ের মতো। সুতপাদের বাড়ি পৌঁছে দেবার আগে বলল, 'রাজনীতি করতে হলে দেখা কোরো আমার সঙ্গে।'

একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল সেদিন।

সন্ধেয় ফিরে যাবে সাউথ সিঁথি রোডে নিজেদের বাড়িতে। জি পি ও-তে কাজ করতেন সুতপার বাবা, তিনিও যাবেন সঙ্গে। তারপর কী হবে রণজয় জানে না। ভাবছিলও না। বলতে কি যত দিন আত্মগোপন করে ছিল, পরিচিত পরিবেশ থেকে দূরে প্রায় সারাক্ষণের

আশঙ্কা ও অস্বস্তির মধ্যেও একটা চাপা অহঙ্কার কাজ করত মনে, দামি মনে হত নিজেকে। কলকাতায় ফেরার পর ক্লান্তি ও হতাশায় শূন্য লাগছিল, বিশেষত তীর্থঙ্করের মুখে তার সম্পর্কে পুলিশের আগ্রহ নেই শুনে থম মেরে গিয়েছিল যেন। বার বার মনে হচ্ছিল সুতপার কথা শুনে তীর্থঙ্করের আশ্রয়ে না গিয়ে সে অনিন্দ্যদের সঙ্গী হলেই পারত। হয় মরত, না হয় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াত আরও কিছুদিন, কিংবা ধরা পড়ে মারধোর খেত, কিন্তু আজকের মতো এমন মূল্যহীন হয়ে পড়ত না।

দুপুরে টানা ঘুমের পর ঠেলে তুলল সুতপা। চা এনে দিয়ে বসল খাটের কোণে। নিজের কাপটা হাতে।

সকালে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে আলাদা লাগছিল ওকে। শ্যামবর্ণ, ছিপছিপে, পিঠ কোমর ঢাকা একমাথা চুল, ঈষৎ লম্বাটে মুখ, ছোট কপাল, ঘন ভুরুর নীচে জ্বলজ্বলে কালো মণির চোখ, খাড়া নাক, পুরু ঠোঁট—এসব যেমন ছিল তেমনই আছে, তবু অন্যরকম। কমলার ওপর সবুজ ডুরে শাড়ি আর কপালের টিপটার জন্যেই কি? টিপ তো ও পরে না!

হোটেলের লবিতে অপেক্ষমাণ নয়, রণজয় চলে গেল শ্যামপুকুর স্ট্রিটে সুতপাদের ভাড়া বাড়ির দোতলার ঘরে। পশ্চিম দিকে মুখ করে থাকায় জানলা দিয়ে তেরছা হয়ে আসা অল্প রোদের আভা পড়েছে সুতপার মুখে। কপালের টিপটাই সামান্য অচেনা করে দিয়েছিল ওকে।

সুশান্ত দিল্লিতে, ওর কোনও আত্মীয়ের কাছে আছে এখন। ওখানে থেকেই পড়াশুনো, রিসার্চ করবে। সুতপা খবর দিচ্ছিল; পর পর, এমন ভাবে, যাতে ধারাবাহিকতায় ছেদ না পড়ে কোথাও। এর অনেকগুলোই সে বর্ধমানে গিয়েই বলতে পারত; বলেনি, সম্ভবত তাকে আপসেট করতে চায়নি। অনিন্দ্য মারা যাবার পর ওর দাদা সুনন্দ এসেছিল লন্ডন থেকে, পারমিতা আর তার মা-কে নিয়ে গেছে। স্কুল পেরিয়ে সবে কলেজে ঢুকেছিল পারমিতা, ওখানে পড়াশুনোর ব্যবস্থা হয়ে গেলে থেকে যাবে। একা মা মেয়ে এখানে থেকে কী করত।

রণজয় শুনছিল। চুপচাপ। ঘটনাগুলো মাথায় ঢুকলেও তাৎপর্য স্পষ্ট হচ্ছিল না তেমন।

অস্পষ্টতার মধ্যেই শুরু হয়ে গেল বৃষ্টি। অপেক্ষার সময় ছিল না, সুতরাং বৃষ্টির মধ্যেই অনিন্দ্যর চলে যাওয়ার খবরটা সে দিতে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। সন্ধের পরে দরজায় দাঁড়িয়ে চুপচাপ ঘটনা শুনল পারমিতা। কলেজে ঢোকার পর শাড়ি ধরলেও সেই মুহূর্তে স্কার্ট ছিল পরনে, পিছনের আলোর তারতম্যে মাথা থেকে পা পর্যন্ত অর্ধেক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল তাকে, বাকিটা ছায়ায় ঢাকা। পায়ের পাতা দেখা গেলেও হাঁটুর দাগে অন্ধকার। ভিজে গায়ে সে যখন চলে যাচ্ছে, হঠাৎই ডাকল। ফিরে তাকাবার পর সঙ্গে সঙ্গে বলেনি কিছু। তারপর বলল, 'ছোড়দার খবর আপনি দিয়ে গেলেন, আপনার খবর কে দেবে?'

শূন্য চায়ের কাপটা ওর হাত থেকে টেনে নিয়ে সুতপা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর আবার বালিশে মাথা দিয়ে রণজয় দেখছিল রোদ সরে যাচ্ছে। রোদের ছেড়ে যাওয়া জায়গাগুলো ভরে যাচ্ছে ছায়ায়। পুলিশ তাকে আর ছোঁবে না, প্রায় অভয় দেওয়া গলাতেই বলেছিল তীর্থঙ্কর, কেন বলল তা সে জানে না। কিন্তু তার মানে কি এই যে, সে কেউ নয়, কিছুই নয়, এই যে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল, তাতে তার কোনও ভূমিকা ছিল না। তাহলে অনিন্দ্য এমন কী করেছিল যে তার চেয়ে আলাদা হয়ে গেল। সুশান্ত দিল্লিতে, এই তথ্য সুতপা জানলে পুলিশ জানবে না এমন কী হতে পারে। না কি সুশান্তরও এমন কেউ আছে

যে তীর্থঙ্করের মতো, যে অভয় দিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারে নিরাপত্তায়। এসব ভাবতে ভাবতে ঘৃণায়, রাগে চোখে জল এসে গিয়েছিল রণজয়ের।

সুতপা ফিরে এসে বলল, 'কী হল। কাঁদছিস যে!'

'ঘেন্নায়।'

'কেন!'

'জানি না।'

ক' মুহূর্ত ফ্যাল ফ্যাল করে তার দিকে তাকিয়ে থেকে কিছু বোঝবার চেষ্টা করল সুতপা। তাপর হঠাৎই এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ল তার মুখের ওপর। দু হাতে মাথার চুল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে বলল, 'তুইও মরে গেলে আমার কী হত, রণো!'

রণজয় বুঝতে পারল না কী ঘটছে, কেন ঘটছে। তার আগেই অনুভব করল সুতপার বুক ঠেসে এসেছে তার বুকে, ঠোঁটদুটো এলোপাথাড়ি ঘুরে বেড়াচ্ছে তার কপালে, চোখের পাতা, গালে। শেষে চুম্বকের মতো চেপে বসল ঠোঁটে। সেই বয়সের আবেগে সুতপার বন্ধু থেকে নারী হয়ে ওঠা টের পেলেও রণজয় এমনই হতকচিত হয়ে পড়েছিল যে সাড়া দিতে পারেনি। বাধাও দেয়নি। যেন যা হচ্ছে হোক—সে কেউই নয়; কিছুই নয়।

সুতপা নিজেই উঠে বসল। আঁচলে ঠোঁট মুছে, আঙুল ছুঁইয়ে টিপটা ঠিকঠাক আছে কি না দেখে নিল। চোখ মুখ তখনও অসম্ভব ঘন। লজ্জা পাওয়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বন্ধু চিনতে পারিস না কেন!'

ভালবাসার ব্যাপারটা আসে পরে। তার আগে রণজয় বলেছিল, 'সুশান্তকে আমি দেখে নেব।'

'সরি, জেন্টলম্যান!'

বাবরি-চুলের লোকটি তার পিঠে হাত দিতে সচেতন হল রণজয়। টেলিফোন খালি হবার অপেক্ষা করতে করতে সম্ভবত স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল সে, না হলে রিসিভার নামানো দেখতে পেত, শব্দও শুনত। দেখল, লোকটি ও যুবতী লবির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে কফিশপের দিকে। ওদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটছে এতক্ষণ এখানে আটকে থাকা যুবতীর শরীরের গন্ধও। রিসেপশনের ঘড়িতে ছ'টা তেইশ।

সময়টা খেয়াল হতেই ফিকে হাসি ফুটল রণজয়ের ঠোঁটে। এতগুলো ঘটনা পেরিয়ে আসতে চার মিনিটও লাগেনি। মাঝখানে হারিয়ে গেল কুড়িটা বছর। তখন সুতপা টিপ পরত কপালে, বাবা অফিসে এবং অসুস্থ মা বিছানায় জেনে অনায়াসে উজাড় করে দিত নিজেকে। বৃষ্টির দিনে আশঙ্কায় বিষাদে সতেরো বছরের স্কার্ট-পরা পারমিতা নিজের অজ্ঞাতেই এমন ভাবে দরজায় এসে দাঁড়াত যাতে আলোর তারতম্যে আড়াল হয়ে যায় সাইকেল শিখতে গিয়ে কেটে যাওয়া তার হাঁটুর দাগ।

অপারেটর ৪০২-এ কানেকশন দিতে ফিরে এল মহিলা কণ্ঠের আকস্মিক 'হ্যালো।' পারমিতা? ব্যতিক্রম মনে হতে নিশ্চিত হবার জন্যে একটু চুপ করে থাকল রণজয়। সুশান্ত কাছে পিঠে থাকলে এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই এসে যাবে।

'হ্যালো!'

না, এখন সে নিশ্চিত হতে পারে। পারমিতারই গলা।

'আমি রণজয়।'

'ও, রণজয়দা!' পারমিতারই গলা, যে-স্কেলে 'হ্যালো' বলেছিল তার চেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত, 'আমরা আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি।'

'জানি তো। সুশান্ত কোথায়?'

'ও একটু নীচে গেল।'

'নীচে!'

'বোধহয় বুকশপে। বলল তো আসছে এখুনি। আপনি কখন আসছেন?'

নিজের মনেই একটু হেসে নিল রণজয়। প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'হোটেলের রুমে তোমাকে একা রেখে গেল!'

'কেন, আমি কি সবসময় পাহারায় থাকি?'

'থাকো না!'

'রাখুন তো!' কিছুটা এলাচ মুখে-দেওয়া গলায় পারমিতা বলল, 'থাকি কি না আপনি বুঝবেন কী করে! কখনও খোঁজ নেন আমার—, কেমন আছি না আছি!'

পরের কথাটা বলবার আগে একটু ভেবে নিল রণজয়। সতেরো বছরের কণ্ঠস্বর সাঁইত্রিশে পৌঁছুতে পৌঁছুতে বদলে যায়, তবু পারমিতার ব্যক্তিগত হবার চেষ্টা কান এড়াল না। রিসিভার হাত বদল করে সে চোখ রাখল লবির বাঁদিকের প্রান্তে, লবি-ম্যানেজারের ডেস্ক ছাড়িয়ে শপিং আরকেডের দিকে। বুকশপটা ওইদিকে। সুশান্ত ওখানে গিয়ে থাকলে ওই দিক থেকেই আসবে।

'এখন বিশ্বাস হচ্ছে তুমি সত্যিই এসেছ!'

'কেন!'

'কাল রাত্রে সুশান্ত যখন ফোন করে তখন তুমি স্যুটকেস ঘাঁটছিলে, আজ সকাল সাতটায় সমুদ্র দেখছিলে, সাড়ে ন'টায় ছিলে বাথরুমে। টেলিফোনে তোমার স্বামীর কৈফিয়ত শুনে সন্দেহ হচ্ছিল তুমি সত্যিই এসেছ কি না।'

পারমিতা জবাব দিল না।

'হ্যালো!'

'হুঁ!'

'সুশান্তর কৈফিয়তগুলো কি সত্যি ছিল?'

'উঃ, বাবা!' অল্প থেমে পারমিতা বলল, 'জোর করে আমাকে চাইলেই তো পারতেন!'

'জোর করে!'

'সে আপনি যা বোঝেন।'

'যাক, জানা থাকল।'

রণজয় হঠাৎ চুপ করে গেল।

'আপনার তো সাড়ে ছ'টার মধ্যে আসবার কথা ছিল?' পারমিতা বলল, 'কখন আসছেন?'

'আমি এসেই গেছি। নীচে, লবি থেকে বলছি। জেনে নিলাম তোমরা ঘরে আছে কি না।'

'ওপরে আসবেন তো!'

'এখনই আসব? নাকি সুশান্তর জন্যে—'

'ও চলে আসবে। আপনি আসুন।'

'আচ্ছা—'

ইতিমধ্যে আরও দুজন এসে অপেক্ষা করছে টেলিফোনের জন্যে। স্যুট-পরা বেঁটে শক্তপোক্ত চেহারার লোকটির মুখ দেখে মনে হয় রীতিমতো বিরক্ত। তবে নিশ্চিত সে বাবরি-চুলের লোকটির চেয়ে বেশি সময় নেয়নি।

টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে আরও একবার লবির চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিল রণজয়। লবিতে ঢোকার সময় যতটা দেখেছিল এখন তার চেয়ে তীব্র হয়ে জ্বলছে ঝাড়লণ্ঠনগুলো, আলো পিছলে যাচ্ছে দেওয়ালের ফ্রেস্কোয়, পিতলের বিশাল টবে সাজানো পাম গাছের পাতায়। তার মানে কমে এসেছে বাইরের আলো। সুশান্তকে দেখল না। রণজয় ভাবল, এই মুহূর্তে সুশান্তকে খুঁজে বের করার কোনও দায়িত্বও তার নেই। সে ওপরেই যাবে।

বার, সেজোয়ান রেস্তোরাঁ এবং মোগলাই রেস্তোরাঁর সামনে দিয়ে করিডোর পেরিয়ে লিফটের সামনে পৌঁছুবার আগেই ওপরমুখো হল একটা লিফট। যারা বেরিয়ে এল তাদের মধ্যে সুদর্শন একজনকে চেনা-চেনা লাগল। লোকটি চলে যেতে খেয়াল হল হিন্দি সিনেমার কোনও অভিনেতা, নাম মনে পড়ল না। বস্তুত হঠাৎই আবার অধৈর্য বোধ করতে শুরু করেছিল সে, কিছুক্ষণ আগে জ্যামে আটকে পড়ে যেমন করেছিল। লক্ষ্য ৪০২। পাশের লিফটের গতি নীচের দিকে লক্ষ করে স্বস্তি হল। কত আর দেরি হবে। লিফটের উল্টোদিকে সুইমিং পুলে আলো আছে এখনও। জলের স্বচ্ছ নীলে মাথায় ক্যাপ পরা সাঁতাররত একজনকে দেখল, শুধু মুখটাই ভাসছে, সামান্য আড়াল হয়ে থাকায় মেয়ে না পুরুষ বোঝা যায় না ঠিক। তার তাকিয়ে থাকার মধ্যেই জল কেটে সরে গেল আবার। রণজয় দেখল, সাঁতারের ঝাপটায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল জলে, সেটা মিলিয়ে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দূরে, করিডোর ধরে সোজাসুজি তাকালে চোখ আটকে যায় বর্ণবহুল ফ্রেস্কোয়। একই ধরনের বিমানের পোশাক পরে জনা পাঁচেকের একটা দল ঢুকল, তাদের পিছনে নীল পোশাকের তিনজন এয়ারহোস্টেস। নিশ্চয়ই কোনও বিদেশি এয়ারলাইনসের ট্রানজিট গেস্ট। ওরা রিসেপশনের দিকে চলে যেতে ফাঁকা হয়ে গেল জায়গাটা। সুশান্ত এল না।

এই মুহূর্তের উত্তেজিত নিঃশ্বাস সহজ করতে করতে রণজয় ভাবল, নিয়মিত না হলেও কলকাতায় মাঝেমধ্যেই তার দেখা হয় পারমিতার সঙ্গে, তা হলেও সুশান্তর অনুপস্থিতিতে হোটেলের ঘরে তাকে একা দেখবার জন্যে সে এত ব্যস্ত হয়ে উঠছে কেন! খানিক আগে যখন ওদের রুমে ফোন করার জন্যে সে রিসিভার তোলে, তখনও পারমিতাকে এভাবে একলা পাবার কথা ভাবেনি। তবে? পারমিতার কথাগুলোই কি বদলে দিল তাকে? যদি এমনও হয় যে, সে ঘরে ঢুকল এবং তারপরেও কিছুক্ষণ এল না সুশান্ত, শুধু সে আর পারমিতা, তখনই বা কী হবে! কুড়ি বছর আগে এক একান্ত মুহূর্তে সুতপা যেমন হঠাৎ হয়ে উঠেছিল আবেগে, পারমিতা নিশ্চয়ই তেমন কিছু করবে না। আর সে—সে কী করতে পারে!

বাজার ঘুরে আসা একটি পরিবার জড়ো হয়েছে লিফ্‌টের সামনে। হাতে উপছে ওঠা বড় প্লাস্টিকের ব্যাগ, পাতেসেরির পেস্ট্রির বাক্স। লিফট থেকে বেরিয়ে এল একজনই, শাঁসালো চেহারার এক বয়স্ক বিদেশি, মুখের ত্বকে অতিরিক্ত লালের আভা। পরিবারটিকে আগে উঠতে দিয়ে লিফ্‌টের এক কোণে দাঁড়িয়ে রণজয় সিদ্ধান্তে এল, না, সে কিছুই করতে পারে না। পারলে ঘটনায় আকস্মিকতা থাকত না; অনেক বছর আগেই বদলে যেতে পারত

ঘটনাগুলো।

সত্যি বলতে, আজও বুঝতে পারে না 'সুশান্তকে দেখে নেব' বলতে সেদিন কী ভেবেছিল সে। তিন চার বছর পরে—এমারজেন্সি চলছে তখন—দিল্লি থেকে কলকাতায় এসে সাউথ সিঁথি রোডের গলি থেকে সুশান্ত নিজেই খুঁজে বের করে তাকে, নিজের রেজাল্টের গল্প করে, থিসিস সাবমিট করার কথা বলে, লন্ডনে কিংবা আমেরিকার বার্কলে-তে হায়ার রিসার্চের জন্যে চলে যাবার কথা জানায়। এ সবই রণজয় শুনেছিল আঙুলের মাংসে নখ ঢুকিয়ে, চুপচাপ। অনিন্দ্য, বিষ্ণুদের কথা একবারও তোলেনি সুশান্ত। চায়ে চুমুক দিয়ে, সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'তোদের সঙ্গে একটা রোগা মতন মেয়ে পড়ত না, স্টুডেন্ট ফেডারেশন করত?' এইভাবেই খবর নেবার চেষ্টা করেছিল সুতপার। রণজয় বুঝতে পারে জেনেশুনে ন্যাকা সাজছে সুশান্ত; কিংবা, কলকাতা থেকে পালিয়ে এই ক'বছরে যে-অস্ত্রটায় খুব ভালভাবে শান দিয়েছে ও, তার নাম অবজ্ঞা। তারপর সে যখন রাত ন'টার সরু, এবড়োখেবড়ো, নিষ্প্রভ রাস্তা দিয়ে সুশান্তকে বাস রাস্তায় এগিয়ে দিতে যাচ্ছে, তখন হঠাৎই বলল, 'এক সময় এই রাস্তায় যখন তখন বোমাবাজি হত। এখন এটা কাদের এলাকা?' রণজয় জবাব দেয়নি; আদ্যন্ত অসহায়তায় তখন তার পেটের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে বমি। মাঝেমধ্যে হ্যাঁ-না করা ছাড়া চুপচাপ ছিল, চুপচাপই থাকল। নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে আকাশ দেখতে দেখতে সুশান্ত বলল, 'বিপ্লব আসন্ন, শুধু এই স্বর, শুধু এই স্বর সারাদিন হাওয়া আনে গরাদবিহীন জানালায়—, কার কবিতার লাইন যেন!' রণজয় জানত না, কিন্তু লাইনগুলো গেঁথে যায় স্মৃতিতে, সুশান্তর প্রতি ঘৃণায়। বাসস্টপে দাঁড়িয়ে সুশান্ত বলেছিল, 'যদি বিদেশে যাওয়া পাকা হয়ে যায় তোকে জানাব চিঠিতে।' তারপর বাসে ওঠার আগে, যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এইভাবে বলল, 'লাইনটা ঠিকই ধরেছিস। তবে অর্ডিনারি হয়ে কী হবে, সবাই তা-ই হচ্ছে। দ্যাখ বিজনেস ম্যানেজমেন্টটা পডতে পারিস কি না।'

লিফট থেকে বেরিয়ে অ্যারো-মার্ক দেখে ৪০২-এর দিকে এগোলো রণজয়। জানে, জোর করলেও সেদিনের ঘৃণার তীব্রতা ফেরত পাবে না এখন।

সুশান্ত লন্ডনেই যায়। দশ বারো বছর পরে, সাউথ সিঁথি রোড থেকে তাদের আর্ল স্ট্রিটের ঠিকানায় রি-ডাইরেক্ট করা একটা চিঠি তার হাতে তুলে দেয় তার স্ত্রী, সুতপা। সুশান্তর লেখা। পাকাপাকি ভাবে ফিরে এসেছে কলকাতায়, একবার দেখা হলে ওর ভাল লাগত। শুরুর কয়েকটা লাইন পড়েই বিরক্তিতে ফেলে দিয়েছিল রণজয়। দোমড়ানো সেই চিঠি মাটি থেকে কুড়িয়ে খুঁটিয়ে পড়তে পড়তে সুতপা হঠাৎ বলল, 'বউয়ের নাম পারমিতা। কোন পারমিতা? অনিন্দ্যর বোন নয় তো? সেও তো লন্ডনে চলে গিয়েছিল!'

সুতপার প্রশ্নে ধাক্কা থাকলেও জবাব দেয়নি রণজয়। হঠাৎ মনে হয়েছিল, সুতপা প্রশ্ন করল কেন, ঘটনা তো এইভাবেই ঘটে! একজন পারে না বলেই আর একজন পারে। একজন পৌঁছয় না বলেই অন্যজন পৌঁছে যায়। একজন বিভ্রান্ত হয় না বলেই অন্যজন হয়। কীভাবে, সেটা রহস্যই থেকে যায়। জরুরিও থাকে না। তখন সে সাত বছরের বিবাহিত; চাকরিতে মোটামুটি প্রতিষ্ঠিত। দু-দুবার গর্ভধারণ করেও সন্তানের জন্ম দিতে না পেরে কপাল চওড়া হতে শুরু করেছে সুতপার; ব্যস্ত থাকে পার্টির কাজে। একটা স্কুলে-টুলে চাকরি নেবে কি না ভাবছে। ইলেকশানে দাঁড়িয়ে হেরে গেলেও দল ক্ষমতায় থাকায় জোর বেড়ে গেছে তীর্থঙ্করের। সন্ধের পরের অন্ধকারে শ্যাওলা-ধরা চৌবাচ্চার ঘোলাটে জলের

দিকে তাকিয়ে কোনও কোনও দিন রণজয় যখন মদ খায়, তখন, কোনও কোনও দিন, হঠাৎ এসে পড়ে তাকে সঙ্গ দেয় তীর্থঙ্কর। তার স্মৃতি প্রখর। নকশাল আমলে তাদের বর্ধমানের গ্রামের বাড়িতে রণজয়কে লুকিয়ে রাখার সময় সে নিজেও কতটা আতঙ্কে ছিল, কীভাবে ম্যানেজ করেছিল লালবাজারকে, সেসব গল্প করে। রণজয় বুঝতে পারে না মদ, নাকি সুতপা, নাকি তার জীবনদাতার ভূমিকা—কোনটা তীর্থঙ্করের বড় আকর্ষণ।

সেইসময়, সুশান্তর খবরে রণজয়ের উৎসাহ নেই দেখে, সুতপা বলল, 'তুমি যা-ই ভাবো, আমি একবার খোঁজ করব পারমিতার। খুব দূরে তো নয়।'

ডোরবেলের শব্দ মিলিয়ে যেতে না যেতে এত দ্রুত দরজা খুলল যে রণজয়ের মনে হল দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়েছিল পারমিতা। তাকে ভিতরে ঢুকতে দিয়ে দরজা বন্ধ করল।

'এত দেরি হল আসতে! ফোন তো করেছেন অনেকক্ষণ।'

'কতক্ষণ?'

'ঘড়ি দেখিনি।' হাসতে হাসতেই ঘরের মাঝখানে চলে গেল পারমিতা, 'মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ।'

সতেরোয় যে অস্ফুট ছিল, যে-কোনও সম্ভাবনায় ধরে রাখত লাবণ্য, সাঁইত্রিশে পৌঁছে সে সম্পূর্ণ হবেই। পারমিতাও হয়েছে। যাকে দীর্ঘাঙ্গী বলে ও কোনও দিনই তা ছিল না, বরং মাঝারি; কিন্তু রঙে ও গঠনে, চোখ মুখ নাক ঠোঁট চিবুকের গড়নে উসকে দিত অদেখা অদৃশ্যের দিকে। সুশান্তর স্ত্রী হয়ে বিদেশ থেকে ফেরার পর যত বার দেখেছে পারমিতাকে তত বারই রণজয়ের মানসিকতা জুড়ে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সুশান্ত। আর দেখার ইচ্ছে হয়নি। আগাগোড়া ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি-ব্লাউজে ঢাকা, আজ, এখানে, তাকে পিছন থেকে দেখতে দেখতে হঠাৎই অদৃশ্যের আঁচ লাগল রণজয়ের শরীরে। পারমিতা তাকেই দেখছে দেখে সহজ হবার চেষ্টায় বলল, 'কুড়ি-বাইশ বছর পেরিয়ে এলাম। সময় লাগবে না!'

পারমিতা যে বুঝতে পারেনি তা ধরা পড়ল ওর চোখের চাহনিতে। ভুরু সামান্য তোলা, দৃষ্টি প্রশ্রয় খুঁজছে কৌতুকে।

'আজ দেখছি সব কথাতেই হেঁয়ালি করছেন!'

'সত্যি বললে তো বিশ্বাস করবে না!'

রণজয় ঘরটা দেখছিল। এখানের ঘর আগে যা দেখেছে তার চেয়ে আলাদা নয়। বাথরুম, বেড, দেয়ালের পেন্টিং, সোফা, রাইটিং-কাম-ড্রেসিং টেবিল, গোল খাবার টেবিল, বড় শেডের ল্যাম্প, চওড়া ওয়াড্রোব, সবই প্যাটার্নে ফেলা। তবে, ওদের ভাগ্য বলতে হবে, ঘরটা সি-ফেসিং। এটা কুপন-জেতার স্পেশাল ট্রিটমেন্টও হতে পারে। পর্দা সরানো দু দিকের মাঝখানে টানা কাচের ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সন্ধের আগের সমুদ্র, বিচিত্র রঙে বিচ্ছুরিত আকাশ, দূরের জাহাজ, বম্বে হাই-এর মশাল। অন্ধকার যত বাড়বে ততই আর সব ঢাকা পড়ে গনগনে রং ধরবে আগুনে। কিছুক্ষণ আগে গেটওয়ের সামনে দাঁড়িয়ে এই ঘরটা খোঁজবার চেষ্টা করেছিল সে। এখন এখান থেকে পার্কিংয়ের জায়গায় নিজের গাড়িটা খুঁজল। বন্ধ কাচের সামনে আধচাঁদা ব্যালকনিটা আড়াল করে দিচ্ছে দৃষ্টি। পেল না।

'চমৎকার ভিউ পাওয়া যায় এখান থেকে।' পাশে, প্রায় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে বলল পারমিতা, 'ব্যালকনিটা বন্ধ রেখেছে কেন বলুন তো?'

রণজয়ের নিঃশ্বাস ভারী হয়ে এল। অনেক দিন পরে পারমিতার এত কাছাকাছি দাঁড়িয়ে

ব্যর্থ লাগছে নিজেকে। কেমন অপমানিতও। অনুভূতিটা নতুন। হঠাৎ মনে হল, হোটেলের ঘর নয়, সে দাঁড়িয়ে আছে নিজের ঘরের জানলায়, অন্ধকারে; দূর সমুদ্রের ফসফরাসের সাদার দিকে তাকিয়ে। মুঠোয় পর্দা সরিয়ে রাখা পারমিতার মসৃণ হাতের দিকে, তারপর ব্লাউজ চেপে বসা কাঁধের ওপর চোখ রেখে পিছিয়ে এল সে। সোফার দিকে এগোতে এগোতে হেসে বলল, 'থ্রি নাইটস ফোর ডেজ-এর প্যাকেজে নিশ্চয়ই কোনও সুইসাইড অফার ছিল না।'

'স্যুইসাইড।'

'কিংবা খুন।' সোজাসুজি পারমিতার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল রণজয়, 'ধরো, খোলা ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছ তুমি, সুশান্ত হঠাৎ ধাক্কা দিল তোমাকে—'

'ও। সেইজন্যে।' রণজয়ের কথাগুলো নিজের মতো করে বুঝে নিয়ে পারমিতা বলল, 'এরকম হয়েছে নাকি? কেউ করেছিল স্যুইসাইড, ব্যালকনি থেকে?'

'শুনিনি। তবে সেটা সম্ভব। করলে ফাইভ-স্টার স্যুইসাইডের একটা কনসেপ্ট তৈরি হয়ে যেতে পারে।'

পারমিতার চোখ দরজার দিকে। কব্জিতে বাঁধা সোনালি ব্যান্ডের ঘড়িতে নজর বুলিয়ে নিল একবার। চিন্তিত নয়, কিন্তু কিছু ভাবছে যেন। কী তা অনুমান করতে পারল না রণজয়। এমনও মনে হল যে, মুখের ভাবে প্রকাশ না করলেও একটু আগে করা তার ঠাট্টাটা মেনে নিতে পারেনি পারমিতা। সুশান্ত ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারে, এ কথাটা সে বলতে গেল কেন।

'কী ভাবছ!' স্বাভাবিক হবার চেষ্টায় রণজয় বলল, 'তোমাকে এখানে রেখে লোকটা ফেরার হল কি না?'

'না, তা ভাবছি না। আসলে—', দুটো সোফার যেটাতে রণজয় বসে, তার উল্টোদিকের সোফাটায় বসতে বসতে পারমিতা বলল, 'আপনি নিশ্চয়ই অফিস থেকে এলেন। ও এলে একটু চা বলা যেত।'

'হোটেলে এসেও বাড়ির স্বভাব ভুলতে চাও না কেন! ফর্মালিটির দরকার নেই। এমনিতেই আমি চা কম খাই।' রণজয় বলল, 'তোমার খবর বলো? সকালে বেরিয়েছিলে কোথায়?'

'গোয়ায় বাসের টিকিট কাটতে। তারপর এদিক ওদিক—কোলাবা—মেরিন ড্রাইভ—অ্যাকোরিয়াম—'

'বোম্বাই শহরটা কিন্তু খারাপ নয়। এক একটা অঞ্চল খুবই সুন্দর।'

'কে দেখাচ্ছে! আজকের রাতটা কাটলে মাত্র কালকের দিনটা থাকবে। পরশু চলে যাব গোয়ায়—'

'ফেরার পথে?'

'না। তারপর বোম্বাইয়ে মাত্র একদিন। ওর ছুটি নেই। জানেন তো কীভাবে এসেছি!'

'লটারি জিতে। সুশান্ত বলেছে।'

'না হলে আসা হত না।' রণজয়ের দৃষ্টি অনুসরণ করে বুকের আঁচল টানল পারমিতা। মুখ নামিয়ে, ডান হাতে গলার পেন্ডেন্টটা নাড়াচাড়া করতে করতে বলল, 'এই ছ' বছরে একবার দিল্লি গিয়েছিলাম, সেখান থেকে দুদিনের জন্যে সিমলায়। বাকিটা কলকাতায়।

অ্যাবসোলিউটলি বোরিং—'

বলবার ঝোঁক আর উচ্চারণ বুঝিয়ে দিল দীর্ঘ দিন বিদেশে ছিল। এতক্ষণের খোলস ছেড়ে বেরিয়েও এল কিছুটা। রণজয় দেখল, অলস ভঙ্গিতে ডান পা-টা কার্পেটে ঠুকছে পারমিতা, সম্ভবত শেষ শব্দদুটির ভিতরের অভিজ্ঞতায়। হঠাৎই সংযত হল আবার।

'যত দিন লন্ডনে ছিলাম, বেশ ছিলাম। প্রত্যেক উইক এন্ডে বেরিয়ে পড়তাম একলা—'

'আর এখানে সবই লটারির ওপর!'

'যা বলেছেন!'

পারমিতা হাসল বলে রণজয়ও স্বতঃস্ফূর্ত হল। বলল, 'সুশান্তকে বলো ফেরার সময় ক'টা দিন থেকে যেতে। এখানে আমার একটা ফ্ল্যাট আছে, থাকার জায়গার অভাব নেই, রান্নাবান্নার লোকও আছে। জানলা দিয়ে এক চিলতে সমুদ্রও দেখা যায়। ফাইভ-স্টার কমফার্ট অবশ্য পাবে না—'

পারমিতা জবাব দিল না। দৃষ্টি দেয়ালের পেন্টিংয়ে—লাল হলুদ নীলের কৌণিক অ্যাবস্ট্রাকশনের মধ্যে থেকে একটি অবয়ব স্পষ্ট হতে গিয়েও হয়নি। বাঁ হাত এলিয়ে আছে সোফার গায়ে, ডান হাতের আঙুলগুলো হালকাভাবে ঘোরাফেরা করছে জানুর ময়ূরকণ্ঠী মসৃণতায়। আর একটু এগোলেই স্পর্শ করবে হাঁটুর সেই ক্ষতচিহ্নিত জায়গা, যা, হয়তো, এ জীবনে আর কখনওই চোখে পড়বে না। এ সব ভেবে নিঃশ্বাস সংবরণ করল রণজয়। একটু আগে যে-কাচের সামনে দাঁড়িয়ে ওরা সমুদ্র দেখছিল সেটা স্বচ্ছতা হারিয়ে কালো হচ্ছে ক্রমশ। আকাশ দেখা যায় না।

পারমিতা হঠাৎ বলল, 'এত ভাল ব্যবস্থা থাকতে সুতপাদিকে নিয়ে আসেন না কেন!'

প্রশ্নটা আশা করেনি রণজয়। সামান্য দ্বিধাগ্রস্ত। বিব্রত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'সুতপা কিছু বলেছে?'

'না। আমিই বলছি।' পারমিতা তাকেই দেখছে, কণ্ঠস্বরে জড়তা নেই কোনও, 'আজকাল মাঝে মাঝে যাই সুতপাদির কাছে। আপনার ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার ওখানেই পেলাম।'

রণজয় ভেবে পেল না কী বলবে। হঠাৎই তার মনে হল, বুকশপ বা যেখানেই যাক, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি সময় নিচ্ছে সুশান্ত। এত কী কাজ ওর! নাকি এসব কথা বলবে বলেই ওকে সরিয়ে দিয়েছে পারমিতা?

ভাবনাটা দাঁড়াল না। পারমিতা এতক্ষণ নিজেদের কথা ছাড়া কিছুই বলেনি। এখানে থেকে যাবার কথাটা সে না তুললে হয়তো সুতপার প্রসঙ্গ উঠতই না।

জবাবের অপেক্ষা না করে পারমিতা বলল, 'এখানে আসবার পর থেকে তো কলকাতাতেও যাননি একবারও!'

'না, যাইনি। অফিস ছাড়ছে না। তা ছাড়া—।' নিজেকে বিশ্বাস্য করে তোলার চেষ্টায় সময় নিল রণজয়, 'তুমি হয়তো বুঝতে পারবে, কলকাতা আমার ভাল লাগে না।'

'না। বুঝতে পারছি না। কলকাতা শুধুই একটা জায়গা। সুতপাদি, মেয়ে—এদের সঙ্গে সম্পর্ক কী! মেয়ের জন্যে মন কেমন করে না!'

'মেয়ে তো সুতপার।' কোণঠাসা অবস্থা থেকে নড়ে বসে প্রায় রূঢ় গলায় বলল রণজয়, 'ও অ্যাডপ্ট করতে চেয়েছিল, করেছে। আমি বাধা দিইনি। দ্যাটস অল। এ ছাড়া টুটুর

ব্যাপারে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।'

রণজয়ের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দিল পারমিতাকে। ছায়া পড়ল মুখে। অপ্রতিভ ভঙ্গিতে কয়েক মুহূর্ত অনির্দিষ্ট তাকিয়ে থেকে বলল, 'আপনি অখুশি হবেন জানলে এসব বলতাম না।'

খানিক আগেকার সহজ কথাবার্তা এইভাবে বেঁকে যাওয়ায় নিজেও অপ্রস্তুত বোধ করছিল রণজয়। পারমিতাকে কাছের কেউ বলে ভাবতে এখনও ভাল লাগে তার, সুশান্তর সঙ্গে জড়িয়ে ভাবলে মনে হয় দূরের। বস্তুত সে দূরেরই। পারমিতা বিদেশে চলে যাবার পরে যে-সম্পর্ক হলেও হতে পারত বলে মনে হয়েছে কখনও—হওয়া সম্ভব ছিল না বলেই হয়নি শেষ পর্যন্ত, সেই সম্পর্কের সামনে আজ কৌশলে আড়াল করতে পারত নিজেকে। পারেনি। বলতে কি, এই মুহূর্তের শিথিল হাসিতেও লুকোতে পারল না আগের কথাগুলো। নিজেকে অনেকটা নামিয়ে এনে বলল, 'খুশি অখুশির ব্যাপার নয়, পারমিতা। হয়তো এভাবে বলা ঠিক হল না। জানি না, দোষটা হয়তো আমারই। যে নিজের নয় তাকে আমি আপন করতে পারি না। টানটা ভেতর থেকে আসে, আমার আসেনি। মাঝে মাঝে নিজেকে খুব সেলফিশ মনে হয়। কী করব! আমি এইরকমই।'

পারমিতা জবাব দিল না। বাইরে পায়ের শব্দ। দরজার দিকে তাকিয়ে সতর্ক হল সামান্য। শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর পিঠ দিল সোফায়। খানিক থেমে থাকার পর আবার জানুর ওপর সক্রিয় হল ওর ডানহাতের আঙুলগুলো।

মুদ্রাদোষ? হয়তো। দেখতে দেখতে রণজয় বলল, 'কিন্তু সুতপা বলতে পারবে না আমি ওকে খারাপ রেখেছি—'

'সুতপাদি কিছুই বলেনি।'

পারমিতা উঠে দাঁড়াল হঠাৎ। ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে কর্ড-স্যুইচ টেনে, আয়নার দু পাশের আলো দুটো জ্বেলে, সেই আলোয় ঘাড় বেঁকিয়ে কাঁধের ওপর কাঁধ পর্যন্ত নামা চুল বরাবর শাড়ির আঁচল পরিপাটি করতে করতে বেশ কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আপনারও তো এখানে একা লাগার কথা! লাগে না?'

যতটা নিরপেক্ষ, ততটাই রহস্যময় শোনাল পারমিতার গলা। যেন এই কথাগুলো বলবার আগে আরও অনেক কথা ভেবেছে ও; যতটুকু বলল তার চেয়ে বেশি ধরে রাখল।

রণজয় ভাবতে শুরু করেছিল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া পারমিতার কাছে আদৌ জরুরি কি না। বেলজিয়ান কাচের নিখুঁত পরিচ্ছন্নতায় প্রতিফলিত ওর কোমর থেকে মুখ পর্যন্ত প্রতিটি অঙ্গে মাংসের সুষম বিস্তার; জানে বলেই বুঝতে পারছে পারমিতা আয়নার সামনে, না হলে ভাবা যেত শো-কেসের ভিতরে স্থির কোনও ম্যানিকিন।

সেই সময় বেল বাজল দরজায়।

পারমিতা এত দ্রুত দরজা খোলার জন্যে এগিয়ে গেল যে, রণজয়ের মনে হল তার জবাব নয়, এই শব্দটা শোনারই অপেক্ষা করছিল সে—ইচ্ছে করেই এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিল যাতে দরজা খোলার সুযোগটা নিজেই পায়।

যা ভেবেছিল, সুশান্তই।

পারমিতা বলল, 'এত দেরি?'

'বই দেখছিলাম।' সুশান্ত এগিয়ে এল। হাতে সাদার ওপর খয়েরিতে 'নালন্দা' ছাপ মারা পরিচিত প্লাস্টিকের ব্যাগ। দাঁড়িয়ে ওঠা রণজয়কে দেখে হাসল একটু। তারপর ব্যাগটা

বিছানার ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'তুই কতক্ষণ?'

পারমিতা এখন অনেকটা পিছনে, তাকেই দেখছে। ইচ্ছে করেই সময়টা কমিয়ে দিল রণজয়।

'মিনিট পাঁচ-সাত।'

'তাহলে বেশিক্ষণ নয়। বোস।' বিছানার ওপর পড়ে থাকা ব্যাগটা তুলে নিচ্ছে পারমিতা, সেদিকে তাকিয়ে খালি সোফাটায় বসতে বসতে সুশান্ত বলল, 'রেকর্ড কিনতে গিয়ে আটকে পড়লাম। এত বই!'

সুশান্তর পরনে সাদা পায়জামার ওপর তসরের পাঞ্জাবি। ব্যাক-ব্রাশ করা চুল কপালের দিকে পাতলা হতে শুরু করলে মুখটা চৌকোই লাগত। পাক ধরেছে জুলপিতে। লম্বায় পাঁচ ছয়-সাত, তার চেয়ে কম; কয়েক মাস আগে যেমন দেখেছিল তার চেয়ে একটু ভারী লাগছে, চশমার ফ্রেমও বদলেছে মনে হল। আত্মবিশ্বাসীই দেখাচ্ছে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে রণজয়ের দিকে বাড়িয়ে ধরল সুশান্ত, 'খাস তো?'

'না। অনেক দিন ছেড়ে দিয়েছি।'

'ভাল করেছিস।' নিজের সিগারেটটা ধরাবার জন্যে ব্যস্ত হল সুশান্ত, লাইটাররের আগুনে চকচক করছে তামাটে কপাল। ধোঁয়া ছেড়ে স্ত্রীকে দেখতে দেখতে বলল, 'আমজাদ আলিই নিলাম। নতুন বেরিয়েছে। সরস্বতী কল্যাণ আর খাম্বাজ—। রিভিউ পড়ছিলাম, খুব ভাল বাজিয়েছে। অবশ্য রণজয়ের কতটা পছন্দ হবে জানি না।'

'পছন্দ হবে না কেন। কলকাতায় দেখেছিলাম, ওঁদের বাড়িতে সরোদ, সেতারের অনেক রেকর্ড আছে—'

স্বামী-স্ত্রীর আলাপ থেকে ঘটনা আঁচ করে রণজয় বলল, 'কী ব্যাপার। হঠাৎ এসব ফর্মালিটি!'

'ফর্মালিটি কেন হবে।' দূর থেকেই বলল পারমিতা, 'আমাদেরও তো ইচ্ছে থাকতে পারে!'

সুশান্ত আসবার পর থেকেই নিজেকে বদলে ফেলেছে পারমিতা। টেলিফোনে, বা তারপরেও, ঘরে, কথায় ব্যবহারে যে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবটা ছিল, এখন আর তা নেই। বরং আড়ষ্ট। 'আমাদেরও' শব্দটায় জোর দিয়ে এই ঘরের মধ্যে পারস্পরিকতায় গড়ে ওঠা খানিক আগেকার মুহূর্তগুলোকে ভেঙে দিল যেন। রণজয়ের মনে হল, এখানে তার ভূমিকা আগে যেমন ছিল তেমনি, নিঃসম্পর্কিতের। হোটেলের এই ছবির মতো ঘরটা থেকে ওদের নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছে সে, গরজটাও তার, দু তিন ঘণ্টা পরে ফ্ল্যাট থেকে হোটেলে পৌঁছে দিয়ে যাবে আবার। তারপর ফিরে যাবে নিজের ফ্ল্যাটে। আবার কবে দেখা হবে। বা আদৌ হবে কি না, সে জানে না। সে যেমন আছে তেমনই থাকবে। আজকের ঘটনায় জীবন বদলাবে না এতটুকু। এই পরিস্থিতিতে এখানে উদ্দেশ্যহীন বসে থেকে লাভ কি। কথা বলার নেই, শোনার নেই, ইতিমধ্যেই অপরিচিত লাগতে শুরু করেছে পারমিতাকে, নিজেকেও মনে হচ্ছে জ্যামে আবদ্ধ। ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে যেভাবে অন্ধকার কাচের দিকে তাকিয়ে আছে সুশান্ত তাতে মনে হয় না তার সম্পর্কে কোনও আগ্রহ আছে ওর।

এসব ভাববার সঙ্গে সঙ্গে অস্বস্তিতে উঠে দাঁড়াল রণজয়।

'তোমরা তো রেডিই। আমরা যেতে পারি তাহলে—'

পারমিতা বলল, 'সত্যিই খাবেন না চা?'

'বললাম তো, চা আমি বিশেষ খাই না।'

'বোম্বাইয়ে শুনেছি সন্ধের পরে কেউ চা কফি খায় না।' নিজের ধরনে বলল সুশান্ত, 'সেইরকম কিছু নয় তো? আগে তো খুব চা খেতিস!'

'আগে তো অনেক কিছুই করতাম।' ট্রাউজার্সের দু পকেটে দুটি হাত, দরজার দিকে এগিয়ে জোর করে হাসল রণজয়, 'আমি একা নয়, আমরা অনেকেই। আগের সবকিছুই কি মানুষের সঙ্গে সঙ্গে আসে! কিছু কিছু ছেড়েও যায়।'

'বাব্বা! এমন দার্শনিক হলি কবে থেকে!' সুশান্তও উঠে পড়েছিল। পেডেস্টাল ল্যাম্পের সুইচ অফ করে, ঘরের চাবিটা তুলে নিল টেলিফোনের পাশ থেকে। তারপর, রণজয়ের প্রতিক্রিয়া লক্ষ না করেই বলল, 'সন্ধের পর অবশ্য আমিও চা-টা বিশেষ খাই না আজকাল। ওই পেগ দুয়েক হুইস্কি। ঘুমটা ভাল হয় তাহলে—'

সুশান্ত দরজা খুলে দাঁড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল রণজয়। ওখান থেকেই দেখল পারমিতাকে—হাতে শর্ট কালারের র-সিল্কের ব্যাগ, রেকর্ডের প্যাকেটটাও নিয়েছে। এখনই তার মনে হল, অনিন্দ্যর বোন আর সুশান্তর স্ত্রীর মাঝখানে কেউ একজন ছিল, যে উইক এন্ডে একাই বেরিয়ে পড়তে পারত, স্বাধীনতা চিনত। তাকে সে দ্যাখেনি। দেখলে হয়তো বুঝতে পারত ওর এই মুহূর্তের আড়ষ্টতার কতটা বিবাহিত সম্পর্কের দান, কতটা সুশান্তর। মাঝখানের সেই অভিজ্ঞতার অভাবে এখন নিজেকেই কেমন খেই হারানো লাগছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে ওরা লিফটের দিকে এগোচ্ছিল। আগে আগে রণজয়, একটু পিছনে সুশান্ত আর পারমিতা। উল্টোদিক থেকে আসা এক তরুণ, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বিদেশি দম্পতিকে পাশ কাটিয়ে যাবার আগে হঠাৎ সুশান্তর গলা শুনল রণজয়।

'আমার ওষুধটা দিলে না তো!'

'সরি! একেবারে ভুলে গেছি।'

'এত ভুলে যাও কেন!'

ওদের দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে রণজয়ও দাঁড়িয়ে পড়ল। খুবই অপ্রতিভ লাগছে পারমিতাকে। ওইভাবেই কয়েক সেকেন্ড থমকে থেকে বলল, 'দু' মিনিট তো লাগবে। খেয়ে যাও তাহলে—'

'আবার যাব?' সুশান্ত ভাবল একটু। তারপর রণজয়ের দৃষ্টি লক্ষ করে বলল, 'থাক। রাত্রেই খাওয়া যাবে। চলো।'

ব্যাপারটা তুচ্ছ বলেই মনে হচ্ছে। রণজয় উৎসাহ দেখাল না। লিফটের সামনে এসে শুধু মনে পড়ল, তাকে দার্শনিক বলে ঠাট্টা করার পরে জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রের ওপর রেখে, উঠে ল্যাম্প নেভাতে যায় সুশান্ত, তারপর চাবি তুলে সটান চলে আসে দরজার দিকে। সিগারেটটা নিভিয়েছিল কি? পরেই ভাবল, ঠাট্টাটা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অসহায় চোখে তার দিকে তাকায় পারমিতা, সুশান্ত ঠিক কী করেছিল তা সে দ্যাখেনি। সুশান্তকে ওষুধ দেবার কথাটা ঠিক কোন সময় ভুলে যায় পারমিতা?

২

আলো খেলছে টুটুর মুখে। সকালের ঝকঝকে আলো নয়; চার হাত দূরত্বে দাঁড়ানো বড় বাড়ির পাঁচিলে রোদ পড়েছে তেরছা হয়ে—বেশ তেজী রোদ, তারই আভা ছড়িয়েছে তাদেরও জানলায়। কিছু দিন আগে রং ফেরানো জানলার কপাটে নরম, সুস্মিত ভাব ফুটেছে একটা। সেদিকে তাকিয়ে কে বলবে এখন শরৎ-হেমন্ত নয়, ঘোর গ্রীষ্ম। রোদ্দুরে ছায়া ফেলে চকিতে অদৃশ্য হল একটা বড় ডানাব রঙিন প্রজাপতি।

শিকের এদিকে পর্দা-সরানো জানলার কপাট খোলার জায়গাটায় বসে এক পা ঝুলিয়ে অন্য পায়ে পাছা ঠেসে সেই আলোয় মুখ ভাসিয়ে রেখেছে মেয়েটা। বিছানা থেকে ওই জায়গার যে দূরত্ব, আড়াই বছরের শিশুর পক্ষে তা পেরুনো সম্ভব নয়। এমনিতে খুবই শান্ত; ইদানীং হাত পা ছাড়াতে শুরু করেছে টুটু, ছটফটে ভাব এসেছে শরীরে, কোনও উদ্ভট খেয়ালে কখন মেতে উঠবে ঠিক থাকে না। যতটা পারা যায় চোখে চোখে রাখতে হয়। তবু, সুতপার চোখের আড়ালে অসম্ভবকে সম্ভব করতে গিয়ে ওই জায়গাতেই এর আগে আছাড় খেয়েছে বার দুয়েক। একবার তো এমন চোট পেল যে ঠোঁট কাটল, কালসিটে পড়ল কপালে—থ্রম্বোফব লাগিয়ে আর আর্নিকা খাইয়ে ফুলো কমাতে সাতদিন কেটে গেল। শিক্ষা হয়নি তাতেও। কী যে ঝোঁক মেয়েটার ওই জানলায় গিয়ে বসার, শিকে মুখ চেপে এক চিলতে আকাশ দেখার, পাঁচিলে উড়ে আসা শালিক, চড়ুইয়ের সঙ্গে কথা বলার।

ঝোঁক যাচ্ছে না দেখে খাট আর জানলার তাকের মাঝখানে সুতপা এখন বেতের মোড়া পেতে রাখে; মোড়া বেয়ে ইচ্ছেমতো ওঠানামা করতে পারে টুটু। যাতে মোড়া পিছলে ভারসাম্য না হারায় সেজন্যে লাল কাগজের শিশুর পা বানিয়ে মোড়ার মাঝখানে সেঁটে দিয়েছে সুতপা। টুটুর বুদ্ধি আছে, ওঠানামার আগে খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করে চিহ্নিত জায়গাটা। তারপর পা ফেলে। তবে শিশু শিশুই, কখন বেফসকা হবে কে জানছে।

ইস্ত্রি-করা শাড়ির পাট ভাঙতে ভাঙতে আড়ে তাকিয়ে মেয়েকে দেখে নিল সুতপা।

একটু আগে বাসন মেজে, কাপড় কেচে, ঘর ঝাঁট দিয়ে ল্যান্সডাউন মার্কেটে দুধের খোঁজে গেছে অণিমা। অন্যদিন সকালে কাজে আসবার সময়েই দুধের বোতল নিয়ে ঢোকে। আজ এল খালি হাতে। রাত্রে ঝড়জলের জন্যে নাকি দুধের গাড়ি এসে পৌঁছয়নি। বুথ বন্ধ। সুতপা ত্রাহি গুনল। এখনই ব্যবস্থা না করলে সারাদিন দুধ পাবে না মেয়েটা। নিজে বেরুতে পারবে না বলে অণিমাকেই পাঠাল।

এটা তার ব্যস্ততার সময়। এগোতে হয় ঘড়ি ধরে। টুটুকে স্নান করিয়ে, ড্রেস পরিয়ে নিজেও তৈরি হচ্ছিল। এরপর ওর টিফিন বাক্স গোছাবে; মেয়েকে খাইয়ে নিজে খাবে। নিজে স্কুলে যাবার আগে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ক্রেশে পৌঁছে দেবে টুটুকে। তারপর কালীঘাট স্টেশন থেকে মেট্রো ধরে টালিগঞ্জ, সেখান থেকে অটো রিকশায় নাকতলা। স্কুল-ফেরতা আবার একই রুটিন। ক্রেশ থেকে টুটুকে নিয়ে বাড়ি ফেরা। তারপর বাড়িতেই থেকে আরও একটা দিন পার করে দেওয়া। তবে, মাঝে মাঝে যেমন হয়, আজ বিকেলে সামান্য পাল্টে যাবে রুটিনটা।

শাড়িতে মাড় পড়েনি ভাল। ভাঁজ খুলতে না খুলতেই ভেঙে যাচ্ছে ইস্তিরি। বেকায়দা লাগলেও বিরক্ত হল না সুতপা। এখন আর নতুন শাড়ি ভাঙার সময় নেই, বরং বিকেলে

আবার বেরুবার আগে বদলে নেবে শাড়িটা। কোমরে কুঁচি ফেলতে ফেলতে মেয়ের দিকে না তাকিয়েই হাঁক পাড়ল সে, 'টুটু, তোমার ভাল নাম কী?'

'সুটপা।'

'আবার দুষ্টুমি! ঠিক করে বলো। মিস জিজ্ঞেস করলে কী বলবে?'

'চন্দনা।'

'পুরো নাম বলো।'

'চন্দনা বসু।'

'গুড। লক্ষ্মী মেয়ে।' সুতপার ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে গেল।

মাঝখানে সিঁদুর পরা ছেড়ে দিয়েছিল সুতপা। শুধু মাসিকের পর একদিন সংস্কারবশত চিরুনির আগায় এক চিলতে ছুঁইয়ে দিত সিঁথিতে। সংস্কারজড়িত দ্বিধাতেই এর বেশি গুরুত্ব দিত না আর। রণজয় যেদিন ভোরের ফ্লাইটে বোম্বাই চলে গেল, সেদিন হঠাৎ শূন্য লাগা থেকে ফিরে আসে বেশ কিছু স্মৃতি। সব স্মৃতির অর্থ স্পষ্ট হয়নি। তবে, সেদিন চানটান সেরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতে দেখতে হঠাৎই সিঁদুর পরার ইচ্ছে হয় তার। সরু রেখায় পরেও ফেলে। ইচ্ছেটা থেকে গেছে।

এখন সিঁথিতে সিঁদুর ছোঁয়াতে ছোঁয়াতে সুতপা বলল, 'টুটু, তোমার বাবার নাম বলো।'

'বাবা দুষ্টু।'

'ছিঃ, এভাবে বলবে না। বলবে, রণজয় বসু।'

অভ্যস্ত কথায় আবেগ থাকে না। খুব তাড়াতাড়ি পরের কথায় চলে গেল সুতপা।

'আজ বিকেলে আমি একটু বেরুব। যাব আর আসব। তুমি অণিমা মাসির কাছে থাকবে।'

টুটু সাড়া দিল না। সুতপা দেখল, জানলার নীচে তাকিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু দেখছে মেয়েটা।

এর পরের সমস্যা বিকেলে ঘণ্টা তিন সময় টুটুকে আগলানোর জন্যে অণিমাকে রাজি করানো।

মহিলা সমিতির প্রতিবাদ সভা আছে আজ। সকালে, টুটু তখনও ঘুমে, চা খেতে খেতে নোটিশ দেখেছে কাগজে। বক্তৃতা করবেন সেবা মিত্র, মনীষা সেনগুপ্ত, গঙ্গামণি দত্তরা। অনেক দিনের চেনা মুখ সব; কলেজে পড়বার সময় এবং তার পরেও বেশ কয়েক বছর, যখন সক্রিয় ছিল পার্টির কাজকর্মে—মিটিং মিছিলে যেত, পোস্টার লিখত, চাঁদা তুলত, তখন দেখা হত প্রায়ই। বিশেষত মনীষাদি—, তাদের ইতিহাস পড়াতেন কলেজে। কী কারণে যেন স্বামী আর ছেলেকে ছেড়ে বিয়ে করেছিলেন গ্রুপ থিয়েটারের বাঘা অভিনেতা অনিমেষ সেনগুপ্তকে। অনিমেষও মারা গেছেন বছর দু তিন আগে। তখনই ভেবেছিল গিয়ে দেখা করবে মনীষাদির সঙ্গে। হয়ে ওঠেনি। আজ গেলে দেখা হবে। তাছাড়া সভাটাও জরুরি। দিন কয়েক আগে হুগলিতে পুলিশ লক-আপে ধর্ষণ করা হয়েছে এক যুবতীকে। এই ঘটনার ক'দিন আগে রাতের অন্ধকারে বেলেঘাটার কাছে কোনও বস্তিতে ঢুকে সমাজবিরোধীরা মারধোর, শ্লীলতাহানি করেছে কয়েকজন মহিলার। সেখানেও ধর্ষিতা হয়েছে দুজন। পুলিশ বলছে এটা দু দল সমাজবিরোধীর মধ্যে এলাকা দখল নিয়ে মারামারির ফল—যারা এসব করেছে তারা চোলাই মদ খেয়ে উন্মত্ত ছিল। তাহলেও, এর শিকার মেয়েরা হবে কেন। একটা পুরুষও জখম হয়নি। রিপোর্টে লিখেছে আক্রমণ হতে

পারে অনুমান করে পুরুষগুলো নাকি আগেই গা-ঢাকা দিয়েছিল। ওদের না পেয়েই গুণ্ডাগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে মেয়েদের ওপর। আশ্চর্য, এইভাবেই ঘটবে নাকি ঘটনাগুলো। কাগজে লিখেছে আগে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের যতটা নিরাপত্তা ছিল এখন আর তা নেই। না, সত্যিই এর প্রতিবাদ দরকার।

সকালেই তেতো হয়ে গিয়েছিল মনটা। আজকাল কাগজ খুললেই শুধু এইসব—ধর্ষণ, গণধর্ষণ, শ্লীলতাহানি। আর, কাগজগুলোও হয়েছে তেমনি, এমন ফলাও করে, খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়ে ছাপে এইসব খবর যে গা রি রি করে। পড়তে পড়তে মনে হয় মেয়েরা আর মানুষ বলে গণ্য হচ্ছে না—যেন মেয়ে হয়ে জন্মানো মানেই যে-কোনও সময়ে ধর্ষিতা হবার সম্ভাবনায় থাকা। একবিংশ শতাব্দী, কম্পিউটার যুগ, পেরেস্ত্রৈকা, স্ত্রী স্বাধীনতা নিয়ে এত আলোচনা, লেখালেখি—কিছুতেই কিছু নয়। বোঝা যায় না সময় মানুষকে কোনদিকে নিয়ে যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে গিয়ে ফেলবে। টুটু বড় হতে হতে আরও কত কী হবে কে জানে!

টুটুর কথাই নিয়ে গেল অন্য চিন্তায়। সুতপা ভাবল, যদি এমন হয় যে হঠাৎই তার কিছু হল, বেশিদিন বাঁচল না, তাহলে মেয়েটার দায়িত্ব কে নেবে। রণজয় মাঝে মাঝে চিঠি দেয়—দু চার লাইনের সেসব চিঠিতে প্রয়োজনের কথা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। 'আশা করি তোমরা ভাল আছ' গোছের একটা লাইন যদিও ভেসে ওঠে চিঠির শেষে, তবু, খুঁটিয়ে লক্ষ করেছে সুতপা, আলাদা ভাবে টুটুর কথা থাকে না চিঠিতে, যা পড়ে মনে হতে পারে মেয়েটা সম্পর্কে আলাদা কোনও চিন্তা, আবেগ, দুর্বলতা আছে রণজয়ের মনে।

তখন মেয়ে না নিয়ে যদি কোনও ছেলেকে দত্তক নিত তাহলে বোধহয় আজকের এই বাড়তি চিন্তাটা থাকত না।

টুটুকেও যে খুব ভেবেচিন্তে নিয়েছিল তা নয়। আসলে সিদ্ধান্ত নেবার পরে মিশনারিজ অব চ্যারিটিজ-এ কথা বলতে গিয়েই গুলিয়ে গেল সব। কথায় কথায় সিস্টার বললেন, অনাথ শিশুদের নিয়েও যে এত বাছবিচার হতে পারে তা তাঁরা ভাবতে পারেন না। অধিকাংশ মা বাবাই চায় ফর্সা, নাদুসনুদুস, সুন্দর চোখমুখের ছেলে; মেয়েগুলো পড়ে থাকে। বোধবুদ্ধি হলে এদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় অন্য কোনও হোমে। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত এরা যাবে কোথায়?

সেদিন ফেরার সময় দুজনেই চুপচাপ ছিল। তবে, বাড়িতে পৌঁছুবার আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সুতপা, একটি মেয়েকেই দত্তক নেবে সে—যে-কোনও মেয়ে, শুধু সুস্থ হলেই হল।

হ্যাঁ বা না, কিছুই বলেনি রণজয়। তারও আগে, সুতপা যখন দত্তক নেবার কথা তোলে, অদ্ভুত চোখে ওকে দেখতে দেখতে রণজয় জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি ধরেই নিয়েছ তোমার আর হবে না?'

সুতপা বুঝতে পারেনি কী বলবে। রণজয়ের দৃষ্টি লক্ষ করে এবং গলার স্বর শুনে তার মনে হয়েছিল প্রশ্নটা যত সহজ তার পক্ষে জবাব দেওয়া ততটা সহজ হবে না। কেন এমন মনে হয়েছিল জানে না। তবে একটা অনিশ্চিতিবোধ ঝুঁকে এসেছিল ভিতরে, যেন সে যা বলবে তার ওপরেই নির্ভর করবে তার আর রণজয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক।

'আমার হওয়া না-হওয়ার সঙ্গে একটা বাচ্চাকে অ্যাডপ্ট করার সম্পর্ক কী।' প্রশ্নটা

এড়িয়ে গিয়ে সুতপা বলেছিল, 'যাদের দুটো তিনটে বাচ্চা থাকে তারা কী করে মানুষ করে! আমরা তো পারি এখন।'

সম্ভবত তার গলায় জেদ ফুটেছিল। কথাগুলোয় তীব্রতা কতটা তা বুঝতে বুঝতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে রণজয় বলেছিল, 'সামাজিক দায়িত্ববোধ! খবরের কাগজের আর্টিকেল পড়ে ডিসিশন নিচ্ছ না তো?'

এ ধরনের প্রতিক্রিয়া আশা করেনি সুতপা। আঁতেও লেগেছিল।

'হঠাৎ এ কথা! আমি নিজে কি ডিসিসন নিতে পারি না? আমারও তো কিছু ইচ্ছে থাকতে পারে!'

'নিশ্চয়ই পারে।' জোর দিয়ে কথাগুলো বলে থামল রণজয়। তারপর বলল, 'তবে পরে আপশোস কোরো না যেন।'

এর পরে আর কোনও ঝামেলা হয়নি। পছন্দ অপছন্দ কিছু না জানালেও দত্তক নেবার ব্যাপারেই যা যা করার সবই করেছিল রণজয়।

বহুদিন পরে আজ সকালে কথাগুলো মনে পড়ায় সুতপা ভাবল, সেদিন আপশোস করার কথাটা কেন বলেছিল রণজয়? সে কি আগেই ভেবে রেখেছিল, টুটু হোক বা যে-কেউ, সুতপা যাকে নিয়ে আসবে তার দায়িত্বও সুতপাকেই নিতে হবে!

হয়তো। টুটু আসার পর থেকেই নিজেকে কেমন যেন গুটিয়ে নিয়েছে রণজয়।

উঠে আসা নিঃশ্বাসটাকে চাপা দিল সুতপা। দায়িত্ব যখন সে নিজেই নিয়েছে তখন দরকার হলে সেটা একাই পালন করবে। মানুষ বর্তমানে বাঁচে। অনেক বছর আগে পুলিশের হাত থেকে রণজয়কে বাঁচাবার জন্যে সে যখন মরিয়া হয়ে উঠেছিল, হাতে-পায়ে ধরেছিল তীর্থঙ্করের, তখন জানত না একদিন তারা স্বামী-স্ত্রী হবে। আশঙ্কার মধ্যে শুধু কিছু দুর্বোধ্য অনুভূতিতে ছেয়ে গিয়েছিল মাথা—মনে হয়েছিল কোনও কারণে যদি রণজয়ের কিছু হয় তাহলে খালি হয়ে যাবে তার আশপাশের জায়গাগুলো; ভাল লাগবে না, কিছুই ভাল লাগবে না। সেই সময়ে সেই সময়টাই চিল আসল। পরে কেমন দ্রুত বদলে গেল সব। রণজয় বদলে গেছে, সে নিজেও কম বদলায়নি। এমন কি হতে পারে, এখনকার জটিলতাগুলো পরে আর থাকবে না, রণজয় আবারও বদলাবে!

টুটুর মুখে আলো পড়েছে। জানলায় বসে বিচিত্র শব্দ করছে মুখে, আরও ছোট বয়সে যেমন করত। কখনও 'আয়, আয়', কখনও 'হ্যাট, হ্যাট'। ওদিকের পাঁচিলে পাখিটাখি দেখলে যে-ভাষায় কথা বলে তার সঙ্গে এখনকার ভাষার মিল নেই কোনও।

সন্দেহ হওয়ায় সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে কথা বলছ, টুটু?'

মুখ না ফিরিয়েই টুটু বলল, 'ফুলের সঙ্গে।'

'ফুলের সঙ্গে! ফুল পেলে কোথায়?'

টুটুর মুখ শিকের কাঠে ঝোঁকানো। বাড়ানো হাতে নিসপিসে ভঙ্গি। ওইভাবেই বলল, 'আমার দিকে আসছে।'

কী বলছে, কেন বলছে বোঝা যাচ্ছে না কিছু। ঘরের ভিতর ছায়া থাকায় আলোকিত জানলার ফ্রেমে টুটুকে ছাড়া আর কিছু চোখেও পড়ছে না ভাল করে। ওদিকের পাঁচিল আর তাদের জানলার মাঝখানের সরু গলিটা ভরে আছে বুনো ঝোপ, ঘাস আর আগাছায়। আগে বাড়িওয়ালারা যখন ওপরে থাকত তখন মাঝেমধ্যে পরিষ্কার করাত গলিটা; তারা ভাড়াটে

বসিয়ে কেয়াতলায় নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পর থেকে আর হাত পড়ে না ওখানে। এখন আগাছা বেশ ঘন; ফুল দেখবে কোথায়!

হঠাৎই একটা আশঙ্কা কাঁপিয়ে গেল সুতপাকে। আঁচলটা কাঁধে ফেলে তাড়াতাড়ি ছুটে এসে দেখল, প্রায় তিন ইঞ্চি মাপের একটা বিদঘুটে রোঁয়াঅলা শুঁয়োপোকা শুঁড় ঘষছে কাঠে। টুটু ধরবে।

দু হাতে ছোঁ মেরে মেয়েকে তুলে খাটের ওপর ছুড়ে ফেলল সুতপা। চঞ্চল হয়ে উঠল নিঃশ্বাস। এক্ষুনি একটা বিশ্রী রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত। ছুঁলে নিশ্চিত শুঁয়োর বিষ-জ্বলুনিতে ছটফট করত মেয়েটা। তার জের কতক্ষণ চলত কে জানে!

কয়েক মুহূর্ত বিছানার ওপর থমকে থেকে চিৎকার করে কান্না জুড়ে দিল টুটু।

'চুপ! একেবারে চুপ!' মেয়েকে ধমক দিল সুতপা, 'ওটা ফুল নয়, জুজু। কাঁদলেই গায়ে ছেড়ে দেব।'

সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কান্না। মুখ দেখে মনে হয় ভয় পেয়েছে।

সুতপা দেখল জানলার কাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করছে শুঁয়োপোকাটা। সাদায় সোনালিতে মেশানো রোঁয়া, ডগার দিকে মেটে কালো, সেখানে চকচক করছে ছোট্ট পুঁতির মতো দুটো লাল বিন্দু। এখনই ওটাকে না সরালে ঢুকে পড়বে ঘরে।

মেয়েকে চুপচাপ বসে থাকতে বলে রান্নাঘরের পাশ থেকে নারকেল ঝাঁটাটা নিয়ে এল সুতপা। একটা বড় কাঠিকে দু টুকরো করে খুব সতর্ক ভঙ্গিতে দু দিক থেকে চেপে কাঠিতে বিঁধে ফেলল পোকাটাকে। তালার আংটার মতো কাঠির দুপাশে পোকাটা ফুলে উঠতে নিশ্চিন্ত হয়ে কাঠিসুদ্ধ সেটাকে ছুড়ে দিল জানলার বাইরে। ঝুঁকে দেখল, আটকে গেছে আগাছায়।

মা'র পুরো কারসাজি খুব মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছিল টুটু। এবার জিজ্ঞেস করল, 'জুজু আছে?'

'না। চলে গেছে।' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ণ হাসল সুতপা, 'না দেখলে কী হত বলো তো! তুমি এখন চুপটি করে বসে বইয়ের ছবি দ্যাখো। অণিমা মাসি আসুক, তারপর খেতে দেব।'

হাত ধুতে যাবে ভেবেও নড়ল না সুতপা। জানলায় দাঁড়িয়ে আকাশ দেখার চেষ্টা করল। খানিক আগে যতটা ঔজ্জ্বল্য টের পেয়েছিল রোদে এখন আর তা নেই। এমনও হতে পারে সূর্য সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে আসছে ছায়া। এই সকালের দিকেই যা কিছুক্ষণ দেখা মেলে রোদের, তারপর বাইরে তাকালে বেলা বোঝা যায় না, বিকেলের গায়ে গায়ে এসে পড়ে সন্ধে। আলো আসে না, হাওয়াও প্রায়ই ঢোকে না।

আর্ল স্ট্রিটের এই একতলাটা এমনিতেই চাপা। যত দিন সামনের বাড়ির পিছনের বাগানটা খোলা ছিল, হাওয়া দিত নিমগাছটা, তত দিন এসব সমস্যা ছিল না। বিয়ের পর সে আর রণজয় যখন সস্তার এই একতলাটা ভাড়া নিতে আসে, তখন রাস্তা থেকে একটু পিছন দিকে পড়ছে বলে মন খুঁতখুঁত করলেও বন্ধ ঘরের জানলা খুলে দিতেই নিম, পেয়ারার সাবলীল হাওয়ায় ভেসে গিয়েছিল দুজনে। সামনের পুরনো দোতলা বাড়িটা ভেঙে ছ' তলা মাল্টিস্টোরেড ওঠার পর থেকে সাবাড় হয়ে গেছে বাগানটাও। বড় বাড়ির গাড়ি যাতায়াতের রাস্তার পরেও আছে পাঁচ ফুট উঁচু পাঁচিল। রোদ, হাওয়া যেটুকু সম্ভাবনা নিয়ে আসে তা

ঠিকঠাক পৌঁছুনোর আগেই ফিরে যায় পাঁচিলে ধাক্কা খেয়ে। মাঝে মাঝে মনে হত সুতপার, তাদের জীবনের ক্রমশ কমে আসা উত্তাপের মতো স্যাঁতসেঁতে হয়ে উঠছে বাড়িটা। বদ্ধতা চেপে আসছে চারদিক থেকে।

টুটু আসবার পর শিশুর আহ্লাদ ও কান্নায় যখন তাদের প্রায় নিস্তরঙ্গ জীবনে ঢেউ লেগেছে সামান্য, তখন থেকেই বুঝতে পেরেছিল সব আহ্লাদই-নষ্ট হয়ে যাবে যদি বাড়িটা এমন সোঁদা, স্যাঁতসেঁতে, অন্ধকার হয়ে থাকে। রণজয়কে বলেওছিল কথাটা। প্রথম দিকে তেমন গা না করলেও বাড়ি বদলানোর ব্যাপারে পরে নিমরাজি হয় রণজয়—টুটুর জন্যে যতটা না, তার চেয়ে বেশি নিজের গরজে।

ম্যাকফারসন হিন্দুস্তানের চাকরিতে তত দিনে অনেকটা উন্নতি হয়েছে রণজয়ের। ম্যানেজেরিয়াল কেতা রাখতে কিছু-কিছু পুরনো অভ্যাস ছেড়ে নতুন অভ্যাসে জড়াতে শুরু করেছে নিজেকে। বোধহয় এগনোর রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছিল সামনে। অফিস থেকে যাতায়াতের কার লিফটের ব্যবস্থা চালু হবার আগেই ভবিষ্যতে গাড়ি পাবে ধরে নিয়ে ড্রাইভিং শিখে নিয়েছিল অটোমোবিল অ্যাসোসিয়েসনের ট্রেনিংয়ে। আগে মাঝে মধ্যে মদ খেয়ে আসত বাইরে থেকে; কে কখন আসবে, আপ্যায়ন করতে হবে এই ভাবনা থেকে এখন বাড়িতেই দু চার বোতল স্টক রাখতে শুরু করেছিল মদের। যাকে পার্টি দেওয়া বলে সেরকম না হলেও প্রতি মাসেই কাউকে না কাউকে ডাকত বাড়িতে—কখনও একা, কখনও সস্ত্রীক। কলকাতার, বাইরের অফিসেরও কেউ কেউ। নিজেও বেরুত। কখনও-সখনও সুতপাও সঙ্গী হয়েছে ওর; বলার পর ইচ্ছে হলে; জোর করত না রণজয়।

তবে রণজয় যত তাড়াতাড়ি বদলে ফেলছিল নিজেকে, সে তা পারেনি। একটা সময়ের পর সন্দেহ হচ্ছিল দাম্পত্য-সম্পর্কে আর তেমন উৎসাহ পায় না রণজয়। তখন ভেবেছিল চাকরি-জীবনের উত্তেজনা যদি ওর মনের ক্রমশ সৃষ্টি হওয়া ফাঁকটা ভরাতে পারে তাহলেই বা মন্দ কি! বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই—বাবা মা গত; দাদা, সুরজয়, সপরিবারে থাকে দিল্লিতে। এখনও কালেভদ্রে চিঠি লেখে সুরজয়ের স্ত্রী দীপা, যতটা না জানতে তার চেয়ে তার বেশি জানাতে। শুধু নিজেদের আরও সমৃদ্ধ হওয়ার কথা। এমন সম্পর্ক টেকে না।

রণজয় বাইরে ব্যস্ত হয়ে ওঠার পর থেকে নিজের জন্যে বরাদ্দ সময়ও বেড়ে গিয়েছিল সুতপার। সময় কাটত না। কলকাতায় নিজের আত্মীয়স্বজন বলতে যা বোঝায় তেমন কেউই ছিল না যে যাবে। মা মারা যাবার বছর তিনেকের মধ্যেই রিটায়ার করলেন বাবা, তারপরেও কিছুদিন ছিলেন কলকাতায়, তার বিয়ের পর চলে গেলেন কুচবিহারে পৈতৃক বাড়িতে, ভাই, ভাইপোদের সঙ্গে থাকতে। গোড়ার দিকে কখনও-সখনও আসতেন কলকাতায়, থেকে যেতেন কয়েকদিন। আর্থারাইটিসে ধরার পর থেকে পারেন না আর। এখন যেটুকু সম্পর্ক তা ওই মাঝেমধ্যের চিঠিপত্রেই সীমাবদ্ধ। টুটু আসবার আগে নিজেকে ব্যস্ত রাখার জন্যে স্কুলের চাকরির পরেও গোটা দুয়েক টিউশন নিয়েছিল সুতপা, বিকেলে বাড়িতেই পড়াত। দুজনের রোজগারে টাকার আমদানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারটাকেও একটু একটু করে গুছিয়ে তুলছিল সে। বাড়িওলার গরজ নেই, তাই নিজেই মিস্ত্রি ডেকে রং ফেরাল একতলার দেয়াল, দরজা, জানলার; বসবার ঘরটা সাজাল নতুন ফার্নিচারে; ডাইনিং টেবিল, বুককেস, টিভি, রেকর্ড প্লেয়ার কিনে ফেলল আস্তে আস্তে; একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে এক সেটের বদলে দু সেট পর্দা বানাল দরজা জানলার।

রণজয়ের জন্যেই এত সব করা। তবু, মাঝে মাঝে মনে হত সুতপার, এসব করার আড়ালে আসলে সে ঢাকতে চাইছে নিজেকেই, বা নিজের ফুরিয়ে যাওয়া অনুভূতিগুলোকে। সে যে সুন্দরী নয়, সাধারণ, অতি সাধারণ—এটা সে বরাবরই জানত; পাছে রণজয় আকর্ষণ হারিয়ে ফেলে সেজন্যে, বিছানায় অন্তত, কখনও বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও, বাড়তি কাম ও কৌশলে ভরে রাখত নিজেকে। কোথায় কী। ক্রমশ বুঝতে পারছিল, পুরুষের কাছে নারীর আকর্ষণ শুধু যৌন সম্পর্কেই স্থির থাকে না, সে চায় আরও কিছু। অন্তত রণজয়। দু দুবার গর্ভধারণের পরেও শেষমেষ যখন বাচ্চা ধরে রাখা গেল না—মন খারাপে আর অপমানে ভাঙতে লাগল শরীর, তখন টুটুকে এনেছিল, যদি বেঁচে থাকার সার্থকতায় ফেরানো যায় ওকে। সম্ভবত হিসেবে ভুল হয়েছিল তার। কিংবা হয়নি?

এটা এখনও তার খটকার জায়গা। টুটু না এলেও হয়তো ঘটনাটা ঘটত, রণজয় ওইভাবে হঠাৎ এবং একা বোম্বাই চলে যাবার পর থেকে যে-ভাবনাটা প্রায়ই অন্যমনস্ক করে দেয় সুতপাকে, তখন বাড়ি বদলানো দূরে থাক, হয়ত এই বাড়িটাও থাকত না। তখন সে কোথায় যেত?

একার ভাবনা ঠেলে দেয় শঙ্কায়। জোর থাকে না প্রশ্নে। শঙ্কার ভিতর থেকেই ক্রমশ উঁকি দিতে থাকে সন্দেহ।

মনে পড়ল, কাল রাত্রে ঘুমের মধ্যে হঠাৎ শুরু হয়েছিল বৈশাখী তাণ্ডব, এতই দাপট ছিল ঝড়ে যে আশপাশের বাধা সত্ত্বেও ঝাঁকুনি দিচ্ছিল জানলার কপাটে। দেখতে দেখতে শুরু হয়ে গেল বে-বলগা বৃষ্টি। ঝড়ের শব্দে জেগে উঠে বিছানা থেকে নেমে খোলা জানলাটা বন্ধ করতে গিয়েও নিজের মধ্যে কেমন যেন থেমে গিয়েছিল সুতপা. হাত সরল না। দিশাহীন ঝড়বৃষ্টিতে পাঁচিলের ওদিকে বড় বাড়ির সামান্য আলোটুকুও ঝাপসা, সামনের দেয়াল ও থামগুলো আন্দাজ করা গেলেও স্পষ্ট হয় না আকার, দূরে কোথাও কাচ ভাঙার ঝনঝনে শব্দ উঠেও আবার হারিয়ে গেল নৈঃশব্দ্যে। ঝড়ের ঝাপটায় বৃষ্টির রেণু উড়ে এসে লাগছিল মুখে। অসচরাচরের এই দৃশ্য ও অনুভূতির মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হয়েছিল সুতপার, রণজয় সম্পর্কে এই যে তার ভয়, ভাবনা—এগুলো তার নিজেরই সৃষ্টি করা নয় তো? এমন কি হতে পারে যে নিজের ভিতরের ক্ষয় ও হতাশাবোধ থেকে সে সৃষ্টি করে নিচ্ছে আর-এক রণজয়কে—যে তার স্বামী নয়, বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই।

হতে পারে, নাও হতে পারে। দুই সম্ভাবনার মধ্যে কোথাও আছে এক ধরনের বিপন্নতা, যা তাকে কখনওই স্পষ্ট হতে দিচ্ছে না।

এখনও সেইভাবেই ভাবল সুতপা। অন্যমনস্কতা থেকে জোর করে নিজেকে সরিয়ে নিতে নিতে তাকাল গলির আগাছার জঙ্গলের দিকে। শুঁয়োপোকাটা মরেনি এখনও। পাতায় আটকে নড়াচড়ার চেষ্টায় তালার আংটার মতো গোল হয়ে যাচ্ছে থেকে থেকে, তখন রোঁয়াগুলো খাড়া হয়ে উঠছে আরও। মেয়েটা ভুল ভাবেনি। না জেনে হঠাৎ দেখলে সেও ওটাকে ফুল ভাবতে পারত।

জুজুর ভয়ে বাধ্য হয়ে উঠেছে টুটু। চোখ রঙিন ছবিতে। কী দেখছে দেখার জন্যে সুতপা নিজেও ঝুঁকে এল।

'কী দেখছ, টুটু?'

'বাঘ।'

'বাঘ কোথায় থাকে?'

টুটু হাসছে। স্পষ্ট চোখ তুলে, হাসিতে দাঁত দেখিয়ে বলল, 'কোথায় থাকে?'

'বলেছি না, জঙ্গলে।'

বেল বাজল দরজায়। সম্ভবত অণিমা। দুধ পেল কি না কে জানে! দরজা খুলতে যাবার আগে মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে সুতপা বলল, 'ঠিক আছে, সামনের রোববার তোমাকে বাঘ দেখাতে নিয়ে যাব। দেখি অণিমা মাসি এল কি না।'

অণিমাই। হাতে দুধের প্যাকেট।

এতক্ষণে হাসি ফুটল সুতপার মুখে।

'পেয়েছ তাহলে!'

'আর একটু দেরি হলে পেতাম না, বউদি। কী ভিড়! কত লোক পেল না। কী এমন ঝড়জল হল যে দুধের গাড়ি এল না!'

'এরা এইরকমই। একটা ছুতো পেলে হল, কাজ বন্ধ।' দরজা বন্ধ করতে করতে সুতপা বলল, 'তুমি দুধটা আগে জ্বাল দিয়ে নাও। টুটুর খাবার রেডি আছে। খিদেও পেয়েছে বোধহয়। আমি ওকে নিয়ে আসছি।'

অণিমা চলে যাচ্ছিল, সুতপা আবার ডাকল।

'সুবিধেমতো একটা লোক ডেকো তো। ওদিকের গলিটা আগাছায় ভরে গেছে, পরিষ্কার করাব।'

অণিমা বুঝতে পারল না এই সকালে এত ব্যস্ততার মধ্যেও সুতপার মাথায় হঠাৎ গলি পরিষ্কার করানোর চিন্তা এল কেন! বলল, 'সাফ করালেই তো চোর ছ্যাঁচড়ের ঝামেলা বাড়বে। একতলা বাড়ি, তুমি একা থাকো, অনেকেই জানে। ওসব বিছুটি গাছ থাক, বউদি। কেউ ঢুকবে না ওদিকে।'

সুতপা হাসল, 'তুমি চোর ছ্যাঁচড়ই দেখছ। এদিকে একটু আগে টুটুর যে কী ফাঁড়া গেল!'

'কেন গো, বউদি! কী হল!'

'একটা বিষাক্ত শুঁয়োপোকা উঠে এসেছিল জানলায়। টুটু প্রায় হাত দিয়ে ফেলেছিল। আমার চোখে না পড়লে যে কী হত!'

'রাতের ঝড়ে খসেছে বোধহয়।' চিন্তিত মুখে খানিক তাকিয়ে থেকে অণিমা বলল, 'বিছুটি কেটো না। বাজার থেকে সাদা পাউডার এনে দেব। ছড়িয়ে দিলেই হবে।'

বুদ্ধি আছে মেয়েটার। মনটাও ভাল। শক্তপোক্ত চেহারা, বয়স কত তা আন্দাজ করা যায় না। ত্রিশ, বত্রিশ হতে পারে। আগে বাড়িওলাদের কাজ করত, তখনই এসেছিল। ওরা চলে যাবার পর বেশি সময়ের জন্যে কাজে লাগিয়েছে সুতপা। ছুতোছাতা কম, দরকারে টুটুকেও দেখে। আবার প্রশ্রয় পেলে গল্পও করতে পারে দিব্যি। অণিমার সারল্য ও ফূর্তির ভাবটা লক্ষ করে মাঝে মাঝে অবাক লাগে সুতপার, একটু রহস্যের গন্ধও যেন পায়। শাঁখা-নোয়া-সিঁদুরে বিবাহিতা, কিন্তু স্বামীর সঙ্গে থাকে না। নিজেই বলেছিল, লোকটা খারাপ, নেশা করে পেটাত প্রায়ই, পরে নাকি অন্য 'মেয়েমানুষ ধরেছে'। সুতপার ধারণা, অণিমাও কম যায় না। মাঝে মধ্যে একটা ছোকরা, শৌখিন চেহারার যুবক এসে খোঁজখবর করে। অণিমাকে জিজ্ঞেস করায় হেসে বলেছিল, 'ও আমার গাঁয়ের লোক।' ওর আবার গাঁ

কোথায়, এদিকে বলে জন্ম থেকেই আছে গরচার বস্তিতে! এড়িয়ে যাওয়ার ধরনটা অস্পষ্ট থাকেনি। সুতপাও ঘাঁটায়নি আর। তার কাজ অণিমাকে নিয়ে।

স্বস্তির ভাবটা জিইয়ে রাখল সুতপা। এখন অনেক নিশ্চিন্ত লাগছে। ঘরে এসে কোলে তুলে নিল মেয়েকে। আদরটা প্রাপ্য। তখন জানলা থেকে তুলে প্রায় ছুড়েই ফেলেছিল খাটে, লাগেনি নিশ্চিত; তবে টুটু যে ওভাবে কেঁদে উঠল তার একটিই কারণ থাকতে পারে—ভয় পেয়েছিল মা'র আচমকা আচরণে। সেই মুহূর্তে সে নিজেও কম ভয় পায়নি। রাত্রে অমন ভয়ঙ্কর ঝড়, সকালে দুধ এল না, তারপর ওই বিদঘুটে পোকাটার আবির্ভাব, সব মিলিয়ে কেমন একটা ভয়ঙ্কর ভাবনায় ছেয়ে গিয়েছিল মনটা। দোষ তার নিজেরই। যা হতে পারে অথচ হয়নি তখনও, হয়েছের পুরো অভিঘাত নিয়ে সেটাই আগে থেকে চাপিয়ে নেয় বুকে।

কেন এমন হয়! সারাক্ষণ এমন ভয়-ভয় ভাব, দুর্ভাবনা ও আশঙ্কায় জড়িয়ে থাকা! এসব তো আগে ছিল না তার স্বভাবে! বরং একটা সময়ে সবাই তাকে চিনত সাহসী ও একরোখা বলে। কত দিন আগে!

ছাত্র অবস্থায় যখন কে কোন দলে চেনা যাচ্ছে না ঠিকঠাক—অসীম, সুশান্ত, দীপঙ্করদের সশস্ত্র বিপ্লবের টানে দলছুট হয়ে যাচ্ছে তাদের সদস্যরা, একদিন ইউনিয়ন ইলেকশনের আগে মিটিংয়ে হঠাৎ বোমাবাজির মধ্যে অনেকেই যখন ছুটোছুটি করছিল আতঙ্কে, তখনও আর কয়েকজনের সঙ্গে গলা ফাটিয়ে ভয় না পাবার জন্যে চিৎকার করতে বুক কাঁপেনি তার। তারপর সাতষট্টি সালেই কি? হ্যা, তাই হবে—প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার যেবার রাইটার্স ছেড়ে আইন অমান্য করতে রাস্তায় নামল, আন্দোলনের তৃতীয় দিনে ছাত্রদের আইন অমান্য শুরু হতে না-হতেই রাজভবন আগলাতে এবং অন্যান্য পয়েন্টে ব্যারিকেড তৈরি করল পুলিশ, সেই দুপুরে কিছুক্ষণের মধ্যেই টিয়ার গ্যাসের ধোঁয়ায়, বোমা আর গুলির শব্দে আর পুলিশ-ভ্যান পোড়ানো আগুনে গোটা এসপ্ল্যানেড, ধর্মতলা আর সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ জুড়ে তৈরি হয়ে গেল যুদ্ধক্ষেত্র—সেদিনও ব্যারিকেড ভেঙে যারা এগিয়েছিল, ভয় পায়নি গ্রেফতার হতে, তার মধ্যে সেও ছিল। পিঠে পুলিশের লাঠি পড়লেও দমেনি। কত আর বয়স তখন? সবে ফার্স্ট ইয়ারে। একটা সমবেত আবেগ যেন তাড়া করছিল পিছনে, দৃঢ় হয়ে উঠেছিল চোয়াল, পুলিশের অবরোধ ভাঙার লক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়া ছাড়া আর কোনও চেতনা ছিল না শরীর-মনের কোথাও। সন্ধের দিকে পুলিশ ছেড়ে দেবার পর বাড়ি ফিরতে ফিরতে মনে হচ্ছিল হাঁটতে পারবে না যন্ত্রণায়। সত্যি-সত্যিই বিছানা ছেড়ে নড়তে পারেনি কয়েকদিন। দুশ্চিন্তায় শুকিয়ে গিয়েছিল মা আর বাবার মুখ।

স্মৃতি দ্বিধাহীন; হঠাৎ মনে পড়া থেকে ছুটে আসছে খুঁটিনাটি কুড়িয়ে। যেন কালকের ঘটনা। দু তিন দিন পরে মনীষাদি এসেছিলেন কলেজ-ফেরতা, সঙ্গে তীর্থঙ্করদা এবং আরও কে-কে যেন ছিল, মনীষাদির সামনেই বাবা বলেছিলেন, 'একটাই তো সন্তান আমাদের। যদি এই করতে গিয়ে মরে যায়, তখন আমরা কোথায় দাঁড়াব।'

বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্মরেখায় হেসেছিলেন মনীষাদি। বললেন, 'মরার ভাবনাটাই আগে মনে আসে কেন। মাঝে-মাঝে একটু গর্বের দৃষ্টিতেও তাকাবেন সন্তানের দিকে।'

বাবা সরল মানুষ। কথাগুলোর অর্থ বুঝতে না পেরে তাকিয়েছিলেন ফ্যালফ্যালে চোখে।

'যাদের সাহস আর আদর্শ থাকে তারা অত চট করে মরে না। কী বলো, সুতপা? তুমি

তো ইতিহাসের ছাত্রী?' মনীষাদি তাকেই দেখছিলেন। স্নেহে চিকচিক করছে দৃষ্টি। তারপর বাবার দিকে চোখ ফিরিয়ে বললেন, 'অত ভাববেন না। এ মেয়ে অনেক দূর যাবে—'

অনেক দূর, মানে কত দূর? কোনও লক্ষ্য কি স্থির করা ছিল তার জন্যে? সে নিজেও কি ভেবেছিল জীবনটাকে নিয়ে কোনও একটা জায়গায় পৌঁছুবার কথা? যদি ভেবে থাকে, কোথায় সেই জায়গা? রণজয়ের স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকার ব্যক্তিগত শান্তিতে, একটি পুরুষের শরীরে শরীর ঘষে তাৎক্ষণিক উত্তেজনায় জ্বলে ওঠা ও নিভে যাওয়ার মধ্যে, নিজের গর্ভে তার সন্তান ধারণের আহ্লাদে এবং তার পরের ব্যর্থতায়! এইভাবে ব্যর্থ হতে হতে, হীনম্মন্যতায় ভুগে ভুগে ক্রমশ পর-নির্ভর ও ভিতু হয়ে পড়ায়, ফুরিয়ে যাওয়ায়!

কেন এমন হল! তখন থেকে এখন পর্যন্ত তো মানুষ সে! তবে?

তাহলে কি তার তখনকার সমস্ত জোরই ছিল রাজনীতিতে—বহুজনের সমগ্রতায় জড়িয়ে থাকার মধ্যে, যেখানে ব্যক্তিগত সাধ, স্বার্থ প্রশ্রয় পেত না তত? আর, যে-মুহূর্তে ব্যক্তিগত হয়ে উঠল, শিথিল হতে শুরু করল চারপাশের সংস্রব, সেই মুহূর্ত থেকে আরও বেশি ব্যক্তিগত হতে হতে দেশলাইয়ের শেষ কাঠিটার মতো সুখের চকিত মুখ দেখেই ক্ষয়ে গেল সে!

টুটুর খাওয়া শেষ। ওকে ডাইনিং টেবিলের চেয়ারে বসিয়ে জুতো পরিয়ে দিতে দিতে হঠাৎ মুখ তুলে অণিমা দেখল, প্লেটের শেষ ভাতটুকু নিয়ে নাড়াচাড়া করছে সুতপা, খাচ্ছে না, চোখমুখ অন্যরকম। যেন নিজের মনেই গভীর কিছু ভাবছে, তার তাকিয়ে থাকার মধ্যেই একটা বড় ফোঁটার জল গড়িয়ে পড়ল গালে।

অবাক হয়ে অণিমা বলল, 'কী হল, বউদি! খাচ্ছ না।'

'কিছু হয়নি। আজ কেমন ভাল লাগছে না খেতে।'

কনুই তুলে হাতটা নাকের পাশে বুলিয়ে উঠে পড়ল সুতপা। সাধারণত যা করে না, এঁটো প্লেটটাও হাতে নিয়ে দ্রুত হেঁটে গেল রান্নাঘরে। বেসিনে প্লেটটা নামিয়ে রেখে ট্যাপ খুলে জল দিল চোখেমুখে। এর পর কোনও দিকে না তাকিয়ে তোয়ালের খোঁজে বাথরুমে গেল, সেখান থেকে শোবার ঘরে। জানলা লাগাল। ঘরের পরিবর্তিত আলোয় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হালকা ভাবে চিরুনি চালাল চুলে। এ সবই আবেগ, ভাবল, অন্ধকার পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতো অর্থহীনতায় হারানো, কোথায় যাচ্ছে, কোনও ঘূর্ণির সৃষ্টি হচ্ছে কি না, কিছুই দেখা যায় না। এ সবই ফুরিয়ে যাবার লক্ষণ। একটু আগে দরকারে একাই টুটুর দায়িত্ব নেবার কথা ভেবেছিল সে, আর এখন হিমসিম খাচ্ছে নিজেকে সামলাতেই! এরকমও কি হবার কথা ছিল তার!

এখনও মিনিট দশেক সময় আছে হাতে। অণিমা থাকার এই সুবিধে, একা দুজনের কাজ করতে পারে।

ঘড়িটা পরে আবার টুটুর কাছে ফিরে এল সুতপা। যেন আচরণের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়েনি কোনও, সেইভাবে অণিমাকে বলল, 'আজ বিকেলে টুটুকে একটু আগলাতে পারবে, অণিমা? আমার এক জায়গায় যাবার আছে। সাতটা নাগাদ ফিরব।'

অণিমা মাথা নাড়ল। পারবে। তারপর বলল, 'দুটো টোস্ট করে দেব? টিফিন বাক্সে নিয়ে যাও?'

'না। ওসব ঝামেলার দরকার নেই।' নিজের প্রতি বিরক্তিতেই সামান্য ঝাঁঝ ফুটল

সুতপার গলায়। সেটা সামলে নিয়ে বলল, 'বিকেল থাকতেই লণ্ঠনটা জ্বেলে রেখো—যদি লোডশেডিং হয়—। কালও তো হল।'

সুতপার কথার মধ্যেই আবার বেল পড়ল দরজায়। একটু বা আধবোজা শব্দে। এটা কারও আসবার সময় নয়। তবে ধোপা বা মিষ্টির ফেরিওলা কখনও কখনও এসে পড়ে অসময়ে। নিজে বসবার ঘরের কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও অণিমাকেই পাঠাল সুতপা। মাঝখানের পর্দাটা টেনে দিয়ে বলল, 'উটকো কেউ এলে বিদায় করে দিও।'

টুটু সুতপাকে দেখছে। বড় সাদামাটা দৃষ্টি। হিসেমমতো আড়াই বছর বয়স হল। কিন্তু এই বয়সের শিশুর যতটা চঞ্চল হওয়ার কথা, ও তা নয়। মন মেজাজ খুব ভাল থাকলে আলাদা কথা, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ভাব করে যেন ওঠালে উঠবে, বসালে বসবে। আগে এমন ছিল না।

হঠাৎই মনে হল সুতপার, তার নিজের জীবনের স্তব্ধতা কি টুটুকেও স্পর্শ করছে ক্রমশ? নাকি নিজের গর্ভজাত হলে যেমন হয়, প্রত্যক্ষ সেই অনুভূতির অভাবে ঠিকঠাক মা হয়ে উঠতে পারছে না সে—শিশুর সহজাত বোধ থেকে টুটু অনুভব করে তা! অভাবটা খুঁজে পায়? তিন মাস বয়সে যখন এনেছিল ওকে তখন বোঝা যেত না বড হয়ে কেমন দেখতে হবে। এখন নাক মুখ চোখ কপাল স্পষ্ট হয়েছে অনেক, ক্রমশ আরও হবে। আস্তে আস্তে পৌঁছে যাবে পরিপূর্ণতায়। তখন একদিন ওকে বলতেই হবে ওর অজ্ঞাত জন্ম-বৃত্তান্তের কথা, 'আমি তোর আসল মা নই'; যাতে ভবিষ্যৎ জীবনটাকে সহজ ভাবে নিতে পারে ও। তখন কি টুটু বলবে, আমি জানতাম, আমি বুঝতে পারতাম!

আকস্মিক ভাবনায় কেঁপে উঠল সুতপা। সে বড় ভীষণ সত্য, সে কি সহ্য করতে পারবে! নাকি এখন রণজয়কে নিয়ে যেমন মনে হচ্ছে, তেমনি টুটুকে নিয়েও বুকে চেপে বসবে আরও দুর্বহ একটা ভার, যা সে কোনও দিনই নামাতে পারবে না! নাকি আরও একবার সাহস সঞ্চয় করে সে বলবে, টুটু, জীবনের সত্য মানুষের আকাঙ্ক্ষা মেনে চলে না। যদি চলত, তাহলে তোর জন্মে ফাঁকি থাকত না, আমার নারীত্বও অসম্পূর্ণ থাকত না—তুই সরাসরি চলে আসতিস আমারই পেটে। তবু কি ব্যর্থ হয়ে যায় জীবন! না। আর ব্যর্থ হয় না বলেই ভেসে যাসনি তুই, আমিও আত্মহত্যা করিনি। যে-অবাস্তব অদৃশ্য শক্তি বঞ্চিত করেছে আমাদের, বাস্তবে সে-ই আবার আমারই কোলে ঠেলে দিয়েছে তোকে, যাতে দুজনেই বাঁচি। এর মধ্যে অপূর্ণতা কোথায়?

'মা—!'

'কী, মা?'

টুটু হাসছে। হাসিতে ঝিরঝির করছে সামনের পাটির দুটি দাঁত। মেয়েকে হাসতে দেখে সুতপাও হেসে ফেলল।

'বুঝতে পেরেছি। হিসি পেয়েছে তো?'

ওপরে নীচে মাথা নাড়ল টুটু। নেমে পড়ল চেয়ার থেকে।

সুতপা ওকে বাথরুমে নিয়ে যেতে যাচ্ছিল, সেই সময় অণিমা ঘরে ঢুকে নিচু গলায় বলল, 'বউদি, তীর্থবাবু—'

'বসতে বলেছ?'

'না। কিছুই বলিনি।'

একটু বা হতাশ হয়ে অণিমাকে দেখল সুতপা।

'উনি উটকো লোক নাকি। যাকগে, টুটুকে বাথরুমে নিয়ে যাও। আমি দেখছি।'

পর্দা সরিয়ে বসবার ঘরে এসে সুতপা দেখল খোলা দরজার সামনে উঠোন মতো জায়গাটার দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে আছে তীর্থঙ্কর। কিছুটা উদাসীন। চেহারায় পোশাকে তেমন পরিপাটি নয়। কাঁধে রংচটা শান্তিনিকেতনি ঝোলা। একটু ফোলা যেন। পাঁচিলের ছায়ায় যাই-যাই করছে কোণঠাসা রোদ। উঠোন কিংবা পাঁচিল কোথায় বসবে তা নিয়ে বচসা করছে দুটো শালিক; বড় বাড়ির অদৃশ্য উচ্চতা থেকে একটা সশব্দ ঠোঙা এসে পড়তেই উড়ে গেল পাখি দুটো। মুখে একটা মাংসের হাড় না কী কামড়ে ধরে একটা রাস্তার কুকুর ঢুকে আসছিল এদিকে; ওদের দেখেই পিছন ফিরে দৌড় দিল।

'ও মা, তীর্থঙ্করদা! বাইরে দাঁড়িয়ে কেন!'

'তুমি আছ তাহলে!' তীর্থঙ্কর ঘরে ঢুকে এল, 'মেয়েটার কথা শুনে বুঝতে পারলাম না আছ কি নেই।'

'এখুনি বেরিয়ে যেতাম অবশ্য।' পুরো দৃষ্টি মেলে তীর্থঙ্করের মুখের দিকে তাকাল সুতপা। বেতের সোফার পিছনে তুবড়ে আছে কুশনটা, সকালে ওই জায়গায় বসে সে খবরের কাগজে ধর্ষণের বৃত্তান্ত পড়েছিল। এখন ব্যস্ত হাতে কুশনটা সাজিয়ে দিয়ে বলল, 'বসুন। আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন!'

তীর্থঙ্কর বসল। কাঁধের ঝোলাটা কোলের ওপর নামিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মেয়ে কোথায়?'

'এই খেয়ে উঠল।'

'বর্ধমানে গিয়েছিলাম। হাওড়ায় নেমে সোজা আসছি। এত জ্যাম রাস্তায়। সন্দেহ হচ্ছিল তোমাকে পাব কি না!'

একটানা কথাগুলো বলে ঝোলা থেকে সরু, সবুজ দড়িতে বাঁধা, তেলের দাগ-লাগা একটা কাগজের বাক্স বের করে সুতপার দিকে বাড়িয়ে ধরল তীর্থঙ্কর, 'নাও। সীতাভোগ, মিহিদানা। টাটকা নামাচ্ছিল, নিয়ে এলাম।'

'গন্ধেই টের পাচ্ছি টাটকা।' বাক্সটা হাতে নিয়ে সুতপা বলল, 'একটু চা করে দিই, তীর্থঙ্করদা?'

'না, না। এই দু মিনিট হল চা খেয়েছি।'

'ও মা! কোথায়?'

'এই তো, হাজরা মোড়ে। খোট্টা দোকানে। এদিকের বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে দেখলাম গরম-গরম ঢালছে মাটির ভাঁড়ে। তুমি থাকবে কি না জানি না তো। লোভ সামলাতে পারলাম না।'

'খুব অন্যায় করেছেন। না পেয়ে ফিরলেও ওই চা পেতেন!' অভ্যাসে বলল সুতপা। তারপর ভিতরের ঘরের পর্দায় চোখ রেখে অন্য সোফাটায় বসতে বসতে গলা তুলল, 'অণিমা, টুটুর হয়েছে?'

'আসছি, বউদি।'

তীর্থঙ্কর সুতপাকেই দেখছে। ট্রেনে বাসে এতটা আসার ফলেই সম্ভবত দৃষ্টি সামান্য ঘোলাটে। চোখাচোখি হতে মুখ নামিয়ে নিল সুতপা।

'তোমাকে একটু টেনস লাগছে। শরীর-টরির ঠিক আছে তো?'

সুতপা ঘাড় নাড়ল। সে জানে, অন্তত অনুমান করতে পারে, এর পরেই শুরু হবে পুরনো কাসুন্দি ঘাঁটা। ইচ্ছে করেই প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, 'আজ সকালেই মনে হচ্ছিল আপনার কথা। এবার অনেক দিন পরে এলেন। মাঝখানে আমিই যাব ভেবেছিলাম।'

'না গিয়ে ভালই করেছ। পেতে না। তিন সপ্তাহ ধরে শুধু বর্ধমান কলকাতা করছি। দেশে ভাইরা সম্পত্তি ভাগাভাগি করছে। সে অনেক ব্যাপার। সংসারে না জড়ালে কী হবে, সংসার ছাড়ে না—'

বলতে বলতে থেমে গেল তীর্থঙ্কর, সম্ভবত লক্ষ করেছিল সুতপা অন্যমনস্ক। তারপর হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, 'রণজয় কেমন আছে? খবর পেয়েছ?'

'কেমন আর থাকবে!' অনিচ্ছা সত্ত্বেও কথাগুলো এড়াতে পারল না সুতপা, 'খারাপ আছে জানায়নি যখন নিশ্চয়ই ভাল আছে।'

তীর্থঙ্কর এগোতে পারল না। তার আগেই টুটুকে নিয়ে ঘরে ঢুকে অণিমা বলল, 'ইজেরটা বদলে দিলাম, বউদি।'

মেয়ের দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল সুতপা।

'জুজুর ভয়ে নাকি?'

টুটু নির্বিকার। তীর্থঙ্করকে চেনে। পছন্দও করে। এক গাল হেসে এগিয়ে এল সামনে।

'এই যে টুটুমণি!' হাত বাড়িয়ে টুটুকে কোলে তুলে নিল তীর্থঙ্কর, 'স্কুলে যাবার জন্যে এক্কেবারে রেডি যে!'

টুটু হাসছে।

'কী খেয়েছ? মাছ, না ডিম?'

'ডিম।'

'হুঁ। ডিম খেলে গায়ে খুব জোব হবে। আর কী খেয়েছ?'

দুধ—'

মিষ্টির বাক্সটা অণিমার হাতে তুলে দিয়ে তীর্থঙ্করের দৃষ্টি বাঁচিয়ে ঘড়ি দেখল সুতপা। এবং ভাবল, হয়ত রূঢ় শোনাল একটু, জ্বালাও ফুটল, কিন্তু তীর্থঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে জবাবটা সে ঠিকই দিয়েছে। সম্ভবত এই ধরনের প্রশ্নে একই ধরনের প্রতিক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে সে। আগে ভাবত, ভেবে জবাব দিত। এখন ভাবতেও হয় না।

পারমিতা এসেছিল ক'দিন আগে। সন্ধে পার করে, সুতপা তখন টুটুকে খাওয়াচ্ছে। সঙ্গে সুশান্ত। তাড়া থাকায় বসেনি বেশিক্ষণ; সুতপাও জোর করেনি। বসবার ঘরের দেয়ালের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টানছিল সুশান্ত। সেই কলেজে পড়ার সময় থেকেই সুতপা পছন্দ করতে পারে না ওকে—কেমন দাম্ভিক, অন্তঃসারশূন্য মনে হয়। তবে পারমিতা স্বচ্ছন্দে চলে এসেছিল খাবার ঘরে, যেমন আসে। কী একটা লটারি জিতেছে ওরা। বোম্বাই যাবে, যাচ্ছেই যখন তখন দেখা করে আসবে রণজয়ের সঙ্গে, ইত্যাদি বলে ঠিকানা চেয়েছিল রণজয়ের ফ্ল্যাট ও অফিসের। এ পর্যন্ত কখনও না গেলেও রণজয়ের ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার মুখস্থ হয়ে আছে সুতপার। ব্যাগ থেকে ছোট লাল ডায়েরি বের করে সেগুলো টুকে নিয়ে পারমিতা জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলতে হবে, সুতপাদি?'

পারমিতার গলায় দ্বিধা। ইচ্ছে করেই হেসেছিল সুতপা, 'নাঃ। কী আর বলবে।'

পারমিতা কথা বাড়ায়নি। এরপর ওরা বসবার ঘরে চলে আসে। যাবার আগে সুশান্ত জিজ্ঞেস করল, 'রণজয়ের খবর কী?'

দরজার বাইরে আলোটা ফিউজ হয়ে আছে ক'দিন। বাল্ব পাল্টাবে ভেবেও হয়ে ওঠেনি। ঘরের আলো যেখানে বাইরের অন্ধকার স্পর্শ করেছে, সেই জায়গাটার দিকে তাকিয়ে ইচ্ছাহীন, দায়সারা গলায় সুতপা বলেছিল, 'ভাল।'

সুশান্ত কিছু ভেবেছিল কি না জানা সম্ভব নয়। ওকে দরজার দিকে এগোতে দেখে নিঃশব্দে অনুসরণ করেছিল ওর স্ত্রী। আলোর জায়গাটা পেরিয়ে যেতে যেতে পিছন ফিরে পারমিতা শুধু বলেছিল, 'ফিরে এসে দেখা করব, সুতপাদি—।'

কতদিন আগেকার কথা! ওরা কি চলে গেছে? দেখা হয়েছে রণজয়ের সঙ্গে?

সুতপা উঠে দাঁড়াল। দেরি হয়ে যাচ্ছে।

'তীর্থঙ্করদা, আপনি না হয় বসুন একটু। অণিমাকে বলি চা করে দিক—কাগজ পড়ুন—'

'না। আমাকেও তো যেতে হবে।' টুটুকে কোল থেকে নামিয়ে তীর্থঙ্করও উঠল, 'পরে আসব একদিন। এখন আসি।'

কাছেই কোথাও একটা লরি বা ট্রাক এসে দাঁড়িয়েছে, স্টার্ট বন্ধ না করায় একঘেয়ে শব্দ উঠছে এঞ্জিনে। শব্দটায় কান রেখে সুতপা বলল, 'হ্যাঁ, আসবেন। দেখলেন তো টুটু কেমন পছন্দ করে আপনাকে!' বলতে বলতে ঘরে গেল। নিজের ব্যাগ, টুটুর জিনিসপত্র, ওয়াটার বটল হাতে নিয়ে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোন দিকে যাবেন?'

'ধর্মতলার দিকে। তারপব ডেরায় ফিরব। সেই ওয়েলিংটনে।' ঝোলাটা কাঁধে গলিয়ে, দু হাতে মাথার চুল সমান করতে করতে হাসল তীর্থঙ্কর, 'চলো, তোমাদের এগিয়ে দিই—'

বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিল সুতপা। অণিমা যাবে কাজ সেরে।

রাস্তায় বেরিয়ে সুতপা একটু দ্রুতই হাঁটবার চেষ্টা করছে দেখে টুটুকে কোলে তুলে নিল তীর্থঙ্কর।

রোদের তাপ নেই তেমন। হাওয়াও নেই। কয়েক পা এগোতে না এগোতেই ছায়া ছড়াল আলোয়। ওপরে চোখ তুলে আকাশ দেখল সুতপা। ইতস্তত মেঘ ছড়ানো। ঠিক বৈশাখের আকাশ বলে মনে হয় না। কে জানে, আজও হয়তো ঝড় বৃষ্টি হবে।

'তীর্থঙ্করদা, আজকাল পার্টি অফিসে যান না?'

'যাই। তবে কম। এখন আর অ্যাকটিভিটিজ কোথায়! আমাদেরও কাজ কমে গেছে।'

সুতপা বলল, 'কমে গেছে মানে!'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না তীর্থঙ্কর। কোলবদল করল টুটুকে। পিছন থেকে হর্ন দেওয়া একটা গাড়িকে জায়গা দিতে রাস্তার ধারে সরে এসে বলল, 'পার্টি যত দিন ক্ষমতায় ছিল না তত দিন যা যা করতে হত, এখন তো আর তা করতে হয় না। অর্গানাইজেশন বড় হয়েছে, অপোজিশন বলেও কিছু নেই। কার বিরুদ্ধে লড়বে?' তীর্থঙ্কর একটু থামল, তারপর এড়িয়ে-যাওয়া গলায় বলল, 'যা হয় আর কি!'

'এই ধরনের কথা আপনি আগেও বলেছেন। অনেকবার। শুনে মনে হয় আপনাদের লড়াইটা ছিল শুধু ক্ষমতা দখলের। এখন ক্ষমতাটাকেই ভালবাসেন।'

'এ কথা বলছ কেন। কাজ করার জন্যেই ক্ষমতায় আসা দরকার ছিল। গত কয়েক বছরে কাজ কম হয়েছে নাকি!'

ঘাড় ফিরিয়ে তীর্থঙ্করকে দেখল সুতপা। সকালে কাগজ পড়তে পড়তে যে-রাগ আর ধিক্কার জমে উঠেছিল বুকে, সেগুলোই উগরে দেবে কি না ভাবল। কোনওরকমে নিরস্ত করল নিজেকে। কী লাভ! তার পরেও যেসব কথা বলবে তীর্থঙ্কর, মন্ত্রীদের বক্তৃতার মতো সেগুলোও পুরনো শোনাতে পারে। সেই মরচে-পড়া উপমাটাই মনে এল এই মুহূর্তে, ভাঙা রেকর্ড। এগোতে পারছে না বলেই ঘুরে যাচ্ছে একই বৃত্তে। চর্বি জমেছে চিন্তায়। সেই চর্বি ভেদ করে এককালের রক্ত মাংসের সজীবতা দেখানো বোধহয় আর সম্ভব নয় ওর পক্ষে। অভ্যাসে হাঁটছে। সত্যের সামনে নীরব থাকার অর্থ পরাজয় মেনে নেওয়া, সেইজন্যেই, ধোপে টিকুক না-টিকুক বলে যাচ্ছে কথা। উদ্দেশ্যও কি আছে কোনও! তারা সঙ্গে আছে বলেই সঙ্গী হয়েছে এখন, না হলে একাই হাঁটত। পনেরো কুড়ি বছর আগেকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তীর্থঙ্করের সঙ্গে এর তফাত অনেক। মায়া লাগে, হাসিও পায়। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে অনেক দিন আগে। বাকি জীবনটা কাটাবে কীভাবে!

ছোট্ট একটু খোঁচা দেবার প্রবণতা তবু সামলাতে পারল না সুতপা।

'দেশে সম্পত্তি ভাগাভাগি হচ্ছে বলছিলেন। আপনার ভাগে কী পড়ল? পুকুরটা?'

'কেন!'

সামনে হাজরা রোড। জোরে স্পিড তুলে এগিয়ে আসছে একটা ডাবল-ডেকার। রাস্তা পার হবার জন্যে অপেক্ষা করতে করতে সুতপা বলল, 'তাহলে কাজ কমে যাওয়ার আক্ষেপটা থাকত না। দিব্যি মাছ ধরতে পারতেন। আমরাও মাঝে মাঝে গিয়ে ভাগ বসাতাম।'

ঠাট্টাটা ধরতে পারল তীর্থঙ্কর। জবাব দিল না। সুতপার পাশাপাশি হেঁটে পৌঁছে গেল রাস্তার উল্টোদিকে।

এখান থেকে রিকশায়। টুটুকে ক্রেশে পৌঁছে, হেঁটে কালীঘাট স্টেশন। একজন চেনা রিকশাওয়ালাকে দেখে হাতের ইশারায় ডেকে নিল সুতপা।

'আপনি তো ধর্মতলায় যাবেন। কীভাবে যাবেন?'

'যে-কোনও ভাবে গেলেই হল। তাড়া নেই।'

'আসুন, রিকশায় উঠুন।' স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে বলল সুতপা, 'আমি কালীঘাটে মেট্রো ধরব। ওখান থেকেই চলে যাবেন। দশ মিনিট লাগবে।'

তীর্থঙ্কর আপত্তি করল না। রিকশায় উঠেও টুটুকে রাখল নিজের কাছে, যেন ওইভাবেই নিরাপদ থাকছে।

বাস, ট্যাক্সি, মোটরের গা বাঁচিয়ে রিকশা এগোতে লাগল চেনা রাস্তায়। ল্যান্সডাউন রোড দিয়ে খানিকটা গিয়ে ডানদিকের রাস্তায় ঢুকবে।

সুতপা ভাবল, এক সময় তীর্থঙ্করের পাশে বসে অনেক ঘুরেছে ট্রামে বাসে। রিকশায় বোধ হয় এই প্রথম। আজ এভাবে যাবার প্রস্তুতি ছিল না কোনও, প্রয়োজনও ছিল না। তবুও হঠাৎ সে তীর্থঙ্করকে রিকশায় উঠে আসতে বলল কেন! নিছকই ভদ্রতা? সুখেদুঃখে যে-মানুষটা সঙ্গ ছাড়েনি, তার সঙ্গ পাবার জন্যে, যাতে নিজের একা-একা ভাবটা কিছুক্ষণ অন্তত দূরে সরিয়ে রাখা যায়? নাকি আজ গোড়া থেকেই ওকে দেখে, ওর এড়িয়ে-যাওয়া কথাবার্তা শুনে, এমনকী খানিক আগে ঠাট্টা করতে গিয়েও যেমন মনে হয়েছিল—ওপরে ওপরে যতই যা বলুক, আসলে খুব একা হয়ে পড়েছে মানুষটা, বিশ্বাস হারিয়েও বলতে

পারছে না মুখ ফুটে—আরও কিছুক্ষণের সঙ্গ হয়তো ভালই লাগবে তীর্থঙ্করের, সেইজন্যে? স্পষ্ট হতে পারল না। সে চুপই করে থাকল।

টুটুর ভাবান্তর নেই কোনও। অন্যদিন রিকশায় উঠে যেমন চুপচাপ থাকে, তেমনই, তীর্থঙ্করের কোলে বসে রাস্তা দেখছে ড্যাবডেবে চোখে।

'একটা কথা বলব, সুতপা?' ক্রেশের কাছাকাছি এসে তীর্থঙ্কর হঠাৎ বলল, 'অবশ্য তুমি যদি—'

'বলুন না।'

'আমি কি রণজয়ের এখানকার অফিসে গিয়ে একবার খোঁজখবর করব? মানে, তোমার হয়ে—'

পাশে তাকিয়ে, ঈষৎ ভুরু কুঁচকে সুতপা জিজ্ঞেস করল, 'কী খোঁজ করবেন!'

'না, মানে—, মাস ছয়েকের জন্যে গিয়েছিল, এদিকে সাতমাস হয়ে গেল! কবে ফিরবে-টিরবে?'

'আপনি বুঝি এইসব ভাবছেন!' বিরক্তির মধ্যে হাসি চাপতে পারল না সুতপা। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বলল, 'স্বামী কবে ফিরবে সেটা তো স্ত্রীরই জানবার কথা। অফিস কী বলবে!'

শেষের কথাগুলো ছড়িয়ে পড়ল শ্লেষে। তীর্থঙ্কর গুটিয়ে নিল নিজেকে।

'তা অবশ্য ঠিক।'

'ঠিকই তো। রণজয় কি আমাকে টাকা পাঠানো বন্ধ করেছে, নাকি ডিভোর্স করেছে। আপনি এত ভাববেন না তো!'

ওরা পৌঁছে গিয়েছিল।

তীর্থঙ্করকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে মেয়েকে নিয়ে ক্রেশের ভিতরে গেল সুতপা। ফিরে এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একটু বা অন্যমনস্ক। তারপর রাসবিহারী অ্যাভিনিউ ধরে কালীঘাট স্টেশনের দিকে হাঁটতে লাগল দুজনে। চুপচাপ।

রোদ চড়া হয়ে উঠেছে এতক্ষণে। কপালে, চিবুকে ঘাম অনুভব করে আলগোছে আঁচল তুলে মুখে বুলিয়ে নিল সুতপা। একটা আবেগ আসছে, এলোমেলো লাগছে নিঃশ্বাস, বুঝতে পারছে না কেন। তীর্থঙ্কর সঙ্গেই আছে, তবু মনে হচ্ছে হঠাৎই দূরত্ব বেড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে, যেটা হয়তো এতক্ষণের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে সে-ই সৃষ্টি করেছে। এভাবে বলা ঠিক হয়নি। স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমেই যে ছুটে এসেছিল তাদের খোঁজ নিতে, রণজয় এখনও ফিরে না আসায় যে উদ্বিগ্ন, তার সঙ্গে এই মুহূর্তের চারপাশে যা ঘটছে সে-সবের, বা রাজনীতির সম্পর্ক কী। এই মানুষটার কাছেই কি রণজয়ের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে সে ছুটে গিয়েছিল একদিন। সেদিন এই মানুষটা আড়াল না দিলে কি রণজয় আজকের রণজয় হয়ে উঠত।

নিজের হঠকারিতায় বিষণ্ণ হতে হতে সুতপা বুঝতে পারল না তীর্থঙ্করও তার সম্পর্কে অন্য কিছু ভাবছে কি না। ভাবলে অন্যায় হবে না।

মেট্রোর সিঁড়ি নেমে, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে, তার ট্রেনই আগে আসবে ভেবে কিছুটা অধৈর্য হয়ে সুতপা বলল, 'তীর্থঙ্করদা, আমার কথাগুলো গায়ে মাখবেন না। মনটা ভাল নেই, অনেক উল্টোপাল্টা বকেছি। আপনি সত্যিই এত ভাবেন আমার জন্যে!'

'তুমি তো এইরকমই বলো।' তীর্থঙ্কর হাসল না। অনেকক্ষণের গাম্ভীর্যে জড়তা এসেছে

গলায়। সেটা ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'ভাবনা তোমাকে নিয়ে নয়। ভাবি টুটুর জন্যে। ও যে ভালভাবে হাঁটতেই শেখেনি এখনও।'

গতির আওয়াজ তুলে গমগমিয়ে ছুটে আসছে টালিগঞ্জগামী ট্রেন। যাবার তাড়ায় সুতপা বলল, 'আসবেন। আমি যাচ্ছি—'

'এসো।' তীর্থঙ্কর বলল, 'সাবধানে থেকো।'

কথাগুলো কানে নিয়ে নিজেকে কম্পার্টমেন্টের মধ্যে সেঁধিয়ে দিল সুতপা। যেমন দেয়। বিশেষ কিছু ভাবল না। শুধু এক ধরনের মন্থরতা টের পেল শরীরে। তবু, টালিগঞ্জ স্টেশনে কম্পার্টমেন্টে উঠে আসার চেষ্টায় অধৈর্য, উল্টোদিকের যাত্রীদের ভিড় ঠেলে নামতে নামতে তার মনে হয় কোথায় কী একটা ফাঁকি থেকে গেল। কী হত যদি সে এতটা ব্যস্ত না হয়ে আরও একটু সময় দিত তীর্থঙ্করকে?

৩

ছ' বছরের একঘেয়েমি থেকে দিন দশেকের মুক্তি—অপরিচিত জায়গায় অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে কাটিয়ে এসে যতটা খোলামেলা, সজীব লাগবার কথা, পারমিতার তা লাগল না। কলকাতায় ফেরার আগে এই ক'টা দিন যেন স্পষ্টতা-অস্পষ্টতায় মেশা তার এতদিনের বোধ ও অভিজ্ঞতাগুলোকে প্রকট করে তুলল আরও।

পারমিতা জানে জীবন অনিশ্চিত, মানুষকে বদল চেনাতে সে কারও নির্দেশ মানে না। সেই ছোটবেলায় চুপিসাড়ে এসে কানের পাশে তীব্র 'কু'-ডাকে ছোড়দার চমকে দেবার মতো, হঠাৎ হঠাৎ চমকে দেওয়ায় জুড়ি নেই জীবনের। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎও। কী, কখন, কার জন্যে অপেক্ষা করে আছে কোথায়—কোন সংস্পর্শ ও অভিজ্ঞতায় পৌঁছে দেবার জন্যে, কেউই কি আগে ভাগে জানতে পারে তা! আজ যেটা যেভাবে হল, কালও যে সেটা সেভাবে হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়। ভাগ্য বলেও কিছু আছে কি না সে জানে না; শুধু জানে ঘটনা ঘটে কারও সুখ শোক আনন্দ বিষাদের তোয়াক্কা না করে। কেন ঘটে জানে না। শুধু, তেমন কিছু ঘটলে, অনুভব করে আকস্মিকে ক্লিষ্ট নিজের অসহায়তাকে।

ঈশ্বরের অদৃশ্য উপস্থিতিতেও বিশ্বাস নেই তার। ভগবান-টগবান মানে না। কৈশোর আর যৌবনের গোড়ার দিকে মা'র কথায় লক্ষ্মীর পাঁচালি নিয়ে বসেছে কখনও-সখনও, কপাল ঠেকিয়েছে লাল কাপড়ে মোড়া বাবার আমলের গীতা-য়, এর বেশি উৎসাহ পায়নি। ছোড়দা অনিন্দ্য ওইভাবে হঠাৎ চলে যাবার পর এসবের প্রতি একটা বিরুদ্ধতা এসে গিয়েছিল মনে, সেটাই থেকে গেছে আজও, যদিও নিজের মনোভাব সামনাসামনি প্রকাশ করে না কখনও। প্রতি মাসের শেষ শনিবারে খুব ভোরে উঠে কালীঘাটে যায় সুশান্ত; স্বামী যায় বলে স্ত্রীকেও যেতে হয়—রক্তজবায় ছোঁয়ানো ভিজে সিঁদুরের আঙুলছাপ নিতে হয় কপালে; কিসের আশায় জানে না।

তবে, ভগবান না মানলেও পারমিতা বোঝে অনিশ্চয়তাকে এড়ানো যায় না। ব্যাখ্যা করা আরও অসম্ভব। নিজের অভিজ্ঞতাই এইভাবে বুঝিয়েছে তাকে।

অনিন্দ্যর মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত ছিল না তারা। কিন্তু, সেই ঘটনাটাই ঘটে গেল অদ্ভুত ভাবে। শেষ দেখাও হল না। পুলিশের কাছে খবর পেয়ে রাঁচি হাসপাতালের মর্গে গিয়ে ছোড়দার মৃতদেহ শনাক্ত করেছিল মামা কল্যাণসুন্দর আর মামাতো ভাই দীপক, ওখানেই সৎকার করে ফিরে আসে ওরা। কে জানত এরকম একটা ঘটনা অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্যে!

তারপর, অনিন্দ্যর মৃত্যুতে সে আর মা যখন স্তব্ধ, খবর পেয়ে লন্ডন থেকে উড়ে এল ওখানেই সেটল করতে বদ্ধপরিকর তার ডাক্তার দাদা সুনন্দ, তখনও কি জানত আরও একটা অনিশ্চিতি অপেক্ষা করে আছে তাদের জন্যে—কোথাও কিছু নেই, মাসখানেকের মধ্যেই দাদার সঙ্গে সে আর মা চলে যাবে লন্ডনে, আর ফিরে না-আসার জন্যে; পিছনে পড়ে থাকবে কলকাতার সকাল-সন্ধেয় অভ্যস্ত তাদের জীবন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্মৃতি, স্বপ্ন, অস্পষ্টতার মধ্যে ভাবা রণজয় নামের কেউ, সবকিছু! না, জানত না।

আবার লন্ডনে, সুনন্দর কাছে থাকতে থাকতে, পড়াশুনো শেষ করে, যখন প্রায় ভুলে যাচ্ছে কলকাতাকে, চাকরি করে হে মার্কেটে আমেরিকান এক্সপ্রেস কোম্পানিতে, ভাবছে এইভাবেই কেটে যাবে জীবন—ইচ্ছে হলে বিয়ে করবে, না হলে না, শাড়ির বদলে মাঝে মাঝে জিনস আর টপ উঠছে গায়ে, তখনও কি জানত এগিয়ে আসছে নতুন অনিশ্চিতি! ইতিমধ্যে মা মারা যাবে, দাদা বিয়ে করবে তার জার্মান বান্ধবী ইভলিনকে, আলাদা থাকার ইচ্ছে থেকে নিউ কেন্ট রোডের ড্রিসকোল হাউসে একটা ঘর পাবার চেষ্টা করবে সে—এগুলো তেমন ঘটনা নয়। কিন্তু সেই সময় সে কি জানত কলকাতা ছাড়ার এগারো বারো বছর পরে হঠাৎই এক বিকেলে অলড্যুইচের বইয়ের দোকানে দেখা হবে সুশান্তর সঙ্গে, যে তাকে প্রথমে কলকাতার, তার পর চিনি- চিনি চোখে তাকিয়ে 'অনিন্দ্যর বোন?' বলে চিনতে পারবে এবং অল্প বিস্মৃতি থেকে সেও একভাবে মনে করতে পারবে সুশান্তকে? সেখানেই কিছু কথা, ক্রমশ সহজ হয়ে আসা—সুশান্ত তাকে এগিয়ে দেবে চেয়ারিং ক্রশ স্টেশন পর্যন্ত, কৌতূহল ও ভদ্রতাবশত সুনন্দর সুদারল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের বাড়ির ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দিয়ে তাকে উইক-এন্ডে বাড়িতে আসার নেমন্তন্ন করে বসবে পারমিতা। হঠাৎ গড়ে ওঠা পরিচয় থেকে মাঝে মাঝে দেখা হওয়া। সে কি জানত, শীত পড়ার মুখে একদিন ওয়াটারলু ব্রিজের ওপর থেকে সে যখন টেমসের জলের দিকে তাকিয়ে, তখন সুশান্তর আকস্মিক স্পর্শে কেঁপে উঠবে তার চেপে রাখা দোটানা, কয়েক মাসের মধ্যেই সুশান্তর স্ত্রী হয়ে ফিরে আসবে কলকাতায়? আর তারপর, নিজেকে মানিয়ে নিতে নিতে ক্রমশ বুঝতে পারবে সুশান্তর স্ত্রী হবার অভ্যাসে জড়িয়ে পড়ে সে হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে, নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা!

অনিশ্চিতের এক-একটা মোচড়ে নিজের জীবনের এই সব পাল্টে যাওয়া দেখতে দেখতে পারমিতা ধরে নিয়েছিল ঘটনা এইভাবেই ঘটে—শুধু তার নয়; আরও অনেকের জীবনে, এ নিয়ে ভেবে লাভ কী! এইভাবেই পার হয়ে গেল ছত্রিশ সাঁইত্রিশটা বছর। এখনও যুবতী সে, এখনও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠার বাকি আছে কিছু। কিন্তু, নিজের ইচ্ছা আর সম্ভাবনাগুলোকে নিয়ে বিয়ের আগেকার মতো নিজের ওপর আর সে জোর খাটাতে পারবে না। বরং যা যেমন ভাবে এসেছে তা-ই মেনে নেওয়া ভাল। সুশান্ত তার সেন্টারের পড়াশুনো আর রিসার্চ নিয়ে ব্যস্ত, সংসার সামলানোর দায় তার স্ত্রীর—এরকম দিন কাটানোয় মাঝে

মাঝে একঘেয়ে বোধ করলেও নিজের শান্ত হয়ে আসা অভিজ্ঞতা থেকে ইদানীং ভাবতে শুরু করেছিল পারমিতা, এমনও তো হতে পারে যে লন্ডনের বিয়ে না-করা স্বাধীন জীবনটাও একঘেয়েমি ও ক্লান্তিতে ভরে উঠত একদিন, অন্তত এর চেয়ে সুখের হত না। কিংবা সুশান্তর সঙ্গে বিয়ে না হয়ে যদি অন্য কারও সঙ্গে হত, তাহলেও কি অন্যরকম হত জীবন! সে জানে না।

কলকাতায় ফিরে আসার পর থেকে নতুন যেসব পরিচয় ও সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, সেগুলোর দিকে তাকালে মনে হয় স্থিরতা নেই কোথাও, যে যার নিজেকে নিয়ে ভাবছে, উনিশ-বিশের তফাতে একজন টেক্কা দিয়ে যাচ্ছে আর একজনকে। প্রাণ খুলে কথা বলবার ক্বচিৎ চেষ্টায় কারও গলা কেঁপে যাচ্ছে চোরা অভিমানে, কারও হাসি বেঁকে যাচ্ছে শ্লেষে। সুতপাদির মতো চাপা দুঃখে কাঠ হয়ে যাচ্ছে কেউ। হাজার চেষ্টাতেও তার কাঠিন্য ভেদ করে এগোনো যায় না।

তবু ভাল লাগে সুতপাকে। মনে হয় নিজের মধ্যে কোথাও একটা জোর পেয়ে গেছে ও, না হলে অনাথ একটা শিশুকে দত্তক নিত না। রণজয়কে বুঝতে পারে না, শুধু বোঝে সুশান্ত আর ওর তুই- তুমি'র সম্পর্কের মধ্যে একটা জট আছে কোথাও, সেটা ধরা পড়ে ওদের কথায়, দৃষ্টিতে, পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়ায়।

মনে আছে কলকাতায় ফেরার পর সুশান্তর চিঠি পেয়ে সুতপাই এসেছিল তাদের লেক রোডের ফ্ল্যাটে দেখা করতে; রণজয় আসেনি। তারপর ওদের আর্ল স্ট্রিটের বাড়িতে যেদিন একাই গেল পারমিতা, তাকে দেখে অনেকক্ষণ সহজ হতে পারেনি রণজয়। একটা দুটো কথার পর—চা করতে সুতপা তখন উঠে গেছে ভিতরে—হঠাৎই বলল, 'শেষ পর্যন্ত সুশান্তকেই বিয়ে করলে তুমি—।' সেটা বিস্ময় না প্রশ্ন, ঠিক ধরতে পারেনি পারমিতা, আটকে গিয়েছিল ওই 'শেষ পর্যন্ত' শব্দ দুটোয়। কখনও যেমন হয়, কারও দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হতাশায় ছেয়ে যায় শরীর, তেমনি রণজয়ের কথাগুলো সেদিন আড়ষ্ট করে দিয়েছিল তাকে। আবছা ভাবে মনে পড়েছিল ছোড়দার খবর দিয়ে বৃষ্টির মধ্যে ও দ্রুত অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে একজন। কোথায় সে-খবর কেউই দেয়নি। মাঝখানের বছরগুলো ভাঙা ব্রিজের মতো মুখ থুবড়ে পড়ে আছে জলে। মরচে ধরেছে ইস্পাতে। ঠিক জানে না, ছোড়দা বেঁচে থাকলে শেষ পর্যন্ত রণজয়ের মতোই হত কিনা। হয়তো হত, হয়তো না; কে তাকে নিশ্চিত করবে!

এসব ভাবনা মাঝে-মধ্যের, পারমিতার সঙ্গে সঙ্গেই ঘোরে। বিভিন্ন ঘটনার স্মৃতি জুড়লে মন খারাপে আচ্ছন্ন লাগে শরীর। মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার এই জীবন সত্যিই কি কোথাও নিয়ে যাচ্ছে তাকে? এর সঙ্গে জীবনের অনিশ্চিতির সম্পর্ক কোথায়? এভাবে আপস করতে করতে সে কি আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ছে না।

এরই মধ্যে হঠাৎ খেয়ালে চায়ের প্যাকেটের সঙ্গে পাওয়া লাকি কুপন ভর্তি করে পাঠিয়েছিল নির্দিষ্ট ঠিকানায়। নিতান্তই মজা করার জন্যে, পাবে বলে নয়। কপাল বলতে হবে, দ্বিতীয় পুরস্কারটা লেগে গেল। স্বামী-স্ত্রীর বোম্বাই বা দিল্লি যে-কোনও একটা জায়গায় যাবার দু দিকের এয়ার-ফেয়ার আর ফাইভ-স্টার হোটেলে তিন রাত চার দিন থাকা। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে ঘোষিত নাম্বারের সঙ্গে কুপনের ডুপ্লিকেট মিলিয়ে এরকম অদ্ভুত একটা ঘটনা ঘটতে দেখে বহু দিন পরে প্রায় শিশুর আহ্লাদে শিহরন ছুটে গিয়েছিল

পারমিতার শরীরে।

কাজে বেরুবার আগে নিজের কাগজপত্র গোছাচ্ছে সুশান্ত। খবরের কাগজ আর কুপনের ডুপ্লিকেটটা ওকে দেখাতে বেশ মনোযোগ দিয়ে দেখল নাম্বার দুটো। তারপর পারমিতার হাতে ফেরত দিয়ে বলল, 'বেশ তো। ভালই—'

'যাক, একটা বাইরে যাবার সুযোগ পাওয়া গেল। দিনরাত শুধু সংসার করতে করতে দম বন্ধ হয়ে আসছিল।' অবিশ্বাসের চোখে তখনও সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে পারমিতা। সেইভাবেই বলল, 'বোম্বাই যাইনি কখনও। ওখানেই যাব। কী বল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সুশান্ত। কাগজ গোছানো হয়ে গিয়েছিল। শেষ হয়ে আসা সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে, উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সংসার করতে যাদের দম বন্ধ হয়ে আসে তারা সংসার না করলেই পারে।'

সুশান্তর গলায় ক্ষোভ। হকচকিয়ে গিয়ে পারমিতা বলল, 'সামান্য কথায় টেম্পার লুজ করো কেন!'

'কথাটা সামান্য নয় বলে।'

সুশান্ত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাথরুমে। না দেখলেও বোঝা যায় স্যান্ডো গেঞ্জি-পরা শক্ত কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়েছে বেসিনে। ওর খাঁকারি দিয়ে গলায় আটকে থাকা কফ বের করার শব্দ শুনতে শুনতে বিমূঢ় ভঙ্গিতে জানলা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকল পারমিতা।

জঞ্জালের গন্ধ ছড়িয়ে চলে যাচ্ছে কর্পোরেশনের লরি। তার পিছনে হ্যান্ডেলের দুপাশে দুটো মুর্গি ঝুলিয়ে একটা সাইকেল। ফুটপাতের রোদ উঠে গেছে স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে থাক করে সাজানো পাঁউরুটির প্যাকেটগুলো পর্যন্ত। দু হাতে বাজারের থলি হাতে এক কাঁচাপাকা চুলের রোগাটে চেহারার প্রৌঢ় ট্যাক্সির হর্ন শুনে বিরক্তিতে দাঁড়িয়ে পড়ে চলতে শুরু করল আবার। চাকা-আলগা শূন্য পেরেম্বুলেটর ঠেলতে ঠেলতে রোদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক আয়া গোছের মহিলা।

দৃশ্যটা হারিয়ে যাবার আগেই ফিরে এল সুশান্ত।

'এই যে কুপন ভর্তি করে পাঠিয়েছ, আমাকে বলোনি তো?'

'এটা কি বলার মতো ব্যাপার!'

'নয় কেন!' পারমিতা তাকেই দেখছে দেখে দৃষ্টি সরিয়ে নিল সুশান্ত। একটা কিছু চাই বলেই যেন সিগারেটের প্যাকেটটা আবার তুলে নিল হাতে, 'তাহলে এখনই বা বললে কেন!'

'ভুল হয়েছে। ক্ষমা চাইছি।' কাগজগুলো হাতে নিয়ে সরে যেতে যেতে পারমিতা বলেছিল, 'আমার কোথাও গিয়ে কাজ নেই—'

ঘটনাটা ওইখানেই শেষ হলেও গেঁথে গেছে মনে। সুশান্তর রাগ চেনা যায় ওর গম্ভীর হয়ে যাওয়া দেখে, এসব মুহূর্তে কথায় ক্বচিৎই ও প্রকাশ করে নিজেকে। পারমিতা বুঝতে পারছিল না তার কথায় সুশান্ত আজ ওই ভাবে রিঅ্যাক্ট করল কেন। সংসারে একঘেয়েমির কথা বলায়, নাকি বহুবার বলা সত্ত্বেও গত চার পাঁচ বছরে তাকে একবারও কলকাতার বাইরে নিয়ে যায়নি—এড়িয়ে গিয়েছিল একটা না একটা অজুহাত দেখিয়ে, এখন পারমিতার হাত ধরেই একটা সুযোগ এসে গেল বলে ঘা লেগেছে অহঙ্কারে?

কারণ যা-ই হোক, এই ধরনের কথাবার্তার সামনে বড় দীন মনে হয় নিজেকে। মনে হয় প্রতিরোধহীন, আত্মীয়-সম্পর্কশূন্য। ছোট, এতই ছোট যে অসাড় হয়ে আসে হাত-পা, অসহায়তার ভিতর অনুভব করা যায় না কোনও রক্ত-মাংসের অস্তিত্ব। আস্তে আস্তে হারিয়ে যায় পূর্বাপর—সে কারও স্ত্রী বা মেয়ে বা বোন, শৈশবের কিছু না-হওয়া থেকে বছরের পর বছর ধরে অনিশ্চিতির মধ্যে যেতে যেতেও সে পৌঁছে গিয়েছিল একটা স্বাধীন সত্তায়, যেখানে পৌঁছুলে স্পর্শ করা যায় আত্মনির্ভরতা। এতদিন ধরে একটু একটু করে হারানোর বোধ যেন একদিনের একটি মুহূর্তে পৌঁছে পেয়ে যায় বোধশূন্যতার পুরো অবয়ব।

সেদিন সুশান্ত চলে যাবার পর থেকে অনেকটা সময় পর্যন্ত ফাঁকা বাড়িটা ফাঁকাই লাগে পারমিতার। বন্ধ দরজা, দেয়াল, সিলিং, আসবাবপত্রের অদ্ভুত সংঘবদ্ধ স্থিরতার মধ্যে একা হতে হতে ক্রমশ টের পেতে থাকে আরও এক আবির্ভাবের, কিছু যেন আকর্ষণ করতে থাকে তাকে, টানতে থাকে শেষ সিদ্ধান্তের দিকে। তখন, নিজেই নিজের শিকারে পরিণত হবার আগে, কীভাবে কে জানে, হঠাৎই সে ভাবতে শুরু করেছিল, কেন? যতই হতাশা থাক জীবনে, যে-কোনও শূন্যতা থেকেই তো আবার বেঁচে থাকায় ফিরেছে সে, আরও একবার পারবে না কেন?

এসব ভাবতে ভাবতে দুপুরের রোদে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল পারমিতা। হেঁটে, তাবপব ট্রামে উঠে যথেচ্ছ ও অনির্দিষ্ট যেতে যেতে ভেবেছিল, যে-সম্পর্ক পারস্পরিক নয়—একজনেরই অধিকার আর ইচ্ছা অনিচ্ছায় সীমাবদ্ধ, যে-সম্পর্কে উত্তাপ নেই, যে-সম্পর্ক শুধুই অভ্যাস, তাকে সামাজিক করে রাখতে হবে কেন! এই পরিচয় কি এতই জরুরি! ইচ্ছে করলেই তো সে ঢেলে সাজাতে পারে নিজেকে, আবার ফিরে যেতে পারে লন্ডনে!

পারমিতা ঠিক করল এখন থেকে সে শক্ত হবে। সুশান্তকে বোঝানো দরকার তার স্ত্রী হওয়া বলতে সে যা বুঝেছিল এবং সেইজন্যেই বিয়ে করেছিল, সেই ধারণার সঙ্গে পরবর্তী বাস্তবের কিছুই মেলেনি। হয় সুশান্ত নিজেকে শোধরাক, না হলে নিজের ভবিষ্যৎ সে নিজেই ভেবে নেবে।

সুশান্ত বাড়ি ফিরল নিজেকে বদলে। পারমিতাকে অস্বাভাবিক রকমের চুপচাপ দেখে বলল, 'সরি। সকালে বোধহয় একটু ওভার-রিঅ্যাক্ট করেছি। মানে—'

পারমিতা আগ্রহ দেখাল না। 'সরি' শব্দটা তার চেনা, বহু ব্যবহারে এখন আর কোনও অর্থে পৌঁছুতে পারে না। ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'সকালের প্রসঙ্গ থাক। আমার যা বলবার বলেছি।'

'সেটা তো রাগের কথা!'

জবাব দিল না পারমিতা। অভ্যাসে হোক বা সংস্কারে, স্বামী বাড়ি ফিরলে স্ত্রীর কিছু-কিছু করণীয় থাকে, বিশেষত সে স্ত্রী যদি হয় পারমিতার মতো কেউ। পুরোপুরি হাউসওয়াইফ। সুশান্তর চা, খাবারের ব্যবস্থা করতে কিচেনে ঢুকল সে।

অক্সফোর্ডের ডিগ্রি, বিদেশে দু বছর পড়ানোর অভিজ্ঞতা এবং খাস বিলিতি না হলেও এগারো বারো বছর লন্ডনে থাকা, ইংরেজি জানা বউ নিয়ে দেশে ফিরে কীভাবে জীবনযাপন করবে সে-সম্পর্কে একটা ছক যেন আগেই কষে রেখেছিল সুশান্ত। সেই সূত্রে যেসব সিদ্ধান্ত সে নেয় তার একটি নিজের নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে যেটুকু সম্পর্ক না রাখলেই নয় তার

বেশি না রাখা। না হলে বাড়ির ছোট ছেলে হিসেবে বিবেকানন্দ রোডে তাদের দোতলা বাড়িতে আরও দুই ভাইয়ের সঙ্গে দিব্যি থাকতে পারত। থাকেনি। 'কালচারে মিলবে না', বলেছিল তাকে, 'তুমি হাঁফিয়ে উঠবে।' বাবা মা জীবিত নেই, সুতরাং জোর করারও কেউ ছিল না। পরের সিদ্ধান্ত, স্ত্রীকে চাকরি করতে না দেওয়া, যাতে পারমিতার পাট না ভাঙে। 'আমি চাই না তুমি সাত তাড়াতাড়ি বুড়িয়ে যাও। দরকারই বা কি!' এসব বলে গোড়াতেই রাজি করিয়ে নিয়েছিল তাকে। পরে, বাড়ি বসে থেকে ক্লান্ত হতে হতে পারমিতা যখন কিছু একটা করতে চাইল, অফিসে না হোক স্কুলে-টুলে, সুশান্ত আমল দেয়নি। আরও যে সিদ্ধান্ত সে নেয় তা হল কোনও ফুলটাইম কাজের লোক, বিশেষত পুরুষ, বাড়িতে না রাখা। কারণটা, স্বামীর কথা থেকে, কোনও দিনই স্পষ্ট হয়নি তার কাছে। একটি ঠিকে মেয়ে আছে তাদের, সকাল বিকেল কাজ করে যায়। বাকি দায়িত্ব পারমিতার। বিদেশে থাকতে যেসব খাবারে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল সুশান্ত তার অনেকগুলো এখানে এসেও ছাড়েনি। ওখানকার অভ্যাসেই প্রয়োজনে নিজেও হাত লাগাতে পারে রান্নাবান্নায়।

সেটা দরকার হয় না। পারমিতারও কিছু কাজ দরকার। না হলে শুধু কাজের অভাবেই এত দিনে একটা কিছু করে ফেলত সে।

এই মুহূর্তে কিচেনে দাঁড়িয়ে টোস্টারে স্যান্ডউইচ সেঁকতে সেঁকতে পারমিতা ভাবল, এরকম কিছুই ভাল-না-লাগা মুহূর্তে নিজেকে নিয়ে একান্ত হবার সুযোগই কি পেত সে। এই যে শেষ পর্যন্ত 'সরি' বলল, যতই খেলো শোনাক, ওটা সকালে কথা কাটাকাটি হবার সময়েই বলতে পারত সুশান্ত। তাহলে মাঝখানের সাত আট ঘণ্টা সময় এতটা হাত-পা-ছাড়া লাগত না নিজেকে। মনে হচ্ছে এই সরি-টাও উচ্চারণ করেছে ভেবেচিন্তে। যদি তা না হয়, তাহলে যে-লোক সকালে ওইরকম কাণ্ড ঘটিয়ে গেল, এখন তো তার নৈঃশব্দ্যে ডুবে থাকা উচিত!

ক্রমশ যেন একটা নতুন ধাঁধায় জড়িয়ে পড়ছিল পারমিতা।

সুশান্তর চরিত্রের অদ্ভুত স্ববিরোধগুলো নিয়ে যখন ভাবে তখন সত্যিই থই পায় না। এগুলো সে চিনেছে আস্তে আস্তে, ওর কথাবার্তা থেকে, কখনও বা ছোটখাটো ঘটনার মধ্যে দিয়ে।

বিদেশে হঠাৎ দেখা হবার আগে ওকে চিনতই না প্রায়। অনিন্দ্য, রণজয়ের মুখে ওর নাম শুনত, দু একবার দেখেওছিল ছোড়দার খোঁজে বাড়িতে আসতে, এর বেশি নয়। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার পর ছোড়দা কথা বলত না বেশি। পরিচিতদের মধ্যে কে কেমন, কী করে, এসব নিয়ে আলোচনা করত না বাড়িতে। ছোড়দা তখন অন্য জগতে। সব সময়েই কেমন যেন চিন্তিত, সারাক্ষণ আড়াল খুঁজছে নিজের মধ্যে। সুনন্দ বিদেশে চলে গিয়েছিল বাবা মারা যাবার আগে, তারপর থেকে তাদের অভিভাবক বলতে মা। কমজোর মানুষ, ছোড়দার সম্পর্কে মা'র একটিই চিন্তা, ছেলে ঠিক সময়ে বাড়ি ফিরছে কিনা। সে নিজেও কি অন্যভাবে ভাবত? পরের ঘটনাগুলো এতই দ্রুত ঘটেছিল যে আগেপরে পরম্পরা থাকেনি। স্মৃতি হারিয়ে গিয়েছিল স্মৃতিতে।

সুশান্তও যে রাজনীতি করত, একই দলে ছিল অনিন্দ্যদের সঙ্গে, এসব সে জানতে পারে যেদিন প্রথম ও এল সুনন্দর সুদারল্যান্ড অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে। ওরই মুখে। কথাবার্তায় সপ্রতিভ। সুনন্দ আর ইভলিনের মুখচোখ দেখে মনে হচ্ছিল ওরাও খুব ইমপ্রেসড। দেশের

অবস্থা নিয়ে আলোচনা করতে করতে ওরা পৌঁছে গিয়েছিল পুরনো দিনে—অনিন্দ্যর মৃত্যুর ঘটনাতেও।

ছোড়দার মৃত্যুটা মেনে নিতে পারেনি দাদা। বিক্ষোভও চেপে রাখতে পারেনি। হঠাৎই, প্রায় আক্রমণ করার ধরনে বলল, 'আপনাদের ওই রাজনীতিটা ছিল অসৎ, পারপাসলেস। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কেমন তা না বুঝেই কতগুলো নিরীহ ছেলের আবেগ এক্সপ্লয়েট করে তাদের ঠেলে দেওয়া হয়েছিল মৃত্যুর দিকে—এটা আমি কখনওই ভুলতে পারব না।'

সুনন্দর কথাগুলো মন দিয়ে শুনল সুশান্ত। তারপর গভীর গলায় বলল, 'রাজনীতিটা কি অসৎ ছিল? বোধ হয় না। আসলে আমরাই ছিলাম পারপাসলেস। অনিন্দ্যরা তো জুনিয়র ছিল আমাদের চেয়ে। আমরাই কি বুঝেছিলাম আন্দোলন কোন দিকে যাচ্ছে, এর পরিণতি কী হতে পারে! যদি বুঝতাম, তাহলে রাজনীতিটা লক্ষ্যহীন হয়ে পড়ত না। আমাদের জীবনটাও হয়তো অন্যরকম হয়ে যেত না!'

সুশান্তর কথাগুলোয় এমন কিছু ছিল যা সকলকেই চুপ করিয়ে রাখল। এমনকী ওকেও। ঘর জুড়ে প্ল্যানচেটের টেবিলের সামনে বসে থাকার মতো স্তব্ধতা।

'জীবন অন্যরকম হয়েছে বলছেন কেন!' খানিক পরে জিজ্ঞেস করেছিল পারমিতা, 'খারাপ কী হয়েছে?'

'মনে হয়। মনে হওয়াটা এড়াতে পারি না।' শান্তভাবে হাসল সুশান্ত। সোজাসুজি তার দিকে তাকাতে গিয়েও দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিল আরও দূরে। বলল, 'ব্যক্তিগত ভাবে কী হয়েছি সেটা বড় কথা নয়। যারা পারল না, চলে গেল, তারাও কিছু হতে পারত। কিসের জন্যে মরল তারা! এই ভাবনাটাই হন্ট করে। নিজের পাওয়াগুলোকেও মনে হয় ইনকমপ্লিট, অসম্পূর্ণ। মানুষ তো শুধু নিজের সাফল্য নিয়ে বাঁচে না!'

সব বাজে কথা। ওল্টানো কলসির জলের শব্দের মতো গবগবে, ফাঁপা। শুধুই কথা, কথা, কথা! সুশান্তর চরিত্রে এসব কথার সত্য কোথায়!

কিচেনের একান্তে চায়ে দুধ মেশাতে মেশাতে চেপে রাখা নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে যেতে দিল পারমিতা।

সাত বছর আগে এসব এবং এরকম আরও অনেক কথার সম্মোহনে না ভুলে সে যদি *নির্বিকারই থাকত, শীতের টেমসের জলের দিকে তাকিয়ে আকস্মিক স্পর্শে কেঁপে না উঠত, তাহলে তার জীবনটাই হয়তো অন্যরকম হত—লেক রোডের বাড়ির কিচেনে চায়ের কাপে অর্থহীন চামচ নাড়তে নাড়তে শেষ হয়ে যেত না। কী ছিল রণজয়ের ওই 'শেষ পর্যন্ত' কথা* দুটোর মধ্যে? সেদিন রণজয়ের ওই কথাগুলোয় প্রশ্ন না বিস্ময় কী ছিল তা বুঝতে না পারার দ্বিধায় নিজের মধ্যে হতাশা টেনে এনেছিল সে, আজ মনে হচ্ছে ঘৃণাও কি ছিল?

সকাল, দুপুর, বিকেলের অস্থিরতা এখন আর নেই। তার বদলে শরীর মন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে জ্বালা। মাথার মধ্যে তিরতির করছে রাগ। অনেকটাই নিজের ওপর। কত বয়স ছিল তখন? আঠাশ, না উনত্রিশ? আঠাশই হবে। ওই বয়সে কেউ খুকি থাকে না। আবেগে ঢুকে পড়ে হিসেব, দৃষ্টিতে ঢুকে পড়ে আড়ে তাকানো। মেয়ে হয়ে জন্মানোর অর্থগুলো সারাক্ষণ সতর্ক থাকে মগজে। সে চিনতে পারেনি কেন।

স্যান্ডউইচ আর চা নিয়ে লিভিং রুমে এসে পারমিতা দেখল ইতিমধ্যে ট্রাউজার্স বুশ সার্ট

ছেড়ে পায়জামা পাঞ্জাবি পরেছে সুশান্ত। চুল সামান্য ভিজে আর পরিপাটি করে আঁচড়ানো। ওকে দরজা খুলে দেবার সময় একটাই আলো জ্বেলেছিল পারমিতা, এখন দুদিকে দুটোই জ্বলছে ঘরের চারদিকে আলোর সমতা বিস্তার করে। সোফায় বসে ডিভানের ওপর দিকে দেয়ালে চওড়া ফ্রেমে বাঁধানো ভ্যান গখ্-এর শূন্য চেয়ার-এর দিকে তাকিয়ে আছে সুশান্ত। হাতে বা মুখে সিগারেট নেই, সুতরাং ওকে অন্যমনস্ক বলা যাবে না।

সামনের গোল টেবিলটায় স্যান্ডউইচ আর চা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল পারমিতা। সুশান্ত ডাকল।

পারমিতা দাঁড়িয়ে পড়ল। ওপরের ফ্ল্যাটে টি-ভি চলছে জোরালো শব্দে। একটা দুটো কথা কানে এল। কান আরও খাড়া করতে শুনল 'এগুলোকে ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ—' ইত্যাদি। পুরুষ-কণ্ঠ। নিশ্চয়ই স্বাস্থ্য বিষয়ক কোনও অনুষ্ঠান।

'একবার সরি বলবার পর ব্যাপারটা মিটে যাওয়া উচিত।' ওকে দেখতে দেখতে বলল সুশান্ত, 'জিইয়ে রাখার কী আছে!'

'আমি কিছুই জিইয়ে রাখিনি। যা বলবার সকালেই বলেছি।'

'তাও শুনেছি। এখন বোসো এখানে। আমারও কিছু বলবার আছে—'

'নতুন আর কী বলবে!'

চায়ের কাপটা হাতে তুলে একটা বড় চুমুক দিয়ে নামিয়ে রাখল সুশান্ত। চোখে কৌতুক। হেসে ফেলল।

'হাসো। হেসে নাও।' এটা পারমিতার চলে যাবার সময়। তার আগে বলল, 'এত দিন নিজেকে অনেক হাস্যকর করেছি। আর পারব না।'

সুশান্ত হঠাৎই ছেলেমানুষ হয়ে উঠল। উঠে দাঁড়িয়ে, হাত ধরে পারমিতাকে এমনভাবে সামনের সোফাটায় বসতে বাধ্য করল যে মনে হবে এই মুহূর্তের ঘটনার সঙ্গে সে নিজে যুক্ত নয়, অন্য কারও আচরণে ক্ষুণ্ণ স্ত্রীকে স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পালন করছে মাত্র।

বসলেও চোখ তুলল না পারমিতা। টেবিলে পড়ে আছে 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'র কপি, এখানে বসবার আগে সুশান্তই নিয়ে এসেছে। অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে সেদিকে তাকিয়ে বলল, 'কী বলবে?'

'বলছি।' সুশান্ত হাসল কি না বোঝা গেল না। সময় নিচ্ছে। একটু পরে বলল, 'স্যান্ডউইচটা খাচ্ছি। চা খাব না। ইচ্ছে করছে হুইস্কি খেতে—'

ছেলেমানুষি কথাবার্তা। সুশান্ত যেমন, তেমন লাগছে না। একই সময়ে পারমিতা অনুভব করল সকালের ওই ঘটনার পর থেকে কিছুক্ষণ আগে পর্যন্তও সে নিজে যেমন ছিল এখন আর তা নেই। সকালে সুশান্তর রাগী প্রশ্ন শুনে 'ক্ষমা চাইছি' বলে যেভাবে গুটিয়ে নিয়েছিল নিজেকে, অবস্থাটা একই না হলেও প্রায় সেইভাবেই এখন সে সরে দাঁড়াচ্ছে নিজের জায়গা থেকে। কেন?

প্রশ্নটা মাথায় ধাক্কা দিলেও উত্তর খুঁজল না পারমিতা। নিজের ওপর বিরক্তিতে হঠাৎ তার মনে হল, এর চেয়ে সকালের চ্যাঁচামেচিটাও ছিল ভাল—অন্তত তার মধ্যে দিয়ে সে আর সুশান্ত আলাদা হয়ে গিয়েছিল পরস্পর থেকে। সুশান্ত কী ভেবেছিল জানে না, কিন্তু, নিজের হতাশা, জ্বালা, রাগ থেকে উদ্ভূত অনুভূতির তীব্রতা দিয়ে একভাবে নিজেকে খুঁজতে

শুরু করেছিল সে। এখন আবার ভোঁতা লাগছে নিজেকে। সুশান্তকে চা দিতে আসার পর থেকে সে আর সুশান্ত যেসব কথা বলেছে এবং যা যা করেছে, আর কেউ সাক্ষী থাকলে সেগুলোকে খেলো, বিরক্তিকর ও অশ্লীল ছাড়া আর কিছুই ভাবত না। সাত বছরে ক্রমশ ক্ষয়ে যেতে যেতে এ কোথায় এসে পৌঁছুল তারা। নিজের চারপাশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে নিতে সুশান্ত কি ভুলে গেছে সে নিজে কোথায় দাঁড়িয়ে।

'ভেবে দেখলাম, শুধু বোম্বাই নয়, এই সুযোগে গোয়াটাও ঘুরে আসা যাবে।' এতক্ষণে কাজের কথায় ফিরে এসে সুশান্ত বলল, 'অবশ্য সেখানেও যদি ফাইভ-স্টারে থাকতে চাও তাহলে আর একটা কুপন জিততে হবে তোমাকে। খরচটা তো কম নয়।'

এখন সুশান্তর ওষুধ খাবার সময়। কথাগুলো তাকে বললেও দৃষ্টি তার দিকে নেই, ফ্রেমে বাঁধানো শূন্য চেয়ারটাও ঠিকঠাক দেখছে বলে মনে হয় না। প্রায় অভিব্যক্তিহীন মুখ, খুঁটিয়ে দেখলে সত্য মিথ্যা আঁচ করা যায় না। উঠে যেতে যেতে পারমিতা বলেছিল, 'যে-কুপনটা আছে সেটাও ছিঁড়ে ফেললে ক্ষতি কী!'

এসব পুরনো ঘটনা। বার বার ফিরে আসে। সরানো যায় না।

ঘটনার ভিতরের ক্লান্তি থেকে একদিন পারমিতা ভেবেছিল মেনে নেওয়া ও মানিয়ে নেওয়ার এই জীবন শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে যাবে তাকে! নতুন কোনও অনিশ্চিতিতে—যা আবার পাল্টে দেবে জীবন, নাকি এব পরের সবকিছুই হয়ে পড়বে আরও একঘেয়ে, আবও অর্থহীন!

ভাবনাটা বেশি করে চেপে বসল গোয়া বেড়িয়ে ফেরার পরে। আবার বোম্বাইয়ে এসে।

সুশান্তব পরিকল্পনা ছিল তিন রাত চার দিন বোম্বাইয়ে কাটিয়ে গোয়ায় যাবে। ওদের সেন্টারের কার সঙ্গে যেন গোয়ার ডিরেক্টর অফ ট্যুরিজম-এর ব্যক্তিগত খাতির আছে, তাকে ধরে আগেভাগেই পানাজিতে সরকারি ট্যুরিস্ট হস্টেল বুক করে ফ্যাক্সে কনফারমেশনও আনিয়ে নিয়েছিল; পারমিতাকে বোঝাল মাণ্ডবী নদীর ধারে বন্দোদকার মার্গের ওপর চমৎকার লোকেশান টুরিস্ট হস্টেলের—সেখান থেকে কন্ডাকটেড ট্যুরে যেখানে যা দেখার দেখে নেবে। তারপব বোম্বাইয়ে ফেরা। মাত্র এক রাতের ব্যাপার। মোটামুটি চলনসই একটা হোটেলে উঠলেই চলবে। রাতটা কোনওরকমে কাটিয়ে সকালে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ানো, পাবমিতা চাইলে কিছু মার্কেটিং করে নিতে পারে, বিকেলে এয়াবপোর্ট। কলকাতা। নিজের ওপর আস্থায় খুঁত রাখেনি সুশান্ত।

পারমিতা কোনও পরামর্শ দেয়নি। দেবার ছিলই বা কী! বস্তুত, সেদিন যা ঘটল তার পরে সুশান্তর কাছে সকালের ঝামেলা সন্ধেয় মিটে গেলেও, সে কিছুতেই ভুলতে পারছিল না ব্যাপারটা। এমন বেড়ানোয় স্ফূর্তি থাকে না। তা ছাড়া, জায়গা বদল হলেও সে তো যাচ্ছে সুশান্তরই সঙ্গে, জায়গা বদলের সঙ্গে সঙ্গে সুশান্তও কি বদলে যাবে? এই যে বোম্বাই, গোয়া—এগুলোও শেষ পর্যন্ত মানচিত্রে নির্দেশিত জায়গা হয়েই থাকবে, যদি ফাইভ-স্টার বা চলনসই যেমনই হোক, হোটেলের ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনও মনে হয়েছিল, ক্ষোভ দুঃখ আত্মহত্যার চিন্তা সবকিছু মাথায় এলেও সেদিন সত্যি-সত্যিই যদি কুপনের ডুপ্লিকেটটা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলত সে, তা হলে দরকারই হত না এত সব পরিকল্পনার, মরে যাওয়া ইচ্ছেটাকে বহন করে সুশান্তর তালে তাল দেওয়ার। সেদিন সকালে সুশান্ত যখন তাকে রূঢ়ভাবে ফিরিয়ে দেয় তখন কুপনটা ছিল তারই হাতে, তখনই

ছিড়ে ফেললে সঙ্গতি থাকত সেই সময়ের ক্ষোভের সঙ্গে। ছেঁড়েনি কেন। ভয়ে? যদি তার প্রতিক্রিয়ায় সুশান্ত এমন কিছু করে যা তাদের সম্পর্কটাকেই ছিঁড়ে দেবে! তা হলে কি অবচেতনায় সে জড়িয়ে গেছে মাঝে মাঝে দুঃসহ হয়ে ওঠা এই জীবনের সঙ্গেই। এর থেকে মুক্তির কথা ভাবলেও ফাঁক থেকে যাচ্ছে ভাবনায়; নিজেকে নিয়ে নিশ্চিত নয় সে?

পরিকল্পনা মতোই চলছিল সব। অশান্তির আশঙ্কায় চুপচাপ থেকে সুশান্তর প্ল্যানে সায় দিয়ে যাচ্ছিল পারমিতা।

সেদিন সন্ধেয় রণজয়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে নতুন করে গোলমাল বাধাল সুশান্ত।

ততক্ষণে হুইস্কি পড়েছে সুশান্তর পেটে। মোলায়েম হতে শুরু করেছে। রণজয় সম্পর্কে আড়ষ্টতা কিংবা নিজেকে বেশি করে দেখানোর চেষ্টা, কোনওটাই প্রবল নয়। রণজয়কেই বলেছিল কথাটা।

'তোর তো বেশ কিছুদিন হয়ে গেল এখানে, সব খোঁজ খবরই রাখিস নিশ্চয়ই—'

ঠাণ্ডা অরেঞ্জে মুখ দিয়ে পারমিতা দেখছিল সুশান্তর বাড়িয়ে দেওয়া হাত থেকে গ্লাস নিয়ে মিহি জলের শব্দে স্কচ ঢালছে রণজয়। ভঙ্গিই চিনিয়ে দেয় আর্ল স্ট্রিট অনেক দূরে।

'কী জানতে চাও বলো না?'

'একটা ভাল কিন্তু সস্তা হোটেল সাজেস্ট কর তো। এই ধর, শ চার পাঁচের মধ্যে?'

'চার পাঁচশোয় ভাল হোটেল! বোম্বাইয়ে? ওই টাকায় এখানে একটা ভাল মাদুরও পাওয়া যায় না আজকাল।'

সুশান্ত দমল না। বরং সোজা হয়ে বসল।

'খবর রাখিস না, সেটাই বল না! স্মার্ট হবার চেষ্টা কেন। ফাইভ হান্ড্রেড ইজ নো জোক! মেরিন ড্রাইভে দেখছিলাম একগাদা হোটেল, সেগুলো কি?'

সোজা দৃষ্টিতে এক পলক সুশান্তকে দেখে নিল রণজয়। কিছু আঁচ করবার চেষ্টা করল যেন।

'হঠাৎ হোটেলের খোঁজ করছ কেন? ফাইফ-স্টার কমফার্ট সহ্য হচ্ছে না!'

'নো, নো, ইটস নট দ্যাট। কথাটা শোন আগে, তারপর কমেন্ট করিস।'

'বলো—'

'গোয়া থেকে ফিরে একদিন থাকতে হবে এখানে। সেদিনই তো ব্যাক করতে পারছি না।' সুশান্ত সিগারেট ধরাল। এক চুমুকে অনেকটা হুইস্কি গিলে দুজনের থেকে সমান দূরত্বে বসে থাকা পারমিতাকে দেখে নিয়ে বলল, 'আই ডোন্ট বিলিভ ইন ওয়েস্টফুল স্পেন্ডিং—'

'হোটেলে থাকার দরকার কি। একটা দিন আমার এখানেই থাকতে পারো। এখান থেকেই এয়ারপোর্টে চলে যাবে—'

পারমিতা লক্ষ করছিল সুশান্তর সঙ্গে কথা চালিয়ে গেলেও হোটেলের ঘরে তার সঙ্গে দেখা হবার পর যেমন চাঙ্গা আর স্বতঃস্ফূর্ত লাগছিল রণজয়কে, এখন আর তা লাগছে না। একটু বা ফরমাল। কথা বলছে ভেবেচিন্তে। এই ফ্ল্যাটে, ওরা লিভিং রুমে এসে বসবার পর পেল-গ্রিন দেয়ালে শুধু একটা বড়সড় কথাকলি মুখোশ ছাড়া আর কিছু নেই দেখে সুশান্ত বলল, 'একটা পেন্টিং রাখিসনি কেন। মুখোশ-টুখোশ খুব ব্যাকডেটেড ব্যাপার।' শুনে সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না রণজয়; মুখোশটার দিকে তাকিয়ে হাসল একটু, তারপর শান্ত গলায় জবাব দিল, 'ব্যাকডেটেড হলেও ডেড কি? ওটা রিমাইন্ডারের কাজ করে।' সুশান্ত বলে

উঠল, 'যেমন, বিওয়্যার অফ ডগ!' এবার উত্তর এড়িয়ে গেল রণজয়, ওর মুখের দিকে তাকিয়ে পারমিতার মনে হল অন্যমনস্ক, সুশান্তর কথা কানে তোলেনি।

এখন বলে নয়, হোটেলের ঘরেই, শেষদিকে, কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছিল রণজয়। গাড়ি ড্রাইভ করল প্রায় গম্ভীর হয়ে। পাশে সুশান্ত, পিছনের সিটে সে। যেটুকু কথা তা সুশান্তই বলেছিল, মাঝে মাঝে রণজয়। মেরিন ড্রাইভের ধোঁয়াটে সমুদ্র এবং নিখুঁত রেখায় বেঁকে যাওয়া আলোর মালার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একসময় মনে হয়েছিল পারমিতার, রণজয়দার গাড়িতে নয়, সে যেন ট্যাক্সিতেই যাচ্ছে। হোটেলে তাকে বলেছিল গোয়া থেকে ফেরার পথে ক'দিন থেকে যেতে তার ফ্ল্যাটে—সুশান্তকেও বলতে সেরকম, এখন নিজে সুযোগ পেয়েও বলল না। সুশান্ত একটা দিন বলেছে বলে নিজেকেও থামিয়ে রাখল একটিই দিনে। ভদ্রতাবশত এমন প্রস্তাব যে-কেউই দিত। তা হলে কি সুতপাদির কথা তুলে সে-ই বিগড়ে দিল রণজয়কে!

'সেটা হয় না। তোর এখানে থাকতে হলে আগে থেকে ইনভাইট করবি। এভাবে নয়।' সুশান্ত বলল, 'আমাদের প্ল্যানটা যেমন আছে থাক। তা ছাড়া গোয়া থেকে কবে ফিরব তাও তো জানি না।'

'তা না জানলে এখানেই বা হোটেল বুক করবে কী করে!'

থামিয়ে দেওয়ার ধরনে হাত তুলে সুশান্ত বলল, 'প্লিজ! ডোন্ট বদার—'

নিজের গ্লাসে চুমুক দিয়ে তেরছা ভঙ্গিতে হাসল রণজয়। সামান্য ছোট হয়ে এল চোখ দুটো।

'আমি বদার করছি না। তোমার ব্যাপার তুমিই বুঝবে। তা বলে ফাইভ-স্টার থেকে সস্তার হোটেলে—আলিপুর থেকে একেবারে গোবরডাঙায়! পারমিতা খুশি হবে তো!'

এতক্ষণের খোলস ছেড়ে হঠাৎই যেন বেরিয়ে এল রণজয়।

পারমিতা দেখল, থেবড়ে গেছে সুশান্ত। এরপর কী বললে ঠাট্টাটা হজম হবে বুঝতে না পেরেই যেন হুইস্কির গ্লাসটা চেপে ধরল মুঠোয়। রণজয়কে এড়াবার জন্যে তাকিয়ে থাকল দেয়ালের মুখোশটার দিকে।

সেই মুহূর্তের অস্বস্তি থেকে দুজনকেই বের করে আনবার জন্যে পারমিতা বলেছিল, 'আপনার ফ্ল্যাট থেকে সমুদ্র দেখা যায় বলছিলেন। কোথায়? আমি তো কিছুই দেখছি না!'

কাজ হল না। সুশান্তকে চুপচাপ গ্লাসে চুমুক দিতে দেখে মনে হচ্ছিল সামনে দাবা নিয়ে বসেছে ও, এখনও বেরুবার রাস্তা খুঁজে পায়নি। খুঁজতে খুঁজতে নিজের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ।

তখনও জানত না সুশান্ত এগোচ্ছে সিদ্ধান্তের দিকে। কথাগুলো রণজয় বললেও রণজয় কোনও ব্যাপার নয়। আসলে সে নিজেকে প্রমাণ করতে চাইবে পারমিতার কাছেই।

গোয়া থেকে আবারও পুরনো হোটেলেই তাকে নিয়ে এল সুশান্ত। আগে জানায়নি কিছু। সত্যি বলতে, গোয়ায় রওনা হবার আগে ফিরে এসে কোথায় উঠবে সে-সম্পর্কে সুশান্তর কোনও আগ্রহ নেই, হোটেল-ফোটেল খুঁজছে না দেখে অবাকই হয়েছিল পারমিতা। একবার জিজ্ঞেস করায় সুশান্ত বলল, 'ভাবনাটা আমার। আমিই ভাবব।'

ওর চোয়াল-কঠিন ভাব দেখে আর কোনও প্রশ্ন করেনি পারমিতা। শুধু ভেবেছিল, খুব ভাল হয় যদি এবারের আসা তিন রাত চার দিনেই শেষ হয়—গোয়ায় যেতে না হয়; খুব

ভাল হত যদি কুপনের লাকি নাম্বার তাদের না ছুঁত, নির্দিষ্ট ওই চায়ের প্যাকেটটা না এসে কাউন্টার থেকে তার হাতে উঠে আসত অন্য কোনও প্যাকেট।

ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসের অদূরে গোয়া-ফেরত বাস থেকে নেমে ট্যাক্সিতে উঠে সুশান্ত যখন ট্যাক্সিওলাকে তাজ হোটেলে যাবার নির্দেশ দিল, তখন অবাক না হয়ে পারেনি পারমিতা।

'আবার ওখানে কেন!'

'কেন!'

'অন্য কোথাও যাবার কথা ছিল না!'

'কোথায়?'

এখন সম্পূর্ণ অচেনা লাগছে সুশান্তকে। গোয়াতে ক'দিন যেমন-তেমন ছিল—প্রায়ই গম্ভীর হয়ে থাকলেও এবং কথা কম বললেও অশান্তি করেনি, কলকাতায় ছকা প্ল্যান মেনেই চলেছে। কিন্তু বোম্বাইয়ে পৌঁছেই যেন পাল্টে গেছে ওর ভূমিকা।

পারমিতা সাড়া দিল না।

'গোবরডাঙায়?' অদ্ভুত শ্লেষের ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল সুশান্ত। আরও কিছু দূর এগিয়ে এসে বলল, 'সেদিন রণজয়ের কথা শুনে মনে হল ওর পেটি বুর্জোয়া মেন্টালিটিটা কাটেনি এখনও, নিজের ক্লাস থেকে বেরুবার চেষ্টায় তলিয়ে গেছে আরও। আমি ওকে বাজাতে চেয়েছিলাম, ও-ও বেজে গেল!'

শব্দগুলো চেনা। মানে খুঁজতে গেলে থই পাওয়া যায় না। পারমিতা বুঝল রণজয়ের ভূত এখনও তাড়া করে বেড়াচ্ছে সুশান্তকে, বুঝতে পারছিল না কোন দিকে এগোচ্ছে কথাগুলো।

পাঁচ ছ'দিন আগে নিতান্তই ঠাট্টার ছলে যে-খোঁচাটা দিয়েছিল রণজয়—মাঝখানে যে-ঘটনার অস্তিত্বই ছিল না, বোম্বাইয়ে পা দিতে না দিতেই সেটা আবার উসকে উঠল কী করে! সে কি ভাবেনি ঠিকঠাক হয়ে গেছে সব—এবার আর দেখা হবার সম্ভাবনা নেই রণজয়ের সঙ্গে; সুশান্ত ফিরে এসেছে নিজের স্বভাবে, সেও বদলায়নি; স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক এইভাবে স্বামী-স্ত্রীরই থাকে!

বলতে কি সেদিনও, কিছুক্ষণ গুম হয়ে থাকার পর, আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল সুশান্ত। আরও অনেকক্ষণ ছিল রণজয়ের ফ্ল্যাটে। নিজের মাপা বরাদ্দের চেয়ে বেশি হুইস্কি চেয়ে নিয়ে খেল, খাবার খেতে খেতে প্রশংসা করল পীতাম্বরের রান্নার। রেকর্ড শুনল। এবং রাত্রে, রণজয় যখন পৌঁছে দিচ্ছে হোটেলে, এ-কথা সে-কথার মধ্যে বলল, 'এরকম পৌঁছে দেবার সঙ্গী থাকলে মাতাল হওয়া সাজে।' হোটেলের সামনে ওরা গাড়ি থেকে নামবার পর রণজয় বলল, 'ইনভিটেশনটা থাকল, সুশান্ত। যদি মনে করো গোয়া থেকে ফিরে আমার ফ্ল্যাটে উঠতে পারো—ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম।' সুশান্ত তখনও হাসছে। 'নিশ্চয়ই', জোর দিয়ে বলল, 'পারমিতার ডায়েরিতে তোর ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার সবই আছে। দেখি কী হয়—।'

সেদিন সুশান্তকে মাতাল বা ক্ষুব্ধ কিছুই মনে হয়নি। শুধু একটু 'হাই', এই যা। বরং রিসেপশন থেকে চাবি নিয়ে সুশান্তর পাশাপাশি রুমে যেতে যেতে রণজয়ের জন্যেই খারাপ লেগেছিল পারমিতার—একটি একাকী মানুষ বাড়ি ফিরছে একা, কিছু যেন আছে এই দৃশ্যে। মনে পড়ে গিয়েছিল সুতপা আর টুকুকেও। তারপর, আরও বেশি রাতে নেশায়

অধৈর্য সুশান্ত যখন তাকে ছাড়াতে শুরু করল, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সন্ধের ঘটনা মনে পড়ায় বাধা দিল সে, তখনও অন্ধকারে ঠাট্টা করেছিল সুশান্ত, 'এত স্টিফ কেন! আর কারুর কথা ভাবছ নাকি!' পারমিতা জবাব দেয়নি। বিয়ের পর থেকেই সে জানে সুশান্ত শরীর চেনে, এ ব্যাপারে পারমিতাকে চেনে না। তবে, সেই মুহূর্তে, সুশান্তর কথাগুলো শুনে তার মনে হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত রণজয়ের সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করল, সেটা মুখোশপরা হলে রণজয় চলে যাবার পরে আবার গম্ভীর হয়ে যেত ও, এই ধরনের রসিকতায় যেত না। তার মানে ভুলে গেছে ঘটনাটা।

এখন নিশ্চিত, ভুল ছিল তার সেদিনের ভাবনায়। কিছুই ভোলেনি সুশান্ত।

খটকা একটাই, রণজয়ের ওপর রাগটা গোয়ায় যাওয়া এবং গোয়া থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত চেপে রেখেছিল কী করে! আমি ওকে বাজাতে চেয়েছিলাম, ও-ও বেজে গেল—এ সব কথারই বা তাৎপর্য কী। এমন কি হতে পারে যে সুশান্ত আর রণজয়ের মধ্যে এমন কোনও ঘটনা ঘটে আছে, যা সে জানে না। আর জানে না বলেই সম্পূর্ণ অর্থহীন লাগছে সুশান্তর কথা, আচরণ, সবকিছু!

কিন্তু, ঘটনা যা-ই ঘটুক, যেমনই হোক ওদের সম্পর্ক, একগাদা টাকা গুনতে এই হোটেলেই বা ফিরে আসতে হবে কেন!

সুশান্তকে কি বলবে কথাটা? এই ছেলেমানুষি বিলাসের সত্যিই দরকার নেই কোনও। তারা কোথায় থাকবে না থাকবে সেটা রণজয়েব জানবার কথা নয়; জানলেই বা কী এসে যায়! ট্যাক্সিওলাকে অন্য কোথাও যাবার নির্দেশ দিক সুশান্ত।

এভাবে নিজেকে গোছাবার চেষ্টা করলেও ভয়ে বলতে পারল না পারমিতা। অন্যভাবে ভাবল, এটা রাস্তা, এই শহরটাও তার অপরিচিত—তার ভাল মন্দ সবই নির্ভর করছে সুশান্তর এপর। এই মুহূর্তে সুশান্ত ছাড়া আর কাকে অনুসরণ করবে সে! সুতরাং, চুপই করে থাকল।

ট্যাক্সি থেকে নেমে বেলবয়ের হাতে স্যুটকেসটা সঁপে দিয়ে কাচের দবজা ঠেলে সোজা রিসেপশনের দিকে হেঁটে গেল সুশান্ত।

বাঁধানো হাসি মুখে এগিয়ে এল কাউন্টারের মেয়েটি।

'ইয়েস, স্যার! হোয়াট ক্যান আই ড্যু ফর ইউ?'

'আই অ্যাম ডক্টর সুশান্ত চ্যাটার্জি। দেয়ারস্ এ বুকিং ইন মাই নেম।'

'জাস্ট আ মিনিট, স্যার।'

কাউন্টারের নীচে থেকে একটা টাইপ-করা লিস্ট বের করল মেয়েটি। এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়ে একটা ফর্ম বের করে বাড়িয়ে ধরল সুশান্তর দিকে।

'কাইন্ডলি ফিল দিস আপ। আই উইল গিভ ইউ আ ভেরি গুড রুম—থ্রি-টু-ফোর।'

চোয়াল শক্ত করে ফর্ম ভরছে সুশান্ত। মেয়েটি এবার তাকাল পারমিতার দিকে, 'হাউ ওয়াজ ইওর ট্রিপ টু গোয়া, ম্যাডাম?'

পারমিতা শুধুই হাসল। ঠিক জানে না এর পরে কী অপেক্ষা করে আছে তার জন্যে। মেয়েটির চোখে যাতে উৎকণ্ঠা ধরা না পড়ে, সেজন্যে সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিল লবির দিকে, লবি ছাড়িয়ে কফিশপের দিকে। একটা অনুভূতি আসছে সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে, মনে হচ্ছে বমি করে ফেলবে। নিজেকে ধরে রাখবার জন্যে প্রাণপণে শরীর শক্ত করে দাঁড়িয়ে থাকল

সে।

সেই একই লিফটে ওপরে ওঠা। একই ভাবে যাওয়া। তবে ঘরটাই যা আলাদা। ৩২৪-এ পৌঁছে বেলবয় দরজা খুলে দেবার পর সুশান্তর পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে পারমিতা ভাবল, না, আর একটা তফাতও আছে। এবার সে যার সঙ্গে এল সে একেবারেই অন্য মানুষ।

সুশান্ত বাথরুমে গেল। ফিরে এসে দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ধরাল।

'এখন বিশ্বাস হচ্ছে যে-লোক কোম্পানির ফ্ল্যাটে বসে ফুটানি মারে, কোম্পানির গাড়ি চড়ে বেড়ায়, নিজের বউ মেয়েকে গারবেজে ডাম্প করে রেখে এসে অন্যের বউকে খুশি করার জন্যে ছটফট করে—সে আর আমি এক লোক নই?'

পরম্পরা রেখে, প্রায় রিহার্সাল-দেওয়া গলায় কথাগুলো আউড়ে গেল সুশান্ত। যেন তৈরিই ছিল আগে থেকে।

জবাব দিল না। ওকে লক্ষ করতে করতেই ভয়-পাওয়া মুখ-চোখ নিয়ে খাটে বসে পড়ল পারমিতা।

'এখন বুঝতে পারছি কেন তুমি রণজয়ের ঠিকানা, ফোন নাম্বার জানবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলে!'

এবার আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে সোজাসুজি স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে পারমিতা বলল, 'কী বলতে চাও তুমি?'

'শাটাপ!'

অবিশ্বাস্য গলায় ধমকে উঠল সুশান্ত। দু পা এগিয়ে এসেও দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন এর পর কী করবে সে-সম্পর্কে নিজেও নিশ্চিত নয়।

পারমিতা সুশান্তকেই দেখছে। দেখতে দেখতেই তার পক্ষে অস্বাভাবিক গলায় বলে উঠল, 'আমি বুঝতে পারছি না তুমি কে! কেন তুমি এমন করছ! তুমি কি স্বাভাবিক মানুষ!'

৪

রাত্রে কি বৃষ্টি হয়েছিল? হবেও বা। এপ্রিল মে'র এই সময়টায় বৃষ্টি বোম্বাইয়ে খুব সচরাচরের ব্যাপার নয়; মে'র শেষে কি জুনের গোড়ায় যদিও আরব সাগরের ঝড়ে কখনওসখনও ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে আকাশ, আকস্মিক সেই সাইক্লোনের কোপে শাসিয়ে ওঠে এমনিতে শান্ত সমুদ্র; অবিরাম প্রবল বর্ষণে জল জমে অচল হয়ে যায় শহর।

ম্যাকফারসন হিন্দুস্তানের চাকরিতে ঢোকবার পর একবার বোম্বাইয়ের সেই অচল রূপ প্রত্যক্ষ করেছিল রণজয়। হেড অফিসের তলবে কলকাতা থেকে এসেছিল দু তিনদিনের জন্যে। যেদিন ফিরবে তার আগের দিন সন্ধে থেকেই নিচু হয়ে এল আকাশ, হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ল মেঘের গন্ধ; দিনশা ভাচা রোডে তাদের অফিস থেকে বেরিয়ে কেম্পস কর্নারের শালিমার হোটেলে যেতে যেতে দেখেছিল বোল্ডারে ক্রুদ্ধ ঝাপটা মারছে সমুদ্র; আরও দূরে

ঢেউয়ে ডিগবাজি খেতে খেতে শহরের দিকে এগিয়ে আসছে মেঘে থকথকে দিগন্ত। কুয়াশার মতো আবরণে ছেয়ে আছে দূরে মালাবার হিলসের উঁচু নিচু বিভিন্ন বাড়ি। জলে গুঁড়ি ডুবিয়ে ছারখার হবার জন্যে মাথা নাড়ছে চৌপাটির গাছগুলো। ওরই মধ্যে সেই অদ্ভুত দৃশ্য—গাছের গুঁড়িতে বাঁধা একটা ঘন বাদামি ঘোড়া বাঁধন ছিঁড়ে বেরুবার চেষ্টায় ঊর্ধ্বে দু পা তুলে চিৎকার করছে মাঝে মাঝে। উন্মত্ত সেই হ্রেষারব মিলিয়ে যাবার আগেই ট্যাক্সি বাঁক নিয়েছিল পরের রাস্তায়।

বৃষ্টি নেমেছিল আরও পরে। সকালে দেখল কেম্পস কর্নারের ফ্লাইওভার গড়ানো আর সমুদ্র ওপছানো জলে ভাসছে ওয়ার্ডেন রোড। পরে কী হবে না হবে চিন্তা করে স্যুটকেস নিয়ে অফিসে চলে এসেছিল রণজয়। যদি ট্যাক্সি, মোটর না যেতে পারে এয়ারপোর্টে তা হলে কাছেই নরিম্যান পয়েন্টে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইনসের অফিসে চলে যাবে—সেখান থেকে বাসে, একবার ওখানে পৌঁছুতে পারলে ফ্লাইট ধরানোর দায়িত্ব ওদের।

বাদ সাধল বৃষ্টিই। বেলা যত বাড়ছে ততই যেন বেগ বাড়ছে আরও। কালচে হয়ে ওঠা চারদিককে ভরাডুবি দেখাতে মাঝে মাঝেই সশব্দ আলোয় চিরে যাচ্ছে আকাশ। হিসেব ঠিকই ছিল, কিন্তু কাজে লাগল না। ফ্লাইট ক্যানসেল্ড্। পরের দিন সকালের আগে আর সম্ভাবনা নেই ওড়ার।

এরপর হতাশা এলেও ভোঁতা হয়ে যায় উদ্বেগ—কারণের ভিতর এসে যায় কৌতূহল। সেদিন নরিম্যান পয়েন্টে থেকে রণজয় দেখেছিল ঝড়ের সমুদ্র কী। আট, দশ ফুট উঁচু হয়ে ঢেউ ঢুকছে শহরে। নিশ্চিহ্ন মেরিন ড্রাইভের তটরেখা। জলের তোড়ে ভাঙা এমব্যাঙ্কমেন্টের দেয়াল আর কংক্রিটের বেঞ্চের টুকরো ঘষটাতে ঘষটাতে চলে এসেছে রাস্তার মাঝখানে; ঢেউয়ের উচ্ছ্বাস কখনও বা ছুঁয়ে যাচ্ছে বিশাল বাড়িগুলোর দোতলা পর্যন্ত। আর সমুদ্রের সঙ্গে সমান হয়ে যাওয়া রাস্তার জলে ভেসে যাচ্ছে নরমুণ্ডের মতো অসংখ্য ডাবের খোলা।

তেমন কোনও কারণ নেই, তবু আজ সকালে দৃশ্যটা মনে পড়ে গেল হঠাৎ। গরমে ঘুম ভেঙে যাবার পরে। তার আগে ঘুমের জড়তা নিয়ে কিছুক্ষণ বিছানায় এপাশ ওপাশ করতে করতে মনে হয়েছিল রিং হচ্ছে টেলিফোনে। অনেকক্ষণ ধরে? হয়তো। অসচেতনতার মধ্যে এ ধরনের শব্দের সংখ্যা পরের ভাবনায় ছড়িয়ে পড়ে এক থেকে বহুতে।

এত সকালে কে তাকে খুঁজবে! রং নাম্বারও হতে পারে। আলস্যে ভেবেছিল, যেই হোক, পীতাম্বর ধরবে। তারপর আবার পাশ ফেরা ঘুমে। তখনই অনুভব করে তাপ উঠছে গায়ে, ঘামে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে গেঞ্জি, কপাল গলা। পাকাপাকি ঘুম ভেঙে দেখল জানলার বাইরে ঘোলাটে আলো। ঘড়িতে সাড়ে ছ'টা।

এই সময়টায় সাধারণত পীতাম্বর উঠে আসে ওপরে, রণজয়ের ঘুম ভেঙে থাকলে চা করে দেয়। না হলে পটে চা রেখে টিকোজি ঢেকে কাপ সাজিয়ে নীচে যায় গাড়ি ধুতে। সাড়াশব্দ পাচ্ছে না লোকটার, তার মানে নীচেই গেছে। ইতিমধ্যেই সত্যি-সত্যিই টেলিফোন বেজে থাকলে ধরবার জন্যে ছিল না কেউ। এমনও হতে পারে সবটাই তার মনের ভুল। ঘুমের মধ্যে প্রতারণা করে গেছে শব্দ।

পাখা বন্ধ। মনে পড়ল শীত-শীত করায় মাঝরাতে সে নিজেই অফ করে দিয়েছিল স্যুইচ। অন্ধকারে জোলো বাতাসের স্পর্শে বৃষ্টি পড়ছে মনে হলেও ভারী মাথা নিয়ে নামেনি

বিছানা থেকে। তেমন জোরে বৃষ্টি হলে জানলার ওপরের দু ফুট চওড়া সানশেড এড়িয়ে ছাঁট আসত ঘরে, শব্দও পেত। সেরকম নয়। তবে মাঝ সমুদ্রের বৃষ্টি কখনও কখনও উড়ে আসে হাওয়ায়। ঝির ঝির করে তীরে এসে। সেরকমও হতে পারে।

পাখাটা চালিয়ে দিল রণজয়। আবার বিছানায় বসে বাইরেটা দেখল। চিন্তার অস্পষ্টতার মধ্যে নির্বোধ লাগল নিজেকে। একটা প্লেন উড়ে যাচ্ছে সম্ভবত, নিশ্চয়ই দূর দিয়ে; শব্দটা মিলিয়ে যাবার পর দাঁড়াল জানলায় এসে। দূরে ফ্লাইওভারের পাশে সমুদ্রের জল নেমে যাওয়ায় কিম্ভূত হয়ে পড়ে আছে কালো পাথর আর ঝামা। খুব সাদা একটা ভ্যানের মতো গাড়ি তীব্র গতিতে পেরিয়ে যাচ্ছে ফ্লাইওভার—মাথার ওপর লাল আলোর জ্বলা-নেভা দেখে চেনা যায় অ্যাম্বুলেন্স বলে। এর পরে শুধুই গাড়ির পর গাড়ির আসা যাওয়া। চেনা দৃশ্য। দেখছেও বহুদিন ধরে—এই ফ্ল্যাটে উঠে আসার পর থেকে। এইভাবে, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে।

দেখতে দেখতে সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে উঠল বণজয়। একদিন ওই ফ্লাইওভারেব ওপরে দাঁড়িয়ে এই জানলাটার দিকে তাকাবে সে—দেখবে স্তব্ধভাবে জানলায় দাঁড়ানো নিজেকে। সে কেমন, কোন পার্থিব প্রয়োজন এইভাবে দাঁড় করিয়ে রেখেছে তাকে! তার পরেই ভাবল, কী অবাস্তব চিন্তা! সে কি হিচকক বা আর কারও ছবিব ডাবল যে মুক্তিব মধ্যে দাঁড়িয়ে লক্ষ করবে নিজের গৃহবন্দি অন্যরূপ—দৃষ্টিতে দার্শনিকতা মিশিয়ে খুঁজবে যা হতে পারত আর যা হয়নির মধ্যেকার দুস্তর ব্যবধান, গ্লানি, দুঃখ ও বিষাদ! কারণ খুঁজবে, কেন।

চিন্তা বড় আশ্চর্য করে দেয় মানুষকে; নিজের কাছে নিজেকেই করে তোলে হাস্যকর। না হলে সঙ্গে সঙ্গেই কেন আবার মনে হল, হয়তো রহস্য নয়—হয়তো যেটাকে রহস্য বলে মনে হচ্ছে তার মধ্যেই প্রতিভাত হচ্ছে নির্মম সত্যের আভাস। যে দেখবে তার চোখে হয়তো সে একাই নয়, ধরা পড়বে একই পরিপ্রেক্ষিতে বন্দি আরও অনেকে। হাস্যকর, বাস্তবিকই হাস্যকর।

আস্তে আস্তে নিঃশ্বাস ছাড়ল রণজয়। হাসল নিজের মনে। এ সব নিশ্চিত হিমাংশু দত্তের বাড়িতে কাল অনেক রাত পর্যন্ত মদ্যপান করার ফল। ঘোরটা ঠিকঠাক কাটেনি এখনও। সেই ঘোরেই সম্ভবত একটু আগে রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল কি না ভাবতে ভাবতে নরিম্যান পয়েন্টের সমুদ্রপ্লাবিত রাস্তায় ভেসে যাওয়া ডাবের খোলায় খুঁজে পেয়েছিল নরমুণ্ডের উপমা; তার পর পরই চলে এল ফ্লাইওভারের ওপর দাঁড়িয়ে থেকে কারমাইকেল রোডের ফ্ল্যাটের ঘরে গ্রিলের পিছনে বন্দি নিজেকে দেখা। নাকি একায় অভ্যস্ত হতে হতে নিজের অজান্তে সে ক্রমশ ঢুকে পড়ছে বাস্তব গুলিয়ে দেওয়া এক ভ্রান্তিকর কল্পনার জগতে—যেখানে নিজের ভিতরের ভাঙাগড়াগুলো সৃষ্টি করে অনবরতের দ্বিধা ও প্রশ্ন, এগোতে দেয় না—যা শেষ পর্যন্ত কারুরই কাজে লাগবে না, এমনকী নিজেরও।

পীতাম্বর ফিরেছে। ঘরের পর্দা সরিয়ে বলল, 'সাব, চায় দেঙ্গে?'

'হ্যাঁ, দাও।'

রণজয় সরে এল। ক্রমশ ফুটে উঠছে রোদ। এরপর সে বাথরুমে যাবে, চা খাবে, চোখ বোলাবে খবরের কাগজে। আজ শনিবার। অফিস নেই। সময় কাটানোর জন্যে বাজারেও যেতে পারে। তারপর?

সে জানে না।

তীক্ষ্ণ চোখে পীতাম্বরকে লক্ষ করল রণজয়। বিশ্বস্ত লোক। বাংলা, হিন্দি ও স্থানীয় ভাষা মিলিয়ে সারাদিনে ক'টা কথাই বা বলে তার সঙ্গে! কিন্তু সে যতক্ষণ ফ্ল্যাটে থাকে আশপাশে থেকে সারাক্ষণই সঙ্গ দিয়ে যায় তাকে, হিসেব রাখে তার বেঁচে থাকার। জানে না, এই লোকটা না থাকলে কী করত সে এত দিনে।

রণজয় জিজ্ঞেস করল, 'এখনই এলে? না আগেও এসেছিলে?'

'আগেও এসেছি, সাব। আপ ঘুমোচ্ছিলেন।' পীতাম্বর বলল, 'সিকিউরিটি ম্যান বোলা কাল আপ দেরি সে আয়া।'

'হ্যাঁ। দত্তবাবুকে ঘর গিয়া থা। খার।'

'হাঁ সাব, পতা হ্যায়! আপ বলেছিলেন—'

বাথরুমেব দরজায় দাঁড়িয়ে রণজয় জিজ্ঞেস করল, 'মর্নিং মে কোই টেলিফোন আয়া থা?'

'নেই সাব। হাম তো ব্যস গাড়ি ধোওয়া, ঔর উপব চলা আয়া—'

শব্দের প্রতারণা? হবেও বা। বণজয় বলল, 'ঠিক আছে। চা দাও।'

নৈঃশব্দ্য ফিরিয়ে আনল নিজেতেই। চিন্তাগুলো স্পষ্ট নয় খুব। স্পষ্ট হতে হতেও হারিয়ে যাচ্ছে।

রণজয় বিরক্ত হল। সে কি এতটাই আত্মকেন্দ্রিক হতে চেয়েছিল? অনেক দিন হয়ে গেল এখানে। সুতপার কাছ থেকে দূরে—একটা অন্য ধরনের স্বাধীনতার মধ্যে জীবন কাটানোর ইচ্ছেটা কোথায় নিয়ে এল তাকে! অফিস আর ফ্ল্যাট, ফ্ল্যাট আর অফিস, কচিৎ কখনও অফিসের কারও বাড়িতে ডিনার, মাঝে মধ্যে উটকো পার্টি—'হ্যালো!', 'হ্যালো!', 'হাউ ইজ লাইফ?' 'ফাইন। থ্যাঙ্ক ইউ'; প্রতিদিন একই ধরনের সংস্পর্শ, একই ধরনের প্রতিক্রিয়া, এমনকী নিজের রাগ, ক্ষোভ, বিরক্তির মধ্যেও কি কোনও ভাবে নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে সে! নাকি নতুন করে জড়িয়ে পড়ছে সন্দেহে!

কাল যেমন হল।

শেষ বিকেলে অফিসের টেবিলে পিওন যেসব কাগজপত্র, চিঠি দিয়ে গেল, তার মধ্যে একটা অচেনা হাতে লেখা খাম। খুলে অবাক হল।

তীর্থঙ্করের লেখা। এর আগে কোনও দিন তাকে চিঠি লেখেনি লোকটা, সেও লেখেনি; সে-ধরনের সম্পর্কও নেই তাদের মধ্যে। কুড়ি-বাইশ বছর আগে একটা ঘটনা ঘটেছিল, ঠিক আছে; তার পরেও যে যোগাযোগ থেকে গেছে লোকটার সঙ্গে তা সুতপার জন্যে। সুতপাও পছন্দ করে ওকে, টুটুকে আদরটাদর করে তীর্থঙ্কর, এসবও ঠিক আছে। কিন্তু যদি আলাদা করে রণজয়ের কথা ধরা হয়, তা হলে এই লোকটার সঙ্গে সম্পর্ক থাকা না-থাকার মূল্য কী!

সেই তীর্থঙ্করই, কোনও কারণ নেই, জ্ঞান দেওয়া ভাষায় চিঠি লিখে ফেলল তাকে, তাও কি না সুতপা-টুটুকে জড়িয়ে! এটা কি তার ব্যক্তিগত জীবনে নাক গলানো নয়! তা ছাড়া, দিন দুয়েক আগেই তো সুতপার সামান্য পুরনো চিঠির জবাব দিয়েছে সে। তাতে সুশান্ত-পারমিতাদের কথা, ওরা যে ফ্ল্যাটে এসেছিল, ফিরেছে খেয়েদেয়ে, ইত্যাদি সবই লিখে, শেষ পর্যন্ত ভেবে চিন্তে জুড়ে দিয়ে সে কবে কলকাতায় ফিরতে পারবে তার ঠিক নেই এখনও—যদি তাড়াতাড়ি ফেরা না হয় তা হলে সামনের গরমের ছুটিতে, স্কুল বন্ধ হলে, সুতপা কিছুদিন থেকে যেতে পারে বোম্বাইয়ে এসে, ইত্যাদি। তার পরেও তীর্থঙ্করের

চিঠি কেন।

চিঠির তারিখ দেখে অবশ্য মনে হল সুতপা তার চিঠি পাবার আগেই লেখা। সেটা কোনও ব্যাপার নয়। সন্দেহ হচ্ছে সুতপাই লিখিয়েছে কি না। কিন্তু, সুতপা কি জানে না, তৃতীয় ব্যক্তির ভূমিকা পছন্দ করবে না রণজয়!

ভেবেছিল ছিঁড়ে ফেলবে। তা না করে ওপর ওপর গোড়ার কয়েকটি লাইনে চোখ বুলিয়ে রেখে দিল অ্যাটাচিতে। সুবিধে মতো দু-লাইনের একটা জবাব দিয়ে দেবে, যাতে ভবিষ্যতে আর না লেখে এ ধরনের চিঠি।

একটু আগে হিমাংশু দত্ত এসেছিল অফিসে। যেমন আসে প্রায়ই, ওর ব্যবসার কাজে, বিজ্ঞাপনের নতুন কোনও ক্যাম্পেন আসছে কি না খোঁজখবর নিতে। সেলস প্রোমোশন ম্যানেজার সুধীর পাটিলের ঘর থেকে বেরিয়ে চেয়ার টেনে বসল সামনে। কলকাতা থেকে ওদের একজন সিনিয়র কোলিগ এসেছে, রাত্রে ডেকেছে বাড়িতে। হঠাৎ ঠিক হল। রণজয় কি ফ্রি আছে সন্ধেয়? আসতে পারলে খুব ভাল হত।

নিচু গলায় কথা বলছিল হিমাংশু।

'সিনিয়র কোলিগ মানে তো বস!' রণজয় বলল, 'বাড়িতে ডেকে তেল দেবেন। ওর মধ্যে আমাকে ডাকছেন কেন!'

হিমাংশু ঘোরে পাতায় পাতায়। একটুও অপ্রতিভ না হয়ে বলল, 'তেল কি আর সারাক্ষণ দেব! আমারও ভাল লাগবে না। তা ছাড়া আপনিও তো আসেননি অনেক দিন!'

'কেন, গতমাসেই তো!'

'গতমাস অনেক দিন গত হয়েছে। তারপর দুদিন আমি গেছি আপনার বাড়িতে!'

রণজয় জবাব দিল না। হিমাংশু বলল, 'আজ এত ফর্মাল লাগছে কেন! এনিথিং রং?'

সামান্য হাসল রণজয়। তারপর, যেন নিজেকে শুনিয়েই বলল, 'হোয়াট ইজ রাইট?'

খানিক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হিমাংশু বলল, 'কিছুদিন ঘুরে আসুন কলকাতায়। ভাল লাগবে। বিজনেসের বাইরে বোম্বাইয়ে লাইফ কোথায়!'

'দেখি।'

টেবিলে অনেক কাজ। মান্থলি ব্র্যাঞ্চ সেলস রিপোর্টগুলো জমা হয়ে আছে, খুঁটিয়ে দেখে অ্যানালাইজ করে সামনের সপ্তাহের মধ্যে টোটাল রিপোর্ট দিতে হবে মার্কেটিং ম্যানেজারকে। সামনে বর্ষা, স্টক পজিশন দেখে ঠিক করা হবে প্রোডাকশন শিডিউল। আজ সকালের মিটিংয়েই জেনেছে এসব।

রণজয় বেশি সময় দিতে চাইল না। হিমাংশু উঠছে না দেখে বলল, 'দেখি। সন্ধেয় ফ্রি থাকব কি না এখনই বলতে পারছি না। যদি পারি যাব।'

'যদি নয়, আসবেন। আমি বন্দনাকে বলব। বসকেও বলছি।'

'দেখি।'

রণজয় ঠিক করল যাবে না। আজ সন্ধেটা নিজের মতো করে কাটাবে ফ্ল্যাটে। গান শুনবে, ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাবে; ইনগ্রিড বার্গম্যানের একটা জীবনী কিনেছে ক'দিন আগে, পড়ে দেখবে। আমজাদ আলী খাঁর যে রেকর্ডটা সেদিন উপহার দিল ওরা, সেটা শোনা হয়নি এখনও। বাজাতে পারে। সুশান্তকে স্পেশাল ট্রিটমেন্ট দেবার জন্যে কেনা স্কচের বোতলটা অর্ধেকে নামেনি এখনও—খরচের বহর ভোলবার জন্যে ক'দিন

একা-একাই উপভোগ করতে হবে তার স্বাদ। তারপর খাবে, ঘুমিয়ে পড়বে।

সত্যিই কি অসম্ভব এইভাবে নিজেকে নিয়ে সময় কাটানো। কোথায় যেন পড়ছিল কদিন আগে—টাইমস-এই কি?—যে, গোটা বিশ্বে ব্যাচেলরদের সংখ্যা বাড়ছে, যেমন বাড়ছে সিঙ্গল উয়োম্যানদের সংখ্যাও। আর যা যা বলা হয়েছিল তার সারাংশ এই যে, বিশেষত ইউরোপে, প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের মধ্যে দেখা দিচ্ছে ওয়ান-রুম অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে একা থাকার প্রবণতা। মানে দূরে থাকছে সংসাব করার ঝুট-ঝামেলা থেকে। এরা কীভাবে বাঁচে, সময় কাটায়! নিশ্চিত কিছু-না-কিছু করে, কোনও না কোনও উপলক্ষ নিয়ে। সত্যি বলতে, এ দেশেও কি এমন মানুষ কম! এরা যদি পারে শুধুই নিজেকে নিয়ে নিরুপদ্রবে সময় পার করে দিতে, সে কেন পারবে না! ভাল লাগে না একাকিত্ব কাটাতে কারও না কারও ডাকের অপেক্ষা করা, কিংবা ডাকলেই মাথা নাড়া।

এইভাবে ভাবতে ভাবতে একটু পবেই সন্দেহ হয়েছিল রণজয়ের, একটু কি ভুল থেকে যাচ্ছে তার যুক্তিতে? অবিবাহিতের একা থাকা এবং বিবাহিতের একা থাকার মধ্যে আছে বিস্তর তফাত—ম্যাড়মেড়ে শোনালেও তফাতটা পেয়েও হারিয়ে থাকা অভিজ্ঞতার সঙ্গে না-পাওয়া অনভিজ্ঞতার, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের অস্তিত্বেব! অভিজ্ঞের অস্বস্তি কি অনভিজ্ঞ ভোগ করে কখনও? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

ভাবনা তাকে যেদিকেই নিয়ে যাক, আজ অন্তত একা হবে সে। পরে যে-কোনও অজুহাত দেখিয়ে দেবে হিমাংশুকে।

তীর্থঙ্করের চিঠিটাই নষ্ট করে দিল মেজাজ। বাড়ি ফিরে চা খেতে খেতে একটা তিতকুটে অনুভূতিতে ছেয়ে গেল মন। শুধু চিঠির জন্যেই নয়। কোথায় কী একটা ঘটছে, সে টের পাচ্ছে না ঠিকঠাক; মনে হল, ক্রমশ মূল্যহীন হয়ে পড়ছে সে। এবং অযৌক্তিক এবং অবিন্যস্ত, হয়তো বা পরিত্যক্তও—নতুন সেতুর সমান্তরালে দাঁড়ানো পুরনো সেতুর মতো। যদি তা না হত, তা হলে এই যে সেদিন এল আর চলে গেল সুশান্ত-পারমিতারা, এত কথা হল, এর পর গোয়া থেকে ফিরে তার ফ্ল্যাটে না উঠুক, একটা ফোনও অন্তত করতে পারত ওরা! সে ঠিক জানে না, ওরাও ভেঙে বলেনি কিছু—কিন্তু, সপ্তাহ শেষ হয়ে যাচ্ছে, এর মধ্যে তো ওদের কলকাতায় ফিরে যাবার কথা! সে কি এতটাই অবাঞ্ছিত যে, গোয়া থেকে ফিরে, কিংবা কলকাতা যাবার আগে, ওদের কাছ থেকে সামান্য একটা হ্যালো-ও আশা করতে পারে না!

পারমিতাই বা কীবকম! নিশ্চিত কলকাতায় ফিরে সুতপার সঙ্গে দেখা করবে ও; পারমিতার কি বোঝা উচিত ছিল না সুতপার জন্যে কোনও খবর কি আর কিছু দিতে পারে রণজয়! সেদিন, হোটেলের ঘরে, সুশান্তর অনুপস্থিতিতে দিব্যি খোলামেলা হয়ে উঠেছিল ও—মেয়েমানুষ বলেই কী, খুঁচিয়েছিল সুতপার কথা তুলে। আর পারমিতাকে একা, কাছে পেয়ে এমনই অনর্গল হয়ে উঠেছিল সে যে, সচরাচর যা করে না, টুটু সম্পর্কে সত্য কিন্তু নিষ্ঠুর একটা নিজস্ব অনুভবের কথা বলতে আটকায়নি মুখে। সে কি বলেছিল, যে নিজের নয় তাকে আমি আপন করতে পারি না?

না, উচিত হয়নি এভাবে বলা। যে-কথা সুতপাকেও বলেনি কোনও দিন, তা পারমিতাকে বলতে গেল কেন! এ তো তার একান্তই ব্যক্তিগত অনুভব! এ ধরনের অনুভবে কি থাকে সেই সর্বজনীতা, যা বিশ্বাস্য মনে হবে আর কারও কাছে! টুটুকে অ্যাডপ্ট করার ব্যাপারে সে

কোনও বাধা দেয়নি; টুটু যেদিন 'বাবা' সম্বোধন শিখল, টলমলে পায়ে এগিয়ে এসে দু-হাতে হাঁটু চেপে ধরল তার, দু-দাঁত মাড়ি বের করে হাসল তার দিকে তাকিয়ে, সেদিন, রণজয় এখনও অনুভব করে, প্রাণপণে সে চেষ্টা করেছিল সেই সম্বোধনে সাড়া দিতে। পারেনি। এই না পারাটা তার নিজের ব্যর্থতা। যে-ঔদার্য পূর্ণতা দেয় মানুষকে, রাজনৈতিক বিশ্বাসের ব্যাপারে যে-সাহস আর সততা অনিন্দ্য, বিষ্ণুদের ছিল, তার তা ছিল না—থাকলে সে ওদেরই সঙ্গী হত; সুতপা তাকে বাঁচাতে চেয়েছিল বলেই তার ইশারায় তীর্থঙ্করের বর্ধমানের গর্তে ঢুকে পড়ত না।

কথা সেটা নয়। পারমিতা যোগাযোগ করলে সে ওর হাতে টুটুর জন্যে একটা টকিং ডল-টল কিছু কিনে পাঠিয়ে দিতে পারত। এটা করার জন্যে মেয়েকে ভালবাসার দরকার হয় না। আকবর আলী'জ বা কোথাও গিয়ে একটা সওদা করা—ইট ওনলি কস্টস ইউ আ ফিউ বাকস, নট লাভ!

অফিস থেকে ফিরে এসব ভাবতে ভাবতেই ক্রমশ আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল রণজয়। চায়ে স্বাদ পায়নি। রাতের রান্নার জোগাড় করছে পীতাম্বর; বুঝতে পারছিল ফ্ল্যাটের মধ্যে ওর রান্নার গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। চটপট তৈরি হয়ে এর পর সে বেরিয়ে পড়ে গাড়ি নিয়ে। হিমাংশু লোকটা গায়ে-পড়া, একই ধরনের কথা বলে বোর করে, প্রায় কথাতেই সাক্ষী মানে বউকে। কিন্তু, মাহিমের আঁশটে পাঁকের গন্ধ পেরিয়ে, ডানদিকে সান্তাক্রুজের রাস্তা ছেড়ে খারের দিকে যেতে যেতে ভাবল, লোকটা গুরুত্বও দেয় তাকে। সবটাই কি ব্যবসার স্বার্থে? মনে হয় না। পাকা মাথার হিমাংশু খুব ভাল করেই জানে ম্যাকফারসনের সেলস-এ থাকলেও তার ব্যবসার প্রয়োজনে রণজয়ের ক্ষমতা কতটুকু। মনে পড়ে না এ পর্যন্ত কখনও তাকে কোনও অনুরোধ করেছে কি না। ডাকে খাদ নেই। যে এগিয়ে আসে তাকে ফেরানো কি ঠিক হবে! টেবিলের উল্টোদিকে বসে আজ সে অকারণে র‍্যালা নিয়েছিল একটু। হিমাংশু মেনে নিল। না, ঠিক হয়নি।

কালকেব বোধে ক্ষোভ ছিল, আজ সকালে টের পাচ্ছে না তা। ক্ষোভের ছেড়ে যাওয়া জায়গাটা ক্রমশ ভরে উঠছে অবর্ণনীয় শূন্যতায়। কাল সে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পেরেছিল হিমাংশু দত্তের বাড়িতে; আজ যদি যেতে চায়, কোথায় যাবে? খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে এসব চিন্তার মধ্যেই চোখ তুলে দেয়ালের কথাকলির মুখোশটার দিকে খানিক তাকিয়ে থাকল সে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রোদের দিকে। ঘোলাটে ভাব কেটে গিয়ে স্বচ্ছ নীলে বিস্তৃত হচ্ছে আকাশ। ডানার জড়তা ভাঙতে ভাঙতে সমুদ্রের দিকে উড়ে যাচ্ছে একটা চিল । শঙ্খচিলও হতে পারে। সেটাকে অনুসরণ করতে করতে হঠাৎই মনে হল রণজয়ের, তীর্থঙ্করের চিঠি লেখায় অনধিকারচর্চা থাকতে পারে। কিন্তু বয়স্ক ও এমনিতে স্থিতধী, সাদাসিধে মানুষটা অকারণ তাকে চিঠি লিখতে যাবে কেন! তা হলে কি তার অনুপস্থিতিতে, দূরে, এমন কোনও ঘটনা ঘটছে যা সে জানে না—নিজের স্বভাব মেনে সুতপাও জানায় না, নিজের বুদ্ধিতে বাধ্য হয়েই লিখেছে তীর্থঙ্কর; না লিখে উপায় ছিল না?

ভাবনাগুলো আসামাত্র লিভিং রুম থেকে উঠে বেডরুমে গেল রণজয়। অ্যাটাচি খুলে মুখছেঁড়া খামটা বের করে ফিরে এল নিজের জায়গায়।

সকালে পর পর দু কাপ চা খাওয়া অভ্যাস তার। পীতাম্বর জানে। দ্বিতীয় কাপ চা-টা সামনে রেখে শূন্য কাপ-প্লেট হাতে তুলে জিজ্ঞেস করল, 'সাব, বাজার আপ যায়েঙ্গে?'

'পরে বলব।' পীতাম্বরকে দেখতে দেখতে রণজয় বলল, 'এখনও তো সাতটা বাজেনি। এতনা জলদি কেয়া হ্যায়?'

'ঔর কুছ জিনিস ভি লানা হ্যায়, সাব।'

'ঠিক আছে। পরে শুনব।'

কথাগুলো বলবাব পরে বণজয়ের মনে হল, ভোরে পীতাম্বর যখন নিজের কোয়ার্টার্স থেকে ওপরে উঠে আসে এবং তাকে ঘুমোতে দেখে গাড়ি ধুতে নেমে যায় নীচে, তখন ফোন এলে ওর জানবার কথা নয়। কলকাতা থেকেই কি কেউ খুঁজছিল তাকে, ডেকে ডেকে ফিরে যায়! সুতপাই কি? তীর্থঙ্কর?

নিঃশ্বাসটা ক্রমশ ভারী হয়ে চেপে বসল বুকে। খামের ওপর লেখা ঠিকানায় চোখ বুলিয়ে চিঠিটা বার করতে করতে এখনই সে খেয়াল করল, সুতপার ইচ্ছায় লিখলে কারমাইকেল রোডের ফ্ল্যাটের ঠিকানাতেই লিখত তীর্থঙ্কর, অফিসে নয়। না, সুতপা জানে না।

রুল-টানা এক্সারসাইজ খাতার মাঝখান থেকে ছিঁড়ে নেওয়া চারটে পৃষ্ঠা। সাধু ভাষায় লেখা। পুরনো ধাঁচের গোটা গোটা অক্ষর। গোড়ার দিকের এবং পরের লেখায় অক্ষরের সমতা নেই, দেখে মনে হয় দু-দফায় লেখা, মাঝখানে কোনও একটা সময় থেমে গিয়ে আবার শুরু করে; শেষও করে।—

'প্রিয় ভাই রণজয়,

বহু দিন তোমার সঙ্গে যোগাযোগ নাই। আশা করি তুমি ভাল আছ, চাকুরিতে উন্নতি করিতেছ। শরীরও আশা করি ভাল।

এখানকার খবর একপ্রকাব। আমি মাঝে মাঝে সুতপার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। সুতপা ও টুটুমণি ভালই আছে বোধহয়। কিন্তু সুতপাকে দেখিয়া মনে হয় সে তোমার অভাব বোধ কবে। সুতপা কিছু বলে না। ইহা আমার ধারণা মাত্র। তুমি বোম্বাই যাইবার পর টুটুমণি একটু বড় হইয়াছে। ক্রেশে যাইতেছে।

আমি এক প্রকার। তবে খুব ভাল আছি বলিতে পারি না। বয়সটা হঠাৎ যেন বাড়িয়া গিয়াছে—কোনও কাজে উৎসাহ বোধ করি না। মনে হয় জীবনের সব লক্ষ্য শেষ হইয়া গিয়াছে। নিজের এই অবস্থার কোনও সমুচিত ব্যাখ্যা পাই না।

শৈশবে রাজনীতিতে দীক্ষা লইয়াছিলাম। যত দূর পারিয়াছি পার্টির কাজে আত্মনিয়োগ কবিয়া বুঝিয়াছিলাম আমার বিশ্বাসে ভুল নাই—সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক প্রয়াস অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভেদ দূর করিয়া মানুষে মানুষে সাম্য আনিতে পারে, সমাজের পক্ষে অশুভ ও হানিকর শক্তিগুলিকে নির্মূল করিয়া বৈষম্য দূর করিয়া সকলের কাছেই বাঁচার সার্থকতা প্রমাণ করিতে পারে। সংঘবদ্ধ আন্দোলন ও প্রতিবাদ সংগঠনের মধ্য দিয়া পুরুষ নারী নির্বিশেষে সকলের জন্য সাম্য অর্জন করিতে পারে। দেশও গড়িতে পারে।

আমার এই বিশ্বাস আজও টলে নাই। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমিই টলিয়া গিয়াছি, নিজেকে outcast মনে হইতেছে। বিশেষ কাহাকেও দোষ দিব, এমন নয়। ইহা এক সামগ্রিক অবক্ষয়—বহু কষ্টে অর্জিত ক্ষমতার অপচয় ও অপপ্রয়োগ আমাকে পীড়া দেয়। আমি কোনও বিশেষ পার্টির কথা বলিতেছি না, বিশেষ নেতৃত্বের কথা

বলিতেছি না; ইহা এখন আমাদের দেশের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। রাজনীতি হইতে আদর্শবোধ ও সততা চলিয়া গিয়াছে; শুধু রাজনীতির জন্য রাজনীতি করিলে যাহা হয় তাহাই হইতেছে। যে যার নিজের পার্টির জন্য এবং নিজের জন্য গুছাইতে ব্যস্ত। ইহাতে যদি মিথ্যাকে সত্য বলিয়া চালাইতে হয়—দুর্নীতি ও দুষ্কর্ম প্রশ্রয় দিতে হয়, তাহাতেও পিছপা নাই। মানবকল্যাণের লক্ষ্যে স্লোগান আছে, নিরপেক্ষতা নাই, সততাও নাই। ইহার পরিবর্তে ক্ষমতার জোর আসিয়াছে। ক্ষমতা বলিতেছে, আমি যাহা বলিব তাহাই সত্য এবং তোমাকে তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে।

এইসব বাক্যের মর্ম তোমার কাছে স্পষ্ট হইবে কি না জানি না। না হইবারই কথা। তুমি অল্পদিন রাজনীতি করিয়াছিলে। তোমাদের মতো সোনার টুকরো ছেলেদের আদর্শের অভাব ছিল না, কিন্তু সেই পরিস্থিতিতে কী করিতে হইবে তাহা বুঝিতে পারো নাই। শুধু এক প্রকারের অন্ধ আবেগে সম্মুখে যুদ্ধ ভাবিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কেউ হতাশ হইলে, কেউ আঘাত পাইলে, কেউ মৃত্যুবরণ করিলে। কিছু নিরীহ মানুষের মৃত্যুব কাবণও হইয়াছ, ইহাও অবশ্য সত্য। তোমাদের বিষয়ে আরও কত কি বলা যায়।

সে যাহাই হোক, রাজনীতি ছাড়িয়া তুমি একটা কোথাও পৌঁছাইয়াছ, ইহা ভালই। যদি লক্ষ্যে বিজয়ী হইয়াও শেষ পর্যন্ত আমার অবস্থায় পৌঁছাইতে, তা বড়ই বেদনাদায়ক হইত।

সে যাহাই হোক, তোমাকে এই চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্য আমার frustration জানানো নয়। আমি আজকাল বিশ্বাস করি দুঃস্থ, সর্বহারা বহু মানুষেব সুস্থভাবে বাঁচার লক্ষ্যে চেষ্টা করা যেমন ভাল, তেমনই ভাল অন্তত একজন মানুষকেও সুস্থ জীবনের অধিকার প্রদানের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা। তোমার স্ত্রী সুতপা তাহাই করিতেছে। সে আর পার্টি করে না. সংসারধর্ম পালন করিতেছে। কিন্তু ইহাতেই ক্ষান্ত না হইয়া সে যে প্রকৃত মাতৃত্বের বোধে উদ্দীপ্ত হইয়া একটি অনাথ মানবসন্তানকে বুকে স্থান দিয়া প্রতিপালন করিতেছে, ইহা আমার কাছে শ্রদ্ধার মনে হয়। সে বুঝাইয়া দিয়াছে রাজনীতির values-এ কিছু কিছু গোলমাল দেখা দিলেও তাহার মতো কোনও কোনও ব্যক্তির নৈতিক values অটুট আছে ও থাকিবে। মানুষ রক্তের সম্পর্ক লইয়া জন্মায়, কিন্তু প্রকৃত মানুষ রক্তের সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকে না। সে নিজেকে বিস্তার করিয়া যায়। ইহাই মানবিকতা। টুটুমণিরা বড় হইয়া এই মানবিকতার অর্থ বুঝিবে, এই আশা।

সুতপাকে আমি সম্ভবত তোমার আগে হইতে চিনি। সে লড়াকু মেয়ে, শেষ পর্যন্ত লড়িবে। কিন্তু সুতপার মুখ দেখিয়া সম্প্রতি আমার মনে হইয়াছে সে একটা কোনও অভাব বোধ করে। আমি তাহাকে সরাসরি কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারি না। কিন্তু তুমি ওর স্বামী— তুমি কি অনুসন্ধান করিবে কোথায় তাহার অভাব? আমি তোমাদের উভয়কেই স্নেহ করি, তোমাদের শুভচিন্তায় ভান রাখি না। তোমাদের সঙ্গে কত আড্ডা দিয়াছি, গল্প করিয়াছি। সেইজন্যেই এইসব লিখিলাম। দোষ হইলে ক্ষমা করিবে। কিন্তু দাদা বলিয়া যাহাকে সম্বোধন করো তাহার কথাটা একটু বিবেচনা করিয়ো।

আমার জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে—ভাঙা বিশ্বাস লইয়া এই বয়সে আর কোথাও যাইব, সে-উপায় নাই। বেশির ভাগ সময়েই ঘরে শুইয়া থাকি। কলকাতায় ভাল না লাগিলে বর্ধমানে চলিয়া যাই। সেখানেও ভাল লাগে না। কী করিব!

সুতপার কাছে কোনও দিন এই পত্রের কথা বলিবে না ইহা আমার বিশ্বাস।

তুমি কবে কলিকাতা আসিবে? ছ-সাত মাস তো হইয়া গেল।
শুভেচ্ছা জানিও। ইতি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
তীর্থঙ্কর'

একবার পড়বার পরে আদ্যোপান্ত আরও একবার পড়ল রণজয়। চায়ে চুমুক দিয়ে যেমন ছিল তেমনি ভাঁজে ভাঁজে চিঠিটা বন্ধ করে ভাবল, কাল যা মনে হয়েছিল আজ তার অর্থ এতটা পাল্টে যাচ্ছে কেন! কাল মনে হয়েছিল সুতপাকে জড়িয়ে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাচ্ছে লোকটা—সুতপা কত মহৎ সেটা বোঝাতে গিয়ে পরোক্ষে জানিয়ে দিল স্বামী হিসেবে তুমি তোমার কর্তব্য ঠিকঠাক পালন করছ না, অভাব সৃষ্টি করছ সুতপার জীবনে। সে আর কী অনুসন্ধান চালাবে! অনুসন্ধান চালিয়ে লোকটা নিজেই পৌঁছে গেছে সিদ্ধান্তে, সেটা আড়াল দিয়েছে ভাষার খেলায়। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, রণজয় কি এতই আহাম্মক যে মতলব বুঝবে না! আজ অন্যরকম মনে হল। সুতপার ব্যাপারটা আছে, কিন্তু সেটা উপলক্ষ মাত্র—উপলক্ষের আড়ালে তীর্থঙ্কর যেন নিজের জীবনের হতাশাই ব্যক্ত করতে চেয়েছে বেশি। তাদের ধরনে পার্সেন্টেজ অ্যানালিসিস করলে ধরা পড়ত চিঠি জুড়ে কমবেশি পঁচাত্তর ভাগ নিজেই রয়েছে সে—এমন সব কথা লিখেছে যেগুলোর বস্তুত মানে হয় না কোনও; এত সরল, এমনই জটিলতাবর্জিত যে আজকের পোড়-খাওয়া, খবরের কাগজ-পড়া যে-কোনও মানুষের কাছেই মনে হবে অবান্তর, সত্য বলেই অবান্তর। তীর্থঙ্কর নিজেও তো কড়া ধাতুতে গড়া, ঝানু, ক্ষমতার অলিগলি চেনা। নাকি বিভ্রান্তি ছিলই, চেপে রাখত, হতাশায় ভুগতে ভুগতে মানুষ এক সময় তার চাপানো খোলস ছেড়ে ঢুকে পড়ে এইরকম সরলতায়! পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছে না তো! আমার জীবন শেষ হইয়া আসিতেছে কথাগুলোরই বা মানে কী। কোনও অসুখে ভুগছে না তো, যা তাকে ক্রমশ ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে? তাকেই বা লিখতে গেল কেন? কোনও সাহায্য চায়?

একটা ধাঁধায় জড়িয়ে গেল রণজয়। একটু বা উতলা। ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে পুবদিকে বাঁক নিয়েছে গলিটা, জায়গাটার নাম কি নেবুতলা? রাস্তার ওপরেই দরজা, দিনেও অন্ধকার হয়ে থাকে ভিতরটা। বাঁদিকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলে দোতলার ঘর। একটাই জানলা, আসবাবের মধ্যে শুধু তক্তপোশটা চোখে পড়ে। বিয়ের আগে এবং পরে গেছে কয়েকবার। বেশিদিন নাপাত্তা থাকলে খোঁজ নিতে সুতপা এখনও যায় মাঝেমাঝে। এই মুহূর্তেও কি ওই ঘরের ওই তক্তপোশের ওপর শুয়ে আছে তীর্থঙ্কর, তার জীবনদাতা?

আর এগোতে পারল না। প্রয়োজনের চেয়ে বেশি শব্দে বেজে উঠল টেলিফোন।

ব্যস্তভাবে উঠে গিয়ে রিসিভার তুলল রণজয়।

'হ্যালো!'

ওদিকে সপ্রতিভ মহিলা কণ্ঠ: 'হ্যালো, ইজ দিস মিস্টার রণজয় বাসু'জ রেসিডেন্স?'

'ইয়েস!' উৎকণ্ঠ গলায় রণজয় বলল, 'রণজয় বাসু স্পিকিং!'

'গুড মর্নিং, স্যার। দিস ইজ তাজ হোটেল। কাইন্ডলি হোল্ড অন। মিস্টার বাধা ওয়ান্টস টু টক টু ইউ—'

তাজ! বাধা! ম্যাকফারসনের কেউ! যদি অফিসের ব্যাপার হয় তা হলে শনিবারে কেন!

প্রশ্নগুলো গোলাতে থাকল মাথার মধ্যে। যে কথা বলবে সে যেন একটু বেশিই সময়

নিচ্ছে।

এর পর পরিচ্ছন্ন ইংরেজিতে যে-কথাগুলো ভেসে এল ওদিক থেকে সেগুলো শোনবার জন্যে প্রস্তুত ছিল না রণজয়। কাঠ হয়ে গেল আস্তে আস্তে।

'নমস্কার, মিস্টার বসু। আমি সুমন বাধা। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার, তাজ।'

'নমস্কার। বলুন—'

'ডিস্টার্ব করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা জরুরি—কিছু মনে করবেন না—'

'না, না। বলুন—'

'আপনি বোধহয় জানেন আপনার বন্ধু ডক্টর সুশান্ত চ্যাটার্জি আর তাঁর স্ত্রী গতকাল গোয়া থেকে এসে আমাদের হোটেলে উঠেছিলেন—'

সুমন বাধা থেমে যাবার আগেই একটা ধাক্কা খেল রণজয়। সে জানে না, কিছুই জানে না। কিন্তু সত্যি কথাটা কিছুতেই বেরুল না মুখ দিয়ে। অজ্ঞাত সম্ভাবনায় ঠোঁট কেঁপে উঠল তার। সুশান্ত, পারমিতারা না জানালে হোটেলে হঠাৎ তার টেলিফোন নাম্বার খুঁজে ফোন করবে কেন! আগেই বলেছে ব্যাপারটা জরুরি।

'হ্যাঁ—'

'ওঁরা ৩২৪ নাম্বার রুমে ছিলেন।'

রহস্যটা এখনও ভাঙছে না। সুমন বাধার কণ্ঠস্বরে ফুটেছে ইতস্তত ভাব। রণজয় চুপ করে থাকল। পরের কথাটা নিজেই আসবে।

'আমার জানাতে খারাপ লাগছে—', একটু থেমে বলল সুমন, 'আজ ভোরে ডক্টর চ্যাটার্জি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। আমাদের ডাক্তার রাওয়াল ওঁকে অ্যাটেন্ড করেছেন। তাঁর অ্যাডভাইসে ওঁকে ব্রিচ ক্যান্ডি হসপিটালে ভর্তি করা হয়েছে—'

এসব সময় যে প্রশ্নগুলো মাথায় আসে তার বাইরে অন্য কিছু ভাবতে পারল না রণজয়। সে জানে ঘটনাটা সুশান্তকে নিয়ে। এতক্ষণে জীবিত থাক বা মৃত, সে হাসপাতালে। তার মানে পারমিতাও গেছে সঙ্গে। এ শহরের কিছুই তো চেনে না সে। পারমিতাই কি জানাতে বলেছে তাকে? মৃত্যুর কথাটা হঠাৎ কেন মনে এল তার!

রণজয় ঢোঁক গিলল। ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়া নিজেকে একত্র করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কিছু চেপে যাচ্ছেন মনে হচ্ছে। প্লিজ, ঠিক কী হয়েছে বলুন তো!'

'ঠিক বলতে পারব না। মনে হয় হার্ট প্রব্লেম। জাস্ট আ মোমেন্ট—' ধরে থাকতে বলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এল সুমন, 'ওঁকে ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা হয়েছে।'

এখন আর অস্পষ্ট নয় কিছু। রণজয় জানে এই টেলিফোনের মানে কী। এখনই তাকে ছুটতে হবে ব্রিচ ক্যান্ডিতে। ঘটনা কি অদ্ভুত ভাবে ঘটে! একটু আগে সে আশঙ্কা করেছিল কলকাতায় কিছু ঘটেছে কিনা! তখন সুশান্ত ধারেকাছে ছিল না।

'আপনারা কি আগেও ফোন করেছিলেন আমাকে?'

'হ্যাঁ, মিসেস চ্যাটার্জি কথা বলতে চাইছিলেন আপনার সঙ্গে। দুবার চেষ্টা করা হল, রিং হয়ে গেল।'

তা হলে শব্দের প্রতারণা নয়। পারমিতাই খুঁজেছিল তাকে এবং না পেয়ে ফিরে গেছে। রণজয় টেলিফোন ছেড়ে দেবার কথা ভাবল।

'খবরের জন্য ধন্যবাদ। আমি এখুনি ব্রিচ ক্যান্ডিতে যাচ্ছি।'

'ওঁকে ডাক্তার ঢোলাকিয়ার আন্ডারে রাখা হয়েছে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'জাস্ট অ্যানাদার ওয়ার্ড, স্যাব। প্লিজ ডোন্ট মাইন্ড।' সুমন কথা বলল, 'আজ দুপুরে ওঁদের হোটেল থেকে চেক-আউট করে কলকাতায় যাবার কথা ছিল। মিসেস চ্যাটার্জি খুব আপসেট। বুঝতেই পারছেন, এই অবস্থায় আমরা ওঁকে কিছু জিজ্ঞেস করতে পারিনি। আপনি ওঁদের বন্ধু, আপনি কি এ ব্যাপারে কী করা উচিত বলবেন আমাদের?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থাকল রণজয়। প্রশ্ন একটা হলেও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে আরও অনেক প্রশ্ন, যার জবাব সে একা দিতে পারবে না। কথা বলা দরকার পারমিতার সঙ্গে। তার আগে জানা দরকার সুশান্ত কী অবস্থায় আছে, এখন থাকলেও পরে থাকবে কি না।

ভাবনাটা কাঁপিয়ে দিল তাকে। আপাতত দেরি করার সময় নেই ভেবে সে বলল, 'আমি যোগাযোগ করব আপনাদের সঙ্গে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, স্যার। আপনি তো ম্যাকফারসন হিন্দুস্তানে আছে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আপনাব সঙ্গে আগে দেখা হয়েছে মনে হচ্ছে। আপনার অফিসও আমাদের ক্লায়েন্ট। তা হলে—থ্যাঙ্কস আ লট—'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'উই হোপ ইটস নট সিরিয়াস। ডক্টর চ্যাটার্জি উইল বি অলরাইট।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিস্টার বাধা।'

রিসিভার নামিয়ে বাখাব শব্দটা বেশ কিছুক্ষণ লেগে থাকল কানে। প্রাথমিক সংশয় কেটে যাবার পর এখন কেমন নির্বোধ লাগছে নিজেকে, কিছুটা চিন্তাশূন্যও।

আর কিছুব অভাবে টেবিলের ওপর থেকে তীর্থঙ্করের খামটা তুলে নিল রণজয়। বাইরে তাকাল। রোদেব রঙে নতুনত্ব নেই কোনও। সবচেয়ে কাছের চারতলা বাড়ির জলের ট্যাঙ্কের পাশে কার্নিশেব ছায়ায় জটাপটি করছে দুটি রমণোন্মুখ পায়রা। নীচে থেকে ক্রমাগত উঠে আসছে একটি গাড়ির এঞ্জিনের স্টার্ট হওয়া, আবার বন্ধ হওয়া, আবার স্টার্ট হওয়ার শব্দ। মনে পড়ল, সেদিন হোটেলের ৪০২ নাম্বার ঘর থেকে যখন ওদের আগে আগে বেরিয়ে আসে সে, তখন হঠাৎই সুশান্তর মনে পড়ে ওষুধ খাওয়া হয়নি। পারমিতা খুবই অপ্রস্তুতে পড়েছিল। হার্টেরই ওষুধ সম্ভবত। অল্প দূরে দাঁড়িয়ে রণজয় ভেবেছিল, ঠিক কোন সময় সুশান্তকে ওষুধ দেবার কথাটা ভুলে যায় পারমিতা!

চটপট তৈরি হয়ে নিতে নিতে পীতাম্বরকে খবরটা জানাল রণজয়। এবং ভাবল, বড় হোটেলে ছিল বলেই ডাক্তার দেখানো থেকে শুরু করে ব্রিচ ক্যান্ডির ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি করা পর্যন্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে দ্রুত। গোয়া থেকে ফিরে ওরা যদি তার ফ্ল্যাটে উঠত এবং এখানেই ঘটত ঘটনাটা তা হলে এত তাড়াতাড়ি এসব ব্যবস্থা সে করতে পারত কিনা সন্দেহ। রহস্য একটাই, ওরা আবার তাজে গিয়ে উঠল কেন। কারণ যা-ই হোক, এর পরের ব্যাপারগুলোর দায়িত্ব কিংবা সিদ্ধান্ত তাকেই নিতে হবে। ঘটনা কতদূর গড়াবে তা সে জানে না। সুশান্তকে হাসপাতালে থেকে যেতে হলে পারমিতাকেও থাকতে হবে, কোথায় থাকবে সে? নিশ্চয়ই হোটেলেই নয়। আজ কলকাতায় ফেরার কথা ছিল ওদের,

না ফিরলে এয়ার-টিকিট দুটোরই বা কী হবে। আর ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে চিকিৎসা চলা মানেই বিপুল খরচ। এসব দায়িত্বও তাকেই নিতে হবে নাকি? দায়িত্ব কার প্রতি? সুশান্তর, না পারমিতার?

সাত-পাঁচ ভেবে বেরুবার আগে হিমাংশু দত্তকে ফোন করল রণজয়। খবরের কাগজের লোক। এ সময় কাজ দিতে পারে।

হিমাংশু বাজারে গেছে। ফোন ধরেছিল বন্দনা। সংক্ষেপে প্রয়োজনটা বুঝিয়ে রণজয় বলল সে ব্রিচ ক্যান্ডিতে যাচ্ছে—যদি অসুবিধে না হয়, হিমাংশু যেন সেখানেই চলে আসে।

বন্দনা জিজ্ঞেস করল, 'আমি আসব?'

'না। আপনি আর কেন—', রণজয় বলল, 'হিমাংশুবাবুকে বলবেন।'

ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতাল দূর নয় এখান থেকে । কয়েক মিনিটেই পৌঁছে যাবে।

দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রণজয়ের। সুশান্ত নয়, পারমিতাই ফিরে আসছে। এখন সকাল, পরিস্থিতিও আলাদা, কিন্তু সেদিন রাতের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে এখনকার যাওয়াটাও।

সেদিন রাতে ওদের হোটেলে নামিয়ে দিয়ে ফিরে আসতে আসতে অস্বস্তি ও ক্ষোভে অসম্ভব বঞ্চিত মনে হচ্ছিল নিজেকে। পেডার রোডের কাছাকাছি এসে আর সামলাতে পারেনি। একটু থেমে আবার গাড়ি ঘোরায় হোটেলের দিকে এবং ভাবে, বহু বছর ধরে সুশান্তর ওপর প্রতিশোধ নেবার কথা ভেবেও বার বার পিছিয়ে এসেছে সে, সুযোগ পায়নি। আজই সেই সুযোগ। হোটেলের ঘরে ঢুকে সে বলবে, তুমি জাল, তুমি প্রতারক, অনিন্দ্যর মৃত্যুর জন্যে তুমিই দায়ী। তুমিই জানতে অনিন্দ্যরা কোনদিকে যাচ্ছে। তুমি না জানালে পুলিশ খুঁজে পেত না ওদের। তোমাদের বিয়েটা ঘটনাচক্রে হতে পারে; কিন্তু অনিন্দ্যর বোনের কাছে তুমি আজও গোপন করে যাচ্ছ তোমার সত্য পরিচয়। তুমি বিশ্বাসঘাতকতা না করলে ঘটনাগুলো অন্যরকম হত। আমি যেমন বেঁচে আছি, তেমনি অনিন্দ্যও বেঁচে থাকতে পারত এবং যে-পারমিতাকে নিয়ে ফাইভস্টার হোটেলের ঘরে বসে তুমি ফুর্তি করছ, সে আমারই হত। পারমিতা আমার, আমারই; কুড়ি বছরের রোদে জলে ঝাপসা হয়ে গেলেও ওর চোখে-মুখে আজও আমি পড়তে পারি আমার ঠিকানা। চলে এসো, পারমিতা—এখনও এসব শেষ হয়ে যায়নি, আমরা আবার নতুন করে শুরু করব। আমার মন, আমার শরীর, শুধু তোমাকেই খুঁজছে।

এরকম তীব্রতা নিয়ে ওদের হোটেলে ফিরে গেলেও রণজয় জানত না সুশান্তকে চিনলে নিজেকে সে কমই চেনে। ভিজে বারুদে বিস্ফোরণ ঘটে না। সুতরাং, গেটওয়ের সামনে কার পার্কিংয়ের জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে অনেকক্ষণ সে তাকিয়ে থাকে ৪০২-এর দিকে। ঘণ্টাকয়েক আগে ওই ঘরের ভিতর থেকে পারমিতার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিল বাইরে; সুতরাং ঘর চিনতে এখন আর অসুবিধে হচ্ছে না। অস্পষ্ট নয় ঘরের ভিতরের অন্ধকারও। বুঝতে পারে ওরা ঢুকে পড়েছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের নিরাপত্তায়। এর পর সে কফিশপে যায়, কফি খায় এবং ফিরে আসে।

না। দুটো ঘটনায় মিল নেই কোনও। মিল নেই এই যাওয়াতেও। ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালের গেটে গাড়ি ঢুকিয়ে ডানদিকে যাবার আগে রণজয় চিনতে পারল নিজেকে। না, সে সুশান্ত নয়। সে মানুষ; প্রকৃত মানুষ ছাড়া এই মুহূর্তে সে আর কিছুই হতে চায় না।

বিপন্নতার মধ্যেও সম্ভবত এখনও আশা জাগাতে পারে সে। না হলে পারমিতা তাকেই খুঁজত না।

পারমিতার খোঁজ করবার আগে এনকোয়্যারিতে গিয়ে ডাক্তার ঢোলাকিয়ার খোঁজ করল রণজয়। চেম্বারে আছেন শুনে সেখান থেকেই ফোনে কথা বলল তাঁর সঙ্গে। ঢোলাকিয়া বললেন, এখনও কিছু বলা যাচ্ছে না। ই-সি-জিতে ইনফ্রাকশন ধরা পড়েছে, তবে সেটা সিরিয়াস কিছু নয়। এ ধরনের কেসে কন্ডিশন স্টেডি হবার আগে অনেক সময় মেজর অ্যাটাক হয়ে যায়। লেফট অ্যাট্রিয়াম-এর মুখে সামান্য কনজেসন আছে, সেটা ওষুধে কেটে যাবে মনে হয়। তবে অন্তত বাহাত্তর ঘণ্টা অবজারভেশনে রাখা দরকার।

রণজয় শুনে গেল। বেশিটাই বুঝল না। শুধু এটুকু বুঝল, বাহাত্তর ঘণ্টা না গেলে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে না।

সামান্য বিমূঢ় বোধ করল সে।

'ইজ হি সেফ, স্যার?'

ডাক্তার হাসলেন।

'পেসেন্টের স্ত্রীকে আমি যা বলেছি, আপনাকেও তাই বলছি। হি ইজ ইন সেফ হ্যান্ডস। চিন্তা করবেন না—উই ডোন্ট ওয়ান্ট মোর পেশেন্টস। বাহাত্তর ঘণ্টা ওঁকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। অ্যাম আই ক্লিয়ার?'

'থ্যাঙ্ক ইউ ডক্টর, উই আর গ্রেটফুল।'

'ইউ আর ওয়েলকাম।'

এখন অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। এনকোয়্যারি থেকে বলল পারমিতা ওপরে ভিজিটরস রুমে থাকতে পারে। রণজয় সিঁড়ির দিকে এগোলো।

পারমিতাকে পেল কার্ডিওলজি ডিপার্টমেন্টের বাইরে। চেয়ারে বসে আছে চুপচাপ। যেন প্রাণপণে জড় করে রেখেছে নিজেকে। বণজয়কে দেখেও উঠল না। খানিক হতভম্ব চোখে তাকিয়ে থেকে হাতটা বাড়িয়ে দিল শুধু।

'আমি ডাক্তার ঢোলাকিয়ার সঙ্গে কথা বললাম। সিরিয়াস কিছু নয়। অবজারভেশনের জন্যে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখেছে—'

হাতটা টেনে নিল পারমিতা।

'আপনি কখনও ভেবেছিলেন এরকম হবে!'

'কে ভাবতে পারে, পারমিতা!' ওর পাশের খালি চেয়ারটায় বসতে বসতে বলল রণজয়, 'কিন্তু এসবও তো ঘটে। ঠিকও হয়ে যায়।'

পারমিতা তাকেই দেখছে। কিছু খুঁজছে যেন। দেখতে দেখতেই চোখ নামিয়ে নিল।

রণজয় সময় দিল ওকে। তারপর বলল, 'হাসপাতাল ভাল। ঢোলাকিয়াও বড় ডাক্তার। আমার মনে হয় বাহাত্তর ঘণ্টার আগেই ইনটেনসিভ কেয়ার থেকে ছেড়ে দেবে ওকে। আমিও তো আছি—'

পারমিতা জবাব দিল না। শুধু বাঁ পাশ ডান পাশ করে মাথা নাড়ল। নিঃশ্বাস ফেলার শব্দটা ছড়িয়ে দিল রণজয়ের কান পর্যন্ত।

রণজয় জানে এর পরের কথাগুলো সে আস্তে আস্তে বলবে। হোটেল থেকে চেক-আউট করার কথা, এয়ার-টিকিট ফেরত দেবার কথা, খরচের কথা। তার আগে ও শান্ত করে নিক

নিজেকে। বেরিয়ে আসুক সুশান্তর মৃত্যুর সম্ভাবনা ও আতঙ্ক থেকে। বুঝুক, এই অপরিচিত শহরে আকস্মিকতার আবির্ভাবে যতই বিপন্নতা থাক, আরও একজন আছে তার পাশে।

এভাবে ভাবতে ভাবতেই দেখল, হিমাংশু আসছে। সঙ্গে বন্দনাও।

রণজয় আশ্বস্ত হল। একটু আগেই সে ভেবেছিল যদি নিজের সাধ্যে না কুলোয় তা হলে দরকারে, অফিসের সাহায্য নেবে—এমন কোনও পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে দেবে না যাতে পারমিতা মনে করে অপরিচিত জায়গায় অসহায়তায় কিছু করা গেল না সুশান্তর জন্যে। দুশ্চিন্তার মধ্যেও অনেক দিন পরে নিজেকে বাদ দিয়ে আর কারুর জন্যে কিছু করার আবেগ অনুভব করছিল সে।

ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবার পর থেকে নিশ্চিন্ত লাগছে অনেকটা। আরও বেশি পারমিতাকে দেখে। হাসপাতালে ওর সঙ্গে দেখা হবার সময় চোখ মুখ বসে থাকার ভঙ্গিতে যে-স্তব্ধতা লক্ষ করেছিল সেটা কেটে যাচ্ছে আস্তে আস্তে; এখনও শঙ্কাজড়িত থাকলেও ফিরে এসেছে কথায়। স্বাভাবিক। সে এসে পৌঁছুবার আগে পর্যন্ত গোটা ঝড়টা একাই সামলেছে পারমিতা। হোটেল যতই সাহায্য করুক, পরিচিত এমন কাউকে কাছে পায়নি যে দুটো আশ্বাসের কথা বলতে পারে—টেলিফোনে রণজয়কে না পেয়ে হয়তো ভেঙে পড়েছিল আরও। সে যে মেয়ে, এই ধরনের বিপন্নতায় পুরুষের তৎপরতা খুঁজে পাবে না, সেটাও তো সত্যি!

এই ধবনের চিন্তার মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রণজয়ের হঠাৎ মনে পড়ল, কয়েকদিন আগে, বিকেলে পারমিতাদের নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে আসবার জন্যে সে যখন তাজ হোটেলের দিকে যাচ্ছিল, তখন রাস্তায় একটি দুর্ঘটনা দেখে নিজের মৃত্যুর কথা ভেবেছিল সে—কোনও ভাবে ব্যাপারটা জানতে পারলে ওরা কী করবে, ইত্যাদি। মৃত্যু না হলেও সুশান্তর এই মারাত্মকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া কী অদ্ভুত ভাবে সে দিনের চিন্তার বিপরীতে আজ দাঁড করিয়ে দিল তাকে! জীবন কি এইভাবেই দেখায়! এখন সে পারমিতার জন্যে ভাবছে; কিন্তু, ঘণ্টাখানেক আগে তীর্থঙ্করের চিঠিতে চোখ বুলোতে বুলোতে যা মনে হয়েছিল, এখান থেকে অনেক দূরে, কলকাতায়, যদি এরকম কোনও সমস্যায় পড়ে সুতপা, তা হলে কে দাঁড়াবে ওর পাশে! ওর তো কেউই নেই কাছে পিঠে! আর, যদি সুতপারই কিছু হয়—সুশান্তর যেমন হল তেমনি, ঘুমের মধ্যে! নিজের ঘুমের মধ্যে কাদা হয়ে থাকতে থাকতে আড়াই বছরের টুটু কি বুঝতে পারবে সে আবার আশ্রয়চ্যুত হল! সে তো এতই ছোট যে দরজা খোলার জন্যে ছিটকিনির নাগাল পাবে না, এমনই অবোধ যে বুঝতে পাবে না সুতপার থাকা না-থাকার মধ্যে পার্থক্য কোথায়। কী করবে টুটু, তীর্থঙ্করের মানবসন্তান! আর কেউ কি নতুন করে আশ্রয় দেবে তাকে! কে? পৃথিবীতে রণজয় বসুর মতো মানুষের অভাব নেই, ভাষাহীন একটি শিশুর এত কাছে থেকে যে অনুভব করে, যে নিজের নয় তাকে আপন করা যায় না!

একটা ধিক্কার আসছে ভিতর থেকে। ঠিক বুঝতে পারছে না কোন সম্পর্ক কার সঙ্গে, কে কার আশ্রয়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঝিমঝিম করতে লাগল মাথা, অনুভূতির শুষ্কতায় ভিজে এল চোখের পাতা। বন্দনার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পারমিতা তাকেই লক্ষ করছে দেখেও হিমাংশুকে ডেকে নিয়ে সরে গেল রণজয়। করিডোরে।

এখন তাদের কিছুই করবার নেই, মাঝে মাঝে খবর নেওয়া ছাড়া। বিকেলে, ভিজিটিং

আওয়ার্সে, পারমিতাকে নিয়ে আসতে হবে হয়তো। তার আগে কোনও দরকার পড়লে হাসপাতালই ফোন করবে। ইতিমধ্যে অ্যাডমিশন রেজিস্টারে তারই ঠিকানা ও টেলিফোন নাম্বার দিয়ে রেখেছে পারমিতা। এ ব্যাপারে শোভন-অশোভন নিয়ে যেটুকু দ্বিধা ছিল— হোটেল থেকে চেক-আউট করিয়ে পারমিতাকে হিমাংশু-বন্দনাদের কাছেই রাখবে কি না ভেবেছিল রণজয়, পারমিতার সিদ্ধান্তই কাটিয়ে দিল তা। বাস্তব ভাবলেও এটাই ঠিক। তার ফ্ল্যাট থেকে ব্রিচ ক্যান্ডি মাত্রই কয়েক মিনিট, খার থেকে বহু দূরে। তা ছাড়া, রণজয় ভাবল, হিমাংশু বন্দনাদের আজ হাসপাতালে এসেই প্রথম দেখল পামরিতা। যতই আন্তরিক হোক ওরা, ওদের সঙ্গে স্বস্তি বোধ করবে না সে।

এর পরের অনেকটা সময় কেটে যায় উদ্বেগের শূন্যতা আর ছুটোছুটির মধ্যে। নতুন কিছু ঘটে না। সুশান্ত স্টেবলই থাকে।

হাসপাতাল থেকে হোটেলে গেল ওরা, পারমিতাকে চেক-আউট করিয়ে নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে এল রণজয়। এয়ার-টিকেট ফেরত দেবার আগে বুদ্ধি করে হাসপাতাল থেকে সুশান্তর অসুস্থতা এবং কোনও অবস্থাতেই ফ্লাই করা সম্ভব নয় ইত্যাদি লেখা একটা সার্টিফিকেট জোগাড় করে নিয়েছিল হিমাংশু, যাতে পুবো রিফান্ড পেতে অসুবিধে না হয়।

রণজয় পারমিতাকে জিজ্ঞেস করেছিল কলকাতায় কাউকে খবর দিতে চায় কি না। পারমিতার ঘোর কাটেনি এখনও। পরিশ্রান্ত, অন্যমনস্ক, কথা যেটুকু না বললেই নয় তার বেশি বলছে না। প্রশ্ন শুনে বেশ কিছুক্ষণ শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকল তার দিকে। তারপর উদাসীন গলায় বলল, 'কাকে জানাব, রণজয়দা! কে আছে?'

'ওর দাদাদের। যাঁরা বিবেকানন্দ রোডে থাকেন?'

'ওদের টেলিফোন নেই। তা ছাড়া—,' অনেক দূর থেকে বলল পারমিতা, 'কী লাভ! সুশান্ত নিজে সম্পর্ক রাখতে চাইত না, আমি আর কী জানাব!'

'ঠিকানা পেলে যোগাযোগ করতে অসুবিধে হবে না।' রণজয় বলল, 'আফটার অল, ওরা নিজের লোক।'

'থাক, রণজয়দা। আজ থাক। আজ আমার কিছুই ভাল লাগছে না।' পারমিতা ভাঙছে। ভাঙনের জেরে বেঁকে গেল পবের কথাগুলো, 'ও আমার সঙ্গেই এসেছিল, যদি ফেরে আমার সঙ্গেই ফিরবে। না হলে আমি একাই ফিরব।'

ওকে সামলে নেবার সময় দিল রণজয়। নিজেও নিল। পরে বলল, 'তুমি আপসেট, তাই এভাবে বলছ। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলবার পর থেকে আমি কিন্তু কনভিনসড, এটা মেজর কোনও ব্যাপার নয়। আজকাল ডাক্তাররা কোনও রিস্ক নিতে চায় না—সেইজন্যেই ওকে হাসপাতালে, ইনটেনসিভ কেয়ারে রাখল। এসব কেসে হোটেলও দায়িত্ব নিতে চায় না।'

পারমিতা জবাব দিল না। ডুবে আছে নিজের মধ্যে। এমন অন্যমনস্ক ভাবে হাই তুলল, যেন দুর্ঘটনা ঘটেই গেছে।

পীতাম্বর চা দিয়ে গেল। পারমিতা আসবার পর থেকে তৎপরতা বেড়ে গেছে ওর।

'চা-টা খেয়ে নাও।' রণজয় বলল, 'বাথরুমে গরম জল পাবে, স্নান সেরে বিশ্রাম নাও একটু। সেদিন গেস্টরুমটা দেখে বলেছিলে না খুব সুন্দর। ওখানেই থাকবে তুমি। পীতাম্বর গুছিয়ে দিচ্ছে—'

পারমিতা রণজয়কে দেখছিল। চায়ে চুমুক দিয়ে এই প্রথম হাসির খাঁজ ফোটাল ঠোঁটের

কোণে।

'আপনার ইচ্ছেশক্তির জোর আছে বোধহয়।'

'কেন!'

'বলেছিলেন গোয়া থেকে ফিরে এখানেই এসে উঠতে। সেই টেনে নিয়ে এলেন!'

রণজয় বুঝল, এরপর আবার ফিরে আসবে সুশান্ত; ও সঙ্গে সঙ্গেই আছে, থাকবে ছায়ার মতো। পারমিতাকে বোঝানো যাবে না, সে পারমিতাকেই চায়, এখনও চায়, কিন্তু সুশান্তর ছায়ায় নয়। এইবাবে, হাসপাতালের গন্ধ-জড়ানো নৈকট্যের মধ্যে নয়। এর চেয়ে সুস্থ সুশান্তর উপস্থিতিও ভাল ছিল।

এ সময়ের দীর্ঘশ্বাস চেপেই রাখতে হয়। নিজের চা-টুকু শেষ করে উঠে দাঁড়াল রণজয়। তারপর বলল, 'বোসো। দাড়িটা কামানো হয়নি সকালে। আসছি।'

'আবার কখন খবর নেবেন হাসপাতালে?'

'যখনই তুমি বলবে। যখন ইচ্ছে করবে, যাবে। আজ, কাল, দুদিনই তো আমার ছুটি।' চলে যাবার আগে পারমিতার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে রণজয় বলল, 'অত চিন্তা করার কিছু নেই—'

দুপুর, বিকেল জুড়ে সারাটা সময় চিন্তাচ্ছন্ন ও চুপচাপ থাকলেও সন্ধের পর একটু বদলে গেল পারমিতা। কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও ইনটেনসিভ কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিটে গিয়ে দেখে এসেছে সুশান্তকে; কথাও বলেছে ডাক্তার ঢোলাকিয়ার সঙ্গে। সকালের চেয়ে অবস্থা অনেক ভাল। সিডেটিভে রাখা হয়েছে, কাল সকালে হয়তো আরও নর্মাল হয়ে যাবে। এসব বলে ঢোলাকিয়া ঠাট্টা করলেন পারমিতার সঙ্গে—বোম্বাই শহরটা পারমিতার ভাল লাগলে সুশান্তর সেরে উঠতে দেরি হবে। না হলে অনেক তাড়াতাড়ি। 'অ্যাজ ফর ইউ, মিসেস চ্যাটার্জি, ঘুমের ওষুধ ছাড়াই আজ তোমার ঘুমোতে পারা উচিত।'

হাসপাতাল থেকে ফিরতে ফিরতে রণজয় জিজ্ঞেস করল, 'কী, নিশ্চিন্ত তো এখন?'

পারমিতা হাসল। গাড়িতে, রণজয়ের পাশে, আরও কিছুটা এগিয়ে বলল, 'আপনাকে নিশ্চিন্ত দেখে আরও ভাল লাগছে। সকালে, হাসপাতালে, আপনি খুব আপসেট ছিলেন।'

'কখন!'

'আমি দেখেছি। আপনার মুখচোখ দেখেই বুঝতে পারছিলাম। হিমাংশুবাবুকে নিয়ে সরে গেলেন।'

রণজয় মনে করতে পারল কখন এবং ভাবল, সুশান্তর জন্যে নয়। পারমিতাকে সে-কথা বলা যাবে না। এখন প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, 'এই রাস্তায় কোনও গন্ধ পাচ্ছ?'

'না তো!'

'নাক টেনে দ্যাখো, পাবে। মুসুম্বি আর আনারসের।'

পারমিতা যেন সত্যিই গন্ধ খুঁজছে। চকমেলানো শাড়ির দোকান আর স্টেশনার্স পেরিয়ে ফলের রসের স্টল দেখে বলল, 'এখন পাচ্ছি। ওই ফলের দোকান থেকে আসছে।'

'দোকানের জন্যে নয়। ব্রিচ ক্যান্ডির রাস্তা জুড়ে এই গন্ধ। বোম্বাইতে যেখানেই যাও, একটা না একটা বিশেষ গন্ধ পাবে। গন্ধই চিনিয়ে দেবে অঞ্চলটাকে।'

ইচ্ছে করেই ঘুরপথ নিল রণজয়। টেনশন কাটিয়ে ফেলুক পারমিতা। ওয়াকেশ্বরের খাড়াইয়ে উঠে নেমে এল চৌপাটি সমুদ্রের ধারে। মনে পড়ছে ঢোলাকিয়ার কথাগুলো।

ঠাট্টাই। তবু, এই শহরটাকে ভালবেসে পারমিতা কি সুশান্তর সেরে ওঠা পিছিয়ে দিতে পারবে!

এখন মেরিন ড্রাইভের রাস্তায়। পারমিতা বলল, 'আপনি বুঝি সারাক্ষণ এই শহরের গন্ধ শুঁকে বেড়ান?'

'কী করব! একা মানুষকে কিছু-না-কিছু কবতে হয়। না হলে সময় কাটবে কী করে!'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল পারমিতা। কিছু ভাবল যেন।

'এখন কীসের গন্ধ পাচ্ছেন?'

'এখন?' পারমিতা ভাবল বলেই যেন রণজয়ও ভাববার সময় নিল। নিউ মেরিন লাইনস স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া ট্রেনের শব্দ পেরিয়ে যেতে যেতে জবাব দিল, 'এখন তো আমি একা নই।'

'তা-ই!'

উচ্চারণই রহস্য চেনায়। নিঃসৃত হবার আগে জিভ ছুঁইয়েছে পারমিতা। রণজয় চুপ করে থাকল।

সন্ধে উতরে গেছে। চারদিকে ঝকমকে আলো। এদিক থেকে ওদিকে, ওদিক থেকে এদিকে তীব্র গতিতে ছুটোছুটি করছে গাড়িগুলো। এই মুহূর্তে গাড়ির ভিতরেব নৈঃশব্দ্যের সুযোগে ভেসে এল বোল্ডারে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের শব্দ। রণজয় একটা গন্ধ পেল। সান্নিধ্যের।

'আপনি একা হয়েছেন নিজের দোষে। সেইজন্যেই সেদিন বলেছিলাম, সুতপাদিকে নিয়ে আসেন না কেন! সুতপাদিও নিশ্চয়ই ভাল নেই!'

'তোমাকে বলেছে কিছু?'

'বলতে হবে কেন। একা-একা কারই বা ভাল লাগে!'

'জানি না।' রণজয় বলল, 'আমার দায়িত্ব ওকে ভাল রাখা। চেষ্টা কবি।'

'রাখা মানে কি!' পাশ ফিরে তাকাল পারমিতা, আবার সামনে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলল, 'রাখা শব্দটায় কেমন যেন দয়া মেশানো থাকে। মনে হয় যাকে রাখছেন বলে ভাবছেন, সে আপনার নিজের কেউ নয়। এখন রাখছেন, পরে ফেলেও দিতে পারেন! সুশান্তও প্রায়ই বলে এরকম। বুঝি না।'

রণজয় ভেবেছিল আগের কথার জের টেনে বলবে, সুতপাকে আসতে লিখেছি। আমি নিজেই হয়তো কিছুদিনের মধ্যে ফিরে যাব কলকাতায়। এর মধ্যে সুশান্তর কথা ওঠায় বিরক্তি এসে গেল। নিজেকে আড়াল করে বলল, 'ধমকটা কি শুধু আমাকেই দিলে। নাকি সুশান্তকেও দাও মাঝে মাঝে?'

সঙ্গে সঙ্গে কথায় ফিরল না পারমিতা। দৃষ্টি যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই। আরও পরে, একটু বা বিষণ্ণ স্বরে বলল, 'মনে হল আপনাকে বলতে পারি। ওকে পারি না।'

'কেন!'

পারমিতা রাস্তা দেখছিল। দুদিকে এবং ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকিয়ে হঠাৎই জিজ্ঞেস করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'ঠিক কোনওখানে নয়। সারাদিন টেনশনে কাটিয়েছি, ভাবলাম তোমাকে একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরিয়ে আনি। কেন? ফিরবে?'

'না। সেজন্যে নয়।'

এবার স্পষ্ট চোখে পারমিতাকে দেখল রণজয়।

'তুমি কিন্তু এড়িয়ে গেলে—'

'না। তা নয়—।' দ্বিধান্বিত ভঙ্গিতে বলল পারমিতা, 'কী জানি কেন, ওকে আমার খুব স্বাভাবিক মানুষ বলে মনে হয় না।'

'কেন।'

'না, এভাবে বলা ঠিক হল না।' বলে ফেলা কথাগুলো ফেরত নেবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠল পারমিতা, 'ও মানুষটা খারাপ নয়, জানেন। অনেক গুণ আছে—। কিন্তু, মনে হয় কিছু যেন সারাক্ষণ তাড়া করে বেড়ায় ওকে! আমি বুঝতে পারি না। ও বদলে যায়—হঠাৎ-হঠাৎ বদলে যায় কেমন।'

নিজের অতীত—পারমিতার কথা শেষ হবার আগেই উত্তরটা মুখে এসে গিয়েছিল রণজয়ের—যা ভার হয়ে বসে থাকে ওর প্রতি মুহূর্তের বর্তমানে, যা হয়তো ওর প্রতিটি সাফল্যকেই ছোট করে দেখায়, কুরে খায় ওর বিবেককে।

বলল না। পারমিতার কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠেছে সেই অসহায়তা, যা প্রশ্ন করে না, উত্তরও খোঁজে না, বিকল্পের অভাবে নিজের অসহায়তাটাকেই চিনিয়ে দেয় শুধু। এমন ভাবে বলল যেন একার রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিজেকেই শোনাচ্ছে কথাগুলো। তা ছাড়া, রণজয় ভাবল, সুশান্ত এখন হাসপাতালে—ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে মৃত্যুর সম্ভাবনা থেকে। যতই আশ্বাস দিক ডাক্তাব, শেষ পর্যন্ত পারবে কি না কেউই জানে না। এই সত্য সে যতটা জানে তার চেয়ে বেশি জানে সুশান্তর স্ত্রী, পারমিতা। সুশান্তর কিছু হলে মন খারাপ হবে তার, কিন্তু ক্ষতি যা হবার তা পারমিতারই হবে। এই মুহূর্তে ও-ও কি স্বাভাবিক আছে? বদলে যায় বলতে কী বোঝাল তাও তো স্পষ্ট নয়। কী লাভ ওকে নিজের ধারণার কথা বলে! বরং ও ভাবুক, নিজের ভাবনা থেকেই যেমন ইচ্ছে বুঝে নিক। এই কথাগুলো না উঠলেই ভাল হত।

বাঁ দিকে চার্চ গেট স্টেশনের রাস্তা ছেড়ে, কাবাব কর্নার, এয়ার ইন্ডিয়ার হোর্ডিং পেরিয়ে ওরা নরিম্যান পয়েন্টের শেষে, প্রায় ওবেরয় হোটেল পর্যন্ত এসে পড়েছিল। স্টিয়ারিং থেকে হাত না সরিয়েই বাঁ হাতের রিস্টওয়াচে চোখ রাখল রণজয়। সওয়া আটটা। টাটা আর্ট সেন্টারে কোনও অনুষ্ঠান ছিল বোধহয়, এইমাত্র ভাঙল, একসঙ্গে বেরিয়ে আসছে অনেকে। সমুদ্রের ধারে বাঁধানো চত্বরে ছোট ছোট ডাবের পাহাড় সাজিয়ে বসে আছে ফেরিওলারা। দূরে কালো জলের মধ্যে এগিয়ে আসা টিলার ওপর আলো-অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে গভর্নর হাউস। এমব্যাঙ্কমেন্টে ধাক্কা খেয়ে অনেক উঁচু পর্যন্ত জলের উচ্ছ্বাস তুলে সমুদ্রেই ফিরে যাচ্ছে ভাঙা ঢেউগুলো।

সে যা দেখছে পারমিতাও তা-ই দেখছে কি না বুঝতে পারল না রণজয়। তবে, ধারণা মিলে যাচ্ছে, আগের কথাগুলো বলবার পরে বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেলেও উত্তর চায়নি পারমিতা। সম্ভবত আটকে আছে ওইখানেই। বিভ্রান্তও। ধকল কম যায়নি ভোর থেকে। হয়তো ক্লান্তির কথা বলতে পারছে না মুখ ফুটে। রণজয় ফেরার কথা ভাবল।

'এই জায়গাটায় এসেছ আগে?'

চুপচাপ মাথা নাড়ল পারমিতা।

'এটাই নরিম্যান পয়েন্টের শেষ। খুব বৃষ্টি হলে সমুদ্র এখানে রাস্তায় উঠে আসে।' রণজয় বলল, 'অদ্ভুত দৃশ্য। আমি একবার দেখেছি—'

পারমিতা সমুদ্রই দেখছে। আশপাশেব আর সব শব্দ থেকে আলাদা করে নিয়ে ঢেউয়ের শব্দই শুনছে হয়তো। অন্যমনস্ক। প্রবল হাওয়ায় সিল্কের শাড়ির আঁচলটা কাঁধ থেকে খসে পড়ার মুহূর্তে চেপে ধরল ডান হাতে। দৃশ্যটা কেঁপে গেল শরীরে। এখনই মনে হল রণজয়ের, রাত বাড়ছে। আরও বাড়বে।

'এবার ফেরা যাক তা হলে?'

'হ্যাঁ।' পারমিতা বলল, 'আপনিও টায়ার্ড।'

রণজয় জানে এসব কথার কথা। বলতে হয় বলেই বলা। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফ্ল্যাটে পৌঁছে যাবে তারা। এক প্রস্ত চা কিংবা কফি খেতে পারে। না, আজ সে মদ্যপান করবে না। কর্তব্য হিসেবে হাসপাতালে ফোন করে সুশান্তর খবর নেবে একবার। তারপর খাওয়া সারবে। কাজ গুছিয়ে নীচে চলে যাবে পীতাম্বর। এই সময় থেকে তার আর পারমিতার আলাদা হয়ে যাবার কথা।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে তাড়া ছিল না। ফেরার রাস্তায় গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে রণজয় বলল, 'আমি টায়ার্ড হব কেন! কাল রাতে এত ঘুমিয়েছি যে ফোনের শব্দ শুনেও ঘুম ভাঙেনি। মনে হয় স্বপ্ন দেখছিলাম! ঠিকঠাক জেগে উঠলে তো হোটেলেই চলে যেতে পারতাম—এত ভোগান্তি পোয়াতে হত না তোমাকে!'

পারমিতা শুনল কি না বোঝা গেল না। বাঁ দিকে আলোর হার-পরানো অন্ধকার সমুদ্র—ওর দৃষ্টি কি আলোয়, নাকি অন্ধকারে? হয়তো আরও দূরে। হয়তো কোথাওই নয়, ও নিজেকেই দেখছে। ট্রাফিকে গাড়ি থেমে দাঁড়ানোও ওর মগ্নতায় চিড় ধরাল না এতটুকু। সবুজ সঙ্কেত পেয়ে এগিয়ে যেতে যেতে রণজয়ের মনে পড়ল, গতকাল, প্রায় এই সময়ে, হিমাংশুর বাড়ি যাবার আগে সে ভেবেছিল পারমিতাই বা কীরকম! বিষয় বদলে গেছে, কিন্তু এখনও কি চেনা যাচ্ছে ওকে!

'রণজয়দা—', অ্যাকোরিয়ামের সামনে এসে নিজেই কথা বলল পারমিতা, 'আপনি তো ওকে আমার চেয়ে বেশি দিন চেনেন, দেখেছেন। সেই কলেজে পড়ার সময় থেকে। আপনার কি কখনও মনে হয়েছে ও ঠিক স্বাভাবিক নয়?'

রণজয় থমকে গেল। প্রশ্ন-চিহ্নের আগের শব্দগুলোকে পর পর সাজিয়ে নিল নিজের মনে। এবং ভাবল, এর উত্তর হ্যাঁ এবং না, দুটোই হতে পারে। ঠিক অনুমান করা যাচ্ছে না পারমিতা নিজের কথারই সমর্থন খুঁজছে কি না। সমর্থন পেলে কি নিজের স্বাভাবিকতাও হারিয়ে ফেলবে?

রণজয় আরও কয়েক মুহূর্ত সময় নিল, আরও একটু। তারপর না-টাকেই আঁকড়ে ধরল।

'স্ত্রীর দেখা আর বন্ধুর দেখা কী হয়? কোথায়, কোন ঘটনার মধ্যে দেখছ, তাও তো বদলে দেয় দেখা—।' এ পর্যন্ত বলে রণজয়ের সন্দেহ হল সে নিজেই স্পষ্ট নয়। তখন বলল, 'অস্বাভাবিক হবে কেন। এই যে আমাকে দেখছ—আমিই কি স্বাভাবিক?'

'কেন!'

'জানি না। মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়। মানুষ নিজের ধারণায় বাঁচে। ধারণাই তাকে গড়ে, ভাঙে, ভুল করায়।' রণজয় একটা নিঃশ্বাস চাপল। কেম্পস কর্নারের ফ্লাইওভারে উঠতে

উঠতে বলল, 'মাঝে মাঝে মনে হয় আর একটা সুযোগ পেলে ভাল হত।'

পারমিতা তাকেই দেখছে। এখন সামান্য ফিরে বসা, জানে না কখন ওর ডান হাতটা ছড়িয়ে দিয়েছে তার দিকে, সিটের পিছনে। পিঠে লাগছে ওর এলানো আঙুলের স্পর্শ। সচেতন হবে ভেবেও হল না রণজয়। যে-কোনও স্পর্শেই দূরত্ব কাটে না।

আগের চেয়ে অনেক সহজ গলায় পারমিতা বলল, 'আমার সঙ্গে আপনার অনেক মিল আছে—'

রণজয় প্রশ্নে গেল না। পেডার রোড থেকে কারমাইকেল রোডে বাঁক নিল সাবধানে। অর্থও খুঁজল না। নিঃশব্দ হেসে বলল, 'হয়তো আছে। ভুল করায়।'

তারপর থেকে ক্রমশ নিবপেক্ষ হয়ে গেল রণজয়। শরীরে ও মনে অস্বস্তি টের পাচ্ছিল স্পষ্ট; অস্বস্তি থেকে পৌঁছে গেল নিজের প্রতি অবিশ্বাসে। তার কি উচিত ছিল পারমিতাকে হিমাংশু বন্দনাদের সঙ্গে থাকতে বাধ্য করা, কিংবা পারমিতাকে বলা, হাসপাতালের ব্যবস্থায় রাতটা ওখানেই থেকে যেতে—না হয় সে নিজেও থেকে যেত নীচে, অনেকেই যেমন থাকে। অ্যাডমিশন রেজিস্টারে পারমিতা যখন তারই ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার নোট করায় তখনও তো ও যোগাযোগ করতে পারেনি রণজয়ের সঙ্গে—, তা হলে কি হোটেলের সেই ভদ্রলোক, সুমন বাধা, ব্রিচ ক্যান্ডিতে তাকে ফোন করে রণজয়কে কনট্যাক্ট করা গেছে, রণজয় পৌঁছে যাবে শীঘ্রি, ইত্যাদি জানাবার সঙ্গে সঙ্গে পারমিতা ধরে নেয় রণজয়ের ঠিকানাই এখন তারও ঠিকানা? সে কি তখনই, কিংবা তার পরে—হোটেল থেকে চেক-আউট করে তার ফ্ল্যাটে উঠে আসার সময়েই জানত যে রাতেও থাকতে হবে এখানে, রণজয়ের সঙ্গে? তবু দ্বিধা আসেনি! কেন! কলকাতায় না হোক, সেদিন হোটেলের ঘরে সুশান্তর অনুপস্থিতিতে তার চোখের দিকে তাকিয়ে, তার কথা শুনে কি একবারও মনে হয়নি পারমিতার, লোকটা তার প্রতি দুর্বল—এভাবে থাকায় বদলে যেতে পারে ঘটনা! নাকি সে যেভাবে ভাবছে পারমিতা তার কিছুই ভাবেনি; বণজয়কে সে চেনে, জানে বিশ্বাস করে; তার বেশি একটুও গুরুত্ব দেয় না!

ফ্ল্যাটে ফিরেই হাসপাতালের আই-সি-সি-ইউতে ফোন করেছিল রণজয়। সিস্টার বলল সুশান্ত ভাল আছে, উদ্বিগ্ন হবার কোনও কারণ নেই। তারপর তারা চা খেল। কথা বলল নিজেদের মধ্যে, বিশেষ কোনও কথা নয়। পারমিতা ইতিমধ্যে কিচেনে গিয়ে কিছুক্ষণ আলাপ করল পীতাম্বরের সঙ্গে, সেখান থেকে চলে গেল তার জন্যে নির্দিষ্ট ঘরে।

ছাড়া-ছাড়া মন নিয়ে সকালের খবরের কাগজটায় চোখ বোলাতে বোলাতে রণজয় অনুভব করছিল, সুশান্ত সম্পর্কে আশঙ্কা সকাল-দুপুর-সন্ধেয় যতটা কাছাকাছি রেখেছিল তাদের, এখন আর ততটা কাছে নেই তারা। এমনও হতে পারে, পারমিতাকেও স্পর্শ করেছে তার নিরপেক্ষতা; কিংবা, সে কোনও বিষয় নয়—নারীর স্বাভাবিক অনুভূতি থেকে ক্রমশ নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছে পারমিতা। হয়তো সে একাই হতে চায়। রণজয় নিজেও অন্যদিন যেমন থাকে তেমনি, একা হয়ে গেল।

রাতে খেতে বসে সামান্যই কথা হল তাদের মধ্যে।

পীতাম্বর নয়, আজ পারমিতাই খাবার তুলে দিচ্ছে তাকে। পীতাম্বর দেখছে।

পারমিতা বলল, 'কাল যদি ও ভাল থাকে, তা হলে আমি আপনার জন্যে দু একটা আইটেম রাঁধব, রণজয়দা। পীতাম্বরকে বলেছি—'

'বেশ তো।' চোখ না তুলেই বলল রণজয়, 'যদি-র কথা নয়, ভালই থাকবে। তবে, কাল ওর দাদাদের একটা খবর দিও। সম্পর্ক থাক না থাক, এই অবস্থায় সুশান্তও হয়তো চাইবে সেটা।'

'একটু আগে আমিও তাই ভাবছিলাম।' পারমিতা থামল একটু, 'এখানে কি সায়ন বলে কোনও জায়গা আছে?'

'আছে। কেন?'

'শুনেছি ওর এক পিসতুতো দাদা থাকেন ওখানে। অনেক দিন, সেটল করেছেন। মফতলাল না কোথায় চাকরি করেন। এর বেশি কিছু জানি না।'

'নাম, ঠিকানা জানলে খোঁজ করা যায়। সুশান্তও বলতে পারে। যদি কাল কথা বলতে দেয়, জিজ্ঞেস কোরো।'

পারমিতা ঘাড় নাড়ল। তারপর বিষণ্ণ হেসে বলল, 'লটারি নাকি মানুষের ভাগ্য ফেরায়। দেখছেন, কীভাবে ফেরাল!'

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আশপাশেব শব্দে ক্রমশ ঢুকে পড়ছে স্তব্ধতা। এ বাড়ির আগের বাড়িটা মাল্টিস্টোরেড, গেস্টরুম থেকে দেখা যায়। প্রায় প্রতিদিনই রাত এগারোটা নাগাদ ওখানে কোনও ফ্ল্যাটে জোর ভল্যুমে বেজে ওঠে স্টিরিও। সেই শব্দটা শুরু হয়ে গেল হঠাৎ। 'ওয়ে, ওয়ে—', সম্ভবত কোনও হিট হিন্দি ছবির গান, বোম্বাইয়ে আসার পর থেকে যখন তখন ভেসে আসে কানে। বিরক্তিকর লাগবার আগেই আবার কমে গেল ভল্যুম। পেডার রোড দিয়ে যেতে যেতে জোরে ব্রেক কষছে কোনও বাস। এইসব শব্দে কান রেখে উঠে দাঁড়াল রণজয়। প্লেটের দিকে তাকিয়ে থাকা পারমিতাকে দেখতে দেখতে, ওকে সহজ করার চেষ্টায় বলল, 'তোমার খারাপ লাগলে আমারও ভাল লাগবে না। কিন্তু—আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পারো, তুমি লটারি জেতায় একটা লাভ হয়ে গেল আমার। অনেক দিন পরে আজ আমি একা বসে খাইনি। বাড়তি কিছুও পেয়েছি। দিস ম্যান ইজ গুড। বাট হি ডাজ নট হ্যাভ দা টাচ অফ ইওর হ্যান্ড। কাল হয়তো আরও ভাল লাগবে।'

হাসি ফুটেছে পারমিতার মুখে। ভুরু তুলে বলল, 'হোয়াই?'

'ইউ সেড শো। বললে না, কাল আমার জন্যে রাঁধবে!'

'ও, সেইজন্যে!'

পারমিতাও উঠে দাঁড়াল। মিলিয়ে যাবার আগে হাসিটা ছড়িয়ে পড়েছে মুখে। চিবুকের ডৌলে, গলায়, কাঁধের অনাবৃত অংশে, কানের লতিতে জেগে থাকা পান্নায়, বুকের কোথাও হারিয়ে যাওয়া সরু চেন-এ। ইতিমধ্যে পোশাক বদলানোয় সামান্য ঢিলেঢালা লাগছে ওকে। অন্যভাবে ঘন, রাতই নেমেছে শরীরে।

রণজয় নিজেকে সংযত করে নিল। হাত ধুয়ে ফিরে এসে বলল, 'রাত হয়েছে। এবার শুয়ে পড়ো। একটুও দুশ্চিন্তা না করে ঘুমিও।'

সোজাসুজি চোখ মেলে রণজয়কে দেখল পারমিতা। কিছু বলতে চাইল যেন। না বলে আস্তে আস্তে হেঁটে গেল গেস্টরুমের দিকে। কিছুক্ষণ জ্বলে থাকল আলোটা। তারপর হঠাৎ নিভে গেল; যেভাবে যায়।

পীতাম্বর না-যাওয়া পর্যন্ত অন্ধকার লিভিং রুমে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকল রণজয়। পীতাম্বর চলে যাবার পর বেডরুমে গেল, শুয়ে পড়বে ভেবেও শুল না। আলো নিভিয়ে,

জানলায় দাঁড়িয়ে ফ্লাইওভারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে দেখল, দৃশ্যে পরিবর্তন নেই কোনও। নীচের সমুদ্রে তীরের দিকে গড়িয়ে আসছে সারিবদ্ধ ফসফরাস, যেন কোনও নৃত্যের মুদ্রায়, স্কুল-ছুটির বাচ্চাদের মতো এলমেলো হয়ে ফিরে যাচ্ছে আবার। সেও কি একইরকম আছে, এখন, এই মুহূর্তেও? নিজেকে জয় করার পরেও?

প্রশ্ন নিয়ে গেল না কোথাও। বরং ফিরিয়ে দিল অন্য ভাবনায়। মনে পড়ল সুতপাকে। টুটুকে। তীর্থঙ্করকে। কোনও নির্দিষ্টতার মধ্যে নয়। ধারাবাহিকতা থেকে বিচ্যুত সে হঠাৎই ভাবল, ঘটনা চাপা থাকে না—সুতপা যখন জানবে পারমিতা রণজয়ের সঙ্গেই ছিল, একই ফ্ল্যাটে, সে কি বিশ্বাস করবে এই ঘটনায় আর কোনও ঘটনা নেই, ছিল না! নাকি সন্দেহ করবে, যে-রণজয় তার প্রতি উদাসীন সে পারমিতার প্রতিও উদাসীন থাকবে তার কী মানে আছে! কিংবা, সুতপা কিছুই ভাববে না, নিজের সম্পর্কে এখনও নিঃসন্দেহ নয় বলেই সে সুতপাকে জড়িয়ে ফেলছে সন্দেহে? আশ্চর্য, কুড়ি বছর আগে যে বিপ্লবের স্বপ্ন দেখত, তুচ্ছ মনে করত নিজের জীবন, নিজেকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতে নিতে আজ কোথায় এসে পৌঁছেছে সে—যেখানে একটি নারীর শারীরিক সংস্পর্শের লোভ থেকে নিজেকে দূরে রাখার মধ্যেই সে খুঁজছে সার্থকতা, নিজের সন্দেহের দায় চাপাতে চাইছে অন্যেরও ওপর!

একটা বিমর্ষতার বোধ ক্রমশ ছেয়ে ফেলল রণজয়কে। বিছানায় শুয়ে কিছুক্ষণ এপাশ ওপাশ করার পর বুঝতে পারল ঘুম আসবে না। আবার উঠে আলো জ্বালল সে, বাথরুমে গেল, বেরিয়ে এসে ইনগ্রিড বার্গম্যানের জীবনীটা তুলে নিল টেবল থেকে, বেড সুইচ জ্বেলে নিভিয়ে দিল বড় আলোটা। তারপর ভারাক্রান্ত ঘাড়ের নীচে বালিশ গুঁজে নির্দিষ্ট পাতায় মনোনিবেশ করতে করতে ভাবল, আর একটা সুযোগ পেলেই কি সে অন্যরকম হত! এই ধরনের ভাবনায় ভার হয়তো আছে, কিন্তু সত্য নেই কোনও—কথাগুলো দাঁড়াতে পারে না। জীবন একটাই, সুযোগও একবারই আসে। যারা পারে তারা এক জীবনেই বেঁচে থাকে। যারা পারে না তারা তার মতো হয়ে যায়।

'রণজয়দা?'

হঠাৎ কণ্ঠস্বরে সচকিত হল রণজয়। পারমিতাই। আধশোয়া হয়ে দরজার পর্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী হল!'

'আমি আসব?'

'এসো।'

'পারমিতাকে দেখে মনে হয় না দেড় ঘণ্টা আগে ঘুমোতে গিয়েছিল সে। ঘরে ঢুকে সোজা চলে গেল জানলার কাছে। বাইরে তাকিয়ে বলল, 'চেষ্টা করলাম। ঘুম আসছে না। মনে হল আপনিও ঘুমোননি—আলো জ্বালছেন, নেভাচ্ছেন, আবার জ্বালছেন। আপনি ঘুমোননি কেন?'

'আমার কথা থাক।' বেড-ল্যাম্পের আলো পারমিতা পর্যন্ত যায় না। আবছায়ায় দাঁড়ানো ওর পুরো শরীরটাকে দেখতে দেখতে রণজয় বলল, 'মনে হয় স্ট্রেন্‌ড্ হয়ে আছ। বেশি দুশ্চিন্তা করছ। অত ভাববার কী আছে!'

পারমিতা জবাব দিল না।

'আমার কাছে ট্র্যাঙ্কুইলাইজার আছে। দেব?'

'না।' পারমিতা ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টি ঘন। তাকেই দেখছে। তারপর বিছানা পর্যন্ত, তার

মাথার দিকে এগিয়ে এসে ছেলেমানুষি গলায় বলল, 'আপনার কাছে বসব একটু? খুব ইচ্ছে করছে।'

অদ্ভুত লাগল কথাগুলো। এ কম্পন ছুঁয়ে গেল রণজয়কে, সামান্য কাঠিন্য এসে গেল শরীরে। এ কেমন পাগলামি পারমিতার!

তীক্ষ্ণ চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে সংযত গলায় রণজয় বলল, 'বোসো। তবে এত রাতে এমন ইচ্ছে কি ভাল!'

রণজয় সরে যেতে বিছানায় বসতে বসতে পারমিতা বলল, 'কেন!'

'বুঝিয়ে বলতে হবে!' হাতের বইটা পাশে সরিয়ে রেখে হালকা গলায় বলল রণজয়, 'একজনের স্বামী হাসপাতালে, আর একজনের স্ত্রী কলকাতায়। এরকম আইডিয়াল সিচ্যুয়েশন গল্প-উপন্যাসেও থাকে না। লোকেই বা ভাববে কী!'

'লোক কোথায়! শুধু তো আমরাই!' একটুও না ভেবে পরের কথাটা জুড়ে দিল পারমিতা, 'এত ভিতু কেন আপনি!'

সান্নিধ্যের গন্ধে জড়িয়ে যাচ্ছে নিঃশ্বাস। দূরত্ব এক হাতও নয়। বেড-ল্যাম্পের আলো আড়াল করে, খাটের মাথার দিকে পিঠ দিয়ে, এক পা মুড়ে অন্য পা-টা মাটিতে রেখে স্থির ভঙ্গিতে বসে আছে পারমিতা, ডান হাতটা এলিয়ে আছে তার বুকের কাছে। মুখ জানলার দিকে। শেষ কথাগুলো বলবার সময় সামান্য ঝুঁকে এসেছিল, তখনই ওর নিঃশ্বাসের স্পর্শ পেয়েছিল কপালে। এখন উদাসীন, হঠাৎই গভীরে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলেছে যেন।

রণজয়ের নিঃশ্বাস দ্রুত হল। শব্দ টের পেল বুকে। ইচ্ছে করলেই সে এখন টেনে নিতে পারে পারমিতাকে। চুম্বনে ভরে দিতে পারে ওর ঠোঁট, চোখ, কপাল; খুঁজে দেখতে পারে স্মৃতিতে জেগে থাকা ওর হাঁটুর কেটে-যাওয়া দাগটা। অন্ধকারে অনাবৃত ওর শরীরের প্রতিটি অঙ্গের স্বাদ নিতে নিতে নিঃশেষ করে দিতে পারে নিজেকে। ওর বুকে নিঃশ্বাস রাখতে রাখতে বলতে পারে, এই মুহূর্তে এই মুহূর্তটিই সব—তুমি শেষ, তুমিই প্রথম। অন্ধকার থেমে থাক আমাদের জন্যে!

কিন্তু, ভাবনা ভাবনাতেই থেমে থাকল। নিঃশ্বাস দ্রুত হলেও কোনও উদ্যমই জাগল না শরীরে। পারমিতার সেই মুহূর্তের সমগ্র ভঙ্গির সারল্য বিস্ময়ে সঙ্কুচিত করে রাখল তাকে। মনে হল সে যা ভাবছে, পারমিতা তা ভাবছে না—তার স্পর্শের নাগালে সান্নিধ্য সাজিয়ে রেখে সে চলে গেছে অনেক দূরে।

কথা খুঁজে পেল না রণজয়।

'জানেন, রণজয়দা—', অনেকক্ষণ পরে অচেনা গলায় বলল পারমিতা, 'এক সময়ে আমি ভাবতাম আর একটু বড় হয়ে আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে—'

'সত্যি!'

'সত্যি না তো কি!'

বিষণ্ণতায় গভীর বড় সুন্দর দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল পারমিতা। সেই দৃষ্টি সেই হাসির অর্থ বোঝবার জন্যে আরও একটু আলোর দরকার হয় না।

নিজেকে যেটুকু দেখাবার দেখিয়ে নিয়েই আবার হারিয়ে গেল পারমিতা। বোধহয় ফিরে গেল তার আর একটু বড় হবার আগের বয়সে। সেখান থেকেই বলল, 'আরও কত কী যে ভাবতাম!'

নৈঃশব্দ্যে শব্দ ফুটতে ফুটতেই জল মিশে গেল বালিতে।

রণজয় থেমে থাকল। সে জানে পারমিতা এখন বালিই খুঁড়ছে। জল দেখলে ফুটে উঠবে কথায়।

'ছোড়দা মারা যাবার পর দাদা যখন আমাদের লন্ডনে নিয়ে যাবে বলল, তখন আমি বলেছিলাম কলকাতা ছেড়ে যাব না।' ডান হাতটা তুলে এবার চোখের কোল পর্যন্ত নিয়ে গেল পারমিতা। ক' মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'যাব না, যাব না করে আছড়েপিছড়ে কেঁদেছিলাম। দাদা খুব অবাক হয়েছিল। মা দাদাকে বলল, তোকে আর কতটুকু দেখেছে ও, অনিন্দ্যকেই দেখেছিল—ছোড়দা ছোড়দা করে পাগল হত সারাক্ষণ! দেখুন, মা'ও কিন্তু বুঝতে পারেনি কিছু। মৃত্যু কাউকে ফিরিয়ে দেয় না, আমি তো জানতাম স্মৃতিও সঙ্গে সঙ্গে যায়—লন্ডনে গেলেও ছোড়দার স্মৃতি যেত আমার সঙ্গে সঙ্গে। আসলে আমার মনে হয়েছিল আপনি মারা যাননি, আপনি একদিন ফিরে আসবেন—খোঁজ করবেন আমাদের। আপনার জন্যেই কলকাতায় থাকতে হবে আমাকে। কিন্তু, আমার আর জোর কতটুকু! যেতেই হল।'

তার দিকে তাকিয়ে হাসল পারমিতা। যেন নিজেকেই দেখছে, হাসছে, সে উপলক্ষ মাত্র। নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, 'আমাদের বাড়ির পাশে গায়ত্রী বলে একটা মেয়ে থাকত। মনে পড়ে? আপনাকে চিনত। তাকে দাদার ঠিকানা দিয়ে গিয়েছিলাম—যদি আপনি আসেন, খোঁজ করেন, আপনাকে দিতে। প্রায়ই জানতে চাইতাম। প্রায় দু' বছর পরে গায়ত্রী লিখল, আমি কেন বুঝতে পারছি না আপনি বেঁচে থাকলে একবার না একবার আসতেনই!'

পারমিতা থেমে গেল। সামান্য কাত হয়ে ঝুঁকে এল তার দিকে। তারপর নিজের ডান হাতটা হঠাৎ তুলে তার কপালে রেখে বলল, 'কী ভাবছেন! বানিয়ে বলছি সব?'

ওর হাতটা সরাবার চেষ্টা করল না রণজয়। সে এখন স্পর্শের অর্থ খুঁজছে। আর একটু বড় হবার বয়সটা অনেক দিনই পেরিয়ে এসেছে পারমিতা, সে নিজেও যেখানে ছিল সেখানে নেই। ভোঁতা হয়ে গেছে অনুভূতিগুলো। তবু, চুলের ভিতর পারমিতার আঙুলের ঘোরাফেরা অনুভব করতে করতে সে ঢুকে পড়ল কুড়ি বছর আগেকার আরও এক অনুভবে। না-বোঝা আবেগে ঝাপসা হয়ে এল দৃষ্টি—সেই দৃষ্টিতে একাকার হয়ে যাচ্ছে পারমিতা আর সুতপা। মৃত্যুর হাত থেকে তাকে ছিনিয়ে এনে, দু হাতে তার মাথার চুল ধরে ঝাঁকানি দিতে দিতে সুতপা বলছে, 'তুইও মরে গেলে আমার কী হত, রণো!' কেন এমন করত এরা! সে কি সত্যিই এত প্রয়োজনীয় ছিল কোনও দিন? আজও আছে? কোন চিন্তায় পারমিতা থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেকে জয়ী ভাবতে শুরু করেছিল সে? কেন সুতপা এমন অপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠল তার কাছে?

প্রশ্নগুলো দানা বাঁধল না। ঠোঁটে চেপে নিজের দুর্বোধ্যতাকে চেপে রাখার চেষ্টায় রণজয় ভুলে গেল পারমিতা কিছু জানতে চেয়েছিল কি না। শুধু চাইল মায়ায় জড়ানো ওই দুঃখিত আঙুলগুলোর স্পর্শ শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে।

৫

গৃহবন্দি এইসব মানুষের জেগে থাকা ও ঘুমিয়ে পড়ার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে একদিন। কে কার, কোন সম্পর্কের আড়ালে নিঃশ্বাস নিচ্ছে কেউ তা ঠিকঠাক বুঝে ওঠার আগেই সৃষ্টি হতে থাকে নতুন আড়াল। আড়ালই ঘটিয়ে দেয় ঘটনা। পাল্টে যায় জীবন।

তবে একদিনেই নয়। একই ভাবেও নয়।

মহিলা সমিতির মিটিং-এ দেখা হবার পর মনীষাদির ভবানীপুরের বাড়ির ঠিকানা নিয়েছিল সুতপার। বেশ কিছুদিন আগেকার কথা; যাব যাব করেও তার পরে যাওয়া হয়ে ওঠেনি সাত ঝামেলায়। সময় পায় জুনের শেষে পৌঁছে, একদিন বিকেলে। সন্ধেয় সেখান থেকে ফেরার সময় প্রবল বৃষ্টিতে আটকে পড়ে রাস্তায়। ঘরের ভিতর কথায় গল্পে খেয়াল করেনি মেঘ জমছে, ছারখার করার জন্যে তৈরি হচ্ছে আকাশ।

একা বৃষ্টি নয়, সঙ্গে লোডশেডিং। ছাতা থাকলেও এগোতে সাহস পায় না। গাড়ি বারান্দার নীচে আটকে-পড়া আরও অনেকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিই দেখে সুতপা। দেখতে দেখতে মনে হয় শুধু জল নয়, অন্ধকারও ঝরছে। চারদিক আস্তে আস্তে ভরে উঠছে জলে। ফাঁকা রাস্তায় ক্বচিৎ একটা দুটো গাড়ি, একটা দুটো রিকশা সাহসে ভর করে এগিয়ে যাবার চেষ্টায় এক দুজনের জলে নামা এবং চুপসে ফিরে আসা। এভাবে কতক্ষণ চলবে জানে না। ভবানীপুরের এই জায়গা থেকে আর্ল স্ট্রিট খুব কাছে নয়। বড় রাস্তাও এখান থেকে কিছুটা দূরে। ট্রাম, বাস বন্ধ হয়ে যাবে কি না, শেষ পর্যন্ত হেঁটেই ফিরতে হবে কি না, এখানে দাঁড়িয়ে কিছুই বুঝতে পারে না।

তবু খুব চিন্তিত হয় না সুতপা। আট ন' মাসের পাষাণভার নেমে যাবার পর থেকে অনেক নিঃশঙ্ক লাগে নিজেকে। নিশ্চিন্তও। টুটুর জন্যে এখন আর সারাক্ষণের উদ্বেগ নেই; জানে, সে নিরাপদে আছে তার বাবার কাছে। অন্ধকারে মাকে না দেখে আর ভয়ে উৎকণ্ঠ হবে না। বোম্বাই থেকে রণজয় হঠাৎ ফিরে আসার কয়েকদিনের মধ্যেই তাকে পেয়ে বসেছে টুটু। অফিস থেকে দিন পনেরোর ছুটি নিয়েছে রণজয়। একেবারে অন্য মানুষ। টুটু এখন বাবার সঙ্গে ক্রেশে যায়, ক্রেশ থেকে ফেরে।

সে নিজেও কি বদলায়নি? একটু কি ভরা-ভরা লাগছে না নিজেকে? মনটাকে চেনে। তা হলেও আজ সকালে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টের পেয়েছিল কী যেন একটা পরিবর্তন এসেছে শরীরেও। অন্যরকম লাগছে মুখচোখ। এ বয়সে যৌবন চলে যেতে থাকে। ফিরেও কি আসে! তা হলে গুণ আছে বলতে হবে রণজয়ের।

এসব ভাবনায় ঠোঁটে হাসি ছুঁয়ে গেলেও থাকে না বেশিক্ষণ। পশ্চিমের রোদ থেকে চোখ তুলে পূবে তাকালে যেমন অন্যরকম লাগে চারদিক, তেমনি, মনটা হঠাৎই পিঠ ফিরে দাঁড়ায়। ঢুকে পড়ে বিষাদে। অন্যমনস্কতার মধ্যে ভাবে, মানুষ কি শুধুই ব্যক্তিগত— নারীজন্ম কি শুধুই পুরুষের সংস্পর্শে জেগে ওঠার, শিশুর আহ্লাদে জড়িয়ে পড়ার জন্যে! এতদিন একার অনুভূতি নিয়ে থাকতে থাকতে সে কি স্বার্থপর হয়ে পড়েছে ক্রমশ!

সুতপা জানে না, কেন হঠাৎ ফিরে এল রণজয়। কিছুদিন আগে—সেটাও হঠাৎ— লিখেছিল, ফেরার ঠিক নেই, ইচ্ছে করলে স্কুলের ছুটিতে ক'দিন বোম্বাই ঘুরে যেতে পারে সুতপারা। সুতপা যায়নি, জবাবও দেয়নি চট করে। নতুন একটা আশঙ্কা কেমন যেন চেপে

বসেছিল বুকে। এই যাওয়া কি শুধুই নতুন করে একাকিত্বে ফিরে আসার জন্যে! কেন স্পষ্ট করে জানাচ্ছে না রণজয়, ছ'সাত মাসের জন্যে গেলেও কোম্পানি তাকে এখনই ছাড়ছে না, দেরি হবে, সুতরাং পাকাপাকি ভাবে চলে আসুক সুতপা! স্কুলের চাকরিটা আছে বলে গায়ে লাগে না তেমন, তা না হলে এইভাবে দুদিকে দুটো সংসার খরচও তো অনেক! সে যে ভেবেছিল আর্ল স্ট্রিটের এই অন্ধবন্ধ একতলা থেকে বেরিয়ে অবাধ আলোয় খোলা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নেবে—টুটুর বেড়ে ওঠার জন্যেও যেটা দরকার, তা কি আর হবে না কখনও! এত বছর বিয়ের পরেও কেন সে নিশ্চিত করে চিনতে পারছে না রণজয়কে! টুটুই কি বাধা! টুটুর জন্যেই সম্পর্কের সুতোটাকে আলগা করতে করতে—দূরত্বে অভ্যস্ত হতে হতে একদিন টুক করে আলাদা হয়ে যাবে রণজয়, এমনও কী হতে পারে?

স্কুল ছুটি হতে দেরি আছে এখনও; তা ছাড়া সুশান্ত-পারমিতারা গেছে বোম্বাইয়ে, পারমিতা বলেছিল ফিরে এসে দেখা করবে, ওরা ফিরলে হয়তো রণজয় ঠিক কী ভাবছে না ভাবছে সে-সম্পর্কে আঁচ পাওয়া যাবে কিছুটা—তারপর যা সিদ্ধান্ত নেবার নেবে, ইত্যাদি ভেবে যাবার কথাটা এড়িয়ে কিছুটা দায়সারা জবাব দিয়েছিল সে। কিছুদিন পরে সন্দেহ হয়েছিল, সপ্তাহ খানেকের জন্যে যাচ্ছে বলে এখনও ফিরল না কেন ওরা! নাকি পারমিতাই আসছে না? এমন কিছু কি শুনেছে রণজয়ের মুখে যে, তার সঙ্গে দেখা করার ভরসা পাচ্ছে না! সে নিজেই কি যাবে পারমিতার কাছে, রণজয়ের খোঁজ নিতে?

না। সে বড় লজ্জার। সেরকম হলে তো তীর্থঙ্কর যেদিন জিজ্ঞেস করল ওর এখানকার অফিসে খোঁজ করবে কি না, সেদিনই রাজি হতে পারত সে। তীর্থঙ্কর, হাজার হোক, অনেক কাছের লোক।

মনের এইরকম অবস্থায়, মে মাসেব এক সকালে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে নানা খবরের ভিড়ে প্রায় হারিয়ে থাকা ছোট্ট একটা খবরে চোখ রেখে ধড়াস করে উঠল সুতপার বুক। মধ্য কলকাতার নেবুতলা অঞ্চলে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে তীর্থঙ্কর দে নামে পঞ্চান্ন বছর বয়স্ক এক ব্যক্তি। পুলিশের বয়ান, প্রতিবেশীরা বলেছে কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন তিনি। ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন সব সময়। কে এই তীর্থঙ্কর?

বৃষ্টি কমেনি। বরং বেড়েছে যেন। স্মৃতিতে ঘন হতে হতে অণিমার হাতে টুটুকে সঁপে দিয়ে সকালের রাস্তায় বিমূঢ় নিজেকে ছুটে যেতে দেখল সুতপা। ট্যাক্সিতে উঠল, পরিচিত দৃশ্য ধরে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে নেবুতলার সেই গলিতে পৌঁছল এবং ফিরে এল। একটি মানুষের চলে যাওয়া যে এত তুচ্ছ হতে পারে, এর আগে কখনও সে ভাবেনি তা। ফেরার রাস্তায় পরিবর্তন ছিল না কোনও। চোখের পাতায় আর্দ্রতা ছুঁয়ে গেলেও কান্না আসেনি। ট্যাক্সির ভিতরে স্তব্ধ বসে থাকতে থাকতে স্মৃতিতে ফেরার চেষ্টায় বার বার একই স্থিরতায় পৌঁছে যাচ্ছিল সে—মেট্রোর কালীঘাট স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে, ট্রেন থেকে নেমেই ছুটে আসা, রাস্তায় ভাঁড়ের চা খাওয়া, প্রায় বিভ্রান্ত একজন নিঃশব্দ মানুষ, সে ছুটে যাচ্ছে টালিগঞ্জের ট্রেনের দিকে, পিছন থেকে বলে উঠল, 'সাবধানে থেকো।'

এই শেষ কথাটা বলবার জন্যেই কি সেদিন সীতাভোগ-মিহিদানার বাক্স হাতে আপনি ছুটে এসেছিলেন, তীর্থঙ্করদা! কেন বোঝেননি আমার সাবধান হওয়ার অনেকটাই ছিল আপনাকে ঘিরে! টুটুর জন্যে আপনার দুশ্চিন্তা কি এইভাবেই শেষ করলেন আপনি!

রাজনীতি কি এতটাই হতাশ করে তুলেছিল আপনাকে, এতটাই একা! আপনি কি দেখেননি, আপনাদের এই অসুস্থ, নির্মম, আত্মঘাতী রাজনীতির বাইরে থেকে বেঁচে থাকার জন্যে, সুস্থ জীবনে ফেরার জন্যে প্রাণপণে লড়াই করে যাচ্ছে আরও কত অসংখ্য মানুষ! কেন এভাবে ব্যর্থ হয়ে গেলেন আপনি! আপনি ব্যর্থ, ব্যর্থই—আর কীভাবে আমি এরপর মনে রাখব আপনাকে!

বৃষ্টিটা ধরে আসছে। তবু এখনও রাস্তায় নেমে পড়ার মতো ধরেনি। আঁচল তুলে জলে ভেজা মুখটা চাপ দিয়ে মুছে নিল সুতপা। মনে পড়ল মনীষাদির কথা, 'বড় সেকেলে মানুষ ছিল তীর্থঙ্কর, বুঝলি। এই বিবেকহীন রাজনীতির যুগে নিজেকে সরিয়ে নেওয়াটা যে ভুল—দরকার পাল্টা আঘাত হানার জন্যে তৈরি হওয়া, এটা ও বুঝতেই পারেনি। নিজের মনে গুমরে গুমরে মরল! গোটা পৃথিবী জুড়ে কত কাণ্ড ঘটছে—ইতিহাস বদলে যাচ্ছে, এসব কি একেবারেই দেখতে পাচ্ছিল না ও!'

মনীষাদির কথায় জোর ছিল; ছিল না ভাল লাগা। ক্রমশ ব্যক্তিগতের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল সুতপা। যেখানে তীর্থঙ্কর একা, সেও একা—সবাই-ই কি একা!

হয়তো সে জানে না।

বৃষ্টি থামলেও ঘোর কাটেনি আকাশের। রাস্তার এদিকটায় লোডশেডিং আছে এখনও, আলো ফিরেছে অন্যদিকে। সেদিক ধরে বড় রাস্তার দিকে হাঁটতে হাঁটতে সুতপা ভাবল, সত্যিই কি জীবন এমনই অদ্ভুত! বোঝে না, বুঝতেও দেয় না! অদৃশ্যে থেকে শুধুই উল্টেপাল্টে দেয় সব! ইতিহাস হয়তো বদলাচ্ছে, কিন্তু কোন রাজনীতি মোকাবিলা করবে দুর্জ্ঞেয় জীবনের সঙ্গে—অন্ধকারের ভিতরের অন্ধকারের সঙ্গে!

বহু দিন হয়ে গেল, এখন সুতপা অনেক কিছুই জানে। শুধু জানে না কেন! জানে না, বোম্বাই থেকে ফিরে তার মুখে তীর্থঙ্করের আত্মহত্যার খবর শুনে কেন অমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল রণজয়, তারপর ভেঙে পড়ল গা-কাঁপানো নিঃশব্দ কান্নায়! যতদূর জানে, তীর্থঙ্করকে তেমন পছন্দ করত না ও। তা হলে কি ওর মনে পড়েছে, এই লোকটি না থাকলে সে আজকের জীবনে পৌঁছতে পারত না! না কি আছে আর কোনও কারণ, যা সে কোনও দিনই জানতে পারবে না!

জানে না, কেন পারমিতা-সুশান্ত আলাদা হয়ে গেল এইভাবে! বোম্বাই থেকে রণজয়ই লিখেছিল, সুশান্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ, হাসপাতালে আছে, বাড়াবাড়িব সময় দিন দুয়েক তার ফ্ল্যাট থেকেই পারমিতা যাতায়াত করছিল হাসপাতালে, তারপর সুশান্তর পিসতুতো দাদা—যে বোম্বাইতেই থাকে, নিয়ে গেছে ওকে।

তারপর সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছিল সুশান্ত। রণজয়ই জানিয়েছিল।

খবর পেয়ে একদিন ওদের লেক রোডের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিল সুতপা। শুধু পারমিতাকেই দেখল। রোগা হয়ে গেছে একটু, ছায়া পড়েছে মুখে আর লাবণ্যে। সুশান্ত এখন আর এখানে থাকে না, পারমিতাই বলল, সে থাকে বিবেকানন্দ রোডের বাড়িতে, ওর দাদাদের সঙ্গে। ভালই আছে। কাজে যাচ্ছে।

'তুমি এখানে কেন! এভাবে, একা!'

'সেটা আমিও ভেবেছিলাম, সুতপাদি।' তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল পারমিতা। দুঃখিত ভঙ্গিতে হাসল। এর বেশি ভাঙল না কিছু। পরে বলল, 'আমি আবার লন্ডনে ফিরে যাচ্ছি,

সুতপাদি। দাদাকে জানিয়েছি। সম্পর্কটা টিকল না।'

সুতপা স্তম্ভিত হল।

'অবিশ্বাস মানুষকে কোথায় নামাতে পারে, তা সুশান্তকে দেখে বুঝলাম।' একটুও না কেঁপে পরিষ্কার গলায় বলল পারমিতা, 'অনেক অ্যাডজাস্ট করার চেষ্টা করেছি। হল না। ও আমাকে একটা মেয়েমানুষের শরীর ছাড়া কিছুই ভাবেনি। আমিও যে একটা মানুষ—ওকে ভালবাসতে পারি, শ্রদ্ধার যোগ্য হলে শ্রদ্ধা করতে পারি, এসব কখনও ভাবেনি। কখনও ভাবেনি আমারও আত্মসম্মান আছে।'

পারমিতা কী বলছে, কেন বলছে, তা মাথায় ঢুকছিল না সুতপার। শুধু মুখের দিকে তাকিয়ে অনুভব করেছিল, ওই মুখ, ওই কণ্ঠস্বর তার সামনে রেখে যাচ্ছে এমন কোনও, প্রশ্ন যার উত্তর হয়তো সে কোনও দিনই খুঁজে পাবে না।

মাঝে মাঝে মনে হয় সুতপার, রণজয় হয়তো জানে। যদি না-ই জানবে, তা হলে বোম্বাই থেকে ফেরার পর সে যখন জানল সুশান্ত আলাদা থাকছে, লন্ডনে ফিরে যাবার কথা ভাবছে পারমিতা—তখন ওর মুখে আরও একটা অঘটন ঘটার ছায়া পড়া ছাড়া আর কোনও ভাবান্তর ফোটেনি কেন। খানিক চুপচাপ থেকে শুধু বলেছি 'এরকম হবে তুমি জানতে না?'

কিছু বলতে পারেনি সুতপা। কোন ভাবনা থেকে এতটা বিশ্বাসে চলে এল রণজয়, সে কী করে জানবে! রণজয়কে কি বলা যাবে, যে নিজেই এতদিন সশঙ্ক থেকে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়া জলের গভীরতা মাপছিল—ভাবছিল কখন ভেসে যাবে, সে কি সত্যিই রাখতে পারে অন্যের খবর!

ধন্ধ এসে যায়। অনেক দূর থেকে রণজয় বলে, 'ভালই হল। ও বেঁচে গেল। ফিরে গিয়ে বাঁচুক নিজের মতো করে।'

'তুমি একবার খোঁজ করবে না ওর? সেদিন বলছিল তোমার কথা।'

'জানি।'

একটি শব্দের উচ্চারণেই কেমন যেন অচেনা হয়ে ওঠে রণজয়। অনেকক্ষণ পরে ফিরে আসে জবাবে।

'খোঁজ তো করবই। অনিন্দ্যর বোন। যখন ফ্রক পরত, তখন থেকেই চিনি ওকে। রণজয়দা, রণজয়দা করে পাগল হত। মাঝখানে ভুলে গিয়েছিলাম ও আমার কে!'

স্মৃতিতে চলে যায় রণজয়।

স্মৃতি থেকে বেরিয়ে আসে সুতপা।

আর্ল স্ট্রিটে পৌঁছে বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নেমে দেখল আলো জ্বলছে বসবার ঘরে। দরজা খোলা। হয়তো তারই অপেক্ষায়।

এগোতে গিয়েও তবু সামনের দৃশ্যে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। ঘোড়ার পিঠে চড়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে টুটু।

গভীর স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলল সুতপা। আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। এই মুহূর্তে অপ্রয়োজনীয় হয়ে ওঠার মধ্যেও নিজেকে এত ভাল লাগছে কেন!